চিত্রসূচী

মাসানুক্রমিক

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৬৲ টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাক বিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি. পি.তে কাগজ পাঠাইতে হইলে পূর্বাহ্ণে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি. পি. খরচ পৃথক লাগিবে।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

শিল্পী—উমা সেনগুপ্তা

লক্ষ্মণ ও সূর্পণখা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

পৌষ—১৩৬২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

সংস্কৃতির স্বরূপ

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

আজকাল 'সংস্কৃতি' কথাটির বহুল ও ব্যাপক প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। শিক্ষা ও কলাবিদ্যার সহিত সম্পর্কিত প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানকেই 'সাংস্কৃতিক' নামে অভিহিত করা হয়। মনে হয় ইংরাজী cultureএর প্রতিশব্দরূপে সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করা হইতেছে। কিন্তু cultureএর সহিত তুলনায় সংস্কৃতি আরও অনির্দেশ্য ও সমষ্টিদ্যোতক গুণাবলীর ইঙ্গিত করে। culture শব্দটির অর্থ প্রধানত শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্য সমাজের সহিত মেশার ফলে প্রভূত মার্জিত রুচি ও অনিন্দনীয় আচরণ। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল অনুশীলনের ফলে অর্জিত মানস সম্পদ। 'সংস্কৃতি' শব্দে ইহা ছাড়াও আরও অনেক বেশী কিছু বুঝায়। বোধ হয় সংস্কৃতি অপেক্ষা অধুনা অপ্রচলিত 'কৃষ্টি' শব্দই cultureএর অধিকতর সমার্থবাচক। 'কৃষ্টি' অর্থে কর্ষণ বা অনুশীলনের দ্বারা লব্ধ চিৎ-প্রকর্ষ। দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্টি শব্দটি বাংলা সাহিত্য বেশ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই—ইহার প্রয়োগ এখন বিরল হইতে বিরলতর হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই চিৎপ্রকর্ষ সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছু উপাদান ও উপকরণ বুঝাইবার দায়িত্ব এখন 'সংস্কৃতি'র উপর পড়িয়াছে। এই বহুধা-বিভক্ত উৎকর্ষ মণ্ডলের অর্থবিস্তৃতি বহন করিতে গিয়া সংস্কৃতি উহার মূল অর্থ ছাড়াইয়া শিথিল ও অস্পষ্ট প্রয়োগের অনির্দেশ্যতায় কতকটা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অপপ্রয়োগে বিহ্বল এই অতি-প্রয়োজনীয় শব্দটির মূল অর্থটি অনুসন্ধান ও পুনরুদ্ধার করার বাঞ্ছনীয়তা বিশেষ করিয়া অনুভূত হইতেছে।

'সংস্কৃতি' শব্দে একটা জাতির ভাবসাধনা ও জীবন

চর্যার সমগ্রতা সূচিত হয়। ইহার মধ্যে ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজবোধ ও জীবনদর্শনের একত্রীভূত সার-নির্যাস নিহিত আছে। ইহাতে জাতির মহত্তা, ঐতিহ্য ও ক্ষুদ্রতম আত্মবিনোদন প্রয়াস পাশাপাশি অবস্থিত। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ইহাতে সচেতন অনুশীলন অপেক্ষা অর্ধ-চেতন অথচ অপরিবর্তনীয়রূপে স্থিরীকৃত মানস রুচি বা প্রবণতাই মুখ্যরূপে প্রতিভাত হয়। সংস্কারে'র সঙ্গে 'সংস্কৃতির' কেবল রূপগত নয়, অর্থগত একটা গভীর সাম্য আছে। সংস্কার যেমন বুদ্ধি বা ইচ্ছার অতীত জীবনের একটা নিগূঢ়, অস্থিমজ্জাগত, আত্মবিস্মৃত অভিপ্রায়ের স্পন্দন, সেইরূপ সংস্কৃতিও এই জৈবসংস্কারের একটা ভাবজীবনগত সূক্ষ্মতর প্রতিরূপ। যেমন জীবধর্মের কয়েকটি স্থূল অথচ অপরিহার্য প্রয়োজন আমরা চিন্তা ব্যতিরেকে শুধু সংস্কার-বশেই সম্পাদন করি, তেমনি একটি বিশেষ জাতির প্রতিনিধিরূপে আমরা একটি অখণ্ড মানস উত্তরাধিকার অর্জন করিয়া মনের বিভিন্ন বিকাশের মধ্যে তাহার অজ্ঞাতসারে প্রয়োগ করিয়া থাকি। বংশধারা সংক্রামিত দোষগুণের ন্যায়, রক্তকণাবাহিত শক্তি দুর্বলতার ন্যায় সমগ্র জাতির অতীত জীবনসাধনা হইতে প্রাপ্ত এই মানস-বৈশিষ্ট্য আমাদের সচেতন চিত্তের ভিত্তি রচনা করে। অন্তরের এই গোপনস্তরশায়ী প্রবণতা, ঐতিহ্য হইতে আগত মনোলোকের এই প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তিই সংস্কৃতির সত্য পরিচয়।

সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিতে হইলে একটি প্রধান পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহা আমাদের সচেতন মানস চর্চা, তাহা সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিলেও ও সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট হইলেও সংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত নহে। যখন আমরা সচেতন-ভাবে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করি, রঘুবংশ-কুমারসম্ভবের রস আস্বাদন করি বা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ধর্ম-চর্চা করি, তখন এই সচেতন অনুশীলনকে সংস্কৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হয় না। কিন্তু এই কাব্য-চর্চা বা ধর্ম-চর্চার ফলে আমাদের অজ্ঞাতসারে যে মানস প্রকৃতিটি গড়িয়া উঠে, অচেতন স্তরে নিমজ্জিত থাকিয়া আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্মসাধনার জগৎকে পাতালশায়ী কূর্মের ন্যায় ধরিয়া রাখে—তাহাই সংস্কৃতি। বাস্তব জীবনের কোন আকস্মিক আঘাতে, কোন অপ্রত্যাশিত সঙ্কটমুহূর্তে, অবসরকালের আত্মবিনোদন বা সামাজিক উৎসবের স্মৃতিবাহিত প্রেরণায় এই সুপ্ত মানসপ্রবণতা, হাজার বৎসর ধরিয়া অবচেতন মনের তলদেশে সঞ্চিত এই আত্মবিস্মৃত ভাবসত্তা হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া সংস্কৃতির রূপে আত্মপ্রকাশ করে। নদীর জল প্রবাহের ন্যায় আমাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মধারা ও চিন্তাধারা যখন পূর্বপরিকল্পিত লক্ষ্যের মুখে ছুটিয়া চলে, তখন তাহা সংস্কৃতি নহে; কিন্তু এই বেগবান প্রবাহের নীচে নদীখাতের যে গভীরতা সৃষ্ট হয়, তটভূমি যে রেখা-চিহ্নিত হয়, বালুকারাশির নীচে যে ফল্গুধারা আত্মগোপন করিয়া সুশীতল নির্ঝররূপে উৎসারিত হয়, সেইখানেই আমরা কর্মমূলজড়িত সংস্কৃতির গোপন পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারি।

(২)

জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ ধর্ম, সমাজবোধ ও সাহিত্যরূপী যে ত্রিধারার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, উহারাই সংস্কৃতির মূলে রসসিঞ্চনের প্রধান হেতু। কিন্তু সংস্কৃতির প্রসার উক্ত ত্রিধারার পরিধি হইতে অনেক বেশী। সংস্কৃতির মধ্যে জাতির উৎসব, উহার সুকুমার শিল্পকলার লৌকিক প্রকরণ, উহার মনোরঞ্জনের বিবিধ আয়োজন, এবং লৌকিক স্তরের নৃত্য, গীত প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। জাতির মন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত না হইয়া যে উদ্বৃত্ত আনন্দরসের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশের বিচিত্র পথ অনুসন্ধান করে, তাহার মধ্যেই তাহার সংস্কৃতির পরিচয় নিহিত। উৎসবের পূজামণ্ডপে ও শাস্ত্রবিধি অনুসরণে ধর্মের অধিকার; কিন্তু প্রতিমার চালচিত্রে অঙ্কিত যে সমস্ত মূর্তি পটুয়ার বন্ধনহীন কল্পনালীলার স্বাক্ষর বহন করে, উৎসব প্রাঙ্গণে যে নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক ও লোকচিত্তের অসংস্কৃত আনন্দোচ্ছ্বাস প্রাকৃত জনসাধারণের ভিড় জমায়েত করে, সেখানে ধর্মের সিংহাসনে সংস্কৃতি ভাগ বসাইয়াছে! কালোয়াতী সঙ্গীতের আসরে যে সমস্ত রসজ্ঞ বোদ্ধা সুরতালের রহস্য ভেদ করিয়া উহার পূর্ণ মাধুর্য আস্বাদনের অধিকারলাভ করিয়াছে তাহারা অনুশীলনের প্রত্যাশিত পুরস্কারই অর্জন করে। কিন্তু এই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর পিছনে কলাকৌশলে অনভিজ্ঞ আর একদল শ্রোতাও এই আনন্দের প্রসাদ পায়। তাহাদের মনের গভীরে এই সুরের অনুরণন প্রবেশ করিয়া

উহাকে একটা মাধুর্যরসে আপ্লুত করে ও উহার মধ্যে একটা সঙ্গীতমুখী আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া উহার রুচিগঠনে সহায়তা করে। এখানে আমরা পাই শিক্ষার পরিবর্তে উহার পরোক্ষ ফল সংস্কৃতি। যাহারা যাত্রা অভিনয়ের বিষয়ের পৌরাণিক মহিমা সচেতনভাবে উপলব্ধি করে তাহারা বিদগ্ধ শ্রোতা। কিন্তু এই যাত্রার আসরের সুদূর কোণগুলিতে আসীন যে নিরক্ষর, পুরাণজ্ঞানহীন শ্রোতৃমণ্ডলী কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া এই অভিনয়ের দৃশ্যগুলি মুগ্ধ, আত্মভোলা মনে অনুসরণ করে ও এক অনির্দেশ্য ভাব-রোমাঞ্চের শিহরণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে; তাহারা এক গোপন চেতনাবাহী সংস্কৃতির অনতিক্রম্য প্রভাবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বাউলের গান, রামপ্রসাদী সঙ্গীতের অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা এই সংস্কৃতির গোপনখনিত সুড়ঙ্গপথেই প্রাকৃত চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সহস্র বৎসরের শিক্ষা দীক্ষা সাধনা আমাদের চারিদিকে যে একটা অদৃশ্য, অথচ অতিমাত্রায় সজীব ও সক্রিয়, ভাবপরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে আমরা অজ্ঞাতসারে উহা হইতেই নিঃশ্বাস গ্রহণ করি ও এই নিঃশ্বাস বায়ুর ভিতর দিয়াই অতীত ইতিহাসের সবটাই আমাদের অনুভূতিতে সূক্ষ্ম অশরীরীরূপে পুনরাবৃত্ত হয়। জীবন-উদ্যানে ফুল ফোটাইবার কাজে হয়ত আমাদের কোন সক্রিয় অংশ ছিল না; কিন্তু এই ফুলের সম্মিলিত সৌরভ কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরা পড়ে। এই অতীতের তীর হইতে বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চারিত সৌরভই সংস্কৃতি।

(৩)

আজকাল কিন্তু সংস্কৃতি শব্দটি সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা ধর্ম বা উচ্চতর সাহিত্য ও কলাবিদ্যার সহিত প্রায় নিঃসম্পর্ক। অধুনা সংস্কৃতি বলিতে আমরা বেদ-উপনিষদ-গীতার ধর্ম বা কালিদাস-ভবভূতির কাব্য বুঝাইতে চাহি না—জাতীয় প্রতিভার এই উচ্চতম বিকাশগুলি এখন সংস্কৃতির সর্বব্যাপী পরিধি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন সংস্কৃতি অর্থে জাতীয় মানসের লঘুতর রুচি ও প্রবণতা সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা হয়। সামাজিক রীতি-নীতি বা আচার-ব্যবহারের মধ্যে কোন বিশেষ সৌকুমার্য বা সুরুচিবোধ, উৎসবের মধ্যে ধর্মের প্রত্যক্ষ সম্পর্কবর্জিত কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক অনুষ্ঠান, নৃত্যগীতের মধ্যে কোন বিশিষ্ট কলাকৌশল বা ভাবদ্যোতনা, মাঙ্গল্যকর্মে সজ্জাবিধান ও আলিম্পন রচনা—মানস আভিজাত্যের কোন বিশেষ পরিচয়—এইগুলিকেই বিশেষভাবে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সংস্কৃতি ক্রমশঃ উচ্চকোটি হইতে নিম্ন-কোটিতে নামিয়া আসিতেছে, জাতীয় অতীত কীর্তিকলাপ অপেক্ষা মানস রুচি ও আপাতদৃষ্টিতে অকারণ উল্লাস, প্রাণহিল্লোলের অদম্য উচ্ছ্বাসের উপরেই ইহার দ্বারা বেশী ঝোঁক দেওয়া হইতেছে। বিবাহ বা অন্যান্য শুভ কর্মে কতকগুলি মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠান আছে—এগুলির হয় ত এককালে ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ বা কিছু সাঙ্কেতিক অর্থ ছিল। এখন এগুলি সংস্কৃতির ক্ষীণসূত্রে বিধৃত ও সুস্পষ্ট তাৎপর্যহীন হইয়া কেবলমাত্র মনের উৎসবরাগ বা আনন্দ-কম্পনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উৎসবে নারীদের নৃত্যগীত ভদ্র বাঙ্গালী সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে এই প্রথা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও প্রচলিত ছিল এবং এগুলিতে অঙ্গভঙ্গীর যে সুরুচিসম্মত, মৃদু ছন্দ, যে সুষমাময় পরিচিতি বোধ ও আতিশয্য বর্জনের পরিচয় মিলে তাহাতে ধর্মের অনুশাসন কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা বোঝা যায়। লোকগীতির বিভিন্ন প্রকারে কবি গান, বাউল গান, দেহতত্ত্বঘটিত গান, ফকিরের গান প্রভৃতিতেও ধর্মের আদিম ভিত্তির উপর সংস্কৃতির নবীন উন্মেষের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত লোকগীতিতে শাস্ত্রধর্মের প্রভাব পরোক্ষ, মানস-চেতনার গভীর স্তরনিহিত, ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক আদর্শের মহিমা দীর্ঘ অনুশীলন ও অভ্যাসের ফলে স্মৃতি-নিমজ্জনের অন্তরাল হইতে উত্থিত হইয়া এক নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সঙ্গীতের সুর শুদ্ধ হইলেও যেমন উহার রেশ মনে বাজিতে থাকে, তেমনি ধর্মসাধনার স্মৃতির আভাস সংস্কৃতির নব রূপায়ণের মধ্যে নিজ অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়।

তা ছাড়া মেয়েদের ব্রত, পাঁচালী, কৃষিপ্রধান দেশের নবান্ন, পৌষপার্বণ প্রভৃতি উৎসব, নিম্নশ্রেণীর ভাদু গান

প্রভৃতির মধ্যে এই ধর্মপ্রভাবিত সংস্কৃতির নানা বিচিত্র রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। অস্থিমজ্জাগত অত্যাজ্য সংস্কাররূপে বর্তমান ধর্মচেতনার সহিত লৌকিক আনন্দ মিশিয়া এই সংস্কৃতিরূপ মানস-আবরণীর সূত্র রচনা করিয়াছে। এগুলির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নিছক মনোরঙ্গিনী-বৃত্তি ও ঐহিক আমোদপ্রিয়তা ধর্মের আকাশ-বাতাস-ব্যাপী অদৃশ্য প্রভাবে একরূপ উর্ধ্বায়ন-প্রবণতা লাভ করিয়াছে। যাহা স্থূল ভোগের বিষয়, যাহা সুখলাভের উপলক্ষ, যাহা সামাজিক মিলনের উপায় তাহাই ধর্মের সূক্ষ্ম আস্তরণে আবৃত হইয়া কাষায়-বস্ত্র-পরিহিতা পূজারিণী কুলবধূর ন্যায় একটি শান্ত, সৌম্য শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা যে মূলতঃ ধর্মবোধ হইতে উদ্ভূত তাহার প্রমাণ ইহাদের সমাজমনের উপর বদ্ধমূল, অনপনেয় প্রভাবে। ইহাদিগকে শুধু লৌকিক আনন্দ প্রকাশের উপায়রূপে গ্রহণ করিলে ইহারা সমাজ-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্বীকৃতি লাভ করিত না—প্রয়োজনবোধেও উৎসাহ মন্দীভূত হইলে ইহাদিগকে ত্যাগ করা সহজ হইত। কিন্তু ধর্মের মূল অনুভূতি যে গভীরে প্রসারিত, সেই মূলের সহিত জড়িত হইয়া ইহারা ধর্মেরই শাশ্বত মূল্য ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ধর্মের বন্ধুর পর্বতগাত্রে শ্যামশষ্পের কোমল শোভারূপে ইহারা পর্বতের দুর্জয় শক্তি ও ধ্বংসহীন চিরস্থায়িত্বের অংশীদার হইয়াছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় নিম্ন শ্রেণীর কাহারদের জীবনযাত্রা বর্ণনার মধ্য দিয়া তাহাদের সংস্কৃতি ও জীবন-বোধের যে অনবদ্য ছবি আঁকা হইয়াছে তাহাতে ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতিশাসিত জীবনের সুগভীর রহস্যটি চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

কাহার পাড়ার মাতব্বর বনোয়ারির প্রতিটি কর্ম ও চিন্তা, তাহার কুসংস্কার ও ভূতের ভয়, তাহার দলপতির কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ, এমন কি তাহার পাপাসক্তি ও পদস্খলন ও কাহারগোষ্ঠীর মদের আড্ডার অসংযম ও মাতামাতি—এ সমস্তই এক সদাজাগ্রত দৈবশক্তির অতন্দ্র, পলকহীন পর্যবেক্ষণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপনিষদের সেই মহা-মন্ত্র 'ঈশাবাস্য মিদং' এই নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মূঢ়, সঙ্কীর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তে কিরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে ভাবিলে হিন্দু সংস্কৃতির প্রসারণশীলতা ও জীবনের মূলদেশ পর্যন্ত অনুপ্রবেশ শক্তির পরিচয়ে আশ্চর্য হইতে হয়।

(৪)

সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল সেই মানদণ্ডে আধুনিক যুগের তথা-কথিত সংস্কৃতির বিচার করিলে উহা কতদূর সংস্কৃতিপদবাচ্য সে সম্বন্ধে কতকটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়। সংস্কৃতির পরিধি ধর্মবোধ ও জীবনদর্শন হইতে ক্ষুদ্রতম আমোদ-আহ্লাদ ও কলানুশীলনের খুসি-খেয়াল পর্যন্ত প্রসারিত। অবশ্যপালনীয় ধর্মানুষ্ঠান ও পটুয়ার ছবি ও মেয়েদের হাতে আঁকা আলপনা সবই একই অনুভূতি-কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত। এই সমস্ত বিচিত্র বিকাশের সাধারণ বৃন্ত ও আশ্রয়স্থল হইল একটা জাতির জীবন-নিরীক্ষা-প্রসূত একটি কেন্দ্রগত জীবনবোধ। যেখানে এই বিশিষ্ট জীবনবোধ নাই, সেখানে সমস্ত সামাজিক উৎসব ও বিভিন্ন প্রকারের কলানুশীলন কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টি ও চিত্ত-বিনোদনের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস মাত্র। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বতন্ত্র হইয়াও এক কেন্দ্রীয় প্রাণলীলার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ-দ্যোতনা, কিন্তু মৃত বা পঙ্গু দেহের অংশগুলি এই সামগ্রিকতার উপাদানরূপে প্রতিভাত হয় না। বৃক্ষের স্থূল কাণ্ড হইতে তাহার প্রান্তলগ্ন ক্ষুদ্রতম পাতাটি পর্যন্ত একই মূলে বিধৃত, শাখা-প্রশাখাবাহী একই রসে পুষ্ট। একই প্রাণসত্তার কোথাও বা বজ্রদৃঢ়, কোথাও বা পুষ্পপেলব লীলাভিব্যক্তি। জীবন্ত সংস্কৃতিরও সেইরূপ অত্যাজ্য ধর্মবোধ হইতে সামান্য আচার ও নৃত্যগীতের উল্লাস-ছন্দ পর্যন্ত একই বৃহৎ জীবনোপলব্ধির তরঙ্গোৎক্ষেপ মাত্র। সংস্কৃতির এই কঠোর ও কোমল দিকের যদি সমন্বয় না হয়, ধর্মের মধ্যে আনন্দ ও আনন্দের মধ্যে ধর্মের চেতনা যদি না থাকে, তবে তাহা কেন্দ্রচ্যুত, আদর্শ-ভ্রষ্ট ও জীবনীশক্তিহীন। যে নারী কেবল নিজের অঙ্কন-নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য আলপনা দেয়, তাহার মধ্যে সংস্কৃতির প্রভাব নিষ্ক্রিয়; যে আলপনা আঁকিবার সময় ইহা যে লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের পীঠস্থান প্রতীক, ইহা যে শুভের আমন্ত্রণের অর্ঘ্য রচনা, ইহা যে অন্তরের একান্ত বিশ্বাস ও আকুতির চিত্ররেখা এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তাহারই ক্ষেত্রে ইহা সংস্কৃতির সার্থক রূপায়ণ। যে ধর্মপ্রাণা মহিলা গার্হস্থ্যধর্মের উচ্চতম আদর্শকে জীবনে গ্রহণ

করিয়াছে, যাহারা সতীত্ব রক্ষার জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিত বা স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতে দ্বিধা করিত না। তাহাদেরই মেয়েলি ব্রত-অনুষ্ঠান বা উৎসবে স্ত্রী-আচার পালনের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে সমগ্রসত্তানিহিত জীবন-সাধনার একটি কমনীয় রূপ প্রকাশিত হয়। আমাদের কঠোর বিধিনিষেধপালন, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক বিচার, আমাদের জীবনাদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিবার একটা প্রবল আগ্রহ ও উদ্যমই আমাদের চিত্তবিনোদনের বিশিষ্ট রীতি, উৎসবের বিচিত্র বিন্যাস-পদ্ধতির পটভূমিকা রচনা করে। পূজার আসনে বসিয়া যাঁহার ধ্যান করি, মন্দিরের অভ্রভেদী মহিমায় যাঁহার বিরাটত্বের প্রতিচ্ছায়া দেখি, সুকুমার শিল্পকলার দ্বারা তাঁহারই চরণে সৌন্দর্যের অর্ঘ্য নিবেদন করি, আনন্দে ও ক্রীড়াকৌতুকে তাঁহারই প্রসন্ন সাহচর্যের স্নিগ্ধ স্পর্শ দেহেমনে পুলক রোমাঞ্চ জাগায়। এই সর্বাঙ্গীণ জীবনানুভূতি সংস্কৃতির মূল কথা।

বর্তমান যুগে শিক্ষা-দীক্ষার ফলে যে নূতন ধরণের মানস আগ্রহ ও বিনোদনস্পৃহা উদ্ভূত হইয়াছে তাহা পূর্ব-বর্ণিত সংস্কৃতির আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা জীবনের মূলের সহিত নিঃসম্পর্ক, কোন গভীর জীবনবোধ ইহার উৎস নহে। আজকালকার সভা-সমিতিতে মানস অনুশীলন ও আনন্দ বিতরণের যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়, তাহারা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীপের মত জীবনস্রোতের উপর মাথা তুলিয়া আছে। উহাদিগকে সংস্কৃতি অপেক্ষা সচেতন কৃষ্টির সহিতই যুক্ত করা বিধেয়। সাহিত্য-আলোচনা, নৃত্য-গীতের উৎসব, আবৃত্তি, অভিনয়, হাস্য-কৌতুক—এগুলি আমাদের নূতন-শেখা বিদ্যা ও মনোরঞ্জনবৃত্তির সামাজিক প্রয়োগ, ইহারা কোন অখণ্ড জীবনানুভূতির নানামুখী প্রকাশ নহে। এখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও সমাজ-জীবনে আমাদের সমগ্র মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের কোন সুযোগ নাই—কাজেই এই শিক্ষা ও সমাজ-চেতনাপ্রসূত যে সংস্কৃতি তাহা জীবনের গভীর মূল পর্যন্ত প্রসারিত হয় না। তাছাড়া আধুনিক জীবনযাত্রা কোন সামগ্রিক জীবনবোধ নিয়ন্ত্রিত নহে। যে সংস্কৃতি ধর্মবোধের সম্প্রসারণ বা পরিণত ফল তাহা স্বভাবতই কেন্দ্রাভিমুখী; কিন্তু যাহা তিল তিল করিয়া বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত, যাহার মূলে কেবল আছে মানসিক আগ্রহ, মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্যবোধ, যাহা বিবিধ আদর্শের যদৃচ্ছালব্ধ সারসংকলনে গঠিত—তাহা অখণ্ড, আদিম জীবনানুভূতির অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী হয় না, তাহা জৈব সংস্কারের মানস সংস্করণের মত সমগ্র সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় না। হয়ত আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল পরিধি, আদর্শসংঘাতের বিভ্রান্তকারী প্রতিক্রিয়া ও মনের স্বেচ্ছা-নির্বাচনপ্রবণতার মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্রিকতা পুনরাবৃত্ত হইবে না। আমরা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহা কিছু আহরণ করিব, তাহা মনের উপরিভাগে একটি মার্জিত স্তর রচনা করিবে, তাহা আমাদের সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে একটি শিষ্টাচারের আদর্শ, একটি লঘু আনন্দের মৃদু কম্পন, রুচি সাম্যগত একটা নৈকট্যবোধের সৃষ্টি করিবে। ইহার অতিরিক্ত কিছু আমরা আশা করিতে পারি না। ধর্মের বন্ধনই যেখানে শিথিল, জীবনবোধ যেখানে বিচ্ছিন্ন অনুভূতি পরম্পরের সমষ্টি, যেখানে আস্বাদ-বৈচিত্র্য নানাবিধ রুচি-বৈষম্যের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে—সেখানে সংস্কৃতির সমগ্র জীবনব্যাপী প্রভাব প্রত্যাশা করা যায় না। কোন ভবিষ্যৎ যুগেও যে এইরূপ সংস্কৃতি পুনরায় গড়িয়া উঠিবে তাহাও অনুমানের অতীত। আমরা হয়ত কালের পরিবর্তনশীলতা ও অগ্রগতির সঙ্গে আনন্দের নূতন নূতন উপাদান খুঁজিয়া পাইব। ছায়াচিত্র যেমন এখন নাটক ও যাত্রাকে পিছু হটাইয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, সেইরূপ হয়ত নূতন কোন চিত্তরঞ্জনের উপায় পুরাতনকে স্থানচ্যুত করিবে। হয়ত পুরাতন পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া শিশু যেমন নূতন পুতুলের দিকে আকৃষ্ট হয়, মানবজাতির মধ্যে যে শাশ্বত শিশু বাস করে সেও তেমনি নূতন ক্রীড়াকৌতুকে মাতিবে। কিন্তু মহাকাব্যের মত প্রাচীন সংস্কৃতির যে একীকরণ শক্তি, সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিকে একই লক্ষ্যাভিমুখী করার যে অমোঘ প্রভাব তাহা আর মানবজাতির ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হইবে কি না সন্দেহ।

• •

ছোটলোক

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অতিক্রান্ত জীবনের পানে চাহিয়া দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর কথা বেশ মনে পড়ে। তাহার মধ্যে কত লোক, স্ত্রী পুরুষ, এই জীবনের পথে আসিয়াছে, গিয়াছে, কেহ দাগ রাখিয়া গিয়াছে, কাহারও পদচিহ্ন ধূলার পথে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বৃহৎ ক্ষুদ্র কত ঘটনা, কত লোক অতীতের আলেখ্যে ভীড় করিয়া আছে। তাহার মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র তুচ্ছ মেয়ের কথা আকাশের তারার মত উজ্জ্বল হইয়া আছে।

তারা তথাকথিত ছোটলোক, অশিক্ষিত, গ্রাম্য—আমার সঙ্গে ছিল প্রভু ভৃত্য সম্পর্ক, পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ নয়—তথাপি তাহাদের কথা মনে পড়ে, কেবল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত, ভদ্র, সমাজের পরে একটা সন্দেহ জাগে। শিক্ষা, সভ্যতা ও আধুনিকতার মোহে আমরা কি হৃদয় হারাইতে বসিয়াছি—আমরা কি হীরক ফেলিয়া কাঁচ ধরিয়াছি ?

শীতের রাত্রি। মাঘ মাস—অস্বাভাবিক শীত পড়িয়াছে। একটা লেপেও যেন শীত মানায় না। লেপের নীচে কোমল বিছানায় গরম করিয়া শুইয়া কি যেন একটা বই পড়িতেছিলাম এবং চোখের পাতা ভারী হইতেই লণ্ঠন কমাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

নিশীথ রাত্রিতে একটা উৎকট হৈ হৈ শব্দ। ধপাধপ্ যেন কয়েকবার লাঠি পড়িল—একটা নারী কণ্ঠের চিৎকার—কোনও পরুষ পুরুষের আস্ফালন, তাহার পর সব চুপ্ চাপ্—

তাড়াতাড়ি উঠিয়া শিয়র হইতে বন্দুক ও কার্টিজের থলেটা লইয়া, টর্চ্চসহ বাহির হইয়া পড়িলাম। সম্ভবতঃ ডাকাত পড়িয়াছে এবং প্রাথমিক আক্রমণের পরে গৃহস্থকে পরাভূত করিয়া লুণ্ঠন করিতেছে। গোলমালের দিক্‌টা অনুমান করিয়া অগ্রসর হইলাম—

চারিদিকে অন্ধকার, টর্চ্চ ইচ্ছা করিয়াই জ্বালি নাই। ডাকাতদের হাতে যদি আগ্নেয়াস্ত্র থাকে তবে টর্চ্চ জ্বালা মারাত্মক। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিব এবং ডাকাতদল সম্মুখীন হইলে বা দেখা গেলে গুলি চালাইব ইহাই ছিল ইচ্ছা। সেই জন্যই অন্ধকারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম—কিন্তু দ্বিতীয়বার কোনরূপ চিৎকার বা শব্দ না পাইয়া একটা মোড়ে দাঁড়াইয়া গেলাম—কোন বাড়ীতে ডাকাত পড়িল ?

কোন শব্দ নাই। আনুমাণিক ভাবেই একটা পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় কে যেন ডাকিল—ছোটবাবু—

—কে ?

—আমি ভরত। কোথায় যাচ্ছেন—ওদিকে আর যাবেন না।

—কেন ? ডাকাত পড়ল না কি দেখ্‌তে হবে না—

—আজ্ঞে না, আমরাই—

—তা হৈ চৈ কেন ? কি হ'য়েছে ?

ভরত একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল—বাবু—এজ্ঞে—মানে একটা 'ঘটিৎ' ব্যাপার তাই একটু হৈ চৈ। লাজের কথা আপনি যাবেন না।

'ঘটিৎ' ব্যাপার অর্থে স্ত্রী-ঘটিত কোন কেলেঙ্কারী এবং তাহাই লইয়া ধরাধরি বা মারামারি হইয়াছে এবং হইবে। ভরতরা গ্রামের ছোটলোক, চাষী শ্রেণীর নিরক্ষর লোক, তাহাদের 'ঘটিৎ' ব্যাপার অনুসরণ করিয়া যাওয়া ঠিক কিনা ভাবিতে ভাবিতে প্রশ্ন করিলাম—তাই বলে তোরা ডাকাত-পড়ামত করবি, আর আমরা এগোবো না ? চুপ করে থাক্‌বো ?

—আজ্ঞে তা নয়, তবে কিনা—আপনি ছোটবাবু, আমাদের পাড়ায় কেলেঙ্কারী—

ভাবিয়া চিন্তিয়া ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা জানিবার জন্য বড় কৌতূহল রহিয়া গেল।

পরদিন আমার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই গ্রামের সকলে কথাটা জানিয়া ফেলিয়াছে। আমি চা-পান করিবার সময়েই ব্যাপারটা যাহা জানিলাম তাহা সংক্ষেপে এই—

আমাদের বাড়ীতে এবং পাড়ায় ধানভানা চিড়াকোটা প্রভৃতি কাজ করিয়া একটি বিধবা জীবনধারণ করিত। লোকে তাহাকে কিরণের মা বলে, বয়স বছর ২৬, কিরণের বয়স বছর দশ। দেহটা তাহার মজবুত এবং হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বয়স উনিশ কুড়ি হইতে পারে। সে বিধবা, আজ কয়েক বৎসর বিধবা হইয়া এই ভাবেই জীবনধারণ করিতেছে। মেয়েটি সৎ এবং সত্যবাদী—কথা দিয়া তাহা উপেক্ষা করে না, সেইজন্যে আমার মা তাহাকে সত্যই স্নেহ করিতেন।

কিরণের মা ও তৎসহ হেমন্ত নামে একটি যুবক কিরণের মায়ের কুটীরে গতরাত্রে আবিষ্কৃত হয় এবং অন্যান্য যুবকগণ উভয়কে ভালরকমই প্রহার করিয়াছে।

মা কহিলেন—কিরণের মাকে নাকি আধমরা করেছে সকলে—কি অন্যায় বাড়ীতে ঢুকে মারবে একটু থাম্‌ত, এর বিচার নেই? ধান ভান্‌তে আসবে কথা ছিল কিন্তু বেঁচে থাকলে ত আসবে—

—তাকে ডাকিয়ে আনো—

ডাকিবার পূর্ব্বেই কিরণের মা আসিয়া উপস্থিত হইল—মাথায় একটা স্থান কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে হলুদ লাগানো দেখা যায়—মায়ের প্রশ্নে সে দেখাইল, পিঠে দুইটি লাঠির আঘাত কালো হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মা কহিলেন—কেন মারলে তোকে? কি হ'য়েছে—তারা মারবার কে—যা ওকে থানায় নিয়ে যা।

মা হয়ত সবটা জানিতেন না, তিনি স্নেহ ও করুণায় ইহার একটা প্রতিকার করিবার জন্যে আমাকে আদেশ দিলেন।

আমি বলিলাম—আমি দেখ্‌ছি—

—দেখ্‌ছি নয়, এক্ষুণি ওকে নিয়ে থানায় যা। দারোগাদের ভাত রাঁধতে রাঁধতে হাড় কালি হ'য়ে গেল, আজ এর প্রতিকার করবে না—যা কিরণের মা, ছোটবাবুর সঙ্গে থানায় যা—দেখি সব কতবড় আস্পর্দ্ধা—

মাতার আদেশ অমোঘ—আমাদের সংসারের রীতি এই। অতএব কহিলাম—চল্‌ কিরণের মা—চল্‌—

কিরণের মা মাথাহেট করিয়া শুধু কহিল—ধান বের করে দিন মা।

—ধান ভান্‌তে হবে না, মুখপুড়ী, থানায় মরে এস আগে—

কিরণের মাও জানিত আমার মায়ের ইচ্ছা বা আদেশ কেবল আমার নয়, অন্যের পক্ষেও অবশ্য পালনীয়। দাদামহাশয় ছিলেন নীলকুঠিয়াল জমিদার, মা সম্ভবতঃ মাতামহের জিদ ও তেজস্বিতার কিছু পাইয়াছিলেন, কাজেই তাহার আদেশ অমান্য করিলে তাহার ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইত।

আমি বলিলাম—তবে একটু খাবার করে দাও, কিরণের মাকেও দাও—

আমি স্থানীয় হাইস্কুলের হেডমাষ্টার, দারোগাবাবুরা আমার বন্ধুলোক একথা সকলেই জানিত—সেখানে মুখের কথায় অনেক কিছু হইতে পারে। এহেন আমি কিরণের মাকে লইয়া থানায় যাইব—কথাটা মুহূর্ত্তে প্রচারিত হইল এবং অনতিবিলম্বেই ভরতরা আসিল। আমি সালিশ করিয়া দিলাম—স্ত্রীলোককে মারিবার জন্য ১০৲ টাকা জরিমানা কিরণের মা'কে দিতে হইবে। হেমন্তকে সামাজিক ভাবে শাসন করিতে হইবে ইত্যাদি—

কিরণের মা'র পিতৃগৃহ আমার শ্বশুরালয়ের গ্রামে, সেই সম্পর্কে সে আমাকে দাদাবাবু বলিত এবং মাঝে মাঝে একটু ঠাট্টাও করিত। একদিন তাহাকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম—কিরণের মা, সালিশ ত করলাম, সত্যিকার ব্যাপারটা আমাকে বল্‌ ত।

কিরণের মা লজ্জিত হইয়া কহিল—ছোটবাবু, ও আমাদের ছোটলোকদের কুচ্ছো কথা—আপনাকে কি ব'লবো—শুনেই বা কি করবেন?

—ক'রবো আবার কি? তবে জান্‌তে ইচ্ছে ক'রছে তাই জিজ্ঞাসা করলাম—

—যদি হুকুম দেন ত বলি—শেষে আপনিই বল্‌বেন আমাকে বজ্জাত—

—বল্‌—

কিরণের মা মুখটা ফিরাইয়া লইয়া কহিল—আজ্ঞে, আমাদের মধ্যে চরিত্তির ত কারও ভাল নয়—ঘর ঢোকাঢুকি ত লেগেই আছে—

—তুই—তুই—ভাল নয়।

কিরণের মা একটু হাসিয়া কহিল—মিথ্যে বলব না, বাবু—আমিও ভাল না—আমাদের মধ্যে ভাল কেউ থাক্‌বারও পারে না—

—তার পর—কি জন্যে—

—আজ্ঞে ঐ কিরণের বাপ মারা যাওয়ার পর ভরতই প্রথম নষ্ট করলে—তবে ভরত ভাল নয়, ওই চারিদিকে ছোটাছুটি করে। হেমন্ত অনেক দিন থেকেই বলছিল আজ্ঞে তাই—সেই আক্রোশে ভরত ঠেঙ্গা লাঠি নিয়ে এসেছিল।

—হেমন্ত কোথায়—

—আজ্ঞে, মার খেয়ে ক'দিন ভিন্ গাঁয়ে গেছে—ভরতও দেওয়া জিনিষ ফিরে পাবে ত?—

—এই রকমই চলে চিরদিন, বারোমাস—

কিরণের মা কহিল—আর আমাদের কুচ্ছো শুন্‌বেন না দাদাবাবু—আপনার কাছে মিথ্যে বল্‌তে পারবো না।

কিরণের মা ভাল নয় জানিয়াও মনে মনে তাহার এই অকপট সত্যবাদিতার সেদিন প্রশংসা করিয়াছিলাম—স্ত্রীলোক এমনি করিয়া স্বীকার করে নিজের পাপ!

১৯৪৭ সালের শেষাশেষি স্বাধীন ভারতে চলিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম ও গৃহ ভূসম্পত্তি আত্মীয় পরিজন বাস্তু ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছি—কেন, সে অনেক কথা।

পূর্ব্ব পুরুষের ভিটায় কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ দ্রব্য মিলিয়া যে সংসার তাহা কেবল যাহারা ত্যাগ করিয়াছে তাহারাই জানে। ঢেঁকি, চালুনী, কুলো, ধামা, হাঁড়ি, টিন, কাট, কত কি দ্রব্য, তাহা না হইলেও সংসার চলে না, আবার স্থানান্তরেও লওয়া চলে না।

জমি ঘর বিক্রয়ের পরে, ভারতে মাল পাঠানো হইতেছিল—কিন্তু এ সব ত লইয়া আসা যায় না।

পাড়ার কাকীমা, মাসিমা সকলেই আসিতেছিলেন এবং এ ধামাটা আমাকে দিয়ে যাও, ও বঁটিখানা আমাকে দাও বলিয়া তাহারা সেগুলি সংগ্রহ করিতেছিলেন। আমি মনে মনে হাসিতেছিলাম—দুদিন পরে আবার এমনি দিয়ে যেতে হবে—তা ওঁরা এখনও জানেন না।

কেহ কুশল প্রশ্ন করিতে আসিয়া, অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া বিদায়ের সময়ে একটা টিন হাতে করিয়া গেলেন, এমনি ভাবে জিনিষপত্র বিতরণ চলিতেছিল। স্বজাতীয় ভদ্রলোকগণের মধ্যে যাহা হয় কিছু পাইবার কি দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা।

মা একদিন কিরণের মাকে ডাকিয়া কহিলেন—তুই ঢেঁকিটা, আর ধামা হাঁড়ি যা নিবি নিয়ে যা, সবই ত সকলে নিয়ে গেল—

কিরণের মা অশ্রুসজল চোখে কহিল—মা আপনারাই যদি চলে যান, তবে কুলো ধামা নিয়ে আর কি করবো—

—লাগ্‌বে, তুই ত যাবিনে? কোথায় বা যাবি?

—মাপ করবেন মা, আমি নিতে পারবো না—

আমি ধমক দিয়া তাহাকে বুঝাইলাম—বোকামী করিস্‌নে কিরণের মা, ঢেঁকি ধামা থাক্‌লে তাতেই পেট তোর চল্‌বে। নিয়ে যা—

সে আমার পায়ের নিকট বসিয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে কহিল—আমাকে এই সব নিতে বল্‌বেন না, ছোটবাবু। ও আমি নিতে পারবো না—

কিরণের মা আসিত যাইত, সমস্ত কার্য্যে সাহায্য করিত কিন্তু কোনদিন এতটুকু জিনিষও গ্রহণ করে নাই। আশ্চর্য্য হইয়াছি, দুশ্চরিত্রা কিরণের মা এত বড় নির্লোভ হইল কেমন করিয়া!

শেষ বিদায়ের দিন মনে পড়ে—

ঘাটে নৌকা বাঁধা। জিনিষপত্র বোঝাই হইল, সকলে ধীরে ধীরে নৌকায় উঠিলাম। মা শেষবারের মত ত্যক্ত ভিটার পানে চাহিয়া অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া নৌকায় উঠিলেন। আমিও পা ধুইয়া উঠিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া কহিলাম—তবে যাই—

ঘাটে প্রতিবেশীগণ সাশ্রুনেত্রে দাঁড়াইয়া—অদূরে দাঁড়াইয়া অস্পৃশ্যা কিরণের মা—সে হাপুস্ নয়নে কাঁদিতেছে—

বিদায় সময়টা বড়ই বেদনাময়—তাই কহিলাম—নৌকা খোলো, মাঝি—কম্পিত কণ্ঠে প্রতিবেশী পুরুষ স্ত্রীগণের দিকে চাহিয়া কহিলাম—যাই তবে—

নৌকা চলিল—কিরণের মা মাটির উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—মা ছোটবাবু—আর আস্‌বে না গো—আর আস্‌বে না—

পিছন ফিরিয়া চাহিলাম—গুলিবিদ্ধ কবুতরের মত কিরণের মা দাপাদাপি করিতেছে। কাঁদিয়া ফেলিব ভয়ে দ্বিতীয়বার ফিরিয়া তাকাইতে সাহস হয় নাই—

নৌকা নিরুদ্দেশের পথে ভাসিল—

ভাসিতে ভাসিতে স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রামে হেডমাষ্টার হইয়া আসিলাম। বন্ধু আত্মীয়-প্রতিবেশীহীন মন, চারি বৎসরকাল অবস্থানের মধ্যে সকলকে আপনার করিয়া লইল। মনে হইল—জীবনের শেষ অংশে এঁরাই পরমাত্মীয়। বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী জেঠা, মেসো সবই জুটিল—ভাবিলাম নূতন করিয়া সংসার পাতিব।

বাসায় নীরবে একটি ২২।২৩ বছরের বাগ্‌দী বৌ ঝির কাজ করিত। ঘোমটা টানিয়া প্রয়োজনীয় সবই করিত—তাহার নাম দাসু। আমার সঙ্গে সে কোনদিন প্রত্যক্ষ-ভাবে আলাপ করে নাই—প্রশ্ন করিলে ছেলেপুলে মারফৎই উত্তর দিত। কদাচিৎ হ্যাঁ না উত্তর দিত।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের সহিত মতবিরোধ হওয়ায় চাকুরী ছাড়িয়া দিলাম। বন্ধুবান্ধব যাহারা তাহারা কহিলেন—কোথায় আবার যাবেন। থেকে যান—। কেহবা কিছুই বলিলেন না—হয়ত কহিলেন—শুন্‌লাম চলে যাচ্ছেন—কোথায় যাচ্ছেন—

বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করিতাম তাই তথাকথিত ছোটলোকরা দুই একজন কহিল—বাবু আপনি গেলে আমরা কোথায় যাবো—

এমনি করিয়া নোটিশের দীর্ঘ তিনমাস অন্তে যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। গো-শকটে যাইতে হইবে—বিদায়কে দীর্ঘতর ও বিড়ম্বনাময় করিবার ইচ্ছা ছিল না তাই ভোর রাত্রি ৩টায় গাড়ী ছাড়িবার ব্যবস্থা করিলাম।

গৃহিণীর নিকট শুনিলাম—দাসু বাসনপত্র মাজিয়া পাওনা লইয়া যাইবার কালে কাঁদিয়া বলিয়া গিয়াছে—আর ত দেখবো না, আপনাদের—খবরবার্ত্তা দেবেন ত? ঃ

আসিবার সময় মাহিনা ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা পাইলাম না—পরে একদিন আসিতে হইবে।

ভোর রাত্রে মালপত্র বোঝাই করিলাম—স্কুলের চাকর দুইজন প্রাণপণ সাহায্য করিল। স্কুলের দুই একজন শিক্ষক, বোর্ডিংএর দুচারজন ছাত্র, প্রতিবেশী ডাক্তারবাবু, মনিটারীবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন—

বিদায়কালে বুকের মাঝে মোচড়াইয়া হাহাকার করিয়া উঠিল—হায় ভগবান! এমনি করিয়া জীবনভোর আর কত বিদায় লইব! আশ্রয়হীন মন স্থানটাকে ভাল বাসিয়াছিল, তাই দ্বিতীয়বার চোখের জলে নিঃশব্দে বিদায় লইলাম—

মাসখানেক বাদে আবার যাইতে হইল—প্রাপ্য অর্থ আনিবার জন্য।

৮।১০ মাইল পথ, সাইকেলে সকালে যাইয়া, বৈকালে ফিরিব স্থির করিলাম। গ্রামের প্রান্তে পোষ্টাফিসের নিকট যখন পৌছিলাম তখন বেলা ৮টা। পোষ্টমাষ্টার কহিলেন—কেমন, ওখানে কেমন চল্‌ছে? আপনার চিঠিপত্র সব রিডাইরেক্ট করে দিয়েছি—

—হ্যাঁ পেয়েছি—

হঠাৎ কে যেন ডাকিল—বাবু—

ফিরিয়া দেখি—দাসু। শতছিন্ন জীর্ণ একখানা কাপড়ে কোনমতে লজ্জা নিবারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! প্রশ্ন করিল—নন্তু, সন্তু ভাল আছে? পূর্ব্বে সে এমনি করিয়া কখনও কথা বলে নাই।

—হ্যাঁ—

—মা, দিদিমণিরা—

—হ্যাঁ ভালই—

—এখন কোথায় কাজ করছিস্—

দাসু সাশ্রুনেত্রে কহিল—কাজ ত জুটলেক নাই। ঘরকেই আছি—

দুঃখ হইল, কাজ নাই বলিয়াই হয়ত বস্ত্র এত জীর্ণ। আমার ওখানে ৫৲ টাকা ও একবেলা খাইতে পাইত। আজ হয়ত উপবাসী।

—আজ থাক্‌বেন বটে ?

—না, ওবেলা যাবো—

—বোর্ডিং কে থাক্‌বেন ?

—হ্যাঁ—

আমি সাইকেলে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। গ্রামটীর পানে চাহিয়া বড় পরিচিত মনে হইল। তাসের আড্ডা, মাছধরা, গল্প করিবার সঙ্গী প্রসন্নবাবুর সহিত দেখা। তিনি কহিলেন—এই যে, মাষ্টারমশা যে! কেমন চল্‌ছে—নতুন জায়গায় কেমন লাগছে ?

—ভালই—

—চা, এককাপ হবে কি ?

—থাক্—

—চেহারাটা যেন চুক্ চুক্ করছে—তিনি রসিকতা করিলেন।

—হ্যাঁ—

চলিয়া আসিলাম—এত নৈকট্য, এত অন্তরঙ্গতা সব একমাসে উবিয়া গিয়াছে—এতটুকু করুণা বা দুঃখ নাই আজ, নেহাৎ যেন পথের আলাপ।

জগতবাবুর পরিবারের সঙ্গে নৈকট্য সর্ব্বাধিক ছিল। তাহার সহিত দেখা হইতে তিনি প্রশ্ন করিলেন—কেমন ? ভালত ? বাসার সব—

—হ্যাঁ। ভালই—

—কোথায় অবস্থিতি ? বোর্ডিংএ! ও জায়গাটা ত ভালই—না ?

—সম্ভবতঃ।

—না হয় এখানে খেলেও পারতেন—

—দেখি যদি না জুটে।

যাহা হউক শিক্ষকগণ সমস্ত বন্দোবস্তই করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে সকলের সহিত গল্প করিয়া বৈকালে ফিরিতে একটু দেরী হইয়াছিল—তাড়াতাড়ি সাইকেলে উঠিলাম। গ্রাম্যপথ সন্ধ্যা হইলে চলা যাইবে না। গ্রামের ভিতর দিয়াই পথ—দ্রুতবেগে গ্রামের প্রবেশ মুখে চণ্ডীতলায় পৌছিয়া দেখি দাসু রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া—

সাইকেল থামাইয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম—কিরে দাসু ?

—হ্যাঁ—

—এখানে একা দাঁড়িয়ে ?

দাসু হঠাৎ আঁচল চোখে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—নন্তু মণ্টুকে কি আর দেখবো না ?

—কেন দেখবি না, বেশীদূর ত নয়, একবার যাস্। যাবার খরচ দেব, মেলা দেখে আস্‌বি—একখানা কাপড় দেব।—যাস্—

দাসু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল—বাবুদের দেখতেই যাবেক বাবু, কাপড়ের লেগে যাবেক নাই।

অর্থাৎ যদি সে যায়ই তবে নন্তু মন্টুকে দেখিবার জন্যই যাইবে, কাপড় লইবার লোভে যাইবে না।

—হাঁ, একবার যাবি—

—মণ্টু আমার কথা বলেক বটে—

—হাঁ রোজই বল্‌ত—

দাসু পুনরায় চোখে আঁচল চাপিয়া দিল। আমি সাইকেলে উঠিতে উঠিতে কহিলাম—একবার যাস্ ছেলেকে নিয়ে—দু' চারদিন থাক্‌বি—

দাসু দাঁড়াইয়া রহিল, আমি চলিয়া আসিলাম। নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই ও দাঁড়াইয়াছিল—শতছিদ্র জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া।

দাসু আসে নাই—কাপড় লইতেও সে আসে নাই।

ওদের আমরা বলি ছোটলোক—কিন্তু এরাই ত চোখের জল ফেলিতে জানে।

বর্তমান শিক্ষা ও হার্বার্ট স্পেন্সার

অধ্যক্ষ শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

বাংলায় একটা প্রবচন আছে,—'না জানলে মত চলে না।' প্রবচনটীর অর্থ এই যে—যিনি যে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁর সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ না করাই উচিত। আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রেও এ প্রবচনটী প্রায়-ই ব্যবহৃত হ'তে শোনা যায়। যারা এ কথা বলেন, তাদের বলবার উদ্দেশ্য এই যে, শিক্ষা ব্যাপার অতীব জটিল ও সমস্যাপূর্ণ। সুতরাং সে বিষয়ে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা না থাকলে, কোন মত প্রকাশ করা অবাঞ্ছনীয় ও অনধিকার-চর্চ্চা।

সম্প্রতি পাশ্চাত্ত্য জগতের এক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এ জাতীয় কথার প্রতিবাদ করেছেন মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। তিনি বলেছেন যে, যে কোন জ্ঞানোন্নত ও পরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, যে কোন বিষয়ে যথোপযুক্ত অভিমত প্রকাশ করতে সক্ষম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি হার্বার্ট স্পেনসারের নামোল্লেখ করেছেন। প্রকৃত-ই হার্বার্ট স্পেনসারের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, যিনি সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিও যে কোন জটিলতম সমস্যার যথার্থ সমাধানে সক্ষম। তিনি নিজে জীবনে কখনো শিক্ষাকার্যের সহিত জড়িত হ'ন নাই; কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতি ও বিষয়-নির্বাচন সম্বন্ধে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও সার্থক বহু সমাধান শিক্ষা জগতকে দান করে গেছেন। এমন কি বর্তমান ইয়োরোপীয় শিক্ষা জগতে শিক্ষক ও শিক্ষানবীশ উভয়েরই আচরণ-যোগ্য-আদর্শ তিনি-ই প্রস্তুত করে গেছেন।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা সমস্যা অন্যান্য সমস্যাগুলির অন্যতম। সুতরাং তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা-সূত্রগুলি হয়ত আমাদিগকে শিক্ষা-সংকট থেকে উদ্ধারের পথে কিঞ্চিৎ আলো দেখাতে পারে, সে উদ্দেশ্যে-ই এপ্রবন্ধে তার মতবাদ নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। আর প্রসংগ-ক্রমে পাশ্চাত্ত্য জগতে শিক্ষাকার্যে স্বীকৃত পন্থার-ও উল্লেখ করব।

মনীষী হার্বাট স্পেনসারের শিক্ষা বিষয়ে মত বহুমুখী। শিক্ষাব্রতী-মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে হার্বাটের অতিশয় শক্তিবাদ ও 'পুনরাবৃত্তিবাদ' বর্তমান পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-জগতে প্রভূত মাত্রায় উপযোগী বলে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং তাঁর মতবাদের বহুমুখীত্ব নিয়ে সমালোচনা করবার প্রয়োজন হতে-ই পারে না। আর, এক প্রবন্ধে তা করাও সম্ভব নয়। তবুও প্রসংগক্রমে এটুকু বলে নিতে-ই হবে যে তাঁর 'বিকাশবাদ' যে মনো-বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা তাঁর বহুমুখী মতকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। যাক্ সে কথা।

শিক্ষাদান সম্বন্ধে তার সর্বপ্রথম অভিমত এই ছিল যে, শিক্ষাকে কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়-কেন্দ্রী হতে হবে। অবশ্য সংগে সংগে এ-ও তিনি বলেছেন যে বিভিন্ন বিদ্যা, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নরূপে পঠিত বা অধীত হলে-ও, শিক্ষাকে এককেন্দ্রিক হ'তেই হবে। না হ'লে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পথে বাধা সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শিক্ষা কখন ও কিভাবে দান করা উচিত এ বিষয়ে আলোচনা করবার পূর্বে জ্ঞানের গুরুত্ব অনুযায়ী তিনি তাকে বিতাড়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞানের গুরুত্ব নির্ভর করে—তার দলের ওপর। যদি কোন বিষয়ের জ্ঞান আমাদের জন্য লাভদায়ক হয় আর সে জ্ঞানপ্রাপ্তির ফলস্বরূপ আমাদের জীবনযাত্রা নির্মল ও সুখপূর্ণ হয়, তবে নিঃসন্দেহে-ই তাকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করব। পক্ষান্তরে যে জ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রার সহায় নয়, আর আমাদের প্রাকৃতিক শক্তিকে সংযত করে না, তা নিম্ন বিভাগেই স্থান পাবে।

সুতরাং তাঁর মতে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে পূর্ণরূপে ও নির্দোষভাবে জীবনকে উপভোগ করা। 'পূর্ণভাবে' কিন্তু স্বকীয় ও পরকীয়, উভয়ের উপভোগকেই বোঝায়।

এ প্রসংগে একটি বিষয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। আজকাল 'শিক্ষা' অর্থে আমরা স্কুল-কলেজের শিক্ষাকেই বুঝি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'শিক্ষা' কি কেবল ঐ পাঁচ, ছয় ঘন্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? এক সম্প্রদায়ের নিকট এরূপ অভিমতও শোনা যায় যে মানুষের জীবনও স্বল্প পরিসর; সুতরাং এত অল্পায়ু হয়ে কেউ বিদ্যা-বিশারদ হইতে পারে না। যদি কদাচিৎ কেউ হয়-ও, তা ব্যতিরেক. নিয়ম নয়। সত্য বটে বিদ্যাবিশারদ সকলে না-ও হইতে পারে কিন্তু আমরা যাকে সাধারণ জ্ঞান বলি, তাহার প্রাপ্তির জন্য-ও শিক্ষা বিষয়ের দোষগুণের বিচার করতেই হইবে।

এ অনুসারে শিক্ষার বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল, সর্বাগ্রে আত্মরক্ষাকর শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে। মানুষ, মানুষ কেন প্রাণীমাত্রই প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিকভাবে সে বৃত্তি নিয়েই আসে, তবুও গৌণভাবে শারীরিক জ্ঞান যে আত্মরক্ষার সহায়ক, তা সাধারণে বোঝে কে? সুতরাং শিক্ষা-বিষয়-নির্বাচনে এ জাতীয় বিষয়ের স্থান সর্বাগ্রে হওয়া উচিত। জীবিকানির্বাহও আত্মরক্ষার-ই অঙ্গ। এ দৃষ্টিতে কলা ও বিজ্ঞান এ শ্রেণীভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের দ্বিতীয় নির্বাচিত বিষয় হওয়া উচিত নাগরিকতা। ছাত্রদের মধ্যে নাগরিকতার দায়িত্ববোধের যে পরিচয় আমরা অহরহঃ সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাই—সন্দেহ নাই, তা একান্তই ভয়াবহ। কিন্তু এ বিষয়ে ছাত্র সমাজের ওপরে-ই দোষারোপ করলে চলবে কেন? যে সুচিন্তিত ও সুসংবদ্ধ জীবনধারা এর মূল, তার প্রবাহ আরম্ভ হয় ছাত্রের শৈশব থেকেই। বিদ্যালয়ের (বর্তমান) শিক্ষা সর্বদোষের আকর—এ ও বর্তমানে চলতি বুলি। কিন্তু বিচার্য বিষয়ে ইহার বাস্তবিকতা কতখানি। বর্তমান স্কুল কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা বিষয়ে বহু দোষ আছে, এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না বা

করতে পারবেন-ও না ঠিকই, কিন্তু বিচার দৃষ্টিতে দেখা যাবে এইত একমাত্র কারণ নয়। কেননা তীক্ষ্ণ অনুকরণ-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন শিশুর শিক্ষা বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাবার বহু পূর্বে-ই আরম্ভ হয়। সুতরাং কোন বিষয়ে বিচার করতে গেলে সে বিষয়ের কার্য-কারণ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গীনভাবে দেখতে হবে, না হলে তা ভ্রমপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।

এভাবে প্রতিটি শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে, বিষয় নির্বাচনজনিত যে দোষ তা বহুলাংশে নিরাকৃত হ'তে পারে।

এবার শিক্ষাদান পন্থা।

স্পেন্সারের নূতন শিক্ষাদান প্রণালী অনুসারে বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য জগতে ক্রম-বিধি-চতুষ্টয়ের অনুসরণ করা হয়। সে বিধি চতুষ্টয় সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(এক) ক্রম-গভীর—শিক্ষাদান কালে শিশুকে সহজ তত্ত্ব নিয়ে প্রথমে বোঝাতে হবে এবং শিশুর অজ্ঞাতে ক্রমশঃ গভীর বিষয়ে প্রবেশ করতে হবে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মূল কথা হ'ল ভাব সংগঠন। কিন্তু চিত্তের ওপর শিক্ষা গ্রহণের যে প্রভাব ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে, তাকে সংগঠিত করে এবং তার-ই সাহায্যে গভীর বিষয়ের জ্ঞান দিতে হবে। এ না হ'লে, যা সচরাচর হয়ে থাকে—মানসিক অজীর্ণ—তা অবশ্যম্ভাবী।*

(দুই) ক্রম পরিচিতি—শিশুমনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত বস্তু বা জ্ঞানের অভাবে শিউরে ওঠে। কিন্তু সে জ্ঞান বা বস্তু-ই যদি পরিচিত পরিবেশে পরিবেশিত হয়, তবে শিহরণের স্থানে জাগ কৌতূহল। লক্ষ্য করলে এ সত্য নিত্য প্রতিগৃহে-ই দেখা যেতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এ সত্যকে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু অজ্ঞানতা বশে আমরা তা উপেক্ষা করি, ফলে শিক্ষাগ্রহণ শিশুর নিকট আনন্দ-দায়ক না হয়ে বিরক্তি-কর-ই হয়ে থাকে।

(তিন) ক্রম নিশ্চিত—অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট জ্ঞান থেকেই নিশ্চিত ও স্পষ্ট জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। জ্ঞানার্জনের প্রাকৃতিক রীতি-ই এই। শিশুচিত্তে প্রথম যে বিচার উত্থিত হয়, তা সর্বদাই অনিশ্চিত ও অস্পষ্টাভাব মাত্র। তারপর ক্রমে ক্রমে যেমন জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাকে, তেমনি ধারণা ও স্পষ্টতর হ'তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এ ধারণাই জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন, শিশু স্লেটে কিংবা খাতায় ছবি আঁকে। ছবি আঁকে তার পরিচিত বস্তু, পাখী বা প্রাণীর। কিন্তু সে চিত্র দেখে কি কিছু বোঝাবার উপায় আছে? তা দেখে কিছুই বোঝা যায় না। শিশু কিন্তু প্রকৃতই তা বোঝে ও দেখে। শিশুচিত্তের সমূহ মনের দ্বারাই ইহা সম্ভব। শিশু-শক্তির ব্যাপারে ইহাকে উপেক্ষা করার ফলেই শিশুর জ্ঞান হয় আভাষ জ্ঞান বা চলতি ভাষায় যাকে আমরা বলি 'ভাসা ভাসা জ্ঞান।'

(চার) ক্রম-বিচার—শিক্ষা ব্যাপারে শিশুকে পদার্থ হ'তে বিচারে নিয়ে যেতে হয়। প্রথমে বাহেন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যের বাস্তবজ্ঞান শিশুকে দিতে হয়। পরে ক্রমশঃ তা থেকেই ভাব (Conception) আসে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ সত্যকে স্বীকার করতে হবে। এ কারণেই চিত্র বহুল পুস্তক শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানে বলে একাগ্রতা থেকেই ভাবের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ ভাবের জন্য একাগ্রতার প্রয়োজন। এ কারণেই চিত্রবহুল পুস্তকের প্রতি শিশুর আকর্ষণ এত স্বাভাবিক।

এই হল হার্বার্ট স্পেন্সারের শিক্ষা বিষয়ক ক্রম-বিধি চতুষ্টয়। অতি সংক্ষেপেই বিষয়গুলি লিখিত হল, সে কারণে বিচার্য বহু তত্ত্বই এতে দেওয়া গেল না। তবুও পাশ্চাত্ত্য দেশে শিক্ষা যে কিরূপ মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, এ থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যাবে।

আমাদের এই শিক্ষা সংকটের দিনে যদি আমরা এমনি ভাবে শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হই ও পাশ্চাত্ত্য দেশ কী ভাবে কোন সূত্রে কী আবিষ্কার করছে, দেখি, তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি—অচিরেই আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারও কোন অংশে সেদেশের অপেক্ষা ন্যূন থাকবে না।

* এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ সমিতির দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। পাশ্চাত্ত্যদেশের Graded Selection Series এ সত্যকে মানিয়াই রচিত হয়।

চরিত-সাহিত্য

শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার

চরিত-সাহিত্য রচনার সঙ্গে ভাস্কর্য বা স্থাপত্য নির্মাণের তুলনাই যুক্তিযুক্ত। চিত্রাঙ্কনে যে খেয়ালী মন সুযোগ পায় সে খেয়ালী মন ভাস্কর্য বা স্থাপত্য নির্মাণে তেমন সুযোগ পায় না। ভাবে বিভোর না হয়ে বরং স্থিরমতি হয়ে ভাস্কর্য বা স্থাপত্য-শিল্পী যেমন মনোলোকে তার ভবিষ্য সৃষ্টির একটি নিখুঁত নিটোল মানসী চারুমূর্তি গড়ে তোলে—চরিতকারকেও তেমনি অন্তরে একটি নিখুঁত পরিকল্পনা করে সৃষ্টিক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হয়।

সুশ্রমী ঐতিহাসিকের সাধনা ও সত্যসন্ধ দৃষ্টি চরিতকারের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। চরিতকারের প্রথম কাজ হোল উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনের সকলপ্রকার পাঠ গ্রহণ করতে হবে। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে সমস্ত পূর্ববর্তী আলোচনা হয়েছে—তা সম্পূর্ণ হোক, অসম্পূর্ণ হোক—সেগুলি সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। মূল ব্যক্তির জীবনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ব্যক্তির জীবন জড়িত, তাদের সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তা ছাড়া মূল বা কেন্দ্রীয় ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক যুগ-ইতিহাস অধ্যয়ন অবশ্য প্রয়োজনীয়—একথা ভুললে চলবে না।

তারপর পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি অপ্রকাশিত মূল্যবান তথ্যপঞ্জী দেখা প্রয়োজন। এমন অনেক সময় দেখা যায় (অনেক শ্রেষ্ঠ জীবনীকারদের অভিজ্ঞতা হয়েছে) যে, কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে বহু জীবনচরিত ও আলোচনা, তাঁর সৃষ্টির বা কৃতিত্বের বহু তথাকথিত নির্ভরযোগ্য আলোচনা প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল—অপ্রকাশিত নবতথ্যভারসমন্বিত অনেক কাগজপত্র রয়েছে অব্যবহার্য অবস্থায়। কাজেই চরিতকারের বিশেষ লক্ষ্য হবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনের একটি সামগ্রিক ও যথাসম্ভব বিস্তৃত ধারণা করে নেওয়া। নামী চরিতকারগণ তো এই তথ্যান্বেষণেই অপূর্ব আনন্দ পান।

কিন্তু তথ্যান্বেষণ ও তথ্যসংগ্রহ করলেই চরিতকারের কাজ ফুরোয় না। চরিত্রের মধ্যে তথ্যরাজি সন্নিবিষ্ট হলেই যে যুক্তিনিষ্ঠ পাঠককে আশ্বস্ত করবে তা নয়। চরিতকারকে প্রত্যেক তথ্যের মূল উৎস সম্পর্কে নির্দেশক (reference) দিয়ে দিতে হবে।

অনেকে মনে করতে পারেন যে অনবরত নির্দেশনার পীড়নে পাঠের পরিতৃপ্তি নষ্ট হয়—'পায়াভারী' (foot notes সমন্বিত) রচনা মোটেই স্বচ্ছন্দপাঠ্য নয়। কিন্তু এ যুক্তি কোন কাজের কথা নয়। কারণ কোন রচনাকে নির্ভরযোগ্য করে তুলতে গেলে নির্দেশনার অবশ্য প্রয়োজন। পাঠক চরিত-সাহিত্য পড়বে কেবল রোমাঞ্চ সিরিজের গল্পরস পাবার জন্য নয়—তার মন যেমন চরিত্রের ঘটনাপঞ্জীর রসগ্রহণে তৎপর হবে—তেমনি উৎসুক হবে নির্দেশনা পাঠের জন্য—যাতে নির্দেশনা সত্যিই তাকে নানা গ্রন্থরাজির দিকে আকৃষ্ট করে। এইভাবে জীবনচরিতকে কেবল জীবনচরিত কেন—নির্দেশনাসমন্বিত যে কোন রচনাকেই পাঠক কেবল রসসাহিত্য হিসাবে নেবে না—বৃহত্তর ও বহুতর পাঠের ভূমিকা হিসাবেও নেবে। চরিত-সাহিত্য এই ধরণের দ্বিমুখী মনোভঙ্গি নিয়ে যে পড়বে সেই সবচেয়ে লাভবান হবে বলে মনে হয়। অবশ্য একথাও ঠিক যে নির্দেশনার সাহায্য ব্যতিরেকে যাতে মূল রচনাটি সুখপাঠ্য হয় সেইদিকেও লেখককে অবহিত হতে হবে। কাজেই লেখক ও পাঠক—উভয়েরই বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

চরিতরচনা যে কালক্রমিক হবে—তাতে কারো দ্বিমত থাকা উচিত নয়। ধীরে ধীরে কালানুক্রমিক হিসাবে ব্যক্তির জীবনকে উদ্‌ঘাটিত করে দেখাতে হবে। Andre Maurois এ বিষয়ে একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—'It is always a mistake in a Giography, to anticipate.' অর্থাৎ ধরুন বৃদ্ধবয়সে যে কৃতিত্বের জন্য কোন ব্যক্তি কোন এক বিশেষণে বিশেষিত হন—সেই বিশেষণটিকে যদি ঐ ব্যক্তির জন্মাবার সময় প্রয়োগ করে বসি তাহলে তা হাস্যকর হবে। যদি বলি যে প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছিলেন...' তাহলে সেটা ঠিক হবে না। কারণ প্রথমতঃ প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক হয়ে পাকা আমটির মতো তিনি এ পৃথিবীতে এসে পড়েন নি। তাঁর জন্মাবার সময় কেউ বলতে পারতো না তিনি সাহিত্যিক হবেন কি শেয়ার মার্কেটের দালাল হবেন—এমন কি তাঁর জীবনীকারও নয়। দ্বিতীয়তঃ এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রথমেই সাহিত্যিক বিশেষণটি অপ্রযোজ্য হবে এইজন্য যে কেদার বান্দ্যাপাধ্যায় প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক' হতে অর্দ্ধশতাব্দীকাল সময় নিয়েছিলেন। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে স্বসত্তার উন্মোচন হয়। চরিতকারও সেই ভাবে অগ্রসর হবেন। জীবনে যে সমস্ত বিরুদ্ধ পরিবেশ ও বিরুদ্ধমত ব্যক্তির জীবনে এসেছে—ব্যক্তির জীবনরচনারকালে সেগুলির কালানুক্রমিক সন্নিবেশ করে ক্রমশঃ পরিণতির দিকে এগোতে হবে। ধরুন কোন কমুনিজ্‌ম্ উপাসক বহু বছর কমুনিষ্ট দলের সহযোগিতা করবার পর জীবনের শেষ দিকে মত বদলে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করলেন এবং প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি ফরওয়ার্ডব্লকের নেতা হয়ে বসলেন। এখন যদি উক্ত ব্যক্তির জীবনী লিখতে গিয়ে আরম্ভ করি 'প্রতিভাবান্ ফরওয়ার্ডব্লক নেতা জন্মালেন এক কৃষকের ক্ষুদ্র কুটীরে'—তাহলে যে ভুল হবে তা সহজেই অনুমেয়। কারণ কেবল ফরওয়ার্ডব্লকের প্রতিভাবান নেতা বলেই তাঁর পরিচয় নয়। তিনি যে জীবনের অধিকাংশ সময়ে কমুনিষ্ট ছিলেন এবং সে দলের যথাসাধ্য সেবা করেছেন—তারপর কোন কারণে মত বদলেছেন—একথা ভুললে চলবে না। কাজেই ঐ পূর্ব বিশেষণটি

অসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু জীবনী রচনায় কোন অসম্পূর্ণতা কোন রকম ওলটপালট করা চলবে না। বিশেষণ যদি দিতেই হয় তাহলে জীবনের যে সময় যে বৈশিষ্ট্যটি দেখা গেছে সেই সময়কার বিবরণে সেই বৈশিষ্ট্যবোধক বিশেষণটি দিতে হবে। তাই Andre Maurois বলেছেন—'Every man discovers successively the ages and aspects of life. We must make the discovery with the subject of the book.'

অনেক জীবনী-সাহিত্য আবার লেখকের সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টির দ্বারা কলুষিত হয়। তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তির জীবনী লিখিত হয়েছে তাকে যথাযথ প্রকাশ করা হয়নি—লেখকের কতক মনোভাব তাঁর দুর্বলতার সুযোগে জীবনীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। এমন চরিত কখনও সার্থক রচনা বলে গ্রাহ্য হতে পারে না।

আবার অনেক চরিত-সাহিত্য আছে যা বিশেষভাবে একটি নীতি-জ্ঞানকে মানুষের মনে জাগিয়ে দেবার জন্যই লেখা হয়ে থাকে, অনেক মহাপুরুষের জীবন এমনভাবে লেখা হয়ে থাকে। এগুলি প্রকৃত জীবনী-সাহিত্য পর্য্যায়ে পড়ে না। জীবনী-সাহিত্য একধরণের আর্ট এবং কোন সার্থক আর্টই যেমন স্পষ্টতঃ উপদেশাত্মক নয়, তেমনি কোন সার্থক জীবনীও স্পষ্টত উপদেশাত্মক নয়। মহাপুরুষের জীবনে যে morals থাকবে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর জীবনীরচনায় তা অন্তর্নিহিত থাকবে—স্পষ্টতঃ ব্যক্ত হবে না। কোন একটি জীবনী পড়ে আমরা যদি ইঙ্গিতে—ব্যঞ্জনায় moralটিকে বুঝতে পারি—তাহলে জীবনী-সাহিত্য হিসাবে তা অসার্থক নয় বলতে পারি। কিন্তু লেখক যদি কোমর বেঁধে ব্যক্তি জীবনের তথ্য সন্নিবেশের দ্বারা কেবল একটি moral প্রচারের উদ্যোগী হন তাহলে চরিত-সাহিত্য হিসাবে সে রচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এ ছাড়া গৌণ চরিত্রগুলিকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে হবে। যতই গৌণ হোক তাকে নগণ্য বলে অবহেলা করলে চলবে না। জীবনী রচনা সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ আর্ট। যে যেটুকু ভূমিকা নিয়েছে—তাকে সেটুকু ভূমিকায় যথাযথ দেখতে হবে। কেবল কেন্দ্রীয় চরিতকে বড় করে দেখালেই চলে না—কারণ জীবনী রচনার আর্টের বিচারে তা অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। কোন মানুষই জীবনযুদ্ধে একা বর্তমান নয়। সকলেরই শত্রুমিত্র থাকে। সকলেই বাস্তব জীবনের লোক। কাজেই তাদের জীবন্ত করে তোলা চরিতকারের লক্ষ্য হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হোল জীবনীসাহিত্যের মূল বক্তব্য বিষয়ের রচনা-ভঙ্গি। সাধারণতঃ সার্থক জীবনীকারের মধ্যে দুটি সত্তা থাকে—একটি ঐতিহাসিক সত্তা অপরটি শিল্পীসত্তা। ঐতিহাসিক সত্তা সকলপ্রকার তথ্যসংগ্রহ করলে পর শিল্পীসত্তার কাজ আরম্ভ। সমস্ত শক্তিসঞ্চয়ের পর যেমন ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী উপলমুখর পথে সুনীল উচ্ছ্বাসে বেরিয়ে আসে—তেমনি সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহের পর চরিত্রকারের শিল্পীসত্তা যথাযথ শিল্পরূপ দানে অগ্রসর হয়। এই রূপরচনার উপরেই সকল উপকরণের সার্থকতা নির্ভর করে। এইখানেই চরিতকারগণের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য ঘটে বেশী। ঐ শিল্পী সত্তা কোন্ ঘটনা প্রাসঙ্গিক, কোন্ নির্দেশনাটি প্রয়োজনীয়, কোন্ চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝে সুন্দরের সাধনায় বসবে। সকল উপকরণ তথ্যাদি—দলিল চিঠিপত্রাদি প্রয়োজনীয় হয় না। উপকরণের মধ্যে বহুশ্রুত, বহুজ্ঞাত ও বহুবার লিখিত বক্তব্য থাকে। সেগুলিকে সাবধানে বর্জন করাই চরিতকারের লক্ষ্য হবে। তারপর শিল্পী যেমন তুলিকার শেষ স্পর্শটি দিয়ে মূর্তিকে প্রাণময় করে তোলে, তেমনি চরিতকারের শেষ তুলি হবে নিরপেক্ষ অথচ দরদী দৃষ্টিভঙ্গি। জীবনের রচনা স্বভাবতঃই প্রাণের স্পন্দনে মুখর হবে—এ আশা অন্যায় নয়। চরিতকার যে জীবনের রূপায়নে অভিলাষী সে জীবন হবে এমন যে তা সমগ্র মানব-জীবনের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে হবে। যদি সে জীবনের উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনোবেদনায় উত্থানপতন ঘটে—যদি সে জীবনের উল্লাস ও হাহাকার শুনে পাঠকের মনও উত্তেজনা ও বিষণ্ন নির্লিপ্ততায় ভরে ওঠে, জীবনসংগ্রামীর মরিয়া অবস্থা দেখে যদি পাঠকও মরিয়া হয় তবে বুঝবো যে জীবনরূপায়ন সার্থক হয়েছে। কল্পনায় ফলাও করা হয় নি বলে এখানে বিন্দুমাত্র ক্ষোভের কারণ নেই। খাঁটি জীবনরসই আমরা প্রত্যক্ষরূপে পেতে চাই—পঠিত জীবনের বেদনা যে বিশ্বমানববেদনারই অংশ—সেই ব্যক্তিবেদনা যে বিশ্বমানব-অনুভূতির মূলে নাড়া দিয়েছে—সেইটিই আমরা দেখতে চাই। জীবনী সাহিত্যের এই শৈল্পিক বিচারে মনে হয় Andre Maurois-র 'Ariel' এক অনুপ সৃষ্টি।

—গান—

সত্যেন্দ্রনাথ সেন

স্মরণের বাঁশরীতে মোর, তুমি সুর-ঝর্ণা।
বিরহ-কাজল-মেঘে, বিদ্যুতপর্ণা॥
ওগো মোর মধুছন্দা,
তুমি, সুরের অলকানন্দা,
স্বপ্নের কল্পলতায় তুমি ফুল-চম্পকবর্ণা॥

আমার মনের বন-ছায়ে
যবে আসে আঁধার ঘনায়ে
স্তিমিত প্রেমের শিখায়, তুমি বিরহের অগ্নিকণা॥
হে আমার স্বর্ণমৃগ
মুকুলিত বসন্ত রাতে, জাগো জাগো মোর ঋতুপর্ণা॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

পরের দিন যথাসময়ে সুধীনের সঙ্গে সন্তু ষ্টুডিয়োতে গেল। এ এক অদ্ভুত রাজ্য। রঙ-করা সব মানুষ—রঙ-করা তাদের পোষাক। সূর্য্যের মত তেজালো আলো আর নানান যন্ত্রপাতি। অদ্ভুত অদ্ভুত সব দৃশ্য। পাহাড়—বাড়ী—সিঁড়ি—গলি—মায় পদ্মফুল-ফোটা পুকুর পর্য্যন্ত। আর সায়েবি-পোষাক-পরা মানুষগুলি। সর্ব্বদাই ছটফট্ করছে—রংকরা মানুষরা এক একবার এসে দাঁড়াচ্ছে, পাহাড়—বাড়ী—সিঁড়ি আর গলিতে—দু'একটা কথা বলছেন—আলোগুলো জ্বলছে—নিবছে, চারধারের যন্ত্রগুলো থেকে ক্লিক্ কিট শব্দ হচ্ছে। তার মধ্যে বিশ্রাম চলছে—চা কেক বিস্কিট আরও অনেক খাবার প্লেটে ভর্ত্তি হয়ে আসছে। আসছে প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট। আশ্চর্য্য—এরা খাবার পুরো খাচ্ছে না—কেউ বা আধখানা বিস্কিট, খানিকটা কেক—ডিমের কিছু অংশ—চামচ দিয়ে খানিকটা চপ···হেলা-ফেলা চলছে খাবারে। অনেক আছে বলেই বুঝি এমন হেলা-ফেলা!

কেমন লাগল? সুধীন মোটরে বসে জিজ্ঞাসা করলে।

চমৎকার। সন্তুর দু'চোখে অভাবিত বস্তু-দর্শনের আনন্দ।

কাল আসবে?

কাল? মাকে জিজ্ঞাসা করে···

মা তো বলেইছেন—সন্ধ্যের আগে পৌঁছে যাবে বাড়ীতে।

আপনার মোটর করে?

হাঁ—ষ্টুডিয়োর মোটর—তুমি আর্টিস্ট হলে তোমাকেও পৌঁছে দেবে বাড়ীতে। কেমন, হবে আর্টিস্ট? প্লে করবে?

সন্তু ঘাড় নাড়লো।

বেশ—কাল তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব। তিনি যদি কনট্রাক্ট ফরম সই করেন—

বাবা—বকবেন।

বেশ তো—সে ভার আমার। এতে তোমার তো পড়ার ক্ষতি হচ্ছে না—ছুটির মধ্যেই স্যুটিং সেরে নেব। তা ছাড়া রোজ তোমাকে যেতেও হবে না। তালিম দেওয়ার জন্য সপ্তাহে চারদিন গেলেই হবে।

সন্তুর গল্প শোনবার মত। কমলা ছোট ভাইবোনদের নিয়ে সন্তুকে ঘিরে বসল গল্প শুনতে। ভগবতীও কাজ সেরে সে আসরে যোগ দিলেন। সে গল্প তোমার আমার মত সাধারণের গল্প নয়, রাজ-অট্টালিকা ধনসম্পদ দাসী প্রহরীর গল্পও নয়। সেখানে প্রাসাদ কৃত্রিম—রাজা কৃত্রিম—শান্ত্রী সিপাই লোক-লস্কর সবই কৃত্রিম, অথচ লাখো লাখো টাকা জলের মত খরচ হচ্ছে। কি আসবাব-পত্র, পোষাক-আশাকের ঘটাই বা কি, আহারে রাজভোগের বাহুল্য—ফেলা-ছড়ার ব্যাপার। এখানেই একটা পদ জুটে যাবে সন্তুর। কাজ এমন কিছু নয়—খানিকটা রং মেখে রঙীন কাপড় জামা পরে আলোর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো—দু'একটি কথা বলা। চারিদিকের সজাগ যন্ত্রে অমনি ছবি নেওয়া—আর কথা নেওয়ার ধূম। মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ। তারপর ওদেরই মোটরে চেপে সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ী ফিরে আসা।

ছোট ভাই জিগ্‌গেস করলে, মোটর কি দাদা?

কমলা বললে, হাওয়া গাড়ীকে মোটর বলে। ওই যে ভ্যাঁক-ভোঁক করতে করতে ছুটে যায় যে গাড়ীগুলো—

আমি মোটর চড়ব—দিদি?

আমি যদি আর্টিস্ট হই—উনি বলেছেন—রোজ মোটরে করে—

ভগবতী সন্তর উচ্ছ্বাসে বাধা দিলেন। তা কি করে হবে? ইস্কুলের ছেলে পড়া করবে, না ছবি তোলাবে! তা হয় না। উনি শুনলে রাগ করবেন।

সন্তু গাল ফুলিয়ে বললে, এখন তো গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেছে।

বেশ তো, ওঁকে জিজ্ঞাসা করো।

অমরনাথ আপিস থেকে ফিরলে—ভগবতী সব খুলে বললেন। বললেন, এতদিনে ভগবান বোধ করি মুখ তুলে তাকালেন। সন্তর উপার্জ্জনের টাকা ক'টা দিয়ে বাড়ীর চালাখানা ছাইয়ে নাও ভাল করে।

অমরনাথ বললেন, ছেলের মূল্যে বাড়ী রক্ষা করব না আমি। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি, সন্তু আমাদের কাউকে না জানিয়ে—

মাপ করবেন দাদা—জানাবার অবকাশ পাইনি। সেই সুযোগে সুধীন এসে দাঁড়াল সামনে। আমরা কেরাণী, আমাদের বাড়ী দেনার দায়ে নীলাম হয় না এই আশ্চর্য্য। কিন্তু প্রত্যেকেরই চাকরি ছাড়া কিছু না-কিছু এক্স্ট্রা ইনকাম করা উচিত। এ বাজারে শুধু চাকরি করে রসাতলে যাওয়ার পথটিই চওড়া করা সম্ভব। তাই বলছিলাম যে আমার নিবেদনটি শুনুন।

আপনার ক'টি ছেলে? সহসা প্রশ্ন করলেন অমরনাথ।

আমার ছেলে নেই।

ঠিক। ছেলে থাকলে এই ধরণের প্রস্তাব কখনও করতেন না। ছেলেদের বিদ্যা না হলে যতটা ক্ষতি হয়—তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি হয়—নৈতিক অধঃপতন হলে।

সুধীন রীতিমত ক্ষুব্ধ হল। মুখে সৌম্যভাব ফুটিয়ে বললে, যাই বলুন, নীতি মানুষের ক্ষুধার অন্ন জোগায় না।

কে বললে? আমাদের বিশ্বাসের অভাব বলে—নীতির মাহাত্ম্য বিশ্বাস করি না। মানুষের নীতি যদি না রইল—রাজ্যের উন্নতি নিয়ে কি হবে? অমরনাথের কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর।

সুধীন বললে, বেশ—আমরা অন্য লোক জোগাড় করে নেব। ঘোড়া হলে চাবুকের অভাব হয় না।

আপনি রাগ করলেন? শান্ত স্বরে অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

না—রাগ করলে আমাদের চলে না। একটা জিনিস আপনারা বড় ভুল করেন। শিক্ষার বিষয়েও প্রোগ্রেসিভ ভিউ না নিলে সে শিক্ষা নিষ্ফল। আপনাদের আউট-লুক অত্যন্ত ন্যারো।

অমরনাথ রাগ করলেন না, হাসলেন। বললেন, কি করবো বলুন—আপনাদের বেশ কিছুদিন আগেই জন্মেছি—শহুরে শিক্ষারও অভাব ছিল। শিক্ষার মানদণ্ড চরিত্রের মানদণ্ডের সঙ্গেই এক করেই দেখেছি। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে বাস করে মানুষের শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হতো—কেন হতো জানেন? চরিত্র গড়তো বলে। ইমারতের বুনিয়াদ শক্ত না হলে শুধু ইঁট চূণ সুরকি মশলাতে আট দশ তলা বাড়ি তোলা যায় না।

সুধীন বললে, প্রাচীন পৃথিবীতে প্রাচীন ভারতের গৌরব ছিল অবশ্য, আজ বিজ্ঞান পৃথিবীকে এত বেশী এগিয়ে দিয়েছে—সে গৌরব নিয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না। আজ চৌষট্টি কলার মধ্যে সিনেমা একটি—শিক্ষার অঙ্গ থেকে ওকে বাদ দেওয়া চলে না।

নাই বা বাদ দিলেন। আমি তাই কি বলেছি! আমি শুধু বলছি—ছেলেরা তরলমতি—একটা শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে-না-হতে আর একটা প্রলোভন তাদের সামনে ধরা উচিত নয়।

একেও শিক্ষার বাহন করেছেন ওদেশের মনীষীরা।

তেমন পদ্ধতি আমাদের কই! শুধু হুল্লোড় করে সপ্তাহে বা মাসে একদিন ছেলেদের সিনেমা দেখালে লাভ কতটুকু! সিনেমা যাঁরা দেখাতে নিয়ে যান—তাঁরা বুঝিয়ে দেন কিছু?

আচ্ছা—আজ আসি। আর একদিন এসে আপনার সঙ্গে তর্ক করব। সুধীন পিছন ফিরল।

অমরনাথ বললেন, মাপ করবেন আমায়। মনের জ্বালায় অনেক অপ্রিয় সত্য বলেছি। বলেছি কেন না, আপনারা একটি চমৎকার দিক নিয়ে আছেন—যা আমাদের চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে গভীর ভাবে। একটু ভেবে দেখবেন—হাল্কা জিনিস নিয়ে আমরা বাঁচতে পারব কি না। মানুষের চরিত্র নিয়ে জাতির চরিত্র তৈরী হয়—তার বাহ্যিক প্রকাশ শিল্প—বিজ্ঞান। যেদিক দিয়ে আমাদের উন্নতি ঘটেছে কিনা—ভাববেন।

সুধীন ফিরে আসতে মঞ্জু বললে, কি খবর?

সুধীন বললে, ভদ্রলোকের শিক্ষার ছিট্ আছে—মস্ত লেকচার ঝাড়লেন।

তুমিও তো তর্ক-বীর—এঁটে উঠতে পারলে না?

না। দি ফেলা ইজ এ ভেরি হার্ড নাট টু ক্র্যাক। যাক—চা দাও।

২৩

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে বর্ষা এল। শহরে এর ক্লান্তিকর রূপটা কেউই পছন্দ করে না। একে তো বাড়ীটাই বিষণ্ণ—কালো আকাশের নীচেয় সেটা শোকপুরীর মত মনে হচ্ছে। ছাদে উঠবার যো নেই—বাইরে বেরুবার সাধ্য নেই—খালি ঘরের কোণে বসে বসে ঝরঝর বাদলের ধারা শোন—তুচ্ছ কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে শোনাও আর শোন। তরুণ দেহের মধ্যে চিরচঞ্চল প্রাণগুলির উচ্ছ্বাস এই অতি-পরিমিত বন্ধনে প্রতিহত হয়ে এধারে ওধারে ছিটিয়ে পড়ছে। গৃহস্থের জিনিসের অপচয় ঘটছে—বাড়ছে কলহ খুনসুটি। দৌরাত্ম্য নালিশ আর কান্নায় বড়রা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন।

ভগবতী বললেন, বর্ষাকাল সব কালের ওঁচা কাল। ঘরময় প্যাচ্‌প্যাচানি জল—কোথায় বা বসি দাঁড়াই—কোথায় বা শুই!

পাড়াগাঁয়েও অসুবিধে কম নয়। ফুটোচালা দিয়ে ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে জল ঝরছেই।

ভগবতী হঠাৎ বলিলেন, এবার বর্ষায় ঘরখানা থাকবে না বোধ করি।

অমরনাথ বললেন, না।

কোন উপায় করলে না—তারপর মাথাগুঁজে থাকব কোথায়?

সব ভগবানের ইচ্ছা। সন্তু যদি মানুষ হয়ে উপার্জন করতে পারে—চালার বদলে—কোঠাঘর উঠবে।

সে কবে? হতাশ হয়ে প্রশ্ন করেন ভগবতী।

অমরনাথ বললেন, সবাই যা নিয়ে বেঁচে রয়েছে—আমরাও থাকব তাই নিয়ে—এই আশা।

মনে মনে ভগবতীর প্রশ্নের প্রতিধ্বনি তুললেন, সে কবে? কবে লেখাপড়া শিখে সন্তু মানুষ হবে—সন্তু উপার্জন করবে? বাপের মনের যত কিছু অপূর্ণ সাধ—ছেলের কর্মের কিরণে উজ্জল হয়ে উঠবে? এমনই বটে মানুষের মন। পৃথিবীতে বাবা করে যাবেন ঋণ—ছেলে শোধ করবে দায়িত্ব নিয়ে। ছেলেকে মানুষ করে তুলছেন এই কৃতজ্ঞতা বোধে—ছেলে হবে বাধ্য বিনীত ও প্রতিবাদ-ভীরু। তাই কি হয়? ছেলে বহুক্ষেত্রে বলে, কিসের ঋণ? আমাকে পৃথিবীতে আনার দায়িত্ব যাঁর—আমাকে স্বাবলম্বী করে তোলার ভারও তাঁর। বাপের কর্ত্তব্য পালন করার মধ্যে ছেলেকে ঋণী করার কথা ওঠেই বা কি করে! তারপর বাবা অক্ষম হলে সুরু হবে ছেলের কর্ত্তব্য। সেখানেও ঋণের প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। তবু স্নেহের মধ্যে প্রত্যাশা তার বর্ণলেপ অতি নিবিড় ভাবেই করে যাচ্ছে। দেওয়া নেওয়ার বাধ্যবাধকতার টানা-পোড়েনে—যোগ হচ্ছে কর্ত্তব্যের পরিধেয়—যা সামাজিক কিংবা সাংসারিক বিধি-বিধানের গায়ে চাপাতেই হবে, না হলে সংসার ঠিকমত জমবে না। এই কর্ত্তব্য নিয়ে কথান্তর—মনান্তর—প্রিয়-পরিজন বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদটা এখন নিত্যই লেগে আছে—স্নেহ-ভালবাসার সুতোগুলো ভারি অপলকা হয়েছে। অভাব তার স্থিতিস্থাপকতাগুণ নষ্ট করে দিচ্ছে—অভাব দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্য পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু সন্তু তার এমন হবে কি? সরল সত্যসন্ধ একান্ত নির্ভরশীল বালক—এখন ঘুমের ঘোরে মায়ের বাহু খোঁজে উপাধান করবে বলে—নিজের মিথ্যা ভাষণের কথা, মনের লোভের কথা অসঙ্কোচে ব্যক্ত করে।

ভগবতী বললেন, এত ভাবছ কি? সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে নাও।

ভাবছি কি জান? সন্তু বড় হয়ে ভিটেয় চালা না-ও তুলতে পারে।

পাগল! কোথায় কি তার ঠিক নেই—এখন থেকেই—

জানি না আমিই ভুল করেছি কিনা। অমরনাথ বললেন। শহর আমাদের নয়—এ বেশ বুঝেছি, কিন্তু দেশে থেকে বাঁচবার উপায়ই বা কই। বর্ণ বিভাগ ভেঙ্গে গেল যেদিন—সেইদিনই আমাদের দুর্দ্দশা আরম্ভ হল।

ভগবতী অত বোঝেন না। বললেন, চিরকাল সমান যায় না।

কিসের? মানুষের—না রাজ্যের?

আমাদের কথাই জানি—সেই কথাই বলছি।

আমি কিন্তু জানি—আমাদের চিরকালই সমান যাবে।

মনে পড়ে তারিণী-কাকাকে ? সন্তু যেবার হয়—সেইবার তিনি মারা গেলেন। তখন তাঁর বয়স সত্তর। বাবার মুখে শুনেছি—তারিণীকাকার বাবা কোনদিন কাঁসার থালায় ভাত খেতে পান নি—একটার বেশী দুটো তরকারি জোটেনি কখনও!—ছিলেন ইস্কুল মাস্টার। তারিণী-কাকারও সেই দশা। সেই ইস্কুল মাস্টারী—সেই ভাঙ্গা খড়ো ঘরে বাস—ছেলেদের পরণে কাপড় নেই—পায়ে জুতো নেই। মরবার সময় চিকিৎসা হল না—পয়সা অভাবে। বলতে পার ভগবানের এ কেমনতর বিচার! এক কালে দুঃখ অন্য কালে সুখ—এ ব্যতিক্রম কেন হল ? বলবে কর্ম্মফল। কর্ম্মফল কি তিন পুরুষের কপালে একই তিলক কেটে একই দুঃখ ভোগ করাচ্ছে ?

আমি মূর্খ মেয়েমানুষ—কি জানি! শুধু জানি ভগবান না দিলে কারো পাবার যো নেই।

ঠিক—ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন—তোমাদের বিশ্বাস আছে—তাই দুঃখের এক রকম ভোগটাই জান—আমরা নানান দিক দিয়ে তা ভোগ করি।

নারায়ণের শীতল দেওয়া শেষ হলে ছেলেদের ডাকলেন প্রসাদ নিতে। যৎসামান্য উপকরণ নিয়ে শীতল হয় প্রত্যহ। কয়েকখানি বাতাসা—সামান্য শসা বা কলার টুকরো—ঋতু ভেদে শাঁকালু, পেঁপে, আম, আনারসের টুকরো। কোন দিন বা গুঁজিয়া আনেন কিছু—মাস কাবার হয়ে প্রথম মাইনে পাবার দিন।

ছেলেরা বাতাসা মাথায় ঠেকিয়ে প্রসাদ পেলে।

অমরনাথ বললেন, বাবার একটি কথা আজ মনে পড়ছে। তখন কলকাতায় আসব ঠিক করেছি। ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে একদিন ওঁর সঙ্গে তর্ক হল খানিকটা। বললাম, উপার্জ্জনের জন্য দেশ ছাড়া পাপ—এ ধারণা আজ অনেকেরই নেই।

বাবা বললেন, অনেকে বর্ত্তমান দেখে—ভবিষ্যতে কি হবে ভাবে না।...অঋণী অপ্রবাসী মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট আসে না—এতো এই জীবনেই কত দেখলাম। এই ঘরের বাঁধন কত চমৎকার করে দিয়েছিলেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা জান ? স্ত্রী পুত্র পরিজন—এদের টান মানুষকে বেঁধে রাখবে এ স্বাভাবিক—সেই সঙ্গে গৃহ-দেবতার প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবার ব্যবস্থা করে গেছেন তাঁরা এই ভেবে—ধর্ম্মের দায়েও তার ভিটের উপর টান আসবেই। গৃহ-দেবতা যেন চুম্বক পাথর—দূরের কাছের সবাইকে টানবে। আজ নারায়ণও হয়েছেন প্রবাসী। আমরা ভুলে গিয়েছি—কেন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা! কেন ভোগরাগ নিত্যপূজার ব্যবস্থা! আমরা ওঁকে টেনে এনেছি থালা বাসন ট্রাঙ্ক বিছানার সঙ্গে। কিন্তু থালা বাসন ট্রাঙ্ক বিছানা যেমন পরিস্কার করে সাজিয়ে রাখা যায়—তেমনি দায়সারা গোছ পূজো দিয়ে ওঁকে ভোলানো চলে না। যে ঘরে উনি প্রথম এসেছেন সেই তো ওঁর মন্দির।

আজকাল এই রকম কথাই বলেন অমরনাথ। গ্রামের অনেক কথা। সমাজের কথা—শিক্ষার কথা। যে কাল চলে গেছে তার গুণের কথা।...ভগবতীও ভাবেন—সেই কালই তো ছিল ভাল। বৃহৎ এক বনস্পতির ছায়ায় জীবনের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল। ঝড় ছিল, তার রুদ্র তাণ্ডব শাখাপত্র স্পর্শ করতে পারে নি। শাশুড়ীর শাসনের আওতায় কেটেছে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলি। কত লজ্জা—কত বাধা ছিল আত্মপ্রকাশের—কিন্তু কি মধুর ছিল সেই বাধা! আজ আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে তিনিও ফিরে যেতে চাইছেন—সেই নিরুদ্বেগ পরশাসন-নির্দ্দিষ্ট দিনগুলির মধ্যে।

বুঝতে পারেন—ছেলেমেয়েগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে। গৃহদেবতার কত মাহাত্ম্যই ছিল—সর্ব্বক্ষণ সে মাহাত্ম্য অন্তরে ধরে রাখার দৃঢ়তা ওদের নাই। সন্তু মনোক্ষুণ্ণ হয়েছে—স্পষ্টই বোঝা যায়। কমলা চুপিসাড়ে গিয়ে দাঁড়ায় সৈনদিদির জানালার ধারে। ও ঘরের সুর-ঝঙ্কার ওকে মন্ত্রমুগ্ধ করে টেনে নিয়ে যায়। ছোট ছোট ছেলেরাও বলে—মা শহর দেখব।

ভগবতীও কদিন শহর দেখেছেন। এখানকার বিস্ময় অফুরন্ত—শত চক্ষু হয়ে দেখেও আশা মেটে না। ছেলেদের কি দোষ ? পচা বর্ষা ওদের গৃহবন্দী জীবনকে আরও অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ঘরের একমাত্র ছাতাটী নিয়ে অমরনাথ আফিসে যান। সে ছাতার বয়স হয়েছে—বর্ষার দুরন্ত বেগ সহ্য করতে পারে না। ভাগ্যে পথের ধারে অসংখ্য গাড়ীবারান্দা আছে এবং আকাশের মেঘও জলধারা ঢেলে খানিক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে

অমরনাথের মত লোকেরা কোন রকমে ঘরে পৌছে যান। এক একদিন দেবতার কোপ যেন বেশী হয়, পৃথিবীকে ভাসাবার সঙ্কল্প নিয়ে অপরির্য্যাপ্ত বর্ষণ সুরু করে। শ্রাবণের প্রথমে এমনি দুর্দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলল। ভাঙ্গা ছাতা সম্বল করে অমরনাথ আফিসে গেলেন। জরুরি কাজ, না গেলে নয়। ফিরলেন ধারা জলে স্নান সেরে। শুধু ঘরে ফেরার কালে নয়, আফিসে যাবার সময়ও সেই ধারা জলে স্নান—সারাদিন ভিজে কাপড়ে আপিসে কর্ম্ম করা—দেহের তাপে কাপড় শুকানোর অনিয়ম ভোগ করতে হল অচিরে। অমরনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাথায় বেদনা—সর্দ্দি ভাব—সর্ব্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা—সেই রাত্রিতেই প্রবল জ্বর এল। কি অসহ্য যন্ত্রণা—জ্ঞানের রাজত্বে সুরু হল বিপ্লব। ঝড় বাদলে—গৃহকোণের রেড়ির তেলের প্রদীপটি কেঁপে কেঁপে উঠে যেমন নিভে যাবার ভয় দেখায়—তেমনি বুঝি চৈতন্যকে আর ধরে রাখা যায় না।

একটু চা খাবে? ভগবতী অসহায়ের মত বললেন।

চা! রক্তচক্ষু মেলে অমরনাথ বললেন, তা দাও। কেমন বিহ্বল অর্দ্ধোচ্চারিত স্বর। ভয় পেলেন ভগবতী। কাকেই বা ডাকবেন! কে দেবে পরামর্শ—এই বিপদে!

সন্তকে বললেন, হাঁরে—কারা চা খায় বলতে পারিস? এক কাপ চা যদি যোগাড় করতে পারিস!

চা কে না খায়—কিন্তু এখন এত রাত্তিরে কেউ খাচ্ছে কি? একটু ভেবে বললো, ঠিক কথা—একজনেরা খায় —সেখানে আমি চাইতে পারব না।

কোথায়—কারা খায়?

ওই যে সুধীনবাবুরা—; ওরা তো দিনরাত চা খায়।

তা যা না বাবা, বলবি—ওঁয়ার অসুখ—

আমি পারব না। সন্ত উঠে ঘরের ওধারে গেল।

বউদি আছ? শোন তো একবার। যেন সৌরভীর গলা। অকূলে কূল পেলেন ভগবতী। তাড়াতাড়ি দুয়োর খুলে বাইরে এসেই কেঁদে ফেললেন, ওঁর বড্ড অসুখ ঠাকুরঝি। জ্বর—গায়ে ব্যথা—কেমন বেহুঁস হয়ে পড়েছেন। কি যে করব ভেবে আমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

সৌরভী বললে, ভয় কি—জলে ভিজে ভিজে এমন জ্বর সব ঘরেই হচ্ছে। কি যে বলে ছাই ওর নাম—গোলাপী বড়ি আনিয়ে খাইয়ে দাও, একটু আদা-চা দাও—দেখবে জ্বর পাল্যে যেতে পথ পাবে নি।

কোথায় চা—কোথায় আদা—

আমি দেখছি—তুমি দাদার শিয়রে বসগে—গা হাত-মাথা টিপে দাও গে।

খানিক পরে চা নিয়ে এল সৌরভী। ডাকলে, বউদি।

ভগবতী চায়ের কাপ ধরলেন অমরনাথের সামনে। চা খাও। আদা চা।

চা! রক্তচক্ষু মেলে অমরনাথ বললেন, না, খাব না।

এই যে বললে চা খাব? আদা খেলে গায়ের ব্যথা জল হয়ে যাবে। একটু খেয়েই দেখ না গো।

ভগবতীর আর্ত্তকণ্ঠে অমরনাথের জ্ঞান ফিরে এল। বললেন, কথায় কথায় চোখে জল আসা ভাল নয়, এ চোখের জল শুকোয় না।

ভগবতী আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, কি করব —আমি। বিদেশ বিভুঁই—কতকগুলি নাবালক নিয়ে কার মুখ চেয়ে বুক বাঁধব। কোথায় ডাক্তার—কোথায় পথ্যি—

ভয় কি—যাঁর ভার তিনিই বইবেন। পৃথিবীতে মানুষ একলাই আসে—মহামায়া মায়ার বাঁধনের পর বাঁধন দিয়ে কষে কষে বাঁধেন জীবকে। জীব ভাবে আমার এ—আমার তা। কা তব কান্তা কস্তে পুত্র।

অমরনাথের হাসিটা ভাল লাগল না ভগবতীর। কেমন অসংলগ্ন ভাব। অমরনাথ গান ধরলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে—

—মাথায় হাত বুলিয়ে দেব? চা খাবে না?—

—চা? দাও। আচ্ছন্ন কণ্ঠে অমরনাথ বললেন।

—চামচ করে চা মুখে দিলেন—কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

ভগবতী বললেন, সন্ত—জিজ্ঞাসা কর তো তোর সৌরভী-পিসিমাকে, এখানে ভাল ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাবে?

ডাক্তারের অভাব কি—গলিতে গলিতে ডাক্তার।

আমি যেন অভাবের কথাই বলছি! জানা-চেনা

ডাক্তার কেউ আছেন কিনা কাছেপিঠে—তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মায়ের স্বরে বিরক্তিভাব লক্ষ্য করে সন্তু বাইরে চলে গেল। ভগবতীও বুঝলেন—নিজের বিরক্তিভাব। কি করবেন—এই অতর্কিত আঘাত তাঁকে কোথায় ঠেলে নিয়ে চলেছে—কত দূরে! ভয়—উদ্বেগ—দুশ্চিন্তা যা কিছুর দায়িত্ব যেন তার কাঁধেই এসে চাপল। বিদেশে পোষ্য-ভারগ্রস্ত একা স্ত্রীলোক—না আছে অর্থের সহায়—না আছে মানুষের সহায়!…সব মিলিয়ে মনের প্রসন্নতা নষ্ট করে দিচ্ছে—বেশ বুঝছেন।

ঘরের কোণে জলচৌকির উপর পিতলের সিংহাসনে গৃহদেবতা জনার্দ্দন রয়েছেন। বহু পুরুষের জাগ্রত দেবতা, কত আপদ বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন গৃহস্থকে—একে একে মনে পড়ল সে সব কথা। স্বপ্নে খাবার চেয়ে খাওয়া—কাপড় চেয়ে নেয়া—ঔষধের সন্ধান দেয়া—ভাবী বিপদে সাবধান বাণী উচ্চারণ—অসংখ্য ঘটনা আর কাহিনী মনে পড়ছে। দেবতা শুধু শিলামূর্ত্তি নন—সর্ব্বভূতাশ্রিত চৈতন্যময় প্রভু। জীবের বল বুদ্ধি ভরসা উনিই তো সব। উনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ—জগৎ ওঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্ট হয়েছে—ওঁরই আশ্রিত জীবকুল। মাথা লুটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে রইলেন জনার্দনের সিংহাসনের সামনে। দু-চোখে ধারা বইল—মনটা অনেকখানি হালকা হল।

ভোরবেলাতেই সৌরভী এসে জিজ্ঞাসা করলে, দাদা কেমন আছেন?

সেই এক ভাব। সারা রাত্তির ভুল বকেছে—ছটফট করেছে। কেবল বলেছে—একটু দাঁড়াও—আমি আসছি। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন ভগবতী।

সৌরভী বললে, শক্ত হও বউদি—তুমি বুক না বাঁধলে ছেলেমেয়েগুলো যে ভেঙ্গে পড়বে। ডাক্তার ডাকাও—চিকিচ্ছে করাও, জ্বর ভাল হবে।

কোথায় ডাক্তার জানি নে ভাই—

আচ্ছা আমি ডেকে নেস্‌ছি সাগরবাবুকে। বুড়ো ডাক্তার—দয়া মায়া আছে, ট্যাকার খাঁইও কম।

সন্তু যা তোর সৌরভী পিসির সঙ্গে।

সাগর ডাক্তার এসে রোগী দেখলেন। সব শুনলেন মন দিয়ে। অদূরে দণ্ডায়মানা অবগুণ্ঠনবতী ভগবতীকে উদ্দেশ করে সৌরভীকে বললেন, জ্বরটা বাঁকা—সময় নেবে। একটু দেখাশোনা দরকার। তা পুরুষ অভিভাবক এঁদের কে আছে?

সৌরভী বললে—কে আর থাকবে ডাক্তারবাবু—এই তেরো বছরের ছেলেটিই ভরসা।

তবু তাঁর বন্ধু-বান্ধর কেউ—মানে যাঁর সঙ্গে মেলামেশা করেন—তেমন কেউ নেই? তাঁকে গুটিকতক কথা বলে যেতাম।

সন্তু বললে, আমি কাকাবাবুকে ডেকে আনছি।

বিনয়বাবু এসে বললেন, আমাকে খবর দেননি কেন বউদি? কবে থেকে জ্বর হল দাদার?

কাল রাত থেকে। সন্তুই জবাব দিলে।

ডাক্তারবাবু বললেন, এদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বিনয়বাবুর ঘরে এসে বললেন, রোগটা সীরিয়াস, দু'টি লাংস্‌ই অ্যাটাক করেছে। গায়ের তাপ নেই—অথচ অজ্ঞান।

নিউমোনিয়া। শিউরে উঠলেন বিনয়বাবু।

হাঁ। পেনিসিলিন দিতে হবে—এ ছাড়া গতি নেই—এতটা ডেভেলাপ করেছে—তাতেও কি হয় বলা যায় না। ওঁর আপনার জন আর কে আছে?

দেশে বোধ হয় কেউ নেই—কারণ বাড়ী বন্ধ করে পরিবার এনেছেন বাসাতে।

যাই হোক—আপনি একটু দেখা শোনা করবেন কখন কি টার্ণ নেয়—জানাবেন আমাকে। আর ঠিকমত যাতে ওষুধ পড়ে—সেটি দেখবেন। আহা—বউটিকে দেখলে কষ্ট হয়।

ডাক্তার চলে গেলে—সন্তু জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তারবাবু কি বললেন—কাকাবাবু?

ভয় নেই, সেরে যাবে।

ভগবতী এ সংবাদে আশ্বস্ত হলেন। হাঁটু গেড়ে বসলেন জলচৌকির সামনে—প্রার্থনা করলেন আকুল কণ্ঠে, হে ঠাকুর—হে অন্তর্যামী—তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার—তুমি দেখো।

মনে পড়ল কয়েকদিন আগে—অমরনাথের মুখে শোনা—মহাভারতের কথা। শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ—সে কি সুখের কথা। আপনার বলে কণামাত্র অবশিষ্ট যদি রাখ—

তাঁর দর্শন মিলবে না। এমনি হয়েছিল অক্ষপণ-ক্রীতা দ্রৌপদীর বেলা। দুষ্ট দুঃশাসন সভাস্থলে সর্ব্বজন সমক্ষে যখন পরিধেয় আকর্ষণ করেছিল, নারী-মর্য্যাদাহানির ভয়ে কৃষ্ণা আর্ত্তস্বরে ডেকেছিলেন—কোথায় দ্বারকানাথ এ বিপদে রক্ষা কর আমায়। তুমি লজ্জানিবারণ—বিপদ-ভঞ্জন—নারীর সম্মান না রাখলে তোমার নামে যে কলঙ্ক হবে। রক্ষা কর প্রভু। কৃষ্ণ আসেননি। দুঃশাসন সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে কৃষ্ণাকে বিবস্ত্রা করতে চেষ্টা করছে—সে শক্তির কাছে কৃষ্ণার প্রতিরোধ কত সামান্য! দু'হাত বুকে চেপে কৃষ্ণা আকুলকণ্ঠে চীৎকার করছেন, এস প্রভু—তোমার সখীকে রক্ষা কর—কুলনারীর সম্ভ্রম যায়—রক্ষা কর। কৃষ্ণ তথাপি বধির।—এদিকে দুঃশাসনের বলপ্রয়োগ মাত্রা অতিক্রম করছে। কৃষ্ণার সমস্ত দেহ হৃতশক্তিতে অবশ হয়ে আসছে। মাত্র একখানি হাত বক্ষোবসনের উপর চেপে ধরে আর একখানি হাত উপরে তুলে ডাকছেন, প্রভু এস। কিন্তু কোথায় প্রভু? এদিকে শক্তিও নিঃশেষিত—দুঃশাসনের আকর্ষণে বক্ষোবসন স্খলিতপ্রায়—থরথর করে কাঁপছে সর্ব্বদেহ। কৃষ্ণা মরিয়া হয়ে উঠলেন—যাক ধর্ম্ম যাক সম্ভ্রম। যিনি সব রক্ষার মালিক তাঁকে সমর্পণ করি আমার লজ্জা সম্ভ্রম, আমার শক্তি সাহস, আমার আত্মরক্ষার এই সামান্য চেষ্টা। বুকের উপর থেকে উঠিয়ে নিলেন হাতখানি—দু'হাত জোড় করে—ঊর্দ্ধে তুলে বললেন, হৃদয়নাথ সবই তোমাকে দিলাম—তুমি ইচ্ছা হয় রাখ—ইচ্ছা না হয়……

তার পর কৃষ্ণার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল—সমস্ত অন্তর হয়ে উঠল কৃষ্ণচৈতন্যে উদ্দীপিত। প্রার্থনাপূর্ণ করলেন ভগবান।

এরপর একদিন দ্রৌপদী কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, আচ্ছা সখা প্রথমেই তো তোমাকে আকুল হয়ে ডেকেছিলাম, কেন আসনি তবে?

কৃষ্ণ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, শুনতে পাইনি যে।

কেন—সামান্য পিঁপড়ের পায়ের ধ্বনি তোমার কানে পৌঁছয়—আর আমার মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনতে পেলে না?

কেমন করে পাব সখী—আমি যে অনেকদূরে ছিলাম। ভেবে দেখ তো কোথায় দ্বারকা আর কোথায় হস্তিনাপুর। দ্বারকানাথকে ডাকলে সে কি শুনতে পায় এতদূর থেকে। কিন্তু যেইমাত্র তুমি ডাকলে হৃদয়বল্লভ বলে—সমস্ত ফেলে দিলে আমাকেই—কত কাছে চলে এলাম বল ত? আর কি করে স্থির থাকি বল তো?

শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। কত কাছে—কত কাছে রয়েছেন প্রভু—কিন্তু কতদূর থেকে ডাকছি আমরা।… দ্রৌপদীর মত সব দেওয়ার শক্তি কই আমাদের! আমরা যে বড় দুর্ব্বল—বড় অসহায়।—একবার রোগীর শিয়রে এসে বসেন—একবার ঠাকুরের বেদিতলে মাথা লুটিয়ে কাঁদেন। সর্ব্বস্ব অর্পণের ক্ষমতা কই তাঁর? বৈদ্যের উপর রোগ আরোগ্যের ভার দিয়ে দেবতাকে করছেন মানত। সংশয়-পীড়িত মনের এর বেশী সামর্থ্য কই!

পরের দিন সৌরভীকে বললেন, মাস কাবারের মুখ—টাকাও নেই হাতে।—কি হবে ঠাকুরঝি?

সৌরভী আশ্বাস দিলে, ভয় কি—এক জায়গা থেকে আমি ধার করে নেসবো'খন—দাদা ভাল হয়ে উঠে শোধ দেবে।

তাই দে—আমায় বাঁচা। উনি বলতেন, ভগবান কিছু মানুষকে দেখা দিয়ে বলেন না—ভয় নাই। কি, এই নাও যা চাইছ। মানুষের ভিতর দিয়ে তিনি সব করান। তুমি আমার সেই ভগবান ঠাকুরঝি।

—সৌরভী পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

সন্ধ্যা বেলায় ভগবতীকে ডেকে বললে, এই নাও পঞ্চাশটা ট্যাকা। শোধ করবার তাড়া নেই—দু' মাস হোক—ছ' মাস হোক—যেমন পারবে, দেবে।

একটু পরে সুরমা এসে বললে, দিদি—একটা কথা শুনবে আমার? আজ আমি রাত জাগব কিন্তু।

সেকি—তোমার কষ্ট হবে!

হোক না কষ্ট। সুরমা হাসলে। কষ্ট মাঝে মাঝে না পেলে মনে হয়—দূর, সুখ আবার কি! রোজ সন্দেশ খেতে খেতে অরুচি হয় যেমন!

ভগবতী ওর ছেলেমানুষিতে ঈষৎ হাসলেন। বললেন, না ভাই—তোমরা কষ্ট করতে যাবে কেন শুধু শুধু? সাধ করে কেউ কি—

না—আমি আজ রাত জাগবই। রাত্তিরের রান্না সেরে নিয়েছি। আর তুমি তো আমাদের হাতে খাবে না—মা হলে—তোমার রান্নাও সেরে ফেলতে পারি। কিন্তু আর

একটা মুশকিল হয়েছে—আজই ওঁর বদলির চিঠি এসেছে—মফঃস্বলে যেতে হবে—সাত দিনের মধ্যে। উনি বললেন, দাদার এই অসুখ—দেখে কি করে যাই। বললুম, বেশ তো—তুমি যাও—আমি ওঁকে পথ্যি না দিয়ে নড়ছি না। তাই ঠিক হয়ে গেল। দাদা সেরে উঠলে আমি যাব।

মুগ্ধ হয়ে গেলেন ভগবতী। কে বলে ঈশ্বর নাই—বিদেশে নির্ব্বান্ধব তিনি!

ভোর রাত্রিতে অমরনাথ চোখ চাইলেন। দৃষ্টিতে অন্বেষণের ভাব—জ্ঞান ফিরে এসেছে—আংশিক জ্ঞান। কাকে যেন খুঁজছেন—অত্যন্ত পরিচিত জনকে। ঘরের অনুজ্জ্বল আলোয়—সব কিছু স্বপ্নবৎ মনে হচ্ছে—অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া ভাব।

—কে—? কে?—অস্পষ্ট গোঙানির মত গলা দিয়ে স্বর বার হল।

সুরমার তরল তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, দাদা আমি। কেমন আছেন?

অমরনাথ ডান হাতের তর্জ্জনী ললাটে ঠেকিয়ে কি যেন বললেন।

—জল খাবেন?

তর্জ্জনী···তুলে ধরে কি যেন ইঙ্গিত করলেন।

সুরমা উঠে এসে ভগবতীর মাথায় আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে বললে, দিদি—ওঠ। ডাকছেন তোমায়! দাদা—ডাকছেন।

—অ্যাঁ। ধড়মড় করে উঠে বসলেন ভগবতী। বেশ-বাস সম্বৃত করে অমরনাথের সামনে গিয়ে বসলেন।

পরিচিত মুখের আলোয় অমরনাথের ছিন্ন চৈতন্যের সূত্র সংযোজিত হল। বললেন, শোন।

—কি—কি বলছ? ভগবতী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। পূর্ণ তিন দিন পরে অমরনাথ কথা কয়েছেন—চৈতন্য ফিরে এসেছে।

—ঘরের কথা বলছিলে কাল, নয়?

—ঘর! ভগবতী বিস্মিত হলেন।

—হাঁ—ঘর। কিন্তু···ঘর···চাইলেই কি ঘর পাওয়া যায়? যায় না। আমি ঘর বাঁচাবার জন্য বাবার সঙ্গে ঝগড়া করলাম—চাকরি নিলাম—কিন্তু···; হাঁপাতে লাগলেন অমরনাথ।

—একটু জল খাও। ভগবতী চামচে করে জল দিলেন।

অমরনাথ বললেন, ঘরে তুলব বলে তোমাদের শহরে আনলাম—; ঘর নষ্ট হয়ে গেল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন অমরনাথ—ওঁর চোখের কোল চক্‌চক্ করছে মনে হল।

—ওকি—তুমি কাঁদছ! ভগবতীর কণ্ঠে অপরিসীম বেদনা। তুমি ভাল হয়ে ওঠো—কিছুই নষ্ট হবে না আমার।

—আর যদি ভাল হয়ে না উঠি?

ডুকরে কেঁদে উঠলেন ভগবতী। সুরমা ছুটে এসে সান্ত্বনা দিল, ছিঃ দিদি—আবার কাঁদছেন! কাঁদলে রোগীর অকল্যাণ হয়—জানেন তো।

ভগবতী মুখ তুলে বললেন, আমি যে আর পারছি না ভাই—আমার কেবলই মনে হচ্ছে—কি যেন হারাতে বসেছি—কি যেন চলে যাচ্ছে—।

অমরনাথের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে ততক্ষণে।

পুরুত-গিন্নি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন,—ছোঁড়াগুলো যে গেল কোন্ চুলোয় কে জানে। এদিকে উপঝরন্ত বৃষ্টি—ওদিকে রুগী এড়িয়ে রয়েছে বাড়ীতে। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে ল্যাটা মিটিয়ে নে—তা নয় কোথায় ঘুরছে সব!

ছেলেরা অবোধ—ওরা তো ঘুরবেই—বুড়োরা কোন আক্কেলে এই বাদল মাথায় করে ঘোরে বলতে পার জ্যেঠিমা? সৌরভীর ভ্রাতৃজায়া পিছন থেকে মন্তব্য করলেন।

—কে—সৌরভী বুঝি? তা বাছা রাগই কর আর যাই কর, হক কথা বলব—যে মানুষের বার টান আছে—তাদের তিথি নক্ষত্র পুণ্যিমে আমাবস্যে আর ঝড় বাদল বা কি! একটু হেসে বললেন, ওনার মুখে শুনেছি অন্ধকার রাতেই রাধিকা বেরুতেন অভিসারে। পাছে শব্দ হয় বলে—পায়ের মল পায়ের মাঝখানে ঠেলে তুলতেন।

—না জ্যেঠিমা বলছিল, কাল কালীঘাটে যাবে পূজো দিতে। সন্তুর বাপের তো খুব বাড়াবাড়ি অসুক—

—ওমা—তা এত লোক থাকতে ওনার মাথা ব্যথা কেন! কথায় বলে—

মা বিয়োলে না বিয়োলে মাসী,
ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়া পড়শী!

ওনারও হয়েছে তাই। হলক নাচানি ভাব ভাল নয় বাছা—একটু শাসন করো। দেখতে শুনতে সব দিকে খারাপ।

তা আমি কি করতে পারি জ্যেঠিমা—কচি খুকীটি নয়—চোখ রাঙিয়ে শাসন করব। তাছাড়া আপনার ছেলের আস্কারা আছে।

—খেতে দিও না—তাহলেই জব্দ হবে। কথায় বলে—

ভায়ের ভাত
ভাজের হাত।

—খায় কোথায়—এই তো আজ তিনদিন ভাত ছোঁয় নি। রেশনের চাল মাপা-জোকা—ফেলা গেল। বুকটা কর কর করে জ্যেঠিমা। ক্ষেতি অপচো দেখতে পারি না।

—আহা—ওর আর কি।

পরের গায়ে লাগে
তুলো হেন বাজে।

—তা এত উপোস কাপাসের ঘটা কেন! শরীর-টরীর খারাপ বুঝি?

—যম জানে—! নাইছে—অষ্ট প্রহর ভিজছে—দশবার ওপর নীচে করছে—শরীর খারাপ হলে কেউ পারে! এই বিষ্টিতে রাঁধাবাড়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে। বলতে শুনিয়ে দিয়েছে—তাই ত রান্নার পাট চুকিয়ে দিয়েছি—মন ভাল নয়—আমার খাওয়ার জন্ম তোমরা ল্যাঠা করো না।

—হুঁ—দেখিস মা—পাখা যেন ছেকল না কাটে। লক্ষণ ভাল নয়।

ওপর থেকে দৌড়তে দৌড়তে ছুটে এলেন বিনয়বাবু। সিঁড়ির মাঝপথে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন দু'জনে—বিনয়বাবু বললেন, দয়া করে একটু সরে দাঁড়ান। ওঁরা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতে ঝড়ের বেগে নেমে গেলেন তিনি। দোতলায় যেন অনেকগুলি পায়ের আসা যাওয়ার শব্দ—একটা চাপা গোলমালও সুরু হয়েছে।

দু'জনে পরস্পরের পানে চেয়ে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর পুরুত-গিন্নি বললেন—চল—ওপরে উঠে দেখে আসি কি ব্যাপার! বোধ করি মিন্‌সের অবস্থা ভাল নয়। আহা—একপাল নেণ্ডি গেণ্ডি নিয়ে মাগী কি যে করবে—ভগবানই জানেন।

(ক্রমশঃ)

দীঘা দেখতে গেলাম

শ্রীসুগৌতম

কাঁথী শহর থেকে বিকেল চারটে কুড়ি মিনিটে দীঘা যাওয়ার বাসখানায় গিয়ে বোসলুম। মনে তখন একটা অফুরন্ত আনন্দের ঢেউ উঠেছে। মনে আনন্দ হওয়ার একটা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে—সেখানে মন যারই স্পর্শ পায় তাই আনন্দে গ্রহণ করে।

বাসের সামনের সীটের সঙ্গী পেলাম কাঁথীর এক উকীলবাবু, নাম শ্রীবিধুভূষণ পাণ্ডা। শুনলাম তাঁর বাড়ি রামনগরের নিকট, দীঘা থেকে পাঁচ ছ' মাইল আগে।

ঠিক সাড়ে চারটে, বাসখানা কাঁথী শহর থেকে যাত্রা শুরু করল। কথায় কথায় পরিচয় আদি সংক্ষিপ্ত ভাবে শেষ করে বিধুবাবুর কাছ থেকে এখানের অনেক পুরাণ কাহিনী শুনতে লাগলুম। ওর মত বক্তা এবং আমার মত শ্রোতা না হ'লে এ যাত্রা যে তিক্ত-যাত্রা হ'ত সন্দেহ নেই। কারণ বাসখানা যে গতিতে চলে, যে ভাবে লোকজন নেয় এবং নামায়, তদুপরি বাসখানার শারীরিক অবস্থা যা তা' হল—রক্তহীন বেতো রুগীর মত—মুখে ফেনা তুলে গোঙাতে গোঙাতে চলে। মাঠে ঘাটে জল দেখলেই তাকে থামিয়ে একটু জল খাওয়াতেই হয়। মোটের ওপর দীঘা পর্যন্ত পথ যাওয়ার বাহন আছে—এই পর্যন্ত।

উকীলবাবুর কাছে ১৯৪২এর সাইক্লোনের বীভৎস কাহিনীর বিবরণ শুনলাম—প্রকৃতির সে কি প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা। আর তার সঙ্গে শুনলাম যে '৪১ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করবার জন্যে যে গোরা সৈন্যবাহিনী তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার নিয়োগ করেছিলেন তা'দের অপূর্ব সামাজিক সাহায্য দান। আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে যে বাহিনী নির্দয় হাতে এখানকার জনসমাজকে নিপীড়িত করেছে, অক্টোবর মাসে সেই হাতেই দয়ার অকুণ্ঠ কর্তব্যপরায়ণতা। যেদিন প্রকৃতি মানুষকে বিপদে ফেলে নিষ্পেষণ করল সেদিন সেই সৈনিকবাহিনী তাদের অগ্নিবান ত্যাগ করে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যের মত মানবধর্মকে মানব-জীবনকে রক্ষা করবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। "এস হে মানুষ ভাই, তোমাদের

বিপদের দিনে সাহায্য দাও। আজ আমাদের ঘৃণা কোরো না। আমরা সৈনিক, মানুষের জন্য দেশের জন্য আমরা নিজেদের উৎসর্গ করে বসে আছি।" কত যে জনহিতকর কার্য সেদিন তাঁরা করেছিলেন তার আর ইয়ত্তা নেই।

'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'—এমন একটা সময়ে এসে পৌঁছলাম "পিছাবনি" গ্রামে। এখানে বাস থেকে নামতে হ'ল, কারণ এখানে সমুদ্রের লবণাক্ত জলের একটা খাল আছে। বোটে ক'রে বাসখানাকে পার করে দেয় অপর পাশে এবং লোকজনকে অন্য একটা নৌকায় করে পার করা হয়। উকীলবাবু এখানে দাঁড়িয়ে আমাকে কিছু ইতিহাস শোনাতে শোনাতে অনেকগুলি পুরাতন ঘটনাকে আমার মনের সামনে ধরে দিলেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে কখনো বা আমার চিত্তে দুর্বলতা স্পর্শ করল, কখনো বা গর্বে বুকখানা ফুলে উঠল।

যাই হোক এই পুণ্যভূমিতে যে স্পর্শ পেলাম—তা'তে আমার সৌভাগ্যই মনে হ'ল।

'পিছাবনি' কথার মানে—পিছাইব না; পিছিয়ে যাবো না। মেদিনীপুরের নিজস্ব ভাষায় 'যাবনি (=যাব না), তেমনিই পিছাবনি। একদা বাংলার সন্তানগণ এই তীর্থক্ষেত্র থেকে সহস্র হৃদয়হীন অত্যাচার সত্ত্বেও ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় নি। হে বঙ্গ জননী, তোমার বীর নন্দনরা কোন দিন পিছিয়ে থাকে নি, পিছিয়ে যেতে শেখে নি। চিরদিনই তোমার বীর ছেলেদের সামলাতে রাষ্ট্রকে হিমশিম খেতে হয়েছে। যখনি রাষ্ট্র অসুবিধা, দুর্ভোগ পেয়েছে, বাঙালীকে ভাগ করে শাসন করেছে—এই ভাগ করার ইতিহাস আজকের নয়, ১৯০৫ সনেরও নয়, সুদূর ১২৮২-১৩৩৮ খৃঃ আঃ যখন বলবনের বংশধরগণ বাংলায় নবাবী করেন, সেই আমলে এ দেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে নবাবরা বাংলাকে তিনটি টুকরো করে সায়েস্তা করেন (লক্ষণবতী—West Bengal, সপ্তগ্রাম—South Bengal, সোনার গাঁ—East Bengal)। আজ এতকাল বাদে বাঙালীর ম্লান মুখ, নির্জীব ভাবে জীবনধারণ করছে।

যাক সে কথা। এই পিছাবনিতে, এই শুষ্ক ভূমিতে ১৯৩০ সনে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয়। আর এই খালের লবণাক্ত জল, আর এই খালের পাশের লবণাক্ত মৃত্তিকা জল দ্বারা ভিজিয়ে ছেঁকে তা' থেকে লবণ তৈরি করা হয়েছে। এই আন্দোলনের পিছনের উদ্দেশ্যের কথা থাক, এই সামান্য লবণ তৈরি করেই সেই দিন দেশের লবণের অভাব ঘুচে যায় নি ঠিক, তবু এই সেই পবিত্র ক্ষেত্র যেখানে লবণ তৈরির নামে সারা ভারতকে উদ্বুদ্ধ করবার একটি মহান অভিনব আয়োজন। এই সেই পুণ্য ভূমি যেখানে আমার বাংলা মা'র কত ছেলেমেয়ে বিদেশী সরকারের আদেশে নির্যাতিত হয়েছে। সেদিনকার পুলিশবাহিনী তা'দের সেই কঠোর কাজের পরিবর্তে কত জননীর অভিসম্পাত যে কুড়িয়েছে সে কথা বলে লাভ নেই। তবে এ' হ'ল আর একটি পরম পবিত্র স্থান, ভারতভূমির একটি তীর্থক্ষেত্র, স্বাধীনতা সংগ্রামের সতীদেহের ভগ্নাংশের একটি অংশ এখানের মাটিতে।

শুভ্র আর ছোট্ট মনুমেন্টখানা দেখলাম—এখানা হ'ল শহীদদের স্মরণ চিহ্ন। আরো দেখলাম '৪২ সনের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার দিনে যে ব্রিটিশ গোরারা এ অঞ্চলের মানুষের উপকার করতে গিয়ে মৃত্যুর হাতে নিজেদের জীবন দান করেছিলেন তাদের কবরস্থান। সেখান থেকে সেই বীরদের দেহাবশেষ অস্থিগুলি নাকি দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় তদানিন্তন ব্রিটিশ সরকার খুঁড়িয়ে নিয়ে চলে গেছেন—কোথায় কে জানে। যাই হোক, সেদিনের নির্যাতন কর্মের সঙ্গেও তাদের হৃদয়ের একটু ছোঁয়াচ এখানের মাটিতে আজও আটকে আছে।

আবার চলেছি। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হ'য়ে আসছে। দক্ষিণের অফুরন্ত বাতাসের সাথে সম্মুখ সমর করতে করতে আমাদের বাহনখানা এগিয়ে চলেছে আঁকা-বাঁকা পিচ ঢালা পথ দিয়ে। নিজেরি তর্জন গর্জনে জনহীন প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে যেন চলে যাচ্ছে—হে শূন্যতা, আমি চলেছি। দেখ আমার সত্তা। আমি শক্তিমান, আমি মানুষের সৃষ্টি। তোমার অনন্ত আকাশকে ধারণার ছোঁয়াচ দিয়ে—মানুষ দর্শন সৃষ্টি করে বটে—কিন্তু বাইরের প্রকাশ কার বেশি। বাসখানা গর্জন করছেঃ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামাহমাদিতৈরুত। এই দেখ আমি চলেছি, পথের দু'পাশে পথিকগণ আমাকে তাকিয়ে দেখছে, পথ ছেড়ে দিচ্ছে; মায় পথের অদূরে শৃগালটি পর্যন্ত চেয়ে আছে উজ্জ্বল চোখ দু'টি নিয়ে।

পথে রামনগরে উকীলবাবু নেমে গেলেন।

তারপর আরো কতক্ষণ বাসখানা যেন দমবন্ধ করে ছুটল—জঙ্গল পেরিয়ে, গুল্ম ডিঙ্গিয়ে, মাঠ অতিক্রম করে—সমুদ্রের বাঁধের পাশে পাশে। আরো প্রায় চল্লিশ মিনিট বাদে বাসখানা অকস্মাৎ বেশি গর্জন করে নাড়াজোলের রাজার প্রমোদনিবাসের বাগানের প্রাচীরের পাশে এসে দম বন্ধ করল।...সত্যিই, এবার অন্ধকার ভেদ করে শুনতে পাচ্ছি অশ্রান্ত জলোচ্ছ্বাস, অবিশ্রাম হু-হু-হু-হুহু শব্দ—একবার উঠছে, পড়ছে। কি আনন্দ, শুনেও আনন্দ!

বাসের চালকএর কাছে পূর্বেই নিবেদন জানান ছিল, তিনি একটা নূতন বাড়িতে স্থান করে দিলেন থাকবার। সেটা হ'ল কলকাতার যতীনবাবুর বাড়ি। সবে নূতন তৈরি হ'চ্ছে, এখনও সমাপ্ত হয় নি। একটিমাত্র ঘর থাকবার মত হ'য়েছে। এ বাড়িখানা নাকি পরে হোটেল হবে।

যাই হোক, কক্ষে প্রবেশ করেই দিলাম দক্ষিণের জানালা খুলে। শুধু বাতাস, আহা, বুকখানা ভরে গেল। আর অজস্র একটিমাত্র শব্দ শুনতে পাচ্ছি—বিরামহীন "হু-হু"। তবুও কর্ণের সাধ মিটছে না, কি মাধুর্য! কি আছে এই শব্দে! শক্তিমানের কারখানার ইঞ্জিন চলার শব্দে বিরক্তি আসে না, কর্ণ বধির হয় না, মনে হয় কোটি কোটি বছর ধরে বসে থাকি আর শুনে যাই।

সে রাত্রে বাবু মুরারীমোহন খাঁড়া আমাকে অতিথি হিসেবে আপ্যায়ন করলেন।

জানালার পাশে বসে ভাবছি, ভাবছি এই বুঝি তোমার কলধ্বনি

শুনছি। কাল প্রভাতে দেখবো তোমার অনন্ত রূপরাশি। এই বুঝি জীবনের সব দেখা, আর সব শোনা। আর বাকি সবই মায়া।

যত ভাবছি কেবল মনে হ'চ্ছে—ঈশা বাস্যমিদং সর্বং……।

এখানে বসে যতই শুনছি, হে সাগর, তোমার ডাক—মন আমার উদ্বেল হ'য়ে উঠছে। কেবল ভাবছি কেমন কোরে তোমার অনন্ত বক্ষে স্থান পাওয়া যায়। যত শুনছি 'হো আয়', 'হো আয়' ধ্বনি—ততই আকুল হচ্ছি। কিন্তু কোথা যাই একা একা রাতের অন্ধকারে। কোন দিকটা মনে হ'চ্ছে বালু, কোন দিকটা মাঠের মত, কোন দিকটা গুল্ম-গাছের রাশি। যে হেতু এ স্থানটি এখনো উন্নতি লাভ করেনি।

অনেক রাত হয়েছে: এবার বিছানায় স্থান নিলাম। কিন্তু ঘুম কই! অশ্রান্ত তোমার আহ্বান—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। কেবল থেকে থেকে ঘুম ভেঙ্গে যায়। হে রাত্রি, তোমার অমা আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নাও। আসুক এবার দিবাকর,—তমসো মা জ্যোতির্গময়…। আমায় দেখতে দাও সমুদ্রের রূপ। আমায় অনুভব করতে দাও—আমি কি, আমি কোথায়!

হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম, ঘড়ি দেখলাম, রাত্রি দু'টা। তুমি কি নির্দয়; রাত্রি, তুমি কি অমানিশা; তুমি কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রিশ্চ দারুণা। মন আমার কেঁদে উঠেছে। আমি শুনছি হে সাগর, তোমার ডাক, কিন্তু রাত্রি আমায় দেখতে দেবে না। মনে এল: ভবতারিণীর মন্দিরে মা'র মূর্তির সামনে ঠাকুরের আকুল কান্না—মাগো, দেখা দে, দেখা দে!

কাল ভোরে সমুদ্র কল্লোলের পাশে দাঁড়িয়ে তোমার অপূর্বরূপ হে আদিত্য, যখন দেখতে পাবো তখন তোমায় প্রণাম করবো 'জবাকুসুম…' বলে। করযোড়ে প্রার্থনা জানাব, হে আদিত্য, পাহি মাম্ পাহি নিত্যং।

বিক্ষুব্ধ, নিদ্রাহীন রজনী। ভোরের দিকের নির্মলতায় অবশেষে নিদ্রাকে স্পর্শ করে বিভোর হ'য়ে গেছি। যখন ঘুম ভাঙল, লাফিয়ে উঠে দেখলাম সাড়ে ছ'টা। উঃ নির্দয় রাত্রি, নির্দয় চক্ষু; আর তুমিও নির্দয়। সারা রাত ডেকেছ 'হো আয়; যেতে পারিনি, তাই শেষে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছ। প্রভাতের সূর্যোদয়ে তোমার কল্যাণ রূপ দেখতে পেলাম না: কি হারালাম ইহ জীবনে! মন বললে, আজ না হয় কাল দেখবি। কাল ত দেখবো, সে ত আজের মত নয়। কাল অন্য, কল্য নতুন—সে যে প্রতি মুহূর্তে চির নূতন।

ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালাম সমুদ্র বেলায় জল কল্লোলের পাশে। সূর্যালোকে দীপ্ত অনন্ত আকাশ—বাতাস—জল—তটভূমি। চেয়ে দেখলাম অনন্ত জলরাশির দিকে। অসংখ্য ফণা তুলে ধেয়ে আসছে ঢেউগুলি, আর কূলে এসেই ফণা নাবিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। কি অপূর্ব তটভূমি—পুরীটুরী কাছেই লাগে না। সোজা একটানা ৭।৮ মাইল লম্বা ২০০ শত ফুট চওড়া যেন একটা পীচঢালা পথের ওপর ভিজে বালি ছড়ান রয়েছে—সমতল।

দেখতে দেখতে চোখ ফেরালাম ঊর্দ্ধে আকাশে। এই অনন্তের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আদিত্যদেব ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠছেন। তোমার তীব্ররূপ এই দুর্বল দৃষ্টিতে দেখতে পারিনা প্রভু। হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতম্ মুখম্। অকস্মাৎ বিহ্বল হ'য়ে গেলুম, হৃদয় গুমরে উঠল:

এত তীব্র নয়, হে আদিত্য, হে জ্যোতির্ময়!
তুমি এস এই নিয়ে আরো স্নিগ্ধ হ'য়ে
দেবদাসী হাতে সন্ধ্যার প্রদীপ সম—
তোমার কল্যাণতম মূর্তি নিয়ে।

* * *

তোমার সেই ক্ষীণ দীপশিখা রূপ
উঠুক জ্বলে আমার অন্তরে,
হিরণ্যগর্ভের স্ফুরণে॥

…একা একা কেবল ঘুরে বেড়ালুম, দিক হারা। কোথাও মানুষের চিহ্ন দেখতে পেলুম না। কেবল আমি, কেবল জল, কেবল আকাশ। অনন্ত জল, অনন্ত আকাশ। কোথায় মিলে গেছে হদিশ পাচ্ছি না। এক সময় নিজেকেই যেন ঠাহর হ'ল না। তাই তৎক্ষণাৎ নিজের দেহে মাথার হাত দিয়ে অনুভব করলাম—স্পর্শ পেলুম, কিন্তু মনে পেলুম না। এই বুঝি উপনিষদ, এই বুঝি তুমি, এই বিশ্ব! এই জল আকাশ আমি পৃথিবী—একাকার!

কত ক্ষুদ্র এই বালুকণা, এই জলকণা, এই দেহ—কোন তফাৎ নেই, সত্ত্বাহীন। আর তুমি বিশ্বময়, তুমি এতো, তুমি ধারণাতীত! আজ আমার সমীপে এই ক্ষেত্রখানিই বুঝি বিশ্বজ্ঞানের জ্ঞান ক্ষেত্র। তাই বুঝি একদা পাহাড় ছেড়ে ঋষিরা সাগরে নেমে আসতেন।

কলকাতার মনুমেন্ট-এর পাশে দাঁড়িয়ে, কি বাংলা সরকারের নূতন করণ-ভবনের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে কত ক্ষুদ্র মনে হ'য়েছে সত্য; তবু নিজেকে ভুলে যাইনি। আকাশে উড়ো জাহাজে চড়ে দশ হাজার ফিট উঁচুতে উঠেও অনন্ত আকাশের মাঝে বিচরণ করেছি; নিম্নে মেঘ, উপরে মহাশূন্য, তবু এত ক্ষুদ্র মনে হয়নি নিজেকে। সেখানেও নিজেকে হারিয়ে ফেলিনি। ভাবাবেগে তন্ময় হ'য়েছি, তবু নিজের চিত্তে, নিজের অজ্ঞাতে নিজেকে প্রশংসা করেছি। বিশ্বনাথ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর এই মনুমেন্ট, এই বিরাট সরকারী ভবন, এই ব্যোমযান মানুষ আমি'র সৃষ্টি—সত্যিই, যেন বিশ্বকে জয় করবার জন্যে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছি।

আজ এই অনন্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, আকাশ ছোঁয়া জলরাশির পাশে দাঁড়িয়ে কিছুতেই নিজেকে খুঁজে পেলাম না। যতবার নিজের সত্ত্বাকে ধরবার চেষ্টা করেছি, হারিয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। আজ এই মুহূর্তে আমি তোমার হ'য়ে গেছি!—তুমিও আমার! হে আদিত্য—

"যঃ অসৌ পুরুষঃ, সঃ অহম্ অস্মি॥"

সাম্প্রতিক তথাকথিত প্রগতি

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

'প্রগতি' শব্দটির আজকাল বাংলাভাষায় যত্রতত্র বহুল ব্যবহার হইতেছে এবং ইহার বাহুল্য উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। অথচ শব্দটির মূলজাত তাৎপর্য্যপূর্ণ-অর্থ সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিতেছে কিনা—তাহা সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। প্রগতির সাধারণ শব্দার্থ প্রকৃষ্ট গতি, কিন্তু এই গতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবাহ শুভ ফলপ্রদ হইয়া মানবজীবনের সকল দিকে বহিয়া না গেলে, তাহাকে 'প্রগতি' বলা যায় না। অধুনা এই বিশেষ শব্দটি কেবলমাত্র স্বল্পপরিসর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ইহার বৃহত্তর তাৎপর্য্যের সার্থকতা লাভে বঞ্চিত। বস্তুতঃ ইংরাজীতে 'In the genus of the term' বলিয়া যে বিস্তৃত পরিধির আভাস দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাই এই শব্দটি এখন হারাইতে বসিয়াছে। প্রত্যুত 'In the species of the term'এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির বহুল ব্যবহার সদর্পে মাথা চাড়া দিয়া ইহার ব্যাপক অর্থকে বিদ্রূপ করিতেছে। পরিণামে শব্দটি নিজস্ব বহুমুখীনতা, তথা সর্ব্বব্যাপকতা হারাইয়া শুধু এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতারূপ-গুণধর্ম্ম লাভ করিয়া ক্রমশঃ শ্লথগতি হইয়া পড়িতেছে। বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 'প্রগতি' কেবলমাত্র 'Material achievement''-এর গণ্ডীতে সীমায়িত হইয়া অন্যান্য সকল দিকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশে ক্রমশঃ ব্যর্থতা বহন করিয়া লইতেছে। মানুষের জীবনে 'Material development' বা বাস্তবক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভই একমাত্র প্রার্থিতবস্তু নহে; প্রত্যুত 'Moral aud spiritual upliftment' বা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-লাভেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দেশের জাতীয় কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি কদাপি শুদ্ধমাত্র জীবনের চাহিদা মিটাইয়া এবং বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতিতে বাস্তবজীবনের চাওয়া ও পাওয়ার সোপানসমূহ স্তরপরম্পরায় অতিক্রম করিয়া অচিরকালস্থায়ী অভীষ্ট লাভ দ্বারা সম্ভবপর হয় না; সেখানে প্রয়োজন হয় মানবজীবনের আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানোন্নয়ন এবং তাহা জাতির জীবন ও ধর্ম্মে, শক্তি ও প্রতিভায়, চারিত্রিক সচেতনতা ও রসমাধুর্য্যে এবং সর্ব্বোপরি দেশপ্রেমের ঐকান্তিকতার মাধ্যমেই মূর্ত্ত হইয়া উঠে। অন্যথা এক একটি বিশেষ দিকে উৎকর্ষ লাভ করিয়া ও জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রগতি' সর্ব্বব্যাপকতা হারাইয়া রিক্ততার গ্লানিতে ম্লান হইয়া পড়ে। বিংশ শতাব্দীতেই বাংলা এবং বাঙ্গালী জাতি ক্ষিপ্রগতিতে উন্নতি বা তথা-কথিত প্রগতির পথে ধাবিত হইয়াছে। মহামহিমান্বিত পাশ্চাত্য সভ্যতা, যান্ত্রিক শিল্পোন্নতির দুর্ব্বার গতিবেগ এবং বিজ্ঞানের তথাকথিত জয়জয়কারে—মুখরিত রথচক্রের নিষ্পেষণে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, সমাজ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য প্রভৃতি দলিতমথিত হইয়া নিয়ত অপমৃত্যুবরণ করিয়া লইতেছে; এমন কি বাঙ্গালীর বহুকীর্ত্তিত মনুষ্যত্বও আজ লুপ্ত প্রায়। ইহার মূল কারণ বাঙ্গালীর জাতিগত ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠুর অবহেলা, শাশ্বত সত্যের মূলে নির্ম্মম কুঠারাঘাত, পাশ্চাত্য ও আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মায়াময় কুহকজালে জাতির নৈতিক এবং চারিত্রিক গুণসত্ত্বার জলাঞ্জলি, প্রাচীনদিগের সকল প্রকার সংস্কৃতির প্রতি কঠোর বিমুখতা ও গভীর অনমুরাগ, অতি শিক্ষিতের দাম্ভিক মনোভাব এবং তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত প্রগতির ঐন্দ্রজালিক প্রভাব; যাহা একদিকে মানুষের জৈব ক্ষুধা ও অকর্ষিত চিত্তবৃত্তিতে অনুক্ষণ ইন্ধন জোগাইতেছে এবং অন্যদিকে অভিশাপগ্রস্ত বাঙ্গালী জাতিকে চিরসত্য ও ন্যায়ধর্ম্মের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া অপেক্ষমান অনিবার্য্য অকালমৃত্যুর কুক্ষীগত করিতেছে। ফলতঃ নাস্তিকতা, সন্দেহবাদ, মনের মালিন্য, চরিত্রের অধঃপতন, সাহিত্যে মূল্যহীন বিশ্রম্ভালাপ ও চিরন্তন সত্যাদর্শের প্রতি তথাকথিত অবিশ্বাস আজ বাঙ্গালী জাতির জীবনে প্রকট নির্লজ্জতার নগ্নমূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান। উপরন্তু ধর্ম্মের অবমাননা, ভারতীয় বেদ-বেদান্ত অনুশীলনের অভাবজনিত ভগবৎ-অস্তিত্বে অনাস্থা, জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি চরম ঔদাসীন্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বাহন স্বরূপ সংস্কৃত এবং মাতৃভাষা চর্চ্চার গভীর বীতস্পৃহা প্রভৃতি আধুনিক বাংলার জাতীয়-চরিত্রে দুরারোগ্য ক্ষতের ন্যায় প্রাণঘাতী হইয়া নিয়ত জাতির অপমৃত্যুর পথ প্রশস্ত করিতেছে। ইহাপেক্ষা জাতির এত বড় ঘনায়মান দুর্দ্দিন আর কি হইতে পারে? প্রগতির নামে অধোগতি, বুদ্ধিবৃত্তির যথেচ্ছাচার, নীতির স্বৈরাচার, ধর্ম্মের নির্লজ্জ ব্যভিচার, ক্ষুদ্র-হৃদয় ও সঙ্কীর্ণ-মনোভাবের হীনতাবোধ এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিস্মৃতি-প্রসূত অন্তরের দৈন্যানুভূতি প্রভৃতি জঘন্যতম প্রবৃত্তিসমূহ জাতির দেহমন নিরন্তর কলুষিত করিয়া দিতেছে; অধিকন্তু পদে পদে অগণিত বাধা সৃষ্টি করিয়া জাতির স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রা অতিমাত্রায় ব্যাহত ও বিঘ্নিত করিয়া তুলিতেছে। ফলে জাতির স্বকীয়তা আজ ক্রমোবলুপ্তির পথে। বর্ত্তমানকালের নব্য আলোকপ্রাপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞান পরিশোধিত মনোভাব, সহস্র বৎসরের অতীত ইতিহাসের বিকৃতি, প্রগতিবাদী সুলভ আত্মম্ভরিতা এবং যাবতীয় ঐহিক সুখভোগে মত্ততা আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত তথাকথিত প্রগতির কল্যাণে নিরন্তর অপ্রতিহতগতিতে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে নারকীয় স্রোত বহাইয়া জাতিকে দুর্নিবার্য্য ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। বিশিষ্টতার গৌরবে গরিমাদীপ্ত বাঙ্গালী জাতি আজ জীবন্মৃত। বাঙ্গালীর দেহ জীবন ও মনোজীবন আজ দুইই শক্তিহীনতায় পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে; তাই মানবতার মহত্তম গুণরাশি যেমন অরুচিকর, কুগুণরাশি তেমনি রুচিকর হইয়া উঠিয়াছে। ফলে পরামুচিকীর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, গুণগ্রাহিতার অভাব, মান্যব্যক্তির

অসম্মাননা, কৃতঘ্নতা প্রভৃতি অনিবার্য্য কুফলস্বরূপ উদ্ভূত হইয়া বাঙ্গালীর চিরউন্নতশির ধূল্যবগুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালীর জাতিগত সামগ্রিক আত্মহত্যার আয়োজন আজ সকল দিক হইতে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কেননা ধর্ম্মে-কর্ম্মে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ভাবে-চিন্তায়, কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে তাহার বহুযুগাগত বৈশিষ্ট্য হারাইয়া জাতি আত্মভ্রষ্ট ও নীতিবিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে; যাহার অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণাম জাতির বর্ত্তমান ক্লীবত্বে পরিলক্ষিত হইতেছে। অধুনা ভারতীয় নব্য প্রগতিবাদী স্ত্রী-পুরুষমাত্রেই পরানুকরণের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া তথাকথিত প্রগতির দ্বারা ভারতীয় চিরন্তনী সত্যসাধনাকে, তাহার মনুষ্যত্বকে, ভারতীয় আত্মদর্শন এবং ধর্ম্মানুশীলনের শাশ্বত জাগ্রৎ মহিমা ও তাহার ক্ষত্রিয় শৌর্য্য-বীর্য্যকে ঘোর তামসিকতার পঙ্কে টানিয়া নামাইয়া আনিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ এ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :—

"This degradation of Bengal is of course, a part of the larger process of the re-barbarisation of the whole of India in the twenty years. In actual fact, the barbarisation of Bengal has been even more complete than the barbarisation of the rest of India."

অতএব বাঙ্গালীর দুর্দ্দিন আজ শোচনীয় আকার ধারণ করিয়া প্রতিটি বাঙ্গালীর অন্তরে নিদারুণ মর্ম্মান্তিক আঘাত হানিতেছে। অজ্ঞানের এই ঘোর তমিস্রা হইতে ও অপেক্ষমান অনিবার্য্য অধঃপতনের করাল গ্রাস হইতে এই মৃতকল্প জাতিকে পুনরুদ্ধার করিতে হইলে বাঙ্গালীকে আধুনিককালের মরীচিকাবৎ তথাকথিত প্রগতিকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া আত্মজ্ঞানার্জ্জনে ও সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত কল্যাণকর প্রগতির পথ অবলম্বন করিতে হইবে; যাহা জাতির দেহজীবন ও মনোজীবনকে ক্লীবত্বের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া উন্নত এবং সমৃদ্ধ করিবে। আজিকার এই মোহান্ধকার অবস্থায় আত্মাদর, আত্মনিন্দা, পরানুকরণ, পরশ্রীকাতরতা ও পরপদাঘাতসহনপটুতার জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালীত্বের, তথা বিশিষ্টতার মর্য্যাদার স্মরণ এবং মনন করুক; জাতির অতীত গরিমা বিজড়িত ইতিহাসের মুকুরে স্বদেশের, তথা স্বীয় ব্যাধি-কবলিত সমাজদেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অধঃপতনের গভীরতা একবার উপলব্ধি করুক; বাঙ্গালী হিসাবে আজ ইহাই একান্ত কাম্য।

স্কটল্যাণ্ডের হ্রদ অঞ্চল

শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ

ছেলেবেলায় বাবার কাছে এবং পরে মহাকবি Wordsworth ও Sir Walter Scottএর কবিতাতে ইংলণ্ডের ও স্কটল্যাণ্ডের লেক অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা শুনেছিলাম ও পড়েছিলাম। তখন থেকেই ইংলণ্ডের ও স্কটল্যাণ্ডের লেক অঞ্চলগুলি দেখার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিলো এবং লণ্ডনেতে আসার পর এই ইচ্ছা কেবল সুযোগের অপেক্ষা করছিলো।

গত বৎসর বেড়াতে বেরিয়ে Swiss lakes গুলি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। তাই এ বচ্ছর মে মাসের মাঝামাঝি পরীক্ষা শেষ হ'তেই কয়েকজন বন্ধুতে মিলে লণ্ডন থেকে বেরিয়ে পড়লাম— English lakes এবং Scottish lochs গুলি দেখতে—মতলব ছিলো যে যাওয়ার পথে ইংলণ্ডের লেক অঞ্চল দেখে স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরাতে যাবো—তারপর সেখান থেকে পাড়ি দেবো Scottish Lochs পথে—এবং সেই পথে Highlandsএর বেশ কিছুটা অংশ দেখে নেবার উদ্দেশ্যও আমাদের ছিলো।

"মে" মাসের এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রাতে আমরা মটরকোচে যাত্রা শুরু করি। প্রথম দিন আমরা Oxford, মহাকবি Shakespeare এর জন্মভূমি Stratford প্রভৃতি স্থান হয়ে সন্ধ্যার সময়ে Chester এতে এসে পৌছলাম, Chester-এতে রাত্রিবাসের পর পরদিন সকালে ইংলণ্ডের রমণীয় পল্লীঅঞ্চলের মধ্য দিয়ে আমাদের আবার পথচলা শুরু হ'ল—অবশ্য মটরকোচে।

পথে আমরা Kendal, Windermere, Amblenide, Rydal water, Grasmere, Thirlmere, Derwentwater, Keswick, Bassenthwrite, Carlisle প্রভৃতি ইংলণ্ডের বহু প্রশংসিত পার্ব্বত্য ও লেক অঞ্চল দেখলাম।

Kendal থেকেই ইংলণ্ডের লেক অঞ্চলের আরম্ভ বলে—ইহার অপর নাম "The gateway to the English lakeland." এখান থেকে আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে Windermereএর লেক অবস্থিত। Windermere লেকটি ১০ মাইল লম্বা এবং দুইশত ফুটের বেশী গভীর। ইংলণ্ডের লেকগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় এবং এই লেকটির পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য্য সত্যিই অতুলনীয়। এই লেকের উপর মটরবোটে করে বেড়াবার ব্যবস্থা আছে। Wordsworth ও তাঁর ভগ্নী Dorothyর স্মৃতিবিজড়িত Grasmere লেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও সৌন্দর্য্যে কিন্তু কারুর চেয়ে কম যায় না। এই Grasmere লেকটি দেখে কবি Gray বলেছিলেন, "It is to be one of the

sweetest landscapes that art ever attempted to imitate, an unsuspected paradise of peace and rusticity." Grasmere লেকের উপরেই Wordsworthএর বাড়ী—"Dove Cottage" এই বাড়ীতেই কবি ও তাঁর ভগ্নী Dorothy বাস করতেন। এই Grasmere এতেই সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসিক Thomas de Quinceyও বাস করতেন।

Derwent water লেকটিও তার সৌন্দর্য্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ এবং এটি "Queen of the lakes" নামে খ্যাত। Keswick লেককে "The hub of the lake district" বলা হয়। এই Keswick এর সংগে কাব্য ও সাহিত্য-জগতের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। বহুদিন যাবৎ Coleridge ও Southey সুপ্রসিদ্ধ কবিদ্বয় এখানে

স্কট মনুমেণ্ট—এডিনবরা

বাস করেন। মহাকবি Shelly ও Harviet westbrookএর সংগে তাঁর বিয়ের পর কিছুকাল এখানে বাস করেন।

এই লেক অঞ্চলের নিকটেই Lake Districtএর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত Skiddow অবস্থিত। গ্রেট বৃটেনের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের নাম "Ben Nevis"—এটি স্কটল্যাণ্ডে অবস্থিত।

Carlisle সহরের প্রান্তেই ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সীমানা। সীমান্ত সহর বলে ইংলণ্ড-স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ হয়েছিলো—তার অনেক ঝড়ই এই সহরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। Carlisle ছাড়িয়ে এডিনবরার পথে কিছুদূর অগ্রসর হলেই Gretna Green—এটি ইংলণ্ডের প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে আজ এক তীর্থক্ষেত্র। ইংলণ্ডের বিবাহের আইনে পিতামাতার অমতে বিবাহ খুব শক্ত ছিলো বলে নাবালক-নাবালিকা প্রেমিক-প্রেমিকারা স্কটল্যাণ্ডের অপেক্ষাকৃত সহজ বিবাহ আইনের সাহায্য নেবার জন্য সীমানা পেরিয়ে পালিয়ে আসতো এই গ্রামে। আঠেরো শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই রকম অনেক বিবাহ পিতামাতার অমতেই Gretna Green-এর কামারশালায় সম্পাদিত হয়েছে। অবশ্য আজকাল আর এ বিবাহকে সিদ্ধ বলে স্বীকার করা হয় না এবং আইনের সাহায্যে এ বিবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই পুরাতন কামারশালার সমস্ত দেওয়ালের গায়ে এই রকম কত প্রেমিক-দম্পতিরই নাম যে লেখা আছে দেখলাম—তা গুণে শেষ করা যায় না।

এই ভাবে ইংলণ্ডের লেক অঞ্চলের একটা বৃহত্তর অংশ দেখে, Carlisle-এর কাছে সীমান্ত পেরিয়ে Gretna Green দেখে আমরা স্কটল্যাণ্ডের বৃহত্তম সহর এডিনবরাতে এসে উপস্থিত হলাম।

এডিনবরাতে আসার আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো যে এখান থেকে আমরা Scottish lochs এবং Scottish Highlands দেখতে
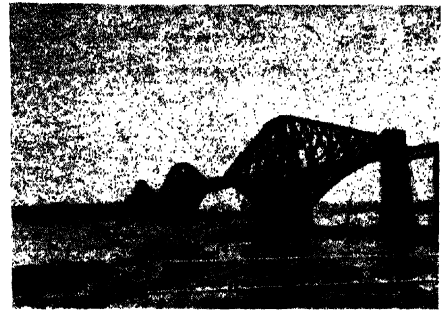
ফোর্থ ব্রিজ

যাবো। তাই একদিন ভোরে আবার আমরা কোচে বেড়িয়ে পড়লাম Oban Western Highlands এর উদ্দেশ্যে। Oban যাবার পথেই পড়ে স্কটল্যাণ্ডের বৃহত্তম লেকদ্বয়—লক লোমাণ্ড এবং লক অ্য। এডিনবারার St. Andrews Sq. থেকে বেরিয়ে আমরা Forth ব্রীজের পাশদিয়ে যে রাস্তা Linlinthgow, Folkirk, Stirling, Balloch হয়ে Loch Lomand গেছে—সেই পথ ধরে আমরাও Loch Lomand-এতে এসে পৌছলাম. পথে Stirling-এর কাছে আমরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ Stirling Castle দেখলাম—এইখানেই মেরী কুইন অব স্কটস্-এর শিশুপুত্রকে এডিনবরার দুর্গ থেকে সরিয়ে এনে "ব্যাপটাইজ" করা হয়। ইনিই উত্তরকালে Jame I of England এবং James VI of Scotland হন।

স্কটল্যাণ্ডের লেকগুলির মধ্যে Loch Lomand-ই বৃহত্তম। এর অপর নাম "The Queen of the Scottish Lakes."—এটি ৩৪ মাইল লম্বা। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সত্যিই অতুলনীয়। এটি স্কটল্যাণ্ডের একটি বৃহত্তম Holiday resort; এইখানেই আমরা

আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনপর্ব্ব সমাধা করে আবার Oban-এর পথে যাত্রা শুরু করলাম। প্রায় ১৬ মাইল ধরে আমাদের কোচটি Loch Lomand-এর ধার দিয়ে চলার পর আমরা Loch Long-এতে এলাম। এটি অবশ্য আকারে অনেক ছোট, কিন্তু এর সৌন্দর্য্যেরও একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে—তারপর আমরা এলাম Loch Fyne এতে, Loch Fyne ও লক লং-এর মত ছোট। লক ফাইনের তিন দিক প্রদক্ষিণ করে আমাদের কোচ Inverary-এর পথ ধরে Loch Awe-এর দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো। স্কটিশ লক্গুলির মধ্যে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম। এটি ২৩ মাইল লম্বা কিন্তু সৌন্দর্য্যে এটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলেই আমাদের মনে হয়। Loch Awe-তে যখন উপস্থিত হলাম তখন চারিদিক মেঘ করে বেশ জোরেই বৃষ্টি হচ্ছিলো।

চারিদিকে পাহাড় এবং বৃষ্টির মধ্যে এর যে সৌন্দর্য্য দেখেছি তা চিরদিন মনে থাকবে। এই লেকের সৌন্দর্য্যকে "Wild beauty" বল্লে বোধ হয় ঠিক বলা হয় এবং মনে হয় সার্থক হয়েছে এর নাম। কারণ ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি, আর এর নিজস্ব wild beauty সব মিলিয়ে বন্ধুবর গুপ্তভায়ার মতে "It really inspires awe." এখান থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে—উঁচু-নীচু পাহাড়ে পথ ধরে আবার আমাদের কোচ এগিয়ে চল্লো—Dalmally এবং Pass of Brander অতিক্রম করে সমুদ্রোকূলবর্ত্তী সহর Oban-এর দিকে। Oban-এর অপর নাম "The gateway to the Isles." স্কটল্যাণ্ডের আশে-পাশে পশ্চিমোপকূলে যে কয়টি দ্বীপ আছে সেগুলি যেতে হলে সকলকে এই Oban-এতে আসতে হয়।
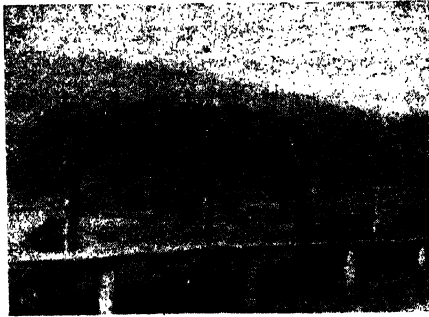
স্কটল্যাণ্ডে ট্রসাক্সের পথে লেখক

Oban এতে আমাদের চা-পর্ব্বসমাধা হবার পর আমরা ফিরতি পথে চলতে শুরু করলাম, আমরা Glen Dochart, Glen ogle, হয়ে Loch Earn ও Loch Lubnaig এতে এসে উপস্থিত হলাম। এই পথে চলতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে অজস্র ছোট বড় নানা আকারে পাহাড়ী ঝর্ণা আর দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে চরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মেষশাবক।

Loch Earn ও Loch Lubnaig highlands-এর মধ্যেই পড়ে, স্কটল্যাণ্ডের অন্যতম বিখ্যাত নদী Forth-এর উৎস হচ্ছে—এই Loch Earn, Loch Lubnaig থেকে বেরিয়ে আমরা Strathyre, Callender, Stirling, Linlithgaw (এইখানেই মেরী, কুইন অব স্কটস্-এর জন্ম হয়)—এর পথ ধরে রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে আবার এডিনবরার St. Andrews Sq.-এতে এসে পৌঁছলাম। যদিও ঘড়ির কাঁটানুসারে তখন বেজেছিলো রাত্রি সাড়ে দশটা, কিন্তু তখন যা দিনের আলো ছিলো তাতে অনায়াসেই বই পড়া যায়।

কয়েকদিন পরে আবার আমরা স্কটল্যাণ্ডের অপর একটি বৃহত্তম Loch Katrine দেখার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। এডিনবরা থেকে বেরিয়ে আমরা Thomhill, Lake Mentheith হয়ে Aberfoyle-এতে এসে পৌঁছলাম। Lake Mentheith হচ্ছে স্কটল্যাণ্ডের একমাত্র "লেক"—এটি কে "লেক" বলা হয় না।—কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের অপর সকল লেককেই "লক" বলা হয়। Duke of Mentheith-এর নামানুসারে এটির নামকরণ হয়েছে—কারণ এটি তাঁর জমিদারীর মধ্যে পড়ে। Duke of Mentheith ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ-পক্ষ অবলম্বন করেন বলে স্কচ্‌রা—এই লেকটির নাম লক থেকে লেকেতে পরিণত করে এবং এটিকে লক বলে স্বীকার করতে তারা আজও ইচ্ছুক নয়।

লক ক্যাটরিন

Aberfoyle থেকে বেরিয়ে আমরা Trsachs-এর পার্ব্বত্য পথ ধরে Loch Katrine-এর দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। এই পথে আমরা Loch Achvay, Loch Vencachar (এটি তিন মাইল লম্বা) এবং Loch Tranchie—প্রভৃতি ছোট ছোট তিনটি হ্রদ দেখি।

Trossachs শব্দটির স্কটিশ এবং এটির অর্থ হ'ল Rough-ragged Country—এবং এই নাম যে কতটা সার্থক হয়েছে তা এই পথ দিয়ে চলার সময়ে উপলব্ধি করেছি। এই রকম আঁকাবাঁকা উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ এদেশে বড় একটা দেখা যায় না। পূর্ব্বে শুনেছিলাম যে স্কটল্যাণ্ডে গাড়ী চালাতে গেলে সাধারণ লাইসেন্স ছাড়াও একটি Hill driving লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়—এটি সত্যি কিনা জানি না—কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম। আর এই রকম

বন্ধুর রাস্তা দিয়ে কোচ চালাতে চালাতে আমাদের কোচ চালক যখন পিছন ফিরে আমাদের সংগে কথাবার্ত্তা বলছিলো—তখন তার পাকা হাতের প্রশংসা না করে আর উপায় ছিলো না।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ Trossach-এর বন্ধুর উপত্যকা দিয়ে চলার পর আমরা Sir Walter Scott-এর "The lady of the Lake" কবিতাখ্যাত Loch Katrine-এতে এসে উপস্থিত হলাম।
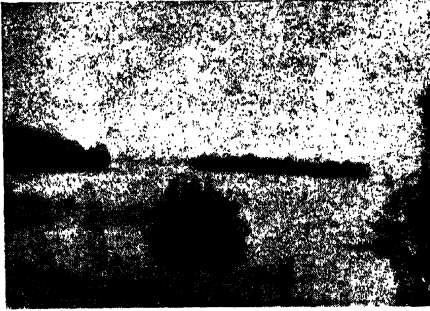
লক অ'

এই লকটি ১০ মাইল লম্বা এবং এখান থেকেই গ্লাসগো সহরের জল সরবরাহ করা হয়। এই লেকেরই একদিকে Ben Lomand পাহাড় অবস্থিত। এখানে লেকের উপর Steamer-এতে করে বেড়াবারও ব্যবস্থা আছে। এই প্রমোদ-বিহারের দক্ষিণা হচ্ছে—চার শিলিং। দিনটা খুব পরিষ্কার থাকায় এই প্রমোদ-বিহার আমাদের কাছে খুব উপভোগ্য হয়েছিলো। এই লক ক্যাটরিনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও পরিবেশের তুলনা মেলা সত্যিই ভার—তাই তার প্রশস্তিকরে বলা হয়েছে "So wonderous wild the whole might seem the scenery of a fairy dream." প্রায় সমস্ত দিন ধরে Loch Katrine-এতে বেড়াবার পর আমরা Callender, Donne, Stirling-এর পথ ধরে রাত্রে এডিনবারাতে ফিরে এলাম।

স্কটল্যাণ্ডের লেকগুলি দেখে একটা কথাই কেবল বার বার মনে হয়েছে যে ইংলণ্ডের লেক অঞ্চল যদি সুন্দর হয় তাহলে স্কটল্যাণ্ডের লেক অঞ্চল সুন্দরতর। ইংরাজ কবিরা যেমন ইংলণ্ডের লেকগুলির সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিয়ে, প্রশংসা করে অনেক কবিতা লিখেছেন, তেমনি স্কট্, বারন্স্, ষ্টিভেনস্ প্রভৃতি স্কটিশ কবি ও সাহিত্যিকগণও স্কটল্যাণ্ডের লেক-অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখেছেন। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন প্রকৃতির কবি, সৌন্দর্য্যের উপাসক—তাঁর কাছে ইংলণ্ড স্কটল্যাণ্ড বলে কোন ভেদাভেদ ছিলো না—তাই বোধ হয় তাঁর লেখনীতে এই উভয় হ্রদ অঞ্চলেরই সৌন্দর্য্যের বর্ণনা মেলে।

স্কটল্যাণ্ড বেড়াবার সময়ে রমণীয় পল্লী-অঞ্চল ছাড়া একটী জিনিষ বিশেষভাবে চোখে পড়েছিলো—সেটি হচ্ছে—স্কটল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র যত্রতত্র-ভাবে ছড়ানো আছে অসংখ্য দুর্গ-এর মধ্যে অনেকগুলিই ভগ্ন, এই দুর্গ-গুলির সংগে আমাদের দেশের প্রাচীন দুর্গগুলির অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায় কিন্তু ভরসা করে তো কোন বিদেশীকে মনেই এই গোপন কথাটি ব্যক্ত করা যায় না—তাই সংগী বন্ধুবর গুপ্তভায়াকে দুর্গগুলি দেখিয়ে ইংগিতে বলেছিলাম "লঙ্কোটা অনেক দূর।" বন্ধুবরও দেখলাম এ বিষয়ে একমত।

এইভাবে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের রমণীয় পল্লী ও হ্রদ অঞ্চলের একটা বৃহত্তর অংশ বেড়িয়ে—আবার আমরা লণ্ডনে ফিরে এলাম।

সুতীব্র বেদনায়

শ্রীদীপেন সেনগুপ্ত

দেবতা তোমায় মূর্খ মানবে দেউলে বন্দী করি',
বিগলিত ধারে অশ্রু ঝরায়ে যায়
শ্বেতচন্দনে তুলসীমালাতে অঙ্গ তোমার ভরি'
অতি অপরূপে সাজাতে বুঝিবা চায়!

তুমি কি তখন বাহিরাও পথে নর-নারায়ণরূপে
ধূলি-ধূসরিত কান্তি তোমার আরো উজ্জ্বল হয়?
অন্ধ মানবে তখনও তোমায় পূজিছে অর্ঘ্য-ধূপে—
তোমার 'তুমি' তো বাহিরে তখন—শিলাই দেউলে রয়।

জপ, তপ, আর উপচার মাঝে, তোমার আসন কই?
—পূজারীর সাথে বিশ্বমানবে খোঁজে,
তব দর্শনে উন্মুখ মোরা, উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রই।
—তাইতো পূজারী আঁখি মেলে আর বোজে।

মিথ্যে খুঁজিছি দেউলে, দেউলে সকলি ব্যর্থ হায়;
পথের ধূলির অণুকণা মাঝে বুঝি—
লুকায়ে রহিছ গোপনেতে আর সুতীব্র বেদনায়
'অন্ধ ভক্তে পায়না কেন যে খুঁজি?'

ভয়
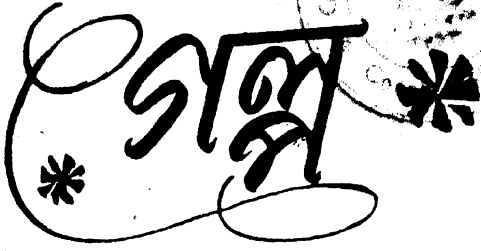
শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

'দেখনা বাবা, মা কি বলছেন', বলে আমার চোদ্দ বছরের মেয়ে মণি এসে আমার ইজিচেয়ারের পাশে দাঁড়াল। রবিবার, বেলা ১০টা হবে। একটা মাসিক পত্রিকা পড়তে পড়তে আমার তৃতীয় কাপ চায়ের প্রত্যাশায় আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলুম, এমন সময় কন্যা এসে এই অভিযোগ করলে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মা চায়ের কাপ নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন আমাকে, 'তুমি বেশী প্রশ্রয় দিওনা ওকে; তাহলে ও আর এবছর অ্যানুয়ালে পাশ করতে পারবে না।'

ব্যাপারটা হঠাৎ এমন ঘোরালো মনে হল যে চায়ের কাপটা হাতে নিয়েও চুমুক দিতে ভুলে গেলুম, একবার মেয়ের মুখের দিকে আর একবার তার মায়ের মুখের দিকে চাইতে লাগলুম।

'কি যে দেখ, বুঝি না। কিছু তোমাকে বললেই কেবল মেয়ের মুখের দিকে চাইবে। ওই আদরেই তো ওর সবেতে বাড়াবাড়ি', আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করলেন আমার স্ত্রী।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ফ্রকপরা, বেণীদোলান, ঈষদ্দীর্ঘ, চঞ্চলা কন্যাটিকে এক হাত দিয়ে কাছে টেনে তার মাকে বললুম, 'ব্যাপারটা কি, তাই বল আগে।'

'তোমাকে একবার বেরোতে হবে বাজারে, ওর একজোড়া শাড়ী কিনে দাও। ফ্রক পরে ছুটা-দৌড়া বন্ধ হোক। তাছাড়া ও যখন পড়াশোনা করবেই না, এবার ফেল হলে এই মাঘ ফাল্গুনে ওর বিয়ে দিয়ে দাও'—বললেন আমার স্ত্রী।

বিস্মিত হবার চেষ্টা করে বললুম, 'বিয়ে!'

'হাঁ গো, বিয়ে। চোদ্দ বছরে কি মেয়েদের বিয়ে হয় না?'

'হবে না কেন, তবে ও-যে বয়সের তুলনায় বড় ছেলেমানুষ।'

'বড় ছেলেমানুষ! কচি খুকী! পড়াশোনা করবে না, কিছু করবে না, শুধু দৌড়ঝাপ করে বেড়াবে। না না, পরীক্ষায় ফেল হলে নিশ্চয়ই এই ফাল্গুনে ওর বিয়ে দিয়ে দেব আমি।'

'তাহলে বিয়েটা কি শাস্তি হিসেবে দিতে চাইছ?'

'হাঁগো, শুধু শাস্তিই তো দিই আমি মেয়েকে, শুধু শাস্তি দিতেই তো দেখছ,' রাগের স্বরে বললেন মণির মা।

'না না, তা কি বলছি! ভালও তো বাসো খুব, তা কি আর দেখি না?' বলে তাঁর মুখের দিকে ভাল করে তাকাই।

হেসে ফেললেন স্ত্রী; বললেন, 'হয়েছে হয়েছে। কিন্তু ওর জন্যে শাড়ী কিনে নিয়ে এস তুমি, পরা অভ্যেস করুক।' বলে বেরিয়ে গেলেন।

এবার সত্যিই শঙ্কিত হলুম। শাড়ী কেনার জন্যে নয়, মেয়েকে শাড়ীপরা দেখতে হবে বলে ভয়। আমার কেমন একটা দুর্বলতা, মেয়েকে শাড়ী পরতে দেখলে বড় মন কেমন করে। পূজোয় বা উৎসবে যখন মণি তার মায়ের এক-আধখানা শাড়ী পরে, তখন তার দিকে ভাল করে চাইতে পারিনা আমি—যেন কত বড় হয়ে গেছে সে, যেন আদর করে আমার কাছে এসে বসে অনর্গল কথা বলার বয়স পেরিয়ে গেছে তার, কারণে অকারণে এটা সেটা যেন আমার কাছে আর চাওয়া যায় না, কলস্বনা ঝর্ণা যেন গভীর নদী হয়ে সরে চলে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে।

তার ভাই দুটিরও তাদের বোনের এই শাড়ীপরা চেহারার প্রতি বড় বিরাগ; বড় ভাই মুখ বাঁকিয়ে বলবে, 'বুড়ী হয়েছে দেখ না।' আর ছোট ভাই হাসতে হাসতে বলবে, 'দিদির বিয়ে হবে।'

বুড়ী হয়েছে বলুক ক্ষতি নেই, বিয়ে হবে শুনলেই মেয়ের রাগ কতটা হয় অনুভব করবার আগেই চঞ্চল হয়ে পড়ি আমি। এই বুঝি দূরে চলে যায়! একেই একটু লম্বা, তার উপর আবার শাড়ী পরলে আর মুখচোখের প্রসাধন করে সামনে এসে দাঁড়ালে কেমন যেন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি আমি।

মা বেরিয়ে যেতে অসহায়ভাবে চাইল আমার মুখের দিকে মণি। ম্লান একটু হেসে তার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে বললুম, 'তুমি বড় বেশী হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছ, পরীক্ষায় ফেল হবে যে! দেখছ না, মা কত রাগ করছেন?'

স্নেহে বিগলিত হয়ে মণি আবার এতটুকু হয়ে গেল, বললে, 'আমি তো খুব পড়ি বাবা। সকালে তুমি বাজার যাও, তারপর অফিস যাও, তাই তো দেখতে পাও না আমি কত পড়ি। রাত্তির বেলাও তো আমি খুব পড়ি, কিন্তু তুমি যে বেড়াতে বেরোও, কি করে দেখবে বল।'

মেয়ের কথা শুনে হাসতে লাগলুম আমি। আমার হাসিতে কিছুমাত্র বিপদগ্রস্ত বোধ না করে বলে চলল মণি, 'সেকেণ্ড টার্মিন্যাল পরীক্ষায় কিরকম নম্বর পেয়েছি জান বাবা? ইংরিজিতে আমি সেকেণ্ড হয়েছি, বাংলায় থার্ড।'

জানতুম, ইংরিজি বাংলায় ভালই করবে সে। তাই ব্যথার জায়গাটাতেই হাত দিলুম, 'অঙ্কে কত পেয়েছ?'

'অঙ্কের পেপারটা বড় কঠিন হয়েছিল বাবা। রুচিদি করেছিলেন কিনা। রুচিদি ভারী শক্ত কোশ্চেন করেন, সে তো তুমি জান বাবা। তাছাড়া আর সবেতেই পাশ করেছি,' বললে মেয়ে।

'মা জানতে চাননি, ফল কেমন হয়েছে?'

মণি ফিসফিস করে বললে, 'মাকে বলেছি, এখনও প্রোগ্রেস রিপোর্ট পাইনি।'

'মায়ের কাছে মিছে কথা বললে?'

'সত্যি কথাই তো বলেছি। এখনও আমরা সত্যিই প্রোগ্রেস রিপোর্ট পাইনি বাবা, শুধু নম্বরগুলো জানতে পেরেছি।' হঠাৎ প্রসঙ্গান্তর এনে বললে, তুমি একটু দোকানে যাবে বাবা? আজ তো রবিবার, চল না যাই।'

'কিছু কিনতে হবে নাকি?'

'হাঁ, খোকনের একটা মাফলার বুনব, খানিকটা উল চাই।'

'ও সব বোনাটোনা এখন থাক, পড়াশোনা কর তুমি। অ্যানুয়্যালে ফেল করবে যে!'

দমে গেল মেয়ে; স্তিমিত স্বরে বললে, 'কিন্তু ওই যে মা বলছিলেন—।'

'না, আজ আর যাওয়া হবে না,' বলি আমি।

'থাক বাবা, আমার ফ্রক তো অনেকগুলো আছে, শাড়ী কিনে আর কাজ নেই,' বলে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার উপক্রম করলে মণি।

'ভাল করে পড়গে তুমি,' একটু গম্ভীরভাবে বলে পত্রিকার পৃষ্ঠে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি আমি। মণি চলে গেল।

এবার একটু আগেই বেশ শীত পড়ে গেছল। সেদিন সন্ধ্যের পর আরাম করে বসে আমার সাত বছরের পুত্র খোকনের আবদারে একটা বাঘ সিংহের গল্প ফাঁদবার উপক্রম করছি, এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বললেন, 'বেড়াতে যদি নাই-ই বেরোও, মেয়ের একবার পড়াটা দেখ না, ৬ই ডিসেম্বর পরীক্ষা যে।"

যেখানে বাঘসিংহ লাফিয়ে পড়বার সুযোগ খুঁজছিল, সেখানে আচমকা পরীক্ষা লাফিয়ে পড়াতে হঠাৎ বড় বিপদগ্রস্ত বোধ করলুম, বললুম, 'আজ তো ২রা ডিসেম্বর, আর তিন দিন পরে পরীক্ষা! কই, মণি আমাকে একদিনও বলেনি তো।'

স্ত্রী বললেন, 'তোমার খোঁজ থাকলে বোলতো।'

'তা বটে। কিন্তু বিলুর পরীক্ষা কবে?'

'বিলুর পরীক্ষা ৯ই থেকে। একটু পড়াশোনাটা কদিন সন্ধ্যের সময় দেখনা ওদের' দায়িত্ববোধ জাগাবার চেষ্টা করলেন স্ত্রী।

'হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, দেখছি, বলে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে দাঁড়াই আমি।

কদিন একটা কাজে একটু বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম বলে ছেলেমেয়ের আসন্ন এগজামিনের খবরটা নিতে ভুলে গেছলুম। এখন মনে পড়তে লাগল, ঠিক বটে, কদিন বিলু আর মণিকে কাছে কাছে ঘুরতে বেশী দেখতে পাইনি। যত কাজই থাক না তাদের—দিনে রাত্তিরে কয়েকবার আমার কাছে এসে কলরব না করলে তাদের

চলবে না। সত্যিই তো, কেমন পড়াশোনা করছে ছেলেমেয়ে, একটু দেখতে হয়।

খোকনকে চুপ করে খাটের উপর শুয়ে থাকতে বলে আস্তে আস্তে নীচে ওদের পড়ার ঘরে নেমে এলুম আমি। এত মনোযোগের সঙ্গে বিলু আর মণি পড়ছে যে প্রথমে তারা টেরই পেল না যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি। একটু পরে চমকে চাইল মণি, বললে—'বাবা! আমাদের পরীক্ষার আর তিন দিন মাত্র বাকী।'

'শুনেছি, পড়।' বলে একটা চেয়ার টেনে চুপ করে বসলুম আমি। একটু পরে বিলুকে জিজ্ঞেস করলুম, 'হাঁ বিলু, জ্যামিতির যে কয়েকটা কি হয়নি বলেছিলে, সেগুলো কি মাস্টার মশায়ের কাছে দেখিয়ে নিয়েছ?'

'হাঁ বাবা,' বলেই পড়ায় মনোনিবেশ করলে বিলু।

'তোমাদের তো ১০ই ডিসেম্বর আরম্ভ? মাইনেপত্র সব জমা দিয়েছ তো?' পুনরায় জিজ্ঞাসা করি আমি।

'হাঁ বাবা,' কোনোরকমে উত্তরটা শেষ করল বিলু।'

'মণি, তোমাদের সব ফি-টি দেওয়া হয়েছে তো?' বলি আমি।

'হাঁ বাবা, শুধু মালীকে আর ঝিকে কিছু বকসিস দেওয়া বাকী। সেটা পরে দিলেই হবে,' আমার মুখের দিকে একবার চেয়েই বইয়ে চোখ রাখল মণি।

'অঙ্কটা ভাল করে মাষ্টার মশায়ের কাছে বুঝে নিও মণি; এবার আর না খারাপ হয়।'

'খারাপ হবে না বাবা,' বইয়ে চোখ রেখেই উত্তর দিলে মেয়ে।

বিস্মিত হলুম ছেলেমেয়ের পড়ায় মনোযোগ দেখে। ছেলের মনোযোগ দেখায় আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু আমার চঞ্চলা কন্যা যে এত মনোযোগী হয়ে পড়াশোনা করবে—যে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতেও অস্বস্তি বোধ করবে, দেখে অবাক হতে হল। চুপ করে বসে রইলুম চেয়ারটিতে অনেকক্ষণ। একটানা তারা পড়ে যাচ্ছে। এত কলভাষী, চপল যারা, তারা যে এমন ধীর স্থির হয়ে পড়াশোনা করবে, আমার সঙ্গে দু একটা কথাও কইবে না, এটা দেখেও আবার কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। মণির মা ওদের একটু পড়া ধরার কথা বললেন, কিন্তু তা আর এখন কি করে হয়! এখন যে অভিনিবেশ নিয়ে পড়ছে ওরা, তাতে তো জিজ্ঞেস করতে গেলে ক্ষতি করাই হবে।

চুলগুলো কেমন রুখু রুখু দেখাচ্ছে মণির—স্নান করেনি নাকি আজ? মুখের উপর দু একটা গুচ্ছ উড়ে এসে পড়ছে, কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। আঙুল-গুলো যেন একটু বেশী রোগা দেখাচ্ছে।

আরও খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। এক আধবার বিলু আমার মুখের দিকে চাইলে, হয় তো আমি লক্ষ্য করছি কিনা সেইটা দেখবার জন্যে, কিন্তু মেয়ের একবারও ঘাড় তোলার সময় হল না। আস্তে আস্তে উঠতে গিয়েও চেয়ারটার একটু শব্দ হল। চেয়ার নড়ার শব্দ পেয়ে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে জিজ্ঞেস করল মণি, 'যাচ্ছ বাবা?'

'হাঁ, ভাল করে পড় তোমরা' বলে বেরিয়ে এসে মণির মা যেখানে কাজে ব্যস্ত, সেখানে এসে দাঁড়ালুম।

'কোথায় ছিলে? খোকনের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল নাকি?' বললেন তিনি আমার চটির শব্দ পেয়ে।

'না গো না, ওদের পড়া দেখতে গেছলুম।'

'পড়া ধরলে একটু? বুঝিয়ে টুঝিয়ে দিলে কিছু? পাস করবে তো মেয়েটা?' ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'পাস করবে গো করবে। যা ভয় দেখিয়েছ তুমি তাকে! পরে না হিতে বিপরীত হয়,' বললুম আমি।

'তার মানে? তার মানে, বিয়ে করতে চাইবে না এই তো?'

'ধর, তাই যদি হয়।'

'ভালই তো। এম-এ, এম-এসসি, কি আরও বড় হোক না, নেই বা বিয়ে করলে।'

'হাঁ, এম-এ, এম-এসসি অবশ্য মন্দ নয়, তবে তার উপরেও হবে কিনা, সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। মায়ের স্কুল-ফাইন্যালটাও হয়নি কিনা,' স্ত্রীকে একটু রাগাবার জন্যই বলি আমি।

'হাঁ গো দেখতে, আমাদের বাড়ীর পাশের ইস্কুল যদি না উঠে যেত। তা ছাড়া শীগগির বিয়ে দেওয়ার ঝোঁক মায়ের, পাস করব কোথা থেকে!'

'তা মায়ের ঝোঁক তো ভালভাবেই মেয়েকে পেয়ে

বসেছে দেখছি। শাড়ী কেনাতে চাইছ, ফেল হলে বিয়ে দেবে বলছ।'

'আহা, সত্যিই কি তাই বলছি নাকি আমি! তবে ভয়ে যদি মেয়ের একটু পড়ার দিকে টান হয়।'

'বিয়ের প্রতি ভয়টা সত্যিই কি ভাল?' বলে একটা বেতের মোড়া টেনে বসবার উপক্রম করি আমি।

'বসবে নাকি? শেষে আবার বলবে না তো যে দামী শালটায় ধোয়াগন্ধ হয়ে গেছে, হাসলেন স্ত্রী, 'একটু চা খাবে নাকি? রাত্তির তো ৮৷৷০ বাজে, আর নেই বা খেতে।'

মোড়ায় বসে ইতস্তত করে বলি, 'দাও একটু, কিন্তু মেয়েটাকে দুধ, ফলটল দিচ্ছ তো? না বিনুই সব কেড়ে কুড়ে খাচ্ছে? কেমন যেন রোগা রোগা দেখলুম। কিছু হয়নি তো?'

'হবে কেন! তবে কদিন একটু পড়ছে দেখছি, হয়তো একটু শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে, বললেন স্ত্রী।

ছেলেমেয়ে পড়ছে; উপরে হয়তো খোকনটাও এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ল—সমস্ত বাড়ীটা বড় চুপচাপ মনে হতে লাগল আমার। চা খেতে খেতে দুচারটে কথা সেরে উপরে এসে একটু লেখার কাজে বসলুম।

শেষ রাত্রিতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে যেতে দেখি, মণিদের ঘরে আলো জ্বলছে। বোধ হয়, আলোটা কখন জ্বালিয়ে ছিল, নেবাতে ভুলে গেছে। সামনে পরীক্ষা বলে বিলু পড়ছে নাকি ভোর রাত্রিতে উঠে?

উঠে দেখি, রাত্রি সাড়ে চারটে। মণির বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালুম; মশারিটা তুলে দেখি, ইতিহাসের বইখানা মণির বুকের উপর উল্টে রয়েছে, আলগোছে একটা হাতে ধরা। পড়তে পড়তে এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হল।

ধীরপদে গিয়ে তার মাকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে ডেকে এনে দেখালুম। বললুম, মুখ চোখ কত শুকিয়ে গেছে দেখেছ? দু-চোখের তলায় কত কালি পড়েছে যেন!'

'তা হবে বৈকি। কদিন একটু পড়াশোনা করছে তো,' সহজ স্বরে বললেন স্ত্রী।

'তুমি বড় বেশী বকো ওকে, ভয়ে যেন শুকিয়ে গেছে,' বললুম আমি।

আমাদের কথার শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে চমকে চাইলে মণি, 'বাবা!'

'হাঁ, ঘুমোও তুমি। রাত্রি জেগে আর পড়তে হবে না। আলো নিভিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, বলে আলো নিভিয়ে দিয়ে মণির মা ও আমি বেরিয়ে এলুম।

আমাদের ঘরে এসে স্ত্রী বললেন, 'আর তো দু তিনটে দিন, পড়তই বা একটু রাত জেগে। ফেল হয় যদি?'

পরিহাসের জন্য বললুম, 'মণির মুখখানা কার মত দেখতে বলতো। ওর মাসীরা কি বলে, তোমার মতো, না আমার মতো?'

'দেমাকে পা পড়ে না তোমার! শুধু মুখই সুন্দর হলে চলবে না, মাথাটাও সুন্দর হওয়া চাই,' শাণিত উত্তর এল স্ত্রীর কাছ থেকে।

দুচারটে চুল পেকেছে বলে কি মাথাটা এখন তোমার কাছে অসুন্দর হয়ে গেল আমার?'

'অপরাধ হয়েছে আমার। তুমি সুন্দর, তোমার মেয়ে সুন্দর, তোমার ছেলেরা সুন্দর, তোমার সব সুন্দর,—হল তো?' কৃত্রিম কোপাবিষ্ট নয়নে চেয়ে রইলেন স্ত্রী।

'পরিশেষে,—একটা কথা বলতে বাকী রাখলে যে?—তোমার ছেলেমেয়ের মা সুন্দর।' হাসতে লাগলুম আমি। স্ত্রীও হাসিতে যোগ দিলেন।

ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ভারতীয় দর্শন ভারতবাসী আর্য্যজাতির দর্শন। আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। তাঁহারা যে ভারতবর্ষের বহিঃস্থ কোনও দেশ হইতে আসিয়া ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ কোনও কিংবদন্তী না থাকিলেও, তাঁহারা যে বর্ত্তমান পারসিক ও ইয়োরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত এক সময় একত্র বাস করিতেন এবং একই ভাষায় কথা বলিতেন, ভাষাতাত্ত্বিকদিগের গবেষণার ফলে তাহা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাদের আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তাহারা কখন ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও মতের ঐক্য নাই। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে আনুমানিক ২০০০ খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দে তাহারা ভারতে আসিয়া তথায় বসতি স্থাপন করেন। বালগঙ্গাধর তিলকের মতে তাহারা ইহার বহু পূর্ব্বেই ভারতে আসিয়াছিলেন।

দ্রাবিড় সভ্যতা

আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের পূর্ব্বে যে সকল জাতি ভারতে বাস করিত, তাহাদিগের মধ্যে দ্রাবিড়গণ সভ্যতায় উন্নত ছিল। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় ভূগর্ভে যে দুইটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দ্রাবিড় সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। অনেকগুলি "সীল" পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে লিখন আছে। এই লিপি প্রাচীনতম আর্য্যলিপি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের। এখন পর্য্যন্ত তাহার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয় নাই। লিখিতে জানিলেও দ্রাবিড়গণ যে কোনও সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জগৎ-সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কি ছিল, ধর্ম্মমতই বা তাহাদের কি ছিল, তাহাও জানা যায় নাই। ভারতে উদ্ভূত যে সকল দর্শনের সহিত আমরা পরিচিত, তাহারা সকলই আর্য্যদিগের চিন্তার ফল।

দর্শনের আলোচ্য বিষয়

দর্শন শব্দ "দৃশ" ধাতু হইতে উৎপন্ন। দর্শন শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার। যে শাস্ত্র পাঠ করিয়া সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহাই দর্শনশাস্ত্র। ইহার ইংরেজি প্রতি শব্দ Philosophy, যাহার অর্থ জ্ঞানে অনুরক্তি। এই জগতের স্বরূপ কি, ইহার উৎপত্তি কিরূপে হইল, ইহার কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা আছে কিনা, মানুষের স্বরূপ কি, মানুষকে কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে, ন্যায় অন্যায় বলিয়া কিছু আছে কিনা, থাকিলে কাহাকে ন্যায় বলিব, কাহাকে অন্যায় বলিব, মানুষ কি পঞ্চভূতে নির্ম্মিত দেহমাত্র, অথবা সেই দেহের মধ্যে চৈতন্যস্বরূপ কোনও বস্তু আছে, যদি থাকে তাহা হইলে তাহা কি দেহের সঙ্গে বিনষ্ট হয়—অথবা দেহের মৃত্যুর পরেও তাহার অস্তিত্ব থাকে—প্রভৃতি বিষয় দর্শনশাস্ত্রে আলোচিত হয়। এই সকল এবং এতদনুরূপ এবং ইহাদের সহিত সম্বন্ধ অন্যান্য বহুপ্রশ্নের যে সকল বিভিন্ন উত্তর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দিয়াছিলেন, ভারতীয় দর্শনে তাহা পাওয়া যায়।

ভারতীয় দর্শন অতি প্রাচীন

ভারতীয় দর্শন শত শত বৎসরের চিন্তার ফল। তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল বেদে। বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদের সূক্তগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত। তাহাদের রচনাকাল নিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। গ্রীসের দর্শনের উদ্ভব খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দিতে থালিশ হইতে। থালিশ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল গ্রীক দার্শনিকেরই জন্মস্থান ও আবির্ভাব কাল লিখিত বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে। কিন্তু বৈদিক ঋষিও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদিগের নাম ভিন্ন তাহাদের জীবনের অন্য কিছু নিশ্চিত রূপে জানা যায় নাই। কেন না তাহার কোনও লিখিত বিবরণ নাই।

বেদ

ভারতীয় আর্য্যদিগের প্রধান এবং প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ। বেদ আর্য্যজাতির যাবতীয় শাখার মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্য। এই বেদ আর্য্য-জাতির ভারতে আগমনের পরে রচিত, অথবা তাহার কোনও অংশ তাহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, এবং আর্য্যগণ তাহা লইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তখন আর্য্যদিগের মধ্যে যে লিপিবিদ্যা ছিল না, তাহা নিশ্চিত? যদি বেদের কোনও অংশ ভারতের বাহিরে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আর্য্যদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও কণ্ঠস্থ ছিল। 'বেদ' লিখিত হয়, তাহার বহু পরে।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব

বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। অতি প্রাচীন কাল হইতে সঞ্চিত ভারতীয় "আর্য্যদিগের" জ্ঞান বেদে নিবদ্ধ আছে। বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। অপৌরুষেয় অর্থ কোনও পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত নহে। পুরুষ অর্থে কেবল মানুষ নহে, ঈশ্বরও পুরুষ। বেদ ঈশ্বর-রচিতও নহে, মানুষের রচিতও নহে। তাহা নিত্য। বেদের মন্ত্র সকল বৈদিক ঋষিদিগের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল। ঋষিগণ তাহাদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাই অনেকের বিশ্বাস। আবার কাহারও কাহারও মতে বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। কিন্তু বেদে নানা দেবতার স্তুতি আছে। ঈশ্বর দেবতাদিগের স্তব রচনা করিয়াছিলেন, একথা অশ্রদ্ধেয়। তাই কেহ কেহ বেদকে নিত্য বলিয়াছেন। তাহা ঈশ্বর রচিত নহে, মানুষের রচিতও নহে, চির বর্ত্তমান।

বেদের এক বৃহৎ অংশ নষ্ট হইয়াছে

বেদ একদিনে রচিত বা প্রকাশিত হয় নাই। বেদ যখন রচিত হয়, তখন লিপির আবিষ্কার হয় নাই। বেদের মন্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা হইত! বেদের এক নাম শ্রুতি! যাহা গুরুর নিকট শ্রুত হয়, তাহাই শ্রুতি। যত মন্ত্র যত স্তব রচিত হইয়াছিল, তাহাদের সকলগুলিই যে স্মৃতিতে রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। অনেকগুলি যে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই! যে সময়ে বেদ লিপিবদ্ধ হয়, তখন যে ঋক্ বা মন্ত্রগুলি স্মরণে ছিল, তাহারাই রক্ষিত হইয়াছে।

বেদ বিভাগ

বেদ মন্ত্রগুলি আদিতে সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না! ক্রমে তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই জন্য বেদকে ত্রয়ী বলিত। পদ্য রচনাগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া ঋগ্বেদ আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। গানের উপযুক্ত রচনাগুলি একত্রিত হইয়া সামবেদ নামে প্রচারিত হয়। তৃতীয় ভাগ যজুর্ব্বেদে পদ্য ও গদ্য উভয়ই আছে। বৈদিক যাগযজ্ঞের পদ্ধতি এই ভাগে বর্ণিত আছে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন এবং বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া তিনি বেদব্যাস আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা কথিত আছে। বেদের আর একটি ভাগ পরবর্ত্তীকালে সংকলিত হয়। এই ভাগের নাম অথর্ব্ববেদ। অঙ্গিরা বংশীয় অথর্ব্বণ নামক ঋষি এই বেদের সংকলন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মোহন, উচাটন প্রভৃতির উপযোগী মন্ত্রগুলি অথর্ব্ববেদে অন্যান্য মন্ত্রের সঙ্গে সংকলিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। সামবেদের প্রায় সমস্ত মন্ত্রগুলিই (৭৫টি ব্যতীত) ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। যজুর্ব্বেদেও ঋগ্বেদের সকল ঋক্ সংগৃহীত হইয়াছে। তদতিরিক্ত অনেক গদ্য রচনাও তাহাতে আছে। যজ্ঞে মন্ত্রগুলি যে ক্রমে ব্যবহৃত হইত, ক্রমানুসারেই তাহারা যজুর্ব্বেদে সজ্জিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ এই নামও এই অর্থবোধক। (যজুঃ=যজ্ঞ)। ঋগ্বেদে এক এক ঋষিরচিত এক এক দেবতা-সম্বন্ধীয় ঋক্‌মন্ত্রগুলি একত্র সজ্জিত আছে। অথর্ব্ব বেদের স্থান অন্যান্য বেদের নিম্নে।

প্রত্যেক বেদের চারিভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। সংহিতায় প্রত্যেক বেদের মন্ত্রগুলি সংগৃহীত আছে। ব্রাহ্মণ ভাগে বিবিধ যজ্ঞের পদ্ধতির বর্ণনা আছে। আরণ্যক বানপ্রস্থাবলম্বী বৃদ্ধ দিগের জন্য উদ্দিষ্ট। বেদের যে অংশ বানপ্রস্থাশ্রমে পঠিত হইত, তাহাই আরণ্যক। তাহাতে যাগযজ্ঞের রূপক ব্যাখ্যা ও ধ্যানের ব্যবস্থা আছে। উপনিষদ্ বেদের শেষ ভাগ। তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

বৈদিক দেবতা

ঋগ্বেদ সংহিতায় সহস্রাধিক কবিতা আছে। এই কবিতাগুলিকে সূক্ত বলে। এক এক সূক্তে নানা ঋক্ আছে। এক ঋষি কর্ত্তৃক এক এক দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত ঋক্ গুলি একত্রিত হইয়া সূক্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে এই সকল ঋকে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিতে দেবত্বের আরোপ করিয়া তাহাদের স্তব করা হইয়াছে। কিন্তু নিরুক্তকার যাস্কের মতে "পরমাত্মার মহত্ব—বশতঃ একই আত্মাকে বহুরূপে স্তব করা হইয়াছে। বিভিন্ন দেবতা একই আত্মার বিভিন্ন অঙ্গ।" ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ঘোষিত হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে এই সকল সূক্ত অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে রচিত। প্রথমে আর্য্যগণ বহু দেবতার উপাসনা করিতেন। বেদের সূক্তগুলি যে বিভিন্ন সময়ে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক ঋষি দিগের অনেকের মধ্যে শত শত বৎসরের ব্যবধান ছিল। যাস্কের সময় বৈদিক দেবতাগণ পরমাত্মার বিভিন্ন নাম বলিয়া গৃহীত হইলেও, অনেক সূক্ত যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। অনেক সূক্ত আছে যাহাদিগকে স্তব বলা যায় না। তাহারা গীতি কবিতা মাত্র। অনেকগুলি স্তুতি বলিয়া গণ্য হইলেও তাহারা প্রকৃতির শক্তির সম্মুখে কবির ভাবোচ্ছাস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত পুরূরবা ও উর্ব্বশীর মধ্যে কথোপকথন। ইহা রূপক বর্ণনা, কিন্তু স্তব নহে। উক্ত মণ্ডলের ৪৪ সূক্তকে যদি স্তব বলিতে হয়, তাহা হইলে উহা দ্যূতক্রীড়ার পাশার স্তব। উক্ত মণ্ডলের ১০৭ ও ১১৭ সূক্তে স্বাধীনতা ও দানের গৌরব খ্যাপিত হইয়াছে। সপ্তম মণ্ডলের ১০৭ সূক্তে যাজক-দিগের প্রতি শ্লেষবাণ বর্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে ভেক বলা হইয়াছে। দশম মণ্ডলের ১৩ সূক্ত দুইখানি গোরুর গাড়ীর প্রতি উক্তি। অনেকগুলি সূক্তে দার্শনিক গবেষণা আছে। দেবতার স্তুতি নহে, এরূপ বহু সূক্ত আছে। * অনেক সূক্তে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ আছে। অনেকগুলিতে কে জগৎ সৃষ্টি করিল, সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল, প্রভৃতির অনুসন্ধান আছে। বৈদিক সূক্তগুলিকে মোটামুটি ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) দেবস্তুতিমূলক, (২) সত্যানুসন্ধানী, (৩) দার্শনিক গবেষণামূলক, (৪) ঐতিহাসিক ঘটনামূলক, (৫) একেশ্বরবাদমূলক, ও (৬) বিবিধ সাংসারিক বিষয়ক।

দেবতাদিগের শ্রেণী বিভাগ

বৈদিক দেবতাদিগকে মুখ্যত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) আকাশের দেবতা, (২) অন্তরিক্ষের দেবতা, (৩) পৃথিবীর দেবতা। আকাশের দেবতা—দ্যৌঃ, মিত্র (আলোকিত আকাশ ও দিনের দেবতা); বরুণ (আলোকবিহীন আকাশ ও সন্ধ্যাকালের দেবতা); সূর্য্য, সবিতা (জীবনশক্তিবর্দ্ধক প্রাতঃ সূর্য্যের দেবতা); অশ্বিনীদ্বয় (প্রাতঃ ও সন্ধ্যার দেবতা); এবং উষা (প্রত্যূষকালের দেবতা) অন্তরিক্ষের দেবতা—ইন্দ্র (বায়ু মণ্ডল ও মেঘ বৃষ্টির দেবতা), মরুৎগণ (ঝটিকার দেবতা) বায়ু ও বাত (বাতাসের দেবতা), পর্জ্জন্য (বৃষ্টি ও মেঘের দেবতা), রুদ্র (ঝটিকা ও বজ্রের দেবতা) প্রভৃতি। পৃথিবীর দেবতা অগ্নি, পৃথিবী, সরস্বতী প্রভৃতি নদী।

---

* Vide Vedic Literature by Bankim Chandra Chatterji Centenary Edition of his works. P. 141.

বৈদিক দেবতার সংখ্যা কোথাও তিন এগারো তেত্রিশ, কোথাও তিনসাত একুশ, * বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে দেবতাদিগকে, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও আট বসুতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের অতিরিক্ত দ্যাবা ও পৃথিবী এবং প্রজাপতিকে লইয়া দেবতা-সংখ্যা শতপথ ব্রাহ্মণের মতে হয় ৩৪টি॥ এই শ্রেণী-বিভাগ ঋগ্বেদের বিভাগের সঙ্গে মিলে না। দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, সবিতা ও অগ্নির প্রাধান্য খুব বেশী। দেবতাদিগের এই বিভাগ—সম্বন্ধে যাস্ক বলেন "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নি পৃথিবী স্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্রোবা অন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহা ভাগ্যাদ্ একৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম্মপৃথকত্বাৎ, যথা হোতা অধ্যয্যু ব্রহ্মা উদ্‌গাতা ইত্যপ্যেকস্যসতঃ।" অর্থাৎ নৈরুক্ত দিগের মতে বেদের দেবতা তিনজন। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে বায়ু বা ইন্দ্র—এবং আকাশে সূর্য্য। তাহাদের মহাভাগত্বের জন্য এক এক জনের অনেকগুলি নাম। অথবা তাহাদের কর্ম্মের পার্থক্য জন্য যথা হোতা, অধ্যর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, একজনেরই নাম। অন্যত্র যাস্ক যাবতীয় দেবতাই এক পরমাত্মার নাম বলিয়াছেন ইহা আমরা দেখিতে পাইব। †

বৈদিক ঋষি ও দেবতা

বেদ অপৌরুষেয়, ইহার অর্থ বেদ কাহারও রচিত নহে। বেদের শব্দরাশি তাহাদের অর্থ সহ নিত্য অর্থাৎ তাহারা চিরকালই আছে। বেদের ঋষিগণের নিকট বৈদিক মন্ত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারা মানস চক্ষুতে মন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা ঋষি অর্থাৎ মন্ত্র-দ্রষ্টা॥ যাস্ক বলিয়াছেন "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ।" আর "যা তেন উচ্যতে, সা দেবতা।" অর্থাৎ এক একটি বৈদিক মন্ত্র যাঁহার বাক্য, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি এবং সেই বাক্যে যাহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি বা তাহা সেই মন্ত্রের দেবতা। প্রচলিত অর্থে যাহাকে দেবতা বলা হয়, অনেক সূক্ত এমন আছে, যাহাতে সেরূপ কোনও পুরুষের কথা নাই। যাস্ক আরও বলিয়াছেন "যো দেবঃ সস দেবতা"—অর্থাৎ যাহা দীপ্তিমান্ (দিক্‌ধাতু—দীপনে বা দ্যোতনে) তাহাই দেবতা। আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দ্যুতিমান, তাই তাহারা দেব, এবং দেবতা। পরে যাহারা দ্যুতিমান নহে, তাহাদের সম্বন্ধও সূক্ত রচিত হওয়ায়, তাহারাও দেবতা পদ-বাচ্য হইয়াছিলেন।

দার্শনিক চিন্তা হইতে দেবতাদিগের উদ্ভব

বেদের দেবতাগণের আবির্ভাব হইয়াছিল ঋষিদিগের মনে দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাবের সঙ্গে। পণ্ডিতেরা দর্শন ও ধর্ম্মের (Religion) মধ্যে একটা ভেদের কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু জগৎ-ব্যাপারের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাই দর্শন এবং কোনও জাতির জগৎ-ব্যাপারের ব্যাখ্যার প্রথম প্রচেষ্টাই তাহার প্রাচীনতম ধর্ম্ম। বেদের বহু দেবতা আর্য্যজাতির জগৎ-ব্যাপার ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা হইতেই উদ্ভূত। প্রাকৃতিক ব্যাপার সকল আকস্মিক ব্যাপার নহে, তাহারা চৈতন্য-বিশিষ্ট এক বা একাধিক পুরুষের—ইচ্ছাশক্তিমান পুরুষের—ক্রিয়া এই চিন্তা হইতেই তাহাদের উদ্ভব হইয়াছিল। এই চিন্তা দার্শনিক চিন্তা। আকাশে মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় দেখিয়া ও মেঘ-গর্জ্জন শুনিয়া তাঁহারা দৃশ্যমান মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে এক অদৃশ্য পুরুষের হস্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সেই পুরুষকে ইন্দ্র নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। অগ্নির মধ্যে সর্ব্ব-অপবিত্রতানাশক জ্যোতির্ম্ময় এক পুরুষকে দেখিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক যাবতীয় ব্যাপারের পশ্চাৎভাগে তাহাদের কারণস্বরূপ তাহারা এক একজন কর্ত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন। এই সকল কর্ত্তাই বেদের দেবতা। কার্য্য হইতে কারণের আবিষ্কারই দার্শনিক চিন্তা।

প্রথমে বহু দেবতার অস্তিত্ব কল্পিত হইলেও এই মীমাংসায় ঋষিদিগের মন বহুদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন কার্য্যের কর্ত্তা, বিভিন্ন নামে স্তুত, কয়েকটি দেবতা যে বস্তুতঃ এক, তাহা বুঝিতে তাঁহারা পারিয়াছিলেন। সবিতা, সূর্য্য ও মিত্র এইরূপে এক দেবতায় পরিণত হইয়াছিলেন। পরিশেষে যাবতীয় দেবতাই যে একই দেবতার বিভিন্ন নাম, এই চিন্তা তাহাদের মনে উদিত হইয়াছিল। যে সকল দেবতার তাহারা স্তব করিতেন, তাহাদের একজন হয় তো অন্যান্য দেবতাদিগের প্রভু, তিনিই হয়তো জগতের স্রষ্টা ও সর্ব্বশক্তিমান, এই চিন্তায় তাহাদের মন অভিভূত হইয়াছিল। তাই ইন্দ্রের অলৌকিক কর্ম্ম সকলের উল্লেখ করিয়া তাহাকে শতক্রতু (সর্ব্বশক্তিমান) ও অভিভূ (বিজেতা), বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদেব ও মহান্ বলা হইয়াছিল। (ঋ, বেদ ৮ম-৮৯), বিশ্বকর্ম্মা শব্দের অর্থ বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা—এই বিশেষণ আর এক জন দেবতার প্রতিও প্রযুক্ত হইয়াছে—তাঁহার নাম ত্বষ্টা। তাহাকে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের, এমন কি অগ্নি, ইন্দ্র এবং ব্রহ্মণস্পতিরও সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। তাহাকে সবিতা ও বলা হইয়াছে। বরুণ ও অগ্নির স্তব করিবার সময় তাহাদিগকে সকল দেবতার উর্দ্ধে স্থান দেওয়া হইয়াছে। সূর্য্যকে মিত্র বরুণ ও অগ্নির চক্ষু, জগৎ (গমনশীল) ও তস্থিবান (স্থিতিশীল) সকল বস্তুর আত্মা বলা হইয়াছে। বহু দেবতার সমষ্টিরূপে "বিশ্বদেব" নামে এক দেবতাশ্রেণীর কল্পনা ইহার পূর্ব্বে ঋষিগণ করিয়াছিলেন। বিশ্বদেবগণ আদিত্য, বসু ও মরুৎদিগের মতই এক শ্রেণীর দেবতা। ইন্দ্রকে এই দেবতাদিগের জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে। প্রায় সকল দেবতাই কোনও না কোনও সূত্রে বিশ্বেদেবদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও অন্য দেবতাদিগের সহিত স্বতন্ত্রভাবে ও তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য এই সপ্ত ব্যাহৃতির দেবতারূপে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বদেবগণও উল্লিখিত হইয়াছেন।

---

* যে ত্রি ষপ্তা পরিয়ন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতুমে।

† বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম শত বার্ষিকী সংস্করণ ও ২৫৫ পৃষ্ঠা।

নারদীয় সূক্ত

জগৎ রহস্য আবিষ্কারের জন্য উৎসুক ঋষি-মনের সুস্পষ্ট পরিচয় নারদীয় সূক্তে পাওয়া যায়। "তখন সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না, আকাশ ছিল না, তাহার উপরিস্থ ব্যোম ছিল না। কিসের দ্বারা সকল আচ্ছাদিত ছিল? কোথায় ইহা ছিল? কাহার আশ্রয়ে ছিল? ইহা কি গভীর জলের মধ্যে ছিল?" সংশয়াকুল মনের প্রশ্ন এই সূক্তে ধ্বনিত হইয়াছে।

হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি

তার পরে একদিন ঋষি হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতিকে আবিষ্কার করিলেন। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দধার পৃথিবীং দ্যাম্ উত ইমাং। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। (ঋঃ বেঃ ১ম ৮।৭।৩) হিরণ্যগর্ভ প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের পতিরূপে আবির্ভূত হন। তিনি পৃথিবী ও আকাশ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই "ক" নামক আদি দেবতাকে ('ক'বর্ণাদিগের প্রথম বর্ণ) আমরা হবিদ্বারা অর্চনা করিব। এই মন্ত্রে স্পষ্টই ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে। এই সূক্তের অন্যান্য ঋকগুলিতে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য খর্ব্বকারী। কোনও কথাই নাই। বরং ঈশ্বরের সমস্ত গুণই হিরণ্যগর্ভে আরোপিত হইয়াছে। "তিনি আমাদের নিশ্বাসের বায়ু ও বল দিয়াছেন, সকল জীবজগৎ ও দেবতারাও তাহার আদেশ পালন করেন। তিনিই মানুষ ও পশুদিগের সনাতন প্রভু। তাঁহার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা, মহাসাগর ও নদীগণ ঘোষণা করিতেছে। তিনি একাই সকল দেবের অধিদেব। তিনি পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, আকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ন্যায়বান্" ইত্যাদি। একেশ্বর বাদের জন্য আর কি চাই? এই সূত্রে কোনও সসীম দেবতার স্তব নহে, ঈশ্বরের স্তব।

ক্রমশঃ

শিক্ষার পথে পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"বাংলা দেশের ঘরে ঘরে
জ্ঞানের আলো জ্বালবো,
সেই আলোকের কিরণ ধারায়
তাক্তা আঁখি খুলবো।"

এই স্বপ্ন যাঁরা দেখেছিলেন, যাঁরা এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে সারা জীবন সাধনা করেছিলেন সেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্বর্গত মহাপুরুষদের আজ স্মরণ করার দিন এসেছে, তাঁদের সাধনা, তাঁদের কল্পনা আজ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করার পথে যতখানি অগ্রসর হয়ে এসেছে পাঁচ বছর আগের বাংলা দেশও এতখানি অগ্রগতির কথা কল্পনা করতে পারতো না। দেশে শিক্ষা বিস্তারের যে প্রধান অন্তরায় ছিল পরাধীনতা—সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে অন্য সব দিক দিয়ে যেমন দেশ আজ দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছে অগ্রগতির পথে, তেমনি শিক্ষা বিস্তারের পথেও তার জয়যাত্রা সুরু হয়েছে। এই জয়যাত্রায় আশীর্ব্বাদ করবেন ঐ সব সাধক, কর্ম্মবীর মহাপুরুষদের অমর আত্মা, আশীর্ব্বাদ করবেন দেশের জনসাধারণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা নিয়ে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দেশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে অবিশ্বাস্যরূপে সাফল্য লাভ করেছেন তা যে কোন জাতি বা যে কোন দেশের পক্ষেই গৌরবের বিষয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলা দেশে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৫৫২৯টি ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৩৮৩৭৩৩ জন, এখন শুধু পশ্চিমবঙ্গেই বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০৫০৭টি ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ। বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা বাদ দিলে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯২১৮টি ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২২১৫৪২১ অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সালে অবিভক্ত সমগ্র বাংলা দেশে যত বিদ্যালয় ও ছাত্রছাত্রী ছিল বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কথা বাদ দিয়েও যথাক্রমে ৩৫৫৯টি বিদ্যালয়ও ৮৩১৬৬৮ জন শিক্ষার্থী বেশী। অবশ্য জনসংখ্যার তুলনায় বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর এই সংখ্যায় গর্ব্ব করার কিছু নেই, কিন্তু অতীতের কথাটাও আমাদের ভুললে চলবে না; অতীতকে বাদ দিয়ে বর্ত্তমানের বিচার করলে ভুল করা হবে।

ইংরাজ সরকার যে আমাদের শুধু ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল তাই নয়, শিক্ষার দিক থেকেও পঙ্গু করে দিয়েছিল। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার ঔদাসীন্য ও অমার্জ্জনীয় অবহেলা দেশকে যে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছিল সেই অবস্থার মধ্য থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে শিক্ষিত সমাজ ও সরকারকে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশ শিক্ষা দীক্ষায় কোন দিনই পশ্চাৎপদ ছিল না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মণ্টোগমারী ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে বাংলা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৭২ জন, আর ইংরাজেরই হিসাব অনুযায়ী সেই দেশেই শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল শতকরা প্রায় ৯ জন মাত্র। রেভারেণ্ড ওয়ার্ডের হিসাবে দেখা যায় যে নদীয়া জেলার লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক ৩২ জনের মাথা পিছু একটি করে টোল বর্ত্তমান ছিল এবং বাংলা দেশের লোক

সংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক ১৮৪ জনের মাথা পিছু টোল ছিল একটা করে। বাংলা দেশের এই হিসাব থেকেই অনায়াসে অনুমান করে নেওয়া যায় যে এই দেশ শিক্ষা দীক্ষায় ছিল কতখানি উন্নত। সেই উন্নত দেশকে ইংরাজ রাজনৈতিক দুরভিসন্ধী নিয়ে হীন চক্রান্তের দ্বারা তলিয়ে দিয়েছিল অধঃপাতের অতলে। যেটুকু ছিটে ফোঁটা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিল তাও নিজেদেরই গরজে—তা না হ'লে সরকারী দপ্তরে কাজের লোক জোটে না।

ভারতবাসীর শিক্ষার ভার ইংরাজ সরকার না নিলেও দেশবাসী নিজেরাই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করার, আর আজ একথা ভুললে চলবে না যে বাঙ্গালীরাই নিজেদের চেষ্টায় দেশবাসীদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম সচেতন হন। রামমোহন রায়ই ছিলেন এ বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক। কাজেই যে বাঙ্গালী একদিন সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছে, সচেতন করেছে—সে আজ চুপ করে বসে থাকতে পারে না, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগ দিয়েছেন তাতে পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিশুরাই জাতি ও দেশের ভবিষ্যৎ, কাজেই শিশুদের গড়ে তুলতে পারলেই জাতি ও দেশ গড়ে উঠবে, তাই পশ্চিমবঙ্গ-সরকার শিশুদের শিক্ষিত করার দিকে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের দিকে সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছেন। ইংরাজ সরকার দেশের অধিকাংশ মানুষকেই নিরক্ষর করে রেখে শাসন ও শোষণের যে ব্যবস্থা কায়েম করেছিল আজ আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব—দেশ থেকে সেই নিরক্ষরতা দূর করা। এ বিষয়ে রাজ্যসরকারের দশশালা পরিকল্পনার কাজ বেশ সাফল্যর সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের এই দশশালা পরিকল্পনায় দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের গরীব দেশ, অন্নবস্ত্রের অভাব এখনও অভিশাপের মত আমাদের দেশের বুকে বাসাবেঁধে রয়েছে, পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের বই কেনার সামর্থ্য নেই একথা স্মরণ রেখেই সরকার বিনামূল্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বই দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বহু টাকা এর জন্যে অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। ১৯৫২-৫৩ সালে শুধু মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টায় ব্যয় হয়েছে প্রায় দেড়কোটি টাকা।

> "ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না।"

রবীন্দ্রনাথের এই সাবধান-বাণী স্মরণ রেখে আমাদের ছেলে মেয়েদের মানুষ করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করাকে পবিত্র কর্ত্তব্য বলেই রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন।

১৯৫১-৫২ সালে পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৫০০৫টি, শিক্ষকশিক্ষিকা নিযুক্ত ছিলেন ৪৩৪৬৭ জন ও ছাত্রছাত্রী ছিল ১৪৭৭২২৮ জন। বর্ত্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যালয় ১৬৯৬৪, শিক্ষক শিক্ষিকা ৫২১৭৪ ও ছাত্রছাত্রী ১৭০৫১৯১ জন। বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার উপযুক্ত যত ছেলে মেয়ে আছে তার শত করা ৫০ ভাগ ছেলে মেয়ে এখন কোন না কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী। গ্রামে গ্রামে এই শিক্ষা বিস্তারের অভিযান সুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আরও ২০২৮টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নূতন শিক্ষক শিক্ষিকা নিযুক্ত হ'য়েছেন ৭৮১৭ জন। তিন বছরের মধ্যে যে ৩০ হাজার শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন, তার ফলে দুটি কল্যাণকর কাজ একই সাথে সাধিত হবে, ৩০ হাজার শিক্ষিত বেকার জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ পাবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ ছেলে মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে নিরক্ষরতার অভিশাপের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করবে।

কিন্তু একথাও আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে শুধু পরিকল্পনা ও আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ চালু করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে চাই আন্তরিকতা ও দেশবাসীর সহযোগিতা। শ্রদ্ধেয় বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য তাঁর 'শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান' পুস্তকে একটি মূল্যবান ও সময়োচিত হুঁসিয়ারী লিপিবদ্ধ করেছেন;—

> "আমাদের দেশের অগণিত অন্নহীন, স্বাস্থ্যহীন, জ্ঞানহীন, অনাহারক্লিষ্ট, ব্যাধিপ্রপীড়িত, মৃতপ্রায়, অল্পায়ু, নির্য্যাতিত, পতিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারীর উন্নয়ন সহজ ব্যাপার নহে। যে ব্যক্তি দুই বেলা দুই মুষ্টি আহার পায় না, তাহাকে ধর্ম্মের বাণী, আত্মার কথা শুনানো বৃথা। সুতরাং দেশের শিক্ষিত এবং বিত্ত-প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সমবেত এবং ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যকে দেশ হইতে চিরতরে বিদূরিত করিতে না পারিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। মূক, অন্ধ, দীন, দুঃখী বিশাল জনগণের জীবনমান উন্নীত করিতেই হইবে। নিরক্ষরতা ও অবিদ্যা দূরীকরণের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যাপক এবং তীব্র অভিযান চালাইতে হইবে।"

ইংরাজ সরকার নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে ধারায় শিক্ষাকে চালু করেছিলেন সেই ধারা বা পদ্ধতি যে এই দেশের পক্ষে উপযোগী নয় একথা আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত। সেই চলতি পদ্ধতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী দুজনেই প্রতিবাদ জানিয়ে নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাকে চালিত করার এক একটি পরিকল্পনা রচনা করে শান্তিনিকেতনে ও ওয়ার্দ্ধায় তার পরখের কাজ চালু করে দেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

> "আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে, নির্জ্জনে, মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞান-চর্চ্চার যোগ্য ক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। যদি সম্ভব হয় তবে ঐ বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমী থাকা আবশ্যক,—এই জমী হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য্য সংগ্রহ হইবে,

ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ, ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গো পালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে কাজের সম্বন্ধও পাইতে থাকিবে।"

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদি শিক্ষারও গোড়ার কথা ছাত্রদের স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া, সুতাকাটা, কাপড় বোনা ও চাষের কাজ করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানদান ও সচেতন করে তোলা।

রবীন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন শিক্ষাপদ্ধতিকে এমন খাতে বহাতে যাতে ছাত্ররা বাস্তব জীবনের সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন,—

"একথা যদি সত্য হয় যে প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জ্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।"

মহাত্মা গান্ধীও রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার মধ্যে অনেক প্রভেদ থাকলেও মূল কথা কিন্তু একই—দেশের শিক্ষাপদ্ধতিকে এমন ধারায় প্রবর্ত্তিত করা—যাতে ছাত্রছাত্রীরা কর্ম্মঠ, চরিত্রবান, শিক্ষিত ও দেশাত্মবোধসম্পন্ন প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে, শুধু পাঠ্য-পুস্তকের ভারে না পিঠ কুঁজো হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের ঐ ধারা দুটীর মূল কথা গ্রহণ করে পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তর থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ সুরু করে দিয়েছেন। এতাবৎ বিভিন্ন জায়গায় ২৭৫টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত হয়ে গেছে, ঐ সব বিদ্যালয়গুলির বর্ত্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হয়েছে ৩১৬২২ জন। যেখানে ১৯৫০ সালে এরকম বিদ্যালয় ছিল মাত্র ৮৬টি আর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮৮০০ সেখানে মাত্র এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এতখানি অগ্রগতি সত্যই আশাতীত। এ বৎসর আরও ৭৭টি নূতন বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা আছে। যাতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকশিক্ষিকার অভাব না হয় সে'দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন রাজ্য সরকার। সরকারী ও সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ৭১৩জন করে শিক্ষকশিক্ষিকাকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করেছেন ১৪০০ জন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে রাজ্য সরকার প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানের যে চেষ্টা করেছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গে ১২৭৮ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করেছেন। তাছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য—শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণী, তপশিলী ও উপজাতীয় ছাত্রদের শিক্ষা, উদ্বাস্তু ছাত্রদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষাদানের জন্য রাজ্য সরকার বহু টাকা ব্যয় করে দেশের শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বাঙ্গীণ করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

১৯৫০-৫১ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১৪১টি ও ছাত্র ছাত্রী ছিল ৩৯৩২৫১ জন। তিন বছরের মধ্যে সেই সংখ্যা বেড়ে ১৯৫৩-৫৪ সালে হয়েছে—বিদ্যালয়—১৪২০টি এবং ছাত্র ছাত্রী ৫০৫৯৩৩ জন। কিন্তু বিদ্যালয় ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কিছু বাড়লেও মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয়নি। উপমন্ত্রী শ্রীমতী পুরবী মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—"প্রাথমিক স্তর ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৮ বছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর শেষ ক'রে পরের তিন বছরের শিক্ষা নানা ধারায় নানা খাতে চলবে। কয়েকটি শিল্প, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, সঙ্গীত ইত্যাদি যার যেমন ঝোঁক বুঝে শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। এই ১১ বছরের শিক্ষা শেষ ক'রে তবেই শিক্ষার্থী ডিগ্রী পাবে। এই নতুন ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হবে।"

শিক্ষাই সভ্যতার মানদণ্ড, কাজেই পশ্চিম বাংলাকে সভ্যজগতের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে হ'লে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। রাজ্য সরকার যত শীঘ্র এদিকে দৃষ্টিদান করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রসারে যত্নবান হন ততই দেশের মঙ্গল। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি তাঁরা রচনা করছেন আশা করি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মধ্য দিয়ে তা সম্পূর্ণ সার্থক করে তুলবেন।

তদন্ত

শীলা গঙ্গোপাধ্যায়

চরিত্র

মিঃ অনন্ত ব্যানার্জ্জী
মিসেস্ সুবালা ব্যানার্জ্জী
মিস্ শীলা ব্যানার্জ্জী
মিঃ আনন্দ ব্যানার্জ্জী
মিঃ যতীন ভট্টাচার্য্য
রামদীন
ইন্‌স্‌পেক্টর গুহ

স্থান—তিনটি অঙ্কই মিঃ অনন্ত ব্যানার্জ্জীর বালিগঞ্জের বাড়ীর ড্রইংরুমে ঘটছে।

সময়—রাত ৯টা।

মঞ্চ-সজ্জা

এ সম্বন্ধে বাঁধাধরা কিছু ঠিক নেই। একজন অর্থশালী এবং রুচি-সম্পন্ন ভদ্রলোকের ড্রইংরুম, তাই বেশ সুসজ্জিত হওয়া প্রয়োজন। জানলা দরজার পর্দা সুদৃশ্য ও দামী—দেওয়ালে কয়েকটি ভালো ছবি। মঞ্চের ডান ও বাম দিকে দুটি দরজা, পিছনে একটি বড় জানলা। জানলার বাইরে মৃদু নীল আলো দিয়ে সময়টা যে রাত্রিকাল সেটা বোঝাতে হবে। জানলার ওপরে একটি দামী দেওয়াল ঘড়িতে ৯টা বাজছে। মঞ্চের মাঝে একটি সুদৃশ্য সোফা সেট ও সেণ্টার টেবিল। ডান দিকের কোণে (front stage) একটি রোলটপ্ রাইটিং টেবিল —তার ওপর লেখবার সাজ সরঞ্জাম, টেবিল ল্যাম্প্ ও টেলিফোন। পিছনের (back stage) দিকে একটি অর্গ্যান বা পিয়ানো। বাম দিকের সামনের কোণে একটি রেডিয়োগ্রাম—এটি মৃদুস্বরে বাজবে। পিছনের দিকে একটি বুকশেলফ্, তার ওপর টেবিল ল্যাম্প্। ঘরের মাঝে ঝুলবে একটি সুন্দর সিলিংল্যাম্প। মঞ্চে যথেষ্ট আলো থাকলেও এ ল্যাম্পগুলো নেভান থাকবে। পছন্দানুযায়ী মঞ্চের নানা জায়গায় ফুলদানীতে ফুল রাখা থাকবে।

প্রথম অঙ্ক

পর্দা যখন উঠলো তখন মঞ্চ খালি। রেডিয়োগ্রাম মৃদুস্বরে বাজছে। ঘড়িতে ৯টা বাজতে লাগলো। বাজা শেষ হবার পর ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢুকলেন মিঃ অনন্ত ব্যানার্জ্জী। পরণে কালো ডিনার জ্যাকেট, মুখে মোটা চুরুট ও হাতে ছোট গ্লাশে পোর্ট। বছর ষাটেক বয়স। ঢুকে [illegible] ভিতরের দিকে চেয়ে বললেন—

ব্যানার্জ্জী। এসো যতীন, এবার এখানে একটু আরাম করে বসা যাক্। ও ডিনার টেবিলে সোজা হয়ে বসে কি আর গল্প করা যায়?

এরপর ঢুকলেন মিসেস্ সুবালা ব্যানার্জ্জী। বয়স বছর পঞ্চাশ, ভারিক্কি চেহারা। বয়সানুযায়ী বেশভূষা। ভেতরের দিকে তাকিয়ে বললেন—

সুবালা। রামদীন—কফি এখানে নিয়ে আয়—

এরপর প্রবেশ করলো যতীন ও শীলা। যতীনের বয়স বছর ত্রিশ, পরণে সাদা কালো ডিনার স্যুট্। বেশ সুদর্শন চেহারা। শীলার বয়স বছর পঁচিশ, মাঝারি রকম সুন্দর, পরণে জমকালো শাড়ী। সবার শেষে ঢুকলো আনন্দ! বছর বাইশ বয়স—রোগা। এর পরণেও ডিনার স্যুট্।

সুবালা। বসো, বাবা যতীন, বসো।

তিনজনে বসলেন। শীলা এগিয়ে গিয়ে রেডিয়োগ্রাম বন্ধ ক'রে দিয়ে মিঃ ব্যানার্জ্জীর পেছনে এসে দাঁড়াল। আনন্দ জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

সুবালা। অক্টোবর শেষ হ'তে চললো, এখনো কিন্তু একটু ঠাণ্ডা পড়লো না—

ব্যানার্জ্জী। বয়স ও মেদবৃদ্ধির সঙ্গে, বুঝলে সুবালা, প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে বলে মনে হয় (গেলাশে চুমুক দিলেন)—বিশেষতঃ যদি এইরকম গরম পানীয় হাতে থাকে। জানো যতীন, তোমার বাবাও এই 1870 পোর্ট খুব ভালবাসেন। (গেলাশ তুলে ধরে) রস উপভোগ করার জন্যে রসিক হওয়া দরকার—

সুবালা। থাক্—ও নিয়ে আর রসিকতা করতে হবে না—

ব্যানার্জ্জী। আরে, তুমি কি বলছো! আজ হ'ল একটা special occasion—অন্য দেশ হ'লে আজ কত নাচ গান ফুর্ত্তি হ'তো। স্যর জগদীশের সঙ্গে আমার যে আবাল্য বন্ধুত্ব আজ তাতে একটা স্থায়ী বাঁধন পড়লো—এটা কি কম আনন্দের কথা—

ইতিমধ্যে রামদীন ট্রেতে করে কফি নিয়ে এলো। শীলা তৈরী করে সকলকে দিল। আনন্দ তার কাপটা না খেয়ে Book caseএর ওপর নামিয়ে রাখলো। শীলা তার দিকে তাকাতে অরুচি সূচক মুখবিকৃতি করে আবার জানলার কাছে ফিরে গেল। মিঃ ব্যানার্জ্জী কথা বলে চলেছেন।

ব্যানার্জ্জী। সে আনন্দ কি তোমার ঐ নিরামিষ কফি দিয়ে celebrate করা যায়? যাই হোক্, আজ রান্নাবান্না খুব ভাল হয়েছিল। তুমি বাবুর্চ্চীটাকে আমার হয়ে বলে দিও।

শীলা। বাবা, তুমি যেন কি! নিজের বাড়ীর রান্নার প্রশংসা বুঝি নিজে করতে হয়! (যতীনের দিকে তাকাল)

ব্যানার্জ্জী। (জোরে হেসে) ঠিক্, ঠিক্। কায়দা-কানুন আমার আবার সব সময় মনে থাকে না। আর, যতীন ত ঘরের ছেলে—

যতীন। না, না, আপনি ঠিকই বলেছেন। রান্না আজ সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে। আমার খাওয়ার পরিমাণ দেখে শীলা তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। তা ছাড়া, এখনো যদি আপনারা আমাকে ঘরের ছেলে বলে মনে না করেন, সেটা কিন্তু—

সুবালা। না, বাবা, তুমি মেয়েটার কথায় কাণ দিও না—। ও অমন যা তা বলে—

শীলা। তা বৈকি। ঘরের ছেলেই যদি হবে তা হলে গত বছর পাঁচ ছ মাস একবার ও এ বাড়ীতে পা দেয় নি কেন? শেষ পর্য্যন্ত বাবাকে নিজে গিয়ে ধরে আনতে হয় কেন?

যতীন। তোমাকে ত বলেছি শীলা যে, সে ক' মাস কাজকর্ম্মে ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। বাবা মা বিলেত যাওয়ার পর সমস্ত কারবারের দায়িত্ব হঠাৎ ঘাড়ে পড়ে গেল—এতটুকু সময় ছিল না—

শীলা। হ্যাঁ, মুখে অবশ্য তাই বলেছ।

সুবালা। শীলা তুই মিছে রাগ করছিস্। তোদের বিয়ে হ'য়ে গেলে বুঝবি যে পুরুষ মানুষের জীবনে কাজটাই সবচেয়ে বড়ো। কাজের জন্যে তাদের পক্ষে অন্য কিছুতে সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। আমার জীবনে এটা আমাকে মেনে নিতে হয়েছে—হয়ত তোকেও মেনে নিতে হবে।

শীলা। কক্ষণো না। তোমাদের যুগে যা চলেছে আমাদের যুগে তা কিছুতেই চলবে না। এ আমি বলে রাখছি—

যতীন। বাবা ফিরে এলে আমার আর কোন দায়িত্ব থাকবে না। সময়েরও কোন অভাব হবে না।

পিছনে হঠাৎ আনন্দ উচ্চস্বরে হেসে উঠতে সকলে ঘুরে তার দিকে তাকাল

শীলা। হঠাৎ হাসির কথাটা কি হ'ল?

আনন্দ। মানে, তোরা বিয়ের আগেই যেকরম ঝগড়া সুরু করে দিলি—ভীষণ হাসি পেয়ে গেল।

শীলা। ব্যাদড়া ছেলে কোথাকার!

সুবালা। আঃ শীলা। তোরা আজকাল এমন সব ভাষা ব্যবহার করিস্—

আনন্দ। এই শুনেই ঘাবড়ে গেলে মা! তবু যদি সত্যি সত্যি শীলা আমাকে যা সব বলে তা শুনতে—

শীলা। এই আনন্দ—আমি না তোর দিদি হই?

আনন্দ। হোস্ বুঝি? জানতাম না ত—

ব্যানার্জ্জী। শীলা, আনন্দ—তোমাদের ছেলেমানুষী এখনো গেল না। এসো দুজনে আমার কাছে এসে বোসো। (শীলা ও আনন্দ তাঁর দু পাশে বসলো) দেখ যতীন, আজকে তোমার আর শীলার বিয়ের পাকাকথা উপলক্ষে একটা বড়ো প্রীতিভোজ দেওয়াই আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্যর জগদীশ আর তোমার মা এখানে না থাকায়, আমার মনে হ'ল একটা ছোট্ট ঘরোয়া ব্যাপারই বোধহয় ভাল হ'বে।

যতীন। হ্যাঁ, এই ত বেশ ভাল।

সুবালা। তা বলে তাঁরা ফেরার পর আশীর্ব্বাদের সময় এ রকম হ'লে চলবে না। তখন কিন্তু আমি ঘটা করে ভোজ দোব—বলে রাখছি।

ব্যানার্জ্জী। এতে যে তোমার মন ওঠে নি, সে আমি জানি। হবে, হবে, এর পরের ব্যাপারটা ঘটা করেই হবে। আমারও ত একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে! (যতীনকে) তোমার বাবা মা আজ উপস্থিত থাকলে আমাদের আনন্দের ষোল কলা পূর্ণ হ'তো। কিন্তু তোমার বাবা কাজের লোক—বলতে গেলে he is the

only Industrial magnate of Bengal to-day—নানা কাজে তাঁকে নানা সময় দেশের বাইরে যেতে হয়, তাই তাঁদের সম্মতি নিয়ে তাঁদের অনুপস্থিতিতেই আজকের এই শুভকাজ করতে হ'লো। আর দেরী করে কোন লাভ ছিল না। তোমাদের ভাব-সাব অনেক দিনের, বিবাহের বয়সও হয়েছে এবং বাংলাদেশে এই নিয়ে নানা কথা ওঠাও কিছু বিচিত্র নয়। অবশ্য আজ সকালেই আমি তোমার বাবার একটা cable পেয়েছি—তাতে তিনি তোমাদের আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন—

যতীন। হ্যাঁ, এটা বাবার অনেক দিনেরই ইচ্ছা।

ব্যানার্জ্জী। যতীন, তুমি এখন আমার নিজের ছেলের মত তাই তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি। তোমার আর শীলার বিয়ে যে আমার কাছে কতখানি আনন্দের বিষয় তা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তোমার বাবা আর আমি আবাল্য বন্ধু। নানা ধাক্কা খেয়ে আজ আমরা উঠে দাঁড়াতে পেরেছি শুধু নিজেদের কর্ম্মশক্তিতে বিশ্বাস ছিলো বলে। আমাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও যথেষ্ট ছিল—তাঁর Bhattacharya Industrials অবশ্য আমার Bannerji & Coর চেয়ে অনেক বড়ো—কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে কেউ কখনো পিছে হটি নি। আজ তোমার আর শীলার মধ্য দিয়ে আমাদের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হ'লো। আমরা শুধু প্রীতির নয়, কুটুম্বিতার বাঁধনেও বাঁধা পড়লাম। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে Bhattacharya Indusrrials ও Bannerji & Co পরস্পরের বিপক্ষতা না করে একযোগে কাজ করবে—বাংলাদেশে নতুন Industrial revolution এনে দেবে।

যতীন। বাবার নিশ্চয়ই তাতে সম্পূর্ণ সম্মতি থাকবে। আমি জানি তিনিও বহুদিন থেকে এই রকমই আশা করে আছেন।

সুবালা। তুমি কি লোক বল ত? আজকের দিনেও ব্যবসা ছাড়া অন্য কথা কইতে পারো না? তার চেয়ে শীলা, তুই বরং একটা গান গা—

শীলা। এক পেট খেয়ে এই রাত দুপুরে বুঝি গান গাইতে পারা যায়?

আনন্দ। গেয়ে ফেল্ না। শেষ পর্য্যন্ত ত গাইবিই —তবে ন্যাকামি করছিস্ কেন?

শীলা। দেখছো মা, আনন্দ আবার সুরু করেছে—

সুবালা। আনন্দ, কেন শীলার পেছনে লাগছো? যা শীলা, যতীনকে একটা ভাল গান শুনিয়ে দে—

ব্যানার্জ্জী। যতীন, শীলার আমার অনেক ভাগ্য তাই তোমার মত স্বামী পাচ্ছে। কিন্তু তুমিও কম ভাগ্যবান নও। শীলা মা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

আনন্দ। কেবল যা একটু ঝগড়াটে—

ইতিমধ্যে শীলা অর্গ্যানের সামনে গিয়ে বসেছে। এঁদের কথা থামলে গাইতে সুরু করলে

গান

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা—

শীলার গান শেষ হ'লো। এতক্ষণ সকলে গান শুনছিলেন, এবার প্রশংসাসূচক দু একটা কথা বললেন। আনন্দ শীলার কাছে গিয়ে হাততালি দিল। রামদীন ঘরে ঢুকে মিসেস ব্যানার্জ্জীকে কিছু বললো। তিনি উঠে পড়লেন

সুবালা। তোমরা কথাবার্ত্তা বলো, আমি একবার চাকর-বাকরদের খাওয়ার ব্যাপারটা দেখে আসি। শীলা, তুইও আয়—

ব্যানার্জ্জী। রামদীনকে দিয়ে portএর decanterটা এখানে পাঠিয়ে দিও—

মিসেস্ ব্যানার্জ্জী, শীলা ও রামদীন ডান দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে গেলেন। একটু পরে রামদীন decanter রেখে গেল

ব্যানার্জ্জী। জানো যতীন, আমার স্ত্রী বলেন যে আমি বড় বেশী কথা বলি। উনি ত আর বোঝেন না যে ভাল ব্যবসায়ী হ'তে হলে বাক্চাতুর্য্যের কতটা দরকার পড়ে—বিশেষতঃ আজকালকার দিনে। (হাসলেন, তারপর গম্ভীর ভাবে) জানো, দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, কাজ করবার এবং অর্থ উপার্জ্জন করবার প্রচুর সুযোগ এসেছে। সাধারণ লোকে অবশ্য তা মনে করে না—ভাবে আমাদের Government Socialistic, আস্তে আস্তে সব বড় industries nationalize করে নেওয়া হবে আমাদের মত capitalistদের গলা টিপে ধরে লাভের

মাত্রা কমিয়ে দেওয়া হবে, শ্রমিকদের আর exploit করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আমি বলছি এ সবের জন্যে আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। এ সব neutralize করবার মত জ্ঞান ও বুদ্ধি আমাদের আছে।

যতীন। হয় ত আপনার কথা ঠিক। কিন্তু বাবার ধারণা যে অবস্থা দিন দিন মন্দের দিকেই চলেছে। লাভই যদি না থাকে, তা হলে ব্যবসা করার ঝুঁকি নেওয়ার জন্য কেই বা এগিয়ে আসতে চাইবে ?

ব্যানার্জ্জী। তোমার বাবা ব্যাপারটাকে কি ভাবে দেখেছেন জানি না—কিন্তু আমি যা বুঝছি তা অন্য রকম। হ্যাঁ, দিনকাল যে ঠিক ১০।১৫ বছর আগেকার মত নেই তা আমি স্বীকার করছি, কিন্তু এমনটিই যে থাকবে না, থাকতে পারে না, তা ও বুঝতে পারছি। (পোর্ট ঢাললেন) দেখো, যাঁদের হাতে দেশের শাসনভার পড়েছে তাঁরা চান যতশীঘ্র সম্ভব এ দেশটাকে অন্যান্য European দেশের সমকক্ষ করে তুলতে, আর সেই জন্যেই এই সব five years plans. কিন্তু কাগজে plan করলেই চলে না। তার জন্যে চাই টাকা, আর সে টাকা আসতে পারে আমাদের মত লোকের কাছ থেকেই, শতকরা নব্বই জন স্বল্পবিত্ত লোকের কাছ থেকে নয়। Taxই বলো, আর loanই বলো, তাদের দেবার ক্ষমতা কতটুকু ? কাজেই আজ না হোক্ কাল কর্ত্তারা বুঝবেন যে যারা টাকা দেবে তাদের টাকা উপার্জ্জন করতে দেবার সুযোগও দিতে হবে। দেখছ না, এই ক-বছরেই গভর্ণমেণ্টের কথাবার্ত্তা কত নরম হয়ে গেছে ? আরো নরম হতে বাধ্য। দেশ industrialized না হ'লে উপায় নেই, অথচ আমাদের বাদ দিয়ে তা করবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের নেই।

আনন্দ। কিন্তু যদি হঠাৎ যুদ্ধ লেগে যায় ?

ব্যানার্জ্জী। লাগবার সম্ভাবনা কি খুব আছে ? ভয় আছে, সন্দেহ আছে, কিন্তু কোন দেশেরই ইচ্ছা নেই যুদ্ধ করবার। তা ছাড়া পণ্ডিত নেহরুর মত লোক আছেন—যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেও শান্তি বজায় রাখবেন। Atomic যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে সকলেই সশঙ্ক। তবু যদি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ লেগেই যায়, তাতে আমাদের লাভ বই লোকসান নেই।

যতীন। কিন্তু labour problem ? দিনের পর দিন তাদের দাবী এতই বেড়ে চলেছে যে তারা যে কোথায় গিয়ে থামবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

ব্যানার্জ্জী। তাদেরও থামতে হবে। হয় নিজেরাই থামবে, না হয় গভর্ণমেণ্ট থামাবে। উৎপাদন না হলে চলবে না, industrialized না হ'লে দেশের বেকার সমস্যার কোন সমাধান হবে না। কাজেই গভর্ণমেণ্ট যেমন করেই হোক industries চলতে দেবার সুযোগ দেবে। তবে labourএর ন্যায্য প্রাপ্য আমরা দোব—সব সময় দিতে প্রস্তুত থাকবো।

আনন্দ। কেবল কোনটা যে ন্যায্য, আর কোনটা যে অন্যায়—তার ঝগড়া মিটবে না—

ব্যানার্জ্জী। আনন্দ, তুমি এই সবে ব্যবসায় ঢুকেছ, তোমার এখনো সব বোঝবার সময় হয়নি। আমার এই করে মাথার চুল পেকে গেল—আমাদের দেশে labourএর কতটা পাওয়া উচিত তার জ্ঞান আমার আছে।

যতীন। বাবা বলেন যে দেশ থেকে Communistic influence কমাতে হলে শ্রমিকদের সুখী রাখতে হবে। আর তারা সুখী থাকলে তাদের অন্যায় দাবীও কমে যাবে—

ব্যানার্জ্জী। তোমার বাবার labour সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিসীম। ওঁর মত লোককে labour minister করলে আমাদের আর কোন ভাবনা থাকতো না। আনন্দ, দেখো ত তোমার মা আর শীলা আমাদের এ রকম একলা ফেলে কোথায় ডুব মারলেন।

আনন্দ ভেতরে গেল

যতীন, তোমাকে একটা কথা বলবো, কিছু মনে কোরো না। আমার কেমন যেন একটা ধারণা রয়েছে যে মেয়ে হিসাবে শীলাকে অপছন্দ না করলেও তোমার মা বোধ হয় আরো উঁচু ঘরে তোমার বিয়ে দেওয়া পছন্দ করতেন। (যতীন লজ্জিতভাবে বাধাসূচক দু একটা কথা বললো) না, না, এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তোমার মায়েরও কোন দোষ নেই। তিনি নিজে রাজবংশের মেয়ে, তোমার বাবাও বড় জমিদার ঘরের মানুষ, আর আমার বংশপরিচয় নিয়ে গর্ব্ব করবার মত কিছুই নেই। তবে প্রেসিডেন্টের next honours listএ বোধহয় এবার আমার নামটাও থাকবে। ভারতরত্ন না হোক্ পদ্মবিভূষণটা হয় ত পাবো।

যতীন। ও, এ ত মস্ত সুখবর! Congratulations, Sir.

ব্যানার্জ্জী। Thanks। তবে ব্যাপারটার এখনো দেরী আছে, এখনই যেন জানাজানি না হয়। অবশ্য কথাটা মন্ত্রিমহল থেকেই আমার কানে এসেছে, তাই মনে হয় হয়েও যেতে পারে। গত কংগ্রেস অধিবেশনে কম খাটাখাটি ত করি নি, সেটা বোধ হয় ওঁদের নজরে পড়েছে। তবে শত্রুরও অভাব নেই, তাই আগে থেকে ব্যাপারটা প্রচার না হ'লেই ভালো।

যতীন। মাকে যদি এ কথা জানাই তাতে বোধহয় আপনার আপত্তি হবে না—

ব্যানার্জ্জী। (হেসে) না, না, আপত্তি হবে কেন? তোমার কাছ থেকে শুনলে বরং ভালই হবে!

আনন্দ ঘরে ঢুকলো

কি, ওরা কি করছে! এলো না যে?

আনন্দ। এখুনি আসবে। কাল ষ্টিমার পার্টির জন্যে শীলা এক গাদা জামা কাপড় নিয়ে পড়েছে। কোনটা পরলে ওকে মানাবে অথচ স্থান, কাল ও occasion অনুযায়ী বেমানান হবে না তাই নিয়ে মা'র সঙ্গে রীতিমত গবেষণা সুরু হয়ে গেছে। বাবাঃ, বারো হাত শাড়ীর মধ্যে যে এত problems আছে তা কে জানত?

ব্যানার্জ্জী। আনন্দ, মেয়েদের শাড়ীটা শুধু লজ্জা নিবারণের জন্যে নয়, নিজেকে সুন্দরী দেখাবার জন্যেও নয়। শাড়ী ও জামার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওদের আত্মসম্ভ্রম, আত্মমর্য্যাদা—

যতীন। খুব সত্যি কথা।

আনন্দ। হ্যাঁ, সেদিন—

থেমে গেল

ব্যানার্জ্জী। কি হয়েছিল সেদিন?

আনন্দ। (দ্বিধান্বিত ভাবে) কিছু না—

যতীন। কি ব্যাপার হে, আনন্দ!

ব্যানার্জ্জী। তোমরা আজকালকার ছেলেরা যে কি করে বেড়াচ্ছ, তোমরাই জান। হাতে অগাধ অর্থ, আর নষ্ট করবার জন্যে প্রচুর সময়। তোমাদের বয়সে আমাদের যে কত অল্প অর্থের জন্য কতখানি পরিশ্রম করতে হত তা যদি জানতে! অবশ্য আনন্দ উপভোগ যে আমরা করি নি, তা বলছি না—(যতীন ও আনন্দ পরস্পরের দিকে চেয়ে একটু হাসলো) না, না, মনে কোর না যে তোমাদের আমি লেকচার শোনাচ্ছি। আমার বলার উদ্দেশ্য যে জীবনে যদি জয়ী হতে চাও তা হলে একাগ্রভাবে শুধু নিজের উন্নতির চিন্তা করো। কারুর দিকে তাকাবার প্রয়োজন নেই, কেন না তোমাদের দিকে কেউ তাকাবে না। বিবেকানন্দ বা গান্ধীর মত মহাপুরুষরা বলতে পারেন যে পরের জন্যেই তাঁদের জন্ম, বিশ্ব তাঁদের ভাই, পরের সেবাই তাঁদের ব্রত, পরের উন্নতিই তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ, নিজের পায়ে দাঁড়াতে না শিখলে কেউ আমাদের শেখাবে না, সাহায্য করবে না। আমার সারা জীবন দিয়ে আমি এই একটা জ্ঞানই উপলব্ধি করেছি—মানুষ জীবনে সম্পূর্ণ একলা—তার আর কেউ নেই, তার—

হঠাৎ কলিং বেল বাজলো। রামদীন ভেতর থেকে এসে বাইরে গেল

এত রাত্রে আবার কে এল?

decanter থেকে port ঢাললেন
রামদীন ঘরে ঢুকলো

রামদীন। হুজুর, একজন ইনিস্‌পেকটর এসেছেন।

ব্যানার্জ্জী। ইন্সপেক্টর? কি রকম ইন্সপেক্টর?

রামদীন। এজ্ঞে, পুলিশ ইনিসপেকটর। নাম বললেন ইনিসপেক্টর গুহ।

ব্যানার্জ্জী। গুহ? কই গুহ বলে কোন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে চিনি বলে ত মনে পড়ছে না! তা, কি চান তিনি?

রামদীন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। বল্লেন, বড় জরুরী।

ব্যানার্জ্জী। আচ্ছা, ভেতরে নিয়ে আয়। আর বড় আলোটা জ্বেলে দিয়ে যা। (রামদীন আলো জ্বালিয়ে বেরিয়ে গেল) কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না—

যতীন। আপনার কোন factoryতে কিছু গণ্ডগোল হয় নি ত?

ব্যানার্জ্জী। না, তা হলে আমি আগেই জানতে

পারতাম। আনন্দ, বিকালে তুমি গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিলে, কোন accident করো নি ত?

আনন্দ। না, বাবা। তা ছাড়া শীলা আমার সঙ্গে ছিল।

ব্যানার্জ্জী। তা হলে? এত রাত্রে বাড়ীতে পুলিশ!

(রামদীনের সঙ্গে ইন্সপেক্টর গুহ ঢুকলেন। বছর ৪৫ বয়স, মজবুত চেহারা, আস্তে আস্তে থেমে থেমে কথা বলেন, কথা বলার সময় অপরের চোখের দিকে প্রখর ভাবে চেয়ে থাকেন। পরণে পুলিশ অফিসার এর খাকি পোষাক, হাতে ছোট ছড়ি। ঘরে ঢুকে মাথার টুপি খুললেন)

গুহ। মিঃ ব্যানার্জ্জী—

ব্যানার্জ্জী। হাঁ, আমি।

গুহ। আমার নাম গুহ। আমি বালিগঞ্জ থানার in charge.

ব্যানার্জ্জী। বসুন ইন্সপেক্টর। (গুহ বসলেন) সিগারেট্—

গুহ। না, আমি খাই না। ধন্যবাদ।

ব্যানার্জ্জী। আচ্ছা, আপনি এখানে নতুন এসেছেন, না?

গুহ। আজ্ঞে হ্যাঁ। এই ক'দিন আগে এখানে বদলি হয়ে এসেছি।

ব্যানার্জ্জী। তাই আপনাকে চিনতে পারি নি। আমি এ wardএর বহুদিনের councillor, বছর পাঁচেক থেকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট—কাজেই থানার অধিকাংশ লোকের সঙ্গেই জানা-শুনা আছে। তা ইন্সপেক্টর, এত রাত্রে আমার কাছে কী দরকার ঠিক বুঝছি না—

গুহ। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, মিঃ ব্যানার্জ্জী, আমার কিছু খবর জানবার আছে। ঘণ্টা দুই আগে হাসপাতালে একটি যুবতী মারা গেছে। আজ বিকালে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। তীব্র acid খেয়ে সে সে আত্মহত্যা করেছে।

আনন্দ। তীব্র acid! ও খেলে ত শুনেছি সব পুড়ে যায়।

গুহ। হ্যাঁ, অসহ্য যন্ত্রণা পেয়ে সে মারা গেছে। হাসপাতালে অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু বাঁচান গেল না।

ব্যানার্জ্জী। এত ভারি বিশ্রী ব্যাপার! আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন!

গুহ। তদন্ত করতে আমাকে সেই মেয়েটির ঘরে যেতে হয়েছিল—সেখানে তার শেষ চিঠি ও একটা ডায়েরী পেয়েছি। এই ধরণের মেয়েরা, যাদের নানা বিপদের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হয়, এরা হামেসাই নিজেদের নানারকম বিভিন্ন নাম রাখে। এ মেয়েটিরও কয়েকটি নাম ছিল, কিন্তু তার আসল নাম ছিল, ইভা দত্ত। মিঃ ব্যানার্জ্জী, আপনার ইভা দত্তকে মনে পড়ে?

ব্যানার্জ্জী। ইভা দত্ত—ইভা দত্ত, নামটা কোথায় যেন শুনেছি শুনেছি মনে হচ্ছে, কিন্তু মনে পড়ছে না। কিন্তু ইভা দত্তের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তা ত বুঝছি না।

গুহ। মিঃ ব্যানার্জ্জী, ইভা দত্ত আপনারই অফিসে এক সময় কাজ করতো।

ব্যানার্জ্জী। তাই নাকি? কিন্তু আমার অফিসে ত কয়েকগণ্ডা মেয়ে কাজ করে, তা ছাড়া রোজই লোক অদল-বদল হচ্ছে। কারুর কি মনে রাখা সম্ভব?

গুহ। ইভা দত্ত খুব সাধারণ মেয়ে ছিল না মিঃ ব্যানার্জ্জী। যাই হোক্, তার ঘর থেকে তার একটা ফটোও পাওয়া গেছে—সেটা দেখলে হয়ত আপনার মনে পড়বে।

পকেট থেকে একটা ফটো বার করে মিঃ ব্যানার্জ্জীর কাছে গেলেন। যতীন ও আনন্দ দু'জনেই ফটোটা দেখবার জন্যে এগিয়ে আসতে গুহ হাত তুলে তাদের বাধা দিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী অনেকক্ষণ ফটোটার দিকে চেয়ে রইলেন।

যতীন। (বিরক্তভাবে) ফটোটা আমাকে দেখতে না দেওয়ার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে, ইন্সপেক্টর?

আনন্দ। আমরা দেখলে কি কোন ক্ষতি হ'ত?

গুহ। হয়ত হ'ত।

ব্যানার্জ্জী। কি ক্ষতি হ'ত ইন্সপেক্টর?

গুহ। মিঃ ব্যানার্জ্জী, প্রত্যেক লোকেরই কাজ করবার নিজস্ব একটা পদ্ধতি থাকে। আমার হচ্ছে একের পর এক গুছিয়ে কাজ করা। একসঙ্গে করতে গেলে সব গোলমাল হয়ে যায়। যাক্, আশা করি ইভা দত্তকে এখন আপনি চিনতে পেরেছেন।

মিঃ ব্যানার্জ্জীর হাত থেকে ফটোটা নিয়ে পকেটে পুরলেন

ব্যানার্জ্জী। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ইভা দত্ত আমার

অফিসে ষ্টেনোগ্রাফারের কাজ করতো। আমি তাকে বরখাস্ত করি।

আনন্দ। সেইজন্যেই সে আত্মহত্যা করেছে না কি ?

ব্যানার্জ্জী। চুপ করো আনন্দ। সে প্রায় বছর দুই আগের ঘটনা।

গুহ। হ্যাঁ। ১৯৫৩ সালের ১০ই অক্টোবর। পূজার ছুটির ঠিক পরে।

ব্যানার্জ্জী। হয়ত হবে। অত দিনক্ষণ আমার মনে নেই।

যতীন। অনেক রাত হয়ে গেল—আমি আজ বরং চলি। বিশেষতঃ এখন এখানে আমার থাকা বোধহয় উচিত হবে না—

ব্যানার্জ্জী। না, না। এতে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনি কি বলেন, ইন্সপেক্টর ? মানে, ইনি হচ্ছেন মিঃ যতীন ভট্টাচার্য্য—স্যার জগদীশ ভট্টাচার্য্যের ছেলে। স্যার জগদীশকে নিশ্চয়ই চেনেন—Bhattacharya Industrialsএর chief।

গুহ। নাম শুনেছি। আপনিই তা হ'লে যতীন ভট্টাচার্য্য—

ব্যানার্জ্জী। হ্যাঁ। এর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের পাকা কথা উপলক্ষে আজ একটা ছোট প্রীতিভোজ ছিল—

গুহ। মিঃ যতীন ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আপনার মেয়ে মিস্ শীলা ব্যানার্জ্জীর বিয়ে হবে ?

ব্যানার্জ্জী। (হেসে) আমরা ত তাই ঠিক করেছি।

গুহ। (গম্ভীরভাবে) তা হ'লে আমার মনে হয় ওঁর এখন এখানেই থাকা প্রয়োজন।

যতীন। বেশ, তা হলে থাকি। (বসলো)

ব্যানার্জ্জী। দেখুন ইন্সপেক্টর গুহ, আপনি একটা অত্যন্ত সাধারণ সামান্য ব্যাপারকে ঘোরাল করে তোলবার চেষ্টা করছেন। ইভা দত্তকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করার মধ্যে কোন রহস্য বা scandal নেই। তা ছাড়া দু বছর আগে যা ঘটে গেছে আজ তার আত্মহত্যার সঙ্গে সেটার কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না।

গুহ। আমি আপনার সঙ্গে এক মত হতে পারছি না—

ব্যানার্জ্জী। কেন ?

গুহ। ইভা দত্তর পরবর্ত্তী জীবনে যা ঘটেছিল, দু বছর আগে চাকরী যাওয়ার সঙ্গে তার যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। তার ফলে যা ঘটেছিল সেই জন্যেই সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

ব্যানার্জ্জী। বেশ, আপনার কথা না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু তা হ'য়ে থাকলেও তার জন্যে আমার দায়িত্ব কোথায় ? এ রকম ভাবে দেখলে ত জীবনে যারই সংস্পর্শে এসেছি তারই পরবর্ত্তী জীবনের জন্য আমাকেই দায়ী হতে হয় ! এ পরিস্থিতিতে মানুষের বাঁচা অসম্ভব !

গুহ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন হয় নি—মিঃ ব্যানার্জ্জী। যাই হোক্, আপনি ইভা দত্ত সম্বন্ধে বলছিলেন—

ব্যানার্জ্জী। হ্যাঁ, বলছিলাম যে এটা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক সাধারণ ঘটনা। সমস্ত ব্যাপারটা এখন আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে। ইভা দত্ত আমার অফিসে ষ্টেনোর কাজ করতো। রেফিউজী মেয়ে, দেখতে শুনতে ভালই ছিল, কাজকর্ম্মও মন্দ করতো না। পূজার ছুটির পর হঠাৎ কি হলো জানি না, অফিসের সমস্ত clerical staff একসঙ্গে বেশী মাইনে দাবী করে বসলো। এমন নয় যে আমরা তাঁদের কম দিচ্ছিলাম, বরং অন্য যে কোন firmএর চেয়ে তারা বেশীই পাচ্ছিল। তাই তাদের দাবী আমি মানি নি—

গুহ। কেন ?

ব্যানার্জ্জী। আশ্চর্য্য ! আপনি জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?

গুহ। হ্যাঁ, তাদের দাবী না মেনে নেওয়ার কি কারণ ছিল ?

ব্যানার্জ্জী। দেখুন ইন্সপেক্টর, আমার ব্যবসা আমি কিভাবে চালাই তার কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দোব না। এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ?

গুহ। আপনি ভালভাবেই জানেন যে সম্পর্ক আছে।

ব্যানার্জ্জী। আপনার কথার সুর মোটেই ভদ্র নয় !

গুহ। মাফ করবেন। আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন—আমি তার উত্তর দিয়েছি।

ব্যানার্জ্জী। কিন্তু তার আগে আপনিও আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন—সম্পূর্ণ অনধিকার প্রশ্ন।

গুহ। আমি তদন্ত করতে এসেছি। প্রশ্ন করা আমার কাজ।

ব্যানার্জ্জী। আমারও কাজ হচ্ছে আমার কোম্পানীর খরচ কম রাখা। ওদের দাবী মেনে নিলে আমাদের খরচ অন্ততঃ শতকরা দশভাগ বেড়ে যেতো। শেয়ার হোল্ডারদের দিকেও আমাদের দেখতে হয়! আশা করি এবার বুঝেছেন যে কেন তাদের দাবী মানা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমাকে স্পষ্টভাবেই বলতে হয়েছিল যে যদি এ মাইনেতে তাদের না পোষায় তারা অন্য জায়গায় যেতে পারে।

আনন্দ। যেতে বললেই ত হ'ল না—যাবে কোথায়?

গুহ। ঠিক। খুব সত্যি কথা।

ব্যানার্জ্জী। আনন্দ, তুমি আমাদের কথার মধ্যে কথা বলছো কেন? এ তোমার অফিসে বসবার অনেক আগের কথা। যাই হোক্ তাদের দাবী না মানায় সকলে ধর্ম্মঘট করলো। অবশ্য সে ধর্ম্মঘট বেশীদিন টেঁকে নি।

যতীন। ঠিক পূজার ছুটির পর ধর্ম্মঘট টেঁকা শক্ত—কারুর হাতে কিছু থাকে না সে সময়—

ব্যানার্জ্জী। হাঁা, দশ পনের দিনের মধ্যেই সব সুবোধ শিশুর মত একে একে ফিরে এলো। আমি জানতাম যে বেশীর ভাগেরই কোন দোষ ছিল না, কাজেই তাদের আবার চাকরী দেবার কোন বাধা ছিল না। তবে যে ক'জনকে ধর্ম্মঘটের চাঁই বলে জানতে পেরেছিলাম তাদের তাড়ান ছাড়া উপায় ছিল না। ইভা দত্ত ছিল মেয়েদের চাঁই। তাকে বরখাস্ত করার সময় সে অনেক কাঁদুনী গেয়েছিল—কিন্তু তবু তাকে যেতে হ'ল।

যতীন। এ ছাড়া আপনার পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না—

আনন্দ। কেন ছিল না? অনুতপ্ত হবার পর তাকে আবার না রাখা অন্যায়।

ব্যানার্জ্জী। বাজে কথা। ঘোঁট পাকিয়ে গণ্ডগোল বাঁধাবার সময় তা মনে থাকে না! অনুতাপ! ও রকম অনুতাপ পরে সকলেই দেখাতে পারে। এদের আস্কারা দিলে কোনদিন গোটা পৃথিবীটাই চেয়ে বসবে!

গুহ। হয়ত তাই চাইবে। কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জী, জোর করে কেড়ে নেওয়ার চাইতে কি চেয়ে নেওয়াটা ভাল নয়?

ব্যানার্জ্জী। (খানিকক্ষণ গুহর দিকে চেয়ে রইলেন) আপনার পুরো নামটা কি ইন্সপেক্টর?

গুহ। সেটা জানবার কি খুব প্রয়োজন আছে?

ব্যানার্জ্জী। না, তবে জেনে রাখা ভাল। আমাদের পুলিশ কমিশনার মিঃ চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে আপনার জানা-শোনা কেমন?

গুহ। তিনি আমার Superior officer—এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার অন্য কোন সম্পর্ক নেই।

ব্যানার্জ্জী। তা হ'লে আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার যে তিনি আমার বিশেষ বন্ধু এবং প্রায়ই দেখাশুনা হয়।

গুহ। আমাকে একথা জানাবার আপনার উদ্দেশ্য কি?

আনন্দ। (অন্যমনস্কভাবে) আমার মতে এটা সম্পূর্ণ অনুচিত।

ব্যানার্জ্জী। তুমি কি বলছো আনন্দ—পাগলের মত?

আনন্দ। (সচকিত হ'য়ে) আমি ইভা দত্তর কথা বলছিলাম। সত্যিই ত, কেন তারা মাইনে চাইবে না? সুযোগ পেলে আমরা জিনিষপত্রের দাম চড়িয়ে দি না? তা ছাড়া যেহেতু এ মেয়েটি অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় একটু বেশী তেজ দেখিয়েছিল, সেই জন্যেই তাকে চাকরী থেকে তাড়ানটা আমার খুব ভাল মনে হচ্ছে না। তুমি নিজেই স্বীকার করেছ যে সে কাজকর্ম্ম ভালই করতো। আমি হ'লে তাকে থাকতে দিতাম।

ব্যানার্জ্জী। আনন্দ, তোমার মতিগতির পরিবর্ত্তন না হ'লে কারুকেই রাখবার বা তাড়াবার ক্ষমতা তোমার কোনকালেই হবে না। নিজের দায়িত্ব বোঝবার তোমার বয়স ও সময় হয়েছে—এটা মনে রেখো। স্কুল কলেজে পড়লেই সবকিছু জানার শেষ হ'য়ে যায় না—

আনন্দ। ইন্সপেক্টরের সামনে এ আলোচনা না হয় নাই হ'লো—

ব্যানার্জ্জী। আর কোন আলোচনারই প্রয়োজন নেই। ইন্সপেক্টর, আমার যা বলবার ছিল বলেছি, এ ছাড়া আমার আর কিছু জানা নেই। মেয়েটি চাকরী ছেড়ে চলে যাবার পর তাকে আর আমি কখনো দেখিওনি, তার সম্বন্ধে কিছু শুনিও নি।

যতীন। আপনি নিশ্চয়ই এর পরের ঘটনাগুলো জানেন, ইন্সপেক্টর।

ব্যানার্জ্জী। এর পরে কি আর হ'তে পারে! হয়ত বিপদে পড়েছিল—হয়ত রাস্তায় গিয়েই দাঁড়িয়েছিল!

গুহ। না মিঃ ব্যানার্জ্জী। রাস্তায় গিয়ে সে দাঁড়ায় নি।

শীলা ঘরে ঢুকলো

শীলা। রাস্তা নিয়ে আবার তোমাদের কি কথা হচ্ছে? (গুহকে দেখে) ও—(খানিকটা ফিরে গিয়ে) বাবা, মা তোমাদের ওপরে আসতে বল্লেন, তিনি আর নীচে নামতে পারছেন না—

ব্যানার্জ্জী। আচ্ছা, আমরা এখুনি আসছি। আমাদের কথা শেষ হ'ল বলে—

গুহ। না, মিঃ ব্যানার্জ্জী। আমাদের কথা শেষ হতে এখনো দেরী আছে।

ব্যানার্জ্জী। (রাগ করে) আবার কি? আমার আর কিছু বলবার নেই।

শীলা। কি হয়েছে বাবা?

ব্যানার্জ্জী। কিছু না, শীলা। তুমি ওপরে যাও।

গুহ। যাবেন না মিস ব্যানার্জ্জী। আপনার সঙ্গেও আমার কথা আছে।

ব্যানার্জ্জী। দেখুন ইন্সপেক্টর, আপনি আপনার ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি যা জানতাম আপনাকে বলেছি। আমার মেয়েকে এই বিশ্রী ব্যাপারে জড়াবার আপনার কোন অধিকার নেই। জানেন, আমি আপনার নামে রিপোর্ট করতে পারি?

শীলা। কি ব্যাপার? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

গুহ। মিস্ ব্যানার্জ্জী, আমি একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। আজ বিকেলে একটি মেয়ে acid খেয়ে কয়েক ঘণ্টা দারুণ কষ্ট পেয়ে হাসপাতালে মারা গেছে।

শীলা। উঃ—কি কাণ্ড! কেন acid খেল?

গুহ। আত্মহত্যা করবার জন্যে। বেঁচে থাকার আর কোন উপায় ছিল না বলে—

ব্যানার্জ্জী। (ব্যঙ্গ স্বরে) বলুন, আরো বলুন—দু বছর আগে আমি তাকে চাকরী থেকে তাড়িয়েছিলাম বলে—

আনন্দ। হয় ত তাই। হয় ত সেদিন থেকেই এই আত্মহত্যার সূত্রপাত?

শীলা। এ কি সত্যি বাবা?

ব্যানার্জ্জী। হ্যাঁ। অফিসে গণ্ডগোল বাঁধিয়েছিল বলে তাড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেটা যে অন্যায় করেছিলাম তা আমি স্বীকার করি না।

যতীন। নিশ্চয়ই নয়। আপনার যায়গায় যেই থাকতো সেই তা করতো। (শীলা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে) তুমি অমন ভাবে তাকিয়ে আছ কেন শীলা?

শীলা। (চমকে) না, কিছু না। আমি শুধু সেই মেয়েটির কথা ভাবছি। কি দুঃখে সে নিজেকে এমন বীভৎস ভাবে ধ্বংস করলো? আজকের এই রাতটা আমার কাছে কত আনন্দের, কত আশার, কিন্তু তার কাছে এত দুঃখের, এত নিরাশার যে আত্মহত্যা করতে হ'ল?

যতীন। এ সব তুমি কেন ভাবছো শীলা?

শীলা। ইন্সপেক্টর, মেয়েটি কি অল্পবয়সী ছিল? সুন্দরী ছিল?

গুহ। তাকে যখন শেষ দেখেছি তখন তার সৌন্দর্য্যের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু বেঁচে যখন ছিল তখন সুন্দরী ছিল—হ্যাঁ, খুবই সুন্দরী ছিল। আর বয়স? আপনার বয়সীই ছিল।

ব্যানার্জ্জী। চুপ করুন, যথেষ্ট হয়েছে।

যতীন। আমি ভেবে পাচ্ছি না ইন্সপেক্টর, কেন আপনি একই কথার বারবার পুনরুক্তি করছেন। এ রকম ভাবে তদন্ত করায় লাভই বা কি? বরং মিঃ ব্যানার্জ্জীর অফিস থেকে যাওয়ার পর যা ঘটেছিল সেটা জানবার চেষ্টা করুন, তাতে আপনার কাজ বেশী হবে।

ব্যানার্জ্জী। আমিও ত সেই কথা বরাবর বলছি।

যতীন। এখানে আপনার কাজ আর এগুতে পারে না। আমরা আর কিছুই জানি না।

গুহ। সত্যি, আপনারা আর কিছুই জানেন না?

একে একে যতীন, আনন্দ ও শীলার দিকে তাকালেন

ব্যানার্জ্জী। আপনার এ রকম ইঙ্গিতের মানে কি?

আপনি কি বলতে চাইছেন যে এদের মধ্যে কেউ মেয়েটার সম্বন্ধে আরো কিছু জানে ?

গুহ। হ্যাঁ।

ব্যানার্জ্জী। তা হ'লে শুধু আমার সঙ্গেই দেখা করার জন্য আপনি আসেন নি ?

গুহ। না।

ব্যানার্জ্জী। যদিও বা এরা কিছু জানে, নিশ্চয়ই সেটা এমন কিছু গুরুতর নয়—

গুহ। মিঃ ব্যানার্জ্জী—একটি মেয়ে মারা গেছে ভুলবেন না। কোনটা গুরু আর কোনটা লঘু তার বিচারের ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দিন্ না—।

শীলা। আপনি এমন ভাবে কথা বলছেন যেন মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে আমরাই দায়ী—

ব্যানার্জ্জী। এক মিনিট শীলা। দেখুন, ইন্সপেক্টর, আমার মনে হয় আমরা দুজনে যদি অন্য কোথাও ঠাণ্ডা মাথায় এ ব্যাপারটা আলোচনা করি তা হ'লে—

শীলা। কেন ? এতে লুকানর কী আছে ? তা ছাড়া বাবা, তোমার সঙ্গে ওঁর কথাবার্ত্তা যা হবার তা হয়ে গেছে। এবার ত আমাদের পালা।

ব্যানার্জ্জী। তা বটে। কিন্তু ব্যাপারটা যাতে সকলের পক্ষেই পরিষ্কার হয়ে যায়, সেই চেষ্টাই আমি করতে চাইছি।

যতীন। আমার পক্ষে পরিষ্কার করবার কিছুই নেই। ইভা দত্তকে আমি চোখেই দেখি নি।

আনন্দ। আমিও না।

শীলা। মেয়েটির নাম বুঝি ইভা দত্ত ?

গুহ। হ্যাঁ।

শীলা। কিন্তু এ নাম ত আগে শুনেছি বলে মনে পড়ছে না !

যতীন। তা হ'লে ইন্সপেক্টর ? এবার আপনার ধারণা ভুল বলে স্বীকার করবেন ত ?

গুহ। আমার ধারণা ভুল নয় মিঃ ভট্টাচার্য্য। আমি আগেই বলেছি ইভা দত্তের আরো কয়েকটি নাম ছিল। মিঃ ব্যানার্জ্জীর অফিস থেকে—মাসে মাত্র দশ টাকা মাইনে বাড়াবার চেষ্টা করার জন্য যখন তার চাকরী গেল তখন বোধ হয় তার ও নামটাতে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল।

আনন্দ। খুবই স্বাভাবিক।

শীলা। বাবা, তুমি অন্যায় করেছিলে। হয়ত এই জন্যেই তার মনটা বিষিয়ে উঠেছিল—

ব্যানার্জ্জী। রাবিশ ! (গুহকে) আমার অফিস ছাড়বার পরের ঘটনাগুলো আপনি জানেন বোধ হয় ?

গুহ। জানি বৈ কি—জানতে হয়েছে। তারপর দু মাস আর তার কোথাও চাকরী জোটে নি। বাপ মা পাকিস্থানে মারা যায়, বাড়ী ঘর-দোরের কিছুই ছিল না, তা ছাড়া সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং তাকে যা মাইনে দিত তা থেকে কোন রকমে বাঁচা যেত—কিন্তু কিছু সঞ্চয় করা যেত না। তাই সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় একটা বস্তিতে কোন রকমে মাথা গুঁজে তাকে দুটো মাস কাটাতে হয়েছিল।

শীলা। আহা।

গুহ। আহা বলছেন মিস ব্যানার্জ্জী ? কিন্তু এই কলকাতার বুকে, এত আলো ঐশ্বর্য্যের মাঝে, ঠিক এই রকম ভাবে কত লোক দিন কাটাচ্ছে তার কোন হিসাব রাখেন ? এরাও যে মানুষ, এদেরও যে বাঁচবার ইচ্ছা আছে সেটা কখনো মনে করেছেন ? নিজেকে এদের অবস্থায় কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করেছেন ?

সকলে চুপ করে রইল

যাই হোক্—দু মাস ধরে চাকরীর জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার পর হঠাৎ একদিন ভাগ্যচক্রের চাকা ঘুরলো। একটা বড় পোষাকের দোকানে তার একটা চাকরী জুটে গেল।

শীলা। কোন দোকানে ?

গুহ। একটা বিলিতি দোকানে। ইংরেজ ভারত ছাড়বার পর এই রকম দোকানগুলোর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এদেশী খরিদ্দার টানবার জন্যে তাই এরা আজকাল দেশী মেয়েদের saleswomen হিসাবে চাকরী দিচ্ছে। সেই জন্যেই বোধ হয় ইভা দত্তর এ চাকরীটা জুটেছিল, হয়ত তার চেহারার জন্যে ও এ রকম চাকরী পাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। মিস্ ব্যানার্জ্জী, আপনি বোধ হয় দোকানটা চেনেন। চৌরঙ্গী আর লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়ে—Milwards & Co.

শীলা। Milwards ? ওটা ত আমার favourite

দোকান। আমার নিজের সব shopping আমি ওখানেই করি। বাবা আমার জন্যে ওখানে একটা running accountও খুলে দিয়েছেন। মেয়েটি তা হ'লে বেশ ভাল চাকরীই পেয়েছিল!

গুহ। হ্যাঁ। তারও তখন তাই মনে হয়েছিল। বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে ১০টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত টাইপরাইটার খট্‌খট্ করার পর এ কাজের নতুনত্ব তার আরো ভাল লেগেছিল। ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার দোকান, চারপাশে রাশি রাশি নানা রংএর নানা ধরণের পোষাক, প্রসাধন দ্রব্য, আরো কত সামগ্রা। নানা রকমের লোকেদের আসা-যাওয়া, দোকানের জিনিষ তাদের সামনে মেলে ধরা, একটু মিষ্টি হাসা, আর ভাল কাজ করার জন্যে দিনের শেষে প্রশংসা পাওয়া। জীবনের রংটাই তার কাছে সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছিল। কিন্তু এত সুখ তার কপালে সইল না—

ব্যানার্জ্জী। মাইনে বাড়াবার জন্যে নিশ্চয়ই সেখানেও গণ্ডগোল সুরু করেছিল।

গুহ। মাস চারেক পরে, যখন সে এই নতুন জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন হঠাৎ একদিন নোটিস পেল যে তাকে আর দরকার নেই।

ব্যানার্জ্জী। কাজকর্ম্ম নিশ্চয়ই ভাল করতে পারছিল না—

গুহ। না, কাজকর্ম্মে তার কোন ভুলচুক হয় নি—নোটিস দেবার সময় ম্যানেজার অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করেছিল।

ব্যানার্জ্জী। কোথাও একটা গোলমাল নিশ্চয়ই করেছিল—না হ'লে মিছামিছি চাকরী যায়?

গুহ। ঠিক মিছামিছি নয়। তাকে বলা হয়েছিল যে একজন খরিদ্দার তার নামে রিপোর্ট করেছে। এ সব বিলিতি দোকানে customer is always right বিশেষতঃ যদি শাঁসাল customer হয়। কাজেই তাকে বিদায় দেওয়া ছাড়া তাদের উপায় ছিল না।

শীলা। (উত্তেজিত ভাবে) কবে এ ঘটনাটা ঘটেছিল?

গুহ। ১৯৫৪র এপ্রিল মাসে।

শীলা। গত বছর এপ্রিল মাসে? মেয়েটির চেহারা সম্বন্ধে একটু বলতে পারেন?

গুহ। এদিকে আসুন, দেখাচ্ছি।

পিছনের দিকে গিয়ে বুককেসের ওপরে রাখা টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে পকেট থেকে ফটো বার করে শীলার হাতে দিলেন। সে ও তখন সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শীলা ফটোটা দেখেই চমকে উঠলো, আলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে ভালভাবে দেখল। বাঁ হাতের আঙুল কামড়ে যেন উদ্যত কান্নাকে আটকাতে চেষ্টা করলো তারপর ফটোটা বুককেসের ওপর রেখে প্রায় দৌড়ে ভেতরের দিকে চলে গেল। গুহ ফটোটাকে পকেটে পুরে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন! অন্যরাও ঘাড় ঘুরিয়ে বা উঠে দাঁড়িয়ে সেই দিকে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে চেয়ে রইলেন।

ব্যানার্জ্জী। এ আবার কি হ'ল?

আনন্দ। দেখতে পেলে না? শীলা ফটো চিনতে পেরেছে।

ব্যানার্জ্জী। ইন্সপেক্টর, আমি বুঝতে পারছি না, এ সব আপনি কি করছেন? আপনি কি চান? বলুন, আপনি কি চান?

গুহ। কিছু চাই না, মিঃ ব্যানার্জ্জী শুধু সত্যকে জানতে চাই।

ব্যানার্জ্জী। শীলা ওরকম ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেন?

গুহ। ঠিক জানি না—এখনো। কিন্তু আমায় জানতে হবে।

ব্যানার্জ্জী। আপনি জানবার আগে আমাকে জানতে হবে।

যতীন। আমি যাবো শীলার কাছে? (উঠলো)

ব্যানার্জ্জী। না যতীন, এ কাজটা আমাকেই করতে দাও। তা ছাড়া শীলার মাকেও সব কথা জানাতে হবে—জানান প্রয়োজন।

ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে পর্দ্দা সরিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন

ইন্সপেক্টর, আজ আমরা একটা আনন্দ উৎসব করছিলাম। আপনি এসে সেটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়ে গেলেন—

গুহ। খানিকক্ষণ আগে হাসপাতালে ইভা দত্তের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আমিও এই রকমই ভাবছিলাম। এমন সুন্দর তরুণ একটা জীবনকে কে এমন ভাবে নষ্ট করে দিলে!

মিঃ ব্যানার্জ্জী স্তম্ভিতভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভেতরে গেলেন। গুহ টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে সোফায় এসে বসলেন। যতীন ও আনন্দ পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল, গুহ সেদিকে দৃকপাত না করে বসে রইলেন।

যতীন। ইন্সপেক্টর, আমি একবার ফটোটা দেখতে পারি?

গুহ। এখন নয়।

যতীন। কেন?

গুহ। মিঃ ভট্টাচার্য্য, আমি একটু আগেই বলেছি যে আমার তদন্তের পদ্ধতিতে আমি একটা কাজ শেষ করার পরে আর একটা কাজ সুরু করি। তা না হ'লে সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে যায়। আপনার যদি কিছু বলবার থাকে একটু পরেই তার সুযোগ পাবেন।

যতীন। আমার বলার কিছুই নেই।

গুহ। তবে ফটোটা দেখবারও কোন কারণ নেই।

আনন্দ। নাঃ ব্যাপারটা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে—

গুহ। খুবই সম্ভব।

আনন্দ। যতীন, কিছু মনে কোর না ভাই। মাথাটা ধরেছে, আমি শুতে চললাম। বাবা মা এখুনি নেমে আসবেন।

গুহ। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার এখন এখানেই বসে থাকা উচিত।

আনন্দ। কেন, আপনার হুকুম না কি?

গুহ। না, অনর্থক কষ্টের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। আপনি শুতে গেলেও হয়ত এখুনি আবার উঠে আসতে হবে।

যতীন। ইন্সপেক্টর, আপনি কি মনে করেছেন আমাদের? আমরা চোর, গুণ্ডা না বদমায়েস যে আপনি সাধারণ ভদ্রতাটুকু ভুলে যাচ্ছেন?

গুহ। ভদ্রতা ভুলে যাই নি। তবে ভদ্রলোক আর গুণ্ডা বদমায়েসের মধ্যে তফাৎটা মাঝে মাঝে এত সূক্ষ্ম যে ভুল হ'য়ে যায়।

যতীন। আমাদের ভাগ্য ভাল যে মাপকাঠিটা গভর্ণমেণ্ট আপনার হাতে তুলে দেয় নি।

গুহ। কিছু দিয়েছে। যেমন ধরুন এই তদন্ত করার ভারটা—

শীলা ঘরে ঢুকলো। চোখ দেখে মনে হয় যেন কেঁদেছে

এই যে মিস্ ব্যানার্জ্জী—

শীলা। আপনি আগে থেকে জানতেন যে আমিই—

গুহ। না, ঠিক জানতাম না, তবে সন্দেহ করেছিলাম। মেয়েটির ডায়েরীতে অনেক কথাই আছে কিন্তু নাম নেই। আপনাকে সে চিনতো না।

শীলা। আমি বাবাকে সব কথা খুলে বলেছি। তাঁর মতে এটা এমন কিছু নয় যার জন্যে আমি দোষী। কিন্তু আমার মন কিছুতে সান্ত্বনা পাচ্ছে না। খালি মনে হচ্ছে হয়ত আমার জন্যেই আজ তার এই পরিণাম।

গুহ। হয় ত। অন্ততঃ এটা ঠিক যে milwards থেকে চাকরী যাওয়ার পর আর তার কোথাও কাজ জোটে নি। এবং শেষ পর্য্যন্ত অর্থের অভাবে তাকে এমন পথে যেতে হয়েছিল যে সহজ অবস্থায় কোন মেয়েই তা কল্পনা করে না।

আনন্দ। কিন্তু তুই করেছিলি কি?

শীলা। আমি Milwards এর ম্যানেজারকে গিয়ে বলেছিলাম যে যদি ও মেয়েটিকে দোকান থেকে না সরান হয় তা হ'লে আমি আর কখনো সেখানে যাবো না, আর বাবাকে বলে আমার accountও বন্ধ করে দোব।

গুহ। কিন্তু কি এমন অপরাধ সে করেছিল?

শীলা। এখন বুঝছি কিছুই করে নি। কিন্তু তখন আমার মাথা ঠিক ছিল না, রাগে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

গুহ। রাগের কারণ ছিল কিছু?

শীলা। একটা নতুন ধরণের কোট পরে আমাকে কেমন মানায় আরশিতে তাই দেখছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়লো মেয়েটা আমাকে দেখে মুচকি হাসছে—(যতীন ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে) ও রকমভাবে আমার দিকে তাকিও না তুমি। সত্যিকথা বলবার সাহস অন্ততঃ আমার আছে। তুমি নিজে বোধ হয় জীবনে কোন ভুল ত্রুটি করো নি-না?

যতীন। (আশ্চর্য্যভাবে) আমি কখন সে কথা বললাম? আমাকে ধরে হঠাৎ টানাটানি কেন?

গুহ। থাক্, আপনারা ঝগড়া করার অনেক সময় পাবেন। মিস্ ব্যানার্জ্জী—তারপর?

শীলা। প্রথম থেকেই বলি, তা হ'লে বোধহয় আপনার বোঝবার সুবিধা হবে। গরমের সময় আমরা বাড়ীশুদ্ধ কয়েকমাসের জন্যে দার্জ্জিলিং যাই। গত বছর

আমার একটা নতুন কোটের দরকার হয়ে পড়েছিল ! Milwards-এ একটা নতুন ডিজাইনের কোট দেখে আমার খুব পছন্দ হয়। মা'র কিন্তু সেটা পছন্দ হয় নি, বলেছিলেন পরলে আমাকে মানাবে না। সেদিন বিকালে তাই একাই আমি সেটা কিনতে যাই। কিন্তু সেটা পরে দেখবার পরই বুঝতে পারলাম যে সত্যি সেটা আমার পক্ষে নেহাৎই বেমানান। অথচ মেয়েটি যখন কোটটা নিয়ে এল, আমাকে দেখাবার জন্যে তার বুকের সামনে তুলে ধরলো, তখন কিন্তু তাকে সুন্দর মানিয়েছিল। আমি আরশিতে যখন নিজেকে কেমন মানিয়েছে তাই দেখছি, আর বুঝতে পারছি যে মোটেই মানায় নি, তখন নজরে পড়ে গেল মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। মনে হ'ল যেন বলছে—আহা, কি রূপই খুলেছে! মনে হ'ল যেন নিজের রূপের দিকে দেখিয়ে বলছে—টাকা থাকলেই হয় না, এমন জিনিষ পরবার জন্যে রূপও চাই! হঠাৎ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল, রাগের মুখে তাকে কি বলেছিলাম মনে নেই, নিশ্চয়ই অনেক রূঢ় কথা শুনিয়েছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বললাম যে মেয়েটা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক—(প্রায় কেঁদে ফেলে) কিন্তু, আমি ত তখন জানতাম না যে তার ফল এইরকম হবে? সে যদি সুন্দরী না হোত তা হ'লে হয় ত আমি কিছুই করতাম না। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল তার রূপের গর্ব্ব ভাঙ্গতেই হবে—

গুহ। অর্থাৎ তার রূপের জন্যেই আপনার যত রাগ?

শীলা। হয় ত তাই।

গুহ। আর সেইজন্যেই আপনার যতটুকু ক্ষমতা ছিল তাই দিয়ে তার মন্দ করবার চেষ্টা করেছিলেন?

শীলা। কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে তার এই পরিণাম হবে। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে সব কিছু করতে রাজী আছি—

গুহ। হ্যাঁ, কিন্তু আর তো কিছু করবার নেই। সে মারা গেছে।

আনন্দ। সত্যি, কি অভিশপ্ত জীবন নিয়ে মেয়েটা জন্মেছিল! আর, তুই মেয়ে হয়ে—

শীলা। তুই চুপ কর্ আনন্দ। আমি কি বুঝছি না যে আমি কী করেছি? কিন্তু সেদিন কি যে হয়ে গেল আমার! উঃ, কেন এমন হল? কেন?

গুহ। মিস্ ব্যানার্জ্জী, কিছুক্ষণ আগে মেয়েটির মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আমারও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল—কেন এমন হল? তারপর মনে হ'ল আমাকে জানতেই হবে কেন এ রকম পরিণাম তার কাছে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। সেইজন্যেই আমি আপনাদের বাড়ীতে এসেছি এবং যতক্ষণ না সমস্ত কিছু জানতে পারছি ততক্ষণ আমাকে এখানে থাকতেই হবে।

যতীন ও আনন্দের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন

ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং থেকে তার চাকরী যায় বেশী মাইনে চেয়েছিল বলে, milwards থেকে চাকরী যায় আপনি তার রূপ সহ্য করতে পারেন নি বলে। কিন্তু রূপ ত বদলান যায় না, তাই সে তার নামটা বদলে ফেললো—নতুন নাম নিল, রত্না সেন।

যতীন। (চমকে উঠে) কি নাম বললেন?

গুহ। রত্না সেন।

যতীন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, তারপর জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। সকলে তার দিকে দেখতে লাগলেন

গুহ। মিস্ ব্যানার্জ্জী, আপনার বাবা কোথায়?

শীলা। ওপরে মার কাছে সব কথা বলছেন। আনন্দ, একবার দেখবি?

গুহ। আমি একটু আড়ালে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার সঙ্গে ওপরে যেতে পারি কি?

আনন্দ। আসুন না।

গুহ আনন্দের সঙ্গে ভেতরে গেলেন

শীলা। (যতীনকে) শোনো—

যতীন। (সামনে এসে) কি, বল?

শীলা। তুমি তা হ'লে ইভা দত্তকে জানতে?

যতীন। না—

শীলা। না হয়, রত্না সেনকে। ও একই কথা—

যতীন। কি আশ্চর্য্য! রত্না সেনকেই বা আমি জানবো কেমন করে?

শীলা। মিছে তর্ক করো না। তার নাম শুনেই তুমি যে রকম চমকে উঠলে তাতে কারুর জানতে বাকী নেই।

যতীন। (একটু রাগ করে) বেশ, স্বীকার করলাম যে আমি রত্না সেনকে জানতাম। কিন্তু এ কথার এখানেই শেষ হোক্।

শীলা। কি করে এত সহজে এ কথার শেষ হয়ে যেতে পারে ?

যতীন। শীলা, তুমি আমাকে ছোটবেলা থেকে জান। আমাকে বিশ্বাস করো—

শীলা। কি করে বিশ্বাস করি ? তুমি রত্না সেনকে শুধু জানতেই না, খুব ভাল করেই জানতে! তা যদি না হ'ত তা হ'লে তার নাম শুনে তোমার মুখচোখের এ অবস্থা হ'ত না। কতদিন ধরে তুমি তাকে জানতে ? milwards থেকে চাকরী যাবার পর থেকে ? সেইজন্যেই কি গতবছর হঠাৎ আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করেছিলে ? কাজে ব্যস্ত বলে আসতে পারো নি বলেছিলে, সে কি সত্যি ? (যতীন নিরুত্তর) না, সত্যি নয়। আমি বুঝেছি, রত্না সেনকে নিয়ে তখন এত ব্যস্ত ছিলে যে অন্য কিছু করবার আর তোমার সময় ছিল না—(মুখ ঢাকলো)

যতীন। শীলা, তোমার কাছে মিথ্যা বলে কোন লাভ নেই। কিন্তু গত বছরই এর সব শেষ হয়ে গেছে। ৮।১০ মাস আমি তাকে চোখেও দেখিনি। আজ তার আত্ম-হত্যার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

শীলা। (মুখ তুলে) আধঘণ্টা আগে আমিও ভেবেছিলাম আমার সম্পর্ক নেই।

যতীন। নেইই ত। আমাদের কারুরই নেই। আর তাই, ইন্সপেকটরকে কিছু বলো না—

শীলা। কি, তোমার আর রত্না সেনের সম্বন্ধে ?

যতীন। হ্যাঁ। এ বিষয়ে সে কিছু জানে না।

শীলা। (পাগলের মত হেসে) তুমি কী ? বুঝতে পারছো না ইন্সপেক্টর সব জানে ? সে যে কতটা জানে—তা ভাবতেও আমার ভয় হচ্ছে। তুমি দেখে নিও—সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী জানে—দেখে নিও—

যতীন মাথা নীচু করলো। গুহ পর্দা সরিয়ে ঢুকলেন

গুহ। তারপর ?

প্রথম অঙ্কের শেষ

(ক্রমশঃ)

(বিদেশী নাটকের মর্ম্মানুবাদ)

বর্তমান বিজ্ঞানের ইঙ্গিত

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের যে-দিকটা ব্যবহারিক তার সঙ্গেই আমরা বেশি পরিচিত। বিজ্ঞানের জয়গান করি, কেননা নানারূপে সে আমাদের প্রয়োজনপূর্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করছে। লক্ষ হাতে মানুষের সেবা করছে যে আলাদিনের দৈত্য, বিজ্ঞান বলতে ত তাকেই বুঝি। অথচ এই অতি প্রত্যক্ষ, ব্যবহারিক, ফলিত বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদানের পশ্চাতে যে বিক্ষুব্ধ, বৈজ্ঞানিক চিন্তা কাজ করছে এবং সেই সব বিক্ষুব্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তারও পশ্চাৎভূমি যে দার্শনিক মনোভাব তা'র সম্পর্কে আমরা তেমন অবহিত নই। এর প্রধান কারণ অবশ্য এই যে—যা প্রত্যক্ষ, যা রঙ্গমঞ্চে সমাসীন, তেমন আগ্রহ নেই। অন্য কারণ এই যে বিজ্ঞান-উদ্ভূত দার্শনিক ধারণাগুলো অত্যন্ত জটিল এবং দুর্বোধ্য। সাধারণ মানুষের মনন ক্ষমতাকে তা বারবার পর্যুদস্ত করে। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দার্শনিক মতামত কঠিন ও জটিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সহজ ও সুরস করে বলবার চেষ্টা চলছে। বিজ্ঞানের মূল্যবান চিন্তাভাবনাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সজাগ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন আগ্রহশীল সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে দেবার জন্য ওদেশে সাহিত্যের একটা শাখাই গড়ে উঠেছে। যুগান্তকারী সব বৈজ্ঞানিক মতবাদের কতরকম দার্শনিক ব্যাখ্যার ওপরেও কতকরম টীকাটিপন্নী! আলোচনার কি শেষ আছে? ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দু' একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় মাত্র।

আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে পদার্থবিদ্যা। প্রকৃতির যে গণিতিক, পরিমেয়, নীতি-নিয়ন্ত্রিত অংশটি রয়েছে, পদার্থবিদ্যার মধ্যে পাওয়া যায় তার পূর্ণতম রূপ। এইজন্যই পদার্থবিদ্যার এত আদর, অন্যান্য বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলোকেও চেষ্টা করা হয় পদার্থবিদ্যার নীতিকে পরিণত করার। এই পদার্থবিদ্যার রাজ্যে বর্তমানকালে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে আমাদের কাছে সেটাই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। প্রথম যুগের পদার্থশাস্ত্রের পুরোহিতরা ধারণা করে নিয়েছিলেন যে বিশ্ববস্তু এক অলংঘ্য কার্যকারণের শৃংখলে আবদ্ধ। খ-এর কারণ ক; সুতরাং ক-খ-এর সম্বন্ধ চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত হয়ে গেল। ক থেকে সর্বদাই খ উৎপন্ন হবে; ক আর খ-এর মাঝে আকস্মিকের কোন স্থান

নেই। বর্তমানের ঘটনাবলী সার্বিকভাবে অতীতের ঘটনাবলীরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যদি অতীতের সব কিছুর হিসেব আমাদের জানা থাকত, তবে বর্তমানের এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের অবস্থা কাঁটায় কাঁটায় অংক কষে বলে দেওয়া যেতে পারে—এমন একটা মনোভাবের উদয় হয়েছিল পদার্থবিদদের মনে। যন্ত্রের নিয়মের সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মের তুলনা করা হত। যান্ত্রিক গতি ও স্বভাবের ওপর এই নিশ্চিত সশ্রদ্ধ বিশ্বাস চরম পরিণতি লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীতে। সে-যুগের প্রতিনিধি-স্থানীয় এক বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন যে সব বিজ্ঞানেরই মূল লক্ষ্য হচ্ছে যন্ত্রবিদ্যায় পরিণত হওয়া। এই যে একে আর একে দুইয়ের মত বিশ্বপ্রকৃতির সরল, বায়ু ও অভ্রান্ত ব্যাখ্যাগুলো জমে উঠেছিল, তার ওপর মানুষের যেন একটা স্বস্তিকর বিশ্বাস জমে গিয়েছিল। প্রকৃতি যতক্ষণ অংকের হিসেবের মধ্যে থাকে ততক্ষণ সে পরিচিত, নির্ভরশীল, রহস্যের অন্ধকার থেকে মুক্ত। বে-হিসেবী, অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক প্রকৃতিকে আমাদের ভয়। তাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশেই যখন অলংঘ্য অভ্রান্ত কার্যকারণবোধের ওপর বিজ্ঞানের দিক থেকেই সন্দেহ জাগল তখন সেটা যেন অনেক বৈজ্ঞানিকেরও পছন্দ হয়নি। যে অভ্রান্ত নিয়মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই বিস্ময়কর পদার্থবিদ্যা, তার মূলে আঘাতটা তারা সহ্য করতে পারেন নি। কিন্তু সত্যকে ত ঢেকে রাখা যায় না।

প্ল্যাংক যে তত্ত্বটি পেশ করে পদার্থবিদ্যার রাজ্যে এই প্রচণ্ড বিপ্লব বাধালেন আপাতদৃষ্টিতে সে-তত্ত্ব এত নিরীহ যে ভাবতে অবাক লাগে কি করে তা এত মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। প্ল্যাংক যা বললেন, তার মোট কথা এই যে তাপরাশি অবিচ্ছিন্ন ধারায় ছড়িয়ে পড়ে। তাপশক্তি ভিন্ন ভিন্ন অংশে, অসংলগ্ন অবস্থায়, বলা চলে প্রায় লাফিয়ে আপনাকে বিকীর্ণ করছে। 'কোয়ান্টা' (kunta) বলতে বোঝায় এই অসংলগ্ন তাপশক্তিরই অংশগুলোকে। এই আপাতনিরীহ মতটি একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে কোথায় এর যুগান্তকারী তাৎপর্য। বৈজ্ঞানিকরা ধরে তরঙ্গের সঙ্গে পরবর্তী তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য যোগ। প্রকৃতি জগতের মধ্যে কোন ছেদ নেই এ ধারণা দ্বারাই বিবৃত হয়েছিল পুরোন বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যা। প্ল্যাংক এসে যেন ছেদ আবিষ্কার করতে পারলেন এবং তাঁর মত থেকেই শেষ পর্যন্ত জন্ম নিল বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে Principle of uncertainty—অনিশ্চয়তার নীতি। কার্যকারণের সনাতন নীতির বিপরীতে কোটিতে দাঁড়িয়ে আছে এই অনিশ্চয়তার নীতি। পরমাণুর ভেতর প্রোটন ও ইলেকট্রনের যে কাণ্ডকারখানা ঘটছে তাকে সহজবোধ্যরূপে উপস্থিত করবার জন্য বৈজ্ঞানিকরা সৌরজগতের চিত্ররূপ ধার করেছেন। সূর্যকে ঘিরে যেমন গ্রহগুলো ঘুরছে, তেমনি কেন্দ্রস্থ প্রোটনকে ঘিরে পাক খাচ্ছে ইলেকট্রনের ঝাঁক। তফাৎ এই যে কোন গ্রহের, যেমন পৃথিবীর, সূর্য প্রদক্ষিণের গতি আমরা হিসেব করে জেনে দিতে পারি, ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে তা পারি না। অনেকগুলো ইলেকট্রন দল বেঁধে যখন থাকে তখন তাদের সমষ্টিগত একটা অবস্থান ও গতি জানা যায় বটে, কিন্তু বিশেষ কোন একটি ইলেকট্রনের পরিচয় মানুষের কাছে নিতান্ত অস্পষ্ট। একটি ইলেকট্রন কখন কোথায় আছে এবং কি গতিতে ঘুরছে তা একই সময়ে জানা অসম্ভব। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইলেকট্রনকে প্রকাশ করতে অতি তীব্র আলোকরশ্মি প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু ইলেকট্রন এত সূক্ষ্ম পদার্থ যে জোরালো আলোর ধাক্কায় তার চলাফেরা ব্যাহত হয়। বিজ্ঞান যে নিরপেক্ষ দৃষ্টির গর্ব করে এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়, কেননা দ্রষ্টা এখানে তার প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই দ্রষ্টব্যকে তার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত করছে। বলতে পারি না ইলেকট্রনটি কখন কোথায় থাকবে, যদি বলতে যাই তবে হিসেবটা হবে কৃত্রিম। এ অবস্থা দেখে বৈজ্ঞানিকদের কেউ কেউ বলছেন যে ইলেকট্রনের রাজ্যে বোধহয় নিয়মনিয়ন্ত্রণের কঠোর বাঁধন নেই। স্থূল অবস্থায় বস্তুরাশি ধরা দিচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে; তাদের চলাফেরা, হাবভাব কার্যকারণের অমোঘ নিয়তির অধীন। তা যদি না হত তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কথা দূরে থাক আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনই অসম্ভব হয়ে পড়ত। ইলেকট্রনের এই শাসন-না-মানা ভাবভঙ্গি দেখে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ত তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন বস্তুসত্তা বলে অভিহিত করে ফেলেছেন। এতটা অগ্রসর হওয়া বোধহয় যুক্তিযুক্ত নয়।

একপক্ষের কথা বললাম। অন্যপক্ষেও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকরা রয়েছেন। অনিশ্চয়তার নীতিকে তাঁরা অস্বীকার করেন না, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁদের অনুমান ভিন্ন। তাঁরা বলতে রাজি নন যে ইলেকট্রনের রাজ্যে কার্যকারণের শাসন নেই। আইনস্টাইন এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'I cannot believe that god plays dico with the world.' ইলেকট্রন যে নিয়মের অধীন আজকের বিজ্ঞান তার বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারছে না অবশ্য, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আশাহীন হওয়া চলতে পারে না—এমন আশ্বাসবাক্যও ফুটে উঠেছে দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লেখায়। দু'পক্ষেই তর্ক করবার মালমশলা প্রচুর। সে-তর্কের একটা শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত হার্বার্ট স্পেন্সারীয় 'অজ্ঞেয়বাদের' আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। ঈশ্বর আছে কি নেই জানতে পারি না আমরা—বলতেন স্পেন্সার। তেমনি ইলেকট্রনের রাজ্যেও নিয়ম আছে কি নেই জানি না—এমন একটা উক্তি করা যায় বটে। কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধিচাতুর্যের ক্ষণদীপ্তি থাকলেও মনের গভীর কৌতূহল তৃপ্ত হয় না। যতদিন পর্যন্ত নব্যবিজ্ঞানের কাছ থেকে সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছে ততদিন অতৃপ্ত কৌতূহল পোষণ করব আমরা।

একদিকে যেমন ক্ষুদ্র ইলেকট্রনের খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি বৃহৎ গ্রহনক্ষত্র নীহারিকার তথ্যানুসন্ধান চলছে। ইলেকট্রনের বে-হিসেবী চালচলন আঘাত দিয়েছিল প্রতিষ্ঠিত সুখকর ধারণায়, বৃহৎ বিশ্বের তত্ত্বও তার চেয়ে কম আক্রমণাত্মক নয়। একদিন ধারণা হয়েছিল বুঝিবা বিশ্বজগৎ ক্রমাগত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের ফলে যে সব দেশে আর্থিক বাণিজ্যিক উন্নতি হয়েছিল, সেখানকার ভাবুক ব্যক্তিরা ভেবেছিলেন এ উন্নতির বুঝি শেষ নেই। অতি উপাদেয় এহেন আশাবাদকে তাঁরা বিশ্বব্যাপারের

উপরেও প্রয়োগ করেছিলেন। বর্তমান বিজ্ঞান এসে বলছে বিশ্বজগতের গতি উন্নতির দিকে নয়—ধ্বংসের দিকে। গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে সৌরজগৎ, নানা সৌরজগৎ নিয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ, নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে গঠিত মহাবিশ্ব—মনে হয় বিশ্বের বোধহয় সীমা নেই। কিন্তু তা নয়। অসীম বলে কিছু নেই। মহাবিশ্ব প্রকাণ্ড হতে পারে, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। জ্যোতির্বিদরা বলছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সসীম ও বাড়ন্ত। সীমা আছে বলেই সে বাড়ছে, অসীমের ত' বাড়াকমার কোন অর্থই হয় না। বিশ্ব বাড়ছে নামেই প্রচণ্ড তেজ ছড়িয়ে পড়ছে মহাশূন্যে। বস্তুর আন্দোলন থেকে তেজের উৎপত্তি, আর সে-তেজ প্রতি পলে বিকীর্ণ হচ্ছে। তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। যে তাপ ও তেজের এক বিশিষ্ট অবস্থায় জীবসৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, তা, একদিন কমতে কমতে থেমে যাবে মহাশীতলতার মধ্যে। বিশ্বের সেই ঠাণ্ডা মরণকে বৈজ্ঞানিকরা ঢেকেছেন, বলেন—Maximum entropy.

তাহলে শেষ পর্যন্ত কি হল ? কত আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নসাধ মানুষের ! সব কিছুর ওপরেই নেমে আসবে মৃত্যুহিম যবনিকা ! মানুষের মন এ পরাজয় মেনে নিতে চায় না। জড়জগতের এ অবশ্যম্ভাবী পরিণতির বিরুদ্ধে তার আত্মা বিদ্রোহ করে। কিন্তু বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মুখাপেক্ষী সে নয়। ভরসা এই যে, বিশ্বমৃত্যু কতকাল পরে ঘটবে বলে তা নিয়ে আজকে ভাত হবার কিছু নেই। তবু যেন জড়জগৎ মানুষকে ব্যঙ্গ করে বলছে—এত গর্ব কর না, মনে রেখ সেই পরিণাম।

পদার্থজগৎ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ যখন তাকায় নিজের দিকে, সমগ্র জীবনধারার ঘটনাবহুল রূপান্তরের দিকে, তখন যেন সে আশার আলো দেখতে পায়। পদার্থবিদদের মধ্যে যে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে, আধুনিককালের জীবতাত্ত্বিকদের মধ্যে তা অনুপস্থিত। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলে মানুষ নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত তুচ্ছ, কিন্তু যদি মনে করি সেই আদিম এ্যামিবা থেকে চৈতন্যবিশিষ্ট মানুষে উত্তরণের কথা তবে বিস্ময়ে ও বিশ্বাসে মন ভরে ওঠে। জুলিয়াস হাক্সলি বলেছেন—'The highest and richest product of cosmic process is the developed human personality.' এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর কি হতে পারে ! বিদ্রূপপ্রিয় দার্শনিকরাও অবশ্য রয়েছেন। তাঁরা বলবেন—এ্যামিবার চেয়ে মানুষ যে উন্নত সেটা একান্ত-ভাবে মানুষেরই মানদণ্ডের বিচারে, এবিষয়ে এ্যামিবার মতামত জানি না আমরা। বিদ্রূপের উত্তরে পাল্টা বিদ্রূপও করা যেতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা থাক। একটা জিনিস শুধু লক্ষ্য করতে হবে যে, যে-মাপকাঠিতে কেবল নরকেন্দ্রিক (anthropocentric) বলে উড়িয়ে দেওয়া হয় সেটা সম্পূর্ণ একপেশে নয়। জীবেতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে এক এক যুগে এক এক জাতীয় প্রাণীর আধিপত্য ঘটেছে পৃথিবীতে। উভচর জীবের যুগ পার হয়ে এল সরীসৃপের যুগ ; তারপর কিছুকাল চলল স্তন্যপায়ীদের রাজত্ব। সর্বশেষে এল মানুষ, এবং—ইতোমধ্যে কতনা লক্ষ বছর কেটে গেল—ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করল পৃথিবীর ওপর। মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত কোন জীব এসে যদি জীবতত্ত্ব আলোচনা করে তবে সেও স্বীকার করবে যে মানুষই এখন dominant Species. তার বুদ্ধিই মানুষকে জয়ী করেছে। নিশ্চয়ই সে বুদ্ধিবৃত্তি যথেষ্ট নয়। তা যদি হত তবে পৃথিবীতে এত দুঃখদ্বন্দ্ব হানাহানি থাকত না। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীর দুঃখসমাধানের জন্য যাঁরা 'অতি-মানুষের (Superman) কল্পনা করেছেন বর্তমান বিজ্ঞান তাদের সমর্থন করে না। অন্য আকারবিশিষ্ট উচ্চতরবুদ্ধিসম্পন্ন কোন প্রাণী এসে যে মানুষকে হটিয়ে দিয়ে সভ্যতাও সংস্কৃতিকে রক্ষা করবে এমন কোন অনুমানের ভিত্তি পাওয়া যায় না। তবে যদি বলা হয় যে আজকের মানুষই ভবিষ্যতে শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়ে উচ্চতর বুদ্ধিমার্গে আরোহণ করবে তবে তা খুবই যুক্তিসহ। জীববিজ্ঞানীরা তাই বলেছেন যে এতকাল যে ক্রমবিবর্তন চলেছিল বাইরে, এবার তার পীঠস্থান হবে মানুষের অন্তরলোকে। বিজ্ঞানীরা একটা কথা ব্যবহার করেন—Trial and error. ত্রুটিবিচ্যুতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। ভুলের ত শেষ নেই, আর মানুষেরই কি কোন সীমা আছে ?

মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন ওঠে জীববিজ্ঞানের আলোচনায়। জীবন ও জড়পদার্থ।—এর ভেতর কোনটা প্রধান। প্রশ্নটা বোধ হয় ঠিক পেশ করা হল না। জিজ্ঞেস করা উচিত—জীবন কি জড়পদার্থ থেকেই উদ্ভুত, না জড়পদার্থের মতই সে প্রাথমিক ? কি ভাবে প্রথমে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল সে সম্বন্ধে সবাই একমত নন, তবে বর্তমান জীববিজ্ঞানীরা স্পষ্ট বলেছেন যে জড়পদার্থ থেকেই প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল। আমেরিকার জীববিজ্ঞানী সিম্পসন বলেন—'Life is materialistic in nature, জীবন জড়প্রকৃতিগত। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে—তবে কি জীবের নিজস্ব কোন গুণাগুণ নেই, সে কি শেষ পর্যন্ত জড়পদার্থের মতই আপন ইচ্ছাশক্তি শূন্য, বহির্জাগতিক নিয়মের দ্বারা পদে পদে নিয়ন্ত্রিত ? সিম্পসন তাই পরমুহূর্তেই বলেছেন—

"But it (life) has properties unique to itself which reside in its organisation, not its nature.' অর্থাৎ, জীবনের এমন সব গুণাগুণ আছে যা তার প্রকৃতিতে নয়, তার বিশেষ গঠন পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত। অচেতন জগতে দেখতে পাই যে একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত বস্তুটি নিজস্ব গুণে বিশিষ্ট। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে সৃষ্টি হল জলের। কিন্তু সে জল আলাদাভাবে হাইড্রোজেনও নয়, অক্সিজেনও নয়, সে তখন নিজের সত্তায় অধিষ্ঠিত। চেতনপদার্থের মধ্যে এই অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আরও প্রকট ও পরিস্ফুট। মানুষ প্রকৃতিজগতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, সে যখন দৃষ্টিপাত করে বাইরে তখন বলতে পারি যে প্রকৃতিই দেখছে আপনাকে। জড়বস্তুর পরিবর্তন লক্ষ কোটি বছর ধরে চলতে একদিন ফুটে উঠল চৈতন্যের আলোয়, সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যদি কেবল এই বালুকণাসম পৃথিবীর ওপরেই সেই চৈতন্যের একমাত্র অধিষ্ঠান হয়, তবু তার ঔজ্জ্বল্য ও অনন্যতা অনস্বীকার্য।

প্রতিভা-পরিচিতি

সত্যসন্ধানী চার্ল্‌স্ ডারউইন

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নিরলস সাধনায় বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে সত্যানুসন্ধানের দ্বারা যাঁরা মানুষকে নূতন জ্ঞানরাজ্যের তোরণ দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন, নিসর্গবেদী বৈজ্ঞানিক চার্ল্‌স্ রবার্ট ডারউইন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীতে যে-সকল অবিস্মরণীয় গ্রন্থ আছে, যে সকল বই যুগ যুগ ধরে মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে, সত্যানুসন্ধানে প্রবুদ্ধ করেছে, ডারউইনের লেখা "প্রজাতির

চার্ল্‌স্ রবার্ট্ ডারউইন

উৎপত্তি" (Origin of Species) তাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

যৌবনারম্ভে চার্ল্‌স্ ডারউইন ধর্ম্মযাজকরূপে নিজের জীবনকে তৈরী করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জীববৃত্তান্ত অনুধাবন করে তিনি যে কোন দিন পৃথিবীকে কোন এক সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্বকথা শোনাবেন, তা বোধ করি তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। এমনিই হয়। কোন্ মানুষের প্রতিভা যে কবে কেমন করে কোন্ পথে বিকাশ ও সার্থকতা লাভ করবে, তা অনুমান করা কোনদিনই কারুর পক্ষে সম্ভব হয় না।

১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের শ্রুস্‌বেরি নগরে তাঁর জন্ম। বংশগরিমায় ডারউইন-পরিবার সে-অঞ্চলে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। চার্ল্‌স্ ডারউইনের ঠাকুরদাদা ইর‍্যাস্‌মাস্ ডারউইন (১৭৩১-১৮০২) তাঁর সময়কালে শুধু একজন বড় ডাক্তারই ছিলেন না, কাব্য-রচনাতেও তাঁর হাতযশ ছিল বহুদূর বিস্তৃত। পিতাও ছিলেন ডাক্তার, বড় ঘরে বিয়ে
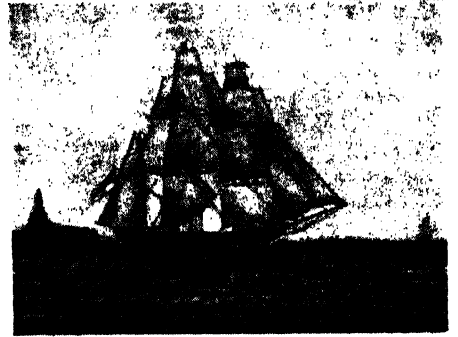
অর্ণবপোত "বীগ্‌ল্"। এই জাহাজে ডারউইন পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন

করে ডাঃ রবার্ট ডারউইন শুধু মোটা যৌতুকই পান নি, সমাজে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিলেন প্রভূত।

চার্ল্‌স্ ডারউইনের মা মারা যান তাঁর আট বছর বয়সে। ছেলের মনে শোক যাতে গভীর না হয় সেজন্যে তাঁর বাবা তাঁকে নানা আমোদ প্রমোদের মধ্যে ভুলিয়ে রাখলেন। মাছ ধরা, পাখীর বাসা তৈরী করা, বনভোজন, গানবাজনা, আরও কত কি। বাপের আদুরে ছেলে যাকে বলে। ফলে, বালক ডারউইন দুষ্টামিও শিখেছিলেন নানাপ্রকার। ন' দশ বছর বয়সে ডক্টর বাট্‌লারের ইস্কুলে তাঁকে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হল। কিন্তু সুবিধা হল না মোটেই। ডারউইন পরবর্ত্তীকালে লিখেছেন—

৮

"ইস্কুলের পড়া আমার ধাতে কোনদিনই সহ্য হয় নি। ডাঃ বাটলারের বিদ্যালয় আমার কাছে ব্যর্থ হল।"

ষোলো বছর বয়সে ইস্কুল থেকে বেরুলেন। মানে তাঁকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হল। পিতা ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন—"বাঁদর হলে তুমি শেষ পর্য্যন্ত! কুকুর নিয়ে খেলা, মাছ ধরা আর ইয়ার্কি মেরে বেড়ানো। আমাদের এত বড় বংশের কলঙ্ক হোলে তুমি।"

ডাক্তারি পড়বার জন্যে তাঁকে অতঃপর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হল। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থতা। মড়াকাটা-ঘরে দাঁড়িয়ে চাল্‌স্ ডারউইন বমি করতে লাগলেন। ডাক্তারি পড়াও সইল না।

তাহলে ধর্ম্মযাজক ছাড়া আর কোন কাজের উপযুক্ত তিনি নন—এই

এক দুরবর্ত্তী সমুদ্রকূলে দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ সংগ্রহে ব্যাপৃত ডারউইন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জাহাজের কাপ্তেন সেগুলি নিরীক্ষণ করছেন

সিদ্ধান্তে পৌঁছে তাঁর বাবা তাঁকে ধর্ম্মযাজকদের শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। সেখানে তিনি প্রফেসর হেন্‌সলোর সান্নিধ্যে এসে জীব-বৃত্তান্তের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করলেন। গ্রীক্ ও লাতিন শেখার চেয়ে তিনি ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যায় বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জ্জন করলেন। এই সময় তিনি নানা কীট পতঙ্গ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। বিশেষ করে' গুব্‌রে পোকা সংগ্রহ করবার কাজে তাঁর প্রবল ঝোঁক দেখা যেত। "ব্রিটিশ কীট পতঙ্গের ছবি" নামে একটি ছবির বইএর মধ্যে যখন তাঁর সংগৃহীত একটি গুব্‌রে পোকার ছবি ছাপা হল তখন তাঁর উল্লাস আর ধরে না। এই ঘটনা সম্বন্ধে ডারউইন লিখে-ছিলেন—"কোন কবির প্রথম কবিতা ছাপার অক্ষরে দেখলে কবির যে আনন্দ হয়, একটি গুবরে পোকার ছবির নীচে আমার নাম দেখে সেই রকম দুর্লভ আনন্দ লাভ করেছিলাম। সেদিনটি ভোলবার নয়।"

কিছুদিন পরে বাড়ী ফেরবার পর ডারউইন অধ্যাপক হেন্‌স্‌লোর কাছ থেকে এক পত্র পেলেন: কাপ্তেন ফিজরয়ের নেতৃত্বে 'বীগল্' নামে এক জাহাজ নানা বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের কাজে পৃথিবী প্রদক্ষিণে বেরুচ্ছে। সেই জাহাজে এক জীবতত্ত্ববিদের পদ খালি আছে, ডারউইন ইচ্ছা করলে সেই পদ নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন।
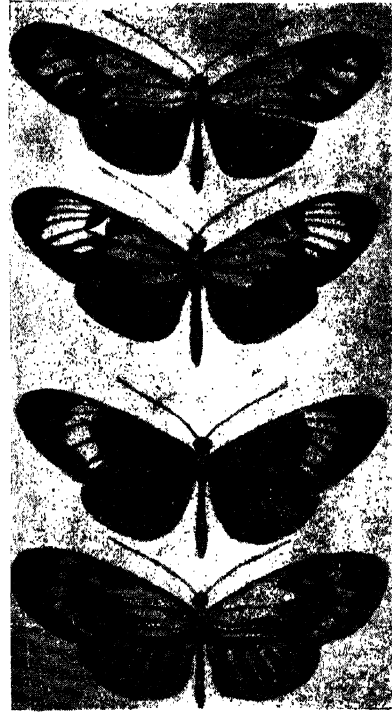
ডারউইনের সংগৃহীত কয়েকটি বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতি

বিপুল আবেগে স্পন্দিত হলেন ডারউইন। দেশের বহু স্থানে ঘুরে তিনি নানা চারা গাছ, খোলস, পোকামাকড় সংগ্রহ করেছিলেন, এইবার যদি পৃথিবীর সুদূরতম প্রদেশ থেকে আরও নানা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ পূর্ণ হয়।

পিতা বাধা দিলেন। কিন্তু জ্ঞাতি-খুড়া যোশিয়া ওয়েজ্‌উড তাঁকে উৎসাহ দিলেন এবং তাঁর বাবাকে বুঝিয়ে বললেন। তখন যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ হল। ১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ডারউইন 'বীগল্' জাহাজে আরোহণ করলেন।

পাঁচ বছর ধরে কত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন তিনি তার যেন আর শেষ ছিল না। বহু দূরবর্ত্তী এক বন্দর থেকে এক পত্রে তিনি

লিখলেন—"আমার জীবন যেন এক দুর্ব্বার ঝড় আর বিপুল বিস্ময়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। এক মিনিটও আমি অলস হোয়ে বসে নেই। জাহাজ যখন চলছে তখন লিখছি, যখন কোন দেশে নামছি তখন নানা বিচিত্র প্রাণীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, আর ছোট খাটো কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ করার কাজে সময় কেটে যাচ্ছে।"

১৮৩৬ সালের অক্টোবর মাসে 'বীগল' দেশে ফিরলো। এই সমুদ্র-যাত্রায় ডারউইন একক জীব-বৃত্তান্তের নানা বিভাগে যে গবেষণা করে-ছিলেন এবং যে-সব দুষ্প্রাপ্য প্রজাতি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেছিলেন তা একজন-মাত্র বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অসাধ্য সাধন বলা যেতে পারে।

পরবর্ত্তী তিন বৎসর ধরে ডারউইন তাঁর সংগ্রহগুলির নামকরণ এবং তাঁর দক্ষিণ আমেরিকা ও প্যাসিফিক মহাসাগর ভ্রমণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লেখবার কাজে ব্যাপৃত রইলেন। বইখানির নাম দিলেন—"এক নিসর্গবেদীর পৃথিবী-ভ্রমণ।"

* *

১৮৩৯ সালে তিনি বিবাহ করলেন। দূরসম্পর্কের খুড়তুতো বোন এমা ওয়েজ্‌উডকে বিবাহ করে তিনি লণ্ডনের ১২ নম্বর আপার গাওয়ার ষ্ট্রীটে বাসা বাঁধলেন। কিন্তু লণ্ডনে তাঁর শরীর টিক্‌লো না। পেটের পীড়ায় তিনি কাবু হয়ে পড়লেন। তখন স্বাস্থ্যের জন্যে কেণ্ট শহরের ডাউন নামক গ্রামে তাঁর বাসস্থান ঠিক করা হল। ১৮৪২ সালে তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং প্রথম সন্তানকে নিয়ে সেখানে চলে গেলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই কলকোলাহলহীন নির্জ্জন গ্রামের বাড়ীতেই তিনি ছিলেন।

ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও ডারউইন অদম্য সাধনায় প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় মগ্ন থেকে জীববিদ্যা সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করলেন। মাঝে মাঝে রয়াল সোসাইটির সভায় সেই প্রবন্ধগুলি পড়া হত, জীববিদ্যায় সিদ্ধকাম বৈজ্ঞানিকরূপে তাঁর খ্যাতি তখন সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণার পর একদিন স্যর চার্লস্ লায়েলের সঙ্গে ডারউইন এক সুদীর্ঘ আলোচনা করলেন। লায়েল ছিলেন তখনকার দিনের সবচেয়ে নামকরা ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিত। ডারউইন তাঁর প্রবন্ধগুলি লেখার সময় প্রায়শই তাঁর মতামত এবং পরামর্শ নিতেন। আলোচনার পর লায়েল সন্তুষ্ট হোয়ে ডারউইনকে বিস্তারিতভাবে তাঁর মতামতগুলি দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করবার পরামর্শ দিলেন। সেই পরামর্শ অনুযায়ী ডারউইন লিখতে আরম্ভ করলেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত বই—"অরিজিন অফ স্পীসিস।"

বইখানি আধাআধি লেখা হয়েছে এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সুদূর মালয় থেকে এক পত্র পেলেন। পত্র লিখছেন অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস্। ব্রিটিশ জীবতত্ত্ববিদ ও বৈজ্ঞানিক রাসেল পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে ১৮৫৪ সালে মালয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হ'য়ে সেখানেই তাঁর সাধনার ক্ষেত্র তৈরী ক'রে বহু রকমের জীবজন্তু ও প্রাণীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। "ডারউইন-তত্ত্ব" নামে ওয়ালেস পরবর্ত্তীকালে যে-গ্রন্থ লিখেছিলেন সেই বইখানিতে ডারউইনের মতবাদকে প্রকৃষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পত্রের সঙ্গে ছিল একটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধ প'ড়ে ডারউইন স্তম্ভিত হলেন। এ যে তাঁরই সমস্ত মতবাদের মূলকথার পুনরাবৃত্তি! ডারউইন লিখছেন—"একজনের মতবাদের সঙ্গে আর-একজনের মতবাদের এমন অদ্ভুত ঐক্য এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! ওয়ালেস যদি তাঁর রচনা আমার কাছে না পাঠিয়ে কোন বিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রকাশ ক'রে দিতেন তাহলে আমার সমস্ত মৌলিক গবেষণা মাঠে মারা যেতো।"

ডাউন গ্রামে ডারউইনের বাসভবন

ওয়ালেস পত্রে লিখেছিলেন—"আপনার লেখাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প'ড়ে আপনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েছি। তাই আমার একটি গবেষণার ফল আপনাকে উপহার দিলাম। যেমন ইচ্ছা, কাজে লাগাতে পারেন।"

ডারউইন ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিলেন না, ছিলেন না সংকীর্ণমনা। অন্য কেউ হয়ত ওয়ালেসের প্রবন্ধটি আত্মসাৎ করতে কালবিলম্ব করত না। কিন্তু ডারউইন তৎক্ষণাৎ সেই রচনার প্রাপ্তি স্বীকার করে উত্তর দিলেন। তারপর দুই খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বন্ধু ও পরামর্শদাতা, লায়েল ও হুকারকে সেই প্রবন্ধ দেখালেন। তখন লায়েল ও হুকারের চেষ্টায় দুই দূরদেশের দুই জীববিজ্ঞানীর মিতালি সংঘটিত হল এবং তাঁদের দু'জনের সংযুক্ত নামে তাঁদের স্নেই সুময়কার গবেষণার ফলাফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।

১৮৫৮ সালের ১লা জুলাই বিখ্যাত বিজ্ঞান-পরিষদ লিনিয়ান

সোসাইটির বিশেষ সভায় যখন সেই যুগান্তকারী গ্রন্থ পড়া হল তখন গ্রন্থকারের দু'জনের কেউই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না। ওয়ালেস ছিলেন মালয়ে, আর ডারউইন ছিলেন উদরাময়ে শয্যাশায়ী। লায়েল এবং হুকার গ্রন্থকারদ্বয়কে অভিনন্দন জানিয়ে সেই সভায় তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় দিলেন এবং তাঁদের মতামত জানিয়ে বললেন যে ডারউইন-ওয়ালেসের গবেষণা জীববিদ্যায় নূতন যুগের সূচনা করল। নানাদেশের বৈজ্ঞানিক ও বহু বিজ্ঞানের ছাত্র সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১৮৫৯ সালে ডারউইনের "প্রজাতির উৎপত্তি" প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণের ১২৫০ কপি বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিনেই নিঃশেষ হোয়ে গেল। বিগত দুশো বছরের মধ্যে পাশ্চাত্যদেশে যত বই বেরিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচনা হয়েছে এই গ্রন্থ নিয়ে। তুমুল
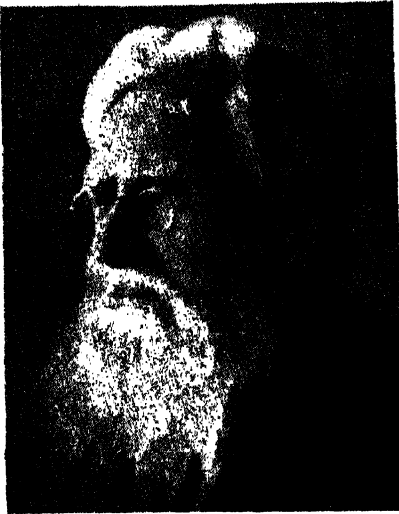
ডারউইনের সহযোগী বৈজ্ঞানিক অ্যালফ্রেড ওয়ালেস্

সমালোচনার ঝড় উঠেছে এই গ্রন্থকে কেন্দ্র ক'রে। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-পুস্তকের মতবাদকে অগ্রাহ্য ক'রে এই বই লেখা হয়েছে, এই গ্রন্থে ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করা হয়েছে, দেবতাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মানুষকে কীট-পতঙ্গ-জন্তুর উত্তর-সন্তান বলে তার প্রতি চরম অপমান বর্ষণ করা হয়েছে— এমনি অভিযোগ উঠ্‌ল চারিদিকে বিশেষ ক'রে ধর্ম্মযাজক মহলে।

এই গ্রন্থ নিয়ে ১৮৬০ সালে অক্স্‌ফোর্ডে বিখ্যাত ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় এক নাটকীয় ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল। সে-সভায় ডারউইন উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা সেই সভায় তাঁর মতবাদকে আক্রমণ ক'রে তাঁকে নস্যাৎ করে দেবেন, মতলব করেছিলেন। সেই আক্রমণের পুরোভাগে ছিলেন অক্স্‌ফোর্ডের কুখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজক বিশপ্ উইলবারফোর্স। তাঁর বাগ্মিতা বড় কম ছিল না। কিন্তু ডারউইনের পক্ষে ছিলেন তাঁরও চেয়ে জবরদস্ত বৈজ্ঞানিকের দল, যথা, হাক্স্‌লে, হুকার, লায়েল, কার্পেণ্টার, আসাগ্রে, র‍্যামসে, জুলস এবং বুট। প্রত্যেকেই ছিলেন যাকে বলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত। তাঁদের সমর্থনের তোড়ের কাছে উইলবারফোর্সের মতবাদ এবং তাঁর অনুগামীদের চীৎকার অচিরেই শূন্যে মিলিয়ে গেল। ডারউইনের মতবাদ খণ্ডিত হ'ল না।

* *

১৮৬৪ সালে রয়েল সোসাইটি তাঁকে কোপ্‌লে পদক দান করে সে যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে তাঁকে স্বীকার করে নিলেন। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সত্তরটি বিজ্ঞান-সংস্থা তাঁকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক মাননীয় সভ্যের পদ প্রদান করে সম্মানিত করলেন। ১৮৭৭ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল, এল, ডি উপাধির দ্বারা অভিনন্দন জানালেন। এই একটি মাত্র অনুষ্ঠানে ডারউইন উপস্থিত হয়েছিলেন। সেনেট হল ছাত্রদের ভীড়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। ডারউইন সভায় প্রবেশ করবামাত্র চারিদিকে সে কী তুমুল হর্ষধ্বনি আর হাততালি। ডারউইন কিছু বিহ্বল হোয়ে পরে বিনীতভাবে সকলকে অভিবাদন জানালেন। একটি দুষ্ট ছাত্র সেই সভায় এক মজার ব্যাপার করেছিল, মঞ্চের উপরে কড়িকাঠের কাছে সে এক প্রকাণ্ড খড়ের বানর ঝুলিয়ে দিয়েছিল এবং লাল সালু দিয়ে তার নীচে লিখে দিয়েছিল—"মিসিং লিংক" (অর্থাৎ যে প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি)।

পর পর বই লিখতে লাগলেন ডারউইন। সে সময় তাঁর প্রত্যেকটি বইএর চাহিদা ছিল অফুরন্ত। "মানুষের অবতরণ" তাঁর আর একটি বিখ্যাত বই। লেখবার ষ্টাইল তাঁর ভাল ছিল না। অনেক সময় ভাষা হোঁচট খেতো, ফলে ভাবপ্রকাশের অসুবিধা বোধ করতেন তিনি। মাঝে মাঝে নিজেই নিজের উপর বিরক্ত হ'য়ে বলে উঠ্‌তেন—"কি বলতে চাও তুমি, ভাল করে বল। লেখার মধ্যে এত জড়তা কেন?"

ক্রমান্বয়ে, ভূবিদ্যা (Geology), উদ্ভিদবিদ্যা (Botany), জীববিদ্যা (Biology), প্রাণিবিদ্যা (Zoology) এবং পতঙ্গবিদ্যা (Entomology) সম্বন্ধে নানা গবেষণার পর শেষ জীবনে তিনি নিরালায় গ্রামের বাড়ীতে ব'সে উদ্ভিদবিদ্যার চর্চ্চায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন। অবসর সময়ে উপন্যাস পড়তেন। গল্পের বই পড়াই ছিল তাঁর একমাত্র নেশা। যে সব ঔপন্যাসিক তাঁদের কাহিনীগুলি মিলনের দ্বারা সুখপাঠ্য করতেন তাঁদের প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করতেন তিনি। বিয়োগান্ত গ্রন্থ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।

১৮৮১ সালে ডারউইন হার্টের অসুখে কাতর হ'য়ে পড়েন। লণ্ডনে কিছুদিন চিকিৎসার পর তিনি গ্রামের বাড়ীতে ফিরে আসেন। কিন্তু সামলে উঠতে পারলেন না। ১৮৮২ সালের ১৯শে এপ্রিল হৃদযন্ত্র চিরকালের মতো বিকল হ'ল। তাঁর শেষ কথা হল—"মরতে আমার মোটেই ভয় করছে না।"
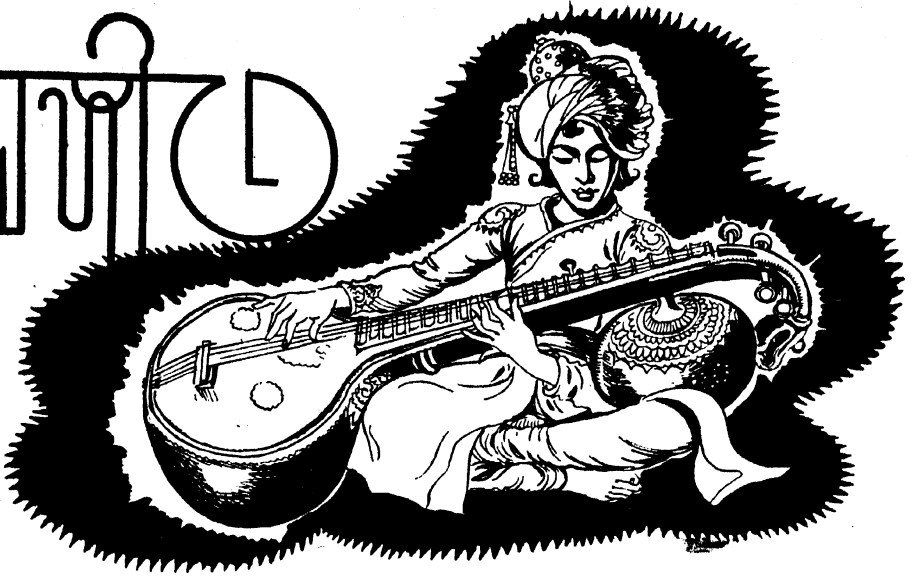
ভৈরবী—কাওয়ালী

করুণার সাগরেই ডুবে আছি নিশিদিন
যেন তা' স্মরি-প্রভু যেন তা' স্মরি
নিরন্তর অবিরাম হৃদয়েই তব ধাম
যেন তা' স্মরি প্রভু যেন তা' স্মরি !
সুখ দুখ যাহা কিছু পেয়েছি জীবনে
এত প্রয়োজন ছিল বুঝিব কেমনে
কিছু নহে নিষ্ফল বেদনা-নয়নজল
যেন তা' স্মরি প্রভু যেন তা' স্মরি !

তাই মোর কাজ জানি নশ্বর জীবনে
যে কাজ দিয়েছ তুমি তাহারি সাধন
না গণিয়া লাভ-ক্ষতি ফলাফল আর
তাহারি সাধন রাখি' তোমাতেই মন ।
স্থির জানি একদিন হবে হবে জয়
ভকতজনের কভু নাশ নাহি হয়—
একদিন ডেকে লবে দিবে বরাভয়
যেন তা' স্মরি প্রভু যেন তা' স্মরি ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি ঃ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, বাণীকণ্ঠ

০ ১ ২´ ৩
II দ্‌া ণ্‌া ণ্‌া সা | সা সা ঋা -ণা | সা জ্ঞা জ্ঞা রা | জ্ঞা রা জ্ঞা -সা I
ক রু ণা র্‌ সা গ রে ই ডু বে আ ছি নি শি দি ন্‌

সা ঋা সা সা | সা -ঋা মা মা | জ্ঞা রা জ্ঞা ঋা | সা -া -া -া I
যে ন তা স্ম রি ০ প্র ভু যে ন তা স্ম রি ০ ০ ০

পা পা পা -া | পা ণদা পা -া | জ্ঞা রা জ্ঞা -মা | জ্ঞা ঋা সা -া I
নি র ন্ত র্‌ অ বি রা ম্‌ হৃ দ য়ে ই ত ব ধা ম্‌

দ্‌া ণ্‌া সা সা | সা ঋা মা মা | জ্ঞা রা জ্ঞা ঋা | সা -া -া -া II
যে ন তা স্ম রি ০ প্র ভু যে ন তা স্ম রি ০ ০ ০

II { পা -া মা -া | ণদা দা দা ণা | র্সা র্সা র্সা সণা | র্সা -া র্সা -া I
সু খ্‌ দু খ্‌ যা০ হা কি ছু পে য়ে ছি জী জী ০ নে ০ }

দা ঋর্া ঋর্া ঋর্া | ঋর্া -া ঋর্া ঋর্া | র্সা ণদা ণা র্সা | জ্ঞঋর্া -া র্সা -া } I
এ ত প্র য়ো জ ন্‌ ছি ল বু ঝি০ ব কে ম ০ ০ নে ০ }

[সা]
{ পা পা পা পা | পা -া পা -ণা | ণা ণা দা দা | মপা -া মা -া } I
কি ছু ন হে নি ষ্‌ ফ ল্‌ বে দ না ন য় ন্‌ জ ল্‌ }

সা ঋা সা সা | সা -ঋা মা মা | জ্ঞা রা জ্ঞা ঋা | সা -া -া -া II
যে ন তা স্ম রি ০ প্র ভু যে ন তা স্ম রি ০ ০ ০

II { দ্‌া -া দ্‌া ম্‌া | দ্‌া -া দ্‌া ণ্‌া | ণ্‌া -সা সা -া | সা সা সা -া I
তা ই মো র্‌ কা জ্‌ জা নি ন ০ শ্ব র্‌ জী ব নে ০ }

দ্‌া দ্‌া -ঋা ঋা | ঋা ঋা ঋা ঋা | সা ণ্‌া দ্‌া ঋা | সা -া -া -া I
যে কা জ্‌ দি য়ে ছ তু মি তা হা রি সা ধ ০ ন্‌ ০

সা পা পা পা | পা -া পা ণা | দা দা পা -া | মা -া -া -া I
ন গ ণি য়া লা ভ্‌ ক্ষ তি ফ লা ফ ল্‌ আ ০ র্‌ ০

সা ঋা সা সা | সা -ঋা মা মা | জ্ঞা জ্ঞা ঋা -া | সা -া -া -া } II
তা হা রি সা ধ ন্‌ রা খি তো মা তে ই ম ০ ন ০ }

II { পা -া মা মা | ণদা -া দা -ণা | র্সা র্সা ঋর্া ণা | র্সা -া -া -া I
স্থি র্‌ জা নি এ ক্‌ দি ন্‌ হ বে হ বে জ ০ য়্‌ ০ }

দা ঋর্া ঋর্া ঋর্া | ঋর্া -া ঋর্া ঋর্া | র্সা -দা দা ঋর্া | সা -া -া -া } I
ভ ক ত জ নে র্‌ ক ভু না শ্‌ না হি ক্ষ ০ য়্‌ ০ }

{ জ্ঞর্া -া জ্ঞর্া -া | র্রা র্রর্সা ণা ণা | পা ণা র্সা জ্ঞর্ঋা | র্সা -া -া -া } I
এ ক্‌ দি ন্‌ ডে কে০ ল বে দি বে ব রা০ ভ ০ য়্‌ ০ }

সা ঋা সা সা | সা -ঋা মা মা | জ্ঞা রা জ্ঞা ঋা | সা -া -া -া II
যে ন তা স্ম রি ০ প্র ভু যে ন তা স্ম রি ০ ০ ০

বাজিকর

ফরাসী গল্প : লেখক আনাতোল ফ্রাঁস

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ফ্রান্সের সিংহাসনে রাজা তখন লুই—সেই সময়কার কথা···

বারনেভি বাজিকর খুব গরীব···সহরে সহরে ঘুরে বাজি দেখায়···বাজি দেখিয়ে সামান্য যা পায়, তাতেই চলে তার খাওয়া-পরা।

আকাশ যেদিন পরিষ্কার থাকে—সেদিন পথে একখানা পুরোনো কার্পেট পাতে—পেতে বাজি দেখায়। বাজি দেখাবার আগে যেমন দস্তুর—হাত পা মাথা নেড়ে সে খানিকটা বক্তৃতা দেয়···এ বক্তৃতায় নতুন কথা কিছু নেই ···বাজিকররা চিরকাল যেমন খেলার আগে লোকের তাক লাগাবার জন্য মজার মজার আষাঢ়ে গল্প ফাঁদে, তারি মামুলি সংস্করণ। দুচার জন লোক পেলেই সে বাজি সুরু করে···তারপর দেখতে দেখতে কত রকমের মানুষ এসে জড়ো হয়···আসে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েরা···আর আসে যে সব মানুষের কাজ নেই, কর্ম্ম নেই—কুড়ের দল।

বারনেভি অনেক রকমের খেলা দেখায়···নাকের উপরে রাখে টিনের প্লেট···রেখে নাচে···লাফায়···প্লেট পড়ে যায় না। নাকের ডগায় খাড়া করে রাখে ছড়ি···নাকের ডগায় সেই ছড়ি খাড়া রেখে ঘুরপাক খায়—ছড়ি পড়ে যায় না—দেখে লোকজন হাসে, খুব বাহবা দেয়।

আরো কত রকম খেলা—দুহাতের উপর দেহের ভর রেখে মাথা নীচু করে পা দুটো তোলে শূন্যে—হাতে হেঁটে চলে···ছ-ছটা তামার বল নিয়ে দুহাতে ছোঁড়ে, ছুঁড়ে বলগুলো লুফতে থাকে! কখনো ঝুঁকে নীচু হয়ে পায়ের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে বারোখানা খোলা ছুরির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে—তখন দর্শকদের বুক যত কাঁপতে থাকে, ততই হাততালির ঘটা পড়ে যায়।

এত রকম খেলা দেখিয়েও বেচারী পয়সা যা পায় অতি সামান্য। সে পয়সায় কোনো মতে দুবেলা অন্নের সংস্থান হয়···বেশী পয়সা কে-বা দেবে? পথে নিজে থেকে খেলা দেখায়···কোনো লোক তাকে বাড়ীতে ডাকে না। পথের লোক যারা দেখে, তাদের মধ্যে দুচার-জনের মায়া হয়, দয়া হয়···তারাই সামান্য কিছু-কিছু দেয়।

সেজন্য কারো উপরে তার নালিশ নেই···কোনোদিন নিশ্বাস ফেলে ভগবানের কাছেও দুঃখ জানায় না যে—কেন ঠাকুর, তুমি আমায় ছাখো না!

সে খাটতে পারে। খাটতে কখনো কাতর নয়। বেলা দশটা থেকে খেলা দেখাতে সুর করলো···লোকের পর লোক যায় আসে···যতক্ষণ একটি লোকও দাঁড়িয়ে দেখে—বারনেবি সমানে খেলা দেখায়। শ্রান্তি জানে না যেন।

অভাব লেগেই আছে—তবু কখনো খেলায় ফাঁকি দেয় না···চুরি জুচ্চুরি দাঙ্গা এ-সব বারনেভি জানে না—ও কাজে তার দারুণ ঘৃণা। পেটে খাবো—পরের জিনিষ চুরি করবো কি—তাতে মহাপাপ! পরের জিনিষে লোভ নেই—পরের ভাগ্যে হিংসা নেই—আশ্চর্য্য সরল মানুষ।

দুনিয়ায় তার কেউ নেই। মা বাপ মারা গিয়েছে ছোটবেলায়—ভাই বোন নেই। মা বাপ মারা গেলে এক বাজিকর তাকে দেয় আশ্রয়···তার ফাইফরমাশ খাটতো—তার জিনিষপত্র বইতো—তার বাজি দেখাবার সময় বারনেভি লাঠি বাঁশ ছড়ি বল—এগুলো দিত এগিয়ে ···আর সে খেলা দেখাবার আয়োজন করলে বারনেভি

চীৎকার করে সে খবর প্রচার করতো—আসুন আবার মজার বাজি খেলা দেখবেন আসুন···লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন। বাজিকরের খেলা দেখে দেখে আপনা থেকেই সে এসব খেলা শিখেছে। বাজিকর মারা যাবার সময় তার যা সম্পত্তি ছিল—বল, লাঠি, পুরোনো প্লেট, ডিশ—ঐ ছেঁড়া কার্পেটখানা—এগুলো সে দিয়ে গেছে বারনেভিকে। এইগুলোই তার জীবিকার সহায়—এই-গুলো নিয়েই তার পৃথিবী।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় গির্জ্জায় যাওয়া চাই—তার ব্যতিক্রম হয় না কখনো। উপাসনার মর্ম্ম বোঝে না—গির্জ্জায় হাঁটু মুড়ে বসে চোখ বুজে মেরি-মায়ের উদ্দেশে নতি করে প্রার্থনা জানায়—মা মা মা—দেবী···যতদিন বাঁচবো, আমাকে দেখো মা—অধর্ম্মে যেন কখনো না মতি হয় আমার—আর এর পরের জন্মে আমাকে অনেক পয়সা দিয়ো মা, সৌভাগ্য দিয়ো মা···

*   *   *   *

সেদিন সন্ধ্যাবেলা—আকাশে মেঘ জমেছে—খেলা বন্ধ করে জিনিষপত্র সেই ছেঁড়া কার্পেটে জড়িয়ে ঘাড়ে তুলে বারনেভি চলেছে পথে···যদি বৃষ্টি আসে—কোথাও একটু আশ্রয়ের সন্ধান···হঠাৎ দেখা গির্জ্জার এক পাদরি সাহেবের সঙ্গে···বারনেভি যেদিকে চলেছে, পাদরিও চলেছেন সেইদিকে। পাদরিকে বারনেভি খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে নতি জানালো—নতি জানিয়ে বললে—ছাতা নেই সঙ্গে···জল এলে ভিজবেন যে ঠাকুর!

পাদরি তার দিকে চাইলেন, বললেন—তোমার এ কি অদ্ভুত সাজ-পোষাক গো—এঁ্যা···আবার সবুজ রঙ করা পোষাক! কোথাও নাটক করতে চলেছো না কি? ক্লাউন সাজবে?

মুখে সলজ্জ হাসি,···বারনেভি বললে—আজ্ঞে না ঠাকুর, আমি বাজিকর···পথে মাঠে বাজি-খেলা দেখিয়ে বেড়াই—বাজি দেখিয়েই যা দুচার পয়সা রোজগার—তাতেই পেট চলে যায়···

পাদরি বললেন—তোমার কে আছে?

—কেউ না ঠাকুর, কেউ না—মা বৌ ছেলেমেয়ে—কেউ না। একা মানুষ।

পাদরি বললেন—একা মানুষ যদি তো এ-কাজ করো কেন? একা মানুষ গির্জ্জায় এসে থাকতে পারো—ভগবানকে ডাকবে—মেরি-মায়ের পূজা—সাধুসেবা এই সব করো। দুটি অন্ন সেখানে মিলবেই—তোমারো জীবন হবে সার্থক—ভগবান আর সাধুসেবা নিয়ে থাকো···

কথাটি লাগলো বারনেভির মনে। তাইতো, একা মানুষ···ভগবানকে ডাকতে পারবো তো—তাহলে এজন্মে পাপ অধর্ম্ম—এ-সব থেকে রক্ষা পাবো···পরের জন্মে কত সুখ সৌভাগ্য হবে।

সে বললে, ঠিক কথা বলেছেন ঠাকুর। আমাকে খুব জ্ঞান দিয়েছেন। কিন্তু কি জানেন ঠাকুর—মুখ্যুসুখ্যু মানুষ ও সব পূজার মন্ত্রতন্ত্র কিছুই তো বুঝি না—তাই বাজি খেলায় টাকা পয়সা রোজগার—লাঠি নাকের ডগায় তুলে বাজি দেখাই। এই কাজই শিখেছি—পারি। তাই এই নিয়েই থাকি। পেটটা চালাতে হবে তো—ভিক্ষা চাইতে পারবো না—চুরি করতেও পারবো না।···আপনি বলছেন চার্চ্চে থাকার কথা। আমি মুখ্যু মানুষ···আমি চাইলেও আপনারা ঠাকুর, আমাকে চার্চ্চে থাকতে দেবেন কেন? সাধে রোদে-জলে পথে পথে ঘুরে বাজি দেখিয়ে পেটের সংস্থান করি!

পাদরি বললেন—চলো তুমি, আমি তোমাকে রাখবো আমাদের চার্চ্চে। চার্চ্চের সঙ্গে আমাদের মঠ আছে—সেই মঠে তুমি থাকবে।

বারনেভি খুব খুশী। সে বললে—আজ এখনি যাবো আপনার সঙ্গে?

—হ্যাঁ—আজ এখনি।

—আঃ ঠাকুর···আমাকে বাঁচালেন আপনি!

বারনেভি এলো পাদরির সঙ্গে তাঁর মঠে। মঠে অনেক সেবক···ভ্রাতৃসঙ্ঘ···সকলে ভাই···ব্রাদার।

সেই রাত্রি থেকেই মঠে তার নূতন জন্ম যেন!

পরের দিন সকালে উপাসনা—উপাসনার পর পাদরি সাহেব ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন বারনেভিকে মেরি-মাতার করুণা মহিমার কথা। সন্ন্যাসধর্ম্মে হলো বারনেভির দীক্ষা—বারনেভি আজ থেকে এখানকার ভ্রাতৃসঙ্ঘে একজন ভাই।

বারনেভির কত নিষ্ঠা···কত ভক্তি! সন্ধ্যার আরতির সময় একাগ্র দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে মেরি-মাতার মূর্ত্তির

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

অলস

ফটো : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

উর্দ্ধে

ফটো : কনক দত্ত
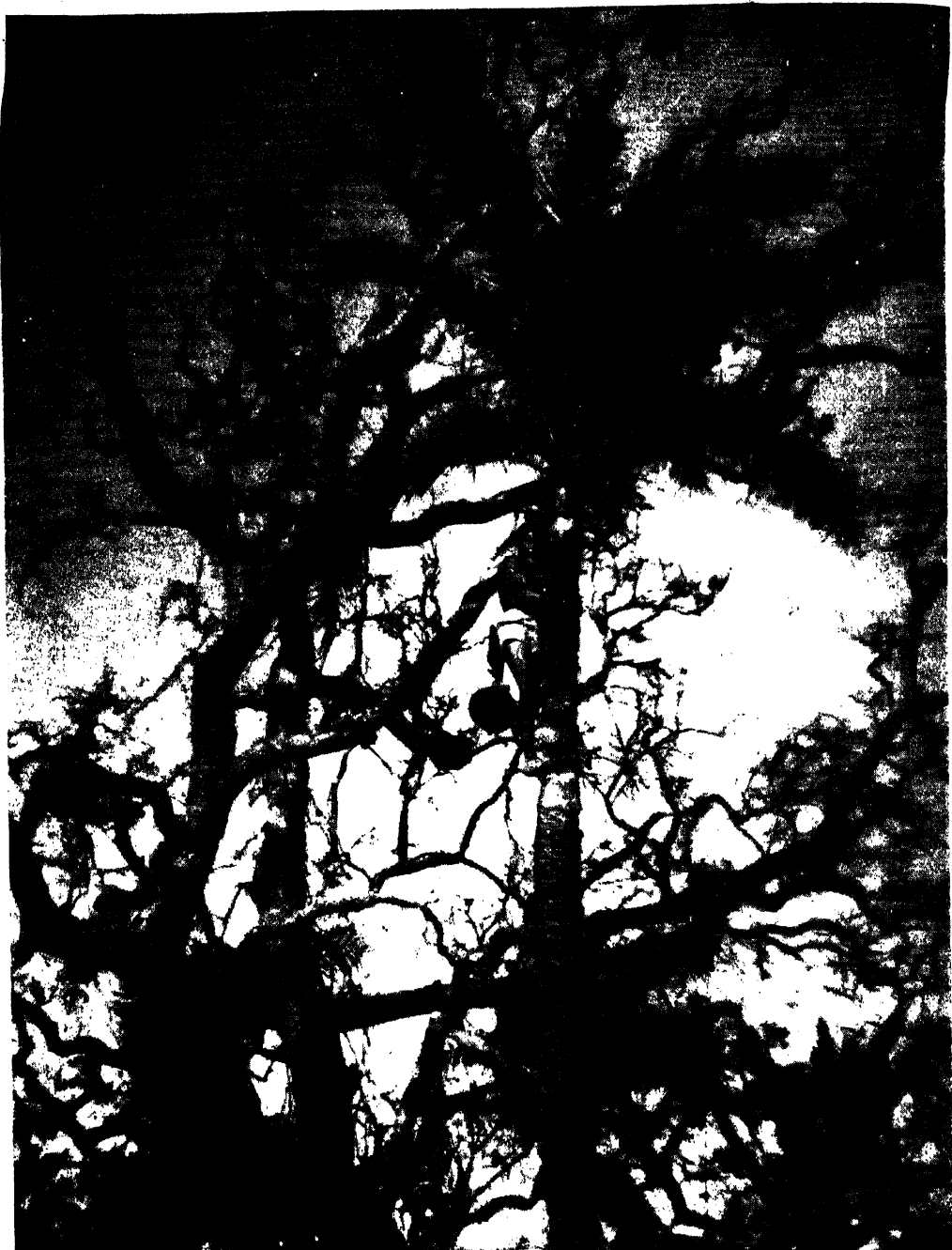
দিকে—মনে হয়, মায়ের দু'চোখে যেন দীপ্তি—অধরে যেন প্রসন্ন হাসি—পাথরের মূর্ত্তি যেন জীবন্ত! তার মনে কি সুখ···কি আনন্দ···বাহিরের পৃথিবী ভুলে গেল বারনেভি···

দিন পনেরো পরে···

মনে কেমন অস্বস্তি···মঠে এতগুলি সেবক-ভাই··· কিন্তু জনে জনে কী রেষারেষি—ভক্তিতে কে বড়··· কার ভক্তি কতখানি খাঁটী—তাই নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে তর্ক বিবাদ।

মঠের অধ্যক্ষ সেই পাদরি একখানি গ্রন্থ লিখছেন—মেরি-মাতার মহিমার কথা বুঝিয়ে···

সেদিন সকলে বসে আছে, পাদরি বললেন—আমার লেখা খাতাখানি আনো মরিস—

ব্রাদার মরিস নিয়ে এলো মোটা খাতা। অধ্যক্ষের লেখা খাতা দেখে ভালো একখানি খাতায় সে লেখা মরিস খুব পরিষ্কার করে আবার লিখে রাখে—লেখা খাতা এলো।

মরিস আলোচনাচ্ছলে বললে অধ্যক্ষকে—খাতার পাতায় পাতায় আমি ছবি এঁকেছি—দেখেছেন—

ছবি দেখা হলো—মেরি-মাতার কখানা ছবি—তাছাড়া সলোমন রাজার সিংহাসনের ছবি—সে সিংহাসনে দেবরাণীর সাজে বসে আছেন মেরিমাতা—মায়ের পায়ের কাছে চারটি সিংহ প্রহরী। মায়ের মাথায় মুকুট—সে মুকুটের মণির জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে সপ্ত সাগরকে উদ্বেলিত করে তুলেছে—আকাশে উড়ন্ত পায়রার ঝাঁক—সাদা পায়রা। এরা হলো দেবীর করুণা, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, বিবেক, জ্ঞান, দৃষ্টি—মায়ের পাশে ছজন কুমারী···মায়ের সঙ্গিনী। এঁরা হলেন নম্রতা, অভিজ্ঞতা, সাধনা আত্মদান, পবিত্রতা, বশ্যতা।—আরো কত ছবি পাতায় পাতায়—তারপর ব্রাদার মার্বো···তিনি ভাস্কর—পাথরের কত মূর্ত্তি। তৈরী করেছেন নিজের হাতে···মেরি-মাতার নানা ভাবের মূর্ত্তি—কোনো মূর্ত্তিতে দেবী হাস্যময়ী সরলা বালিকা—কোনোটিতে বৈরাগিণী সন্ন্যাসিনী—কোনোটিতে জগতের ধাত্রী···পায়ের কাছে কোলের কাছে কত মানবশিশু—

কবি আছেন—মাতা-মেরির নামে কত ছন্দে কত-না বন্দনা গান রচনা করেছেন—বারনেভি মঠে থেকে চার্চ্চে ঘুরে এই সব সাধুর সেবায় মন ঢেলে দিয়েছে—তাদের সব কথা সে শোনে—মানে বোঝে—আর এটুকুও বুঝেছে ভক্তির বহর নিয়ে ব্রাদারদের মধ্যে কি ভয়ানক রেষারেষি চলেছে।

ধর্ম্মের মন্দিরে সাধুর মঠে—সেখানেও এমনি রেষারেষি! বারানেভির মন অস্থির হয়, চঞ্চল হয়। ভগবান কি তবে ভক্তির মাপ করে তবে মানুষকে রক্ষা করেন? আজন্মের সংস্কার এতে সায় দিতে চায় না। সাধুদের উপর তার মনে কেমন সংশয় জাগলো—ভয়ও। একা সে চার্চ্চের বাগানে মঠের বাগানে ঘুরে বেড়ায়—অশান্ত মন কেবলি ভগবানের উদ্দেশে বলে—আমি তাহলে কি করে তোমার কৃপা পাবো। সাধন জানিনা পূজন জানিনা···ভক্তি দেখাবো কি করে প্রভু? না জানি লিখতে, না জানি ছবি আঁকতে, না পারি মূর্ত্তি গড়তে—তবে? তবে আমার কি সামর্থ্য কি শক্তি আছে—যা দেখিয়ে তোমাকে দেবো আনন্দ? পাবো তোমার কৃপা?

একথা ভেবে তার মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। সব সময়ে সে মলিন মুখে থাকে—কারো সামনে যেতে কুণ্ঠা হয়। সে ভাবে—আমি নিঃস্ব—আমি রিক্ত···

সেদিন মঠের পাদরি কাহিনী বলছিলেন—এক ধার্ম্মিকের কাহিনী। তিনি বললেন—একজন মূর্খ লোক—সামান্য মানুষ—দিনমজুরী করে খেতো—ভগবানের উপর তার যেমন বিশ্বাস তেমনি ভক্তি। মেরিমাতার পায়ে মাথা নতি জানিয়ে সে শুধু বলতো—মা গো, আমি মূর্খ—মন্ত্র জানি না, মন্ত্রের মানে বুঝি না—তোমাকে শুধু মনে প্রাণে ভক্তি করি, বিশ্বাস করি···আমার মনের সেই ভক্তি বুঝে তুমি আমাকে কৃপা করো। তোমাকে আনন্দ দেবো কি দিয়ে—এমন কিছু আমার নেই!···এ ছাড়া দেবীর কাছে তার আর কোনো কথা ছিল না। এই কটি কথা দেবীকে সে জানাতো—সেই কটি কথাই বেরুলো। তার মুখ থেকে তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সময়—মরণ কালেও দেবীর কাছে এই কটি কথাই ছিল তার নিবেদন। সকলে দেখলো সেই কটি কথা তাজা গোলাপফুল হয়ে পড়লো দেবীর চরণে।

বারনেভি শুনলো এ কাহিনী—তার মনে যেন আ

ফুটলো—তার সব দুঃখ নিমেষে যেন উবে গেল! সে পেলো উপায়! ঠিক যা তার আছে, তাই সে নিবেদন করলো নিষ্ঠাভরে দেবীর চরণে।

পরের দিন সকালে সে চললো চার্চে উপাসনা করতে··· এক ঘণ্টা ধরে সেদিন উপাসনা—দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আবার চললো চার্চে—আবার উপাসনা সেই এক ঘণ্টা ধরে—সেদিন থেকে সে চার্চে যেতে লাগলো উপাসনা করতে···ব্রাদারদের সকলের উপাসনা শেষ হলে তাঁরা চার্চ থেকে চলে আসবার পর···

সকলের মনে কৌতূহল—হঠাৎ ওর হলো কি? কি এমন মন্ত্র পেলো? কি এমন জ্ঞান? যার জন্য—

পাদরি চললেন তত্ত্ব জানতে। এসে তিনি দেখেন দরজা ভেজানো—দরজার ফাটলে চোখ রেখে তিনি দেখেন—

দেবীর মূর্ত্তির সামনে বারনেভি তার সেই সব বাজির কসরতি দেখাচ্ছে···নাকের ডগায় লাঠি রেখে ঘুরে ঘুরে নাচ—দুহাতে দেহের ভর রেখে মাথা নীচু আর দু পা উঁচু করে মূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ···দুটা বল নিয়ে লোফালুফি···

পাদরি সাহেবের বুক উঠলো দুলে···এ কি অনাচার—দেবীর অমর্য্যাদা—মন্দিরে কলুষ! দরজা ঠেলে তিনি ঢুকলেন মন্দিরে···ডাকলেন—বারানেভি—

চমকে বারানেবি ফিরে তাকালো।

অধ্যক্ষ বললেন—এ কি তোমার অনাচার···মন্দির কলুষিত করছো তোমার এই হীন ইতর খেলায়! যাও, এখনি বেরিয়ে যাও—মন্দিরে মঠে তোমার স্থান হবে না আর।

বারানেভির দু চোখে জল। সে বেরিয়ে যাবে—পাষাণ মূর্ত্তি ভেদ করে দেবী নেমে এলেন করুণাময়ী জননীর রূপে—এসে নিজের বসনের প্রান্ত দিয়ে স্বহস্তে মুছিয়ে দিলেন বারনেভির চোখের জল।

দেখে পাদরি লুটিয়ে পড়লেন দেবীর পায়ে···বললেন—আমাকে ক্ষমা করো মা—জ্ঞানের স্পর্দ্ধায় আমি অপরাধ করেছি—সরল বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করে তোমারো অমর্য্যাদা করেছি মা!

দেবী বললেন—অন্তর দিয়ে যে আমাকে ডাকে, তাকেই আমি দেখা দিই। গভীর জ্ঞানের মন্ত্র···শিল্প-কলার কৌশল দেখিয়ে আমাকে পাওয়া যায় না—তর্কে আমাকে পাওয়া যায় না—সরল মনের বিশ্বাস আর অকপট ভক্তিতে আমি ধরা না দিয়ে থাকতে পারি না!

ঘাস

(Pai-chu-yi থেকে)

অনুবাদক—জীবনকৃষ্ণ দাশ

লম্বা ও সবুজ ঘাস বছর বছর
হয় আর মরে যায়,
আবার বসন্তে দেখি ঠিক মাথা তোলে।
আগুনে পোড়াও তারে
কতদিন?
আর বার যে কে সেই ফাল্গুন প্রভাতে।

ঘাসের কোমল গন্ধ রাজপথ ভরে
একদিন এ পথের ছিল কী বাহার!
এবে এক আশ্চর্য্য সবুজ
ঢেকে দেয় নগরীর সংগ্রামের ক্ষত।
বাতাসের আন্দোলনে থেকে থেকে ঘাস
প্রণাম জানায় যতো মৃতের উদ্দেশে;

দৃঢ় প্রাচুর্য্যের সাথে তারপর প্রতীক্ষা তাদের
জনতার লাগি—যে জনতা আসিতেছে যুদ্ধ শেষ করে।

সোভিয়েট অতিথিবৃন্দ—

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন ও সোভিয়েট সভাপতি-মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মঃ ক্রুসেভ গত ২৯শে নভেম্বর যখন কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে নিম্নলিখিত রুশীয় নেতৃবৃন্দও আসিয়াছিলেন—সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বিভাগের প্রধান মঃ ওয়ামকমভক, রুশিয়ার সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী মঃ মিখাইলভ, কৃষি বিভাগের উপমন্ত্রী মঃ বাসুলভ, উজবেক সোসালিষ্ট রিপাবলিক সভাপতি-মণ্ডলীর প্রধান এস-আর-রসিদো, উজবেকিস্তানের সাংস্কৃতিক দপ্তরের উপমন্ত্রী মাদাম রহিমবান ইভা ও ভারতস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মিঃ এম-এ, মেনসিভস্ক। ভারতের শিল্পদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো ও রুশিয়াস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীকে-পি-এস-মেনন সর্বদা তাঁহাদের সঙ্গে আছেন। তাহা ছাড়া ১০ জন ক্যামেরাম্যান সহ ২৪ জন রুশ সাংবাদিক ঐ দলে ঘুরিতেছেন। রুশিয়ার নেতৃদ্বয় একা আসেন নাই—সদলে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন। ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কলিকাতায় অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা—

৩০শে নভেম্বর কলিকাতার গড়ের মাঠে সোভিয়েট নেতা বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভকে যে বিরাট জনসভায় সম্বর্দ্ধনা করা হয়, তাহাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনেহরু কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে বলিয়াছেন—"কলিকাতার অধিবাসীগণ সোভিয়েট অতিথিবর্গকে যে বিপুল অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন, বিশেষতঃ যে ভাবে তাঁহারা চমৎকার শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কলিকাতাবাসীগণকে আমার ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাইতেছি। এই ঘটনা সরকার, পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতারও একটি অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত। কলিকাতা যাহা করিয়াছে, তাহা অভিনব। পৃথিবীর আর কোথাও ইহার পুনরাবৃত্তি হইবে কিনা সন্দেহ।" পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। তাঁহার মত অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

সোভিয়েট ভারত সংবাদ—

তৈল শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার জন্য ভারত হইতে প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থীকে শীঘ্রই সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রেরণ করা হইবে। দেশের তৈল সম্পদ সন্ধান সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় এই ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। মাদ্রাজে মার্শাল বুলগানিনের সহিত যাইয়া সোভিয়েট সহকারী কৃষিমন্ত্রী মঃ রসুলভ মাদ্রাজের কৃষিমন্ত্রী শ্রীভক্ত বৎসলমকে একদল কৃষি বিশেষজ্ঞ সহ সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শনের আমন্ত্রণ করিয়াছেন। মঃ রসুলভ মাদ্রাজে তুলা, ধান ও আলু চাষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বোম্বায়ে যে উচ্চতর টেকনোলজিকাল ইনিষ্টিটিউট স্থাপনে ভারত সরকার আয়োজন করিয়াছেন, সে বিষয়ে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়া যাইবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার কারিগরী সাহায্যের কর্মসূচি অনুযায়ী রুশিয়া ঐ সাহায্য দান করিবে। রাশিয়ার সহিত ভারতের সম্পর্ক এই ভাবে ঘনিষ্ঠতর হইতে চলিয়াছে।

রাসিয়া হইতে ডাক প্রেরণ—

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভ যে কয়দিন ভারতে ছিলেন, প্রত্যহ তাঁহাদের জন্য রাসিয়া হইতে স্পেশাল বিমানযোগে চিঠিপত্র ও রুসীয় সংবাদপত্রাদি আসিত। তাঁহারা ভারত ভ্রমণ কালে যে সকল উপহার পাইতেন, সেগুলি ঐ বিমানে প্রত্যহ রাসিয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বিদেশে থাকিয়াও প্রত্যহ মস্কোর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ছোট সংবাদ হইতে তাঁহাদের রাজ্যশাসন ব্যবস্থার উন্নতির কথা বুঝা যায়। সারাদিন ভ্রমণ, বক্তৃতা, সম্বর্দ্ধনা লাভ প্রভৃতির মধ্যেও তাঁহারা স্বদেশ-শাসনের নিত্য কার্য্য সম্বন্ধে অনবহিত থাকিতেন না—ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য।

সৌদী আরবের রাজার সহৃদয়তা—

১লা ডিসেম্বর সৌদী আরবের রাজা সৌদ যখন কুফরীতে 'লোকনৃত্য দর্শন করিয়া সিমলায় ফিরিতেছিলেন, তখন একটি মুরগী তাঁহার গাড়ীতে চাপা পড়িয়া মারা যায়। রাজা মুরগীর মালিক এক বৃদ্ধাকে মুরগীর জন্য ২ শত টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন। সিমলায় তাঁহার আগমনের দিন অভ্যর্থনার সময় যে সকল বালক-বালিকা পথের ধারে দাঁড়াইয়াছিল চাঞ্চল্যের ফলে তন্মধ্যে একটি বালিকা ভিড়ের চাপে আহত হয়—তখনই তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। রাজা ঐ সংবাদ পাইয়া বালিকাটিকে হাজার টাকার উপহার ও হাসপাতালে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। রাজার মত কাজ বটে।

সৌদী আরবের রাজার ভারত ভ্রমণ—

রুসিয়ার নেতৃগণের আসার সময়েই সৌদী আরবের রাজা সৌদ ও গত ২৭শে নভেম্বর দিল্লী পৌঁছিয়াছেন। তিনি ভারতে ৯৭ দিন থাকিয়া বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আরব ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন রহিয়াছে—সেই বন্ধনকে দৃঢ়তর করিয়া বৈষয়িক ব্যাপারে তাহার প্রয়োগ করাই রাজা সৌদের আগমনের উদ্দেশ্য। আরব এসিয়ার একটি বড় অনুন্নত দেশ। ভারতের সাহায্যে তাহার বহুমুখী উন্নতির ব্যবস্থা

হইলে উভয় দেশই উপকৃত ও সমৃদ্ধ হইবে। রাসিয়ার নিকট যেমন আমরা শিল্পোন্নয়ন শিক্ষা করিব, তেমনই তাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শিখাইবার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। রাজা সৌদের চেষ্টায় সে পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করুক, ইহাই আমরা কামনা করি।

২৫০০তম বুদ্ধ জয়ন্তী—

আগামী বৎসর (১৩৬৩ সাল) বুদ্ধ পুর্ণিমা হইতে ২৫০০তম বুদ্ধ জয়ন্তী আরম্ভ হইবে। তদুপলক্ষে ভারতের সকল বৌদ্ধ তীর্থে বিরাট উৎসব সম্পাদিত হইবে। ভারতসরকারের শিক্ষা দপ্তরের অন্যতম সচিব ডাঃ মনোমোহন দাস গত ২রা ডিসেম্বর প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ উৎসব উপলক্ষে ভারত সরকার বৌদ্ধ জগতের শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভারতে আমন্ত্রণ করিবেন। কানাডা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, জার্মানী, গ্রেট বৃটেন, যুগোশ্লাভিয়া, জেকোশ্লোভাকিয়া, সোভিয়েট রুশিয়া, ইন্দোচীন, ফ্রান্স, জাপান, চীন, সিংহল, ব্রহ্ম, নেপাল প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ আসিবেন। এই বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও ভূপালের মুখ্যমন্ত্রীত্রয়—৪ জনকে লইয়া এক কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই সাংস্কৃতিক মিলনের দ্বারা ভারতের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির মৈত্রী বন্ধন দৃঢ়তর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা—

গত ১লা ডিসেম্বর দিল্লীতে রাজ্যসভায় ছাত্রদের মধ্যে বর্তমান শৃঙ্খলার অভাবের কথা আলোচিত হইয়াছিল। সহকারী শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার শ্রীমালি জানাইয়াছেন—অর্থনৈতিক কারণ, নির্বাচনী অভিযানে ছাত্রদের নিয়োগ, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির ত্রুটি, শিক্ষকদের বেতনের স্বল্পতা, ছাত্রদের প্রতিভাস্ফুরণের উপযোগী ব্যবহার অভাব—প্রভৃতি কারণে ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়। যাহাতে কোন রাজনীতিক দল নির্বাচনী অভিযানে ছাত্রদের নিয়োগ না করেন, সে জন্য তিনি সকলকে বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলেন। কেন্দ্রীয় সরকার ছাত্রদের খেলাধুলা, উন্মুক্ত স্থানে অভিনয় প্রভৃতির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে ছাত্ররা শিক্ষকদের সহিত অধিক মেলামেশার সুযোগ পাইবে ও তাহার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা কমিয়া যাইবে।

কলিকাতায় নেপালের রাজা ও রাণী—

ভারত সরকারের নিমন্ত্রণে নেপালের রাজা ও রাণী ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দিল্লী হইতে ইলোরা গুহা, সাঁচী স্তূপ ও মহা-বালীপুরমের মন্দিরাদি দেখিয়া ১লা ডিসেম্বর কলিকাতায় আগমন করেন। ৪ঠা ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহার সম্মানার্থ এক সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা মাইথন, কোনার ও তিলায়া দেখিয়া যাইবেন। কলিকাতার পূর্বে তাঁহারা গয়ায় গিয়াছিলেন। নেপাল ভারতের উত্তর সীমান্তস্থিত রাজ্য। নেপালে বহু খনিজ দ্রব্য ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ আছে—নেপালের সহিত ব্যবসা দ্বারা ভারত ও নেপাল উভয় দেশেরই সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। এ অবস্থায় নেপাল-রাজ কর্তৃক ভারত পরিদর্শন নানাদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমাদের বিশ্বাস, এই পরিভ্রমণের ফলে উভয় দেশ উপকৃত হইবে।

আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন—

প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর গত ২রা ডিসেম্বর ৭৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে এক অনাড়ম্বর উৎসব হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে তিনি ভারত সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত হিন্দী-ইংরাজি অভিধান সঙ্কলন কার্যে অন্যতম সম্পাদক আছেন। এ বৎসর তিনি ২ খানি বাংলা পুস্তকও রচনা করিয়াছেন—(১) চিন্ময় বঙ্গ (২) ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস। আচার্য সেন বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠতম মণীষীদের অন্যতম। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস—

দিল্লীর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য গত ১লা ডিসেম্বর হইতে তিন মাসের ছুটী লওয়ায় উক্ত আদালতের অন্যতম বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ ভারতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। সুধীরঞ্জন কলিকাতা হাইকোর্টেরও অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। দিল্লীতে একজন বাঙ্গালীর স্থলে অপর একজন বাঙ্গালীর নিয়োগ বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের কথা। আমরা সুধীরঞ্জনের সুদীর্ঘ, কর্মময় জীবন কামনা করি।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৫৬ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি গত ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে তাঁহার বাজীরাও নাটক প্রশংসিত হইয়াছিল। তিনি বহু উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পরিচালনার সহিতও তিনি দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহার এই সম্মানলাভে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য—

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৫৬ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'রামানন্দ অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়াছেন। চপলাবাবু শুধু সাংবাদিক নহেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য সর্বজন বিদিত। যাঁহাদের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, চপলাকান্ত তাঁহাদের অন্যতম এবং বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা শিক্ষার ব্যাপারে প্রধান পরিচালক। তাঁহার নিয়োগে গুণীকেই সম্মানিত করা হইয়াছে।

শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক পদ 'স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক' নামে অভিহিত। ঐ পদে সম্প্রতি শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ মহাশয়কে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইনি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক।

মহিলা প্রধান অধ্যাপক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার স্থলে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি ভাষার অধ্যাপিকা মিস এ, জি-ষ্টোককে 'স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় প্রধানের পদে এই প্রথম একজন মহিলাকে নিযুক্ত করা হইল।

নরসিংহ দাস পুরস্কার লাভ—

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থের লেখককে নগদ এক হাজার টাকা ও একটি ডিপ্লোমা প্রদত্ত হইয়া থাকে। গত বৎসর বিজ্ঞান-ভারতী নামক পুস্তকের লেখক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ঐ "নরসিংহদাস আগারওয়ালা" পুরস্কার ও ডিপ্লোমা পাইয়াছিলেন। গত ২৬শে নভেম্বর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তাঁহাকে সম্মানিত করা হইয়াছে। এ বৎসর 'চীন দেখে এলাম' পুস্তকের লেখক খ্যাতনামা বাঙ্গালী কথা-সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু ঐ পুরস্কার লাভের জন্য মনোনীত হইয়াছেন। মনোজবাবু ভারতবর্ষের লেখক—তাঁহার এই সম্মানে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

নূতন দশমিক মুদ্রা—

নূতন দশমিক মুদ্রা আইন পাশ হইয়াছে। গত ৩০শে নভেম্বর দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ—নূতন মুদ্রার নিম্নলিখিতরূপ নামকরণ হইবে—নূতন আইন বলবৎ হইলে নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করা হইবে। (১) এক টাকা অথবা একশত নয়া পয়সা (২) আট আনা বা ৫০ নয়া পয়সা (৩) চারি আনা বা ২৫ নয়া পয়সা (৪) দশ নয়া পয়সা (৫) পাঁচ নয়া পয়সা (৬) দুই নয়া পয়সা ও (৭) এক নয়া পয়সা—এই ৭ রকম মুদ্রা প্রস্তুত হইবে। এক টাকা, আট আনা ও চারি আনা নিকেলে, এক নয়া পয়সা ব্রোঞ্জে এবং বাকী মুদ্রাগুলি তাম্র ও নিকেলে প্রস্তুত করা হইবে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ দশমিক মুদ্রা প্রথা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতেও তাহা চালু হইল। প্রথম ২।৪ বৎসর ইহার ব্যবহারে অসুবিধা হইবে বটে। কিন্তু পরে তাহা আর থাকিবে না।

মহিলাদের বেকার সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গে বহু মহিলা, বিশেষ করিয়া উদ্বাস্তু মহিলা সহায় সম্বলহীন অবস্থায় নিজেরা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে চাহেন। উদ্বাস্তু মহিলাদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা শিবিরে নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবস্থা অত্যন্ত কম। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকার মহিলাদিগকে ফিতা তৈয়ারী শিক্ষা দানের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি সম্বলিত কোন স্থানে একটি শিক্ষাকেন্দ্র ও কারখানা স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৩২ জন মহিলাকে ৬ মাসকাল ধরিয়া ঐ কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে—শিক্ষাগ্রহণ কালে শিক্ষার্থিনীরা মাসিক ২৫ টাকা ভাতা পাইবেন। শিক্ষার পর তাঁহাদিগকে স্বাবলম্বী করার জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে বা শিল্পে সরকারী সাহায্য পরিকল্পনা মাধ্যমে মূলধন ঋণ দেওয়া হইবে। এই ভাবে একদল মহিলাকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারিলে বেকার সমস্যা কমিবে।

নেকওয়ালের ঘটনার ক্ষতিপূরণ—

পাক-ভারত সীমান্তে নেকওয়াল নামক স্থানে পাকিস্তানী পুলিশ কর্তৃক কয়েকজন ভারতীয় সৈন্য বিনা দোষে নিহত হইলে সে বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকদল কর্তৃক তদন্ত হয়। তদন্তে পাকিস্তান দোষী সাব্যস্ত হয়। তদন্তের পূর্বে পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছিলেন—তদন্তের ফলে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাঁহারা সেজন্য ভারতকে ক্ষতিপূরণ দান করিবেন। কিন্তু এখন পাকিস্তান সরকার তাহা লইয়া টালবাহানা করিতেছেন। এ বিষয়ে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের পত্রের কোন উত্তর দেন নাই। শ্রীজহরলাল নেহরু গত ৫ই ডিসেম্বর রাজ্য-সভায় এ বিষয়ে পাকিস্তানের আচরণ অদ্ভুত ও নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার পর রাষ্ট্রসংঘ এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।

বেত ও বাঁশের কাজ শিক্ষা দান—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি এদেশে বেত ও বাঁশের দ্বারা আসবাবপত্র তৈয়ারী সম্পর্কে উৎসাহদানের জন্য জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি অঞ্চলে একটি শিক্ষা-দান-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঐ কেন্দ্রে ১০০ জন যুবককে ৬ মাস করিয়া বৎসরের ২ শত জনকে উক্ত শিল্প শিক্ষা দান করা হইবে। শিক্ষা গ্রহণকালে তাহারা ২৫ টাকা করিয়া ভাতা পাইবে। ঐ উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়ের জন্য ১৩ হাজার টাকা, শিক্ষক প্রভৃতির ভাতার জন্য ৩২ হাজার টাকা ও কাঁচা মাল খরিদের জন্য ২৫ হাজার টাকা ভারত সরকার দিবেন ও রাজ্য সরকারও ঐরূপ টাকা ব্যয় করিবেন। এই সকল শিল্প শিক্ষা করিয়া একদল যুবক যদি অন্নসংস্থান করিতে সমর্থ হয়, তদ্দারা দেশ লাভবান হইবে এবং মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষের চাহিদাও মিটিবে।

লোকসভায় উদ্ভূত সংকট—

১লা ডিসেম্বর দিল্লীতে লোকসভার অধিবেশনে যখন সংবিধান সংশোধনী বিল সিলেক্ট কমিটীতে প্রেরণের প্রস্তাব হয়—তখন কংগ্রেস দলের বহু সংখ্যক সদস্য সভা গৃহে উপস্থিত না থাকায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। সেদিন লোকসভার বহু সংখ্যক সদস্য দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন—লোকসভার হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কিন্তু ভোট

দানের সময় উপস্থিত ছিলেন না। অনেক মন্ত্রীও ঐ ভাবে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু সেজন্য বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিয়া অনুপস্থিত (অথচ দিল্লীতে বাসকারী) সদস্যদের এক পত্র দিয়াছেন। ভারতীয় লোকসভার সদস্যগণ যদি এরূপ দারিত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন, তবে সাধারণ মানুষ কি শিক্ষা লাভ করিবে॥

মৃৎ শিল্পের উন্নয়ন—

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকট সাধারণ চিক্কণ মৃৎ শিল্প উন্নয়নের জন্য একটি পটারী স্থাপন সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। রাণাঘাট অঞ্চলে বহু মৃৎশিল্পী আছেন। তাঁহাদের শিক্ষা ও কাজের মাধ্যমে এই কার্য্য করা হইবে। এই ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকার ৭৫ ভাগ অর্থ দিবেন—বাকী টাকা রাজ্য সরকার দিবেন। বাঙ্গলা দেশের মাটীর কাজ প্রায় বন্ধ হইতে চলিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্বেও হাজার হাজার কুম্ভকার ঐ কার্য্য দ্বারা জীবিকার্জন করিতেন। নূতন করিয়া এই শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে, আবার হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হইবে। আমরা এই নূতন প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

পাক-আফগান বিরোধ—

গত ২৭শে নভেম্বর করাচীতে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের সহিত আফগানিস্তানের বিরোধ কি ভাবে মীমাংসা করা যায়. সে বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন। আফগান সীমান্তে আফগানগণ পাকতুনিস্থান গঠন করিতেছেন। পাকিস্তানের বিশ্বাস, ঐ ভাবে আফগানগণ পাকিস্তানের কিয়দংশ নিজেদের এলাকা বলিয়া দাবী করিতেছেন। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে পাক-সরকার পাকতুনিস্তান গঠনে বাধা দিতেছেন। সে বাধাদান চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় বর্তমানে ইস্কান্দার মির্জা গোল-টেবিল বৈঠক ডাকিয়া ঐ সমস্যার সমাধান করিতে চান। মার্শাল শা মামুদ খাঁ ও মার্শাল শা ওয়ালি খাঁ প্রভৃতির মত শক্তিশালী আফগান নেতারা এই মীমাংসা প্রস্তাবে কোন সাড়া দেন নাই। ফলে এখন ইস্কান্দার মির্জা চিন্তিত হইয়াছেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। আফগান-নেতারা কি পাকিস্তান লাটের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন ?

উদ্বাস্তু বালকবালিকাদের শিক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু বালকবালিকাদের জন্য রাজ্যে বহু সংখ্যক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সম্প্রতি ঐ সকল বিদ্যালয়ের তিনশত জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বুনিয়াদি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ জন্য রাজ্য সরকার ৫২৫০৯ টাকা ব্যয় করিবেন—সে টাকা ভারত সরকার হইতে পাওয়া যাইবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মাসিক বেতন সাড়ে ৫৭ টাকা ছাড়া শিক্ষাগ্রহণ কালে মাসিক ৩০ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন না হইলে দেশ কখনই সমৃদ্ধ হইবে না, গান্ধীজি সে কথা চিন্তা করিয়াই বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুনিয়াদি প্রথায় সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত করিতে পারিলে হয়ত মানুষের বর্তমান মনোবৃত্তি চলিয়া গিয়া দেশবাসী প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করিবে।

ঘুমের পরশ

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সুপ্তি যখন আসে তাহার,
সেরূপ নেহারি,
চাঁপা ফুলের সুরভি তার,
কমল বনের বিজন শোভা,
অধরকোণে, লুকিয়ে থাকে,
চরণঘিরি, উঠে ফুটে,
তাহারে হেরিয়া
মাটীর ধূলিতে
যে মূরতি হেরি'
পূজার লাগিয়া,
নয়ন দুটী ছেয়ে,
মনে নাহি হয়,

মাটী মায়ের মেয়ে,—
অলক লয়ে করে খেলা,
আপনমাঝে পাতে মেলা,
যূথি ফুলের হাসি
কুসুম রাশি রাশি,—

মনে হয় যেন, নন্দন বনশোভা,
উঠেছে ফুটিয়া অনুপমা, মনোলোভা,
পুলকিত হই,
মনের গহনে চুপে,
অর্ঘ্য সাজাই
আরতি গন্ধ ধূপে।

ভাবান্তর

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

ভূতোকে কেউ দেখতে পারে না। তার দুষ্টুমির জ্বালায় পলতাপোঁতার লোক অস্থির। গ্রামের সমস্ত অকাজ কুকাজের মূল সে।

ভূতো বাপ মা'কে হারায় পাঁচ বছর বয়সে। সেই থেকে তাকে মানুষ করেন সন্তানহীনা বিধবা মাসি। এগার বছর ধ'রে বকাবকি রাগারাগি মারধর ক'রে মাসি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ষোল বছরের ভূতো এখন শাসনের সম্পূর্ণ বাইরে। মারকুটে ছেলের গায়ে হাত দিতে সাহস হয় না। কি ক'রে বসবে কে জানে! নিজের মান নিজের কাছে। দাক্ষায়ণী নীরবে সহ্য করেন তার অত্যাচার ও গ্রামবাসীর গালাগালি। আড়ালে চোখের জল ফেলেন আর মদনগোপালের কাছে প্রার্থনা করেন—ঠাকুর, ভুতুর সুমতি হোক।

অটুট স্বাস্থ্য ভূতোর। অসুখ-বিসুখ বড় একটা হয় না। ষোলয় পা বাড়ালেও দেখতে ছেলেমানুষটি। বেঁটেও নয়, লম্বাও নয়। রোগাও নয়, মোটাও নয়। মসৃণ মুখ। গোঁফের রেখাটি পর্যন্ত ওঠেনি। একেবারে বর্ণচোরা আম।

ভূতোর দুরন্তপনার অন্ত নেই। পুকুরঘাটে পাঁচুরমা'র নতুন কলসি ঢিল মেরে ভাঙে। পাঁচুরমা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁরে ভূতো, কলসি ভাঙলি যে?

ভূতো জবাব দেয়—কলসি ভাঙার আওয়াজ ভারি মিষ্টি।

মিত্তিরদের রক্তভেঁতুল গাছে চ'ড়ে তেঁতুলগুলো দু-আধখানা ক'রে মাঠে ছড়ায়। খবর পেয়ে দাশু মিত্তির ছুটে আসে। ভূতো গাছ থেকে নামলে বলে—তুমি দু চারটে খেলে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তেঁতুলগুলো কি এমনি ভাবে নষ্ট করতে হয়!

ভূতো বলে—না ভাঙলে লোকে বুঝবে কি ক'রে রক্ত-তেঁতুল? রক্ত-তেঁতুল তো এ অঞ্চলে বেশী নেই।

পানেদের বাগান থেকে তিনটে খাজা কাঁঠাল অদৃশ্য হয়। দিনকয়েক পরে পানগিন্নী এসে দাক্ষায়ণীকে বলে—তোমার বোনপো'র দৌরাত্মিতে গাঁয়ে বাস করা দায়। আমাদের তিন তিনটে কাঁঠাল হাটে বেচে এসেছে।

—ওমা সত্যি?

—সত্যি নয় তো কি অমনি এসেছি ওপাড়া থেকে বাড়ি চড়াও হতে?

ভূতো দাওয়ায় বসে মুড়ি খাচ্ছে। মাসি বলেন—এমন কাজ কেন করলি বাবা?

—শোন মাসি, ওঁদের ন্যাড়া আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বিড়ি খায়। চাইলে একটা দেয় না। বলে—বিড়ি খেতে পয়সা লাগে। তোর যখন পয়সা হবে তখন খাবি। যা, গরীবের এত শখ কেন? তাই আমি ওঁদের তিনটে কাঁঠাল পেড়ে মদনপুরের হাটে বেচে কয়েক বাণ্ডিল 'জয়হিন্দ্' বিড়ি কিনে এনেছি।

মাসি অনেক বুঝিয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে পানগিন্নীকে ঠাণ্ডা করেন।

গ্রামের বারোয়ারিতলায় মাতব্বরদের জটলা। আলোচনা ভূতোকে কেন্দ্র ক'রে। নরহরি চক্কত্তি টিকি নেড়ে ঝাঁজের সংগে বলেন—একটা বিহিত চাই। হারামজাদাকে গাঁ-ছাড়া করতে হবে। আমার গোয়াল-ঘরের চাল থেকে খড়ি-ধরা কুমড়োগুলো কেটে কেটে গর্তে ফেলেছে। আবার বলে কিনা ওগুলো কোন কাজে আসবে না। গাঁয়ে কবিরাজ নেই যে ওষুধ তৈরি করবে। তত্ত্বজ্ঞান শোনায় আমাকে! পাজী বদমাশ কোথাকার। হতভাগার কাছে কি বার মাস তিরিশ দিন নষ্টচন্দ্র!

বুড়ো ত্রিলোচন পণ্ডিত যেতে যেতে থমকে দাঁড়ান চক্কত্তির চিৎকার শুনে। ভূতোকে তিনিই যা একটু স্নেহ করেন। তাঁর পাঠশালায় কিছুদিন সে পড়েছিল। বলেন—ভূতনাথের যত দোষই থাক সে কখনও মিথ্যা বলে না। সত্যবাদী গাঁয়ে ক'জন?

তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন নরহরি। বলেন—থাম পণ্ডিত। তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। সার্টিফিকেট দেওয়ার আর ছেলে পেলে না! নির্লজ্জ বেহায়া অকালপক্ক ছোঁড়া কিনা সত্যবাদী! বলি তোমার ভীমরতি ধরতে আর কত দেরি?

নরহরির প্রতিপত্তি আছে। ত্রিলোচন চুপ ক'রে যান।

জমিদার অনুকূল মুখুজ্যে শৌখিন মানুষ। তাঁর বাগানে নানা রকমের ফুল। ভূতো বাজি রেখে গোলাপ তুলতে যায়। ধরা পড়ে বদন সিংয়ের হাতে। বদন সিং কলকাতা থেকে আমদানি করা পশ্চিমে দরোয়ান। সে কর্তার হুকুমে কঞ্চি দিয়ে মেরে ভূতোর পিঠ লাল ক'রে দেয়। মারের চোটে ভূতোর জ্বর আসে। গায়ের ব্যথা মরতে লাগে পনের দিন। জীবনে এত দিন কখনও ভোগেনি ভূতো। এমন শাস্তিও কখনও পায় নি। বকুনি কানমলা চড়-চাপড়ের ওপর দিয়ে গিয়েছে।

বিপদের ওপর বিপদ। হঠাৎ পরপারের ডাক আসে দাক্ষায়ণীর। বোধ হয় বেরিবেরি। অভাব ও অশান্তির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে মানুষ ক'দিন বাঁচে? ভূতোর লাঞ্ছিত জীবনে নামে ঘোর অন্ধকার। তেখোড় ডানপিটে ছেলে ভূতো। গাছে চড়া সাঁতারকাটা পাঁচিল টপকানোয় অদ্বিতীয় কিন্তু ঘরের কাজ কোনদিনই শেখেনি। রান্না করতে তার কান্না পায়। ভাতের হাঁড়িতে জাল দিতে ভুল হয়, তরকারিতে নুন দিতে মনে থাকে না। উঠতে বসতে মাসির কথা ভাবে। কী জ্বালাতনই না করেছে তাঁকে! আজ তিনি না থাকাতেই এই আথান্তর। হাতে পয়সা নেই। ঘটিবাটি বিক্রি ক'রে আর কতদিন চলবে?

কষ্টেসৃষ্টে কয়েক মাস কাটে। একদিন দুপুর রাত্রে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ভূতো। উঠনে দোলনচাঁপা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মাসি বলছেন—ভুতু, তোমার জন্যে মরেও আমার শান্তি নেই। দুষ্টুবুদ্ধি ছাড়, কাজের চেষ্টা দেখ। শক্ত সমর্থ ছেলে। পরিশ্রম করলেই ঘরে লক্ষ্মী আসবে। সংসারী হতে পারবে।

ভূতোর ঘুম ভেঙে যায়। সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসে। কোথাও কিছু নেই। উঠন খাঁ খাঁ করছে। অদূরে নিশাচর পাখির ডানা নাড়ার ঝটপট শব্দ শোনা যাচ্ছে। আকাশের তারাগুলো অপলকনেত্রে চেয়ে আছে—যেন রজনীর প্রষুপ্ত প্রহরে ধরণীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে। গভীর অনুতাপ জাগে ভূতোর মনে। সে আর উপদ্রব ক'রে বেড়াবে না। খেটে খাবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। মাসীর অশরীর আত্মার কাছে শপথ করে ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলবে, জীবনে খুলবে নতুন খাতা।

একটি রাত্রের অভিজ্ঞতা দুরন্ত ভূতোকে শান্ত ক'রে তোলে। তার পরিবর্তন দেখে পাড়া-পড়শীর সহানুভূতি হয়। সে পাঁচজনের ফাই-ফরমাশ খেটে কিছু কিছু রোজগার করতে শুরু করে। বছরখানেকের মধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। সামনে তালনবমী। মথুরনগরের বাঁড়ুজ্যে গিন্নীর জন্য তাল পাড়তে গাছে উঠেছে ভূতো। পড়ন্ত বেলা। হঠাৎ ছেলেমানুষের কান্না শুনে চেয়ে দেখে বদন সিং অনুকূলবাবুর পাঁচ বছরের নাতনীকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর মেয়েটা অঝোরে কাঁদছে। ভূতো চট ক'রে বদনের পিঠ লক্ষ্য ক'রে একটা তাল ছোঁড়ে। আকস্মিক আঘাতে হকচকিয়ে বদন ধপাস ক'রে প'ড়ে যায়। তারপর কাস্তে হাতে ভূতোকে সরসরিয়ে গাছ থেকে নামতে দেখে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। ভূতো খুকীকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যার আগেই গ্রামে ফেরে। তখন জমিদার বাড়িতে হুলস্থূল। খুকীর সন্ধানে দিকে দিকে লোক ছুটেছে। খুকীকে নিয়ে ভূতোকে আসতে দেখে সবাই অবাক্। তার মুখে ঘটনার বিবরণ শুনে অনুকূলবাবু বলেন—বদন ব্যাটা ছদ্মবেশে ছেলেধরা। আজকাল প্রায়ই এরকম কাণ্ড হচ্ছে। কিছুদিন আগে কৃষ্ণনগরের নেদের পাড়ায় দুব্যাটা ছেলেধরা ধরা পড়েছে। নেমকহারাম আর কাকে বলে। আমার সর্বনাশ করতে বসেছিল।

তারপর ভূতোর হাত চেপে ধ'রে ধরা গলায় বলেন—ভূতনাথ, তোমার বাহাদুরী আছে। তুমি আচ্ছা জব্দ

করেছ বদনাকে। আমাকেও কম করনি। একদিন ঐ বদনাকে দিয়েই আমি তোমার নির্মম প্রহারের ব্যবস্থা করেছিলাম। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে। ভগবান তোমার মংগল করুন।

বছর না ঘুরতেই অনুকূলবাবুর আন্তরিক চেষ্টা ভুতোর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তার পোস্টাল রানার-এর চাকরি হয় মাঝেরগ্রামে। পণ্ডিতমশাই বলেন—ভারি খুশী হয়েছি ভূতনাথ। সরকারী চাকরী, পাকা হলে আর দুঃখ থাকবে না। তুমি সত্যাশ্রয়ী। ঈশ্বর তোমার সহায়।

যথাসময়ে চাকরিতে পাকা হয়ে ভূতো পণ্ডিত মশাইকে পনের টাকা প্রণামী পাঠায়। অনুকূলবাবুকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পোস্টকার্ড লেখে।

বছর দুই পরে খবরের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় :—

কৃষ্ণনগর—নদীয়া—১লা ফেব্রুয়ারি

পোস্টার রানার-এর বীরত্ব

বাঘের সংগে লড়াইয়ে বাঘ কুপোকাত

১৫ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার শীতের সন্ধ্যায় মাঝেরগ্রাম পোস্ট অফিসের রানার শ্রীভূতনাথ মণ্ডল নোয়াশার বিলের ধারে একটি বড় চিতা বাঘের পাল্লায় পড়ে। ভূতনাথের হাতে টর্চ ও লাঠি ছিল। বাঘটি যতবার তাহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে ততবারই সে টর্চ ফেলিয়া বাঘের চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। দশ মিনিট এইরূপ কসরতের পর সে লাঠির আঘাতে বাঘকে ঘায়েল করে। ভূতনাথের বাড়ি নদীয়ার পলতাপোতা গ্রামে। নদীয়া জেলা সংবাদপত্রসেবী সংঘের তৎপরতায় ঘটনাটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে ভূতনাথকে একশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

ভুতোর বীরত্বের কাহিনী শুনে পলতাপোতার জনসাধারণ রীতিমতো গর্ববোধ করে। মুখুজ্যে মশাই উচ্ছ্বাসপূর্ণ অভিনন্দন পত্র লেখেন। উত্থানশক্তিরহিত ত্রিলোচন পণ্ডিত বিছানায় শুয়ে শুয়ে আশীর্বাদ জানান।

রবীন্দ্র-নাটকে মানবতা

অধ্যাপক কল্যাণনাথ দত্ত

জীবনই নাটকের উপজীব্য। শ্রেষ্ঠ নাটক চিরদিনই জীবনী-বোধে সঞ্জীবিত। রবীন্দ্র-নাটক প্রসংগে এ কথাই স্বীকার্য। কবির শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি এক মানবীয় বোধের স্পর্শে উজ্জীবিত, জীবনের জয়গানে মুখর। এইখানে রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মী দর্শনের স্বরূপ দৃষ্টীভূত।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কয়েকটি বিশেষ নাটকের ভিত্তিতে রবান্দ্র-নাটকের মানবতা-ধারার পরিচয় দেওয়াই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

জীবন-সম্পর্কচ্যুত সাহিত্যের মূল্য বোধ বহুলাংশে ব্যাহত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্য সমাজে অগ্রগণ্য। সাহিত্যের সত্য ও সৌন্দর্য যে জীবনীবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সম্বন্ধে তার কোনো দ্বিধাই ছিল না। তাই তাঁর কণ্ঠে শুনি—

> জীবনে জীবন যোগ করা
> না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

জীবনের সঙ্গে এই সংযোগ সাধনের প্রয়াসে রবীন্দ্র-নাটক উদ্ভাসিত। সমাজবদ্ধ জীব মানুষের সমাজের অপর মানুষের সঙ্গে আছে এক আত্মিক যোগ। এরি মাঝে তার মানবধর্মের স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। পদমর্য্যাদায় অন্ধ, আত্মগর্বে সমাহিত মানুষ যখন নিজেকে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় তখনই আসে তার মানবীয় বোধের বিস্মৃতি। অন্তর্মুখী, আত্মকেন্দ্রিক মানুষের জীবনস্রোত স্বভাবতই সঙ্কুচিত, কারণ মানবপ্রেমের মধ্যেই মানবীয় অবস্থিতির বিবৃদ্ধি।

অপরের কাছ থেকে নিজেকে বিমুক্ত করার প্রচেষ্টার অসংগতিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন এবং এইখানে তাঁর নাটকের প্রগতিশীল রূপ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত।

নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ অচলায়তনের সমাজ বাইরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে উঁচু প্রাচীর আর বন্ধ জানলার কড়াকড়ির মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চেয়েছিল। আয়তনের বাইরের বিশাল পরিবেশের সম্বন্ধে এ সমাজের

ছিল শুধু অবজ্ঞা আর অবহেলা। মানবতা-বিরোধী কৃষ্টিমধ্যে প্রতিপালিত সভ্যতার নগ্ন কদর্য্যতাকে রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে তাঁর 'অচলায়তন' নাটকে চিত্রিত করেছেন। অচলায়তনের সমাজের রক্ষকরা করেছিল অবমাননা—মানবীয় চেতনাবোধের অসম্মান এবং এই জন্য এ হয়েছিল বিপর্য্যস্ত। আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব সভ্যতা অপরের বিনিময়ে চায় নিজের প্রতিষ্ঠা, মানুষের মধ্যে আনতে চায় এক কৃত্রিম ব্যবধান। মানবীয়বোধবিবর্জিত এই সভ্যতার জীবনীপ্রবাহ অচল, বৈনাশিক। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রচিত 'অচলায়তন' বিবদমান, স্বার্থান্বেষী, মারণাস্ত্রী পশ্চিমী সভ্যতার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাই অচলায়তন প্রসঙ্গে বলেছেন—"আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ওই গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে।" (সবুজপত্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪)

অচলায়তনের সনাতনী ধর্মনীতির সঙ্গে যুদ্ধবাদী পশ্চিমী সভ্যতার তুলনায় অনেক হয়তো আপত্তি তুলবেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। উভয়েই সমানভাবে আত্মকেন্দ্রিক, মানবীয়-বোধশূন্য। জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবতা। সে ধর্ম যখন অস্বীকৃত হয়, তখন সমাজের হয় অধোগতি, জীবন হয় স্পন্দনরহিত। তাই অচলায়তনের জীবনধারা অনড়, যুদ্ধবাদী পশ্চিমী সভ্যতার কৃষ্টি বিপজ্জনক। নিজের মধ্যে অন্ধীভূত এরা নিজেদেরই বিকৃত করেছে। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিকে পদদলিত করে, কঠিন অনুশাসনের উপাসনার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে, অচলায়তনের সমাজ নিজেকে অন্তঃসারশূন্য করেছিল। অচলায়তনের আচার্যের মুখে শোনা যায় এই বিভ্রান্তির বিবরণী—"আজ দেখছি এই অতি দীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই প্রদক্ষিণ করেছে—কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশিকৃত হয়ে জমে উঠেছে।" সমাজবিরোধী, অনুভূতিহীন অবস্থিতির মধ্যে বিকশিত সভ্যতার স্বরূপ অচলায়তনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মানুষের অস্বীকৃতিও নিষ্পেষণের উপর নির্ভরশীল সমাজের বিরুদ্ধ অভিযোগকে রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনের আচার্যের মুখ দিয়ে ভাষা দিয়েছেন—"ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতার কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনও শতধা হয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেল না। পশ্চিমী সভ্যতার পাষাণের বেড়াও মানুষকে কাঁদিয়ে গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ তাই পশ্চিমী সভ্যতার সর্বগ্রাসী রূপের বিরুদ্ধেই প্রয়োজ্য।

মানুষকে অপমান করে বিস্তৃত সভ্যতা শত সমারোহ সত্ত্বেও জীর্ণ, পঙ্গু, আসন্ন ধ্বংসের সম্ভাবনায় সশঙ্কিত। মানবধর্মের অসম্মানের উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার ধ্বংস তাই নিশ্চিত। শোন পাংশুদের আক্রমণে তাই অচলায়তনের শুষ্কতুণ্ড সন্ন্যাসীরা হলেন আত্মহারা। আত্মবিস্মৃত এরা পরস্পরের মধ্যে শুধু কলহে প্রবৃত্ত হলেন। অচলায়তনের সবকিছু অচলতার অবসান করে নতুন সৃষ্টির জন্য গুরুর হল আগমন। সামাজিক চেতনা-বিরোধী, মানবীয়-ধর্মের পরিপন্থী কৃষ্টির নিশ্চিত অবলুপ্তি রবীন্দ্র-লেখনীতে প্রতিশ্রুত হল। মানবতার জয়গানে রবীন্দ্র-সৃষ্টি মুখরিত হল।

অচলায়তনের মানবতার সুর ডাকঘরেতে প্রতিধ্বনিত। অচলায়তনের পরিবেশ ডাকঘরে ক্ষুদ্রাকারে রূপায়িত হয়েছে। এখানের সমাজেও সেই একই প্রয়াস—মানুষকে মানব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জঘন্য ষড়যন্ত্র। অমলের মঙ্গলের অজুহাতে তাকে বাইরের জগতের কাছ থেকে সযত্নে রাখার চেষ্টা করা হল। কিন্তু এ প্রচেষ্টা নিষ্ঠুর ভ্রান্তিমূলক। তাই এর সমাপ্তি এল দ্রুত। বাইরের জগতের সঙ্গে ভেতরের মানুষের হল মিলন। নিজের ছোট গণ্ডীর বাইরে অবস্থিত বিশাল সমাজের সঙ্গে মিলনের জন্য মানব মনের আত্মিক আকুতিকে রবীন্দ্রনাথ ডাকঘরে অতি সার্থকভাবে প্রতিভাত করেছেন। বাধা-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ অমলের মন বাইরের জগতের স্পর্শের জন্য ব্যাকুল; তাই তার মনের তৃপ্তি রাস্তার দইওয়ালা, ফকির, পথের ছেলেমেয়ের মাঝে; তাই স্বপ্নে সে ভালবাসে ডাক-হরকরার অবহেলিত জীবনকে। "আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে, বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি, কতদিন কতরাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে।......রাতদিন একলাটি চলে আসছে...।" সহানুভূতি ও আন্তরিকতার স্পর্শে সজীব করে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে অপর কোনো সাহিত্যিক বোধহয় ডাক-হরকরার অবজ্ঞাত জীবনকে এতো সুন্দর করে প্রকাশ করেন নি। যতীন্দ্রনাথের 'ডাক-হরকরা' ও সুকান্তের 'রাণার' রবীন্দ্রনাথের এই ডাক-হরকরার উত্তরপথ।

অচলায়তনের 'পঞ্চক' ও ডাকঘরের 'অমল' বহুব্যাপী মানবপ্রেমে অজ্ঞাত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ের মধ্যে দুর্দমনীয়। তবে পঞ্চক অমলের চেয়ে শক্তিশালী, তাই সে আরো বেশী অগ্রণী। অনুভূতি তার আরো ব্যাপক, ভাষা তার আরো জোরালো। সে শুধু মানবপ্রেমের বিমূর্ত ভাবনায় ভারাক্রান্তময়। সে সক্রিয় কর্মী। তাই নব সৃষ্টির নেতৃত্ব পড়ল তার উপর। মানবতার আদর্শে উচ্ছ্বসিত নতুন সৃষ্টির পঞ্চকই হল শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথের মানবতা সৃজনশীল। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের মাঝে নতুন সৃষ্টির অগ্রগতি। শোনপাংশুদের সঙ্গে পঞ্চক, আচার্য ও অপরের মিলনই অচলায়তনের নবব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সাধারণ মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মনোভাবের পরিচয় এখানে বিশেষ করে প্রকাশিত। 'কালের যাত্রা' নাটকটিও এই মননধারার স্মারক। মহাকালের রথ হল অচল। আভিজাত্য অর্থের দম্ভ-শক্তির দর্প রথকে কোনো গতি দিতে পারল না। অবশেষে অস্পৃশ্য শূদ্র সমাজের আন্তরিকতায় ভগবান দিলেন সাড়া। রথ পেল গতি। মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ মানুষের অধিকারকে দিলেন শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। কবি কণ্ঠে ঘোষিত হল নতুন দিনের আগমনী—

যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার
মাথা তুলে।

'রক্তকরবী'তে জালের আড়ালে ঢাকা রাজা অর্থনৈতিক সৌষ্ঠবের উপর সভ্যতার কাঠামো গড়ার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। কিন্তু মন তার মানুষের স্পর্শের জন্য আকুল। মানবস্পর্শবিচ্যুত, মানবীয় বোধবিরোধী জীবনে অশান্ত রাজা নিজেরই গড়া সভ্যতার বিরুদ্ধে তাই বিদ্রোহী। চিরন্তনী মানবীয় অনুভূতির প্রেরণায় অস্থির রাজার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মানব-প্রেমের জয়গানের ঘোষণা করেছেন। রাজার বিদ্রোহ মানবতার বিদ্রোহ।

মুক্তধারা প্রসঙ্গেও ঠিক এ কথা প্রযোজ্য। রাজা রণজিৎ সিংহ ও যন্ত্রকার বিভূতি মানুষকে উৎপীড়িত ও প্রলোভিত করে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যগ্র। মানুষের বিরুদ্ধে তাদের এক অমানুষিক ষড়যন্ত্র। কিন্তু তাদের এ সর্বগ্রাসী, বিকৃত প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের চোখে ঘৃণ্য। এ সংকীর্ণ নীচ মতবাদের পরাজয় মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বচ্ছ। তাই রণজিৎ সিংহ ও বিভূতির বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ রাজকুমার। রাজকুমারের কণ্ঠে বৃহত্তর মানবিক মিলনের ডাক। সেই মিলন তীর্থের শহীদ রাজকুমারকে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অসামান্য সাফল্যের অধিকারী করে রবীন্দ্রনাথ মানবতার বিজয় বারতাকে রূপায়িত করেছেন।

সমাজের কৃত্রিম ব্যবস্থা ও বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে মানুষের অন্তরের প্রেম ও সৌন্দর্য যে অনেক বেশী সত্য, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'র মধ্যে তা ব্যক্ত। রাজার অন্তরের পরিচয়ে রাণী সুদর্শনা তৃপ্তি পায় নি; তার মন চেয়েছিল রূপের বাহ্যিক দীপ্তিকে। এই বাহ্যিক দীপ্তির অভাবেই রাজার মানবতা রাণীর কাছে প্রাপ্য মর্যাদা পেল না। আবার রাণীর দেহের দখল নিয়ে অন্যান্য রাজারা সুরু করলেন তাঁদের আড়ম্বর আর প্রস্তুতি। কৃত্রিমতায় ভরপুর, বাহ্যিক আড়ম্বরে গড়া সভ্যতার বিকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'তে শৈল্পিকভাবে চিত্রিত করেছেন। সেই সঙ্গে এই সভ্যতার পরাজয়কে কবি অঙ্কিত করেছেন। রাজার আগমনের মধ্যে দিয়ে বিকৃতির হল অবসান, মানবতার হল জয়। রাণী উপলব্ধি করল পরিপূর্ণ মানবীয়বোধকে। মানবধর্মের প্রতীক রাজার সঙ্গে তার পূর্ণমিলন হল।

শাশ্বতিক মানবপ্রেমের প্রবাহে রবীন্দ্র-নাটক সঞ্জীবিত। অমল, পঞ্চক, দাদাঠাকুর, রাজকুমার, রাজা—সকলের মধ্যে মানবতার ধারা প্রবাহমান। কোথাও এ ধারা দুরন্ত, কোথাও সংযত, কোথাও স্থির, কোথাও মুখর। এ বিষয়ে দাদাঠাকুর ও রাজার চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দাদাঠাকুরের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমাজসচেতন পূর্ণমানবিকবোধে উদ্ভাসিত বিপ্লবী সত্তাকে প্রতিভাত করেছেন। অচলায়নের অচলতা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই এ আয়তনের ধ্বংসের জন্য তাঁর আগমন। তবে দাদাঠাকুর নতুনের স্রষ্টা। পঞ্চকের ওপর তাঁর তাই আদেশ—"কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেখানে তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে। মানবতার শক্তিশালী সৃজনশীল রূপ দাদাঠাকুরের মধ্যে পরিলক্ষিত।

রাজার রূপ কিন্তু অনেকাংশে অস্পষ্ট, তাঁর আদর্শ অনেক স্থির। অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে তিনি উদ্‌গ্রীব। কিন্তু তাঁর জন্য তিনি কঠিন হতে অপারক। সজোরে আঘাত না করে মনের অর্গলকে আস্তে আস্তে উন্মোচন করাই তাঁর কাজ। তবে দাদাঠাকুরের মতো তিনিও অসীম মানবপ্রেমের অধিকারী, মানবধর্মের পূজারী। পথভ্রষ্টা সুরঙ্গমাকে তিনি দিয়েছিলেন আশ্রয়, মোহমুগ্ধা রাণীকে করেছিলেন সচেতন। রবীন্দ্রনাথের রাজা চরিত্রে সমভাবে পরিস্ফুট।

রবীন্দ্র-নাটকের মূল আদর্শ বিপ্লববাদ নয়, মানবপ্রেম—তাই গর্বিত মহাপঞ্চক শাস্তির বদলে তাঁর নতুন অচলায়তনে স্থান পেল, কুচক্রী মোড়ল পেল অমলের আন্তরিক প্রীতি, পরস্ত্রীলোলুপ কাঞ্চীরাজ পেল রাজসম্মান। রবীন্দ্র-নাটকের মূল বক্তব্য মানবতার প্রতিষ্ঠা। ক্ষমা আর প্রেমের মধ্যে দিয়ে এ বক্তব্য হয়েছে মূর্ত। বিপ্লবের জলন্ত বিবরণীতে নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের আহ্বানেই তাঁর নাটকের আদর্শবাদ প্রস্তাবিত।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। উৎকট প্রচারশীলতার দ্বারা তিনি তাঁর শিল্পবোধকে ব্যাহত করেন নি। বহুক্ষেত্রে হয়তো তাঁর বক্তব্যকে মনে হয়েছে অস্পষ্ট, তাঁর সঙ্কেতকে মনে হয়েছে সাধারণের অবোধগম্য, কিন্তু তাঁর শিল্পদৃষ্টি কোনো সময়েই স্থানচ্যুত হয়নি। সমাজ ও মানব জীবনের প্রতি সচেতন ও সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-মনের পরিচয় তাঁর নাটকগুলি সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং এইখানে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব।

আর নিরপেক্ষ নীতি বা 'naturalistic art'র অজুহাতে রবীন্দ্রনাথ সমাজের প্রতি সাহিত্যিকের দায়িত্বকে, সাহিত্যের সামাজিক নৈতিক মূল্যকে অস্বীকার করেননি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্থান পাশ্চাত্যের বহু সমাজতাত্ত্বিক নাট্যকারদের ঊর্দ্ধে। গলস্‌ওয়াদী, যীশু প্রভৃতি নাট্যকারদের মধ্যে সমাজবোধের চিহ্ন অনুভূত। কিন্তু এঁরা বহুক্ষেত্রে সামাজিক গ্লানি ও মানবীয়বোধের অবমাননার মধ্যে স্তব্ধ। শিল্পের শুচিতা রাখার জন্য এঁরা অসহনীয় সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে জীবনের শাশ্বত সত্যকে অনেক সময়ই বলতে সাহসী হননি। এইখানে তাঁদের সৃষ্টির নৈতিক মূল্যবোধের বৈকল্য। তাদের সমাজ তাত্ত্বিকবোধের অসম্পূর্ণতা, তাঁদের মানবতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশিত। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক অগ্রণী। এমন কি বিখ্যাত সমাজ-নাট্যকার ইবসেনও এবিষয়ে তাঁর সমকক্ষ নন। মানবতার আদর্শে উজ্জীবিত রবীন্দ্র নাটকগুলি সর্বযুগের। এদের শ্রেষ্ঠত্ব সত্যই অনস্বীকার্য।

অথবা
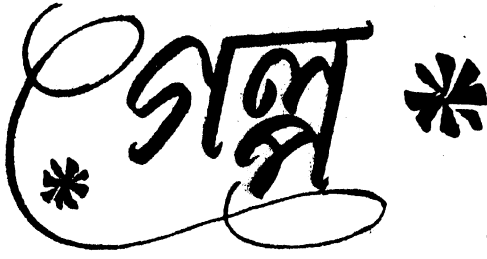
সন্তোষকুমার অধিকারী

পূর্বদিকের পীচের রাস্তায় শহরের একমাত্র সিনেমা হাউস। পশ্চিমের মাঠের সীমা আকাশ ছুঁয়ে আছে। মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়ালে অপর প্রান্তে দৃষ্টি পৌছায় না। শুধু দেখা যায় পায়েচলা একটি পথের রেখা মাঠের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে। কতকগুলো শরবনের পাশ দিয়ে পথটা যেখানে বেঁকেছে তার পাশে ছোট ছোট নীচু কুঁড়েঘর অনেকগুলো। বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ঢাকা কুঁড়েগুলোতে থাকে বাগ্দী ও বাউরি জাতের লোকেরা।

পীচের রাস্তা থেকে আরও একটি রাস্তা মাঠের মাঝখানে এগিয়ে এসে থেমেছে। এত বড় মাঠের মধ্যে একমাত্র বাড়ী, সরকারী ডাকবাংলো।

সন্ধ্যের পর পশ্চিমের অন্ধকার যখন নিবিড় হ'য়ে ছেয়ে দেয় মাঠ, সিনেমা হাউসের উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক সেই অন্ধকারকে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে থাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত। সেই টুকরো টুকরো আলোর লেখাগুলো যেন মাঠের মধ্যে খেলা করে বেড়ায়। সেই আলোর খণ্ড দিয়ে দেখা যায় ইতস্ততঃ বিচরণকারী লোকেদের। অথবা বাউরি মেয়েদের যারা রোজই সন্ধ্যের পর সিনেমা দেখতে আসে পাঁচ আনার টিকিটে।

অনেক দিন পর কাজের অজুহাতে হঠাৎ এই শহরে এসে নামলো সুনন্দ। কাজ হয় ত সামান্য, তবুও আসতে ইচ্ছে হ'লো তার। সেই আগেকার পুরোনো ডাকবাংলো —কিন্তু তবুও চিনতে একটু কষ্ট হলো বইকি।

দুপুরটা গরমে রৌদ্রে ঘর্মাক্ত হয়ে ছুটোছুটি করলো সে। শহরের চেহারা পালটে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। পূর্ত বিভাগের তদারকীতে নতুন নতুন খাল খোঁড়া হচ্ছে, তৈরী হচ্ছে নতুন রাস্তা, ওভারব্রীজ ও সাইফন। কিছু কাজের কণ্ট্রাক্ট সেও পাচ্ছে। বিকেল পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে এলো সে। তারপর ইঁদারার জলে স্নান সেরে ডাকবাংলোর খোলা বারান্দায় এসে গা এলিয়ে দিয়ে বসলো চেয়ারে।

এক মুহূর্তে সমস্ত ক্লান্তি যেন অপনীত হ'য়ে গেলো। সারাদিনের প্রচণ্ড উত্তাপের পর শীতল বাতাসের মাধুর্য্যে দেহমন ভরে উঠ্‌লো। সন্ধ্যের আবছায়া অন্ধকারে পৃথিবী হারিয়ে যাচ্ছে। দূরের সিনেমা হাউসের চাঞ্চল্য মাঠের বাতাসকে এতটুকুও কম্পিত করছে না। শুধু তালের উঁচু মাথার সোজা চতুর্থীর চাঁদকে দেখা যাচ্ছে।

—কে?

—আজ্ঞে আমি পূরণ। কিছু দরকার আছে আপনার?

—শোনো পূরণ, তুমি কতদিন আছো এখানে?

ডাক বাংলোর চৌকিদার। সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে তার আস্তানা! এতবড় ফাঁকা মাঠের মধ্যে ওই ঘরে আর বাংলোর বারান্দায় তারা জনতিনেক লোক থাকে।

—আজ্ঞে, এখানে আমার তা পাঁচ বছর হ'লো।

—তোমার আগে কে ছিলো?

—একটা বুড়ো লোক ছিলো, শুনেছি।

—আমি পাঁচ বছর আগে এখানে এসেছিলাম। সেই বুড়োকে চিনতাম আমি। সে কোথায় গেছে জানো?

—আজ্ঞে না।

—আর···সেই বুড়োর একটা মেয়ে ছিলো না?

—আজ্ঞে চিনি না।

—আচ্ছা, যাও তুমি। দরকার হ'লে ডাকবো।

পূরণ চলে যেতেই হঠাৎ সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো সুনন্দ। হাতঘড়ির দিকে টর্চ ফেলতেই দেখা গেলো আট্‌টা বাজে প্রায়। আর একটু পরেই সিনেমা ভাঙ্গবে। অন্ধকার শুধু ঘন হয়ে উঠ্‌ছে। চাঁদ আড়াল হ'য়ে যাচ্ছে একটা হালকা মেঘের তলায়। মাঠের অন্ধকার হঠাৎ যেন হাতছানি দিয়ে ডাক দিলো তাকে।

পূরণ চেনে না। কিন্তু এই মাঠ, বাতাস, অন্ধকার তাকে চিন্‌তো, এই আকাশ আর চাঁদ তাদের জান্‌তো। আর জান্‌তো···

সুনন্দ উঠে দাঁড়ালো। একটি লোকও নেই কোথাও। এই বিপুল শূন্য মাঠের মধ্যে একা বারান্দার অন্ধকারে থাকা নিরাপদ নয়। পূরণ জিজ্ঞেস করছিলো সে বারান্দায় এসে শোবে কিনা। তাকে নিষেধ করেছে সুনন্দ।

হঠাৎ বারান্দা থেকে মাঠের মধ্যে নেমে গেলো সে। সামনের ছোট বাগানের ইতস্ততঃ ছড়ানো গাছপালার মধ্য দিয়ে বাঁ দিকে এগিয়ে গেলো। একটা শিশু-দেবদারুর আড়ালে অন্ধকার গভীর হয়ে উঠেছে। তারই পাশে এসে দাঁড়ালো সে। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই হঠাৎ

স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো তার সমস্ত দেহ। হাত দশেক দূরে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে কে যেন নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা ছায়ামূর্তি। তার শরীরের ছায়াটাকে সে অনুভব করতে পারছে।

দক্ষিণ থেকে একটা বাতাস ছড়িয়ে গেলো মাঠের মধ্যে দিয়ে। তালের শিরে শিরে সে বাতাসের স্পর্শ বাজ্‌তে লাগলো। শীতল আরামদায়ক স্পর্শ। সুনন্দের মনে হ'লো বাতাসের সঙ্গে ছায়াদেহও হাঁট্‌তে সুরু করেছে।

সুনন্দ দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে গেলো। কিন্তু চাঁদ ডুবে গেছে। মূর্তি অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না। আকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে সে তাকালো। কাউকেই সে অন্ধকার ভেদ ক'রে দেখা যায় না। টর্চটা নিতে ভুল হ'য়ে গেছে। চোখের সামনে শুধু এক কালোর জটিলতা।

মেঘটা সরে যাচ্ছে। একটু একটু করে অন্ধকার আবার দৃশ্যমান হ'য়ে উঠ্‌ছে। ওই ত সে··· । সুনন্দ এগিয়ে গেলো। মেয়েটি পশ্চিম দিকে মুখ করে এগিয়ে চলেছে। এত পরিচিত তার হেঁটে চলার ভঙ্গী যে ভুল হওয়ার উপায় নেই। এত চেনা এই মাঠের বুক যে, অন্ধকারেও হোঁচট খাওয়ার ভয় নেই। ঠিক এই দিকটা দিয়েই সে হাঁট্‌তো। কোথায় যায়? জিজ্ঞেস করলে উত্তর মেলে না। কিন্তু সে ধরা দেয়। তাকে ধরতে পারলেই সে সহজ হ'য়ে ওঠে।

অন্ধকার যেন পাশ ফিরলো। সিনেমা হাউসের সামনের উজ্জ্বল আলোটা জ্ব'লে উঠেছে। সেই আলোতে বহু দূরের পথ দেখা যাচ্ছে। সেই আলোর রেখা বয়ে দেখা গেলো অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে সে। বাতাসের মত দ্রুত ও নিঃশব্দ তার সঞ্চরণ। ডান দিকে ঘুরে যাচ্ছে। সুনন্দও দ্রুত হাঁট্‌তে লাগলো। আরও জোরে ···চলার গতি ক্রমশঃ দ্রুত হ'চ্ছে। বাঁদিকে পায়ে চলা পথের পাশে পাশে গাড়ী চলার চাকার গভীর গর্ত। পাশ দিয়ে দিয়ে প্রায় দৌড়োতে লাগলো সে। হঠাৎ খুসী হ'য়ে উঠ্‌লো তার মন। ওই ত ওখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে। সাদা শাড়ীতে ঘেরা কালো মেয়ের চকচকে দুটো চোখ। তার খোঁপায় গোঁজা করবীর গোছা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই ফুলের গন্ধটাও এসে লাগলো বুকে। উত্তেজনায় বুকের স্পন্দন বেড়ে গেলো। মনে হ'লো হৃদ্‌পিণ্ডের ওঠানামায় বুকের ভেতরটা আট্‌কে যাচ্ছে। চাপা কম্পিত গলায় অস্ফুটকণ্ঠে সে ডেকে উঠ্‌লো—উমা···

অনড় অকম্পিত ছায়া। ছোট্ট পাকুড়গাছের মসৃণ দেহকাণ্ড। চাঁদের ম্লান আলোতে মানুষ বলে ভ্রম হ'চ্ছে। গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো সুনন্দ। কেউ নেই, কোথাও নেই। দূরে একদিকে কতকগুলো শরবন দুলে দুলে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। মেঘমুক্ত চাঁদের আলোয় অনেকদূর দেখা যাচ্ছে। যদি আরও দূর দেখা যেতো? যদি ওই শরবনের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে শুকনো উঁচু নীচু মাঠ দিয়ে দিয়ে হেঁটে আরও দূরের ছবিকে দেখা যেতো! একদিকের মাঠে কতকগুলো খড়ের চালা নিঃশব্দ হ'য়ে পড়ে রয়েছে। আর একদিকে বাঁশবনের নিবিড় কালো ছায়ার পাশে পাশে যে বিজন বনভূমি···তার সজীব অস্তিত্বকে যদি জানা যেতো?

কিন্তু সে আসবেই। কোনদিন ভুল হতে দেখেনি সুনন্দ। এই মাঠকে এই অন্ধকারকে সে ভালোবাসে। এই ছায়ার আড়ালে আড়ালেই সে থেমে রইবে। অপেক্ষা করবে। এখানে এসেই সে ধরা দেবে।

সুনন্দ বসে থাকবে। চাঁদ ডুবে যাবে। বন্ধ সিনেমা-ঘরের নৈঃশব্দে মাঠ নিবিড় হ'য়ে থাকবে। পৃথিবী থেকে বহুদূরে সরে গিয়ে এখানেই সে জাগ্‌বে। তারপর অন্ধকার যখন অসঙ্কোচে কথা বলতে সুরু করবে, আর বাতাস স্বপ্ন ছড়াবে নীল আকাশের·····তখনই সে আসবে।

শেষ রাত্রিতে হঠাৎ ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেলো পূরণের। বাইরে বেরিয়ে এসে চমকে উঠ্‌ল সে। বাংলোর বাবু ডাকছেন। কিন্তু একি চেহারা? এলো-মেলো চুল আর ছেঁড়া কাদালাগা জামা-কাপড়। চোখ দুটো যেন ভয়ে আর আবেগে জ্বলছে। সুনন্দ বললো—একটা রিক্সা ডাকতে পারবি রে? এই ভোরের ট্রেণেই যাবো।

সুনন্দ ফিরে গেলো ঘরে। বিদ্যুতের সবকটা আলোই এক সঙ্গে জ্বালিয়ে রেখেছে সে। পূরণকে রিক্সা ডাকার হুকুম দিয়ে ঘরের মধ্যেই ঘুরতে লাগলো প্রায় ছোটার মত বেগে।

পূরণের পাশে তার চাচাতো ভাই বিষণ এসে দাঁড়িয়ে-ছিলো। সে এবার মৃদুস্বরে বললো—বাবু খুব ভয় পেয়েছে। কিছু দেখেছে বোধ হয়।

অস্ফুটস্বরে কয়েকবার রাম নাম জপ করলো পূরণ। তারপর বললো—পাঁচ বছর আগে ওই পাকুড়গাছের ডালেই সেই বুড়ো চৌকিদারের মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়ে মরলো। বাবু এসেই বলছিলো বুড়োর কথা। মেয়েটাকেও চিন্‌তো রে।

দুজনে ঘেঁষাঘেষি হ'য়ে দাঁড়ালো—বোধ হয় ভয়েই।

পরিচালক—উপানন্দ

রচনা ও সাহিত্য

কোন বিষয়, বস্তু বা ভাব অবলম্বন করে সে সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট নানারকম বাক্য একত্র করার নাম রচনা। গদ্যে ও পদ্যে দুভাবেই রচনা করা যায়। রচনা শিক্ষার সময়ে তোমরা প্রথমে সরল ভাবে রচনা-অভ্যাস করবে, লিখ্তে লিখ্তে হাত যখন অনেকটা পাকা হয়ে আসবে, তখনই রচনায় অলঙ্করণের চেষ্টা করবে, তৎপূর্ব্বে নয়। উৎকৃষ্ট রচনা শক্তি লাভ করতে হোলে পর্য্যবেক্ষণ ও কল্পনাশক্তি বিকাশ যাতে হয় তার জন্যে চেষ্টা করা দরকার। আমাদের চতুর্দ্দিকে নিত্যই বহু ঘটনা ঘটছে, এগুলি নিবিষ্টচিত্তে দেখা, ঘটনার বিবরণী শোনা আর সে সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার। রচয়িতা হোতে গেলেই চিন্তাশীল হওয়া আবশ্যক। নানারকমের ভালো ভালো বই, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পাঠ, সদ্বক্তাদের বক্তৃতা শোনা প্রভৃতিও প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর নানাদেশের মনীষীদের চিন্তাধারায় অবগাহন করাও উচিত। যাহোক্, প্রত্যহ কিছু কিছু লিখ্বে। যেমি ভাবে কথা বলো, সেই ভাবেই প্রথমে লিখ্বে। যে বিষয়ে লিখ্বে, সে বিষয়টী মনে মনে ভালো ভাবে ভেবে নেওয়া দরকার। যে ভাবটার পর যে ভাবটী বসলে রচনা সুন্দর হয়, তা ঠিক করে নিয়ে এক একটী ভাব বিস্তৃত করে যুক্তির সঙ্গে প্রাঞ্জল ভাষায় স্পষ্ট অক্ষরে লিখ্বে। এক একটী ভাব এক একটী স্বতন্ত্র প্যারাগ্রাফে সম্প্রসারিত করবে। মনে রেখো রচনা গৃহ নির্ম্মাণের মত। কোন সহজ ভাবকে ঘুরিয়ে প্রকাশ করবে না, অতিরঞ্জিত ভাষা (যেমন আহতগণের রক্তে নদী লোহিতবর্ণ ধারণ করিল।) একেবারেই বর্জ্জনীয়। প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা দোষ (যেমন, ভ্রমরের গুণ গুণ শব্দের পরিবর্ত্তে ভ্যান ভ্যান বলা) যাতে না ঘটে, তা লক্ষ্য রাখ্বে।

রচনার গুণ তিনটী—(১) মাধুর্য্য (২) ওজঃ (৩) প্রসাদ। কবি পোপ বলেছেন—আয়াসহীন রচনা শিক্ষাসাপেক্ষ, এ শক্তি হঠাৎ আসে না : যারা নৃত্য শিক্ষা করেছে, তারাই সবচেয়ে সহজে চলাফেরা করতে পারে। রচনার আর্টের প্রধান গুণ সহজ বোধ্যতা ও সংক্ষিপ্ততা, অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করা বিশিষ্ট শক্তি সাপেক্ষ। রচনা যাতে সংযত, সংক্ষিপ্ত অথচ সহজে বোধগম্য হয়, তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করবে। রচনায় অনাবশ্যক শব্দ ব্যবহার করবে না।

বহু অধ্যয়ন ও অভ্যাসের ফলেই উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভব হয়। রচনাকে মধুর করতে হোলে যথাসম্ভব শ্রুতি-কঠোর পদের ব্যবহার পরিত্যাগ করতে হয় যেমন দার্ঢ্য, হর্য্যক্ষ, ইত্যাদি। জগতে বিষয়ের অন্ত নেই, তাই রচনার বিষয়ও অনন্ত। বিশেষ শৃঙ্খলা অবলম্বন না করলে রচনায় অগ্রসর হওয়া কঠিন। সমাপ্তির দোষে অনেক রচনা হৃদয়গ্রাহী হয় না, এজন্য সমাপ্তির সময়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজনীয়। উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিক, কথাশিল্পী ও কবি হওয়া সাধনা সাপেক্ষ।

রচনা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে যে আর্টিষ্টের—সে কেবল সমস্যা লইয়াই আলোচনা করিবে কেন? কি বুদ্ধিহীন সঙ্কীর্ণ নীতি? 'ক' নিজে যাহা দেখিয়াছে বা ঠেকিয়া শিখিয়াছে তাহা ছাড়া বাস্তবিকই কি আর কিছু সম্বন্ধে সে লিখিতে পারে না? কি রকম কল্পনা শক্তিহীন সঙ্কীর্ণ মানুষ সে?

ভিক্টর হুগো জিন ভলজীনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার জন্য কি তাঁহাকে জেলখানায় কয়েদীর জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল! অবশ্য জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিতেই হইবে, কিন্তু জীবনের হুবহু অনুকরণ করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। কল্পনাশক্তিসম্পন্ন যে মানব, সে নিজের মধ্যেই একটি জগৎকে বরণ করে, জীবন হইতে সামান্য একটু ইঙ্গিত লইয়াই সেই জগৎ চলিতে আরম্ভ করে। এখন সকলেই স্বীকার করে যে, বালজাক (Balzac) ও ডিকেন্স যে সব শ্রেষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সবের সহিত তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তব জীবনের কোন মিলই ছিল না। বালজাক সমাজের যে চিত্র দিয়াছেন, সে সবই একেবারে ভ্রান্ত, সমাজ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার নিজের জগৎ তাঁহার পরিপার্শ্বিক বাস্তব জগৎ অপেক্ষা অনেক জীবন্ত ও সত্য ছিল, জীবনের যথাযোগ্য আলেখ্য তিনি দেন নাই, বরং জীবনই তাঁহার সৃষ্টি সকলের অনুকরণ করিয়াছে।

তাহা ছাড়া পণ্ডিচারীতে একাধারে নির্জ্জনবাস করিতেছে কে? তোমার চারি পার্শ্বে রহিয়াছে জীবন্ত নরনারী, বৃহত্তম সহরের ন্যায় এখানেও মানব-প্রকৃতির পূর্ণ খেলা চলিতেছে—কেবল তাহাদের মধ্যে কি রহিয়াছে তাহা দেখিবার দৃষ্টি চাই, আর এমন কল্পনাশক্তি চাই যাহা কয়েকখানা ইট লইয়াই এক বৃহৎ ইমারৎ তুলিতে পারে। এটা দেখিবার সামর্থ্য চাই—যে মানব প্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান, তাহা হইতে মূল জিনিষগুলি সংগ্রহ করিয়া উচ্চ আর্টের সৃষ্টি করিতে হইবে।

কিশোর বয়সে তোমরা যারা সাহিত্য রচনা সুরু করেছ, শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত বাণী ভালো করে ভেবে দেখবে। যা-ই লেখো না কেন, তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর তোমাদের শিল্পসৃষ্টি নির্ভরশীল। শিল্পীর মহান্ কর্ত্তব্য হচ্ছে অন্ধ নয়নে দৃষ্টিদান, বধির কর্ণে শ্রবণশক্তি অর্পণ। জীবনকে নিয়েই সাহিত্য। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার প্রকৃত জীবনের দিকে দৃষ্টি চালনায় সহায়তা করা। এমনভাবে বাহুল্যহীন সুস্পষ্টতার মাধ্যমে অতি অল্প কথায় বস্তুজগতের ভাবচিত্রটীকে পরিস্ফুট করে তোলার দিকে তোমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত—যাতে তোমাদের শিল্প সৃষ্টি শুধু মানুষের মননশীলতাকেই উদ্বুদ্ধ করবে না, তার হৃদয়কেও মুগ্ধ করবে।

মানুষ মুখে যে কথাই বলুক না কেন, তার আসল তাৎপর্য্য হচ্ছে তার অনুভবের ভিতরে। আধুনিক রচনায় প্রাঞ্জলতা ও অনায়াস-বোধ্যতা ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। গণতন্ত্রের যুগে মানুষের মনের ভিতর আর আভিজাত্যের নিদর্শন নেই। মেটারলিঙ্কের রচনায় দেখা যায় রাজার কথায় আর রাজভৃত্যের কথায় বিশেষ তফাৎ নেই। গণতন্ত্রের নিদর্শন নেই। গণতন্ত্রের যুগে রাজা আর রাজভৃত্যের লোপ পেয়েছে। সুতরাং আজকের দিনের রচনায় ও ধরণের আদর্শ আর চলে না। এটা জেনে রেখো রচনামাত্রেই সাহিত্যের আসরে স্থান পায় না,—সাহিত্য সৃষ্টির উপজীব্য বস্তু হচ্ছে রস। রস না থাকলে সে রচনা সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করে না।

লেখকের মনে প্রাণে যেটা আছে, তার লেখায় সেইটাই জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। কেবল ভাবুকতার ওপর জোর দিলেই চল্‌বে না, কিভাবে ব্যক্ত করা যায় সেটার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বস্তুহীন ভাব নিরর্থক। ভাবকে রসশ্রীমণ্ডিত করে তোলাই সাহিত্য রচনার লক্ষ্য। তোমরা বোধহয় লক্ষ্য করেছ, কোন একটা কথাকে বল্‌তে হোলে তাকে দু'ভাবে বলা যেতে পারে। ভাবের সঙ্গে যা বলা যায় আর যা আমাদের কাছে বাণী বলে সমাদৃত হয়, তা বেশ কিছুটা ভেবে তবে তার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যায়। (যেমন—'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।)' আর একভাবে বলা যায় গল্পের ভিতর দিয়ে নিজের মনোমত চরিত্র সৃষ্টির সাহায্যে। নিজের জীবনাদর্শের অনুভূতি এর মধ্যে ফুটে ওঠে। এজন্যে চরিতশিল্পীরা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করেন।

কার্লাইল, এমার্সন, মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যেভাবে ভাবময় বাণী প্রচার করেছেন তা বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে অক্ষয় সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আবার মনোমত কাহিনী রচনা করে নিজেদের আদর্শ-অনুরূপ চরিত্র সৃষ্টি করে ভিক্টর হুগো, টলষ্টয়, ইবসেন, গর্কি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্রশিল্পীরা নিখিল মানব মনে চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছেন। চিন্তার দ্বারা মানুষের চিন্তাশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরণা দিয়ে নিজেদের ধারণা-নুযায়ী জীবনাদর্শকে ব্যক্ত কর্‌বার চেষ্টা করেছেন বহু সাহিত্যিক। তাঁদের স্থান বহু উর্দ্ধে। এ জন্যেই সাহিত্যিকদের জীবন পুরোহিত বলা হয়।

সাম্প্রতিক দ্বিতীয় সমরোত্তর দিনে মানুষের জীবনাদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটেছে, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও চিন্তাধারার বিবর্ত্তন এসেছে, ফলে সাহিত্যেও অভাবনীয় রূপান্তর দেখা দিয়েছে। মানুষের বাস্তব ও আত্মিকক্ষেত্র একেবারে বিধ্বস্ত হওয়ায় আজকের মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েছে। দিক্‌ভ্রষ্ট মানুষের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে বলিষ্ঠ রচনার প্রয়োজন আছে, অভয়বাণী শুনিয়ে আমাদের ছায়াচ্ছন্ন জীবনকে সূর্য্যস্নাত কর্‌বার সময়ও এসেছে। তাই তোমরা এমন কিছু রচনা করো—যাতে আমরা পেতে পারি প্রবল আদর্শবাদ, আর বিপুল আশার বাণী। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করেছ আজকের সাহিত্য রচনায় সমাজ জীবনের বিচিত্র দিক ফুটে উঠ্‌লেও বলিষ্ঠ প্রাণের আশার আলোক সম্পাত করা হয়নি, তোমাদের ওপর রয়েছে সেই গুরুদায়িত্বভার। প্রার্থনা করি তোমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অন্তর্গূঢ় হয়ে উঠুক যাতে তোমরা দিয়ে যেতে পারো নবতম আদর্শের চেতনা আমাদের সাহিত্যে, দিয়ে যেতে পারো সত্যের আবির্ভাব, আর শিবসুন্দরের লীলা আমাদের সাংস্কৃতিক আয়তনে আর বাঙ্গলা সাহিত্যকে করে যেতে পারো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য—যাতে তোমাদের রচনা পড়্‌বার জন্যেই বিশ্বের অধিবাসীরা বাঙ্গলা শিখতে উদ্যত হয়, সেইদিনের অপেক্ষায় রয়েছে অনাগত কাল, এটা তোমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না। উপসংহারে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী তোমরা ভুলো না। তিনি বলেছেন—"যশের জন্য লিখিবে না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।"

প্রথম দর্শন

প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

১৯৩৬ সালের আগে মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ-দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ঘটে নি। অবশ্য, তার আগে তিনি কোলকাতায় কয়েকবার এসেছেন এবং তাঁর বক্তৃতা শ্রবণের জন্য অনুষ্ঠিত যে কোন জনসভায় তাঁকে দর্শন করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যে কোন কারণেই হোক, তা আর হয়নি! অথচ এর বহুদিন আগে

থেকে—সেই বালক বয়স থেকেই মহাত্মাজিকে দর্শন করবার একটা বিশেষ আকাঙ্ক্ষা আমার মনের মধ্যে ছিল।

১৯৩৬ সালে কোলকাতা কর্পোরেশন গান্ধিজীকে একটি নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করেন। টাউন-হলে এই সম্বর্দ্ধনা-সভার অনুষ্ঠান হ'য়েছিল।···দুপুরবেলা চাকরী-পাবার একটা দরখাস্ত লিখছি, এমন সময় আমার এক দেশ-কর্ম্মী বাল্যবন্ধু হঠাৎ এসে বল্লেন—'টাউন-হলে যাবি—মহাত্মাকে দেখতে? আমার কাছে কার্ড আছে—আর এই বেলা গেলে খুব কাছেই—ভাল জায়গায় সিট পাবি।' দেশপূজ্য নেতাকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌বার এ সুযোগ আমার ছাড়তে ইচ্ছা কর্‌ল না। আমি তখুনি তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম।

বন্ধু আমাকে টাউন-হলে নিয়ে গেলেন এবং সত্যই বেশ ভাল যায়গাতেই দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর স্বেচ্ছা-সেবকের কর্ত্তব্যে যোগ দিতে চ'লে গেলেন।

মহাত্মাজি তখনো আসেন নি।·· ইতিমধ্যেই টাউন-হলের দ্বিতলের প্রশস্ত হলটি নাগরিকবর্গে ভ'রে গিয়েছে। এঁরা সব সাধারণশ্রেণীর নাগরিক নন।···উত্তর দিকের সমস্ত উঠানটা এবং দক্ষিণের রাস্তাটা দামী দামী মোটরে বোঝাই। আমার আশে-পাশে যাঁদের দেখেছি সবায়েরই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আকৃতি; মূল্যবান সুদৃশ্য পরিচ্ছদে ভূষিত।··· একটু গরমের ভাব থাকায় রুমাল বার করে তাঁরা পরিচ্ছন্ন মুখ মুচছেন—সুগন্ধে হল ভরে যাচ্ছে।···সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের আকৃতি ও পোষাকের কথা মনে পড়ল।—চার-দিনের খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি-কণ্টকিত, রুক্ষ-অবিন্যস্ত-কেশ-যুক্ত একটি ম্লান, চিন্তাক্লিষ্ট মুখ!—কনুই-ছেঁড়া, মলিন, টুইল-সার্ট পরণে—বিয়াল্লিশ-ইঞ্চি কাপড়ের বহর,—গুটিয়ে প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালটা একবার মুছতে গিয়ে দেখি—কালো ঝুলের মত কি একটা দাগ কাপড়ে লেগে গেল!···মনটা যেন গ্লানিতে ভ'রে গেল। ভাবলুম—এই অভিজাত সমাজের ভিড়ে, এই বিশেষ সভায় আমার মত নগণ্যের না এলেই ভালো হ'তো। স্বাভাবিক চেহারা বা বেশভূষার জন্য আমার কোনদিনই লজ্জাবোধ করবার প্রয়োজন হয়নি—কিন্তু সে-সময় সঙ্কোচে আমার সমস্ত শরীর যেন লুকোবার স্থান খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌ল!···

সভার কল-গুঞ্জন প্রায় নিস্তব্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।—এইবার তিনি এসে পড়বেন। সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে প্রবেশ-পথের দিকে তাকাচ্ছে। এই অভিজাত সার্থক-জন্মা, সুখী জন-মণ্ডলী ব্যাকুলভাবে যাঁর জন্য প্রতীক্ষা কর্‌ছেন, সেই শ্রেষ্ঠতর মহান পুরুষ আস্‌ছেন!·· বুকে যেন একটা কম্পন অনুভব করতে লাগলুম!

···বিশাল হলটি তখন একেবারেই স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। মহাত্মাজি এসে পড়েছেন! পরক্ষণেই তিনি হলে প্রবেশ করলেন!···আমি দেখলুম—হাঁটুর উপরে তোলা-বস্ত্র পরণে নগ্ন-গাত্র এক প্রবীণ—অল্পহাসি মুখে নিয়ে—ধীর অথচ অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করলেন।···

বিস্ময়ে আমার চোখে পলক পড়ে না!···যাঁর জন্য এত উদগ্র সমারোহ, তাঁকে এই বেশে চাক্ষুষ যখন দেখলুম, আমার মনের সেই সময়কার অবস্থা আমি কারুকে বোঝাতে পারবো না!···শুধু মনে হ'লো,—আমার বেশ-ভূষার দৈন্যের সমস্ত গ্লানি,—আমার সমস্ত মালিন্য,—মুছে গেছে!···শুধু মনে হ'লো,—আমার অভিমান নিরর্থক, দারিদ্র্য আর আমার অপমান নয়! আর মনে হ'লো—আমারই আছে, এই মহাপুরুষকে দর্শন করবার, এঁর চরণ-পদ্মে প্রণাম জানাবার, অগ্রাধিকার!···

সেই সভায় মহাত্মাজি কি বলেছিলেন তা' আমার মনে নেই! ব্যাকুল আবেগে অন্তর তখন কাণায়-কাণায় পূর্ণ। নিস্পন্দভাবে চেয়ে আছি সামনের দিকে, কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না—চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে।···

একটা অনুভূতি শুধু জেগে থাকে!···

—ভারতের সহস্র সহস্র বৎসরের সুমহান সাধনার দীপ্তি—এই কটিমাত্রবস্ত্র-পরিহিত অক্লান্ত পরিব্রাজক—এই উপবাস-ব্রতধারী, সহিষ্ণু সন্ন্যাসীর শীর্ণ দেহের অভ্যন্তরে কি অনির্ব্বাণভাবেই না জ্বলছে!···

শাশ্বত-ভারতের এই মূর্ত্ত-প্রতীকের সান্নিধ্য আমার জীবন সার্থক ক'রে দিলে—একটা মোহময় আবেশে আমার সমস্ত চেতনা—আমার সমস্ত সত্ত্বা যেন স্তব্ধ··· যেন লুপ্ত হ'য়ে গেল!···

———

বকুলফুল

শ্রীশিবানী নাগ

বকুল ফুলের গাছটি ছেয়ে—
গন্ধে ভরা হাওয়া—
দিনমণির পরশে তা'র
কী অপরূপ চাওয়া।
সবুজ ঘাস হোল যে সাদা
শতেক বকুল ফুলে,
পথের লোক উদাস মনে
থমকে দাঁড়ায় ভুলে।
ফুলের মত সরল শিশুর
মনেও লাগে দোলা,
আপন মনে গাইছে একা
নেশায় আপন ভোলা।
চললো ছুটে—আনলো লুটে
শতেক ফুলের মেলা,
বকুল ফুলে গাঁথলো মালা
শিশুর খেয়াল খেলা
আকুল করা বকুল ফুল,
মোহন বাঁশীর স্বর!
শিশুর মনে—বুড়োর মনে
তুমিই স্বপন পুর।

ভাইফোঁটা

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

লীনা প্রতিদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই দেখতে পায় তাদের বাড়ীর সমুখের চওড়া রাস্তার বাঁপাশ দিয়ে যে সরু গলিটি বেরিয়েছে—তারই ভিতরকার একটা ভাঙা বাড়ীর একখানিমাত্র দোতলার ঘরের জানালা দিয়ে একটি ছোট্ট পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে! ছেলেটির ঐ পুরাণো নোনাধরা দোতলার ঘরখানির জানালার অংশটুকুই মাত্র দেখা যায় লীনাদের ঘর হতে। লীনাদের আজ বছর দুই হলো বড়ো রাস্তার ওপরে এই নতুন ঝকঝকে মস্ত বাড়ীখানি তৈরী হয়েছে। ওরা বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ করেছে গত বছর। তার আগে লীনারা বিদেশে ছিলো। ছেলেটির দোতলার ঘরখানির জানালাটুকু ছাড়া আর সবখানি অংশই অন্য অন্য বাড়ী ও গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। ছেলেটি বোধহয় তার জানালা হ'তে লীনার শোবার জায়গাটি দেখতে পায়—তাই এক এক দিন সকালে লীনা বড্ড বেলা করে ফেলতো ঘুম ভেঙে উঠতে—আর উঠে লজ্জিত চোখে ছেলেটির জানালার দিকে চেয়ে দেখতো—ফুটফুটে ছেলেটি মাথা দুলিয়ে যেন ওর দিকেই চেয়ে হাসছে। লীনা ভারী রেগে তখন ছুটে গিয়ে বাথরুমে ঢুকতো। তবু লীনার প্রতিদিন ঐ ছেলেটিকে দেখতে বড্ড ভালো লাগতো—ভাঙা জানালার কাছেই একটা বিছানায় কাকে যেন চাদর মুড়ি দিয়ে কখনও শুয়ে কখনও বসে দেখা যেতো। ছেলেটি সারাদিন ঐ ঘরেই নানারকম কাজ করতো—কখনও জল আনছে, কখনও কাপড় শুকোতে দিচ্ছে। কখনও সে আপন মনে জানালায় বসে একটা বিবর্ণ বল নিয়ে খেলা করতো। কখনো বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে গরাদেতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তো। কখনো বা একখানি ছেঁড়া বই নিয়ে বসে পড়তো। পরণে একখানি ছেঁড়া ধুতী, আর গেঞ্জী—কি ফুটফুটে সুন্দর হাসিমাখা মুখখানি। লীনার ওকে বড় ভালো লাগে—ওদের দুইবোনের একটিমাত্র ছোট ভাই আড়াই বছর হলো ওদের বাড়ী শূন্য করে দিয়ে চলে গেছে। লীনার চেয়ে সে দু বছরের ছোট ছিলো—ওর আবছায়া মনে পড়ে হারিয়ে যাওয়া ভাইটির মুখ। মাকে ভাইর কথা জিজ্ঞাসা করলেই মা হু হু করে কেঁদে ফেলেন, তাই লীনাও কেঁদে ফেলে—ভাইর কথা আর শোনা হয় না। দিদি লীনাকে বারণ করেছে ভাই মণ্টুর কথা বলতে মার কাছে। মার ঘরে তিন বছরের ভাইটির যে সব বড়ো-বড়ো অয়েল-পেন্টিং আছে—ঐ জানালার ফুটফুটে মুখ ছেলেটির যেন ঐ রকমই হাসি হাসি ভাব। লীনা কিন্তু এসব কথা মাকে বা দিদিকে একদিনও বলে না।

সেদিন সকালেও লীনার বেশ বেলা হয়ে গেছিলো

ঘুম ভাঙতে! মা যে কেন ডেকে দেন না। লীনা একটু অপ্রস্তুত মুখে ছেলেটির জানালায় তাকালো—ছেলেটি মাথা নীচু করে বসে কি যেন করছে—ওর দিকে চায়নি। লীনা জানালার কাছে বসেই রইলো খাটের ওপর। একটু পরেই ছেলেটি উঠলো দু'হাতে দুটি গাঁথা মালা নিয়ে—মনে হলো যেন শিউলীর মালা। মালা দুটি হাতে নিয়ে এবার একবার ছেলেটি জানালায় এসে দাঁড়ালো—লীনার দিকে চেয়ে সে একটু করুণ হাসলো যেন। তারপরে দেয়ালের দিকে ফিরে চলে গেলো বোধহয় হাত উঁচু করে কোনও ছবিতে পরাতে লাগলো। এই সময় লীনার দিদি অলকা ঘরে ঢুকে বললো—"লিনি! তোর ঘুম সাঙ্গ হলো না এখনও? মা সেই থেকে জলখাবার নিয়ে বসে আছেন খাবার ঘরে—যা শিগ্‌গির, আচ্ছা কুম্ভকর্ণ মেয়ে বাবা—!"

দশটার সময় লীনা তাড়াতাড়ি ভাত খাচ্ছে—ওদিকে স্কুলের বাস এসে গেছে। অলকা তাড়াতাড়ি করছে—তার খাওয়া ও কাপড়পরা হয়ে গেছে। অলকা লীনার ভাত ফেলে ওঠা দেখে বলে উঠলো—"ও মা, মা গো! লীনার কাণ্ড দেখো এসে—এক তো ঘুম থেকে উঠতে দেরী কোরবে—তারপর আবার চোদ্দ ঘণ্টা জানালায় বোসে দৃশ্য দেখবে—তার ভাত খাবেই বা কখন—স্কুলে যাবেই বা কখন—আর পড়বেই বা কখন?" লীনা বিরক্ত-মনে জুতা পরতে পরতে মনে মনে বললে "ক্লাস টেনে উঠে দিদির সর্দারী বড্ড বেড়েচে!" এতো তাড়াতাড়ির মধ্যেও একবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো—বরাবরই ছেলেটিও এসময় থাকে না—বোধহয় স্কুলেই যায়। আজ দু তিন দিন হ'তে কিন্তু সে ঘরেই থাকে। আজও মাথা নীচু করে কি যেন করছিল। লীনা তাড়াতাড়ি লাফাতে লাফাতে চলে গেলো—আজই ওদের পূজার ছুটি হয়ে যাবে।

পূজা কেটে গেলো। কালীপূজাও চলে গেলো—আর দুদিন পরেই ভাইফোঁটা। লীনারা এ'কদিন নানা-রকম আনন্দে আর হৈ চৈ করে বেড়ানোয় মশগুল ছিলো—ছেলেটির জানালার দিকে আর বিশেষ দেখা হয়নি—তবে কখনও আচমকা তার সাথে দেখা হয়ে গেলে যেন মনে হতো তার মুখখানি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে—আর সে হাসতো না কখনও। আজ সকালে লীনা অনেকক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে একটিবার মাত্র তাকে দেখতে পেয়েছে—মুখখানি তার কি ম্লান! লীনার তাই কোনো কিছুই যেন ভালো লাগছিলো না। লীনা ওর সঙ্গে একটিও কথা বলে নি—ওর নাম জানে না—ওদের বাড়ী কোথা হতে যেতে হয় তা জানে না, অথচ তার জন্য যেন ওর চোখে জল আসতে লাগলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর লীনা বিছানার ওপর জানালায় হাত রেখে চুপ কোরে বসেছিলো—কোলের ওপর নতুন শারদীয়া বই বাবার দেওয়া। লীনার কিন্তু এখন বই পড়তেও ভালো লাগছিলো না। দিদি তার এক বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে—আর মা বোধহয় পাশের ঘরে কোনও কাজ করছেন—মাঝে মাঝে চুড়ী বালা চাবীর টুংটাং আওয়াজ আসছে। লীনা আনমনে তাদের হারানো ভাইটির কথা ভাবছিলো—সে থাকলে তাকে কেমন ছোড়দি বলে ডাকতো—কেমন দুটিতে খেলা করতো—কেমন ভাইফোঁটার দিনে ফোঁটা দিতো ভাইকে—বলতো—

"স্বর্গে উলু উলু মর্ত্যে ফোঁটা
আমি দিলেম ভাইকে ফোঁটা
যমুনা যেমন যমকে ফোঁটা
দিয়ে অমর কোরেছিলেন—
আমিও তেমন আমার ভাইকে ফোঁটা
দিয়ে কোরলেম অমর, অজর, অক্ষয়!"

মামাকে ফোঁটা দেবার সময়ে মাকে বলতে শুনে লীনা ছড়াটি শিখে নিয়েছে। ভাবতে ভাবতে কখন যেন ওর তন্দ্রা এসেছিলো জানালায় মাথা রেখে। হঠাৎ আধঘুম ভেঙে ও যেন চমকে জেগে উঠলো—ছেলেটির জানালায় চাইতেই দেখে সে ব্যাকুলভাবে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—দুই চোখে যেন তার কান্না ফেটে পড়ছে। লীনাও এতে আকুল হয়ে উঠলো—হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললে—"আসচি।" দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়ে—মা আলমারীতে কাপড়-চোপড় গোচাচ্ছিলেন—মাকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো—"মা, মাগো! ও ডাকচে যে—চলো মাগো!" মা ভীষণ অবাক হয়ে বললেন—"কে ডাকচে রে?—ও মা! কাঁদচিস কেন এমন কোরে?

চুপ চুপ কাঁদে না···কোথা যাবি···আচ্ছা আচ্ছা চল··· যাবি কোথায় ?” লীনা মাকে টেনে এনে ওর শোবার জায়গায় জানালার কাছে এসে আঙুল দিয়ে ছেলেটির জানালা দেখিয়ে বললো—“মা ঐ ওদের বাড়ী চলো—ও ডাকছিলো।” মা আর কি করবেন ? ঝিকে বললেন “একবার লালসিংকে ওপরে ডেকে এনে ঐ জানালাটা দেখা—জানি না ওখানে আবার লীনুর কে বন্ধু জুটলো !” ড্রাইভার ওপরে এসে জানালাটি দেখে বললো, “হাঁ মাইজী ! ও এক বংগালী বাবু থৈ, আভি মর গাঁয়—উনকা বহু বহুত বেমার—ছোটা একঠো লড়কা হ্যয়—বড়া গরীব মাইজী—দেখনেবালা কোই নেহি !”

দুমিনিটের মধ্যেই মোটর গিয়ে একটি জীর্ণশীর্ণ ভগ্নদশা বাড়ীর দোরে থামলো। সরু অন্ধকার গলিতে লীনা মোটরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলো—এখন তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নেমে পড়লো—মাও আস্তে আস্তে নামলেন। ছেলেটি খোলা দোরের কাছেই দাঁড়িয়েছিলো, ছুটে এসে লীনার হাত ধরে বললে, “দিদি তুমি এসেচ ? মার বড় অসুখ···চলো ওপরে !” লীনার “দিদি” ডাক শুনে বড় আনন্দ হলো। লীনার মা ছেলেটিকে দেখে চমকে উঠলেন। আরও অবাক হলেন তার গলার স্বর শুনে। তিনিও খুব তাড়াতাড়ি ওদের পেছনে পেছনে উঠলেন।

দোতলার ঘরটিতে একটি ছেঁড়া মলিন বিছানায় একজন বিধবা শুয়েছিলেন—শীর্ণ শরীর বিছানার সাথে মিলিয়ে গেছে। লীনার মা বিস্ময়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, “মন্দা ! ভাই তুই এখানে···এ ভাবে ?” ছেলেটির মাও আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করলেন—কিন্তু পারলেন না। ক্ষীণ উত্তেজিত স্বরে বললেন, “মণিকা ! গাঁয়ের ছোটবেলার প্রাণের বন্ধু বকুল-ফুল ! এখানে তো তোকে কখনও দেখিনি···” থেমে থেমে আবার বলতে লাগলেন—“মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন ! বিয়ের পর দুই বন্ধুতে ছাড়াছাড়ি···চিঠি লেখাও আস্তে আস্তে ঠিকানা হারিয়ে ফেললো !···কোথায় যেন পশ্চিমে তুই চলে গেলি শেষে ! আর আমি ! তাঁর ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেলো···নিজের বিরাট বাড়ী বিক্রী হয়ে, এলাম এই অন্ধকূপে !···এইখানেই মেয়ে গেলো···গেলেন তার বাবা, এবার আমার যাবার দিন গুনচি।” অবসন্ন হয়ে কিছুক্ষণ থেকে আবার বললেন, “কি আনন্দ বকুলফুল, আবার দেখা হলো তোর সঙ্গে···সুজু মাসীমাকে প্রণাম করো বাবা !” সুরজিত প্রণাম করতেই তাকে চুমো দিয়ে বুকে টেনে সজল চোখে লীনার মা বললেন—“লীনু তার ভাইটিকে ঠিকই চিনে নিয়েছিলো।”

“হ্যাঁ ভাই বকুলফুল—আমার নয়নের মণি সুজুকে তোমায় আজ দিয়ে দিলাম—এবার আমি নিশ্চিন্তমনে যেতে পারবো···!” সুরজিতের মা হঠাৎ অচৈতন্যের মতো হয়ে পড়লেন। সুরজিত কাঁদতে লাগলো।

ভাইফোঁটার দিন এসে পড়লো। সুরজিতের মার সেবাশুশ্রূষা খুব হচ্ছে, কিন্তু তিনি বোধহয় আর বাঁচবেন না। লীনা তার দূরের জানালার ভাইটিকে এবার একান্ত আপন করে পেয়েছে। ভাইফোঁটার দিনটিতে ওর কি আনন্দ আজ। মনের মতো করে সুরজিতকে সাজিয়েছে। ফুলের মালা গলায়, চন্দন কপালে, সুরজিত ফুলআঁকা আসনে, আলপনার ওপর, রুপোর থালায় মিষ্টি সামনে, ঘীএর প্রদীপ জ্বেলে, লীনা বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটি ভোরের শিশির-মেশানো চন্দনের বাটিতে ডুবিয়ে বললে, “ও দিদি ভাই সর না। তাড়াতাড়ি কর না। আমার যে ভাই—তোর তো এতোটুকুন ভাগ—কেবল ফোঁটাটুকুন দিবি—

স্বর্গে উলু উলু মর্ত্যে ফোঁটা
আমি দিলেম ভাইকে ফোঁটা
যমুনা যেমন যমকে ফোঁটা
দিয়ে অমর কোরেছিলেন—
আমিও তেমনি আমার ভাইকে ফোঁটা
দিয়ে কোরলেম অমর, অজর, অক্ষয়।”

নীলাক্ষী নর্মদা

শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

মধ্যপ্রদেশের প্রাণদাত্রী নর্মদা নদীর অরণ্য-শ্যামল নীল নয়নের নীলিমায় সুদূরের স্বপ্ন। বিন্ধ্যপর্বত মালার প্রসাদপুষ্ট চঞ্চল সমীর হিল্লোলে, তার তরঙ্গ ভঙ্গে দূরান্তরের হাতছানি। তাইতে দেশ দেশান্তর হোতে ছুটে আসে মানুষ তার পাদপীঠে উৎসর্গ করতে অন্তরের সৌন্দর্য পিপাসা।—দুর্গম অমরকণ্টক পর্বতের গিরি গহ্বর থেকে নেমে আসছে নর্মদা; চলার ছন্দে তার মধ্যপ্রদেশের মৃন্ময় মাটীর পাথরে পাথরে জেগে উঠেছে উর্বরা শক্তি। সোনার ধান আর ফলার ফসলে দেশের মানুষের দুহাত ভরে দিয়ে আবার ছুটে চলেছে সাগর মিলনের উদ্দেশে। উত্তরাখণ্ডের হিমালয়ের তুষারমৌলী গিরিশৃঙ্গ যেমন গঙ্গার স্বভাব-সৌন্দর্য শতগুণে বৃদ্ধি করেছে, সেই রকম জব্বলপুরের নর্মদাতীরস্থ বিন্ধ্যপর্বতের শ্বেত মর্মররাজি নর্মদাকে দিয়েছে অনবদ্য শোভা ও অপার্থিব সুষমা।

হাওবাগ স্টেশান থেকে মার্বেল-রকস্ দীর্ঘ বারো মাইল পথ। আমরা চলেছি সেই পথে। সকলের মনই আশা নিরাশার দোলায় দুলছে। শ্বেত-মর্মর দেখা হবে ত? নর্মদার ভেড়া ঘাটে যাত্রী পারাপারের জন্য নৌকা-পথ খুলেছে কি? কারণ বর্ষায় নদীতে জল বৃদ্ধির জন্য কিছুদিনের জন্য জলপথ বন্ধ থাকে।

তারপর অক্টোবরের প্রথম বর্ষান্তে সরকার থেকে নদীপথ খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু তখন ছিল সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগ। আর তার দু'দিন আগেই জব্বলপুরে তুমুল ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজেই নদী পথ তখন না খোলাই সম্ভব ছিল। মনে সন্দেহ থাকলেও উৎসাহ ছিল অদম্য। যেমন করেই হোক মার্বেল রকস্ দেখতেই হবে। নদী পথে যদি গতি-রোধ হয়, তবে জঙ্গল অতিক্রম করে পাহাড়ে উঠে পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে তাকে দেখবো। যদিও সে দেখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তবুও মানুষ কিনা আশা করে?

পথিপার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী দেখার জন্য আমরা টাঙ্গা নিয়েছিলুম। যন্ত্র-যানের দ্রুত গতির সঙ্গে দৃষ্টি ও মনের গতি কিছুতে মেলে না, তাই গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে একটু দেরী হলেও পথের দিকে চেয়ে মন প্রসন্ন থাকে। গাড়ী ছুটে চলেছে। সহর সহরতলী অতিক্রম করে ক্রমে একসময়—দেখা গেল জব্বলপুর-নাগপুর রোডের প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন রাজপথ। তার দু দু পাশে অবাধ উন্মুক্ত প্রান্তর, অথবা অরণ্য-বেষ্টিত শৈলমালা আকাশের সাথে একাত্ম হয়ে রয়েছে। কোথাও বা মাইলের মাইল ভরে সোনার ঝালরের মত ঝলমল করছে মঞ্জরিত শস্যক্ষেত্র। কোথাও বা শুধু পাহাড় আর জলাভূমি। সবুজ আর সাদায় একত্রিত হয়ে বনলক্ষ্মীর আনাগোনার পথে এঁকে রেখেছে সুন্দর আল্পনা। কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল সুউচ্চ শৈল-চূড়ায় রামচন্দ্রের একটী মন্দির। এই মন্দির সম্বন্ধে একটী প্রচলিত কাহিনী আছে। বহুদিন পূর্বে এর প্রতিষ্ঠা করেছিল এক দরিদ্র ভক্তি-মতী বৃদ্ধা রমণী। সেই বৃদ্ধার ইহ সংসারে কেহ ছিল না। গৃহস্থর বাড়ী বাড়ী গম ভেঙ্গে ছোলা পিষে সে দিনপাত করতো এবং সেই সামান্য আয় থেকে প্রত্যহ কিছু কিছু সঞ্চয় করে সেই অর্থে, এই মন্দিরের একশত

নর্মদার জলধারা

সিঁড়ি সে নির্মাণ করিয়ে দিয়েছে। সিঁড়ি তৈরী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার জীবন দীপও নির্বাপিত হয়। আমরা মনে মনে সেই কৃষক-বধূকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানালুম।

এদিকের হনুমানগুলি খুব বড় বড়। মাঠে আলের ধারে বা বৃক্ষমূলে হনুমতীরা যখন শাবক বক্ষে নিয়ে বসে থাকে তখন দূর থেকে সব মানুষ বলে ভ্রম হয়। এদিকে পাখী বিশেষ দেখা না গেলেও, বহু বিচিত্রধরণের বকের পাঁতি দেখা যায়। সবুজ শস্যক্ষেতের মধ্যে তারা যখন ছড়িয়ে থাকে তখন দেখে ঠিক একখানা ছবি বলে মনে হয়। পথের দৃশ্যরাজি দেখতে দেখতে বেলা প্রায় একটার সময় আমরা ভেড়াঘাটে এসে পৌঁছুলুম। এই পর্যন্ত এসে আর গাড়ী চলার পথ নেই। ভীষণ খরস্রোতা নর্মদা এখানে পথের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এখানে কয়েকটী হোটেল, রেষ্টহাউস ইত্যাদি আছে। জ্যোৎস্না রাত্রে মার্বেল রকস্ দেখার জন্য অনেকে এখানে রাত্রি অতিবাহিতও করে থাকে। সাঁকোর উপর দিয়ে নদী পার হয়ে আমরা এপারে এলুম। এ পথের দৃশ্য সত্যই মানুষের মন ভুলায়। কিন্তু বড় জঙ্গলাকীর্ণ। একধারে পাষাণে চূর্ণিত হয়ে প্রমত্ত বেগে জলপুঞ্জ আবর্তিত করে সমতল ভূমিতে নেমে আসছে নীলাক্ষী নর্মদা। অপর ধারে বনরাজি সমাচ্ছন্ন বিন্ধ্যগিরিশ্রেণী উন্নত শিরে দণ্ডায়মান। মধ্যভাগে সঙ্কীর্ণ অসমতল বন্ধুর পথ এঁকে বেঁকে হারিয়ে গেছে দূর দিগন্তে। এই পথ ধরে আমরা যাত্রা করলুম ধুঁয়াধার

ঝরণার দিকে। গাইড বললে, "আগে ধুমাধার দেখে পরে শ্বেতমর্মর দেখতে নর্মদায় যেতে। (সুখের বিষয় এখানে এসেই ভাদুড়ী খবর সংগ্রহ করলেন যে গতকাল থেকে নর্মদায় নৌকা বিহারের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে)। কেননা এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাঘ আছে। যদিও এই প্রখর দিবালোকে বাঘ বনের বাইরে আসে না। তবুও পার্বত্য প্রকৃতির কথা কিছুই বলা যায় না। যদি হঠাৎ আকাশ কালো করে মেঘ ঘনিয়ে বৃষ্টি নেমে আসে, তার সঙ্গে ঝড় আর তিমির তমসা, তাহলে আর রক্ষা নেই। যদিও ব্যাঘ্র ভীতির অপেক্ষা সেই মধ্যাহ্ন বেলার পাষাণ বিদারক পাহাড়ী রৌদ্র সহ্য করা অত্যন্ত কষ্টকর, তবুও আমরা সেই পথেই চলতে চলতে পৌঁছলুম। একটু পরেই নীলাক্ষী নর্মদা বনান্তরালে অদৃশ্য হয়ে সেখানে জেগে উঠলো শুধু বন আর পাহাড়। এখানে বনের মধ্যে সঙ্কীর্ণ একটী পথ রেখায় দু একজন মানুষকে দেখা গেল। গাইড বললে, ও দিকে সোপস্টোনের পাহাড় আছে সেখানে পাথর কাটার কাজ হচ্ছে। জব্বলপুরের এই মার্বেলরক্স অঞ্চলে যত সাদা পাথরের সৌখীন সামগ্রী পাওয়া যায় সে সমস্তই ওই সোপস্টোন নির্মিত। আসল এখানের শ্বেত পাথরের জিনিষ কিনতে হলে পূর্বে দোকানীকে বায়না দিলে যথাসময় তারা তৈরী করে দেয়। সে বহু সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ।

পথ চলতে চলতে দূর থেকে এক সময় শোনা গেল, জলপ্রপাতের গর্জ্জন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ হতে অরণ্য পর্বতের পটভূমি সরে গিয়ে সেখানে জেগে উঠল বহুবিস্তৃত অসংখ্য শিলাকীর্ণ একটী প্রকাণ্ড জলপ্রপাত। সেই জলরাশি বহুনিম্নে ভূগর্ভে যেখানে পতিত হচ্ছে সেখানে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু রাশি রাশি শুভ্রাস্ত ধুমে শিলাগর্ভ সমাচ্ছন্ন। এই জলধারা পতিত হচ্ছে ত্রিশ ফুট নিম্নে ভূগর্ভে। মনে হয় সেখানে নিশ্চয়ই কোনও শ্বেতবর্ণের অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত আছে। তাই থেকে এত ধুম উদ্গীরণ হচ্ছে। এইজন্য এই প্রপাতের নাম হয়েছে ধুমাধার। সেই প্রপাতের পানে চেয়ে আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলুম মহাকালের রুদ্র রূপ। সেই রুদ্র দেবতার কণ্ঠে রূদ্রাক্ষের মালার মত নীলাক্ষী নর্মদা তার চতুঃপার্শ্বে উচ্ছল প্রাণ প্রবাহে টলমল করছে। আমরা কিছুক্ষণ সেখানে থেকে বিশ্রামের জন্য একটু ছায়াময় স্থান অনুসন্ধান করতে লাগলুম। কিন্তু কোথায় ছায়া? ছায়ার কিছুমাত্র চিহ্নও কোথাও দেখা গেল না। প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত পাষাণ শিলাগুলি ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে। সেই সব পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চলেছে নর্মদার জলধারা। সে জল খুব ঠাণ্ডা। কিন্তু স্রোত দুর্বার। এক পাথর থেকে অন্য পাথরে উত্তরণের সময় আতঙ্কে বুক কাঁপে। একটু অন্যমনস্ক হলেই নর্মদার স্রোতে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। এমন সময় একটী বড় পাথরের আড়ালে দেখা গেল, সেখানে শুষ্ক বৃক্ষশাখা মাটীতে পুতে তাইতে কৃত্রিম ছায়া সৃষ্টি করে সেই ছায়ায় বসে একটী কারিগর নানা রকম পাথরের জিনিষ তৈরী করছে। আমাদের শ্রান্ত দেখে সে তার স্থানটী ছেড়ে দিয়ে আমাদের বসতে অনুরোধ করল। সেখানে বসে সামান্য আহার ও বিশ্রাম করে স্থানদাতা শিল্পীকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আবার চলতে সুরু করলাম।

ধুমাধার জলপ্রপাতের ধ্বনি ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে এল, এখন পথপ্রদর্শক ছেলেটী বললে, "এখানে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির আছে, নিয়ে যাবো বাবু?"

ভাদুড়ী বললেন "হ্যাঁ চল"—

পায়ে চলা পথ ছেড়ে গাইড একটী জঙ্গলী পথের মধ্যে প্রবেশ করল। সে পথ ঢালু হয়ে যত উপরে উঠেছে—জঙ্গলও সেই পরিমাণে গভীর হয়েছে। অবশেষে এমন স্থান এল, সেখানে পথ বলতে কিছু নেই। সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে শুধু জঙ্গল। দুই হাতে বন্য গাছপালা সরিয়ে পথ করে নিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছে। সামনে পিছনে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তাহলেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে বাক্যালাপে যুক্ত হলুম। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে গাইডের আশ্বাস বাণী। শাখা পত্রের মর্ম বাণীকে ব্যাহত করে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে—"আর দুই ফারলং পথ বাবু, আর এক ফারলং পথ, ইত্যাদি।" সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। চন্দা পাপড়ীর কথা শোনা যায়, "এখন যদি বাঘ এসে পড়ে তাহলে কি হবে"? গাইড বললে, "মানুষের কথা শুনতে পেলে বাঘ কখনও বেরোবে না"। বলে সে উচ্চ কণ্ঠে কি একটা ছড়া বলতে সুরু করে দিল। যাহোক কোনও রকমে ভগবানের নাম করতে করতে আমরা জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটু অপেক্ষাকৃত মুক্ত স্থানে এসে উপস্থিত হলুম। সামনেই একটী প্রাচীন মন্দিরের বৃহৎ তোরণ দ্বার। অবসন্ন পথিক আমরা সেই সোপানে শ্রান্ত হয়ে উপবেশন করলুম। সকলে সকলের মুখের পানে চেয়ে মনে সাহস ফিরে এলেও আতঙ্ক তখনও সম্পূর্ণ ঘোচেনি। মন্দির থাকলেও স্থানটী এমন বনময়, জনমানবহীন, পরিত্যক্ত ও প্রাচীন, দেখলে মনে হয়না যে এখানে কদাচ কোনও তীর্থযাত্রীর আগমন হয়। অথচ নর্মদাতীরে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির সর্বজনখ্যাত। একটু বিশ্রাম করে মনে মনে মহাপ্রাচীন অরণ্য-দেবতাকে প্রণাম নিবেদন করে আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলুম। আশ্চর্য মন্দিরের সুবৃহৎ মৃন্ময় অঙ্গনের স্পর্শ লাভের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনের শ্রান্তি ও আতঙ্ক কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রথমে আমরা মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে দেবতা প্রণাম করলুম। একটী কষ্টি পাথরে নির্মিত বৃষের উপর উপবিষ্ট রয়েছেন মহাদেব ও পার্বতী। এ দেবমূর্তি অতি প্রাচীন হলেও একটী অপার্থিব জ্যোতিতে চির ভাস্বর, অতি সুন্দর ও ভাবময়। তার গঠন প্রণালীর মধ্যে অজন্তা গুহা শিল্পের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মন্দির পূজারীহীন ও পূজা উপচারহীন। মন্দির পরিমার্জনাও বোধহয় কিছুদিন বন্ধ আছে। মন্দির চত্বরে বিলম্বিত প্রকাণ্ড পিতলের ঘণ্টা বাজিয়ে আমরা নেমে এলুম প্রাঙ্গণে। এই মন্দিরকে চতুর্দিক থেকে গোলাকারে পরিবেষ্টন করে সুদৃশ্য পাষাণ চত্বরে চৌষট্টিটি ভিন্ন ভিন্ন বেদী নির্মিত আছে। এবং সেই বেদীতে চৌষট্টি জন যোগিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালের হস্তাবলেপনে মূর্তিগুলি যে কোন্ পাথরের তাহা বোঝা যায় না। তবে তাদের নিষ্ঠুরভাবে ভগ্নাবস্থা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় একদা মুসলমান যুগের হিন্দুবিদ্বেষী তাণ্ডবলীলার উন্মত্ততায় এই মন্দির অতি নিষ্ঠুরভাবে

আক্রান্ত হয়েছিল। সুন্দর ভাস্কর্য-খোদিত বৃহৎ মূর্তিগুলির কারো হস্ত পদাদি কর্তিত, কারো কণ্ঠ, কারো সুচারু আনন হতে নাসিকা ও চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত। কেহ বা বাহনহীন সিংহাসনভ্রষ্ট। কারো বা দেহের অর্দ্ধাঙ্গ বিনষ্ট। এই প্রকার নৃশংস অত্যাচারের শত সহস্র চিহ্ন সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও চৌষট্টি যোগিনীর নির্মূল ভাবে ধ্বংস সাধন ঘটেনি। এত নিপীড়নের মধ্যেও তাদের প্রস্তরীভূত সর্বাঙ্গ বয়বে মৃদু হাস্যযুক্ত দিব্যাভা প্রকটিত রয়েছে। এই ভাস্কর্যের অলঙ্করণ শিল্প এত সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ যে যুগ-যুগান্তরের ধূলা বালির স্তর ভেদ করে আজও তাহা পূর্ব গৌরবে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। অনেক অনুসন্ধান করেও আমি জানতে পারলুম না এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। মহাকালের অতল গর্ভে কোথায় লুপ্ত হয়েছে সে যুগ, কিন্তু তার স্বাক্ষর আজও ছড়িয়ে রয়েছে মাটীতে; তার বেদনার কাহিনী মূক হয়ে রয়েছে সুদৃঢ় পাষাণ বন্ধনীতে। নির্জন অরণ্যভূমিতে কেঁদে কেঁদে ফিরছে তার অবিনশ্বর দীর্ঘশ্বাস।

চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির

মন্দির প্রদক্ষিণান্তে আমরা অপর একটী সিংহদ্বার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম। সিংহদ্বারই বটে। দরজাগুলি কাঠের হলেও এর বিরাটত্ব এবং কারুকার্য্য দর্শনযোগ্য। তার সম্মুখে দেখা গেল প্রশস্ত সোপান রাজি। এই একশত আটটী সিঁড়ি পার হয়ে আমাদের নীচে অবতরণ করতে হবে। তাড়াতাড়ি পৌছাবার জন্য গাইড আমাদের নিয়ে গিয়েছিল মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে। তাই সে পথ অত বনাকীর্ণ ছিল। সাধারণত গ্রামের লোক ভিন্ন ওপথে কেউ যাতায়াত করে না। এখানে একটী বেশ বড় গুহা আছে। এর সুড়ঙ্গ পথ নাকি একেবারে ধূমাধার ঝরণায় গিয়ে শেষ হয়েছে। মন্দির থেকে নেমে আমরা যে পথ পেলুম তার আশে পাশে কয়েকটী পাথরের জিনিষের দোকান রয়েছে। এখানকার পণ্যের কোনও নির্দ্ধারিত মূল্য নেই। যাকে যেরকম দেখে তার কাছে সেই রকম মূল্য দাবী করে। তা হলেও পণ্যগুলি ভারী শোভন ও লোভনীয়। আমরা কিছু পণ্য ক্রয় করে নদীর ঘাটে এলুম। এখানে নৌবিভাগের কার্যালয় আছে। সেখানে টিকিট পেলে তবে নৌকায় স্থান পাওয়া যাবে। আটজন যাত্রী না হলে নৌকা ছাড়ে না। আমরা চারজন ছিলুম। আর চারজন আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। তাঁরা চারজন বন্ধু। তার মধ্যে একজন শ্রীঅমিয় ঘোষ, কবি প্রভাতকিরণ বসু মহাশয়ের শ্যালিকাপুত্র। ইনি পরে আমাকে নর্মদার আলোকচিত্র দিয়ে অনেক সাহায্য করেছেন।

স্থলভূমি থেকে অনেক নীচে নদী। তার তটে বাঁধা রয়েছে নৌকা। সেখানে নেমে আমাদের নৌকায় উঠতে হবে। উঃ, সে পথ সামান্য শিলাকণ্টকিত বন্ধুরতায় অসামান্য! মাটীর দিকে না তাকিয়ে একপা অগ্রসর হবার উপায় নেই। একটু অন্যমনস্ক হলেই পতন অনিবার্য; আর সঙ্গে সঙ্গে শিলার সূচাগ্র ভাগে আঘাত লেগে দেহ থেকে রক্ত ক্ষরণ। অফিসের দিকে আমরা দেখেছিলুম একটী বেশ বাঁধানো সোপানযুক্ত পথ রয়েছে নদীতে নামবার। কিন্তু সে ঘাটে নৌকা ছিল না বলে আমাদের এই বন্ধুর পথে আসতে হোল। যাহোক হৈ-হল্লা করে কোনও রকমে নৌকায় উঠে নীলাক্ষী নর্মদার স্নিগ্ধ স্পর্শ লাভে সকলের মন আবার আনন্দে ভরে উঠল।

ধীরে ধীরে নৌকা চলতে সুরু করল। তীরের কাছে নদী বেশ প্রশস্ত। নর্মদা এখানে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে একটী চলে গেছে বোম্বাই প্রদেশ হয়ে আরব সাগরে, অপরটী স্থানীয় একটী পাহাড়ী নদীতে গিয়ে মিশেছে। নদীর দুই তীরে ঘনশ্রেণীবদ্ধ ধূসর শৈলরাজি উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। তার পদপ্রান্তে নীলস্রোতা নর্মদা অতল গভীরতায় রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। ক্রমশঃ নদীর পরিধি যত কমে আসতে লাগল, তত তার তীরস্থ শৈলরাজির বর্ণান্তর ঘটতে লাগল। প্রথমে দেখা গেল ঘন নীলরংএর পাহাড়। তারপর গোলাপী, পীত এবং তারার থেকে সুরু হোল শ্বেত মর্মর। তার মাঝে মাঝে ধূসর পাহাড়ও আছে। নদী একজায়গায় বাঁক ফিরতেই দেখা গেল, জলের মধ্যভাগে একটী শ্বেত শুভ্র মর্মর দ্বীপ। তার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে একটী শুভ্র সুন্দর শিবলিঙ্গ। মাঝি বললে, এই শিব প্রতিষ্ঠা করেছেন পুণ্যবতী রাণী অহল্যাবাঈ। সেই দ্বীপের পর থেকে সুরু হোল নদীর দুই তীরে দুগ্ধ-ধবল মর্মর রাজি—সমুন্নত শিরে তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেই শ্বেত মর্মরের নয়নাভিরাম শোভা, অবর্ণনীয়, অকল্পনীয়। মনে হয় শত শত কোহিনূর একত্রিত হয়ে তার উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীর্ণ করছে। নীলস্রোতা নর্মদার অঙ্গ ভঙ্গে সেই স্ফটিক বিম্ব আরও শোভাময় হয়ে উঠেছে। এক জায়গায় এসে মাঝি বললে, "এই পাহাড়ের নাম

"বাঁদর লাফি"। এখানে নদীর পরিধি, অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। তার দুই তীরের মর্মর পাহাড় এত সন্নিকটবর্তী যে মনে হয় উভয়ে যেন উভয়ের স্পর্শলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। এই মর্মর পাহাড়ের উপর দিয়ে

শ্বেত পাথরের দেওয়াল

বাঁদরেরা একলাফে নদী পার হয়ে যায় বলে এর নাম হয়েছে "বাঁদর লাফি"। এই স্থানের দৃশ্য আরও সুষমাময়, আরও বিস্ময়কর, আরও প্রাণোচ্ছল। কালের প্রলেপে, রৌদ্র ও বৃষ্টির তাড়নে শ্বেত মর্মর গাত্রের বহু ক্ষয় প্রাপ্তি ঘটেছে। এক একটী শিলাখণ্ড এমন ভাবে শূন্যে ঝুলে আছে যে মনে হয় এখনি বুঝি ভূপতিত হবে। আর একটু যেতেই দূর থেকে দেখা গেল—শ্বেত মর্মরের পরিসমাপ্তির সীমানা। আর এগোনো যাবে না। জল এখানে অত্যন্ত গভীর এবং স্রোত পূর্ণ বেগবান। স্থানে স্থানে ঘূর্ণী রয়েছে। জলের রং সেখানে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ধুমাধারের হিমানী সাদা জলোচ্ছ্বাস, শোনা যাচ্ছে তার কলনাদ। এর মুখে নৌকা গেলে সলিল সমাধি অবশ্যম্ভাবী। মাঝিরা সতর্কতার সঙ্গে নৌকা ঘুরিয়ে নিল। নৌকা ধীরে ধীরে ফিরে এল ঘাটে। সেই সোজা খাড়া সিড়ি বেয়ে উপরে ওঠা আরও প্রাণান্তকর। কোনও রকমে সেই সোজা সিঁড়ি বেয়ে বসে, বিশ্রাম করে উপরে এসে পৌঁছেই অবসন্ন হয়ে বসে পড়লুম।

আমাদের টাঙ্গার চালক দুটী ভালো ছিল। কথা অনুযায়ী সময়ের চেয়ে আমরা অনেক দেরীতে ফিরেছিলুম। তার জন্য ওরা বিশেষ কিছু অনুযোগ করেনি। উপরন্তু আমাদের শ্রান্তি অপনোদনের জন্য অনেক সাহায্য করেছিল। ভেড়াঘাটের নিকটবর্তী কোনও কোনও দারুণ চড়াইয়ের পথে যাত্রীসমেত ঘোড়া কিছুতে গাড়ী টানতে পারে না। ওরা কিন্তু আমাদের ক্লান্ত অবস্থা দেখে, গাড়ী থেকে কিছুতে নামতে দেয়নি। যদিও আমরা নেমেছিলুম। তবুও বিদেশে দেনাপাওনার সম্বন্ধ যেখানে—সেখানে এই আন্তরিকতাটুকুই মহার্ঘ বলে মনে হয়।

ধীরে ধীরে গাড়ী চলছে। ভাদুড়ী বলেছেন, দুটো গাড়ী যেন নিকটবর্তী থাকে। তাই তাদের এই মৃদু গতি। আশে পাশের আরণ্য প্রকৃতির শ্যামলিমায় যেন, রূপালী জরীর ঝালর ঝুলছে। মোমের মত সাদা সুন্দর জ্যোৎস্না কুয়াসায় ঢাকা। আমি দেখলুম আকাশের নীলিমা যেখানে দিগন্তের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে সেখান থেকে নীলাক্ষী নর্মদা যেন সাদা জ্যোৎস্নার গুণ্ঠনে মুখ ঢেকে আমাদের পানে নির্ণিমেষে চেয়ে আছে। ভাসমান খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘপুঞ্জগুলি যেন তার চোখের উদ্গত অশ্রুবিন্দু, আমাদের স্মরণ করে ঝরে পড়ছে ভূ পৃষ্ঠে। পিছনে পড়ে রইল শঙ্খশুভ্র শ্বেত মর্মর, কলোচ্ছ্বলা নীলাক্ষী নর্মদা। সম্মুখে আমাদের অনন্ত অবারিত পথ। সেই মুক্ত পথের যাত্রী আমরা।
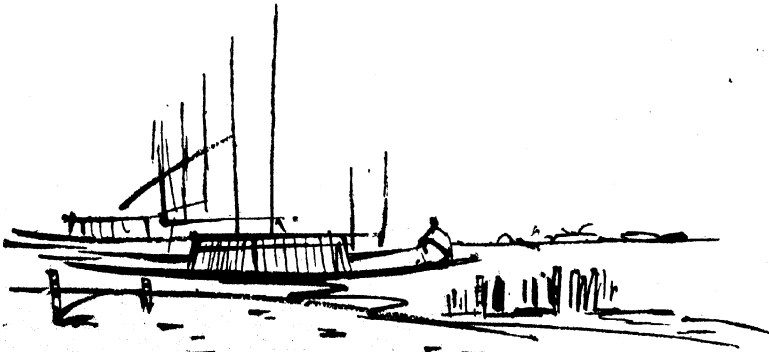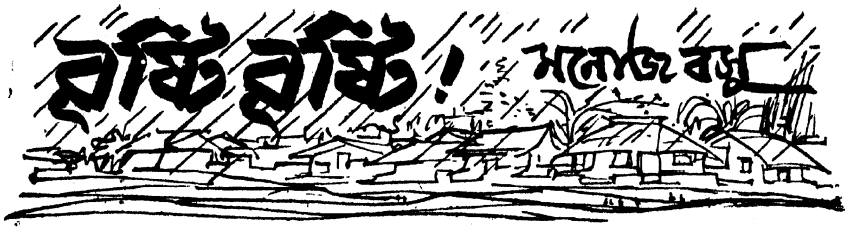
—নয়—

একা বিশ্বেশ্বর নয়, বলে কয়ে পঞ্চাননকেও পাঠানো হল। অরুণাক্ষ আছে অবশ্য, তবু এ তরফের একজন পাকা লোক সঙ্গে থাকা ভাল। বিশ্বেশ্বরকে বিশ্বাস নেই— শুভকর্মের প্রসঙ্গ যখন উঠবে, কি বলতে তিনি কি বলে বসবেন ঠিক কি! কৃতান্তর যাবার কথা হয়েছিল, সে হলে সর্বাংশে ভাল হত। কিন্তু ইলেকসনের সময় যে ভাষায় অম্বুজাক্ষের নামে লিখেছে, তার পরে তাঁর নিজস্ব এলাকার মধ্যে ঢুকতে ভরসা পায় না। গ্রাম অঞ্চলে শোনা যায়, হাতে মাথা কাটেন ওঁর নায়েব-গোমস্তারা। সেখানে স্বেচ্ছায় মাথা ঢোকানো বুদ্ধির কাজ হবে না! পঞ্চাননই চলল তাই। বয়স কম হোক যাই হোক, কৃতান্তর সাকরেদি করছে এতদিন ধরে—সে-ও নিতান্ত হেলাফেলার বস্তু নয়। বিশ্বেশ্বরকে সেরে সামলে নিয়ে বেড়ানোর কাজ তাকে দিয়েও হবে।

সন্ধ্যাবেলা তাঁরা এসে পৌছলেন। অম্বুজাক্ষ ও সুহাসিনী আগে এসে আছেন। বিশ্বেশ্বরের পালকি সোজা ওঁদের বাড়ি চলে আসবে, ফরাস সাজিয়ে বসে আছেন অম্বুজাক্ষ। কয়েকটি ভদ্র-সজ্জনও এসে বসেছেন, গড়গড়ায় তামাক চলছে। এতবড় একজন মানুষ গাঁয়ে আসছেন— আলাপ-পরিচয় ও অভ্যর্থনার জন্য বসে আছেন সকলে। কিন্তু কোথায় কি! নদী-পারে হাটখোলার রাস্তায় বাস ওঁদের নির্বিঘ্নে নামিয়ে দিয়ে গেছে, সে খবর পেয়েছেন ঘণ্টা দুই আগে। পালকিতে এইটুকু পথ ইতিমধ্যে বার দুই-তিন আসা চলে, অথচ কান খাড়া করে আছেন—রাতের নিস্তব্ধতায় অনেক দূরেও বেহারার ডাকের নিশানা মেলে না। অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন মনে মনে। পালকি মাঝপথে ভেঙে পড়ল নাকি? নয় তো আর কোন দুর্ঘটনা ঘটল? অরুণের কাছে শোনা, নিপাট ভাল মানুষ বিশ্বেশ্বর লোকটি। দুর্গম অঞ্চলে টেনে নিয়ে এসে না জানি কোন বিপদে ফেলা হল ভাল মানুষটিকে!

পুজোটা এবার কিছু পিছিয়ে—কার্তিক মাসে। তার আগে এই বিশাল উৎসবের জোগাড় হয়েছে। যা গতিক, জোর উৎসব চাপা পড়ে যাবে এর কাছে। হাটখোলার অবস্থা দেখে অরুণাক্ষ অবধি অবাক হয়ে গেছে। গোটা অঞ্চল ভেঙে এসেছে, লোকে লোকারণ্য। বেশির ভাগ লোকেরই হয়তো অক্ষর-পরিচয় নেই—'ভারতে' ইংরাজ এর মহিমা তারা বুঝল কি করে? বাঘা বাঘা গুণী-জ্ঞানীরা যে বই কায়দা করে উঠতে পারেন না? কেমন করে যে বিশ্বেশ্বরকে ভালবাসা দেখাবে, ভেবে পাচ্ছে না। পালকি বওয়ার বেহারাগুলোকে হাঁকিয়ে দিয়েছে, তোমরা বসে বসে তামাক খাওগে যাও, পালকি আমরা নিয়ে যাবো। এত বড় একজনকে কাঁধে তুলে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার গৌরব পেশাদার বাহকদের ছেড়ে দেবে না। এই নিয়েও বচসা, হাতাহাতির জোগাড়। সকলে কাঁধ দিতে চায়—কিন্তু পালকির দু-দিককার ডাণ্ডায় খুব বেশি তো আট আট ষোল কাঁধের জায়গা হয়, তার অধিক কি করে কুলোয়? তখন গতিক দাঁড়াল—দু-পা না যেতে অন্য দল এগিয়ে আসে, সরে যাও—সরে যাও, এবারে আমরা।

কোথায় কলকাতায় ছাতের উপরের সভা, আর গ্রাম অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষের এই বিরাট অনুষ্ঠান। পালকিতে উঠতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের মেয়ের কথা মনে পড়ছে। আহা, সে যদি—সে চোখে দেখত এই ব্যাপার! পঞ্চাননকে চুপি চুপি বললেনও একবার, ইরাকে নিয়ে এলে কেমন হত পঞ্চানন? তুমি এলে, সে-ও যদি আসত!

পঞ্চানন হেসে বলে, এখন আসতে যাবে কেন? পরে আসবে। কপালে থাকলে কতবার আসাযাওয়া

ডালডা
আমার
পক্ষে
ভালো
DALDA
ডালডা
ডালডা মার্কা বনস্পতি
দিয়ে রান্না করুন
শুধু রান্নার জন্যই ভালো নয় — পুষ্টিকরও বটে!
HVM. 253-50 BG

করবে। আজকে তার কাজে এসেছি; আবার তারই নেমন্তন্নে হয়তো বা কোনদিন আসতে হবে।

তখন ধ্বক করে বিশ্বেশ্বরের আর এক দায়িত্বের কথা মনে পড়ে যায়। সরমার মতে সেইটাই হল এখানকার আসল কাজ, বিশ্বেশ্বর ভাবতে গিয়ে থই পান না। এই বিপুল সমারোহের মধ্যে কোন কৌশলে তিনি মেয়ের বিয়ের কথা পাড়বেন? লোকের ভিড়ে অবসরই পাবেন না। আর অম্বুজাক্ষই বা কি ভাববেন, এমন স্বার্থবুদ্ধি রামনিধি সরকারের প্রপৌত্রের পক্ষে মানান-সই হবে না।

দেড় ক্রোশ পথ নিয়ে যেতে দু-ঘণ্টার উপর লাগাল। অম্বুজাক্ষের বাইরের উঠানে নারিকেলতলায় পালকি নামল অবশেষে। অম্বুজাক্ষ প্রসন্ন নন। বিশ্বেশ্বরকে গাঁয়ে এনে হৈ-চৈ করবেন, উদ্যোগ-আয়োজন সমস্ত তাঁর—এখন টের পাচ্ছেন, কর্তৃত্ব তাঁর হাত থেকে পিছলে সর্বসাধারণের মধ্যে চলে গেছে। উঠানে নেমে অভ্যর্থনা করে বিশ্বেশ্বরকে ফরাসের তাকিয়ার পাশে এনে বসালেন—গ্রামের আরও দশটি ভদ্রলোক নেমে গেলেন, তাঁদেরই একজন তিনি। সুহাসিনী ও আর কয়েকটি বউগিন্নি অন্দরের জানলায় দাঁড়িয়ে। বাইরে আসতে অসুবিধা নেই, এমন ক্ষেত্রে সুহাসিনী এসেও থাকেন। কিন্তু অম্বুজাক্ষ সামাল করে দিয়েছেন, চাল-চলনে হাবে-ভাবে শহুরে ভাব তিলেক ধরা না পড়ে। ভয়ে ভয়ে তাই আরও অতিরিক্ত মাত্রায় তিনি গাঁয়ের লোক হয়ে আছেন।

বিশ্বেশ্বরের এই প্রথম দেখা অম্বুজাক্ষের সঙ্গে। সাধারণ দুটো ভদ্রতার কথার সবুর সয় না—আসবার আগে সরমা যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন সেই প্রশ্ন করে বসেন, কাশীশ্বর রায়ের আমলের পুরানো কাগজ আছে নাকি অনেক?

—আছে বই কি!

তখন কিঞ্চিৎ সুস্থির হলেন। ধাপ্পা দিয়ে এত কষ্টের পথে নিয়ে আসবে, সে ছেলে অরুণ নয়। জোর গলায় বলে এসেছিলেন তো তাই। তাঁর কথাই খাটল। অধীর হয়ে বলেন, কোথায়—কোথায়?

অর্থাৎ জায়গাটার নিশানা পেলে হাত-পা না ধুয়েই বসেন গিয়ে সেখানে। সহাস্য মুখে আবার প্রশ্ন করেন, তিনটে সিন্দুক ঠাসা ভরতি শুনলাম, সত্যি?

অম্বুজাক্ষ বলেন, শুনেছেন মিথ্যে নয়। লোহার নয়, কাঠের সেকেলে সিন্দুক। ছাত দিয়ে জল পড়ত, জানলা-দরজা ছিল না—একটু বৃষ্টি হলে জলের সমুদ্দুর খেলত ঘরের মধ্যে। আমি এই কিছুদিন আসা-যাওয়া করে যা হোক একটু ভদ্রস্থ করেছি—

শেষ করতে দিলেন না বিশ্বেশ্বর—হায়-হায় করে ওঠেন। মণিমাণিক্য ফুটো ঘরে রাখে কেউ কখনো? সব বোধ হয় পয়মাল হয়ে গেছে।

অম্বুজাক্ষ হাসি মুখে ঘাড় নাড়লেন, জলে কিছু নষ্ট হয়েছে, উই-ইঁদুরেও কেটেছে কতক। ঘাবড়াবেন না—এখনো যা আছে, সে এক গন্ধমাদন।

বিশ্বেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান, চলুন দিকি—

অম্বুজাক্ষ অবাক হয়ে বলেন—সে কি, এখন কি তার? কষ্ট করে এলেন, বিশ্রাম করুন। কাগজপত্তোর রাতের মধ্যে তো পালিয়ে যাচ্ছে না?

বিশ্বেশ্বর বললেন, তা নয়। তবু একটিবার চোখের দেখা দেখে আসি রায় মশায়। কণ্ঠে কাতর সুর। যেন পরমপ্রিয় একজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে এঁরা বাগড়া দিচ্ছেন।

সতীশ সেই হাটখোলা থেকে সঙ্গে সঙ্গে আসছে। বিশ্বেশ্বরের পালকি নিজে বিশেষ কাঁধে তোলে নি। কিন্তু বড় এক বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে পাইক-বরকন্দাজের মতো পালকির আগে আগে এসেছে। সে বলল—তাই হোক ডাক্তারবাবু। এক নজর না দেখে সরকার মশায়ের সোয়াস্তি হবে না। সারা রাত্তির ছটফট করবেন। আপনারা সুখ পাবেন না এই অবস্থায় কথাবার্তা বলে। কেউ সঙ্গে করে ওঁকে দেখিয়ে নিয়ে আসুন।

অম্বুজাক্ষ ঘাড় কাত করে তাকালেন। মাতব্বরদের মধ্যে কথা বলতে এসেছে মূর্খস্য মূর্খ সতীশ। কিন্তু যে বিয়ের যে মন্তোর। এদের ভোটের আশায় আছেন, অতএব বাপু-বাছা করতেই হবে সকলকে। একটুখানি হাসির ভাব এনে বললেন, ইলেকট্রিক আলো নেই, টিমটিমে হেরিকেনে কী-ই বা দেখবেন। বেশ, দেখে আসুন তাই, সকালবেলা তার পরে ভাল করে দেখবেন। মাঝের কোঠায় নিয়ে যাও ওঁকে অরুণ। সতীশও যাও না—একবারটি ঘুরিয়ে আনো।

রাতটুকু ভাল করে না পোহাতে অম্বুজাক্ষের বাড়ি আবার লোকের আনাগোনা শুরু। অঞ্চলশুদ্ধ ক্ষেপে গেছে যেন। রামনিধি ফাঁসি গিয়েছিলেন, ইংরেজ তখন মাথার উপরে চেপে বসে আছে। দেশের মানুষ চুপি সাড়ে চোখের জল ফেলেছিল, গলা ছেড়ে কাঁদতে পারে নি। তিন পুরুষ পরে শোধ তুলছে তার এখন। সেই বংশের বিশ্বেশ্বরকে পেয়ে কি করবে, ভেবে পায় না। অম্বুজাক্ষ মৃদু প্রতিবাদ করেন, বয়স হয়েছে, এত ধকল কি সহ্য হবে ওঁর? এত জনের সঙ্গে গোণাগুণতি দুটো করে কথা বললেও খাটনিটা কি দাঁড়াবে আপনারা বুঝে দেখুন। বিকালে তার উপর সভা রয়েছে, সেখানে দু-চার কথা বলতে হবে।

বিশ্বেশ্বরেরও মনোভাব তাই। বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ঘাড় নেড়ে অম্বুজাক্ষকে তিনি প্রবল সমর্থন করেন। লোকের ভিড়ে আসল কাজে গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। কাগজগুলো ঠাণ্ডা মাথায় একটু নেড়েচেড়ে দেখব, তা হচ্ছে না। আপনারা একটু রেহাই দিন তো মশায়েরা।

কেবা শোনে কার কথা! মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। একটা দল চলে না যেতেই আবার এক দল। সতীশ বলে, পোড়ো ভিটে আছে আমাদের পাড়ায়। রামনিধির ভিটে। আরে এক তেঁতুলগাছ—সে-ও শুনেছি সেই আমলের। সেইখানে নিয়ে যাবো একবার দেখে আসবেন।

কৃতান্তর শিষ্য পঞ্চানন—কাজকর্মের ব্যাপারে সদা সতর্ক। ফাঁক বুঝে অমনি কথাটা পাড়ল, শুধু ভিটে কেন—জমাজমি বাগবাগিচাও তো রয়েছে, বারো ভূতে বেদখল করে খাচ্ছে।

সতীশ বলে, কেউ আসা যাওয়া নেই বলে এই অবস্থা। আসুন না গাঁয়ে—বছরে দু-একবার পদধূলি দিন। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা দেখব, তার পরেও বেদখল রাখতে পারে। ওসব কিছু নয়—গ্রাম শুদ্ধ মানুষ পিছনে আছি, তার পরে আবার ভাবনাটা কি?

আবার ওরই মধ্যে এক ফাঁকে পঞ্চানন সরাসরি অন্দরে ঢুকে সুহাসিনীর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করল। বলে, দরবার নিয়ে এসেছি। বিশ্বেশ্বরবাবুর বাড়ির ছেলের মতো আমি।

সুহাসিনী কথা বললেন, বসুন—

বুড়ো মানুষটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলাম। কন্যাদায়ে বড় বিব্রত।

সুহাসিনী কুণ্ঠিতভাবে বললেন, আমাদের সাধ্যপক্ষে যা করা চলে, নিশ্চয় তার ক্রটি হবে না।

বললেন অবশ্য টাকাকড়ির দিকটা ভেবে। পঞ্চানন লাফিয়ে উঠল।

সাধ্য পুরোপুরি আছে। নয়তো আর বলি কেন? আপনার ঘরেই নিয়ে নিন মেয়েটাকে।

সুহাসিনী অবাক হয়ে রইলেন। পঞ্চানন বলে, ছেলের বউ করে নিন। সর্বাংশে উত্তম হবে। অমন মেয়ে হাজারে একটা মেলে না।

কেমন মেয়ে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না—তার উপরে এ ব্যাপারে অম্বুজাক্ষের মতামতই প্রচণ্ড। সুহাসিনী গোড়া থেকেই এড়িয়ে যেতে চান। মৃদুকণ্ঠে বললেন, ভালই তো হত! কিন্তু অনেক দিন ধরে কথাবার্তা হয়ে আছে এক জায়গায়। কর্তার বিশেষ বন্ধু তাঁর—

পঞ্চানন হেসে ওঠে, কানপুরের সম্বন্ধ—সে তো ভেস্তে গিয়েছে। জানেন না বুঝি?

জানেন সমস্ত সুহাসিনী, অম্বুজাক্ষ বলবার আগে সাবিত্রীই এসে হাত ধরে কান্নাকাটি করে সমস্ত বলে গেছেন। কিন্তু কর্তার উপরে কথা বলতে যাবে কে? তা ছাড়া সুহাসিনীরও আগ্রহ ছিল না সুনন্দা মেয়েটার সম্পর্কে। সাত নয় পাঁচ নয়, ঘরের একটা মাত্র বউ—আরও সুন্দরী মেয়ে চাই। অনেক বেশি সুন্দরী। সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে অম্বুজাক্ষ একটা সুযোগ করে দিলেন। কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছেন, এত দূর খবর এরা জানল কি করে? জেনে শুনে তবে চলে এসেছে।

বলতে হয় তাই একবার বললেন, মেয়ে কেমন?

আমার মুখে কি শুনবেন, সেটা আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করুন। হামেশাই যাচ্ছে আসছে ওবাড়িতে, সে ভাল জানে।

পঞ্চানন খুব হাসতে লাগল। অর্থাৎ জোর আছে কন্যাপক্ষের অরুণের পছন্দের মেয়ে। সুহাসিনীর চমক

লাগে। অম্বুজাক্ষ নাকি ছেলের মতামতের কথা তুলেছিলেন কানপুরের সম্বন্ধ ভেঙে দেবার সময়। কথাটা সুহাসিনী কানে নেন নি—একটা অজুহাত। এখন ভাবছেন, সত্যিই ঐ ধরণের কিছু হয়তো মূলে আছে। অম্বুজাক্ষ অন্যের মতামতের মূল্য দিচ্ছেন—তাজ্জব ব্যাপার! বিষম রকম বদলেছেন তিনি, সন্দেহ মাত্র নেই। করপোরেশনে হেরে গিয়ে বিস্তর উপকার হয়েছে।

এতদূর যখন ঘটনা পঞ্চাননকে সামাল করেছেন, খবরদার—ওঁর কানে এসব না যায়। তা হলে কাজ হবার আশা নেই। ওঁকে বলবেন, আপনি দেখে শুনে যা করবার করুন। আগে থেকে দেখাশুনো আছে শুনলে এক কথায় কেটে দেবেন। সেই রকম ওঁর স্বভাব।

সেই উপদেশ মেনে নিয়ে পঞ্চানন ভিজে বেরালটি হয়ে অম্বুজাক্ষের কাছে প্রস্তাব তুলল। বলে, বিবেচনা করে দেখুন—ঐতিহাসিক আত্মীয়তা আপনাদের মধ্যে। সেই কাশীশ্বরের আমল থেকে। নতুন করে সেইটে আবার ঝালিয়ে নেওয়া।

অম্বুজাক্ষের কিন্তু খুব বেশি উৎসাহ দেখা গেল না। আপত্তিও করলেন না। শুধু মাত্র বললেন, বেশ, মেয়ে তো দেখা যাক আগে—

পঞ্চানন শত মুখে পরিচয় দিচ্ছে, ডানা-কাটা পরী না হলেও মেয়ে খারাপ নয়। গৃহস্থঘরে যেমন দেখেন, তার চেয়ে অনেক ভাল। নরম স্বভাব, বুদ্ধিমতী।

অম্বুজাক্ষ অন্যমনস্কভাবে বললেন, ভালই তো—। তিনি এখন বিকালের ভাবনা ভাবছেন। সভা বিষম জমবে। গরুর গাড়ি করে এখন থেকেই দূর গাঁয়ের মেয়েছেলেরা এসে জমছে। তোমরা কি বুঝবে হে বাপু? রথের সময় সেই যে মেলা বসিয়েছিলেন, তারই কাছাকাছি কিছু একটা ভেবেছে। সে যাই হোক, সভার মধ্যে বিশ্বেশ্বর বেশ গুছিয়ে যাতে দু-কথা বলেন কাশীশ্বরের সম্বন্ধে এবং কান টানলে যখন মাথা আসে, অম্বুজাক্ষও এসে পড়বেন ঐ সঙ্গে। কিন্তু গতিক দেখ না! কত উদ্যোগ-আয়োজন করে নিয়ে আসা হল—দু-জনে এসেছেন, এসে অবধি উভয়েই নিজ নিজ মতলব-হাসিলের তালে রয়েছেন। সকালবেলা চক্ষু মুছে বুড়ো গিয়ে বসেছেন পচা কাগজপত্রের আণ্ডিলের মধ্যে, কলকাতায় একগাদা বয়ে নিয়ে যাবেন—তারই বাছাবাছি হচ্ছে। আর সঙ্গের সাগরেদটি ইত্যবসরে বুড়োর মেয়ে গছাবার ঘটকালি করে বেড়াচ্ছে। নির্বিকার দর্শক হয়ে থাকলে মতলব বানচাল হবে, বিশ্বেশ্বরের হুঁশ করিয়ে দিতে হবে কাশীশ্বরের কথা বলবার জন্যই তাঁকে মণিরামপুর নিয়ে আসা। উঠে গিয়ে তিনি অরুণাক্ষকে ডাকলেন, সভার সময় হয়ে আসছে। তার কি বন্দোবস্ত করলে?

অরুণাক্ষ উল্লাস ভরে বলে, সমস্ত হয়ে গেছে। একবার দেখে আসুন গিয়ে। অশ্বত্থতলায় বেদি—দেবদারু-পাতা আর গাঁদাফুলে সাজিয়েছে, আলপনা দিয়েছে।

অম্বুজাক্ষ খিঁচিয়ে ওঠেন, বেদির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কি মশা মারবেন? বলবেন-টলবেন না?

তাড়া খেয়ে অরুণ হকচকিয়ে যায়।

বলবেন বই কি! বক্তৃতা না হলে আবার সভা কিসের?

কি বলবেন, তার কিছু তালিম দেওয়া হয়েছে? ধরো, উনি ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমির গল্প ফেঁদে বসলেন। আমাদের তাতে কোন কাজটা হবে?

অরুণাক্ষ এবার হাসল। তা সত্যি, উনি একেবারেই বলতে পারেন না। আগডুম-বাগডুম বকেন, থেই খুঁজে পাওয়া যায় না। লেখেন এমন চমৎকার—

অম্বুজাক্ষ বললেন কচু লেখেন। গলদঘর্ম হয়ে গেছি, কিছুতে তবু শেষ হল না। দেবভাষা সংস্কৃতও ফটিক জল ওঁর ভাষার কাছে। বইয়ের বিষয়টা ভাল, কিন্তু কাঁটা ছাড়িয়ে সে মৃণাল বের করবার তাগদ ক'জনার?

অরুণ কি বলবে, সে নিজেই ভুক্তভোগী। অম্বুজাক্ষ বললেন, সভায় দাঁড়িয়ে মুখে মুখে উনি বলবেন সমস্ত কথা, সোজাসুজি সকলের কানে ঢুকবে। যাতে ঠিক মতো হয় সেইটে দেখ তুমি। পাগল মানুষের উপর ভরসা কোরো না—বক্তৃতাটা লিখে দাও, উনি শুধু পড়ে যাবেন।

সারা দুপুর বসে বসে অরুণাক্ষ অভিভাষণ বানাল। 'ভারতে ইংরাজ' পড়া আছে, তার শেষ অংশটা। এই মণিরামপুরের কথা যেখানে। নদীর ধারের ভাঙাচুরো ঐ নীলকুঠি, লেখার মধ্যে সহসা প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠল। নীলখোলায় ভারে ভারে নীল এসে জমছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ টমাস সাহেব। ফাঁসির দড়ি মালার মতো গলায়

ঝোলানো রামনিধিসরকার। আর আছেন রামনিধির অভিন্নহৃদয় বন্ধু রামনিধির সর্বকর্মের সহায়ক কাশীশ্বর—

অম্বুজাক্ষ এসে তাগিদ দেন, হল শেষ?

হয়েছে বাবা। উৎসাহ ভরে খানিকটা শুনিয়েও দেয়। অম্বুজাক্ষ গভীর মনোযোগে শুনে ঘাড় নাড়লেন, উঁহু—কাশীশ্বরকে বাড়াও। হাতে পেয়েছ যখন ছাড়বে কেন? রামনিধিকে দেশসুদ্ধ লোক চিরকাল ধরে জানে। কাশীশ্বরকে নতুন পাওয়া যাচ্ছে, ফলাও করে না বললে মানুষের মনে ধরবে না।

পাড়াগাঁয়ে এত বড় সভা—না দেখে কেউ ধারণায় আনতে পারবে না। নীলখোলার পাশে খানিকটা ডাঙা জমি—সারি সারি তিনটী অশ্বত্থগাছ, সামনে সরকারি রাস্তা, রাস্তার ওদিকে মাঠ। দুপুর না হতেই ডাঙা জমিটুকু ভরতি হয়ে গেছে। তার পরে মাঠের উপর লোক বসছে। বর্ষাকাল পার হয়ে গেছে—জল না থাকুক, মাঠের মাটি নরম ভিজে-ভিজে, এখানে-ওখানে একটু আধটু কাদাও রয়েছে। সে সব বাদ-বিচার করে না কেউ, কাদার উপরই জাপটে বসছে। যতখানি নজর চলে, সীমাহীন নরমুণ্ড। আর ভূমির উপরে যত ল্লোক—চারিদিকে গাছগাছালি, এক আমবাগান আছে অদূরে, গাছের ডালে ডালে অগুন্তি মানুষ-ফল ফলে আছে যেন। রামনিধির নামে হুঙ্কার উঠছে। কাশীশ্বরের কথা উঠছে না এমন নয়—অম্বুজাক্ষের লোকজন রয়েছে, মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে তারা। কিন্তু স্বল্পপরিচিত নাম নিয়ে উল্লাস করতে বাধো-বাধো ঠেকছে মানুষের।

রামনিধির চরম আত্মদানের গল্প ঘরে ঘরে রূপকথার মতো চলে আসছে এ তাবৎ। মা বলেছেন শিশুকে, সেই শিশু বড় হয়ে আবার তার সন্তানকে বলেছে। বলেছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে, আশে পাশে কিম্বা ঘরকানাচে কেউ আছে কিনা। চেনা মানুষ বলে নিশ্চিন্ত হবার জো নেই; এমনও দেখা গেছে, ইংরেজ টাকা খাইয়ে পরম আত্মীয়কেও হাত করে ফেলেছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, এক সময়ে এমনি হয়েছিল বটে! শ্বশুর সুধালেন, বৌমা কোথায়? অনতিপরে পুলিশ এসে পড়ল। চর শুনে গেছে, বোমা কোথায়; বৌমা বলতে বোমা শুনে গেছে।

রামনিধি গেলেন, চোখের জল তখন চেপে-চুপে রাখতে হয়েছে। এখন দিন বদলেছে। পুরুষানুক্রমে যে ভালবাসা জমে আছে রামনিধির জন্যে, আজকে তা সহস্র ধারায় কলকল নিনাদে বেরিয়ে পড়ল। সভার বেদির উপর বিশ্বেশ্বরের দিকে এক নজরে তাকিয়ে তারা সেকালের এক পুরুষসিংহকে দেখছে। ওরই মধ্যে কাশীশ্বরকে ঢোকাবার চেষ্টা হয়েছিল, দু-একজন বক্তা উল্লেখ করেছিলেন তাঁর নাম—কিন্তু জমল না। আর বিশ্বেশ্বর মানুষটাও তেমনি—হাতে রয়েছে অরুণাক্ষের লেখা অভিভাষণ, গোড়ায় দু-চার ছত্র পড়েওছিলেন, তারপর অত সমাদরের সঙ্গে ক্ষিপ্তবৎ হয়ে গেলেন। হাতের কাগজ পড়ে গেল মাটিতে। তাঁর নিজস্ব গালিগালাজ যথারীতি শুরু হয়ে গেছে। পণ্ডিতেরা হলেন মূর্খস্য মূর্খ, ইতিহাসে আনাড়ি, তাবৎ দেশের মধ্যে সবজান্তা একমাত্র হলেন তিনিই। গতিক দেখে অম্বুজাক্ষ সভাস্থল থেকে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

রাতে খেতে বসে প্রকাণ্ড মাছের মুড়ো সাপটাতে সাপটাতে পঞ্চানন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ধন্য আপনি রায় মশায়। পাড়াগাঁ জায়গায় এত বড় ব্যাপার ভাবতে পারা যায় না। সবই আপনার কৃতিত্ব।

অম্বুজাক্ষ বিরস কণ্ঠে বললেন, কিন্তু কাশীশ্বরের কথা একবারও হল না—

বিশ্বেশ্বরের খেয়াল হল। জিভ কেটে বলেন, ছি-ছি, ভুলে গিয়েছিলাম।

বক্তৃতা তো লেখাই ছিল—

তা বটে! বিষম ভুল হয়েছে।

একটু থেমে সান্ত্বনার ভাবে বলে, যাকগে—অর্ধেক বলে কি হবে? কাশীশ্বরকে আরও ভাল করে পাবো মনে হচ্ছে। পুরোপুরি পেয়ে যাবো। তাঁকে নিয়ে পড়লাম এবারে, ভাল করে লিখে ফেলব তাঁর কথা। আবার কখনো যদি আসি, ভাল করে বলব। ক্রমশ

ভারতে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ

শ্রীমীনাক্ষী রায় এম. এ.

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু গত জুন মাসে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন। নেহরুর এই রাশিয়া ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী ও বিশ্বশান্তিকে দৃঢ়তর করা। এ ছাড়া তাঁর আর কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল না। রাশিয়ার মাটিতে মস্কোর বিমান-বন্দরে অবতরণ করেই তাই তিনি বলেছিলেন—"আমি একজন তীর্থযাত্রী, এখানে এসেছি শান্তির সন্ধানে, নিজের দেশের জন্য ঐশ্বর্যের সন্ধানে।"

সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণ ও গবর্ণমেণ্ট ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুকে অত্যন্ত আনন্দ ও সৌহার্দের সহিত বরণ করে নিয়েছিলেন এবং শ্রীনেহরু সোভিয়েট দেশের যে সব জায়গায় গিয়েছিলেন, সর্বত্রই তাঁকে তাঁরা বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট শ্রীনেহরুর বিশ্বশান্তি ও ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর প্রস্তাব সমর্থন করলে, দুই দেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও মার্শাল বুলগানিন পঞ্চশীলের ভিত্তিতে তখন এক যুক্ত ঘোষণাও করেছিলেন। এই পঞ্চশীল হচ্ছে—(১) এক দেশ আর এক দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে (২) সকল দেশ শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি অবস্থান করবে (৩) কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। (৪) কোন দেশ অন্য দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না (৫) প্রত্যেক রাষ্ট্র পারস্পরিক সুবিধা দান করবে।

শ্রীনেহরু সোভিয়েটের জনগণ ও গবর্ণমেণ্টের সৌজন্য ও অতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নেতাদের ভারত পরিদর্শনের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এই আমন্ত্রণেই গত ১৮ই নভেম্বর তারিখে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন ও সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক মঃ ক্রুশ্চেভ সদলবলে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে এসে উপস্থিত হন। মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভের সঙ্গে আর যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা হলেন—সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী মঃ এন. এ. মিখাইলভ, সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ এ. এ. গ্রোমিকো, সহকারী কৃষিমন্ত্রী মঃ ভি. আর. রসুলভ, বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী মঃ পি, এন. কুমিকিন, উজবেক রিপাব্লিকের সাংস্কৃতিক দপ্তরের উপমন্ত্রী মাদাম রখিমবায়াভা প্রভৃতি।

ঐদিন বেলা ২-৩১ মিনিটের সময় দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে রুশ বিমান থেকে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ অবতরণ করলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু, উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর জেনারেল যদুনাথ সিং প্রভৃতি তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। বিমান বন্দরে অপেক্ষমান লক্ষ লক্ষ লোক ও তুমুল উল্লাস-ধ্বনি সহকারে সোভিয়েট নেতাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিমানঘাটিতে রুশ নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীনেহরু যে ভাষণ দেন, তার উত্তরে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন বলেন—ভারতের জনসাধারণ সুপ্রাচীন ও অনন্যসাধারণ এক সংস্কৃতির স্রষ্টা। তাঁরা কষ্টসহিষ্ণু, তাঁরা প্রতিভাবান। তাঁদের প্রতি সোভিয়েট জনসাধারণের রয়েছে অসীম শ্রদ্ধা ও মৈত্রীর মনোভাব। আমরাও সেই মনোভাব নিয়েই সানন্দচিত্তে এই পুণ্য ভারতভূমি স্পর্শ করছি।

মাদ্রাজের এক জনসভায় সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন ও সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক মঃ ক্রুশ্চেভ স্থানীয় বালিকাদের নিকট প্রীতির পুষ্পোপহার গ্রহণ করছেন

ভারতের শান্তিকামী জনসাধারণ মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য বীরোচিত সংগ্রাম করেছেন। সোভিয়েট জনসাধারণ প্রথমাবধি সেই সংগ্রাম

কুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছে, দ্বিধাহীন চিত্তে তার প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে। ভারতে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সোভিয়েট জনসাধারণ আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

বিমান ঘাঁটি থেকে সোভিয়েট নেতাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু একটি খোলা গাড়ীতে করে রাষ্ট্রপতি ভবনে গমন করেন। পালাম বিমানঘাটি থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের আগমন পথের উভয়পার্শ্বে তাঁদের দেখার জন্য সেদিন দিল্লীতে যেরূপ জনসমাবেশ হয়েছিল রাজধানীর ইতিহাসে সেরূপ আর কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ।

নয়াদিল্লীতে পৌঁছানর পরদিনই সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ প্রথমে রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে মাল্য অর্পণ করেন। ঐদিন তাঁরা লালকেল্লা, জুম্মা-মসজিদ, যন্তর-মন্তর, কুতব-মিনার প্রভৃতি নয়াদিল্লীর ঐতিহাসিক স্থানগুলিও পরিদর্শন করেন। ঐদিন অপরাহ্ণে সোভিয়েট নেতাদের নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য দিল্লীর রামলীলা ময়দানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সভাপতিত্বে এক বিরাট সম্বর্ধনা সভার অনুষ্ঠান হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে মার্শাল বুলগানিন বলেন—ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্ক সুবিদিত পঞ্চশীলের ভিত্তিতে রচিত। রাশিয়া ও ভারতের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামাজিক কাঠামো ভিন্ন হলেও "শান্তি" উভয়েরই নিকট সমান পবিত্র। এই শান্তির জন্য এই কামনা উভয় রাষ্ট্রকে ঘনিষ্ঠতর করেছে এবং একই সূত্রে আবদ্ধ করেছে ও জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে উভয় রাষ্ট্রকে ব্রতী হতে সাহায্য করেছে।

পুণায় একটি ধান্তউৎপাদন কেন্দ্র দর্শনরত মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভ

২০শে নভেম্বর সোভিয়েট নেতারা বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল ও আগ্রার দুর্গ দেখবার জন্য বিমানযোগে আগ্রায় যান। ভারতের রাজধানীর বাইরে সোভিয়েট নেতাদের এই প্রথম সফর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো সোভিয়েট নেতাদের ভারতের বিভিন্ন স্থান সফরকালে প্রদর্শক হিসাবে সঙ্গী হন।

তাজমহল দেখে মার্শাল বুলগানিন বলেন যে, এই তাজ অনেক শতাব্দীর পুরাতন ভারতীয় সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও সুদক্ষ শ্রমের পরিচায়ক।

মঃ ক্রুশ্চেভ বলেন যে, তাজমহল দেখে তাঁর মনে দুটি ধারণার উদয় হয়েছে। একটি ধারণা হচ্ছে—মানুষ কি আশ্চর্য বস্তুই না সৃষ্টি করতে পারে এবং এই মানুষ কতবড় শক্তিশালী। ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির বিরাটত্বের প্রতীক তাজমহল। প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে তাজমহল এক গৌরবের বস্তু। দ্বিতীয় ধারণাটি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সামন্তযুগীয় শাসক-শ্রেণী অতীতে কিরূপে মানুষকে ব্যবহার করত, এখানে তার দৃষ্টান্ত মেলে। শাসক-শ্রেণী সাধারণ মানুষকে যখন প্রকাণ্ড সৌধ নির্মাণের কাজে নিয়োগ করত, তখন এই সাধারণ মানুষেরা থাকত অনশনক্লিষ্ট। নিজেরা বিখ্যাত হয়ে থাকার উদ্দেশ্যে শাসক-শ্রেণী এই সব সৌধমালা নির্মাণের কাজে সাধারণ মানুষের শ্রম নিয়োগ করত। কিন্তু তাজমহল ও শিল্পকার্যখচিত অন্যান্য সৌধ নির্মাণের সমস্ত গৌরবই সাধারণ মানুষের। শ্রম ও বুদ্ধিই এমন শিল্প সৃষ্টি করেছে।

২১শে নভেম্বর সোভিয়েট নেতারা পার্লামেন্টের অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন। সংসদের উভয় পরিষদের এক সভায় মার্শাল বুলগানিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশ্বের-শান্তির জন্য ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন—অর্থনীতিক ও কারিগরী ব্যাপারে গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমরা আমাদের অর্থনীতিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা আপনাদের জানাতে প্রস্তুত আছি।

২২শে নভেম্বর সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ভাকরা-বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনার কার্য পরিদর্শন করে বিশেষ সন্তোষলাভ করেন। মার্শাল বুলগানিন ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনাকে "অপূর্ব" বলে বর্ণনা করেন।

২৩শে নভেম্বর সোভিয়েট-নেতারা বোম্বাইয়ে পৌঁছালে সেখানে তাঁদের বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেখানে এক লক্ষ লোকের এক জনসভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্শাল বুলগানিন বলেন—আজ বিশ্বের সম্মুখে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে—শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান অথবা ধ্বংস।

২৩শে নভেম্বর সোভিয়েট প্রধান-মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন বোম্বাইয়ে

এক সম্বর্ধনা সভায় বলেন—মানব জাতির মুক্তিদাতা হিসাবে লেনিন ও মহাত্মা গান্ধী একই শ্রেণীভুক্ত।

২৫শে নভেম্বর সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ পুণায় যান। সেখানে তাঁরা বাদাগাঁ সরকারী ধান্য উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

২৬শে নভেম্বর সেখান থেকে তাঁরা বাঙ্গালোর যান। ২৭শে নভেম্বর সোভিয়েট নেতারা কোয়েম্বাটুর গিয়ে পৌঁছান। সেখানে এক জনসভায় মার্শাল বুলগানিন বলেন যে, ভারত ও রাশিয়া এই দুই সুমহান দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রগাঢ় বন্ধন প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র বিশ্বে শান্তিরক্ষার মহান উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

২৮শে নভেম্বর সোভিয়েট নেতারা কোয়েম্বাটুর থেকে মাদ্রাজে গিয়ে উপস্থিত হন। মাদ্রাজে এক বিরাট জনসভায় মার্শাল বুলগানিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে গোয়ায়পর্তুগীজ উপনিবেশের কথা উল্লেখ করে বলেন—ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এই অঞ্চলে অধিষ্ঠিত থাকা সমগ্র সভ্যজাতির কলঙ্ক। যে গোয়াবাসীরা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার অবশিষ্ট যাহা কিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন, তাঁদের প্রতি সোভিয়েট অধিবাসীদের চির-সহানুভূতি রয়েছে।

২৯শে নভেম্বর সোভিয়েট নেতারা মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছান। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ভারতের যেখানে যেখানে যান সর্বত্রই তাঁরা বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন, কিন্তু কলকাতায় তাঁরা যে অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা লাভ করেন, তার কাছে কোন সম্বর্ধনারই তুলনা হয় না। তাই এখানে কলকাতার এই ঐতিহাসিক সম্বর্ধনার একটু বিস্তৃত বিবরণ দিলাম—

বাঙ্গালোরে মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভ

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের আগমন উপলক্ষে, কলকাতা মহানগরী এই সময় যেন উৎসব-সজ্জা পরিধান করে অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের আগমন-পথ দমদম বিমান ঘাঁটি থেকে রাজভবন পর্যন্ত এই দীর্ঘ আট মাইল পথ নানারকমের তোরণে, ভারতের ও সোভিয়েটের জাতীয় পতাকায়, উভয় দেশের নেতাদের চিত্রে, পুষ্পপত্রে, বেলুনে, আল্পনায়, ফেস্টুনে, 'ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী স্থায়ী হোক' প্রভৃতি লেখমালায়, 'স্বাগত' লিপিতে ও আলোক সজ্জায়—সুসজ্জিত হয়েছিল। পথের উপরের বৃহদায়তন তোরণগুলির কোনটি সাঁচি স্তূপের অনুকরণে, কোনটি বা বাঙ্গলার পল্লীকুটীরের অনুকরণে তৈরী করা হয়েছিল।

কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে যেখানে বরেণ্য সোভিয়েট নেতাদের নাগরিক সম্বর্ধনার ব্যবস্থা ছিল, সেখানেও রাজভবন থেকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড পর্যন্ত সমস্ত পথই ঐ একই সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল। এখানে সোভিয়েট নেতাদের শুধু গমন পথেই নয়, পথের আশে-পাশে ময়দানের মনুমেণ্ট ও অন্যান্য স্থানও আলোক-মালায় সাজানো হয়েছিল।

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে সম্বর্ধনা সভার মঞ্চটি হয়েছিল এক অভিনব। ময়ূরপঙ্খীর অগ্রভাগের পরিকল্পনায় কাষ্ঠখণ্ডে এই ময়ূরমঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন শিল্পীরা কয়েকদিন ধরে নিরলস পরিশ্রমে। ঢেউ ভেঙ্গে বুক ফুলিয়ে ময়ূরপঙ্খী যেন সাগরে পাড়ি জমিয়েছে। ধান মাথায় করে ঘরেফেরা কিষাণ-কিষাণী, গুণটানা বলিষ্ঠ মাঝি, গরুর গাড়ীতে ঘরেফেরা গ্রামবধূ, তাঁতী, শিল্পী, পুতুল হাতে গ্রামের কিশোর-কিশোরী—গ্রাম বাঙলার জীবনযাত্রার এই ছবি ময়ূরপঙ্খীর গলুইয়ে ছিল আঁকা। এই ময়ূর-পঙ্খীর বুকের উপরে টকটকে লাল ছাতার তলায় বারান্দাঘেরা চাঁদোয়ার নীচে মাননীয় অতিথিদের জন্য আসন করা হয়েছিল। আর রাজভবনে যেখানে বরেণ্য অতিথিরা এসে ছিলেন, সেখানের তো কথাই নাই। সমস্ত প্রাসাদ ও প্রাসাদ-সংলগ্ন চারিদিকের উদ্যান যে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়েছিল তা বর্ণনা করা যায় না। সোভিয়েট নেতারা রাজভবনে যে যে ঘরে ছিলেন, সেই সব ঘরগুলিও আড়ম্বরপূর্ণ রাজোচিত সজ্জায় মনোরম করে তোলা হয়েছিল।

২৯শে নভেম্বর বেলা ১-৫৮ মিনিটের সময় সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ সুসজ্জিত দমদম বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। তাঁদের আগমনের নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব থেকেই সমাজের সকল স্তরের নরনারী, বালক-

বালিকা, কিশোর-কিশোরী তাঁদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য বিমান-ঘাঁটিতে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ সমবেত অগণিত নরনারীর উদ্দাম আনন্দোল্লাস ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে বিমান থেকে অবতরণ করলে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মাননীয় অতিথিদের জরীর মালায় ভূষিত করে স্বাগত সম্ভাষণ জানান।

ডাঃ রায়ের স্বাগত সম্ভাষণের উত্তরে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন বাঙ্গলার গৌরবময় ঐতিহ্যের উল্লেখ করে বলেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে যে বাঙ্গলা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেই বাঙ্গলার ভূমিতে পদার্পণ করে আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে। বিমান থেকে সবুজ ক্ষেত্র, সুদৃশ্য গ্রামাঞ্চল এবং প্রোজ্জ্বল গভীর নদীপ্রবাহগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমরা ভারতের বৃহত্তম শিল্প-কর্মব্যস্ত মহানগরী কলকাতা দেখেছি। সোনার বাঙ্গলার সম্পদ অপরিমেয় এবং বাঙ্গলার জনসাধারণ মাতৃভূমির স্বার্থে তাদেরই উৎপন্ন সম্পদের উপর স্বীয় আধিপত্য ফিরে পাচ্ছে দেখে আমরা আপনাদের সঙ্গে সুখানুভব করছি।

দমদম বিমানঘাঁটি থেকে রাজভবন পর্যন্ত সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের আগমন পথের উভয় পার্শ্বে এত অগণিত নরনারীর সমাবেশ হয়েছিল যে কোথাও তিলধারণের স্থান ছিল না। পথিপার্শ্বের বাড়ীগুলির বারান্দা, ছাদ, অলিন্দ—সবই লোকে পরিপূর্ণ হয়েছিল। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের আগমন পথের দুই পার্শ্বে সমগ্র কলকাতা সহর যেন ভেঙ্গে পড়েছিল। শুধু এই সহরেরই নয়, দূর দূরান্তর হতেও গ্রামাঞ্চলের বহু নরনারী এই দিন কলকাতায় এসে উপস্থিত হন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সোভিয়েট নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে একটি খোলা গাড়ীতে করে দমদম বিমানঘাঁটি থেকে রাজভবন অভিমুখে রওনা হন। কিছুদূর আসার পর পথে জনতার ভীড় এমনি হয়ে ওঠে যে, শেষে সোভিয়েট নেতাদের আচ্ছাদন-আবৃত পুলিসের বেতার ভ্যানে করে রাজভবনে নিয়ে যেতে হয়। এর ফলে বহু লোক সোভিয়েট নেতাদের দর্শন পান নি।

৩০শে নভেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে সোভিয়েট নেতাদের নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুও দিল্লী থেকে এসে এই সভায় উপস্থিত হন। এই সভায় ঐ দিন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। এই বিরাট জনসমুদ্র দেখে শ্রীনেহরু বলেছিলেন, পৃথিবীর আর অন্য কোথাও এত বিশাল জনসমাবেশ দেখি নাই।

মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভ কলকাতা আসার পরে ময়দানে যে বিশাল জনসমাগম হয় তারই একাংশের দৃশ্য। মঞ্চের উপর মঃ ক্রুশ্চেভ বক্তৃতারত এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী, রাজ্যপাল প্রভৃতি বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপবিষ্ট। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একটি সভায় এরূপ জনসমাগম ইতিপূর্বে পৃথিবীর আর কোথাও হয় নাই

সভায় সম্বর্ধনার উত্তরে মঃ ক্রুশ্চেভ বলেন—ভারতের জনগণ বহুদিনকার ঔপনিবেশিক শাসন হতে নিজেদের মুক্ত করেছেন। ভারতের এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভে সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ খুবই আনন্দিত। এই প্রসঙ্গে গোয়ায় পর্তুগীজ শাসনের উল্লেখ করে মঃ ক্রুশ্চেভ বলেন, পৃথিবীতে এখনও এমন কয়েকটি দেশ আছে যারা জোঁকের মত মানুষের রক্ত শোষণ করছে। গোয়ার লোকেরা ঔপনিবেশিক শাসন হতে মুক্তিলাভ করার জন্য আন্দোলন করছেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে। তাঁরা নিজেদের বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন এবং গোয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে।

মঃ ক্রুশ্চেভ তারপর ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙ্গলার বিরাট অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা এখন সেই বাঙ্গলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় এসেছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গলা ভারতের অন্য সমস্ত অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেছে। কলকাতার জনগণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অপূর্ব কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতার অধিবাসীদের অভিনন্দন জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত।

রাশিয়ার উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে মঃ ক্রুশ্চেভ বলেন—আপনাদের দেশে শক্তিশালী শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ আপনাদের দেশে প্রচুর সম্পদ এবং কর্মঠ ও প্রতিভাশালী মানুষ আছে।

কলকাতা থেকে রেঙ্গুন যাত্রার পথে দমদম বিমান বন্দরে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল, মার্শাল বুলগানিন, শ্রীনেহরু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মঃ ক্রুশ্চেভ প্রভৃতি

ইহা সত্য যে আপনাদের অভিজ্ঞতার অভাব আছে। আপনাদের শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে আমরা আপনাদিগকে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভাগ দিতে প্রস্তুত আছি।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন—আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ সব সময়েই ছোট অথবা বড় সমস্ত দেশের সঙ্গেই শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী। আমরা তাদের আঞ্চলিক গঠনতন্ত্রকে শ্রদ্ধা ও সমর্থন করি। সেইজন্য আমরা পঞ্চশীল গ্রহণ করেছি। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সেই পঞ্চশীলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

উপসংহারে মঃ ক্রুশ্চেভ সংস্কৃতি ও শিল্পের দিক দিয়ে ভারতের সর্বাপেক্ষা উন্নত নগরী কলকাতার শুভ কামনা করেন। এই নগরীর মহান্ সন্তান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, কবি রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশ্বস্ত ও প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। সোভিয়েট জনগণ তাঁকে শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর রচনাবলীর আদর করে। তিনি আশা করেন যে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী দিনে দিনে আরও শক্তিশালী হবে।

কলকাতায় দুদিন থেকে সোভিয়েট নেতারা ১লা ডিসেম্বর ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের জন্য রেঙ্গুন যান। সেখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর তাঁরা পুনরায় ৭ই ডিসেম্বর তারিখে বাঙ্গলার আসানসোল শহরে এসে উপস্থিত হন এবং ঐদিন তাঁরা চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা ও দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অন্যতম অঙ্গ মাইথনের বাঁধ পরিদর্শন করেন। মাইথন থেকে সন্ধ্যার সময় সিন্ধ্রিতে যান। ৮ই ডিসেম্বর তারিখে সিন্ধ্রিতে রাসায়নিক সার তৈরীর কারখানা দেখে জয়পুরে যান। জয়পুর থেকে ৯ই তারিখে সোভিয়েট নেতারা কাশ্মীর যান। কাশ্মীরে পদার্পণ করেই মার্শাল বুলগানিন বলেন—কাশ্মীর উত্তর ভারতেরই একটা অংশ। মঃ ক্রুশ্চেভ আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেন—কাশ্মীরবাসীদের সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাশ্মীর ভারতীয় রিপাবলিকের অন্যতম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

এঁদের এই উক্তিতে পাকিস্থানের গাত্রদাহের সৃষ্টি হয়েছে, তাই পাকিস্থান থেকে সোভিয়েট নেতাদের এই উক্তির বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে।

১১ই সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ শ্রীনগর থেকে নয়াদিল্লীতে ফিরে আসেন। এখানে এবার তাঁরা কয়েকদিন ধরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করেন এবং পঞ্চশীল ও পারস্পরিক বাণিজ্যিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এক যুক্ত বিবৃতি দেন। তারপর তাঁরা ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁদের ভারত ভ্রমণ সমাপ্ত করে দেশে ফিরে যান।

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের পঞ্চশীলের উপর আস্থা এবং দীর্ঘদিনব্যাপী আন্তরিকতার সঙ্গে এই যে ভারত-ভ্রমণ—এর ফলে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর পথ যে দৃঢ়তর হ'তে চলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট সোভিয়েট নেতাদের আজকের ভারতের প্রকৃত রূপ দেখাবার জন্য নানা জায়গাতেই নিয়ে গেছেন এবং সোভিয়েট নেতারাও সেই সব আন্তরিকতার সহিত দেখে ভারতের অবস্থা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

ভারত সরকার এত করলেও আরও দুএক জায়গা তাঁদের ভ্রমণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করলে ভাল করতেন বলে মনে হয়। প্রথমতঃ—আজকের ভারতের অন্যতম যে একটা বড় সমস্যা—উদ্বাস্তু সমস্যা—সেটা দেখবার জন্য তাঁদের একবার কোন উদ্বাস্তু কেন্দ্রে নিয়ে গেলে ভাল করতেন বলে মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ—সোভিয়েট নেতারা ভারতে এসে রবীন্দ্রনাথের কথা ও তার সাহিত্যের কথা বারবার শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করেছেন এবং যাঁকে তাঁরা রাশিয়ার একজন প্রকৃত বন্ধুরূপে বর্ণনা করেছেন, সেই বিশ্বকবির সৃষ্টি বিশ্বভারতী একবার সোভিয়েট নেতাদের দেখানো উচিত ছিল। এমন কি কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমিটিও দেখালে পারতেন।

যাই হোক দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বহুস্থান ঘুরে সোভিয়েট নেতারা ভারতকে সম্যকভাবে বুঝেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, সোভিয়েট ভারতের শুধু সুদিনের বন্ধুই নয়, দুর্দিনেরও বন্ধু হবে। তাঁরা একথাও বলেছেন যে, ভারতে যে কোন ধরণের গবর্ণমেন্টই থাকুক না কেন, ভারত ও সোভিয়েটের মৈত্রীর পথে কোন অন্তরায় হবে না। একদিন একজন কম্যুনিষ্ট এম-এল-একে মঃ ক্রুশ্চেভের সামনে উপস্থিত করে বলা হয়েছিল যে, তিনি কম্যুনিষ্ট। মঃ ক্রুশ্চেভ জবাব দিয়েছিলেন, আপনার রাজনৈতিক মতবাদ কি আমি তা জানতে চাই না, আপনি ভারতবাসী ইহাই যথেষ্ট।

সোভিয়েট নেতাদের ভারত-আগমনের ফলে আমেরিকা ও বৃটেনের কোন কোন মহলে গাত্রদাহের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ তারা একথা বুঝতে পেরেছে যে, রাশিয়া, চীন ও ভারত সম্মিলিত হলে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে একদিনেই সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ঘটবে।

তাই পাছে গোয়া পর্তুগালের হাতছাড়া হয় এই ভয়েই ইতিমধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস ও পর্তুগালের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ কুন্হা ওয়াশিংটন থেকে যুক্ত বিবৃতিতে প্রকাশ করেছেন যে, গোয়া পর্তুগালেরই একটি প্রদেশ, উহা পর্তুগীজ শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং গোয়ার নাগরিকরা পর্তুগালেরও নাগরিক। মিঃ ডালেস ও মিঃ কুন্হার বিবৃতির প্রধান লক্ষ্য সোভিয়েট নেতাদের গোয়া সংক্রান্ত সাম্প্রতিক উক্তিই।

পঞ্চশীলের ভিত্তিতে চীনের সঙ্গে ভারতের চুক্তি ইতিপূর্বেই হয়েছে। এখন আর একটি বৃহত্তর শক্তি রাশিয়াও এই পঞ্চশীলের নীতির সমর্থক হ'ল। বিশ্বশান্তির জন্য পঞ্চশীলের যে প্রয়োজন একথা রাশিয়াও স্বীকার করেছে। এই পঞ্চশীলের ভিত্তিতে মিলিত ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী অক্ষুণ্ণ হোক ও স্থায়ী হোক্ এবং বিশ্বশান্তি বিরাজ করুক, আমরা আজকে এই প্রার্থনাই করছি।

মেয়েদের কথা

বিশ্বের প্রগতিশীল মহিলা সমাজের আলেখ্য

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল মহিলা সমাজের জীবন আলেখ্য পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রেম, পরিণয় ও পরিবার নিয়ে তাদের বহু সমস্যা-কণ্টকিত পথ ধরে চল্‌তে হয় দুর্গম তীর্থযাত্রায় দুর্লভের সন্ধানে—কত অপবাদ, কত লাঞ্ছনা, কত অত্যাচারই না তাদের ভোগ করতে হয়! এদের কথা কজনই বা ভাবে! অথচ নারী মহাশক্তির জীবন্ত প্রতীক, পুরুষের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার উদ্দেশে ভোগ-বিলাসের যন্ত্রবিশেষ নয়—প্রাচীন বৈদিক ভারত এই সত্যই একদা বিশ্বের সম্মুখে প্রথম উদ্‌ঘাটিত করেছিল। কিন্তু সেই ভারতকে আজ অনেক বিদেশী বলে থাকে নাচওয়ালীর দেশ, এটা কম দুঃখের বিষয় নয়। তবে প্রশংসার বিষয় এই যে, রাষ্ট্রকর্ণধারগণ ও ভারত সরকার মেয়েদের মান উচ্চ করে দিয়েছেন, কিন্তু সমাজ এখনও মেয়েদের প্রতি অত্যাচার করেই চলেছে।

যে জাতি নারীকে ভোগ-বিলাসের উপাদান ও প্রজনন-যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন মর্য্যাদা দিতে কার্পণ্য করে, আর যে জাতির পুরুষেরা ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় আত্মমগ্ন হয়ে কুৎসিত দৃষ্টি প্রয়োগ ও পাশবিক আচরণের দ্বারা মাতৃজাতিকে লাঞ্ছিত করে, তার পশ্চাতে যত বড় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিদর্শন থাকুক না কেন, তার অস্তিত্ব লোপ হবেই, আর তা হয়েছেও—এর প্রমাণ ইতিহাসে বিরল নয়। আসুরিক শক্তি কখন সুদৃঢ় হয় না।

ভারতীয় সাম্প্রতিক সমাজ দিক্‌ভ্রষ্ট—দৈহিক লালসার মধ্যে এদেশের অধিকাংশ পুরুষ নিমজ্জিত হয়ে আছে—তাদের ভালোবাসা পণ্যের মত, তাই ভারতীয় নারী হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে পণ্যবস্তুর মত। এ দেশের নারীর মর্য্যাদা কোথায়? আমরা উদ্‌ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট। অনেকের মুখে শোনা যায় একখানি উৎকৃষ্ট মোটর থাক্‌লেই নাকি যে কোন নারীকে করতলগত করা যায়, এদেশের বর্ত্তমান পুরুষের মনোবৃত্তি এইরূপ। এই অভিমত শুনে মনে হয়, এদেশে নারী বুঝি খুব সুলভ। তুড়ি দিলেই কাছে আসে! রাষ্ট্র কর্ণধারগণ আইনের পৃষ্ঠায় ঐন্দ্রজালিক হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষায় মেয়েদের জন্য কত ধারা উপধারাই না রচনা করেছেন, আসলে তাদের মর্য্যাদা ও নারীধর্ম্ম রক্ষার জন্যে কিছুই ব্যবস্থা করেন নি। নানা স্থানে নারীত্রাণ-সমিতি, অবলা আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য সংস্থা প্রভৃতি দেখা যায়। এই সব স্থলে রক্ষকর্ত্তারাই ভক্ষক হয়ে বসে আছেন। এই সব আশ্রমের আনাচে কানাচে কত ভ্রূণহত্যা হয় তার সংবাদ ক'জন রাখে!

তাছাড়া ধর্ম্মমন্দির, মঠ, আশ্রম ও ভজনালয়ে নির্ব্বিবাদে ব্যভিচার চলে এবং রাসপুটিনের মত তথাকথিত বাবারা অবতার পুরুষ সেজে বহু গৃহস্থের বাড়ীতে এসে মেয়েদের নারীধর্ম্ম নষ্ট করে যান, আশ্রমেও যাদুবিদ্যা ও সম্মোহনের ঐন্দ্রজালিকতার সাহায্যে করতলগত করেন। স্বামী সংসার পুত্র পরিবার ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কত নারী যে সাধুবাবাদের শুধু সেবার নয়, ভোগের বস্তু হয়ে আছে সে সম্বন্ধে কজনই বা ভাবে! এরা এরূপভাবে দলবদ্ধ যে এখানে আইন প্রবেশ করতে পারে না, কেন না আইনজ্ঞরাই এই সব বাবার প্রধান চেলা হয়ে বসে আছেন। ফলে পুলিস, আদালত, এসেমব্লি, পার্লামেণ্ট, সংবাদপত্র সব থেকেও শক্তিসম্পন্ন বাবাদের স্বনামধন্য শিষ্যদের দাক্ষিণ্য ও ক্ষমতার বলে সব অভিযোগ ব্যর্থ হয়ে যায়, আর অসংখ্য তরুণী মহিলা সীতার মত অশোক-কাননে আর্ত্তনাদ করে—ধর্ম্মের নামে চলেছে ব্যভিচার! পরকীয় তত্ত্বে মজগুল হয়ে পরকীয়তার প্রতি আসক্তির উৎসাহ বর্দ্ধন করে অবতার পুরুষেরা শিষ্যবর্গকে উত্তেজিত করে তোলেন—নারী তাঁদের ও তাঁদের বড় বড় চেলাচামুণ্ডার ভোগের বস্তু হয়—এদিকে দৃষ্টি দেবার কি কেউ নেই!

নানা সংবাদপত্রের বহু বিঘোষিত প্রচার কলরবের আনুকূল্যে এই সব পুরুষের জন্মতিথি উৎসব হয়, বড় বড় বক্তার সমাবেশ হয় যাঁদের ভাষণে থাকে এঁদের অলৌকিকতার সম্বন্ধে অত্যুক্তি—এই সব ভাড়াটিয়া বক্তারা কি কোনদিন অনুসন্ধান করেছেন নেপথ্যে প্রভুদের কিরূপ রাসলীলা হয়? তারপর আছে উৎসবে যোগদানের জন্যে রেলকর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় অসংখ্য স্পেশাল ট্রেন—আছে অগণিত নারী পুরুষের ভিড়। এদেশে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তদানীং বহু রাসপুটিনের আবির্ভাব হয়েছে, অথচ এদের প্রতি কঠোর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা আজও পর্য্যন্ত হয় নি। এই তো এই হতভাগ্য দেশের অবস্থা! নানা তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তথাকথিত মহাত্মারা মেয়েদের আশ্রমে রেখেছেন গরু ভেড়া করে, এ সংবাদ কজনই বা জানে!

প্রেম, পরিণয় ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীরা সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাপ্রপীড়িতা এবং লাঞ্ছিতা। আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অর্থে বুঝায় মেয়েদের নাচওয়ালী করে এনে লক্ষ লক্ষ পুরুষের কামলোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করে সমাজ ধর্ম্মকে সর্ব্বনাশের মুখে নিক্ষেপ করা। এর ফলে পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বলে আর কিছুই থাকে না। যে দেশের মেয়েরা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ও অন্তরে শুচিতা রাখবার জন্য প্রাণপণ

বাসন্তীকে বাড়ী থাকতে হোল
মেলায়
নীনা ! বাসন্তী কই !
দেখি বাসন্তীর বাড়ী গিয়ে
বাসন্তী ! বাড়ী বসে করছিস্ কী !
মেলায় যাই কী করে ভাই। আমার কাপড় যে বড্ড ছিঁড়ে গেছে।
বুঝেছি · এ বিষয়ে তোর সঙ্গে কথা কইবো ভেবেছিলুম ···
কাপড় কাচবার সময় ওগুলোকে আছড়াস্ নাকি বাসন্তী ?
অবশ্যই! পরিস্কার করে কাচতে গেলে এ ছাড়া আর অন্য উপায় কই ?
সানলাইট সাবান ব্যবহার করে দেখ - যা আমি করি ! দেখ্‌বি আর আছড়ে কাচার দরকার হবে না। আছড়ে কাচলে কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায় আর তাতেই তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে দেখানো হয়েছে)
দেখ, সানলাইটে কী পরিস্কার করে আমার কাপড় কাচা হ'য়েছে।
আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো
সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা বিনা আছাড়ে কাপড় সাদা আর ঝক্‌ঝকে করে কাচে। এখন আমার কাপড়-চোপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমার পয়সা বাঁচিয়েছে।
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
ভারতে প্রস্তুত
S. 236-X52 BG

চেষ্টা করে এসেছে, আজ তাদের শিক্ষায় দীক্ষায় আচার ব্যবহারে এমন দূষিত আবহাওয়া আর পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে তারা নারীধর্ম্মের পবিত্র আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়ে শেষে বিপন্নতার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বলোপ করছে—কত তরুণীরই না কুৎসিত অধঃপতন ঘটছে পুরুষের নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে—এই প্রতীকারহীন অবস্থার ভেতর দিয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা ঘরে বাইরে ট্রামে বাসে অফিসে, হাসপাতালে, সভাসমিতিতে দিনে দিনে লাঞ্ছনা ভোগ করেই চলেছে—ঘৃণায় লজ্জায় তারা সব সময়ে সব কথা বলতেও পারে না। আমাদের দেশের লোক কি কোনদিন মানুষ হবে না? পশুই থেকে যাবে ইন্দ্রিয়ভোগ লালসা নিয়ে?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রত্যেক সংঘর্ষ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পটভূমিকায় দ্বিখণ্ডিত ভারতের সামাজিক শক্তির ধ্বংস ও অর্থ-নৈতিক বিপর্য্যয় এদেশের মহিলা সমাজকে একেবারে পশুর স্তরে নামিয়ে এনেছে। এদের মর্য্যাদা রক্ষার দিকে রাষ্ট্র ও গণশক্তির কতটুকুই বা লক্ষ্য আছে—সর্ব্বত্রই আসুরিকতা ও পাশবিকতা আত্মগোপন করে আছে' সুদক্ষ শিকারীর মত—নারী কল্যাণের উদ্দেশ্যে এদেশের মত বিবেচনা কোথায় আছে?

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে আমাদেরই মত যে দুটি রাষ্ট্রের মেয়েরা সব চেয়ে বহুধা-বিস্তৃত সঙ্কটের মধ্যে পড়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে বহু বিড়ম্বনা ভোগ করেছে, তার নাম হচ্ছে চীন ও অষ্ট্রিয়া। মাউসেতুনের অধিনায়কতায় নয়া-চীন আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছে মাত্র কয়েক বছরে, এর আগে চিয়াংকাইসেকের সময়ে মেয়েরা পেয়েছে অজস্র দুর্গতি—ব্যভিচারের স্রোতে সমগ্র চীন প্লাবিত হয়েছিল। সেই চীনের আজ নতুন রূপ।

অষ্ট্রিয়ার মেয়েদের ভাগ্যের ওপর দিয়েও বয়ে গেছে তুমুল ঝড়। এখনও মেয়েরা মুক্তির পথে মুক্ত মনের পরিচয় দেবার অধিকারী হয়নি—এখনও শাসনের গণ্ডীবদ্ধ অবস্থার মধ্যে এদের থাকতে হয়েছে। অষ্ট্রিয়াতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মেয়েপুরুষের সমান অধিকার কাগজে কলমে থাকলেও মেয়েদের অধিকার পশ্চাতেই রয়ে গেছে। এখানকার পরি-বারের কর্ত্তাই তাঁর স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভালো মন্দ সব কিছুই দেখেন, সব ব্যাপারের তিনিই পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর কর্ত্তৃত্বই সকলকে মেনে চলতে হয়। স্ত্রীর মত না নিয়েও তার পক্ষ হয়ে তিনি আদালতে 'প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রে আছে তাঁর সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার। স্ত্রী কেবল তাঁর সাহায্যকারিণী ও সঙ্গিনী হিসাবেই সংসারে কাজ করেন। স্ত্রীর ধনৈশ্বর্য্য এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর স্বামীর কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার আছে। যেখানে স্ত্রীর আপত্তি থাকে, সেখানে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। বিয়ের পরই স্বামীর নাম-পদবীর সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে আত্মবিলোপ সাধন পূর্ব্বক স্বামীগৃহে আসতে হয়, আপত্তি করলে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। বিবাহবন্ধন-ছিন্ন নারী তার সন্তানসন্ততিদের সম্পর্কে সর্ব্ব বিষয়ে তাদের পিতার মতামত নিতে হয়, নিজের থাকে না কোন স্বতন্ত্র মর্য্যাদা। ছেলেমেয়েরা কোথায় যাবে না যাবে, কি ভাবে থাকবে না থাকবে, তাও তাদের পিতার নির্দ্দেশ নিয়ে বিবাহবন্ধন ছিন্ননারীকে চলতে হয়—এর চেয়ে বিড়ম্বনা ভোগ নারীর পক্ষে আর কি হোতে পারে? স্বামীর মৃত্যুর পর নারী শুধু অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কের ভারটুকু পায়, তাও স্বামী মনে করলে এ ক্ষমতা অপরকে দিয়ে যেতে পারেন তাঁর মৃত্যুকালে, এই অষ্ট্রীয় নারীর অবস্থা।

স্বামীর এবম্প্রকার অধিকারব্যাপ্তি ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য অষ্ট্রীয়ার মহিলার ভাগ্যে বহু দুর্ভোগ ঘটে আসছে। বহু প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বামী আছেন, এঁদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে অষ্ট্রীয় বধূরা। মহিলা সমাজ সাম্প্রতিক সময়ে ওর প্রতীকারের জন্যে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আইনের ধারাগুলি সংশোধিত করবার উদ্দেশ্যে, গভর্ণমেণ্টও অবশ্য এঁদের কথায় কর্ণপাত করলেও কাজে এখনও বিশেষ কিছু হয় নি। অষ্ট্রীয় নারী বিদেশীকে বিবাহ করলে অষ্ট্রীয়ার রাষ্ট্রগত নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আইনের চক্ষে অষ্ট্রীয়ার মেয়েপুরুষের সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থান বা আসন পায় না। রাজনীতিক্ষেত্রে অতিঅল্পসংখ্যক নারী আছে বটে, কিন্তু তাদের কণ্ঠমুখর হবার মত অবস্থা নেই। সরকারী দপ্তরে, পরিষদে বা রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগে অতি অল্প মেয়েই প্রবেশ করতে পেরেছে, কিন্তু এদের আসন উচ্চে নেই।

আজকাল সওদাগরী অফিসে, কলকারখানায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের সংস্থায়, পণ্যবীথিতে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে অষ্ট্রিয়া মেয়েরা কিছু কিছু প্রবেশ করেছে কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় এদের সংখ্যা অল্প। সাহিত্য ও কাব্যক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে আছে কাগজওয়ালাদের এক-দেশদর্শিতার ফলে। এই সব লক্ষ্য করে মেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে; নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্যে এরা মহিলা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন গঠন করেছে, ফলে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা কিছুটা সংযত হয়েছে। অষ্ট্রিয়ার মহিলা হপ্তায় ৪৪ ঘণ্টা কাজ করে। যারা নার্স বা পরিসেবিকা রাত্রিতে তাদের কাজ করতে হয় না—খুব কম নার্স'ই আছে যাদের নাইটডিউটি দেওয়া হয়, অবশ্য এর জন্যে তারা বেশ পয়সা পেয়ে থাকে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের দেশের নার্সদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—তারা মরুক আর বাঁচুক সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি নেই, বহুদিন অসুখ ভোগের পর পথ্য করেই নাইটডিউটী দিতে যেতে হয়, এরূপ সংখ্যা বহু দেখা যায়—ফলে তাদের শরীর ভেঙে পড়ে, আর অকালে প্রাণত্যাগ করে—প্রকারান্তরে এও একপ্রকার নারীনির্য্যাতন।

অষ্ট্রিয়াতে স্বাস্থ্যহানিকর কোন কাজই মেয়েদের করতে দেওয়া হয় না, ভারি জিনিষ পর্য্যন্ত তাদের তুলতে দেওয়া হয় না, গর্ভবতী মহিলাকে কোন প্রকারেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদচ্যুত করবার অধিকার নেই। গর্ভাবস্থায় আর সন্তান প্রসবের পর চার মাস পর্য্যন্ত কোন কারণেই পদচ্যুত করা চলতে পারে না—এইটাই হচ্ছে অষ্ট্রিয়ার মেয়েদের সম্পর্কে কর্ম্মক্ষেত্রে আইনকানুন। এ সম্পর্কে আইনের ধারাগুলি মেনে নিয়োগ কারিগণ চলছেন কিনা, তা দেখবার জন্যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারের

পরিদর্শকমণ্ডলী আছেন। এঁরা নিত্যই এসে পর্য্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করে থাকেন, কোথাও ব্যতিক্রম হোলে নিয়োগকারিগণকে আইনের বলে বাধ্য করা হয়, এমন কি দণ্ড পর্য্যন্তও দেওয়া হয়ে থাকে। অষ্ট্রিয়ায় মহিলাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অল্পসংখ্যক মহিলা প্রতিষ্ঠান আছে। রাজনৈতিকক্ষেত্রে মহিলাদের যে প্রধান তিনটী দল আছে তারা নারীদের জন্য এযাবৎ ভোটই সংগ্রহ করে আস্‌ছে, বর্ত্তমানে এদের প্রভাব রাষ্ট্রের ওপর তেমন নেই। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে অষ্ট্রিয়ার গণতান্ত্রিক সংস্থার মেয়েরা কিছু কাজ করছেন বটে, তবে এঁরা কোন রাজনৈতিক দলে নাম লেখাননি।

বিংশ শতাব্দীতে মহিলাপ্রগতি সম্পর্কে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জগতে চলেছে নানা পরিবর্ত্তনের পরীক্ষা নিরীক্ষা। সভ্যতার রাজপথে নবজাগরণের শোভাযাত্রা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, আর এ জাগরণে প্রভূত সহায়তা করছে বিশ্বচেতনা। এই বিশ্বচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আনন্দ বেদনা ও সৌন্দর্য্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জেগে উঠেছে নবতান্ত্রিক চীন। প্রাচ্যের মহাস্থবিরতার আবরণ উন্মোচন করে এই দেশের মহাঅভ্যুদয় ঘটেছে। আজ সে আর অহিফেনজর্জ্জরিত নয়—পাশ্চাত্যজাতির শোষণ-যন্ত্রও নয়। আজ তার মহৎ জীবনাদর্শের দিকে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি পড়েছে। তার মহিলা সমাজ হয়ে উঠেছে সর্ব্বোন্নত, মহাশক্তির মূলাধার আর মহিমাবৈভবসমন্বিত।

চিয়াং কাইসেকের আধিপত্য পর্য্যন্ত একদিনের জন্যেও চৈনিক নারী সংসারে সুখশান্তি পায় নি—ধর্ষণ, বলাৎকার, ব্যভিচার ও অত্যাচার ভোগ করেছে অসংখ্য নারী। তাছাড়া সুবৃহৎ পরিবার নিয়ে জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত দেশের লোক নৌকায় পর্য্যন্ত বাস করেছে—শাশুড়ী বউয়ের দ্বন্দ্ব কলহ দু'বেলাই দেখা গিয়েছে, তাদের মধ্যে হয়েছে মারপিঠ, আর অশান্তিকর পরিস্থিতি উঠেছে চরম দুর্দ্দশায়। তাই চীন হারিয়ে ফেলেছিল তার জীবন-লক্ষ্মীকে ঠিক আমাদেরই মত।

এশিয়া খণ্ডে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে হঠাৎ কিছুদিন আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাউ সেতুন এসে চিয়াং কাইসেকের সামন্ততন্ত্রবাদ ভেঙেচুরে ফেলে নয়াচীনকে গড়ে তুল্লেন সমাজতন্ত্রী করে, আর স্বজাতির হৃত গৌরব ও আত্মমর্য্যাদাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে পৃথিবীর কৃতী পুরুষ রূপে সকলের নমস্য হলেন। মেয়ে-পুরুষের দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন হোলো। নয়াচীন মুখে বল্‌লো না রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো--কিন্তু কাজে দেখালো রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

আমাদের রাষ্ট্রে বলা হল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে, কাজে দেখানো তা আকাশ কুসুমে পরিণত হয়েছে। আজ চীনের মেয়েরা সুশিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী, স্বাধীনা, চরিত্রবতী এবং সুখী। ওদের প্রেম, পরিণয় ও পরিবার পৃথিবীর অন্যান্য শক্তির অনুকরণীয় বলা যেতে পারে। নেই আর বীভৎস ব্যভিচারের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া—মহিলা সমাজ শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিতা। এরা পেয়েছে প্রচুর প্রগতির আলো। অষ্ট্রিয়া ও চীন সোভিয়েটের আনুকূল্য পেয়েছে একটি মহা অধিনায়কের—আর অষ্ট্রিয়ার হয়েছে নেতৃত্বের অভাব। অষ্ট্রিয়া সমাজের মেয়েদের রয়েছে এখনও দুর্দ্দশা, চীনেরা মেয়েরা পেয়েছে অজস্র সুখশান্তি।

নয়াচীনের সাধারণতন্ত্র বিবাহ আইনের বলে মেয়েপুরুষের জীবনযাত্রা পথে সঙ্গ-নির্ব্বাচন সম্পর্কে স্বাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়েও এইরূপ ব্যক্তি-স্বাধীনতা দিয়ে মেয়ে পুরুষকে আত্মসম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করবার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়াতে পারিবারিক আবহাওয়া শান্তিপূর্ণ ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হ'য়েছে। স্বামী স্ত্রী উভয়েই ইচ্ছুক হোলে বিবাহ বিচ্ছেদ হোতে পারে, তবে ঘটনাচক্রের পরিবেশ অনুসারে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনা আদালতগ্রাহ্য করতে পারেন, আবার নাও করতে পারেন। বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে কোন কারণ প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথা আইনের কোন ধারায় উল্লেখ নেই। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধ অতীব জটিল। তাই আইনের বলপ্রয়োগ করে কঠিন আবেষ্টনীর সৃষ্টি করা হয় নি, কেননা এ'তে বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যাহত হোতে পারে। স্থানীয় জেলা সরকারের কাছে বিবাহ বিচ্ছেদ বা ডাইভোর্সের জন্যে দরখাস্ত করা হয়। সরকার চেষ্টা করেন স্বামীস্ত্রীর গণ্ডগোল মিটিয়ে দিয়ে ঘরসংসার করবার জন্যে—স্থানীয় সরকার মিটমাটে বিফল হোলে সাধারণের আদালতে (People's Camp) বিচারকের সম্মুখে মামলা শুনানী হয়। বিচারের সঙ্গে থাকেন দুজন পঞ্চায়েৎ—এঁদের রায় অনুসারে বিবাহ সম্পর্কীয় মামলার নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর করার পূর্ব্বে জন আদালত কঠোররূপ ধারণ করেন এবং যেমন করেই হোক স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব কলহ মিটিয়ে দিয়ে দাম্পত্য জীবন সুখকর করবার জন্যে চেষ্টা করেন। বিবাহ আইনের অষ্টম ধারায় বলা হয়েছে যে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বামীস্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে প্রেম ভালোবাসা মর্য্যাদা সাহচর্য্য, সম্প্রীতি ও ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সন্তানের জন্মদান, তাদের কল্যাণের প্রচেষ্টা, পরিবারের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন এবং নূতন সমাজ গঠন ও উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হবে। যদি প্রেম স্বামীস্ত্রীর মধ্যে আর না থাকে এবং কোন প্রকারেই তাদের পক্ষে একত্র থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন বিশেষভাবে আদালত তদন্ত করে মিটমাটের পক্ষে অসমর্থ হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর করেন। কারণ এক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিকূল মনোভাব নিয়ে উভয়কে একত্রে থাকতে বাধ্য করার কোন অর্থ হয় না তা'তে আধ্যাত্মিক ক্ষতিপার্থিব অশান্তি ও কর্ম্মক্ষতি হয় এবং সন্তান লালন পালন, সমাজ কল্যাণ ও মেয়েপুরুষের ব্যক্তিগত অধিকার ব্যাহত হয়।

স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে অথবা এক বছরের নিম্নে শিশুর বয়স থাকলে স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনতে পারেন না, কিন্তু স্ত্রী যে কোন সময়েই স্বামীর বিরুদ্ধে এই মামলা আনতে পারেন। বিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রীর কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যায় না, ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ ও তাদের শিক্ষার জন্যে মনঃসংযোগ করতে হয়। মায়ের কাছে ছেলেমেয়েরা থাকলে পিতাকে তাদের লালনপালনের জন্যে ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হয়। এ ভার লাঘব হোতে পারে অথবা একেবারেই এ ভার দেওয়ার

'সংস্কৃতি'র ঘাড়ে চেপে সংস্কৃতি-সন্ধানাকে এমন বিপথে নিয়ে যায় যে তিনি সম্ভব, অসম্ভব, সব কিছুর মধ্যেই সগৌরবে সংস্কৃতির অস্তিত্ব আবিষ্কার ক'রে বসেন! এমন কি, একথাও বিশ্বাস করেন যে "অন্তরের গোপন-স্তরশায়ী প্রবণতা, ঐতিহ্যলব্ধ মনোলোকের 'প্রচ্ছন্ন' জীবনীশক্তিই সংস্কৃতির সত্য পরিচয়।"

দুঃখের বিষয়, এটা সত্য নয়। সংস্কৃতির পরিচয় তো নয়ই। যা অন্তরের গোপনস্তরশায়ী প্রবণতা তা সংস্কৃতির পরিচয় হ'তে পারে না। কারণ, আমার অন্তরের গোপনস্তরশায়ী প্রবণতা হ'ল কোনও প্রতিবেশিনী সুন্দরীকে কোনও রকমে অঙ্কশায়িনী করা, বা—আমার হাড়-কঞ্জুস বাপটাকে কোনও রকমে বিষ খাইয়ে মেরে টাকাকড়ির মালিক হবার উদগ্র বাসনা! মনীষী ফ্রয়েডের কথিত অন্তরের গোপনস্তরশায়ী এ প্রবণতা আর যাই হোক,—সংস্কৃতির সত্য পরিচয় যে নয়,—আশা করি মনোবিকলন বিদ্যায় গভীর জ্ঞান না থাকলেও একথা কাউকে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হবে না। তারপর, ছাই-চাপা আগুনে যেমন ভাত রাঁধা যায় না, তেমনি ঐতিহ্যলব্ধ মনোলোকের প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তি অসাড়তা বা জড়ত্ব ছাড়া আর কিছুরই সত্য পরিচয় বহন করেনা। সংস্কৃতির পরিচয় তো নয়ই!

'সংস্কৃতির-স্বরূপ' প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় লেখক বলেছেন—"হাজার হাজার বছর ধরে অবচেতন মনের তলদেশে সঞ্চিত সুপ্ত মানসপ্রবণতা বা আত্মবিস্মৃত ভাবসত্তা হঠাৎ জেগে উঠে সংস্কৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে" কিন্তু 'সংস্কৃতির' হঠাৎ আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়। ও যে দীর্ঘ সাধনার ধন! তার পরই শুনি—"বালুকা রাশির নীচে যে ফল্গুধারা আত্মগোপন করে সুশীতল নির্ঝর রূপে উৎসারিত হয়, সেইখানেই আমরা মর্মমূল জড়িত সংস্কৃতির 'গোপন' পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারি।"

মর্মমূল জড়িত সংস্কৃতির গোপন-পদচিহ্ন লক্ষ্য করা খুব powerful চশমার সাহায্যেও সম্ভব নয়, মাইক্রস্কোপেও ধরা পড়বে কিনা সন্দেহ! গোপন-পদচিহ্ন লক্ষ্য করতে হলে এক্সরে-আইজের সর্বভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চাই। সে আর আমাদের কজনের আছে? সুতরাং, মর্মমূলজড়িত সংস্কৃতির গোপন পদচিহ্ন চিরদিন অলক্ষ্যই থেকে যাবে।

"আমাদের ধর্মগত সংস্কার, সামাজিক সংস্কার, জাতীয় জীবনের সংস্কার এই ত্রিধারাই সংস্কৃতির মূলে রসসিঞ্চনের প্রধান হেতু" এ মতবাদ যুক্তিসহ নয়। উপরন্তু বেশ একটু গোলমেলে। সংস্কৃতির সন্ধানে যাত্রা করে এই তে-মাথায় প্রবন্ধকারের দিক্‌ভ্রান্তি ঘটেছে। অবশ্য, সংস্কৃতির প্রসার উক্ত ত্রিধারার পরিধির চেয়ে যে অনেক বেশি, এটা তিনি স্বীকার করেছেন। অথচ, পল্লীর প্রাচীন পূজা উৎসবগুলিকেও তিনি সংস্কৃতির পরিচায়ক বলে মনে করেন।

তা'হলে প্রশ্ন উঠতে পারে—পাঁঠা বলি, মেষ ও মোষ বলির পরে নবমীর কাদামাটি, প্রতিমা বিসর্জনের মিছিলে কুৎসিৎ অঙ্গ-ভঙ্গিসহ নাচ, কালী পূজায় ছুঁচোবাজী, কানের পর্দা কাটানো পটকার আওয়াজের উৎকট উল্লাস, ফাল্গুন পূর্ণিমার বসন্ত উৎসবে কাঠফাটা রৌদ্রে আবীর কুঙ্কুমের বদলে গোবর পাঁক কালি ঝুল নিয়ে হৈ'হল্লা মাতামাতি, গাজনতলায় কাঁটা ঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ, আগুনঝাঁপ, আর কোমরে শলা বিঁধে চড়কগাছে চরকীঘোরা—এ গুলিকেও কি আমাদের সংস্কৃতি বলে নির্দেশ করা হবে?

শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় দেখেছেন "জাতীয় উৎসবের মধ্যে সুকুমার শিল্পকলার লৌকিক প্রকরণ ও মনোরঞ্জনের বিবিধ আয়োজন।" লৌকিকস্তরের নৃত্যগীত প্রভৃতিকেও তিনি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'লৌকিক' এই নাম দিয়ে সামাজিক শিষ্টাচারসম্মত শব্দের পোষাক পরালেও অশিক্ষিত প্রাকৃতজনের অমার্জিত অসংস্কৃত স্থূল গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদ বা নৃত্যগীত Cultural Function বলে গণ্য হতে পারে না। জামাজোড়া গায়ে দিয়ে নিরেট মূর্খ পাঁচু, পঞ্চাননবাবু সেজে এলেই কি সে সংস্কৃতিবান বলে গণ্য হবে? গুরুগম্ভীর শব্দবিন্যাসের দ্বারা দুর্বোধ্য বাক্য রচনাপূর্বক সংস্কৃতির এরূপ জটিল ব্যাখ্যা করাকে বলা চলে Sophism বা হেত্বাভাস প্রচার করা। কোদালকে সোজা কোদাল না বলে কুদ্দালক বললেই তাকে তরবারির জাতে তোলা যায় না। শাবল-টাকে বড় জোর মাটি খোঁড়া খোন্তা পর্যন্ত বলতে পারা যায়, কিন্তু সেটাকে যদি 'অয়স্কান্তিক শর্বলা' ইত্যাদি গালভরা নাম দিয়ে বর্ণনা করি তা'হলে বেচারা শাবল ঐ দাঁতভাঙা নামের আড়ালেই চাপা পড়ে যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে সংস্কৃতির অবস্থাও দাঁড়িয়েছে তাই।

মাননীয় লেখক মহাশয় সংস্কৃতির মোদ্দা কথাটা কি বলতে চেয়েছেন, আমরা তাঁর শব্দাড়ম্বরের তরঙ্গে তা' অনুধাবন করতে পারিনি।

গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদের মধ্যে যতই কেন অশিক্ষিতপটুত্ব, স্বাভাবিক নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য থাকুক না, তবু তার আদিম স্বভাবের স্থূল রূপটা ঢাকা পড়ে না। পৃথিবীর অসভ্য যুগের আদিম বর্বর মানুষ, যাঁরা বর্তমান জগতের শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বল আলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন, মানবের সেই অবিস্মরণীয় পূর্বপুরুষগণের প্রায়-নগ্ন অবস্থায় সর্বাঙ্গ চিত্র-বিচিত্র করে ঢোল বাজিয়ে মশাল জ্বেলে উল্লসিত উৎকট চিৎকারের সঙ্গে সদ্য-নিহিত মানুষ বা পশুকে ঘিরে উদ্দাম নৃত্য করাকে যদি "বংশধারা সংক্রামিত দোষ গুণের ন্যায়, রক্তকণা বাহিত শক্তি দুর্বলতার ন্যায়—সমগ্র জাতির অতীত জীবনসাধনা থেকে পাওয়া এই মানসবৈশিষ্ট্য আমাদের সচেতন চিত্তের ভিত্তি রচনা করে"—বলি, তা'হলে বেচারা 'সংস্কৃতি' এসে দাঁড়ায় কোথায়? তাই কি তাকে মনের অবচেতন ভূমিতে নামিয়ে অন্তরের গোপনস্তরে ঠেলে দেবার সকরুণ প্রয়াস?

কালোয়াতী সঙ্গীত যাঁরা বোঝেন না, অর্থাৎ, যাঁরা কলাবৎ নন, তাঁদেরও মনের গভীরে সুরের অনুরণন প্রবেশান্তে একটা মাধুর্যরসে চিত্ত আপ্লুত করে কিনা এবং সঙ্গীত-মুখী কোনও আকর্ষণ সৃষ্টি করে কিনা অথবা—তার রুচিগঠনে সহায়তা করে কিনা—এ সকল তর্ক-সাপেক্ষ বিষয়কে সিদ্ধান্ত-হিসাবে মেনে নেওয়া চলে না। কিন্তু, এটা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, যেখানে শিক্ষার সম্পর্ক নেই সেখানে তার পরোক্ষফল 'সংস্কৃতি' হ'তে পারে না। সঙ্গীতের মোহিনী সুরে বনের পশু পাখীও আকৃষ্ট হয়, বংশীধ্বনি বিষধর সর্পকেও নাচায়। তাদের মধ্যেও কি তবে অন্তরের গোপনস্তরবাহী সুপ্ত সংস্কৃতি কাজ করে বলে স্বীকার করে নিতে হবে?

শান না-দিলে যেমন ইস্পাতে ধার হয় না—হীরে না-কাটলে যেমন তার জেল্লা প্রকাশ পায় না—তেমনি প্রকৃত শিক্ষা না-পেলে, সভ্য-সমাজের অভিজাত সহবতের সংস্পর্শে না এলে, রুচি ও রসবোধের উৎকর্ষ সাধিত না-হলে—কোনও মানুষই সংস্কৃতিবান হয়ে উঠতে পারে না। ওটা মহাভারতের কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো— সহজাত নয়, দৈবায়ত্তও নয়। সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে 'সংস্কারের' সঙ্গে 'সংস্কৃতিকে' জড়িয়ে ফেলায়—বিষম-জটিলতার সৃষ্টি হ'য়েছে। যেমন ধরুন প্রবন্ধকার বলেছেন—"যাত্রার আসরে সুদূর কোনগুলিতে আসীন যে নিরক্ষর পুরাণ-জ্ঞানহীন শ্রোতৃমণ্ডলী কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া অভিনয়ের দৃশ্যাবলী মুগ্ধ আত্মভোলা মনে অনুসরণ করে, আর এক অনির্দেশ্য ভাব-রোমাঞ্চের শিহরণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে, তাঁহারা এক গোপন চেতনাবাহী সংস্কৃতির অনতিক্রম্য প্রভাবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।"

এখানে আমি শ্রদ্ধেয় লেখকের উক্তির সবিনয়ে প্রতিবাদ করে বলতে চাই—তাদের সে শিহরণ ও কম্পন—পৌরাণিক কাহিনী কিছুই না-বুঝে যদিই বা হয়, তবে সেটা তাদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কারবশে হতে পারে। সংস্কৃতির প্রভাবে কদাপি নয়। 'সংস্কৃতি', কোনো অনির্দেশ্য ভাবরোমাঞ্চে শিহরিত হয় না এবং তার প্রভাব 'গোপন-চেতনা বাহীও' নয়। সামাজিক সচেতনতার মধ্যেই সংস্কৃতির বিকাশ। তা' প্রকৃত শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনার উৎকর্ষের দ্বারাই আয়ত্ত করতে হয়। সংস্কৃতিবান পরিবারের ছেলে মেয়েরা আশৈশব, Cultural atmosphere এর মধ্যে মানুষ হবার সুযোগ পায় বলে তাদের আচরণে ও জীবনযাত্রা প্রণালীতে পারিপার্শ্বিক প্রভাবজাত সংস্কৃতির ছাপ পড়ে। কিন্তু অশিক্ষিত জনেরা গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে, অসংস্কৃত আবহাওয়ায় পালিত যারা তাদের কাছে সেটা আশা করা যায় না। কাদামাটী—নোংরা কাদা-মাটিই থেকে যায়, যে পর্যন্ত না কোনও মৃৎশিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় তা অপরূপ দেবদেবীর মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়! অবচেতন মনের গোপনস্তরে যে বস্তুই থাক না, তা 'সংস্কৃতি' বলে পরিচিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না দক্ষ-শিল্পীর নিপুণ স্পর্শে তা রমণীয় রূপ পরিগ্রহ করে প্রকাশ পাচ্ছে।

সুগঠিত সুন্দর প্রতিমা—আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির পরিচায়ক। কিন্তু তার ভিতরের গোপনস্তরে প্রচ্ছন্ন যে খড় দড়ি ও বাঁশ বাঁখারি আছে সেটাকে "সংস্কৃতির ফল্গুধারা" বলে বর্ণনা করলে কি সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয় না? পথের ধারে—পাথরখানা পাষাণ অবস্থায় পড়ে থাকে। কিন্তু নিপুণ ভাস্করের সুদক্ষ তক্ষণ-প্রয়োগে যখন সে দেব-দেবীর রূপ ধারণ করে। তখন আর অনাদৃত শিলাখণ্ড রূপে পড়ে থাকে না, পূজার মন্দিরে এসে—দেবতার বেদীতেই স্থান পায়!

মানুষেরও সেই কাদামাটি পাথরের মতো আদিম অবস্থা ও তার মূঢ় প্রকৃতি থেকে তাকে মুক্তি দেয় তার অনুশীলনলব্ধ সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতি' মানব জীবনে মননশক্তির পূর্ণ বিকাশের দ্বারা মানসিক ক্রান্তির একটা অভিনব দিব-অয়ন সৃষ্টি করে, যা সাধারণ হ'তে পৃথক এবং সংস্কৃতিবান মানুষেরই বিশেষ গুণ হিসাবে গণ্য। কেবলমাত্র নৃত্য গীত অভিনয় আবৃত্তির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, কেবলমাত্র জনসাধারণের মনোরঞ্জন প্রয়াসই সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ নয়! সমাজ জীবনের উৎকর্ষ, তার শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত ও রম্যকলার সঙ্গে নীতি ও ধর্ম বোধের দিক দিয়েও সংস্কৃতির দান অপরিমেয়। যেহেতু, একমাত্র সংস্কৃতিই মানুষের অনাড়ম্বর ধর্মবোধকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার আনুষঙ্গিক কুসংস্কার থেকে তাকে মুক্তি দেয়।

শিক্ষিত ও সভ্য মানুষের নিয়ত উন্নত চিন্তা ও অনুশীলনের ফলে একটি পরিচ্ছন্ন সূক্ষ্মানুভূতি সম্পন্ন মন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, যার ফলে উচ্চাঙ্গের শিল্প সুষমার পেলব স্পর্শ সহজেই সেখানে তীক্ষ্ণ রসানুভূতির আবেদন এনে পৌঁছে দেয়। তাঁদের রুচি ও রসবোধ এবং শিল্প দৃষ্টির মধ্যে একটি সুচারু উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁরা সুকুমার শিল্প, রম্য কলা, ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির প্রকৃত রসবেত্তা হয়ে ওঠেন। সুসভ্য মানব সমাজের এই উন্নতমনা, সূক্ষ্মরসবেত্তা, বিদগ্ধ মানুষ গুলিকেই একমাত্র সংস্কৃতিবান বলা যায়। শিক্ষা-বিভাগের ডিগ্রী পেলেই সংস্কৃতিবান হয় না, গোঁড়া 'ধর্মপ্রাণ' হ'লেই সংস্কৃতিবান হয় না, এ আমরা তো প্রতিদিনই আশে পাশে দেখতে পাই।'

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বনোয়ারী কাহারকে বাংলার ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে উপস্থিত করলে আমরা সেই ভুলই করবো যা সংস্কার ও সংস্কৃতিকে একাকার করে দেখার ফলে উদ্ভূত হ'তে বাধ্য। 'সংস্কৃতি' ধর্ম-নিরপেক্ষ। সংস্কৃতির ঐশ্বর্য ধর্মকে বাদ দিয়েও লাভ করা সম্ভব। সোভিয়েট রাশিয়া তথাকথিত ধর্ম মানে না, কিন্তু সংস্কৃতির সাধনায় আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করেছেন। অনেক 'নাস্তিক' সংস্কৃতিবানও পৃথিবীতে আছেন।

এক সময়ে সারা পৃথিবীর মানবসমাজই ধর্মগুরুদের দ্বারা শাসিত হত। ভারতবর্ষও একদিন ধর্মশাসনের নাগপাশে আবদ্ধ ছিল। সে যুগে, শিক্ষা, সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা স্বভাবতই ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতো। তার মানে এ নয় যে ধর্মই ছিল সেদিন সংস্কৃতির মূল। এমন অনেক ধার্মিক সেদিনও ছিলেন, আজও আছেন, যাঁরা ধর্মের গোঁড়া হলেও 'সংস্কৃতির' সংস্পর্শে আসেননি। ফোঁটা তিলক, দাড়ি, জটা, পৈতে টিকি তাঁদের ধর্মের প্রতীক রূপে প্রত্যক্ষ গোচর হলেও, সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না।

আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হয়েছে "বিবাহ ও অন্যান্য শুভকর্মে কতকগুলি মেয়েলী আচার অনুষ্ঠান আছে, এগুলির হয়ত' এককালে ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ বা কিছু সাংকেতিক অর্থ ছিল। এখন এগুলি সংস্কৃতির ক্ষীণসূত্রে বিধৃত।......উৎসবে নারীদের নৃত্যগীত ভদ্র বাঙালী সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের কোনো কোন স্থানে এই প্রথা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও প্রচলিত ছিল এবং এ গুলিতে অজতবীরবে সুরুচি-সম্মত মৃদু ছন্দ, যে সুষমাময় পরিমিতিবোধ ও আতিশয্য বর্জনের পরিচয় মিলে তাহাতে ধর্মের অনুশাসন কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সংস্কৃতির স্বতস্ফূর্ত প্রেরণায় রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা বোঝা যায়।"

'বোধহয় ছিল' এবং 'হয়ত আছে' ইত্যাদি সংশয়াত্মক ভাষার মাধ্যমে পরিবেশিত কোনও তত্ত্ব কোথাও তথ্য হিসাবে প্রমাণিত হয় না। এদেশের গ্রাম্য মেয়েরা কোন কোন দেব দেবীর পূজা পার্বণে ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের অধিবাস উপলক্ষে দলবেঁধে গান গাইতে গাইতে জল সইতে যান। কোনও কোনও বিশেষ উৎসবে কেবলমাত্র মেয়ে মহলে এক সময়ে তাঁরা এক ঢঙের রঙ্গ-নৃত্য নাচতেনও। গান গেয়ে গেয়ে বা ছড়া বলতে বলতে বারাঙ্গনার প্রাঙ্গণে মৃত্তিকা সংগ্রহ করে আনতে যেতেন প্রতিমা গড়বার প্রয়োজনে লাগবে বলে। এই সব গ্রাম্য উৎসব ও নানা কুসংস্কারজড়িত অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে 'লোক' নৃত্য ও গ্রাম্য গীত এদেশে প্রচলিত ছিল, তাকে আর যাই বলা যাক্— সংস্কৃতির পরিচায়ক বলা চলে না। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে, সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, নিজেদের রুচি ও রসবোধের উৎকর্ষের ফলে এগুলোকে লজ্জার ব্যাপার বলে বুঝে, আজ ছেড়ে দিয়েছেন।

এখনও বিবাহ উপলক্ষে ঘনঘন হুলুধ্বনির মধ্যে স্ত্রী-আচার, পরামাণিকের খেঁউড় এবং বাসর ঘরে বেহায়াপনা যা চলে, অথবা রজস্বলা নববধূর প্রথম পুষ্পোৎসবে বা গৃহে নব-জাতকের আবির্ভাবে নপুংসকের দল এসে ঢোল বাজিয়ে তালি দিয়ে যে কুৎসিত নৃত্য করে, সেটা একটু সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে তার মধ্যে 'সংস্কৃতি' বলে কিছু নেই। ওগুলো আমাদের আদিম অসভ্য যুগের বর্বর অবস্থাকালীন প্রাচীন ঐতিহ্যের জের-টেনে আসাটাই প্রমাণ করে! প্রগতি ও পরিবর্তন-বিমুখ আমাদের সমাজ কেবল পিছন দিকে তাকিয়ে অতীতের অপকীর্তি গুলোকেও মহিমার উজ্জ্বল বর্ণে মণ্ডিত করে, দেখতে চায় ও দেখাতে চায়। এমন কি, যে তরজা, কবির লড়াই, ময়ূর-পঙ্খার খেমটা নাচ অনেক সময় জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বা পিতা পুত্র একত্রে বসে শুনতে ও দেখতে লজ্জাবোধ করতেন, গ্রামের মুরুব্বীরা ছিলেন কিন্তু সে সম্বন্ধে নির্বিকার! আদিরসের অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগ হেতু সেগুলি শিক্ষিত ও সুরুচি সম্পন্ন ভদ্র সমাজের পক্ষে ক্রমে অশ্রাব্য ও দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা অদৃশ্য হ'তে শুরু হয়। আমাদের প্রাচীন সমাজের রসিকতা ও হাস্যপরিহাসও ছিল এক সময় সম্পূর্ণ আদি-রসাশ্রিত। বেহাই বেহানের অশ্লীল ঠাট্টা তামাসা ও শালী শালাজ ভগ্নি-পতিদের রসালাপ সেদিনের সমাজে উপভোগ্য ছিল। আজকের সংস্কৃতি-সম্পন্ন সমাজে তা অচল হয়ে পড়েছে। প্রবন্ধকারের এজন্য আক্ষেপ করার কোনও হেতু নেই। প্রগতিশীল মনোভাব ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের বিদূষণে সংস্কৃতির পরিচয় পরিস্ফুট হয় না। তারপর, আলপনা দেওয়ার প্রসঙ্গেও বলা যায় যে—যে শিল্প-সুদক্ষা নারী কেবল নিজের অঙ্কন-নৈপুণ্য দেখাবার জন্যই আলপনা দেয় তারই মধ্যে প্রকৃত কলা-সম্মত সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আর, যে নারীর কিছুমাত্র অঙ্কন নৈপুণ্য নেই, সে যতই আলপনা দেবার সময় মনে করুক না কেন যে—"ইহা লক্ষ্মীর চরণ চিহ্নের পীঠস্থান এবং ইহা শুভের আমন্ত্রণের অর্ঘ্য রচন, অন্তরের এই একান্ত বিশ্বাস ও আকুতির চিত্র রেখা যতই কেন ধর্মাত্মক ধারণায় উদ্বুদ্ধ হোক না, তা' শিল্পানুরাগীর অশিক্ষিত-পটুত্বের প্রাথমিক প্রয়াসের অক্ষম প্রকাশ মাত্রই হ'য়ে থাকবে—সংস্কৃতিজাত নৈপুণ্যের সার্থক রূপায়ণ হ'য়ে উঠতে পারবে না। 'সংস্কৃতি' অনায়াস-লব্ধ সম্পদ নয়।

"ধর্মপ্রাণা মহিলার সতীত্ব ধর্ম রক্ষার জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়া বা মৃত স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দান" করাকে—অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ-প্রচলিত সাধ্বীরীতির বাধ্যতামূলক আনুগত্য ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এর মধ্যে প্রাচীন সংস্কারের বা কুসংস্কারের প্রভাবই প্রকট হ'য়ে ওঠে এবং সংস্কৃতির অভাবই সূচিত হয়। যে দেশে নারীর সতীত্বধর্ম বিপন্ন হ'য়ে সমাজে একেবারে প্রাণ বিসর্জনের পর্যায় গিয়ে পৌঁছয়, সে অপরাধী দেশের লজ্জার ইতিহাস কি ধর্মপ্রাণ ও সংস্কৃতিবান জাতির পরিচয় বহন করে? এই একটা ব্যাপার থেকেই তো বোঝা যায়, মানুষের চিরাচরিত ধর্ম-বিশ্বাস ও প্রাচীন সংস্কারকে কোনও যুক্তির দ্বারাই 'সংস্কৃতির মূলকথা' বলে ঘোষণা করা চলে না। সংস্কৃতির বিচারে এগুলি 'কুসংস্কার' বলেই ধরা পড়ে। সংস্কারের কুসংস্কার আছে, কিন্তু সংস্কৃতির মধ্যে 'কু' নেই!

রাজ্য পুনর্গঠন ব্যবস্থা—

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের বিবরণ ও মন্তব্য সম্বন্ধে গত ৫ই ডিসেম্বর হইতে ৫ দিন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ও ৫ই ডিসেম্বর হইতে ২ দিন বিধান পরিষদে আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনার পূর্ণ বিবরণ দিল্লীতে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। শ্রীজহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কামাল আজাদ, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ-এন-ডেবর—এই ৪জনকে লইয়া গঠিত এক উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন কমিটী রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্ত ও সে বিষয়ে জনমত আলোচনা করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। পশ্চিমবঙ্গকে যে সামান্য বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বিহার হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের কোন অধিবাসীই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অতুল্য ঘোষ নূতন দাবী দিল্লীতে পেশ করিয়াছেন। তাহাতেও জনগণের দাবীতে নিম্নলিখিত স্থানগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিতে বলা হইয়াছে—(১) সমগ্র মানভূম জেলা (২) সিংহভূম জেলার ধলভূম মহকুমা (৩) সাঁওতাল পরগণার সমস্ত বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল (৪) কিষণগঞ্জ মহকুমার সমগ্র অংশ বিহার হইতে পাওয়া প্রয়োজন এবং (৫) আসাম হইতে গোয়ালপাড়া জেলা পাওয়া প্রয়োজন। ত্রিপুরা জেলাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল—কিন্তু আসাম ত্রিপুরা জেলাকে লইতে সম্মত হয় নাই—কাজেই ত্রিপুরাকেও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করা হইয়াছে। দাবীর পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেগুলি আদৌ অযৌক্তিক বা অন্যায় নহে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গকে ঐ সকল অঞ্চল পাইতেই হইবে। সেজন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, যতদিন না উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটী এই প্রস্তাবে সম্মত হন, ততদিন পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রবল আন্দোলন পরিচালন করিবে।

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস—ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি বিজ্ঞানে 'ডি-ফিল' উপাধি লাভ করিয়াছেন

রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি উৎসব—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, রিপন কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার জেমো গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জেমোর অধিবাসীরা প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয় গৃহে সম্প্রতি তাঁহার স্মৃতি উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের বাসগৃহে তাঁহার জন্মস্থানের ঘরটি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে ও তাঁহার বৈঠকখানা ঘরটি সাধারণ পাঠাগারে পরিণত করা হইয়াছে। তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা চঞ্চলা দেবীর চেষ্টায় তাঁহার নামে একটি বিদ্যালয় চলিতেছে, তাহার গৃহও নির্মিত হইয়াছে

এবং সরকারী সাহায্য ও অনুমোদন পাইলে শীঘ্রই তাহা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। ত্রিবেদী মহাশয়ের ভাগিনেয় স্থানীয় জমীদার শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায় ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীবিজয়েন্দুনারায়ণ রায় এবং স্থানীয় উৎসাহী কর্মী শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় সমারোহের সহিত স্মৃতি উৎসব হইয়া থাকে—এবার কলিকাতা হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। জেমো গ্রামে এখনও বহু লোক বাস করেন, ধনীর সংখ্যাও কম নহে—তাঁহাদের চেষ্টায় ত্রিবেদী মহাশয়ের বাসগৃহ ও জন্মস্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হওয়া প্রয়োজন। তিনি শুধু শিক্ষাব্রতী ও কর্মী ছিলেন না—বঙ্গ সাহিত্যের বিজ্ঞান বিভাগে তাঁহার দান অতুলনীয়। বর্তমান সময়ে তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির পুনরায় বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন। আমরা তাঁহার গ্রামবাসীদিগকে এ বিষয়ে উৎসাহী হইয়া বিস্মৃত-প্রায় ত্রিবেদী মহাশয়ের কথা প্রচার করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা উদ্যোগী হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসীরা অবশ্যই তাঁহাদিগের সে কার্য্যে সাহায্য করিবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য—
ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামানন্দ অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়াছেন

জেলা সাংবাদিক সমিতি—

স্বাধীনতার পর] যেমন অন্য সকল পেশার উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, সেইরূপ সাংবাদিক বৃত্তির উন্নতির নানা প্রকার চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষা ও বেতন সম্বন্ধে আইন তৈয়ারী করিয়াছেন। সাংবাদিকগণও এ সময়ে সংঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের দাবী জানাইতে অগ্রসর হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রত্যেক জেলায় জেলা-সাংবাদিক-সমিতি গঠিত হইয়াছে। ২৪পরগণা জেলাও এ বিষয়ে পশ্চাদপদ নহে। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি এবং শ্রীমনকুমার সেন ও শ্রীসুবাস ঘোষকে সম্পাদক করিয়া ২৪পরগণা জেলা সাংবাদিক সমিতি গঠিত হইয়াছে। গত ১৩ই নভেম্বর বসিরহাটের সাংবাদিক শ্রীবিজয়চন্দ্র দাশের আমন্ত্রণে বসিরহাটে জেলা সমিতির এক সভা হইয়াছিল। সারা দিনব্যাপী উৎসবে সমাগত সাংবাদিকগণকে আদর আপ্যায়নের অভাব হয় নাই। ২৪পরগণা জেলার সাংবাদিকগণের অন্যান্য জেলার মত সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের অধিকার রক্ষায় অবহিত হওয়া প্রয়োজন।
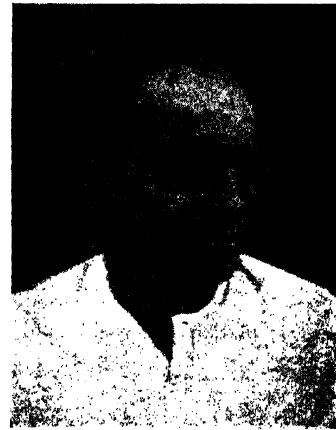
শ্রীমনোজ বসু
ইনি এবৎসর ইঁহার 'চীন দেখে এলাম' নামক বাংলা গ্রন্থের উপর দিল্লীর 'নরসিংহদাস আগরওয়ালা' পুরস্কার অর্জন করিয়াছেন

নদীয়া জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন—

একমাস ধরিয়া কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন হইয়া গেল। জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী তাঁহার

প্রধান উদ্যোক্তা। গত ৪ঠা ডিসেম্বর আচার্য্য শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুপণ্ডিত শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তপনবাবু তথায় হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতির ভাষণে আচার্য্য সুনীতিকুমার বলেন—বিশ্বের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা দেশ যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি যাহা তাহার কাছ হইতে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমরা ইংরাজি শিক্ষার দ্বারা লাভ করিয়াছি। কাজেই ইংরাজি শিক্ষার সহিত যোগ ছাড়িলে আমাদের চলিবে না। ইংরাজির মাধ্যমে আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা বিশ্বমানবতার সহিত যোগ—সেজন্য আমরা ইংরাজের নিকট ঋণী। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি প্রভৃতি বিশ্বের নিকট যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, তাহা ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে সম্ভব হইয়াছে। হিন্দী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আচার্য্য চট্টোপাধ্যায় বলেন—স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে ছেলেমেয়েদের হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত হইবে না। বাংলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত শিক্ষার পর চতুর্থ ভাষারূপে হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন।—আমরা তাঁহার এই মন্তব্য সম্বন্ধে সকলকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

কলিকাতায় বিমান দুর্ঘটনা—

গত ৪ঠা ডিসেম্বর সকালে কলিকাতা গড়ের মাঠে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের সময় একখানি দুই আসনের 'টাইগার মথ' বিমান কসরৎ দেখাইবার সময় মাটিতে পড়িয়া যায় ও তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়; ফলে আরোহী ২ জন—শান্তনুকুমার বসু ও মহাবীরপ্রসাদ মজুমদার—তখনই পুড়িয়া মারা যায়। শান্তনু বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের প্রধান শিক্ষাদাতা ছিলেন ও নিজে ঐ বিমানটি চালাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে জাতীয় সমর শিক্ষাবাহিনীর শিক্ষার্থী—কলিকাতা চারুচন্দ্র কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র মহাবীরপ্রসাদ ছিলেন। শান্তনুকুমার স্বর্গত খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এচ-ডি-বসুর পৌত্র এবং এলেনবারীর কর্মী ৺ও-বসুর একমাত্র পুত্র। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর ছিল—বিবাহ করেন নাই—মাতা ও দুই ভগিনী আছেন। ১৯৪৩ সালে বি-এস্‌সি পাশ করিয়া তিনি বিমান চালানো শিক্ষা করেন ও পরে শিক্ষক হইয়া ২ হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী প্রণবানন্দের শিষ্য ছিলেন এবং ব্যাঘ্র শিকার তাঁহার একমাত্র সখ ছিল। মহাবীরপ্রসাদের পিতা শ্রীবিবেকরঞ্জন মজুমদার যশোহরে উকীল ছিলেন—তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর হইয়াছিল। তিনি পিতামাতার প্রথম সন্তান। স্কাউট ও এন-সি-সি শিক্ষার পর মহাবীর-প্রসাদ বিমান চালানো শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা নিহত যুবকদ্বয়ের আত্মীয়বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

গৌতমকুমার সরকার—

প্রেসিডেন্সী কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র শ্রীগৌতমকুমার সরকার সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল-

শ্রীগৌতমকুমার সরকার

ভারত আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসবে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিখিল-ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল গানে প্রথম শ্রেণীর মানপত্র লাভ করিয়াছেন। শ্রীমান গৌতম কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিশেষ কৃতী ছাত্র এবং হুগলী টিচার্স ট্রেণিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅশোককুমার সরকারের পুত্র।

গোয়ায় পর্তুগীজ প্রাধান্যের নিন্দা—

গত ২৮শে নভেম্বর রুসিয়ার নেতারা মাদ্রাজে গমন করিলে সমুদ্রতটে তাঁহাদের নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা

হয়। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে মার্শাল বুলগানিন ভারতে প্রথম রাজনীতিক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—যে যুগে উপনিবেশবাদ সর্বত্র নিন্দিত হইতেছে, সে যুগে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ভারতের একটি অতি ক্ষুদ্র স্থান 'গোয়া'তে তাঁহাদের প্রাধান্য রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কোন সভ্য দেশই সমর্থন করিবে না। গোয়ার অধিবাসীরা স্বাধীনতালাভ ও ভারত-ভুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর পক্ষে সে সংগ্রামে সাহায্য করা সম্ভব হইবে না। মার্শাল বুলগানিন বিষয়টি সকল সভ্য দেশের গোচরীভূত করায় তিনি ভারতবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই উক্তির জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। গোয়াবাসীদের ভারত-ভুক্তির যে আর অধিক বিলম্ব নাই —তাহা একজন বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের উক্তি হইতে বুঝা যায়।

সৌদী আরব কর্ত্তৃক পঞ্চশীল সমর্থন—

১১ই ডিসেম্বর দিল্লীতে সৌদী আরবের রাজা ইবন সৌদ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে—তাঁহারা উপলব্ধি করেন বিশ্ব-শান্তির পথ সুগম করা এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। তাঁহাদের উভয় দেশই পঞ্চশীল (১) সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা মানিয়া চলা (২) আক্রমণমূলক কার্য্য হইতে বিরত থাকা (৩) অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা (৪) পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সমান আচরণ (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—এই পঞ্চনীতি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতে এই পঞ্চশীলই বিশ্বের বিভিন্ন জাতির শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক অস্তিত্বের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে পারে। সৌদী আরবের রাজাও এই নীতি গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্ম, চীন, যুগোশ্লাভিয়া, রুস প্রভৃতি বহু রাজ্য পূর্বেই এই নীতি সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীনেহরু জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের বহু পুরাতন এই পঞ্চশীল নীতি প্রচার করিতেছেন। অবিশ্বাসীর দল এখনও যুদ্ধের কথা চিন্তা করেন—ইহাই আশ্চর্য্য।

রাষ্ট্রপতি ভবনে সৌদী আরবের রাজা সৌদ বীন আবদুলাজিজ

মিঃ ক্লিমেণ্ট এটিলি—

মিঃ ক্লিমেণ্ট এটিলির বর্তমান বয়স ৭২ বৎসর। তিনি ১৯৪৫ হইতে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত বিলাতে প্রধানমন্ত্রী থাকিয়া যুদ্ধোত্তর উন্নতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি গত ৮ই ডিসেম্বর বৃটীশ শ্রমিক দলের নেতৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করায় বৃটেনের সাম্রাজ্ঞী রাণী এলিজাবেথ তাহাকে আর্ল উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি লর্ডস্ সভায় সদস্য হইবেন। বৃটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সার এণ্টনী ইডেন তাঁহার স্থলে শ্রমিক দলের নূতন নেতা নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রমিক নেতার পক্ষে এই উচ্চ সম্মান লাভ প্রায় বিরল।

শ্রীচন্দন গুপ্ত

সম্প্রতি রহস্যচিত্রের খ্যাতনামা পরিচালক ও প্রযোজক মিঃ এ্যাল্‌ফ্রেড হিচ্‌কক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুক্তি প্রতীক্ষিত দুইখানি ছবির প্রদর্শনের জন্যই তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার দুইখানি ছবির নাম 'টু ক্যাচ এসিফ' এবং 'ট্রাবল্‌ উইথ হ্যারি' ছবি দুইখানির প্রদর্শন উপলক্ষে স্থানীয় বহু চিত্র-সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। মিঃ হিচ্‌কক ছবি নির্ম্মাণের বিভিন্ন বিষয় লইয়া সাংবাদিকদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন।

*　　*　　*　　*

খ্যাতনাম্নী বৃটিশ মঞ্চাভিনেত্রী হার্মিয়ন ব্যাড্‌লী সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া গ্রাণ্ড হোটেলের প্রিন্সেস্‌-এ বহু দর্শককে অভিনয়-কৌশল দেখাইয়া আনন্দ দান করিয়াছেন। তিনি ও দেশের কেবলমাত্র মঞ্চাভিনেত্রী হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেন নাই। চিত্রে এবং বেতার অভিনয়েও তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

*　　*　　*　　*

নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী তারা চৌধুরী পুনরায় রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভ্‌ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। রাশিয়ার নেতৃদ্বয় মাদ্রাজ সফরকালে তাঁহাকে এই আমন্ত্রণ জানান। গত বৎসর ভারতীয় সাংস্কৃতিক যে দলটী রাশিয়ায় গিয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রীমতী চৌধুরীও ছিলেন। এবার রাশিয়ার খোদকর্ত্তাদের আমন্ত্রণ শ্রীমতী চৌধুরীর পক্ষে অধিকতর
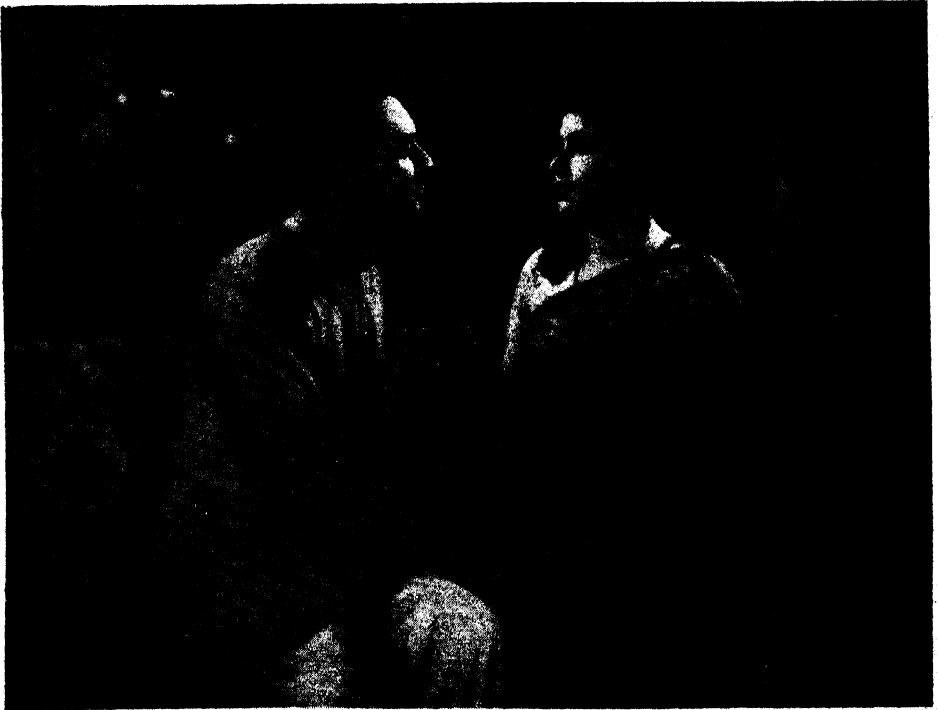
সানরাইজ প্রযোজিত মুক্তি প্রতীক্ষিত 'শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক' চিত্রে অনুভা ও বসন্ত

গৌরবজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরাও এবিষয়ে গৌরবান্বিত করিতেছি।

* * * *

মার্শাল বুল্গানিন ও মিঃ ক্রুশ্চেভের সাম্প্রতিক ভারত পরিভ্রমণ, ফিল্ম ডিভিসন কর্ত্তৃক গেভা কলারে গ্রহণ করা হইয়াছে। শোনা যাইতেছে, ছবিটি শীঘ্রই বিভিন্ন

অগ্রদূত পরিচালিত এম-পি প্রোডাকসন লিঃ প্রযোজিত মুক্তি প্রাপ্ত 'সবার উপরে' চিত্রের একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, কালী বন্দ্যো, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি

চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে। ইতিপূর্ব্বে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু রাসিয়া ভ্রমণ 'মিত্রতা কী যাত্রা' যেরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল, আশা করি আলোচ্য চিত্রটিও সেইরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিবে।

* * * *

আমাদের দেশে কমার্শিয়াল ছবির নামে, বর্ত্তমানে যৌন আবেদনমূলক যে সব ছবি তোলার হিড়িক দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের চোখের সম্মুখে ওদেশের সাম্প্রতিক একটী ছবির নজীর তুলিয়া ধরিলে বোধহয় তাঁহাদের উপকারই করা হইবে। নিউ ইয়র্কে "ড্যাম বাটাস্" নামক ছবিটীর মাত্র একসপ্তাহকাল পরমায়ুলাভ হয়। ওদেশের দর্শকেরাও এখন যৌন-আবেদনমূলক ছবি দেখিয়া বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদের দেশেও এই অরুচি দেখা দিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তাই এই ধরণের ছবি তোলায় যে সকল প্রযোজক উৎসাহী, তাঁহাদের নিকট "ড্যাম্ বাষ্টাস্"-এর নজীর বোধহয় উপকারে আসিবে।

* * * *

১৯৫৪ সালের বিভিন্ন ভাষায় চলচ্চিত্র পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার প্রদানের জন্য কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে যে তিনটী আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহাদের চিত্রগুলি সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য সুপারিশ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভাষায় প্রযোজিত শ্রেষ্ঠ চিত্রকে রাষ্ট্রপতি পদক দ্বারা সম্মানিত করা হইবে। ডিসেম্বর মাসের শেষে এই পুরস্কার প্রদান করা হইবে। তিনটী

আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রায় ৪০টী চিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দী চিত্র—১২টী, বাংলা চিত্র—১৩টী, তামিল চিত্র ৫টী, তেলেগু চিত্র ৯টী, মারাঠী চিত্র—২টী, মালায়ালাম চিত্র—২টী, কানাড়ী চিত্র ১টী ও অসমিয়া চিত্র—১টী। কলিকাতার আঞ্চলিক কমিটীতে আছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত, শ্রীমতী সবিতা দেবী, খ্যাতনামা শিল্প-সমালোচক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব বাগেশ্বরী অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীখগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়।

* * * *

সম্প্রতি এম্‌-পি-প্রোডাকসনের 'সবার উপরে' চিত্রটি কলিকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। অগ্রদূতের পরিচালনায় এম্‌-পির ছবি, তদুপরি বর্ত্তমানের অধিকতর জনপ্রিয় নায়ক নায়িকার দ্বারা অভিনীত 'সবার উপরে' দর্শকদের মনে চিত্র-মুক্তির পূর্ব্বে যতখানি সাড়া জাগাইয়াছিল, চিত্র-মুক্তির পর তাহাদের ততখানি নিরাশ করিয়াছে। ইহার প্রথম এবং প্রধান কারণ 'সবার উপরে' চিত্রের কাহিনী। 'অগ্রদূতে'র সুপরিচালনা বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। অভিনয়ের দিকে নায়িকা অপেক্ষা নায়কের অভিনয় সংযত। কিন্তু চিত্রনাট্য এবং কাহিনীর দুর্ব্বলতায় সমস্ত শ্রম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ঘটনার সময়-কাল দীর্ঘ। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘটনার পারস্পরিক সংহতি বজায় নাই। শঙ্কর বারো বছর পরে তাহার পিতার মুক্তির জন্য আদালতে হাজির হইল এবং তাহার ওকালতির ফলে সে পিতাকে মুক্ত করিয়া প্রকৃত আসামী পাবলিক প্রসিকিউটারকে দোষী প্রমাণিত করিল। ইহা চোখে দেখিতে যতই ভাল লাগুক না কেন, বাস্তবে এ ঘটনা কতদূর সম্ভব তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যদিও স্বপক্ষ যুক্তিতে ঘটনাকে দাঁড় করান হইয়াছে, তথাপি কাহিনীকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে কষ্ট হয়। খানিকটা ক্রাইম, খানিকটা রোমান্স, মধ্যে মধ্যে থ্রিল—ফলে, কোথাও রসাধিক্য, কোথাও বা রসের অভাব ঘটিয়াছে। সর্ব্বোপরি, অগ্রদূত গোষ্ঠীর ন্যায় কলাকুশলীদের নিকট ইহাই বক্তব্য যে চিত্র-নাট্য সাধারণতঃ 'less dialouge more action' এই নীতির উপরই রচনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু আলোচ্য চিত্রটি হইয়াছে তাহার বিপরীত অর্থাৎ more dialouge less action। ফলে চিত্রের গতি বক্তৃতার চাপে মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। নায়িকাকে উদ্বাস্তুরূপে খাড়া করিয়া বক্তৃতার যে সুযোগ লওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা না করিলে হয়ত কাহিনীকে অধিকতর নাটকীয় করা যাইত।

অভিনয়ের দিকে সর্ব্বাগ্রে ছবি বিশ্বাসের নাম উল্লেখ করিতে হয়। দীর্ঘকাল পরে তিনি একটি সম্পূর্ণ নূতন ভূমিকায় রূপদান করিয়াছেন। কলাকৌশলের দিকে অগ্রদূতের সুনাম অব্যাহত আছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ—নিউজিল্যাণ্ড টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৪৯৮ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। উমরীগড় ২২৩, মঞ্জরেকার ১১৮, কৃপাল সিং ১০০ নট আউট। হেজ ৯০ রানে ৩ উইঃ)

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ৩২৬ (গাই ১০২, ম্যাক্‌গীবন ৫৯। সুভাষ গুপ্তে ১২৮ রানে ৭ উইকেট) ও **২১২** (সাটক্লিফ ১৩৭ নট আউট)

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম টেষ্ট খেলা ড্র যায়। ভারতবর্ষ প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিন ভারতবর্ষের ২ উইকেট পড়ে ২৫০ রান ওঠে। উমরীগড় (১১২ রান) এবং মঞ্জরেকার (১০২) নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ ৪ উইকেটে ৪৯৮ রান ক'রে ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। পলি উমরীগড় এবং মঞ্জরেকারের ৩য় উইকেটের জুটিতে ২৩৮ রান ওঠে। আলোচ্য খেলায় এই তিনটি ভারতীয় টেষ্ট রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে—

(১) ১ম ইনিংসের ৪৯৮ রান (৪ উইকেট)—এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ দলগত রানের রেকর্ড। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড—৪৮৫ (৯ উইকেট), ইংলণ্ডের বিপক্ষে, বোম্বাই, ১৯৫১।

(২) ২২৩ রান—পলি উমরীগড়—এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ১৮৪ রান—ভিন্নু মানকড়, ইংলণ্ডের বিপক্ষে, লর্ডস, ১৯৫২।

(৩) ২৩৮ রান—উমরীগড় এবং মঞ্জরেকারের ৩য় উইকেটের জুটি—যে কোন উইকেটের জুটিতে সর্ব্বাধিক রানের রেকর্ড। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ২৩৭ রান—পঙ্কজ রায় এবং মঞ্জরেকারের ২য় উইকেটের জুটি, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, জামায়িকা, ১৯৫৩।

২য় দিনে কোন উইকেট না পড়ে নিউজিল্যাণ্ডের ১ রান হয়।

৩য় দিনের খেলায় ৫ উইকেট খুইয়ে নিউজিল্যাণ্ড ১৭০ রান করে। ফলো-অন্ থেকে রক্ষা পেতে নিউজিল্যাণ্ডের ১৭৯ রানের প্রয়োজন হয়।

৪র্থ দিনে দুটো তরুণ খেলোয়াড় জন গাই এবং টনি ম্যাক্‌গিবন আপ্রাণ খেলেন কিন্তু ২৩ রানের জন্যে দলকে ফলো-অন্ থেকে রক্ষা করতে পারলেন না। ১ম ইনিংসে দলের ৩২৬ রান ওঠে। গাই সেঞ্চুরী করেন।

খেলার ৫ম অর্থাৎ শেষদিনে নিউজিল্যাণ্ড ২য় ইনিংসের খেলা সুরু করে এবং পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে খেলে খেলাটা ড্র করে। সাটক্লিফ ১৩৭ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

ডুরাণ্ড কাপ ঃ

১৯৫৫ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফাইনালে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার (ওয়েলিংটন) ৩—২ গোলে এ বছরের দিল্লী ক্লথমিলস ট্রফি বিজয়ী ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স দলকে (নিউ দিল্লী) পরাজিত ক'রে ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে। প্রথম দুদিন খেলাটি গোলশূন্যভাবে ড্র যায়। ডুরাণ্ড কাপ ফাইনাল খেলার ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে একদিনের বেশী ফাইনাল খেলা ড্র যায় নি। সেমি-ফাইনালে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার ২—০ গোলে ই, এম, ই সেণ্টার দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ১—০ গোলে গত

বছরের ডুরাণ্ড এবং রোভার্স বিজয়ী হায়দ্রাবাদ সিটি পুলিস দলকে পরাজিত করে। এ বছরের ডুরাণ্ড যোগদানকারী ক'লকাতার ফুটবল দলগুলির মধ্যে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবই যা কিছুটা নাম রেখেছিলো। কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায় তারা ০—১ গোলে হায়দ্রাবাদ সিটি পুলিসের কাছে হেরে যায়। প্রথম দিন ২—২ গোলে খেলাটা ড্র যায়। মোহনবাগান শেষ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় নি। শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছরের ডুরাণ্ড বিজয়ী মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার দলের কাছে প্রতিযোগিতার গোড়ার দিকে পরাজিত হয়। ২য় রাউণ্ডে হায়দ্রাবাদের আর্মড রিজার্ভ পুলিস ৫—১ গোলে ক'লকাতার এরিয়ান্স ক্লাবকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দেয়।

রাশিয়ার লোকোমোটিভ ফুটবল দল ঃ

ক'লকাতায় রাশিয়ার লোকোমোটিভ ফুটবল দল দু'টি প্রদর্শনী খেলায় যোগদান ক'রে অপরাজেয় থাকে। প্রথম খেলায় মোহনবাগান ক্লাবকে তারা ৫—০ গোলে হারায়। দ্বিতীয় খেলায় আই এফ এ-র দলকে হারায় ২—০ গোলে। মোহনবাগানের বিপক্ষে লোকোমোটিভ দলের ইন্‌-সাইড রাইট বুবুকিন একাই প্রথম চারটি গোল করেন।

ইণ্টার-ইউনিভারসিটি ব্যাডমিণ্টন ঃ

পুনায় অনুষ্ঠিত ইণ্টার ইউনিভারসিটি ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই ৩—০ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে। এ নিয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় উপর্য্যুপরি ৬বার বিজয়ী হ'ল। ব্যাড-মিণ্টন প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে ১৯৪৮ সালে এবং বোম্বাই মাত্র ১৯৪৯ সাল (কলিকাতা জয়ী হয়) বাদ প্রতি বছর জয়লাভ করেছে। মহিলা বিভাগে ফাইনালেও বোম্বাই জয়ী হয়েছে ৩—০ খেলায় পাঞ্জাবকে হারিয়ে।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতা ঃ

দলগত বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই ৩—১ খেলায় দিল্লীকে পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস ঃ ত্রিলোকনাথ শেঠ (উত্তর প্রদেশ) ১৫—১২, ১৫—২ পয়েণ্টে পি এস চাওলাকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

ক'লকাতার খেলায় রাশিয়ার লোকোমোটিভ ফুটবল দল ফটো ঃ—ডি রতন

মহিলাদের সিঙ্গলস: শ্রীমতী প্রেম পরাশর (বোম্বাই) ১১—৮, ১১—৮ পয়েন্টে শ্রীমতী সুশীলা কাপাদিয়াকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস: নন্দু নাটেকার এবং আর ডোংরা (বোম্বাই) ১৫—৯, ১৫—১১ পয়েন্টে ডি এন ধোংগাডে এবং বিক্রম ভাটকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস: শ্রীমতী প্রেম পরাশর এবং শ্রীমতী সুশীলা কাপাদিয়া ১৫—৪, ১৫—১০ পয়েন্টে কুমারী ফরিদা বেগ এবং শামিন বেগকে (হায়দ্রাবাদ) পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস: বালু ঘোষ (উত্তর প্রদেশ) ১৫—৬, ১৫—৭ পয়েন্টে অক্ষয় গুহকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ: ৪২১ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মানকড় ২২৩, কৃপাল সিং ৬৩। কেভ ৭৭ রানে ৩ উইকেট)

নিউজিল্যাণ্ড: ২৫৮ (সাটক্লিফ ৭৩, ম্যাক্‌গিবন ৪৬। গুপ্তে ৮০ রানে ৩ উইকেট) ও **১৩৬** (গুপ্তে ৪৫ রানে ৫ এবং মানকড় ৫৭ রানে ৩ উইকেট)

বোম্বাইয়ের ২য় টেষ্ট খেলায় পলি উমরীগড়ের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ ১ ইনিংস এবং ২৭ রানে নিউজিল্যাণ্ড দলকে পরাজিত করে।

ভারতবর্ষ প্রথম ব্যাট করে। সূচনা ভাল হয় নি। ৬৩ রানে উমরীগড় এবং মঞ্জরেকার সহ ৩টে উইকেট পড়ে যায়। ৪র্থ উইকেটে কৃপাল সিংয়ের জুটি হয়ে ভিনু মানকড় খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে ভারতীয় দলকে পতন থেকে রক্ষা করেন। প্রথম দিন ৩ উইকেটে ভারতবর্ষের ২২৩ রান হয়; মানকড় (১৩২) এবং কৃপাল সিং (৫৯) নট-আউট থাকেন। ২য় দিন ভারতবর্ষ ৮ উইকেটে ৪২১ রান ক'রে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে।

মানকড় ভারতীয় দলের পক্ষে টেষ্ট খেলায় দ্বিতীয় ডবল সেঞ্চুরী (২২৩) করেন। হায়দ্রাবাদের ১ম টেষ্টে উমরীগড় সর্ব্বপ্রথম এ কৃতিত্ব লাভ করেন। ২য় দিনের খেলায় ১ উইকেট পড়ে নিউজিল্যাণ্ডের ২১ রান ওঠে। ৩য় দিন নিউজিল্যাণ্ডের ২০৮ রান দাঁড়ায়, ৫ উইকেটে। ফলো-অন্ থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও তাদের ৬৪ রান দরকার। ৪র্থ দিনে নিউজিল্যাণ্ড দলের খেলায় দারুণ ভাঙ্গন দেখা দিল। ১ম ইনিংস ২৫৮ রানে শেষ হ'লে তারা ফলো-অন্ করতে বাধ্য হ'ল। ২য় ইনিংসে ৭টা উইকেট পড়ে রান উঠল মাত্র ৯৯। অর্থাৎ ৫ ঘণ্টার খেলায় তাদের ১২টা উইকেট পড়ে রান ওঠে মাত্র ১৪৯। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যা থেকে তারা তখনও ১৬৩ রান পেছনে—হাতে মাত্র ৩টে উইকেট জমা, এদিকে খেলা আছে পুরো ৫ ঘণ্টা। নিউজিল্যাণ্ড দলের এ দারুণ পতনের মূলে ছিল সুভাষ গুপ্তের বোলিং। ৪র্থ দিনে তিনি ৪টে উইকেট পান। এ দিন ভারতীয় দলের ফিল্ডিং যথেষ্ট প্রশংসনীয় হয়েছিল। মানকড়, ফাদকার, উমরীগড় এবং গুপ্তে দর্শনীয়ভাবে শক্ত ক্যাচ ধরেছিলেন। খেলার শেষ দিন নিউজিল্যাণ্ড দলের বাকি ৩টে উইকেটে ৩৭ রান হয়, ৫৫ মিনিটের খেলায়। ফলে ভারতবর্ষ ১ ইনিংস এবং ২৭ রানে জয়ী হয়। সুভাষ গুপ্তে মোট ৮টা উইকেট (১ম ইনিংসে ৩ এবং ২য় ইনিংসে ৫টা) পান ১২৮ রানে।

মুষ্টি যুদ্ধে বিশ্ব খেতাব ঃ

বিশ্ব মুষ্টি-যুদ্ধের মিডল ওয়েট বিভাগের লড়াইয়ে ভূতপূর্ব্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান 'সুগার' রে রবিনসন নাটকীয়-ভাবে কার্ল 'বোবো' ওলসনকে ২য় রাউণ্ডের খেলায় নক্-আউটে পরাজিত করেন। বিশ্ব মুষ্টি-যুদ্ধের ইতিহাসে রে রবিনসন ছাড়া আর কোন মুষ্টিযোদ্ধা এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার বিশ্ব খেতাব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন নি। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনের এক চ্যাম্পিয়ানসীপের লড়াইয়ে রবিনসন বৃটেনের র‍্যাণ্ডল্ফ টার্পিনের কাছে পরাজিত হ'ন। কিন্তু ৬৪ দিনের মধ্যে তিনি নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত মুষ্টি যুদ্ধে টার্পিনকে পরাজিত ক'রে বিশ্ব খেতাব পুনরুদ্ধার করেন। এরপর রবিনসন ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে মুষ্টি-যুদ্ধ থেকে অবসর নিলে মিডল ওয়েট বিভাগে চ্যাম্পিয়ান খেতাব শূণ্য থাকে। ফলে শূণ্যস্থান পূরণের জন্যে পুনরায় লড়াইয়ের আয়োজন হয়। কার্ল ওলসন এই লড়াইয়ে জয়ী হয়ে বিশ্ব খেতাব লাভ করেন।

দাঁড়িয়ে আছেন (বামদিক থেকে) :—লো হেং চু, শৈলেন চ্যাটার্জ্জী (জয়েন্ট সেক্রেটারী, বেঙ্গল টেবল টেনিস এসোশিয়েসন্), শ্রীঅমরনাথ মুখার্জ্জী (ডেপুটি মেয়র), শ্রীপট্টনায়ক, পুন্ ওয়েং হো, শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত (প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল টেবল টেনিস এসোশিয়েসন্) এবং জে কক্‌জিয়ান্।
বসে আছেন (বামদিক থেকে) :—শ্রী আর নারায়ণ (জয়েন্ট সেক্রেটারী, বেঙ্গল টেবল টেনিস এসোশিয়েসন্), এরিক্ সলোমন, সুধীর থ্যাকারসে, উত্তম চন্দ্রাণা এবং এফ্ সিডো।

পূর্ব্বভারত টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ :

পূর্ব্ব ভারত টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা সাড়ম্বরে ইডেন উদ্যানের ইন্‌ডোর ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও সর্ব্ব ভারতীয় ও বিদেশী খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন; কিন্তু এবারকার বিশেষত্ব ছিল, এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত ত্রিদলীয় টেষ্ট ম্যাচ। এই ত্রিদলীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয় ভারত, হাঙ্গেরী ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে। এইরূপ ত্রিদলীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা বোধ হয় খেলার ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম। প্রথম দিন ভারত সিঙ্গাপুরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে এবং ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত হয়। এই দিন ভারতীয় দলে উত্তম চন্দ্রানা ও সুধীর থ্যাকারসে খেলেন। পরের দিন ভারত হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে খেলে এবং পুনরায় ষ্ট্রেট্ সেটে পরাজিত হয়। এই দিন ভারতীয় দলে বাংলার উদীয়মান খেলোয়াড় সলোমনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য ভারত-হাঙ্গেরী টেষ্ট খেলার কিছুক্ষণ আগেই সলোমন অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে হাঙ্গেরীর বিখ্যাত খেলোয়াড় কক্‌জিয়ান্‌কে পূর্ব্ব-ভারত প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস খেলায় চতুর্থ রাউণ্ডে ৩—২ গেমে পরাজিত করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন।

সিঙ্গাপুর ভারতের কাছে জয়লাভ করলেও হাঙ্গেরীর কাছে পরাজিত হয়। হাঙ্গেরী, ভারত ও সিঙ্গাপুর উভয়কেই ষ্ট্রেট্ সেটে পরাজিত করে। হাঙ্গেরী দলের হয়ে ভারত সফরে এসেছেন প্রাক্তন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন্ এফ্,

এফ্‌ সিডো (হাঙ্গেরী)
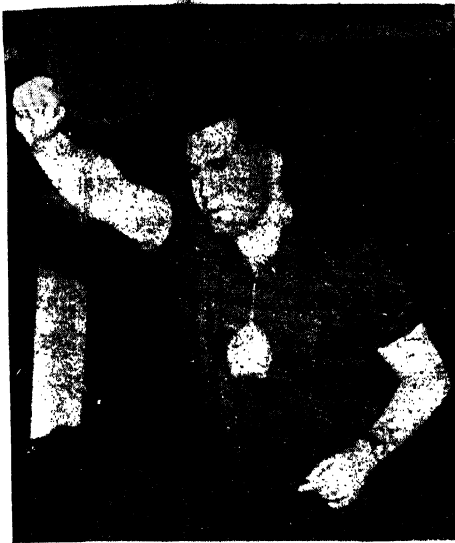
জোসেফ্‌ কক্‌জিয়ান্‌ (হাঙ্গেরী)

সিডো এবং জে কক্‌জিয়ান। সিঙ্গাপুর দলে আছেন লো হেং চু এবং পুন্‌ ওয়েং হো।

এবারকার পূর্ব্ব-ভারত প্রতিযোগিতা ও টেষ্ট ম্যাচ খেলার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্য বেঙ্গল টেবল টেনিস এসোসিয়েশনের কর্ম্মকর্ত্তাগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় এবারকার প্রতিযোগিতা বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবে ও সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে।
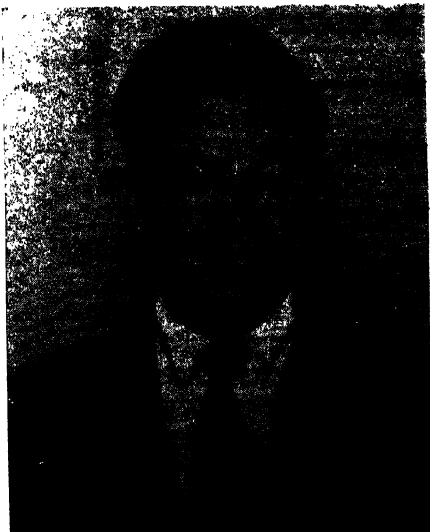
লো হেং চু (সিঙ্গাপুর)
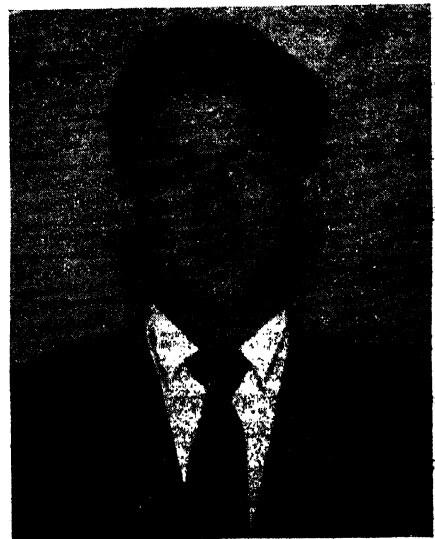
পুন্‌ ওয়েং হো (সিঙ্গাপুর)

টেষ্ট ম্যাচের প্রথম দিনে জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতের পতাকা, বাংলার টেবল টেনিস এসোসিয়েশনের পতাকা, ভারতীয় টেবল টেনিস ফেডারেসনের পতাকা এবং হাঙ্গেরী ও সিঙ্গাপুরের পতাকা উত্তোলিত হয়। পতাকা উত্তোলন ও টেষ্ট খেলার উদ্বোধন করেন ক'লকাতার ডেপুটি মেয়র শ্রীঅমরনাথ মুখার্জ্জী। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপট্ট নায়ক।

নিম্নে পূর্ব্ব-ভারত প্রতিযোগিতার ফাইনালের ফলাফল দেওয়া হ'ল :—

বালকদের সিঙ্গলস : দীপক ঘোষ ২১—৭, ২১—১৪ ও ২১—১২ গেমে হ্যারি অকে পরাজিত করে।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস্ সৈয়দ সুলতানা ২১—১১, ২১—১৩ ও ২১—১২ গেমে মিস্ উষা আয়েঙ্গারকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : সিডো এবং কক্জিয়ান্ ২১—১১, ২১—১০ ও ২১—১৪ গেমে হো এবং চুকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস্ : সিডো ও সুলতানা ২১—১১, ১৯—২১, ২২—২০ ও ২১—১৫ গেমে কক্জিয়ান এবং চমন কাপুরকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস : এফ্ সিডো ২১—৯, ২১—১৫ ও ২১—১২ গেমে পুন্ ওয়েং হোকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেন।

মৃত্যুবিজয়ী তোরা যাত্রী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নিগু'ণ ঝরণার রস ঝরি রঙ্গীন
তিনরূপে হোল আদি সৃষ্টি,
চিন্ময় দেহে দেহে নন্দন ধরণীতে
লীলাময় মেলিলেন দৃষ্টি।
অতনুর অন্তরে মৃন্ময়-বাসনার
লীলাতনু নেচে ওঠে ছন্দি',
কামহীন কামনার ইন্দ্রিয়াতীতরূপ
ইন্দ্রিয় দিয়ে হল বন্দী।
লীলাতনু সুন্দরসুন্দরী গাহে গান
নেচে নেচে মিশে দুটি অঙ্গে,
দুটি আদি মধু বুক নাচে লীলা উন্মুখ
জীবনের রসভোগে রঙ্গে।
রঙ্গীন জীবনের সঙ্গীত ঘিরে ঘিরে
ছন্দি নামিল উষাভর্গ,
রসে বাঁধা রাসদোল ঝুলনার হিন্দোল
এক হোল ধরা আর স্বর্গ।
সেই রসরূপায়ন মধু উৎসব থেকে
সংসার লীলায়িত ছন্দে,
নেমে এল ভাই বোন কোটি লীলাদম্পতি
নিখিল ভরিল গীতে গন্ধে।
বন্ধুগো তোরা সেই লীলামানবের ধারা
চেতনার রস ফুল দলগো,
নাহিরে দুঃখতাপ দলি ধরণীর পাপ
জয়যাত্রায় ভবে চল্গো।
ঐ শোন্ ঐ তোর হৃদপদ্মের দলে
বাজে মৃত্যুঞ্জয়ী বীণ্ রে,
গলে রসঝঙ্কার ঝরে রূপটঙ্কার
উদ্দাম ধ্বনি নিশিদিনরে।
গাহো জয় নাহি ভয় চলো ওরে দুর্জ্জয়
ঈশ্বর বাঁধা তোর সঙ্গে,
মৃত্যুর পারাবার চলরে উত্তরিয়া
লীলারস পানকরি রঙ্গে।
নিঃস্পাপ নারীনর তোদের যাত্রাপথে
থাকিবেনা দুঃখ সমস্যা,
অসীম সুপ্রভাতে মিলনের অন্ধকার
স্তোত্র গাহিবে অমাবস্যা।
দুর্নীতি পাপ থেকে যারা সদামুক্তরে
বুকে জ্বলে সত্যের অগ্নি,
দুঃখদৈন্যহীন বিশ্বে সর্বজয়ী
অমর তাহারা ভাইভগ্নী।
সর্বধরাতে যদি ঘটেরে বিপর্য্যয়
তাদের হবেনা কভু ধ্বংস,
জীবনের জয় গেয়ে নির্ভয়ে চলে যাবে
জগন্নাথের যারা অংশ।
তোরা সেই অংশরে শাশ্বত পরিবার
গেয়ে চল সত্যের জয়গান,
সর্বমানব নারী তাহাদের দিয়ে চল্
মৃত্যুঞ্জয়ী শিবসন্ধান।
ঐ ত্রাথ, পথে তোর মেলি কোল দাঁড়াইয়া
স্বয়ং যে জগতের ধাত্রী,
কাল তোর ভৃত্যরে নৃত্য করিয়া চল্
মৃত্যুবিজয়ী তোরা যাত্রী।

সাহিত্য সংবাদ

বিবস্ত্র মানব (৩য় সংস্করণ): শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

লেখক নিজেই উপন্যাসটিকে 'দুঃসাহসিক' বলে বর্ণিত করেছেন। সত্যি দুঃসাহসিক কিনা এ সম্বন্ধে পাঠকমহলে তর্কের যথেষ্ট অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু এ ধরণের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানের একটি দুটি তত্ত্বকে ভিত্তি করে আজকাল অনেক সাহিত্যিক গল্প রচনা করেছেন ও করছেন কিন্তু পৃথ্বীশবাবুর মত মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে উপন্যাস রচনা আর কেউ করেন নি। উপন্যাসের ভূমিকাটি মনোবিজ্ঞানের একটি চমৎকার প্রবন্ধ। অতি সাধারণ পাঠকও এ বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা অতি পরিষ্কার ও স্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন এ ভূমিকা পাঠে। সত্যি মানুষের মনের বিকৃতির শেষ নেই। কেবল পাওয়া পাওয়া নয়, কেমন ভাবে চাই, তাও এক প্রশ্ন। ভালবাসা প্রেম, প্রীতি, সেবার দ্বারাই যে সুখী হওয়া সম্ভব তা' নয়। যৌনজীবনের বিকৃতির জন্যে কেহ হয়ত নিপীড়িত করতে চায়, কেহ বা নিপীড়িত হতে চায়।' এমনি বিচিত্র মানুষের মন। বিচিত্র মানুষের বিচিত্র মানস-ছবি উন্মুক্ত করে তুলে ধরেছেন সুপণ্ডিত সুকৌশলী লেখক। গল্পের মধ্যে প্রত্যেকটি চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন লেখক মানুষের মন কেমন জটিল। এ হ'ল উপন্যাসটির তত্ত্বের দিক থেকে সাফল্য।

কাহিনীর সাফল্যও তদনুরূপ। জমিদার আদিত্যবাবুর আস্তানায় যারা আসতেন, তাঁরাও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিচিত্র। মনোবিজ্ঞানবিদ্ ডাঃ বিশ্বাস, ইন্সিওরের এজেন্ট মিঃ ঘোষ, সিনেমা পরিচালক মিঃ লাহিড়ী, সাহিত্যিক মলয়বাবু, অধ্যাপিকা মিস্ বসু, মিস্ চক্রবর্ত্তী, গায়িকা ও মহিলা সিনেমা-শিল্পী মিস্ দাস, মিস্ চন্দনা প্রত্যেকের জীবন-কাহিনীই পাঠককে মুগ্ধ করে। তাঁদের মনের উন্মুক্ত রূপ দেখে হয়ত নিজেকে খুঁজে পায় বা চিনতে পারে। তারপর মানবেন্দ্রের অদ্ভুত ভাবে আবির্ভাব ও একটা কৌতুকের সৃষ্টি করে। মানবেন্দ্রর মুখ থেকেই আমরা পাই—অন্যান্য চরিত্রের ব্যাখ্যা। শেষে নিজে মানবেন্দ্রও জড়িয়ে পড়ে। আদিত্যবাবুর কলেজ শিক্ষিতা তরুণী মেয়ে তপতী, অধ্যাপিকা মিস্ বসু, অভিনেত্রী চন্দনা তারা সকলে মানবেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট। মানসিক বিকারমুক্ত মন মানবেন্দ্রের এসব বুঝতে বাকী থাকে না। সে নিজেই বলেছে, "জগৎটাকে রঙীন কাঁচের মাঝে দিয়ে দেখি নি বলেই মানুষকে চিনি। যার আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙীন কাঁচ হারিয়ে গেছে সে কেমন করে ভালবাসবে?" তাই সে আদিত্যবাবুর আশ্রয় ছেড়ে অন্তর্হিত হল। পাঠকের মনে জিজ্ঞাসা থেকে গেল, তিন প্রেয়সীর মাঝখানে যদি থেকে যেত মানবেন্দ্র আরও কি জানি ঘটত? কেমন হত গল্পের পরিণতি?

অতি সত্বর প্রথম দুই সংস্করণ ফুরিয়ে গেছে। উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা এত কেন, তা না পড়লে বুঝতে পারা যাবে না। ছাপা বাঁধাই এমন চমৎকার, প্রিয়জন এর উপহার পেলে খুশী হবে।

[প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪৲ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বনকেতকী: শ্রীমতী ছবি মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্ববঙ্গের পদ্মাতীরবর্ত্তী রাজবাড়ী নামে এক অখ্যাত পল্লীর সুরেন চক্রবর্ত্তীর সুন্দরী কিশোরী বধূ সরসীর জীবনের জন্মান্তর কাহিনীকে আলোচ্যগ্রন্থে রোমাঞ্চকর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পাঠক-পাঠিকা-সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে। গ্রন্থকর্ত্রী কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগতা হোলেও গ্রন্থখানিতে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ গ্লানি, সঙ্কট বিপর্য্যয়, উত্তেজনা ও বিক্ষোভের রেখা অঙ্কনের ভিতর যে সব ভাব অনুভাব অভিব্যক্ত হ'য়েছে, তার ভেতর মানবিকতার মহত্তম প্রকাশ ও মহীয়সী মহিলার হৃদয়ের সর্ব্বোন্নত বৃত্তিগুলির অলঙ্করণ সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটির চরিত্র সৃষ্টির তারিফ না করে থাকা যায় না। ঘাতপ্রতিঘাত দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বেশ সুন্দর ভাবেই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলি সুন্দর ভাবে কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের যথাযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। লেখিকার লেখার ষ্টাইলটিও ভাল। উপন্যাসখানি পড়ে তৃপ্তি পাওয়া গেল। প্রচ্ছদপট সুন্দর। আশা করি, এই উপন্যাস সাহিত্যসমাজে সমাদর লাভ করবে।

[প্রকাশক: ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩। মূল্য—৪৷৷০ আনা]

ভগ্নতরী: রমেন গুপ্ত

আলোচ্য গ্রন্থখানি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা-সম্বলিত মনস্তাত্ত্বিক ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ উপন্যাস। লেখক ইতিমধ্যেই সাহিত্যসমাজে প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। লিখন শৈলীর নূতনত্ব আছে, এটা অস্বীকার করা যায় না। সুন্দরভাবে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি—রসোত্তীর্ণ শিল্প সৃষ্টি সত্যই উপভোগ্য।

কাহিনীর নায়ক জয়ন্তের জন্মের রহস্য হয়তো চিরদিনই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যেতো যদি না তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিহিংসা পরায়ণ পাকড়াশী তার প্রাণের বস্তু কেকাকে পাবার জন্যে তা উদ্‌ঘাটিত করতো।

জয়ন্ত অগাধ ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত পালিত, মেডিকেল ডিগ্রী নিয়ে ভাবী জীবনকে সে গড়ে তুলবে কত সুন্দর করে এই আশার সৌধভিত্তি গড়ে উঠছে। ও দিয়েছে ফাইন্যাল পরীক্ষা, সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওর অনাগত ভবিষ্যতের স্বগত বন্দনা। কিন্তু তারপর? সমগ্র কাহিনীর অবতরণিকায় গ্রন্থকার সংক্ষেপে জয়ন্তের জীবনের কথা প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন দার্শনিকতার তত্ত্ব ও তথ্যের আভাস দিয়ে। ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ এই গ্রন্থখানি পড়ে পাঠকগণ খুশী হবেন বলেই মনে করি।

[প্রকাশক: তারা লাইব্রেরী। ১৪।১ গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য ২॥০ আনা]

দেশের মেয়ে: শান্তশীল দাস

দেশের মেয়ে নাটিকাখানির গ্রন্থকার সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ও সর্ব্বজন বিদিত। এঁর কবিতার সঙ্গে পূর্ব্বেই পরিচয় ঘটেছে। আলোচ্যগ্রন্থে গ্রন্থকার কিশোর-মহলের উপযোগী দৃশ্য কাব্য রচনা করেছেন আর তাদের মনের মতই হয়েছে, নিঃসঙ্কোচে এই অভিমত প্রকাশ করা যায়। সমাজের অবহেলিত মানুষের প্রতি দরদ দেখিয়ে কিশোরী দুর্গা জীবনের জয়গানই করেছে। মানুষ ও প্রকৃতির মিলনের মাধুর্য্য আছে এই আলোচ্যগ্রন্থে। পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলির ভিতর দুর্ব্বলতা নেই,—এদের আনন্দ ভোজের ভেতর অংশ গ্রহণ করতে লোভ হয়। সাতটি দৃশ্যে সমাপ্তি ঘটেছে। যারা এখনও কৈশোরোত্তর স্তরে আসেনি তারা পড়ে আনন্দ পাবে, অভিনয় করেও খুশী হবে। নাটিকাটি পুরুষ ভূমিকা বর্জ্জিত।

[প্রকাশক: কল্যাণব্রত দত্ত: তুলিকলম: ৪, মধু পাল লেন, কলিকাতা-৫। মূল্য—৬০ আনা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আনন্দময়ী মা: চন্দ্রগুপ্ত প্রণীত

এই পুস্তকে 'আনন্দময়ী মা'র বহু উপদেশ লিখিত হইয়াছে। মা একজন সাধিকা—কি ভাবে তিনি জীবনে অধ্যাত্মসাধনা দ্বারা সর্বজন শ্রদ্ধেয়া হইয়াছিলেন, ভক্ত চন্দ্রগুপ্ত এই পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেশ আজ ধর্মহীন—কাজেই ধর্মপ্রসঙ্গ যত অধিক প্রচারিত হইবে, লোকের মনে ধর্মভাব তত অধিক জাগ্রত হইবে।

[প্রাপ্তিস্থান: নিউ বেঙ্গল লাইব্রেরী। ৯, গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ১।০ আনা]

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ স্মৃতিচয়ন: স্বামী আত্মানন্দ

স্বামী প্রণবানন্দ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সংঘ আজ সর্বজন পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যেমন পৃথিবীর সর্বত্র জনসেবার ভার লইয়াছে, ভারত সেবাশ্রম সংঘও তেমনই সর্বত্র জনকল্যাণ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সংঘের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর দল নীরবে কাজ করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিতেছেন। তাঁহাদের আকর্ষণে বহু গৃহী সংঘের আচার্য্যের শিষ্য হইয়াছেন। সকলের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। দেশে সৎ-কথার প্রচার যত অধিক হয়, ততই মঙ্গল হইবে। স্মৃতি চয়ন পাঠ করিলে সংঘ-নেতা, সংঘ ও তাহার কার্য্যের কথা জানা যায়।

[প্রকাশক: ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ২১১, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-১৯। মূল্য—৬০ আনা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "হে মহাজীবন"—৩৲
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "চুয়াচন্দন" (৩য় সং)—৩৲
শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান" (৪র্থ খণ্ড—২য় সং)—৪৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বিরাজ-বৌ" (২৬শ সং)—২৲,
"পথ-নির্দেশ" (৪র্থ সং)—১৲, "পণ্ডিতমশাই" (১৩শ সং)—২৲
গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "প্রফুল্ল" (১১শ সং)—২॥০
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "কাশ্মীর"—৪৲
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বিবাহ বন্ধন"—২৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কিশোরপাঠ্য উপন্যাস "শত বর্ষ পরে"—১॥০
তপতীরাণী প্রণীত "সাধক বামাক্ষেপা"—॥০
শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ"—৪॥০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত　　হেপি ভিলা　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
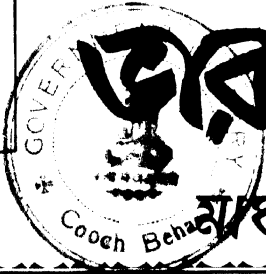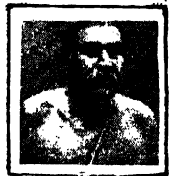
দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

হিন্দুধর্ম্মের সার কথা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এম-এল

হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মের অন্যতম। আজি হইতে বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন হিন্দুঋষি, ঈশ্বরে মন সমাধিস্থ করিয়া, ঈশ্বর, জীব ও জগত সম্বন্ধে ধর্ম্মের প্রধান সারতত্ত্বগুলি নিজ নিজ অন্তশ্চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, অর্থাৎ হৃদয়ের দ্বারা পরিষ্কারভাবে অনুভব করিয়া নির্ভুলভাবে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং সকল মানবের মঙ্গলের জন্য উহা প্রকাশিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই তত্ত্বগুলি সনাতন অর্থাৎ চিরস্থায়ী, এবং উহা কেবল মানুষের বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া অথবা বিজ্ঞানের সাহায্যে আবিষ্কৃত হয় নাই। সেগুলির অধিকাংশ তত্ত্ব মানুষের বুদ্ধির দ্বারা বা বিজ্ঞানের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। সেইজন্য, ঈশ্বরের সাহায্যে আবিষ্কৃত, ঈশ্বর, জীব ও জগত সম্বন্ধে সেই সত্যতত্ত্বগুলিকে হিন্দুধর্ম্মে "অপৌরুষেয়" তত্ত্ব বলা হয়। সেই তত্ত্বগুলি অনেক, তবে তাহাদের মোটামুটী সার অংশ অধিকাংশ হিন্দুই জানেন, এবং তাহা এই—

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর একমাত্র নিত্য সত্যবস্তু হইতেছেন ঈশ্বর। তিনি নির্গুণ এবং সগুণ। অনন্তকাল ধরিয়া তিনি বিশ্বসৃষ্টি করিতেছেন এবং তাহা লয় করিতেছেন। প্রতিবার বিশ্বলয়ের পর, তিনি নিরাকার নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপ অবস্থায় থাকেন। যখন তাঁহার বিশ্বসৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সগুণ ভাব অবলম্বন করেন এবং সৃষ্টি করেন। তাঁহার সৃষ্টির ভিতর, ক্রমবিকাশের পথে, জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু চলিয়া আসিতেছে।

তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু আপনার ভিতর হইতে সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টি লয় হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভিতর লীন হইয়া যায়। কি ভাবে তিনি আপনার ভিতর হইতে এই বিশাল বিশ্ব বাহির করেন এবং কি ভাবে কালক্রমে বিশ্বের সমুদয় বস্তু তাঁহার ভিতর লীন হয়, তাহা ধারণা করা কঠিন। সেইজন্য, শাস্ত্রবাক্যে উহা ধারণা করিবার জন্য সাহায্য করা হইয়াছে। উপনিষদে বলা হইয়াছে, যেমন মাকড়শা নিজ শরীরের ভিতর হইতে বস্তু বাহির করিয়া তদ্বারা জাল প্রস্তুত করে এবং তাহার উপর বসিয়া থাকে, তেমনই ঈশ্বর নিজের ভিতর হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাহির করিয়া সৃষ্টি করেন এবং তাহার ভিতর ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করেন ও তাহার বাহিরেও রহিয়াছেন। উপনিষদে আরও বলা হইয়াছে যে, যেমন মাটীর ভিতর হইতে গাছ জন্মিয়া বাহিরে আসে, এবং যেমন আমাদের দেহের ভিতর হইতে কেশ জন্মিয়া বাহিরে আসে, তেমনই ঈশ্বরের ভিতর হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া বাহিরে আসে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, গৌরীদেহ হইতে চণ্ডীদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, চণ্ডীদেবীর দেহ হইতে চামুণ্ডা দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবতাগণের দেহ হইতে দেবসৈন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং সেই সকল সৈন্যগণ চণ্ডীদেবীর দেহে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল বিবরণ হইতে ঈশ্বরের ভিতর হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং তাঁহার ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লয় সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করা যায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব ও দ্রব্য মোটামুটিভাবে 'চৈতন্য' ও 'জড়' এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। মানুষের ভিতর তাঁহার প্রকৃত সত্তা হইতেছে তাঁহার আত্মা। এই আত্মা চৈতন্যময় ঈশ্বরের চৈতন্যের অংশ। মানুষের আত্মাকে জীবাত্মা বলে, ঈশ্বরকে পরমাত্মা বলা হয়। যদিও সমস্ত জীব ও জগত ঈশ্বর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি এই জীবাত্মার সহিত অন্যান্য সকল বস্তুর একটী স্থায়ী জাতিগত পার্থক্য আছে। জীবাত্মা চৈতন্য পদার্থ; মানুষের দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি, জগতের যাবতীয় বস্তু, মানসিক ও প্রাকৃতিক শক্তি প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য জড়পদার্থ। মানুষের দেহের পাঁচটী উপাদান—মাটী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। এই উপাদানগুলিকে পঞ্চভূত বলা হয়। জীবাত্মা অবিনশ্বর, দেহ নশ্বর। মানুষের মৃত্যুতে দেহ ধ্বংস হয় অর্থাৎ উপরোক্ত পঞ্চ উপাদানে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সেই মৃত্যুর সময় জীবাত্মা ধ্বংস হন না। মানুষের মৃত্যুর সময়, জীবাত্মা দেহটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং যাইবার সময় সেই দেহস্থিত মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তাহার পর, শীঘ্র অথবা বিলম্বে, এই জন্মের এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জীবনে কৃতকর্ম্মের ফল অনুসারে পরবর্ত্তী জন্মে একটী মানব দেহ অথবা একটী পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির মধ্যে কোন-প্রকার মানবেতর দেহলাভ করেন। এইভাবে, কর্ম্মফলে, জন্মজন্মান্তর লাভ করিয়া, ক্রমবিকাশের পথে, উন্নতি ও অবনতির ভিতর দিয়া, পাপ ও পুণ্যের ভিতর দিয়া, কোনও না কোন সময়ে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হন। এই মিলনের অনেক প্রকার পথ আছে। নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসনা করা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দেবতাকে সেই এক ঈশ্বরের প্রতীক মনে করিয়া উপাসনা করা, কর্ম্মযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মপথে ধর্ম্ম অনুশীলন করা প্রভৃতি, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনের বহু পথ আছে। হিন্দুধর্ম্ম অনুশীলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে, বিভিন্ন ধর্ম্মপথের মধ্যে যে কোন পথ অবলম্বন করিয়া জীবাত্মার ও পরমাত্মার মিলন সংঘটন করা এবং তদ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি ও আনন্দ লাভ করা।

ঈশ্বর, জীব ও জগত সম্বন্ধে ধর্ম্মের এই প্রকার "অপৌরুষেয়" প্রধান সারতত্ত্বগুলি, অন্যান্য ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত, "বেদ" নামক হিন্দুর বিরাট ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা হইতে মনে হয় যে, বেদ শাস্ত্রের পর, মোটামুটি ভাবে পর্য্যায়-ক্রমে পর পর, স্মৃতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-শাস্ত্র প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থে অতি উচ্চস্তরের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। সেই সকল শাস্ত্রকারগণ বেদের সত্যতত্ত্বগুলি, নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি ও অনুভূতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া, অথচ সেই তত্ত্বগুলির সত্যতা স্বীকার করিয়া, অসংখ্য ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই

অসংখ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁহারা, প্রত্যেক হিন্দুর জীবনের, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, বৈষয়িক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সকল প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এইভাবে, প্রত্যেক হিন্দুর জীবন, জন্ম সময় হইতে মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত এবং প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগ হইতে রাত্রে শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত, বিবিধ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিয়া পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আজিও আমরা হিন্দুরা সেই সকল আদেশ কতক কতক পরিমাণে প্রতিপালন করিতেছি।

উপরোক্ত কারণে, প্রত্যেক হিন্দু জীবনের সহিত ধর্ম্মের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায়, হিন্দু জনসাধারণের মনে একটী প্রবল ধর্ম্মভাব জাগরিত হইয়াছিল এবং আজিও তাহা অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। অতীতে, অসংখ্য হিন্দু প্রকৃত ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও বহু হিন্দু প্রকৃত ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেছেন। কিন্তু আমাদের এই গৌরবময় ইতিহাস ও মনোবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা বহু হিন্দু সর্ব্বদা মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, নির্দ্দয়তা, কাপুরুষতা, কর্ম্মবিমুখতা এবং ঈশ্বর-বিমুখতার পথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির ভিতর জীবনযাপন করিতেছি। উপরন্তু, যখন বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ হয়, তখন আমরা নির্দ্দয়তায় ও নৃশংসতায় হিংস্র বন্যপশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, এই পৃথিবীতে প্রথম মানব আজি হইতে কয়েকলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে গবেষণাকারী পণ্ডিতগণ অনেকে মনে করেন যে, আমাদের বেদে প্রকাশিত ধর্ম্ম আজি হইতে কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা সাধারণ হিন্দুরা বর্ত্তমানকালেও যথোপযুক্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারি নাই এবং উপরোক্তভাবে অবনত জীবন যাপন করিতেছি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অন্যান্য অধিকাংশ ধর্ম্মাবলম্বী সাধারণ ব্যক্তিগণ আমাদের ন্যায় কম বেশী অবনত জীবন যাপন করিতেছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম, ধর্ম্মের ইতিহাসের দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মের প্রথমস্তরে—অধিকাংশ ধর্ম্মাবলম্বী ভাবিতেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মই একমাত্র সত্যধর্ম্ম, এবং অন্য সকল ধর্ম্ম ভ্রান্ত। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্তরে, বহু ধর্ম্মাবলম্বী ভাবিতেছেন যে, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই স্তরের পরিপূর্ণতা আসিতে এখনও বিলম্ব আছে, তবে নানাপ্রকার ধর্ম্ম সম্মেলন ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ভাব বিস্তার লাভ করিতেছে। যখন, অধিকাংশ ধর্ম্মাবলম্বী আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিবেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মের চিন্তাধারার ও অনুষ্ঠানের ভিতর অনেক ভুল ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহারা সেই ভুল ভ্রান্তি খুঁজিয়া বাহির করিয়া পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবেন, তখনই আমরা ব্যাপকভাবে ধর্ম্মের তৃতীয় স্তরে পৌছাইব। অধিকাংশ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের ভিতর প্রকৃত বিশ্বাসের ও বিচার বুদ্ধির সহিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও ভীতি মিশ্রিত থাকায়, আমাদের পক্ষে ব্যাপকভাবে ধর্ম্মের তৃতীয় স্তরে পৌছাইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর উদ্যোগে কলিকাতায় পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্ম সম্মেলন হইয়াছিল এবং তাহাতে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলির প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সভায় প্রতিদিন নানা ধর্ম্মের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে আলোচনা হইত এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে যে সত্য ও যে সৌন্দর্য্য নিহিত আছে তাহা বর্ণিত হইত। কিন্তু সে সমস্ত কার্য্য ধর্ম্মের দ্বিতীয় স্তরের বিষয়। সেই সময়ে কোন একজন সভ্য কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট প্রার্থনা করেন যে এই সারা পৃথিবীর ধর্ম্মের প্রতিনিধিদের সভায় সভ্যগণ নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের ভিতর যে ভুলভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করুন এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে ভুলভ্রান্তির প্রতিকার করিবার জন্য সহানুভূতির সহিত সমবেত চেষ্টা করুন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল, যে প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের ভুলভ্রান্তি আলোচনার এখনও সময় হয় নাই এবং এইরূপ আলোচনা করিলে ঐ সর্ব্বধর্ম্ম সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাইত। আমরা যে ধর্ম্মের তৃতীয় স্তরে এখনও পৌছাইতে পারি

নাই, ইহাই তাহার একটী প্রমাণ এবং যতদিন পর্য্যন্ত নির্ভীকভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভুলভ্রান্তি আলোচনা করা এবং তাহার প্রতিকারের বিষয় ব্যাপকভাবে আলোচনা করা না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের অধিকাংশ ধর্ম্মালোচনা বহু পরিমাণে বাস্তবতাবিহীন ও নিষ্ফল হইবে।

আমাদের ধর্ম্মালোচনা যে বহু পরিমাণে বাস্তবতাবিহীন ও নিষ্ফল হয়, তাহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। সাধারণতঃ, আমাদের ধর্ম্মালোচনার সারমর্ম্ম হইতেছে যে, (১) আমাদের হিন্দুধর্ম্ম অতি শ্রেষ্ঠ ও অতি উদার, (২) আমাদের ধর্ম্মের বিস্তৃত নিয়মাবলী নির্ভুলভাবে পালন করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরলাভ করিতে পারিব, (৩) আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অতি উচ্চস্তরের ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, এবং (৪) পৃথিবীর অন্য অনেক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ আমাদের অপেক্ষাও ধর্ম্মে অধিকতর অবনত জীবন যাপন করিতেছেন। ইহা বলিবার সময় আমরা ভুলিয়া যাই যে, (১) নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা না করিলে, ধর্ম্মের অতি উচ্চ আদর্শ গ্রহণের কোন সার্থকতা নাই, (২) আমাদের বিরাট ধর্ম্মের বিস্তৃত নিয়মাবলী নির্ভুলভাবে পালন করা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, এবং ধর্ম্মের প্রধান সারতত্ত্বগুলি জানিয়া আত্মবিশ্লেষণ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিজ নিজ ভুলভ্রান্তি বাহির করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা না করিলে কখনও ঈশ্বরলাভ, দুঃখ-নিবৃত্তি ও আনন্দলাভ হইবে না, (৩) যেমন উদরান্ন সংগ্রহ করিতে না পারিলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং চোব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, ভোগ করিবার বিষয় চিন্তা করিলেই আমাদের ক্ষুধার জালা মিটিবে না, তেমনই মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অধর্ম্মপথে আমরা জীবন যাপন করিতে থাকিলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ধার্ম্মিক জীবন চিন্তা করিলেই আমরা ধার্ম্মিক হইতে পারিব না, এবং (৪) অন্যান্য জাতির এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা আমাদের অপেক্ষা অধিকতর অবনত জীবন যাপন করিতেছেন, ইহা চিন্তা করিলেই আমাদের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হইবে না। এইরূপ আলোচনা বহু পরিমাণে বাস্তবতা-বিহীন এবং নিষ্ফল এবং ইহার ফল, ভ্রান্ত আত্মপ্রসাদ ও আত্মপ্রবঞ্চনা।

আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থাবলী এত অধিকসংখ্যক, উহাদের মধ্যে অনেকগুলি এত দুর্ব্বোধ্য এবং উহাদের ভিতর অনেক স্থলে এত পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে যে, আমাদের ন্যায় সাধারণবুদ্ধি-বিদ্যাসম্পন্ন হিন্দুর পক্ষে উহা পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহার প্রতিকারকল্পে, অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে অতি সহজ ভাষায় হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্বগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল গ্রন্থে সেই তত্ত্বগুলি, অন্যান্য ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত মিশ্রিত হইয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে—সেগুলি বিষয়ানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, পর পর ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয় নাই। সেইজন্য সেই প্রধান ধর্ম্মতত্ত্বগুলি একত্র করিয়া পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে একটু অসুবিধা হয়। প্রথমতঃ, আমরা সকল সময় বুঝিতে পারি না, কি প্রকার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এবং কি প্রকার মানসিক উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে ধর্ম্ম অনুশীলন করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ সোপান শ্রেণী দিয়া আমরা নিম্নস্তরের ধর্ম্ম অনুশীলন হইতে উচ্চস্তরের ধর্ম্ম অনুশীলনে অগ্রসর হইতে পারিব। আমরা ভুলিয়া যাই যে, ধর্ম্মজীবন নৈতিক উন্নতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমরা নির্ব্বোধের ন্যায় মনে করি যে, কতকগুলি শাস্ত্রবাক্য পালন করিলে এবং কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠান অনুশীলন করিলে, আমরা ঘোর নির্দ্দয় ও মিথ্যাবাদী থাকিয়াও সেই দয়াময় ও সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিব। দ্বিতীয়তঃ, আমরা সাধারণ হিন্দুগণ, অধিকাংশ শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া যাই বলিয়া—বাল্যকাল হইতে আমাদের সাধকগণের ও শাস্ত্রবাক্যের অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়া, বাল্যকাল হইতে নির্বিচারে শাস্ত্রবাক্য পালন করিবার জন্য ক্রমাগত উপদেশ পাইয়া থাকি বলিয়া—এবং শত শত বৎসর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরাধীনতার ভিতর জীবন যাপন করিয়া আসিতেছি বলিয়া, আমাদের ধর্ম্ম-অনুশীলন সম্বন্ধে অধিকাংশ বিষয়ে আমরা বিচারবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া, শাস্ত্রবাক্যের প্রতি একটা অহিতৈষী ও অর্থহীন ভীতির ভাব ও দাসমনোবৃত্তি পোষণ করিয়া থাকি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, যদি শাস্ত্রবাক্য পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে কল্যাণকর শাস্ত্রবিধিগুলি আগে পালন করা কর্ত্তব্য এবং আমরা নির্ব্বোধের ন্যায়, একদিকে

অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় ও অমঙ্গলজনক শাস্ত্রবাক্য পালন করিবার জন্য আন্তরিকভাবে আগ্রহান্বিত নই, এবং অপরদিকে সত্য নিষ্ঠা, জীবে দয়া প্রভৃতি নৈতিকগুণ অর্জ্জন করিবার জন্য শাস্ত্রবাক্যে যে সকল বিধান আছে, তাহা নিঃসঙ্কোচে ও বিনা অনুশোচনায় লঙ্ঘন করিয়া থাকি। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতায় এবং শাস্ত্রবাক্যে নির্ব্বুদ্ধিতাপূর্ণ দাসমনোবৃত্তির ফলে, আমরা ধর্ম্মপ্রবণ জাতি হইয়াও, এত অধিক অবনত ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেছি।

আজ স্বাধীন ভারতে বিমানের বৈপ্লবিক যুগে আমাদের ধর্ম্ম আলোচনা বাস্তবতাবিহীন ও নিষ্ফল হইতে দেওয়া উচিত নহে। আমাদের প্রত্যেক হিন্দুর চেষ্টা করা উচিত যাহাতে আমরা সাধারণ হিন্দুগণ (১) ধর্ম্মের প্রধান সারতত্ত্বগুলি জানিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি (২) শাস্ত্র-বাক্যে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে এবং ভীতি ও দাসমনোবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারি, (৩) ধর্ম্মচিন্তায় ও ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে একটী নির্ভীক ও বলিষ্ঠ মনোভাব অবলম্বন করিতে পারি, এবং (৪) ধর্ম্ম-অনুশীলনের একটী নির্দ্দিষ্ট পথ স্থির করিয়া তাহা আন্তরিকভাবে ও সর্ব্বদা আত্মবিশ্লেষণ সহকারে, অনুসরণ করিতে পারি। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের একটী বিরাট শক্তিমান অংশ, এবং আমরা সকলেই দয়াময় ঈশ্বরের সন্তান, আমরা তাঁহার বলিদানের পশু নহি এবং তিনি আমাদের রক্তপিপাসু জল্লাদ নহেন।

উপরোক্ত সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং কর্ত্তব্য-বোধে, আমি হিন্দুধর্ম্মের একান্ত প্রয়োজনীয় সত্যতত্ত্বগুলি ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের অপরিহার্য্য পদ্ধতিগুলি, যথাসম্ভব সহজ ভাষায়, সংক্ষেপে, সরলভাবে, কোন প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন না করিয়া, এবং বিষয়ানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। আমি হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত এবং যথাসাধ্য নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে, আমাদের ধর্ম্মের, ধর্ম্মশাস্ত্রের ও সমাজের বিষয় আলোচনা করিব এবং এই প্রচেষ্টায়, আমি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ও তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিব।

হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, আমি উহার প্রধান সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু আমার আলোচনা যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিবার জন্য, আমি অধিকাংশ স্থলে মূল সংস্কৃত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত না করিয়া, সেই বাক্যগুলি কোন্ গ্রন্থের কোন্ খণ্ড, অধ্যায়, বল্লী, শ্লোক প্রভৃতিতে পাওয়া যাইবে তাহার উল্লেখ করিয়া, শাস্ত্রবাক্যটীর সারার্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

হিন্দুধর্ম্মের বহু শাখা ও প্রশাখা আছে। সেইজন্য ধর্ম্মের বহু সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু সেই সকল পার্থক্যের পশ্চাতে একটী সনাতন একত্ব আছে। ধর্ম্মে প্রকৃত সত্য-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি, সেই সকল পার্থক্যের ভিতর একত্ব দেখিতে পাইবেন। এই শাখাগত পার্থক্যের জন্য, এবং ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তিরই ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া, আমার সহিত আমার পাঠক পাঠিকাগণ সকল বিষয়ে একমত হইবেন, ইহা আশা করা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে।

যুগের যাত্রী

সঙ্কর্ষণ রায়

বাসের পিছন দিকের বেঞ্চির এক কোণে ব'সে বাসের ঝাঁকানি হজম ক'রবার চেষ্টা ক'রছিলাম। নড়বড়ে গাড়ি মান্ধাতা আমলের রাজপথের ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে হুমড়ি খেতে খেতে গড়িয়ে চলে—পদে পদে বাধা অতিক্রম করার প্রতিক্রিয়া গাড়ির বডি থেকে আমার সর্বাঙ্গে হাড়গোড়ের মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ছে। সবে গৌরাংডি ছেড়ে এসেছি—আরো কুড়ি মাইল পথ পেরোলে আসানসোল—পথ চলার ধকলে দূরত্বটা দুস্তর ব'লে বোধ হ'চ্ছিল এবং আস্ত হাড়গোড় নিয়ে আদৌ পৌছতে পারবো কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠছিলাম।

বাসে উঠবার সময় দেখেছি এ্যালুমিনিয়ামের বডির ওপর বড়ো বড়ো লাল অক্ষরে লেখা র'য়েছে 'যুগের যাত্রী'। ভোরের সূর্যের আলোয় ঐ 'যুগের যাত্রী' যেন এ্যালুমিনিয়ামের পাতের ওপর ঝলসে ওঠা রক্তাক্ত ভ্রূকুটির মতো বোধ হচ্ছিল। গাড়ির ভেতরে ঢুকতেই আমার এক সহযাত্রীর মন্তব্য কানে এসেছিল—কোন যুগের যাত্রীরে বাবা! ঝাঁকানির চোটে যে জান মেরে দিল।

যুগ-যুগান্তরের—আর একজন সহযাত্রী বলে উঠেছিলেন, দোমোহানি—গৌরাংডি লাইনের লোকেদের যুগ-যুগান্তরের মন্দ ভাগ্য—এই গাড়িটা তার সিম্বল। আমাদের মতো লঝঝড় মানুষদের সঙ্গে থাপ খাইয়ে গাড়িটা তৈরী করা হ'য়েছিল।

বেঞ্চির শূন্যাংশের একাংশ অধিকার ক'রে বক্তার বিরক্তি-বিকৃত মুখের দিকে তাকালাম। স্বাস্থ্যহীন পাঁশুটে চেহারা—নিষ্প্রাণ অবয়বের ওপর এই বিরক্তিটুকুই জীবন্ত।

এঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন নিজেদের দেহগুলোকে নানা কায়দায় বেঁকিয়ে চুরিয়ে ঝাঁকানি থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা ক'রে চ'লেছিলেন—ভিড় বেশি না থাকায় লম্বা লম্বা বেঞ্চিগুলোর ফাঁকার মধ্যে এঁদের অঙ্গ সঞ্চালনে বিশেষ অসুবিধা হ'চ্ছিল না। দেখে মনে হ'চ্ছিল বাসের মধ্যে যেন এক সম্মিলিত ব্যায়ামের মহড়া চ'লেছে।

ঝাঁকানি-বিপর্যস্তদের মধ্যে নির্বিকার শুধু একজন। আমার ঠিক সামনের ডান ধারের লম্বা বেঞ্চিটাতে নিমীলিত চোখে বসে আছেন একজন গেরুয়া পরা ভদ্রলোক—দেখে সন্ন্যাসী না হ'লেও আধা-সন্ন্যাসী ব'লে মনে হয়। সবাই যেখানে যন্ত্রণায় মুখ ভেঙ্গচাচ্ছে—তিনি সেখানে আশ্চর্য রকম শান্ত—প্রায় নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন।

এতক্ষণ ভাবছিলাম বুঝি তিনি সব দুঃখকষ্টের অতীত। কিন্তু হঠাৎ কানে এল—তিনি ব'লছেন, নিজেদের গড়া যন্ত্রের যন্ত্রণা—একেই বলে যুগের অভিশাপ। কী দরকার বাপু হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার। হেঁটে ধীরে সুস্থে গেলেই তো হ'ত।

কুড়ি মাইলের রাস্তা আজ্ঞে—তাঁর পাশের লোকটি ঈষৎ ঝাঁঝালো স্বরে ব'লে ওঠে।

কুড়ি মাইল!—মৃদু হেসে সন্ন্যাসী বলেন। তোমাকে ঘিরে যেখানে শত কোটি যোজনের বিস্তার—সেখানে কুড়ি মাইল তো কিছুই নয়।

—শত কোটির হিসেব রাখি না। ব'লছিলাম এতটা পথ হাঁটার কষ্টের কথা।

—কষ্ট এড়াতেও যে কষ্ট পাচ্ছ, মোহন।

মোহন কোন জবাব না দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। একটা বিরক্তি-মেশানো গাম্ভীর্য তার মুখে-চোখে থম্ থম্ ক'রতে থাকে।

গাড়ি তখন শালবনের ভেতর দিয়ে চ'লেছে। বে-পরোয়া গাছকাটার ফলে জঙ্গলের জঙ্গলত্ব আর নেই ব'ললেই চলে। রাঙা মাটির ওপর কাটা গাছের গুঁড়িগুলো সবুজের নিরবচ্ছিন্নতাকে বিভক্ত ক'রে দিয়েছে অসংখ্য জায়গায়। ফাঁকে ফাঁকে পলাশ ও মহুয়া গাছ পাতা ঝরিয়ে কতকালের মত খাড়া হ'য়ে আছে। সবুজের

সুর আয়োজন এদের কাছে এসেই যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। আাখা-না-ডাকা শুব্ধ বনের বিস্তারের ওপর 'যুগের যাত্রীর' গর্জন যেন কষ্টি পাথরের ওপর সোনার দাগের মত আঁচড় কাটে। ভোরের রোদটুকু সবুজের ওপর, সোনালী আভা ফুটিয়ে সব ত্রুটি ঘুচিয়ে দিতে চায়—অথচ 'যুগের যাত্রীর' যাত্রীদের চোখে তা' ব্যর্থ।

—এই সেই মহুয়া তলার মনসা মন্দির!—মোহন হঠাৎ জানালা দিয়ে মাথাটা বাইরে ঝুকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

—হুঁ।—নিমীলিত চোখেই বলেন সন্ন্যাসী।

—হুঁ কী ঠাকুর? আপনার গ্রাম তো এ তল্লাটেই। মনসা মন্দিরের পর পীরপুর—তারপর লালগঞ্জ—

—চুপ কর মোহন—সগর্জনে সন্ন্যাসী ব'লে ওঠেন।

একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকায় মোহন। তারপর অনেকটা যেন আত্মগতভাবে ব'লতে থাকে, আপনারি দেশ—তাই ব'লছিলাম—নইলে আমার কী?

—আমার দেশ নেই—সন্ন্যাসী চাপা গলায় বলেন।

আমি এসব বুঝি না বাপু—মুখটা একটু বিকৃত ক'রে মোহন ব'লতে থাকে—যত হোক নিজের জন্মভূমি—সন্ন্যাসী হ'লেই তা' অস্বীকার ক'রতে হ'বে?

—তোমার ছুটি পায়ে পড়ি মোহন—আর্ত অনুনয় ফুটে ওঠে সন্ন্যাসীর কণ্ঠে—তুমি থামো।

তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে মোহন জিভ কাটল। সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হ'য়ে সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে সে বললে—ছি, ছি ঠাকুর! ও কী ব'লছেন ওতে যে আমার অপরাধ হয়।

—থাক থাক—সন্ন্যাসী বলেন—তাঁর গলার স্বরে বিরক্তির ঝাঁজ গোপন থাকে না—অতটা অপরাধবোধ পোষণ না ক'রলেও চলবে। দয়া ক'রে শুধু চুপ ক'রে থাকো—এই আমার অনুরোধ।

মাথা নীচু ক'রে নীরবে ব'সে থাকে মোহন। বাইরের অপস্রিয়মান দৃশ্যগুলো তখন বন থেকে লোকালয়ে পট-পরিবর্তন ক'রতে উদ্যত। ইতস্ততঃ ছিটোনো মাটির ঘর—মাঝে মাঝে দু'একটা দালান একটা বিস্তীর্ণ খোয়াই-এর পটভূমিকায় আঁকা হ'তে থাকে। তাল-খেজুরের জড়াজড়ি—এক পাশে আমবাগান—তারপর ধানের ক্ষেত। গাড়ির স্পিড কমে আসে।

চোখ বুঁজে থাকলেও বাইরের দৃশ্যপটের পরিবর্তন সন্ন্যাসীর মনে যে বিশেষ এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রেছে তা' তাঁর মুখের ভাবে টের পাচ্ছিলাম। আত্ম-সংবরণের আপ্রাণ প্রয়াসের আগল ভেঙ্গে তাঁর মনের চাপা অস্বস্তি মুখে ফুটে উঠছিল। মোহন নির্ণিমেষে চেয়ে থাকে তাঁর মুখের পানে।

গাড়ি থামল। জনকয়েক যাত্রী নেমে যায়—দু' একজন উঠল। ড্রাইভার ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত ক'রে হর্ণ বাজাতে থাকে। কণ্ডাক্টার রাস্তার ওপর নেমে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে চলে, এত্‌রা, আসান্সোল, এত্‌রা।

সাময়িকভাবে গাড়ির ঝাঁকানির কবলমুক্ত হ'য়ে যাত্রীরা একটু আরাম ক'রে টান হ'য়ে বসে। পথ-চলার যন্ত্রণা হজম করা ছাড়া আর কিছুতে যারা মন দিতে পারছিল না—এবারে তারা পরস্পরের প্রতি মনোযোগী হ'য়ে ওঠে। বাঁ-দিকের বেঞ্চের দাড়িওয়ালা বয়স্ক ভদ্রলোকটি তার বাঁ পাশের লোকটির দিকে চেয়ে মৃদু কণ্ঠে ব'ললেন, আবার যাচ্ছো রতন?

—হ্যাঁ চক্কোত্তিমশাই—লোকটি ক্ষীণ স্বরে বললে, মোক্তারবাবু যেতে ব'লেছেন।

—যেতে ব'লেছেন? তার মানে আজকেই মামলার তারিখ নাকি?

—আজ্ঞে না।

—এই যে মোক্তারবাবু—কণ্ডাক্টার চেঁচিয়ে ওঠে, আসুন আসুন।

বাইরের দিকে চেয়ে দেখি পাতলুন কোর্তাপরা একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে বাসের দিকে এগিয়ে আসছেন। দোহারা চেহারা—তৈলাক্ত চকচকে মুখের ওপর এক জোড়া ধূর্ত চোখের শাণিত তীব্র দৃষ্টি সম্মুখবর্তী সব কিছুতেই যেন বিদ্ধ ক'রছে। গাড়ির কাছে আসতেই দেখলুম তার বাঁ-হাতে এক তাল গোবর জড়ো করা র'য়েছে। কণ্ডাক্টারের দিকে চোখ ঠেরে একটু হেসে তিনি ব'ললেন, এক মিনিট দাঁড়া ভোঁদা—এটার একটা গতি ক'রে দিয়ে আসি।

ব'লে তিনি রাস্তা পার হ'য়ে একটা ডোবার ধারে

গোবরটা ছড়িয়ে দিলেন। তারপর ছুটতে ছুটতে এসে গাড়িতে উঠলেন।

—কী ফেললেন ওখানে মোক্তারবাবু?—দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি প্রশ্ন ক'রলেন।

—আজ্ঞে গোবর—প্রশ্নকর্তার পাশের খালি জায়গাটিতে ব'সে প'ড়ে মোক্তারবাবু ব'ললেন। কিছু জমেছিল—ওরা ফেলে দিতে যাচ্ছিল ব'লে নিয়ে এসে জমিটাতে দিয়ে দিলুম। জানেনই তো, অপচয় পছন্দ করি না আমি।

—তার আর জানিনে?—দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বৃদ্ধ বলেন—আপনার মতো হিসেবী আর ক'জন? কিন্তু কথা হ'চ্ছে, অপচয়ের যুগ এটা—যতোই ঠেকাতে যান না কেন পারবেন না। এই দেখুন না—সামান্য জমিটুকুর জন্যে রোজই সদরে ছুটতে হ'চ্ছে আমাকে। দেহের শক্তি ও অর্থ দুয়েরই অপচয় হ'চ্ছে প্রচুর পরিমাণে—অথচ বিনিময়ে কটা টাকাই বা পাবো!

—আপনাকে আগেই বলেছিলুম রামজয়বাবু, জমিগুলো ছেলেদের নামে লিখিয়ে দিন। পাঁচ ছেলের মধ্যে জমি ভাগ হ'য়ে গেলে আর এ্যাকুইজিশনের পাল্লায় প'ড়তে হ'ত না।

—সে তো আমি চাই না, মোক্তারবাবু। ছেলেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে চাকরি-বাকরি ক'রছে। ওদের তো আর দরকার নেই। আমিও আর জমিগুলোর দেখা-শুনা ক'রতে পেরে উঠি নে।

বাস ছেড়ে দিল। গ্রাম ছেড়ে যেতে কিছুটা অপরিসর ধান ক্ষেতের পর শুরু হ'ল নিস্তৃণ খোয়াই-এর বিস্তার—পোড়া ইঁটের মতো রঙ—দিগন্ত-জোড়া ঢেউখেলানো মাঠের বে-আব্রু রুক্ষতার ওপর কোথাও এতটুকু সবুজের আড়াল নেই।

—মোক্তারবাবু!—রামজয়বাবুর বাঁ পাশের রতন নামধারী লোকটি ক্ষীণ স্বরে ডাকে।

তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মোক্তারবাবু সহাস্যে বললেন, এই যে রতনবাবু—আপনাকে দেখতেই পাই নি।

—মামলার শুনানি তো সেই পয়লা মার্চ শুরু হ'বে—রতন মাথা নীচু ক'রে বলে, আজকে আমাকে আদালতে যেতে ব'লেছেন কেন?

—কাজ আছে ব'লেই ব'লেছি। যত হোক উইল জাল করার মামলা—আর আপনি হ'লেন প্রধান সাক্ষী। আগের থেকে সবটা ঠিক মতো গুছিয়ে না নিলে চলে?

—গুছিয়ে নেবার কী আছে?—ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলে রতন। আমার কাজ হ'ল সাক্ষী দেওয়া—

—হ্যাঁ, সাক্ষী দেওয়া—ধৈর্য হারিয়ে ব'লে ওঠেন মোক্তারবাবু। কিন্তু দিয়েছেন কখনো সাক্ষী? কী ব'লতে হ'বে বা না হ'বে সে সব ঠিক করা আছে?

রতনের মুখে কোন জবাব জোগাল না। নীরবে ব'সে থাকে সে মাথা নীচু ক'রে।

—খুব কড়া মামলা বাগিয়েছেন মোক্তারবাবু—রামজয়বাবু হেসে ব'ললেন।

—কড়া ব'লে কড়া—একেবারে দা কাটা তামাক!—ব'লে হো হো ক'রে হেসে ওঠেন মোক্তারবাবু।

গাড়ির স্পিড্ আবার ক'মে আসে। কণ্ডাক্টার দরজার হ্যাণ্ডেল ধ'রে হাঁক দিতে থাকে, লালগঞ্জ, লালগঞ্জ!

গাড়ি থামে—আবার ছেড়েও দেয়।

রামজয়বাবু ব'ললেন, এত্‌রার চৌধুরীরা যে এম্নি মামলায় জড়িয়ে প'ড়বে কে ভেবেছিল? অমন একটা আদর্শ পরিবার!

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে ওঠেন সন্ন্যাসী। মোহন তাঁর একটি হাত চেপে ধ'রে বললে, কী হ'ল ঠাকুর?

—না, না, কিছু নয়—নিজেকে সংবরণ ক'রে নিয়ে সন্ন্যাসী ব'ললেন।

মামলার কথা যদি বলেন, সেই কেওটজুলির পরাণ হালদারের জমির সীমানা নিয়ে মামলা—মোহনের পাশের লোকটি ব'ললে। তার কাছে কোন মামলাই লাগে না। তাতে খর্চা হ'য়েছিল পঁচিশ হাজার টাকা। যে জমি নিয়ে মামলা, মামলার খরচ মেটাতে সেটা পর্যন্ত বাঁধা দিতে হ'য়েছিল পরাণকে। মামলায় পরাণ জিতল বটে, কিন্তু জমিটা খোয়া গেল। কিন্তু তাতে কী? মামলা জেতার জন্য পরাণ যে মচ্ছোব—

বক্তার কাঁধে তার ডান পাশের বুড়ো লোকটির কনুইয়ের গুঁতো এসে প'ড়তেই সে থামল। অগ্নিদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বুড়ো বললে, ফের সেই পরাণ হালদারের মামলার গপ্পো শুরু ক'রেছিস সামাদ! তোকে

নিয়ে আর পারা গেল না।—তারপর রামজয়বাবুকে উদ্দেশ ক'রে সে বললে, এতবার চৌধুরীরা মামলায় জড়িয়ে প'ড়েছে চক্কোত্তিমশাই! এতো শুনিনি! ব্যাপারটা খুলে বলুন দিকিনি।

চক্ষু কপালে তুলে রামজয়বাবু বললেন, শুনিস নি? না শোনাই ভালো রে সুরুদ্দিন। আমাদের শিরোমণি মশাই ব'লতেন, অমন একটা পরিবার ভূ-ভারতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই পরিবার কি না উইল জালের মামলায় জড়ালো!

—পরাণ হালদারের সেই মামলাতে জাল দলিলের ব্যাপার ছিল—সামাদ বললে।

—সামাদ ফের!—সুরুদ্দিন ধমক দিয়ে উঠ্‌ল।

—জয় গুরু!—অস্ফুট আর্ত স্বরে সন্ন্যাসী ব'লে উঠলেন। তাঁর মুখের স্বাভাবিক সৌম্যতা ভেঙ্গে-চুরে যেতে শুরু ক'রেছে ব'লে বোধ হ'ল।

—ব্যাপারটা খুলে বলুন না চক্কোত্তিমশাই!—সুরুদ্দিনের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। বাসের অন্যান্য সকলের মুখে চোখে উগ্র কৌতূহল ফুটে ওঠে।

রামজয়বাবু তাঁর দাড়ির স্তূপে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, কী আর ব'লব রে! কালে কালে কত কী-ই যে দেখতে হ'বে মা জগদম্বাই জানেন। সচ্চরিত্র সাধু লোককে রাতারাতি পাকা বদমাইস ব'নে যেতে দেখলুম। যাকে সত্যবাদী ব'লে জানতুম, একদিন দেখা গেল তার মত মিথ্যেবাদী—

বাসের ঝাঁকানি হঠাৎ প্রচণ্ড রকম বেড়ে যেতে রামজয়বাবুর বাক্যস্রোতে ভাঙ্গন ধরল। আসনচ্যুত হ'য়ে প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিলেন তিনি—অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন।

সুরুদ্দিন বললে, আপনি বড্ডো ভণিতা করেন চক্কোত্তি-মশাই! কার উইল কে জাল ক'রল তা' না ব'লে কবে কোন সত্যবাদী মিথ্যেবাদী হ'ল সেই সব কথা—

ভণিতা কাকে ব'লছিস সুরু?—সুরুদ্দিনের মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি হেনে রামজয়বাবু বললেন। সবাই ব'লত—হরিসাধন চৌধুরীর স্ত্রী হরসুন্দরী একেবারে যাকে বলে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী! তাঁর যে এই পরিণাম হ'বে ভাবতে পেরেছিল? শিরোমণি মশাই বলেন—

—আঃ বড্ডো বাজে ব'কচেন চক্কোত্তিমশাই! রামজয়-বাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন মোক্তারবাবু। কে যুধিষ্ঠির, কে জগদ্ধাত্রী—এ' সব কে শুনতে চাইচে? শুনুন বাবুমশাইরা, স্বর্গতঃ হরিসাধন নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি উইল ক'রে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর মেজ ভাই-এর দুই ছেলে মদন ও যাদবকে দিয়ে গেছেন।

—অসম্ভব!—অস্ফুট উত্তেজিত স্বরে সন্ন্যাসী ব'লে উঠলেন। এ হ'তেই পারে না।

তাঁর কথা কারুর কানে গেছে ব'লে মনে হ'ল না। মোক্তারবাবু তখন ব'লে চ'লেছেন, কিন্তু হরিসাধনের মৃত্যুর পর মদন ও যাদব যখন তাঁর উইলের কথা প্রকাশ ক'রল, হরসুন্দরী তখন একটা জাল উইল খাড়া ক'রে বললেন যে সব সম্পত্তি হরিসাধন তাঁকেই দিয়েছেন—ঐটে তাঁর আসল উইল।

—তারা তারা ব্রহ্মময়ি!—অবরুদ্ধ স্বরে ব'লে ওঠেন সন্ন্যাসী। তাঁর তামাটে মুখখানা হঠাৎ যেন মড়ার মতো শাদা হ'য়ে ওঠে।

—কিন্তু মোক্তারবাবু, হরিসাধনের স্ত্রী নিজে উইল জাল ক'রেছেন—এ কী সম্ভব?—বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করে সুরুদ্দিন।

ড্রাইভারের পেছন দিকের বেঞ্চিটিতে একজন অতি শীর্ণকায় অনির্দ্দিষ্টবয়স্ক লোক ব'সে ব'সে নিবিষ্ট চিত্তে পান চিবোচ্ছিল। সে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, অসম্ভব। মোক্তারবাবু যেটাকে জাল উইল ব'লচেন, শুনেচি ওটাই আসল উইল। উইলের একজন সাক্ষী ছিলেন হরিসাধনের ছোট ভাই রামসাধন—তিনি দোমোহনির রেবতীকে ব'লেছিলেন—রেবতী গৌরাংডির বিলাসকে ব'লেচে—বিলাসের কাছেই শুনেচি।

ওরে বাপ্‌স্!—মোক্তারবাবু চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বলেন—রামসাধন একজনকে ব'লেছে সে আর একজনকে—তার কাছে শুনেচ তুমি! ভাবতে আমায় মাথার ভেতরটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রচে। তা' যাই বলো, রামসাধন ও উইলের ব্যাপারে কাউকে কিছু ব'লেচে—এ আমি বিশ্বাস করিনে। শোনো শুকদেব, তুমি যদি স্বকর্ণে রামসাধনের কাছে শুনতে তা' হ'লে কথা ছিল। তাতো নয়—তুমি শুনেচো একজনের কাছে—সে কী শুনে তোমাকে কী

ব'লেচে—আর তুমি কী শুনতে কী শুনেচ,ভগবান জানেন। রামসাধন যদি এখানে থাকৃত তা' হ'লে ও রেবতীকে কী ব'লেচে, ওর কাছ থেকে জানা যেত। কিন্তু সে তো হ'বার জো নেই। ছোঁড়া রাজনীতি ক'রতে গিয়ে ফেরার হ'য়েছে, সে প্রায় সাত আট বছর হ'ল। এই মামলার ব্যাপারে ওকে পেলে ভালোই হ'ত—ওর সাক্ষীর ওপর মামলাটা ষোল আনার ওপরে আঠারো আনা দাঁড়িয়ে যেত। অনেক খোঁজও ক'রেচি ওর—কিন্তু কোন ফল হয় নি। বোধহয় সে মারাই গেছে। কিন্তু শোনো বাপু, রামসাধন ছাড়াও উইলের আর একজন সাক্ষী ছিল। সে হ'ল রতন। সে তো এ গাড়িতে সশরীরে উপস্থিত র'য়েচে। তাকে জিজ্ঞেস ক'রে ছাখো না—সে-ই তোমায় ব'লে দেবে, হরসুন্দরী উইল জাল ক'রেছেন কি না।

শুকদেব ব'ললে, হরসুন্দরী উইল জাল ক'রেছেন—এ আমি মরলেও বিশ্বাস ক'রব না মোক্তারবাবু।

—হরসুন্দরী নিজে ওকাজ ক'রেছেন এ কথা আমিও বলিনে শুকদেব। কাজটা ক'রেচে ওঁর ভাই নটবর। ব্যাটা পাকা জালিয়াৎ।

তোমার চেয়েও?—বজ্রগম্ভীরস্বরে সন্ন্যাসী ব'লে উঠলেন।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ালেন মোক্তারবাবু, কিন্তু পরক্ষণে ঝাঁকুনির ঝোঁকে ব'সে প'ড়লেন।

যাত্রীরা সকলেই হতবাক বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকায়।

একটা মস্ত বড়ো চড়াই বেয়ে উঠছে তখন যুগের যাত্রী। টপ গিয়ারে যন্ত্রের গর্জন যন্ত্রণাদায়ক হ'য়ে ওঠে। চড়াইয়ের ডান পাশে কয়লার খনি—বাঁ-দিকে নীচু জমিতে কুলিলাইন—অদূরে এত্‌রার সামানা।

চড়াইয়ের পর উৎরাই। গাড়ির গর্জন কমে আসে। সন্ন্যাসী তাঁর জলন্ত দৃষ্টি দিয়ে মোক্তারবাবুর আপাদ-মস্তক লেহন ক'রতে ক'রতে বলেন, মদন ও যাদবের হ'য়ে উইল জাল করা বা হরিসাধন, রতন ও রামসাধনের সই নকল করা—তোমার পক্ষে একটুও শক্ত নয় যদু মোক্তার। আর রতন এমন কিছু ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির নয়—মোটা টাকা পেলে নিজের আসল সইটাকে জাল ব'লে সাক্ষী দিতেও অনায়াসে পারে।

—কোথাকার কে হে তুমি যে আমাদের নামে যা তা ব'লছ?—বাসের গর্জনকেও ছাপিয়ে যায় মোক্তারবাবুর গলার স্বর। জানো, তোমার নামে মানহানির মামলা আনতে পারি?

মোক্তারবাবুর কথায় কর্ণপাতমাত্র না ক'রে সন্ন্যাসী ব'ললেন—ঠিকই ব'লেছে শুকদেব। হরিসাধন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর স্ত্রী হরসুন্দরীকে দিয়ে গেছেন। ওই উইলই আসল। রামসাধন ও রতন ও উইলের সাক্ষী।

—কিন্তু তুমি এ সব জানলে কী ক'রে?—দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলেন যদু মোক্তার। নটবরের সাকরেদ বুঝি তুমি? কত টাকা খেয়েচ ওর কাছে—অ্যাঁ?

বাসের গতি তখন মন্থর হ'য়ে আসছে। কণ্ডাক্টার চেঁচাতে থাকে, এত্‌রা, এত্‌রা—যাঁরা নামতে চান, তৈরি হ'য়ে নিন।

স্মিত হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত ক'রে সন্ন্যাসী বললেন, মোহন, জন্মভূমির আকর্ষণ এড়াতে পারলাম না। এখানেই আমাকে নামতে হ'বে।

—সে কী ঠাকুর!—মোহন ব'ললে। আপনি ব'লছিলেন—

—হ্যাঁ ব'লেছিলুম আমার জন্মভূমি নেই। ঠিকই ব'লেছি—সন্ন্যাসী অসীমানন্দের জন্মভূমি নেই। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে যাকে সাড়া দিতে হয় সে নাম-গোত্র-পরিচয়হীন সন্ন্যাসী নয়। জন্মভূমির আকর্ষণ সে এড়াতে পারে না। সংসার তাকে টানে।

বড়ো একটা দীঘির ধারে গাড়ি এসে থামে। সন্ন্যাসী তাঁর পাশে রাখা পুঁটলিটি হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নামতে উদ্যত হ'লেন।

—কই—ব'লে গেলে না তো তুমি কে?—মোক্তারবাবু বাঁশপাতার মত কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে ব'লতে থাকেন, আমাদের নামে যা-তা লাগিয়ে গেলে—এদিকে নিজের নামটি ব'লবার মত সৎসাহস নেই! খুব সন্ন্যাসী যা হোক।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মোক্তারবাবুর মুখের ওপর অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি স্থাপন ক'রলেন সন্ন্যাসী। তারপর বললেন, সন্ন্যাসীর বেশে নিজের নাম প্রকাশ করাটা সমীচীন মনে করি নি ব'লেই বলি নি। ভেবেছিলাম, একেবারে সেই পয়লা মার্চ তারিখে আদালতে গিয়ে আত্মপরিচয় দেবো। কিন্তু একান্তই যখন জানবার জন্যে অধৈর্য হ'য়ে উঠেছ—তখন বলি, আমি রামসাধন।

ব'লেই সন্ন্যাসী গাড়ি থেকে নেমে গেলেন।

সাহিত্য-দৃষ্টি

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

এই বিশ্বজগতে আমরা যাহা কিছুই দেখি না কেন, তাহার পিছনে আছে একটি দৃষ্টিশক্তি ; সে-দৃষ্টিতে যাহা যেমন ভাবে আছে, ঠিক তেমনিভাবেই ধরা দেয়। কাজেই ইহা বাহিরকে দেখিবার দৃষ্টি। নিসর্গের কোলে ফুটিয়া-ওঠা ফুলের পাপড়ির সবটুকু সৌন্দর্যকে আমরা দেখি, কিন্তু তাহার পাপড়ি-ঢাকা সৌন্দর্য-সত্তার অপরূপত্বকে দেখিতে হইলে আমাদের অন্তরকে জাগাইয়া লইতে হয়। এই অন্তর-জাগরণের দ্বারাই একটি বিশেষ ধরণের দৃষ্টি আমাদের মধ্যে জাগিয়া ওঠে, যাহার মধ্যে ধরা পড়ে জগতের নিগূঢ়তম সত্য। আন্তরিক আনন্দ-আস্বাদের সঙ্গে এই দৃষ্টির একটি সম্পর্ক আছে, এবং এই দৃষ্টিটিকেই বলা চলে সাহিত্য দৃষ্টি। রস-মাধুর্যের গোপন লীলায় পরিপূর্ণ এই দৃষ্টি। আত্ম জাগৃতির আনন্দ-চেতনায় ও সৌন্দর্যবোধের আবেশ-মুগ্ধতায় অন্তরের গভীর দেশে গড়িয়া ওঠে যে দৃষ্টি তাহাই সার্থক সাহিত্য-দৃষ্টি। আচার্য আনন্দ-বর্ধনের কথায়—'দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থ বিষয়োন্মেষা—।' লোক-প্রসিদ্ধ বিষয়ের স্বরূপ উন্মেষণেই নিয়োজিত এই দৃষ্টি। এই দৃষ্টি দিয়াই পৃথিবী এবং তাহার মৃণ্ময়-বৃন্তে বাঁধা প্রাণ লোককে দেখিতে হয়। মানস-চৈতন্যের নিত্যরূপ হইতেছে সাহিত্য, আর সত্যচর্যার সন্ধানী দর্শনশক্তিই এই সাহিত্য-দৃষ্টি।

নিত্য নূতন করিয়া দেখার রস-আলেখ্য রচনা করিয়াই সাহিত্য-দৃষ্টি নিজের গৌরবটিকে ঘোষণা করে। বিশ্বসৃষ্টির মর্মগহনে লীলামাধুর্যের এক গোপন প্রতিষ্ঠা আছে। যাহারা রসের কারবারী, তাহারা সব সময়েই দৃষ্টি রাখেন সেই গহন লোকের প্রাণ প্রদীপটিতে ; এবং তাহার রশ্মি-শিখায় বিশেষ একটি রস-সাধনার দ্বারা নিজের দর্শনশক্তিকে প্রখর করিয়া তুলিয়া জগৎ এবং জীবনকে গভীরভাবে দেখিতে আরম্ভ করেন। এই গভীরতম দর্শন ও জীবনবোধের দৃঢ়তায় বলিষ্ঠ যে-সাধনা, তাহার দ্বারাই নরনারীর মানস-রহস্যের গ্রন্থি-বন্ধনটি খুলিয়া যায়, এবং তাহাতে কি যেন সত্যের প্রতিভাসন ঘটে। সেই সঙ্গে আসে এক রসসৃষ্টির কারুকৃতি। এই কারুকৃতির বলে নরনারীর মানস-রহস্য ও জাগতিক গোপন সত্যকে শিল্পায়নের মাধ্যমে প্রকাশ করাই সাহিত্যিকের প্রধান কাজ। কিন্তু এই কাজটির যেমন পরিমিতি আছে, তেমনি আছে নির্মিতির কলাকৃতিত্ব। প্রেক্ষাপটের ব্যক্ত ও নেপথ্য অভিনয়কে বর্হিদৃষ্টির সাহায্যে সমান ভাবেই দেখিয়া লইয়া নির্মাণের কারুকলায় তাহাকে আবেদন-মুখর করিতে হয়। কাজেই তাহাকে অনেক কিছুই দেখিতে হয় ও বুঝিতে হয়। বাস্তবানুগ বা আদর্শানুগ জীবনায়নের পথে সামগ্রিক দর্শনের রশ্মিপাত করিতে হয় সাহিত্যিককে। কেননা, জগৎ এবং জীবন এই সাহিত্য-দৃষ্টির আলোকস্পর্শে নূতনরূপে হইয়া ওঠে সঞ্জীবিত, নূতন চেতনার সহজ আবেগে লাভ করে গতি-স্পন্দন। রস-সমৃদ্ধ অন্তর্দৃষ্টিই আর এক কথায় সাহিত্য-দৃষ্টি।

এই দৃষ্টিকে থাকিতে হইবে যেমন সংবেদনশীলতায় অভিসিঞ্চিত, তেমনি থাকিতে হইবে জীবন-প্রতীতিতে প্রবুদ্ধ। অপূর্ব এক মননশীলতায় ভাবগঙ্গাবক্ষে আবাহন করিয়া লইয়া সাহিত্যিক যখন নূতন ফসল ফলানোর পলিমাটিতে আত্মার প্রতিষ্ঠাভূমি রচনা করিবেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে জীবনের তথ্যকে ছাড়াইয়া সত্যের নিগূঢ়তাকে লাভ করিবার দিকে। কারণ, সেই নূতন ফসল হইবে নূতন সৃষ্টির সবুজে ভরা ভাবীকালের সম্পদ। শুধু কেবল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখা কয়েকটি বিষয়কে কথার মাধ্যমে প্রকাশ করিলেই তাহা যেমন সৃষ্টি হয় না, তেমনি তাহাতে প্রতি-ফলনও ঘটে না সত্যের যে-দৃষ্টির পিছনে থাকিবে ধ্যানের প্রশান্তি ও আত্মবোধের সজীবতা, কেবল সেই দৃষ্টির দ্বারাই সত্যকে দেখা চলে,—এবং 'অন্তর হইতে বচন আহরণ' করিয়া আনন্দ লোকে বিচরণ করা যায়। এই দেখবার শক্তিতেই ঘটে শিল্পীত্বের উদ্বোধন। আলংকারিক অভিনব গুপ্ত এই দৃষ্টিকে যে-ভাবে দেখিয়াছেন তাহা হইতেছে,—'প্রতিভান লক্ষণেহর্থে সংক্রান্তম্।' অর্থাৎ কবি বা সাহিত্যিক বিশ্বপৃথিবীকে দেখিতে দেখিতে সমস্ত কিছুর সত্যকে জানার প্রতিভা লাভ করিয়া তাঁহাদের সাহিত্য-সৃষ্টির রসকে সঞ্চার করেন অন্যের হৃদয়ে। সাহিত্য-দৃষ্টি তাই চিরকালীন সত্য-দর্শনের পথেই যুগ যুগান্তর ধরিয়া প্রসারিত।

সাহিত্য-দৃষ্টির পিছনে ধ্যানময়তা আছে বলিয়াই সাহিত্যিক অদূরবর্তী ভাবীকালের বুকে কি ঘটিতে পারে, তাহারও কিছু ইংগিত দিয়া যাইতে পারেন। ভাবীকালের চিন্তাশীলেরা লেখকের যুগের পটভূমিকায় তাঁহারই ইংগিতের উপর ভিত্তি করিয়া পদক্ষেপ করেন নূতন সত্য-চিন্তার পথে। তাহাদের গতিপথ রচিত হয় নূতন তীর্থযাত্রার দিকে। নদীর উৎস-প্রবাহে জাগে সত্য-সন্ধানের প্রথম কল্লোল ধ্বনি, আর পরবর্তী তরঙ্গধারা বিপুল-ব্যাপ্ত সমুদ্রবুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য বহুপ্রয়াসে পথ রচনা করিয়া যায়। এই দিক দিয়া সাহিত্য দৃষ্টি যুগে যুগে প্রগতির পাথেয়ও জোগাইয়া যায়।

এই সাহিত্য দৃষ্টি জাগে বিশেষ একটি প্রেরণার দ্বারা। আকাশব্যাপী মৌনতার পরিবেশের মধ্যে যেমন করিয়া নিঃশব্দে জাগে জ্যোৎস্নার শুভ্রতা, তেমনি নিঃশব্দ স্বপ্নসঞ্চারের মতই এই সাহিত্য-দৃষ্টির ভাবাকাশে বিস্তৃতি লাভ করে প্রেরণার রসসংকেত। এই প্রেরণাময় দৃষ্টির অধীশ্বর হইয়া সাহিত্যিক যেন তখন আর ইহলোকের অধিবাসী নন, তিনি যেন অপরূপ রূপ-মাধুর্যের সাড়া-জাগানো ভাবরাজ্যের অধিবাসী। একদিকে যেমন শত সৌন্দর্যের উৎসদ্বার তখন তাহার সামনে খুলিয়া গিয়াছে, অন্যদিকে তেমন বাস্তব পৃথিবীর নরনারীর হৃদয়গত বেদনা-উল্লাসের সহস্র নিগূঢ় রাগিনী নূতন ঝংকারে তাঁহার প্রাণের তারে বাজিয়া উঠিয়াছে। কি যেন এক অজানা আনন্দের নির্ঝর-ধারায় প্রাণকে ডুবাইয়া দিয়া তাঁহার প্রাণের

সমস্ত অনুভবকে স্নিগ্ধ করিয়া লইতেছেন,—এবং সেই সঙ্গে নূতন ছন্দ, নূতন সৃষ্টির গভীরতম বাণী, জীবলোকের প্রতিটি মর্মের রহস্য-নিবিড় সমস্ত তত্ত্ব তাঁহার কাছে অতি সহজেই আসিয়া ধরা দিতেছে। এই সাহিত্য দৃষ্টিই যেমন সৌন্দর্যকে দেখে, তেমনি দেখে বাস্তব-জগতের ঘটনা-ধারার মাধ্যমে মানব-মানবীর হৃদয়-রহস্যকে। তাই তিনি স্বতঃই বুঝিতে পারেন, কোন্ বিদ্রোহের বাণী মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, কোন্ 'মাধবীর' অন্তরপুরে সমাজ চেতনার সঙ্গে হৃদয়ের রুদ্ধ প্রেম দুঃসহ দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গোপনে মাথা কুটিয়া মরিতেছে। এইদিক দিয়াই সাহিত্য-দৃষ্টি বোধিদৃষ্টির সঙ্গে দিব্যদৃষ্টির সমন্বয়। রসকীর্তির সৌধ রচনা করিতে থাকে সাহিত্য দৃষ্টি।

এই সাহিত্যদৃষ্টির প্রশ্রয়েই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ও 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যে দেখিতে পাইয়াছেন, মোহের ভিতর যাহা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, মঙ্গলের ভিতর দিয়া তাহাই লাভ করে সার্থকতুর পরিণতি। সেখানে তিনি দেখিয়াছেন, ধর্মের ধ্রুবত্বের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে-সার্থকতর সৌন্দর্য, এবং ধর্মের কল্যাণ বন্ধনেই বাঁধা থাকে প্রেমের শান্ত সংযত একটি মঙ্গলরূপ। বন্ধন এবং বন্ধন-মোচনের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাণ-তপস্যার দিক দিয়া যে-একটি সমন্বয়ের ভাব আছে, উভয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ আছে, আদান-প্রদানের নিবিড়তম সম্পর্ক আছে. রবীন্দ্রনাথ তাহাই দেখিতে পাইয়াছেন কালিদাসের কাব্যশিল্পে। শকুন্তলার পার্থিব জীবনের প্রথম অঙ্কে যে-মোহমদির সৌন্দর্য-পিপাসা আর শেষ অঙ্কে স্বর্গ-তপোবনের চিরন্তনী আনন্দলগ্নের মিলন-প্রত্যাশা, ইহা সাহিত্য-দৃষ্টির আলোক স্পর্শ ছাড়া দেখিয়া লইবার সাধ্য ছিল না। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতে'ও রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইয়াছেন,—আমাদের মনোরাজ্যের অন্তরতম লোকটিকে বাহিরে রাখিয়া প্রাণ যেমন কিছুতেই স্বস্তি পায় না. তেমনি একান্ত নৈকট্যের স্নিগ্ধ পরিবেশেও বিরহভীরু চেতনার গোপন আশংকা মনকে পাগল করিয়া তোলে। কালগত বিরহে অতীতকালের ছায়ান্ধকারে হারাইয়া-যাওয়া মানুষগুলির স্মরণে একটি বিরহবোধ. আর মানসগত বিরহে প্রত্যেকটি মানুষের আপন প্রিয়জনের ঘন সান্নিধ্যের আবেশ-বিহ্বলতার মধ্যেও হারাইবার গভীরতম আর্তি। তখন শুধু এই এক কথা—'কোরে থাকিতে কতদূর হেন মানয়ে তেজি সদা লয়ে নাম।' এইজন্যই সাহিত্য-দৃষ্টি সৃষ্টির প্রাণপথ বাহিয়া সত্যের জ্যোতির্লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রেম-সৌন্দর্যের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক আছে এই দৃষ্টির—এবং এই-জন্যই ইহা অনেক সময় রস-সাধনায় কবি-মানসকে অতীত-মুখাও করিয়া তোলে। কেননা. সেইখানে কবি-মানস নূতন এক রস-সৌন্দর্যের সন্ধান পায়; স্বপ্ন-কামনার মধুরতায় ভরিয়া ওঠে তাঁহার অন্তরদেশ। বাস্তব জীবনের পথে মনের যে-আদর্শগত নারীকে কবি কিছুতেই পাইলেন না, সেই চিরকামনার নারীকেই কবি মানসী করিয়া তুলিয়া অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরান; এবং তাহাকেই অতীতকালের উজ্জয়িনীর এক স্বপ্নঘেরা পটভূমিকায় যেন এই দৃষ্টির সাহায্যেই দেখিতে পান। তখন কবি আবেগময় প্রাণের ছন্দ-ঝংকারে বলিয়া ওঠেন—

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে—মোর হস্তে হস্ত রাখি'
নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,
"হে বন্ধু, আছ তো ভালো ?" মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু কথা আর নাহি। (স্বপ্ন—রবীন্দ্রনাথ)

সাহিত্য-দৃষ্টির অতীত স্বপ্নের অঞ্চলে এমনি করিয়াই মনকে স্বপ্নময় করিয়া তোলে। জীবনের চেতনালোকে রহস্যের মাধুরীছায়া এমনি ভাবেই সঞ্চার করিয়া অতীতের সঙ্গে বর্তমান মানস লোকের সমন্বয় সাধন করে।

তারাশংকরের 'কবি' উপন্যাসে দেখিতে পাই,—কবিয়াল নিতাই রোগক্লিষ্টা হতশ্রী নিম্নশ্রেণীর,স্বৈরিণী বসন্তকে অপেক্ষাকৃত সুস্থির দেখিয়া খুশি হইয়া বলে—'বাঃ, এই তো বেশ মানুষের মত হয়েছে।

বসন্ত হাসে, এবং সেই হাসির মধ্যে যতটুকু বিদ্রূপ ততটুকু দুঃখ। নিতাইও বিচলিত না হইয়া পারে না। পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া নিতাই অত্যন্ত আদর ও তৃপ্তির সঙ্গেই আয়নাখানা পাড়িয়া বসন্তের সম্মুখে ধরে।

"মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। * * নিতাইয়ের হাত হইতে আয়নাটা ছিনাইয়া লইয়া—বসন্ত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মারিল। দুর্বল হাতের লক্ষ্য—আর নিতাইও মাথাটা খানিকটা সরাইয়া লইল—তাই নিতাই সে-আঘাত হইতে বাঁচিয়া গেল। আয়নাটা ছুটিয়া গিয়া একটা বাঁশের খুঁটিতে লাগিয়া—তিন চার টুক্‌রা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

নিতাই একটু হাসিল। সে কাঁচের টুক্‌রা কয়টা কুড়াইতে আরম্ভ করিল।"

সুচতুর দক্ষ ঔপন্যাসিক এইটুকু বলিয়াই এই ঘটনাটির নেপথ্যে চলিয়া গেলেন। কিন্তু হে-দৃষ্টির স্বচ্ছ একটু আলোকপাত করিয়া বসন্তের মর্ম-রহস্যটিকে—তাহার জীবনের সব নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার অভিমানগুলিকে সকলের কাছে তুলিয়া ধরিতে চাহিলেন, তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। 'বসন্ত' যেন তাহার একান্ত প্রিয় নিতাইকে বলিতে চায়—সে তো আগে তাহার দেহ-বেসাতির ব্যাপারেই ভালো ছিল; প্রেমের অমৃত-স্বাদ জীবনে সে পায় নাই, পাইবার প্রয়োজনও তাহার ছিল না। সমাজ-সীমার বাইরে তাহার ঘৃণিত স্বৈরিণী জীবনে প্রেম-পিপাসার কোন তীব্রতা সে অনুভব করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাই জাগাইয়া দিল অন্ত্যজ ও জাতীয় কবিয়াল নিতাই—তাহার নারী-মর্যাদার লাঞ্ছনাময় ইতিহাসটিকে নূতন করিয়া সে যেন তাহাকে প্রেম-গভীরতার সঙ্গে বুঝাইয়া দিল। প্রেমের-অমৃত কবি পান করিয়া এখন সে মরিতেও চায় না—কিন্তু মৃত্যু তাহার একেবারে দ্বারের কাছে। তাহার নিভিয়া-আসা দেহরূপের শিখাটিকে নিতাইয়ের মত আর কেহ তো আগে এমন করিয়া প্রাণের সত্যকার অনুরাগ দিয়া ঘিরিয়া রাখে নাই। সুতরাং জীবনবোধ তাহার জাগিয়াছে, কিন্তু সেই জীবনকে পাইবার পথও নারীত্বের দিক দিয়া সর্বহারা জীবনের সম্মুখে হারাইয়া গিয়াছে। তাই নিতাইয়ের প্রতি তাহার এত রাগ। নিতাইকে নির্মম আঘাতের দ্বারা রক্তাক্ত করিয়া

দিতেও তাহার প্রেম-সুরভিত হৃদয়ের যেন এতটুকু কুণ্ঠা নাই। নিতাই কেবল কামনাহীন প্রেমের বিপুল প্রশান্তিতে হৃদয়টিকে ভরিয়া লইয়া বসন্তের আঘাতের টুকরাগুলিকে কুড়াইয়া লয়। শিল্প-সজাগ কাহিনীকার তাঁহার সাহিত্য-দৃষ্টির ইংগিত-আলোকে লাঞ্ছিত নারী-হৃদয়ের সংগোপন প্রেমবোধটিকে এমনি করিয়াই আমাদের জ্ঞানের গোচরে আনিয়া দিয়াছেন।

এই ঘটনা-বিবৃতির ভিতরে আছে সত্যসন্ধানী সাহিত্য দৃষ্টি, আর বাহিরে আছে রাজপ্রবুদ্ধ ইংগিত ভাষণ। সাহিত্য দৃষ্টি যাহা দেখে, তাহার সুসমঞ্জস সজ্জাকরণের জন্যই আসে এইরূপ শিল্পকুশলতা ; আর এই দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্যই পাঠক-পাঠিকার মনে জাগে অধীর উৎকণ্ঠা,—এবং ইহার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়াই তাহারা—'সহৃদয় সংবাদ ভাজঃ সহৃদয়াঃ।' সাহিত্য দৃষ্টি তাই সুন্দর ভাবে সত্য-প্রকাশের জন্যই শিল্পের উদ্বোধনকারী।

সাহিত্যদৃষ্টির পিছনে একদিকে যেমন আছে মননধর্মিতা, আর একদিকে তেমনি আছে আবেগ-গভীরতা। প্রাণের আবেগ মননশীলতার সঙ্গে সহযোগিতা করে বলিয়াই সাহিত্যদৃষ্টি সত্যদৃষ্টি হইয়া দেখা দেয়। এই দৃষ্টির রস-সৌকর্যই কবি বলিতে পারেন—

Our birth is but a sleep and a forgetting
The soul that rises with us, Our life's star,
Hath had elsewhere its setting
And cometh from afar. (wordsworth)

কবি এই দৃষ্টির দ্বারাই যেন আমাদের জীবনের একটি নিগূঢ় উৎসকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। উপলব্ধির বৃন্তে এক গভীর সত্যের ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে এই দৃষ্টির আলোকে। এই দৃষ্টি লইয়া যেদিকেই তাকানো যায়, সেদিকেই ঢোলে পড়ে নূতন অভিজ্ঞতার অফুরন্ত সংকেত ও অপরিসীম সম্ভাব্যরূপ। ইহার ভাবময় স্পর্শেই কবি যেন এক নিগূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করিয়া কবি-আত্মার স্বর্ণ জ্যোতিকে অন্তরের আবেগ-উচ্ছলতায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। এই ভাবেই একটি বিশেষ মনের ধ্যানমধুতে পূর্ণ হইয়া ওঠে নিখিলের প্রাণভাণ্ডার।

এই দৃষ্টিই কবিকে মিষ্টিক বা মরমী করিয়া তোলে। ইহার সহজানু-ভূতির গুণেই কি যেন এক অরূপের স্পর্শ কবির হৃদয়কে রসায়িত করিয়া রাখে। বিশ্বসৌন্দর্যের যবনিকার অন্তরাল হইতে একটি বিশ্বমোহিনী শক্তিকে শুধু কবিদৃষ্টি দেখিতেই চায় না, আবিষ্কার করিতে চায় নূতন ভাবে নিজ অন্তরের রসভাবনার জগতে। সেই বিশ্বমোহিনীর জন্য এই যে রস-চেতনা, ইহা তো কবির কাছে ভুল নয়। কেন না, এই চেতনার সঙ্গে নিগূঢ় একটি যোগ-বন্ধন আছে সাহিত্যদৃষ্টির। এই দৃষ্টিই তো জীবনের সত্যকামনার সঙ্গে আনন্দ মাধুর্য মিলাইবার দৃষ্টি। যদি ভুল হইত, তবে মন কেন এমন ভাবে রসসিক্ত হইয়া সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ফুলের মালায় নিজেকে সাজাইয়া লইতে মাতিয়া উঠিত ? এই রূপ-সাধনার মধ্য দিয়াই সাহিত্যদৃষ্টি হৃদয়ের বোধের সঙ্গে মিলিত হইয়া বুঝাইয়া দেয় 'এ ভুল মর্মের ভুল'—এবং ইহার মূল বিজড়িত রহিয়াছে মর্মের সঙ্গেই ; আর দেখাইয়া দেয় 'জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্লবী'কে। হৃদয়ের আনন্দ-সত্তার সঙ্গে যাহার চিরন্তন সম্পর্ক সেই তো জীবনে অমৃতময়ী, এবং তাহাকে দেখিতে যাইয়াই কবি মিষ্টিক হইয়া পড়েন। এই বিশ্বের রহস্য-ঘেরা কুহেলি-ছায়ার মধ্য হইতেও যিনি এক সত্যের আলোক-সজ্জিতা সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে,—সীমার মধ্যে অসীমের উদার ব্যঞ্জনাকে দেখিতে পান, তিনিই তো মিষ্টিক। পৃথিবী যেন তাঁহার কাছে দেখা দেয় অরূপ-সুন্দরের রূপজ্যোতির ভাব-মহিমা লইয়া। এই দৃষ্টি লইয়াই কবি ধ্যানী পুরুষ।

ভাব-তন্ময়তার মায়াঘন লগ্নটিতে ধ্যানের অতল হইতে যাহাকে এই দৃষ্টির আলোকে কবি দেখেন, তিনি—

কিরণ-মণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ময়ী সুরূপসী,

যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে। (সারদা মঙ্গল বিহারীলাল)
ধ্যানের পদ্ম-আসনে বসিয়া কবি-হৃদয়কে জ্যোতিঃস্নাত করিয়া দিয়া যে জ্যোতির্ময়ী রূপসী কবির রসদৃষ্টিকে মধুর করিয়া তোলেন, কখনও তিনি কাব্যলক্ষ্মী 'সারদা,' কখনও 'যোগানন্দময়ী তনু', কখনও—'স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী।' কখনো কবি আর সেই বিশ্ববিমোহিনী শক্তিকে যেন দেখিতে পান না,—কি যেন রহস্যের অন্ধকারে নিজেকে লুকাইয়া রাখেন। হাহাকার করিয়া ওঠে কবি আত্মা—'জীবন কুসুমলতা কোথা রে আমার।' কিন্তু পরক্ষণেই রসোজ্জ্বল দৃষ্টির স্বচ্ছতা আসে ফিরিয়া,—কবি দেখিতে পান চির-আকাঙ্ক্ষিতা সেই অপরূপ-রূপিণীকে আর অপূর্ব আনন্দে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন 'মানব মনের উদার সুষমা বলিয়া।' এই প্রত্যক্ষ বিরাজমান উদার সুষমার বিশ্বময়ী কান্তিতে হৃদয়কে ভরিয়া লইয়া কবি বিশ্বপৃথিবীকে যেমন ভালোবাসিতে পারেন, তেমনি ভালোবাসেন নিখিল ধরণীর মানব মানবীকে। এইভাবে সাহিত্য-দৃষ্টি বিশ্বের অন্তরালবর্তী সত্যসৌন্দর্যকে দেখাইয়া সারা বিশ্বকেই আনন্দ-মিলনের পীঠভূমি করিয়া তোলে। বিশেষ একটি অন্তরের ভাবজগতে ধ্যানমগ্নতা ও বিশ্বমুখীনতার যেমন সার্থক সমন্বয় ঘটাইয়া দেয়, তেমনি নূতন এক রশ্মিশিখায় চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল করিয়া রাখে বিশ্বের অন্তর-লোকটিকে। এই দৃষ্টির সঙ্গে মনের যোগ-বন্ধন আছে বলিয়াই ইহা মননজীবী হইয়াও আবেগজীবী। সাহিত্যদৃষ্টি তাই সত্যদর্শনের আলোক-শিখায় উজ্জ্বল ও নিত্যমাধুর্যের প্রাণসঞ্চারী।

প্রাগৈতিহাসিক কৃষি

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী এম্-এ

জগতে সর্বপ্রথম কোন যুগে মানুষের সৃষ্টি হয়, তা' এখনও অজ্ঞাত। তবে প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করেছেন যে, বর্তমান সময়ের সকল জীবের পরে মানুষের আবির্ভাব।

ধরার বুকে মানুষ যেদিন প্রথম দেখা দিল, সেদিনও তার ক্ষুধাতৃষ্ণা ঠিক আজকের মতই ছিল। কাজেই জীবনের সেই প্রথম প্রভাত থেকেই তাকে আহারের অন্বেষণে বেরোতে হয়।

ভূ-তত্ত্ববিদ্ ও প্রাণী-তত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করেছেন যে, সৃষ্টির প্রথম যুগে আদিম মানব ছিল উদ্‌ভিদভোজী। প্রকৃতির ভাণ্ডার বনজঙ্গলে ছিল অজস্র উদ্‌ভিদ। তাই সংগ্রহ করে আদিম মানব আহারের কার্য সম্পাদন করতো। কাজেই চাষ-আবাদ করে কৃত্রিম উপায়ে উদ্‌ভিদ জন্মানোর চিন্তাও তার ছিল না। এইভাবে বহুদিন কেটে যায়। ক্রমে যুগ পরিবর্তনের ফলে দেশে আবহাওয়ারও পরিবর্তন দেখা দেয়। তখন মানুষ প্রথম অনুভব করলো যে প্রকৃতিজাত উদ্যানে তার জীবনধারণের জন্য পর্য্যাপ্ত ফল মূল নাই। কাজেই ধরার বুকে যদি তা'র অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়, তা'হলে এই সব ফল-মূল ছাড়াও অন্য আহার্য্যের প্রয়োজন। তাই সেদিন থেকে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে আহার্য্য সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রয়াসের ফলস্বরূপ মানুষ সে-সময়ে যে-সব অস্ত্র বা যন্ত্রপাতি তৈরী করে, তার উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিকগণ প্রাগৈতিহাসিককালকে বিশেষ বিশেষ ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন। সেই সব ভিন্ন যুগের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে নীচে বলা হচ্ছে ঃ

পুরা-প্রস্তর যুগ

সহজ-লব্ধ বন্য ফলমূলে যখন মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ল না, তখন তা'কে বনে জঙ্গলে ঘুরে পশুমাংস ভোজনে প্রবৃত্ত হতে হয়। কিন্তু এতেও তার খাদ্য সমস্যার সমাধান হ'ল না। ক্রমে পরিবারবর্গও তার বেশী হয়ে পড়লো। কাজেই এইভাবে খাদ্যের জোগাড় করে আর সে পেরে উঠলো না। কিন্তু করবেই বা সে কি? তার সম্বলের মধ্যে কয়েক টুক্‌রা পাথর। তাই দিয়ে তৈরী করেছে সে কিছু অস্ত্র। তাতে পশু-পাখী মারা ছাড়া আর কিছুই হয় না। কাজেই ভারতের আদিমবাসিন্দা এই নিগ্রোবটুর দলকে যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন করে বছরের পর বছর ধরে খাদ্যের অন্বেষণে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হয়।

নব-প্রস্তর যুগ

বহু বছর ধরে ব্যবহারের ফলে পাথরের যন্ত্রপাতি অনেক উন্নত হ'ল, আর সেই সময় ভারতে দেখা দিলে আর এক দল লোক। এদের বলা হয় আদি-অষ্ট্রেলিয়। এদেরই এক শাখা ভারতে চাষ-আবাদ আরম্ভ করে। বেদে যে নিষাদের উল্লেখ আছে, বিষ্ণুপুরাণে যে নিষাদের অঙ্গার-কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বকায়, চ্যাপ্টামুখ বলে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে যাদের কাককৃষ্ণ, অতি খর্বকায়, খর্ববাহু, প্রশস্তনাস, রক্তচক্ষু এবং আম্রকেশ বলে বলা হয়েছে, সেই নিষাদরা ছিল এই আদি-অষ্ট্রেলিয়দের বংশধর। এই নিষাদ গোষ্ঠীরাই ভারতে কৃষি কার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক (১)।

সে সময় কেউ ধাতুর ব্যবহার জানতো না। কাজেই আদি-অষ্ট্রেলিয় দলের এই নিষাদগোষ্ঠীর পক্ষে চাষের জন্য উন্নত ধরণের কোন ধাতব যন্ত্রপাতি তৈরী করা সম্ভবপর হয়নি। তাদের চাষ-আবাদের হাতিয়ারের মধ্যে ছিল একরকম 'খনন যষ্ঠি'। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে এই খনন-যষ্ঠিই ভারতের সর্বপ্রথম চাষ-যন্ত্র। এই দিয়ে তারা মাটি খুঁড়ে যে পদ্ধতিতে চাষ আবাদ করতো তা আজও 'ঝুম চাষ' নামে পরিচিত। চাষের যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার বছর আগে ভারতের এই আদিম চাষ-যন্ত্রের ব্যবহার লোপ পেয়ে গেছে। তবে নাগা, কুকিদের মধ্যে এইরকম যন্ত্র দিয়ে ঝুম-চাষ এক্ষেত্রে প্রচলিত আছে এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এখনও এই রকম খনন-যষ্ঠি ব্যবহার করে থাকে। তা'ছাড়া ফিজি ও দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরাও ঝোপ ও উইয়ের ঢিপি পরিষ্কার করার জন্য এখনও এর ব্যবহার করে (২)।

যা'হোক এই যুগের অধিবাসীরা এই খনন যষ্ঠি দিয়ে মাটি খুঁড়ে পাহাড় অঞ্চল ও সমতল ভূভাগে চাষ আজও করে। পরে অষ্ট্রিক ভাষাভাষীদের কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি অন্যান্য শাখারও অনেকে চাষের কাজে যোগ দেয়। শস্য খাদ্যোপযোগী করতে যে সব যন্ত্রপাতি দরকার, তাও এরা তৈরী করেছিলো। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রাঁচি জেলায় এই সময়ের যে-সব যন্ত্র-পাতি পাওয়া যায়, তার মধ্যে শস্য পেষণের মূসলও (grinder) পাওয়া গেছে (৩)। তা'ছাড়া 'ঢোক', 'কুলো' প্রভৃতিও প্রাক্-বৈদিক যুগের দেশী শব্দ থেকে উদ্ভূত। এই সব দেখে মনে হয়, তৎকালে মানুষ চাষ আবাদকেই জীবিকানির্ব্বাহের উপায় বলে গ্রহণ করেছিলো। অনেক বছর ধরে খনন-যষ্ঠির সাহায্যে চাষ করতে করতে অবশেষে তারা কাঠের লাঙ্গল তৈরী করে। পুশিলুশিক প্রমাণ করেছেন যে, 'লাঙ্গল' শব্দটা অষ্ট্রীকভাষীদের ভাষা থেকেই গৃহীত হয়েছে। কাজেই চাষের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার 'লাঙ্গল' অষ্ট্রিকদেরই দান বলে বলা চলে। ভাবলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না, কোন এক অজ্ঞাত দিবসে অষ্ট্রিকভাষাভাষী ভারতের আদিম-বাসিন্দারা চাষের জন্য যে লাঙ্গল আবিষ্কার করেছিলো

১। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—History of Bengal পৃঃ ৫৬২

২। সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী—জমি ও চাষ, পৃঃ ১২

৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ পৃঃ ৯

তা আজও আমাদের কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়ক হয়ে আছে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ফলে এর অনেক উন্নতি হয়েছে সত্য; কিন্তু তবুও অষ্ট্রিক-দের দান-স্বরূপ সেই লাঙ্গলই এখনও আমরা মাথায় করে রেখেছি।

এই সময় যে সব শস্তের চাষ হ'ত তার মধ্যে ধানই ছিল সর্বপ্রধান। উঁচু-নীচু জমির মৃত্তিকা-ক্ষয় নিবারণের জন্য জমি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে নিয়ে তাতে আইল বা বাঁধ দিয়ে করতো তারা ধানের চাষ।

আমাদের দেশে এখনও পাহাড় অঞ্চলে এবং সমতল ভূভাগেরও বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় যেখানে জমি উঁচু-নীচু, সেই সব জায়গায় এই উপায়ে ধানের চাষ করা হয়। কাজেই এই অষ্ট্রিকভাষাভাষী লোকেরাই যে ভারতে ধান চাষের প্রথম প্রবর্তক তা' অনায়াসেই বলা যেতে পারে। ধান ছাড়া অন্যান্য শস্তের আবাদও তারা করতো। এই সব আমরা জানতে পারি তাদের ভাষা থেকে। অন্যান্য যে সব ফসলের আবাদ হ'ত তার মধ্যে নারকেল, (নারিকেল), কলা (কদলী), পান (তাম্বুল), সুপারি (গুবাক) প্রভৃতি প্রধান। তা' ছাড়া হলুদ (হরিদ্রা), আদা (শৃঙ্গবের), বেগুন (বাতিঙ্গন), লাউ (অলাবু) প্রভৃতির চাষও যে তারা করতো, তা'ও এদের ভাষা থেকে অনুমান করলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। বাংলা ভাষায় এই রকম শত শত প্রচ্ছন্ন অনার্য্য শব্দ বিদ্যমান। এই সব অজ্ঞাতকুলশীল শব্দের ভিতরই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উপাদান লুক্কায়িত। উপরে যে সব ফসলের কথা বলা হয়েছে তা যদি এই যুগে চাষ না হ'ত তাহলে কখনই তা' এই সময়ের অষ্ট্রিকভাষীদের ভাষায় স্থান লাভ করতো না। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন:

They brought, as the names from their language would suggest, the cultivation of the co-coanut (narikela), the Plantain (Kadali), the betel-vines (tambula), the betel-nut (guvaka), probably also turmeric (haridra) and ginger (Sringavera) and some vegetables like the brinjal (Vatingane) and the pumpkin (alabu)."

তা'ছাড়া লেবু, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা, ডুমুর, ঝিঙ্গা, ডালিম প্রভৃতির চাষও তারা করতো। কেননা এই নামগুলো মূলতঃ অষ্ট্রিক ভাষা থেকেই উদ্ভূত। কার্পাস শব্দটিও মূলতঃ অষ্ট্রিক। কাজেই তুলোর কাপড়ের ব্যবহারও অষ্ট্রিকভাষীদেরই দান বলে মনে হয়।

তখনকার লোকে ডালের চাষ করতো বলে কোথায়ও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কাজেই ভাতের সঙ্গে শাক-সব্জি বা তরিতরকারি খাওয়াই ছিল তখনকার রীতি। চাষ-আবাদ জানলেও তারা গো-পালন করতো না এবং দুধও খেত না। তবে এই অষ্ট্রিক ভাষাভাষী লোকেরাই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম হাতী পুষতে আরম্ভ করে। এর কারণ সম্ভবতঃ চলাফেরার সুবিধার জন্যই। এ ছাড়া তারা মুরগী পালনও করতো। এর কারণও অনুমান করা শক্ত নয়। তারা ছিল আমিষ-ভোজী। কাজেই খাদ্যের জন্যই যে তারা মুরগী পালন করতো তা' বলাই বাহুল্য।

এই ভাবে যে সভ্যতা গড়ে উঠলো, তাও হল কৃষি সভ্যতা, আর এই সভ্যতা হল একান্তভাবেই গ্রামকেন্দ্রিক। যেখানে তারা জমি পেল সেইখানেই করলো চাষ, আর চাষের জমিকেই ঘিরে গড়ে উঠলো গ্রাম। তখন চাষের সঙ্গে বাসের ব্যবস্থা হওয়ায় সেদিন থেকে হল 'চাষ-বাসের পত্তন। এক এক টুকরো জমিকে আঁকড়ে ধরে এক এক গোষ্ঠী বাস আরও করলো, আর অনেকগুলো গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠলো গ্রাম, গড়ে উঠলো সমাজ। আর সেই সমাজের জীবন-রস পড়লো মাটির টানে বাঁধা। ক্রমে তাদের মানস-সংস্কৃতিও গড়ে উঠলো এই পরিবেশকেই ভিত্তি করে। তার ছোঁয়াচ্ আমরাও এড়াতে পারিনি। আজও আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ধান, ধানের গোছা, দূর্বা, কলাগাছ প্রভৃতি একটা জায়গা জুড়ে আছে। আসলে এ গুলো আমাদের সেই আদিম অধিবাসী অষ্ট্রিকদেরই কৃষি-সভ্যতা ও কৃষি-সংস্কৃতির স্মৃতি বহন করে এনেছে।

তাম্রযুগ:

পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে করতে লোকে তামার ব্যবহার শিখলো। এই সময় ভারতে আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়। এরা দ্রাবিড় নামে পরিচিত। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ স্থির করলেন যে ভারতবর্ষই দ্রাবিড়জাতির প্রাচীন বাসস্থান এবং এরাই খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগে বাবিরূষ (Babylon) অধিকার করে বাবিরূষ ও আসুরের (Assyria) প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। কাজেই দ্রাবিড়রা যে একটা সুসভ্য জাত, অনায়াসেই তা' বলা চলে।

এই দ্রাবিড়রাই ভারতে যব আর গম চাষের প্রথম প্রবর্তক। এরা সোনা, তামা, ব্রঞ্জ, কাঠ প্রভৃতির ব্যবহার জানতো। তারা ছিল খুব ভাল কারিগর। কেননা দ্রাবিড় ভাষার 'কর্মার' শব্দ থেকেই বাংলায় 'কামার' শব্দ এসেছে। কাজেই চাষের জন্য যে তারা অনেক উন্নত যন্ত্র-পাতি আবিষ্কার করতে পেরেছিলো, তা' বললে বোধহয় অসঙ্গত হবে না। চাষের ধাতব যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রথম আবিষ্কার হচ্ছে কোদাল। এই কোদাল সম্ভবতঃ দ্রাবিড়রাই তৈরী করে। জলসেচনের উন্নততর চাষের ব্যবস্থা প্রভৃতি সব কিছুই দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনপ্রবাহেরই ফল। গোরুর গাড়ীও দ্রাবিড়রাই প্রথম তৈরী করে। এই সভ্যতার যুগে এখন অনেক রকম যান-বাহন আবিষ্কার হলেও এই গোরুর গাড়ী আজও চাষীর একমাত্র সম্বল।

দ্রাবিড়রা পশুপালনও করতো। গোরু, মহিষ, মেষ, হাতী, উট, শুকর, ছাগল, মুরগী, ঘোড়াও কুকুর ছিল দ্রাবিড়দের গৃহপালিত জন্তু। সিন্ধু সভ্যতার যুগের মহেন-জো-দড়ো ও হরাপ্পার ধ্বংসাবশেষে কৃষির উৎকর্ষের যে সব পরিচয় পাওয়া গেছে, তা দ্রাবিড়দেরই কীর্তি।

সিন্ধু-সভ্যতা

ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা বলতে আগে বৈদিক সভ্যতাকেই বুঝাতো। কিন্তু সিন্ধুপ্রদেশে সারকানা জেলার মহেন-জো-দড়োতে এবং

পশ্চিম পাঞ্জাবে মণ্টগোমারি জেলার হারাপ্পাতে মাটিরতলা থেকে যে দুইটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসস্তূপ বেরিয়েছে, তা এই প্রচলিত ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে। ঋক্‌বেদের যুগকে সাধারণতঃ খৃষ্টের জন্মের দেড় থেকে দুই হাজার বছর আগে বলে ধরা হয়। এই দুই ধ্বংসস্তূপ থেকে বোঝা যায় যে খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে এই শহরগুলি বিদ্যমান ছিল।

মহেন-জো-দড়ো কথার অর্থ সিন্ধী ভাষায় 'মৃতের স্তূপ'। আর এটি হচ্ছে সিন্ধুনদীর তীরে অবস্থিত। মহেন-জো-দড়ো আবিষ্কারের কিছুদিন পরে রাবী নদীর তীরে হারাপ্পায় আর একটি ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়। মহেন-জো-দড়ো থেকে হারাপ্পার দূরত্ব প্রায় চারশ' মাইল। তা' সত্ত্বেও এই দুই জায়গায় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রচুর মিল আছে। সিন্ধুনদ ও তার উপনদীগুলির তীরে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। সেজন্য বলা হয় একে সিন্ধুসভ্যতা।

মহেন-জো-দড়ো অঞ্চলে পুরাবৃত্ত উদ্ধারের জন্য যে খনন কার্য্য হয়েছে, তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বৈদিকযুগের বহু আগে থেকেই ভারতে কৃষি কার্য্যের প্রচলন ছিল। এই স্থানের ভূগর্ভ থেকে কিছু কিছু ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য পাওয়া গেছে। তা থেকে জানা যায়, এই যুগে যবই ছিল লোকের প্রধান খাদ্য। যে সব জাতের গম ও যবের এই সময় চাষ হত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে, ঠিক সেই রকম গমও যবই এখন পাঞ্জাবপ্রদেশে উৎপন্ন হয়। ভূগর্ভ থেকে খেজুরের মতো কোন ফলের চিহ্ন ও পাওয়া গেছে। তা থেকে বুঝা যায় যে খেজুর বা খেজুরের মতো একরকম গাছও এই সময় ছিল, আর সে-সময়ের লোকে তার ফল খেত। জানা যায় যে এই সময় লোকে তুলার ব্যবহারও করতো। কাজেই তুলার চাষও যে এই সময় করা হ'ত, তা' বলা চলে।

উপসংহার

উপরে বর্ণিত বিষয় থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ভারতের আদিম বাসিন্দা অষ্ট্রিক ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী যে মাটির টানে আমাদের জীবনকে বেঁধে দিয়েছিলো, তার ওপর ভিত্তি করেই আমাদের এই সুদীর্ঘকালের জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছে। এদেশ আজও কৃষিপ্রধান, আর এখানকার বেশীরভাগ লোকই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। পরবর্ত্তী যুগে আর্য্যরা এসে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় এই দুই সভ্যতাকে নিজের করে নিয়ে যে নতুন সভ্যতা গড়ে তুললো, তারও বাহন হ'ল চাষ-বাস।

আজ এ যুগের লোকের দিকে তাকালে সুদূর অতীতের কত বিস্মৃত মুখ মনে পড়ে। হিংস্র জন্তুর আবাস, ঝোড়জঙ্গল পরিষ্কার করে যারা মাটির বুক চিরে ফসল ফলানোর পন্থা দেখায়, যারা প্রথম বনচারী মানুষকে গৃহবাসী করে গড়ে তোলে, সেই আদিবাসীদের কথা মনে হলে গভীর কৃতজ্ঞতায় প্রাণমন ভরে ওঠে। আজ কত বছর অতীত হয়ে গেছে, নতুন যুগে নতুন রূপে আবার নতুন মানুষ দেখা দিয়েছে, কিন্তু আদিবাসীদের ছাপ এখনও তার অঙ্গের ভূষণ। যে জাত দীন দরিদ্র অসহায় আদিবাসীর পর্ণকুটীরে জন্ম নিলো, আজ তা ক্রম-বিবর্ত্তনের ভেতর দিয়ে বিরাট মহীরুহরূপে পরিণত হয়ে উঠলেও চাষ আবাদই আজও সে দেহের প্রাণরস হয়ে আছে।

শ্রীকালহস্তী বা ত্রিকালহস্তী

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—

ত্রিমলয় দেখি' গেলা ত্রিকালহস্তী স্থানে।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিল প্রণামে॥[১]

মহাপ্রভু তিরুপতি-তিরুমলয় হইতে শ্রীকালহস্তী বা ত্রিকালহস্তীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই স্থানের নাম 'ত্রিকাল-হস্তী' দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিগণ ইহাকে 'শ্রীকালহস্তী' বলেন। স্কন্দপুরাণে সুবর্ণমুখরী নদীর তীরে 'কালহস্তী' নামক মহাদেবকে শ্রীঅর্জুন দর্শন করিয়াছিলেন,—এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তথায় শ্রীকালহস্তী বা ত্রিকালহস্তী শব্দের পরিবর্তে 'কালহস্তী' শব্দ দৃষ্ট হয়।[২] হয়ত তির (=শ্রী) কালহস্তী হইতে ত্রিকালহস্তী নাম হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন, এই স্থানে 'শ্রী' গৌরব-সূচক নহে। 'শ্রী' অর্থে ঊর্ণনাভ বা মাকড়সা। স্থলপুরাণের বর্ণনানুসারে শ্রীকালহস্তী শব্দের দ্বারা শ্রী=মাকড়সা, কাল=সর্প, হস্তী=গজ—এই তিন ভক্তমূর্তির অধীশ্বর মহাদেবকে বুঝায়। অতি প্রাচীনকালে এই স্থানে কোন মন্দিরাদি ছিল না; তখন এই শিবলিঙ্গকে শ্রী অর্থাৎ মাকড়সা তাহার জালের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া লিঙ্গের সেবা করিত। কাল অর্থাৎ সর্প মহাদেবের মস্তকের মণি রক্ষা করিত। হস্তী মহাদেবের মস্তকোপরি বিল্বপত্র স্থাপন করিয়া শুণ্ডের দ্বারা জল সেচন করিত। এই তিনজনই মহাদেবের ভক্ত। ভক্তত্রয়ের নামানুসারে ঈশ্বরের নাম হইল শ্রীকালহস্তী। এখানে মহাদেবের মন্দিরে পার্শ্বদেবতাগণের মধ্যে পঞ্চ লৌহ নির্ম্মিত ঊর্ণনাভ, সর্প ও হস্তীর মূর্তি অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিংবদন্তী এই যে, ঊর্ণনাভ, সর্প ও হস্তী মহাদেবের ঐরূপ সেবা করিতেছিল। একদিন সর্প দেখিতে

১। চৈ, চ, ম, ৯।৭১। ২। স্কন্দপুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, সন ১৩১৮) বিষ্ণুখণ্ড বেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য ৩০শ অধ্যায় ১৩-১৪ শ্লোক এবং প্রেমামৃতম্ ৬।২২ শ্লোক।

পাইল যে, মহাদেবের মস্তক হইতে মণিটি নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। সর্প ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য লুকাইয়া থাকিল এবং ক্রমে দেখিতে পাইল যে, হস্তী লিঙ্গোপরি বিল্বপত্র স্থাপন ও জলসেচন করিবার সময় মণিটি ঐরূপ ভাবে পড়িয়া যায়। ইহাতে সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তীর শুণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহাকে দংশন করিল। হস্তী বিষের জ্বালায় জর্জরিত হইয়া সর্পকে শুণ্ডের মধ্য হইতে বাহির করিবার জন্য শুণ্ডকে শিবলিঙ্গের উপরে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। ইহাতে উর্ণনাভ, চত্বর ও ধ্বজস্তম্ভ। এই স্তম্ভ সাধারণতঃ 'ঈশ্বর স্তম্ভ' নামে খ্যাত। দক্ষিণা মূর্তির সম্মুখভাগে আর একটি স্তম্ভ। এই স্থান 'দক্ষিণ কৈলাস' নামে খ্যাত। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন যে, কাশীতে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয়। কিন্তু শ্রীকালহস্তীতে প্রবেশমাত্র মুক্তিলাভ হয়। এই মন্দিরের বহির্ভাগে একটি গোপুরম্ এবং অভ্যন্তরে একটি গোপুরম্। এতদ্ব্যতীত আরও একটি গোপুরম্ আছে। উহা কেবল উৎসবের সময় ব্যবহৃত হয়। এই মন্দির অতিশয় বিরাট, বিশাল ও বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত। প্রথম

শ্রীকালহস্তী
(শ্রী=মাকড়সা, কাল=সর্প ও হস্তীর দ্বারা সেবিত শিবলিঙ্গ)

সর্প ও হস্তী একসঙ্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শিব এই তিন ভক্তকে মোক্ষ দান করিলেন এবং ভক্তত্রয়ের নামানুসারে 'শ্রীকালহস্তী' নামে বিখ্যাত হইলেন।

এ স্থানে আর একটি শিবভক্তের বৃত্তান্ত বিশেষ ভাবে প্রচারিত আছে। কান্নাপ্পা নাম এক শিবভক্ত ব্যাধ সমস্তই শিবের নিকট উৎসর্গ করেন। শিব কান্নাপ্পার ভক্তির অকৃত্রিমত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য একটি লীলা করিলেন। শিবের একটি চক্ষু হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিল। তাহা দেখিয়া কান্নাপ্পা তাঁহার একটি চক্ষু বাণের দ্বারা উৎপাটন করিয়া শিবকে অর্পণ করিলেন। তখন শিবের অন্য চক্ষু হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে কান্নাপ্পা শিবলিঙ্গের উপর নিজপদ স্থাপন করিয়া (পাছে উভয় চক্ষুই নষ্ট হইয়া গেলে শিবকে দেখিতে না পান) অন্য চক্ষুটি পুনরায় বাণের দ্বারা উৎপাটন করিয়া (ধনুর্বাণ ধারণে দুই হস্ত নিযুক্ত থাকায় শিবের উপর পদস্থাপন ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না) শিবলিঙ্গের উপর তাহা অর্পণ করিল। তখন শিব কান্নাপ্পাকে মোক্ষ দান করিলেন। তদবধি কান্নাপ্পা শ্রীকালহস্তী-শিবলিঙ্গের সন্নিকটে বিরাজমান আছেন। শ্রীকালহস্তী-লিঙ্গের গর্ভমন্দিরের সংলগ্ন অব্যবহিত পরের প্রকোষ্ঠে ধনুর্বাণ-ধৃক্ কান্নাপ্পার মূর্তি অধিষ্ঠিত আছে। উর্ণনাভ, সর্প ও হস্তী মন্দিরের পার্শ্বদেবতারূপে এবং গর্ভমন্দিরের মধ্যেও শ্রীমহাদেবের লিঙ্গ' স্বরূপের অন্তর্ভুক্তরূপে অধিষ্ঠিত আছে। সেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মস্তকোপরি সর্প, তৎপরে কান্নাপ্পার নেত্র, তৎপরে হস্তীর দন্ত ও তন্নিম্নে উর্ণনাভের জাল উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। কেবল লিঙ্গের অভিষেকের সময়ই ঐ সকল চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অন্য সময় লিঙ্গ রৌপ্যকবচের দ্বারা আবৃত থাকে।

শ্রীকালহস্তী-মহাদেব বিমানের অভ্যন্তরে পশ্চিমাভিমুখী। বিমানের পর জগমোহন, নাটমন্দির। নাটমন্দিরে বৃষবাহন, তৎপরে বিরাট কুলত্তুঙ্গ চোলরাজ[১] এই মন্দির ও গোপুরম্ নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বহির্ভাগের বৃহৎ গোপুরমটি কোন দেবদাসীর অর্থানুকূল্যে বহু শত বৎসর পূর্বে নির্মিত বলিয়া কথিত হয়। মন্দিরটি বর্তমানকালে বৈদ্যুতিকমালায় ভূষিত হইয়াছে। প্রখর সূর্যোত্তাপকালেও মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব ও অভ্যন্তর আলোক ব্যতীত অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। গর্ভমন্দির ব্যতীত সর্বত্রই বৈদ্যুতিক আলোকমালা দৃষ্ট হয়। গর্ভমন্দিরে বহু ঘৃত প্রদীপ ও তৈল প্রদীপ দিবারাত্র প্রজ্জ্বলিত থাকে।

এই স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গটি পঞ্চবিধ লিঙ্গের অন্যতম বায়ুলিঙ্গ। এখানে চতুষ্কোণাকৃতি বায়ুরূপী মহাদেব বিরাজমান। কোন দিক্ দিয়াই বায়ুপ্রবেশের পথ নাই ; অথচ শিবলিঙ্গের মস্তকোপরি যে দীপালোক জ্বলিতেছে, তাহা সর্বদাই ঈষৎ দোদুল্যমান। কিন্তু অন্যান্য দীপগুলি একটুও আন্দোলিত হয় না। বিমানস্থ ঐ প্রদীপটি এই স্থানে স্বয়ম্ভু বায়ুলিঙ্গের নিত্য অধিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া প্রদর্শিত হয়। স্থলপুরাণের মতে এখানে ব্রহ্মা কৈলাসপর্বতের একটি শৃঙ্গ আনয়ন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। বায়ুলিঙ্গ শিবমন্দিরের দক্ষিণে মণিকুণ্ডেশ্বর নামক আর একটি শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার দক্ষিণে চতুরানন ব্রহ্মার মূর্তি ও মন্দিরের কোণে একটি সরোবর। তৎপার্শ্বে ভরদ্বাজ-আশ্রম।

১। প্রথম কুলত্তুঙ্গ চোলরাজ একজন গোঁড়া শৈব ও শ্রীরামানুজাচার্যের সমসাময়িক ছিলেন। এই শৈবরাজই শ্রীরামানুজাচার্যের চক্ষু উৎপাটন করিবার চেষ্টা করেন। প্রথম কুলত্তুঙ্গ ১১১৮-২০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

—(History of Tirupati—Vol 1 by Dr. S. Krishnaswami Aiyangar, Madras 1940, pp 274-75)

কৈলাসগিরি নামক পর্বতের পাদদেশে শ্রীকালহস্তীর বর্তমান মন্দিরও গোপুরম্‌ ও দক্ষিণা মূর্তি ধ্বজস্তম্ভ। তুম্বীপুষ্প নামক একপ্রকার শ্বেতবর্ণের পুষ্প (আকার অনেকটা বকুলফুলের মত ; উহাতে লিঙ্গ ও গৌরীপট্টের চিহ্ন আছে) এই স্থানে পাওয়া যায়। এই পুষ্পের মালা শ্রীকালহস্তি মহাদেবের বিশেষ প্রিয়। গোপুরমের বহির্ভাগে বাজারে এই পুষ্পের মালা কিনিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের অভ্যন্তরে পরিক্রমার পথে অসংখ্য পার্শ্বদেবতা, শিবভক্ত ও শিবলিঙ্গসমূহ বিরাজমান। নিম্নে যথাক্রমে তাহাদের নামমাত্র উল্লেখ করা হইল। মন্দির প্রদক্ষিণকালে ক্রমে এই দেবতাগণ দৃষ্ট হয়। (১) গণপতি, (২) সরস্বতী তীর্থ (অতিশয় গভীর কূপ ; ইহার জল সেবনে মূকত্ব দূর হয় বলিয়া কথিত), (৩) সম্মুখ সুব্রহ্মণ্যদেব (কার্তিক), (৪) উৎসবমূর্তি (শ্রীকালহস্তী, পার্বতী, কার্তিক, কান্নাপ্পা, গণেশ দক্ষিণামূর্তি), (৫) ধ্বজস্তম্ভ, (৬) বালসুব্রহ্মণ্য (৭) কাশীলিঙ্গ, (৮) রামেশ্বরলিঙ্গ, (৯) কান্নাপ্পা (প্রমাণাকার প্রস্তরমূর্তি), (১০) বল্লভগণপতি, সিদ্ধিগণপতি, মোক্ষগণপতি, (১১) বলরাম ও কৃষ্ণ লিঙ্গস্বরূপে, (১২) বেঙ্কটেশ্বর বালাজী, (১৩) থামলিঙ্গেশ্বর, (১৪) শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীরাম, শ্রীআঞ্জনেয় লিঙ্গস্বরূপে, (১৫) পরশুরাম লিঙ্গস্বরূপে, (১৬) শমি, (১৭) সপ্তর্ষি প্রতিষ্ঠিত সপ্তলিঙ্গ, (১৮) বালগণপতি, (১৯) কণকদুর্গা, (২০) চিদাম্বরম্‌ নটরাজ, (২১) ৬৩ জন তামিল দেশীয় শিবভক্তের পঞ্চলৌহ-নির্মিত মূর্তি, (২২) শ্রীকালহস্তী (পঞ্চলৌহ নির্মিত মূর্তি), (২৩) ভরদ্বাজ ঋষি, (২৪) শ্রীকালী, (২৫) মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ, (২৬) কালভৈরব, (২৭) বাটলভৈরব, (২৮) নাগকন্যকা, (২৯) দেবকন্যকা, (৩০) পার্বতী দেবী, (৩১) আক্কান্না ও মাদান্না নামক রামভক্তদ্বয় প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ, (৩২) প্রসন্নকালহস্তীশ্বর (লিঙ্গস্বরূপ), (৩৩) পঞ্চক্ষেত্রস্থ পঞ্চ লিঙ্গ (ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়ু, (মরুৎ) ও ব্যোমলিঙ্গ), (৩৪) আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত স্ফটিক লিঙ্গ, (৩৫) যমদূতগণ, (৩৬) সহস্রালিঙ্গেশ্বর (একটি শিবলিঙ্গে সহস্রালিঙ্গস্বরূপ), (৩৭) চিত্রগুপ্ত, যমরাজ ও ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গত্রয়। (৩৮) মৃত্যুঞ্জয় স্বামী ও (৩৯) দক্ষিণা মূর্তি ইত্যাদি।

(১) সিংহাসন, (২) অধিকারী নন্দীশ্বর, (৩) সূর্যপ্রভা (৪) রাবণাসুর, (৫) ভূতকি (রাক্ষস), (৬) শুকপাখা (৭) কামধেনু এবং রৌপ্যনির্মিত বাহনের মধ্যে নন্দীবাহন, হস্তী, হংস, নাগ, ময়ূর, সিংহ, অশ্ব, ইন্দ্র বিমান ও শিবিকা প্রসিদ্ধ।

শ্রীকালহস্তি মন্দিরের ব্যবস্থা ও পরিচালনা দেবস্থানবোর্ড গ্রহণ করিয়াছেন এবং বোর্ডের নিযুক্ত পি, কুমার স্বামী পিল্লাই নামক একজন বেতনভুক্‌ ট্রাষ্টীর অধ্যক্ষতায় ইহা পরিচালিত হইতেছে। মন্দির প্রাতঃ ৭৷৷০টা হইতে বেলা ১২টা ও তৎপরে অপরাহ্ণে ৪৷৷০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বেলা ৯—১০টা, ১২টা ও অপরাহ্ণ ৬৷৷০টায় শিবলিঙ্গের অভিষেক দর্শন হয়। এখানে মহাশিবরাত্রি উৎসবই সর্বপ্রধান উৎসব। ইহা বহুলা দশমী হইতে আরম্ভ হইয়া বার দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পৌষ-সংক্রান্তির সময়ও একটি উৎসব হয়। তখন উৎসবমূর্তি শিবিকা-বাহনে করিয়া কালহস্তি-পর্বতের চতুর্দিকে বিজয় করেন। মহাদেবকে অন্নাদি ভোগ দেওয়া হয়। মন্দিরে প্রবেশের নির্দিষ্ট দর্শনী আছে। তাহা সকলকেই দিতে হয়। জনপ্রতি এক আনা এবং দশ বৎসরের নিম্ন বালক বালিকাগণের প্রবেশ ফি দুই পয়সা।

সুবর্ণমুখরী নদী

সুবর্ণমুখরী নদীর আবির্ভাব সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে [১] এইরূপ বর্ণনা আছে। মুনিবর অগস্ত্য মহাদেবের আদেশে পৃথিবীর সমতা সম্পাদনার্থ বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে উপনীত হইলে পৃথিবী সমতা লাভ করিল। তখন তিনি এক অতি উচ্চ পর্বতকে পৃথিবীর উপর ভার ন্যস্ত করিয়া তাহার শিখরে অবস্থানপূর্বক শিবের আরাধনা করিতে থাকেন। তখন হইতে ঐ পর্বত "অগস্ত্যশৈল" নামে বিখ্যাত হইল। এক দিবস শ্রীঅগস্ত্য শ্রীশিবের আরাধনাকালে আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন—'এই প্রসিদ্ধ দেশ নদীহীন হওয়ায় শোভা পাইতেছে না। অতএব লোকহিতের জন্য কোন এক নদীর প্রতিষ্ঠা কর।' এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত অগস্ত্যের সম্মুখে উপস্থিত হন। মুনিবর অগস্ত্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন—'হে ব্রাহ্মণ ! এই দেশ নদীহীন দেখিয়া অর্থজ্ঞান-হীন বেদপাঠের ন্যায় আমার মন অত্যন্ত খিন্ন হইয়াছে, হে দেবেশ ! এক্ষণে পৃথিবী পবিত্র ও রক্ষা করিতে সমর্থ এইরূপ একটি মহানদীই আমার অভীষ্ট। অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।' ব্রহ্মা অগস্ত্যের অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইয়া মনে মনে সুরনদীকে স্মরণ করিলেন। তখন দীপ্তিমতী আকাশ গঙ্গা ব্রহ্মার অগ্রে উপনীত হইয়া বদ্ধাঞ্জলি পূর্বক উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে গঙ্গে। আমি যেমন লোক-রক্ষায় নিযুক্ত আছি, আমার ন্যায় তোমাতেও লোকরক্ষাভার নিত্য ন্যস্ত আছে। সম্প্রতি মহর্ষি অগস্ত্য এই নদীহীন দেশে একটি নদী প্রার্থনা করিতেছেন। তুমি নিজের এক অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমার প্রদর্শিত পথে বসুধাতলে গমনপূর্বক লোক সকল পবিত্র কর। অনন্তর আকাশগঙ্গা অগস্ত্য সমীপে স্বীয় শরীরোৎপন্ন এক দিব্যমূর্তি কল্পিত করিয়া মুনিবরকে বলিতে লাগিলেন—আমার এই অংশই বসুধাতলে গমনপূর্বক নদীরূপ ধারণ করত আপনার অভীষ্ট পূরণ করিবে। তখন গঙ্গার এক অংশ প্রসিদ্ধ প্রবাহে পরিণত হইয়া অগস্ত্যের অভিলষিত দেবগণ মহর্ষি অগস্ত্যের পশ্চাদ্গামিনী মহানদীর অনুগমন করিয়া উক্ত নদীর সেবা করিতে লাগিলেন। বায়ুদেব ব্রহ্মার আদেশে বলিতে লাগিলেন—এই মহানদী সুবর্ণের ন্যায় নিখিল লোকের ভাগ্যলব্ধ এবং মহর্ষি অগস্ত্য দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া ইহাকে ভূতলে লইয়া যাইতেছেন। অতএব সর্বলোকবন্দিত এই নদী "সুবর্ণমুখরী" নামে বিখ্যাত হইবে।

তিরুপতি হইতে ২২ মাইল উত্তর পূর্বদিকে স্বর্ণমুখরী নদীর (নামান্তর জীব নদীর) তটে 'শ্রীকালহস্তী' শিবক্ষেত্রে বিরাজমান। গুডুর কাটপাড়ী শাখা-লাইনে (M+S. M. R.) কালহস্তী ষ্টেশন। তিরুপতি হইতে কালহস্তীতে সর্বদাই মোটর-বাস যতায়াত করে। পূর্বে এই স্থান উত্তর-আর্কট জেলার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে ইহা (Chittor) জেলার অন্তর্ভুক্ত। রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম কালহস্তী (Metre-gunge)। ষ্টেশন হইতে শ্রীকালহস্তীর মন্দির প্রায় দুই মাইল। ইহা একটি পার্বত্য নগর।

১। স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্য ৩১—৩৩ অধ্যায়। (বঙ্গবাসী সং ১৩১৮ বঙ্গাব্দ)

রবীন্দ্রকাব্যে মানুষ

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

রবীন্দ্রকাব্যে নশ্বর মানবজীবন এক সম্পূর্ণ নূতন অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমরা সাধারণ মানুষ—জীবনকে দেখিতে অভ্যস্ত ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া। সমগ্ররূপে দেখিতে পারি না বলিয়াই জীবনের অর্থ আমাদের নিকট এত সঙ্কীর্ণ, এত সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে আমরা একটু অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক—"আপনারে শুধু ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।" আমাদের দুঃখসুখ, বাসনাকামনা নিতান্তই ব্যক্তিগত,—বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাহাদের ব্যাপ্ত, বিকীর্ণ করিয়া দিতে পারি না ইহাই সকল অনর্থের মূল। মানবজীবনকে বৃহতের পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া দেখিলে আপাতদৃষ্টিতে যে সৃষ্টিকে অর্থহীন, নির্মম, অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে হয় তাহার মধ্যে একটি সুগভীর তাৎপর্য, অন্তর্লীন সুষমা ও অপূর্ব সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়। তখন জগতের ধূলিকণাটুকুও মধুময় হইয়া উঠে—মধুমৎপার্থিবং রজঃ—ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনাকে বিশ্বব্যাপারের সহিত সংযুক্ত ও বিধৃত করিয়া মানবাত্মা সম্প্রসারিত হইয়া একটা উদার মুক্তি ও অসীম তৃপ্তির সন্ধান পায়। তখন মনে হয় ধরণীর লেশতম স্থানও তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্রতম প্রাণও নগণ্য নয়!

> To me the meanest flower that blows
> Can give thoughts that lie deep for tears.

রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনকে আমাদের মতো খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি অখণ্ড, সর্বাত্মক। এই জন্য তাঁহার নিকট জীবনের অর্থ গূঢ়, গভীর, মহান্‌।

শুধু মানবজীবন নয়—মানুষ নিজেও রবীন্দ্রকাব্যে এক অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দীনতা, নশ্বরতা, অসম্পূর্ণতা পূর্ণের পদস্পর্শে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ধরণীর ধূলি হইতে মানুষকে কবি এক ঊর্দ্ধলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিয়াছেন, মাটির দুলাল হইয়াও তাই সে বলিতে পারে—

> ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলিপরে,
> জেনেছি ভাই ব'লে জগত চরাচরে।

দুঃখবেদনা, জরামৃত্যু মানুষের নিত্যসহচর বটে, কিন্তু তবু জীবনের এই অনিবার্য ঘটনাবলীর ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে তাহার স্থান।

> আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে
> যাবো আমি চলে।

অমৃতপিপাসু মানুষের কণ্ঠে এই মহাবাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে সে আমাদের মত শুধু ক্ষুধাতৃষ্ণাপীড়িত, দুঃখশোক জর্জ্জরিত, মৃত্যুভীত এক অসহায় জীব নয়। সে যেন ইহ-জীবনের সকল ক্ষুদ্রতা নীচতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া জ্বলন্ত জীবন-সত্যকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়াছে। মরণের বেলাবালুকায় বসিয়াও তাই সে অবিনশ্বর মানবাত্মার জয়গীতি গাহিয়া উঠে।

> মহাম্বুধি যেই মত বাণীহীন স্তব্ধ ধরণীরে
> বাঁধিয়াছে চতুর্দ্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে
> তেমনি আমার ছন্দ ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে,
> গাবে যুগযুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
> দিক্ হ'তে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,
> ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্য্যাদা করি' দান।

এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথ যে-মানুষের স্তবগান গাহিয়াছেন সে আমাদের মত মানুষ নয়—মহামানব। কোনো বিশেষ দেশকাল ও সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে না ফেলিয়া মানুষের কল্পনা করা আমাদের পক্ষে একরূপ দুঃসাধ্য। কিন্তু কবিকল্পিত মহামানবের কোনো সুনির্দ্দিষ্ট ভৌগলিক অস্তিত্ব নাই,—সে কোনো সম্প্রদায়ের পতাকাবাহী নয়। সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে যেমন উঁচু ও নীচু কোন বস্তুর মধ্যে প্রভেদটুকু আর ধরা পড়ে না, বিরাটের পট-ভূমিকায় মানুষকে দেখিবার ফলে কবির চোখে দেশকাল ও সম্প্রদায়গত প্রভেদটুকুও ঠিক সেইরূপ অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উগ্র দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ হইতে যেরূপ সঙ্কীর্ণ মানবপ্রীতির উদ্ভব হয়, রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেমকে ঠিক্ তাহার সগোত্র বলিয়া মনে করিলে নিতান্ত অন্যায় হয়।

> সব ঠাঁই মোর ঘর আছে
> আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া

এই বসুধৈব কুটুম্বকম্ মনোভাব, উদার বিশ্বমৈত্রী এবং সকল ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ মানবতাকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস প্রকৃতপক্ষে একটা Abstract ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। Concrete এর পরিধি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ। সুতরাং এইরূপ বিশুদ্ধ মানবপ্রেম Abstract হইতে বাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ রবীন্দ্রকাব্য-লোকের মানুষ শুধু Abstraction নয়—অশরীরী আত্মা বলিয়া প্রতি-ভাত হয়। এই সূক্ষ্ম ছায়াশরীরী জীবের মধ্যে শরীর ধর্মের এতই অভাব ও হৃদয়বৃত্তিগুলির এতই প্রাধান্য যে, সে সাধারণ দেহসর্বস্ব মানুষ হইতে রীতিমত স্বতন্ত্র। ব্রাউনিঙ্ যাহাকে Fleshly perfection of the

soul বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যসৃষ্ট মানুষের ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ মূল্য দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মানুষের পরিপূর্ণ জৈবিক বিকাশের জন্য দেহ ও আত্মা উভয়েরই সমান প্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে যে-মানুষের সাক্ষাৎ পাই তাহার একমাত্র অবলম্বন—আত্মা। অচ্ছোদসরসী নীরে যে-নারী অবগাহন করিতে নামিয়াছিল তাহার—

অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে, তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্রে, ললাটে অধরে
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।

এ চিত্র কোনো কল্পলোকচারিণী ছায়াশরীরিণী নারীর নয়—স্থূল রক্ত-মাংসের জীবের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই মোহিনীকে দেখিয়া কার্মুক নিক্ষেপ করা থাক্—

পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজাউপচার
তূণ শূন্য করি'।

মকরকেতনের এই আকস্মিক ভাবপরিবর্তনের ফলে যৌবনচঞ্চলা জীবন্ত নারী হইয়া উঠিয়াছে মানসলোকচারিণী সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী; Concrete হইয়া উঠিয়াছে Abstract—বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে নির্বিশেষ। বলা বাহুল্য, ইহাই কবির স্বভাবধর্ম।

রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড় মানবের পূজারীকে বুর্জোয়া বলিয়া উপহাস করিবার একটা জঘন্য মনোবৃত্তি আজকাল অনেক অজাতশ্মশ্রু বালকের মধ্যেও লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইতে হয়। সম্ভবতঃ ইহাদের ধারণা, মানবপ্রেমিক হইবার একমাত্র উপায় 'দরিদ্রয়ানা' দেখাইয়া নোংরা রাবিশও আস্তাকুঁড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠা। ফ্যাশানের খাতিরে কোনো বিশেষ মতবাদের লেবেল আঁটিয়া প্রচারধর্মী কাব্যসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত না হইলেই কাহাকেও উন্নাসিক বুর্জোয়া বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রীতির মর্ম উপলব্ধি করিলে এইরূপ মনোবৃত্তিকে মহামিথ্যা বলিয়া মনে হয়।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

ইহা কি বুর্জোয়া মনোভাবের অভিব্যক্তি? কবির কাঁচা হাতের রচনা 'কবিকাহিনী'তেও তাঁহার অকৃত্রিম মানবপ্রীতি লক্ষণীয়—

অত্যাচার গুরুভারে হয়ে নিপীড়িত,
সমস্ত পৃথিবী দেব, করিছে ক্রন্দন!
সুখশান্তি সেথা হতে লয়েছে বিদায়!
কবে দেব, এ রজনী হবে অবসান?
স্নান করি' প্রভাতের শিশির সলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী!

অথবা—

কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস!
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা,
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার!

ইহাকে যদি গজদন্তমিনারচূড়াশ্রয়ী কবির রচনা বলিয়া কাহারো মনে হয়, তবে তাহার নিঃসীম মূঢ়তায় হতবাক্ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। অবশ্য যদি দৈবক্রমে অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করাটাই কাহারো নিকট মহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় তবে সে কথা স্বতন্ত্র।

আজকাল শ্রেণীগত সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরার ফলে একপ্রকার কৃত্রিম মানবপ্রেমের উদ্ভব হইয়াছে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রকাব্যে কেহ যদি ঠিক্ এইরূপ মানবপ্রেম খুঁজিয়া না পাইয়া কবিকে বুর্জোয়া বলিয়া অভিহিত করিতে চায় তবে সেই হাস্যকর প্রচেষ্টা কবির নিজের ভাষায় "ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যাওয়ার" সহিত একমাত্র অতুলনীয়। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, শ্রেণীগত সংঘর্ষজাত মানবপ্রেম অধিকাংশক্ষেত্রেই অকৃত্রিম নয়। এবং এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইরূপ মানবপ্রেম Dignified animality ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহার মূল হিংসার মধ্যেই নিহিত।

Not the ruler for me, but the ranker, the tramp of the road,
The slave with the sack on his shoulders pricked on with the goad,
The man with too weighty a burden, too weary a load.

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুঁতোরের
মুটে মজুরের,
আমি কবি যত ইতরের।

উভয়ক্ষেত্রেই যে-মানবপ্রীতি উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আন্তরিকতার অভাব নাই সত্য, কিন্তু সে কোন্ মানব?—পদদলিত শোষিত নির্যাতিত মানব। ধিকৃত, লাঞ্ছিত, অসহায় একশ্রেণীর মানুষকে চিহ্নিত করিয়া কবি তাহাদের সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতেই হইবে যে ইহা পক্ষপাতিত্ব-শূন্য নয়—সমাজের বিশেষ একদল মানুষের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি হইতে এই মানবপ্রেমের উদ্ভব। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম আরো ব্যাপক—আরো, বিশাল; তাহার উৎপত্তি কবির অন্তরবাসী বিশ্বাত্মবোধ হইতে।

সূর্য্য যেরূপ সুদূর আকাশ হইতে ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচনির্বিশেষে সকলকেই অকৃপণভাবে আলোক বিতরণ করে, সার্থকনামা রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ জাতিধর্ম দেশকাল ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই প্রেম ও প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার ভালবাসা শুধু নিঃস্ব, সর্বহারা মানুষের নয়—সর্বকালের সর্বদেশের সর্বসম্প্রদায়ের মানুষের জন্য নিত্য উৎসারিত।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান ভার।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম; এ প্রেম যেরূপ বিশাল, সেইরূপ উদার ও অসাম্প্রদায়িক। এখানে Ruler এবং Rankerএর প্রশ্নই উঠে না।

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে দেখিয়াছেন খানিকটা দূর হইতে; সর্বসাধারণের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া 'দরিদ্রয়ানার' অভিনয় করেন নাই।

মাটির পৃথিবীপানে আঁখি মেলি যবে
দেখি, সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।

কবি এখানে নির্লিপ্ত দ্রষ্টার চোখে মানুষকে দেখিয়াছেন। এই নিরাসক্ত দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গিমা তাঁহার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। জীবনের খেলার মাঠে কবির ভূমিকা কোন্‌টি—খেলোয়াড়ের—না দর্শকের? তাঁহার পক্ষে Artistic detachment এর কতটুকু প্রয়োজন তাহাই বিবেচ্য বিষয়!

বাঙ্গালীর প্রাচীন সাজ-পোষাক

শ্রীগোপা নন্দী এম-এ

আমরা যেসব সাজ-পোষাক এখন ব্যবহার করছি, বাঙ্গালী হিসাবে চিরকালই কি তা' আমরা করে এসেছি—এই কথা জানবার জন্য স্বভাবতঃই আমাদের মনে কৌতূহল জন্মে।

প্রাচীন সাহিত্যে তার বহু চিত্র ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তা' থেকে আমরা জানতে পারি, আমাদের দেশে আগে যাঁরা বসবাস করে গেছেন তাঁদের প্রতিদিনের জীবনের কাহিনী। অবশ্য এই সুদীর্ঘকাল ধরে ধীরে-ধীরে অনেক পরিবর্ত্তন এসে গেছে। যা' হোক প্রাচীন সাহিত্য থেকে সংকলন করে আমাদের প্রাচীন সাজ-পোষাকের পরিচয় এখানে কিছু কিছু দেওয়া হ'ল।

প্রাচীন বাঙ্গালীর প্রধান বেশ-বাস ছিল পুরুষদের ধুতি, আর মেয়েদের শাড়ী। তবে হাঁটুর নীচে ধুতি পরার তখন রীতি ছিল। কাজেই এখনকার থেকে তখন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছোট ধুতি পরা হত। তবে মেয়েরা ধুতির মত খাটো শাড়ী পরতো না, গরীব লোকেরা ছোট ধুতি, ছোট খুঞা, শিমুর আঁশের এক রকম কাপড় এবং খোকড়ী মোটা কাপড় পরতো। শীতকালে দোপাট্টা ও পাছুরী গায়ে দিত। আজও যেমন, প্রাচীন কালেও তেমনি বাঙ্গালীর টুপি-জাতীয় কিছু ছিল না। নানা কায়দায় কেশবারি করা চুলই ছিল তাদের শিরোভূষণ। সেকালের মেয়েদের শৌখীনতাও কম ছিল না। আজ থেকে হাজার বছর আগে কবি রাজশেখর গৌড় দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন:

> বুকে তাদের চন্দন-পলা, গলায় সূত্রহার, সীঁথি পর্য্যন্ত টানা ঘোমটা অনাবৃত বাহুমূল, গায়ে অগুরুর প্রসাধন, রং যেন দূর্বাদলের মত শ্যামল সুন্দর—এই হচ্ছে গৌড় দেশের মেয়েদের বেশ।

আবার কবিচন্দ্র চন্দ্রপল্লীর মেয়েদের সাজসজ্জা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

> কপালে কাজলের টিপ। হাতে চাঁদের আলোর মত শাদা পদ্ম ডাঁটার বালা, কানে কচি রীঠাফুলের দুল, আর স্নিগ্ধ চুলের খোঁপায় তিলের পল্লব।

মেয়েদের শাড়ী ও পুরুষদের ধুতিতে অনেক সময় নানারকম নক্সা কাটা থাকতো। এই রকম নক্সা কাটা কাপড়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতক থেকে। সে সময় নানা রকমের মিহি কাপড়ও এদেশে ছিল। চুমকি-বসানো নক্সা-কাটা কাপড়ের খুব নাম ছিল। ১৩দশ শতকে বাংলাদেশে মেঘ, উদুম্বর, গঙ্গাসাগর, গাঙ্গোর লক্ষ্মীবিলাস, বাসবাসিনী, শিলহটী, পট্টাম্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা'

ছাড়া রেশমেরও কাপড় পাওয়া যেত। রেশমের কাপড়কে সে সময় বলা হত কৌষেয়, ক্ষৌম এবং পট্ট। মহাভারতে আছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন শত জাতিরা বহু বিচিত্র কীটজবস্ত্র উপহার দিয়াছিল। এই কীটজবস্ত্র হল রেশম। বাংলার এই রেশম একদিন য়ুরোপ ব্যবহার করে ধন্য হয়েছে। কারণ য়ুরোপ তখন কীট থেকে এই সুতা বের করতে জানতো না। আর একরকম কাপড়ের তখন বহুল প্রচার ছিল। তার নাম মসলিম। ঢাকা ছিল এই মসলিম তৈরীর কেন্দ্র। বাংলার নবাব আসিবেগ যখন ভারতবর্ষ থেকে পারস্যে ফিরে যান তখন একটি পাথরের ডিম তিনি পারস্য সম্রাটকে উপহার দেন। তার ভিতর ৬০ হাত দীর্ঘ একখানি মসলিন কাপড় ছিল।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপ নকল মসলিন তৈরী করলেও বাংলার মসলিনের সঙ্গে আশ্চর্য্য প্রভেদ রয়ে যায়। কলে তৈরী মসলিনের সুতার প্রত্যেক ইঞ্চিতে যেখানে গড়ে ৬০৮০৮ এবং ৫৬০৬ পাক দেওয়া হয়, সেখানে আসল মসলিনে হাতে পাক পড়ে ১১০০১ এবং ৮০০৭ বার। এই মসলিনের নানা রকম নাম ছিল—মলমল, বাস, সরকার, আলি ঝুনা, রঙ্গ, খাসা, শাবণম্, আলাবলী, সরবতী, জামদানী প্রভৃতি। একখানা কাপড়ের দাম তখনকার দাম অনুসারে ছিল ১০০৲। ১৫০৲ টাকা। শাবণম কাপড় রাতে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে রাখলে সকালে শিশিরের সঙ্গে ভিজে ঘাসের সঙ্গে মিশে যেতো। রোদে শিশির শুকিয়ে গেলে ক্রমশঃ কাপড় দেখা যেতো।

অলঙ্কার ব্যবহারেরও তখন বহুল প্রচলন ছিল। কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ূর, শংখবলয়, মেখলা প্রভৃতি অলঙ্কার মেয়েপুরুষে সমান ব্যবহার করতো। সোনা রূপোর গহনা ছাড়া মুক্তার হার, হীরাখচিত নানা রকম অলঙ্কার, রত্নখচিত ঘুঙুর, মরকত নীলকান্তমণি, চুণী প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল।

বড়লোকের বিয়েতে কি রকম সাজসজ্জা ও ধুমধাম হত তার উল্লেখ আছে নৈষধ চরিতে। প্রথমেই সধবারা মঙ্গল গীত গাইতে গাইতে বিয়ের কনেকে স্নান করাতেন এবং শুভ্র পট্টবস্ত্র পরাতেন। তারপর সঙ্গীরা পরাতেন কপালে মনঃশিলার তিলক, সোনার টিপ, চোখে পরাতেন কাজল, কানে মণিকুণ্ডল, গলায় সাতলহর, মুক্তের মালা, হাতে শাঁখা ও স্বর্ণবলয়, এবং পায়ে আলতা। বিয়ের জায়গায় মেয়েরা আলপনা দিতেন, শিল্পীরা অনেক রকম ছোপানো কাপড়ের তৈরী ফুলে নগরের রাস্তাঘাট সাজাতেন, আর বাড়ীর দেয়ালে আঁকতেন নানা রকমের ছবি। উৎসবের প্রধান বাজনা ছিল বাঁশী, বীণা, করতাল, আর মৃদঙ্গ।

জুতা পরার রেওয়াজ তখনও ছিল। তবে যোদ্ধা এবং পাহারাওয়ালা দারোয়ানদের মধ্যেই চামড়ার তৈরী জুতার প্রচলন ছিল বেশী। তাই বলে অন্য লোকে জুতো যে একেবারে পরতো না, তা' নয়। সাধারণ লোকের মধ্যে খড়ম পরার প্রচলন ছিল বেশী। সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের মধ্যে ও খড়মের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

বাংলার সেদিন আর নাই, সে সব সাজ-পোষাকও এখন ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে চলেছে। নবীন যুগে নতুন সভ্যতার ছোঁয়াচে আমরা দিন দিনই এখন নব নব সজ্জায় সজ্জিত হতে প্রয়াস পাচ্ছি। কিন্তু দেশের নিজস্ব ভঙ্গীর যে বৈশিষ্ট্য, পরাণুকরণের শত চাকচিক্যময় বেশভুষা ও তার স্থান পুরণ করতে পারে না।

তোমাকে

প্রভাকর মাঝি

অনেক দিয়েছি, অনেক পেয়েছি জানি,
আরো পেতে চাই প্রতিটি মুহূর্ত্তেই।
আজো অধরের তৃষ্ণা মিটে নি, রাণী,—
মনে হয় যেন এ পাওয়ার শেষ নেই।

তুমি জীবনের অন্ধকারের মাঝে
এক মুঠো আলো নিয়ে এলে কোথা থেকে।
আমার বীণাতে এক সুর শুধু বাজে,
এক তান যায় তোমাকেই ডেকে ডেকে।

কাছে এলে যেই সুরু হল উৎসব,
দূরে সরে গেল গ্রীষ্মের দাবদাহ।
এলো হাসি, গান, স্বপ্ন ও সৌরভ,
চলবার পথে আনন্দ—উৎসাহ।

তুমি কে? তুমি কে? তুমি কি পৃথিবীময়
শিশির-হাসিটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাও?
জানি না, জানতে চাই না তো পরিচয়;
শুধু প্রার্থনা—আরো দাও, আরো দাও।

হৃদয় উজাড়ি দিয়েছ তোমার প্রেম,
আমার কবিতা তোমাকে তাই দিলেম।

২৪

সে কথা শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পর ভগবতীও ভাবলেন —প্রচণ্ড শোকের আঘাত ধীরে ধীরে বুকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। যে বিচ্ছেদ আত্মহত্যার চিন্তায় অসহ্য হয়েছিল—কালের প্রলেপে তাও যেন দিনরাত্রির আবর্ত্তনের মত সহজ হয়ে এল। যা সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই—তা আঘাতের বেশে এসেও আপোষ-রফা করে নেয়। জীবনে আপোষ-রফা না থাকলে—মানুষ কবে শেষ হয়ে যেত। শোকের কুয়াশা কাটলে ভগবতী দেখলেন—পৃথিবী আগেকার মতই চলছে। দিন থেকে রাত্রি—আর রাত্রি থেকে প্রভাত স্বনিয়মে চলছে—ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হওয়ার বিধি একভাবে রয়েছে। উজ্জ্বল দিন থেকে খসে পড়েছে একটি নক্ষত্র—দিনের আলোয় লুকানো নক্ষত্র—সুতরাং দিনের শ্রী তাতে একটুও ম্লান হয়নি। রাত্রির আকাশে এত তারার সমারোহ যে তা থেকে একটি কমলে আকাশের উজ্জ্বলতা কিছুমাত্র ম্লান হয় না। কিন্তু আকাশের শূন্যতা কি মানুষের চোখে পড়ে? অনন্ত কোটি নিয়ে যার গ্রহলোকের পূর্ণতা—⋯

ঘরের মধ্যেই শূন্যতা ঝাঁ ঝাঁ করে। সকাল সন্ধ্যায় মধুসূদনের সিংহাসনের সামনে পদ্মাসন হয়ে বসে মুদিত নয়নে ধ্যান- করে না কেউ—সুরময় স্তব-মন্ত্র উচ্চারণে শূন্য ঘর আর ভরে ওঠে না—ধুনার সুগন্ধি—দীপের অনুজ্জ্বল আলোয় দেবতার মহিমাকে আর বুঝি উপলব্ধি করা যায় না। একপাশে গুটানো রয়েছে বিছানাটা—কম্বলের আসন দড়ির আলনায় রয়েছে তোলা—লণ্ঠনের আলোয় মহাভারত খুলে মধুর কণ্ঠে গল্প উপাখ্যান—ব্যাখ্যা, উদাহরণ দেওয়ার পালাও শেষ হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে যে ঘর গড়ে উঠছিল নতুন করে—তার কাজ অর্দ্ধ সমাপ্ত রয়েছে—

কিন্তু মানুষের নামার কথা এইখানেই নয়। এ যেন নদীর স্রোত। একটি ধারা আর একটি ধারায় যুক্ত হয়ে প্রবল হয়—গতি লাভ করে—ধ্বনি আর তরঙ্গে লীলা বিস্তার করে—আবার মাঝ পথে একটি ধারা বিযুক্ত হয়ে ভিন্ন পথ নেয়—তবু গতি ধ্বনি তরঙ্গ আর লীলার সমারোহ তার নষ্ট হয় না। এই সব মিলিয়েই জীবন—সুস্পষ্ট একটি অর্থ, সুসমঞ্জস্য একটি নীতি। এই গতি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলেছে সমুদ্র পর্য্যন্ত—কিন্তু সমুদ্র যে অনেক দূর। অনেক বন্ধুর পথ—অনেক চক্ররেখা পাথরের বাধা—বালুর বিভীষিকা অতিক্রম করে তবে পৌছতে হবে সেখানে। সেখানে পৌছানো যাবে কিনা অনিশ্চিত—সেখানে যাত্রা করে মুহূর্ত্তের জন্য থামা চলবে না। না শোকে মুহ্যমান হয়ে—না সুখে আত্মবিস্মৃত হয়ে। চলতে হবে—দিনের তালে পা ফেলে—আর পাঁচজনকে পাশে নিয়ে।

কি করে চলবে সংসার? এতগুলি অবোধ প্রাণীর মুখে কি তুলে দেবেন ভগবতী?

বিনয়বাবু আর সুরমা অনেক করেছেন। নিকট-আত্মীয় তেমন করে না। শেষকৃত্যের যা কিছু সুসম্পন্ন হয়েছে ওঁদেরই সাহায্যে। সৌরভ করেছে যথাসাধ্য। মিত্তির বউ—কেষ্টর মা—এমন কি—পুরুত গিন্নি পর্য্যন্ত যথাসাধ্য করেছেন। এত বড় কাজ কেমন করে সুসম্পন্ন হ'ল ভগবতী জানেন না।

বিনয়বাবু যাবার দিনে একখানি কাগজে ঠিকানা লিখে ভগবতীর হাতে দিয়ে বলেছেন, কি করব বউদি, চাকরি—যেতেই হবে। যখন কিছু দরকার হবে জানাবেন—যদি এখানে ভাল না লাগে যাবেন আমার বাসাতে। বেশি দূর তো নয়। আসব মাঝে মাঝে।

সুরমা প্রণাম করে বলেছে, দিদি আশীর্ব্বাদ কর।

ছোট বোনটিকে ভুলো না—একবার পায়ের ধুলো দিয়ো বাসায়।

এখন ভগবতী এই বাড়ীতে থাকবেন কোন্ ভরসায়? কোথায় অর্থ—কে করবে উপার্জ্জন?

সন্তু বললে—মা—আমি কেষ্টদার মত চানাচুর বেচব।

কমলা বললে—মা—আমি বেলাই শিখব রমাদির মত। কাকীমা কলটা যে রমাদিকে দিয়ে গেছেন। আর ঠোঙা তৈরী করে বেচব—ওতে চলবে না?

অবোধের দল জানে না—জীবিকা সংস্থানে এই অনিশ্চিত উপার্জ্জনের মূল্য কি। ভগবতীও জানেন না সে কথা। টাকা তিনি হাতে করে খরচ করেন নি কোনদিন—আয় ব্যয়ের হিসাব রাখেন নি কখনও।

পুরুত-গিন্নি বললেন—বড় ঘরখানা ছেড়ে দাও—কম ভাড়ায় নীচের একখানা ঘর বরঞ্চ নাও বাড়ীউলিকে বলে। তাতে অনেক সুসার হবে সংসারের।

কেষ্টর মা বললে—দেশের ভিটেয় চলে গেলেও তো পার—বাড়ী ভাড়াটা বাঁচবে।

সেখানে কার ভরসায় যাবে? উপার্জ্জনের মানুষ কোথায়—খাবে কি? পুরুত-গিন্নি বললেন। ভিটে কামড়ে পড়ে থাকলে তো পেট বুঝবে না। এ সহর হেন জায়গা—একটু মাথা খাটিয়ে চলতে পারলে—ভাবনা কি পেট চালাবার। ওই রমা ছুঁড়িটাকেই দেখ না। বাবা নেই—মা নেই—তিন কূলে কেউ নেই—খাচ্ছে না নিজে উপার্জ্জন করে? বরঞ্চ তোমার আমার চেয়ে ভালভাবেই রয়েছে। বাপের ঘর ছাড়ে নি—ভাড়া দিচ্ছে মাস মাস। চানাচুর বিক্রী—জামা বিক্রী—সেলাই শেখানো—আবার তারই মধ্যে পড়া—। ধন্যি মেয়ে যা হোক—পুরুষ মানুষের নাক কান কেটে দিয়েছে!

কেষ্টর মা বললে, হবে না কেন—কেষ্টা ছোঁড়াটাকে যে ভেড়া বানিয়েছে—যা কিছু উপার্জ্জন আমার কেষ্টর দৌলতে। জিনিসপত্তর আনা নেওয়া—বিক্রী করে দেওয়া—টাকা পয়সার হিসাব করা সব এই কেষ্ট! আমার সংসারে একটি পয়সা ঠেকায় না।

পুরুত গিন্নী বললেন, তোদের কপাল। তা যাকগে, তুমিও বাছা এখানেই থাক—কম ভাড়ায় ঘর নাও—ক' মায়ে-ঝিয়ে-ব্যাটায় মিলে খাটো—দিন চলে যাবে তোমাদের। আচার কর—বড়ি দাও—ঠোঙা তৈরী কর—হলো কারো ঘরে বাটনাটা বেটে দিলে—কি বালতি কয়েক জল তুলে দিলে—অনায়াসে চলে যাবে দিন। আজই ঘর একটা ঠিক করে নাও—মঙ্গলাকে বলে।

এক মাসের ভাড়া আগাম দেয়া আছে—যখন বাসায় আসি। এ মাসটা আমরা এখানেই থাকতে পাব।

বেশ—মা বেশ। তারপর লেখাপড়া শিখে সন্তু মানুষ হবে—মিণ্টু যোঁতন মানুষ হবে—তোমার দুঃখু কি। তুমি তো রাজরাণী হয়ে থাকবে।

ভগবতী অবাধ্য অশ্রু আঁচলে মুছে উঠলেন। সংসারে কাজ অনেক। এতগুলি প্রাণীর মুখে অন্ন দিতে হবে—

সন্তুকে বললেন, হাঁরে—রেশনের দিন কবে—চাল ফুরিয়েছে যে!

কার্ড আর টাকা দাও।

কার্ড বার করে দিয়ে ভগবতী বললেন, ওঁর আপিসে কি পাওনা আছে—সেদিন ঠাকুরপো এসে বলে গেল। একবার খোঁজ করতে পারবি? তুই চিনবি তো আপিস?

কেন চিনতে পারব না—কলকাতার সব জায়গা জানি। লালদীঘির পাড়ে বাবার আপিস—সাদা বাড়ী।

আপিস চিনে সন্তু গেল—বাবা যে বিভাগে কাজ করত। উর্দ্দিপরা চাপরাসীটা গোল বাধিয়েছিল—একজন বাবু কি কাজে বাইরে এসেছিলেন তখন। দেখতে পেয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন সন্তুর। পরিচয় পেয়ে ওকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একখানি চেয়ারে বসিয়ে বললেন, বোস খোকা, মনীশ সায়েবের ঘরে গেছে—এখুনি আসবে।

মনীশ এসে বললে, কি চাও খোকা? কোথা থেকে আসছ?

আমি অমরবাবুর ছেলে।

ওহো—ঠিক—ঠিক, তোমায় চিনতে পারিনি। বস—বস। তা কি খবর তোমাদের? ওখানেই রয়েছ—দেশে যাওনি?

আপনি বলেছিলেন আসতে—

ওহো—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের দরুণ কিছু আছে অমরদার। তা সে এমন বেশী আর কি!—সেই ভরসায় তোমাদের কলকাতায় থাকা ঠিক নয়। শহর জায়গা, খরচ তো

অনেক। তার চেয়ে চল সায়েবের কাছে—কিছু পাইয়ে দি।

সন্তুর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। বললে, না।

না—কেন, এতে লজ্জার কি আছে? এতো আর ঠিক ভিক্ষে নয়—আপিসে চাকরি করেছে যে—তার একটা ক্লেম আছে কিনা আপিসের সবাইএর কাছে? এই তো সেদিন—কানাইবাবুর ছেলে এল কাচা গলায় দিয়ে—বড় সাহেব দিলেন দশ—ছোট সায়েব পাঁচ—আর আমরা সবাই চাঁদা তুলে কুড়ি টাকার মত দিলাম। ছেলেমানুষ বোঝ না তো—পৃথিবীতে মানের চেয়ে টাকার দাম অনেক বেশী। টেনে টেনে হাসতে লাগলেন মনীশবাবু।

সন্তুর ভাল লাগল না ওঁর হাসি। বললে, বাবার পাওনাটা যা আছে তাই ঠিক করে দিন কাকাবাবু।

আচ্ছা তাই।···কথায় বলে না:

বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া,
কুছ না মিলি তো থোড়া থোড়া।

অমরদার অমনি গোঁ ছিল, মাথা নোয়ালে কত ওপরে উঠে যেত—কলমের জোর ছিল তো, কিন্তু কেমন গোঁ—কারও খোসামোদ করব না।। আরে দেবতারা পর্য্যন্ত খোসামোদ না করলে টলেন না—তা মানুষ তো কোন ছার! এই যে এত স্তবস্তুতির বহর—এর মানেটা কি?

গজ গজ করতে করতে মনীশ উঠে গেল।

যে ভদ্রলোক সন্তুকে আপিসের ভিতরে নিয়ে এসেছিলেন তিনি উঠে এলেন চেয়ার থেকে। বললেন, এস আমার সঙ্গে—সায়েবের ঘরে। টাকাটা যাতে শীগ্‌গির পেয়ে যাও তার ব্যবস্থা করে দিই। অন্য ডিপার্টমেণ্টের কাজ কিনা। দেখ—একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের সই চাই—যদি নমিনেশন ঠিক না থাকে। না হলে আমাদের সায়েবই দায়িত্ব নিয়ে টাকাটা দিয়ে দেবেন।

সায়েব ইংরেজিতে সহানুভূতিসূচক অনেক কথা বললেন এবং টাকাটা যাতে শীঘ্র পাওয়া যায় তার হুকুমও লিখে দিলেন।

ভদ্রলোক এ ঘরে এসে সন্তুকে বললেন, সায়েব বললেন, সাবালক হলে তোমাকে চাকরি দিতেন। যাই হোক—নামটা তোমার দপ্তরে টুকে রাখবার হুকুম দিলেন। ভাল নাম—আর ঠিকানাটা আমায় দাও। আর ইচ্ছে করলে—কিছু টাকা আগাম দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে বললেন। নেবে কিছু টাকা?

দিন।

দাঁড়াও—তোমার বাবার অ্যাকাউণ্টে কত আছে দেখে আসি চট্ করে। ফিরে এসে বললেন, একশো টাকা—নিজের রিস্‌কে তোমায় দিচ্ছি—পরে পেমেণ্ট পেলে শোধ দিও। খুব সাবধানে নিয়ে যাবে টাকা—পেট কোঁচড়ে বেঁধে দিচ্ছি—আর কারও সঙ্গে কথা কইবে না—সোজা চলে যাবে বাড়ীতে।

টাকা নিয়ে সন্তু বললে, মনীশকাকা কোথায়?

তার দেখা আজ আর পাবে না—শনিবার কিনা। আরে বাবা—বড় হও আগে তখন বুঝবে শনিবারে মানুষের কত রকম রোগ হয়। তার মধ্যে ঘোড়া-রোগ হল সব রোগের সেরা।···থাক—থাক, আর প্রণাম করতে হবে না। সামনের হপ্তায় এস একবার—খবরটা নিয়ে যেয়ো।

সন্তুর ভারী ভাল লাগল ভদ্রলোককে। কেমন তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে পুরো টাকাটাও পেয়ে গেল সন্তু। ভগবতীর নামেই ছিল টাকা—আপিসের দু'জন সহকর্ম্মী ছিলেন অছি। হাজার খানেকের কিছু বেশী টাকা। একটি সাদা কাগজে প্রত্যেক পাই পয়সার হিসেব মিলিয়ে সেই ভদ্রলোক সন্তুকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন বাসাতে।

বললেন, মাঝেমাঝে আমাদের আপিসে যাবে—বুঝলে?

সন্তু বললে, মা যদি জিজ্ঞাসা করেন আপনার নাম—কি বলব?

···নাম? আমার নাম অমর ঘোষ।

আপনি ঘোষবাবু? সন্তু বিস্মিত কণ্ঠে বললে।

অমর ঘোষ হাসলেন। বললেন, তোমার বাবার সঙ্গে আমার নামের মিল যেমন—কাজের অমিল ছিল তেমনি বেশী। তা হোক, যার ঝগড়া তার সঙ্গে গেছে। সব মানুষের মত যে সব মানুষের মতের সঙ্গে মিলবেই এমন কিছু কথা নেই। তোমার মাকে বলবে—আমি লোক খুব খারাপ নই। হাসতে হাসতে ঘোষ চলে গেলেন।

সন্তু অবাক হয়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। এই মানুষটিকে মনীশবাবু প্রায়ই বলতেন, ঘুষখোর—নীতিজ্ঞান-

শূন্য। ইনি নাকি অমরনাথের দারুণ শত্রু ছিলেন! কিন্তু ইনি না থাকলে ফাণ্ডের টাকা এত শীঘ্র হাতে আসত কি?

ভগবতী বললেন, দেখ সন্তু—ইচ্ছে করছে না এই ঘরখানি ছাড়ি। এই ঘর আমার কাছে তীর্থতুল্য।

কুড়ি টাকা মাসে মাসে দেওয়া—

হাতে তো কিছু টাকা এল—যাক না দু'চার মাস। আমরাও কিছু কিছু উপার্জ্জন করব।

আমিও করব মা।

না, তোমার পড়ার ক্ষতি হবে।

এই ঘরই হল ভগবতীর তীর্থক্ষেত্র। গৃহদেবতা মধুসূদনের সেবা—স্বামীর স্মৃতিধ্যান—আর ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে তোলার কামনা···ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হলেন ভগবতী। পাঁচজনেও সংসারের শোক দুঃখ ঠেলে এমনি করেই বুক বাঁধে—এমনি করে উঠে দাঁড়ায়।·· তাদের দৃষ্টান্ত মনের বল বাড়ায়—সাহস আনে। তবু সামান্য অতৃপ্তি কোথায় যেন লেগে থাকে। যা তিনি চেয়েছেন—তা যেন পূরণ হচ্ছে না—কোথায় বুঝি ফাঁক রয়ে যাচ্ছে।

নারায়ণের পূজোপাট! সন্তুর পৈতে হয়েছে—পূজোটী সে গায়ত্রী-মন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করে—কিন্তু সুরময় কণ্ঠে স্তবমন্ত্র উচ্চারণ—ধ্যানের জগতে দেবতার প্রসন্নতালাভ—এ সবের অঙ্গহানি নিত্যই ঘটে। আর রাত্রিকালে—শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ—ব্যাখ্যা উপদেশ যা দেহের কর্ম্মক্লান্তি ও মনের ক্লেদমালিন্য মুছে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দলোকে পৌছে দিত—তার অভাবও অনুভব করেন। তা ছাড়া ছেলেরাই কি মনের মত হয়ে উঠছে! সন্তু ইস্কুলে যায়—কিন্তু সংসারের আনা-নেওয়ার শতেকছিদ্র ওর মনোযোগের পালখানিতে দিন দিন বেড়েই চলেছে, প্রতিকূল বায়ু ঠেলে ওকি অভীষ্টক্ষেত্রে পৌছতে পারবে!

···এমনি অতৃপ্তি—উৎকণ্ঠা, ভয় ভগবতীর ঘর-বাঁধার আকাঙ্ক্ষাকে নিত্য পীড়ন করে। কোথায় যাবেন—কার কাছে পরামর্শ নেবেন ভগবতী ভেবে পান না।

ভগবতী দেখেন—ঘরের কাজ করতে করতে কমলা কেমন বাইরের দিকে কান পেতে থাকে। ওঘরে গানের শব্দ উঠলে, কমলার হাত পায়ের গতি মন্থর হয়ে আসে—একবার ডাকলে উত্তর মেলে না—কিংবা জবাবী কথার অর্থবোধও সুস্পষ্ট হয় না।

একদিন কমলাকে বললেন, গান শিখবি?

কমলার মুখ আরক্ত হল—বললে,···না—না—

না তো—হাঁ করে শুনিস কি!

কমলা মৃদুস্বরে বললে, মঞ্জুদি চমৎকার গান করেন। জান মা—বায়স্কোপের অনেক গান নাকি উনি গেয়েছেন।

ভগবতী বলেন, তাতে কি?

জাননা বুঝি—? গান গেয়ে মেলাই টাকা রোজগার করেন উনি।

মেয়েমানুষ টাকা রোজগার করে—এ ভাল নয়। ভগবতী গম্ভীর স্বরে উত্তর দেন। উনি বলতেন—যার যা কাজ ভগবান ভাগ করে দিয়েছেন। যার যা কাজ না করলে দুঃখু পেতে হয়।

কমলা তর্ক করলে না—তাহলে মেয়েমানুষ চাকরি করছে কেন? এই তো সন্তু সেদিন বলছিল—

এ তর্কে লাভ নেই। আজকাল অল্পেতেই উত্তেজিত হন ভগবতী—সামান্য মতান্তরে ওঁর চোখে জল আসে।

এই ত সেদিন বকলেন কমলাকে, খেয়ে-দেয়েই শুয়ে পড়িস সব—পড়াশোনার পাট তো তুলেই দিয়েছিস। মহাভারতখানা—পড়না খানিক, শুনি।

নাঃ—তোরা পড়তেও পারিস নে ভাল করে! কি কথার কি মানে তাই বুঝিস নে—তার পড়বি কি!

কমলার চোখে জল আসে—মুখ ফিরিয়ে অন্য কথা পাড়ে সে।

২৫

একদিন তুমুল ঝগড়া বাধল একতলায়।···কার সঙ্গে কে ঝগড়া বাধাল—কেউ বলতে পারে না—কিন্তু সকলেরই কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।—ভগবতীও বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে একতলার দিকে চাইলেন।···সৌরভীর সঙ্গেই যেন কার বচসা হচ্ছে।

মিত্তির বউ ওপরে এসে বললে, ও আর শুনছ কি দিদি—, কথায় বলে না—ইল্লত যায় না ধুলে—,

সৌরভীর গলা শুনলাম না?

ওকে নিয়েই তো কাণ্ড! তা বাপু—যে উপায় করেছে—সে যদি খরচ করে—কার কি বলবার আছে!··· এ্যাদ্দিন নয়—তদ্দিন নয়—আজ হিসাব নিচ্ছেন—ওর গলার হার কোথায় গেল?···আমরা তো দু' মাস ধরে

দেখছি···ওর গলার হার নেই, ও পান খায় না—পথে বার হয় না—কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ে না। পান্নুর মা বলছে—ও নাকি হার বেচে মেরে দিয়েছে! সৌরভী বলছে—বেচিনি, টাকার দরকার হয়েছিল—বাঁধা দিয়েছি। কেন দরকার হ'ল টাকার? এর উত্তরে ঝেঁজে উঠেছে সৌরভী, সব কেন'র কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে? তোমার খাই পরি—না তোমার একচালায় মাথা গুঁজে থাকি? অনেক দুঃখেই বলেছে বেচারী—ওকে ঘা কেটে কেটে নুনের ছিটে লাগিয়েছে—তাতে মরা মানুষেরও রাগ হয়। কথাটা হঠাৎ উঠল কেন আজ? তবে শোন।

মিত্তির-বউ ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসল। বললে, শোন তবে। মঙ্গলা-মাসীর দেওর-ঝি, কি বোনঝি কার যেন বিয়ে—এই অগ্রাণেই হবে। আপন বলতে বুড়ীর তো ওরাই আছে—বিয়েতে সোনা দানা না দিলে ভাল দেখায় না বলে বুড়ী মন্মথ স্যাকরার কাছে গিয়ে বলেছিল—সস্তায় কি গহনা আছে দিতে পারিস মন্মথ? বাণী-টানী দিতে পারব না বাপু। মন্মথ বললে, বাণী দিতে হবে না মাসী—মেলাই গহনা আছে—তৈরী, লোকের বাঁধা দেওয়া—বিক্রী করা। তা সব তো একসঙ্গে ভেঙ্গে গলাবার দরকার হয় না···ফুরসৎ মত গালিয়ে নিই। বলে কতকগুলো গহনা দেখালে বুড়ীকে। বুড়ীর পছন্দ হ'ল একগাছি সরু লিক-লিকে ফাঁস হার। হাল্কার ওপর গড়নটি চমৎকার। আর আর যা গয়না—দুল—পাশচিরুণি—ঝুমকো—টিকলি—কোনটা পুরনো প্যাটার্ণ, কোনটা বা হাল্কা ফঙ্‌ফঙে—দিলে পাঁচজনের কাছে নিন্দে হবে বলে বুড়ী পছন্দ করলে না। হার নিয়ে বুড়ী আর পাঁচজনকে দেখালে।—তখন পড়বি তো পড়—সৌরভীর বৌদির চোখেও পড়ল।—বললে, দেখি—দেখি—, এযে ঠিক ঠাকুরঝির গলার ফাঁস হারের মত ঠেকছে? ওমা—তাই ক' মাস থেকে দেখছি বটে গলাটা খালি-খালি! দাঁড়াও, জিজ্ঞেস করি।—তার পরেই এই তুলক্লাম কাণ্ড।···এখন সৌরভী তো বলছে—ও হার আমার নয়—ফাঁস হার কি জগতে ওই একটিই আছে! ওর বৌদি বলছে, তোমার নয় তো কার শুনি? মন্মথ স্যাকরার কাছে গহনা বিক্রী করবে বা বাঁধা দেবে—এ বাড়ীর লোক ছাড়া কি হিল্লীদিল্লীর মানুষ? এ বাড়ীর কোন লোকটার গহনা ওর সিন্দুকে ওঠেনি শুনি? কোন্ গহনাটা মন্মথর হাতে তৈরী নয় শুনি? তা কথা মিথ্যে নয় দিদি, দায়ে অদায়ে—সবাই ছোটে মন্মথর কাছে। টাকায় এক পয়সা সুদ—। সবাই গহনা গড়ায়ও ওর কাছে। গেরস্ত-পোষা গহনা তৈরী করে দেয় ও, বানী কম—নজর-ধরা জিনিস।

মিত্তির-বউ চলে গেলে ভগবতী ভাবতে লাগলেন, কেন গহনা বিক্রী করলে সৌরভ? কি এমন অভাব হল ওর—? আহা—সংসারে যার পতিপুত্র নেই তার মত দুঃখী কে! ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠলেন। তাঁরও তো স্বামী নেই—কোন নিকট-আত্মীয়ও নেই—যাঁরা বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন!···মেয়েমানুষ কি এমনি অসহায়? ঘরের মধ্যেই তার জীবন—অথচ সেই ঘরই আপন হয় না—যদি স্বামী না থাকেন। স্বামী বিহনে সে জীবন্মৃত। পিতৃকুল বা শ্বশুরকুলের আশ্রয়··· তাকে নির্ভয় করে না—সম্মান দেয় না—আশা আনন্দ কোন কিছুই জাগিয়ে তোলে না মনে। চার পাশে যা দেখে আসছেন—নিজের মনে যে আশঙ্কার ছায়া পাত হচ্ছে, তাকে কি দিয়ে ঠেকাবেন—ভগবতী? বার্দ্ধক্যে পুত্রের আশ্রয়—সেকালের শাস্ত্রবিধি। কিন্তু একালের মানুষের মনে সে বিধির উপর অচলা নিষ্ঠা কই! আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন ভগবতী।

···সন্ধ্যার সময় সৌরভীকে ডেকে নিয়ে এলেন ঘরে। বললেন, এ মতি কেন তোমার হল ঠাকুরঝি? কেন হার বেচলে?

সৌরভী বললে, জিনিস তো সময়-অসময়ের জন্যেই—নইলে—বিধবার কাছে কি দাম সোনার!

ভগবতী বললেন, এই অশান্তি—সইতে পারবে?

সৌরভী বললে, বোধহয় পারব নি।—

তাহলে—করবে কি?

কেন—পৃথিবীতে এত মানুষ রয়েছে—আমার জায়গা হবে নি?···ম্লান হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে।

ভগবতী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দৃঢ় সম্বিদ্ধ দুটি ওষ্ঠের দিকে। কি একটি নিশ্চয় সঙ্কল্পের আভাসে তা যেন ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠেছে।

সে বললে, এখানে আমার থাকা হবে নি বউদি—

আমি অনেকদিন থেকে জানি। অন্য যায়গা আছে—তাও মানের নয়।···গতর খাটিয়ে খেতে গেলে কষ্ট হবে—তা হোক—এই আমাকে বাঁচিয়ে রাখুক। না হয় রমার মত কাজ শিখব—সেলাই না পারি হাসপাতালের নার্স'গিরি।

সে-ও পাস করতে হয়।

সে সব সন্ধান সুলুক নিয়েছি বউদি।···না পারি—ঝি-গিরি করব—রাঁধুনি-গিরি করব—তবু ভাইয়ের অন্নে থাকব নি।

সে তো মানের অন্ন নয় ঠাকুরঝি?

এখানে আমার কি মানটা রয়েছে বউদি? সাত সন্ধ্যে উঠতে ঝাঁটা—বসতে ঝাঁটা। মেয়েমানুষের মান লজ্জা একজনের দৌলতেই—তার সঙ্গে সঙ্গেই সব ফরসা। শ্বশুর বাড়ীও দেখলাম—বাপের বাড়ীও দেখছি। কাজের বেলায় কাজী—কাজ ফুরোলে পাজী। সব শ্যালের এক রা!

নিজের ভাবনার প্রতিধ্বনি তুলে গেল সৌরভী। ঘর—ঘর চাই মেয়েমানুষের। ঘর না হলে তার লজ্জা ঘোচে না—সম্ভ্রম রক্ষা হয় না—তার জীবনও ভরে না। স্বামী নিয়ে হোক, পুত্র নিয়ে হোক, কন্যা নিয়ে হোক—দূর-সম্পর্কের কোন স্নেহভাজনকে নিয়েই হোক—নিজের কর্তৃত্বে—নিজের কামনায় সেই ঘর সুন্দর করে গড়ে তুলেই তার তৃপ্তি। ঘর নয়—জীবন।

দিন দুই পরে সৌরভীকে খুঁজলেন—কোথাও তার দেখা মিলল না। কাল রাত্রিতে ভাবতে ভাবতে একটি কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে ভগবতীর। আশ্চর্য্য, সব আগে মনে পড়া উচিত ছিল—তাই ভুলে বসে ছিলাম বেমালুম। কি যে দশা পোড়া মনের! ঘর—ঘর—ঘরের চিন্তাই তাঁকে পাগল করে তুলেছে। সাধ আনন্দ আশার বাতিগুলি জেলে জেলে দেখছেন কাজের অবসরে। তার ফাঁকে সাংসারিক কর্ত্তব্যগুলি ঠিকমত পালিত হচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ল—সৌরভীর লাঞ্ছনা মনটাকে বেদনাতুর করেছিল বলেই হঠাৎ মনে পড়ল—ওর কাছে তিনিও তো ঋণী হয়ে রয়েছেন।···তেমন দুর্দ্দিনে সৌরভী যদি সাহায্য না করত—সামর্থ্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে—চিকিৎসা বা সেবার সান্ত্বনাই কি থাকত তাঁর? সেবার ঋণ মনের মাঝেই জমা থাকবে—শোধ দেবার অবসর কার কদাচিৎ ঘটে—কিন্তু অর্থের ঋণ? আশ্চর্য্য—টাকাটা হাতে পেয়েও ওর ঋণের কথা কেমন করে ভুললেন তিনি! আশ্চর্য্য নয়—ওই টাকার দায়েই হয়তো ওর গলার হার গিয়ে উঠেছে মন্মথ স্যাকরার বাক্সে। তারই জন্য এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হচ্ছে ওকে।

বাকি রাতটা ছটফট করে কাটল—সকালে উঠেই নীচেয় নেমে এলেন। এই ভোরেই—কলে জল এলে সৌরভী বাসন মেজে স্নান সেরে উনুনে কয়লা দিয়ে উপরে ওঠে। কিন্তু—

কোথায় সৌরভী?···কলে জল এসেছে—ছর ছর করে জল পড়ছে উঠোনে। শীতের সকাল বলে—এখনও ঘোর ঘোর রয়েছে, কেউ ওঠেনি। কলের মুখের বাঁশটী চৌবাচ্চায় লাগিয়ে দিয়ে ভগবতী উঠোন থেকে বারান্দায় উঠছেন—মঙ্গলা বাড়ীউলি পঞ্চকন্যার নাম অধরে উচ্চারণ করতে করতে ঘরের দুয়োর খুলেই জিজ্ঞাসা করলেন, সৌরভী বুঝি?

না—মাসীমা, আমি।

ও—বামুন মেয়ে! তা তুমি তো এত ভোরে কখনও নীচেয় নাম না মা?

সৌরভী ঠাকুরঝিকে খুঁজছিলাম।

অ-মা—জান না বুঝি, সে যে দত্তবাড়ীতে কাজের যোগাড় করে চলে গেছে কাল বিকালায়।

আর আসবে না? শুষ্ক স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ভগবতী।

আসবে নি কেন—আসবে বৈকি। ওই তো হোথা দত্তবাড়ী—একটা গলি পেরোলেই বড় বড় থাম'ওলা বাড়ীটা দেখা যায় না—নোয়ার পেরকাণ্ড ফটক—ফটকে দুটো যমদুতের মত ভোজপুরী পালোয়ান—ওই বাড়ীই তো। ঢুকেই চকমিলানো দালান—দালানে কেষ্টরাধার যুগলমূর্ত্তি। আগে অবিশ্যি বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ হত—দোল দুগ্‌গোচ্ছব—রথ চন্নন যাত্রা—কালীপুজো—জগধাত্রী পুজো—রাস ঝুলন কিনা হতো। এখনও হয়—নমো নমো করে। সে জাঁক নেই—সে খাওয়ান দাওয়ান নেই—সে মচ্ছোব সদাবেরতো নেই। তা না থাকুক—মরা হাতী লাখ টাকা। সেইখানেই ঠাকুরের পূজোর জোগাড় করা—নৈবিদ্যি ফুল গুছিয়ে দেয়া—ঠাকুরের

থালা-বাসন মাজা—ঘর ধোয়া-মোছা—এই সব কাজ। তা কাজ ভাল—ঠাকুর দেবতা নে থাকা—মনটাতেও ময়লা জমে না—। দুইয়েরই হিল্লে হল ছুঁড়ীটার।···আচ্ছা এলে পরেই বলব'খন—বামুন-মা তোকে ডেকেছে—।

আরও দুদিন পরে সৌরভীর দেখা মিললো। নিজেই দেখা করতে এল ভগবতীর সঙ্গে। বললে, ঝিগিরি যদি করতেই হয়—ভগমানেরই করবো বউদি। কাজটা তোমরা বলবে অসম্মানের—আমার মনে কিন্তু এতটুকুন দুঃখু নেই। বেশ আছি।

ভগবতী বললেন, তা ভালই থাক ঠাকুরঝি—ভগবান তোমাকে শান্তি দিন। কিন্তু আমাকে ঋণের বোঝা খালাস দিও। বলে বাক্স খুলে পাঁচখানি দশ টাকার নোট ও কয়েকটি খুচরো টাকা বার করে নিয়ে এলেন।

ওকি—ট্যাকা কি হবে?

ওনার অসুখের সময় তোমার কাছ থেকে নিয়েছিলাম যে। সুদটা কত পড়বে হিসেব করে দিয়ো।

সৌরভী সত্রাসে হাত গুটিয়ে নিলে। বললো, বউদি—যা চুকে বুকে গেছে—সে কথা আবার কেন! দাদা যদি ভাল হয়ে উঠতো—পঞ্চাশ কেন—একশো ট্যাকা নে নিতাম—কিন্তু, সৌরভীর স্বর ভারী হয়ে উঠল ও তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

ভগবতীর চোখেও জল এল। বললেন, সবই বুঝি ঠাকুরঝি। উনি বলতেন—ঋণ মহাপাতক। কে একজন পাঁচগণ্ডা কড়ি ধার নিয়ে একখানা কুলো কিনেছিল—তারপর ভুলে গিয়েছিল ধার শোধ দিতে। মৃত্যুর পর যমালয়ে গিয়ে দেখা সেই কুলোওয়ালার সঙ্গে। সে বললে, তোমার কাছে কিছু পাব—শোধ দাও। সেখানে কি আর পাবে যে শোধ দেবে—দেনার দায়ে পিঠের চামড়া কেটে নিলে—ঠিক কুলোর মতো। টাকাটা নিতেই হবে ভাই।

সৌরভী বললে, একটা কথা বলব—কিছু মনে করো না বউদি। যে জিনিস দেবতাকে দেয়া যায়—ধার কর্জ্জ করে যেমন করে হোক—সেকি দেবতার কাছে পাওনা বলে হিসেব রাখি আমরা? যে জিনিস নিজের সংসারে দেয়া যায় তা কি দেনার সামিল? তোমার কানের দুল বেচে দিয়েছ—সে দেনা কাকে শোধ দেবে বউদি?

ভগবতী বললেন, সে কথা আলাদা। তুমি দুঃখী মানুষ—তোমার ঘাড়ে কেন চাপাব এই দেনা? আমার ধর্ম্ম যে আমায়—

সৌরভী বললে, দুঃখী বলে সবাই দয়া করবে, কারও সেবা করতে পারব না!—না বউদি, এখন এ ট্যাকা রেখে দাও—। আছি পরের বাড়ীতে—কোথায় রাখব—কে নেবে—তার ঠিক কি! ও বরঞ্চ তোমার কাছে থাক।

তোমার হার ছড়া ছাড়িয়ে নাও না কেন!

হার—! সৌরভী হাসলে। বললে, গহনা মেয়েমানুষের শোভা—আমার শান্তি ও। গহনা পরে তার যে শান্তি—গহনা হারিয়ে যদি তার চে শান্তি পায়—তা'লে কোন্‌টা লাভ বউদি? শব্দ করে হেসে উঠল সৌরভী।

এসব কথা বুঝবে নি ভাই, যেন বুঝতেও না হয়। আচ্ছা পাগল তো—রেখে দাও না তোমার কাছে। কথায় বলে না—মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। হারই নেই তার হার ছাড়ানো। হাসতে হাসতে চলে গেল সৌরভী।

একটু পরেই ফিরে এল হাসতে হাসতে। বললে, না বউদি—তোমাকেই বা কেন ঋণী করে রাখি। হয়তো যমরাজার রাজ্যিতে গিয়ে ওই পঞ্চাশটা ট্যাকার মতো গোল গোল চাকতি কেটে নেব তোমার পিঠ থেকে। তখন তো দুনো পাপে মরব ভুগে। তার চে- এক কাজ কর। দেনা করেছি ঠাকুরের সেবার জন্যে—ঠাকুরের সেবাতেই দেনা শোধ হয়ে যাক। কি বল? তোমাদের ঘরে তো নারায়ণ ঠাকুর রয়েছেন—তেনারই ভোগ শেতল দিয়ো সন্ধ্যেবেলা। না হয় আমার নাম করেই দিয়ো—তাহলেই শোধ হয়ে যাবে। যাবে নি?

ঠাকুরের দেনাটা হ'ল কিসে?

নয়? ওমা—ব্রাহ্মণ দেবতা নয়? কলিতে তোমাদের মত বড় দেবতা—জ্যান্ত দেবতা আর আছে? বলে পায়ের গোড়ায় মাথা রাখলে সৌরভী।

চোখে জল এল ভগবতীর। এই মেয়েটিকে নিয়ে একদিন কি অশান্তি ভোগই না করেছেন, মনে মনে পাপ-পুণ্যের বিচার করেছেন—অমরনাথকে পাছে দখল করে নেয় সৌরভী—এই হিংসাবৃত্তি প্রচ্ছন্নভাবে মনের তলায় জমিয়ে রেখে কি কষ্টই না পেয়েছেন! আজ কোথায় গেলেন অমরনাথ? সীমন্তের সিঁদুর হাতের লোহা—

সতীত্বের গৌরব বারব্রত পূজাপাট কোন কিছুর বাঁধন দিয়েও আটকে রাখা গেল না তাঁকে। তা যায় না, অথচ নিত্যমরণশীল বস্তুতে এত আসক্তি—এত অনুরাগ জমিয়ে রেখে জীবনভোর উৎকণ্ঠা আর আক্ষেপ ভোগ করে কেন যে মানুষ! মানুষের বিচার করে মানুষ—মনের কতকগুলি বৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে। সেই বৃত্তির সঙ্কীর্ণ বৃত্তে বিচারের প্রহসন চলছেই চিরকাল। কালের কালো যবনিকা উঠে একদিন হয়তো বিচারের রহস্য সমাধান হয়ে যায়। চমকে ওঠে মানুষ।···বুঝতে পারে নিজের ভুল, আজ অমরনাথকে নিয়ে হারানো বা প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব-উল্লাস নাই—আজ অনুত্তেজিত শান্ত বৃত্তিকে বিচারকের আসনে বসিয়ে সেদিনকার অপরাধকে অত্যন্ত নির্দ্দোষ মনে হচ্ছে। সৌরভীর আর একটি দিক—যা বিচারের প্রদীপ শিখার নীচেয় পড়েছিল—তা অন্যদিকের আলোয় প্রকাশিত হল—কি সুন্দর ওর মন—ভাবতে ভাবতে ভগবতীর অশ্রুপ্রবাহ অবিরল ধারায় দু'টি গাল প্লাবিত করে দিল। এতদিনে সমস্ত বেদনার অবসান হল বুঝি!

(ক্রমশঃ)

ভাঁড়ুদত্ত ও কবিকংকণ

শ্রীউষা বসু এম-এ, সাহিত্য-সরস্বতী

কবিকংকণ মুকুন্দরাম তাঁর বিখ্যাত কাব্য "চণ্ডীমংগল" ষোড়শ শতাব্দীতে রচনা করেন। কবি বর্ধমানের সিলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে আরড়া গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সেইখানে ব্রাহ্মণ জমিদারের উৎসাহে, দেবীর আদেশ লাভ করে কবিকংকণ তাঁর চণ্ডীমংগল কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচিত চণ্ডীমংগলে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের রূপ প্রতিভাত হয়েছে দেখতে পাই। চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কাব্য রচিত হলেও ভক্তিভাব ও আদর্শ কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেনি। তিনি তাঁর কাব্যকে জীবনের সংগে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। তাইতো আমরা দেখি চণ্ডীমংগলের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রণিত হয়ে উঠেছে মানুষেরই বেদনা, ব্যর্থতা, আশা ও আকাংখার গান। মুকুন্দরাম দেশকে কোন সময়ের জন্য ভুলতে পারেন নি। তাইতে যখন আমরা চণ্ডীমংগল পড়ি তখন দেখতে পাই যে বনের পশুরা পর্যন্ত চণ্ডীদেবীর কাছে তাদের দুঃখের কথা বলছে। ভল্লুক দেবীকে বলছে যে, সে বনে অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করে—'নেউগী চৌধুরী নহি, না রাখি তালুক'—তবু অত্যাচার অবিচারের শেষ নেই। বনের পশুদের মধ্য দিয়েই সেই যুগের বেদনার কাহিনী রূপকাকারে বর্ণিত হয়েছে। কবিকংকণ সুখদুঃখে চিরশ্যাম এই ধরিত্রীকে ভুলতে পারেন নি তাই তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে নিপীড়িত মানুষ ও মানুষের সমাজের বেদনার গান। কবির জীবন-ভোর দুঃখের সহিত নিবিড় সখ্যতাই কবিকে করে তুলেছিল বাস্তববাদী। বাস্তববাদী লেখকের নিকট তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রের মূল্য রয়েছে। তাই মুকুন্দরামের নিকট কালকেতু বা শ্রীমন্ত যে মূল্য বহন করে, ভাঁড়ুদত্ত ও দুর্বলাদাসীও তদ্রূপ। আদর্শের অপেক্ষা মানুষের জীবন বড় এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই জীবনের রূপ যথাযথ প্রকাশিত করে। কবিকংকণ মানুষকে ভালবাসতেন, তাই সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তর তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। রাজা বিক্রমকেশরী, ধনপতি, লহনা, খুল্লনা চরিত্রে কবিকংকণ বিকশিত করেছেন সমাজের উচ্চস্তরকে, অপরদিকে দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত কালকেতু, ফুল্লরা, কৃষকদের প্রতিনিধি স্বরূপ বুলানমণ্ডল, দুর্বলাদাসীর মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরকে দেখতে পাই। সুতরাং সেই সময়ে যে সামাজিক জীবের উচ্চ ও নিম্নের বৈষম্য ছিল তা' আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরীকৃত নিম্ন-শ্রেণীর নরনারীরা যে অতিশয় দুঃখেকষ্টে দিন অতিবাহিত করতো তা' আমরা ফুল্লরার বারমাসী পড়লে জানতে পারি। ব্যক্তিগত চরিত্র-অংকণের সময়ও কবিকংকণ অপূর্ব কৃতিত্ব ও অসাধারণ দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করেছেন। সেই জন্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আজও বাংলা সাহিত্য সরসী-নীরে কুবলয়ের মত প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে—থাকবেও চিরদিন অম্লান হয়ে। বিশেষ করে কবির নারী-চরিত্রগুলি যথাযথ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে কবির কাব্যকে কালজয়ী করেছে। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে কবি নায়ক চরিত্রগুলি বিশেষ সাফল্যের সংগে বিকশিত করতে পারেন নাই। অপর দিকে কবির সৃষ্ট মুরারী শীল, ভাঁড়ুদত্ত বা দুর্বলাদাসী চিরকাল অমর হয়ে বেঁচে থাকবেন। এখানে কবির Humour ও পরম উপভোগ্য।

"ভাঁড়ুদত্ত"—নাম মাহাত্ম্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। ভাঁড়ুর চরিত্র সমালোচনা করলে দেখতে পাই যে ভাঁড়ুদত্ত সার্থক নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধার্মিক দোহারা মিষ্টভাষী "ভাঁড়ু"ও সময়কালে যে সংহার মূর্তি ধারণ করতে পারে তা' কালকেতুর মত সরলপ্রকৃতির লোক বুঝতে পারে নি। "হৃদয়ে পুরিতবিষ, মুখে মকরন্দ, ভাঁড়ুদত্তের এই কপটতা শুধু কালকেতু কেন, অনেকেই বুঝতে অসমর্থ হয়ে থাকেন। সর্বকালের সাধারণ এই ভাঁড়ুদত্তর চরিত্র-চিত্রণ সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বের একজন অতি সাধারণ পল্লীকবির পক্ষে সত্যই অসাধারণ। কবি-

কংকণের ভাঁড়ু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সামান্য ব্যাধকেও প্রণাম করতে পারে, আবার হতাশ হলে নিজের স্বভাবজ কুটবুদ্ধি ও কপটতার সাহায্যে তাঁর স্বার্থবিনাশকারীর সর্বনাশ সাধন করতে অগ্রসর হয়। ভাড়ুর উচ্চ শ্রেণী বলে অহংকার ও রয়েছে, আবার প্রয়োজন হলে নিজেকে নীচকাজে নিয়োজিত করতেও দ্বিধা বোধ করে না। ধূর্ত-চূড়ামণি ভাঁড়ুদত্ত বুঝতে পেরেছে যে কালকেতু রাজা হলেও অশিক্ষিত সরল ব্যাধ, তাকে ভাঁড়িয়ে জমিজমা, মানসম্ভ্রম আদায় করার সুবর্ণ সুযোগই হল এই—তাই

"ফোঁটাকাটা মহাদম্ভ,   ছেঁড়াধুতি কোঁচালম্ব
শ্রবণে কলমখরশান।"

কালকেতুর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কলম কাণে গুঁজে পণ্ডিত সেজে এসেছে। স্বার্থের তাগিদে আজ

"প্রণাম করিয়ে ধীরে,
ভাড়ু নিবেদন করে,
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।"

তারপর "ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি" অত্যন্ত বিনয়ের সংগে ভাঁড়ু বলে—

বহু পরিবার মেলা
দুই মাও তিন শ্যালা
চারিপুত্র বহিন শাশুড়।"

আবার কথার ফাঁকে প্রকাশ করছে—

"যতেক কায়স্থ দেখ
ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ।

কিন্তু সর্বদাই তাঁর চক্ষু বুলাল মণ্ডলের ওপর আছে, কারণ তার আগে থেকেই সন্দেহ ছিল যে কালকেতু তাকে বেশি পছন্দ করে। তাই বুলাল মণ্ডলকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্য ভাড়ুদত্ত বলছে—

দেয়ানে পেটের বেটা
বহিল আমার চিটা
যারে বল বুলালমণ্ডল

*   *   *

পারি দু'পণের কাচা
ভানিত আমার ভাচা
সেই বেটা হবে দেশ মুখ?
নফরের হাতে খাঁড়া
বহুড়ি জনের ভাঁড়া
পরিজন পায় বড় দুঃখ।"

এইভাবে কথার চাতুর্যে কালকেতুকে ভুলিয়ে নিজেকে মহৎ বলে প্রচার করতে লাগলো। বর্তমান যুগেও এরূপ ভাঁড়ু দত্ত আমরা অনেক দেখতে পাই। হাটের দিনে ভাঁড়ু "মহামণ্ডলের" ক্ষমতা প্রকাশ করে—

"পশরা লুটিয়া ভাঁড়ু পুরয়ে চুবড়ী।
যত দ্রব্য লয় লুটি, নাহি দেয় কড়ি॥"

তখন—"পসারি পসার ঢাকে ভাড়ুর তরাসে।" হাটের লোকেরা যখন তাঁর এই অত্যাচারের কাহিনী কালকেতুর নিকট নিবেদন করলো; কালকেতু তখন তাঁর শঠতা বুঝে তাকে দূর করে দিল। ভাঁড়ু স্বীয় মূর্তি ধারণ করে বললো—

"(খুড়া) তিনগোটা শর ছিল একখানা বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস॥
দৈব-যোগে আমি যদি ছিলাম কাঙাল।"

এখন থেকে ভাঁড়ুর একমাত্র চিন্তা হ'ল কালকেতুর সর্বনাশ করা। ভাড়ুর কৌশলে কলিংগরাজ কালকেতুকে আক্রমণ করেন ও পরাজিত করেন। ভাঁড়ুর বিশ্বাসঘাতকতায় কালকেতু বন্দী হন। চণ্ডীদেবীর কৃপায় কালকেতু মুক্তিলাভ করে গুজরাটের রাজা হন। ভাঁড়ু দত্ত যখন বুঝতে পারলো যে কলিংগরাজ চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে বন্দী কালকেতুকে মুক্ত করে দিয়েছে ও গুজরাটের রাজা বলে স্বীকার করেছে, তখন তিনি এক চমৎকার কৌশল আবিষ্কার করলেন। ভাঁড়ু দত্ত বিলম্ব না করে কালকেতুর কাছে গিয়ে বললো যে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত কলিংগ রাজকে অনেক অনুনয় বিনয় করে তিনি কালকেতুর মুক্তি সাধন করেন। তাঁরই অনুরোধে রাজা তাকে মুক্ত করে জীবনদান করেছেন। শুধু কালকেতুর প্রাণই নয়—তার রাজ্য পর্যন্ত ফিরে পেয়েছে। ভাড়ু বললো—

তুমি খুড়া হইলে বন্দী
অনুক্ষণ আমি কাঁন্দি

*   *   *   *

যবে দুপ্রহর নিশা
কৈনু রাজ সম্ভাষণ
অনেক বুঝানু নরপতি।"

কালকেতুকে সান্ত্বনা ও অভয় দিয়ে বলছে—

"হইয়া রাজার চূড়া,
সিংহাসনে বৈস খুড়া,
আমাকে রাজ্যের লাগে ভার।"

কিন্তু এবার কালকেতু ভাড়ু দত্তের শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ভণ্ডামী বুঝতে পেরেছে। ভাঁড়ু দত্তের কথায় কোনরূপ কর্ণপাত না করে তৎক্ষণাৎ নাপিত দিয়ে ভাড়ুর মস্তক কিয়দংশ—মুণ্ডন করে ঘোল ঢেলে দূর করে দিল।

কবি কংকণের ভাঁড়ু দত্ত এখনও আমাদের সমাজের বুকে সগৌরবে বিরাজ করছে। এইরূপ শঠতা ও বিশ্বঘাতকতা করে আমাদের চক্ষের সম্মুখে সমাজ-দেহকে বিনষ্ট করছে। এইরূপ জাতীয় চরিত্রের লোক বিষাক্ত ক্ষতের মত সমাজকে ধ্বংশ করে দেয়। তবুও তারা আছে…আর থাকবেও। তাই মনে হয় ভাঁড়ু দত্তের চরিত্ররূপায়ণে সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বেকার পল্লী কবি কবিকংকণ যে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা' যেমন চমৎকার তেমনি অনন্যসাধারণ।

"মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা বাস্তবজগতের এক অপূর্ব রহস্যলোকের সন্ধান পাই। তাঁর কাব্যে ভক্তির যে অনাবিলমূর্তি অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে তা'ও তাঁর কাব্য গ্রন্থটিকে মধুর করে তুলেছে।"

জীবন রহস্য

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

জীবন-স্রোত বহু-মুখ। বিপরীত প্রবাহের ঘূর্ণীপাকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছোটে জীব সেই কূলের সন্ধানে যেথায় বিরাজিত চির-শান্তি। আশার ছলনা অদূরে দেখায় তীর ভ্রান্ত-দৃষ্টি পরিশ্রান্ত যাত্রীকে, স্বর্ণ রেণু শোভিত উজ্জ্বল নদী-সৈকত। সেই তীর ভাবে যাত্রী মনোরম মধুর। পথে নানা তরঙ্গ এসে নাচায়। কোনোটি অনুকূল, কোনোটি প্রতিকূল। ঝঞ্ঝা ওঠে কভু, কভু বয় শান্তবায়ু। এক দল পিছে ডাকে। আপাত-মধুর আশ্রয়-কূল সাদর ইঙ্গিতে বলে—এস, এস। জীব বোঝে না সে স্বর উদ্‌ভ্রান্ত মনের। বোঝে না মন হরবোলা। সে যা শেখে ভালো মন্দ দিনের পর দিন, অভ্যাসবশে ভাবে সে অভিজ্ঞতার মূলে নিহিত প্রেরণার সুর—সত্যের ধ্বনি। কুহক ভ্রান্তি পথের সন্ধান দেয়। কোন্ কূলে প্রকৃত শান্তি, অনন্ত মধুর বিশ্রাম-নিলয় কোন্ দেশে, সে সত্য তো দৈনিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে না জীব। অথচ জীবন মন্দাকিনীর আবিল জলতরঙ্গ এবং পথের ক্লান্তি অদম্য স্পৃহা জাগায় মনে শান্ত ভূমির স্বচ্ছ জলে তৃষ্ণা নিবারণের।

রম্য বোধ হয় যে সুদৃশ্য পুলিন, সেথায় পৌঁছে মলিন হয় মন—যখন দেখে ঘেরা সে দেশ মরীচিকায়। সেথায় না বিরাজে শান্তি, না মেলে তৃপ্তি। বহুক্ষণ বিশ্রাম করবার স্থানটুকুও নাই সেই মায়ায়-রচা নদী-সৈকতে। ধূ ধূ করছে বালুবেলা—অট্টহাস্য করছে প্রতি বালুকণা, চির-শান্তির অলীক আশার বিদ্রূপ উৎসাহে। শ্রান্ত পথিক ভাঙ্গা প্রাণে আবার খোঁজে নিলয়। মরীচিকা পুনরায় তাকে দেখায় রম্য-ভূমি, প্রশান্ত প্রদেশ। ছুট্ ছুট্। সেই পথে ধাবিত হয় শ্রান্ত পথিক নবীন উদ্যমে। কিন্তু ফল সমান। সে ভোগ করে বৃথা-পথ-চলার ক্লান্তি। তার পথ-প্রদর্শক অলীক আশার ভ্রান্তি। এদিকে কালের ক্রীড়া চলেছে সমানে। যৌবন প্রৌঢ়ত্বে পরিণত হয়। প্রৌঢ়ের অদূরে বার্দ্ধক্যের পিছনে মসীঘন যবনিকা। সারা-জীবনের ব্যর্থতা হয় পুঞ্জীভূত চিত্তের পট-ভূমিতে। মৃত্যুর ভীম ভ্রূকুটি উৎপীড়ন করে যাত্রীকে। ভীষণ নিরুৎসাহ, প্রাণ-ভাঙ্গা বিফলতা পরিহাস করে জীবকে জীবনের শেষ দশায় যদি সে সার্থক্য লাভ না করে পথের অনুসন্ধানে। পথ-চলার ভ্রান্তি পর্য্যবসিত হয় বৃথা শ্রমের ক্লান্তিতে।

মাত্র প্রাণধারণের জন্য জীবের পক্ষে পরিশ্রম অনিবার্য্য। মানুষ কিন্তু মাত্র প্রাণধারণের তাকিদ মেনে জগতে বাস করতে পারে না। তার মনের গভীরে অনুভূত হয় অবিশ্রান্ত তৃষা পরিবেশের তথ্য এবং তত্ত্ব জানবার, জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করবার। অথচ পরিবেশের জড় এবং চেতন সৃষ্টি তার চিত্তে আভাস দেয় স্রষ্টার। জীব বোঝে প্রতি কলাকাষ্ঠায় ভিন্ন পরিণতি পরিবেশের। মানুষের মনে সদাই জাগে প্রশ্ন—এরা কোথা হতে আসে কোথা যায়? কে এদের ভাঙ্গে গড়ে? প্রতি ভাঙ্গায় নতুন গড়ন। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন নয় সৃষ্টির নব নব রূপ। সদাই নূতন পরিণতি। চেতন ও অচেতনের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। হৃদয়ের উৎস-মুখ হতে ওঠে আস্তিক্য বুদ্ধির বুদ্‌বুদ্। কার রচনা এ বিচিত্র জগত? কার খেলাঘরের এ ভাঙ্গাগড়া? আস্তিক্যবুদ্ধি মানুষকে সত্য পথ দেখাতে সদাই প্রস্তুত, যদিও সে মাত্র অস্পষ্ট স্বরের নিক্কণ। মানুষ ঠিক তাকে রূপ দিতে পারে না। কারণ স্পষ্ট অতৃপ্তি ও অসন্তোষের হিল্লোলে সে দেখে উজ্জ্বল আপাত মনোরম সন্তোষের চিত্র অনিত্যে। ধন-রত্ন যশ-মান, কামিনী কাঞ্চনের বিমোহন মাধুরী তাকে প্রলোভিত করে। সংসারে দৃষ্টি-মনোহর সে চিত্র। মানুষ সহজে বোঝে না সংসারের সুখ অলীক। বাসনার প্রতিক্রিয়া নব-অনুরাগের সৃষ্টি করে মায়ার ছলনা-পুষ্ট হৃদয়ে।

যেমন মায়ায় ভোলাবার আদর্শ বিশ্ব-ভরা, তেমনি জগতের সুর-ছন্দে মিলিত সত্যের সঙ্গীত। সে উদাত্ত সঙ্গীত মেশানো থাকে মায়ার সুরের সাথে। ছন্দ এক। কিন্তু যে বোঝে তার কানে বাজে ধ্বনি বিভিন্ন রাগে। এ ত্রিভুবন যে মায়ের গড়া—গেয়েছিলেন কবি। জগৎ জুড়ে তাঁর সঙ্গীত। তাতে মেশানো মায়ার সাথে সত্যের

গান। সীমার মাঝে বাজে অসীমের সুর। রূপ-সাগর ছেঁচে বার করতে হয় অরূপ রতন। এই সংসার নাট্যমঞ্চে বাছতে হবে গীতাভিনয়ে কোন্‌টি ছলনার, কোনটি অনন্তের স্বর। আলোকের ঝরণা ধারায় চিন্‌তে হবে কোন্ ঝলক আলেয়ার, কোন্ রশ্মি সত্যাকাশের বিজলীর চমক।

এ প্রত্যয় স্পষ্ট যে জীবনের সাথী কর্ম্ম, যার প্রয়োজন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণ বায়ুকে সজীব রাখতে। কর্ম্মের সহায়তাও অত্যাবশ্যক সেই দৃঢ় ভূমিতে পৌছতে যেথা বিরাজে চিরশান্তি। ইন্দ্রিয়ের তাগিদ অনুপেক্ষণীয়। কিন্তু একই রসনা কভু তুষ্ট মধুর রসে, কভু তার তৃপ্তি অম্লে। ভক্ষ্য উদরসাৎ হলেই তো তার শেষ হয় না। ভোজনের ফলে মানুষের দেহের পুষ্টি হয়, ক্ষয় হয়; সুখ হয়, দুঃখ হয়। মানুষ পশুর মত একই প্রকারের খাদ্যে বহুদিন তৃপ্তি পায় না। সে সর্ব্বভুক, কাজেই রসনার সংযম অনিবার্য্য স্বাস্থ্যের নিরাময়তার প্রয়োজনে। এই বাছাই কার্য্য সাধনা-সাপেক্ষ। কিন্তু লোভের ছলনা অতিক্রম করা কঠোর সাধনা।

তেমনি প্রতিক্রিয়া প্রত্যেক ইন্দ্রিয় চরিতার্থের। কান হরিগুণ গান শুনে সুখ পায়, আবার সেই কানে মধুর ছন্দে প্রবেশ করে পরনিন্দা, হিংসার কথা, ঈর্ষার জঘন্য রব। চক্ষুরও সেই দশা। নাসিকা ও ত্বক ভিন্ন মানুষে ভিন্ন; আবার একই মানুষে বিভিন্নকালে বিভিন্ন। তাদের পরিতোষের আদর্শ চিরস্থায়ী নয়, অথচ কোনো মুহূর্ত্তের অনুভূতি ভিন্ন মুহূর্ত্তের অনুভূতি হতে বিচ্ছিন্ন নয়। অন্তকার সঞ্চয় বিগত দিনের অভিজ্ঞতার পরিণতি—আগামী কালের মনোবৃত্তির হেতু। রবির তেজ জলকে করে বাষ্প। সে বাষ্প হয় পর্জন্য। আবার বৃষ্টির জলে বাড়ে নদী। মানুষের সুখ দুঃখ স্বর্গ নরক শান্তি অশান্তি নির্ভর করে তার প্রতি মুহূর্ত্তে কৃতকর্মের পরে। সুতরাং কর্ম-নিয়ন্ত্রণ জীবন-রহস্যের প্রধান কৌশল। কর্ম-কুশলতা আয়ত্ত করবার প্রচেষ্টা মানব-মনে সদাই বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয় বাহিরের সন্ধান এনে দেয় মনের দরবারে। জ্ঞান মানুষের সংস্কৃতিগত। অথচ জ্ঞান ও অজ্ঞানের সীমার প্রাচীর-রেখা স্পষ্ট নয়। কোন্‌টি কর্ত্তব্য কোন্ কর্ম অকর্ত্তব্য, কোন্ কাজের পরিণামের অন্তে বিষ, কোন্ কর্ম সুধার সন্ধানী, এ সমস্যার মীমাংসা বড় কঠিন। জ্ঞান কর্ম নির্বাচন করে, তার গতি নির্ণয় করে। সকল জীব বোঝে যে কর্ম্মের গতিকে সুষ্ঠু পথে প্রবাহিত করতে না পারলে স্থায়ী সুখ-শান্তির আশা দুরাশা।

কর্ম্মের পথে অনাবিল জ্ঞানের আশায় মানুষ ছোটে কর্মী ও জ্ঞানীর সন্ধানে। সত্য গড়া মানব-প্রকৃতি। অথচ যুগ-যুগান্তর মানুষ ভোগ করেছে বিষের তীব্রতা সত্য-নায়কের ভ্রান্তির ফলে। কর্ম এবং জ্ঞানের পথ আমাদের এই পুণ্য ভূমিতে গড়ে গেছেন মুনি, ঋষি, মহামানব, অবতার, যুগাবতার। আজিও মহামানবের পুণ্য স্পর্শের হর্ষে উৎফুল্ল হয় জগজ্জন। অথচ সংসার সুখের বিলাস-ঝলক জগত আকাশের কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ ঝলকের মত প্রভাময় সর্ব্বযুগে।

কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে কে? এ তত্ত্বে আবার আমরা পড়ি গোলকধাঁধাঁর মাঝে। কারণ ভিন্ন-মুখ জ্ঞান বিভিন্ন আদর্শের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান-বাদ যে কর্মে নিয়োজিত করে মনকে তা বিরোধী নয় পরম জ্ঞানের। কিন্তু সে তো সেখানে নিজের গণ্ডীর পরিসমাপ্তি করে না। সে দর্শনের রাজ্যে পড়ে—যার ফলে মানুষ আবার কালের স্রোতে হয় নিমজ্জমান। ধর্মের গোঁড়ামী যে পথে নিয়ে যায় মানুষকে, সেও তো মনুষ্য ধর্ম নয়। আবার বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে যে আদর্শ নীতি—সে নিজের মহত্ত্বের গণ্ডী এড়িয়ে লোকের হিত-সাধনে সফল হয় না।

কাজেই শুদ্ধ-জ্ঞানের সন্ধান লাভ করতে হয় সেথায় যেথায় প্রাণ সিক্ত হয় প্রকৃত প্রজ্ঞায়। জীবনের উদ্দেশ্যকে দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত না করলে চরম সুখ-শান্তির আশা দুরাশা। আস্তিক্য-বুদ্ধি মানুষের সংস্কার। আত্ম-জ্ঞানের রশ্মিতে জীব বোঝে স্রষ্টার প্রতি একান্ত আত্ম-নিবেদনই মাত্র চিরশান্তির অনুকূল অবস্থার বিধান করতে পারে। এই পরা-শ্রদ্ধা ভক্তি। সে আনুগত্য আমাদের সহজ সংস্কারের মাঝে বিদ্যমান। ঈশ্বর জীবের হৃদ্দেশে অবস্থিত।

ভারতবর্ষ পুণ্য-ভূমি কারণ জীবন-রহস্যের সকল চরম সত্য যুগে যুগে ব্যাখ্যা করেছেন এ দেশের ঋষি। সেই সকল শিক্ষাকে এক-কেন্দ্র ক'রে মানবের মুক্তি-পথ নির্দেশ করেছেন শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। শ্রীকৃষ্ণ এই সামঞ্জস্যের কথা

প্রকৃষ্টভাবে বুঝিয়েছেন ভীষণ কর্মভূমি বিশাল রণক্ষেত্রে। কর্ম হ'তে বিরত হ'বার শিক্ষা গীতার নয়। বাস্তবকে অতিক্রম করা সংসারের নিত্য কর্মের কুরুক্ষেত্রে অসম্ভব। সুষ্ঠু ও মন্দ প্রবৃত্তির সংগ্রাম অনিবার্য্য গৃহ-আশ্রমে। বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা নয়—যদি বৈরাগ্যের অর্থ হয় সংসারের কর্ম প্রবাহ হতে আপনাকে লুকিয়ে রাখা নির্জীব নিরালায়।

কর্ম-প্রবাহকে শুভ পথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মাত্র সেই জ্ঞান যে পরা-ভক্তি প্রসূত। জ্ঞানের পটভূমিতে ভক্তি বিদ্যমান না থাকলে শুষ্ক নিরস জ্ঞান হতাশ হয় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে। ভক্তি ব্যতীত আনন্দ অসম্ভব। আনন্দ জীবের সংস্কার-সুলভ কাম্য। জ্ঞানের জ্যোতি যদি ভক্তির দীপ-শিখা হয়, তার নির্দিষ্ট কর্ম হয় সুখের এবং সত্য পথের যাত্রা। সংসারের আবর্জ্জনা তেমন কর্ম্মীযাত্রীকে মলিন করতে পারে না। ভক্তি-প্রসূত অনাবিল জ্ঞানের শিখা শত মলিনতার মাঝে সন্ধান দেয় সু-পথের। কারণ ভক্তি চিত্তে জাগায় চিরানন্দময়ের প্রকৃত স্বরূপ।

অন্তর-দৃষ্টি জীবের চিত্তে জাগিয়ে তোলে পরা-ভক্তি যার কল্যাণ জীবন-সমুদ্রকে করে সুখের সরোবর। সংসারের ভ্রান্ত আদর্শের জঞ্জাল-স্তূপে অবলুপ্ত হয় মানব-হৃদয়ের সংস্কার-মূলক আস্তিক্য-বুদ্ধি। সে অবরোধ অপসরণে জেগে ওঠে অরূপের রূপ, আনন্দ-ধামের লহর-ছন্দ। ভক্তির অমৃত-প্লাবন আপনি আসে অপসরণ করতে ভক্ত-চিত্ত হতে নিরর্থক ভাঙ্গা আশার ধ্বংসস্তূপের বিলাপ-বেদনা।

মানব-চিত্তের শক্তি অফুরন্ত। মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ ও প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে অজ্ঞান-অন্ধ। অনন্ত প্রেম-সাগরের লহরে জীবের ক্ষীণ জীবন-স্রোত মিলিয়ে দিতে পারলে, নৃত্য-চঞ্চল প্রেমের লহর মানব প্রাণের বেদনা-কাতর মজা-নদীতে অমৃত সায়রের রস সঞ্চার করে। এই অনন্ত প্রেম-সাগরের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়। তার ফলে হয় জীবের ক্ষুদ্র আমিত্বের পরিসমাপ্তি।

গীতার বৈশিষ্ট্য এই যে সে বাস্তবকে অবহেলা করেনি। মানুষের প্রকৃত স্বভাব, তার সহজ আচরণ, সংস্কার, স্পৃহা এবং নরের অন্তর বাহিরের নিত্য-সংগ্রাম উপেক্ষিত বা লাঞ্ছিত হয়নি এই মহা-শাস্ত্রে। বাস্তব জীবনের সহজ গতি, সাধারণ সমস্যা আমাদের অন্তরের নিত্য-উপলব্ধ ঝঙ্কার মেনে নিয়ে তাদের সুখের পথে, শান্তির পথে, মুক্তির পথে চালাবার সুলভ উপায় বর্ণনা করেছেন গীতা। তাই গীতা পাঠে মানবের তৃপ্তি। তার রস তৃষিত মানব-চিত্তে বর্ষণ করে অমৃত-ধারা। সে রস সিঞ্চনে হতোদ্যম জীবনের অবসাদ অবলোপ করা সহজ। আশাবাদ সুখ-জীবনের রহস্য। সে আশার দীপ কোন্ কৌশলে প্রজ্জলিত রাখতে হয় দারুণ জীবন-রণের ঝঞ্ঝায়, নিত্য ক্ষণিক জয়-পরাজয়ের ঘন-ঘটায়, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভাঙ্গা উদ্যম, ভগ্ন উৎসাহ, বিফল প্রাণ—এসব বোধ অলীক। কারণ জীব মাত্রেরই যাত্রার শেষে অবস্থিত মোক্ষের আনন্দ-ধাম।

মানুষের শুভযাত্রা-পথের পাথেয়—নিষ্কাম কর্ম, শুদ্ধ জ্ঞান এবং অচলা ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মাত্র এদের বর্ণনা দিয়ে বা জীবের নিত্য-গন্তব্য সাধন পথের ইঙ্গিত দিয়ে ক্ষান্ত হননি। বিশ্ব-ধারার উৎপত্তি এবং স্বরূপের তিনি পরিচয় দিয়েছেন। সে তত্ত্ব না বুঝলে—ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্মের উৎস-মুখের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ ভক্তি প্রবল হলে সে রহস্য-দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয় অনায়াসে আত্মদর্শনের আশীর্ব্বাদে।

বিপরীত-স্রোত প্রবৃত্তি-প্রবাহকে এক-মুখ করবার কৌশল শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার শিক্ষা। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের মূল এক—মায়া। তাদের গভীরে মাত্র এক পরমবস্তু বিরাজিত—ব্রহ্ম। যাকে বলি মন্দ—সেও তো সেই পরব্রহ্মের মায়া-বিকাশ। কারণ তাঁর শক্তির বাহিরে তো স্থাবর-জঙ্গম-দেব-মানুষ কারও শক্তি নাই। তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত—মণিমালার সূত্রের মত। ভক্তির পট-ভূমিতে জ্ঞান ও কর্মের স্রোতকে প্রবাহিত করলে জগতের ভেদ-জ্ঞান দূর হয়—জ্বলে ওঠে চিত্তে আদিত্যের জ্যোতি—যার উজ্জ্বলতায় দৃষ্টি-পথে উদয় হয় জীবের চরম আনন্দ-ধাম—সমাধান হয় জীবন-রহস্য।

মোক্ষ-লাভ তো বিশ্ব-প্রাণতার অনুভূতি বিনা সম্ভব-পর নয়। সেই সাত্ত্বিক জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করা প্রকৃত মনুষ্য-ধর্ম্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে বিশুদ্ধ জ্ঞান বর্ণনা করেছেন।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমক্ষয়মীক্ষতে
অবিভক্তং বিভক্তেষু তদ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম।

যে জ্ঞানের দ্বারা বিভক্ত ভূতসমূহের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপক একই অব্যয় অবিভক্ত সত্ত্বার ভাব উপলব্ধি হয়, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক।

গীতার শেষ অধ্যায়ে বলেছেন ভগবান—তুমি মদ্গত চিত্ত হও, তুমি আমার ভক্ত হও, আমার জন্য যজন কর, আমাকে নমস্কার কর। তাহলে তুমি আমাকেই পাবে। আমি এই সত্য পথ বিদিত করছি। কারণ তুমি যে আমার প্রিয়। সকল প্রকার ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি মাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি সর্ব্ব-পাপ হ'তে তোমাকে মুক্ত করব। তুমি শোক ক'র না।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিযানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রম

শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম জয় করে ভারতবর্ষে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ এ দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছিলেন :

We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, intallect is expanded and by which one can stand on his own feet.

কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষা শুধু কতগুলি বিষয়ের সংবাদসংগ্রহ নয়—জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার যোগ্যতা অর্জন করাই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থী যদি শিক্ষার শেষে বলিষ্ঠ মন, সুস্থ দেহ ও দৃঢ় চরিত্র নিয়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে না পারল তবে সে শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? আজকের দিনে আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব নেই—এবং শিক্ষিতের সংখ্যা যাতে বাড়ে তার জন্য সব দেশে চেষ্টা করা হচ্ছে, আর তা সার্থকও হচ্ছে অনেক পরিমাণে, কিন্তু শিক্ষিতের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে—মানুষের জীবনে সুখ ও শান্তি সে হারে বাড়ছে না। এ সব কথা চিন্তা করলে স্বতঃই মনে উঠে যে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেই গলদ থেকে গেছে। এই গলদ দূর না করলে জীবনের সুখ শান্তি সমাজকল্যাণ বা রাষ্ট্র-উন্নয়নের কোন চেষ্টাই আশানুরূপ ফল প্রদান করতে পারবে না।

দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ তাই এদেশের সর্বাঙ্গক উন্নতির কথা ভাবতে গিয়ে শিক্ষা-সংস্কারের কথাই ভেবেছিলেন প্রথম। বর্তমান পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন—কি তার অভাব এবং কি করে সে অভাব পূরণ করতে হবে। এজন্য বর্তমান শিক্ষা-ধারাকে সমূলে বিনাশ না করলেও চলবে, তবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ভারতের যে প্রাণধর্ম তার ভিত্তিভূমির উপর, অর্থাৎ ভারতের অধিবাসীদের সুশিক্ষার জন্য পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ না করে আমাদের প্রাচীন গুরুকুলপ্রথার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। The old institution of living with Guru and such like systems of imparting education are needed. শান্ত ও আনন্দময় পরিবেশ—অনাড়ম্বর পবিত্র জীবন—সুখে দুঃখে সহানুভূতিভরা উদার হৃদয়—এ সকলের ছোঁয়া যদি লাগে—তবেই ত সবুজ, কচি প্রাণের কুঁড়িগুলি সৌরভময় সহস্রদল হয়ে ফুটে উঠবে। প্রাচীন গুরুকুল পদ্ধতির এগুলিই ছিল অন্তরের কথা। আজকের দিনের বিদ্যার্থীদের জন্যও অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে অবশ্য আধুনিক সমাজের উপযোগী করে।

স্বামীজীর এই শিক্ষাদর্শকে কাজে রূপ দেওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এই বিদ্যার্থী আশ্রম (বর্তমান বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা) তাদের অন্যতম। কলকাতার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এখানে থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের সর্ববিধ সুযোগ পায়। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণের আহার ও বাসস্থান এবং পুস্তকাদি সব কিছুর দায়িত্ব নেন এখানকার পরিচালকেরা। দরিদ্রের দুস্তর বাধাবিঘ্ন থেকে দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা তরুণ বিদ্যার্থীদের নিশ্চিন্ত করে উচ্চ শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের সর্বপ্রকার সহায়তা করাই বিদ্যার্থী আশ্রমের বৈশিষ্ট্য। সংযম ও শ্রদ্ধামূলক এখানকার নৈতিক শিক্ষায় আগ্রহশীল কিছুসংখ্যক ছাত্র পূর্ণ ব্যয় বহন করে এখানে থাকতে পারে, তবে তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট; মোট ছাত্রসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী হতে পারে না। কিন্তু নিজের পুরো খরচ যারা দিতে পারল, আর তা যারা দিতে পারল না—তাদের মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্য থাকবে না কি আচার-ব্যবহারে কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে। মানুষ হওয়ার সুযোগ সকলের সমান এখানে। সকলেই একই পরিবারভুক্ত আপনার জন। আশ্রম সেবকদের স্নেহ যত্নে এক পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা অল্পদিনেই

গড়ে উঠে। তাইত বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি নাম Students Home এবং বোধ হয় এই নামেই তার প্রসিদ্ধি অধিকতর।

ছাত্রদের এই আনন্দময় আবাসটির সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে উচ্চ জীবনযাপন ও লোককল্যাণে উদ্বুদ্ধ এক তরুণ স্নাতকের জীবনসাধনাকে কেন্দ্র করে। মধ্য কলকাতার এক ভাড়া বাড়ীতে একজন ছাত্র নিয়ে দিনের বিভিন্ন সময়ে কোচিংক্লাস এবং সেই সংগে পবিত্র ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের সমবেত প্রচেষ্টা—এই ছিল সেদিনকার বিদ্যার্থী আশ্রমের রূপ। স্থায়ী অর্থভাণ্ডার, নিজস্ব ঘরবাড়ী, শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব সেদিন তার কিছুই ছিল না, তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র রূপে এই প্রতিষ্ঠানটি স্বীকৃতি লাভ করল ১৯১৯ সালে। এই বৎসরই বিদ্যার্থী আশ্রম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছাত্রাবাস রূপেও পরিগণিত হল।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমের মন্দির

ফটো—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ নায়ক ব্রহ্মিষ্ঠ মহাপুরুষবৃন্দের অজস্র আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানটির উপর। বিদ্যার্থী আশ্রমের স্বল্পপরিসর ভাড়া-বাড়ীতে তাঁদের পদধূলি পড়েছে অনেকবার। বিশেষ করে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর দিনটি বিদ্যার্থী-আশ্রমের জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র আধ্যাত্মিক জগতের রাজাধিরাজ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের শুভ পদার্পণ হয়েছিল এই দিনে।

ধীরে ধীরে দেশের নেতৃস্থানীয় বিভিন্ন মনীষীরও স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করল বিদ্যার্থী আশ্রম। সেই একান্ত নিরাভরণ শিশু প্রতিষ্ঠানটির মধ্যেও তাঁরা এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলেন। পরিচয়ের প্রথম দিনেই তাই তাঁদের অকুণ্ঠ প্রশংসা দেবতার আশীর্বাদের মত তার চলার পথ সুগম করেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—বাংলা দেশের কলেজীয় শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বসু এবং শক্তিধর পুরুষ শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা। ১৯২০-২২ সালে এঁদের সংগে বিদ্যার্থী আশ্রমের প্রথম পরিচয়। আশ্রমের তখনকার পরিবেশ অতি সাধারণ, একখানি দোতলা ভাড়া বাড়ী নীচে ও উপরে মোট পাঁচখানি ঘর। ছাত্রসংখ্যা ৮।৯ জন, কিন্তু বিদ্যার্থী আশ্রমের জীবনধারা তাঁদের মনে সেদিন এমন এক সশ্রদ্ধ সহানুভূতি এনেছিল যার জন্য তাঁরা জীবনের অবশিষ্ট অংশ এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে এর ক্রমোন্নতির সর্বপ্রকার চেষ্টা করে গেলেন। বিদ্যার্থী আশ্রমের ক্রমবিকাশের জন্য আরও অনেক শুভানুধ্যায়ী অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। দীর্ঘদিনব্যাপী তাঁদের সে পরিশ্রম ও প্রযত্ন শুধু এই প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্তের উপাদান নয়, সমগ্র দেশের জাতীয় ইতিহাসেরও একটি মূল্যবান অধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ ঈশ্বরদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রাণঢালা আশীর্বাদ ও শিক্ষানুরাগী বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর ঐকান্তিক সহানুভূতি অবলম্বন করে বিদ্যার্থী আশ্রমের জয়যাত্রা সুরু হোল। ধীরে ধীরে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ আসতে লাগল। ত্যাগী কর্মীরাও এসে যোগ দিলেন ধর্ম ও কর্মের এই মিলনক্ষেত্রে। ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগল। ক্রমবিকাশের পথ বেয়ে বিদ্যার্থী আশ্রম ১১৯নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট থেকে ৬।এ বাঁকারায় ষ্ট্রীট, সেখান থেকে ৭নং হালদার লেন এবং তারপর ৭।১ অভয় হালদার লেন—এবং তারপর ১৯৩২ সালের অক্টোবরে স্থায়ী আবাস গৌরীপুরে (দমদম) উপস্থিত হোল। অগ্রগতির পথে এটি তার দৃঢ় পদক্ষেপ।

১৯২৮ এর এপ্রিলে দমদম গৌরীপুরের ২০ বিঘা জমি দান করলেন কলকাতার বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী শ্রীরজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। এই সংগে দিলেন আরও আট-হাজার টাকা—উদ্দেশ্য বিদ্যার্থী-আশ্রমের পরিকল্পিত কৃষি শিল্প বিভাগ এখানে কাজে রূপ নেবে। ধীরে ধীরে জমির সংস্কার হয়ে জায়গাটি একেবারে নতুন আকার ধারণ করল। তারপর লালগড়ের বদান্য রাজা শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ সাহস রায়ের প্রদত্ত ৬৩০০৲ টাকায় যখন এই জমির সংলগ্ন আরও ৬৩ বিঘা জমি কেনা সম্ভব হল তখন শুধু-কৃষি শিল্প বিভাগ নয়—বিদ্যার্থী-আশ্রমের বহু বাঞ্ছিত স্থায়ী আবাসের জন্য গৌরীপুরই নির্দিষ্ট হল। এই সব হতে প্রায় তিন বছর কেটে গেল। গৌরীপুরে প্রথম বাড়ীর ভিত্ পড়ল ১৯৩১এর শেষের দিকে।

সহরের প্রতিকূল প্রভাব থেকে দূরে, মুক্ত আলো বাতাসে ভরপুর, শান্ত ও নির্জন এই পরিবেশে বিদ্যার্থী আশ্রমের ঘর বাড়ী তৈরী হতে লাগল। ধীরে ধীরে মাথা তুলল সুশোভন পবিত্র এক ব্রহ্মচর্য আশ্রম—বিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে। একতলা বাড়ীগুলিতে থাকবে মাত্র ১২ জন করে, আর দো্তলাখানিতে থাকবে ২৪ জন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৯ এর মধ্যে এখানে নির্মিত হলো ৪ খানি একতলা ও একখানি দোতলা ছাত্রাবাস গৃহ, ভাণ্ডারসহ রান্নাঘর, আরোগ্যভবন এবং তাদের কেন্দ্রস্থলে বিদ্যার্থী আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির।

ছাড়া কয়েকটি কুটীর, একটি গোশালা, ফুল ও ফলের বাগান, তরকারীর ক্ষেত ও দুটি বড় জলাশয় যুক্ত হয়েছিল এর সংগে।

এই সময় ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ১৯৪১ সালের অক্টোবরে বিদ্যার্থী আশ্রমের রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হল মহাসমারোহে। এই উপলক্ষে প্রকাশিত হল একটি সুদৃশ্য স্মারক গ্রন্থ—Silver Jubilee Souvenir. যাতে দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রাণভরা শুভেচ্ছা এবং প্রাক্তনদের ভক্তি নম্র প্রশস্তির সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত। এই অপরূপ জীবনালেখ্যের সঙ্গে পরিচিত না হলে বিদ্যার্থী আশ্রমকে বোঝা কখনই সম্ভব নয়।

রজতজয়ন্তী উৎসবের অল্প কিছুদিন পরে ডিসেম্বরেই বিদ্যার্থী আশ্রমের জীবনে আর একটি অধ্যায় আরম্ভ হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে গৌরীপুরের এই রম্য আবাস ছেড়ে দিতে হলো ২৪শে ডিসেম্বর। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অস্থাবর যা কিছু সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যেতে হল। ঘর বাড়ী ও জমিজমা ভারত সরকার রিকুইজিশান করলেন। কলিকাতার ভাড়া বাড়ীতে বিদ্যার্থী আশ্রমে আবার ফিরে গেল। অবশ্য যুদ্ধের ভিতর কিছুদিন কলকাতা থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চল হাসনাবাদে ছিল। চারদিকে বোমার বিভীষিকা, আর্থিক সঙ্কট, তা সত্ত্বেও বিদ্যার্থী আশ্রমের কাজ বন্ধ হলো না। সমস্ত বাধাবিঘ্নের মাঝখানেও এক অদৃশ্য শক্তির সুশীতল স্নেহচ্ছায়া বিদ্যার্থী আশ্রমের জীবন-ধারাকে রাখল অব্যাহত। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে ১৯৪৩ সালে স্থায়ী তহবিলে এল কুড়ি হাজার টাকা এবং অল্প কিছুদিন পরে ১৯৪৪ সালে এই তহবিলে আরও দুই লক্ষ টাকা দিলেন কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী। তাঁরা এ টাকা দিলেন বিদ্যার্থী আশ্রমের পরিচালন ও পরিবর্ধনের জন্য; শুধু একটি সর্ত করলেন—তাঁদের নাম যেন প্রকাশিত না হয়। বিদ্যার্থী আশ্রমের রিপোর্টে তাই এদের নাম ছাপা হয়েছে—Well wisher বলে। এই অর্থে জি. পি. নোট কেনা হল। তার থেকে যে বার্ষিক সুদ, গৌরীপুর সম্পত্তির বাবদ মাসিক ভাড়া, আর তার সঙ্গে জনসাধারণের প্রদত্ত কিছু চাঁদা এই নিয়ে বিদ্যার্থী আশ্রমের খরচপত্র চলতে লাগল। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ-ফ্রী ও আংশিক-ফ্রী ছাত্রের সংখ্যা বাড়ান হল। ১৯৪৯ সালে বিদ্যার্থী আশ্রমের ২০ নং হরিনাথ দে রোডের ভাড়া বাড়ী ও সোদপুরের শ্রীযুত রামচন্দ্র সুর মহাশয়ের বাগান বাড়ী—উভয় জায়গায় মিলে এই সংখ্যা আবার গৌরীপুরের সংখ্যার কাছাকাছি এসে গেল। মোট ৪৮ জন ছাত্র সংখ্যার মধ্যে সম্পূর্ণ বিনাখরচে ২৬জন, আর আংশিক খরচে ৭ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হল।

১৯৪১ সালে ভারত সরকার গৌরীপুরের ঘর-বাড়ীর যে অস্থায়ী দখল (Requisition) করেছিলেন ১৯৪৭ সালে তা স্থায়ী দখলে (acquisition) পরিণত হল। গৌরীপুর ফিরে পাবার আর কোন আশা রইল না। কাজেই বিদ্যার্থী আশ্রমের স্থায়ী আবাসের জন্য আবার চারদিকে অনুসন্ধান চলল। অনেক চেষ্টার পর ১৯৫০ সালে বেলঘরিয়া ষ্টেশনের নিকট—রাইফেল রেঞ্জ গ্রাউণ্ডের প্রায় ১০৬ বিঘা জমি ভারত সরকারের কাছ থেকে কেনা হল—কিছু কম এক লাখ তিরিশ হাজার টাকায়। গৌরীপুর ঘরবাড়ীর ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে এই অর্থ দেওয়া সম্ভব হল। এদিকে জমিটি একেবারে নীচু এবং স্থানে স্থানে হোগলা বনে ভর্তি। কিন্তু কর্মীদের উৎসাহের অন্ত নেই; যে উৎসাহ নিয়ে তাঁরা একবার জঙ্গলাকীর্ণ গৌরীপুরকে 'স্বর্গের নন্দন কাননে' (কথাগুলি পুণ্যস্মৃতি জলধর সেন মহাশয় গৌরীপুর এসে ছাত্রদের কাছে বলেছিলেন—১৯৩৭ এ) পরিণত করেছিলেন সেই অনমনীয় উদ্যমে আবার তাঁরা প্রবৃত্ত হলেন জমি সংস্কার, ঘর বাড়ী ও বাগান বাগিচা তৈরীর কাজে। দীর্ঘ দুটি জলাশয় খনন করা হল। তা থেকে, যে মাটি পাওয়া গেল তা দিয়ে আর প্রচুর সিণ্ডার ছাই ফেলে সমস্ত জায়গাটি ৩ ফুট ভরাট করা হল। এই ভরাট জায়গার উপর ধীরে ধীরে ঘর বাড়ী উঠতে লাগল।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমের একাংশ ফটো—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও অগণিত শুভানুধ্যায়ীর অকৃপণ সাহচর্যে অত্যল্পকালের মধ্যেই বেলঘোরিয়ার জলামাঠে সর্বাঙ্গসুন্দর সেই

গৌরীপুর আশ্রমটি যেন আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। গৌরীপুরের সেই নয়নাভিরাম মন্দির এবং মন্দিরকে কেন্দ্র করে—বিভিন্ন ছাত্রাবাস গৃহ গুলি—সবই একে একে তৈরী হল। প্রতিটি বাড়ীর সম্মুখে মার্বেল পাথরে খোদিত হয়েছে দাতার নাম—যাঁর অর্থানুকূল্যে গৌরীপুরে নির্মিত হয়েছিল অনুরূপ বাড়িখানি। জার্ডিন্ মেন্সিস্ কোম্পানীর সুযোগ্য পরিচালক ৺সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ৺চারুচন্দ্র দাস, দিঘাপতির জমিদার—৺হেমন্তকুমার রায় ও তদীয়া পত্নী শ্রীযুক্তা হেমলতা রায়, বালিয়াটির জমিদার ৺জ্ঞানেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী ভাগ্যকুলের শ্রীযুত প্রমথনাথ রায়, ভারত সরকারের ভূতপূর্ব আইন সচিব স্বর্গীয় স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার—এই দানবীরদের নামগুলি সেথানে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এঁদের অনেকেই আজ ইহলোকে নেই, কিন্তু এই বিদ্যাস্থানের ইতিহাসে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যানুরাগীর জনচিত্তে তাঁরা চির-অমর হয়ে আছেন। দাতার নামের সঙ্গে আছে গৌরীপুরের বাড়ী নির্মাণের তারিখ এবং তার সঙ্গে বেলঘরিয়ায় পুনঃ প্রতিষ্ঠার সুসংবদ্ধ ইতিহাস। কয়েকটি বাড়ীতে অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে যেগুলি বেলঘরিয়ার নিজস্ব। সেগুলি হচ্ছে একতালা দুটি কর্মীনিবাস, দোতলা একটি ছাত্রাবাস, একটি ব্যায়ামাগার এবং বিশাল লাইব্রেরী বাড়ীখানি। প্রতিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজনীয় শেষোক্ত এই বাড়ীগুলির নির্মাণ আর সমস্ত জায়গাটার বিদ্যুতীকরণ সম্ভব হয়েছে রাজ্যসরকার ও ভারত সরকারের অর্থসাহায্যের জন্য।

হরিনাথ দে রোডের ভাড়া বাড়ী থেকে বিদ্যার্থী আশ্রম বেলঘরিয়ায় স্থানান্তরিত হল গত বছর (১৯৫৪) ১৫ই এপ্রিল। বিদ্যার্থী আশ্রমের শুভানুধ্যায়ী প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র এবং কর্মীদের সেদিন কী আনন্দ! ৩ দিন ব্যাপী এক আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হল এই উপলক্ষে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণ অধ্যক্ষ শ্রীমৎস্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত মন্দিরের শুভ্রবেদীতে অবতার-বরিষ্ঠের করুণাঘন প্রতিমূর্তিখানি স্থাপন করলেন—আনুষ্ঠানিক ভাবে নূতন আবাসের উদ্বোধন হল।

এই নূতন আবাসে ছাত্রসংখ্যা বর্ধিত হল। এখন এখানে ৭২ জন বিদ্যার্থী বাস করছে—অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা যাতে একশতে উন্নীত হয় কর্তৃপক্ষ তার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা নির্ভর করছে সাধারণ তহবিলে অর্থসংস্থানের উপর। কারণ এখানকার নিয়ম হল অধিকাংশ ছাত্রই যাতে সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে, নতুবা আংশিক ব্যয়ে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা। অবশ্য আশ্রমের বিশেষ শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল সঙ্গতিপন্ন ছাত্রদেরও বঞ্চিত করা হয় না—জীবন গঠনের এই মনোরম পরিবেশ থেকে —একথা আমরা আগেই বলে এসেছি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমানে ৩৯ জন ছাত্র সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে, ১১ জন আংশিক ব্যয়ে এখানে বাস করছে—মাত্র ২২ জন ছাত্র নিজেদের খরচ নিজেরা বহন করে থাকে।

আশ্রমের বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সবার প্রথমে চোখে পড়ে চারিদিকের সরল সহজ একটি পবিত্র ভাব। ফলফুলের বাগান, দীর্ঘ জলাশয়, উন্মুক্ত আকাশ আর অনাড়ম্বর বাসগৃহগুলি—সব মিলে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যাতে উদারতা ও পবিত্রতার প্রেরণা সহজেই এসে পড়ে। মানুষের ভিতরে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা, ঈশ্বরের যে অমিত ঐশ্বর্য মানুষেই তার প্রকাশ; মানুষ চেষ্টা করলে ভিতরের এই শক্তিকে জাগিয়ে নিজের ও দেশের অশেষ কল্যাণে লাগাতে পারে—ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন এই বাণীগুলি এখানকার কর্মধারা ও পরিবেশের মাঝখানে যেন ওতোপ্রোত হয়ে আছে। প্রচারধর্মী বক্তৃতা বা জবরদস্ত হুকুমের মারফৎ নয়—স্নেহস্নিগ্ধ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এখানকার ত্যাগী কর্মীরা চান তরুণমনের সন্দেহ সংশয় দূর করে গোপনে আত্ম-বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করতে। এখানকার সাপ্তাহিক যে আলোচনাসভা অথবা বিভিন্ন মহাপুরুষের যে জন্ম-উৎসব, সে সকলের মধ্য দিয়ে বিদ্যার্থীগণ লাভ করে উচ্চ আদর্শ জীবনের উদ্দীপনা। সাময়িক পত্রিকা ও বহু মূল্যবান গ্রন্থ সম্বলিত আশ্রমের গ্রন্থাগার থেকে তারা পায় প্রচুর মনের খোরাক। হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা, বিচিত্রানুষ্ঠান এবং নাট্যাভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে বিদ্যার্থীগণের সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ আছে প্রচুর। কিছুদিন আগে এই হাতে লেখা পত্রিকা 'বিদ্যার্থী'র যে বিশেষ সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছে অথবা গত মার্চে ছাত্রদের যে নাট্যাভিনয় হয়ে গেল তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই বিদ্যার্থীদের সর্বতোমুখী কুশলতার প্রশংসা করবেন। শরীর গঠনের সহায়তার জন্য একটি শিক্ষাবিদ্ নিযুক্ত আছেন। তাছাড়া দুটী বড় খেলার মাঠ, সন্তরণ ও নৌচালনার জন্য দুটি বৃহৎ জলাশয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কার্যকরী শিক্ষার জন্যও কৃষিশিল্প বিভাগের পরিকল্পনা অনেকখানি বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। বর্তমানে ফুল-ফলের বাগান, তরকারীর ও ধানের ক্ষেত, মাছের চাষ ও গোপালন—এ বিষয়ে ছেলেরা অনেক কিছু শিখ্‌তে পারে।

এসকলের পিছনে রয়েছে এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, যা বিদ্যার্থীশিক্ষণের একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। সকাল ও সন্ধ্যায় মন্দিরের পুণ্য পরিবেশে সমবেত প্রার্থনা ও ভজনগান তরুণ মনগুলির জড়তা ও ক্লান্তি দূর করে তাদের প্রাণশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে। তারপর প্রাত্যহিক কিছু কাজ—পূজোর ফুল তোলা, নিজের ঘরবাড়ী পরিষ্কার —কিছু না কিছু কাজ সকলকে করতে হয়। এসব কাজের ব্যবস্থা বা তদারক করার ভার থাকে বিদ্যার্থীদের নিজেদের উপর। ফলে শ্রমের মর্যাদাবোধ ও তার সঙ্গে পাঁচজন মিলে বা পাঁচজনকে নিয়ে কাজ করার যে অতি-প্রয়োজনীয় শিক্ষা তা তারা পায় অতি সহজে। তবে এই কাজের জন্য পড়াশুনার ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয় সব সময়। বিদ্যার্থী আশ্রমের বিভিন্নমুখী কর্মসূচী ছাত্রদের পড়াশুনার সহায়ক হয়ে এসেছে এতদিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় তাদের সাফল্য অনন্যসাধারণ। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম হওয়া, ডিগ্রী পরীক্ষায় অনার্স বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করা, আর এম.এ, এম, এস সিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভকরার সৌভাগ্য এখানকার বিদ্যার্থীরা অর্জন করেছে একাধিকবার। সুচিন্তিত একটি কর্মধারা দিনের প্রতি মুহূর্তকে যাতে ফলপ্রসূ করে তোলে তার একনিষ্ঠ সাধনা

রয়েছে এখানে। কিন্তু নিয়মের বন্ধন যাতে জীবনকে শুষ্ক ক'রে না দেয়, তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। দিনের কর্মসূচীর মধ্যে গানবাজনা, খেলাধুলা ত আছেই, তাছাড়া রাত্রির আহারের পর যে অন্ধকারময় কর্ম-সূচী 'নৈশ সম্মেলন' তার আকর্ষণ বিদ্যার্থীদের কাছে খুব বেশী। এই সময় বিদ্যার্থীরা সবাই একজায়গায় সমবেত হয় এবং তাদের সঙ্গে বসেন বিদ্যার্থী-আশ্রমের সেবকেরা। নানারকমের হাসির গল্প, কখনও বা আবৃত্তি, বিতর্ক ও সঙ্গীত রকমারী বিষয়ের পরিবেশনে বৈঠকটি খুবই প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। সারাদিনের কাজকর্মের পর এখানে শুধু হাসি ও আনন্দের অবকাশ।

প্রতিদিনের এই মধুর জীবন মধুরতর হয়ে উঠে কয়েকটি বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানে। এই প্রসঙ্গে ভ্রাতৃবরণের দিনটি স্মরণীয়—নূতনদের আগমন উপলক্ষে পুরাতনেরা এই উৎসবের আয়োজন করে। নবীনেরা পূত হোমাগ্নিতে আহুতি দেয়—প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের ঋষিবালকদের মত। পুণ্যব্রত গ্রহণ করে জীবনে বড় হওয়ার এবং অপরের ভাল করার দীক্ষা গ্রহণ করা হয় তারপর যে অভ্যর্থনা সভা বসে তাতে ফুল চন্দন দিয়ে নবীনদের বরণ করা হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে—বিদ্যার্থী আশ্রমের পুণ্য জীবন সাধনায়।

এছাড়া আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে শ্রীশ্রীকালীপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বিশেষ দিনগুলি ভাবগম্ভীর দৈনন্দিন জীবন প্রবাহকে আনন্দোচ্ছল করে তোলে। এছাড়াও আছে স্বামীজী, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের জন্মতিথি এবং স্বাধীনতা উৎসবের বিশেষ ক্ষণ —যখন তরুণদের কর্মচাঞ্চল্যে আশ্রমে আনন্দমুখর হয়ে উঠে। এই সব দিনের আলোচনা সভায় এবং আশ্রমে অনুষ্ঠিত মাসিক বৈঠকগুলিতে বহু গুণীব্যক্তি আমন্ত্রিত হন যাঁদের ভাবসম্পদ তরুণমনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে!

বিদ্যার্থী আশ্রমের পুণ্য অঙ্গনে অভ্যর্থনা আছে কিন্তু বিদায়ের রীতি নেই। বিদ্যার্থীরা আশ্রমিক জীবন শেষ করে যখন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন আশ্রম থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং তাদের সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শময় প্রতিষ্ঠানের সীমারেখা বর্ধিত হয় দূরদূরান্তরে। অতীত দিনের সুখস্মৃতি আর আদর্শের এক ঐকান্তিক নিষ্ঠা—এই নিয়ে তারা কঠোর জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়—কিন্তু মনটি পড়ে থাকে এই পরমতীর্থের আনন্দময় মিলনক্ষেত্রে। তাই দেখি প্রাক্তনদের সঙ্গে বিদ্যার্থী আশ্রমের সম্বন্ধ বড় মধুর। আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য প্রাক্তনদের একটি সংস্থা আছে এবং তা থেকে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়ে আসছে গত কয়েক বছর। তাছাড়া এই সংস্থা প্রতি বছর নববর্ষ সম্মেলন ও বিজয়া-সম্মেলন এবং প্রতি তিন বছর অন্তর মিলনোৎসবের আয়োজন করেন। প্রতি অনুষ্ঠানেই প্রাক্তনেরা যোগ দেন দলে দলে, কিন্তু মিলনোৎসবের আকর্ষণ তাঁদের কাছে সবচেয়ে বেশী। গত বছর (১৯৫৪ এপ্রিল) যে মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হল তাতে দূর-দূরান্ত থেকে সমবেত হয়েছিলেন এখানকার প্রাক্তনেরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কত গুণী ব্যক্তি; আদর্শ-জীবন শিক্ষাব্রতী, শাসনবিভাগের উচ্চপদাধিকারী, কৃতবিদ্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার উকীল আবার কেউ বা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। জীবন-সংগ্রামের জয়তিলক তাঁদের সকলের কপালে। কিন্তু সকলেই এখানে ভুলে গেলেন তাঁদের পদমর্যাদা। যে আনন্দময় উৎসধারা থেকে তাঁদের জীবনপ্রবাহ একদিন গতি ও আবেগ আহরণ করেছিল আজ তাঁরা সেই উৎসে আবার ফিরে যেতে চান। প্রবীণ আশ্রমাধ্যক্ষ তাঁদের স্বাগত জানালেন পরম আদরে। আন্তরিকতাপূর্ণ এক উৎসব সূচী পালিত হল তিনদিন ধরে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, বিশেষ অনুষ্ঠান, প্রাক্তনদের ঘনিষ্ঠতা সব কিছুর ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে শিক্ষা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের এক সার্থক সাধনা।

শিলালিপি

রত্নেশ্বর হাজরা

নীরোগ বলিষ্ঠ হিংস্র বর্বরতা জাগে নগ্নতায়
আদিম অরণ্য হতে পদক্ষেপ নিয়ে শ্বাপদের
রাত্রির আঁধার খোঁজে—কম্পিত গুহায়,
কখনো শংকিত প্রাণ, কখনো উল্লাস মাতালের ;
প্রস্তর যুগের প্রাণ প্রাগ্ইতিহাসে নাম তার,
বর্বর বুকের চাপে টলোমলো যৌবন আমার।

আমি বন্ধ্যা থেকে যাই, জননীর কামনা ঘুমাক,
লম্পটের বীর্যে-গড়া আমি আজ চাইনা সন্তান,—
অগ্নির স্বাক্ষর নিয়ে পারে কেউ সে বল ঘুচাক,
না হলে আমাকে দাও, হে অনঙ্গ, ঐ পঞ্চবাণ।
আমি তার রূপ দিই বুকের শোণিত ঢেলে লাল
আদিম নারীর মতো নিয়ে দেখি আবার মশাল।

শ্মশানে আগুন যদি না জ্বালাতে পারি কাজ নাই
তবুও রক্তিম হবে—কুমারী আশ্বাস রেখে যাই।
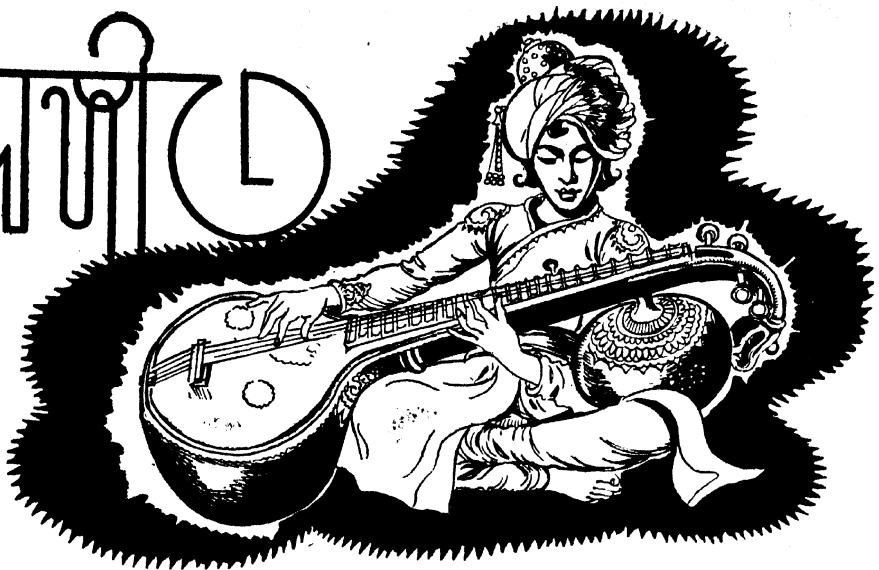
জাতীয় সঙ্গীত

মিশ্র-দাদ্‌রা

হে মহান্‌ তুমি জাতিরে দিয়েছ তব অহিংসা দান
অক্ষত সাগরে নিখিল মানব হ'ল আজি ম্রিয়মাণ ॥
সাধনা তোমার ওগো মহাত্মা
এনেছে বিশ্বে প্রেমের বারতা
নির্জ্জিত এই ভারতবর্ষে জাগালে স্বাধীন প্রাণ ॥

কোথা গান্ধিজী দেশের সেবক জাতির জনক তুমি
তোমার বিরহে কাঁদিছে বিশ্ব কাঁদিছে ভারতভূমি
বাংলার মাটি কাঁদিয়া আকুল
জেগেছে সবাই ভেঙ্গে গেছে ভুল
তোমার মন্ত্র আশিসে আমরা রাখিব দেশের মান ॥

কথা—শ্রীবিমলেন্দু মান্না

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

না—শুদ্ধ
ণা—কোমল

+ ০ + ০
{ সা গা ধা | ধা পা গা | পা । । | পা । । }
{ হে ম হা ন্‌ হে ম হা ০ ন্‌ ০ ০ ০ }

II সা গা ধা | ধা । । | পা ম্মা পা | গা গমা গা I
হে ম হা ন্‌ তু মি জা তি রে দি য়ে০ ছ

সা পা পা |. পা পগা মা | র্সা । ধা | ধা । । I
ত ব অ হিং ০ সা দা ০ ন ০ ০ ০

পা ক্ষা পা | ধা মা । | পধা পধা ধা | মা গা । I
অ ০ শ্রু সা গ রে নি০ খি০ ল ভু ব ন

প্‌া ন্‌া সা | রা ন্‌া সা | পা । গা | গা । । II
হ ল আ জি ত্রি য় মা ০ ০ ০ ০ ন

\+ ০ + ০
II না না না | । । । | না । । | র্সা । না I
সা ধ না তো মা র ও গো ম হা ০ আ

ধা । । | । । । | ধা । ধদা | ধা ননা পা I
এ নে ছে বি ০ শ্বে প্রে মে র০ বা র০ ০

পা । । | । । । | পর্গা । । | র্রা । সা I
তা ০ ০ ০ ০ ০ নি০ র্জ্জি ত এ ই ভা

র্রা । । | র্সা র্সধা ধা | সা রা গা | পা গা পা I
র ত ০ ব ০০ র্ষে জা গা লে স্বা ধী ন

র্সা । । | । । । | র্সা । ধা | পমা । মা I
প্রা ০ ণ ০ ০ ০ হে ০ ম হা০ ০ ন

পা । গা | রসা । সা II
হে ০ ম হা০ ০ ন

\+ ০ + ০
II সগা গা । | গা । । | গা গপা পা | গা গরা রা I
কো থা গা ন্ধি ০ জী দে শে০ র সে ব ক

সরা রা । | রা । সা | সগা রগা সা | সা । । I
জা তি র জ ন ক তু০ মি০ ০ ০ ০ ০

সা ধা । | ধা । । | ধনা ধনা না | পা । । I
তো মা র বি র হে কাঁ০ দি০ ছে বি ০ শ্ব

গা ধা া | পা া গা | সরা গা া | গা া া I
কাঁ দি ছে ভা র ত ভূ০ ০ মি ০ ০ ০

গা না া | না র্সনা না | না র্সা ধা | পধা পধা না I
বাং ০ লা র মা০ টী কাঁ দি য়া আ০ কু০ ল

না র্সা ধা | না দা া | গা দা ধা | র্সা র্সনা ধনা I
জে গে ছে স বা ই ভে ঙ্গে গে ছে ভু০ ০০

ধা া া | া া া | র্গা া া | র্রা া র্সা I
ল ০ ০ ০ ০ ০ তো মা র ম ০ ন্ত্র

র্রা া া | র্সা র্সধা ধা | সা রা গা | পা গা পা I
আ শি সে আ ম০ রা রা খি ব দে শে র

র্সা া া | র্সা া া II II
মা ০ ন ০ ০ ০

দ্বিজ নিত্যানন্দ শিবায়ন

শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু এম-এ

শিবায়নের সুরু হ'য়েছিল উত্তরবঙ্গে কোচজাতির মধ্যে—যা থেকে শিবের কোচনী-প্রীতির কথা প্রচলিত আছে। রামেশ্বরের শিবায়ন বা মৃগলুব্ধ পুঁথিতে আমরা যে কাহিনী পেয়েছি আলোচ্য পুথিটি সেই ধারারই বাহক। কাব্যের এই অনুকৃতির পিছনে যে যুক্তি ছিলনা তা নয়। কারণ মঙ্গল-কাব্যের যুগে সাধারণতঃ দেবদেবীর কাহিনী নিয়ে কাব্য লেখা হোত। কবি দেবতা কর্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে কাব্য লিখতেন। আর দেব মাহাত্ম্য সূচিত না করলে জন-সমাজ কর্তৃক সে কাব্য হোত অনাদৃত। সেই সব কারণেই একই কাহিনীকে অবলম্বন করে বিভিন্ন কবি কাব্যরচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর বিচিত্রতা না থাকলেও এই সব কবিদের স্বাতন্ত্র্য ও কাব্যিক বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না।

আলোচ্য পুথিটি কবি নিত্যানন্দের রচিত। এই নিত্যানন্দ যে কে ছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানিনে। বৈষ্ণব কবি এক নিত্যানন্দ দাসের অস্তিত্বের সন্ধান মিলে, কিন্তু তিনিই যে শিবায়ন প্রণেতা নিত্যানন্দ তার কোন প্রমাণ নেই। আলোচ্য পুথির কবি তিনরকম ভণিতা ব্যবহার করেছেন :

(১) বিপ্র নিত্যানন্দ—

> "পার্ব্বতির বাক্যে সায় দিল পদ্মাবতী।
> বলে বিপ্র নিত্যানন্দ বিভুপদে মতি ॥"

(২) দ্বিজ নিত্যানন্দ—

> "হিত করি পদ্মা হেথা হোগলের বনে।
> নিচুহৈয়া রৈল দ্বিজ নিত্যানন্দ ভণে ॥"

(৩) নিত্যানন্দ

> "দেখিব জোর্জ্জার কত যাবতার্থ স্থানে।
> ভীম কহে শুন শুনে নিত্যানন্দ ভণে ॥"

এই ভণিতা ছাড়া আলোচ্য পুথিতে কবি সম্বন্ধে নূতন কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় আমরা এক 'দ্বিজ নিত্যানন্দের দেখা পেয়েছি। তিনি 'শ্রীচৈতন্য পাঁচালী' প্রণেতা। আলোচ্য পুথিতে হয়তো কবি সম্বন্ধে কিছু বলা যেত, কিন্তু ১৯ পৃষ্ঠার পর পুথিটি খণ্ডিত হয়েছে। তার ফলে এর লিপিকাল, কবি প্রভৃতি কিছুই জানা যায়নি। তবে মনে হয় এটি উনবিংশ শতাব্দীর পরে অনুলিখিত হয়নি।

শিব বৈদিক দেবতারূপে গণ্য হবার পরেও বাংলার নিম্নকোটি মহলে তাঁর রূপ ছিল কৃষক। উত্তরবঙ্গের প্রধান উপজীব্য কৃষি। আর সেই কৃষির দেবতারূপে গৃহীত হলেন শিব। দরিদ্রের সংসার দুবেলা আহারও জোটে না, তাই ভাগিনা পবননন্দন ভীমকে নিয়ে শিব চ'ললেন ধান চাষ ক'রতে। এদিকে শিবের অদর্শনে গৌরী অস্থির হ'য়ে উঠেছেন, তিনি ডোমনীর বেশে চললেন শিবের সন্ধানে। ডোমনী-পার্ব্বতীর রূপযৌবনে আকৃষ্ট শিবের চপলতা ও তাঁদের মিলনই কাব্যের উপজীব্য বিষয়।

এই কাহিনী সর্বজনপরিচিত। এখানে দেবতা হরগৌরী সম্পর্কে দু'একটি কথার উল্লেখ থাকলেও সাধারণতঃ তাঁদের মানুষীরূপেরই বর্ণনা করা হ'য়েছে। এই শিবদুর্গা যেন বাঙ্গালী ঘরের ছেলে মেয়ে। শ্রীনন্দদুলাল সেনগুপ্তের ভাষায়—'এই শিব যেন কোন এক শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য, আর পার্বতী সর্বংসহা ভট্টাচার্য গৃহিণী।'

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রেরা জানেন—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিশেষতঃ রাজদরবার সংক্রান্ত কাব্যে ভাষার রাজসিক আড়ম্বর থাকলেও রুচির কৌলিন্য সব সময় বজায় থাকে নি। এর প্রমাণ মিলে ভারতচন্দ্রের কাব্যে। যে গ্রাম্যতা এখন আমাদের চক্ষুর পীড়াদায়ক—তখনকার দিনে তা সাধারণ ও সহজপাচ্য ছিল; কাজেই সেই গ্রাম্যতাকে রুচিবিকার বলা উচিত নয়। আলোচ্য কাব্যে গৌরী ও শিবের রহস্য-পরিহাসের মধ্যেও অনেক রসবিকারের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সেগুলি আমাদের কবির ত্রুটি কিংবা শিবায়ন শ্রেণীর কাব্যের সাধারণ ভূষণ—বলা শক্ত।

পুথির মলাটে লেখা আছে 'শিবায়ন মৎস ধরার পালা। কাব্যধারার অনুসরণে রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

"শিবের সঙ্গীত যেন সুধার পসরা।
শুন সবে গিরিশ গৌরির মৎসধরা॥
ছয়মাস গৃহছাড়ি গেছে শূলপানি।
বিসাদিত হৈয়া গৌরী হয় বাগদিনী॥

কার্তিক গণেশ শিবকে খোঁজেন—অভিমানে গৌরীর কণ্ঠরুদ্ধ, কিইবা করেন। পরে সখী কুমুদার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিন্তু কিইবা করবেন—শিব কি সাধে গিয়েছেন!

"সেবকের অন্নদোষ ক্ষেমিও শূলপাণি।
সর্ব্বসিদ্ধি শিবের ঘরে অন্ন টানাটানি।
সন্ধ্যায় প্রদীপ নাই দিবসে আহার।
ভাল মতে এক সন্ধ্যা না হয় সুসার॥
ভিক্ষা করে ভবেশ্বর জগত ভুবনে।
অন্নের ভাবনা পুন চিন্তা অনুক্ষণে॥"

অন্ন চিন্তায় অস্থির হ'য়ে শিব কৃষিকার্যে মন দিলেন। সমস্ত কৈলাস শূলীর বিরহে কাতর। পার্বতীর চোখে অশ্রুর পারাবার। সহচরী পদ্মাকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন।

"দাসিনী পদ্মার কাছে পেয়ে উপদেশ।
ভব ভুলাইতে ভীমা বাগদিনির বেশ॥"

তাঁর সীমন্তে সিন্দুর, কর্ণে রামকড়ি, দুই করে রাঙা রুলি—পরিধানে রাঙা সাড়ী—হাতে জাল আর হাঁড়ি। পার্বতী বিচিত্র বেশে চলেছেন।

"দাসী সঙ্গে দানবদলনি দ্রুত পায়।
এমনি মোহিনী ভব ভুলাইতে জায়॥"

শিবের কৃষিক্ষেত্রে এসে গৌরী মোহিত হ'য়ে গেলেন। নবদুর্বাদলতুল্য ধান্যক্ষেত্রের অপূর্বতা গৌরীকে বিস্মিত করে তুললো।

"দাসী সঙ্গে দক্ষজা দেখিয়া যত ধান্য।
কর্ণে কর দিয়া কহে ধূর্জটিকে ধন্য॥
সুন্দর সেজেছে শস্য সর্ব্ব অনুপাম।
লহ লহ অতি লক্ষ দুর্ব্বাদল শ্যাম॥
আসিয়া জলধমেঘ যেমন উদয়।
ধান্য দেখি পুণ্যবতী প্রফুল্ল হৃদয়॥"

সত্যই শূলপাণি ধন্যবাদার্হ। মোহিত হ'লেও পার্বতী নিজের সঙ্কল্পে অটল। তিনি বাগদিনির বেশে শঙ্করকে ভুলাতে চান। পদ্মা স্মরণ করিয়ে দিল—ধান ভেঙে মাছ না ধরতে—কারণ এতে শঙ্কর দুঃখ পেতে পারেন। কিন্তু গৌরী অটল। মাছ ধরতে সুরু করেন তিনি। পায়ের চাপে ধান ভাঙে—কাদায় চট্‌পট্ শব্দ হয়। মাছও পেলেন প্রচুর।

প্রথমে প্রচুর পুঁটি পড়িল প্রচুর।
রাটাললা বুদালি খরালি মদ্গুর॥
চুণা চুণা চিঙ্গুড়ি চঞ্চল যত চাদা।
পাটাতে পড়িয়া তার উপরে হৈল বাঁধা॥
বড় বড় বাটা মৎস বড় হৈল ভরা।
পার্বতি বলেন পাটা টিকে নাই পারা॥

অনেকদিন ধানের ক্ষেত তদারক করা হয়নি। শিব-ভাগিনা ভীমকে অনুরোধ করলেন ক্ষেত দেখে আসতে। উপযুক্ত মামার উপযুক্ত ভাগিনা। সে বললে চাষে খেটে খেটে কোমরে ব্যথা হ'য়েছে—আমি

আর পারি না। তুমিতো কেবল ফরমাসই করতে পার, নিজে যাও না। যাক্ শিবের অনেক কাকুতিতে ভীম গেল ক্ষেত তদারক করতে।

এদিকে বাগদিনীবেশী দুর্গা ধান ভেঙে মাছ ধরে চলেছেন। দেখে ভীম রেগে আগুন। বলে—

"আরে মাগী কি করিলি হায় হায় হায়॥
ঘেট্যা লুট্যা ক্ষেত কর্য্যাছি যেয়্যা কাটামাটি।
হেন ধান্য ভাঙ্গ হেদে অভাগার বেটি॥"

বাগদিনীও কম বাক্পটু নয়। বিলে মাছধরাও তার জন্মগত অধিকার। ভীম-বাগদিনীর ঝগড়া উপভোগ্য। তবে সুরের মধ্যে যেন গ্রাম্যভাব বেশী। ভীমের কটূক্তিতে বাগদিনী প্রচণ্ডা হ'য়ে রুখে উঠ্লে ভীম ভয় পেয়ে শিবের কাছে গিয়ে তাঁকে সব জানালো। ভীম শিবের কাছে বাগদিনীর রূপ বর্ণনা সুরু করলো।

"বৃকোদর বলে মামা কি দিব রূপের সীমা
রসময়ী নূতন যৌবনী।
মুখের মধুর হাসে আকাশে বিজলী খসে
জলে জল মিশায় যেমনি॥
প্রেমাঞ্জরি কলাবতী নবঘন অঙ্গজ্যোতি
এক মুখে কি বলিব মামা।
যোগমুখে বসি বিধি কোটিকল্প কয় যদি
তথাপি নারিতে দিবে সীমা॥
নবীন বয়স বেশা কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশা
মুখপদ্ম পূর্ণ সৌদামিনী।
দেখিয়া রূপের ছবি কিরণ হরের রবি
লজ্জিত হইল কাদম্বিনী॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি হেন বুঝি তাহা দেখি
করঙ্গ মলিন লজ্জা ভাবি।
দোষের নাহিক লেশ কম্বুজিনি কণ্ঠদেশ
কৃশোদরি জিনি বর নাভি॥
কপালে সিন্দুর ফোঁটা তাহে চন্দনের ছিটা
স্বেদ বিন্দু বিন্দু চিহ্নবান॥
কামের কামনা ভুরু অঙ্গে ভঙ্গে দেহচারু
কটাক্ষে হরিয়া লয় প্রাণ॥

* * * *

গলে দিব্য পরিপাটি বিচিত্র সোনার কাটি
মণিময় হেমপুতি পলা।
গজেন্দ্র গঞ্জিয়া গতি জিনিয়া এ মৃগপতি
উরুদেশ জিনি রামকলা॥

* * * *

যুবতী যৌবনভরে চলিয়া চলিতে নারে
মন্দগতি মরালগামিনী।
মনোহর অঙ্গরুচি তারা অরুন্ধতি শচি
জিনি রম্ভা উর্ব্বশী মোহিনী॥
ধান্য ভাঙ্গে মৎস ধরে লজ্জা ভয় নাহি করে
রূপে কৃষিভূম করে আল।
শুনিয়া আমার স্থানে প্রত্যয় না হবে মনে
সাক্ষাতে দেখাব মামা চল॥"

শিব বললেন, নিশ্চয়ই গৌরী এসেছেন ছদ্মবেশে—তাঁকে ছলনা করতে। ভীম বললেন—

"বৃকোদর বলে জা মামী দুছেলের মা
আমি কি মামীকে চিনি নাই?"

ভীমের প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে শিব যাত্রা করলেন। ধান ক্ষেতে হৈমবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল। বিভু বৃকোদর স্থানে বৃষ রেখে ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরমাসুন্দরী বাগদিনীকে দেখে শঙ্কর ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। তারপর চল্লো দীর্ঘসময় ধরে উভয়ের বাক্যবাণ। এই বাক্যুদ্ধের দু'একটি রসঘন অবস্থার বর্ণনা দেওয়া যাক্।

"বাগদিনী বলে আছে এত ব্যস্ত কেন।
কি করিবে পরিচয়ে ভাল কথা শুন॥
পর্ব্বত নগরে পিতা হিমালয় বুড়া।
বিন্ধ্যাচল বাগতি আমার হয় খুড়া॥

* * *

এই কি যে অর্থ লোভে আমার মা বাপ।
বুড়া বরে দিয়াছে মোরে নিত্য মনস্তাপ॥
বহুত বিলাপ করি স্বামী মাত্র বুড়া।
সর্ব্ব সুখে দিন যায় রাত্রি সুখ ছাড়া॥

* * *

শিব নিজের পরিচয় দিলে বাগদিনী বিনীত হ'য়ে বললেন,—

"বাগদিনী বলে সখা শুনে লাগে ভয়।
সংসারের সার তুমি হও মৃত্যুঞ্জয়॥
আমি নর নীচ জাতি ধীবরের দার।
বসিতে তোমার কাছে সাধ্য কি আমার॥
কামাতুরে ক্রীড়া করে কুল মজাইবে।
অমর সভায় উগ্র অপযশ পাবে॥
দূরকর দেবরায় চিত্তে দেহ ক্ষমা।
বিভু বলে বলি শুন বুঝাইয়া তুমা॥
বড় ভাই ব্রহ্মা মোর সৃষ্টিকর্ত্তা যে।
কন্যাকে করিতে বিয়া চেয়েছিল সে॥

আর ভাই অনচ্ছুত উপেন্দ নাম ধরে।
বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনা সহিত বিহারে॥
সুরকুল স্বামী শক্র হরে গুরুদার।
শুন সই সংসারেতে সাধ্য আছে কার॥
এড়াতে নারিবে আজি আলিঙ্গন বই।
বাগদিনী বলে আমি তেমন মেয়ে নই॥

শিব তাবৎ জাগতিক জীবের চরিত্রহীনতার ফিরিস্তি দিয়ে চলেছেন। শিবের আহ্বানের উত্তরে শিবানী বললেন—বৃদ্ধ স্বামীর দুঃখেই যদি নতুন নাগরের প্রয়োজন হয় তবে বুড়াকে বরণ করার হেতু কি? শিবের অনেক অনুনয় বিনয়ে বাগদিনীর অন্তর আর্দ্র হোল। তিনি বললেন—আমার কথা যদি শোন ও সেই মত কাজ কর—তা হোলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ ক'রবো। বাগদিনী প্রস্তাব করলেন—ধান্য বনে দুজনে বান্ধিব আইস কুড়া।" বললেন,—আমি মাছ ধরবো, ঝাঁকা সাজিয়ে তোমার কাঁধে তুলে যাব বাজারে-মাছ বিক্রী করতে। শিবের মনে লাগলোনা সে কথা। শেষে বাগদিনীর অনুরোধে শিব জল সেচন শুরু করলেন। বাগদিনী মাছ ধরেন।

"চিথল চিঙ্গিড়া চেই চান্দা চুনা চানা।
আমকাচুরা ইলিশ রুহিত রূপাপাটি॥
পেতে পুরাইয়া ধরে রাখিল বুর্জ্জটি।
ভলা ভেট্‌কি ভোলকড়া ভুতকুড়ি ভাজাতালি॥
তেচৈঙ্গরা টেঙ্গরা ধরাজি ধানহুলি॥
গন্ধবড়া গাগর গোড়ই ধরে গুত্যা।
পশুপতি পশ্চাতে জোগায়ে দেয় পেত্যা॥
ফলুই কাতল কই কুড়চি কাম্বাস।
তারই পারল পুঁটি পাব্‌দা পাঙ্গাশ॥
আড়িইসা মদ্গুর মৃগাল মুরালা।
বাণির্কালি বাশপাতা বাটি বাটানলা॥
সাল সোল সিঙ্গীকে শঙ্কর ধরে তেড়ে।
ডানিকলা তেচখে রাখিয়া দিল ছেড়ে॥

মাছধরার পর শ্রান্ত হয়ে গাছতলায় বসে শিব বাগদিনীকে ডাক দিলেন। বাগদিনী কর্দমময় দেহ পরিষ্কার করার ছলে পদ্মাকে নিয়ে কৈলাসে চলে গেলেন। হতাশ শিবকে ভীম বহু কষ্টে কৈলাসে নিয়ে এল। পিতাকে দেখে গণেশ ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। শিবানী বাধা দিলেন, টেনে নিলেন ছেলেকে। ভণ্ডপ্রতারক বলে গালি দিলেন শিবকে। শেষের ঘটনা climaxএর দিকে এগিয়ে এসেছে। কবির কথাতেই বলা যাক্।

"হেতা আয় হেরম্ব ডাকেন হৈমবতী!
বসুধাতে তোর বাপ হইয়াছে বাগ্দী॥
এত শুনি শিবের শুধান বাণমুখ।
ঈশ্বরী বলেন আট্যা ঐখানে থাক॥
বাগদিনী বধূ পেয়ে পাসরাহ মোকে।
কোন কার্য্য কেন আইলে কে ডেকেছে তোকে॥
কিন্তু হৈয়া কন প্রভু কাত্যায়নী স্থানে।
এমন আপত্য কেন অকিঞ্চন জনে॥
প্রাণ গেলে পরবধূ পরশ করি নাই।
তিন সত্য ত্রিলোচনা তোমার দোহাই॥

*　　*　　*　　*

প্রভুবাক্যে প্রেমময়ী পাঁচখান হৈয়া।
কোপানলে কহেন অঙ্গুরি কাছে দিয়া॥
কাল হেনকালে আইল একটি বাগদিনী।
ভুরূভঙ্গে ভুবন ভুলাতে চান তিনি॥

*　　*　　*　　*

তিলেক ধ্যানে ত্রিলোচন তত্ত্ব পাইল যত।
বিমলা বাগদিনী হৈয়া বাকচক্র এত॥
মহাক্রোধে মহেশ্বর মনে মনে বলে।
সাজাব সুন্দর করে শঙ্খ দিতে গেলে॥"

পুথি এখানেই খণ্ডিত হয়েছে। কাজেই শিবের দুর্গতির খবর আর পাওয়া যায় নি। তবে পরবর্তী ঘটনা আমাদের জানা।

* পুথিটি হাওড়া জেলার পানশীলা গ্রামের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র পাল মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
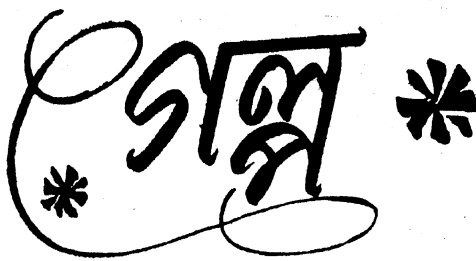
স্বভাব

শক্তিপদ রাজগুরু

নোতুন জামাই এসেছে বাড়ীতে, মণিকা দ্বিরাগমনে যাচ্ছে, সারাদিন হৈ চৈ চলেছে। বড়বৌদি, মেজবৌদি সকলেই বিদায়বেলায় ঘিরে ধরেছেন মণিকাকে, বেহালা থেকে বাগবাজার কি এমন দূর! তবুও তো শ্বশুরবাড়ী। মেয়ে পর হয়ে গেছে—তবুও মায়া কাটেনি। মা ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কর্ত্তাবাবু বাইরের ঘরে নীরবে বসে কি ভাবছেন। গাড়ী তৈরী। হঠাৎ নোতুন জামাইএর কাপড় একখানা পাওয়া যাচ্ছে না। দামা কাঁচি-ধুতিখানা স্নানের পর মেলে দিয়েছিল ঝি উঠোনে তারের আলনায়! একি কথা! খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায়।

—ঠিক মনে পড়ছে তো পটল?

গিন্নীমার কথায় ঝি ফোঁস করে ওঠে—তোমার যেমন কথা মা, নিজে মেল্লু—

চাকরটাকে বকতে সুরু করেন কত্তা—ব্যাটা হারাম-জাদা, সদর দরজা হাট করে খুলে নাক ডাকাস? দেখ কেউ ঢুকে নিয়েই গেল নাকি!

বাড়ীর সব ঘরগুলোই তন্ন তন্ন করে খোঁজা গেল, আর সবই ঠিক আছে—নাই কেবল ওই ধুতিখানাই। ওদিকে 'অমৃতযোগ' পার হয়ে যাচ্ছে।

—খুঁজে পেলে পাঠিয়ে দোব, না হয় অন্য ব্যবস্থা হবে, এখন যেতে দাও ওদিকে।

...বর-কনে বিদায় হয়ে গেল, কিন্তু গিন্নীমার মনের খুঁতখুতোনি গেল না। কি এক কুলক্ষণ নাকি?

সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসে প্রমথ, মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান, পেশা ওকালতি। আলিপুর বারের নামকরা প্র্যাকটিশনার। দু'পুরুষ ধরে খ্যাতির সঙ্গে ওকালতি করছে ওরা। পিতাপুত্র একসঙ্গে বার হয়, সময়ে সময়ে এজলাসে হাকিমের সামনে বাবার তীক্ষ্ণ যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করে টেবিল চাপড়ে প্রমথ কোট মাথায় তুলে চীৎকার করে

—"ইওর অনার, দি ষ্টেটমেণ্ট অব মাই লারনেড ফ্রেণ্ড হ্যাজ গট নো ফাউনডেশন ইন ফ্যাক্ট।"

শেয়ানা মক্কেলের দল বাপবেটার এই তরজার আসরে ভিড় জমায়। ছেলের মুখের সামনে দাঁড়াতে বারের প্রবীণ উকিল মনোহরবাবুও ঘেমে নেয়ে ওঠেন। প্রমথের সওয়াল-জবাবের তোড় সামলাতে হাকিমও হিমসিম খেয়ে যায়।

এই তীক্ষ্ণধী, খ্যাতির জোরেই ইলেকসনে জিতেছে এবং কমিশনার থেকে ভাইসচেয়ারম্যানও হয়েছে। রবিবারের বৈকালে মিটিং থেকে ফিরছে। ট্যাক্স কলেকশন কি করে আরও ভালভাবে করা যায় তাই নিয়েই জোর বক্তৃতা দিয়েছে এবং কয়েকজন মিউনিসিপ্যালিটির বাস্তু ঘুঘুকেও কাৎ করে দিয়েছে।

—কি করেছো তুমি?

সামনেই অরুণকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। হাকিম-জজ সামলাতে পারে, তাদের চাহনি দেখেই মামলার হাল বুঝতে পারে, কিন্তু ঘরের ওই স্ত্রীরূপী চিজটিকে ঠিক চিনতে পারে না মাঝে মাঝে। আমতা আমতা করে জবাব দেয় প্রমথ—কি করলাম?

—"কি করলে? তোমার এই স্বভাব কি কোনদিনই বদলাবে না? মা—ওরে মীরা ডাক বাবাকে, সবাই আসুন, দেখে যান কি কাণ্ড।"

প্রমথ এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। অবশ্য এটা খানিকটা জেনে শুনেই সে করেছিল, তবে আশা করেনি যে তার অবর্তমানে এতসব ব্যাখানা ঘটে গেছে, মণিকারাও চলে গেছে স্বামীস্ত্রীতে এই বৈকালেই। আলনায় ওই ভালো ধুতিখানা দেখে কেমন যেন লোভই হয়েছিল। নিজের ট্রাঙ্ক খুলে ধুতি বার করানো—তার জন্য অরুণার কাছে দু'একটা ঠাট্টা শোনা—ওসব এড়িয়ে গিয়েই সে নোতুন জামাইএর কাপড়খানা পরে চলে গিয়েছিল।

বাড়ীর সকলেই ইতিমধ্যে এসে পড়েছে। মা—বাবা—মেজভাই সুমথ—ছোটভাই রমেন—সকলেই চেয়ে থাকে বড়দার দিকে, অরুণা বলে ওঠে

—"ওই দেখো জামাইএর কাপড়।"

সুমথ পুলিশইনস্পেক্টার, গম্ভীরভাবে বলে ওঠে

—"চুরির পর্য্যায়ে পড়ে এটা। তাছাড়া এরকম প্রায়ই করো তুমি।"

রমেন ডাক্তারি পাশ করে সবে প্র্যাকটিশ করছে, সেও ফোড়ন কাটে

—"সাইকোনিউরেটিক—"

—"থাম—থাম! খুব হয়েছে সব। ভারি তো একবার পরেছি কাপড়খানা…মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে।" প্রমথ বেশ রেগেই উঠেছে। অরুণাকে ধমকে দেয়

—"তাই নিয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোককে ডেকে দেখাতে লজ্জা করে না?"

অরুণাও ছাড়বার পাত্রী নয়, মেজঠাকুরপোকে সালিশ মানে

—"দেখছো ঠাকুরপো—লজ্জা ও'র হলো না—হবে আমার?"

মা শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা মীমাংসা করে দেন।

"থাম বাপু তোরা, হাতমুখ ধুগে যা প্রমথ! তোমাকেও বলি বৌমা—তুচ্ছ এই ব্যাপার নিয়ে এত হৈ চৈ বাধানোর কি দরকার?"

অরুণা বলে ওঠে! আদর দিয়েই ওঁকে বাড়িয়ে তুলেছেন মা! এসব কিন্তু ভারি বদভ্যাস।

আজ বলে নয়—প্রমথের ও অভ্যাস সকলেই জেনে ফেলেছে। ভাইদের যার হোক না কেন ফরসা ধুতি-লুঙ্গি পাবে আলনায়—চুপিসারে পরে বসে থাকবে। অনেক চেষ্টা করেও অরুণা স্বামীর এই বদভ্যাস ছাড়াতে পারেনি, ধুতি-লুঙি-গেঞ্জি গোটাকতক সর্বদাই বেশী করে বাইরে রাখে, কিন্তু তবুও প্রমথ ওই করে বসবে।

পাশাপাশি দুটো চেম্বার, কর্তা এবং প্রমথের। ওপাশে ছোটভাই রমেনের ডিস্পেনসারী। নিজের নিজের মক্কেল পেসেণ্ট সব আলাদা জায়গাতেই বসে। সেদিন প্রমথ খুব নিবিষ্টমনে একটা ক্যালসানি কেসের ব্রিফ পড়ছে, টেবিলের উপর নামানো একগাদা বই; একখানা পুরোনো ল' জার্নাল নিজের ঘরে খুঁজে না পেয়ে বাবার লাইব্রেরীতে ঢুকে হাতড়াতে থাকে, হঠাৎ নজরে পড়ে ড্রয়ারের ভিতর ওভ্যালটিনের কৌটা। দরজার দিকে সন্তর্পণে চেয়ে কৌটার ঢাকনি খুলে একমুঠো ওভ্যালটিন বার করে মুখে পুরে নেয়। বেশ লাগে! আর একমুঠো বার করতে গিয়ে কেমন করে কাৎ হয়ে গেল টিনটা, টেবিলের উপর—মেজেতে ছিটিয়ে পড়লো খানিক, বাকীটা তাড়াতাড়ি মুখে পুরে ঘর থেকে বইটা নিয়ে বার হয়ে এলো নিজের ঘরে।

মনোহরবাবু নিজের ঘরে ঢুকেই দেখেন টেবিলে—মেজেতে ছড়ানো রয়েছে ওভ্যালটিন…

—"মণ্টু!…বুলা—এ্যাই রুনু…"

দাদুর ডাকে নাতি-নাতনীরা এগিয়ে যায়। সামনে মণ্টুকেই ধরে ফেলেন মনোহরবাবু—"চুরি করে ওভ্যালটিন খেয়েছিস কেন?"

—"কই না তো?"

মাঝে মাঝে ঠাকুমার ভাড়ার ঘর থেকে আচার-কুলচুর-আমসত্ব চুরি করে সত্যি, তাই বলে দাদুর ঘর থেকে এই কাণ্ড করতে তার সাহস হবে না কোনদিন। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়, দাদু একধার থেকে সবাইকে কান-মলা নাকেখৎ দিয়ে তবে ঠাণ্ডা হন।

গিন্নী এগিয়ে আসেন—

—"না হয় খেয়েছেই বাপু, তাই বলে সব্বাইকে শাস্তি দেবে?"

—আলবৎ। উকিল মনোহরবাবু হাকিমী মেজাজ দেখাতে ছাড়েন না।

ওবরে প্রমথ নিবিষ্টমনে কালকের সওয়াল জবাবের খসড়া করছে। ৩০৯ ধারা থেকে আসামীকে খালাস করবার ফন্দীফিকির খোঁজে পেনালকোডের সমুদ্রে।

স্বামীকে কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখে অরুণাই চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। প্রমথের কোনদিকেই খেয়াল নাই। চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে বলে ওঠে সে—

—"বাবার কাণ্ড দেখেছো? ওভ্যালটিন চুরির দায়ে বাড়ীর সব ছেলেমেয়েগুলোকে নাকখৎ আর কানমলা দিয়ে ছাড়লেন।"

—"ঠিকই করেছেন।" চোখ মেলে স্ত্রীর দিকে চাইল প্রমথ।

—"হুঁ, তা তোমার গোঁফের ডগে এত ওভ্যালটিন এলো কোত্থেকে ?"

হকচকিয়ে যায় প্রমথ। পরমুহূর্তেই জামার হাতা দিয়ে বামাল সাফ করে দিয়ে বেশ জোর গলায় চীৎকার করে ওঠে

—"তোমার কি আর কোন কাজ নাই, এঘরে কাজের সময়ে কে আসতে বলেছে তোমাকে ?"

—"যাই খবরটা বাবাকে দিই গে।"

প্রমথর চোখে মুখে নেমে আসে শান্ত ছায়া, রাগ কোথায় উপে গেছে। স্ত্রীর দিকে কাচু মাচু হয়ে চেয়ে থাকে। হেসে ফেলে অরুণা

—"আর কিন্তু করো না।"

মনোহরবাবু মাঝে মাঝে ছেলের শরণাপন্ন হন, জটিল আইনের মারপ্যাচে পড়ে হিমসিম খাচ্ছেন, কোন নজীর হাতড়ে পান না। প্রমথের ডাক পড়ে—

—"এই মামলাটার কাল দিন আছে হে, একটু দেখদিকি কোন নজির-টজির বার করতে পারো।"

বাবা নিরাশ হয়ে তবে তাকে ডেকেছেন এও প্রমথ জানে। দুচার পাতা উলটে উঠে গিয়ে ইণ্ডিয়ান ল' জার্নাল, না হয় অন্য কোন কাগজপত্র ঘেঁটে ঠিক নজির তুলে আনে। বাবাকেই পরামর্শ দেয়

—"এভাবে আর্গুমেণ্ট করবেন না, ও পক্ষের উকিল নরেনবাবু ঘুঘু লোক ঠিক ঠেসে ধরবে, ওটাকে ঘুরিয়ে বলে যান যে আসামী ওর সীমানার মধ্যেই যায় নি, 'তড়া' পড়ে আছে—কোন বাঁটোয়ারা সীমানা আল কিছুই নাই। উলটে ফরিয়াদীকেই 'ট্রেস পাস' চার্জে ফেলবার পথ করে রাখুন।"

ছেলের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন মনোহর-বাবু, উকিলের ব্যাটা উকিল, তার এই বুদ্ধি হবে না তো কি মাষ্টারের ছেলে উকিলের মাথায় খেলবে এই প্যাঁচ। মনোহরবাবুর বাবা মাষ্টার ছিলেন কিনা।

কোর্টেও ছেলের সাহসে মনোহরবাবু পশার বজায় রেখে চলেছেন। তাঁর সমবয়সী প্রবীণ উকিলদের অনেকেই বিদায় নিয়েছেন, যদিবা কেউ টিকে আছেন তা কোন রকমে। বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে আসে বিস্মৃতি—এমন কি আসামী-ফরিয়াদীর সাক্ষীদের নামও গুলিয়ে যায়; ল' পয়েণ্ট তো দূরের কথা। তারপর মেজাজ হয়ে যায় তিরিক্ষি। পর পক্ষের উকিলের দু'চারটে চাটিম চাটিম বুলি শুনলেই আর ধৈর্য থাকে না। ফলে মামলা বেসামাল হয়ে যায়, কিন্তু মনোহরবাবুর ও ভয় নাই। বড়-সড় মামলায় প্রমথ বাবার কাছেই থাকে—দরকার হলে নিজেই উঠে জোরালো কণ্ঠে কড়া কড়া যুক্তিবাণ নিক্ষেপ করে উকিল-সাক্ষী-হাকিমকে বিভ্রান্ত করে দেয়।

তাই মনোহরবাবুর সম্মান আজও কমানই আছে, একাদিক্রমে দশ বছর ধরে বারের প্রেসিডেণ্ট পদে রয়ে গেছেন।

সেদিন কোর্টে যাচ্ছে প্রমথ, বাবা আগেই গিয়ে গাড়ীতে উঠেছেন, প্রমথ বার হয়ে আসছে—বাড়ীর ভিতরেই আটকায় তাকে সুমথ।

—"খোল কোট-সার্ট।"

—"কেন ?"

প্রমথ সুট পরে বার হয়ে আসছে—পথেই মেজভাইএর দারোগাগিরি দেখে একটু থমকে দাঁড়ায়।

—"আমার নোতুন গেঞ্জিটা পাচ্ছি না, আলনায় মেলা ছিল—বারকতক তোমাকে ওদিকে যেতে আসতে দেখেছি। সার্ট খোল তোমার গেঞ্জি দেখবো।"

—"বেশ জুলুম তোর যাহোক। এই নে টাকা, কিনে নিবি গেঞ্জি।"

হাতে নাতে ধরা পড়তেই দারোগা জেদ ধরে বসে—"টাকা চাই না, গেঞ্জি দিতে হবে।"

শেষ পর্য্যন্ত মিনু এসে দারোগা স্বামীকে সামলায়—"কোর্টে বেরুচ্ছেন এই সময়ই যত বাখরা। শুনে যাও তুমি।"

প্রমথ মেজবৌমাকে বলে ওঠে—"দেখো তো বৌমা, ও ভাবে বাড়ী তো নয়, এটা যেন ওর পুলিশ থানা। সব তাতেই জোর।"

কোন রকমে বার হয়ে গাড়ীতে উঠলো প্রমথ।

বাজারের ফড়ে—তরকারীওয়ালারা মাছওয়ালা সকলেই তাকে সেলাম করে, অন্য চেয়ারম্যানরা বাজার আদা তো দূরের কথা, বাড়ীর নায়েব চাকর পাঠিয়ে মাসকাবারী

বাজার করিয়ে নিয়ে গিয়ে আধা-দাম দিতেও দুমাস ঘোরাত। কথাটি বলবার উপায় ছিল না—তাহলে মিউনিসিপ্যালিটির বাজার থেকে উঠতে হতো। কিন্তু বর্তমানে নিশ্চিন্ত হয়েছে তারা।

—"আলু কত করে হে ?"

—"সেলাম বড়বাবু, ছ' আনা করে বিচছি।"

—"সাড়ে পাঁচ আনা নাও।"

—"মরে যাবো হুজুর, চড়া দামে কিনা।"

প্রমথ এক পয়সার জন্য দরদস্তর করবে। বাজারের লোক জানে—তবুও ওরা চায় বড়বাবু বাজারে আসুন, তাঁকে রোজ আসতে দেখলেও তাদের ভরসা বাড়ে। মাছওয়ালা বনমালী বলে ওঠে—"হুজুর দেখুন মিউনিস্-প্যালিটির কাণ্ড, টাক্স দিতে দিতে জিব বার হয়ে গেল, বাজারে একটা জোরালো আলো নাই, মাছ কাটতে গিয়ে বড়বাবু কোনদিন কার গর্দানই কেটে যাবে।"

কয়েক দিন পর দেখা গেল বাজারের হাল ফিরে গেছে, জোর আলোয় চারিদিক ভরে উঠেছে বাজারের মধ্যে।

চারিদিকে ভাল টিনের ছাউনি হলো, ড্রেণগুলো ঝকঝক তকতক করছে। প্রমথ রোজ সন্ধ্যায় ঘুরে ফিরে বাজার করে।

—"ওহে তোমার মোচা তিনটের জন্য বাপু আট আনা দিচ্ছি।"

—"ন' আনা না হলে পোষায় না হুজুর।"

—"তবে থাক।"

মোচাওয়ালাই যেন অপ্রস্তুত হয়ে যায়—ওর সটান চলে যাওয়া দেখে। নিজেই এগিয়ে যায় সে—"নিন, আজ্ঞে একটা পয়সা আর ধরে দেবেন।"

—"উঁহু! ওই পুরোপুরিই দোব।" এক পয়সার জন্যও কথা পালটাবে না প্রমথ।

খুকুর জন্মদিনে ছোট কাকা দিয়েছে খুকুকে দশ টাকা পেন কিনতে। খুকু পরম আনন্দভরে জেঠুকে দেখাতে এসেছে নোটখানা।

—"পেন কিনতে দিয়েছে ছোটকা।"

প্রমথ খুকুকে দিয়ে পাকা চুল তোলাচ্ছিল, এর জন্য অবশ্য দু চারটে লজেন্স ঘুস দিতে হয়। নোটখানা দেখে বলে ওঠে, "পেন কিনবি ? চমৎকার পেন এনে দোব তোকে।"

—"দেবে ? লাল রংএর চাই, না হয় চকোলেট রংএর।"

প্রমথ পরদিনই কোর্ট-ফেরতা পেন এনে হাজির করেছে। খুকু মহা খুসী। লাল ঝকমকে পেন, একটা রেশমী ফিতে মোড়া। উপরের ঘরে বাবা—কাকা—জেঠিমা—ঠাকুমা সকলকেই দেখাতে ছুটলো। ভণ্টু বলে ওঠে—

—"কক্‌খনো দশ টাকার পেন নয়।"

—"নয় তাই ?" খুকু রেগে ওঠে!

রমেন ডিসপেন্সারী থেকে ফিরেছে, সেও এসে পড়ে। ক্রমশঃ সকলেই সন্দিহান হয় বড়দার সততায়।

অরুণাও বলে ওঠে—"স্রেফ ঠকিয়েছে খুকুকে।"

এমন সময় প্রমথকে দেখে এগিয়ে যায় খুকু—"দেখ না জেঠু, ওরা কি সব বলছে।"

প্রমথ সদপদাপে বলে—"মিছে কথা ওদের। পেনের দাম এগারো টাকা, নেহাৎ চেনা দোকান বলেই ওই দামে দিলে, আসলে ওর দাম আরও বেশী।"

রমেন ফস্ করে পৈতা বার করে বলে ওঠে—"ছুঁয়ে দিব্যি করে বলো বড়দা।"

প্রমথ গম্ভীর হয়ে ঘর থেকে বার হয়ে যায়। আসলে সে তো ফুটপাথ থেকে বারো আনায় কিনেছে পেনটা। অরুণা খুকুকে বলে—"তোকে এর থেকেও ভাল পেন আমি দোব। এও কেমন সুন্দর বল তো।"

খুকুর কাছে ওর চেয়ে ভালো পেন আর হতে পারে না।

প্রমথর নিজের ছেলেপুলে নাই, অবসর সময় ওর ভরে থাকে ভাইদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। জেঠুর কথা তাদের কাছে বেদবাক্য। অবশ্য ওদের জামা—ধুতি—জুতো কোনটাই প্রমথর হয় না, সুতরাং প্রমথ ওদের কাছে নিরুপদ্রব। উপরন্তু কোন কোনদিন দল বেঁধে ওদিকে গাড়ীতে করে বেড়াতে নিয়ে যায়, না হয় চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনে।

মনোহরবাবু বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্তেই আছেন, ছেলেরা সকলেই উপার্জনক্ষম, সামনে অনেকদিন থেকেই জায়গাটা কেনা ছিল, সংসার বাড়ছে, তাই তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই নোতুন বাড়ীটা শেষ করে যেতে চান।

মামলার কাজে প্রমথ কয়েক দিনের জন্য বাইরে চলে গেল, ইতিমধ্যে মনোহরবাবু বাড়ীর ভিত খুঁড়িয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

বোধ হয় সময়টা বিশেষ ভাল ছিল না। এই ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে বাড়ীতে বেশ একটু কড়া আলোচনাই হয়ে গেল মনোহরবাবুর—সুমথ আর রমেনের সঙ্গে।—"এত বড় করে বাড়ী না ফাঁদলেই হতো ?"

মনোহরবাবু ফোঁস করে ওঠেন—"আমি ভোগ করবো কিনা তাই ওবাড়ী করাচ্ছি! যার যা খুসী কর গে তোমরা।"

শ্বশুরের এই মূর্তি দেখে অরুণা ভয় পেয়ে যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডপ্রেসারও বেড়েছে, তার উপর মেজাজের ঠিক থাকে না সব সময়। সেই বলে ওঠে—"ওসব কথা এখন থাক ঠাকুরপো, পরে হবে।"

মনোহরবাবু ছেলেদের কথায় রেগে উঠেছেন। সংসারে বিশেষ টাকাকড়ি ওদের কাউকেই দিতে হয় না। এখনও তিনিই সংসারের সব খরচ চালান। আশা করেছিলেন ছেলেরাও টাকা দিয়ে বাড়ীখানা তৈরী করে নেবে। কিন্তু সব আশা তাঁর ধূলিসাৎ হয়ে গেল। লোকের কাছে মুখ দেখাবেন কেমন করে তিনি! সবে ভিৎ উঠেই বাড়ীর কাজ বন্ধ রাখতে হবে—এ যে কত বড় অপমান তা ওরা বুঝবে কি করে।

বৌমাকে থামিয়ে দেন মনোহরবাবু

—"যা হবার কথাবার্তা এখনই হয়ে যাক বৌমা। ওরা যদি টাকা না দেয় আমিও সংসার ছেড়ে কাশী চলে যাবো। লেখাপড়া শিখিয়েছি, মানুষ করেছি, ভাল চাকরী করে দিয়েছি—ওরা এইবার বুঝে নিক। আমিও ছুটি নি—"

মিনুই সুমথকে পরামর্শটা দিয়েছিল। নিজেরা ওরা বেহালা ছেড়ে দিয়ে বালীগঞ্জে জায়গা কিনেছে। আশা আছে ওইখানেই বাড়ীঘর করে বসবাস করবে, মিনুর দাদার কনট্রাকটারি ফার্ম—ক্ষিতীবন্দীতে তারাই বাড়ী করে দেবে। সুতরাং আবার এখানে এক গাদা টাকা ঢেলে কি হবে! দরকার হয় মিনু সুমথ পুলিশ কোয়ার্টারে বাসা নিয়ে উঠে যাবে। তবুও বেশী টাকা দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ করতে পারবে'না।

রমেনও তেমনি আটকে পড়েছে। শুধু এম-বি পাস করে আজকাল ডাক্তারী করার চেয়ে লোহার বাজারে দালালী করা ভাল। তার বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই বিলাত ঘুরে এসে ভোল বদলে ফেলেছে। নিজের গাড়ী —বাড়ী, সাজান চেম্বার—সব কিছু মিলিয়ে সমাজের বুকে প্রবল প্রতাপ নিয়ে বাস করছে। সেও টাকা জমাচ্ছে বিলাত যাবার ইচ্ছায়। এই সময় বাবা যে এমনিভাবে সব সাধে বাদ সাধতে বসবেন কল্পনাই করতে পারে না। তাড়াতাড়ি বাড়ী করতে যাবার কি দরকার ছিল। আগেই এই সব কথা ভাবা ওঁর উচিত ছিল।

লেখাও স্বামীর মতে মত দিয়েছে।

মনোহরবাবু সারারাত ঘুমোতে পারেন না। চাঁদের আলোয় জানালার বাইরে দেখা যায় সদ্য-ভিত ওঠা দেওয়ালগুলো, এক রাশ ইট জমা করা পড়ে রয়েছে, যেন কোন প্রাণীর কঙ্কাল। কত সাধ আশা করে তিনি হাত দিয়েছিলেন কাজে। বন্ধুবান্ধবরা সকলেই তার সৌভাগ্যকে গর্ব করে, কিন্তু জানে না তারা মনোহরবাবু কত অসহায়! মাথার শিরগুলো অনিদ্রা আর দুশ্চিন্তার ফলে দপ্ দপ্ করছে।

স্ত্রীর কথায় ফিরে চাইলেন তিনি—"ঘুমোবে না সারা রাত! বাড়ী—বাড়ী করে সর্বনাশ বাধাবে দেখছি।"

মনোহরবাবু কথা বলেন না। গরীবের সন্তান ছিলেন তিনি, খড়ো ঘরে কেটেছে তাঁর জীবনের অনেকগুলো দিন, বাবা মাও দেহ রেখেছেন সেই ঘরে। বড় সাধ ছিল নিজের হাতে তৈরী করা দোতালায় তিনি শেষ দিন কাটাবেন।

সকাল বেলাতে ঘর থেকে বার হন না। সারা বাড়ীর আবহাওয়া থমথমে। মেজ-বৌ ছোট-বৌ এদিকে বড় একটা আসে না। ভোরবেলাতেই ডিউটিতে বার হয়ে গেছে সুমথ, রমেন নীরবে স্নান সেরে হাসপাতালে বার হয়ে গেল না—খেয়েই। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কোলাহল কোন চাপা দুশ্চিন্তায় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

অরুণার ডাকে মুখ তুলে চাইলেন মনোহরবাবু

—"কোর্টে যাবেন না বাবা ?"

ঘাড় নাড়েন তিনি। যাবার ইচ্ছে তাঁর নাই। শরীরটাও ভাল নাই। এতদিন দিনান্ত পরিশ্রম করে যাদের জন্য তিল তিল সঞ্চয় করেছেন আজ তাদের সব মুখোস যেন খুলে পড়েছে। ওদের জন্য আর খাটতে মন চায় না।

—"শরীরটা ভাল নাই মা, কোর্টে যাবো না। ড্রাইভারকে চলে যেতে বলো।"

নীরবে নেমে গেল অরুণা। পাশের ঘরে রেডিওটা বন্ধ করে দিল।

সমস্ত আনন্দ-প্রাণপ্রাচুর্য্য এক দিনে নিঃশেষ হয়ে গেছে। মিস্ত্রীদের ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে মনোহরবাবু চুপ করে বসে আছেন। চোখের সামনে খোলা জানলাটা দিয়ে দেখা যায় নোতুন ভিটে, উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিলেন জানলা। ওদিকে নজর দিতেও ইচ্ছা নাই।

সারা বাড়ীটা একটা গুমোট বুকচাপা নীরবতার অতলে তলিয়ে গেছে।

বিকাল বেলাতে বাড়ীতে পা দিয়ে প্রমথ হৈ চৈ বাধিয়ে তোলে। কয়েকদিন মফঃস্বলে কাটিয়ে আসছে। মামলায় জিতেছে, মক্কেল বোঝাই করে দিয়েছে নানা উপঢৌকনে, গাড়ী থেকে নামাচ্ছে আমের টুক্‌রি, খরমুজা, দই-সন্দেশ, একটা মস্ত ক্যানাস্তারার টিনে মুখ বাঁধা কি রয়েছে।

—"এই মণ্টু, বুলা—খুকু—ভণ্টা—"

বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত ছেলেমেয়ের দল ছুটে বার হয়ে আসে বাড়ী থেকে, শোভাযাত্রা করে ঢুকলো প্রমথ বাড়ীতে।

—"উঠোনের নর্দমাটা বন্ধ কর।"

ছেলেমেয়ের দল তাই করে, ক্যানাস্তারার টিনটা উপুড় করে দিতেই একরাশ বড় বড় কই মাছ অল্প জলে উঠোনময় লাফালাফি করে।

—"ধর, ধর ওগুলো।"

হুটোপাটি করে ছেলেমেয়ের দল মাছ ধরতে নামে।

চারিদিক চেয়ে একটু বিস্মিত হয়ে যায় প্রমথ। আগে হলে বাড়ীর বৌরাও আসতো এই দাপাদাপিতে যোগ দিতে, মিষ্টির হাঁড়ি-আম নিঃশেষ হয়ে যেত এইখানেই, আজ বিশেষ কেউ এলো না। ছেলেদের কোলাহল থামতেই বাড়ীতে নেমে আসে আবার স্তব্ধতা।

—"কি ব্যাপার বল দেখি ?"

স্বামীর প্রশ্নে অরুণা মুখ তুলে চাইল—"চাটা খাও, পরে বলছি।"

কেমন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ। বিশ্রী লাগে প্রমথর। প্রমথ নীরবে উঠে গেল উপরে, রমেন এখনও ফেরেনি।

মনোহরবাবু নীরবে বিছানায় শুয়ে ছিলেন, প্রমথকে ঢুকতে দেখে শুষ্ককণ্ঠে বলেন—"এসো।"

ঘরে কেমন একটা স্তব্ধতা। ছেলের কথায় মুখ তুলে চাইলেন তিনি

—"কাল মিস্ত্রীদের আসতে বলে দিয়েছি, কাজ সুরু করুক।"

—"কিন্তু আমার তো বেশী টাকা এখন হাতে নাই।" মনোহরবাবুর কণ্ঠস্বর শুষ্ক।

—"বাকী যা লাগবে আমি দোব। দোতলাই তৈরি হোক। আর রমেন চান্স পাচ্ছে, F. R. C. S. পড়তে যাবে, আপনি বাধা দেবেন না। ওরও তো ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু টাকা ওকে দিতে হবে, হাজার দুয়েক—সে কোন রকমে 'ম্যানেজ' হয়ে যাবে। ও যাক।"

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন মনোহরবাবু—যেন ওর কথাগুলো বিশ্বাসই করতে পারেন না। ধীরে ধীরে ওঁর মুখে চোখে ফুটে ওঠে তৃপ্তির আভা।

বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। মুখের শীর্ণতা ওঁর কেটে গেছে কোনদিকে।

বাড়ীতে আবার ফিরে এসেছে সেই প্রাণচাঞ্চল্য। ছেলেমেয়ের দল হৈ চৈ করে, বৌদের মুখে ফুটে উঠেছে হাসির আভা। কোর্ট থেকে ফিরে এসে সেদিন মিস্ত্রীদের কাজ তদারক করছে প্রমথ, নীচে মিউনিসিপ্যালিটির খাজাঞ্চিকে দেখেই মেজাজ চড়ে যায়।

ভদ্রলোক বহুকাল থেকে নানাখাতে বহু টাকা আত্মসাৎ করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, বড় রকম একটা চুরি ওর ধরে ফেলে প্রমথই এবং তাকে বরখাস্ত নোটিশ দিয়েছে। নেমে এসে প্রশ্ন করে প্রমথ

—"কি চাই আপনার ?"

—"আমার কেসটা ?"

ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে প্রমথ

—"বাবার কাছে দরবার করতে এসেছিলেন ? মিউনিসিপ্যালিটী আমার বাবার নয়, আমারও নয়। আইন যা বলেছে—করেছি। যান আপনি।"

ভদ্রলোক নীরবে বার হয়ে গেলেন। প্রমথবাবুর হুকুম টলানো যাবে না এও তিনি জানতেন—তবুও শেষ চেষ্টা করতে এসে বিফল হয়ে গেলেন।

ছোট খুকু আর ভণ্টার হাতে দুটো বিস্কুট দেখে এগিয়ে যায় প্রমথ—"ওগুলো কে দিলরে তোদের হাতে ? রাজ্যের ধূলোবালি সমেত। যা বাড়ীর ভিতরে বলগে—ভাল বিস্কুট দেবে।"

ছেলেরা শুধু হাতেই বাড়ী ফিরে গেল মুখ কাচুমাচু করে।

খাজাঞ্চিকে বকুনি শুনে মনোহরবাবু অরুণা মেজবৌমা দোতালার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। নীচে দেখা যায় খাজাঞ্চি মুখ নীচু করে বার হয়ে যাচ্ছে ফটক দিয়ে, একটা কার শাড়ী দুভাঁজ করে লুঙির মত পরে চেয়ারম্যান সাহেব বারান্দায় বসে ছেলেদের হাতের থেকে নেওয়া সেই বিস্কুট দুখানা চিবুচ্ছে পরম তৃপ্তিভরে।

প্রতিভা-পরিচিতি

কথাশিল্পী ষ্টিভেনসন্

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রতিভাধর কথাসাহিত্যিক রবার্ট লুই স্টিভেনসন তাঁর নানাধরণের গল্পের দ্বারা আবালবৃদ্ধবনিতার মনোরঞ্জন ক'রে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আর একটি বিষয়েও তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন—সে হচ্ছে তাঁর অন্যমনস্কতা আর অবিমৃষ্যকারিতা। লেখার মধ্যে খুঁটিনাটি বর্ণনার কমতি নেই; কোন্ পরিবেশে, কোন্ পরিস্থিতিতে, কোন্ জিনিষগুলি দরকার তা তাঁর নখদর্পণে, কিন্তু নিজের ঘরে কোথায় কি জিনিষ আছে, তা তাঁর জানা

ষ্টিভেনসনের অবিমৃষ্যকারিতা। শুক্‌নো গাছের ছালে আগুন ধরিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন!

নেই, কোন্ কাজটা কখন করতে হবে সে সম্বন্ধেও খেয়াল নেই তাঁর। ঢিলেঢালা এলোমেলো প্রকৃতি—চিরকাল।

তাঁর অবিমৃষ্যকারিতার একটা কাহিনী বলি। দেশভ্রমণে বেরিয়ে তখন তিনি আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া শহরে বাস করছেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার চারিধারে তখন অরণ্যের বিস্তার। আর সেই অরণ্যে আগুন লাগত প্রায়ই। ক্যালিফোর্ণিয়ার অধিবাসীদের নানা কাজের মধ্যে, তাদের বাড়ীর পাশে বনের মধ্যে আগুন লাগলে তা নির্ব্বাপিত করা একটা বিশেষ কাজ বলে নিরূপিত হয়েছিল। এই শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে সব সময় তাদের সজাগ থাকতে হত।

একদিন দক্ষিণ-অরণ্যে আগুন লেগেছে। অগ্নিযোদ্ধারা হাতিয়ার নিয়ে রণস্থলে গিয়ে আগুন-লাগা গাছগুলিকে কেটে ফেলে আগুন নিবিয়ে ফেলছে—এমন সময় একজন চীৎকার ক'রে উঠল—ওদিকে, ওদিকে আবার লেগেছে।

সবাই চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে, শ'খানেক হাত দূরে

ষ্টিভেনসনের জননী

ঘন বনের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা, আর সেই আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি বোধ করি আগুন নেবানোর চেষ্টা করছে!

হৈ হৈ করে লোকগুলি ছুটে গেল সেইদিকে! যে-বড় গাছটায় আগুন ধরেছিল সেটাকে কেটে মাটিতে পেড়ে ফেললে, তারপর লাঠি চালিয়ে আর বালি ছড়িয়ে আগুন নিবিয়ে ফেললে!

তারপর তারা ঘিরে ধরল সেই কালো-ভেলভেটের-কোট-পরা-অচেনা ভদ্রলোকটিকে! কি করছেন তিনি এখানে? হঠাৎ এগাছটায় আগুন লাগল কেমন করে? এ কি? লোকটির পায়ের কাছে একটা দেশলাই-এর বাক্স পড়ে রয়েছে। কয়েকটা কাঠি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে! তাহলে

তিনি কি দেশলাই জ্বেলে ইচ্ছা করে গাছে আগুন লাগিয়েছেন? প্রশ্নের উপর প্রশ্ন! তারপরেই মার মার শব্দ! সে-যাত্রা লোকটি যে ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীদের হাতে মার খেয়ে প্রাণে মারা পড়েন নি, তা তাঁর বহু ভাগ্য বলতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত গ্রামবাসীরা ভদ্রলোকের কথা শুনে বুঝেছিল যে তিনি ইচ্ছা করে আগুন লাগান নি, দৈবক্রমে আগুন ধরে গেছে। সেই বিপন্ন ভদ্রলোক হলেন রবার্ট লুই স্টিভেনসন।

আমেরিকার গ্রামের মধ্যে বেড়াতে ভালবাসতেন তিনি। মাঝে মাঝে অরণ্যে অগ্নিকাণ্ড দেখে ভাবতেন, এমন যখন-তখন আগুন লাগবার কারণ কি? একটি বড় গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে সেটি দেখতে দেখতে তাঁর ধারণা হল, গাছের গুঁড়ির চারধারে যে শুকনো ঝুরো মস্ বা শ্যাওলা জমে' থাকে সেগুলোতে আগুন ধরলে খুব দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেগুলো যদি নিয়মিত সাফ করে গাছের তলদেশ পরিষ্কার রাখা যায় তাহলে এ-ভাবে যখন-তখন আগুন লাগবে না। শুক্‌নো ঝুরোগুলো কী রকম

শিশু-ষ্টিভেনসন

তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে তা পরীক্ষা করবার জন্যে পকেট থেকে দেশলাই বার করে তিনি একটি কাঠি জ্বেলে গাছের তলায় ধরলেন! ব্যস! আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল! হঠাৎ এভাবে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে ষ্টিভেনসন্ হ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। তিনি মনে করেছিলেন, অল্প আগুন জ্বলবে, পা দিয়ে মাড়িয়ে তাকে নিবিয়ে ফেলতে পারবেন। কিন্তু এখন আগুন যে উঠ্‌ল মাথা ছাড়িয়ে! নেবাবার সাধ্য তাঁর নেই! কি ভাগ্যি যে তাঁর জামা কাপড়েও আগুন ধরে যায় নি!

কত গল্প আর কাহিনী লিখেছেন। তার মধ্যে কত কল্পনা, কত রং, কত ভাব? কিন্তু বাস্তব জীবনের পরিবেশে, যাকে বলে, ছিলেন একেবারে পয়লা নম্বরের "হুঁসো।" কোন্ কাজের ফল কি দাঁড়াবে, তার খেয়াল মোটেই তাঁর ছিল না। তা নাহলে কেউ কি আর ওইভাবে শুক্‌নো গাছের পাতায় আগুন ধরিয়ে হাঁ করে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে!

* *

১৮৫০ সালের ১৩ই নভেম্বর এডিনবরা সহরে রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের জন্ম। ছেলেবেলায় ছিলেন চিররুগ্ন। আজ হুপিং কাশি, কাল জ্বর, পরশু নিমোনিয়া, পাঁচ ছ বছর এমনিভাবে কেটেছিল। কিন্তু বালকের মেজাজ ছিল বড় মিষ্টি! কখনো কেউ তাঁকে বিরক্ত হোতে দেখেনি। একা একা শুয়ে নিজের মনেই খেলা করতেন তিনি।

ষ্টিভেনসনের পত্নী

এই প্রতিভাশালী মানুষটির উপর যেন ভগবানের মার ছিল। সারা জীবন নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে ব্যাকুল হোয়ে তাঁকে যদি দেশ বিদেশের স্বাস্থ্য-নিবাসে ছুটে বেড়াতে না হত, যদি তিনি সুস্থদেহে নিজের ভিটায় বসে নিরবকাশ সাহিত্য-চর্চ্চার সুযোগ পেতেন তাহলে তিনি যে আরও গভীর জীবনবেদ জগতকে শুনিয়ে যেতে পারতেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

এডিনবরা থেকে আড়াই বছরের রবার্টকে নিয়ে তাঁর বাবা-মা ইন্‌ভারলে টেরেসের নতুন বাসায় এলেন। কিন্তু সে বাসা শিশুর সইল না। অনবরত
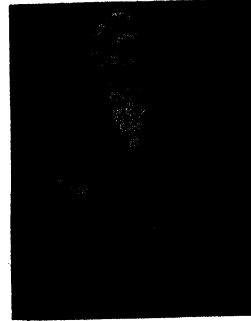
আইনের ছাত্র ষ্টিভেনসন

সর্দ্দি কাশি দেখা দিতে লাগল। তখন তাঁরা ১৭ নং হেরিয়ট রো-তে নতুন বাড়ি ঠিক করলেন। এই বাড়িতেই ষ্টিভেনসনের জীবনের ত্রিশ বছর কেটেছে।

শৈশবকালেই রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন মনের মধ্যে অভাবিত প্রেরণা অনুভব করলেন—তিনি লেখক হবেন। আকাশের রং বদলে গেল,

জীবনকে তিনি নতুন চোখে দেখতে লাগলেন, মানুষ তাঁর কাছে জীবনের এক নতুন বাণী বহন করে নিয়ে এলো।"

তাঁর কাকা নিজের ছেলে এবং ভাইপোদের মধ্যে লেখার চর্চ্চায় উৎসাহ দেবার জন্যে একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। কনিষ্ঠতম প্রতিযোগী রবার্ট তখনো ভাল করে লিখতে পারেন না। কিন্তু তবুও তিনি সেই যুদ্ধে যোগ দিলেন এবং মাকে সকল কাজ থেকে টেনে এনে তাঁর গল্প লেখার কাজে লাগালেন। অদ্ভুত বুদ্ধি ছেলের! "আমি মুখে মুখে বলি, তুমি লিপে নাও।" চোখ বুজে ছোট্ট ছেলে যখন আবোল-তাবোল গল্প বলতে লাগল তখন শ্রোতারা সব অবাক।

স্কুলে ভর্ত্তি হোয়ে তাঁর প্রথম কাজ হল স্কুলের পত্রিকার উন্নতি-বিধান।
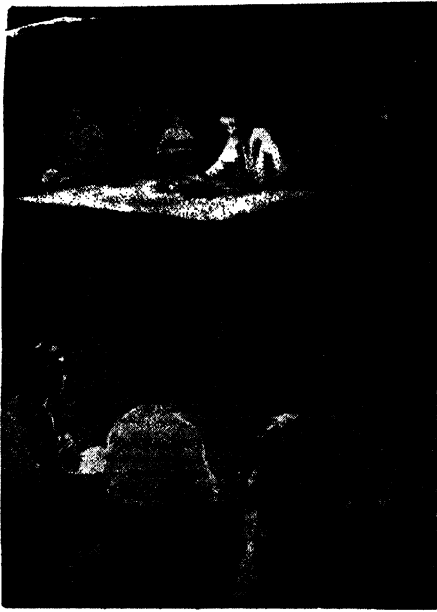
উপলু দ্বীপের বাড়িতে সন্ধ্যার পর ষ্টিভেনসন গ্রামবাসীদের কাছে তাঁর গল্প পড়ছেন ; পিছনে স্ত্রী বসে আছেন

ছাপা, লেখা, বাঁধাই—এসব যেন কেমন ধারা, আরও ভাল করতে হবে, বললেন নবীনতম ছাত্র! "ডেঁপো ছেলে।" বললে সবাই। কিন্তু কি চমৎকার লিখতে পারে! মাথা আছে বটে! এত সব অ্যাড-ভেঞ্চারের কাহিনী ঐটুকু ছেলের মাথায় আসে কেমন করে?

বাবা ছিলেন এন্‌জিনীয়ার। বন্দরে কাজ করতেন তিনি। স্কুলের পড়া শেষ হোলে রবার্ট কলেজে ভর্ত্তি হলেন বটে, কিন্তু তাঁর বাবা স্থির করলেন, এইবার তাঁকে বন্দরে তাঁর আপিসে ঢুকিয়ে দেবেন। কিন্তু রবার্ট লুই যখন তাঁর বাবাকে জানালেন যে পূর্ত্তবিদ হবার ইচ্ছে তাঁর নেই ; তিনি হবেন লেখক, সাহিত্যিক—তখন টমাস ষ্টিভেনসন্ আঘাত পেলেন বটে, কিন্তু মনের মধ্যে সেই সঙ্গে এক প্রকার প্রচ্ছন্ন গর্ব্বও অনুভব করলেন।

রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন্ অতঃপর আইন পড়তে লাগলেন। সেই সঙ্গে চলল সাহিত্য-চর্চ্চা। তেইশ বছর বয়সে তিনি দু'জন বন্ধু লাভ করেন

উপলু-দ্বীপের "তুসিতলা"
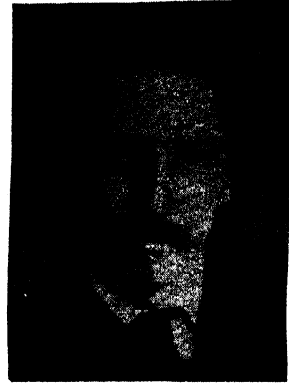
যাঁরা তাঁর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। একজন মিসেস সিট্‌ওয়েল। অপরজন সিডনি কলভিন (পরে স্যর সিডনি কলভিন)।

অত্যন্ত বন্ধু-বৎসল ছিলেন ষ্টিভেন্‌সন। তাঁর জীবনে তিনটি মাত্র কামনা ছিল ; "স্বাস্থ্য, সামান্য সাফল্য আর বিত্ত এবং বন্ধু-সংসর্গ।" কিন্তু বিধি ছিলেন বাম। দেশে শরীর ভাল থাকছে না। ডাক্তাররা বললেন, দক্ষিণ ফ্রান্সের স্বাস্থ্যনিবাসে যেতে হবে তাঁকে, নইলে সাংঘাতিক অসুখ ধরতে পারে।

*   *
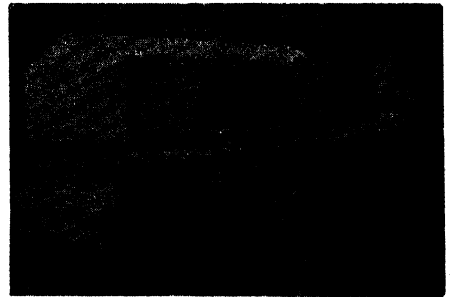
উপলু-দ্বীপে ষ্টিভেনসনের সমাধি

দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর সেই সঙ্গে লিখছেন উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী।

১৮৭৯ সালে তিনি আমেরিকায় গেলেন। ক্যালিফোর্ণিয়ায় মিসেস ওসবোর্ণের সঙ্গে আলাপ হল। এই বিধবা তরুণী রবার্ট

দুই ষ্টিভেনসনের মনের সকল আকাঙ্ক্ষা, বেদনা, হতাশা এবং সাহিত্য-দর্শনের সঙ্গে যেন এক হোয়ে মিশে গেলেন! অপার মমতায় তিনি এই নরম প্রকৃতির মানুষটির প্রতি আকৃষ্ট হোলেন। পর বৎসর উভয়ের বিবাহ হোল।

দু'তিন বৎসর কাটল পরম সুখে আর অব্যাহত লেখনী চালনায়। তারপর আবার রোগের আক্রমণ। চিকিৎসক বললেন, যক্ষ্মার ভয় আছে! আঁৎকে উঠলেন ষ্টিভেনসন। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, দক্ষিণ সমুদ্রের আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হোতে পারে।

১৮৮৮ সালে ষ্টিভেনসন দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে পাড়ি দিলেন। তিন বছর সেই দেশে ছিলেন। সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, প্রেরণা দিয়েছিল। বিশেষ করে উপলু দ্বীপটি তাঁর কাছে এক বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হোয়ে উঠেছিল। সেই দ্বীপেই তিনি ঘর বাঁধলেন, একটি কাঠের বাড়ী তৈরী হল। সেই দেশের জন কয়েক অধিবাসীকে গৃহের নানা কাজে নিযুক্ত করে তিনি পরম আরামে সেখানে রইলেন। না থাক বন্ধুবান্ধব, না থাক আত্মীয়স্বজন, তবুও সেই শ্যামল বনানীর প্রান্তে বসে তিনি যেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করলেন। গৃহিণী ছিলেন সর্ব্ব বিষয়ে সুনিপুণা। মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি স্বামীকে অপ্রসন্ন হবার অবকাশ দেন নি।

দেশ বিদেশে তাঁর তখন কত নাম। একের পর এক বই লেখা হয়েছে; ট্রেজার আইল্যাণ্ড, ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড, কিড্ন্যাপড্, ব্ল্যাক অ্যারো, মাষ্টার অব্ ব্যালানট্রি, ক্যাটরিওনা এবং বহু গল্প কাহিনী।

সন্ধ্যায় নিজের ঘরে ব'সে ষ্টিভেনসন গল্প বলতেন। শ্রোতা ছিল সেই দেশের অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা। কিন্তু তাঁর গল্প বুঝতে তাদের কোন অসুবিধা হত না। তারা তাঁকে সম্বোধন করত—'তুসিতলা' অর্থাৎ গল্প-কথক। তাদের উন্নতি বিধানে ষ্টিভেনসন চেষ্টিত ছিলেন বলে সেই দেশের অধিবাসীরা তাঁকে রাজার মত সম্মান করত। তাঁর নামে একটি চওড়া রাস্তা তাঁর বাড়ীর সামনে তৈরী করে তার নাম দিয়েছিল—"দয়ালু হৃদয়ের সড়ক।"

১৮৯৪ সালে তাঁর সম্মানে তারা তাঁর জন্মদিনের আয়োজন করল। সেই উৎসবের পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কয়েকদিন পরে সুস্থ বোধ করে বারান্দায় বসে স্ত্রীর সঙ্গে আমেরিকা ভ্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁর মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। দু'হাতে দুই কপাল চেপে ধরে তিনি বলে উঠলেন—"কি আশ্চর্য্য! এমন অদ্ভুত লাগছে কেন?" তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"হ্যাঁ গা! তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছো তো? আমাকে কি অদ্ভুত লাগছে দেখতে?"

সেই তাঁর শেষ কথা! স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে তিনি সেইখানেই শুলেন চিরকালের মত।

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি দিক্

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

সুফী-সম্প্রদায়ের ফকিরেরা হিন্দুভাবের আচার ও প্রচারের দ্বারা শুধু যে ইস্লামকে ভারতবাসীর মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা গোমাংস ভক্ষণের বিরোধিতা করায় বহু লোককে তাহাদের অনুগত করিয়াও ফেলিতে পারিয়াছিলেন।

অবশ্য, সকল সাধকই যে হিন্দুকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার মতলবেই হিন্দুশাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া কপটভাবে ইস্লাম প্রচার করিতেন, তাহা মনে করিলে অন্যায় হইবে। তখনকার দিনে অধিকাংশ মুসলমান সাধক ও কবি হিন্দু সাহিত্যের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—ইহাই প্রকৃত অবস্থা ছিল। বিদ্বেষভাব ঘুচিয়া একটা প্রীতির ভাবই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

মালিক মহম্মদ জ্যায়সী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকের প্রসিদ্ধ কবি। তখন পদ্মিনীর সতীত্ব গর্ব্ব ও আলাউদ্দীনের কামকলুষ চরিত্রে দেশবাসীর দারুণ ঘৃণা। কবি জ্যায়সী তাই হিন্দুর রামায়ণ হইতেই রূপক সাজাইয়া পাপদুষ্ট আলাউদ্দীনকে 'মায়া'রূপে উপস্থাপিত করতঃ সুলতানদের প্রতি দেশবাসীর বিদ্বেষ বিষ নষ্ট করিতে ও তাহাদের মনে সান্ত্বনা দিতে 'পদ্মাবত' নামে প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যের শেষ কয় চরণ উদ্ধৃত করিয়া কবির কাব্যকৌশল প্রদর্শন করিতেছি—

তন্ চিতৌর মনরাজা কীন্হা।
হিয় সিংঘল, বুধি পদমিনী চিন্হা!
গুরু সুয়া জেই পন্থ দেখাওয়া।
বিনু গুরু জগৎ কো নিরগুন পাওয়া?
নাগমতী ইয়হ দুনিয়া ধন্ধা।
বাঁচা সোই ন এহি চিত বন্ধা॥
রাঘব দূত সোই সয়তানু।
মায়া আলাউদী সুলতানু॥

মায়া যেমন বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে চায়, তদ্রূপ সেই মায়ারূপী আলাউদ্দীন সেই 'চিতোর'রূপ তনুস্থিত 'বুদ্ধি'রূপ পদ্মিনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে

গিয়াছিল। সয়তান রাবণ সীতাকে আক্রমণ করিয়াছিল—ইহা মায়ারই প্রভাব। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা এই সব কথায় খুবই সান্ত্বনা পাইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সময়কার বহু মুসলমান কবি ও সাধকের আচার ব্যবহার ও রচনা পড়িলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে বিদেশী শাসক ও দেশীয় প্রজাবৃন্দের মধ্যে একটি প্রীতি জানাইবারই চেষ্টা রহিয়াছে।

কবি উসমান জাহাঙ্গীরের আমলে গাজীপুরে বাস করিতেন। ১৬১৩ খৃঃ 'চিত্রাবলী' কাব্য লিখিয়া তিনি হিন্দু কবিদেরও মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

কাব্যের বিষয়বস্তু হইল নেপালের মহারাজাধিরাজ ধরণীধরেরও চিত্রাবলী নাম্নী সুন্দরীর প্রেমকাহিনী। মানবীয় প্রেমকথা বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু রচনা মধ্যে নতুন কায়দায় ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য জীবের প্রেম-বিরহের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজকে চমৎকৃত করিতে পারিয়াছিলেন। উর্দ্দু কবি, কিন্তু রচনাটিকে উর্দ্দু অপেক্ষা হিন্দী মনে করিলেই সমীচীন হয়। অক্ষরগুলি মাত্র উর্দ্দু, নতুবা ভাষা হিন্দীঘেঁষা; ভাব হিন্দুরও মনোমুগ্ধকর। একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

চিত্রাবলী সখাগণকে লইয়া সরোবরে জলকেলী করিতেছেন। কখন কখন গভীর জলে আত্মগোপন করিতে করিতে সখাদের বলিতেছেন—যে আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে, তাহারই জিত হইবে। সখীরা খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া গেলেন। দরদী কবি ক্লান্ত সখাদের মুখের আকুলতা প্রকাশ করিতেছেন—

গুপুত তোহি পাবহি কা জানী।
পরগট মহঁ জো রহৈ ছিপানী॥
চতুরানন পঢ়ি চারৌ বেদূ।
রহ খোজি পৈ পাব ন ভেদূ॥
হম আঁধি জেহি আপন সূঝা।
ভেদ তুম্হার কহঁা লৌ বুঝা॥
কৌন সো ঠাঁউ জহাঁ তুম্ নাহী!
হম চখ জোতি ন, দেখহিঁ কাহী॥
পাবৈ খোজ তুম্হার সো
জেহি দিখয়াবহু পন্থ।
কহা হোই জোগী ভএ
ঔর বহু পঢ়ে গরন্থ॥

প্রকট হইয়াও যে তুমি তারই মধ্যে লুকাইয়া থাক, তুমি অমন ভাবে গুপ্ত হইয়া থাকিলে, কি জানি কেমন করিয়া পাইব? চতুরানন (ব্রহ্মা) চারি বেদ পড়িয়াও তোমার গুপ্তরহস্যটির সন্ধান না পাইয়া খোঁজ করিতেছেন। আমরা যে অন্ধ, তাই নিজেরা নিজেদেরও দেখিতে পাই না; তা তোমার গুপ্তরহস্য কেমন করিয়া বুঝিয়া লইব? কোথায় এমন ঠাঁই আছে যেখানে তুমি নাই? আমাদের চোখেও তো জ্যোতিঃ নাই যে তোমায় দেখিব!

সেই তোমার খোঁজ পাইবে, যাহাকে তুমি পন্থা দেখাইবে।

বলা বাহুল্য ইহা উপনিষদের সেই 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' ইত্যাদি বাণীরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

মুসলিম সুফী সাধকগণের চেষ্টায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এমনই ভাবেই একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছিল। দুঃখের বিষয়, ঔরঙ্গজেব প্রমুখ অপরিণামদর্শী বাদশাহ ও তাঁহার ধর্ম্মান্ধ ওমরাহগণের দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ এই মিলনের চেষ্টায় অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এবং ইহাদেরই আস্কারায় গোঁড়া মোল্লার দল সুফীবাদের প্রতিও কটাক্ষ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। পারস্যের রসধারায় আরবের শুষ্ক সিদ্ধান্তকে সরস করিবার যে চেষ্টা চলিয়াছিল, সুফীবাদের শত্রুরা সে উৎস বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই তুল্য ক্ষতি হইয়াছে।

হায়! অবোধ মুসলমানদের মধ্যে অনেকে আজও জানে না যে মহাকবি জালালদ্দীন রুমির অমর কাব্য 'মশনবী' আজও কোরাণেরই মত মর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছে।

মসনবী-এ মৌলভী-এ মানব।
হস্ত কোরাণ-এ দরজবান-এ পহ্লবী॥

পুণ্যাত্মা মৌলভীর (রুমির) মসনবী কাব্য পহ্লবী (পার্শী) ভাষায় কোরাণ স্বরূপ কাব্য।

এ কথা আজেবাজে লোকের কথা নয়। ঐস্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে আজ যিনি জাতীয় কবি বলিয়া সর্ব্বজনমান্য সেই মহাকবি ইক্‌বালই বলিয়া গিয়াছেন—

কি উ বা হরফ-এ পহ্লবী কোরাণ নবিস্ত্।

অর্থাৎ জালালদ্দীন পহ্লবী ভাষায় কোরাণই লিখিয়া গিয়াছেন। কবি ইক্‌বালের মন্তব্য না মানিবে এমন মুসলমান কে আছে?

ধর্ম্মান্ধ গোঁড়ারদল কিন্তু সুফীবাদের সাফল্য ধরিতে পারিল না। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা, বিগ্রহ চূর্ণ করা, নারীধর্ষণ প্রভৃতি যে সকল আসুরিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, সুফীতত্ত্বকে তাহার বিরোধী বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে সুফীবাদই বরং হিন্দুকে ইস্লামের প্রতিবেশী আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল।

হিন্দুসমাজ ধর্ম্মভীরু হইলেও, সাধারণ নরনারী ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব কিছুই জানিত না। অল্প সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি বেদ-বেদান্তের চর্চ্চা করিতেন। সাধারণ মানুষ অজ্ঞ ও অনেকেই অস্পৃশ্য হইয়া থাকিত। সাধারণ হিন্দুর তৎকালীন মনোভাবের সুযোগেই সুফীবাদ জনসাধারণের মধ্যে ইস্লামের সাম্যবাদ প্রচার করিতে পারিয়াছিল। সরল ভাষায় ধর্ম্মের সাদা কথা শুনিয়া এবং ফকিরদের সাম্য ব্যবহার ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের মত আচার ব্যবহার দেখিয়া শুধু নিম্নশ্রেণীর নয় বহু রাজা মহারাজাও অনেক সময় মুগ্ধ হইতেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন মাত্র সাধকের কথা এস্থলে উল্লেখ করিব। ইঁহার প্রসিদ্ধ নাম—মক্‌দুম জাঁহানীয়া। ইনি যে কতবড় সর্ব্বজনমান্য উচ্চস্তরের

প্রাণ মহাপুরুষ ছিলেন, তাহা স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী নামক হিন্দু-পরিব্রাজক মহাশয়ের খোদোক্তি হইতেই পরিস্ফুট—

"দুঃখের বিষয়, এরূপ ভক্তি-বিশ্বাস-বৈভবসম্পন্ন ধর্ম্মবীর, এরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সমালঙ্কৃত কর্ম্মবীর, এরূপ তপঃপ্রভাবশালী তমোহীন তাপসবর এবং এরূপ জনহিতৈষী পরিব্রাজক ও মেধাবী মানব, ইস্লাম-কুলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।"

—ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী, ১৩৭ পৃঃ

আনুমানিক ১৫শ শতাব্দীতে ফতেগড় দুর্গের নিকটে সেখ হায়দার নামক ব্যক্তির এই পুত্রটি সামসুদ্দীন নামে পরিচিত হন এবং বিবিধশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়া উঠেন। এই সময় অযোধ্যায় সরযুতটে গুল্জার শা নামক এক দরবেশ সাধনা করিতেন। যুবক সামসুদ্দীন ইহাকে দেখিতে আসিয়া মুগ্ধ হন—তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। গুরু তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া নাম দিলেন মকদুম শা।

গুরুর সহিত কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি-পরিভ্রমণান্তে গজনীতে আসিলে গুরুর দেহান্ত হয়। শোকতপ্ত হৃদয়ে মকদুম শা বিশ্ব পর্য্যটনে বাহির হন। অতঃপর আরব্য, পারস্য, তাতার প্রভৃতি বহু দেশ পরিভ্রমণান্তে মকদুম শা পুনরায় মুর্শেদের আস্তানা গাজ্নী নগরে আগমন করেন। এবং কিছুকাল অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন পুরাতন বন্ধু গাজিমিঞাকে বোগদাদ হইতে আনাইয়া উভয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। গাজিমিঞাও একজন পরম বিদ্বান্ সন্ন্যাসী হইলেন।

বহুশত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া দুই বন্ধু বিদ্যাকেন্দ্র বারাণসী নগরে উপনীত হন্ এবং নগরপ্রান্তে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া জ্ঞান-চর্চ্চার কালাতিপাত করিতে থাকেন। গাজিমিঞা মরণান্তকাল পর্য্যন্ত কাশীতেই ছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রাক্কালে এই গাজিমিঞার মেলা লোকপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

মকদুম শা বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া বিদ্যাবিভবসম্পন্ন কান্যকুব্জ (কনৌজ) নগরে গমন করেন। সেখানকার হিন্দু রাজারা তাঁহার অতুলনীয় পাণ্ডিত্য অবর্ণনীয় সাধুতা, অলৌকিক ক্ষমতা ; বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কনৌজ নগরে অবস্থান পূর্ব্বক তত্রত্য জনসাধারণ মধ্যে ধর্ম্মালোক বিতরণে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে মকদুম শা শেষ জীবন কনৌজেই অতিবাহিত করেন।

স্বামীজী তাঁহার সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছিলেন-যে—

"সমগ্র হিন্দু ও মুসলমান সমাজ সমভাবে ও সমাদরে তাঁহার সেবা করিতেন। হিন্দু রাজারা তাঁহাকে রাজমন্ত্রী অপেক্ষাও শতগুণে অধিকতর সম্মান দান করিতেন। অন্যান্য দেশের তুল্য কনোজ নগরেও তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ব্রহ্মোপাসনা, পরহিত, লোকশিক্ষা, ভগবৎ গুণগান, দান, ধ্যান, দুঃখীর অশ্রুমোচন, জীবে দয়া ও পরমেশ্বরের নাম প্রচারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে রাজারা এই দিগ্বিজয়ী ব্রহ্মদর্শী প্রাজ্ঞ সাধুর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং নানা স্থান হইতে নানা-শ্রেণীর লোক আসিয়া তাঁহার নিকট উপবেশন পূর্ব্বক প্রশান্তমনে ও পরম সুখে সাধুর অমৃতময়ী উপদেশ কথা শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইত।"

একজন হিন্দু সন্ন্যাসী যাঁহার সম্বন্ধে ঈদৃশ উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া তৎকালীন সাধারণ হিন্দু যে অনুগত হইবে. ইহা আদৌ বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ জাঁহানীয়া মহোদয় আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন—আদৌ বিবাহই করেন নাই। স্ত্রী-জাতির সম্পর্ক হইতে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র থাকিতে ভালবাসিতেন—হিন্দু সন্ন্যাসীর অনুরূপ জীবনের এই অপূর্ব্ব প্রতিচ্ছবিটি দর্শনে সাধারণ মানুষ ইস্লামকে হিন্দুরই এক প্রকারভেদ বলিয়া তখন যদি মনে করিয়া থাকে, তাহা হইলে, তজ্জন্য তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না।

মকদুম শা জাঁহানীয়ার কথা বলিলাম, হিন্দু-সমাজে ও হিন্দুর রাজ-দরবারে তাঁহার প্রভাবের কথা দেখিলেন। এইরূপ অসংখ্য মকদুম শা শ্রেণীর দরবেশ ফকির তখন সমাজে সম্মানিত হইবার ফলে সমাজে প্রাচীন ধর্ম্মভাবের প্রতি আস্থা যে টলিতে সুরু করিবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দক্ষিণ ভারতে মনসোঁ প্রভৃতি পাদ্রীরাও ঠিক এইভাবেই নোয়া প্রভৃতি অঞ্চলে লোককে খৃষ্টান করিতে পারিয়াছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেও রেভাঃ ডফ্ সাহেব এবং কেরী মার্শম্যান প্রভৃতি পাদরীরাও ঠিক এইভাবেই হিন্দুসমাজের ধর্ম্মানুরাগ টলাইতে পারিয়াছিলেন। ইংরাজ রাজা হইয়াছে—নূতন সভ্যতার আগমনে লোকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রলোভনে বিভ্রান্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টান হইলে সাহেবেরা সমধিক সমাদর করিতেছে—এইরূপ এক বিপজ্জনক পরিবেশে জাতীয় সংস্কৃতি যেমন দারুণ বিপন্ন হইয়াছিল, পঞ্চদশ-শতাব্দীতেও সুপ্রসিদ্ধ মকদুমা শা জাতীয় অসংখ্য ফকির ও দরবেশের প্রভাবে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিও ঠিক তেমনি দারুণ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজী সভ্যতা প্রচারের সময় রাজা রামমোহন রায়, পরমহংস রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি নানা দিক্ দিয়া যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সমাজের ধর্ম্মনিষ্ঠার শৈথিল্য দূর করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে যেমন দেশ খ্রীষ্টানে ভরিয়া যাইত, ঠিক তেমনই চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নানক, কবীর, রামানন্দ স্বামী, নামদেব, ত্রিলোচন, সাধনা সেন, রেদাস প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া তৎ-কালীন ইস্লম-ধর্ম্মে সমাকৃষ্ট হিন্দুগণের সমক্ষে হিন্দুশাস্ত্রের উদার মর্ম্মবাণী অমৃতময়ী ভাষায় পরিবেশন করিয়া যদি তাহাদিগের শিথিল মতি স্বধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিতে না পারিতেন, তাহা হইলে, সারা ভারত আজ পারস্য, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের মত সমগ্রভাবে ইস্লামপন্থী হইয়া যাইত—হিন্দু বলিতে শুধু তাহাদের কয়েকটি প্রাচীন ভগ্নস্তূপ পড়িয়া থাকিত।

শিল্পী পূর্ণচন্দ্রের শিল্প-প্রদর্শনী

শ্রীসন্তোষকুমার দে
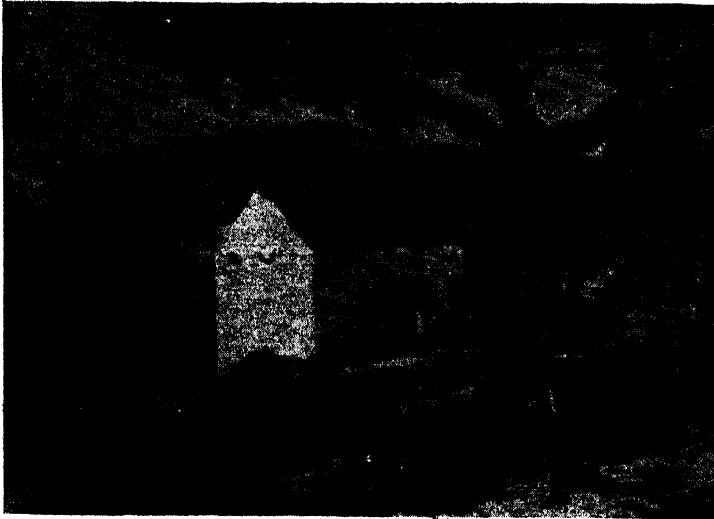
বিগত ত্রিশ বৎসর কাল বাংলাদেশে যে সমস্ত শিল্পী নিয়ত শিল্পসাধনায় নিযুক্ত থেকে নিজেদের স্বকীয়তার জন্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পাঠকদের নিকটও পূর্ণচন্দ্র বিশেষভাবে পরিচিত, কারণ দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে তাঁর বহু চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

পুস্তক মণ্ডন শিল্প ভারতের একটি প্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্যের অন্তর্গত। হস্তলিখিত পুঁথিসমূহের পাটায় এবং পুথির পাতায় অনেক প্রকার শিল্পকাজ করা হত। পরে বটতলায় ছাপা বই পত্রেও চিত্রসংযোগ করা হত এবং সে যুগেও অনেক সুদক্ষ শিল্পী একাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য প্রথায় পুস্তকের মণ্ডনকলা এতদ্দেশে খুব দীর্ঘকাল প্রচলিত হয় নাই। বলতে গেলে সে পথে পূর্ণচন্দ্রই পুরোধা। ললিতকলার সাধনা অব্যাহত রেখেও নিয়মিতভাবে ফলিত-কলার চর্চা ও গবেষণায় তিনি যে সুগভীর নিষ্ঠাদ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তা যে-কোন শিল্পীর গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে। এমন কি আমার তো মনে হয়, গ্রন্থ-অলঙ্করণে তাঁর মেঘদূত, ওমর খৈয়াম, আরব্য রজনী প্রভৃতি পুস্তকের চিত্র ও অলঙ্করণ নানা ভারতীয় ভাষার গ্রন্থে উদ্ধৃত হতে দেখা যাচ্ছে।

সম্প্রতি ১লা ডিসেম্বর হতে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৫ কলকাতার আর্টিষ্ট্রি হাউসে পূর্ণচন্দ্রের অঙ্কিত

মহাভারতের জন্ম

চুনারের গ্রাম

৮০খানি চিত্রের একটি সুন্দর প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীতে পূর্ণচন্দ্রকে যেন নতুনভাবে দেখা গেল। এবারের প্রদর্শনীটি ক্ষুদ্র হলেও বিষয়-বৈচিত্র্যে অভিনব। যে গ্রন্থ-অলঙ্করণ শিল্পের জন্য পূর্ণচন্দ্র স্বনামধন্য, এখানে তার কোন পরিচয় নেই বল্লেই চলে। পরন্তু যে পৌরাণিক চিত্রের জন্য তাঁকে বিশেষজ্ঞ বলা হয়, সে-জাতীয় চিত্রের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। গত দেড় বছরে আঁকা অজস্র দৃশ্য ও স্কেচই এবারের প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই চিত্রগুলি পূর্ণচন্দ্রের শিল্পী-সত্তার একটি নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত করেছে বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। তিনি পল্লী বাংলার স্নিগ্ধরূপ যেমন এঁকেছেন, তেমনি এঁকেছেন সাঁওতাল পরগণার ঢেউ-খেলানো মাঠ, চুনারের মাটির কুটীর, পার্বত্য অঞ্চলের ধূসর পরিবেশ, আবার মানুষের শিল্প-সংস্কৃতির বহুতর নিদর্শন—মহাভারতের জন্ম হতে রামায়ণ গান, বাউল দল, কিম্বা একেবারে ঘরোয়া গাঁয়ের গেজেট। আমার সৌভাগ্য হয়েছে শিল্পীকে তাঁর সাধনা মন্দিরে উপাসনারত দেখবার। আবার দেখেছি সুদূর আরাবল্লী কিম্বা উত্তুঙ্গ গ্যাংটকের পার্বত্য উপত্যকায়, মীরার মন্দিরে এবং নির্জন বিটপীতে শিল্প রচনায় নিবিষ্ট-অবস্থায়। তিনি যা দেখেন সব জীবন্ত, তাই যা আঁকেন সব এত বর্ণাঢ্য, এত প্রাণচঞ্চল। ভাবের গভীরতায় তাঁর চিত্র কত প্রাণস্পর্শী তার প্রমাণ মহাপ্রভুর কয়েকখানি চিত্র। এ ছবিগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাশৈলীর পরিচায়ক।

এবারের প্রদর্শনীতে পূর্ণচন্দ্র
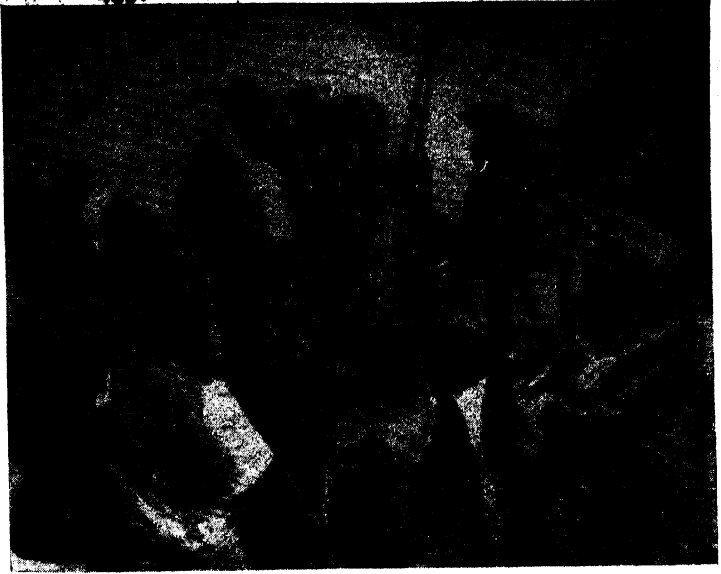
বাউল

সংগীতের জন্ম

এক হিসেবে একটা 'চ্যালেঞ্জ' উপস্থিত করেছেন। সচরাচর চিত্রের দুর্মূল্যতার অজুহাতে জনসাধারণ চিত্র ক্রয়ে বিমুখ থাকেন, এবারে তিনি মাত্র কয়েকখানি চিত্রের মূল্য ব্যতীত আর সব কিছুই এত সহজলভ্য মূল্যে উপস্থিত করেছেন যাতে বহু চিত্ররসিক তার চিত্র কিনবার সুযোগ পেয়েছেন। মাত্র সাত দিনের প্রদর্শনীতে এবার কয়েক সহস্র দর্শকের সমাগম হয় এবং যতগুলি চিত্র বিক্রয় হয়েছে কোনবড় প্রদর্শনীতে সচরাচর তা হয়না।

এত ছবির মধ্যেও কিন্তু অনেকে পূর্ণচন্দ্রের অঙ্কিত মেঘদূত, ওমর খৈয়াম কিম্বা আরব্য রজনীর বিখ্যাত ছবির দু'একখানির সন্ধান করছিলেন এবং তা না পেয়ে তাঁরা হতাশ হয়েই ফিরেছেন। আমরা আশা করি এবারের মতো প্রতিবৎসরই পূর্ণচন্দ্রের চিত্রের প্রদর্শনী করা হবে— যাতে জনসাধারণ তার সবশ্রেণীর চিত্র একত্র দেখবার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা থাকবে।

কাশ্মীর

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার রূপের খ্যাতি
ছড়ায়েছে বহু দেশে,
তাইত তাহার ভাতি
দেখিতে এলাম শেষে।
কিছু ছিল সংশয়,
কি জানি কেমন দেখি,
মনেতে যেমন লয়
তেমন হইবে সেকি ?
এখন এসেছি কাছে,
হেরেছি নয়ন ভরি,
হৃদয় যে হরিয়াছে
তব রূপ, সুন্দরি !
দেখেছি তোমার মাটি
নরম ঘাসেতে ঢাকা,
কি সবুজ পরিপাটি
কি যে কোমলতা মাখা।
তার মাঝে আছে ফুটে
কত ফুল অগণিত
তৃণ আবরণ টুটে,
কেহ সাদা কেহ পীত।
দেখেছি দাঁড়ায়ে তরু
ঘনশ্যাম দেহ তার,
কেহ মোটা কেহ সরু,
উঁচু পাহাড়ের ধার।

'চিপার' তাদের সেরা
বিরাট তাহার দেহ,
চিকণ পাতায় ঘেরা,
ছায়ায় শীতল স্নেহ।
'পপলার' ঋজু নারী,
তনুর তনিমা তার,
ছোট ছোট পাতা নাড়ি
সবারে মানাল হার।
হোথা 'উইলোর' সারি
দাঁড়ায়ে জলার ধারে,
রূপালি পাতায় ভারি
ডালগুলি তার নাড়ে।
ঢালু পাহাড়ের গায়
'পাইন' ঊর্দ্ধগতি
হামাগুড়ি দিয়ে যায়
আকাশে জানাতে নতি।
লীলাময়ি, তুমি সাজ
কত বিচিত্র সাজে ;
কত রূপে একা রাজ
কৌতুক বুঝি না যে !
হেথা সমতল ভূমি
ধান ক্ষেত দিয়ে ভরা,
হোথা অম্বর চুমি
শিখর যায় না ধরা ;

হেথা পাহাড়ের বুকে
ঝরণা নাচিছে ধেয়ে,
হোথা সমতলে সুখে
সাজে যে শান্ত মেয়ে।
হ্রদ আছে মনোলোভা
স্ফটিক স্বচ্ছ জল,
বাড়ায় তাহার শোভা
বুকে শত শতদল।
সবার উপরে আছে
উঁচু শিখরের সার,
তুষার মাখিয়া রাজে
ধবল দেহ যে তার।
রবির কিরণে প্রাতে
হয় তা ধবলতর,
ম্লান গোধূলির সাথে
ধরে রাঙা কলেবর,
নিশীথে চাঁদের আলো
পড়িলে তাহার গায়,
নয়নে লাগে যে ভাল,
হৃদয় হারায়ে যায়।
তোমার রূপের ভাতি
নয়নানন্দ-কর ;
ছাড়ায়ে তোমার খ্যাতি
তুমি হও সুন্দর।

তদন্ত

শীলা গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

পর্দা উঠতে দেখা গেল, প্রথম অঙ্কের শেষে যে যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনি রয়েছেন। ইন্সপেক্টর গুহ দরজার কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন

গুহ। (যতীনকে) তারপর?

শীলা। (আবার প্রায় পাগলের মত হেসে যতীনকে) দেখেছ? আমি বলেছিলাম—

গুহ। কি বলেছিলেন আপনি?

যতীন। ইন্সপেক্টর, মিস্ ব্যানার্জ্জীকে এবার আপনার প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই দিন। যথেষ্ট হয়ে গেছে, তা ছাড়া ওঁর আর কিছু বলবারও নেই। সারাদিন আজ ধকল গেছে, জানেনই ত এখানে একটা উৎসব ছিল। আর উনি সহ্য করতে পারবেন না, ভেঙ্গে পড়বেন।

গুহ। (শীলাকে) বেশ, আপনি যেতে পারেন! আপনাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই।

শীলা। কিন্তু আপনার প্রশ্ন করা ত শেষ হয় নি?

গুহ। তা অবশ্য হয় নি।

শীলা। (যতীনকে) দেখেছ? (গুহকে) তা হ'লে আমি যেতে চাই না।

যতীন। কিন্তু কেন শীলা? এই বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে থেকে কি লাভ?

গুহ। তার মানে আপনি মেয়েদের বিশ্রী ব্যাপার থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চান!

যতীন। হ্যাঁ, যদি তা সম্ভব হয়।

গুহ। কিন্তু আমরা জানি একটি মেয়ের জীবনে তা সম্ভব হয় নি।

যতীন। আপনার সামনে কোন কথা বলাই শক্ত!

শীলা। আমি ত তোমাকে আগেই বলেছিলাম।

যতীন। শীলা, তোমার এখানে থাকার প্রয়োজন কি? মিছে কষ্ট পাবে।

শীলা। যা কষ্ট পেয়েছি তার চেয়ে বেশী আর কিছু হতে পারে না। থাকলে বরং ভালই হবে—

যতীন। ও, বুঝেছি।

শীলা। কি বুঝেছ?

যতীন। তোমার নিজের পালা ত শেষ হয়ে গেছে, তাই দেখতে চাও অপরের বেলায় কেমন মজা হয়?

শীলা। আমার সম্বন্ধে তোমার এই রকম ধারণা? আমার ভাগ্য ভাল যে সময় থাকতে এটা জানতে পারলাম!

যতীন। না, না, তুমি ভুল বুঝছো। আমি কিছু মনে করে ও কথা বলি নি।

শীলা। নিশ্চয়ই বলেছ। আমার সম্বন্ধে যদি তোমার এতটুকু ভাল ধারণা থাকতো, তা হলে অমন কথা মুখে আনতে না। কেমন করে একটা অসহায় মেয়েকে আমি বিনা দোষে চাকরি থেকে তাড়িয়েছি, বসে বসে তাই শুনেছ—আর তোমার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে আমার মত নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, হিংসুক মেয়ে আর হতে পারে না—'

যতীন। এমন কথা আমি বলি নি, মনেও করি নি।

শীলা। তবে তুমি কেন বললে যে আমি মজা দেখবার জন্যে থাকতে চাই? আমার কি তাই উদ্দেশ্য ছিল?

যতীন। বেশ, আমি অন্যায় স্বীকার করছি।

শীলা। তা করছো, কিন্তু এখনো তুমি আমায় বিশ্বাস করছো না। মনে রেখ, আমাকে অবিশ্বাস করার সময় এটা নয়—

গুহ। (থামিয়ে) আমাকে বলতে দিন, মিস্ ব্যানার্জ্জী,। মিঃ ভট্টাচার্য্য, আমি বলছি কেন উনি থাকতে চাইছেন। এই ট্রাজেডীর জন্যে মিস্ ব্যানার্জ্জী নিজেকে দায়ী মনে করেছেন। এখন যদি এখানে না থাকেন এবং এর পরে যা ঘটেছিল তা না জানতে পারেন, তা হলে সমস্ত রাত ধরে উনি কেবল নিজেকেই দায়ী বলে ভাবতে থাকবেন। শুধু আজকের রাত নয়, কালকের রাত নয়, সমস্ত জীবন ধরে প্রত্যেক রাত্রে চোখ বুজলেই

সেই মেয়েটির মুখ ওঁর চোখের সামনে ভেসে উঠবে—(শীলা মুখ ঢাকলো)। ভেবে দেখুন মিঃ ভট্টাচার্য্য—

শীলা। (মুখ তুলে) আপনি চুপ করুন। আমি জানি আমি দোষী—আর এর জন্যে যে আমি কতটা অনুতপ্ত তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না—আমি বিশ্বাস করবো না, যে কেবল আমার দোষেই তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে! সে আমি সহ্য করতে পারবো না—

গুহ। দেখছেন, সব জিনিষই কিছু ভাগাভাগি হয়ে যাওয়া দরকার। আর কিছু না হোক্‌ অপরাধের ভাগাভাগিটা বড়ই প্রয়োজনীয়, তা না হলে একজনের ওপর বড় বেশী ভার পড়ে যায়—

শীলা। আপনার কথাবার্তা আশ্চর্য্য ধরণের! আপনাকে যেন কিছুতেই বুঝতে পারছি না—

গুহ। প্রয়োজনই বা কি?

মিসেস্ সুবালা ব্যানার্জ্জী ঘরে ঢুকলেন। তাঁর ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি কোনই গুরুত্ব দেন নি

সুবালা। এই যে ইন্সপেক্টর গুহ। নমস্কার।

গুহ। নমস্কার। আপনি মিসেস্ ব্যানার্জ্জী?

সুবালা। হ্যাঁ। আমার স্বামী আমাকে সব কথা বলেছেন। আপনার তদন্তে যতটা সাহায্য আমরা করতে পারি, নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু আমরা ত বিশেষ কিছু জানি না—

শীলা। (বাধা দিয়ে) মা—

সুবালা। কি রে, কি হয়েছে?

শীলা। মা, তুমি ভুল করছো, তুমি কিচ্ছু বলো না। কি বলতে কি বলে ফেলবে—

সুবালা। কেন লুকোবার কি আছে?

শীলা। তুমি বুঝছো না মা, আমরাও ঠিক তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু উনি একবার প্রশ্ন সুরু করলে আর থই পাবে না।

সুবালা। শীলা, তোকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তুই বরং যা। এ ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাস্ না। সকালে উঠে দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।

শীলা। মা, তুমি বুঝছো না, আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। এই নিয়ে অনেক কথা এখুনি হয়ে গেছে। আমাকে জানতেই হবে কেন মেয়েটি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হ'লো।

সুবালা। আমার ত মনে হয় না যে কোন কালেই সমস্ত কারণ জানা যাবে। ও ধরণের মেয়েরা—

শীলা। মা, আমি তোমাকে মিনতি করছি, তুমি চুপ করো—

সুবালা। তোর কি হয়েছে বল ত?

শীলা। কিছু হয় নি মা, কিছু হয় নি। শুধু তুমি আমাদের আর মেয়েটির মধ্যে কোন প্রভেদ দেখাবার চেষ্টা কোর না। তোমার কথা দাঁড়াবে না—ইন্সপেক্টর দাঁড়াতে দেবেন না।

সুবালা। তোর কথা আমি কিছুই বুঝছি না। (গুহকে) আপনি বুঝছেন।

গুহ। বুঝছি বৈকি। মিস্ ব্যানার্জ্জী ঠিকই বলছেন।

সুবালা। দেখুন, আমি জানি আপনি একটা আত্মহত্যার তদন্ত করতে এসেছেন এবং আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু যেভাবে আপনি তদন্ত করছেন, আপনাকে জানিয়ে রাখছি, সেটা আমাদের মোটেই পছন্দ নয়। আপনি ভাববেন না যে এর প্রতিকার আমাদের হাতে নেই। আমার স্বামী একজন নামজাদা লোক, অনেক বড়ো বড়ো পুলিস অফিসার, এমন কি হোম-মিনিষ্টারের সঙ্গে আমাদের জানাশোনা আছে—

শীলা। মা, পাগলের মতো কথা বলো না।

যতীন। ইন্সপেক্টরের এ সবই জানা আছে। তাঁকে বারবার মনে করিয়ে দিয়ে কোন ফল হবে না।

গুহ। হ্যাঁ, মিসেস্ ব্যানার্জ্জী। হোম-মিনিষ্টারের সঙ্গে মিঃ ব্যানার্জ্জীর আলাপ আছে তা জানি। কিন্তু তারপর?

সুবালা। তারপর? আমার স্বামী এখুনি আসছেন, এসে আপনার ব্যবস্থা করবেন।

গুহ। মিঃ ব্যানার্জ্জী কোথায়? কি করছেন তিনি?

সুবালা। আমার ছেলে আনন্দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। আপনার আসাতে সে বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। হাজার হোক্ ছেলে মানুষ—

গুহ। আপনি আপনার ছেলেকে এখনো ছেলেমানুষ মনে করেন, মিসেস্ ব্যানার্জ্জী ?

শীলা। আনন্দ ছেলেমানুষ! তার সব কীর্ত্তির কথা যদি তুমি জানতে মা—

সুবালা। শীলা, তুই কি বলছিস্ ?

শীলা। মা, আমি আনন্দকে কোন গোলমালে ফেলার জন্যে একথা বলছি না, কিন্তু ইন্সপেক্টরের সামনে তাকে ছেলেমানুষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় কোন লাভ হবে না। তোমরা চোখ কান বুজে থাকতে পারো, কিন্তু আনন্দ দু বছর ধরে কি করে বেড়াচ্ছে তা সকলেই জানে।

সুবালা। (স্তম্ভিত ভাবে) তোর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। (যতীনকে) যতীন, তুমি পুরুষ মানুষ, মেয়েদের মত তোমার কান পাতলা নয়। তুমি নিশ্চয়ই জানো শীলা যা বলছে তা সত্যি নয় ?

গুহ। (যতীন চুপ করে আছে দেখে) কি মিঃ ভট্টাচার্য্য, কথার উত্তর দিন।

যতীন। (ইতস্তত করে) দেখুন, এ বাড়ী ছাড়া আনন্দের সঙ্গে বাইরে আমার বিশেষ দেখাশোনা হয় না—তবে—তার সম্বন্ধে নানা রকম কথা কানে এসেছে। আমার দু একজন বন্ধু তাকে—

সুবালা। (উত্তেজিত ভাবে) মদ খেতে দেখেছে ? খারাপ মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেখেছে ? বলো, যা মনে আসে বলো।

যতীন। (সোজা ভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। অন্ততঃ এটা আমি ভালভাবেই জানি যে আনন্দ আজকাল অতিরিক্ত drink করতে সুরু করেছে।

সুবালা। (বসে পড়লেন) এতদিন একথা আমাদের কাছে লুকিয়ে রেখে, আজ এই সময়ে বলছো ?

শীলা। তোমাকে সেইজন্যই ও বলছিলাম মা, কারুর সঙ্গে কোন প্রভেদ আমাদের আর রইল না। ইন্সপেক্টর থাকতে দেবেন না।

সুবালা। উনি যা না করেছেন, তুই ত তার চেয়ে অনেক বেশী করছিস্ শীলা। বোন হয়ে তুই ভায়ের নামে যে অপবাদ দিলি—

শীলা। তুমি এখনো অপবাদ মনে করছ মা ? সত্যকে স্বীকার করতে পারছো না ? উনি প্রশ্ন সুরু করলে তুমি কি করবে ?

সুবালা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) ইন্সপেক্টর, আমাকে আপনার যদি কোন প্রশ্ন করবার থাকে তা হলে করুন। কিন্তু গোড়াতেই বলে রাখছি, এ মেয়েটার সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।

গুহ। জানেন কি না তা এখনি দেখা যাবে মিসেস্ ব্যানার্জ্জী।

মিঃ ব্যানার্জ্জী ঘরে ঢুকিলেন

ব্যানার্জ্জী। (মিসেসকে) আনন্দকে শুতে যেতে বললাম, তা সে কিছুতেই যাবে না। (গুহকে) ইন্সপেক্টর, আপনি নাকি তাকে জেগে থাকতে বলেছেন ?

গুহ। হ্যাঁ।

ব্যানার্জ্জী। কেন ?

গুহ। তার সঙ্গেও আমার কিছু কথা আছে।

ব্যানার্জ্জী। তা হ'লে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সেরে নিয়ে তাকে ছেড়ে দিন না—ঘুমিয়ে বাঁচুক।

গুহ। না, এখনো সময় হয় নি। তাকে আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে।

ব্যানার্জ্জী। দেখুন ইন্সপেক্টর—

গুহ। (থামিয়ে দিয়ে) আমি বলছি তাকে অপেক্ষা করতে হবে। তার পালা এখনো আসে নি।

ব্যানার্জ্জী। (কঠিন সুরে) ইন্সপেক্টর, আমি আগেও বলেছি, এখন আবার বলছি, নিজের ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যাবেন না। আমি আর সহ্য করবো না।

গুহ। আমি আপনাকে সহ্য করতে ত বলি নি।

শীলা। (প্রায় চেঁচিয়ে) বাবা, তুমি বুঝছো না উনি কি করতে চাইছেন ? উনি ইচ্ছে করে আমাদের রাগাতে চাইছেন, যাতে আমাদের মুখের বাঁধন আলগা হয়ে যায়!

সুবালা। শীলা, তুই চুপ কর, আমাদের কথা বলতে দে। (গুহকে) বলুন, কি জানতে চান ?

গুহ। গত বছর, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি, ইভা দত্তকে milward co ছাড়তে হয়, মিস্ ব্যানার্জ্জী রিপোর্ট করার পর। এরপর, কোথাও চাকরি না পেয়ে নিদারুণ অর্থাভাবে কয়েকটা মাস তার বড়ই দুর্দ্দশায় কেটেছিল। এই সময়ে, ইভা দত্ত হিসাবে জীবনে সে সুখ পায় নি বলেই

হোক্ কিম্বা পুরাণো নামের সঙ্গে অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে নতুন জীবন আরম্ভ করার আশাতেই হোক্, সে নতুন নাম নিয়েছিল—রত্না সেন। (হঠাৎ ঘুরে যতীনকে) মিঃ ভট্টাচার্য্য, রত্না সেনের সঙ্গে কবে আপনার জানাশুনা হ'লো ?

সুবালা। }
ব্যানার্জ্জী। } (একসঙ্গে বিস্ময়াম্বিত কণ্ঠে) এ আপনি কি বলছেন ?

যতীন। রত্না সেনের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, এ ধারণা আপনার কোথা থেকে হ'লো ?

শীলা। লুকোবার চেষ্টা করে লাভ নেই। মিছে সময় নষ্ট করছো—

গুহ। রত্না সেনের নাম শুনেই আপনি যে রকম চমকে, উঠেছিলেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আপনি তাকে ভালভাবেই জানতেন।

শীলা। জানতোই ত।

গুহ। তা ছাড়া, এটা আমি আগে থেকেই জানি। ডায়েরীর কথা ভুলবেন না! এখন আমি জানতে চাই কবে, কি রকম ভাবে, তার সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ হ'লো।

যতীন। (একটু চুপ করে থেকে) বেশ, বলতে যখন আমাকে হবেই তখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় গত বছরের জুন মাসে, রাস্তায়—

শীলা। রাস্তায় দেখা হবে না ত কি হবে রাজপ্রাসাদে।

যতীন। শীলা, তোমার মনোভাব জানতে আমার আর বাকী নেই! কেন আমার কাহিনী শুনে নিজেকে আরো কষ্ট দিতে চাইছ ? তার চেয়ে তুমি যাও না—

শীলা। কখনো না। আমি জানতে চাই যে কি মোহে তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক কাটাতে চেয়েছিলে, মিথ্যা কাজের অজুহাত দেখিয়ে মাসের পর মাস এ বাড়ীতে আসো নি ?

গুহ। মিঃ ভট্টাচার্য্য, থামবেন না, বলে যান।

যতীন। সে রাত্রে আমার মনটা ভাল না থাকায় একাই মোটরে খানিকটা ঘুরে আসবার জন্যে বেরিয়ে ছিলাম। উদ্দেশ্যহীনভাবে নানা পথ ঘুরে যখন ধর্ম্মতলা দিয়ে ফিরছি, রাত তখন বারোটা হবে। একটা মোড়ের মাথায় হঠাৎ নজরে পড়ে গেল যে একটু ভেতরে প্রায় *অন্ধকার জায়গায় দু তিনজন লোক একটি মেয়েকে* ধরে টানাটানি করছে। গাড়ীর আলো পড়তেই মেয়েটি তাদের হাত ছাড়িয়ে আমার মোটরের দিকে দৌড়ে এল, সময়ে ব্রেক না করলে হয়ত গাড়ীর সামনেই এসে পড়তো। গাড়ী থামতেই সে পিছনের দরজা খুলে ভেতরে উঠে পড়লো, আর আমাকে কাতরস্বরে বললো 'জোরে চালান, আমাকে বাঁচান'। তারপর ঠিক কি করেছিলাম মনে নেই, কিন্তু সম্বিত ফিরে আসতে দেখলাম চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে বেশ জোরে গাড়ী চালিয়ে চলেছি।

সুবালা। শীলা, তোর এ সব শোনার কোন প্রয়োজন নেই। আমি বলছি, যা, তুই ভেতরে যা।

শীলা। (পাগলের মত হেসে) মা, আমার শোনারই ত সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন! তুমি ভুলে যাচ্ছ যে এই নাটকের নায়কের সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ের কথা পাকা করেছ! (যতীনকে) বলো, বলো, নিশীথ রাতে এ রকম একটা বীরত্ব দেখানর পর—

যতীন। তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো শীলা ?

গুহ। মিস্ ব্যানার্জ্জী, দয়া করে আপনি আর কথা বাড়াবেন না। বলুন, মিঃ ভট্টাচার্য্য।

যতীন। তারপর যখন ব্যাপারটা বোঝবার মত শক্তি ফিরে পেলাম তখন গাড়ী থামিয়ে তাকে নেমে যেতে বললাম। নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে সে ধীরে ধীরে ফুটপাথের ওপর নেমে অবসন্নভাবে একটা ল্যাম্পপোষ্টে ভর দিয়ে দাঁড়াল। সেই প্রথম তার মুখ দেখতে পেলাম। দেখে মনে হ'ল সে ভদ্রঘরের মেয়ে, হঠাৎ বিপদে পড়ে দিশে-হারা হয়ে গেছে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তার সে অবস্থা দেখে আমার মনে হ'লো যে আমার কর্ত্তব্য তাকে তার বাড়ীতে পৌছে দেওয়া।

গুহ। আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান তার সৌন্দর্য্য দেখে জেগে ওঠেনি ত ?

যতীন। জানি না। গ্যাসের অল্প আলোতে যেটুকু দেখতে পেয়েছিলাম তাতে বুঝেছিলাম যে সে খুবই সুন্দরী, কিন্তু—ওঃ—

গুহ। কি হ'লো ?

যতীন। কিছু না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে সে আর বেঁচে নেই।

গুহ। হ্যাঁ, সে আর বেঁচে নেই।

শীলা। এবং আমরাই তার মৃত্যুর কারণ!

সুবালা। কি বাজে বকছিস্ শীলা, চুপ কর না?

শীলা। বাজে বকছি মা? তুমি দেখে নিও—

গুহ। আপনারা দয়া করে চুপ করবেন? মিঃ ভট্টাচার্য্য, তারপর?

যতীন। তারপর? তার মুখ দেখে তাকে ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত্ত মনে হওয়ায় তাকে নিয়ে একটা রেস্তোঁরায় ঢুকলাম। প্রায় সব দোকানই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই এটা খুঁজে পেতে বেশ সময় লেগেছিল। তার খাওয়া দেখে মনে হ'লো বেশ কদিন সে কিছু খেতে পায় নি। খাওয়ার পর তার বাড়ীর ঠিকানা জেনে তাকে সেখানে পৌছে দিয়ে এলাম।

গুহ। তার সম্বন্ধে তখন কিছু জানতে পারেন নি?

যতীন। হ্যাঁ, ফেরবার সময় গাড়ীতে তাকে তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে সে জানিয়েছিল, তার নাম রত্না সেন, পাকিস্থান থেকে এসেছে, বাবা মা দুজনেই দাঙ্গায় মারা গেছেন। কলকাতায় সে সহায়সম্বলহীন, সম্পূর্ণ একলা। একটা অফিসে কাজ করতো কিন্তু মাইনে নিয়ে গণ্ডগোল হওয়ায় চাকরী যায়, একটা পোষাকের দোকান থেকেও বিনা কারণে বিতাড়িত হয়েছে, কিন্তু অফিস বা দোকান কোনটারই নাম সে জানায় নি। সারাপথ সে নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিল, হয়ত বা আমার সহানুভূতি তার মুখের বাঁধন খুলে দিয়েছিল। কিন্তু তার নাম রত্না সেনই আমি জানতাম। আজ এই প্রথম জানলাম যে তার আসল নাম ইভা দত্ত। (একটু থেমে) ইন্সপেক্টর, আশা করি এবার আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

গুহ। না। রত্না সেনের সঙ্গে আপনার জানাশুনা এখানেই শেষ হয় নি।

যতীন। তা হয় নি, কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে তার আত্মহত্যার কোন সম্পর্ক নেই।

গুহ। কার সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে সেটা বোঝবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন মিঃ ভট্টাচার্য্য। এর পরে কি ঘটেছিল সেটা আমি জানতে চাই।

যতীন। বেশ। সে রাত্রে নয়—কিছুদিন পরে—অবশ্য তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আমি তার ঘরে গিয়েছিলাম—কিছুদিন পরে আমি জানতে পারলাম যে টাকার অভাবে, ভাড়া না দিতে পারায় তাকে ঘর ছেড়ে দিতে হচ্ছে। যাতে তাকে পথে না দাঁড়াতে হয় সেই জন্যে তাকে কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলাম। (গুহর দিকে সোজা তাকিয়ে) কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজ করিনি। আমি শুধু চেয়েছিলাম যে অর্থের অভাবে তাকে যেন পথে গিয়ে না দাঁড়াতে হয়। প্রতিদানে আমার কিছুই দাবী ছিল না।

গুহ। আপনাকে আমি অবিশ্বাস করছি না।

শীলা। কিন্তু ওকথা ইন্সপেক্টরকে বলার ত কোন মানে হয় না! কৈফিয়ৎ যদি দিতে চাও, আমাকে দাও।

যতীন। কোন কৈফিয়ৎই আমি দিচ্ছি না, দেবার প্রয়োজনও নেই। তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে না, সে আমি জানি।

গুহ। মিঃ ভট্টাচার্য্য, আপনি কি রত্না সেনকে ভালবেসেছিলেন?

শীলা। আমিও ঠিক এই প্রশ্নই করতে যাচ্ছিলাম।

ব্যানার্জ্জী। অনেক হয়েছে। এবার এ কথার এখানেই শেষ হোক্। আমি চাই না যে—

গুহ। আপনি কি চান বা না চান তার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই। এ কথা চাপা দেবারও কোন অধিকার আপনার নেই। ভুলে যাবেন না আপনিই প্রথম তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছিলেন!

ব্যানার্জ্জী। আমার অবস্থায় যে-কোন লোক ও কাজ করতে বাধ্য হ'তো। কিন্তু ও কথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি বলতে চাইছিলাম যে আমি চাই না যে আমার মেয়ের সামনে এই সব নোংরা ব্যাপারের আলোচনা চলে।

গুহ। আপনার মেয়ে কিছু চন্দ্রলোকে বাস করেন না—তাঁকেও এই নোংরা পৃথিবীর নোংরা আবহাওয়ার মধ্যেই বাস করতে হয়!

শীলা। বাবা, আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আমি ছেলেমানুষ নই। মেয়েটিকে milwards থেকে তাড়ানর জন্যে আমিই দায়ী, চেষ্টা করলেও এ নোংরামি থেকে তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না। তা ছাড়া আমাদের

বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে; এ ব্যাপারের সব কিছু জানবার অধিকার আমার আছে। (যতীনকে) বলো, তুমি কি রত্না সেনকে ভালবেসেছিলে?

যতীন। জানি না। হয়ত তার সম্বন্ধে খানিকটা মোহ আমার মনে জেগেছিল, আমি পুরুষ মানুষ, তার সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করার মত শক্তি আমার ছিল না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার দয়ার জন্তই হোক বা সহানুভূতির জন্তই হোক, তার মনে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আরো বেশী কিছু ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। কিন্তু আমার দিক থেকে কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় নি কখনো, কোন প্রশ্রয়ও আমি কখনো দিই নি।

শীলা। আজ সারা সন্ধ্যায় এই প্রথম তোমার সত্যকথা বলবার সৎসাহস আছে তা জানতে পারলাম। কিন্তু পাঁচ ছ'মাস যে এখানে আসো নি, তা থেকে এ প্রমাণ হয় না যে রত্না সেনের সম্বন্ধে তোমার মনে কোন দুর্ব্বলতা ছিল না!

যতীন। তোমাকে যখন বলেছিলাম যে কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন মিথ্যা কথা বলি নি। তবে এই সময়ে রত্না সেনের সঙ্গে অনেক বার দেখাশুনা হয়েছে সেটা অস্বীকার করবো না। আমি ছাড়া তার আর কেউ অবলম্বন ছিল না। তার সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে ছিল স্নেহ, মায়া, করুণা। তাকে যে অবশ্যম্ভাবী পতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছি, হয়ত তার জন্যে ছিল আত্মপ্রসাদ। আমি জানতাম যে আমার প্রতি তার যে মনোভাব তাতে যে-কোনদিন, যে-কোন মুহূর্ত্তে তাকে পাওয়া আমার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু সে প্রবৃত্তি আমার হয় নি। রক্ষক হয়ে ভক্ষক হবার মত মনোবৃত্তি আমার ছিল না।

গুহ। (কঠিন স্বরে) মিঃ ভট্টাচার্য্য, রত্না সেনের সম্বন্ধে যখন আপনার এই মনোভাব তখন তাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন কেন?

ব্যানার্জ্জী। }
সুবালা। } জেলে? আপনি কি বলছেন, ইন্সপেক্টর?

গুহ। ঠিকই বলছি।

শীলা। (যতীনকে) কয়েক মিনিট আগে তোমার কথা শুনে তোমার ওপর শ্রদ্ধা আসছিল। কিন্তু রত্না সেনের নাম শুনেই তুমি যে রকম অপরাধীর মত মুখের ভাব করেছিলে তাতে আমার বোঝা উচিত ছিল যে যতো সহজ, যতো সুন্দরভাবে তুমি ব্যাপারটাকে দাঁড় করাচ্ছ কখনোই তা অত সহজ বা সুন্দর হতে পারে না।

যতীন। আমাকে বিশ্বাস করো শীলা, এতক্ষণ যা বলেছি তার মধ্যে কোন মিথ্যা আমি বলি নি। কিন্তু এর পর যা ঘটেছিল—

গুহ। হাঁ, এর পর যা ঘটেছিল তা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

যতীন। আমার পকেট থেকে সাত শ টাকা হারায়। আমার মনে হয়েছিল সেই এ টাকা চুরি করেছে।

গুহ। কোন প্রমাণ ছিল

যতীন। না, কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ ছিল না, কিন্তু যে অবস্থায় টাকাশুদ্ধ পার্স'টা হারায় তাতে সে সময় তাকে ছাড়া আর কারুকে সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না।

গুহ। শুধু সন্দেহের ওপর নির্ভর করে পুলিস নিশ্চয়ই তার নামে কেস করে নি! কি প্রমাণ তাদের সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন, মিঃ ভট্টাচার্য্য? না মিথ্যে জালে জড়াবার জন্য ঘুষ দিয়েছিলেন?

যতীন। না, ইন্সপেক্টর। যখন আমার স্থির বিশ্বাস হলো যে টাকাটা সে ছাড়া আর কেউ নিতে পারে না তখন যে কত বড় মানসিক আঘাত পেলাম তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। টাকাটা কিছুই নয়, কিন্তু সে যে আমার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখে নি সেটাই আমার কাছে মর্ম্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমার সমস্ত মন ঘৃণায় বিষিয়ে উঠেছিল। আমি জানতাম শুধু আমার সন্দেহের ওপর নির্ভর করে পুলিস কিছু করবে না—তাই, তাকে আগে যা দু একটা জিনিষ উপহার দিয়েছিলাম, পুলিসকে বলেছিলাম যে টাকার সঙ্গে সেগুলোও সেই দিনই আমার পকেট থেকে চুরি গেছে। যখন তার ঘর সার্চ্চ হ'লো, টাকা পাওয়া গেল না, কিন্তু সেগুলো পাওয়া গেল—

শীলা। ছিঃ ছিঃ। তুমি শুধু সন্দেহের বশে একটি মেয়েকে এমনি করে মিথ্যা জালে জড়ালে?

যতীন। আমার তখনকার মনের অবস্থাটা একটু ভেবে দেখো শীলা। সে যে অপরাধী তাতে কোন সন্দেহ আমার তখন ছিল না। তখন আমার একমাত্র চিন্তা ছিল

যে, যে আমার দয়ায়, আমার উপকারের এমন ভাবে প্রতিদান দিল, তাকে যে কোন উপায়েই হোক্ শাস্তি আমাকে দিতেই হবে। ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার মত ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। (একটু থেমে) কিন্তু তার যেদিন চার মাস জেল হয়ে গেল, সেদিন সারারাত আমি ঘুমাতে পারি নি।

গুহ। কেন, বিবেকের দংশনে না কি?

যতীন। যতদিন কেস চলছিল, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে আমি ঠিকই করছি। কিন্তু শেষদিন যখন তাকে কোর্টে দেখলাম তখন মনে হ'ল যেন ভুল করেছি। রায় শোনবার পর তার মুখে লজ্জা, গ্লানি বা অনুতাপের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পেলাম না—শুধু দেখলাম বিস্ময়। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না যে আমি সত্যিই তার মাথায় এই সর্ব্বনাশের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারি!

গুহ। তার ডায়েরীতেও সে এই কথাই লিখে গিয়েছে, এইটাই তার ছিল জিজ্ঞাসা। কেন আপনি অযাচিতভাবে অত দয়া করার পর এমন নির্দ্দয়ভাবে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন! মিঃ ভট্টাচার্য্য, কবে আপনি জানতে পারলেন যে সে সত্যই নিরপরাধ?

যতীন। মাস তিনেক পরে, একদিন আমার পকেট থেকে সিগারেট কেসটা পড়ে গাড়ীর সিটের নীচে চলে যাওয়াতে সেটা বার করবার জন্তে সিটটা তুলে দেখতে পেলাম টাকাশুদ্ধ পার্স টাও সেখানে পড়ে রয়েছে।

শীলা। যখন জানতে পারলে যে সে নিরপরাধ, তখন কি ব্যবস্থা করলে?

যতীন। তখন আর আমি কি করতে পারতাম শীলা! চার মাসের মধ্যে তিনমাস জেল বাস তখন হয়ে গিয়েছে।

শীলা। কি করতে পারতে? কেন তুমি তোমার নিজের ভুল স্বীকার করলে না? যে আদালতে দাঁড়িয়ে তুমি মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিলে, সেখানে দাঁড়িয়ে সত্যি কথা বলতে তোমার কিসে বাধলো? তাতে অন্ততঃ তার একমাস কম জেল ভোগ হ'ত—মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে বাঁচতো!

যতীন। সে সাহস আমার হয় নি শীলা। আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কি শাস্তি তা আমার জানা ছিল। তা ছাড়া, আমি ভেবেছিলাম যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। পুরানো ব্যাপারকে আবার ঘাঁটিয়ে লাভ নেই, অনর্থক কেবল নিজের ওপর নানা ঝঞ্ঝাট টেনে আনা হবে।

গুহ। অর্থাৎ একটা নিরপরাধ মেয়ের কলঙ্ক ও দুঃখভোগের চাইতে আপনার নিজের সুনাম ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনটাই আপনার কাছে বড়ো হয়েছিলো। একটা মিথ্যা সন্দেহ ও রাগের বশে তাকে চরম শাস্তি দিতে আপনার একটুও দ্বিধা হয় নি, কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করে তার মাশুল দেবার মত সৎসাহস দেখাবার শিক্ষা আপনার ছিল না। অথচ সেই মেয়েটি আপনার এই নির্দ্দয় আঘাতে মর্ম্মাহত হয়েছে—তবু ডায়েরীতে লিখে গেছে যে এর জন্ত আপনার কোন দোষ নেই, দোষ তার ভাগ্যের। সে যদি জানতে পারতো যে আপনি সব জেনেও তাকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা করেন নি—তা হ'লে তার কি মনোভাব হ'ত সেটা বুঝতে পারেন?

যতীন নিরুত্তর, শীলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মিঃ ও মিসেস ব্যানার্জ্জী যতীনের দিকে চেয়ে রইলেন

তারপর, মিঃ ভট্টাচার্য্য?

যতীন। নভেম্বর মাসে কোর্টে তার সঙ্গে দেখা হবার পর আর কোনদিন আমি তার দেখা পাই নি। ইন্সপেক্টর, এর বেশী আমি আর কিছু জানি না।

গুহ। এর বেশী আপনার কাছ থেকে জানবারও কিছু নেই।

যতীন। তা হ'লে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমি যেতে চাই।

গুহ। কোথায় যাবেন আমার জানা দরকার। বাড়ী যাচ্ছেন?

যতীন। না, একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরে আসতে চাই। একটু পরেই আমি ফিরে আসবো।

গুহ। বেশ, তা হ'লে যান।

শীলা। (জানলা থেকে এগিয়ে এসে যতীনকে) যদি ফিরে না আস, বা ফিরে আসতে না চাও, তা হ'লে এ কথাটা এখনই জেনে যাও। আজকের উৎসবের উপলক্ষটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। তোমার আর আমার মধ্যে এখন আর কোন সম্পর্ক রইল না।

যতীন। এমন যে হবে তা আমি জানতাম।

শীলা। তোমাকে আমি কোন দোষ দিচ্ছি না।

কিন্তু তুমি যে একটা নিরপরাধ মেয়েকে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে শাস্তি দিয়েছ, উপায় থাকতেও তার কোন প্রতিকার করো নি, এটা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। আমি জানি আমার নিজের অপরাধও কিছু কম নয়। কিন্তু ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে-আমি, যে-তোমাকে জানতাম, সে-আমি, সে-তুমির অনেক অদল-বদল হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার সময় আমরা পরস্পরের কাছে যা ছিলাম এখন আর তা নেই। এখন আমাদের আবার একেবারে গোড়া থেকে সুরু করতে হবে, নতুন করে নিজেদের জানতে হবে।

ব্যানার্জ্জী। দেখো শীলা, আমি যতীনের পক্ষ নিয়ে কিছু বলছি না। কিন্তু এমন কি সে করেছে, যার জন্যে তোমাদের সব সম্পর্ক শেষ করে ফেলতে হবে? জীবনে এমন ভুল কে না করে?

শীলা। বাবা, আমি যা বলতে চাইছি, তা তুমি বুঝবে না—

যতীন। বেশ, তোমার কথাই রইল। কিন্তু আমি আবার ফিরে আসছি।

শীলা। যদি আসতে চাও—এসো। আমি বাধা দোব না।

যতীন বেরিয়ে গেল। দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল

(ইন্সপেক্টরকে) আচ্ছা, ওকে ত আপনি মেয়েটির ফটো দেখান নি?

গুহ। না, প্রয়োজন ছিল না। আমি দেখাতে ত চাই নি।

সুবালা। মেয়েটার ফটো বুঝি আছে আপনার কাছে?

গুহ। হ্যাঁ। আমার মনে হয় আপনারও সেটা দেখা উচিত। (পকেট থেকে ফটো বার করে মিসেস ব্যানার্জ্জীকে দেখালেন) চিনতে পারছেন?

সুবালা। (ফটো দেখে একটু চমকে উঠলেন, তারপর নিজেকে সামলে নিলেন) না। কেন, আমার চেনা উচিত না কি?

গুহ। (ফটো আবার পকেটে পুরলেন) ইদানীং হয়ত তার চেহারার কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছিল, কিন্তু সেজন্যে তাকে চেনা যাবে না এ আমি বিশ্বাস করি না।

সুবালা। আপনার কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না।

গুহ। তার চেয়ে বলুন বুঝতে চাইছেন না।

সুবালা। (রেগে) আমি ঠিক যা বলতে চেয়েছি তাই বলেছি।

গুহ। আপনি সত্য কথা বলছেন না।

সুবালা। কি বললেন

ব্যানার্জ্জী। (এগিয়ে এলেন) ইন্সপেক্টর, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। আপনাকে এখুনি ক্ষমা চাইতে হবে—

গুহ। ক্ষমা চাইতে হবে? কেন? কর্ত্তব্য করার জন্যে?

ব্যানার্জ্জী। না, কর্ত্তব্য করতে এসে অভদ্রতা করার জন্যে। জানেন, আমি আপনার কি করতে পারি?

গুহ। মিঃ ব্যানার্জ্জী, আপনি অনেকবারই আমাকে এ রকম ভয় দেখিয়েছেন। জানি না আপনার নিজের ক্ষমতার সম্বন্ধে কি ধারণা, কিন্তু ক্ষমতা থাকলেই হয় না, তার সঙ্গে খানিকটা দায়িত্বজ্ঞানও থাকা দরকার।

ব্যানার্জ্জী। ও, আপনি আমাকে দায়িত্বজ্ঞান শেখাতে এসেছেন?

শীলা। বাবা, এ রকম বচসা করে কি লাভ হচ্ছে? বুঝছো না, ওঁর প্রত্যেকটি প্রশ্নের পিছনে গভীর অর্থ রয়েছে? মা ফটো দেখে কেন চিনতে পারছেন না বলছেন জানি না, কিন্তু ওঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে চিনতে পেরেছেন। মা যদি সত্যি কথা না বলেন, তা হলে ইন্সপেক্টরই বা ক্ষমা চাইতে যাবেন কেন? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না যে সমস্ত ব্যাপারটাকে তোমরা আরো কঠিন করে তুলছো?

ঘুরে দাঁড়াল। বাহিরে থেকে দরজার শব্দ শোনা গেল

ব্যানার্জ্জী। দরজার শব্দ বলে মনে হ'ল না?

সুবালা। যতীন বোধহয় ফিরে এলো।

গুহ। কিম্বা আপনার ছেলে বোধহয় বাইরে গেলেন।

ব্যানার্জ্জী। আমি দেখছি।

তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে বেরিয়ে গেলেন

গুহ। মিসেস ব্যানার্জ্জী, আপনি দক্ষিণ কলিকাতা নারীত্রাণ সমিতির একজন সদস্যা, নয় কি?

মিসেস ব্যানার্জি চুপ করে রইলেন

শীলা। মা, চুপ করে থেকো না, স্বীকার করতে বাধা কি? (গুহকে) হ্যাঁ, মা নারীত্রাণ সমিতির প্রেসিডেণ্ট। কেন?

গুহ। এই সমিতির কাছে দুঃখে কষ্টে পড়ে মেয়েরা সাহায্যের জন্যে আবেদন করতে পারে, নয় কি?

সুবালা। (গর্ব্বিত ভাবে) হঁ্যা, আমাদের সমিতির প্রধান কাজই হচ্ছে দুঃস্থ মেয়েদের নানা ভাবে সাহায্য করা, অবশ্য সত্যিই যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন থাকে।

গুহ। গত সপ্তাহে আপনাদের এক অধিবেশনে এমন কয়েকজন সাহায্যপ্রার্থী দেখা করতে এসেছিল। আপনার মনে আছে?

সুবালা। হঁ্যা আছে। কিন্তু এ সব প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি?

গুহ। বুঝতে পারছেন না? আরো সহজ সরল ভাষায় বলে দিতে হবে?

মিঃ ব্যানার্জি ঘরে ঢুকলেন

ব্যানার্জ্জী। আনন্দই বাইরে গেছে।

সুবালা। সে কি, এত রাত্রে আনন্দ বাইরে যাবে কেন? তুমি তার ঘরটা দেখেছ ত?

ব্যানার্জ্জী। হঁ্যা, ঘরে সে নেই। অন্য কোথাও সাড়াশব্দ পেলাম না।

সুবালা। আশ্চর্য্য! কোথায় গেল?

ব্যানার্জ্জী। মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যে বোধহয় একটু বাইরে ঘুরতে গেছে। কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল দেখেছ ত? এখুনি ফিরে আসবে।

গুহ। এখুনি না ফিরলে তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা আমায় করতে হবে।

সুবালা। তার মানে? জোর করে ধরে আনবেন না কি?

গুহ। মিসেস ব্যানার্জ্জী, এ প্রশ্নের উত্তর আমি দোব না—যতক্ষণ না আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন।

ব্যানার্জ্জী। আপনার প্রশ্নের উত্তর উনি কেন দেবেন তার কারণ জানতে পারি?

গুহ। নিশ্চয়। খুব সঙ্গত কারণ আছে। মিঃ ভট্টাচার্য্য এখুনি বলে গেলেন যে নভেম্বরের পর রত্না সেনের সঙ্গে আর দেখা হয় নি, এবং আমার বিশ্বাস তিনি সত্যিকথাই বলেছেন। কিন্তু আপনার স্ত্রী মাত্র এক সপ্তাহ আগে তাকে দেখেছেন, তার সঙ্গে কথা বলেছেন।

শীলা। (আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে) মা—

ব্যানার্জ্জী। এ কি সত্যি?

সুবালা। (একটু চুপ করে থেকে) হঁ্যা।

গুহ। আপনাদের সমিতির কাছে সে সাহায্যের জন্য এসেছিল?

সুবালা। হঁ্যা।

গুহ। কি নামে সে সাহায্য চেয়েছিল—ইভা দত্ত?

সুবালা। না, রত্না সেন নামেও নয়।

গুহ। তবে?

সুবালা। প্রথমে নিজের নাম বলেছিল—মিসেস ব্যানার্জ্জী।

ব্যানার্জ্জী। মিসেস ব্যানার্জ্জী!

সুবালা। হঁ্যা। কি প্রচণ্ড ধৃষ্টতা বল ত? আর সেইজন্যে গোড়া থেকেই তার ওপর আমার মন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

ব্যানার্জ্জী। হবার কথাই ত। কি সাহস!

গুহ। (মিসেস ব্যানার্জ্জীকে) আপনি স্বীকার করছেন যে প্রথম থেকেই আপনি তার ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন?

সুবালা। এ কথা স্বীকার না করবার কি আছে? একটা মিথ্যুক—

শীলা। মা, তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে মেয়েটা মারা গেছে?

সুবালা। সে জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু তার মৃত্যুর জন্য তাকে ছাড়া আর কারুকে দোষ দেওয়া যায় না।

গুহ। মিসেস ব্যানার্জ্জী, আপনি প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তাকে কোন রকম সাহায্য না দেবার জন্যে অন্যান্য সভ্যাদের ওপর জোর দিয়েছিলেন?

সুবালা। আমি কি করেছিলাম তা জানবার আপনার প্রয়োজন নেই।

গুহ। হঁ্যা, আছে। আমি জানতে চাই যে সমিতি তাকে সাহায্য করে নি কেন? সকলেরই অমত ছিল, না আপনি প্রেসিডেণ্ট, আপনার অমতের বিরুদ্ধে কেউ যেতে চায় নি?

সুবালা। বেশ, আমিই তাকে সাহায্য করতে দিই নি স্বীকার করছি। কারণ তার ভাবগতিক আমার মোটেই ভাল লাগে নি। প্রথমতঃ সে ভুল নামে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, শুধু ভুল নয়, আমার কাছে সহানুভূতি পাবে বলে আমাদেরই নাম দিয়েছিল। পরে যখন ধরা পড়ে গেল, তখন স্বীকার করলো যে নাম গোপন রাখতে চেয়েছিল—আর এই নামটাই প্রথম মাথায় আসায় সেটাই চালাবার চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয়তঃ সে যে কটা কথা আমাদের জানিয়েছিল—সব মিথ্যা। বলেছিল যে তার স্বামী নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে, কিন্তু জেরার পরে স্বীকার করলো যে তার বিয়েই হয় নি।

গুহ। কিন্তু আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে সে গেল কেন?

সুবালা। সে ও আপনি জানবেন।

গুহ। না। আমি জানি কেন তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু আপনাদের কাছে সে কেন গেল সেটা জানি না।

সুবালা। এ বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করতে আমি রাজী নই।

গুহ। আপনি রাজী না থাকলেই যে আলোচনার শেষ হয়ে যাবে এ ধারণা আপনার কি করে হ'ল?

সুবালা। আপনি যদি মনে করেন যে চাপ দিয়ে আপনি কথা বার করবেন, তা হলে খুব ভুল করছেন ইন্সপেক্টর। আমি এমন কিছু করি নি যা প্রকাশ করতে বাধা থাকবে। মেয়েটা আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছিল কয়েকটা কারণ দেখিয়ে। আমাদের সমিতির নিয়মানুযায়ী তার সত্যাসত্য সন্ধান করে, আমরা জেনেছিলাম তার অধিকাংশই মিথ্যা। কাজেই প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি তাকে কোন সাহায্য দেওয়া উচিত মনে করি নি। এবং তারপর যা ঘটেছে তা জানা সত্ত্বেও আমার ধারণা আমি কোন অন্যায় করি নি।

গুহ। মিসেস ব্যানার্জ্জী, আমি বলছি আপনি একটা গুরুতর অন্যায় করেছেন—এমন অন্যায় যে সারাজীবন ধরে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। আপনি যদি হাসপাতালে সেই মেয়েটির মৃতদেহ দেখতেন—তা হ'লে—

শীলা। না, না, আর বলবেন না। তার মরা মুখ বার বার আমার কল্পনায় ভেসে উঠছে!

গুহ। এর পরের বার যখন তার কথা ভাববেন, মনে রাখবেন যে সে মা হতে যাচ্ছিল।

শীলা। না—উঃ কি ভয়ানক কথা! নিজের সঙ্গে আর একটা প্রাণকেও এমনি ভাবে নষ্ট করলে?

গুহ। বার বার আঘাত পেয়ে তার সামনে আর কোন পথ ত খোলা ছিল না! এটাই ছিল তার শেষ উপায়।

শীলা। মা, তুমি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলে?

গুহ। সেই জন্যেই সে নারীত্রাণ সমিতির কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল।

ব্যানার্জ্জী। ইন্সপেক্টর—এর মধ্যে যতীন—

গুহ। না—না, মিঃ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

শীলা। আঃ বাঁচলাম। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ।

গুহ। মিসেস্ ব্যানার্জ্জী, আর আপনার কিছু বলবার নেই?

সুবালা। হ্যাঁ, আছে। তাকে যা বলেছিলাম ঠিক সেই কথাই আপনাকেও বলছি। তার সন্তানের পিতাকে খুঁজে বার করুন—সমস্ত দায়িত্ব তারই।

গুহ। তাতে আপনার দায়িত্ব কিছু লাঘব হবে না। সে যে অবস্থায় আপনার কাছে এসেছিল, তার চেয়ে দুরবস্থা মেয়েদের হতে পারে না। আর সেই সময়ে আপনি নিজে ত কোন সাহায্য করেনই নি, উপরন্তু অন্য কারুকেও সাহায্য করতে দেন নি। সহায়হীন, সম্বলহীন, বন্ধুহীন হ'য়ে সে আপনার কাছে এসেছিল। শুধু অর্থের প্রয়োজনই তার ছিল না, প্রয়োজন ছিল একটু সহানুভূতির, দুটো মিষ্টি কথার, খানিকটা আশ্বাস ও ভরসার। মিসেস ব্যানার্জ্জী, আপনারও ছেলেমেয়ে আছে, তার মানসিক অবস্থাটা কি আপনি একটুও বুঝতে পারেন নি? না, তার নৈতিক পতনটা আপনার কাছে এতবড়ো অপরাধ হয়েছিল যে ক্ষমার অযোগ্য মনে করে সে অবস্থাতেও তাকে দূর করে দিয়েছিলেন!

শীলা। মা, কি করে তুমি এত নির্মম, এত হৃদয়হীন হ'য়েছিলে?

ব্যানার্জ্জী। সত্যি সুবালা, যখন এ সব কথা প্রকাশ পাবে তখন আমাদের কি অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখ। এ সব যদি খবরের কাগজে বেরুতে সুরু হয়—

সুবালা। (উত্তেজিতভাবে) চুপ করো তোমরা। আমাকে দোষ দিচ্ছ, কিন্তু ভুলে যেও না যে তুমি যদি তাকে চাকরী থেকে না তাড়াতে, তা হ'লে এ সব কিছুই ঘটতে পারত না। সেখানেই এর সূত্রপাত। আর শীলা, তুই যখন তার রূপের হিংসায় তাকে দোকান থেকে দূর করেছিলি তখন সেটা নির্ম্মম, হৃদয়হীন কাজ হয় নি? (একটু সামলে গুহকে) অবস্থা বুঝে আমি যে ব্যবস্থা করেছিলাম তার জন্যে আমি কখনোই নিজেকে দোষী মনে করব না। এক ঝুড়ি মিথ্যা কাঁদুনী গেয়ে সে নিজের কাহিনী সুরু করেছিল, তারপর জেরায় পড়ে একে একে সব সত্য কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হ'লো। আমি বুঝেছিলাম যে তার সন্তানের পিতাকে সে ভাল ভাবেই জানে। তাই তাকে বলেছিলাম যে তার কর্ত্তব্য হচ্ছে যে কোন উপায়ে তাকে বিবাহ করতে বাধ্য করা। আর যদি একান্তই বিয়ে করা সম্ভব না হয়, অন্ততঃ ভরণ-পোষণের ভার নিতে সে বাধ্য। তার জন্য প্রয়োজন হ'লে কোর্টে যাওয়া—।

গুহ। উত্তরে সে কি বলেছিল?

সুবালা। সে একগাদা বাজে কথা।

গুহ। (একটু জোরে) কি বলেছিল?

সুবালা। যাই বলে থাক, শেষ পর্য্যন্ত আমার আর ধৈর্য্য ছিল না। নিজের সম্বন্ধে তার বড় উঁচু ধারণা ছিল। ওই অবস্থায় পড়ার পরও তার মুখ থেকে বিবেক, নীতি, দ্বিধা, সংশয় এই সব বড়ো বড়ো কথা শুনতে মোটেই ভাল লাগে নি।

গুহ। আর সেই জন্যেই তার আজ এই অবস্থা! এসিডে ভেতর-বাইরে সব পুড়িয়ে সে মর্গের ঠাণ্ডা পাথরের উপর শুয়ে আছে! (মিঃ ব্যানার্জ্জী বাধা দিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করলেন। গুহ হিংস্রভাবে তাঁর দিকে ঘুরলেন) আবার আপনি বাধা দেবার চেষ্টা করছেন? এই শেষবার বলছি—আপনার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আমার ধৈর্য্যের বাঁধ আপনারা ভেঙ্গে দিচ্ছেন। (মিসেস ব্যানার্জ্জীকে কঠিন সুরে) সোজা ভাষায় বলুন, সে কি বলেছিল?

সুবালা। (ভীত স্বরে) বলেছিল যে ছেলেটির বয়স অতি অল্প—তা ছাড়া সে অসংযত, মাতাল। তাই বিয়ে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না—দুজনের পক্ষেই সেটা মস্ত ভুল করা হবে। অবশ্য কিছু টাকা সে দিয়েছিল, কিন্তু আর টাকা নেবার ইচ্ছা মেয়েটির ছিল না।

গুহ। কেন?

সুবালা। কতগুলো বাজে ওজুহাত দেখিয়েছিল। আমি তার একটা কথাও বিশ্বাস করি নি।

গুহ। আপনার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। আমি জানতে চাই, মেয়েটি কি বলেছিল? কেন আর টাকা নেওয়া তার ইচ্ছা ছিল না?

সুবালা। একটা উদ্ভট কারণ দেখিয়েছিল—যেন ও ধরণের মেয়ে টাকা পেলে টাকা নেবে না এটা বিশ্বাস করা যায়!

গুহ। (আবার কঠিন সুরে) দেখুন মিসেস ব্যানার্জ্জী, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। বাজে কথা বলে আপনি নিজের অবস্থা আরো খারাপ করে তুলছেন। টাকা না নেওয়ার কি কারণ সে দেখিয়েছিল?

সুবালা। একদিন রাত্রে মাতাল অবস্থায় ছেলেটা নাকি এমন সব কথা বলেছিল, যা থেকে মেয়েটার ধারণা হয় যে সে টাকা তার নিজের নয়।

গুহ। তা হলে কোথা থেকে সে টাকা পেয়েছিল?

সুবালা। চুরি করেছিল।

গুহ। অর্থাৎ মেয়েটি আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল এই জন্যেই যে—সে চুরি করা টাকা নিতে চায় নি।

সুবালা। হ্যাঁ, কিন্তু তার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া স্বামীর গল্পের চেয়ে যে এ গল্পটা বেশী সত্যি, এমন ভাববার কোন কারণ ছিল না। ও ধরণের মেয়েরা একটা কেন হাজারটা মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলতে পারে তাদের নিজের সুবিধার জন্যে।

গুহ। কিন্তু ধরুন সে সত্যি কথাই বলেছিল যে ছেলেটি তাকে চুরি করে এনে টাকা দিচ্ছিল। সে ক্ষেত্রে যখন সাহায্য চাইতে এসেছিল তখন তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে ছেলেটিকে তার জন্যে আবার চুরি না করতে হয়। তাকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্যেই সে বোকা হয়ে থাকতে চায় নি—নয় কি?

সুবালা। হয় ত, কিন্তু তা আমার বিশ্বাস হয় নি। আর সেই জন্যেই আমি সমিতির পক্ষ থেকে তাকে কোন সাহায্য করতে দিই নি। আপনি যাই বলুন, আমার ধারণা আমি ঠিকই করেছিলাম।

গুহ। মেয়েটির শেষ পর্য্যন্ত কি হয়েছে তা জেনেও বোধ হয় আপনার এতটুকু দুঃখ হয় নি?

সুবালা। তার এই শোচনায় পরিণামের জন্যে আমি নিশ্চয়ই দুঃখিত—কিন্তু এর জন্যে আমি নিজেকে দায়ী মনে করি না।

গুহ। তবে, আপনার মতে দায়ী কে?

সুবালা। প্রথমতঃ, মেয়েটা নিজে—

শীলা। (তিক্ত সুরে) নিশ্চয়ই! আমরা সকলে মিলে যখন তাকে বার বার আঘাত করেছি, তখন কেন সে প্রতিবাদ করে নি!

সুবালা। দ্বিতীয়তঃ সেই ছেলেটা। মেয়েটা বলেছিল সে উঁচুঘরের ছেলে, বড়লোক। আর সেইজন্যেই আরো দরকার সেই নিষ্কর্ম্মা মাতাল, বখে-যাওয়া ছেলেটাকে খুঁজে বার করা। তাকে এমন শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন যে একটা উদাহরণ হয়! যাতে ব্যাপারটা চাপা না পড়ে, সে যেন সহজে পরিত্রাণ না পায় তারই ব্যবস্থা করা দরকার।

গুহ। আর যদি মেয়েটির কথা সত্যি হয়? যদি এই ছেলেটি তাকে চুরি করে এনে টাকা দিয়ে থাকে?

সুবালা। এ রকম মনে করবার কোন কারণ নেই।

গুহ। কিন্তু ধরুন যদি তাই হয়ে থাকে, তা হ'লে?

সুবালা। সে ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অপরাধটা সম্পূর্ণ তার একলার। সে যদি চুরি না করতো তা হ'লে মেয়েটাকে সাহায্যের জন্যে আমাদের কাছে আসতে হতো না, হতাশ হয়ে ফিরেও যেতে হতো না। আর শেষ পর্য্যন্ত তাকে—

গুহ। তা হলে স্বীকার করছেন যে ছেলেটাই একমাত্র দোষী, সমস্ত দায়িত্ব তারই?

সুবালা। নিশ্চয়। আর তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।

শীলা। (হঠাৎ ভয় পেয়ে) মা, তুমি কি বলছ? চুপ করো, চুপ করো—

ব্যানার্জ্জী। কি হচ্ছে শীলা?

শীলা। তোমরা কি বুঝতে পারছো না? দেখতে পাচ্ছো না?

সুবালা। শীলা, তোর পাগলামির মাত্রাটা আজ বড় বেড়েছে। (শীলা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো) কাঁদতে সুরু করলি কেন? (গুহকে) এখন আপনার কর্ত্তব্য হচ্ছে যে সেই ছেলেটাকে খুঁজে বার করে যাতে সে সকলের সামনে নিজের দোষ স্বীকার করে তারই ব্যবস্থা করা। তা না করে অহেতুক আমাদের নানা রকমের প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করছেন!

গুহ। আমার জন্যে ভাববেন না মিসেস ব্যানার্জ্জী। আমার কাজ আমি ঠিক করবো। (ঘড়ি দেখলেন)

সুবালা। শুনে সুখী হলাম।

গুহ। ছেলেটাকে এমন শাস্তি দিতে হবে যে একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে—কি বলেন? সকলের সামনে তাকে দোষ স্বীকার করতে বাধ্য করতে হবে, ব্যাপারটাকে কিছুতেই চাপতে দেওয়া হবে না, কেমন?

সুবালা। নিশ্চয়ই। এই ত আপনার কর্ত্তব্য। যাই হোক্, আশা করি এখানে আপনার কাজ শেষ হয়েছে। এবার তা হ'লে আপনি আসুন—

গুহ। না, এখনো সব কাজ শেষ হয় নি। আমাকে আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে।

সুবালা। অপেক্ষা করতে হবে? কেন?

গুহ। আমার কর্ত্তব্য করার জন্যে।

শীলা। (করুণ সুরে) মা, মা, বুঝতে পারছো না? এখনো?

সুবালা। (হঠাৎ বুঝলেন) কিন্তু নিশ্চয়ই—মানে—এ অসম্ভব—

মিঃ ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল—দুজনেরই চোখে ভয়

ব্যানার্জ্জী। (ভীত স্বরে) দেখুন ইন্সপেক্টর, আপনি—আপনি কি বলতে চাইছেন যে—আমার ছেলে—আনন্দ—এই ব্যাপারে—

গুহ। (কঠিন সুরে) যদি তাই হয়, তা হ'লে তাকে কি করা উচিত তা ত আমাদের জানা আছে, নয় কি? মিসেস ব্যানার্জ্জী এতক্ষণ ধরে আমাকে শিক্ষা দিলেন!

ব্যানার্জ্জী। (হতভম্ব অবস্থায়) এ কী হলো? ভগবান—

সুবালা। (আর্ত্তস্বরে) এ আমি বিশ্বাস করি না, কিছুতেই বিশ্বাস করবো না। এ ভুল—নিশ্চয়ই ভুল—

শীলা। (কাঁদতে কাঁদতে) মা, কতবার তোমাকে বললাম চুপ করো, কিছু বোল না, কিছু বোল না। তুমি ত শুনলে না—

ইন্সপেক্টর গুহ হঠাৎ হাত তুলে সকলকে থামিয়ে দিলেন। সামনের দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল। সকলে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন, ডানদিকের দরজার পর্দ্দার দিকে চেয়ে। পর্দ্দা সরিয়ে আনন্দ ঢুকলো—পরণে পাজামা আর পাঞ্জাবী, বোতাম খোলা, মাথার চুল এলোমেলো। মুখে দুঃখ, ভয়, ভাবনা আর হতাশা মাখান। সকলের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, অন্য সকলে তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ (ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

স্মৃতি-সৌধ

ফটো : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

স্মৃতি-পত্র

ফটো : রঞ্জন বিশ্বাস
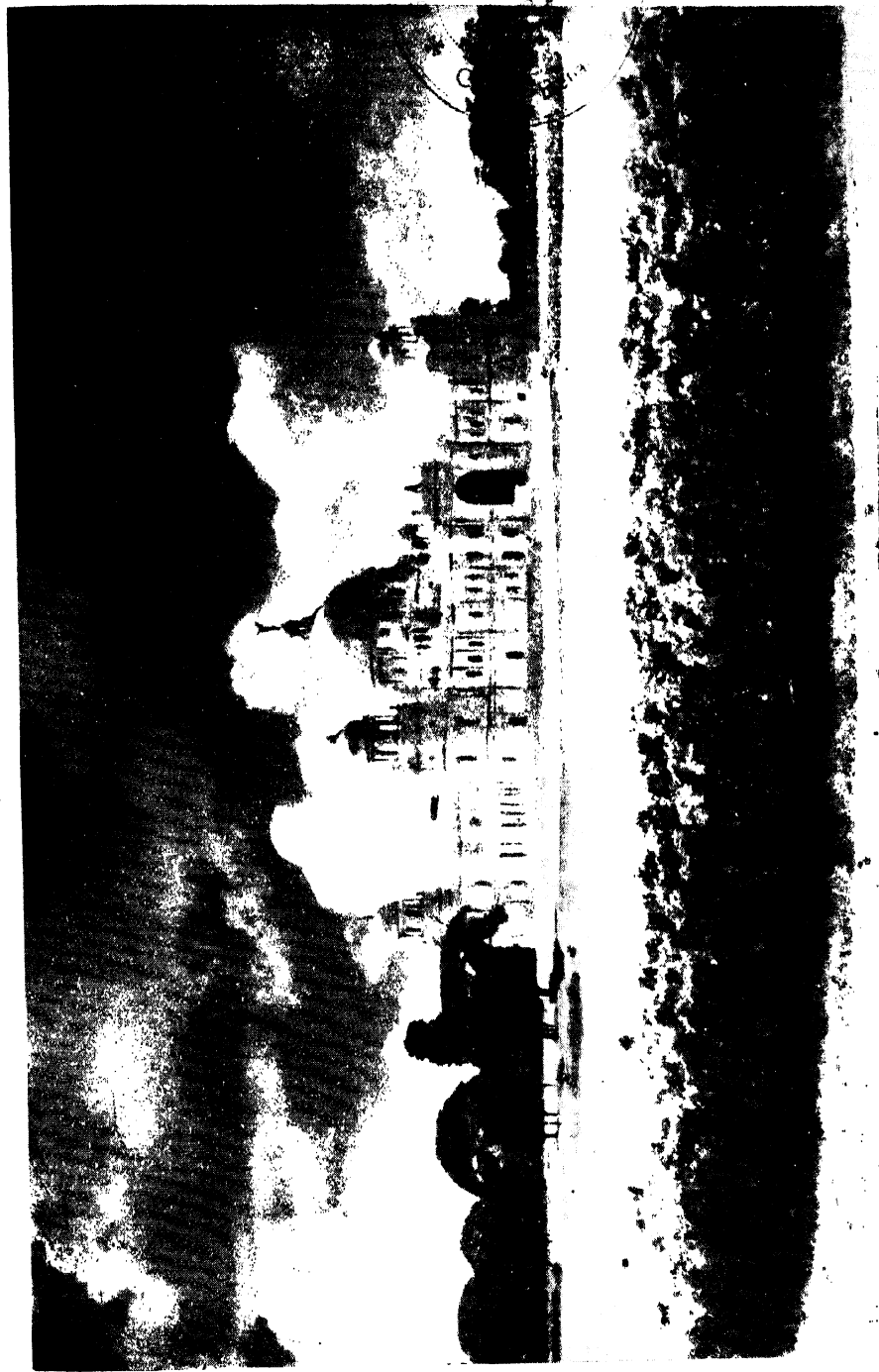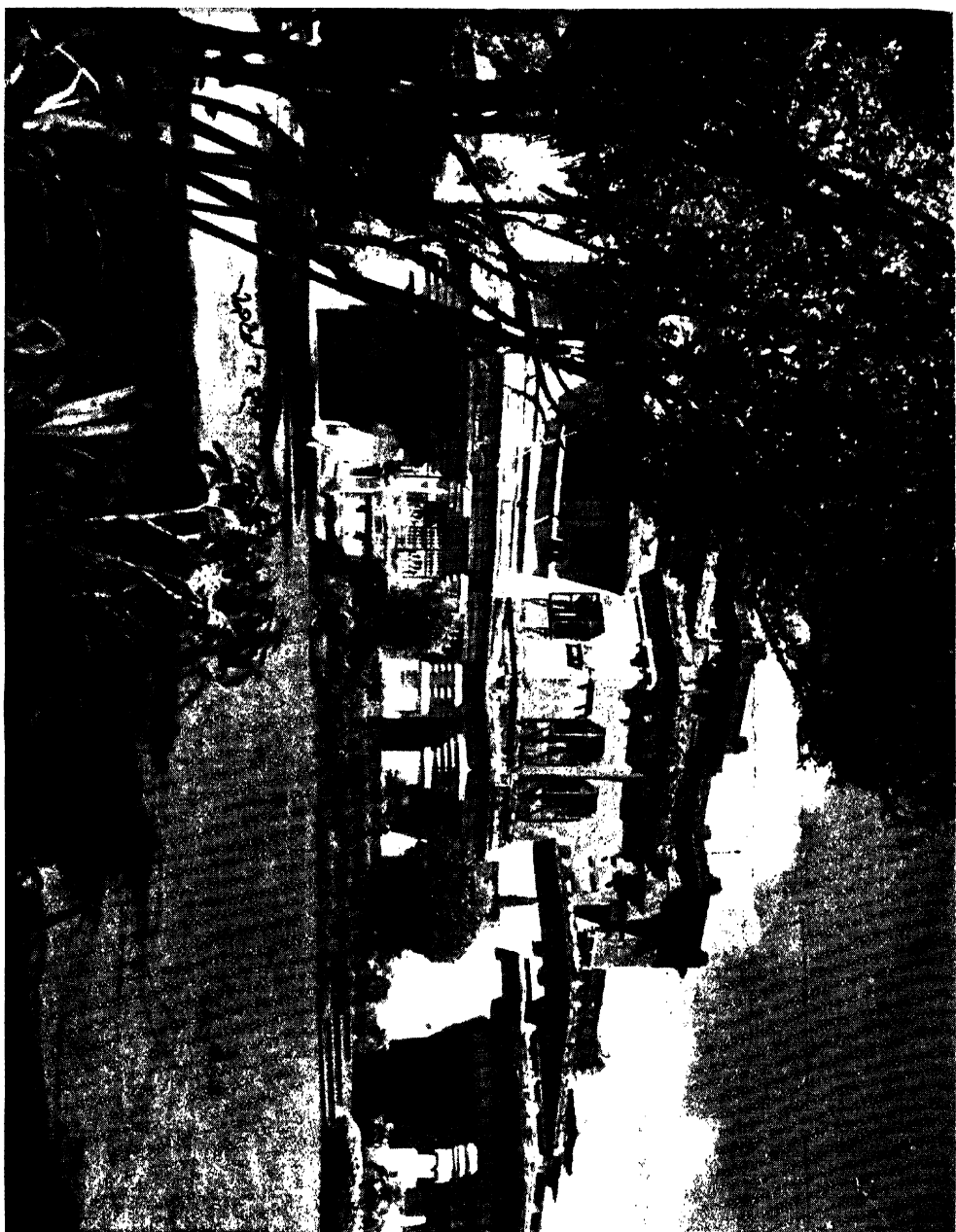
ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

"একংসৎ—তদেকং"

ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদিগের মাহাত্ম্য যতই অধিক বলিয়া বর্ণিত হউক না কেন, তাঁহারা যে সসীম, এ ধারণা ঋষিদিগের ছিল। সসীমে—অল্পে—ঋষিমন তৃপ্ত হয় নাই। তাই প্রথম হইতেই তাঁহারা অসীমের সন্ধানে ছিলেন। অসীম একের অধিক হইতে পারে না। তাই অনেক সূক্তে "একের" কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও ঋকে ইন্দ্রকে বিশ্বকর্ম্মা, শতক্রতু (সর্ব্বশক্তিমান্) এবং সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। অন্যত্র ত্বষ্টাকে বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বকর্ম্মাও অনেক স্থলে বহু দেবতাদিগের মধ্যে একজন। দেবতারা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নহেন। তাঁহারা যে একই পুরুষের বিভিন্ন নাম, কোনও কোনও ঋষির মনে তাহাও উদিত হইয়াছিল। এক ঋষি বলিয়াছেন "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" (ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৬) এখানে সেই এক দেব "একং সৎ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যত্র (১ম মণ্ডল, ১৬৪—৬) তাহাকে "তৎ একং" বলা হইয়াছে। সুবিখ্যাত নারদীয় সূক্তে এই একেরই অনুসন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিগণ কেবল সেই একের অনুসন্ধান করেন নাই, কিরূপে কোন উপাদানদ্বারা তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন এ সকল প্রশ্নও তাঁহাদের মনে উঠিয়াছিল। "কোথায় দাঁড়াইয়া, কি অবলম্বন করিয়া, কি প্রকারে, কিসের দ্বারা সর্ব্বদর্শী বিশ্বকর্ম্মা নিজ শক্তিবলে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া আকাশকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন?" (ঋ, বে, ১০ম ৮১, ২, ৪) এই সকল উক্তি হইতে ঋষিদিগের মনে গভীর দার্শনিক চিন্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "যাঁহার অস্থি (রূপ) নাই, তিনি যখন যাহার অস্থি (রূপ) আছে তাহাকে প্রসব করিয়াছিলেন, তখন সেই প্রথম জাতককে কে দেখিয়াছিল? পৃথিবীর নিঃশ্বাস, শোণিত ও আত্মা কোথায়? যিনি তাহা জানেন, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে কে গিয়াছিল?"*

একেশ্বরবাদ

বহু দেবতার মধ্যে একজনকে সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করাকে মোক্ষমূলার Henotheism বলিয়াছেন। অন্য দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে স্বীকার করাই তাঁহার মতে একেশ্বরবাদ। বেদে অন্য দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত বলিয়া তাহার ঈশ্বরবাদ পূর্ণ একেশ্বরবাদ (Monotheism) নহে, ইহাই মোক্ষমূলারের মত। কিন্তু বহু দেবতার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব প্রথমে স্বীকৃত হইলেও পরে এই সকল দেবতা যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই বিভিন্ন নাম এবং তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, একথা বেদে বলা হইয়াছে। ম্যাকডনেল সাহেব বেদের ঈশ্বরবাদকে Henotheism বলিতেও স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার মতে এক এক দেবতার স্তবের সময় তাঁহাকে যে ঈশ্বরত্বে উন্নীত করা হইয়াছে, তাহাতে কবির ভাবোচ্ছ্বাসের আতিশয্যই সূচিত হয়, প্রকৃত একেশ্বরবাদ সূচিত হয় না। কিন্তু ম্যাকডনেলের এই উক্তি যুক্তিসহ নহে। "একং সদ্বিপ্রঃ বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" এই ঋকে ভাবোচ্ছ্বাসের কোনও প্রমাণ নাই। "মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তম্ অগ্নিঃ, ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্" ঋ, বে, (১০।৮৮)—অগ্নি রাত্রিকালে পৃথিবীর মস্তক, প্রাতে তিনি সূর্য্য হইয়া উদিত হন। এই মন্ত্রে অগ্নি ও সূর্য্য যে একই দেবতা, তাহা বলা হইয়াছে। আবার "যদেনমদধুর্যজ্ঞিয়াসে দিবি দেবাঃ সূর্য্যমাদিতেয়ম্।" ইহাতে অগ্নিই যে সূর্য্য তাহা বুঝাইতেছে। এখানেই বা ভাবের আতিশয্য কোথায়? অথর্ব্ববেদে আছে যে বরুণঃ সায়ং অগ্নির্ভবতি, স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্। স সবিতা ভূত্বা অন্তরিক্ষেণ যাতি, স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবং।" ইহাতে অগ্নি, বরুণ, মিত্র, সবিতা ও ইন্দ্র যে একই দেবতার বিভিন্ন নাম তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানেই বা উচ্ছ্বাস কোথায়? তার পরে যাস্ক বলিলেন "মাহাত্ম্যাৎ দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্য আত্মনঃ অন্যে দেবতাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।" একই আত্মা বহু দেবতা স্বরূপে স্তুত হন। সকলেই এক আত্মার প্রত্যঙ্গ মাত্র। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম—শতবার্ষিক সংস্করণ—২৫৮ পৃঃ) এই অর্থেই যদি বৈদিক দেবতাগণ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বেদের ধর্ম্মকে একেশ্বরবাদ না বলিবার কারণ নাই। মোক্ষমূলার লিখিয়াছেন, যে সকল ঋষি একেশ্বরবাদের মহান্ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বকীয় প্রযত্নদ্বারাই অজ্ঞানান্ধকার হইতে বাহির হইয়া মহত্তর সত্যের আবিষ্কারের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সৎ ও অসতের মধ্যে, দৃশ্য ও অদৃশ্যের মধ্যে, প্রতিভাস ও সতের মধ্যে কি সম্বন্ধ, এবং যে "এক" উৎপত্তিহীন, যিনি পুরুষও নহেন স্ত্রীও নহেন, দেবতাদিগের স্বরূপ হইতে যাঁহার স্বরূপ একান্ত ভিন্ন, তাঁহার ও সাধারণের উপাস্য বহু দেবতার মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে বিজ্ঞ যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন। সেই "একে" তাহারা যে ব্যক্তিত্বের (Personality) আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা গ্রীকদিগের জিউস্ এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের জিহোবার ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা ভিন্ন। বেদের

---

* গ্রীক দার্শনিক Parmenides জগতের মূল সত্তাকে "এক" (One) বলিয়াছেন। প্লোটিনাসও তাহাকে "One" বলিয়াছিলেন। কোনও নাম দেন নাই।

ঋষিগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন আলেক্‌জান্দ্রিয়ার কয়েকজন খৃষ্টান দার্শনিক সেই ধারণায় পৌঁছিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে যাহারা আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া অভিহিত করেন, তাহাদের অনেকের পক্ষে তাহা অনধিগম্য। ঋষিগণ ঈশ্বরে যে ব্যক্তিত্বের আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাতে ইচ্ছার আরোপের অতিরিক্ত কিছু নহে। মানবের ব্যক্তিত্ব হইতে একান্ত ভিন্ন দেবতাদের ব্যক্তিত্বের বহু উর্দ্ধে তাহা অবস্থিত।

পুরুষ-সূক্ত

ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম্মের ঈশ্বর জগদতীত। কিন্তু বেদের ঋষিগণ যে ঈশ্বরের ধারণা করিয়াছিলেন, তিনি জগতের মধ্যে ও বাহিরে বর্ত্তমান—তিনি জগতে অনুস্যূত ও জগতের অতীত উভয়ই। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে যে পুরুষের বর্ণনা আছে, তিনি সহস্র-শীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, তিনি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এবং তাহার দশ আঙ্গুল উর্দ্ধেও অবস্থিত। এই সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য মস্তক, অক্ষি ও চরণ বিশ্বের অসংখ্য জীবের মস্তক, অক্ষি ও চরণ। পুরুষ যেমন সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, তেমনি জীবশরীরেও অধিষ্ঠিত! এই বিরাট পুরুষই "সর্ব্ব," যাহা ভূত তাহাও তিনি, যাহা ভবিষ্যতের গর্ভে তাহাও তিনি, তিনিই অমৃতের অধিপতি। যাবতীয় ভূতগণ তাহার এক "পাদ", অন্য তিন পাদ আকাশে, ইত্যাদি। ঋষিদিগের মন যে একত্বের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তাহারই পরিণতি এই সূক্তে। এই অদ্বৈত দর্শন স্ফুটতর হইয়াছে উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে। গায়ত্রীমন্ত্রেও এই অদ্বৈতবাদই দেখিতে পাওয়া যায়—যিনি আমাদের 'ধী' প্রেরণ করেন, গায়ত্রী তাঁহারই উপাসনামন্ত্র। "আমাদের ধী প্রেরণ করেন," ইহার অর্থ যাঁহার ধী প্রস্রবণ হইতে ধী আমাদের মধ্যে প্রবাহিত। আমাদের ধী সেই অসীম ধীর অংশ।

ঋত

সমগ্র বিশ্বে বেদের ঋষি এক শাশ্বত অব্যভিচারী নিয়মের অস্তিত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নিয়মকে তাহারা বলিতেন ঋত। ঋতই সত্য। বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও যাবতীয় ঘটনা এই নিয়মে বিধৃত এবং এই নিয়ম আছে বলিয়াই পরস্পর সম্বন্ধ। বাহ্যজগতে ও অন্তর্জগতে উভয়ত্রই এই নিয়ম বর্ত্তমান। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা যেমন আছে, তেমনি এক নৈতিক ব্যবস্থার (Moral order) অস্তিত্বও আছে। এই ব্যবস্থা আছে বলিয়াই সৎকর্ম্ম পুরস্কৃত হয় এবং অসৎ কর্ম্মের শাস্তি ভোগ করিতে হয়। ঋতের ধারণা হইতেই কর্ম্মবাদের এবং জন্মান্তরবাদের উদ্ভব হইয়াছিল।

বৈদিক যজ্ঞ

বেদে অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ প্রভৃতি বহু যজ্ঞের বিধান আছে। যজ্ঞে দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া হবিঃ ও অন্যান্য উপহার দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টিবিধান করা হইত। একেশ্বরবাদের উদ্ভবের পরেও যজ্ঞ অবাধে চলিয়াছিল এবং যজ্ঞের জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যজ্ঞে ভক্তি অপেক্ষা অনুষ্ঠানবিধির যথাবিধি পালন অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইত। প্রত্যেক যজ্ঞের নির্দিষ্ট ফল-প্রাপ্তি তাহার যথাবিধি অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিত। যান্ত্রিক নিয়মেই যজ্ঞের ফল উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে দেবতাগণ তাহার ফল দিতে বাধ্য। নির্দিষ্ট বিধি হইতে কিছুমাত্র স্খলন হইলে, ফল উৎপন্ন হয় না। যজ্ঞের নিজের শক্তিতেই তাহার ফল উৎপন্ন হয় এক অচিন্তনীয় উপায়ে; তাহার জন্য দেবতার অনুগ্রহের প্রয়োজন হয় না। যজ্ঞ "কর্ম্ম" নামেও অভিহিত হইত। যজ্ঞের এই ফলোৎপাদিকা শক্তি শাশ্বত ঋতেরই ফল। যজ্ঞ ভিন্ন অন্যান্য কর্ম্মের ফলও এই অখণ্ডনীয় ঋতবলতঃ এক অনির্ব্বচনীয় উপায়ে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব মীমাংসাদর্শনে যজ্ঞের ও দেববাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল।

পরলোক

বেদে আত্মা শব্দের উল্লেখ আছে। মৃত্যুর পরে জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে, একথাও আছে। কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতায় জন্মান্তরের উল্লেখ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। সংহিতায় না থাকিলেও "ব্রাহ্মণে" আছে। শতপথব্রাহ্মণে আছে যে যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করে না, তাহারা জন্মমৃত্যু ভোগ করে। ঋগ্বেদ সংহিতায় (১০ম ৫৮) মূর্চ্ছিত কোনও ব্যক্তির আত্মাকে তাহার শরীরে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। যজ্ঞানুষ্ঠাতা পরলোকে সুখভোগ করে এবং পাপীরা নরকে যায়, একথাও আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে মৃতের আত্মা দুই অগ্নির মধ্য দিয়া গমনকালে, পাপীর সেই অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া এবং ধার্ম্মিকের নিরাপদে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা আছে। প্রত্যেকেই মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার কর্ম্মানুসারে পুরস্কার অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। ঋগ্বেদ সংহিতায় পুনর্জন্মের উল্লেখ না থাকায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে পুনর্জন্মে বিশ্বাস আদিতে ছিল না, যজ্ঞে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু বেদের ব্রাহ্মণভাগে যখন ইহার উল্লেখ আছে, তখন এ বিশ্বাস যে অতি প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। —ঋগ্বেদে পুনর্জন্মের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও তাহার ইঙ্গিত আছে।

আত্মন্

"আত্মা" শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মোক্ষমুলার লিখিয়াছেন, শব্দটি সম্ভবতঃ প্রাক্‌-বৈদিক। ইহার অর্থ প্রথমে ছিল নিঃশ্বাস। ঋগ্বেদের এক সূক্তে (১০ম।১৬।৩) মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে "সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতম্ আত্মা।"—তোমার চক্ষু সূর্য্যে গমন করুক, তোমার নিঃশ্বাস বায়ুতে প্রবেশ করুক। পরে ইহা প্রাণবায়ু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পরে জীবাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূর্য্যকে যে "জগৎ ও তস্থিবান্" সকলের আত্মা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। একসূক্তে "জগতের প্রাণবায়ু (অসু) রক্ত (অসৃক্) এবং আত্মা কোথায় ছিল" (ঋ, বে, ১ম, ১৬৪।৪) আছে। পরে ইহা পরমাত্মা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ

শতপথ ব্রাহ্মণে "ব্রহ্ম" শব্দ জগতের মূল তত্ত্ব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহাতে আছে "আদিতে এই বিশ্ব ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল। ইহা (ব্রহ্মণ্) দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে এই সকল লোকের উপর তুলিয়াছিল ; অগ্নিকে পৃথিবীর উপরে, বায়ুকে বাতাসের উপরে, সূর্য্যকে আকাশের উপরে, ব্রাহ্মণ ইহার পরে এই সকল লোকের উপরিস্থ লোকে গিয়াছিলেন। তখন তিনি চিন্তা করিলেন "কিরূপে আমি এই সকল লোকে অবতরণ করিব ?" তখন তিনি নাম ও রূপের সাহায্যে অবতরণ করিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণে অন্যত্র ব্রহ্ম বিশ্বের মূলতত্ত্ব এবং প্রজাপতি, পুরুষ এবং প্রাণের সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাহাকে স্বয়ম্ভুব বলা হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতায় এই অর্থে ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার হয় নাই। ঋগ্বেদ সংহিতার উপনিষদে যে অর্থে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে বৈদিক ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না কিন্তু আত্মন্ শব্দের ব্যবহার আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ব্রহ্ম শব্দ পাওয়া যায়। বৈদিক ঋষি যে "একের" সন্ধান পাইয়া, তাহাকে প্রথমে "তদেকং" বলিয়াছিলেন, সেই 'একই' পরে ব্রহ্ম ও আত্মা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বৈদিক দেবতাগণ সসীম। ঋষিগণ অসীমকে যখন আবিষ্কার করিলেন তখন তাহার উপযোগী কোনও নাম খুঁজিয়া পান নাই। প্রজাপতি বা বিশ্বকর্ম্মা নামও তাহার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাই প্রথমে তাহাকে "একং সৎ" বা "তদেকং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যদিও ঋষি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতিকে একই দেবতার বিভিন্ন নাম বলিয়া জানিয়াছিলেন, তথাপি এই সকল নামের কোনটি গ্রহণ না করিয়া বলিলেন "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমম্ মাতরিশ্বানম্"— বিজ্ঞেরা "এক সৎকে" অগ্নি, যম, মাতরিশ্বন্ নামে অভিহিত করেন। ঋষি এখানে এই "এক" ও বিভিন্ননামের দেবতার মধ্যে ভেদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই "একই" ব্রহ্ম। "ব্রহ্ম" শব্দ "বৃহৎ" ধাতু হইতে উৎপন্ন। "বৃহ" ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। "বৃহ" শব্দও 'বৃহ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মোক্ষমূলারের মতে 'বৃহ' ধাতুর আর একটা অর্থ ছিল "কথা বলা, শব্দ উচ্চারণ করা।" বৃহস্পতি ও বাচস্পতি একার্থক। বৃহস্পতি শব্দের অর্থ বৃহতাম্ (বাচাম্) পতি, বাক্যের পতি। ইহা হইতে 'বৃহ' ধাতুর এক অর্থ যে কথা বলা এবং বৃহৎ শব্দের এক অর্থ যে "বাক্" তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ উপাসনা বা আরাধনা। উপাসনা হয় বাক্য দ্বারা। তাই উপাসনা অর্থে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাই বৈদিক মন্ত্র বা বেদ ব্রহ্ম। "বৃংহতি" বা "বৃংহয়তি" শব্দে "বৃহ" ধাতুর অর্থ মুখে "শব্দ করা" বা কথা বলা। ইহা হইতেই মৌখিক উপাসনা অর্থে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল মনে হয়। বাক্ বা শব্দ যখন উচ্চারিত হয়, তখন এক অব্যক্ত অতীন্দ্রিয় শক্তি মুখ দিয়া বাহির হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। এই সাদৃশ্য হইতে যে সার্ব্বিক শক্তি দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই ভাবে মোক্ষমূলার বিশ্ব-স্রষ্টা অর্থে ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'বৃহৎ' শব্দের অর্থ প্রকাণ্ড বা বিরাট ধরিয়া সেই অর্থেই ব্রহ্ম শব্দ বিশ্বস্রষ্টা বুঝাইতে প্রথমে হইয়াছিল, ইহাও বলা যায়। যিনি বিরাট বা অসীম, তিনিই ব্রহ্ম। পুরুষ সূক্তে যে পুরুষের কথা আছে তিনিই ব্রহ্ম। তাহার এক পাদ পৃথিবীতে। তিন পাদ তাহার ঊর্দ্ধে। এই সূক্ত রচনার সময় বোধ হয় ব্রহ্ম শব্দের আবিষ্কার হয় নাই। পরে হইয়াছিল।

কিন্তু ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ বাক্। ভর্ত্তৃহরির ব্রহ্মকাণ্ডে নিম্নলিখিত শ্লোক পাওয়া যায়।

> অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং
> বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যথা।

জন্মমৃত্যুহীন ব্রহ্ম শব্দতত্ত্ব এবং অক্ষর। ব্রহ্মই জগতের অভিব্যক্তিতে বস্তুরূপে পরিণত হন।

এই শ্লোকে ব্রহ্মকে শব্দতত্ত্ব অর্থাৎ শব্দের স্বরূপ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকাণ্ড অবশ্য বেদের বহুকাল পরে রচিত। কিন্তু বেদেও বাক্‌কে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে যে দেবী সূক্ত আছে, তাহাতে বাক্ বলিতেছেন "আমি রুদ্র, বসু, আদিত্য ও বিশ্বদেবগণের সহিত (অথবা রুদ্র, বসু, আদিত্য ও বিশ্বদেব রূপে) বিচরণ করি ; মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। আমি দেবশক্রহন্তা, সোমকে ত্বষ্টাকে, পুষণ ও ভগকে ধারণ করি। যজমানের যজ্ঞফলের বিধান আমিই করি। আমি জগতের ঈশ্বরী, ধনদায়িনী, তত্ত্বদ্রষ্ট্রী এবং উপাস্যদিগের মধ্যে প্রধানা। বহুভাবে অবস্থিতা সর্ব্বভূতে প্রবিষ্টা আমাকে দেবগণ আরাধনা করে। আমারই শক্তিতে যে দেখে, যে নিশ্বাস ছাড়ে, যে শোনে, সে অন্ন আহার করে।......আমি জগতের শীর্ষে পিতাকে (দ্যৌঃ) প্রসব করিয়াছি, সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার উৎপত্তি। আমি সেখান হইতে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছি এবং গগন স্পর্শ করিতেছি।" কোলব্রুক বলেন এই বাক্ ব্রহ্মের শক্তি। ইহার সহিত বাইবেলের Loges বা Word (বাণী) এর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এই Loges সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং ইহা দ্বারাই সকল পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে (এ য—১২,১৭) "আমি সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানি ; যিনি তমসের পারে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্তরূপের চিন্তা পূর্ব্বক তাহাদিগকে নাম দিয়াছিলেন।" ইহার অর্থ যাবতীয় বস্তুররূপ ঈশ্বরের চিন্তা হইতে উদ্ভূত এবং নামের (বাক্যের) সহিত প্রকাশিত। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে (৭ম-৫,২,২১) "বাক্ জন্মহীন। বাক্ হইতে বিশ্বকর্ম্মা সকল জীবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণে আরও আছে "বাক্ বৈ ব্রহ্ম (২য়, ১, ৪, ১০)। যোগবাশিষ্ঠের "ব্রহ্ম বৃংহৈব জগৎচ ব্রহ্ম বৃংহসম্" জগৎ ব্রহ্মের বৃংহণবাশক্বং। ব্রহ্মের বৃতহর্ষ বশেষ ; ব্রহ্মের চিন্তার শব্দরূপে বাক্য রূপ। এই সকল হইতে "কথা বলা" অর্থে "বৃহ ধাতু হইতে জগৎস্রষ্টা অর্থে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি খুবই সম্ভবপর মনে হয়।

একটুখানি বেড়ান

গী. দ্য. মপাসাঁ.

অনুবাদক ঃ—জয়চরণ সরকার

'মেসার্স লাবুজে এ্যাণ্ড কোম্পানীর কেরাণী বুড়ো লেরাস দোকান থেকে বেরিয়েই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অস্তগামী সূর্যের ঔজ্জ্বল্য ওকে মুগ্ধ করেছে।

দোকানের পিছন দিকে কূপের মত অন্ধকার এক কোণে বসে গ্যাসের হলদে আলোয় সারাদিন কাজ করে সে। আজ চল্লিশ বছর যে ঘরে সে তার সারাদিন কাটিয়ে যায়, সেই ঘরটা এমনই অন্ধকার যে গ্রীষ্মের দুপুরেও আলো না জ্বাললে চলে না।

জায়গাটা সব সময়েই ঠাণ্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে। এই গর্ত্তের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ একমাত্র একটা জানলা, সেই জানলা ঐ অন্ধকার ঘরটাকে ভ্যাপসা নালার পচা গন্ধে ভরে তুলত।

চল্লিশ বছর ধরে মঁসিয়ে লেরাস রোজ সকাল আটটায় এই জেলখানায় ঢোকে—তারপর সন্ধ্যে সাতটা অবধি শান্ত সুবোধ চাকুরের অবাধ বিশ্বস্ততায় খাতার উপর ঝুঁকে থাকে।

বছরে পনের শ'য়ে সুরু করে এখন তিন হাজার ফ্রাঁয়ে ঠেকেছে। ঐ আয়ে বউয়ের ভার নেওয়া চলে না, তাই সারাজীবন অবিবাহিতই রয়ে গেল। জীবনকে কখনো উপভোগ করেনি, তাই কোন আকাঙ্ক্ষাও তার নেই।

মাঝে মাঝে কখনো-সখনো সেই একঘেয়ে অবিরাম কাজে বিরক্ত হয়ে প্লেটোর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বলত : ক্রিষ্টি, আমার আর যদি পাঁচ হাজার টাকা হ'ত, তাহলে আমি জীবনটাকে ভোগ করতুম।

মাস গেলে মাইনে ছাড়া আর কিছুই জোটেনি, জীবনটাকে সে কখনো উপলব্ধি করল না।

বিনা ঘটনায়, বিনা আবেগে, এমন কী বিনা আশাতেই জীবনটা ফেটে গেল ওর। স্বপ্ন দেখার যে মনোভাব সব মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক, তার উচ্চাশার মধ্যে সেটিও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি।

একুশ বছর বয়সে মেসার্স লাবুজে কোম্পানীর চাকরীতে ঢুকেছিল। তারপর একবারও চাকরী ছাড়েনি।

আঠারশ' ছাপান্ন সালে বাবা মারা গেল, তারপর উনষাটে মা। তারপর থেকে বাড়ীওলা ভাড়া বাড়াতে বাসা বদল করা ছাড়া আর উপায় রইল না।

প্রত্যেক দিন সকালে এলার্মটা এমন গোলমাল সুরু করে যে তাকে লাফ দিয়ে উঠে পড়তে হয়। এই যন্ত্রটা মোট দুবার বিগড়েছে আজ অবধি, একবার ছেষট্টি সালে, আর একবার চুয়াত্তর সালে। এর কারণ অবশ্য সে কখনোও জানতে পারল না।

সে জামাকাপড় পালটে বিছানাটা গুটিয়ে ফেলে, তারপর ঘরদোর পরিষ্কার করা। মোট দেড়ঘণ্টা সময় লাগে এই সব করতে। তারপর সে বেরিয়ে যায়। রাস্তায় লাহারে বেকারীর একটা রুটি কেনে। এর মালিকানা প্রায় ডজনখানেক বার হাতবদল হলেও নামটা একই আছে। অফিস যেতে যেতে রাস্তায় রুটিটা খেয়ে নেয়।

তার সমস্ত অস্তিত্ব সেই ঘরটার মধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেছে, সেই একই কাগজ আঁটা চার দেয়ালের মধ্যে। ছোকরা বয়সে মঁসিয়ে বারমেৎ-এর সহকারী হিসেবে ঢুকেছিল, তখন ওর ইচ্ছে ছিল তার স্থানটা অধিকার করা।

তার স্থান সে অধিকার করেছে, তারপর আর কিছু আশা করেনি।

অন্য সব লোকেরা সারাজীবন ধরে যে স্মৃতির ফসল তোলে, যে সব অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে তাদের জীবনে, মধুর কিংবা বিধুর ভালবাসার কাহিনী, অথবা কোন দুঃসাহসিক ভ্রমণ কাহিনী, স্বাধীনভাবে বাঁচার যে সব সঙ্কট, মঁসিয়ে লেরাসের কাছে সবই অবাকের, বিস্ময়ের, অদ্ভুত।

দিন থেকে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে মাস, মাস থেকে ঋতু, ঋতু থেকে বছর, সবই এক, এতটুকুও পরিবর্ত্তন নেই।

প্রত্যেক দিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠে একই সময়ে বাড়ী থেকে বেরোয়, একই সময়ে অফিসে পৌছয়, একই সময়ে লাঞ্চ খায়, অফিস থেকে ফেরে, ডিনার খায় আবার শুয়ে পড়ে। সেই একই কাজ, একই কর্ম্ম, একই চিন্তার অনুকৃতির একঘেয়েমিত্বে সে কখনো বাধা দেয়নি।

প্রথম প্রথম সে তার পৈতৃক গোল আয়নাটায় নিজের কচি গোঁফ আর কোঁকড়ানো চুল দেখত। এখন রোজ সকালে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সেই আয়নাটাতেই শাদা গোঁফ আর টাক মাথাটা একবার করে দেখে নেয়। চল্লিশ বছর যেন উড়ে পার হয়ে গেছে, দীর্ঘ এবং দ্রুত। দুঃখের দিনের মত শূন্য, কাল রাত্রির মত দীর্ঘ চল্লিশটা বছর, যার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, এমন কী স্মৃতিও নয়, এক মা-বাবার মৃত্যু ছাড়া একটা দুঃসংবাদ পর্যন্তও নয়।

সেদিন মঁসিয়ে লেরাস চৌকাঠ পার হয়ে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে পড়ল। অস্তগামী সূর্যের ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হয়ে গেল। বাড়ী না ফিরে, ভাবল, আজ ডিনারের আগে একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বছরে চার কী বড় জোর পাঁচবার সন্ধ্যেবেলা একটু বেড়ায় সে।

সে চুলেভার্দ্দএ গেল, সেখানে অনেক লোক নবমুকুলিত গাছের নীচে বেড়াচ্ছে। বসন্তের সন্ধ্যা। প্রথম ঈষদুষ্ণ সন্ধ্যা। অন্তরে জাগিয়ে তোলে জীবনের মাদকতা।

বুড়ো মানুষের মন্থর টলমলে পদক্ষেপে হাঁটতে লাগল মঁসিয়ে লেরাস। ওর চোখদুটো উজ্জ্বল, বাতাসের অস্বাভাবিক উতলা মধুরতায় আনন্দিত।

আম্প-এলিসেতে পৌছতেই আঠার বসন্তের সুবাস-ভরা উতলা বাতাস লাগল ওর গায়ে, মনে হ'ল যেন সে নতুন জীবন লাভ করছে।

সমস্ত আকাশটা ঝকমক করছে। রাঙা দিগন্তের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ছায়াচ্ছন্ন বিরাট-দেহ ট্রিয়ামকাল আর্ক, যেন একটা কাল দৈত্য অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে।

সেই বিরাট স্তম্ভের সামনে আসা মাত্রই সেই বুড়ো কেরাণী ক্ষুধা অনুভব করল, তারপর ঢুকল একটা মদের দোকানে।

দোকানের সামনে পথের পাশেই একছিটে জায়গা, সেখানেই টেবিল পেতে খাওয়ার বন্দোবস্ত। মটনের স্টু, স্যালাড আর এ্যাসপারাগাস দিয়ে গেল। অনেকদিন এমন একটি পরিপাটি ডিনার হয়নি মঁসিয়ের। ব্রি পনিরের উপর মনোহর বোর্কুক্সের মদ ঢাললে। তারপর এককাপ কফিতে আরামের চুমুক। এ জিনিষ খুব কমই জুটেছে তার ভাগ্যে। অবশেষে ছোট এক গ্লাস ব্রাণ্ডি।

বিল মিটিয়ে দেওয়ার পর নিজেকে তার অত্যন্ত সজীব, তরুণ বলে মনে হ'ল, একটু বুঝি চঞ্চলও। মনে মনে বললে: বয় গু বোলনের সামনে পর্যন্ত হাঁটা যাক, তাহলেই বেশ ভাল লাগবে।

তারপর সে চলতে সুরু করল। অনেক দিন আগেকার একটা বাতাস ভেসে এল তার মনের মধ্যে। সে বাতাসে একটা গানের সুর। তখন তার পাড়ার লোকেরা গাইত:

বাগান যখন উচ্ছল সবুজ হাসি—আনন্দে মাতে,
তখন আমার তরুণ সাহসী প্রেমিক আসিয়া বলে:
ওগো সুন্দরী, ওগো মধুমতী, এস আজি মোর সাথে,
বুক ভরে নিই উতলা বাতাসে মুক্ত আকাশ তলে।

সে একটানা গুন গুন করতে লাগল এই গানের কলি, বার বার নতুন করে গোড়া থেকে আরম্ভ করতে লাগল। পারীর উপর রাত্রি নেমেছে। বায়ুহীন, স্তব্ধ মধুর রাত্রি। পাশ দিয়ে চলে যাওয়া গাড়ীগুলো দেখতে মঁসিয়ে লেরাস বয় গু বেলেনের উদ্যানের দিকে এগিয়ে চলল। উজ্জ্বল আলো জেলে একটার পর একটা গাড়ী এগিয়ে আসছে, তারপর আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগলমূর্ত্তির চকিত-দর্শন। মেয়েটির পোষাক হালকা রঙের, পুরুষটির পরণে কাল স্যুট।

প্রেমিক যুগলদের সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা, তারকাখচিত, গাঢ়, রুদ্ধ আকাশের নীচে তারা এগিয়ে চলেছে। একের

পর এক এসে পৌঁছচ্ছে। গাড়ীর মধ্যে নিঃশব্দে এলিয়ে পড়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। একে অপরের সংলগ্ন, মুহূর্তের মরীচিকায় আত্মহারা, বাসনার আবেগে আত্মমগ্ন, সমাগত চরম মুহূর্তের উত্তেজনায় বাক্যহত। এই উষ্ণ অন্ধকার বুঝি ভাসমান চুম্বনে পরিপূর্ণ। একটা শান্ত কোমলতা বাতাসকে যেন ক্লান্তিকর, রুদ্ধশ্বাস করে তুলেছে। এই সব আলিঙ্গনাবদ্ধ মানুষেরা, একই ইচ্ছায়, একই চিন্তায় উজ্জীবিত, উত্তেজিত মানুষেরা চারপাশের আবহাওয়াটা উষ্ণ করে তুলেছে। সোহাগভরা, প্রগল্ভ গাড়ীগুলো যাওয়ার সময় উচ্চকিত করে দিয়ে যাচ্ছে, চকিত, উদ্বিগ্ন নিঃসরণ।

হাঁটাহাঁটি করে মঁসিয়ে লেরাস একটু ক্লান্ত। ভালবাসার বোঝায় ভরা গাড়ীগুলো দেখার জন্যে রাস্তার পাশে একটা বেঞ্চির উপর বসল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি মেয়ে তার কাছে এসে, তার পাশেই বসে পড়ল।

: শুভ সন্ধ্যা। ওগো ছোট্ট মানুষ আমার! বললে মেয়েটি।

সে কোন উত্তর দিলে না। মেয়েটি আবার বললে,

: ও! তোমার বুঝি কোন প্রিয়া দরকার নেই!

: আপনি ভুল করেছেন মাদাম।

মেয়েটি এবার ওর হাত ধরলে

: এস, বোকামি ক'র না, শোন—

মঁসিয়ে উঠে চলে গেল। ওর মনটা ভারী হয়ে উঠল।

শ'খানেক পা যেতে না যেতেই আরেকটি মেয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে।

: এক মিনিটও বসবে না আমার সঙ্গে, সুন্দর মানুষটি?

মঁসিয়ে বললে তাকে,

: কেন তোমরা এ জীবন গ্রহণ করলে?

: ভগবানের নামে বলছি, এ আমার নিজের সুখের জন্যে নয়।

মঁসিয়ে আরও কোমল স্বরে বললে;

: তাহলে কেন, কেন এ কাজ কর তোমরা?

: বাঁচবার জন্যে, শুধু বাঁচবার জন্যে। বাঁচতে তো হবে, বলুন? মেয়েটি চলে গেল গান গাইতে গাইতে।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মঁসিয়ে লেরাস। আরও কয়েকটি মেয়ে তার সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেল। তার মনে হ'ল ঃগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, হৃদয়-বিদারক একটা কিছু ধীরে ধীরে নেমে আসছে তার মাথার উপরে। সে আবার একটি বেঞ্চির উপর বসে পড়ল। সামনে দিয়ে তখনো দ্রুতবেগে গাড়ী যাতায়াত করছে।

মনে মনে ভাবল: এখানে না এলেই ভাল হ'ত। আমি বড় অস্থির।

সে তার চারপাশে বয়ে-যাওয়া এই সব প্রেমের বন্যার কথা ভাবতে লাগল—বৈতনিক অথবা স্বতোৎসারিত; ভাবতে লাগল চারধারের এই চুম্বনের স্রোতের কথা, পয়সা দিয়ে কেনা, অথবা অনুরাগের রসে সিক্ত?

প্রেম! এ কথাটার মানেই সে জানে না ভাল করে। সারা-জীবনে দুটি কী তিনটির বেশী প্রিয়া জোটেনি তার, ক্ষমতায় কুলোয়নি। সে ভাবতে লাগল, এতদিন কী জীবন কাটিয়ে এসেছে সে। আর সকলের জীবনের থেকে কত তফাৎ! কত ম্লান, কত নীরস, কত সরল, কত শূন্য তার জীবন!

জনকয়েক আছে, যাদের সত্যি সত্যিই বরাৎ বলে কিছু নেই। হঠাৎ যেন তার চোখের সামনে থেকে একটা কাল পর্দা সরে গেল, সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠল দারিদ্র্য, তার সারাজীবনের অন্তহীন দৈন্য: তার অতীতের দৈন্য, তার বর্তমানের দৈন্য, তার ভবিষ্যতের দৈন্য। শেষ দিনগুলোও ঠিক সেই প্রথম দিনটির মত, তার সামনেও কিছু থাকবে না, তার পিছনেও কিছু থাকবে না; চারপাশেও কিছু নয়, তার অন্তরেও কিছু নয়! কোনখানেই কিছু নেই!

গাড়ীগুলো তখনও যাতায়াত করছে। দ্রুত চলে যাওয়া খোলা গাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছে সে। নিঃশব্দ আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি মানুষ একবার দেখা দিয়েই আবার চকিতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হ'ল গোটা মানুষ জাতিই বুঝি আনন্দে, তৃপ্তিতে, সুখে পুনরুজ্জীবিত হয়ে তার সামনে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সে—একা; ঐ সারির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে—একেবারে একা। সে আজ একা, কালও সে একাই থাকবে, চিরদিনই সে একা থাকবে, চিরদিন কিন্তু, আর কেউ, আর কেউ একা নয়।

সে উঠে কয়েক পা এগোল। হঠাৎ ভীষণ ক্লান্তি বোধ করল, যেন কয়েক মাইল হেঁটে এসেছে। আমার পরের বেঞ্চিটাতেই বসে পড়ল।

কী অপেক্ষা করছিল তার জন্য, কী আশা করে সে? কিছু নয়। সে ভাবল, বুড়ো বয়সে শিশুদের অর্থহীন কলকাকলীতে-ভরা বাড়ীতে বাস করা না জানি কত ভাল, কত সুন্দর! বুড়ো হওয়া সত্যিই মধুর, যখন সেই বৃদ্ধের চারপাশ ঘিরে থাকে তারাই, যারা তাদের জীবনের জন্য ঐ বৃদ্ধের কাছে ঋণী; যারা তাকে ভালবাসে, সোহাগ করে, মনোমুগ্ধকর বোকা বোকা কথা বলে—যা হৃদয়কে উষ্ণ করে, আর সবকিছুর জন্যই সান্ত্বনা দেয়।

তার নিজের সেই শূন্য ঘর, সেই পরিষ্কার অথচ বিষাদাচ্ছন্ন, তার নিজের ছাড়া অন্য কোন মনুষ্য-পদচিহ্নহীন সেই ঘরখানার কথা ভাবতেই একটা দুঃখের অনুভূতিতে তার হৃদয় আকুল হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, সেই ছোট অফিসটার চেয়ে তার নিজের ঘরটার অবস্থাই বেশী শোচনীয়।

কেউ আসে না এ ঘরে, এখানে কেউ কথা বলে না। এটা মৃত, নিস্তব্ধ; মনুষ্য কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনিশূন্য। যে কোন লোকই বলবে, যারা ঘরে বাস করে, তাদের অনেক কিছুর চিহ্নই থেকে যায় ঐ চার দেওয়ালের গায়ে; তাদের দৃষ্টি, তাদের মুখচ্ছবি, তাদের কথার টুকরো।

এই রকম হতভাগাদের আস্তানার চেয়ে সুখী পরিবারের বাড়ীগুলো অনেক বেশী আনন্দের। তার ঘর তার জীবনের মতই স্মৃতিশূন্য। আবার সেই ঘরে ফিরে যাওয়া, সেই একা একা বিছানায় শোয়া, আবার সেই সন্ধ্যেবেলার করণীয় কাজগুলো ঠিক ঠিক করার কথা ভাবতেই ভয় পেয়ে গেল সে। সেই নিরানন্দ আস্তানায় ফিরে যাওয়ার মূহূর্তটিকে দূরে ঠেলবার চেষ্টায় সে উঠে পড়ল, তারপর হঠাৎ সামনে পার্কের সরু রাস্তাটা দেখতে পেয়ে সবুজ ঘাসের উপর বসবার জন্যে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে তার চারদিকে, উপরে, সব জায়গায় একটা এলোমেলো, বিশৃঙ্খল শব্দ শুনতে পেল; অসংখ্য বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের অসীম একটানা শব্দ, কাছে ও দূরে সর্ব্বত্র জীবনের অনিশ্চিত, অপরিমেয় স্পন্দন, যেন পারী-মানুষের মতই নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

সূর্য ইতিমধ্যেই আলোর বন্যা ছড়িয়ে দিয়েছে বয় দ্য বোলনের উপর। কতকগুলো গাড়ী সবে ঘোরাফেরা সুরু করেছে, ঘোড়ার পিঠে সওয়াররা স্ফূর্ত্তিতে টগবগ করে এসে পৌছচ্ছে।

এক তরুণ দম্পতী একটি নির্জ্জন পথে বেড়াচ্ছে।

সহসা সেই তরুণীটি উপর দিকে তাকিয়ে ডালপালার আড়ালে খয়েরী রঙের একটা কী দেখতে পেয়ে হাত তুলে দেখিয়ে বললে: দেখতো ওটা কি?

তারপরই চীৎকার করে সে তার সঙ্গীর কোলের উপর এলিয়ে পড়ল; সে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলে।

তাড়াতাড়ি দ্বারোয়ানদের ডাকলে। ওরা এসে গাছের ডালে দড়ি দিয়ে ঝোলা একটা বুড়োর দেহ খুলে নামালে।

সকলেই একমত হ'ল যে মৃত ব্যক্তি আগের দিন সন্ধ্যেবেলা গলায় দড়ি দিয়েছে।

তার কাছ থেকে যে সব কাগজপত্র পাওয়া গেল তাতে বোঝা গেল যে 'মেসার্স লাবুজে এ্যাণ্ড কোম্পানী'তে কেরাণীর কাজ করত, তার নাম ছিল মঁসিয়ে লেরাস।

তারা তার মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলেই স্থির করল, কিন্তু কোন কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছিল।

দার্শনিক

(কার্ল স্যাণ্ডবর্গ)

অনুবাদক—সুশান্ত পাঠক

জল হ'চ্ছে ঝুপ ঝুপিয়ে
বিরামও নেই—বেগও নেই, এ' বৃষ্টির।
সাতটী দিন ধ'রে ঘোরালো ধোঁয়াটে আকাশ
আর স্যাঁতসেতে মাটি—।

ভাঙ্গা-ঘরের ছাদ দিয়ে
গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা—
সব যাচ্ছে ভিজে:
জলের দেবতাকে গাল দিচ্ছে সেই ঘরের বাসিন্দা
ভীষণ রাগে আর ভীষণতর দুঃখে।

* * *

ফাঁকা শুকনো মাঠে দাঁড়িয়ে চাষী
পোড়া মেঘকে দিচ্ছে গাল—একফোঁটা জল নেই বলে
জমির ফসল তার রোদে পুড়ে—শুকিয়ে গেল সব।
কি আশ্চর্য্য! মেঘ আছে, বৃষ্টি নেই একেবারে।
আক্রোশ ফেটে পড়ে জলের দেবতার ওপর—
দেখে শুনে আমার দার্শনিক হতে ইচ্ছে করে
একেবারে নির্বিবাদী দার্শনিক—।

বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাভাষার সমস্যা*

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

যিনি আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ-পূর্ব্বক অকালে অস্তমিত হইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে "বাঙ্গলা লেখকদিগের গুরু, বাঙ্গলা পাঠকদিগের সুহৃদ এবং সুজলা, সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তান" বলিয়া অভিহিত করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন সেই সাহিত্য গুরু বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাকে শেষ "বাঙ্গলার কবি" বলিয়াছিলেন, তাহার যে কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী পাঠককে পড়িতে বলিয়াছিলেন, তাহার উপসংহার—

"মাতৃসম মাতৃভাষা পূরালে তোমার আশা ;
তুমি তা'র, সেবা কর সুখে।"

যখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই কথা বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) লিখিয়াছিলেন—

"নানান দেশে নানা ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা ?"

তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার ঐন্দ্রজালিকদণ্ডের স্পর্শে বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম—আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে-বিমূর্চ্ছিত, ক্রোধে উদ্বেলিত, করুণায় বিগলিত, লজ্জায় বিকুঞ্চিত, ঘৃণায় বিকুণ্ঠিত, সংশয়ে দোলায়িত হয় নাই এবং ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখ-মারুতে পূর্ণ পাঞ্চজন্যের মত মধুসূদনের কম্বুনাদে গগন পবন পূর্ণ করে নাই, তখন সে ভাষায় হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সাহিত্যিকদিগের রচনা ভাষার ঝঙ্কারে, ভাবের টঙ্কারে, লালিত্যের অলঙ্কারে অতুলনীয় সাহিত্য সৃষ্টি করে নাই। বাঙ্গালা কবিতা বহুদিনের। বিজ্ঞবর রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছিলেন :—

গঙ্গার গতির সঙ্গে বাঙ্গালা কবিতার গতির উপমা দেওয়া যাইতে পারে। গঙ্গা যেমন বিষ্ণুপদ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছেন, তেমনই বাঙ্গালা কবিতা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও চৈতন্যের শিষ্যগণের হরিপদভক্তি হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়া হিমালয় প্রদেশে যেখানে প্রকৃতি দেবী বন্য ও অসংস্কৃত কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন, সেখানে হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীর কীর্ত্তিস্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনই বাঙ্গলা কবিতা মুকুন্দরামের চণ্ডী মহাকাব্যে বন্য ও অসংস্কৃত অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করতঃ মহামায়ার অদ্ভুত কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। গঙ্গা যেমন বিঠুর গ্রামের সন্নিহিত হইয়া একদিকে বাল্মীকির তপোবন ও অন্যদিকে রামচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থান অযোধ্যা প্রদেশ উভয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনই বাঙ্গালা কবিতা বাল্মীকিকে আদর্শ করিয়া লিখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামগুণগান করিয়া ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি করিতেছে। গঙ্গা যেমন প্রয়াগতীর্থে আগমন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের কীর্ত্তিস্থান দিয়া প্রবাহিত যমুনার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন, তেমনই বাঙ্গালা কবিতা মধ্যকালে কৃষ্ণার্জ্জুনের গুণকীর্ত্তনকারী কাশীরামদাসের মহাভারতরূপ শাখানদী হইতে বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার স্তুতিরবে পূর্ণ হইতেছেন, তেমনই বাঙ্গালা কবিতা রামেশ্বর ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবদুর্গার স্তুতিরবে পূর্ণ আছে। আবার ঐ গঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থান নবদ্বীপের নিকট দিয়া যেরূপে প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। ভাগীরথী যেমন একদিকে চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা ও শ্রীরামপুর, অন্যদিকে চাণক, দক্ষিণেশ্বর, বরাহনগর, কলিকাতা ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইউরোপীয় কীর্ত্তির প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছেন, তেমনই বাঙ্গালা কবিতা প্রধুতানন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাঙ্গালা কবিদিগের গ্রন্থে ইউরোপীয় সুন্দর কিন্তু বঙ্গ-প্রকৃতি-বিরোধী অস্বাভাবিক ভাবের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছে। গঙ্গা যেমন কলিকাতার দক্ষিণে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া মহাকল্লোলসম্বলিত বেগে সমুদ্র-সমাগম লাভ করিয়াছেন, তেমনই বাঙ্গালা কবিতা সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষার সাহায্যে ভবিষ্যতে কত বিশাল ও ওজস্বী হইয়া সমীচীনতা লাভ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে ?"

প্রায় ৭৭ বৎসর পূর্ব্বের এই প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদিগের রচনায় পাওয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা গদ্য রচনা অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের হইলেও রামমোহন রায়ের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের ও তৎপরবর্ত্তীদিগের রচনায় যে অসাধারণ উন্নতির স্বরূপ সপ্রকাশ ও সুপ্রকাশ তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। * * * পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদিগের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না কেহ তাহা পড়িত না।"

* মানভূম জিলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণ।

এই ভাষাকে সংস্কৃত করিয়া "সাধু" ও "অপর" ভাষার সমীচীন সম্মিলন ঘটাইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি যখন ভাষা সরল ও সবল করিতে প্রবৃত্ত—তখন স্বভাব-বিদ্রোহী বাঙ্গালার এক দল সাহিত্যিক সে ভাষার বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁহাদিগের নেতৃস্থানীয় "হুতোম" নামে কালীপ্রসন্ন সিংহ ও "টেকচাঁদ ঠাকুর" নামে প্যারীচাঁদ মিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বিবেকানন্দ কি ভাবে বাঙ্গালা ভাষাকে সরল, সবল ও প্রবল করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সে কার্য্যে আরও সাহায্য করিয়াছে বাঙ্গালার সংবাদপত্র। দিনের পর দিন পৃথিবীর উন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বাঙ্গালা ভাষা উন্নতি লাভ করিয়াছে; বাঙ্গালা সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে। সেই বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা। বাঙ্গালী মাতৃভাষার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে—বাঙ্গালী কবি গোবিন্দচন্দ্র যমুনার কূলে বসিয়া "যমুনা-লহরী" রচনা করিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালী লেখক সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই প্রদেশে থাকিয়া "বোম্বাই চিত্র" রচনা করিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পঞ্জাবে ও বোম্বাই প্রদেশে বাসকালে বহু উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতি রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বগামী মধুসূদন য়ুরোপে অবস্থান কালে লিখিয়াছিলেন—দীর্ঘকাল মাতৃভাষা অবজ্ঞা করিয়া—"অবরণ্যে বরি" তিনি যখন বিভ্রান্ত, তখন বঙ্গ ভাষার কুললক্ষ্মী তাঁহাকে বলেন—

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারিদশা তবে কেন তোর আজি?
যা' ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা'রে ফিরি ঘরে।"

তাই—

"পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপখনি, পূর্ণ মণিজালে।"

সেই প্রবাসে "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" সমাপ্ত করিবার সময় তিনি মাতৃভাষার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।"

মা তাঁহার ভক্ত সন্তানের সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। আজ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ভারতে সকল প্রচলিত ভাষার ও সকল প্রচলিত সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

আজ যদি বাঙ্গালীকে তাহার সেই সম্পদে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা হয়, তবে তাহাতে যে কেবল বাঙ্গালীরই ক্ষতি হইবে, তাহা নহে—তাহাতে সমগ্র ভারতের ক্ষতি হইবে—সমগ্র সভ্য জগতের ক্ষতি হইবে। কারণ, আজ বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—বাঙ্গালা-সাহিত্য আজ নানা দেশে অনূদিত হইয়া লোককে পরিতৃপ্ত করিতেছে।

একান্ত পরিতাপের বিষয়, যে সকল স্থান বাঙ্গালার অংশ—যে সকল স্থানের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি সবই বাঙ্গালীর সেই সকল স্থান বাঙ্গালী-বিদ্বেষী বিদেশী শাসকদিগের অপকৌশলে বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমাদের স্বদেশীয় এক দল লোক—হীন স্বার্থের প্ররোচনায় সে সকল স্থানে বাঙ্গালা ভাষার উচ্ছেদ সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া দাস-মনোভাবের পরিচয় প্রকট করিতেছেন। ইংরেজের কৌশলে ক্ষমতা-লোলুপতার উত্তেজনায় যাঁহারা জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা করিয়া—বদরিকাশ্রম হইতে কন্যাকুমারী—চন্দ্রনাথ হইতে দ্বারকা—এই যে দেশকে আমরা মা বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছি, সেই দেশকে খণ্ডিত করিতে সম্মত হইয়াছেন—ভারতের ঐক্য নষ্ট করিয়াছেন—তাঁহারা যদি হীন স্বার্থের জন্য বাঙ্গালা ভাষার অনিষ্ট সাধনে অগ্রসর হয়েন, তবে বাঙ্গালী তাহা সহ্য করিতে পারে না—বাঙ্গালী তাহার বিরোধিতা করিবে—সে জন্য সর্ব্ববিধ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিবে। রামমোহন-বিবেকানন্দের বাঙ্গালা, বঙ্কিমচন্দ্র-অরবিন্দের বাঙ্গালা, রামকৃষ্ণ-সুভাষচন্দ্রের বাঙ্গালা কখন সে অপমান সহ্য করিবে না—করিতে পারে না। আজ আমরা যে স্থানে সমবেত হইয়া মাতৃনাম কীর্ত্তন করিতেছি, সেই স্থানও বাঙ্গালী প্রতিপন্ন করিয়াছে—সে অন্যায় করিবে না, কিন্তু অন্যায় সহ্য করিবে না—অন্যায়ের প্রতীকার করিতে তৎপর হইবে। বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার জন্য কি ত্যাগ স্বীকার করিতে সাগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়, তাহা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার পরিচিত সঙ্গীতে তাঁহার বৈশিষ্ট্যব্যাঞ্জকভাবে—প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—

"জননী বঙ্গ ভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও'দুটি অমলকমল-চরণে স্থান।"

আজ বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকদিগের সমবেত সাধনায় অবস্থা যেমনই কেন হউক না, যখন মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদিগের ইংরেজী শিক্ষা-তীক্ষ্ণ সাহিত্যিক-প্রতিভা লইয়া বাঙ্গালা ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা দিব্যদৃষ্টিতে বর্ত্তমানের অন্ধকারের পশ্চাতে ভবিষ্যতের আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না জানি না; তবে তখন বাঙ্গালী মহিলারা ও মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী পুরুষই তাহাদিগের রচনার পাঠক ছিলেন। অথচ কোন চিত্রকর যেমন আপনার অঙ্কিত চিত্র সকলের মধ্যে বা কোন ভাস্কর যেমন আপনার রচিত মূর্ত্তি সকলের মধ্যে পেশ করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না, পরন্তু তাঁহাদিগের ভাবের ভাবুক দর্শকের প্রশংসার প্রেরণা লাভ করিতে চাহেন, তেমনই কোন লেখক মুষ্টিমেয় পাঠকের সহযোগিতায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সেই জন্য তাঁহাদিগের ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া অরবিন্দ বলিয়াছিলেন—

"All honour to the noble few who with only the women of Bengal and a small class of cultured men to appreciate their efforts adhered to the language our forefathers' spoke, and did not sell themselves to the tongue of the foreigner."

বহু সাধকের সাধনার ফলে আজ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ভারতের

আর সকল ভাষাকে ও সাহিত্যকে বহু পশ্চাতে রাখিয়াছে—আজ বাঙ্গালা সাহিত্য জলাভূমির মধ্যে অভ্রংলিহ পর্ব্বতের মত—উদয়াস্তভাস্করের কররঞ্জিত হইয়া বিদ্যমান। সে দিন রাশিয়া হইতে আগত নিরপেক্ষ রাজনীতিকরা যেমন বলিয়া গিয়াছেন—ভারতের স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালা যে কাজ করিয়াছে, আর কোন প্রদেশ তাহা করে নাই, তেমনই অভিজ্ঞ সাহিত্যিকরা বলিবেন, আজ ভারতের আর কোন ভাষায় গঠিত সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যের সন্নিহিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই। বাস্তবিক পরিপুর্ণতা যদি একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হইত, তবে বাঙ্গালাই যে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতম ভাষা তাহা অনায়াসে বলা যায়। খণ্ডিত ভারতে হয়ত হিন্দীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক অধিবাসীর বোধগম্য এবং সেই জন্য স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতে তাহার দৈন্যও উপেক্ষা করিতে হইতেছে; কিন্তু যদি কখন স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত আবার সম্মিলিত হয়, তবে কি হইবে, তাহা বলা যায় না। কারণ, পূর্ব্ব-পাকিস্থানে বাঙ্গালী মুসলমান তরুণতরুণী মাতৃভাষা বাঙ্গালার স্থানে উর্দ্দুর প্রবর্ত্তন-চেষ্টার প্রতিবাদে অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে। আপনার ক্ষমতায়—বিঘ্নকঙ্করকণ্টকিত পথ অতিক্রম করিয়া অধিকার অর্জ্জনের যোগ্যতা যাহার নাই সে-ই ছলে বলে কৌশলে অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া আপনার অধিকার-বিস্তৃতির চেষ্টা করে—তাহার চেষ্টা পরস্বলোলুপ দস্যুর চেষ্টা বলা যায়। সেইরূপ চেষ্টা বাঙ্গালী কখন করে নাই, তাহার তাহা করিবার প্রয়োজন কখন অনুভূত হয় নাই। কেন না, তাহার স্রষ্টার ক্ষমতা আছে, সাধকের একাগ্রতা ও ক্ষমতাবানের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব নাই। সেই জন্যই বাঙ্গালী কৃপাপরবশ হইয়া হিন্দীর উন্নতি-সাধন-চেষ্টা—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে—করিয়া আসিয়াছে। কয়টি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) বিহারে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার পরিকল্পনা করিবার ভার পাইয়া ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দীতে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পাঠ্য-পুস্তকের অভাব দূর করাইয়া বিহারে হিন্দীকে শিক্ষার বাহন ও আদালতে উর্দ্দুর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

(২) উত্তর প্রদেশে যাঁহারা সৈয়দ আমেদের বিরোধিতা প্রহত করিয়া আদালতে হিন্দীর প্রচলন করাইয়াছিলেন—বাঙ্গালী তাঁহাদিগের নেতা ছিলেন।

(৩) বাঙ্গালীই প্রথম উল্লেখযোগ্য হিন্দী সংবাদ-পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক—"হিন্দী বঙ্গবাসীর" প্রবর্ত্তক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, সম্পাদক অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী। হিন্দী কবি বালমুকুন্দ গুপ্ত কলিকাতায় এই অমৃতবাবুর শিষ্য হইয়া হিন্দী রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যেমন অকাতরে সমগ্র ভারতের জন্য রাজনীতিক অধিকার দাবী ও অর্জ্জন করিয়াছে, তেমনই হিন্দীর জন্যও আপনার শক্তি-নিয়োগ করিয়াছে। বাঙ্গালী অপরের অধিকার নষ্ট করিয়া স্বীয় অধিকার-বৃদ্ধির চেষ্টা ঘৃণ্য মনে করে।

বিহার সুবা বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল—মুসলমানের শাসনকালেও বটে, ইংরেজের শাসনকালেও বটে। বাঙ্গালী যখন ভারতে রাজনীতিক নেতা—হেনরী কটনের কথায় যখন বাঙ্গালীরাই পেশাওয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ভারতে লোক-মতের চালক—তখন বাঙ্গালীর স্বদেশ-প্রীতির ও স্বাধীনতার আদর লক্ষ্য করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড কার্জ্জন তাহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার ব্যবস্থা করেন।—বাঙ্গলা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তখনও বিহার পশ্চিমবঙ্গের অংশ। বাঙ্গালী সেই বিভাগ স্বীকার করে নাই। সেই বিভাগ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীরা যে আন্দোলন করিয়া জয়ী হইয়াছিল, তাহাই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের তূর্য্যনিনাদ। আজ যাঁহারা ইতিহাসের শিক্ষা বিকৃতভাবে লক্ষ্য করিয়া বলেন, অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, তাঁহারা ভ্রান্ত। বাঙ্গালীর "স্বদেশী" নামে পরিচিত আন্দোলনের সহিত অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনের পার্থক্য সহজেই প্রতিভাত হয়। "স্বদেশী" আন্দোলন ছিল—মনীষার আন্দোলন; তাই সে আন্দোলনে কত কবিতা, কত গান, কত প্রবন্ধ, কত ছোটগল্প, কত উপন্যাস—মনীষার প্রদীপ্তি প্রকাশ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী আন্দোলনে তাহার একান্ত অভাব মনীষার দৈন্য প্রকট করিয়াছিল। ফলে ভারত আজ খণ্ডিত—সাম্প্রদায়িকতা স্বীকৃত। দুই আন্দোলনে আর যে প্রভেদ ছিল, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়—"স্বদেশীতে" উদ্দেশ্য-সিদ্ধিই ছিল চরম লক্ষ্য, উপায় অবস্থাসাপেক্ষ। সেই জন্য তাহাতে যেমন সমুচ্চভাবের অভাব ছিল না, তেমনই প্রয়োজনে হিংসার স্থান ছিল—রাজনীতি জনগণের কার্য্য; তাহারা মানুষ—এক শতে এক জনও সাধু বা সন্ন্যাসী নহে। সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

(১) "অহিংসা পরমধর্ম্ম, একথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণজন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে, বরং পরমধর্ম্ম।"
(২) "আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম্ম। আমরা বাঙ্গালী জাতি, আজি শত শত বৎসর সেই অধর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বেদান্তবাদী বিবেকানন্দের উক্তি—"অহিংসা ঠিক, নির্ব্বৈর বড় কথা; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বল্‌ছেন, তুমি গেরস্থ—তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে।** বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; ধর্ম্ম প্রকাশ কর, —সাম-দান-ভেদ-দণ্ডনীতি প্রকাশ কর; পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক * * অন্যায় কোর না, অত্যাচার কোর না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ—গৃহস্থের পক্ষে, তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।"

ইহা গীতার উপদেশ। ইহা অবলম্বন করিয়া অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন—

"Aggression is unjust only when unprovoked, violence unrighteous when used wantonly or for unrighteous ends."

বাঙ্গালীর আন্দোলন দ্রুত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে পরিণত হওয়ায় ইংরেজ আপনার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বঙ্গ বিভাগের পরিবর্ত্তন করে; এবং
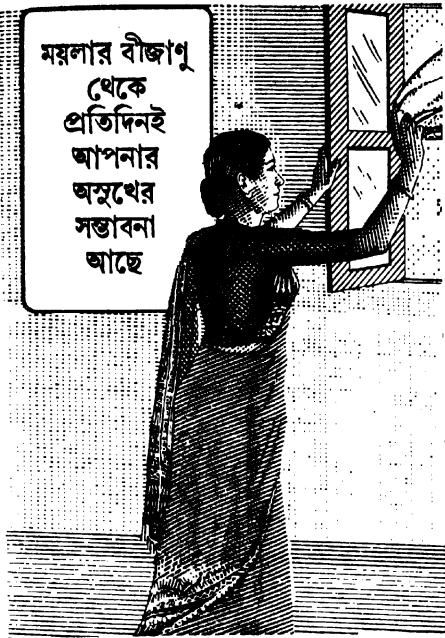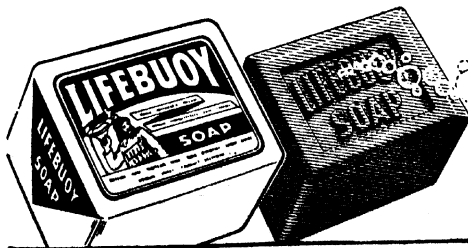
ানেও পাঠাইয়া
ধান-সচিব সত্যই
ন্ধা তাহাদিগের

উপযোগী এবং যে স্থানের সমাজে তাহারা সহজে মিশিতে পারে সেই স্থানে তাহাদিগের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। তিনি আসামের গোয়ালপাড়া সম্বন্ধে এই উক্তি করিয়াছেন। বিহারের সমগ্র মানভূম জিলা, ধলভূম পরগণা এবং সাঁওতাল পরগণার ও পুর্ণিয়ায় বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল সম্বন্ধেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। যে হিন্দুরা আজ পূর্ব্ববঙ্গে পূর্ব্বপুরুষের ভিটা ও সকল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া সম্ভ্রম ও ধর্ম্মবিশ্বাস রক্ষা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে, তাহাদিগের প্রতি ভারত সরকারের কর্ত্তব্য ভারত সরকার অস্বীকার করিতে পারেন না। পরলোকগত বল্লবভাই পেটেল একবার বলিয়াছিলেন, পাকিস্থান যদি পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের মান ধন প্রাণ লইয়া নিরাপদে বাস করিবার অধিকার দিতে না পারে, তবে ভারতকে তাহাদিগের জন্য আবশ্যক ভূমি দাবী করিতে হইবে। তাহার কারণ দেশ-বিভাগের সময় সে দায়িত্ব বর্জ্জন করা হয় নাই এবং দেশ বিভাগ—ইংরেজের সহিত আপোষ করিয়া—উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে হইয়াছিল। অথচ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব বলিয়াছেন, পাকিস্থানের কুব্যবহারে পূর্ব্ব পাকিস্থানের হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে আসিতে বাধ্য হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিভক্ত—এখন এক-তৃতীয়াংশে পরিণত। তথায় স্থানাভাব।

সেজন্য যেমন, পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের বাঙ্গালীদিগের প্রতি অন্যান্য সরকারের অবাঞ্ছনীয় ব্যবহারে তেমনই—পশ্চিমবঙ্গের প্রসার বৃদ্ধি প্রয়োজন। বিস্ময়ের ও পরিতাপের বিষয় এই যে, কমিশন যে বিষয়ে আবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। পশ্চিবঙ্গের অর্থনীতিক ভিত্তি যে দুর্ব্বহভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে—বাঙ্গালী যে বিপন্ন—তাহা বিবেচনা করিয়াও কি কেহ বলিতে পারেন, বাঙ্গালার যে অঞ্চল ইংরেজের ব্যবস্থায় অন্যান্য প্রদেশভুক্ত হইয়াছিল সে সকল অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তিতে আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে? বিলম্বে সমস্যার জটিলতাই বৃদ্ধি পাইবে—অসন্তোষ আগ্নেয়গিরির গৈরিক স্রাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া খণ্ডিত ভারতের ঐক্য নষ্ট করিতে—জাতির উন্নতি বিপন্ন করিতে পারে।

গত কয় বৎসরের মধ্যে যে মানভূমকে বার বার সত্যগ্রহ করিতে হইয়াছে—লোক সঙ্গীত "টুশু" সম্বন্ধেও যে তাহা করা প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই।

বিহারে রাজ্যের নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার নামে আইনের যে অপপ্রয়োগ হইয়াছে, তাহা বিহার হাইকোর্টের বিচারেই প্রকাশ পাইয়াছে। গণতান্ত্রিক দেশে সেরূপ কারণে সরকারকে পদত্যাগ করিতে হয়। ভারতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়াছে।

বিহারের বঙ্গভাষা ভাষী অঞ্চলের বাঙ্গালীরা কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা হেতু মনে করিয়াছিলেন—আশা করিয়াছিলেন, জাতীয় সরকার সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধ-কলঙ্কে আপনাকে কলঙ্কিত হইতে দিবেন না। তাঁহারা ধৈর্য্যের অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহারা যাহা লক্ষ্য করিতেছেন, তাহাতে আর আশার অবকাশ নাই। ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রীর মত—এখন অন্য কাজের জন্য রাজ্যপুনর্গনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ-গঠন নীতি পরিচালনের অবসর নাই। আর রাজাগোপালাচারী আবার গণতন্ত্রের নামে স্বৈর শাসন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বলিতেছেন—পঞ্চদশ বর্ষকালের জন্য রাজ্য-পুনর্গঠনের প্রস্তাব ত্যক্ত হউক! কিন্তু যে কমিশনের রিপোর্ট সন্তোষজনক হয় নাই সেই কমিশনের অন্যতম সদস্য সর্দ্দার পাণিকর মত প্রকাশ করিয়াছেন, রাজ্য-পুনর্গনে আর বিলম্ব করিলে ভারত রাষ্ট্রের ঐক্য বিপন্ন হইবে। মানুষের পক্ষে ভুল করা স্বাভাবিক। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও বার ভুল করিয়াছেন—তিনি দেশদ্রোহী চিয়াং-কাইশেককে চীনের ত্রাণকর্ত্তা মনে করিয়া ভুল করিয়াছিলেন—তিনি কাশ্মীরের ভারত শত্রু-সেখ আবদুল্লাকে বন্ধু বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী শ্যামাপ্রসাদ আপনার প্রাণ দিয়া তাঁহাকে সে ভুল সংশোধন করাইতে পারেন নাই। তিনি সুভাষচন্দ্রকে জাপানের পুতুল বলিয়া মনে করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। গান্ধীজীও ভুল করিয়াছেন এবং ভুল স্বীকারও করিয়াছেন।

আজ আমরা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে ও তাঁহার ভক্তদিগকে বলি—তাঁহারা ভুল স্বীকার করিবার সৎসাহস দেখাইতে অগ্রসর হউন; ভুলে অবিচলিত থাকিয়া ভারতের ঐক্য ও উন্নতি বিপন্ন করিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ আজ বিপন্ন, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীরা আজ মৌলিক অধিকারে বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গকে নূতন গঠিত করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে বিষয়ে অবহিত হইলেও স্থানাভাবে ও অর্থাভাবে সে গঠনকার্য্য দ্রুত সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না—বঙ্গভাষাভাষী কতকগুলি অঞ্চল যে সকল প্রদেশভুক্ত হইয়াছে, সে সকল প্রদেশ সে কার্য্যের সাফল্যে অন্তরায় হইতেছে। বিহারে ও আসামে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস হইয়াছে; বিহারে ও আসামে বাঙ্গালী বিহারী ও আসামীর মৌলিক অধিকারে বঞ্চিত; এমন কি উড়িষ্যায় ও উত্তর প্রদেশে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীর বাঙ্গালায় শিক্ষালাভের যে সুযোগ তাহা নির্ম্মম নির্লজ্জভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—নহিলে উপায় নাই। সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালী, বিহারের বাঙ্গালী, আসামের বাঙ্গালী সকলকে এক স্বার্থে একযোগে কাজ করিতে হইবে।

বিহার যখন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী তাহার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল, বিপন্ন পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি বিহার বা আসাম তাহার শতাংশের একাংশ আজ স্বীকার করিয়াছে? তাই আমরা মনে করিতে পারি—বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিবে? পশ্চিমবঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন—বাঙ্গালা ভাষা। বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীকে সেই ভাষা বর্জ্জন করিয়া অপুষ্ট হিন্দী ও আসামী ভাষা শিখাইয়া তাহাকে তাহার প্রতিভা স্ফূরণের অবসরে বঞ্চিত করিবার যে হীন চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করিতেছি, তাহার বিরোধিতা বাঙ্গালীকে করিতেই হইবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে বলিয়াছিলেন—

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের জন্য একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হ'বে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে!

একাধিক শতাব্দীর শাসন-ধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে !"

পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধে দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালী সুভাষচন্দ্রের বিস্ময়কর কার্য্যে ভাত ইংরেজ তাহার এই শোষণক্ষেত্র ভারতের শাসনাধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সে যে লক্ষ্মীছাড়া ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—যাইবার সময় তাহাকে খণ্ডিত ও দুর্ব্বল করিয়া গিয়াছে।

আজ শিল্প নূতন করিয়া গঠিত করিতে হইবে—মূলধনের ও অভিজ্ঞতার অভাব দূর না করিতে পারিলে তাহা হইবে না। আজ শিক্ষার শোচনীয় অভাব দূর করিতে হইবে—নহিলে জাতির উন্নতি অসম্ভব—আবশ্যক অর্থের ও শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতেও বিলম্ব ঘটিতেছে। আজ জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে হইবে—অর্থের ও শিক্ষার অভাবে তাহা দ্রুত হইতে পারিতেছে না। আজ সেচের সুব্যবস্থা করিতে হইবে—সেজন্য অর্থের ও অভিজ্ঞতার অভাব। সমগ্র খণ্ডিত ভারতের এই অবস্থা যে উদ্বাস্তু সমাগমে ও বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারে পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনীভূত ও শোচনীয় হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ বাঙ্গালীই রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়াছে—বাঙ্গালার গোমুখামুখ হইতে জাতীয়তার যে পাবনী ধারা নির্গত হইয়াছে বাঙ্গালীই তাহা সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত করিয়া জাতিকে জড়ত্বশাপমুক্ত করিয়াছে—ভস্মরাশিতে জীবন সঞ্চার করিয়াছে—বাঙ্গালীই পঞ্জাব পর্য্যন্ত স্থানে জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা লইয়া গিয়াছে—বাঙ্গালীর ভাষাই ভারতে সকল আধুনিক ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যই নব ভারতের সকল সাহিত্যের অগ্রণী—বাঙ্গালীই স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গকে আবার গঠিত করিতে হইবে। সেজন্যও ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠিত করিতে হইবে।

সেই পুনর্গঠিত বাঙ্গালার স্বপ্ন যাঁহারা দেখিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করিতেছি। আজ আমার পুত্রপ্রতিম শরৎচন্দ্রের ও শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতি আমাকে বেদনা দিতেছে—আজ সুভাষচন্দ্রের কথা মনে করিয়া আমার পক্ষে অশ্রু সম্বরণ করা দুষ্কর হইতেছে।

যে বাঙ্গালাকে আমরা "দেবী আমার, সাধনা আমার, ধাত্রী আমার—আমার দেশ" বলিয়া ধন্য হই—সেই বঙ্গ-জননীকে আমরা—

"হেরি—তুমি শাশ্রুনেত্রে, অবনত-শিরে,
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী !
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী।"

কিন্তু বিশ্বাস কর—আসমুদ্র হিমাচল দেশ বঙ্কিমচন্দ্রের যে "বন্দে মাতরম" মন্ত্রে নব জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া জন্মগত অধিকার স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিয়াছে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালী সন্তানদিগের ত্যাগপূত সাধনায় সেই বাঙ্গলা আবার বৃহত্তর বঙ্গরূপে পুনর্গঠিত হইবে—কর্ম্মে মহান ধর্ম্মে প্রধান গৌরবে উজ্জল হইবে। সেই পুনর্গঠিত বাঙ্গালায় বাঙ্গালী কবির পুণ্য গীত গীত হইবে—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার মাঠ,
বাংলার বন, বাংলার হাট,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান।
বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা,
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান।"

সেই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকিয়া বাঙ্গালী ভ্রাতাভগিনীদিগের সঙ্গে—মাতৃ-মন্দিরে ভক্তির রত্নবেদী নিষ্ঠার গঙ্গোদকে ধৌত করিয়া তাহাতে সর্ব্বার্থসাধিকা জননীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া বঙ্গজননীকে প্রার্থনা জানাইতেছি—

"মূর্ত্তিমতী হয়ে, সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা দু'খানি !
ধান্যশীর্ষ স্বর্ণ ঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি।"

তুমি বাঙ্গালীর হৃৎ-পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত হও—

"এস চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ জ্ঞান-দীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি,
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী।"

বন্দে মাতরম।

পরিচালক—উপানন্দ

অনুশীলন ও অভ্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'অনুশীলন, শক্তির অনুকূল। অভ্যাস শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের ফল সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা……অভ্যাস প্রয়োজন মতে কর্ত্তব্য, অনুশীলন সর্ব্বত্র কর্ত্তব্য।'

বিনা অনুশীলনে এ সংসারে কোন কাজেই সফল হওয়া যায় না। শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ একমাত্র অনুশীলনের দ্বারাই সম্ভব। বিদ্যোপার্জ্জন, নানা দর্শনবিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ, শিল্প খণ্ডাদির উদ্ভাবন, নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার, নব নব তথ্যের সন্ধান, সব কিছুর মূলেই আছে প্রভূত চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা, আর তা সম্ভব হয়েছে একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম, আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে বারে বারে অনুশীলন করে।' প্রত্যহ যথোচিতভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনার দ্বারা ব্যায়াম অনুশীলন করলে পেশীগুলি বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং ফুসফুসের ক্রিয়াবৃদ্ধি পাওয়ায় নিশ্বাস প্রশ্বাস অধিকভাবে আমরা নিতে পারি, ফলে শরীর সুস্থ সবল ও কর্ম্মপটু হয়। কিন্তু যদি কিছুদিন পরে ব্যায়ামের চর্চ্চা ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে শরীর সর্ব্বদাই অসুস্থ, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে নানাপ্রকার ব্যাধির আশ্রয়স্থল হ'তে পারে। মনের স্থিরতা, লক্ষ্য ও দৃঢ়সঙ্কল্প না থাকলে অনুশীলন সম্যক্‌ভাবে হয় না। ঈশ্বর চিন্তা থেকে সুরু করে প্রতিদিনের অন্ন-সংস্থানের পথে আছে অনুশীলন ও অভ্যাসের প্রাধান্য।

রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে হাত মুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করার পর পড়্‌তে বসবার যে রীতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন, তার দিকে তোমাদের অনেকেরই লক্ষ্য নেই। তাই তোমরা সময়ের সদ্ব্যবহার করে ঠিকভাবে শারীরিক ও মানসিক শক্তি চর্চ্চা করতে সক্ষম হও না। বেলায় উঠ্‌বার অভ্যাস তোমাদের বিদ্যাচর্চ্চায় ব্যাঘাত জন্মায়। এই অভ্যাসকে বদ‌অভ্যাস বলা হয়, এটা তোমাদের শক্তি অর্জ্জনের প্রতিকূল। দিন কয়েক যদি তোমরা তোমাদের বাড়ীর লোকের চেষ্টায় বা ঘুম ভাঙ্গানো ঘড়ির সাহায্যে ভোরে উঠতে আরম্ভ করো তা হলে এমি অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে, বিনা সাহায্যে ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙ্‌বে, আর অনুশীলন তখন সার্থক হয়ে উঠ্‌বে সদভ্যাসের ফলে। মনও বস্‌বে দৈহিক ও মানসিক চর্চ্চার দিকে।

কিছুদিন ভোরে উঠে তারপর ভোরে ওঠার জন্যে লক্ষ্য না রাখ্‌লে, বেলায় ঘুম ভাঙ্‌বে, শেষে বিদ্যালয়ে পড়া তৈয়ারী করে ঠিক মত নিয়ে যেতে পারবে না। তারপর ক্রমে ক্রমে দিনগুলি অবহেলায় চলে যাবে। পরীক্ষার ফল শোচনীয় হ'য়ে উঠ্‌বে অনুশীলনের অভাবে। যতগুলি বিষয় বিদ্যালয়ে তোমাদের পড়্‌তে হয়, সবগুলির নিত্য অনুশীলন না করলে আর অনুশীলনীগুলি নিয়ে মানসিক চর্চ্চার দিকে মনোনিবেশ না হোলে উত্তরকালে লেখাপড়ায় বেশীদূর অগ্রসর হোতে পারবে না, সমাজের কাছে মূর্খ হয়ে ঘৃণার বস্তু হোতে হবে, আর হীন বৃত্তি অবলম্বন করেও অন্ন সংস্থান করতে পারবে না। জেনেরেখো সহজে সবদিকে জ্ঞানলাভ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর মধ্যে একস্থানে বলেছেন—'জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে আমি সব জানি, আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না—'

জ্ঞান আহরণের জন্যই মানুষ বিদ্যালাভ করে। যে নিজেকে ফাঁকি দিয়ে সংসারে ফাঁকিতে পড়্‌লো, তার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কে আছে, বল্‌তে পারো?

সংসারে সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার, এর জন্য অনুশীলন করা উচিত। কোন বিষয়ে যে একনিষ্ঠ সাধনার পথে প্রতিদিন অনুশীলন করে, পরবর্ত্তীকালে সে ব্যক্তি সেই বিষয়ে সুদক্ষ হয়ে সমাদৃত হয়। যে পরকে প্রতারণা করে সে বঞ্চক মাত্র, যে নিজেকে প্রতারণা করে ছেলেবেলা থেকে, জেনেরেখো সে নিজেরই সর্ব্বনাশ করে।

এখনকার দিনে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তর্জ্জমা বা অনুবাদ করার দিকে তোমাদের অনেকেরই লক্ষ্য নেই। তোমরা পড়ার বইগুলিও সম্পূর্ণভাবে পড়ার মত না পড়ে কেবল নোট মুখস্থ করে

কোন রকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসে থাকো। শেষে দেখা যায় তোমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও বিশুদ্ধভাবে এক পংক্তিও লিখ্তে পারোনা, তর্জ্জমা করার অভ্যাস না থাকায় নানাভাবে অসুবিধায় পড়ে থাকো—কথাবার্ত্তা অন্য ভাষায় বল্তে পারোনা।

ইংরাজী সারা ভারতের বিভিন্ন শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিতদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী, কিন্তু মনের ভাব অন্তরে তর্জ্জমা করে বল্বার মত যে শক্তি একদিন এদেশের ছেলেমেয়েরা অর্জ্জন করতো, বর্ত্তমানে তা অনুশীলনের অভাবে—আজ্কের দিনের অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের পক্ষে অবাঙালীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা সমস্যাজনক হয়ে উঠেছে। এজন্যে তোমরা বাঙ্লা থেকে ইংরাজী আর ইংরাজী থেকে বাঙ্লা, আর রচনা করার দিকে দৃষ্টি দেবে, নিত্য অনুশীলনী নিয়ে অনুশীলন কর্লে শেষে অভ্যাসে পরিণত হোলে তখন তোমাদের কাছে এগুলি দুরূহ বোধ হবে না—আর মনের ভাব অন্য ভাষায় প্রকাশ করতে পেরে এবং সেই ভাষাভাষীর সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানের দ্বারা সম্প্রীতি লাভ করে নিজেরা যথেষ্ট উপকৃত হবে। তারাও বুঝ্বে তোমরা মূর্খ নও।

আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সাফল্যলাভ হয়। চেষ্টাই অনুশীলনের প্রধান সক্রিয় শক্তি। যার লেখাপড়ার ইচ্ছা নেই, নেহাৎ অভিভাবকের ভয়ে সেই শুধু বই নিয়ে বসে মনকে নানাদিকে নানা চিন্তায় ছেড়ে দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করে। এই আত্মপ্রবঞ্চনাই তার মানসিক মৃত্যু আনে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাস নিয়ে মুখোমুখি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আবোল তাবোল বলে আসে, আর তাদের বিদ্যার পরিচয় সংবাদপত্রের মারফৎ আমরা জান্তে পারি তখন আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায় লজ্জায়, ঘৃণায়? যে বাংলা বড় বড় মনীষীকে জন্ম দিয়েছে, আর যে বাঙালী সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, প্রগতির ক্ষেত্রে আর মননশীলতার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে এসেছে, আজ তাকে অনেকদূর পিছিয়ে আস্তে হচ্ছে, আজ্কের দিনের ছেলেমেয়েদের জ্ঞানানুশীলনের অভাবে—এটা কি কম লজ্জার কথা। চরিত্র শোধন করতে হোলে নিজের দোষ না দেখ্লে কখন তা শোধন হয় না। তাই তোমরা নিজেদের দোষ দেখ্তে শেখো, আর তাই সংশোধন করতে অভ্যস্ত হও। যারা স্নাতকোত্তর হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আস্ছে তারা অনেকেই শিক্ষার মর্য্যাদা নিজেদের দোষেই ক্ষুণ্ণ করে বসেছে, আর সংসারের ক্ষেত্রে প্রবেশের সময়ে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে বিড়ম্বনা ভোগ করছে। অধ্যয়নেই স্বভাব দোষ দূর হয় না, অনুশীলনে দূর হয়। অনুশীলন করতে করতে অভ্যাসে পরিণত হোলে তখন স্বভাব-দোষ আর থাকে না। এজন্যে উপযুক্ত শিক্ষক এবং শিক্ষার দরকার। অনুশীলনের পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না; সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য, কেবল শৈশবে কেন চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য হিন্দু ধর্ম্মে গুরুর এত মান—'

সৎ শিক্ষকের সাহায্যে তোমরা উপযুক্ত শিক্ষালাভের দিকে দৃষ্টি দাও যাতে সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে নানা বিষয়ে অনুশীলন করে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবকে আবার ফিরিয়ে আন্তে পারো, আর সকল দিকে শীর্ষস্থান অধিকার করে পৃথিবীতে এই জাতিকে সর্ব্বোচ্চস্থানে বসিয়ে রাখ্তে সক্ষম হও, নতুবা ভবিষ্যতে বাঙালীর অস্তিত্ব আর থাক্বে না।

তারাও মানুষ, ভাই

শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

(কিশোর রচনা)

অভ্রংলেহি গিরি চূড়ায়,
বিজয়কেতন যারা উড়ায়,
বাধার প্রাচীর যারা গুঁড়ায়,
তারাও মানুষ, ভাই;

ধূ ধূ প্রান্তর যারা হয় পার,
লক্ষ যোজন ছোটে অনিবার
শ্যামল করিছে মরু সংসার
তাদের শঙ্কা নাই।

দূর সমুদ্রে করে অভিযান,
নূতন যুগের ভরে দেয় প্রাণ,
তারাই প্রাচীন করি অবসান
বাজায় ডঙ্কা, ভাই!

ভয়-শঙ্কুল অরণ্য শত,
যাহাদের কাছে হয় পদানত
তারাই মানুষ পূজিবার মত,
তাদের বার্ত্তা চাই।

রক্ত যাদের আল্পনা আঁকে,
বিপদ যাদের পাশে পাশে থাকে,
সেই পান্থেরে সবে মনে রাখে
যার পথ ধরে যাই।

সুপ্ত কিশোর তাই তো তোমায় বলি;
যাঁরা মহাজ্ঞানী, পথ সন্ধানী
শাশ্বত আজও তাঁহাদেরই বাণী
যেথায় জ্বলিছে আলোকের শিখা—
যেন সেই পথে চলি।

মিশরের কায়রো শহরে থাকত একটি ছেলে; নাম তার আলী। ভারি ভাল ছেলে, তাই তার মা বাবা ভাই বোন সকলেই তাকে ভালবাসত খুব।

আলীর কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল, মুক্তোর মত ঝক্‌ঝকে দাঁত; গোল মত মুখ আর গায়ের রং চকলেটের মত বাদামী! রোজ সকাল বেলা সে তার আলখাল্লার মত বিরাট একটা জামা গায়ে চড়িয়ে, মাথায় একটা ছোট্ট লাল টুকটুকে টুপি চাপিয়ে, আর পায়ে তার হলদে জুতো জোড়াটা গলিয়ে সারাদিনের মত বাড়ী থেকে বার হয়ে যেত। যাবার সময় কয়েকটা তরমুজের ফালি আর জল খেয়ে নিত কিন্তু।

তার ছিল একটা গাধা। সেই গাধার পিঠে লোকজনকে চড়িয়ে সে অনেক দূরে দূরে সকলকে পৌঁছে দিত। এই ভাবে তার রোজ রোজগারও হতো কিছু কিছু।

একদিন সে কায়রোর একটা বড় হোটেলের সামনে

আলী আর তার গাধা

তার গাধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় হোটেল থেকে ভারি অদ্ভুত এক বুড়ো লোক বার হয়ে এলো। তার হাতে একগাদা গাইড বুক, আর গলায় ঝোলান অনেকগুলো ক্যামেরা। সে এসেছে মিশরের পিরামিড্ দেখতে।

বুড়ো লোকটা আলীকে খিঁচিয়ে মিচিয়ে বলে উঠল, "চল, তাড়াতাড়ি আমায় পিরামিডে নিয়ে চল। হাতে একটুও সময় নেই।" আলী খুব ভদ্রভাবে বল্লে, "আসুন, আমার গাধার ওপর চেপে বসুন, আমার গাধা আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবে।"

গাধায় চড়ে বালির ওপর দিয়ে যেতে যেতে সেই বুড়ো লোকটি দেখলে আলীর গলায় সুতোয় বাঁধা একটি সুন্দর পাথর ঝুলছে। বুড়োর দেখে এতো ভাল লাগল যে সে বলল "আমায় ঐ পাথরটা বিক্রি করবি? নগদ এক শিলিং দাম দেব।" এই কথা শুনে আলী তো আহ্লাদে আটখানা! মনে মনে বললে, "এক শিলিং পেলে অনেক খাবার কেনা যায়, মোণ্ডা মেঠাই, সরবৎ কত কি! নিজেও খাব; ভাই বোনেদেরও দেব, কি মজা!

কিন্তু সংগে সংগে তার মন খারাপ হয়ে গেল, কারণ সে একদিন তার মাকে কথা দিয়েছিল, কোনদিন এই পাথরটা হাতছাড়া করবে না। তাই সে বুড়ো লোকটাকে দুঃখ করে বললে যে সে এটা বিক্রি করতে পারবে না। বুড়ো লোভ দেখিয়ে বললে, "দু শিলিং দেব।" আলী বলল, "না মশাই, অত পেড়াপীড়ি করবেন না, আমি দিতে পারব না।"

সন্ধ্যে বেলা যখন আলী বাড়ী ফিরছে এমন সময় হঠাৎ একটা জীর্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে:

"আলী, আলী!"

আলী একটু ভয় পেয়ে গেল : বলল,

"কে তুমি ?"

"আমি তোমার গলায় ঝোলান পাথর। আজ তুমি আমায় বিক্রি করনি তাই তোমায় একটা পুরস্কার দিতে চাই, তুমি কি চাও বল ?"

আলী থতমত খেয়ে গেল ; ধন্যবাদ দিয়ে বলল, "আমি যে কি চাইব ভেবেই পাচ্ছি না।"

পাথর বললে, "কিন্তু ভেবো না, একদিন তোমার আমাকে দরকার হবে ; সে সময় আমি নিশ্চয়ই তোমায় সাহায্য করব।"

এবার পাথর তার নিজের কথা বলতে লাগল !

"অনেক দিন আগে আমি ছিলুম এই দেশের এক রাজকুমার। এক দুষ্টু দৈত্য আমাকে এমনি এক পাথরে পরিণত করেছে। আর এমন এক মন্ত্র দিয়েছিল যে যতদিন না কেউ এই পাথরকে বিক্রি করার সুযোগ পেয়েও বিক্রি করবে না ততদিন আমার মুক্তি নেই। আজতুমি আমাকে বিক্রি না করে আমার মুক্তি এনে দিয়েছ। আজ আমি মুক্ত। তুমি আমার যে উপকার করলে তা আমি কোনদিন ভুলব না। ভাই বিদায় !"

"বিদায় রাজকুমার !" আলী বলল। তাকে এক প্রাচীন রাজকুমার জেনে সে যথেষ্ট সম্মানও করল। হঠাৎ

রাজকুমার বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন

তার গলার সুতোয় একটা টান পড়ল, আর পাথরটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সে দেখল একটু দূরে একজন অদ্ভুত সুন্দর রাজকুমার এগিয়ে যাচ্ছেন। তাকে এমন অদ্ভুত দেখতে যে এমন চেহারা খালি ছবিতেই দেখা যায়। আলী চোখ মুছতে মুছতে বাড়ী চলে গেল। বাড়ী গিয়ে দেখে তার মা তার জন্যে খুব ভাল খাবার দাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন, খাবার দেখে সে তার মাকে এই রাজকুমারের কথা বলতে একেবারেই ভুলে গেল। এমন কি তার মায়েরও লক্ষ্য পড়ল না যে আলীর গলায় সে পাথরটী নেই।

কয়েকদিন পরে আলীর জীবনে ঘটল এক দুর্ঘটনা। একদিন ছুটিতে তার বাবা তাকে নীল নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। সে মনের আনন্দে নদীর ধারে বেড়াচ্ছে এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেল, কে যেন বলছে, "সাবধান !" এই শুনে সে প্রাণপণে ছুটতে সুরু করল। একটু গিয়েই

উট আলীকে তাড়া করেছে

দেখে না সামনে একটী বিরাট উট।

উটটা গোঁ গোঁ করতে করতে গলা বাড়িয়ে তার দিকে ছুটে এলো। আলীও উল্টো দিকে ঘুরে ছুটতে সুরু করল। সামনেই দেখে এক খেজুর গাছ। এদিকে তার ঘাড়ের ওপর উটের গরম নিশ্বাস পড়তে সুরু করেছে। সে তাড়াতাড়ি গাছে উঠে, খেজুরের কাঁদি ডিঙ্গিয়ে একেবারে মাথায় চড়ে বসল।

উট তো রেগে আগুন; বিশ্রী চিৎকার সুরু করে দিল। তার রাগ থামাবার জন্যে আলী ওপর থেকে কাঁদি কাঁদি খেজুর পেড়ে দিতে লাগল। পেট

ভরে খেজুর খেয়ে সে পড়ল ঘুমিয়ে। তখন আলী তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে একেবারে দে ছুট।

পরদিন আলী গেল নীল নদীতে সাঁতার কাটতে। কি ঠাণ্ডা জল! প্রাণ জুড়িয়ে যায়! আলী হঠাৎ শুনতে পেল—

"পালিয়ে যাও, আলী, তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও!" আলী প্রাণপণে সাঁতার কেটে পালিয়ে আসতে লাগল। একবার পেছন ফিরে দেখল, একটা ভয়ংকর কুমীর হাঁ করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে ধরে ফেলল বলে। এমন সময় গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ! পাশ দিয়ে একটা জাহাজ যাচ্ছিল। সেই জাহাজ থেকে এক ভদ্রলোক গুলি ছুঁড়েছিলেন। ভীষণ কুমীরটা ঝপাং ঝপাং করে ল্যাজ ঝাপটাতে ঝাপটাতে জলে ডুবে গেল। নীল নদীর জল কুমীরের রক্তে রাঙ্গা হয়ে গেল।

কুমীর তাড়া করেছে আলীকে

এদিকে আলীদের কায়রো ফিরে যাবার দিনের আর দেরি নেই। যাবার দিন কিন্তু আলীকে পাওয়া যায় না চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব; কিন্তু কোথায় আলী? হয়েছে কি—সে একটা পাতকুয়ার ধারে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় শুনতে পেল যেন তার সেই পাথর কথা কইছে। যেই শোনা ওমনি এমন চমকে গেল যে নিজেকে আর সামলাতে পারল না—পড়ল গিয়ে সেই পাতকুয়ার মধ্যে।

ভীষণ গভীর কুয়া। কিন্তু সুখের বিষয় তার মধ্যে জল ছিল না মোটেই। তাই সে গিয়ে পড়ল নরম কাদার ওপর।—যাক্ খুব বেঁচে গেছে। কিন্তু সে ভয়ে কাঁদতে লাগল খুব, শুনতে পেল, "কেঁদো না আলী চারদিকে চেয়ে দেখ।"

আলী দেখে তার পায়ের কাছে একটা সুন্দর পাথর পড়ে আছে, আর তা থেকে উজ্জ্বল নীল আলো ঠিকরে পড়ছে, এটা তার আগের পাথরের চেয়েও সুন্দর। সে রাজকুমারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "নাও, পাথরটা কুড়িয়ে নাও, আর যতদিন না কায়রোয় পৌঁছে যাচ্ছ তত দিন এটা সংগে রেখে দেবে। আলী আনন্দে রাজকুমারকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, "আপনি যে আমায় এমন সুন্দর উপহার দিলেন, আপনি যে আমায় ভীষণ কুমীর আর ভয়ংকর উটের হাত থেকে সাবধান করে দিয়ে বাঁচালেন, সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।"

আলীর বন্ধুরা যখন আলীকে নিরাপদে পেল তখন তারা খুব আনন্দিত হলো—আর তার হাতের নীলাভ পাথরটা দেখে সবাই বলতে লাগল এটা একটা মহামূল্য রত্ন—নীলকান্তমণি।

চিঠি

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

পূর্ণিমা,—আছে মনে মামাটার নামটা?
পড়ে কিনা দেখ মনে খুলে এই খামটা।
ভেবেছিনু সশরীরে পূজো এলে কাশীতে—
গিয়ে মন নেবো ভ'রে পূর্ণিমা-হাসিতে।
রাজা আর ভূতেদের দীর্ঘ সে কাহিনী,
মগজে রেখেছি পূরে বিরাট সে বাহিনী;
পরী আর ডাইনীর কতশত গল্প,—
জোগাড় করেছি এসে, নেহাৎ না অল্প,—
এই পুঁজি নিয়ে যাবো পূর্ণিমা তুষিতে—
কিছুদিন কেটে যাবে হাসি আর খুসিতে।

কিন্তু এ সাধ মোর মনেতেই থাকলো ;
পূর্ণিমা কই আর চিঠি লিখে ডাকলো !
লিখ্‌লো কি—মামা তুমি চলে এসো এখানে ;
লোকালয়ে, যমালয়ে, থাকো ছাই যেখানে।
থাক বাবা, মিছিমিছি ঝগড়ায় কাজ কি ?
পূর্ণিমা ভাগনীকে কেন মিছে লাজ দি' !
স্নেহাশিস চুম্বন নিও মাগো তুলিয়া ;
চিঠি দিও আজিকার ঝগড়াটা ভুলিয়া।

নারিকেলের জন্ম

(নিউ-গিনি বা পাপুয়ার রূপকথা)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আফ্রিকার নিউগিনি···সমুদ্রের ধারে এক গাঁ। গাঁয়ে যত জেলের বাস। জেলেদের পুরুষমানুষরা সকাল হলেই জাল নিয়ে যায় সুমুদ্দুরে মাছ ধরতে—সন্ধ্যার সময় মাছ নিয়ে ঘরে ফেরে—তখন মেয়েপুরুষ সকলে মিলে মাছ খায়।

কিন্তু জেলেদের মধ্যে একজন···সে কারো সঙ্গে মাছ ধরতে যায় না—সে যায় একা। কেউ তার সঙ্গে যেতে চায় যদি তো তাকে ধমক দেয়, বলে—আমার সঙ্গে কেউ যাবে না!

এ জেলে কোথায় মাছ ধরে, অন্য জেলেরা জানে না। এ জেলে মাছ ধরে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফেরে—ঝুড়ি ভরতি মাছ নিয়ে। এত মাছ আর কোনো জেলে ধরতে পারে না।

অন্য জেলেরা সন্ধ্যার সময় খেতে বসে কেবলি এই জেলের কথা বলে। কোথায় ও যায়—কেন কাকেও সঙ্গে নেয় না—কারো সঙ্গে কেন মেশে না—আর এত মাছ ধরে কি করে—কেউ ভেবে পায় না!

একদিন এক ছোকরা জেলে বললে—আমি যাবো চুপি চুপি ওর পিছনে—দেখবো ও কোথায় গিয়ে মাছ ধরে।

অন্য জেলেরা বলে—কি করে যাবি? ও দেখতে পাবে না? দেখতে পেলে মেরে ধুমসে দেবে।

ছোকরা বলে—মাঠে লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল তো—সেই সব ঘাসের আড়ালে আড়ালে যাবো—ও জেলে টেরও পাবে না।

পরের দিন সকালে ছোকরা চললো ও জেলের পিছনে—দেখবে, কোথায় ও যায়। লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল ফুঁড়ে সুমুদ্দুরে যাবার পথ—জেলে জানতেও পারলো না, ছোকরা তার পাছু নিয়েছে।

জেলে এলো সুমুদ্দুরের ধারে—এসে সুমুদ্দুরের ধারে বালির উপরে রাখলো তার ঝুড়ি। ঝুড়ি রেখে দুহাতে নিজের মাথাটা ধরলো চেপে—ধরে ধড় থেকে মাথাটা নিলে খুলে—মাথা খুলে সে মাথা রাখলো ডাঙ্গায় তার সেই ঝুড়ির পাশে। মাথা রেখে কন্দকাটা হয়ে জেলে নামলো সুমুদ্দুরের জলে।

ছোকরা দেখলো লম্বা ঘাসের আড়ালে বসে—দেখে তার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ভয় করছে—তবু উঠলো না—দেখতে হবে, এর পরে কি হয়।

জেলে ওদিকে জলে নেমে চলেছে—কাঁধ পর্য্যন্ত জলে নেমে সে দুহাত তুললো আকাশের দিকে—যেন কোনো ঠাকুরদেবতার কাছে কি জানাচ্ছে—তারপর ডুব দিতে লাগলো। অনেকগুলো ডুব দিয়ে—ডুব দিয়ে—ডাঙ্গায় উঠলো। ডাঙ্গায় উঠে দুহাতে ঝুড়িটা ধরে ঘাড় নামালো। যেমন ঘাড় নামানো অমনি তার ধড় থেকে ঝর্ঝর করে মাছ পড়ে ঝুড়ি বোঝাই। ঝুড়ি বোঝাই হতে ডাঙ্গায় ঝুড়ি রেখে হাতড়ে হাতড়ে নিজের মাথাটা তুললো—তুলে ধড়ের উপর মাথা চেপে বসিয়ে—জেলের আগের যে মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তি হলো। তখন মাছভরতি ঝুড়ি নিয়ে জেলে ফিরলো বাড়ী।

ছোকরা সব দেখলো—দেখে তার বুক টিপ টিপ করছে! বাপরে, জেলে তো সহজ মানুষ নয়!

সন্ধ্যার সময় জেলেরা খেতে বসেছে ছোকরাও বসেছে—একসঙ্গে খাবে—সকলে খাচ্ছে, হাসি গল্প করছে—ছোকরা কিন্তু কিছু খাচ্ছে না—গুম্ হয়ে বসে আছে।

জেলেরা বললে—খাচ্ছিস না কেন রে? ক্ষিদে নেই?

ছোকরা তখন নিশ্বাস ফেলে সকলকে বললে—

সমুদ্দুরের জেলে কি করে মাথা নামিয়ে কন্দকাটা হয়ে মাছ ধরছিল। সেই গল্প।···

শুনে সকলে আঁৎকে উঠলো। বললে—ভালো কথা নয়—এমন কন্দকাটার সঙ্গে বাস—কবে আমাদের কন্দ কেটে দেবে!

উপায়?

ছোকরা বললে—আমি করবো উপায়, সকলে বললে —কিন্তু কি করে?

ছোকরা বললে—সে আমি ঠিক উপায় করবো'খন!

সকলে বললে—কিন্তু দেরী নয়, যত শীগ্‌গির হয়!

ছোকরা বললে—তাই হবে—কালই আমি···

পরের দিন সকালে ছোকরা আবার চললো সেই জেলের পিছু পিছু···লম্বা ঘাসের জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে—

সমুদ্দুরের ধারে গিয়ে জেলে ডাঙ্গায় ঝুড়ি রাখলো—ধড় থেকে মাথা খুলে রাখলো—রেখে জলে নামলো—জলে নেমে সেদিনকার মতো তেমনি মাছ ধরা।

মাছ ধরে ডাঙ্গায় উঠে ধড় থেকে ঝুড়িতে মাছ ফেলে হাতড়ে মাথা খোঁজে—মাথা আর পায় না! এধারে হাতড়ায়, ওধারে হাতড়ায়—মাথা পায় না! শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে হাতড়াতে লাগলো, তবু মাথা পায় না। মাথাটা ছোকরা সরিয়ে ফেলেছে, বেচারী তো তা জানে না।

হাতড়ে মাথা খুঁজতে বেচারী ঘেমে একশা—মাথা মিললো না। তখন সে আবার ফিরে জলে নামলো··· নেমে জলে দিলে ডুব। যেমন জলে ডুব দেওয়া—মস্ত মাছ হয়ে জলে কোথায় গেল তলিয়ে···ছোকরা ঘাসের আড়ালে বসে বসে দেখলে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছোকরা সমুদ্দুরের ধারে বসে রইলো—কি হয় দেখবে বলে—কিন্তু জেলে আর এলো না! ছোকরা তখন ভয়ে ভয়ে গাঁয়ে ফিরলো। মুখে কথা নেই—কেমন ভয় ভয় ভাব—সকলে বলে—কি হলো রে? ছোকরা তবু কথা কয় না।

সে রাত্রে ছোকরার মুখে কথা ফুটলো না। সকলে ভাবলো, ছোকরাকে ভূতে পেলে নাকি? সে রাত্রি কারো চোখে ঘুম নেই—ছোকরাকে ঘিরে আগলে বসে সকলের রাত কাটলো।

সকালে আলো ফুটতে ছোকরা বললে ব্যাপার···

শুনে সকলে একেবারে থ। অনেকক্ষণ পরে সকলে নিশ্বাস ফেললো, নিশ্বাস ফেলে বললে—যাক—আপদ বিদায় হয়েছে তো—এখন বাঁচোয়া। ছোকরার মন কিন্তু কেমন হয়ে আছে···সে হাসে না, কারো সঙ্গে কথা কয় না, একা চুপচাপ থাকে—

তারপর একদিন একদিন করে এক মাস গেল কেটে—তখন ছোকরা এক সকালে উঠে এলো সমুদ্দুরের ধারে—যেখানে সেই জেলে আসতো মাছ ধরতে। এসে ডাঙ্গায় খুঁজতে লাগলো, সেই জেলের মাথা।

মাথা পাওয়া গেল না—যেখানে ছোকরা মাথা রেখেছিল···দেখে, সেখানে তাল গাছের মতো সিরিঙ্গি লম্বা একটা গাছ উঠেছে—গাছের ডালপালা নেই—মাথার কাছে একরাশ পাতা—আর গাছের গলায় ঝুলছে বড় বড় কতকগুলো ফল।

কি ফল? সকলকে ছোকরা খবর দিলে। খবর শুনে সকলে এলো—এসে অনেক কষ্টে কটা ফল পাড়লো।

ভয়ানক শক্ত ফল—যেন পাথর! কষ্টে ফলটা ভেঙ্গে দেখে ভিতরে জল—আবার ফলের নরম শাঁস!

এ ফল খেতে কেমন—সকলের যেমন হচ্ছে লোভ, তেমনি ভয়—অজানা ফল—জেলের মাথা থেকে গাছ বেরিয়েছে—সেই গাছের ফল। কে জানে হয়তো বিষ—খেলেই মরে যাবে।

মেয়েরা কিন্তু ছাড়লো না। তারা বললে—খেতেই হবে। খেয়ে মরি যদি, তবু ভাববো, নতুন ফল না-খেয়ে মরিনি।

দুজন মেয়ে খেলো ফলের ভিতরকার জল আর শাঁস। খেয়ে তারা বললে, কী চমৎকার গো! এমন জল কুয়ায় নেই—সমুদ্দুরে নেই—কি মিষ্টি···আহা! আর শাঁস··· এর কাছে কোথায় লাগে ননী ছানা!

—বটে! বটে!

জেলেরা তখন বাকি ফলগুলো পাড়লো···পেড়ে ফলের জল খেয়ে শাঁস খেয়ে কি সকলে খুশী! বলে—মরে

লোকটা এত ভালো জিনিষ দিয়ে গেল আমাদের—ভগবান তার ভালো করুন !

সেদিন থেকে হলো পৃথিবীতে নারিকেলের জন্ম।

বুদ্ধির জয়

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

মনীষী ঈসপ্‌ পশুপক্ষীদের নিয়ে বহু মজার মজার গল্প রচনা করে তোমাদের উপহার দিয়েছেন। সে-সব গল্প প'ড়ে তোমরা একই সঙ্গে শিক্ষা এবং আনন্দ দুই-ই পেয়েছ।… আমাদের দেশের প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতেও অনুরূপ অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু আমরা আমাদের ঘরের জিনিষের সন্ধান বড় একটা রাখি না।…এখানে যে গল্পটি ব'লছি, এটি মহাভারতের আদি পর্ব্বেই আছে। গল্পটি পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে—আমাদের দেশের পুরাণ-কারেরাও ঈসপের মত কেমন সুন্দর সব গল্প তোমাদের জন্য লিখে রেখে গিয়েছেন।

কেমন করে বলবান অপর পক্ষকে ছলনায় বঞ্চিত করে—একাই যথাসর্ব্বস্ব ভোগ করতে পারে তারই উদাহরণ দিয়ে গল্পটি বলেছিলেন কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের এক মন্ত্রী 'কণিক'।…তোমরা "কুরু-পাণ্ডবের গল্প" শুনেছ। বলা বাহুল্য শক্তিমান পাণ্ডবদের কৌশলে রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত করে সমগ্র কুরুরাজ্য কৌরবদের অধিকার-ভুক্ত করারই ইঙ্গিত ছিল গল্পটির মধ্যে। যাক, এখন গল্পটাই তোমাদের বলি :

দুর্গম সে বন। অনেকদিন থেকেই সেখানে বাস করতো এক সিংহ, এক বাঘ, আর এক শেয়াল। আর তাদের সঙ্গে এক ইঁদুর, আর এক নেউল।…

পাঁচজনে ভারী ভাব ! সকলে মিলে-মিশে থেকে বেশ মজা করেই দিন কাটাতো।

হঠাৎ একদিন তারা দেখলে, খানিকটা দূরে বেশ নধর চেহারার মোটাসোটা একটা হরিণ চরছে।…দেখেই তো তাদের জিভে জল সরতে লাগলো। বাঘ সিংহ আর লোভ সামলাতে না পেরে দু'জনেই ছুটলো হরিণটাকে ধরতে।…কিন্তু হরিণটা তাদের ছুটতে দেখেই চার পা তুলে এমন দৌড় মারলো যে, কার সাধ্য তাকে ধরে !

হরিণটা ছিল বেজায় চালাক—আবার তেমনি হুঁসিয়ার। নরম নরম ঘাসের লোভে সে সেখানে প্রায় রোজই আসতো—আর বাঘ সিংহ তাকে ধরতে ছুটেছে দেখলেই—সেও লাফ মেরে ছুটতো একেবারে যেন হাওয়া।…ব্যাপার দেখে মনে হতো—একটা মজাই যেন পেয়ে গেছে সে। বাঘ-সিংহ অনর্থক খানিকটা হয়রাণ হয়ে ফিরে এসে হাঁপাতে বসতো !

ক'দিন ধরেই এমনি হলো।

বাঘ একদিন মনের দুঃখে শেয়ালকে ব'ললে—"বুঝলে ভাগনে—হরিণটার গায়ে নরম নরম অনেক মাংস আছে !"

শেয়াল উত্তর দিলে—তাতো আছে মামা, কিন্তু ধরতে তো পারছো না। মিছেই আপশোষ।

বাঘ আর কি বলে ? মানে মানে চুপ করে থাকলো।

সিংহেরও যে মনে মনে আপশোষ না হতো, তা নয়। তবে হাজার হোক, সে রাজা।…একটা রাজ-অভিমান তো তার আছে ? কাজেই মুখ ফুটে সে আর কিছু বলতো না।

এদিকে শেয়ালও দিনরাত ভাবতো—কেমন করে হরিণটা ধরা পড়ে !…আহা, অমন নরম নরম মাংস। ধরা পড়লে সে-ও তো কিছু ভাগ পাবে !

ভাবতে ভাবতে শেয়ালের মাথায় হঠাৎ একদিন একটা মতলব এসে গেল। অমনি মহা-উৎসাহে সিংহের কাছে এসে 'হাতযোড়' করে সে বললে—মহারাজ হরিণটা যাতে ধরা পড়ে, এমন একটা উপায় ঠাওরেছি।

"কি ?…কি ?"—সিংহ চোখ বুজে শুয়েছিল ; হরিণটার নামে তড়াক করে সোজা হয়ে বসে ব'ললে—"কি উপায় বলো দেখি ?"—লোভে পশুরাজের চোখ দু'টো চকচক্ করে উঠলো !

শেয়াল বললে—মহারাজ, দেখেছেন তো, হরিণটা চরতে চরতে মাঝে মাঝে ঐ শিশুগাছটার তলায় এসে শোয়। আপনি ইঁদুর ভায়াকে হুকুম করুন—সে এখান থেকে ঐ গাছতলা অবধি মাটির তলা দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ

কেটে ফেলুক। সুড়ংগটার ও-দিকে ছোট মত একটা মুখ থাকবে। তারপর হরিণটা এসে যেই ওখানে শোবে, অমনি ইন্দুর ভায়া সুড়ংগ পথে গিয়ে ও-দিককার মুখ দিয়ে বেরিয়েই আচমকা ওর পায়ের শিরা কেটে দেবে।… ব্যস, তারপর আর কি? শিরা-কাটা পায়ে তো ও আর বেশি ছুটতে পারবে না? এদিক থেকে তখন আপনি কিংবা বাঘা-মামা—

"আবার বাঘা-মামা কেন?"—কট্‌মট্ করে সিংহ চাইলো শেয়ালের দিকে। শেয়াল তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে নিয়ে ব'ললে—"না, না, আপনিই তখন লাফ মেরে ছুটে গিয়ে—"

আর ব'লতে হ'লোনা। ইংগিতটা বুঝতে পেরেই সিংহ কেশর দুলিয়ে একমুখ হেসে বললে—"বাঃ, এ যে বেশ মতলব এঁটেছ হে?…কাজ হাসিল হ'লে তোমাকে বখশিস্ দেওয়া উচিত!"

'সেটা মহারাজের দয়া!'—শেয়াল মাথা নুইয়ে বললে—"মহারাজের দয়াতেই তো বেঁচে আছি!"……

এর পর আর কি?…যে কথা, সেই কাজ। সিংহের আদেশে ইঁদুর দু'তিন দিনের মধ্যেই এক সুড়ংগ কেটে ফেল্‌লে। তার পর সুযোগ মত সুড়ংগ দিয়ে গিয়ে আচমকা হরিণের পায়ের শিরাও দিলে কেটে। বেচারা তো আর এত সব ফন্দির কথা জানতো না!…অন্যদিনের মতই শিশুগাছের তলায় এসে শুয়েছিল। এদিকে সিংহ তো তৈরীই ছিল—সেও কেশর ফুলিয়ে ছুটলো লাফ মেরে। তারপর যা হলো তা তো তোমরা বুঝতেই পারছো।… শিরা-কাটা পায়ে হরিণ আর কত ছুটবে?…খানিকটা না যেতে যেতেই সিংহ সামনের দুই ভীষণ থাবা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ঘাড়ে!

যাক, হরিণটা তো ধরা পড়লো, এখন ভোজের পালা। শেয়াল ভাবলে—এত যে মাথা খাটালুম—তার কি লাভ হলো?…বাঘ-সিঙ্গীর ভাগ দিয়ে থাকবে আর কতটুকু? কোন রকমে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে গোটা হরিণটা কি একাই খাওয়া যায় না?…যেই ভাবা অমনি চট করে তার মাথায় আবার এক মতলব এসে গেল। সে তাড়াতাড়ি সিংহের কাছে এসে ব'ললে—"মহারাজ, আগে আমার একটা নিবেদন আছে?"

"এখন আবার নিবেদন কিসের?"—বাঘ বিরক্ত হয়ে চোখ পাকিয়ে উঠলো—"নাও, নাও, ভাগ কর শীগ্‌গির। ও-সব নিবেদন-টিবেদন পরে হ'বে।"

'আহা শুনিই না হে কথাটা কি?'—বাঘকে মিঠে-কড়া রকমের একটা ধমক দিয়ে সিংহ ব'ললে—'শেয়াল বলে ভাল।…বল হে শেয়াল কি ব'লছিলে?'

'মহারাজ?'—শেয়াল একটু নড়ে-চড়ে বসে চোখে মুখে বেশ একটা গদ্‌গদ ভাব ফুটিয়ে ব'ললে—পাঁজিতে না-কি আজ খুবই একটা শুভ দিনের কথা লেখা আছে। আজ নাকি 'চান' না ক'রে খাওয়া মহাপাপ! মানুষেরা তাই আজ আগে চান করে—বাপ-ঠাকুরদা'র নামে জল দিয়ে—তবে নিজেদের মুখে জল দেবে। তা মহারাজ"—

শেয়ালের মুখের ভাব আরও গদগদ হয়ে উঠ্‌লো—"যে কাজ মানুষের মত জীবও করছে, আমরা পশু হ'য়েও তা যদি না করি—তবে আমাদের পশুজীবনেই ধিক্! মানুষের লেখা বইগুলো সব খুলে দেখুন মহারাজ—ওরা আমাদের কথা নিয়ে কত গল্পকাহিনী রচনা করে ওদের ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে।…আমাদের আদর্শে গড়ে না তুললে ওদের ছেলেরা কি আর মানুষ হ'তো? ওদের মধ্যে কেউ জাঁদরেল হ'য়ে উঠ্‌লে তো ওরা তাকে মহারাজেরই সঙ্গে তুলনা করে। বলে—নরসিংহ—নরকেশরী—এবং এমনি আরও কত কি? তাই বলছিলাম মহারাজ—"

"বল, বল। থামলে কেন?"—নিজের গৌরবের কথায় সিংহ একেবারে ফেঁপে উঠ্‌লো। শেয়াল বললে, —"খাওয়া তো রোজই আছে—তবে কি-না আজকের দিনে মানুষও যখন চান না করে—"

"ঠিক, ঠিক!"—কথা শেষ না হতেই সিংহ ব'লে উঠ্‌লো—"আমরাও আজ চান না করে খাবো না। চলো হে চল সব, আগে চান করেই আসি। এসো হে শেয়াল, তুমিও এসো।"

শেয়াল পরম হিতৈষীর মত মুখ করে বললে—"সবাই এক সংগে গেলে হরিণটাকে আগলাবে কে মহারাজ?… তা' যান, যান, আপনারাই চান ক'রে এসে আগে খেয়ে নিন্।…আমার না হয় একটু বেলাই হবে। পাঁচজনার

কাজে অমন হয়ই। আমি বরং এই ফাঁকে যার যেমন—তেমনি ভাগ করে রাখি।"

খোদ রাজাই যখন শেয়ালের চালাকিতে ভুলে গেল—তখন আর সকলে কি-ই বা করে? সিংহের পিছু পিছু ইঁদুর এবং নেউলের তো কথাই নেই—বাঘও মনে মনে গজ্ গজ্ করতে করতে চান করতে গেল নদীতে। শেয়াল এবার একলা বসে বসে মনে মনে নানা মতলব ভাঁজতে লাগলো।···

সকলের আগে সিংহ চান করে এসে দেখে—শেয়াল মহাদুঃখে মুখ কালি করে বসে আছে। মনে মনে সে যেন কত আঘাতই না পেয়েছে!···সিংহ কিছু বুঝতে না পেরে শেয়ালকে জিগ্‌গেস করলে—"কি হ'লো কি শেয়াল? অত মুখ শুকনো ক'রে ব'সে কেন? কই, মাংসও তো ভাগ করনি!"

"আর ভাগ করবো মহারাজ!"—মনের দুঃখে শেয়াল যেন আর ভাল করে কথা কইতেও পারছে না। কত না খেদেই যেন সে বললে—"ছোট মুখে বড় কথা—কে সইতে পারে বলুন?···এ পাপ মাংস আপনার মুখে তুলে দিই বা কি করে? চান করতে যেতে যেতে ইঁদুর চুপি চুপি নেউলকে কি বলছিল জানেন মহারাজ?—বলে—সিংহের মুরোদ কত তা' দেখা গেছে!···আমার দয়াতেই আজ এমন ভোজ কপালে জুটলো! নইলে—"

"কি—কি ব'ললে?"—পশুরাজের চোথ কপালে উঠ্‌লো,—"এই এতটুকু একটা পুচ্‌কে ইঁদুর কি-না অত বড় কথা বলে!···জীবনে এমন কত শত হরিণ মেরেই না পেটে পূরেছি!···থাক্, ও-মাংস আমি আর ছোঁবও না। এখুনি আর-একটা হরিণ মার্‌বো, তবে খাবো।"—বলেই মহা-অভিমানে মহারাজ সেখান হ'তে চলে গেলেন।

শেয়াল মনে মনে খুব একচোট হেসে নিলে। তারপর চোখে-মুখে দারুণ ভয়ের ভাব ফুটিয়ে বসে থাকলো চুপ করে।···এমন সময় বাঘও এলো চান করে। এসেই শেয়ালের চোখে মুখে ভয়ের ভাব দেখে সে থমকে দাঁড়ালো: "কি হলো ভাগ্‌নে?"—এদিক সেদিক একবার চেয়ে নিয়ে সে ব'ললে—"ভয় পেয়েছ নাকি? কেন? কই, মাংসও ভাগ করনি। কি হয়েছে কি বলো তো?"

শেয়াল কাঁদ কাঁদ সুরে বললে—"কি আর বলি মামা? ব'লতেও বারণ—আর না-বলেও পারি না। যতই হোক, তুমি মামা। একটা নাড়ীর টান তো আছে? তোমার নামে পথে কে-যে কি ব'লে দিয়েছে মামা—মহারাজ তো রেগেই আগুন!···এসেই ব'ললে—থামো, আগে বাঘ আসুক। আজ তারই একদিন—কি আমারই একদিন! হরিণের মাংস চুলোয় যাক—আগে তারই ঘাড় ভাঙবো! ওঃ সে যে কি রাগ মামা—যদি দেখতে তো বুঝতে! এই —একটু এগিয়ে গেছে তোমারই খোঁজে। এসে পড়লো ব'লে। তা' মামা—"

মামার আর ভাগনের কথা শেষ অবধি শোনার সাহস হলো না। কি জানি বাবা, হঠাৎ মহারাজ হয়ত এসেই পড়বেন ঘাড়ে। হরিণের মাংস মাথায় থাক বাবা—জানটা তো বাঁচুক!—ভয়ে ভয়ে এদিক-সেদিক চাইতে চাইতে বাঘও সেখান থেকে সরে পড়লো।

শেয়াল এবার গোঁফে তা দিয়ে মনের সুখে শীষ্ দিতে লাগলো। বাঘ-সিংহকেই ছিল তার ভয়। সে-ফাঁড়া কেটে গেছে। আর তাকে ঠেকায় কে?

এবার এলো ইঁদুর। তাকে দেখেই শেয়াল বললে,—"এসো ভাই এসো! দেখো ত একবার নেউলের কাজ?···হঠাৎ তার কি-না একটা সাপের সংগেই মিতালী হয়ে গেছে। অথচ জানো তো—দুজনের চির-বিবাদ? 'নাম-নাম' চান সেরে ফিরে এসেই বলে কি জান?···বলে,—ইঁদুরের ভাগটা আমার এই নতুন মিতে সাপকে দাও। আমি যেই ব'লেছি—তা কি হয়?···অমনি ছুঁচলো মুখে সে কি বকবকানি!···সাপকে নিয়ে ছুটলো তোমারই খোঁজে। আগে নাকি তোমার মাংসেই মিতেকে জলযোগ করাবে, তারপর হরিণের মাংস তো আছেই। তা' ভাই—"

ভাইয়ের ধড়ে তখন যেন আর প্রাণ নেই।···শেয়ালের কথা শুন্‌তে-শুন্‌তেই বেচারা ইঁদুরের চোখ মুখ ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে!···কাজ নেই বাবা আর হরিণের মাংস খেয়ে; শেষকালে কি আবার সাপের পেটে যেতে

হবে? ভাবতে ভাবতে ছুটে গিয়ে—সে যে কোথায় কোন্ গর্ত্তে লুকিয়ে পড়লো—তা সেই জানে।

সকলের শেষে এল নেউল। তাকে দেখেই শেয়াল তাল ঠুকে বললে—"এসো ভাই, তোমারই অপেক্ষা করছি!—ফাঁকি আমি কারুকে দিতে চাইনে। নইলে অনেক আগেই ভোজ সুরু করতে পারতাম। কিন্তু জানোই ত "জোর যার মুলুক তার"—এ ডাক পুরুষের বচন। বাঘ, সিঙ্গী সকলে আমার কাছে হার মেনে ভোজের আশা ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে। এখন তুমি আর আমি। তুমি যদি লড়াইয়ে আমাকে হারাতে পারো—আমি কথা দিচ্ছি—গোটা হরিণটাই তোমার।" বলতে বলতে সে গোঁফে চাড়া দিয়ে—লেজ ফুলিয়ে এগিয়ে এল নেউলের দিকে।

বেচারা নেউল একে নিরীহ—তায় শেয়ালের চেয়ে বলেও কম। ধূর্ত্ত শেয়াল যে কোন চালাকি করে সকলকে ভাগিয়েছে—এ তার বুঝতে বাকী থাকলো না।…কিন্তু উপায় তো কিছু নেই! বেগতিক বুঝে সে বেচারীও ধীরে ধীরে সরে পড়লো সেখান থেকে।

তারপর?…তারপর তো তোমরা বুঝতেই পারছো, শেয়াল মজা করেই ভোজ সুরু করে দিলে! বাঘ-সিংহের মত বলবান জন্তুও তার বুদ্ধির কাছে হেরে গেল।

(পূর্বানুবৃত্তি)

—দশ—

সময়টা মোটামুটি জানা আছে, কোন সময়ে ট্রেন শিয়ালদহ পৌঁছবে, স্টেশন থেকে ট্রামে বাসে কতক্ষণ লাগতে পারে। সরমা এতক্ষণ রান্নাঘরের কাজকর্মে ছিলেন। কিন্তু উৎকণ্ঠায় ঘরের মধ্যে থাকা যায় না, ঘন ঘন বাইরে আসেন, রাস্তার দরজা খুলে গলির মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন বারংবার। ইরাকে বলেন, ক'টা বাজল রে?

ইরা হেসে বলে, ঘড়ি দেখাদেখির কি আছে মা? এই ট্রেনে যদি আসেন, সন্ধ্যের ভিতর ঠিক এসে পড়বেন।

যেন জানেন না তিনি সেটা। ভাব দেখ মেয়ের! হাতে ঘড়ি বাঁধে—ঘরে গিয়ে ঘড়িটা একবার দেখবে, তাতেও আলস্য। এমন ঘর-বরেও উৎসাহ নেই—কি তার মনের কথা কেবা জানে! টাইমপিস আছে দোতলার তপোবনে, রাগ করে সরমা থরথর করে উপরে চললেন।

গোটা দুই-তিন সিঁড়ি উঠেছেন, ঠুনঠুন করে দোর-গোড়ায় রিক্সা থামল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের গলা, ওরে ইরা—

ছাঁৎ করে উঠল সরমার বুকের ভিতর। রিক্সা করে আসতে হল, অসুখ-বিসুখ করে নি তো? কোনদিন কোথাও যান না, শরীর অপটু, দুবেলা দুটি দুটি পাখীর আহার করেন—সেই মানুষ ধাপধাড়া জায়গায় গেলেন, সরমা 'না' বলতে পারলেন না মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে।

বিশ্বেশ্বর বললেন, দুয়োর খোল গো—

ততক্ষণে কিশোরীবালা দুয়োর খুলে দিয়েছে। সরমা তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালেন।

খবর কি?

ভাল খবর।

উল্লাসে বিশ্বেশ্বর যেন মাটির উপর পা রেখে হাঁটছেন না, আকাশে উড়ছেন। সরমাও খুশি হয়ে বললেন, কার্যসিদ্ধি হয়েছে তা হলে?

সিদ্ধি মানে? এতখানি আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

গলির উপর অদূরে রিক্সা দাঁড়িয়ে। রিক্সাওয়ালা বলে ওঠে, আমায় বাবু ছেড়ে দিন—

তখন ঠাহর হল, রিক্সায় মানুষ আসেনি, এসেছে বিস্তর পোঁটলাপুঁটলি। পঞ্চানন নামিয়ে নামিয়ে সেগুলো দরজার চাতালে জড় করছে।

কিশোরীবালা সকৌতুকে বলে, অত সব কি এলো কুটুম্ববাড়ি থেকে? বিয়ে না হতে তত্ত্বতালাস?

সরমা বলেন, কি রকম কি সাব্যস্ত হল, দু-চার কথা বলো দিকি শুনি?

বিশ্বেশ্বর একনজরে ঐ বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলছি। ঠাণ্ডা হয়ে বসে সমস্ত বলব। শোনাবার মতোই ব্যাপার বটে—

সহসা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, ফেলে দিলে পঞ্চানন? ছি—ছি, রাস্তার ধুলোয় পড়ে গেল! তোমার দ্বারা হবে না, তোমার নিষ্ঠা নেই—সরো।

একটা পুঁটলি পঞ্চাননের হাত ফসকে পড়েছিল, বিশ্বেশ্বর ছুটে এসেছেন। সন্তান মাটিতে পড়লে যেমন করে, তেমনি ব্যাকুলতায় দু-হাতে পুঁটলিটা তুলে ধরে তিনি ধুলো ঝাড়ছেন। রোষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন পঞ্চাননের দিকে।

সরে যাও।

পঞ্চানন বেকুব হয়ে বলে, এত বোঝা আপনি দোতলায় তুলবেন কেমন করে? আর পড়বে না, দুটো-তিনটে করে নেবো না, খুব সামাল হয়ে একটা একটা করে নিয়ে যাব।

বাসন্তীকে বাড়ী থাকতে হোলো
মেলায়
নীনা ! বাসন্তী কই !
দেখি বাসন্তীর বাড়ী গিয়ে
বাসন্তী ! বাড়ী বসে করছিস্ কী !
মেলায় যাই কী করে ভাই ! আমার কাপড় যে বড্ড ছিঁড়ে গেছে।
বুঝেছি ! এ বিষয়ে তোর সঙ্গে কথা কইবো ভেবেছিলুম ...
কাপড় কাচবার সময় ওগুলোকে আছড়াস্ নাকি বাসন্তী ?
অবশ্যই ! পরিষ্কার করে কাচতে গেলে এ ছাড়া আর অন্য উপায় কই ?
সানলাইট সাবান ব্যবহার করে দেখ - যা আমি করি ! দেখ্‌বি আর আছড়ে কাচার দরকার হবে না। আছড়ে কাচলে কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায় আর তাতেই তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে দেখানো হয়েছে)
দেখ, সানলাইটে কী পরিষ্কার করে আমার কাপড় কাচা হ'য়েছে।
আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো
সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা বিনা আছাড়ে কাপড় সাদা আর ঝকঝকে করে কাচে। এখন আমার কাপড়-চোপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমার পয়সা বাঁচিয়েছে।
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
ভারতে প্রস্তুত
S. 286-X52 BG
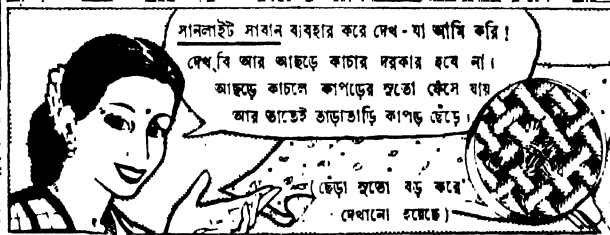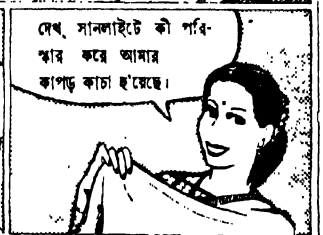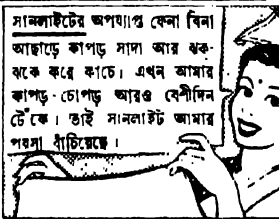
না, অত বড় অপরাধের ক্ষমা নেই। পঞ্চাননকে ঘেঁসতে দিলেন না। বিশ্বেশ্বর সিঁড়ি ভেঙে কাগজপত্র একাই তপোবন-ঘরে তুলে ফেলছেন।

তখন ইরাবতী হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ে, এই কষ্ট করে এলে, আবার এখন উপর-নিচে করতে হবে না—

পঞ্চাননের সঙ্গে যে মেজাজ চলে, মেয়ের উপর তা চলবে না। নরম হয়ে বললেন, কি জিনিষ জানিস নে তো! বলি, হীরেমুক্তো বয়ে নিতে কষ্ট হয় বুঝি? তবে মেয়েলোকে অত গয়না পরে ঘোরে কেমন করে?

হেসে উঠলেন তিনি। কিন্তু ভবী তাতে ভোলে না। কাগজের বোঝা কেড়ে নিল বাপের হাত থেকে। বলে, সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ বাবা, তোমার হীরে-মুক্তোর এক কণিকা খোয়া যাবে না।

এইটুকুতেই বুড়ো মানুষ হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তা ছাড়া এ সব ব্যাপারে দ্বিতীয় ব্যক্তি কারও উপর যদি আস্থা করা যায়, সে ঐ ইরাবতী। পঞ্চাননটার মতন হাঁদারাম নয়। অতএব দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বেশ্বর, ইরাই তুলছে সমস্ত। তাকে কে ঠেকাবে?

সরমা কাছে এসে আবার সেই কথা তুললেন। শুভকর্ম কোন লাগাত হতে পারে, তার কিছু ঠিকঠাক হল? দিতেথুতে হবে কি?

বিশ্বেশ্বর প্রমাদ গণেন। মুখের হাসি নিমেষের মধ্যে মুছে গেল। তাই তো!

সরমা কঠিন হলেন, মেয়ের বিয়ের কথা হয় নি বুঝি কিছুই?

বিশ্বেশ্বর আমতা আমতা করেন, হয়েছে বই কি! পঞ্চানন ছিল, সে কাজ ভোলবার ছেলে নয়। কথাবার্তা অনেক হয়েছে।

বলতে বলতে পঞ্চাননের উপর হাঁক দিয়ে ওঠেন, চুপচাপ আছ কেন? আচ্ছা মানুষ! এরা ব্যস্ত হয়ে আছে, বলে ফেল সমস্ত।

সরমা বলেন, কথাবার্তা বুঝি পঞ্চাননই বলেছে, মেয়ের বাপ তোমার কিছু চাড় নেই?

আমি ফুরসৎ পেলাম কখন? কাগজ বাছাবাছিতে সময় চলে গেল। তা-ও কি হয়েছে, গন্ধমাদন তাই এদ্দূর ঠেলে নিয়ে আসতে হল। ধীরে সুস্থে এখানে বসে করব।

বলতে বলতে বিশ্বেশ্বর চটে উঠলেন, বৃষ্টির ছাট আসে—সেই জায়গায় সিন্দুক রেখে দিয়েছে। কত কি বরবাদ হয়ে গেছে, ঠিক কি! ওদের মতন বোকা আছে দুনিয়ার উপর! উঁহু, বোকা বললে হয় না, কি বলো পঞ্চানন! সর্বনেশে লোক। খুনীর বেহদ্দ। কাগজপত্র যা নষ্ট করেছে, ফাঁসিতে লটকালেও রাগের শেষ যায় না—

সরমা গর্জন করে ওঠেন, পচা কাগজের আগুিল উনুনে দেবো আজকে আমি—

পঞ্চানন তাড়াতাড়ি প্রবোধ দেয়, রাগ করেন কেন মাসিমা। সে এক এলাহি কাণ্ড, মস্ত বড় ব্যাপার—বিস্তর মানুষের ভিড়। তার মধ্যে বেশি কথাবার্তার সময় কখন? আমি প্রস্তাব তুলেছি। সমস্ত শুনে মোটের উপর ডাক্তারবাবু 'হাঁ'-ই বললেন। বলেন, ভালই তো! অর্থাৎ নিমরাজি আছেন, মেয়ে দেখে পুরোপুরি মত দেবেন। ছেলের মা-ও আমায় আলাদা করে সেই কথা বললেন, বিষম রাশভারি মানুষ—ছেলের পছন্দে অমনি যে ঘাড় নেড়ে বসবেন তেমন মানুষ অম্বুজ ডাক্তার নন। আমিও ছাড়ন-পাত্র নই। আপনাকে বলে রাখছি মাসিমা, এই মাসের ভিতরে ডাক্তারকে টেনেটুনে এনে মেয়ে দেখিয়ে লগ্নপত্তোর করিয়ে তবে ছাড়ব।

খাঁটি ছেলে পঞ্চানন, ফাঁকিবাজি জানে না। যে কথা বলল, ঠিক তাই। উঠে পড়ে লেগেছে অম্বুজাক্ষকে এনে মেয়ে দেখানোর জন্য। বের করা মুশকিল তাঁকে। অহরহ লোকের ভিড়। রোগীরা তো আছেই, তার উপর ইলেকশন যত এগিয়ে আসছে হিতাকাঙ্ক্ষীর দল তত বৈঠকখানা জমিয়ে বসছে। দিনরাত্রি শলাপরামর্শ। করপোরেশনের ব্যাপারে ভরাডুবি হয়ে গেল, এবারে সকলে কোমর বেঁধে লাগছেন—পার ওঁরা করাবেনই। কোন পার্টি থেকে দাঁড়াতে চান, অবিলম্বে তার তোড়জোড় শুরু করে দিতে হবে। এমনি দেরি হয়ে গেছে। যাদের এ মতলব, চার-পাঁচ মাস, এমন কি চার-পাঁচ বছর আগে থেকেও কেউ কেউ পথ তৈরি করে। মাথায় খদ্দরের টুপি চড়ায়, কিম্বা মোটরগাড়ি পুত্র-পরিবারকে দান করে পায়ে হেঁটে বস্তিবাসীর সেবায় নেমে যায়। দেশ স্বাধীন, দেশের কাজ মানে মারধোর আর জেল-

দ্বীপান্তর নয়—হেঁ-হেঁ, মজা আছে। ভিড়ও তাই অঢেল। অমুক পার্টি থেকে দাঁড়াব বললেই তারা অমনি গদগদ হয়ে টিকিট হাতে এগিয়ে আসবে না। টিকিট যোগাড় করাই এক ধুন্দুমার ব্যাপার, আসন্ন ইলেকসনের পূর্ববর্তী আর এক ইলেকসন। অম্বুজাক্ষ সেই কর্মে আপাতত বিশেষরূপে ব্যস্ত। রোগীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছটফট করছে, বেরিয়ে এসে ডাক্তারবাবুর একনজর দেখবার সময় হয় না। রোগী মারা যাচ্ছে, তবু না।

কিন্তু পঞ্চানন নাছোড়বান্দা। বার তিনেক ইতিমধ্যে হানা দিয়ে পড়েছে।

মেয়ে দেখতে যাবেন, তার কি হল ?

যাবো, যাবো—

বলেন তো ঐ রকম। কবে যাচ্ছেন, ঠিক করে বলে দিন।

এনগেজমেণ্ট-বইয়ের কয়েকটা পাতা উল্টে ক্ষণকাল চিন্তার ভাণ করে অম্বুজাক্ষ বললেন, মঙ্গলবারে—

সামনের এই মঙ্গলবারে তো ?

পঞ্চাননের কথায় খেয়াল হল, একবার ঘাড় নেড়ে দিলে আরও তো দিন সাতেক হাতে পাওয়া যায়। বললেন, ওরে বাস রে! এ মঙ্গলবারে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই। এই মঙ্গলের পরের মঙ্গলবার।

বেশ, এই মঙ্গলের পরের মঙ্গলে—তারিখটা হল ষোলই। আমি এসে নিয়ে যাবো।

পঞ্চাননটা এমনি, যেন ছিনেজোঁক। নিজের খাতায় তারিখ টুকে নিল। অম্বুজাক্ষকে বলে, আপনিও লিখে নিন ডাক্তারবাবু। নয়তো—নানা কাজের মানুষ—মনে থাকবে না। এই তিনটে নাগাদ চলে আসব আমি।

অম্বুজাক্ষও লিখে নিলেন। যাবেন বলে নয়। ঐ সময়টা রোগি দেখা বা অন্য কোন ছুতোয় বেরিয়ে পড়বেন। পঞ্চানন এসে ধরা না পায়। পঞ্চানন না হয়ে বিশ্বেশ্বর নিজে যদি আসতেন স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেওয়া যেত, না মশায়, মাথায় আগুন জ্বলছে—বিয়েথাওয়ার কথা এখন ধামা-চাপা থাকুক। কিন্তু পঞ্চানন হল 'যুগচক্রের' মানুষ—'যুগচক্র' ভেল্কি দেখিয়েছে কর্পোরেশন-ইলেকশনের সময়ে। এবারে ওদের তোয়াজ করে যেতে হবে কাজ ফতে না হওয়া অবধি। আর ওরা বলে কথা কি—কাগজের লোক মাত্রই গুরুঠাকুরের মতন এসময়টা। তা বলে পাকা-কথাও দেবার জো নেই, টালবাহানা করতে হচ্ছে। বিশেষ এক কারণ আছে, হিতৈষীবর্গ খাসা এক মতলব দিয়েছেন। মতলবটা অনেক দিনের—করপোরেশনের সময় লাগে নি, এবারে লেগে যাবে মনে হচ্ছে।

সেইটে প্রকাশ হয়ে পড়ল। অরুণকে একদিন ডেকে বললেন, বিকালবেলা পাত্রী দেখতে যাবে তুমি। আজকেই। আমি কথা দিয়ে এসেছি।

অম্বুজাক্ষ নিজ মুখে ছেলেকে পাত্রী দেখবার জন্য বলছেন। সুহাসিনী সেখানে ছিলেন, মুখ টিপে হাসলেন তিনি। সুনন্দার সম্বন্ধ ভেঙে দেবার সময়ও ছেলের মতামতের কথা তুলেছিলেন বটে! আত্মীয়-বন্ধুর ছেলেমেয়ের ব্যাপারে লম্বা লম্বা বচন ঝাড়া হয়—কচিকাঁচা ওরা সংসারধর্মের কি বোঝে, বিয়েথাওয়ার কাজে ওরা কি বলবে, আর বললেই বা শুনছে কে? প্রবীণ অভিভাবকেরা শুভাশুভ বিবেচনা করে যা ঠিক করবেন, ঘাড় হেঁট করে সেই নামে মন্ত্র পড়ে যাবে। ব্যস! সেই মানুষ, দেখ, নিজের ছেলেকে কনে পছন্দ করে আসতে বলছেন।

মুখ টিপে হেসে সুহাসিনী বলেন, তাই যাস। আগে দেখে থাকিস তো সে হল ভাসা-ভাসা দেখা। এবারে বেশ খুঁটিয়ে দেখে আয়। একা যেতে না চাস তো দু-একটি বন্ধুবান্ধব নিয়ে যাস সঙ্গে করে।

স্ত্রীর হাসির অর্থ অম্বুজাক্ষ বুঝলেন। বলেন, কেউ যদি যেতে চায়, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো। কন্যাপক্ষের আপত্তি নেই। মোদ্দা, তোমার নিজের যাওয়া চাই—বকলমে চলবে না। পাত্রীর মা নিজের চোখে একটু দেখে নিতে চেয়েছেন। বাতে পঙ্গু, চলতে ফিরতে পারেন না, তোমাকেই তাই যেতে হবে। আমিও বলে এসেছি তাই।

সুহাসিনী বলেন, দেখাদেখি কবে হয়ে গেছে। পাত্রীর মা কতবার দেখেছেন ওকে।

তাই নাকি? আমি কিছু জানি নে—

জানো তুমি, খেয়াল নেই। তোমার কথা মতোই তো খুঁজে খুঁজে বিশ্বেশ্বর সরকার মশায়ের বাড়ি বের করল।

অম্বুজাক্ষ ভ্রূকুটি করেন, সরকার মশায়ের মেয়ে দেখাবার জন্য পঞ্চানন ছোঁড়া আমায় তো অস্থির করে

মারছে। সে মেয়ে ওর পছন্দর? তা দেখব আমি, দেখতেই হবে একবার, পঞ্চাননকে এড়ানো যাবে না। কিন্তু এটি সে নয়, এ হল আমার পছন্দর।

কার মেয়ে? বাড়ি কোথায়?

অম্বুজাক্ষ হেসে বললেন, মেয়ের বাপ হলেন প্রতুল বিশ্বাস। কলকাতা শহরে প্রতুল বিশ্বাসের ঠিকানা বলতে হয় না।

অতিশয়োক্তি নয়। রাজা-মহারাজা নন প্রতুল—তাঁদের অনেক বেশি। রাজা-মহারাজারা তো রাজ্যপাট হারিয়ে ফতুর হয়ে যাচ্ছেন। এঁরা চিরকাল ধরে দেশের কাজ করে এসেছেন, ইদানীং তার দাম উশুল হচ্ছে। স্বাধীন-ভারতের স্বর্গধামে ইন্দ্র-চন্দ্র বায়ু-বরুণদের ভিতর একজন। এ হেন প্রতুল বিশ্বাসের মেয়ে।

সুহাসিনী বললেন, সেবারেও তো কথা উঠেছিল। তারা এগুলো না, কত কি বলেছিল আমাদের সম্বন্ধে।

অম্বুজাক্ষ বললেন, বলেছিল, ইংরেজের জুতো বয়ে বেড়াই আমরা। তখন বলেছিল, আর বলবে না। বর্তে যাবে কাশীশ্বরের বংশে মেয়ে দিতে পারলে। প্রতুল ইংরেজের জেলই খেটেছেন, ইংরেজের গুলি খেয়ে মরেন নি কাশীশ্বরের মতন। আমাদের মতো বড় কুলীন স্বাধীন-ভারতে ক'জন?

রায় দিয়ে অম্বুজাক্ষ চলে গেলেন। তখন অরুণ বোমার মতো ফেটে পড়ল।

কক্ষণো যাবো না। যেতে বয়ে গেছে। আমাদের বংশ ধরে গালি দিয়েছে, জামাই করো বলে দরখাস্ত নিয়ে দাঁড়াবো সে বাড়ি?

সুহাসিনী বলেন, সে তো সকলেই বলত সে আমলে। ভিতরের ব্যাপার জানত না। একলা ওদের কি দোষ?

চিরকালের কলঙ্ক মুছে দিলেন বিশ্বেশ্বর সরকার। তার জন্য কৃতজ্ঞতা নেই? একটা মেয়ে—কন্যাদায়ে মুখ ফুটে তাঁরা সাহায্য চাইলেন—

আবেগে কণ্ঠরোধ হয়। কথা থামিয়ে অরুণাক্ষ চুপ করে গেল।

সুহাসিনী বললেন, তা বেশ তো, সাহায্য করব আমরা। সাহায্য কত রকমের হতে পারে। কন্যাদায় বলে সেই মেয়ে আমাদেরই ঘরে নিয়ে আসতে হবে, এমন কি কথা আছে?

অরুণ রাগ করে বলে, তারা ভিক্ষে চায় না। তেমন পাত্রই নয়। মুখ বেঁকিয়ে দয়া দেখাতে গেলে, সে দান ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

যেতে হল প্রতুল বিশ্বাসের বাড়ি। অম্বুজাক্ষ কথা দিয়ে এসেছেন, গোড়া থেকেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে লাভ কি? মেয়ে দেখাই মানে বিয়ে নয়। তার পরে সে পঞ্চাননের কাছে ছুটে গেল। সে-ই একমাত্র ভরসা এখন। মণিরামপুর যাওয়া এবং ক'দিনের মেলামেশায় ভাবসাব হয়েছে দু'জনের।

তোমার তদ্বির-তাগাদায় কাজ হল না পঞ্চানন। অন্য মেয়ে দেখে এলাম! কি করা যায় এখন বলো।

সমস্ত শুনে পঞ্চানন গুম হয়ে ভাবল একটুখানি। বলে, ব্যাপার বোঝাই যাচ্ছে—পলিটিক্যাল বিয়ে। ঠেকানো বড় মুশকিল, ইলেকসন মুকিয়ে এসেছে।

অরুণাক্ষও বোঝে সেটা। কাতর অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। পঞ্চানন বলতে লাগল, প্রতুল বিশ্বাস পক্ষে থাকলে নমিনেশন পেতে গণ্ডগোল হবে না। আধাআধি কেল্লা ফতে সেখানেই। বোঝা গেল, কানপুরের সম্বন্ধ এই মতলবে ভেঙে দিয়েছিলেন; সরকার মশায়ের কথা ভেবে নয়। আচ্ছা, যাই একবার সম্পাদকের কাছে। তিনি কোন উপায় বাতলান দেখি।

পঞ্চানন কৃতান্তর কাছে পরামর্শ নিতে গেল। কি কারণে বলা যায় না, স্ফূর্তিতে সে উগমগ। পঞ্চানন এমন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছে, তবু তার ভাবান্তর হয় না। পঞ্চানন রাগ করে বলে, হাসি দেখে গা জ্বলে যায়। কি করা যায়, ভেবে চিন্তে বলো সেইটে। সরকার মশায়কে নিয়ে নয়—ইরার মা'কে কি জবাব দেবো ভেবে পাইনে। ও বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াই। অম্বুজ ডাক্তার মঙ্গলবারে যাবেন বলেছেন। যান তো তাঁর সঙ্গেই যাবো, তার আগে নয়।

কৃতান্ত বলে, যাবে না। বুঝতে পারো না, এরপরে কি করতে যাবে? তুমি সোজাসুজি ঢুকে পড়োগে এবার। কন্যাদায় নিয়ে কথা। টোপর মাথায় চাপিয়ে নিজেই ছাতনাতলায় বসে পড়ো। পরের খোশামোদের গরজ কি?

পঞ্চানন বলে, তোমার ঠাট্টার কালাকাল নেই—

ঠাট্টা? চোখ বড় বড় করে কৃতান্ত বলে, ঠাট্টা করব, আমাদের দাদার ব্যাপার নিয়ে? টাকার লেন-দেনের মাপে হাতের কলম সিধে-উল্টো করি বটে—কিন্তু বিশ্বাস করো না করো—ডান হাত ছাড়াও মন বলে এক পদার্থ আছে, সেখানে ভালবাসা আছে কৃতজ্ঞতা আছে। তোমায় চিনতে জানতে এতটুকু বাকি নেই, ইরাবতীকে তুমি অপছন্দ করো না। তাই তো বলছি, সর্বাংশে তুমি উপযুক্ত পাত্র।

পঞ্চানন বলে, উপযুক্ত তাতে সন্দেহ কি? মেসের ক'টা টাকা মাসে মাসে শুধতে পারি নে। আর কাগজের যা অবস্থা—ওটা ওঠে গেলে সোজা রাজপথে নেমে দাঁড়াবো—

কাগজের জন্য ভাবনা নেই। কাগজ খুব ভাল চলবে এবার থেকে। নতুন মেশিন কেনা হবে, সাইজ মোটা হবে, ছবি যাবে সাত-আটখানা করে—

বলো কি, গুপ্তধন পেয়ে গেলে কোথা?

কৃতান্ত হেসে বলে, ব্যাপার তাই বটে! অম্বুজ ডাক্তার টাকা দেবে। যত টাকা দরকার, দেবে তাই।

খুশি হয়ে পঞ্চানন বলল, এবারে তবে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে পড়লে? কথাবার্তা হয়ে গেছে সমস্ত।

কথাবার্তার কি আছে? ড্রাফট পাচ্ছি একটা—হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের উপর যেমন ড্রাফট থাকে, ভাঙিয়ে নিলেই করকরে টাকা। তেমনি জিনিষ আছে ডাক্তারবাবুর নামে। ক'টা দিন ঝামেলার মধ্যে আছি। তারপরে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করব। ড্রাফট ভাঙিয়ে নগদ টাকা নিয়ে আসব। যুগচক্রের শুধু নয়, সরকার মশায়ের মেয়ের বিয়ের পুরো টাকাও বের হয়ে আসবে।

পঞ্চানন অবাক হয়ে তাকায়। কি মতলব কৃতান্তর মাথায় ঘুরছে, আন্দাজে আসছে না। কেমন এক রহস্যময় ভাব। কৃতান্ত বলবেও না কিছু কাজ হাসিল—না হওয়া পর্যন্ত। সে তখন জোর দিয়ে বলে, টাকা আনো আর যাই করো সাফ জবাব দিয়ে দিচ্ছি আমায় কক্ষণো বর সাজতে বলবে না, অমন কথা মুখে আনবে না। বেকুব হবে।

আচ্ছা, টাকা তো আসুক হাতে। ছেলেছোকরার দুর্ভিক্ষ হয় নি দেশে। টাকা মুঠো ভরে ডাক ছাড়লে কুকুর বিড়ালের মতো কত বর এসে পড়বে! (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

মানুষে বেসেছ ভাল, তাই ত তোমারে ভালবাসি,
মহাপ্রভু ব'লে ডেকে তোমার নিকটে তাই আসি।
শিখায়েছ জীবে জীবে ভাবিবারে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান;
এর চেয়ে মানুষেরে কে দিয়েছে অধিক সম্মান?

পাশবিক শক্তিবলে অসম্ভব পৃথ্বী-প্রাণ-জয়
যদি এ ভুবন ভরি প্রতি জীবে শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণ না হয়।
তোমার এ মহাশিক্ষা আগুন জ্বালালো লাখো প্রাণে,
পুড়ে গেল পাপগ্লানি কণ্ঠে কণ্ঠে অমৃতের গানে।

কি করিবে ধন দম্ভে, রাজপদে, জন্ম-অভিমানে?
প্রাণের তরঙ্গ জাগে একমাত্র প্রেমের আহ্বানে।
তাই চির-পরীক্ষিত:যত শক্তি যেথানে নিষ্ফল
সর্বত্র হয়েছে জয়ী প্রেমপূর্ণ তব আঁখিজল।

শোনাওনি কোনোদিন বাষ্পেভরা শূন্যগর্ভ ভাষা,
দেখায়েছ আচরণে কি করিতে পারে ভালবাসা।

মিথ্যাচার এ জগতে আজ তব বড় প্রয়োজন,
ছলনার অন্ধকারে আবৃত হয়েছে ত্রিভুবন।

সর্বত্র আরাম-সুখ, শান্তি শুধু লয়েছে বিদায়,
উল্লাসের অন্ত নাই, প্রাণ তবু আনন্দ যে চায়,
মানুষ পেয়েছে শক্তি বিজ্ঞানের নব নব বলে,
তবু বলহীন বিশ্ব ভাসিতেছে নয়নের জলে।

বুদ্ধির—দীপ্তিতে-ভরা চাতুর্যের চরম বিকাশে
আসন্ন ধ্বংসের তটে দাঁড়াইয়া নর-নারী হাসে
নাই মানুষের মনে দয়ামায়াপ্রেমের সন্ধান
পশুত্বের পাদপীঠে মনুষ্যত্ব হয় বলিদান।

এস মনুষ্যত্বদাতা, এস এস প্রেম-অবতার,
প্রেমমন্ত্রে যন্ত্র মাঝে কর প্রাণ-শক্তির সঞ্চার।
দাহ-ময় এ মরুতে এনে দাও প্রেমের প্লাবন।
অচৈতন্যে হে চৈতন্য, কর কর মহা-উদ্ধারণ।

শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী—

৩১শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারী উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাজাজী তাঁহার ভাষণে বাংলা সাহিত্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলেন—ইহা সুবিধাবাদী সুলভ প্রশংসামাত্র নহে। সৃজনী-শক্তি-পূর্ণ ও কলাকুশলী বঙ্গদেশের জনগণের মধ্যে কবি-মানসিকতা আছে। বঙ্গদেশে স্বাভাবিক কাব্যপ্রেরণা এক অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি বাঙ্গালী-দের বলেন—আপনাদের ভাষার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নাই। এই ভাষা নিশ্চিতরূপে ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধির সম্ভাবনাপূর্ণ ভাষা। দক্ষিণ ভারতে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। ইহা অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা। শ্রীরাজাগোপালাচারী অভিজ্ঞ ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি—তামিল সাহিত্য-রচনা দ্বারাও যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার আগমনে সম্মিলনের মর্য্যাদাবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে মাদ্রাজ অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৮১ সালে ভাগলপুরে তাঁহার জন্ম। ১৯১২ সালে বি-এল পাস করিয়া তিনি ১২ বৎসর ভাগলপুরে ওকালতি করিয়াছিলেন। তাহার পর বিচিত্রার সম্পাদক হইয়া কলিকাতায় আসেন ও ১২ বৎসর 'বিচিত্রা' সম্পাদনা করেন। বর্তমানে তিনি গল্প-ভারতীর সম্পাদক। উপেন্দ্রবাবু বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি, সাহিত্য সেবক সমিতি প্রভৃতির সভাপতি। তিনি খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক হইয়াও কাব্য রচনা করেন, সঙ্গীত রচনা ও সঙ্গীতের সাধনা করেন। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক। তাঁহার নির্বাচনে বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রকৃত সাধককে সম্মানিত করা হইয়াছে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—

খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, জবরদস্ত পালোয়ান, দক্ষ বংশী-বাদক, লেখক ও শিকারী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এবার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে মাদ্রাজ অধিবেশনে মূল সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর। তাঁহার পিতা উমাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ছিলেন রংপুর তাজহাটের জমীদার। ১৮৯৯ সালে তাঁহার জন্ম—১৯২৮ সাল হইতে এখনও তিনি মাদ্রাজ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আছেন। তিনি দিল্লীর ললিতকলা একাডেমীর সভাপতি। ১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম রচনা গল্প:ভারতী মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র ভাস্কর রায়চৌধুরী খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী। তিনি ভারতবর্ষেরও দীর্ঘ দিনের লেখক ও চিত্রশিল্পী। বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বহুদিন পূর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

মাদ্রাজ ও বাংলা—

গত ৩১শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে সম্মিলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাহাতে প্রাচীন যুগে বাংলার সহিত মাদ্রাজের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহার কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সুদূর অতীতেও বিদেশীর লেখা পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী বা লোহিত সাগরের নৌ-শিক্ষাতে পর্য্যন্ত বাংলার সঙ্গে সোপাৎমা, পদুকে, কামারা (কাবেরী পট্টিনম) অরিকমেদু (পণ্ডিচেরীর কাছে) প্রভৃতি মাদ্রাজী সহরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা উল্লেখ আছে। * * এই মাদ্রাজ সহরের ৪০ মাইলের মধ্যে কাঞ্চীতে এসে বসবাস করেছিলেন, গঙ্গাদেশের দক্ষিণ রাঢ়ের শৈব-চূড়ামণি উমাপতি দেব। * * বাঙ্গালী বৈদিক পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর শম্ভু চোল, মালব আর কাকতীর রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। ওরঙ্গলের রাজা গণপতির কন্যা রুদ্রাম্বার প্রশস্তি গেয়েছেন বিশ্বপর্য্যটক মার্কো পোলো। সেই রাজকন্যা কৃষ্ণার দক্ষিণ তীরে বেলানগপুত্তি নামে একটি গ্রাম বিশ্বেশ্বর শম্ভুকে উৎসর্গ করেন। তিনি সেখানে মন্দির, বিদ্যালয়, মঠ, নারীসেবায়তন, অন্নসত্র ও আরোগ্যশালা স্থাপন করেন। * * দেড় হাজার বছর আগে বাংলার চন্দ্রগোমিন বরেন্দ্রভূমি থেকে দাক্ষিণাত্যে যান। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের চান্দ্রশাখা নামে একটি নূতন বিধি সৃষ্টি করেন। ১১ শত বছর আগেকার ঘটনা আর্য্যধর্মের পুনরুত্থান হচ্ছে বঙ্গ ও দাক্ষিণাত্যের নিবিড় যোগাযোগের ইতিহাস। আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ শঙ্করের গুরুর গুরু অর্থাৎ পরমগুরু শুকদেবের শিষ্য ছিলেন বাংলার গৌড়পাদ। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর গৌড়পাদকারিকা থেকে উদ্ধৃতি দেবার সময় গৌড়পাদকে বেদার্থসম্প্রদায়বিদ্ আচার্য্য বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীযুত দাশ বাংলার সহিত মাদ্রাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে, আজ আবার বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী ভায়েদের একত্রভাবে দেশীয় ভাষার আলোচনা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে উৎসাহিত করিয়াছেন। দেবেশবাবু সুপণ্ডিত ব্যক্তি—কাজেই তাঁহার ভাষণ সেদিক দিয়া যোগ্যই হইয়াছে বলা যায়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মাদ্রাজ অধিবেশনে শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও লেখক। শিশু ও কিশোরদের জন্য তিনি প্রায় ৬০ খানা গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। বিক্রমপুরের ইতিহাস রচনা করিয়া

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...

তিনি বহুকাল পূর্বে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার ১০খণ্ডে লিখিত শিশুভারতী বা শিশু বিশ্বকোষ সর্বজনপ্রশংসিত। ১৮৮৩ সালে তাঁহার জন্ম। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এসিয়াটিক সোসাইটি, রবিবাসর প্রভৃতির সহিত যুক্ত আছেন।

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক—

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মাদ্রাজ অধিবেশনে এবার সঙ্গীত শাখায় সভাপতি হইয়াছিলেন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক। সঙ্গীতকেই তিনি জীবনের একমাত্র সাধনা ও বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আকাশ-বাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই পঙ্কজবাবু তাহার সহিত যুক্ত আছেন। পরে তিনি চলচ্চিত্রে যোগদান করিয়া সঙ্গীত পরিচালকরূপে সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। কলিকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম।

কলিকাতায় কংগ্রেস সভাপতি—

নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীউচ্ছরঙ্গরায় নওলকিশোর ডেবর গত ১লা ও ২রা জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গে সরকারীভাবে ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। রবিবার ভোরে কলিকাতায় পৌঁছিলে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে হাওড়া রেল ষ্টেশন হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তিনি পতাকা উত্তোলন করেন। রবিবার বিকাল ৪টায় কলিকাতা ময়দানে মনুমেন্টের পাদদেশে এক বিরাট জনসভায় তিনি দেড়ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—ভারতে সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য ভারতের প্রতিটি নরনারীকে কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতে হইবে। সভায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ শ্রীডেবরকে এক লক্ষ টাকার একখানি চেক উপহার দেন। পরদিন সোমবার সকাল ৭টায় তিনি মোটরে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যায় বর্দ্ধমান সহরে গমন করেন—পথে উত্তরপাড়া, কোতরং, রিষড়া, শ্রীরামপুর বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, ব্যাণ্ডেল ও বৈঁচিতে তিনি নাগরিক সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করেন। চন্দননগরে তিনি বলেন—ভারতের কম্যুনিষ্টদের সর্বপ্রকার বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তিনি বলেন—বাঙ্গালী জাতি বীরত্ব ও প্রেম—উভয় গুণেরই অধিকারী। হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীশ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে ১৫ হাজার টাকার তোড়া উপহার দেন। শ্রীডেবরকে ১০টি স্থানে সম্বর্দ্ধনার উত্তরে ভাষণ দিতে হইয়াছিল। বর্দ্ধমানে সন্ধ্যায় টাউন হল ময়দানে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইলে তিনি এক ঘণ্টাকাল তথায় বক্তৃতা করেন। তথায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জনাব আবদুল সাত্তার তাঁহাকে ১০ হাজার টাকার এক চেক প্রদান করেন। পথে দেবীপুর, কলসী, রসুলপুর, কাটারপুরী, শক্তিগড়, জটিরাম ও কানাই-নাটশালায় গ্রামবাসীরা শ্রীডেবরকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবস্থা—

গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প সমূহের উন্নতি বিধানের জন্য কেন্দ্রে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া একজন নূতন মন্ত্রীর উপর সে বিভাগের কার্য্য ভার প্রদান করা হইবে স্থির হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য ও বাকী টাকা রাজ্য-সমূহ কর্তৃক পরিকল্পিত শিল্পের জন্য প্রদত্ত হইবে। হস্তচালিত তাঁত শিল্প, খাদি, উদ্ভিজ্জ তৈল (ঘানি), চামড়া, গুড়, খন্দসারী, দেশলাই, (কুটীর শিল্প) ও রেশম শিল্পের জন্য ঐ টাকা ব্যয় করা হইবে, স্থির হইয়াছে। সত্বর এ সকল ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, দেশের বেকার-সমস্যা কতকটা দূরীভূত হইবে, আশা করা যায়।

ভারতের আমদানী নীতি—

৩০শে ডিসেম্বর দিল্লীতে ১৯৫৬ সালের প্রথমার্দ্ধের আমদানী-নীতি ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে মোট আমদানীর শতকরা ১৬ ভাগ যন্ত্রপাতি ও ৫৭ ভাগ শিল্পে ব্যবহার্য্য কাঁচা মাল আমদানী করা হইয়াছে। এই প্রথম ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। আমদানী নীতি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কয়েকটি দ্রব্য সম্বন্ধে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাইবার জন্য দেশে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বোতাম, ছোট ছুরি, বিভিন্ন ধরণের লোহার জিনিষপত্র, তারের জাল, বস্ত্র সংরক্ষণের জিনিষপত্র, বস্ত্র প্রস্তুতে ব্যবহৃত তৈল, কয়েক ধরণের আলকাতরা রং, জলের মিটার, মোজা, কয়েক ধরণের ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, ফ্লোরেসেন্ট আলোর টিউব প্রভৃতির আমদানী বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলকব্জার আমদানী বৃদ্ধি করা হইবে। ইহার ফলে যদি দেশে নূতন নূতন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তবেই দেশ স্থায়ীভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক—

গত ৩১শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীটি-টি-কৃষ্ণমাচারী ঘোষণা করেন—ভারত কোনরূপ সর্তে রুশিয়ার নিকট হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ করিতেছে না—ভারত যে বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহা লেনদেনের ভিত্তিতে খোলাখুলি ব্যবসায়ের ব্যাপার। ভারত কোন গোষ্ঠীভুক্ত হয় নাই। ভারত রাশিয়ার সহিত সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত অধিকতর অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিবে। রুশ-নেতা বুলগানিনের ভারত ভ্রমণের পর একদল রাজনীতিক মিথ্যা প্রচার করিতেছেন—তাঁহাদের উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

কলিকাতা-লণ্ডন রেডিও টেলিফোন—

গত ৩০শে ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূরে হরিণঘাটা হাতিকান্দা নামক স্থানে ৫৫০০ মাইল দূরে লণ্ডনে বৃটীশ মন্ত্রী ডাঃ হিল ও ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সহিত টেলিফোন সংযোগ করিয়া

কথা বলেন। ঐ যন্ত্র স্থাপন করিতে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। হাতিকান্দায় গ্রহণ যন্ত্র ও সেখান হইতে ৫ মাইল দূরে হালিসহরে প্রেরণ যন্ত্র রাখা হইয়াছে। উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উপস্থিত ছিলেন। যোগাযোগ বিভাগের অন্যতম সেক্রেটারী শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারূপে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পুনার নিকট ঐরূপ একটি যন্ত্র আছে—কলিকাতায় দ্বিতীয় কেন্দ্র স্থাপিত হইল। ইহার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য উপকৃত হইবে।

বেতার যন্ত্র ও ব্যাটারী নির্মাণ কেন্দ্র—

গত ৩০শে ডিসেম্বর শুক্রবার বেলা ৩টায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কল্যাণী উপনগরীতে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বেতারযন্ত্র ও ব্যাটারী নির্মাণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তথায় উপস্থিত ছিলেন। ৩০ বিঘা জমির উপর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ২ শত কর্মী তথায় কাজ করিতেছেন। ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য আবাসিক হোস্টেল, ২০টি পরিবার ও ২০ জন কর্মীর বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে। তথায় মাসে ৫০০ করিয়া বেতার যন্ত্র নির্মিত হইবে। প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীগোপিকাবিলাস সেন তথায় সকলকে জানান—ঐ কেন্দ্র হইতে সুলভ গার্হস্থ্য বেতার যন্ত্র বাজারে ছাড়া হইবে। সরকার বহু গ্রামে ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে গ্রাম্য বেতার যন্ত্র সরবরাহ করিবেন, তাহাও তথায় নির্মিত হইবে। গ্রাম্য বেতার যন্ত্র পাইবার জন্য গ্রামবাসী দিগকে প্রথম বৎসরে ১০৭।৵০ ও পরবর্তী বৎসরে ৪৬।৷৵১০ দিতে হইবে। মূল্য, সংরক্ষণ ও লাইসেন্স—সবই ঐ মূল্যের মধ্যে ধরা হইয়াছে। সরকারের এই শিল্প প্রতিষ্ঠা অবশ্যই প্রশংসার কার্য্য।

কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন—

গত ১লা জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে ৪৪ ও ৪৫ স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন কেন্দ্রের উদ্বোধন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—১৯৫৭ সালের মধ্যেই সমগ্র কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পূর্ণ হইবে। ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য অতিরিক্ত লাইনের ব্যবস্থাও শীঘ্রই করা হইবে। উদ্বোধন উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সার্কাস ও আলিপুর ৪৪ ও ৪৫ নম্বর হইল। পার্ক ও কালিঘাট ৪৭ ও ৪৮ নম্বর হইবে। আগামী মার্চ মাসে রসা ও সাউথ কেন্দ্রও স্বয়ংক্রিয় করা হইবে। স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন যাহাতে ত্রুটিযুক্ত না থাকে, তাহার ব্যবস্থা হইলে জনগণ সন্তোষলাভ করিবে।
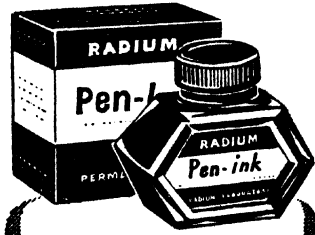
বোম্বাই ভারতের বাণিজ্য-রাজধানী—

গত ২৯শে ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বোম্বাই যাইয়া রাজ্যপুনর্গঠন বিষয়ে বোম্বাই সমস্যা সম্বন্ধে বোম্বায়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইএর সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। ফলে স্থির হইয়াছে, বোম্বাই সহরকে ভারতের বাণিজ্য-রাজধানী করিয়া তাহা কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে রাখা হইবে। গত নভেম্বর মাসে রাজ্য পুনর্গঠন সমস্যার আলোচনার সময়ও শ্রীনেহরু এই কথাই বলিয়াছিলেন। বোম্বাই শুধু বাণিজ্য রাজধানী হইবে না—দ্বিতীয় রাজধানীরূপে গণ্য হইবে। শ্রীনেহরুর ইচ্ছা—ক্রমে কতকগুলি সরকারী বিভাগের কার্য্যালয় ও বোম্বায়ে স্থানান্তরিত করা হইবে। দেখা যাউক, শেষ পর্য্যন্ত কি হয়।

চাষ করি আনন্দে—

বীরভূম জেলা হইতে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য শ্রীনিশাপতি মাঝি 'চাষ করি আনন্দে' শীর্ষক এক চারি-আনা দামের পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া ভূমি উন্নয়ন বিলের লক্ষ্যের কথা সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি নিজে গ্রামবাসী ও কৃষিকার্য্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কাজেই তিনি কৃষকদের অন্তরের কথাই এই পুস্তকে প্রচার করিয়াছেন। ভূমি উন্নয়ন বিলে যে ৬০টি ধারা রচনা করা হইয়াছে তাহার ১৫ হইতে ২২ ধারায় ও ৪৯ (ক) ধারায় ভূমিদান, ভূমিরক্ষা, মীমাংসা, বিচার, সর্বউচ্চ আপীল, ফসলের অংশবৃদ্ধি ও নিষ্করভাবে বসতবাটীতে বসবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। মনে হয়, এইবার ধীরে ধীরে রাজ্যের বর্গাদারগণ জমিজায়গাতে উন্নত হইতে পারিবে। উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বোত্তম উপায় হিসাবে সমবায়প্রথায় চাষের প্রবর্তনই ভূমি উন্নয়ন বিলের প্রধান লক্ষ্য। খণ্ড খণ্ড জমিকে বৃহৎ ও সমতল করতে পারলে এর দ্বারা যথেষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি হবে। ভূমি উন্নয়ন বিলের সবচেয়ে বড় উপকার হবে—১২ লক্ষ রায়ত চলতি খাজনার তুলনায় অর্ধেক টাকা রাজস্ব দিয়ে লাভবান হবে। ৪০ লক্ষ বসতবাটীর মালিক (এক বিঘা পর্য্যন্ত) নিষ্করভাবে বসবাস করবে। ১ লক্ষ রায়ত ও পরিবার (দুই একরের কম জমির মালিক) ৩ লক্ষ বিঘা জমি পাবে। ২ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক ৬ বিঘা করে জমিজায়গা লাভ করবে। প্রতি পল্লীতে আদর্শ সমবায় ক্ষেতখামার গড়ে উঠবে। নিশাপতিবাবু তাঁহার পুস্তিকায় বিলের ধারাগুলি সম্বন্ধে নানা দিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। দেশের কৃষক-সমাজকে এই সব কথা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কাজেই সেদিক দিয়া নিশাপতিবাবুর ছোট বইখানি সকল শ্রেণীর কর্মীদের কাজে লাগিবে। আমরা এই পুস্তক প্রকাশের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করি এবং ইহার প্রচার বিষয়ে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

প্যাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

১৯৫৪ সালের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য এদেশে নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র নির্ব্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় যে কেন্দ্রীয় পুরস্কার কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা "মির্জ্জাগালিব" নামক হিন্দী চিত্রটি শ্রেষ্ঠ কাহিনীর জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিসনের "স্পিরিট অব দি লুম" শীর্ষক প্রামাণ্য চিত্রটি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পাইয়াছেন। এ বৎসরে কমিটি কোন শিশুচিত্রের জন্যই প্রধান মন্ত্রীর স্বর্ণপদক দেন নাই। কোন শিশুচিত্রই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। শিশু-চিত্র সাধারণতঃ আমাদের দেশে খুব বেশী তোলা হয় না। এ বিষয়ে প্রযোজকদের বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। পদকলাভের যোগ্যতা যেমন কোন শিশুচিত্রই

এম. এল. বি প্রোডাকসন্সের ভোলামাস্টার কথাচিত্রে ছবি বিশ্বাস, ভারতী দেবী, জীবেন বসু ও রবীন মজুমদার—ছবিটি শীঘ্রই কলিকাতার বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে

ছবিগুলি পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের নির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠ চিত্রের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আর, আর, দিবাকর উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এবার বোম্বাই-এর মিনার্ভা মুভীটোনের লাভ করে নাই তেমনি যোগ্যতার সার্টিফিকেটও পায় নাই। মাদ্রাজের চন্দ্রতারা প্রোডাকসন্স "নীলাককুইল" নামক মালয়ালাম চিত্রটি এবং বোম্বাই-এর হিতেন চৌধুরী প্রোডাকসন্স-এর "বিরাজ বহু" নামক চিত্রটিকে কাহিনীর

জন্য সর্ব্বভারতীয় যোগ্যতার সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন। প্রামাণ্য চিত্র হিসাবে ফিল্ম ডিভিসনের "দার্জ্জিলিং" ও "গোল্ডেন রিভার" নামক চিত্র দুইটীকে যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে। "মহাত্মা ফুলে" নামক মারাঠি চিত্রটি রজতপদক এবং কানাড়ী ভাষায় "বেদারা কান্নাপ্পা" নামক চিত্রটি যোগ্যতার সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে। তামিল ভাষায় "মালয়কল্লান" চিত্রটি রজত পদক এবং "অন্ধানাল" ও "এথিরপারথাথু" নামক চিত্র দুইটি যোগ্যতার সার্টিফিকেট পাইয়াছে। তেলেগু ভাষায় "পেড্ডামানুসুলু" রজতপদক এবং "বিপ্রানারায়ণ" ও "থোডু-ভাঙ্গালু" নামক চিত্র দুইটী যোগ্যতার সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালায় "ছেলেকার" নামক চিত্রটি রৌপ্য পদক এবং "যদুভট্ট" ও "অন্নপূর্ণার মন্দির" চিত্র দুইটীকে যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে। এই পুরস্কার ব্যবস্থা করিয়া সরকার সত্যই একটি প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের ব্যাপারে আরও সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। কেননা এমন অনেক ছবি আছে, যাহা ব্যবসা ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যলাভ না করিলেও মানব-কল্যাণের ক্ষেত্রে তাহা বিশেষ কার্য্যকরী। আশা করি, পরবর্ত্তী বৎসরে আঞ্চলিক কমিটীগুলি এ বিষয়ে দৃষ্টিদান করিবেন।

* * * *

সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় চিত্র প্রযোজক গিল্ড ও ভারতীয় চিত্র ফেডারেশন নামক প্রযোজকদের দুইটী পৃথক প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত হইয়া একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 'যত মত তত পথ' এই প্রবাদ বাক্যকে পরিহার করিয়া একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার কল্পনা সত্যই প্রশংসার্হ। এ ব্যাপারে অবশ্য শ্রীএস্-এস্-ভাসান ও শ্রীভি, শান্তারাম উদ্যোগী হওয়ায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। শ্রীএস্, কে, পাতিল এই মিলন প্রচেষ্টায় আন্তরিকভাবে চেষ্টা করায় তিনিও ধন্যবাদার্হ; প্রযোজকদের এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের মিলনের দৃষ্টান্ত আশা করি, লেখক, পরিচালক, শিল্পী, প্রদর্শক ও কলাকুশলীদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।

* * * *

কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের ফিল্ম ডিভিসন সম্প্রতি শ্রীবুলগানিন ও শ্রীক্রুশ্চেভের ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে যে, পূর্ণাঙ্গ (Full length) ছবিটি তুলিয়াছেন তাহার পরিবেশন সত্বলাভ করিয়াছেন বোম্বাই-এর হিতেন চৌধুরী প্রোডাকসন্স। এই পরিবেশন সত্বে তিনি সমগ্র পৃথিবীতে চিত্র পরিবেশন করিতে পারিবেন। বিচক্ষণ দশজন ক্যামেরাম্যান এই ছবিটির চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ছবিটির নামকরণ হইয়াছে—'ভারত দর্শন'। এই ছবিতে রুশ নেতৃদ্বয়ের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও বিপুল সম্বর্দ্ধনা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে যোগদানের চিত্র ছাড়াও বিভিন্ন স্থানের বক্তৃতাবলীও ইহার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছবিখানি শীঘ্রই সমগ্র ভারতে মুক্তিলাভ করিবে।

* * * *

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কাহিনীকার শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত কাহিনী 'পরিণীতা' অবলম্বনে নূতন নাটক আরম্ভ

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতায়' মনোরমার বেশে শ্রীমতী অপর্ণা দেবী ফটো—কালিশ মুখোপাধ্যায়

হইয়াছে। কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়াছেন সুখ্যাত নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। উপন্যাসে নাট্যরূপ দানে দেবনারায়ণ-

বাবুর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য্য। ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্রের অন্যান্য বহু কাহিনীর নাট্যরূপ তিনি দিয়াছেন এবং প্রত্যেকটিতেই অসামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। 'পরিণীতার' নাট্যরূপ দানেও তিনি তাঁর পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। নিরুপমা দেবীর সুবৃহৎ উপন্যাস 'শ্যামলী'র নাট্যরূপ দিয়া তিনি যে বিপুল খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন এবং অভিনয়ের দিক দিয়া শ্যামলী মঞ্চজগতে যে নূতন ইতিহাস স্থাপন করিয়াছে আশা করা যায় এ নাটকটিও স্টার মঞ্চের ও নাট্যকারের সে গৌরব ক্ষুণ্ণ করিবে না। আগামী সংখ্যায় নাটকটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত শরৎচন্দ্রের পরিণীতার একটি দৃশ্যে গুরুচরণ, গিরীন ও ললিতের ভূমিকায় সন্তোষ সিংহ, নবকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ফটো—পান্না সেন

* * * *

গত ৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা ইয়ুনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটে "সব পেয়েছির আসরের" দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্যিকরা এক অভিনয় করেন। অভিনয়ে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 'আধিভৌতিক' নামক একটি কৌতুক নাট্য রচনা করেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীসুবোধ ঘোষ, শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি), শ্রীক্ষিতীশ বসু, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী, শ্রীধীরেন বল, শ্রীহীরেন পাল, শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত, শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য, শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত, শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীরণজিৎ সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও গীতিকার। অভিনয়টী বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সাহিত্যিকদের এইরূপ অভিনয় আয়োজন করিতে পারিলে পারস্পরিক যোগাযোগের সুবিধা হয়।

* * * *

সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। সঙ্গীত-সাধক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরবাবু দীর্ঘকাল ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এই নিয়োগে সঙ্গীতানুরাগী মাত্রই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

* * * *

বিকাশ রায় প্রোডাকসনের "অর্দ্ধাঙ্গিনী" সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছে। আলোচ্য চিত্রের কাহিনী রচনা করিয়াছেন শ্রীযুত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। কাহিনীকার রচনায় মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। হাসির ছবিগুলিতে সচরাচর যে ভাঁড়ামো দেখা যায়, আলোচ্য চিত্রে সেরূপ কোন কদর্য্য দৃশ্যের অবতারণা করা হয় নাই। সম্পূর্ণ নিছক একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রণয়মধুর হাস্যোজ্জ্বল কাহিনী। পাঁচ ভাই, পাঁচ বৌ—ভায়েরা মনে করেন সংসার মধুময় হইয়া আছে তাঁহাদের ভায়ে ভায়ে সদ্ভাবের জন্য। বৌয়েরা মনে করেন—আমরাই সংসারের শান্তি অব্যাহত রাখিয়াছি। শেষে ভাইদের একতার আস্ফালনে অতিষ্ঠ হইয়া বৌয়েরা সাংসারিক অশান্তির অভিনয় করিয়া চলেন। ভুল বোঝাবুঝি সুরু হয়। শেষে অবস্থা এমনই

চরমে ওঠে যে পৃথক হওয়ার সব ঠিক। এই সময় মধু চাকর ভাঙা সংসার জোড়া দেয়। বৌয়েদের সলাপরামর্শ সে আড়ি পাতিয়া শোনে ও ফাঁস করিয়া দেয়—সব ঘটনা ভাইয়েরা সামলে যান এবং বৌয়েদের জব্দ করার জন্যে মতলব আঁটেন। বৌয়েদের ত তখন আর চিন্তার অন্ত নাই। শেষ পর্য্যন্ত সব গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। সংসারের শান্তি ফিরিয়া আসে।

কাহিনীটি একদিকে যেমন অভিনয়, অপরদিকে তেমনি বৈচিত্র্যময়। বিকাশ রায় অভিনেতা হিসাবে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, আলোচ্য চিত্রের পরিচালনার ব্যাপারে তাঁহার সে খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। কোন মারপ্যাচের মধ্যে না গিয়া সোজা ও সরলভাবে গল্পটিকে তিনি চিত্রায়িত করিয়াছেন। ঝিয়ের প্রতি চাকরের আকর্ষণ একটু হাল্কা হইয়া গিয়াছে। কাহিনীর সহিত ইহার কোন সমতা নাই। ঐ অংশটুকু বর্জ্জন করিতে পারিলে ভাল হইত।

বিভিন্ন ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, জীবেন বসু, নির্ম্মলকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক যথাযথ রূপদান করিয়াছেন। স্ত্রীচরিত্রে সুনন্দা দেবী, মঞ্জু দে, সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় সুঅভিনয় করিয়াছেন। সঙ্গীতাংশ অনুল্লেখ্য। কলাকৌশলের দিক সাধারণ স্তরের। মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন নিছক হাসির ছবি হিসাবে চিত্রামোদীদের আলোচ্য ছবিখানি যথেষ্ট আনন্দদান করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বাংলার নাট্যশালা ও নাট্যকলা

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়গুলির অবস্থা কিছুদিন পূর্ব্বে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সেই নিদারুণ বিপদ কাটাইয়া বাংলার নাট্যশালা আবার যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতেছে, রসিকজনের পক্ষে ইহা মহা আনন্দের ও আশ্বাসের কথা। রঙ্গমঞ্চ জাতীয় সংস্কৃতির মানদণ্ড, দেশে বিদেশে বাঙ্গালীর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের দান প্রচুর। রুচিমান বাঙ্গালীর সহিত নাট্যশালার একটা আত্মিক যোগ আছে; বিগত আশীবৎসরের ইতিহাসে বাংলার রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে বহু দুর্দ্দিন আসিয়াছে, প্রত্যেকবারই "বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকিলে বাংলার নাট্যশালাও বাঁচিয়া থাকিবে,"—এই নীতিবাক্যই যেন মঞ্চকে দুস্তর বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। এবারও এইজন্যই মঞ্চপ্রেমিকদের বিপুল অর্থব্যয়ের ঝুঁকি ব্যর্থ হয় নাই। পুরাতন ও অপরিচ্ছন্ন মঞ্চগুলিকে সুসংস্কৃত করিয়া যাঁহারা বর্ত্তমানে ব্যবসায়িক নিষ্ঠার সহিত থিয়েটার চালাইতেছেন, তাঁহাদের এখন আর লগ্নীকৃত অর্থের জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। বর্ত্তমান যুগ পরিচ্ছন্নতার যুগ, সিনেমাগৃহগুলির সমান না হইলেও কাছাকাছি আরামের ব্যবস্থা থাকিলে বাঙ্গালী থিয়েটারকে সিনেমার তুলনায় কম পছন্দ করিবে না, এই সত্য এখন প্রমাণিত বলা চলে।

আজকাল যে থিয়েটারগুলি আশাপ্রদভাবে চলিতেছে, তাহা সম্ভব হইয়াছে মালিকেরা প্রধানতঃ ব্যবসায়িক সফলতার দিক হইতে জিনিষটাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া। একালের বিচারে এই দৃষ্টিভঙ্গি এক হিসাবে ভালই। নাট্যশালার সহিত যাঁহারা জীবিকার গণ্ডীতে বাঁধা, এই পরিবর্ত্তন তাঁহাদের একান্ত কাম্য। মানুষের আনন্দসংস্থানী মনকে পরিতৃপ্ত করিয়া রঙ্গালয় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, মঞ্চামোদীদের পক্ষেও ইহা আশার কথা।

তবে এই সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যবসায়িক বুদ্ধিই থিয়েটার পরিচালনার শেষ কথা নয়, অন্ততঃ বাংলাদেশের পেশাদার থিয়েটারের ক্ষেত্রেতো নয়ই। সাধারণভাবেই ব্যবসা হিসাবে থিয়েটার চালানো আর কারখানা চালানোর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। কলাকৃষ্টির বিকাশের প্রতি লক্ষ্যহীনতা আমাদের দেশে মঞ্চপরিচালনার পক্ষে অপরাধ।

এছাড়া মঞ্চের সত্যকার সাফল্যের জন্য থিয়েটারে মালিক ও কর্ম্মীদের সম্পর্ক যথেষ্ট হৃদ্য হওয়া আবশ্যক। থিয়েটারের কর্ম্মীবৃন্দকে কখনই কারখানার শ্রমিকের শ্রেণীতে ফেলা যায় না। রঙ্গালয়ে নাটক অভিনীত হয়, এই নাটকের সফলতা নির্ভর করে শুধু আয়োজনের উপর নয়, সকলের হৃদয় স্পর্শের বা সমবেত আন্তরিক প্রয়াসের উপর। নাট্যকার নাটক লেখেন, অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করেন, কিন্তু রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেরই নাটকের সাফল্য সৃষ্টিতে অল্পবিস্তর অবদান থাকে। এই সমবেত প্রচেষ্টার আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে বলিয়াই নাট্যশালার প্রত্যেক কর্ম্মীকে ভাল করিয়া কাজ করিবার সুযোগ দিতে হইবে, কর্ম্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রেরণা দিতে হইবে রঙ্গালয়কে কলালয় হিসাবে ভালবাসিবার। ইহাতে অভিনয় ও মঞ্চকলার ক্ষেত্রে নূতন প্রতিভার বিকাশ হইবে। যেখানে প্রাণের এই সংযোগ না ঘটিবে, সেখানে কর্ম্মীর ব্যর্থতা অনিবার্য্য এবং সে ব্যর্থতা সমগ্রভাবে নাট্যশালার সাফল্য সম্ভাবনার উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবেই। বর্ত্তমানে অধিকাংশক্ষেত্রে দুই চারিজন বড় অভিনেতা অভিনেত্রী ব্যতীত থিয়েটারের অধিকাংশ কর্ম্মীর ভাগ্যেই এরূপ অনুকূল আবহাওয়ায় কাজ করা হইয়া উঠে না। অথচ কর্ত্তৃপক্ষের সামান্য একটু হৃদয়ানুভূতি ও দূরদৃষ্টি থাকিলে এ ধরণের ব্যবস্থা হওয়া মোটেই কঠিন নয়। এই অবস্থায় কর্ম্মীরা স্বভাবতঃই থিয়েটারকে মালিকের ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের জিনিষ বলিয়া ধরিয়া লয় এবং থিয়েটার ভালভাবে চালাইবার ব্যাপারে মাথা ঘামাইবার উৎসাহ পায় না। সাধারণ কর্ম্মীদের এই 'দিনগত পাপক্ষয়' অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া সমস্ত কর্ম্মীকে এখন থিয়েটারের ভালমন্দের অংশীদার করিয়া নেওয়া দরকার। কিছুদিন পূর্ব্বে রূপমঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'দি পার্ল থিয়েটার লিমিটেড' নাটকে আমি এই উদ্দেশ্যেরই ইঙ্গিত দিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে মালিক, ম্যানেজার, দু একজন বিশেষ কর্ম্মচারী বা দু একজন বড় অভিনেতাকেই থিয়েটারের সবকিছু দেখাশোনা ও পরিচালনা করিতে হয়। আস্থা স্থাপনের প্রতিশ্রুতিতে এই দায়িত্ব যথাক্রমে সকলের হাতেই কিছু কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে। এখন থিয়েটারের সাফল্য সম্ভাবনা সুস্পষ্টভাবে সূচিত হইয়াছে, মঞ্চ-মালিক এখন

এমন প্রতিশ্রুতিও দিতে পারেন যে, সমবেত প্রয়াসে থিয়েটারের যদি লাভ হয়, সেই লাভের অংশ বৎসরান্তে বোনাস হিসাবে সকলের মধ্যেই বণ্টিত হইবে। এইভাবে একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইলে মর্য্যাদা, অধিকার, চাকুরী নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার সহিত কর্ম্মীসাধারণের উপর যে অতিরিক্ত দায়িত্ব আরোপিত হইবে, তাহা বহন করিতে বিরক্তির পরিবর্ত্তে আনন্দ ও আগ্রহ দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক।

অবশ্য মালিকদের মনোভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীদেরও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য অধিকতর সচেতন হইতে হইবে। এখন নাট্যশালার তলার দিকের কর্ম্মীরা অন্তর্নিহিত হীনতাবোধ বা ইনফিরিওরিটি কম্‌প্লেক্সের দ্বারা ক্লিষ্ট, দারিদ্র্য ইহাদের প্রাণশক্তি স্তিমিত করিয়া দিয়াছে। নিজের সম্পর্কে সচেতনতার সহিত নিজের কাজের দায়িত্ব ও নিজের প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্পর্কে সচেতনতাও তাহাদের অত্যাবশ্যক।

কর্ম্মীরা যেমন নাট্যশালার ভিতরের লোক, নাট্যকার ঠিক তাহা না হইলেও তাহার সহিতও রঙ্গালয়ের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। এই সম্পর্ক অচ্ছেদ্য বলিয়া নাট্যকারকে প্রাপ্য মর্য্যাদা না দিয়া মঞ্চ পরিচালনার প্রয়াস ধৃষ্টতামাত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা নাট্যশালায় অনেকক্ষেত্রে তাহাই হয় বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের স্বভাবতঃই নাটক লিখিতে ইচ্ছা থাকে না। নাটক সাহিত্যের অংশ সন্দেহ নাই, তবু মঞ্চে অভিনীত হইলে তবেই এদেশে নাট্যসাহিত্যের সমাদর দেখা যায়। নাটক নাট্যশালার প্রাণ, নাটক ভাল না হইলে নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব। নাট্যকারকে সম্মান, ন্যায্য পারিশ্রমিক, উৎসাহ এবং সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইলেও মঞ্চ-কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু এই গুরুতর বিষয়টি প্রায়ই অবহেলা করেন। খুব খ্যাতনামা নাট্যকারদের ভাগ্যেই কিছুটা অভ্যর্থনা জুটে, না হইলে নূতন নাট্যকারের কথা দূরে থাক, অপেক্ষাকৃত পরিচিত নাট্যকারদের পক্ষেও থিয়েটার-কর্ত্তৃপক্ষকে নূতন নাটক শোনানো রীতিমত কঠিন ও ধৈর্য্যসাপেক্ষ ব্যাপার। নাট্যকার বাহিরের ভদ্রলোক, সাধারণতঃ শিক্ষিত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। নাটক হাতে নাট্যশালায় ঢুকিলে কিন্তু তাঁহাকে প্রায়ই একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িতে হয়। সম্প্রতি পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হইয়াছে, নতুবা কিছুদিন আগেও থিয়েটারে নাটক শোনানো লইয়া যে নাট্যকার একবার অন্ততঃ হতাশ না হইয়াছেন, তিনি পরম ভাগ্যবান। থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষ নাট্যকারকে দেখিয়াও দেখেন না, নাটক শুনিবার সময় স্থির করিয়া সেকথা কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ষাই করেন না, কোন ক্ষেত্রে রক্ষা যদি বা করেন, নাট্যকারকে পড়িতে হয় এক কঠিন প্রতিকূল পরিবেশে। কর্ত্তৃপক্ষ যখন নাটক শোনেন, সঙ্গে প্রায়ই সাঙ্গপাঙ্গ থাকে। নাট্যকার নাটক পড়িয়া চলেন, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে মূল শ্রোতারা কাজের অছিলায় এখানে ওখানে যান, চা পান সিগারেটের ফরমাস দেন এবং সপারিষদে মাঝে মাঝে এমন সব মন্তব্য করেন যাহা শুনিয়া স্তম্ভিত নাট্যকারের নীরবে ঘাড় নাড়িয়া যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অবশ্য যোগ্যতর ব্যক্তিও কখনও কখনও নাটক শোনেন এবং সেক্ষেত্রে আর কিছু না হউক, পরিবেশটি আশাপ্রদ হয়। তবে শ্রোতৃবৃন্দ যোগ্যই হউন বা অযোগ্যই হউন, নাট্যকারের মানসিকতা এবং রচনা কুশলতা প্রথম পরিচয়েই স্বীকৃতিলাভ করে কদাচিৎ। নাট্যকারকে তাঁহার রচনা সম্পর্কে বক্তৃতা শুনিতেই হয়, নাটক ভাগ্যক্রমে পছন্দ হইলেও অনেকক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের উপদেশ আসে। নিরুপায় নাট্যকারকে বাধ্য হইয়াই এরূপ পরামর্শের অধিকাংশ মানিয়া লইতে হয়, না হইলে নাটক তাঁহার মঞ্চস্থই হইবে না। কিছুকাল পূর্ব্বে একখানি নাটক দেড়শত রজনী অভিনীত হইয়া মরণোন্মুখ একটি জরাজীর্ণ নাট্যশালাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল, নাটকখানির আবেদন সার্ব্বজনীন হইলেও কর্ত্তৃপক্ষ এই নিজ্জয়সের নাটকটির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াও লোকসানের আশঙ্কায় প্রথমটা মঞ্চস্থ করিতে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। আর একখানি নাটকের ব্যাপারে আরও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়াছিল। জনৈক নাট্যকারের একখানি নাটক শুনিয়া পছন্দ করিয়া মঞ্চ-কর্ত্তৃপক্ষ তাহার অজ্ঞাতে অপর এক নাট্যকারকে দিয়া সংশোধন করাইয়া লন। নাটকখানি ছিল জনপ্রিয় এক উপন্যাসের নাট্যরূপ। শুধু নাটকখানি চলিল না বলিয়া নয়, বিখ্যাত উপন্যাসের এই নাট্যরূপ সম্পর্কেও নানা মহল হইতে তীব্র আপত্তি উঠিল। নাট্যকারের সহিত ইহা লইয়া থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষের ঘটিল মনান্তর, তিনি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নিজের অসহায়তা ও লাঞ্ছনার কথা বিবৃত করিলেন।

কলাশিল্প সাধারণের সম্পদ। বলা বাহুল্য, মানবতার প্রশ্নকে উপেক্ষা করিয়া দাম্ভিক রঙ্গালয় পরিচালনা-নীতি শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইবেই। আবার সবচেয়ে আতঙ্কের কথা এই যে, ব্যক্তিবিশেষের এই পরিচালনা-ব্যর্থতা সমগ্রভাবে মঞ্চ-পরিচালনা ব্যবসার উপর প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবে কোন কর্ত্তৃপক্ষ আপন অহমিকার মূল্য দিতে থিয়েটারের দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলে নাট্যশালার সম্ভাবনা সম্পর্কেই ভয়ের কারণ ঘটে। কলিকাতায় সাম্প্রতিক নাট্যশালা পুনর্গঠনের আগে ঠিক এমন অবস্থাই হইয়াছিল। এখন কোন কোন রঙ্গালয়ের ক্রমবর্দ্ধমান সম্মানের ফলে হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে সমগ্রভাবে বাংলার নাট্যজগৎ আপন মহৎ মর্য্যাদা ফিরিয়া পাইবে।

ইহার পর নাটকের কথা। সকলেই বোধহয় লক্ষ্য করিয়াছেন, বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে নূতন মৌলিক নাটক এখন খুবই কম খোলা হয়। নাটকের সার্থকতা রচনায় নয়, নাট্যকারের বন্ধুবান্ধব শুনিয়া প্রশংসা করিলেও নয়, ইহার সাফল্য অভিনয়ে। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া সুনাম হইলে তবেই নাটকের সত্যকার সুনাম হয়, নাট্যকারের হয় প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমানে মৌলিক নূতন নাটক কম অভিনীত হইতেছে বলিয়া যাঁহারা নাটক লিখিতে পারেন বা লিখিবার শক্তি আছে, তাঁহারা বাধ্য হইয়াই লেখা কমাইয়া দিয়াছেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত না হইলে নাটকের প্রকাশক পাওয়া কঠিন এবং প্রকাশক মিলিলেও তাহা বাজারে কাটান শক্ত। কলিকাতার নাট্যশালাগুলিতে উপন্যাসের নাট্যরূপ ও বিগত দিনের জনপ্রিয় পুরাতন নাটক অভিনয়ের বিশেষ একটা প্রবণতা আছে। এজন্যও মৌলিক নাটক আত্মপ্রকাশের পথ পায় না। এ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে মঞ্চ-মালিকেরা ব্যবসায়িক স্বার্থের কথাটাই জোর করিয়া বলেন। বলা বাহুল্য, লাভালাভের প্রশ্ন সম্পর্কে এই মনোভাব অতীতকালের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত, বর্ত্তমানে জনমানসের যে কৃষ্টিগত মানোন্নয়ন ঘটিয়াছে, সে সম্পর্কে সম্যক সচেতনতা ইহাতে নাই। বর্ত্তমানে কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে বুধবারে অভিনয় হয় না, অন্ততঃ বুধবার কিছুটা ক্ষতির দায়িত্ব লইয়াও কর্ত্তৃপক্ষ যদি উন্নতমানের বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেন, তাহা হইলেও নাট্যকলার উন্নয়নে তাঁহাদের পরিচালিত নাট্যশালার স্থায়ী একটা অবদান থাকে। বাঙ্গালী দর্শকের মন চিরকালই রসপিপাসু, রবীন্দ্রোত্তর যুগে ইহা কতখানি অগ্রগতিলাভ করিয়াছে তাহার প্রমাণ গণনাট্যসংঘ, উত্তরসারথী, বহুরূপী সম্প্রদায় প্রভৃতির নূতন ধরণের নাট্যসাফল্যে প্রমাণিত হইবে। এখন রঙ্গমঞ্চগুলি সংস্কৃত হইয়াছে বা হইতেছে, এসময় রুচিমান বা প্রগতিশীল দর্শকদের সত্যকার সন্তুষ্ট করিতে উচ্চশ্রেণীর নাটক মঞ্চস্থ করাই দরকার। আগেকার দিনে যে মন লইয়া মানুষ থিয়েটার দেখিতে যাইত, সেই মনের যেভাবেই হোক মৃত্যু হইতেছে। এই পরিস্থিতি যথার্থভাবে অনুধাবন না করিয়া থিয়েটার মালিকদের পুরাতন অভিজ্ঞতা আঁকড়াইয়া থাকা জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষে মারাত্মক। পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই নাট্যশালার পরিচালকবৃন্দ জাতীয় সংস্কৃতির হিসাবে নূতন নাটকের মূল্য কি এবং এদিক হইতে নাট্যশালার দায়িত্ব কতখানি সে সম্পর্কে সচেতন থাকেন। রাষ্ট্রও অনেকক্ষেত্রেই এসব ব্যাপারে

পৃষ্ঠপোষকতা করে। আমাদের দেশে এতদিন বিপরীত অবস্থা চলিতেছিল। বর্ত্তমানে সরকারের পক্ষ হইতে দেশের নাট্যোন্নতির কিছুটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে, এই আগ্রহের কার্য্যকরী রূপায়নের সঙ্গে সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলির আধুনিকীকরণ সম্ভব হইলে বাংলার নাট্যশালা ও নাট্যকলার ক্ষেত্রে সোনা ফলিবে সন্দেহ নাই।

সত্যসত্যই এখন বাংলাদেশে নূতন ধরণের নাটকের প্রভূত সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সমাজজীবন যখন আলোড়িত হয়, নাটকের তখন স্বর্ণযুগ। সেই আলোড়নের পরিচয় নানা দিক হইতে নূতন নূতন নাটকে স্থান পায়, দরদী নাট্যকারের হৃদয়ানুভূতি মিশিয়া বাস্তব সত্য যে কবির সত্যে রূপান্তরিত হয়, দর্শকের চোখে তাহাই পরাইয়া মোহের অঞ্জন। দীর্ঘ পরাধীনতার পর নবলব্ধ স্বাধীনতার আস্বাদনে নানাবিধ সমস্যার ক্রমবর্দ্ধমান স্পষ্টতা, যুদ্ধোত্তর মন্দার পদক্ষেপে বাস্তবজীবনে বিশৃঙ্খলা, দেশ বিভাগের ট্রাজেডি,—এসব লইয়া যদি ভাল নাটক লেখা না হয়, তাহা হইলে উচ্চশ্রেণীর নাটকের উপাদান আর কি? নাট্যকার তো শুধু ঘটনার বিন্যাস করেন না, সমস্যা-সমাধানেরও ইঙ্গিত দেন। চরিত্রকে উদারতার সহিত উন্মুক্ত করিয়া তিনি তাহার পথে সহানুভূতির আলো ধরেন। এযুগের দুর্ভাবনা-ম্লান, বিপর্য্যস্ত দর্শক তো তাই চায়। তাহাদের কাছে এযুগের সমস্যা লইয়া রচিত নাটক ভাল লাগিবে না কেন? ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক শান্তি সম্মেলনে রুশ প্রতিনিধি মসিয়ে এস্ জেরাসিমফ্ বর্ত্তমান বিশ্বের নানা সমস্যা প্রপীড়িত মানুষের চিত্র বা নাটক দেখিতে পাওয়ার পশ্চাতে এই আগ্রহের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"জগতে এখন দর্শকেরা প্রেক্ষাগৃহে কেবল অবসর কাটাইবার বা আমোদপ্রমোদের জন্য যায় না, তাহারা আশা করে এখান হইতে জীবনের অতি বাস্তব-সমস্যাসমূহের সমাধান তাহারা জানিতে পারিবে। কি করিয়া আরও ভালভাবে বাঁচা যায়, কি করিয়া জীবনে পরিতৃপ্ত থাকা যায়, কি আমরা বিশ্বাস করিব, ভালবাসিব, ঘৃণা করিব,—এই সবই তাহাদের প্রশ্ন, তাহারা চায় এই সব প্রশ্নের সমাধানের ইঙ্গিত।"

নাটক পছন্দ করার উপর নাট্যশালার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে বলিয়া নাটক মনোনয়নের জন্য প্রত্যেক থিয়েটারের একটা বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। মঞ্চ-পরিচালকদের আর্থিক দায়িত্বের দুর্ভাবনা আছে, কাজেই নূতন ভাল নাটক পরিবেশনে যে প্রাথমিক সাহস ও স্থৈর্য্য লাগে, তাহার অভাব তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষের উচিত এই নাটক নির্ব্বাচন ব্যাপারে যোগ্যতাসম্পন্ন বাহিরের দু একজনের সাহায্য লওয়া। থিয়েটারের আর্থিক অবস্থা সহ সর্ব্বপ্রকার সংস্থান তাঁহাদের জানাইয়া দিলেই তাঁহারা নাট্যশালা বিশেষের উপযুক্ত নাটক নির্ব্বাচনে প্রভূত সাহায্য করিতে পারিবেন। অবশ্য ইহাতে সামান্য খরচের প্রশ্ন আছে, কিন্তু থিয়েটারের ও জাতীয় স্বার্থের হিসাবে খরচের তুলনায় লাভ হইবে ঢের বেশি। বিশেষতঃ এইরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত নাট্যশালার যোগাযোগ এবং নাটক নির্ব্বাচনে তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ দর্শক সাধারণের মনে অনুরাগ ও আগ্রহের সৃষ্টি করিবে।

তাছাড়া এখন সাধারণতঃ শেষমুহূর্ত্তে নাটক বাছাই করা হয়, অর্থাৎ যতদিন একখানি নাটক চলিতে থাকে, অন্য নাটক নামাইবার কথা ততদিন কর্ত্তৃপক্ষের যেন মনেই থাকে না। ইহার প্রধান কারণ কর্ম্মব্যস্ততা হইলেও কর্ত্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টির অভাবও ইহার অন্যতম কারণ। একখানি নাটককে মঞ্চস্থ করিয়া পরবর্ত্তী খানিকে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইলে এদিক হইতে অনেক সুবিধা হয়। উপরোক্ত বাহিরের বিশেষজ্ঞরা নাটক পছন্দের ব্যাপারে থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করিলে এই সমস্যারও সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বাংলা-নাট্যশালাকে মর্য্যাদাসহ বাঁচাইতে হইলে চাই ভাল নাটক এবং সুচিন্তিত পরিচালনা ব্যবস্থা। থিয়েটার জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে রাষ্ট্রপরিচালিত হইলেই ভাল হয়, কিন্তু তাহা যখন উপস্থিত হইতেছে না, তখন ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা করিয়াই যতটা পারা যায় ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত মালিকানা সত্ত্বেও ছোট একটি কমিটির সাহায্যে থিয়েটার পরিচালনা করিলে ফল ভালই হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই কমিটিতে মালিক বা মালিকের প্রতিনিধি, অভিনেতাদের একজন এবং অভিনেত্রীদের একজন প্রতিনিধি, যন্ত্রীসঙ্ঘ ও মঞ্চশিল্পীদের একজন প্রতিনিধি, পূর্ব্বোল্লিখিত একজন নাট্যবিশেষজ্ঞ এবং থিয়েটারের ম্যানেজার,—এই কয়জন যদি থাকেন, কমিটির কাজে সকলেরই সংযোগিতা পাওয়া যাইবে এবং কমিটির বিধিব্যবস্থা সকলেই কার্য্যকরী করিতে অধিকতর সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

মঞ্চশিল্পেই হউক, আর চলচ্চিত্র শিল্পেই হউক, উভয় ক্ষেত্রেই যথাসম্ভব খরচ কমানো দরকার। বিশেষ করিয়া থিয়েটারে সামান্য ব্যয়বাহুল্যেই সর্ব্বনাশ দ্রুততর হয়। নাট্যশালার মোট ব্যয়ের $\frac{1}{2}$ ভাগের বেশি অভিনেতা অভিনেত্রীদের পারিশ্রমিক বাবদ খরচ করা উচিত নয়। বাড়ীভাড়া, গাড়ী, যন্ত্রীসঙ্ঘ, চাকরবাকর, সিফ্টার, পেণ্টার, ড্রেসার, প্রম্পটার, মঞ্চশিল্পী, নাট্যকার, জলখাবার—প্রভৃতি খরচ বলিতে গেলে অপরিবর্ত্তনীয়। কাজেই থিয়েটারের আয় বাড়াইবার চেষ্টা এবং নটনটী, দৃশ্যপট ও বিজ্ঞাপনখাতে যতটা সম্ভব ব্যয় কমাইবার ব্যবস্থা,—ইহাই আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। বিজ্ঞাপনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলে, অর্থাৎ কি ধরণের বিজ্ঞাপন লাভজনক তাহা সঠিক অনুধাবন করিলে বিজ্ঞাপনের দরুণ কিছু খরচ বাঁচে বলিয়া আমাদের ধারণা। দৃশ্যপটখাতেও কিছু বাঁচান যায়। অবস্থা থাকিলে মনোমুগ্ধকর বাস্তবানুগ দৃশ্যপট ভালই, কিন্তু ভাল নাটক সুপরিচালিত হইলে অনাড়ম্বর দৃশ্যপটেও বিশেষ আসিয়া যায় না। উন্নততর আলোর কাজ দৃশ্যপটের অপ্রাচুর্য্য বহুলাংশে পূরণ করিতে পারে।

কিছুদিন পূর্ব্বেও অনেকেই বলিতেন, কলিকাতায় এখন সিনেমার যুগ, থিয়েটার এযুগে চলিতে পারে না। 'শ্যামলী' ও 'উল্কা'র অভাবনীয় সাফল্যে এইরূপ দুঃখজনক মন্তব্য প্রকাশ বন্ধ হইয়াছে। অবশ্য সিনেমার তুলনায় ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেকের পক্ষে থিয়েটার দেখা কষ্টকর। কিন্তু খরচ একটু বেশি বলিয়াই কি লোকে ভাল নাটক দেখিবে না? রসাস্বাদনের হিসাবে ছায়াছবির সহিত থিয়েটারের অনেক পার্থক্য আছে, ছায়া ও কায়ার আবেদন এক নয়। সিনেমা ভাল চলে বলিয়া ভাল নাটক চলিবে না,—এ ধারণা ইউরোপ ও আমেরিকায় ইতিমধ্যেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। নাটক যদি সত্য সত্যই রুচিসম্মত ও নাট্যরস-সমৃদ্ধ হয়, সিনেমার হাজার আকর্ষণ নাটকের ক্ষতি করিবে না। গণ থিয়েটারগুলির অবদান ছাড়িয়া দিলেও পেশাদার মঞ্চে অভিনীত, যুগমানব, নিষ্কৃতি, উল্কা, শ্যামলী প্রভৃতি নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সমগ্রভাবে সাধারণ রঙ্গালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইলে কলিকাতায়, বিশেষ করিয়া কৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষিণ কলিকাতায় একাধিক নূতন নাট্যশালা গড়িয়া উঠিবার সবিশেষ সুযোগ আছে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীমা'র কথা

বেলা দে

(পরিচালিকা—"মহিলামহল", কলিকাতা বেতার কেন্দ্র)

শ্রীশ্রীমা'র কথা কিছু বল্‌তে গেল প্রথমেই মনে হয় তিনি যেন নারীজাতিকে জ্ঞানমুক্তি ও শান্তি দেবার জন্য আবির্ভূতা ছিলেন। মাতা সারদা দেবীর মধ্যে দিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই লোকপাবনী শক্তি বিশেষভাবে ও বিচিত্র আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ঠাকুরের একমাত্র লক্ষ্য ও নির্দেশ ছিল পুণ্যকর্মের ও পবিত্রতার অধিকারী হ'তে হবে নারীকে এবং তবেই হিন্দুসমাজের কল্যাণ ও শান্তি হবে। তিনি জানতেন যে, বর্তমান যুগে যুগ-ধর্মের শক্তি শ্রীসারদা দেবার শরীরকে অবলম্বন ক'রে অশেষ লোক-কল্যাণ সাধন করবে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের নারীজাতির আধ্যাত্মিক আদর্শ যে সারদামণীর ভেতর দিয়েই আবার নতুন রূপে প্রকাশিত হবে এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাল করেই জান্‌তেন। তাই তিনি বার বার মা'কে বলেছিলেন—"মেয়েদের জন্যই এবার তোমার আসা, মেয়েদের যা'তে কল্যাণ হয়, তাই তোমাকেই করতে হ'বে। এমন কি ঠাকুরের দেহত্যাগের অনেক বছর পরে শ্রীমা'র নিকট দিব্য মূর্তিতে তিনি দেখা দিয়ে বলেছিলেন: "মেয়েদের জন্যে তোমাকে আরো অনেক বছর থাক্‌তে হবে। তুমি না থাক্‌লে মেয়েদের কি উপায় হবে?" শুনেছি, ভদ্রবংশের হিন্দুবাড়ির ভক্তিমতী মেয়েরা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন কিন্তু ঠাকুরের কাছে প্রায়ই পুরুষ ভক্তেরা থাকতেন। তাই তাঁরা মনপ্রাণ খুলে ঠাকুরের সংগে কথা বলতে পারতেন না। অন্তর্যামী ঠাকুর মেয়েদের প্রাণের সেই ব্যথা ও অভাব বুঝতেন। সেজন্য নহবতখানায় যেখানে শ্রীমা আছেন সেখানে তাঁদের পাঠিয়ে দিতেন। শ্রীমায়ের চরণতলে ব'সে মেয়েরা নিজেদের প্রাণের কথা ও অন্তরের ব্যথা সমস্তই জানিয়ে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করতেন। মা বলতেন, "শরীর ধারণে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। দুঃখপূর্ণই জগৎ। সুখ কেবল একটি নাম মাত্র। ঠাকুরের কৃপা যার ওপর হয়েছে, সেই কেবল তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতে পারিয়াছে। এবং তার সেইটুকুই সুখ জানবে।" একটি গৃহস্থ বাড়ির বউ একবার শ্রীমা'কে লিখেছিলেন: "মা, আমার অল্প বয়স, শ্বশুর-শাশুড়ী আপনাদের কাছে আস্‌তে দিচ্ছেন না, তাঁদের অমতে কি ক'রে যাই বলুন তো? অথচ আপনার কৃপালাভ আমার একান্ত ইচ্ছা।" মা' তাঁকে লিখলেন: "মা তোমার এখানে আসার আবশ্যক নাই। যে ভগবান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন তুমি তাঁকেই ডাকো। তিনিই তোমায় কৃপা করবেন।" একবার এক গৃহস্থ শিষ্য মা'কে প্রণাম করতে এসে বলেছিলেন: "মা, কেন ঠাকুরের দর্শন পাচ্ছি না?" মা বললেন, "ডাকতে থাকো, ক্রমে হবে। কত মুনি ঋষি যুগ-যুগান্তর ধ'রে তপস্যা ক'রে পেলে না, আর তোমাদের ফস্ করে হবে? এ জন্মে না হয় পরজন্মে হবে। ভগবান লাভ কি এতই সোজা?" সংসারে মেয়েদের কি ভাবে থাক্‌তে হ'বে সে সম্বন্ধে শ্রীমা বলেছেন: "নিজের ইষ্টদেবতার ওপরে মন রাখো। সব সময়ে ইষ্টদেবতাকে মনে রাখবার চেষ্টা করবে। তোমার সংসার নয়, ভগবানের সংসারে দাসী হ'য়ে তাদের সেবা করছো এই কথা মনে রাখো। স্বামী ছেলেমেয়ে যাকেই সেবা করো, জান্‌বে তাদের মধ্যেই তোমার ইষ্টদেবতা রয়েছেন—সব কাজকে ভগবানের কাজ বলে মনে করবে। কারুর দোষ ধরবে না—কারুর নিন্দে করবে না—কাউকে কষ্ট দিও না। ভগবানকে সব সময় ধ'রে থাকো—তাঁর নাম করো তা' হলেই হ'বে।" তিনি বলতেন,: "মনকে পবিত্র রাখাই কাজ। সব সময়ে ঠাকুরকে মনে রাখাই সাধন। সব কাজে ভগবানকে

মনে রাখতে পারলেই হলো।" শ্রীশ্রীমা' বলতেন, "তেজস্বিতা, মনের দৃঢ়তা, মেয়েদের মধ্যে থাকা অবশ্যই দরকার।" কিন্তু মেয়েদের চালচলন ও আচার ব্যবহারে ধীর নম্র বিনীত ও শান্তভাব না দেখলে শ্রীমা অত্যন্ত দুঃখিত হ'তেন। তিনি বল্‌তেন, "মেয়েরা বেহায়া হাড়হাবাতে বাচাল ও অলস হলে সংসারের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি, শ্রী সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। সেবা, সহিষ্ণুতা, নম্রতা, স্নেহ, মায়া, দয়া, সংযম, লজ্জা প্রভৃতি নারী চরিত্রের গুণ।" এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং নিজের জীবনের প্রত্যেক দিনের বহু ঘটনায় তাদের প্রকৃত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ভারতবর্ষের নারীজাতির মহান্ আদর্শ হাজার হাজার বছর ধ'রে সেই বৈদিক যুগ থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্রে রামায়ণ, মহাভারতে, পুরাণ ও কাব্যে নানা ভাবে লেখা হয়েছে। শত শত ঋষি পত্নী ঋষি কন্যা কত তপস্বিনী কত মহীয়সী নারী সেই আদর্শের সাধনায় নিজেদের নারীজীবনকে চির-উজ্জল ও মহিমাদীপ্ত করেছেন। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, সেবা, দয়া, সুচিন্তা, সৎকর্ম আর নানা ভাবে কর্তব্য পালনই ভারতীয় নারীজীবনের চির-আদর্শ। জ্ঞান পুণ্য পবিত্রতা ধর্মনিষ্ঠাই ভারতবর্ষের নারীজাতির আদর্শগত বিশেষত্ব।

অনেক কাল বিদেশী শাসনের কুপ্রভাবের ফলে এ যুগে নানা রকম বিজাতীয় ভাব ও চাল-চলন ভারতীয় নারীদের সেই পবিত্র আদর্শকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো। শ্রীমায়ের আবির্ভাবে ভারতীয়া নারীদের সেই মহান্ ও পবিত্র আদর্শ আবার জেগে উঠেছে। এই পবিত্র আদর্শকে যদি আমরা ধ'রে রাখ্‌তে পারি—তা' হলেই আমাদের প্রত্যেকের জীবনও শান্তিপূর্ণ হ'বে—আমাদের মঙ্গল হ'বে। ভারতীয় নারীদের এই আদর্শ যেন শ্রীমায়ের জীবনে যে জীবন্ত রূপ নিয়েছে—সেই আদর্শ যেন আমাদের সকলের অন্তরকে ও মনকে সর্বদা জাগিয়ে রাখে। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করি—তাঁর আশীর্বাদ আমাদের ওপর যেন সর্বদা থাকে। যেন তাঁর অজস্র করুণায় এই আদর্শকে পালন কোরে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনকে সার্থক ও ধন্য করতে পারি।

কেক্ ও পুডিং তৈরীর প্রণালী

শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় বি-এ

স্পঞ্জ কেক

উপকরণ ও পরিমাণ।—দেড় পোয়া চিনি, এক পোয়া ময়দা, দেড় পোয়া জল, বারটি ডিম এবং দু' কাঁচ্চা মাখন।

একটি পাত্রে মাখন মাখিয়ে জ্বালে চড়ান। পাত্র গরম হলে চিনি দিয়ে দু'চার বার নেড়ে জল ঢেলে দিন, এবং জল গরম হয়ে চিনি গলে গেলে নামিয়ে রাখুন। এবার আর একটি পাত্রে মাখন মাখিয়ে জ্বালে বসান; পাত্র গরম হলে ময়দা ঢেলে দু'একবার নেড়ে চিনি মিশিয়ে জল ঢেলে দিন। এখন উহা গাঢ়গোছের হয়ে এলে, নামিয়ে ডিমের তরল অংশের সঙ্গে ঠেসতে থাকুন। এবার একটি পাকপাত্রে এই প্রস্তুত দ্রব্য পূর্ণ করে উহার মুখ বন্ধ করে, দমে বসিয়ে রাখুন। খানিকক্ষণ পরে পাত্রের ঢাকনি খুলে দেখবেন যে, কেক ফুলে উঠেছে; তখন নামিয়ে অন্য পাত্রের ভিতরে রেখে দিন।

সুইস্ কেক

উপকরণ ও পরিমাণ।—মাখন, ময়দা, চিনি, ডিম, পাতি বা কাগজি লেবু, ছোট এলাচ চূর্ণ এবং গোলাপজল পরিমাণ মত।

ডিমের শাদা অংশ পৃথক রেখে হলদে অংশের সঙ্গে ছোট এলাচ চূর্ণ, লেবুর রস ও গোলাপজল মিশিয়ে রাখুন। এদিকে ময়দা ও মাখন মিশিয়ে উপরে লেখা জিনিষগুলো ঠেসতে থাকুন। এখন ডিমের শাদা অংশের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে ময়দায় মিশান, তারপর পাকপাত্রে অল্প পরিমাণ মাখন মাখিয়ে, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করে, মুখ বন্ধ করে

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

১৯৫৬ সালের ২রা জানুয়ারী আগ্রায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ১৯৫৬-৫৭ সালের জন্য ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচন করা হইয়াছে। ডাক্তার রায় শুধু চিকিৎসক বা রাজনীতিক নহেন—তাঁহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও গবেষণা ইহার পূর্বেও তাঁহাকে এই উচ্চ সম্মানের অধিকারী করিয়াছিল। ডাক্তার রায় এ বৎসরও আবার তাঁহার বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির কাজ গ্রহণ করায় বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন। এ বৎসরের জন্য ডাঃ ইউ-পি-বসু ও শ্রীবি-বি-যোশী সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রীবি-কে-সরকার কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। পরবর্তী বৎসরের জন্য অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালের শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ডিরেক্টার শ্রীএম-এস-থাকার সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। কার্য্য-নির্বাহক সমিতির ১০জন সদস্যের মধ্যে ৭জন বাঙ্গালী—অধ্যাপক এম-এন-বসু, অধ্যাপক পি-সি-মহলানবীশ, অধ্যাপক কে-এন-বাগচী, ডাঃ এ-কে-দে, অধ্যাপক জে-এন-বসু, ডাঃ পি-সেন ও শ্রীএম-এন-সিংহ। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। বিজ্ঞান আলোচনা ও গবেষণায় বাঙ্গালী যে আজও ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহা তরুণ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকদিগকে অবশ্যই নূতন প্রেরণা দান করিবে।

দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য আলোচনা—

সম্প্রতি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে পৌরসভা প্রাঙ্গণে একমাসব্যাপী নদীয়া জেলা সাংস্কৃতিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। নদীয়ার জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগরবাসী খ্যাতনামা যক্ষ্মা চিকিৎসক ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী সম্মিলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। গত ১৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার ১৭তম দিবসে তথায় দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা হইয়াছিল। সেদিন উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী সভাপতি ও শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথি ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন—তাঁহার দেশপ্রেম, নাট্যপ্রতিভা ও সঙ্গীতানুরাগের কথা দেশবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। কৃষ্ণনগরবাসী সাংস্কৃতিক সম্মিলন করিবার সময় যে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা বিস্মৃত হন নাই···ইহাই বাঙ্গালীর গৌরবের কথা। 'ভারতবর্ষের' সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়া আমরা কৃষ্ণনগরবাসীদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

শিলং-এ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র সেন নিজ হস্তে এই দুর্গামূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া 'বলেন্দ্র লজ'এ পূজা করেন

ভারত সেবক সমাজের কার্য্য—

পশ্চিমবঙ্গে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার কার্য্য চলিতেছে। সেজন্য হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় বহু খাল কাটিয়া দুর্গাপুর হইতে বাঁধে সঞ্চিত দামোদরের জল কৃষিক্ষেত্রসমূহে সেচের জন্য বণ্টন করা হইবে। ঐ কাজে ভারত সেবক সমাজের পশ্চিমবঙ্গ শাখায় কর্মীরা খাল-

কাটায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। সর্বত্র তাঁহারা মাটি কাটার কাজ গ্রহণ করিবেন এবং সেজন্য স্থানীয় কর্মীদের সমবেত করিয়া তাঁহাদের সাহায্য লইবেন। সম্প্রতি দেড় লক্ষ টাকায় ৭০ লক্ষ ঘনফিট মাটি কাটার কাজ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের লোকের স্বেচ্ছা-প্রেমের দ্বারা জনহিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইলে দেশের অর্থ বাঁচিয়া যাইবে, কাজও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে।

কলিকাতার নূতন সেরিফ—

কলিকাতা বালীগঞ্জ ৬নং ডালিয়া প্রেস নিবাসী, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইসচ্যান্সেলার ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। বরিশাল জেলায় ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ঢাকা, কলিকাতা ও অকস্‌ফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক, ১৯৩৯ সালে ভারত গভর্ণমেন্টের রেকর্ড-কীপার ও ১৯৪৯ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। তিনি মারাঠা যুগের ইতিহাস লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ভারতবর্ষে তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই সম্মান-লাভে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

দীঘায় সমুদ্রোপকূলে স্বাস্থ্য নিবাস—

গত ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দীঘায় যাইয়া নূতন স্বাস্থ্য নিবাসের উদ্বোধন ও বিজলী আলোর ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়াছেন। তথায় এক সমবায় সমিতি ২৪২ একর জমীর দখল লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন— তন্মধ্যে ৫২ একর সমিতির সদস্যদের বিলি করা হইবে। তথায় বাড়ী নির্মাণের ১০৫টি প্লট পাওয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্ট তথায় দর্শকদের জন্য ১০টি অতিথি-ভবন নির্মাণ করিবেন—উহা সকলে ভাড়া লইতে পারিবেন। তথায় মাছ, তরকারী ও অন্যান্য জিনিষের একটি বাজার খোলা হইবে। দীঘায় পথ নির্মাণের জন্য ২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এখন খড়্গপুর হইতে বা কাঁথি রোড ষ্টেশন হইতে কাঁথি হইয়া বাস বদল করিয়া দীঘা যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে কোলাঘাট—ডেবরা-সবং-এগরা হইয়া একটি এবং কোলাঘাট-তমলুক—কাঁথি হইয়া একটি—যথাক্রমে ১১২ ও ১০২ মাইল দুইটি নূতন পথ শীঘ্র নির্মিত হইবে। আপ মাদ্রাজ মেল কাঁথি রোডে থামিলে ও সরাসরি বাস যাতায়াত ব্যবস্থা হইলে বেলা সাড়ে ৪টায় কলিকাতা ছাড়িয়া রাত্রি সাড়ে ৯টায় দীঘা যাওয়া যাইবে এবং ভোর সাড়ে ৫টায় দীঘা হইতে রওনা হইয়া সকাল সাড়ে ১০টায় কলিকাতা আসা চলিবে। সেদিন যে নূতন দ্বিতল ভোজনাগার খোলা হইয়াছে তথায় ১৫জন দর্শক বা ভ্রমণকারী ২।৩ দিন থাকিতে পারিবেন। দীঘায় সমবায় সমিতি বাড়ীগুলি তৈয়ার করিবে ও রাজ্য সরকার রাস্তা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করিবে। দীঘা হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্ত ২০০ গজ চওড়া ও সাড়ে ৬ মাইল লম্বা সমুদ্রতট ভারতের অন্যান্য স্থানের সমুদ্রতটের তুলনায় অনেক মনোরম। এই মসৃণ সমুদ্রতটের বালীতে পা বসিয়া যায় না—তথায় বিমান অবতরণ করিতে পারে এবং মোটরগাড়ী তাহার উপর দিয়া ৬০ মাইল বেগে চলিতে পারে। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই সমুদ্র শান্ত থাকে—ঢেউও আকারে ছোট। পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রোপকূলে কোন স্বাস্থ্য নিবাস না থাকায় লোককে পুরী, গোপালপুর বা ভাইজাগে যাইতে হইত। আমাদের বিশ্বাস, দীঘায় সত্বর এক চমৎকার স্বাস্থ্য নিবাস গড়িয়া উঠিবে। স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ছাত্রছাত্রীদের ঐ মনোরম স্থান দেখাইবার ব্যবস্থা করিলে তাহারা নূতন আমোদের সন্ধান পাইবে।

শিশুশিক্ষা প্রদর্শনী—

গত ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শিশুশিক্ষা ভবনের (২৩এ, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীটস্থ) স্কুল বাড়ীতে নার্সারী প্রণালী সম্বন্ধে যে প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল তাহা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বিভিন্ন জীবজন্তুর আকৃতির সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য একটি ঘরে হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি ৭০টি বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তুর মাটির প্রতিকৃতি তৈয়ারী করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া দেয়ালগুলিতেও বহু জীব-জন্তুর ছবি টাঙ্গান ছিল। আর একটি ঘরে কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতিতে পড়াইবার বিভিন্ন চার্ট ও নার্সারী শিক্ষার নানা সরঞ্জাম ছিল। এই ধরণের চার্টের মাধ্যমে শিশুরা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষালাভ করে। অপর দুইটি ঘরে

কথামালার গল্পের কয়েকটি মডেল রক্ষিত ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির দর্শকদের নিকট সহজ ও সরল ভাষায় সেই গল্পগুলি বলা সুন্দর হইয়াছিল। মডেলগুলির মধ্যে 'শিয়াল ও সারস', 'রাখাল ও বাঘ', 'শিয়াল ও আঙ্গুর ফল' প্রভৃতি কাহিনীগুলি উপভোগ্য হইয়াছিল। অপর ঘরটি ভূগোল ও বিজ্ঞানের ঘর। এই ঘরে মডেলের সাহায্যে দেখান হয় উত্তর মেরু, পিরামিড, আগ্নেয়গিরি, কয়লার খনি, দ্বীপ, হ্রদ, পর্বত, উপত্যকা প্রভৃতি। এই ঘরেই একদিকে একটি শিশু সাদা রংএর মধ্যে যে সাতটি রং আছে তাহা একটি যন্ত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া সকলকে মুগ্ধ করে। এই ধরণের শিশুশিক্ষা কেন্দ্র আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অল্পই আছে। আমরা শিশুশিক্ষা ভবনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি এবং কিণ্ডার গার্টেনের মাধ্যমে শিশুশিক্ষার বহুল প্রচার আশা করি।

পরলোকে প্রতুলচন্দ্র দাস—

বিগত ১৯৫৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে প্রতুলচন্দ্র দাস পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি খ্যাতনামা ডাক্তার সার কেদারনাথ দাসের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এস. সি. পরীক্ষায় পাস করার পর তিনি চাটার্ড্ একাউণ্টশিপ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান এবং তথা হইতে ফিরিয়া কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি মার্টিন কোম্পানির রেলওয়ের প্রধান নিরীক্ষক ছিলেন এবং পরে অ্যাসোসিয়েটেট ইলেকট্রিকেল ইনডাস্ট্রী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের প্রধান গাণনিক ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানির প্রধান গাণনিক নিযুক্ত হন। তিনি নিরলস কর্মী ছিলেন! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কর্ম করিয়া গিয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ক্রিকেট, ফুটবল, বিলিয়ার্ড প্রভৃতি খেলায় বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া ছিলেন এবং শিকারেও তাঁর

প্রতুলচন্দ্র দাস
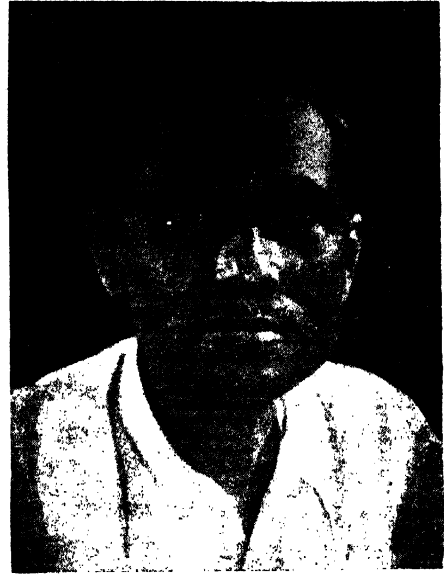
বিশেষ সুনাম ছিল। তিনি স্ত্রী, ভ্রাতা ও একমাত্র পুত্র, যন্ত্র সঙ্গীতের সুদক্ষ শিল্পী শ্রীমুকুল দাস এবং অসংখ্য আত্মীয় পরিজনকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ—নিউজিল্যাণ্ড টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ৪৫০ (২ উইকেটে ডিক্লেঃ সাটক্লিফ ২৩০ নট আউট, রীড ১১৯ নট আউট, গাই ৫২) ও **১১২** (১ উইকেটে ; লেগাট ৫০ নট আউট)

ভারতবর্ষ ঃ ৫৩১ (৭ উইকেটে ডিক্লেঃ মঞ্জরেকার ১১৭, রামচাঁদ ৭২, নদকরাণী ৬৮, কনট্রাক্টার ৬২)

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের ৩য় টেষ্ট খেলা ড্র যায়। নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ব্যাট করে। খেলার দ্বিতীয় দিনে চা-পানের সময় ২ উইকেটের ৪৫০ রানে তারা ১ম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। বার্ট সাটক্লিফ ২৩০ রান ক'রে এবং রীড ১১৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ভারতবর্ষ কোন উইকেট না হারিয়ে ২৪ রান করে। খেলার ৪র্থ দিনে ৫ উইকেট হারিয়ে ভারতবর্ষের ৩৯৩ রান ওঠে। ৫ম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষ ৭ উইকেটে ৫৩১ রান তুলে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। টেষ্ট খেলায় এই ৫৩১ রান ভারতবর্ষের পক্ষে এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান হিসাবে গণ্য হয়।

ভারতবর্ষ ঃ ১৩২ (ঘোরপাড়ে ৩৯। রীড ১৯ রানে ৩, এ্যালবাস্টার ৮ রানে ২ এবং হেজ ৩৮ রানে ২ উইঃ) ও **৪৩৮** (৭ উইকেটে ডিক্লেঃ রামচাঁদ নট আউট ১০৬, পি রায় ১০০, মঞ্জরেকার ৯০, কনট্রাক্টার ৬১)

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ৩৩৬ (রীড ১২০, গাই ৯১। গুপ্তে ৯০ রানে ৬ উইঃ) ও **৭৪** (৬ উইকেটে। গুপ্তে ৩০ রানে ২, মানকাদ ১৪ রানে ২, ফাদকার ১১ রানে ২ উইঃ)

ক'লকাতায় ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের ৪র্থ টেষ্ট খেলাও ড্র যায়। ভারতবর্ষ প্রথম ব্যাট করে। মাত্র ৪৯ রানে ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট পড়ে যায়। চা-পানের কিছু আগে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস মাত্র ১৩২ রানে শেষ হয়। নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ভারতবর্ষের পক্ষে এক ইনিংসে এই ১৩২ রানই সর্ব্বাপেক্ষা কম রান। খেলার প্রথম দিনের সম্মান নিউজিল্যাণ্ড দলই লাভ করে। ঐ দিন এক উইকেট হারিয়ে নিউজিল্যাণ্ড ৩৫ রান করে। ভারতীয় দলের কোন ব্যাটসম্যানই আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারেন নি। নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়ার ভুলে দু'জন রান আউট হন। নিউজিল্যাণ্ড দলের নিখুঁত বোলিং এবং শক্ত বাঁধুনির ফিল্ডিংয়ে ভারতীয় দলের বিপর্য্যয় দেখে দর্শক সাধারণ পরাজয়ের মনোভাব নিয়েই সেদিন বাড়ী ফিরলেন।

২য় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের ৪ উইকেট পড়ে রান ওঠে ২৬২। রীড ১২০ রান করে নট আউট থাকেন। তাঁর দর্শনীয় 'কাট' এবং 'ড্রাইভ' দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। গাই ৯১ রান ক'রে গুপ্তের বলে এল-বি-ডবলউ হ'ন।

খেলার ৩য় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ৩৩৬ রানে শেষ হ'লে তারা ভারতবর্ষের থেকে ২০৪ রানে এগিয়ে যায়। ১ উইকেট পড়ে ঐদিন ভারতবর্ষের ১০৭ রান ওঠে।

খেলার ৪র্থ দিনে ভারতবর্ষ ৪ উইকেটের বিনিময়ে ৩০১ রান করে। পি রায় সেঞ্চুরী করেন।

৫ম দিনে ভারতবর্ষ ৭ উইকেটে ৪৩৮ রান ক'রে ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। রামচাঁদ ১০৬ রান

করে নট আউট থাকেন। ২৩৪ রান পিছনে থেকে নিউজিল্যাণ্ড চা-পানের ৩০ মিনিট আগে (২-৩০ মিঃ) ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। নাম করা খেলোয়াড়রা একে একে আউট হ'তে লাগলেন, ৬টা উইকেট পড়ে রান দাঁড়াল ৫৫। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে খেলা চলতে থাকে। স্পিন বোলারদের পক্ষে উইকেট সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। গুপ্তে এবং মানকাদ তার সদ্ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষের ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার পর খেলার সময় ছিল মাত্র দেড় ঘণ্টা। এই অল্প সময়ে ভারতবর্ষ ৬টা উইকেট পায়, ওদিকে রান ওঠে ৭৪। এই দেড় ঘণ্টা সময়ের উত্তেজনা নিউজিল্যাণ্ডের মনে থাকবে। সময়ই তাদের শেষ রক্ষা করে।

ভারতবর্ষ: ৫৩৭ (৩ উইকেটে ডিক্লেঃ মানকাদ ২৩১, পি রায় ১৭৩, উমরীগড় ৭৯ নট আউট)

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ২০৯ (সাটক্লিফ ৪৭। গুপ্তে ৭২ রানে ৫, প্যাটেল ৬০ রানে ৩ উইঃ) ও **২১৯** (লেগাট ৬১, রীড ৬৩। গুপ্তে ৭৩ রানে ৪ এবং মানকাদ ৬৫ রানে ৪ উইকেট)

মাদ্রাজের ৫ম অর্থাৎ শেষ টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ এক ইনিংস এবং ১০৯ রানে জয়ী হ'লে ভারতবর্ষ ২—০ খেলায় নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে 'রাবার' লাভ করে। পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ ২টিতে জয়ী হয় এবং বাকি ৩টি খেলা ড্র যায়।

একাধিক কারণে এই টেষ্ট খেলা স্মরণীয়। ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসে ৫৩৭ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)ভারতবর্ষের পক্ষে টেষ্ট খেলায় এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান করার রেকর্ড হয়েছে। ১ম উইকেটের জুটিতে ভিনু মানকাদ এবং পঙ্কজ রায়ের ৪১৩ রান টেষ্ট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ১ম উইকেটের জুটিতে পূর্ব্বের বিশ্ব রেকর্ড—হাটন এবং ওয়াসব্রুকের ৩৫৯ রান (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, জোহানেসবার্গ ১৯৪৮-৪৯)। ১ম উইকেটের জুটিতে পঙ্কজ রায় এবং ভিনু মানকাদ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৪১৩ রান ভারতবর্ষের পক্ষে টেষ্ট খেলায় যে কোন উইকেটের সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড হয়েছে। ভিনু মানকাদের ব্যক্তিগত ২৩১ রান ভারতবর্ষের পক্ষে এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান করার রেকর্ড হয়েছে।

খেলার প্রথমদিন ভারতবর্ষের কোন উইকেট না পড়ে ২৩৪ রান ওঠে (মানকাদ ১০৯ এবং পঙ্কজ রায় ১১৪)। ২য় দিনে ৩ উইকেট পড়ে রান দাঁড়ায় ৫৩৭। ৩য় দিন ভারতবর্ষ পূর্ব্বদিনের ৩ উইকেটে ৫৩৭ রানের ওপর ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। উমরীগড় ৭৯ রান করে নট আউট থাকেন। মানকাদ টেষ্ট খেলায় দ্বিতীয়বার ডবল সেঞ্চুরী (২৩১ রান) করেন। প্রথম করেন ২২৩ রান, নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, বোম্বাইয়ে। ভারতবর্ষের পক্ষে টেষ্টে এ পর্য্যন্ত মাত্র দু'জন খেলোয়াড়, মানকাদ (২২৩ ও ২৩১) এবং উমরীগড় (২২৩) 'ডবল' সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন।

৩য় দিনের খেলায় ৬ উইকেট হারিয়ে নিউজিল্যাণ্ড ১ম ইনিংসে ১৫৬ রান করে। ৪র্থ দিনে নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ২০৯ রানে শেষ হ'লে নিউজিল্যাণ্ড 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। ঐদিন ২য় ইনিংসে ১ উইকেট পড়ে রান দাঁড়ায় ১২৪ (লেগাট নট আউট ৬১)। ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে তখনও তাদের ২১৫ রান দরকার। ৫ম অর্থাৎ শেষ দিনের খেলার সুরু থেকেই নিউজিল্যাণ্ডের দারুণ ভাঙ্গন আরম্ভ হ'ল। ৬টা উইকেট পড়ে গেল আর মাত্র ৫৭ রান যোগ হ'ল পূর্ব্বদিনের ১ উইকেটের ১১৪ রানের সঙ্গে। লাঞ্চের সময় স্কোর ছিল ১৮১, ৭ উইকেটে। হাতে তখন ৩টে উইকেট, ভারতবর্ষের থেকে ১৪৭ রান পিছনে। নিউজিল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস শেষ হয় লাঞ্চের পর ৭৫ মিনিট খেলে। হেজ অসুস্থতার দরুণ ব্যাট করেন নি।

আলোচ্য ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ড টেষ্ট সিরিজে সুভাষ গুপ্তে মোট ৩৪টি উইকেট পেয়ে ১৯৫১-৫২ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে মানকাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত টেষ্ট সিরিজে সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার ভারতীয় রেকর্ডের সমান করেন।

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের 'প্যারালাল' প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে হায়দ্রাবাদের রামকৃষ্ণ জয়লাভ করেন। পুরুষদের সাধারণ সিঙ্গলস ফাইনালে পুন ওয়েং হো (সিঙ্গাপুর) সিঙ্গাপুরের লো হেং চুকে পরাজিত করেন।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ ফাইনাল

পুরুষবিভাগ : বোম্বাই বাংলাকে পরাজিত করে।

মহিলাবিভাগ : মহারাষ্ট্র বোম্বাইকে পরাজিত করে।

জুনিয়ারবিভাগ : বিজয়ী দিল্লী।

ব্যক্তিগত বিভাগ ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : কে রামকৃষ্ণ (হায়দ্রাবাদ) উত্তম চন্দ্রাণাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন ২২-২০, ১৬-২১, ১১-২১, ২১-১৯, ২১-১৭ গেমে।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস সৈয়দ সুলতানা (হায়দ্রাবাদ) মীণা পারাণ্ডেকে পরাজিত করেন ২১-১৮, ২১-১৮, ২৩-২১ গেমে।

মিক্সড ডবলস : রণবীর ভাণ্ডারী (বাংলা) এবং মিস সুলতানা (হায়দ্রাবাদ) ২১—১০, ২১—১৪, ২১—১৫ গেমে সুধীর থাকার্সে (বোম্বাই) এবং মিস মীণা পারাণ্ডেকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস : যতীন ভায়াস এবং উত্তম চন্দ্রাণা (বোম্বাই) ২১—১৭, ১৭—২১, ২১—১৭, ২১—১১ গেমে হাঙ্গেরীয়ান জুটি এফ সিডো এবং ককৃজিয়ানকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে সৈয়দ সুলতানা এবং নলিনী জয়লাভ করেন।

এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপস ঃ

ক'লকাতার সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত ৫ম এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতার সকল বিভাগেই বৈদেশিক খেলোয়াড়রা জয়লাভের সম্মান লাভ করেছেন। এই প্রতিযোগিতার প্রথম বছর, ১৯৫০ সালেই কেবল ভারতবর্ষ দু'টি বিভাগে খেতাব লাভ করে,—পুরুষদের সিঙ্গলসে দিলীপ বসু এবং পুরুষদের ডবলসে দিলীপ বসু এবং সুমন্ত মিশ্র। এ ছাড়া বাকি চার বারের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ কোন বিভাগে জয়লাভ করতে পারে নি এমন কি ১৯৫০, ১৯৫১ এবং ১৯৫৪ সালের প্রতিযোগিতায় কোন বিভাগের ফাইনালে পর্য্যন্ত উঠতে পারে নি। দু'বছর ১৯৫২-৫৩ সালে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নি। ১৯৫৫ সালের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ পুরুষদের ডবলস এবং মহিলাদের ডবলসের ফাইনালে উঠে হেরে যায়। ১৯৫৫ সালের ফাইনাল খেলার ফলাফল—

পুরুষদের সিঙ্গলস : কুর্ট নিয়েলসন (ডেনমার্ক) ৬-২, ৬-৪, ৬-১ গেমে জ্যাক্ আর্কিনষ্টলকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস : রোগার বেকার এবং জে ব্যারেট (বৃটেন) ১১-১৩, ৬-৪, ৬-৩, ৬-৪ গেমে আর কৃষ্ণাণ এবং নরেশ কুমারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস এ গিবসন (আমেরিকা) ৬-৩, ৯-১১, ৬-২ গেমে গতবারের বিজয়িনী এস কামোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস : মিস টি জেডেন এবং মিস আই ডগ্লার (জার্মেনী) ৬-৩, ৯-৭ গেমে মিস এল উড্ব্রীজ এবং মিসেস এস আর মোদীকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : হ্যামিলটন রিচার্ডসন এবং মিস এ গিবসন (আমেরিকা) ৬-১, ৬-৩ গেমে জে ব্যারেট এবং মিস বাক্সটনকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

ত্রিদলীয় টেবল টেনিস টেষ্ট ঃ

হাঙ্গেরী, ভারতবর্ষ এবং সিঙ্গাপুর—এই তিনটি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ত্রিদলীয় টেবল টেনিস টেষ্ট খেলায় হাঙ্গেরী 'রাবার' লাভ করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে হাঙ্গেরী জয়লাভ করে ১ম টেষ্ট (ক'লকাতা), ২য় টেষ্ট (লক্ষ্ণৌ) এবং ৫ম টেষ্ট (মাদ্রাজ)। ভারতবর্ষ জয়ী হয় ৩য় টেষ্ট (বোম্বাই) এবং ৪র্থ টেষ্ট (বাঙ্গালোর)। প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ ২য় স্থান লাভ করে।

জাতীয় কবাডী প্রতিযোগিতা ঃ

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কবাডী প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা দু'দিনই অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়াতে বাঙ্গলা এবং মধ্যপ্রদেশ যুগ্মভাবে ১৯৫৫ সালের চ্যাম্পিয়ান খেতাব লাভ করেছে।

জাতীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপস ঃ

১৯৫৫ সালের জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের চূড়ান্ত ফলাফল—

পুরুষদের সিঙ্গলস : এস ডেভিডসন (সুইডেন) ৬-৪, ৬-১, ১৫-১৭, ৬-৩ গেমে কুর্ট নিয়েলসন (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস এ গিবসন (আমেরিকা) ৬-২, ৬-২ গেমে মিস কামোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস : এস ডেভিডসন (সুইডেন) এবং কুর্ট নিয়েলসন (ডেনমার্ক) ৬-২, ৬-৪, ৬-৪ গেমে আর কৃষ্ণান এবং নরেশ কুমারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে : মিস গিবসন এবং কে ফ্যাগোরস (আমেরিকা) ৬-১, ৬-৪ গেমে মিস এ বক্সটন এবং মিস পি ওয়ার্ডকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : জে ব্যারেট এবং মিস এ বক্সটন (বৃটেন) ৬-৩, ৬-২ গেমে বব্ পেরী এবং মিস্ কে ফ্যাগোরসকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

এশিয়ান চতুর্দ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ এশিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ সব খেলাতেই জয়লাভ ক'রে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৫২ সাল থেকে প্রতিবারই ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ান খেতাব পেয়ে এসেছে। ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ান হয়। খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ভারতবর্ষ ৫—২ গোলে ব্রহ্মদেশকে, ৪—৩ গোলে সিংহলকে এবং ২—১ গোলে পাকিস্তানকে পরাজিত করে। পাকিস্তান দু'টি খেলায় জয়ী হয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। পাকিস্তান ৪—২ গোলে ব্রহ্মদেশকে এবং ২—১ গোলে সিংহলকে পরাজিত করে। ৩য় স্থান লাভ করে ব্রহ্মদেশ; তারা সিংহলকে ৩—১ গোলে হারায়।

সাহিত্য সংবাদ

শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র ঃ শ্রীগোপালচন্দ্র রায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

শাস্ত্রে বলে—জীবেম শারদং শতং। শরৎচন্দ্র অবশ্য শতবর্ষ বাঁচেন নি, তবু যে বয়সে তিনি প্রয়াণ করেছেন সে বয়সকে পরিণত বলাই চলে ; আর বাঙালীর মানসলোকে তাঁর উপস্থিতি যে শতবর্ষ পরেও হবে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। বাংলার সাহিত্য আকাশে যেদিন তাঁর আবির্ভাব হলো, সেদিন মাইকেল হয়ে গেছেন ইতিহাস, বঙ্কিম হয়েছেন ঋষি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ঢুকেছেন দেবতাদের গোষ্ঠীতে, শ্রীঅরবিন্দ ডুবে গেছেন ধ্যানের নৈঃশব্দে আর রবীন্দ্রনাথ সারা সাহিত্য-গগন জুড়ে বসে আছেন অভ্রভেদী জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ রূপে, তুষার কিরীটী চূড়ায়,—শুভ্র অচঞ্চল নিবাত নিষ্কম্প। তাঁকে দেখে দূর থেকে প্রণাম করা যায়, কাছে গিয়ে সুখ দুঃখের কথা বলতে ভয় হয়। এমনি যুগে বাঙালীর মন চাইছিল একটি ঘরের মানুষকে যে সহজ ভাষায় দোষেগুণে রসিয়ে অপূর্ব্ব অনুভূতিতে রাঙিয়ে ঘরের কথা বলবে, যার গল্পত্ব ডুবে যাবে না ভাষার তীক্ষ্ণতায়, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কল্পনার অসীমতায়, বৈদগ্ধ্যে দগ্ধ হবে না নরনারীর চিরন্তনী বেদনা। সেই মানুষই ছিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি এলেন, দেখলেন, জয় করলেন বাঙালীর মনটিকে, পেলেন তাঁর হৃদয়ের অপরূপ আতিথ্য, তুললেন সেই রহস্যসাগর থেকে শুকুতি মুকুতা। রিক্ত তিক্ত শ্রান্ত ক্লান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী লক্ষকণ্ঠে জয়ধ্বনি করলে সেই অপরাজেয় কথাশিল্পীর। তাই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের সীমা নেই, তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জানতে আমাদের এত উৎসাহ, এত গবেষণা। যদিও কখনও এই কৌতূহলের আতিশয্য রসিকমনের সীমা লঙ্ঘন করে যায় তবু একথাও সত্য যে কোন মনীষীর জীবনীর তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বৈজ্ঞানিক রীতিতে সঙ্কলিত না হলে তার সাহিত্যিক জীবনে ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তার বিচার সুষ্ঠু হয় না। প্রীতিভাজন গোপালচন্দ্রকে এ বিষয়ে প্রায় পথিকৃৎ বলে অভিনন্দিত করলেও অত্যুক্তি হয় না। যথেষ্ট পরিশ্রম আপ্রাণ চেষ্টা, অক্লান্ত উৎসাহ নিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবনের নানাদিকে তিনি আলোক সম্পাত করেছেন, তাঁর বৈঠকী গল্প শুনিয়েছেন, তাঁর চিঠিপত্র সঙ্কলন করেছেন। এজন্য অজস্র সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই এই বাহ্য সামাজিক শরৎচন্দ্রের ঊর্দ্ধে রসলোকের তুঙ্গশিরে সমাসীন মরমী শরৎচন্দ্রকে। সত্যিই তাঁর চিঠিগুলি বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ। কী বলার ভঙ্গী, কী ভাষার স্বচ্ছতা, কী বিচারশক্তি, কী আত্মপ্রত্যয়। যেদিন তাকে কেউ চিনতো না, সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল দুর্লভ সেদিন তাঁর স্থির অবিচলিত বিশ্বাস "কাল আমার বিচার করবে" "নিরপেক্ষ সত্য এইটাই আমি সাহিত্যে চাই"। তাঁর নিজের কথাতেই বলি, "আর্টের জন্য আর্ট একথা আমি পূর্ব্বেও কখনও বলি নি, এর তাৎপর্য্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি নি। এটা উপলব্ধির বস্তু, সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে বোঝানো যায় না। সাহিত্যের আর একটা দিক আছে—বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। মানুষের সুগভীর বাসনা, নরনারীর একান্ত গূঢ় বেদনার বিবরণ সাহিত্য প্রকাশ করবে না ত করবে কে? মানুষকে মানুষ চিনবে কোথা দিয়ে—সে বাঁচবে কি করে—মানুষের রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকু যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি তার, আর বেশী কিছু করবার আমার নেই।" এর সঙ্গে ইনটেলেকচুয়াল গল্পেরও সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল সে কথাও চিঠিপত্রে জানা যায়। কবিগুরুর সঙ্গে সাহিত্যের মূল্য, সুনীতি দুর্নীতি, কংগ্রেস, চরকা শিক্ষার মিলন প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর মতভেদ হলেও এতবড় প্রণাম কোন সাহিত্যিক বোধ হয় তার সমকালীন অন্য কোন সাহিত্যিককে দেয় নি। 'পথের দাবী' সম্বন্ধে কবি যখন বইখানি উত্তেজক, এই বলে লিখলেন যে, শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আর বর্ত্তমানের প্রলোভনে যারা এই রকম সাহিত্য সৃষ্টি করে রসসরস্বতীর তপোভঙ্গ করেন তাদের আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করা উচিত নয়। তখন শরৎচন্দ্রকে কবির সাবধান বাণী কি রকম বিচলিত করেছিল তার পরিচয় পাই এই চিঠিপত্রের মধ্যে। দুই সাহিত্যরথীর পত্রালাপের মধ্যে দুই দৃষ্টিভঙ্গীর যে রূপ ফুটে উঠেছে তার তুলনা ক্বচিৎ পাওয়া যায়। ডিসরেলির ভাষাতেই বলি "I am certain there is no greater misfortune than to have a heart which will never grow old." মনের এই দুরন্ত যৌবনই শরৎচন্দ্রকে কালজয়ী করেছে।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ৫৲ টাকা।]

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরহি-মাধব ঃ শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী খ্যাতনামা প্রবীণ কবি—তিনি লীলা সঙ্গী, পুনর্নবা, রক্তকমল, যুগ শংখ, নব সূর্য্য প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া যশ ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব, অধিকাংশ লেখাই বাংলার প্রাণ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাপ্রসঙ্গ লইয়াই রচিত। খ্যাতনামা বৈষ্ণব মত ব্যাখ্যাতা ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বর্তমান গ্রন্থ—বিরহি মাধবে'র সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বিরহ-বেদনায় ভক্ত কাঁদিতেছে, ভগবানও কাঁদিতেছেন, বার্তাবহ

প্রেরিত হইতেছে, কিন্তু ভাগবতে সে বার্তাবহ বৃন্দা দেবী নহেন, উদ্ধব মহারাজ। ভক্তের নিকট হইতে ভগবানের দিকে নহে, ভগবানের নিকট হইতে ভক্তের দিকে। ব্রজ হইতে মথুরায় নহে, মথুরা হইতে ব্রজে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪৬ তম ও ৪৭ তম অধ্যায়ে উদ্ধবসংবাদ বর্ধনে শুকদেবের মর্মবাণী মূর্ত হইয়াছে।" এই উদ্ধব—সংবাদ লইয়া 'বিরহি-বাধব' রচিত হইয়াছে। ভাগবতের মত প্রাণস্পর্শী ভাষাতেই সরস্বতী মহাশয় এই কাব্যগ্রন্থখানি লিখিয়াছেন।

এই চির-বিরহ কথা—যে বিরহ প্রেমিক তাহার দয়িতার জন্য সাময়িক ভাবে অনুভব করে এবং প্রত্যেক মানুষ তাঁহার চির-প্রিয়ের জন্য অহোরাত্র, সারাজীবন ধরিয়া জানায়—ভাগবতের বর্ণনাও আমাদের কবি সরস্বতীর আকৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। যতই পড়া যায়, মন ততই ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার অনুসন্ধান করে।

"নহে নহে দূরে অন্তরপুরে
আছে অন্তরতম
অরণির মাঝে বহ্নি যেমন
ক্ষীরে নবনীত সম।"

[প্রাপ্তিস্থান: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—১৲ টাকা।]

সন্ধিক্ষণ: শ্রীপ্রশান্ত মুখোপাধ্যায়।

সিংহমূর্তি, কল্পলোক, পথিক ও সন্ধিক্ষণ—এই ৪টি বড় কবিতা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। কল্পলোকে কবি লিখিয়াছেন—

জাগে জীবনের চির-পুরাতন চির-নূতনের গান,
প্রেমের পরশে মানব-মানবী ধরায় তুলেছে তান।
সকল লোকের মিলন হেথায় মাধুরি করিছে দান,
কল্পলোকের প্রবাসী যুবার সার্থক হল প্রাণ।

ইহাই কবির পরিচিতি। নবীন কবির ভাষা, ছন্দ ও ভাব প্রশংসনীয়। কবির কাব্যালোচনা জয়যুক্ত হউক।

[প্রাপ্তিস্থান: ৮এ, মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য ৷৷৹ আনা।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জিমির ঝকমারি: জেমস্ থারবার: অনুবাদক: অ-কু-রা

আধুনিক কালের বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে আমেরিকান রস-সাহিত্যিক জেমস্ থারবার তাঁদের অপরিচিত নন। গুরু গম্ভীর সাহিত্য রচনা অপেক্ষা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অবহেলিত ঘটনাকে সাহিত্যে রূপ দেওয়াই জেমস্ থারবারের বৈশিষ্ট্য। তিনি সাহিত্য-জগতে ব্যঙ্গ সাহিত্যিক হিসাবেই পরিচিত। যদিও সে ব্যঙ্গের পশ্চাতে থাকে গভীর সংকেত, যা চিন্তাশীল পাঠকের মনকে নাড়া দেয়। সারা জীবনে অনেক লিখেছেন থারবার। My life and hard times নামক গ্রন্থখানিও তাঁর একটি বিশেষ সাহিত্যকীর্তি। আলোচ্য বইটি তাঁর সেই বিখ্যাত রচনার বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন অ-কু-রা। অনুবাদ স্বচ্ছন্দ এবং সরল,—প্রশস্ত। আশা করি যাঁরা পড়বেন তাঁদেরও ভালো লাগবে। ছাপা এবং গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা ভালোই।

[প্রকাশক: হসন্তিকা প্রকাশিকা। ৩৯-বি, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২৬। দাম—১৷৷৹ আনা]

বি. না. চ.

অপরিচিতার চিঠি: নীলরতন মুখোপাধ্যায়

মোট ৭টি গল্পের সঞ্চয়ন। লেখক নবীন হইলেও রচনায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করে। ভাষা মনোরম ও সুখপাঠ্য। গ্রন্থের মুদ্রণ পারিপাট্য ও আঙ্গিকসজ্জা সুরুচির পরিচায়ক। এই কারণে ইহা প্রিয়জনকে উপহার দিবার বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক: অগ্রণী প্রকাশনী। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা ৬। মূল্য—২৲ টাকা।]

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

অঙ্গুরীয় সংবাদ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
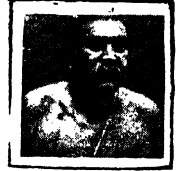
ফাল্গুন—১৩৬২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

বেদের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য

শ্রীনলিনীকান্ত সেন

ভারতের প্রথম প্রভাতে, জাতির সে গৌরবোজ্জ্বল যৌবনে অগাধ আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি সক্রিয় ছিল, বোধিদীপ্ত সূক্ষ্মদর্শন ছিল, জ্ঞান ও ধর্ম-বিষয়ক চিন্তা ছিল গভীর ও সুস্পষ্ট এবং সে চিন্তার ধারা ছিল সুদূরপ্রসারী, কর্ম ও সৃষ্টি ছিল বীরোচিত; আর তা থেকেই হয়েছে ভারতের অনন্যসুলভ সংস্কৃতির ও সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন, তার পরিকল্পনার রেখাপাত ও স্থায়ী সৌধনির্মাণ। সে আদিম যুগের মনীষার পরিচয় পাই বেদ, উপনিষদ ও দুখানি মহাকাব্যে, তার প্রতিভার এই চারিটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি থেকে। আকার, প্রকার বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের গৌরবে তার যে কোন একখানার সমকক্ষ রচনা অন্য কোন সাহিত্যে পাওয়া সহজ নয়। প্রথম দুখানি হল জাতীয় অস্তিত্বে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম-জীবনের সর্বস্বীকৃত ভিত্তি, আর দুখানা হল জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠযুগের কবিকল্পনায় রূপায়িত চিত্র—যে-সব সংস্কারে তার অন্তর গঠিত হয়েছিল, যে-সব আদর্শে তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হত, যে-সবরূপে তখন মানুষকে, ভগবানকে ও বিশ্বের সব শক্তিকে দেখা হত, সে-সবের ব্যাখ্যান। বেদে পাই সে-সবের প্রথম প্রতীক ও প্রতিরূপ—রূপক-বহুল আধ্যাত্মিক সম্বোধিতে এবং আধিদৈবিক ও আত্মিক অভিজ্ঞতাতে সে-সবকে যে-ভাবে দেখা ও রূপ দেওয়া হয়েছিল। উপনিষদে সব আকার প্রতীক প্রতিরূপের ব্যূহ ভেদ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সে-সব সম্পূর্ণ বর্জন করা হয় নি, মূলসুরের সঙ্গে সংবাদী বা গৌণ সুরের মত সে-সব রয়েছে। অনুপম কবিত্বময় ভাষায়, অনন্য-

সুলভ নিজস্বরূপে, তা আত্মা, ভগবান, মানব এবং বিশ্বের ও তার সব তত্ত্বের ও শক্তির চরম অনুত্তরণীয় সব সত্য উদ্ঘাটিত করেছে, সে-সবের স্বরূপতম অন্তরতম ব্যাপকতম বাস্তবতার রূপে এবং নিগূঢ় হ'ক বা সুস্পষ্ট হ'ক, সে-সবের উর্দ্ধতম সব সত্য প্রত্যক্ষ করেছে বোধিদীপ্ত লোকোত্তর দৃষ্টিতে—অথবা তাও অতিক্রম ক'রে, বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির আলোকে এবং তার বাধামুক্ত অব্যাহত অনুভবে। তার পর আসে পরিণত বুদ্ধির ও জীবনের সব শক্তিমান সুন্দর সৃষ্টি, যা মনীষা-নীতি-রসবোধের, অন্তঃকরণ-হৃদয়াবেগ-সংবেদনের ও স্থূল জগতের সব জ্ঞান সংস্কার প্রত্যক্ষদর্শন ও অভিজ্ঞতার ফল। মহাকাব্যে পাই তার প্রথম লিপিবদ্ধ রূপ, আর পরবর্তী সাহিত্যে পাই তারই অনুক্রম। কিন্তু তার মূল চিরকাল একই আছে; অনেক সময় নূতন, হয়ত বা মহত্তর আদর্শ বা ভাবসমৃদ্ধ প্রতিরূপ পুরাতনের স্থান নিয়েছে, কিংবা বাহির থেকে এসে সমষ্টিতে যুক্ত হয়েছে অথবা তাকে অল্পবিস্তর পরিবর্তিতও করেছে, কিন্তু সে-সবেরই মূল গঠন ও প্রকৃতি সেই প্রথম সৃষ্টি ও আদিম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার রূপান্তর বা প্রসারণমাত্র, অসংশ্লিষ্ট ব্যতিক্রম নয়। পরিবর্তন যতই আসুক না কেন, যেমন চিত্রে-ভাস্কর্যে তেমনি সাহিত্য-সৃষ্টিতে, ভারতীয় মনীষার প্রকাশে একটা সুসংলগ্ন পারম্পর্য অব্যাহত আছে।

বৈদিক ঋষিদের মনোবৃত্তি এখনকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল; তাঁরা দেখতেন বোধির আলোকে, প্রকাশ করতেন প্রতীক রূপকের ভাষায়। পরের যুগে মানব-মনোবৃত্তি প্রখর বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত—তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, একদিকে, তর্কবিদ্যার সংস্কার ও বস্তুবিবিক্ত ধারণা আর অন্যদিকে, জীবন ও জড় জগতের যে স্থূলরূপ ইন্দ্রিয়-বোধ ও ব্যাবহারিক বুদ্ধির কাছে ধরা দেয়; সে-সবের মধ্যে সে কোন দিব্য বা অলৌকিক তাৎপর্যের সন্ধান করে না; কল্পনার প্রশ্রয় সে দেয় শুধু রসাত্মক রচনা উদ্ভাবনের একটা খেলা বলে, সত্যের দ্বার উন্মোচন করে বলে নয়, তার নির্দেশ গ্রহণ করে শুধু যখন ন্যায়ানুগ বিচারে ও স্থূল অভিজ্ঞতাতে তার সমর্থন মেলে; বোধির প্রকাশ সে জানে শুধু তাকে বুদ্ধির দেওয়া পরিচ্ছদে সযত্নে সজ্জিত ক'রে, অন্যথা প্রায়শই তার প্রতিকূলতা করে। তাই এ মনোবৃত্তির কাছে পুরাকালের ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারেই অপরিচিত। সুতরাং, কেবল ভাষার বাহিরের খোলস ছাড়া, বেদ যে একেবারেই আমাদের বোধগম্য নয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। আর, দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দযোজন-প্রণালীর বাধার জন্য সে পরিচয়ও হয়েছে আবার অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিসঙ্কুল। তার ফলে, মানব জাতির নবযৌবনের প্রদীপ্ত মনীষার এই মহৎ সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে আনাড়ি হাতের আঁচড় বা অজ্ঞের বিকৃত শ্রীহীন অসংলগ্ন রচনা; অন্যথা যা প্রকৃতি-পূজকের আনুষ্ঠানিক ধর্মের সরল নীরস বর্ণনা হতে পারত যাতে বর্বরোচিত জৈব মনোবৃত্তির অসংযত লোকায়ত বাসনা প্রতিফলিত ক'রে তার ইন্ধন যোগাতে পারত, তাও যেন আদিম অমার্জিত অলীক কল্পনার বিভ্রমে একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতে পরবর্তী যুগে পুরোহিত ও বিদ্বানেরা বেদকে ধর্মানুষ্ঠানের আকর ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্র বলে দেখেছেন, দেবতত্ত্ব উপকথা ও যজ্ঞবিধানের দর্পণের বেশী আর কিছু তাতে পান নি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তার মধ্যে শুধু আদিম মানবের পুরাতন আখ্যায়িকা, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত ও লৌকিক ধর্মসংস্কার সন্ধান করেছেন। আর কিছুতেই তাঁদের কৌতূহল ছিল না, তাই তাঁরা বেদের উপর আরও বেশী অত্যাচার করেছেন এবং বাহ্যতম আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়ে তার আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণ ও মহৎ কাব্যসৌন্দর্যও হরণ করেছেন।

কিন্তু বেদের ঋষিদের নিজের কাছে বেদের এ রূপ ছিল না। পরে, উপনিষদের যুগে যে সব মহান মুনিঋষিরা কবিভাবুকেরা বেদের বোধিদীপ্ত ভাবগর্ভ ও প্রকাশময় জ্ঞানবীজ পুষ্ট ক'রে, অতুলনীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণার ভিত্তির উপর নিজেদের ভাব ও ভাষার সেই অতুলনীয় সৌধ নির্মাণ করেছিলেন, তাঁরাও বেদকে এ চোখে দেখতেন না। প্রথম প্রভাতের এই সব তত্ত্বদর্শীদের কাছে বেদ ছিল পরাবাক, যে বাক্য সত্যের প্রকাশক এবং জীবনের সব অলৌকিক তাৎপর্যের প্রতীক-রূপকময় পরিচ্ছদ। সে ছিল বাক্যের সব বীর্য-বিভব, সব প্রকাশ ও সৃজন-ক্ষমতার দিব্যভাবে আবিষ্কার ও অভিব্যক্তি, তবে বিচারনিষ্ঠ রসবোধী বুদ্ধির রচিত বাক্যের নয়, মন্ত্রের—বোধি ও অনুপ্রেরণায় লব্ধ ছন্দোবদ্ধ বাক্যের। রূপক ও কাহিনী অবাধে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কল্পনা-

বিলাসের জন্য নয়, যে-সব সত্য বক্তার কাছে অত্যন্ত বাস্তব ছিল এবং অন্য কোন উপায়ে যে-সবের নিজস্ব প্রকৃতিগত অন্তরতম রূপকথায় প্রকাশ করা যেত না, সে-সবের জীবন্ত দৃষ্টান্তও প্রতিচ্ছবিরূপে। আর, তাঁদের কল্পনাও ছিল স্থূল দেহপ্রাণের বাহ্য অনুভবে আবদ্ধ বলে আমাদের মন ও চক্ষু যা গ্রহণ করতে বা ধারণ করতে পারে, তার চেয়ে বৃহত্তর সত্যের পুরোহিত। পুণ্যাত্মা কবি অর্থে তাঁরা বুঝতেন 'কবয়ঃ সত্যশ্রুতাঃ', পরম সত্যের দ্রষ্টা ও শ্রোতা, যাঁরা কোন উর্দ্ধতম জ্যোতির স্পর্শ পেয়েছেন এবং মনে যাঁরা সে জ্যোতির ভাব ও ভাষাগত রূপ সাক্ষাৎ করেছেন। আজকালকার পণ্ডিতেরা বলেন যে, তাঁরা ছিলেন কথঞ্চিৎ উচ্চশ্রেণীর ওঝা বা ঐন্দ্রজালিক, তাঁদের কাজ ছিল প্রাণবান অসভ্য জাতির ঝাড়ফুক, তুকতাক ও স্তবস্তোত্র রচনা করা। বলা বাহুল্য, নিজেদের কাজ সম্বন্ধে তাঁদের সে ধারণা ছিল না, তাঁরা নিজেদের দেখতেন 'ঋষিঃ', 'ধীরাঃ', সত্যদ্রষ্টা ধীমান ভাবুক বলে। এই সব উদ্গাতারা মনে করতেন যে, তাঁরা এক মহৎ অলৌকিক সত্যের সন্ধান পেয়েছেন এবং সে দিব্যজ্ঞানের বাহন হবার উপযুক্ত ভাষার তাঁরা অধিকারী। তাঁদের উক্তির বিষয়ে প্রকাশ্যতই তাঁরা বলেছেন যে সে সব গুহ্য শব্দের পূর্ণ তাৎপর্য একমাত্র সত্যদ্রষ্টা বিপ্রদের কাছেই প্রকটিত হয়, কবয়ে নিবচনানি নিণ্যাঃ বচাংসি।* আর পরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছে বেদ ছিল ঐহিক জ্ঞানের তথা পরমজ্ঞানের আকর ও ভাগবত প্রত্যাদেশ, ঈশ্বর প্রণোদিত দেবোপম ভাবুকেরা আন্তর অভিজ্ঞতাতে যে সব নির্ব্যক্তিক নিত্য সত্য দেখেছেন ও শুনেছেন, বাক্যে সে সবের স্বতস্ফূর্ত্ত উচ্চারণ। যজ্ঞের সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান নিয়ে বেদের সূক্ত রচিত হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটিতেই যাতে একটা চেতসিক ও তাত্ত্বিক তাৎপর্য প্রতিফলনের ক্ষমতা থাকে, এ অভিপ্রায় ঋষিদের ছিল। প্রাচীন ব্রাহ্মণের রচয়িতারাও একথা বিলক্ষণ জানতেন। পবিত্র ঋক্‌মন্ত্রের প্রত্যেকটি দিব্য তাৎপর্যে ভরপুর, এই জ্ঞানে উপনিষদের মনীষীরা তাঁদের অম্বিষ্ট সত্যের গভীর অর্থগর্ভ বাগ্বীজ বলে তাকে গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের সব সুমহৎ উক্তির শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে, 'তদেতদৃচাভ্যুক্তং' ** ঋক্‌মন্ত্রে একথা বলা হয়েছে, এই ভণিতা ক'রে পূর্ব্বগামী বৈদিক ঋষিদের বাক্য উদ্ধৃত করেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নিজের খুশীমত অনুমান করলেন যে, বৈদিক ঋষিদের উত্তরাধিকারীদের ভুল হয়েছে, গুটিকত অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন সূক্ত ছাড়া আর সব প্রাচীন ঋকের তাঁদের দেওয়া অর্থ অমূলক ও স্বকপোলকল্পিত। পাশ্চাত্যের দাবী হল যে, বহু যুগের দুস্তর ব্যবধান ও বুদ্ধিজীবী মনোবৃত্তির অগাধ পার্থক্য সত্ত্বেও বেদের অর্থ তার নখাগ্রে। কিন্তু সহজবুদ্ধিই বলে যে, কালে এবং মনোবৃত্তিতে প্রাগ্ যুগের কবিদের যাঁরা এত নিকটবর্ত্তী তাঁদের পক্ষেই বেদের প্রকৃত মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা বেশী সম্ভব। সুতরাং নিশ্চিত না হলেও অন্ততঃ বিশেষ একটা সম্ভাবনা রয়েছে যে, বেদ নিজের বিষয়ে যা প্রচার করেছে তাই ঠিক, বস্তুতই বেদ অলৌকিক জ্ঞানের সন্ধান এবং ভারতের মনীষা অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে অবিরাম যে প্রয়াস ক'রে এসেছে তারই প্রথম রূপ :—পার্থিব জগতের বাহ্য প্রতিভাসের ওপারে দৃষ্টি দিয়ে, নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অবলম্বন ক'রে, পরম একের বিভিন্ন দৈব শক্তি ও স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্ব দর্শন করা। নিজের মূল রহস্য সম্বন্ধে বেদের প্রসিদ্ধ উক্তি হ'ল, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি,* সেই এক পরম অদ্বিতীয় যাঁকে সত্যদর্শী ঋষিরা মনোভাবে প্রকাশ করেন।

বেদের যে কোন স্থান থেকে যে কোন সূক্ত নিয়ে তার বাক্য ও রূপকের সহজভাবে ব্যাখ্যা করলেই তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারা যায়। একজন বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত, নিজের বুদ্ধি গর্বের উচ্চাসন থেকে, যে সব নির্বোধেরা বেদে মহৎ ভাব দেখে তাদের তিরস্কার ক'রে বলেছেন যে, বেদের ধারণা সব শিশুসুলভ, মূর্খোচিত, এমন কি উদ্ভট, তার ভাষা নীরস অপকৃষ্ট ও নূতনত্বহীন, মানব প্রকৃতির নিম্নস্তরের স্বার্থপর ও সাংসারিক ভাবের বর্ণনাই তাতে দেখা যায় যা অন্তরের গভীর থেকে এসেছে। এভাবে বেদকে দেখান যায় বটে, যদি ঋষিদের বাক্যে নিজেদের মনগড়া অর্থ আরোপ করা হয়। কিন্তু, প্রাক্‌কালের অসভ্যদের আমাদের মতে যা ভাবা ও যা বলা উচিত, সেই অনুসারে ভুল অনুবাদ না ক'রে, সহজভাবে তা যেমন আছে তেমনি যদি পড়া হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, তাতে রয়েছে

* ঋগ্বেদ, ৪।৩।১৬। ** যথা, মুণ্ডক, ৩।২।১০; ১১৭

* ঋগ্বেদ,১।১৬৪।৪৬

পূত ভগবদুদ্দিষ্ট কবিত্ব ; এবং তার কল্পনা ও রচনা, আমরা যা আদর করি, বা বুঝতে পারি—তা থেকে ভিন্ন প্রকারের হলেও, তার ভাব, ভাষা ও রূপক সবই শক্তিমান ও গভীর ভাবব্যঞ্জক, তাতে পাই সূক্ষ্ম ও গভীর অন্তর অভিজ্ঞতা, এবং সে সব দর্শন ও প্রকাশ করবার ভঙ্গী সে অভিজ্ঞতায় অভিভূত আত্মার উচ্ছ্বাসে উদ্দীপ্ত।

বেদের একটা সূক্ত নেওয়া যাক, ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের উনবিংশ সূক্ত :—

"অবস্থার পর অবস্থা জাত হয়, আবরণের উপর আবরণ (অথবা আবরকের উপর আবরক) জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হয়, মায়ের ক্রোড়ে সে সম্যকভাবে দেখে। তারা তাকে আহ্বান করেছে ব্যাপক জ্ঞান লাভ ক'রে, সে বলকে তারা অতন্দ্রিত হয়ে রক্ষা করে, দৃঢ় (বা, দুর্গরক্ষিত) পুরে তারা প্রবেশ করেছে। পৃথিবীর জীবেরা শ্বেত মাতার সন্তানের দ্যুতিমান শক্তি বাড়িয়ে দেয় ; তার কণ্ঠ স্বর্ণময়, তার বাক্য বৃহৎ, যেন এই মধুর (বা মন্ত্রের) বলেই সে প্রাচুর্যের সন্ধানী। প্রিয় ও কাম্য দুগ্ধের মত সে, সঙ্গীহীন, দুজন সাথী সঙ্গে, যেন প্রাচুর্যের জীবরূপী উষ্ণতা ; অজেয় সে বহুকে দমন করে। হে রশ্মি ক্রীড়া কর, নিজেকে প্রকাশিত কর বা, আক্ষরিক অর্থে, আমাদের অভিমুখী হও।"

তার পরের সূক্ত :—

"তোমার এই সব (আর্ট) সমিদ্ধ, বলবান (দেবতা), গতিহীন, বন্ধনশীল ও শক্তিমান ; যার ধর্ম অনুরূপ তার শত্রুতা ও কুটিলতা দূর কর। হে অগ্নি, তোমাকে আমরা বরণ করি পুরোহিতরূপে, আমাদের বলের সাধনরূপে, তোমার কাম্য অন্ন সংগ্রহ ক'রে মন্ত্রের দ্বারা আমাকে যজ্ঞে আহ্বান করি। হে সুক্রতু, (সুষ্ঠুকর্মচারী দেবতা) "আমরা থাকি যেন আনন্দের পক্ষে, উৎসব করি যেন আলোক রশ্মির সঙ্গে বীরের সঙ্গে।"

তার পরের সূক্ত প্রচলিত যজ্ঞের রূপকে রচিত, তার অধিকাংশ নেওয়া যাক :—

"মনুর মত তোমাকে আমরা তোমার আসনে বসিয়েছি, মনুর মত তোমাকে সমিদ্ধ করেছি, হে অগ্নি, হে অঙ্গিরা, দেবতাদের যে চায়, দেবতাদের কাছে তার জন্য মনুর মত হোম কর। হে অগ্নি, সুপ্রীত হয়ে মানুষের মধ্যে সমিদ্ধ হও, স্রুক সব অবিরত তোমার কাছে যেন যায়। তোমাকে প্রীত হয়ে দেবতারা সব একযোগে তোমাকে তাঁদের দূত (রূপে নির্বাচন) করেছে, এবং তোমার পরিচর্যা ক'রে, হে কবি, যজ্ঞে দেবপূজা করা হয়। মর্ত্যেরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে দেব (দ্যুতিমান) অগ্নির পূজা করুক। হে শুভ্র (উজ্জ্বল) সমিদ্ধ হয়ে জ্বলে ওঠ, সত্যের বেদীতে উপবেশন কর, শান্তির আসন গ্রহণ কর।"

যতদূর সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করা হল ; মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এই তার প্রকৃত আক্ষরিক অর্থ। এ সব প্রতীকের যে ব্যাখ্যাই করা হ'ক না কেন, *

---

* শ্রীঅরবিন্দ এই সূক্ত কটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'Hymns of the Atris' গ্রন্থে ; তার চুম্বক এখানে বাংলায় দেওয়া হল :

প্রথম সূক্তে অত্রিপুত্র বব্রি সত্যপ্রকাশক রশ্মি ও সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তির স্তুতি করছেন। আত্মার যে আবির্ভাবে উর্ধ্বতর অবস্থার সব আবরণ ভেদ ক'রে সেসবকে দিব্য আলোকের দিকে উন্মীলিত করা হয় তার কথা বলা হল। অস্তিত্বের তৃতীয় স্তর (মনোবুদ্ধি) সমগ্রভাবে উন্মীলিত হবার পূর্বে তা ছিল যেন দুর্গরক্ষিত পুরীর মত, তার সব দ্বার মানবাত্মার পক্ষে রুদ্ধ ছিল। তপোদেব ভাগবত শক্তির এই নূতন ক্রিয়ার দ্বারা মানস ও শারীর চেতনা উর্ধ্বে, অতি মানসের সঙ্গে সংমিলিত হল এবং নিম্নতর চেতনার কাজ করে যে প্রাণশক্তি, দিব্যসূর্যের উত্তাপে প্রজ্বলিত হয়ে ভাগবত জ্ঞানের সূর্যরশ্মির ক্রীড়ার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য স্থাপিত হল।

'মাতা' হলেন অদিতি, অনন্তচেতনা, সবের জননী। 'শ্বেতমাতা,' তাঁর কৃষ্ণ রূপ, দিতি, অন্ধকার শক্তির জননী। অদিতিকে গোরূপেও কল্পনা করা হয়, তাঁর দুগ্ধ হল চিরকাম্য সব আধ্যাত্মিক সম্পদ। অদিতির পুত্র 'স্বর্ণগ্রীব,' দিব্যসত্যের সুবর্ণ আলোকে দীপ্ত। 'সঙ্গীহীন,' কারণ সর্বস্রষ্টা অতিমানস আত্মতুষ্ট, মানব চেতনাতে শারীর ও মানস স্তর থেকে উর্ধ্বে বহুদূরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে-স্তরদ্বয়ের পশ্চাতে থেকে সেই তাদের পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মুক্ত অবস্থাতে ব্যবধান দূর হয়ে তারাই হয় তার দুজন সাথী।

দ্বিতীয় সূক্তের বিষয় হল কর্ম ও সিদ্ধি। ঋষিরা চান আধ্যাত্মিক সম্পদে সম্পন্ন অবস্থা এবং তাতে সম্পূর্ণরূপে ভাগবত শক্তির কাজ, যাতে কিছুই আর বিভাজন ও ক্রূরতার মধ্যে স্খলিত না হয়। এভাবে আমাদের কাজের দ্বারা প্রত্যহ অন্তরে তপোদেবের পুষ্টি সাধন ক'রে আমরা উপনীত হব পরম আনন্দে ও সত্যে, আলোক ও শক্তির হর্ষোল্লাসে।

তৃতীয় সূক্তে পাই মানবের মধ্যে দিব্য অগ্নিশিখার স্তুতি। ঋষির প্রার্থনা হল যেন দিব্য অগ্নিশিখা দিব্য মানবরূপে মানব ভাবের মধ্যে

এ যে রূপক কবিতা অলৌকিক ভাবব্যঞ্জক, তাতে কোন সন্দেহ নাই ; এই হল প্রকৃত বেদ।

বেদের কবিতার এই যে বৈশিষ্ট্য দেখা গেল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই বা অর্থোদ্ধারের আশা হারাবার কোন হেতু নাই। এশিয়া মহাদেশের সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বস্তুত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা কবিতায় প্রকাশ করবার জন্য এই হল রূপক বা প্রতীক চিত্রের এক বিশেষ ধারার সূত্রপাত। অবশ্য, বেদের নিজস্ব অনেক বিশেষত্ব আছে—যেমন, বাক্যের বিশেষ তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ, প্রতীক চিত্র অঙ্কনের বিশিষ্ট প্রথা, রূপকে প্রকাশিত অভিজ্ঞতার ও চিন্তার জটিলতা। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও বেশ বোঝা যায় যে, ভারতের পরবর্তী রচনায়—তন্ত্রে, পুরাণে, বৈষ্ণব কবিদের চিত্রে, এমন কি বলা চলে যে বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের রচনার কোন কোন অঙ্গে—অবিরত তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এবং তার অনুরূপ ধারা আছে চীনের কোন কোন কবির মধ্যে সুফীদের রূপকে।

কোন কবি যদি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা বলতে চান, দার্শনিকের মত সম্পূর্ণ বা প্রধানতঃ গুণবাচক ভাষায় তা তাঁর বলা চলবে না, কারণ সে সবের একটা নগ্ন ধারণামাত্র দিলেই হল না, যত জীবন্তরূপে সম্ভব সে সবের মর্মকথা ও নিবিড় অনুভব ব্যক্ত করতে হবে। যে কোন উপায়েই হ'ক, তাঁর অন্তরের সমগ্র একটা জগৎ বাহিরে প্রকাশ করতে হবে, পারিপার্শ্বিক বাহ্যজগতের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রকটিত করতে হবে, তদুপরি হয়ত আমাদের মন স্বভাবত চেতনার যে পার্থিব স্তরে অভ্যস্ততা ছাড়া অন্যান্য স্তরের দেবতা শক্তিদৃশ্য অভিজ্ঞতা সব বর্ণনা করতে হবে। সাধারণ মানবের এবং তাঁর নিজের নৈসর্গিক বাহ্য জীবন ও প্রকৃতি থেকে নেওয়া সব চিত্রই তাঁকে ব্যবহার করতে হয়, অন্তত সে সব দিয়েই আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু সে সবের স্ফুট অর্থের দ্বারা তাঁর বক্তব্য যথাযথভাবে বলা হয় না, কাজেই লক্ষণা ব্যঞ্জনার দ্বারা সে সব চিত্রে তাঁর ঈপ্সিত অর্থ আরোপ করতে হয় এবং আধ্যাত্মিক ও আত্মিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতা রূপকে প্রকাশ করতে হয়। নিজের ইচ্ছামত উপমার দ্রব্য বেছে নিয়ে, অন্তর্দৃষ্টি বা কল্পনা অনুসারে উপমেয়ের গুণসাদৃশ্য রূপকের জন্য স্থির ক'রে, সে সবকে গভীরতর আর একটা অর্থের বাহনে রূপান্তরিত করেন। সেই সঙ্গে যে নিসর্গ বা জীবন থেকে সে সব চিত্র নেওয়া হয়েছে, সহস্রধারে তাকে সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে প্লাবিত করেন এবং অন্তরের বস্তুতে বাহিরের রূপক চিত্র প্রয়োগ ক'রে, জীবনের সব বাহ্য ব্যাপার ও বিষয়ের মধ্যে সে সবের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন আত্মিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ ফুটিয়ে তোলেন। না হয়, আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার কাছাকাছি, তারই অনুরূপ বা প্রতিকল্প কোন বাহ্য চিত্র নিয়ে, বাস্তব সঙ্গতি সম্পূর্ণ অটুট রেখে সর্বত্র এমন সুষমরূপে প্রয়োগ ক'রে যান যাতে, যাদের সে অভিজ্ঞতা হয়েছে তারাই তার আধ্যাত্মিক অর্থ বোঝে, অপরে দেখে শুধু বাহ্য ব্যাপার। যেমন, বাংলা বৈষ্ণব কবিতা ভক্তিমান লোকের মনে উদ্রেক করে ভগবৎ প্রেমে তন্ময় মানবজীবের দেহ ও হৃদয়ের চিত্র বা ছায়া, কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে তা ইন্দ্রিয়জ অনুরাগপূর্ণ প্রেমের কবিতা বই নয়, তবে রাধাকৃষ্ণের পরম্পরাগত দৈবমানব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গ্রথিত, এই মাত্র। এদুটি রীতি আবার এক সঙ্গে মিলিয়েও দেওয়া হয়,—মূল কবিতায় নির্দিষ্ট ধারার বাহ্য চিত্র ব্যবহার ক'রে ইচ্ছামত তার প্রথম সীমা অতিক্রম করা হয়, সে সবকে সূচনারূপে গ্রহণ ক'রে সুকৌশলে রূপান্তরিত করা হয় বা একেবারেই পরিত্যাগ করা হয় কিংবা গৌণ উপাদানরূপে ব্যবহার করা হয়, অথবা সেসবের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নূতন একটা তাৎপর্য প্রকাশ করা হয় যাতে, সেসব থেকে আমাদের মনে পরম সত্যের উপর যে অর্ধস্বচ্ছ অবগুণ্ঠন রচিত হয়েছিল, তা দূর হয়ে সে উক্তি উন্মুক্ত প্রত্যাদেশে পরিণত হয়। এই শেষের রীতিই বেদে ব্যবহৃত হয় এবং কবির অন্তর্দৃষ্টির

প্রজ্বলিত হয়ে, সত্য ও আনন্দধামে আমাদের পরম পরাকাষ্ঠার দিকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

তপোদেব অগ্নি মানবের মধ্যে অবতরণ করেন মানবত্বে পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে। দেবভাবে তিনি নিত্য পূর্ণ, অজাত, পরম সুখে ও পরম সত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে অবতরণ ক'রে মানুষের মধ্যে জন্ম নিলে, তাঁর ক্রমপরিণতি হয়, ধীরে ধীরে তিনি নিজের পূর্ণতা প্রকাশ করেন, যেন সংগ্রাম ক'রে, কষ্টসাধ্য প্রগতির মধ্য দিয়ে পরম সত্য ও পরম সুখে উত্তীর্ণ হন। মানব হল ভাবুক, মনীষী, আর দেবতা হলেন নিত্য ঋষি, সত্যদ্রষ্টা ; কিন্তু তিনি তাঁর ঋষিদৃষ্টি আবৃত করেন মননের ও জীবনের সব রূপের মধ্যে, যাতে তিনি মর্তজীবের অমরত্বে পরিণতির সাহায্য করতে পারেন।

আবেগ অথবা তার রসোল্লাস ও বিষয়বস্তু অনুসারে তাতে বহু বৈচিত্র্য আসে।

বেদের কবিদের মনোবৃত্তি আমাদের মত ছিল না। একটা বিশেষভাবে তাঁরা রূপক-চিত্রের ব্যবহার করতেন এবং অধুনাবিলুপ্ত ভঙ্গীতে দেখে তাঁরা বিষয়বস্তুর যে আকার দিয়েছেন তাও আমাদের অপরিচিত। তাঁদের চোখে দৈহিক ও চেতসিক জগৎ হল বিশ্বদেবগণের অভিব্যক্তির দ্বিবিধ ধারা, পৃথক হলেও সম্বন্ধযুক্ত ও সমতুল প্রতিচ্ছবি, মনের বাহ্য ও আন্তর জীবন উভয়ই হল দেবতাদের সঙ্গে দিব্যভাবে আদান-প্রদান এবং সবের পশ্চাতে অধিষ্ঠিত আছেন এবং অধ্যাত্মসত্তা বা পরমপুরুষ আর তাঁর বিভিন্ন নাম বিভূতি ও শক্তি হলেন দেবতারা। দেবতারা সব একাধারে স্থূল নিসর্গের ও তার সব তত্ত্ব ও আকারের অধীশ্বর এবং সে সবের দৈবত ও বিগ্রহ, তাঁরাই আবার অন্তর্মুখী সব দিব্যশক্তি—আমাদের চৈত্য সত্তাতে তাঁদেরই অনুরূপ সব অবস্থা ও প্রৈতি জন্ম নেয়, কারণ তাঁরাই বিশ্বাত্মার শক্তি, সত্য ও অমরত্বের রক্ষক, অনন্তের সন্তান, প্রত্যেকেই আবার মূল ও চরম বস্তুতে পরম পুরুষেরই বিভূতি, তাঁর এক একটা বিভবের বাহ্যরূপায়ন। এ ঋষিদের কাছে মানবজীবন হল সত্যমিথ্যার সংমিশ্রণ। মৃত্যু থেকে অমরত্বে যাবার প্রয়াস, আলো-আঁধারি থেকে দিব্যসত্যের দীপ্তিতে ক্রমগতি; সে সত্যের স্বধাম অবশ্য উর্ধ্বে অনন্তলোকে, কিন্তু এখানেই মনের আত্মাতে ও জীবনে তা গড়ে তোলা যায়। তাই মানবজীবন হল দেবাসুরের যুদ্ধক্ষেত্র, জ্যোতির সন্তানদের সঙ্গে রাত্রির সন্তানদের সংগ্রাম, বিত্ত সম্পদ আহরণ করা—মানব-যোদ্ধাকে দেবতাদের দেওয়া বিপক্ষের কাছ থেকে লুণ্ঠিত ধন লাভ করা। দেখতেন জীবন যেন অবিরাম পথচলা, "অধ্বরযাত্রা" ও 'অধ্বর', যজ্ঞ। এসবের বর্ণনা করেছেন তাঁরা একটা নির্দিষ্ট রূপক চিত্রে, তার উপমাদ্রব্য নেওয়া হয়েছে প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে এবং আর্যজাতির কৃষ্টি, গোচারণ ও যুদ্ধের পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে; আর সে জীবনের কেন্দ্র ছিল অগ্নিপূজা, জাগ্রত নিসর্গ-দেবতাদের অর্চনা ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান। তাঁদের জীবনে ও ব্যবহারে বাহ্য অস্তিত্বের ও যজ্ঞের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সব ব্যাপারই ছিল যেন সংকেত চিহ্ন, আর কবিতাতেও সে সব প্রাণহীন প্রতীক বা কৃত্রিম উপমেয় মাত্র ছিল না, ছিল আন্তর অনুভূতি প্রকাশের জীবন্ত সতেজ উপাদান, যেন তারই প্রতিকল্প বা অনুরূপ বাহ্য অভিব্যক্তি। তাছাড়া ভাবপ্রকাশের জন্য তাঁরা আর একশ্রেণীর নির্দিষ্টার্থ অথচ বৈচিত্র্যসহ চিত্র ব্যবহার করতেন, যেন রূপকথা ও রূপকে ওতপ্রোত, ঝলমল সব জাল—কখনও বা উপমা পরিণত হত রূপক আখ্যায়িকায়, রূপক হত রূপকথা—আর রূপকথা সব চিরকাল উপমার চিত্র থেকে যেত; অথচ তাঁদের কাছে সে সব বাস্তব বর্ণনাই ছিল, সে যে কি ভাবে তা বুঝতে পারে তারাই যারা একটা বিশেষ আত্মিক অভিজ্ঞতার জগতে প্রবেশ করতে পেরেছে। পার্থিব চিত্রের কোমল রং বিগলিত হত আত্মিক চৈত্য দীপ্তিতে, আত্মিক আলোক গভীরতর হয়ে পরিণত হত অধ্যাত্মিক, কিন্তু কোথায়ও তীব্র বিচ্ছিন্নতার রেখা থাকত না, তার বর্ণ, তার ইসারা স্বাভাবিকভাবে একে অপরের মধ্যে মিশে যেত, অনুপ্রবিষ্ট হত। বলা বাহুল্য, এই প্রকৃতির কবিতা, এভাবের অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাপ্রসূত রচনা মাত্র বাহ্যজীবনের অনুভব থেকে জাত প্রজ্ঞা বা রসবোধের নিকষে বোঝা বা বিচার করা যায় না। "হে রশ্মি ক্রীড়া কর, সচল হও, আবির্ভূত হও আমাদের দিকে চেয়ে,"—অগ্নির উদ্দেশ্যে এই উক্তির মধ্যে একসঙ্গে দুটি ভাব প্রকাশ করা হল, স্থূল বেদীর উপর সর্বক্ষম যজ্ঞাগ্নি জ্বলে ওঠা ও তার উজ্জ্বল শিখরে খেলা, আর সেই সঙ্গে, তবেই অনুরূপ চৈত্য ঘটনা, আমাদের হৃদয় বেদীতে দিব্য শক্তি ও আলোকের নিস্তারিণী শিখার আবির্ভাব। আবার, "পৃথিবী ও স্বর্গের পুত্র ইন্দ্র তাঁর জনক জননীকে সৃষ্টি করলেন,"—পাশ্চাত্য সমালোচক এই অসমসাহসী, পূর্বাপর-সামঞ্জস্যহীন এবং তার কাছে, উদ্ভট উপমাতে নাসিকা কুঞ্চিত করতেই পারে; কিন্তু, যদি স্মরণ রাখা যায় যে, ইন্দ্র হলেন পরমপুরুষের একটা শাশ্বত ও নিত্য বিভাব, তিনি দ্যাবাপৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং বিশ্বজনীন দেবতারূপে আবার তাঁর জন্ম হয় মানস ও দৈহিক জগতের সংযোগে ও এই দুই লোকের সব ক্ষমতা নূতন করে তিনি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করছেন—তাহলে বোঝা যাবে যে, এ চিত্র কত সমর্থ; কত সুপ্রযুক্ত ও কত বাস্তব এবং কেমন স্পষ্ট ক'রে তা গূঢ় সত্য উদ্ঘাটিত করেছে; আর, এ উপমা যে স্থূল কল্পনার ব্যাভিচারী

বেদের শৈলীতে তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ তাতে একটা বৃহত্তর বস্তু সত্য এমন নিপুণভাবে বোধ জাগিয়ে এবং এমন জীবন্ত কাব্যশক্তির সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে যা আর কোন চিত্রের দ্বারা সম্ভবপর হত না। গুহার মধ্যে লুকান, সূর্যের ভাস্বর পশুপাল স্থূল মনের কাছে অবশ্যই অদ্ভুত জন্তু ; কিন্তু তারা পৃথিবীর নয়—নিজের লোকে সে সব যুগপৎ রূপক চিত্র ও বাস্তব সত্য প্রাণবন্ত ও তাৎপর্যে পূর্ণ। বেদের কবিতা সর্বত্র এইভাবে তার নিজস্ব প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্যাখ্যা ক'রে, আমাদের কাছে অদ্ভুত ও অতি প্রাকৃত হলেও, তার সব ধারণা ও রূপক আন্তর জগতের আলোকে দেখে গ্রহণ করতে হবে।

বেদ এভাবে বুঝলে, জগতের অধুনালভ্য প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও, তা মানব ভগবান ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রথম বর্ণনারূপে এবং মহৎ ওজস্বী কাব্যসৃষ্টিরূপে বিশেষ আদরণীয় হয়। ভাষায় ও গঠনে তা বর্বরোচিত সৃষ্টি আদৌ নয়। বেদের কবিরা সুনিপুণ শিল্পী, তাঁদের শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দকল্লোল দেবরথের মত উৎকীর্ণ, তবে ধ্বনি যেন দিব্য বিশাল পক্ষ মেলে তাকে বহন করে নিয়ে যায়, যুগপৎ তা সংহত ও বিপুল তরলময়, ব্যাপক তার মূর্ছনা ও সূক্ষ্ম তার কম্পন-মাধুর্য ; গীতি কাব্যের সাম্প্রতা ও মহাকাব্যের উচ্চতা, এই উভয়গুণযুক্ত বলে তার বাক্য মহাশক্তিশালী, তার সীমারেখা অমলিন শুদ্ধ সুস্পষ্ট বিরাট, স্বল্পাক্ষর ও বিশদ—তার উক্তি স্ফুটার্থে ও গূঢ়ার্থে ভরপুর, প্রত্যেক শ্লোক যেমন নিজের গুণবলে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত তেমনি পূর্বাপর সংযোগের প্রশস্ত সোপান তখন আনুষ্ঠানিক ধর্মের সংস্কার, ও যাগযজ্ঞের চিরাচরিত বিধি নিষ্ঠা সহকারে অনুসৃত হত বলে তা থেকেই তার বাহ্য আকার ও আশ্রয় এসেছে, কিন্তু বস্তু হল মানব জীবের অধিগম্য মহত্তম ও গভীরতম আধ্যাত্মিক ও চেতসিক সব অভিজ্ঞতা। সে আকার প্রায় কখনও অচলায়তন আচারে পরিণত হয় নি, কারণ সে সবের অভিপ্রেত মূল সত্য প্রত্যেক কবিই নূতন ক'রে নিজের জীবনে উপলব্ধি এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও উচ্চতা অনুসারে প্রত্যেক কবির মনে সে অনুপ্রেরণা অবিরাম নূতন রূপ নিত। বিশ্বামিত্র, বামদেব, দীর্ঘতমা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদের উক্তিতে পাই মহৎ অধ্যাত্মমূলী কবিত্বের অভাবনীয় উচ্চতা ও প্রসার, নারদীয় সূক্ত ও পুরুষ সূক্তের মত কবিতায় পাই চিন্তার তুঙ্গতম শিখরের স্বচ্ছ আকাশ, যার বিশদ দিগন্ত ব্যাপ্তির নিদর্শন পাই উপনিষদে। প্রাচীন ভারতের মনীষীরা ভুল ক'রে বলেন নি যে, ভারতের সব দর্শন-ধর্ম-সংস্কৃতির সার পদার্থের মূলে রয়েছে এই সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের উক্তি, কেননা, উত্তরকালের ভারতের আধ্যাত্মিক সব অনুভূতি বীজাকারে অথবা প্রথম প্রকাশরূপে এখানে আহৃত রয়েছে। ধর্মগ্রন্থ হিসাবেও বেদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝবার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। তা থেকে সহজে দেখা যায়, ভারতের মনীষাকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত ক'রে এসেছে যে সব মৌলিক ভাব ও প্রেরণা সে সবের আদিম রূপ কি ছিল, বোঝা সহজ হয় কি ছিল ভারতের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিশিষ্ট স্বরূপ, তার কল্পনার মুখ ও স্বজনবৃত্তির স্বভাব, এবং কি সব গূঢ়ার্থক প্রতীক-প্রতিরূপের সাহায্যে ভারতের সুধীরা চিরকাল আত্মা, বাহ্য আবেষ্টন, জীবন ও বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁদের সব অনুভব ব্যক্ত ক'রে এসেছেন। চিত্র-ভাস্কর্য স্থাপত্যে এবং সাহিত্যে বহুলাংশে দেখি অনুপ্রেরণা ও আত্মপ্রকাশের সেই একই ধারা। তার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে, সর্বত্র জেগে আছে এক অনন্ত বিস্ময়ের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ববোধ, আর বাহ্যবিষয় সব দেখা হয়েছে বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে অথবা সে দৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত রূপে, এবং এক অনন্তের ভূমার মধ্যে অথবা তার প্রতিপক্ষ-রূপে স্থাপিত ক'রে। তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল বহুবিচিত্র রূপকচিত্রে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অনুভব করা ও রূপ দেওয়া ; সে সব চিত্র হয় আন্তর চৈত্যভূমি থেকে নেওয়া হত, না হয় স্থূল জগতের চিত্রকে আত্মিক তাৎপর্য ও সংস্কারের প্রভাবে রূপান্তরিত ক'রে এবং সেইভাবের রূপ-রেখা ও বর্ণরাগে সজ্জিত ক'রে ব্যবহার করা হত। তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল পার্থিব জীবনকে পৃথক ক্ষুদ্র আকারে না দেখে, রামায়ণ, মহাভারতের মত, অতিরঞ্জিত অথবা বিশালতর গগনের স্বচ্ছতার উপযোগী তনিমা দিয়ে তাতে পার্থিব পরিবেশের চেয়ে বৃহত্তর তাৎপর্য আরোপ করা, কিংবা অন্তত, আধ্যাত্মিক ও চৈত্য জগতের পটভূমির সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দেখা। তাঁদের কাছে অনন্ত অধ্যাত্মপুরুষ অতি নিকট ও বাস্তব, দেবতারাও সত্য, এবং পরলোক ততটা ওপারে নয় যতটা নিজেদের অস্তিত্বে অনুস্যূত। পাশ্চাত্য মনোবৃত্তির কাছে যা কল্পনা বা রূপকথা, এখানে সে সব বাস্তবে বিদ্যমান, আন্তর সত্তার জীবনের তন্ত্রী ; পাশ্চাত্যে যা সুন্দর কবিত্বময় ভাব বা দার্শনিক বিচারের সিদ্ধান্ত, এখানে তা উপলব্ধির ব্যাপার, অভিজ্ঞতার কাছে নিত্য বর্তমান। ভারতের মনোবৃত্তির এই ধারার জন্য এবং আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা ও চৈত্য জীবনের বাস্তবতা বোধের জন্য, বেদ উপনিষদের এবং উত্তরকালের ধর্মবিষয়ক পৌরাণিক ও দার্শনিক কবিতা এত প্রবল অনুপ্রেরণা লাভ করেছে এবং সে সবের ভাবব্যঞ্জনা ও রূপক চিত্র এত জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী হয়েছে। এমন কি ঐহিক সাহিত্যেও কবির মনোভাব ও কল্পনার উপর এ প্রভাব বেশ অনুভব করা যায়।

শ্রীঅরবিন্দের Foundations of Indian Culture পুস্তকের অধ্যায়াংশের অনুবাদ।

নদী

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

১

মৃত্যুই মৃত্যু নয়,—বেঁচে থেকেও মানুষ মরে; যেমন মরেছে রীণার জীবনে সলিল। একদিন সে ছিল রীণার সব। আজ সে তা'র কেউ নয়। পথে-চলা অপরিচিত লোকের মতোই রীণার কাছে সে।

আড়িয়ালখাঁ নদীর তীরে মাদারীপুর সহর। সুরশিল্পী সলিলের নাম ওখানকার ছোট বড় ছেলেবুড়ো সকলের মুখে মুখে। সে-শিল্পী চলেছে আরেক জগতে। বিয়ের দিনে তাই গোটা সহরই চঞ্চল। আলোর মালা রাতকে করেছিল দিন! গোধূলী থেকে নহবতে বাঁশীওয়ালার সুর আর অন্দরে তারই মাদকতায় সুর জেগেছিল সকলের মনোবীণায়। সে-সুর শুধু এখন কানেই বাজে রীণার; কণ্ঠে যা' বাজে তা' করুণ সুরের বিলাপ! ব্যথার পাথার রীণার অন্তর মথিত সে-সুর যে শোনে সে না কাঁদলেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই!

সুরের যাদুকর সলিল। জীবিকা গান শেখান। গানে গানে, সুরে সুরে মায়ার জাল বোনায় তার অপূর্ব কৌশল! এমন শিল্পীর কাছেই ম্যাট্রিক পাশ করার পর গান শিখতে এল রীণা। সে-ও কম শিল্পী নয়। যেমন গুরু হ'ল তেমন ছাত্রী। উলুবনে তাই মুক্তা ছড়ান হ'ল না মোটে। সলিলের পরিশ্রম হ'ল সার্থক। গানের সুর দরদী অন্তরেই গ্রহণ করেছে রীণা। শিখেছেও অনেক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সলিলের সুরের জালেই আটকা পড়েছে সে।

বিয়ের পরে একদিন রীণা বলেছিল, গান শেখান ছেড়ে এখন অন্য পথ ধর। দিনে পাঁচ সাতটা টিউশনি! সারাদিন গলা চেঁচান; তাও একদিন নয়, রোজ রোজ!

তুমি আমাকে অবাক করলে রীণা! বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ে বলেছিল সলিল। অন্য পথে চলা মানেই আমার মৃত্যু! আর গলা চেঁচান বলছ?—ওটাই যে আমার একমাত্র আনন্দ!

তা' হ'ক—তবুও আমার আপত্তি।

শিল্পীকে তবে মেরে ফেলতে চাও তুমি?

উত্তরে নীরব থেকেও রীণা মনে মনে বলেছিল অনেক কথা। সলিলকে নিয়ে ভয় হচ্ছিল তা'র। শিল্পীকে ভালোলাগে অনেকেরই—যেমন লেগেছিল তার নিজের। কতো ছাত্রীকে তো শেখাচ্ছে—তাই তো ভয়! গান সাদা কথা নয়, মনের রঙীন বাণী! সুর শুধু সুরই নয়—দেবতাকে প্রিয় আর প্রিয়কে দেবতা করার হৃদয় নিঙড়ান অর্ঘ্য! সেই বাণী এবং অর্ঘ্যই তখন সলিল তুলে ধরেছে লীণার কাছে। গান শেখে লীণা—করে সুরের সাধনা। শিল্পী সে-ও। যদি—না আর ভাবতে পারে না রীণা!—তবুও আবার ভাবে, শিল্পীদের মিলন তো এমন করেই হয়!—কথা না বলেও বলে অনেক কথা। লীণা যদি সে-পথেই পা ফেলে! দূরে ফেলতে পারবে কি সলিল?

রবিবারেও ছুটী নেই সলিলের। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা এনে ফেল্‌ল তাকে বিশ্রামের কোলে। শুয়েছিল বিছানায়। চোখ দুটী ঘুরছিল দেয়ালে দেয়ালে ঝোলান তারযন্ত্রগুলোর ওপর। বাইরের আকাশে তখন চলছে মেঘের আনাগোনা—দলবেধে তারা চল্‌ছে আকাশের কোণে কোণে। বাতাস বইছে হিমের পরশ নিয়ে। মনের ভেতর কেমন যেন করে উঠল সলিলের। সন্ধ্যা সাতটা বাজে। এমন সময়েই তো লীণাকে গান শেখাতে যায় সে। নিশ্চয়ই লীণা প্রস্তুত হ'য়েছে তা'র জন্যে। আশায় রয়েছে আশাপথপানে চেয়ে। রোজ দুয়ারের সামনে তাকে দেখে মুখে একটা পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে বলে, আসুন; আজ সে-হাসি ফুটবে না তার মুখে। সে হবে নিরাশ। তানপুরা থাকবে না-ছোঁয়া। সময় যখন

পার হ'য়ে যাবে, জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে হয়তো দেরীতে পাওয়ার আশা নিয়ে।

বিছানায় উঠে বসল সলিল। আকাশের মেঘ পাগল করেছে তাকে। ঠিক করল, ওখানে বসেই গান শোনাবে লীণাকে। কতোটুকুই বা পথ! অন্তরের সুরের কাছে ও-দূর দূর নয়। তাই হাতে নিল তানপুরা। গাইল মেঘমল্লার। আকাশে তখন বারি ঝর ঝর!

এক পশ্‌লা বৃষ্টির পরেই এলো ঝড়। নদীর পারে সলিলের বাড়ী, ঝড় লাগল একটু বেশী। আড়িয়ালখাঁ তখন ক্ষুব্ধ। বুকে তার উত্তাল তরঙ্গমালা। লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের উন্নতশির ভেঙ্গে চৌচির হচ্ছে আড়িয়ালখাঁর কূলে আছাড় খেয়ে। এমনিতেই আড়িয়ালখাঁ রাক্ষস, ঝড়ের ঢেউ পেয়ে হ'ল তার আরো সুবিধা। আর একটু হ'লেই সলিলদের বাড়ীখানা গ্রাস করবে। তাই নূতন বাসার জন্যে সলিলের চিন্তা।

পরের দিন লীণার কাছে গিয়ে সলিল বলল, অনেকদিন পরে এলাম কিন্তু!

সলিলের ঐ সংক্ষিপ্ত কথা আর তার তাকানো যেন কতো গয়না পরাল লীণাকে। আনন্দের লজ্জায় লীণা তখন হাস্‌ছে!

মুগ্ধ দু'নয়নে সলিল তাকিয়ে দেখছে লীণার হাসি ;— হাসি যেন সুবাস ছড়াচ্ছে ঘরময়। হাসলে কতো ভালো দেখায় লীণাকে! চোখভরেই দেখছে সলিল!

সলিলের মনের কর্মশালায় তখন চলছে ভাঙ্গাগড়া। মনের মঞ্চ থেকে একজন যাচ্ছে, একজন আসছে! একদিন যে-অন্তর-রাজ্যের রাণী ছিল রীণা, সেখানে শোনা গেল নূতন রাণীর পদধ্বনি! রাক্ষস আড়িয়ালখাঁর ভাঙ্গাগড়ার তালে তালে তারই তীরের বাসিন্দা সলিলের মনেও তখন আরেক ভাঙ্গাগড়ার আয়োজন।

কয়েকদিন পরেই ক্ষুধার গ্রাসরূপে সলিলের বাড়ীখানা নিশ্চিহ্ন হ'ল আড়িয়ালখাঁর গহ্বরে। নীড় গেল ভেঙ্গে। রীণার কতো শত দিনের পদরেণু মেশান ধূলিকণা, তার কতো সুখ-দুঃখের এলবাম্ ঐ বাড়ীখানা—তাও গেল নদীর অতলতলে! দাঁড়ায় কোথায় রীণা? সলিল নূতন বাসর সাজাল লীণাকে নিয়ে। ভাঙ্গা মন, ক্লান্তপক্ষ এক বিহঙ্গী রীণা উঠল গিয়ে বাবার কাছে। দুঃখে চোখের জল ফেলে, বুকের সবটুকু স্নেহ উজাড় করে বাবা-মা বুকেই তুলে নিল রীণাকে, কিন্তু তখনকার ও পরিবেশে বাবা-মায়ের সে-স্নেহ কতোটুকু শান্তি দিতে পারে রীণাকে?

*   *   *   *

বছরের পর বছর গিয়ে দাঁড়াল কয়েক বছরের কোঠায়। নূতন আদর্শে এখন জীবন গঠন করেছে রীণা। হ'য়েছে স্কুল মিস্ট্রেস্। পড়াতে পড়াতে পড়ত নিজেও। করল বি.এ. পাশ—তারপরে বি.টি.। স্কুলের খাতায় যে নামটী ছিল সবার শেষে সে-নামটী উঠল সবার আগে। বেশ ছিল তখন রীণা। সময় নেই, নেই পেছনের দিকে ফিরে তাকিয়ে নিজের জীবনকে দেখবার অবসর। সে তখন ব্যস্ত এগিয়ে চলতে। চোখ দুটী তার সাম্‌নে।

কাছে থেকেও দূরে সলিল। ছোট্ট সহর। সবারই সব পথ জানা। জানে কে কোথায় থাকে। পথ চলতে সলিলের সঙ্গে দেখাও হ'য়েছে রীণার—দেখেছে সে অপরিচিত লোককে দেখার মতোই। কিন্তু একদিন দেখা হ'ল সাম্‌নাসাম্‌নি। সলিলকে এড়াতে চাইলেও পারল না রীণা।

কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে সলিলের! দেখলে আর মনে হয় না যে শিল্পী! সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরণে ময়লা কাপড়। খেতে না পাওয়ার সুস্পষ্ট ছাপ চেহারায় মাখা।

তোমার কাছে পরের পর কয়েকখানা চিঠি দিয়েছি, আশা করেছিলাম উত্তর দেবে, বলল সলিল।

প্রয়োজন বোধ করিনি, জানাল রীণা।

আমার যে একান্ত প্রয়োজন।

লীণা তাড়া করেছে বুঝি?

চিঠিতেই তো সব জানিয়েছি—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্‌ল সলিল। জানাল, অনেক দিন হয় গলাটাও যেন কেমন হ'য়েছে—সুর ওঠে না। টিউশনিগুলো তাই একে একে সব হাতছাড়া হ'য়ে গেছে…

সেজন্যে নয়—বাধা দিল রীণা। বাজারে তোমার দুর্নামের হাট বসেছে। তোমাকে আর কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না।

কাটা ঘায়ে পড়ল নুনের ছিটা। কিছুক্ষণ নীচু মুখে

নীরব থেকে বলল, নিয়তির হাতে মানুষ অসহায়! আমাকে ক্ষমা করো রীণা!

—ক্ষমা!

হ্যাঁ রীণা। আমার সারা দেহে বিবেকের অসংখ্য দংশন; অনুতাপে আজ আমি দগ্ধ, মন ক্ষত-বিক্ষত। লজ্জায় মুখ লুকিয়ে তোমাকে মুখ দেখাচ্ছি। বল তুমি আমাকে ক্ষমা করবে কি না?

একটু করুণার হাসি হাসল রীণা, আজকে যাও—কালকে জানাব। বলেই পা' চালাল রীণা!

সলিল কিন্তু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

কাল বলে কয়েকদিন কেটে গেল। তবুও কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারল না রীণা। দিনের কর্মব্যস্ততায় একদম সময় নেই তার। রাত্রে বসে চিন্তা নিয়ে—শুরু করে ভাবতে। একটা কিছু ঠিক করে—শেষ পর্যন্ত বাতিল করে তা'। এমন করেই রাতের সিদ্ধান্ত মুখ লুকায় দিনের আলো দেখে। কিন্তু আর তো দেরী করা যায় না! যা' বলার বলে দেওয়া উচিত তাড়াতাড়ি।

সেদিন রাতে শুয়ে রীণা আবার চিন্তা করে চলেছে সলিলকে নিয়ে: টাকা থাকলে ফিরে আসতে চাইত না নিশ্চয়ই। ঠেকেছে তাই পড়েছে নাকে দড়ি। এ-আসা আসাই নয়—মন নেই এতে। তাছাড়া আর কি ওকে বিশ্বাস করা উচিত? ঘৃণা হ'ল সলিলের ওপর।

ভাবল আবার: পোষাক আর চেহারায় ঠিক পাগল বলেই মনে হয়। বাকী আছে শুধু পাগল হ'তে। পাগল হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে তাকে স্থান দিলে লোকেই বা বলবে কি! সারা সহর হাসবে মুচকি হাসি। যেখানে তার প্রয়োজন নেই এতোটুকু, সেক্ষেত্রে ঐ হাসি হজম করা…! না কিছুতেই না। তা'ছাড়া আরো যেটা প্রধান সেখানেই রীণা থাকবে স্থির। লীণা ঘর ভেঙ্গেছে তা'র। মেয়ে হ'য়ে মেয়ের বুকে দিয়েছে ছুরি। সে তা' পারবে না। প্রথম প্রথম অবশ্য লীণার ওপর একটা আক্রোশ হ'য়েছিল তার। প্রতিজ্ঞা করেছিল যেমন করেই হ'ক প্রতিশোধ সে নেবেই। যে-আশায় ঘর বেঁধেছে লীণা সে-আশায় সে ফেলবে ছাই। দেবে তার সুখের ঘরে আগুন। তারপর মনের গতি হ'ল ভিন্নমুখী। মন থেকে মুছে ফেলল রাগ।

এতোদিন পরে সে-আক্রোশটা আবার প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠ্ল। মনে জ্বলল দাবানল। কিন্তু না—নিবিয়ে দিল নিজেই—স্নান করল শীতল-সায়রে। যে তার ঘর ভেঙ্গেছে তার ঘরও আবার ভাঙ্গার মুখে। এই তো প্রতিশোধ নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ! বিছানায় উঠে বসল রীণা—মনের আনন্দে চীৎকার করে উঠল চাপা গলায়—পেয়েছি! পেয়েছি প্রতিশোধ নেওয়ার পথ। কিছুতেই সে ঘর ভাঙ্গতে দেব না লীণার। ওদের টাকার অভাব? টাকা প্রত্যেক মাসেই দেব ওদের। দেব সলিলের হাত দিয়ে লীণার হাতে পৌছিয়ে। প্রত্যেক মাসে মাসে লীণা এই দান নিতে নিতে কি একবারও কিছু মনে করবে না?

কিন্তু সিদ্ধান্তকে আর বুকে চেপে রাখতে পারছিল না রীণা। ওদিকে ভোর হতেও আছে কিছু দেরী। ইচ্ছা হচ্ছিল লালমুখো সূর্যকে ছিনিয়ে এনে বসিয়ে দেয় পূব আকাশের কোলে—করে দেয় ভোর।

রোজকার মতো প্রভাতী আলো-অন্ধকারে আড়িয়াল-খাঁর ধারে বেড়াতে গেল রীণা। যতোটুকু বেড়ানোর বেড়াল তা'। ফেরার পথে দেখে সূর্য উঠেছে পূব আকাশের কপালে টিপ পরিয়ে। আড়িয়ালখাঁর বুকের জলে সোনার ঢেউ। ওপারের চড়ায় প্রভাতের নবারুণ সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে ছোট ছোট চালাঘরের চালে, কলাগাছের মাথায়। চোখ দু'টীকে ছুটিয়ে চরের পানেই চেয়ে থামল রীণা। অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। তার বাড়ীঘর ভেঙ্গে নিয়ে আড়িয়ালখাঁ ফিরিয়ে দিয়েছে ওপারেই—ঐ চড়ায়। তার ঘর নেই, কিন্তু জায়গা তো রয়েছে। সে-জায়গাও হ'য়েছে হাত-ছাড়া—নূতন মালিক সেখানে!

তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে বের হবে ঠিক করেছিল বলেই হয়তো সেদিন অনেকগুলো উট্‌কো কাজ এসে হাজির হ'ল রীণার হাতে। সবগুলোই করতে হ'ল মুখ বুজে। যখন শেষ করল, ঘড়ির কাঁটা তখন জানাল ছটা। তবুও উঠে পড়ল রীণা—আর দেরী করা যায় না।

সন্ধ্যার আঁধার তখন নেমেছে। দূরে দূরে মিউনিসি-পালিটীর কেরোসিনের আলো উঠেছে জ্বলে। কিছুদূর যেতেই রীণা চমকে উঠল লাইট পোষ্টের পাশে একটা

ছায়ামূর্তি দেখে। ভাবল—কে?—সলিল নাকি? ধীর পায়ে কাছে গেল সে। যা' ভেবেছে তাই।'

আজ আর পাশ কাটিয়ে যাওয়া নয়, নিজেই জিজ্ঞেস করল, তুমি এখানে?

তোমার জন্যে। আর কিছু বলতে পারল না সলিল।

আমি তো তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম—তোমার বাসায়।

আমার বাসায়!

হ্যাঁ—তোমার বাসায়। চল।

বিস্ময়ে চোখ দু'টী বেশ বড় বড় হ'য়ে উঠল সলিলের। চল্‌ল মন্ত্রমুগ্ধের মতো। চল্‌ছে তো চলেছেই। মনেও চলছে ভাবনা, চিন্তা আর দুশ্চিন্তার আনাগোনা। কিন্তু মুখে প্রকাশ করতে পারছে না একটি কথাও। বুকখানা যেন হঠাৎ কেমন টন্‌টন্ করে উঠল ব্যথায়। কতোদিন, কতোবছর পর পাশাপাশি হাঁটছে সে আর রীণা। কিন্তু দু'জনের মনও কি এমন পাশাপাশি?

পথ চলতে চলতে দু'একবার আড়চোখে সলিল তাকাল রীণার দিকে—পড়তে চাইল রীণার মনের ভাব। অথচ কিছুতেই রীণাকে হিসাবে আনতে পারল না সে। বাসায় যেতে চাইছে কেন রীণা—কি তার ইচ্ছা? ভয় হ'ল সলিলের। অবিশ্বাস করতে লাগল রীণাকে।

এরি মধ্যে দু'জনে নীরবে পথটুকু শেষ করে এসে পৌচেছে সলিলের বাসার কাছে। নিজের অলক্ষ্যেই সলিল আবার জিজ্ঞেস করল, সত্যি তুমি আমার বাসাতেই যাচ্ছ?

—ভয় নেই তোমার।

তবুও ভয় দূর হ'ল না সলিলের। বুক কাঁপছে তা'র। ভাবল, রীণা তাকে ক্ষমা তো করলই না বরং এলো ঘর ভাঙতে। কি হবে যদি সব বলে দিয়ে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়? মিনতি-ভরা অসহায় চোখ দু'টী শেষ বারের মতো সলিল রীণার দিকে তুলে ধরে একটু জোর গলায় ডাকল লীণাকে। বলল, দেখ কে এসেছে!

তাড়াতাড়ি পা ফেলে ঘরে এলো লীণা। এসে তো অবাক! যা' ভাবেনি তাই! যা কল্পনার বাইরে বাস্তবে তা!! থমকে দাঁড়াল রীণার মুখোমুখি। নীরব লীণা। চোখে শুধু নীরব ভাষা—বিস্ময়।

ঘরের আবহাওয়াকে হাল্কা করতে রীণা বলে উঠল, আমি তোমার কাছেই এসেছি বোন!

দু'টী অক্ষরের ছোট্ট কথা বোন সম্বোধনটী কানে যেতেই ভেতরে ভেতরে চম্‌কে উঠল লীণা। ভেতরে যেন বিদ্যুৎ—বাইরে তার ছটা। দাঁড়িয়ে থেকেও চঞ্চল সে।

লীণাকে নীরব দেখে রীণাই আবার বলল, তুমি বুঝি খুব অবাক হচ্ছ?

লীণা যেন কতো পরিশ্রমে ক্লান্ত। রীণাকে হঠাৎ তারই ঘরে, তারই সামনে দাঁড়ান দেখে তার গলার স্বর পালিয়েছে কোথায়। চেষ্টা করল সহজ হ'য়ে, সরলভাবে কথা বলতে। কিন্তু বেরোল শুধু···তা'···কিছু···

কিন্তু যা' ভাবতে পারো না আমি তাই, বুঝলে বোন, —লীণার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে এনে বলতে লাগল রীণা। ধরো তোমার এ দিদি অনেক দিন দূরদেশে ছিল।

লীণার বিস্ময়ের জালে আরো ঘন বুনন পড়ল রীণার কথায়। একবার সলিলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ফেলল, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

তোমাদের সব খবরই আমি রাখি বোন। ওঁর টিউশনি নেই অনেকদিন থেকে—তাও আমি জানি। তাই এসেছি তোমার দিদি হ'য়ে দিদির কর্তব্য করতে।··· কিছু মনে না করে প্রত্যেক মাসেই আমার কাছ থেকে কিছু হাতখরচ তোমাকে নিতেই হবে।

আপনার টাকা···

লীণার হাতখানিতে একটু জোরে চাপ দিয়ে রীণা বলল, হ্যাঁ বোন আমার টাকা! তোমার দিদির টাকা!!

তবুও···

এর মধ্যে আর কিছু এনো না তুমি। তোমার কাছে এটা আমার দাবী—আমার আশা! এ-আশা নিয়েই তোমার দুয়ারে আজ আমি ভিখারিণী! আমাকে ফিরিয়ে দিও না বোন।

ইচ্ছা না থাকলেও অনিচ্ছায় নীরবে মৌনসম্মতি জানাল লীণা। কিন্তু মুখর হ'য়ে উঠল সলিল। চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল, তুমি কি রীণা? দেবী না মানবী?

রীণার দু'খানি পাৎলা ঠোঁটে একটু আলতো হাসি হেসে উঠল—এই ধূলার ধরণীতে, মাটীর ঘরে আমি মানবীই, বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

ভেতরে অনেক কান্না নিয়ে রীণার ঐ আলতো হাসিই তখন পরিণত হ'য়েছে প্রতিশোধ নেওয়ার হাসিতে।

সমবায়-আন্দোলনের পুনর্গঠন

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষে সমবায়-আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে বলা হয়। কিন্তু এই ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে পল্লীবাসী ও নগরবাসী ইহার জন্য দায়ী এবং জনসাধারণের চরিত্রের দৃঢ়তা, সমবেতভাবে কার্য্য করিবার নিষ্ঠার অভাব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার অভাবেই আন্দোলনটি জয়যুক্ত হইতে পারিতেছে না। কিন্তু সমবায়-আন্দোলনের ব্যর্থতা ও দুর্দ্দশার কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তের কোন যৌক্তিকতা দেখা যায় না। বরং ইহাই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ইংরাজ সরকারের আমলাতান্ত্রিক সমবায়-নীতি ছিল একটি উদ্দেশ্য মাত্র—জনসাধারণের জীবনে সমবায় নীতি অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধন করুক ইহা মোটেই কাম্য ছিল না।

ভারতে ইংরাজ শাসনের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল শোষণ ও শাসন। এই জন্য ইংরাজ রাজত্বকালে বিভিন্ন প্রদেশে ও স্বাধীন রাজ্যে সমবায় আন্দোলন গতানুগতিক ধারায় পরিচালিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে শাসনের কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমবায়-সংক্রান্ত আইন এমন ভাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছে যাহাতে ক্ষমতা সরকারের হাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে এবং সমবায় বিভাগের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব আন্দোলনের উপর বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সমবায়-আন্দোলন একটি প্রধান সহায়। কিন্তু বিগত অর্দ্ধশতাব্দী কালের উপর ভারতে যে সমবায়-আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে এবং যে সরকারী সমবায়-বিভাগ এই আন্দোলন পরিচালনার সনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহার পিছনে সমবায়-নীতি সম্পর্কিত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধারণাটি নাই বলিলেই চলে। দেখা গিয়াছে যে, সমবায় বিভাগের দোষত্রুটি বিদূরিত করিবার প্রশ্ন উঠিলেই আইনের সাহায্যে উক্ত বিভাগের ক্ষমতা-প্রসারের অতি সনাতন রীতি কার্য্যকর হইয়াছে, আইনের সাহায্যে ক্ষমতা বারংবার সুদৃঢ় করা হইয়াছে। সমবায়-আন্দোলন যে গণআন্দোলন এবং তাহা কেবলমাত্র জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসেই সফল হইতে পারে, তাহার সম্পর্কে কোন উদারনীতি গৃহীত হয় নাই।

সমবায় বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা রেজিষ্ট্রার। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে মন্ত্রীগণের দপ্তরেই ধীরে ধীরে এই কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে আন্দোলনের যোগ যেখানেই যত গভীর, আন্দোলন সেখানেই তত সফল হইয়া উঠিয়াছে। রেজিষ্ট্রার এবং তাঁহার বিভাগ জনসাধারণের বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক, আর কিছুই নয়। কিন্তু ভারতের সমবায় আন্দোলনের যে অসাফল্য, তাহার জন্য তবে দায়ী করিতে হয় রেজিষ্ট্রারকেই, কারণ তিনি আন্দোলনের বন্ধু হইয়াও কার্য্যক্ষেত্রে তাহার পরিচয় দিতে পারেন নাই বলিয়াই আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, রেজিষ্ট্রার আন্দোলনের দার্শনিক হইয়াও আন্দোলনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া ভবিষ্যৎ দৃষ্টির সহিত আন্দোলনও গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই; রেজিষ্ট্রার পথপ্রদর্শক হইয়াও আন্দোলন সুপথে পরিচালিত করিতে পারেন নাই বলিয়াই আন্দোলন বিপথে চালিত হইয়াছে—ফলে অনিবার্য্য ব্যর্থতা আসিয়াছে।

ভারতের সমবায়-আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আন্দোলনের অসাফল্যের মূল কারণ সমবায় আইন ও নীতি সম্পর্কে সরকারী বিভ্রান্তি। যে আন্দোলনের মৌলিক উদ্দেশ্য জনসাধারণের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও নৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা—সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতি ও রীতি যে আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ, সেই আন্দোলনকে সার্থক করিবার কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন জনসাধারণের ঐকান্তিক সহযোগিতা, পারস্পরিক সাফল্যের অঙ্গীকার এবং সমস্বার্থবোধ শুভেচ্ছা। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সমবায়-আন্দোলনের কর্ণধার দেশের জনগণের প্রতিনিধিরা নহেন—যাঁহারা সমবায়-আন্দোলনের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে জড়িত তাঁহারা নহেন, আইনসভা প্রদত্ত ক্ষমতার বলে রেজিষ্ট্রার আন্দোলনের সর্ব্বময় কর্ত্তা। এই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের ইতিহাস বিভিন্ন প্রদেশের রেজিষ্ট্রার কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। এই রিপোর্টগুলি আন্দোলনের দুর্দ্দশার কাহিনী।

সমবায়-আন্দোলন একমাত্র জনসাধারণই সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে। এই জনসাধারণের হাতে আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যতক্ষণ না হস্তান্তরিত হইতেছে, ততক্ষণ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নাই বলিলেই চলে। ক্ষমতার হস্তান্তর বলিতে আমরা এই কথা বলিতে চাই না যে, আইন উঠাইয়া দেওয়া হোক, রেজিষ্ট্রেশন ও অডিট উঠাইয়া দেওয়া হোক। আমরা ঐতিহাসিক যুক্তিবিচারের পথে ইহা উপলব্ধি করিতেছি যে, গতানুগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন রেজিষ্ট্রারের বিভাগটির পুনর্গঠন করা হোক। সমবায়-আন্দোলনের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে যদি আইনের সাহায্যে ক্ষমতা রেজিষ্ট্রারের হাতে কেন্দ্রীভূত না করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে আন্দোলন গড়িয়া তোলার এবং প্রসার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। সমবায় সমিতিসমূহ স্বায়ত্ত-শাসনশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সমগ্র সমবায়-আন্দোলনকে কেন সমবায় ইউনিয়নের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না? ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটির মত প্রত্যেক রাজ্যে আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমবায় ইউনিয়নে আন্দোলনের প্রতিনিধিরা এই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হয় না কেন?

ভারতের সমবায়-আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ ইহা সরকারী বিভাগ

বিশেষের কার্য্যকলাপমাত্র। এই বিভাগটি একটি অতি পুরাতন গতানুগতিক কার্য্যধারাকে আঁকড়াইয়া আছে, ইহা একটি অতি প্রাচীন ও প্রাণহীন একটি প্রথার দাসমাত্র। এই বিভাগ জাতিসংগঠনের বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে এযাবৎকাল পারে নাই। এই বিভাগের কার্য্যকলাপ সংগঠনশক্তি ও সংগঠনের কল্পনা বিহীন। উৎপাদন, বণ্টন, ব্যবসায় বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিকক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে এই বিভাগ সম্পূর্ণ উদাসীন বলা চলে। এই বিভাগ যুগধর্ম্মের সহিত তাল রাখিয়া জনসাধারণের আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, কারণ, এই বিভাগ পুরাতন জীর্ণ ভাবগুলি আঁকড়াইয়া আছে। দেশবাসীর সংঘর্ষে আসার পরিবর্ত্তে এই বিভাগ নথিপত্র লইয়াই ব্যস্ত বেশি। ভাল কাজের উপর লক্ষ্য গৌণ—সংগঠনের দায়িত্ব এড়াইয়া ভাল কাজের সুফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গতানুগতিক পথে কাজ করিয়াই চলে। এই বিভাগের একমাত্র নির্ভর স্থান আইনপ্রদত্ত ক্ষমতার উপর।

ভারতবর্ষে সমবায়-আন্দোলনের নব-বিধান প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাজ্যসরকারসমূহ সমবায়-আন্দোলনের প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্বপাত করিতেছেন। এই সময় সমবায়-আন্দোলনের ব্যর্থতার ঐতিহাসিক কারণ কি—তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। আমরা মনে করি যে, পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সমবায়ের মূল সত্য ও নীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয় করা প্রথমেই আবশ্যক। সমবায় গণতন্ত্রের পরিপোষক। সমবায়ে প্রত্যেক মানুষ মানুষ হিসাবে সম্মানিত এবং ব্যক্তির অধিকার সমষ্টি-স্বার্থে স্বীকৃত। একনায়কত্বের শাসনে সমাজের ও মানুষের অধোগতি হয়। রেজিষ্ট্রারকে কেন্দ্র করিয়া আইনের বন্ধনে ভারতে যে সমবায়-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে বেসরকারী সমবায়-নেতৃত্বকে পদে পদে আঘাত করা হইয়াছে—স্বাধীন মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা আন্দোলনের সংগঠন কার্য্যে আগাইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যাখ্যাত হইতে হইয়াছে। সরকারের হাতধরা একশ্রেণীর লোককে সম্মুখে রাখিয়া রেজিষ্ট্রারকে আন্দোলনের কাঠামো রক্ষা করিতে হইয়াছে—প্রাণহীন যন্ত্রমাত্রে সমবায়-সংগঠনসমূহ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী সংগঠন কর্ম্মপন্থার উদ্দেশ্যরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন "স্বরাজ মানে নিছক ক্ষমতার হস্তান্তর নয়, স্বরাজের প্রকৃত অর্থ অর্থনৈতিক বন্ধনের ভয়াবহ নাগপাশ হইতে কোটি কোটি পরিশ্রমী অথচ অনাহারক্লিষ্ট নরনারীকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা।" সমবায়ের সংগঠনে এই অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর একশ্রেণী সমবায়ের দেনাদার হিসাবে অবশ্য মিলিত হইয়াছে এবং সরকারী সমবায়-আন্দোলন সমবায় ঋণদান সমিতির সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখাইয়া আন্দোলনের প্রগতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের অর্থ-নৈতিক স্বরাজ সমবায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কি করা হইয়াছে?

সমবায়-আন্দোলন আইনের নাগপাশে ব্যাহত হইয়াছে বলিয়াই সমবায়-আন্দোলনের গণতন্ত্র সরকারী আইনে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমবায়-আন্দোলন বিশেষ করিয়া সরকারী কর্তৃত্বে উন্নতিলাভ করিতেছে না বলা চলে। বর্ত্তমান সমবায় আইনটি বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তৎকালীন সরকার পাশ করাইয়া কার্য্যকরী করে। সেই কাঠামো এখনো অব্যাহত আছে। তখন বিরোধীপক্ষ হিসাবে কংগ্রেস দল এই আইনের প্রবল বিরোধিতা করে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সমবায়-নীতি ও দেশের জনসাধারণের সংঘবদ্ধ কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে বাধা দিয়া এবং সমবায়ের গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে প্রতিহত করিয়া সরকারী প্রভাব-প্রতিপত্তি তথা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। তখন সমবায় সমিতিসমূহের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান "কো-অপারেটিভ এলায়েন্স" সরকারী সমবায় কর্ত্তাদের কর্তৃত্বে আনা হয়—যে সকল বেসরকারী সমবায়, নেতা "বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি" মারফৎ বেসরকারী সমবায় জনমত ও আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসিত ছিলেন, তাঁহাদের "বিতাড়িত" করা হয়। এই বিতাড়নের ফলেই সরকারী কর্তৃত্ব আন্দোলনের উপর নিরঙ্কুশ হইয়া পড়ে। যাঁহারা বিতাড়িত হইলেন—তাঁহারা বঙ্গের সমবায় আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং নিঃস্বার্থসেবা ও ত্যাগের দ্বারা আন্দোলনের অগ্রগতিতে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই "বিতাড়ন" ষড়যন্ত্রে সম্মুখে রাখা হয় আন্দোলনে স্বার্থান্বেষী কয়েকজন ব্যক্তিকে—ইহাদের কার্য্যকলাপের ফলে বঙ্গীয় সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস মসিলিপ্ত হইয়া পড়ে। সেদিন সমবায়ের মূল নীতিকে উড়াইয়া দিয়া সরকারী শাসন কায়েম করা হয়। সেই বিল প্রণয়নের রীতি ও উদ্দেশ্য সমানভাবেই অন্যায় ও ক্ষতিকর বিধায় সর্ব্বত্র প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়। কিন্তু ভোটের জোরে আইন কানুনে পরিণত হইয়া গেল। সাধারণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র হইল সমবায় সমিতিগুলি। কিন্তু সমবায়ের মূল নীতি ও উদ্দেশ্য কার্য্যকর রাখা যে আইনের উদ্দেশ্য নয়, সমবায় শক্তি বিনষ্ট করাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে যাহা হইবার তাহাই হইল।

পরবর্ত্তী ইতিহাস সকলের বিদিত ঘটনা। ভারতের অন্যান্য কয়েকটি অগ্রসরমান প্রদেশে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের সমবায় আইনের স্থানে প্রাদেশিক সমবায় আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও বঙ্গীয় সমবায় আইনের মত কঠোর বিধানসমূহ সেখানে গৃহীত হয় নাই, তথাপি এই সকল আইনে রেজিষ্ট্রারকে কেন্দ্র করিয়া আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। রেজিষ্ট্রারকে যদি "ডিরেক্টার অব রুর‍্যাল ক্রেডিট ও স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ" করিয়া কৃষি ও কুটীর শিল্পের সংগঠন ভার দেওয়া হইত, কতকটা কাজ হইত। কিন্তু সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই আন্দোলনের উন্নতি হইল যদি বুঝায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, সমবায়-আন্দোলনের নামে একশ্রেণীর ঋণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রকৃত সমবায়-আন্দোলন বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এখনো বহুদূরে।

সমবায়-আন্দোলনের নবযুগ সৃষ্টি যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয়, তবে সরকারকে ইংরাজ আমলের সমবায় কাঠামোটাকে নতুন করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে হয়। সমবায় সম্পর্কীয় সরকারী নীতির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর অবিলম্বে সংস্কার কেবল

নয়—আমূল পরিবর্ত্তন দরকার। সরকার পরিচালিত সমবায়-আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কেবল ব্যর্থতায় মন ভরিয়া আসে। কারণ, এই সরকারী বিভাগটি একটি মজানদীর মত—তাহাতে প্রাণস্রোত নাই, আমলাতান্ত্রিক গতানুগতিকতা কেবল অনুসৃত হইতেছে। জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে সমবায়কে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে সমবায়ীদের হাতেই সংগঠন ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া দরকার। ইংলণ্ডে কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন যাহা করে ভারতে তাহা কি হইতে পারে না? ইংলণ্ডে বা ইউরোপ আমেরিকার অন্যান্য উন্নতিশীল দেশে সমবায় নিয়ন্ত্রণের কঠোর রক্ষাকবচ আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয় নাই। সেখানে জনসাধারণের প্রয়োজনমত সমবায়ের নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্র উদ্ভাবিত হইতেছে, পরিচালিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এখন সরকার সমবায়-আন্দোলনে অংশীদার হইয়া আন্দোলন সংগঠন করিতে চাহেন। কিন্তু এই অংশীদারত্ব যেন শাসকের সঙ্গে প্রজার না হয়, সাধারণ মানুষের অধিকারের সঙ্গে সরকারের অধিকার যেন সমান অংশিদারত্ব গ্রহণ করে। সমবায় বিভাগের পুর্ণ সংগঠন যেন সমবায় মতবাদ ও কর্ম্মপ্রণালীর উন্নতির উদ্দেশ্যে কার্য্যকর হয়।

সমবায়-আন্দোলনের পুনর্গঠন সকলের কাম্য। সমবায়-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—স্বাবলম্বন, সহযোগিতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার যদি স্বীকার করিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলেই ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ আছে। অন্যথায় ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তিই ঘটিতে থাকিবে। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, সমবায়-আন্দোলন—গণআন্দোলন, ডিরেক্টর-শাসনে এই আন্দোলন কখনো পরিচালন করা যায় না। সমবায়-আন্দোলনের ইতিহাস এই কথা সাক্ষ্য দেয় যে, সরাসরী সমবায় কর্ত্তৃপক্ষ পুর্ব্বাপর অধিকার ক্ষমতার দাবী করিয়া আসিয়াছে এবং ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছে। অপরপক্ষে বেসরকারী সমবায়-আন্দোলন চাহিয়া আসিতেছে সরকারী অভিভাবকত্বের অবসান হইয়া সমবায় আন্দোলনে জনসাধারণের আত্মপ্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বায়ত্বশাসনশীল প্রতিষ্ঠানের মত ইউনিয়ন-সমূহ কি প্রত্যেক রাজ্যে বেসরকারী সমবায় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে না? সে আদর্শকে ভিত্তি করিয়া তাহা সফল ও সার্থক হইতে পারে না যদি সমবায় বিভাগীয় ক্ষমতার স্থানে জনসাধারণের প্রাধান্য স্থাপিত না হয়।

সমবায়-আন্দোলনের পুনর্গঠন কেবল প্রয়োজন নয়—ইহা জাতীয় স্বার্থে একান্তভাবে অপরিহার্য্য। একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, কঠোর আইন দ্বারা সমবায় আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করার ফলে কোন সুফল আসে নাই। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ম্মাদেশে নূতন সমবায় আইন প্রবর্ত্তন করিয়া বর্ম্মাদেশের সমবায় আন্দোলনকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যায় নাই। বিহার প্রদেশে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এক কঠোর সমবায় আইন রচনা করা হয়, কিন্তু বিহারের সমবায়-আন্দোলনের বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হয় নাই। আইনের দ্বারা বিভাগীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়—আন্দোলনের বিস্তৃতির পথে তাহা বাধার সৃষ্টি করে। আইন এমন আদর্শকে ভিত্তি করিয়া রচিত হওয়া দরকার যাহাতে জনগণের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা না হয়।

সমবায় নীতির প্রসার সাধনের অর্থ হইল জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম করা। সমবায় নীতির বিস্তার ও প্রগতি একটি উন্নতশীল গণতন্ত্রের জন্য অহিংস্র সংগ্রাম। এই অবস্থায় ভারতে সমবায়ের নবীন অভ্যুদয়ের জন্য অন্যান্য জন-আন্দোলনের মত সমবায় আন্দোলনকেও গণতন্ত্রের জয়ের জন্য সার্থকভাবে কাজে লাগানো কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য কেবল জনগণের একার নয়—রাষ্ট্রেরও কর্ত্তব্য এই—সমবায়ের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকৃতিদান। তবে পুনর্গঠনের কাজ সুরু হইতে পারে।

হেমন্ত ভোরে

কালিদাস রায়চৌধুরী

সবুজ ঘাসের দেহে শিশিরের ফোঁটাগুলি ফেলে
আঁধারের মিছিলেরা মৌন মুখে চলে গেলে পর,
যে সকাল এলো হেথা স্বর্ণ-আভা ঢেলে
হেমন্ত রেখেছি নাম: আশ্চর্য প্রহর।
প্রান্তরের কুয়াশা সরিয়ে
জীবনের যাত্রাপথে দিলো গান উষ্ণসুর নিয়ে।
গ্রামের আকাশ শীর্ষে গৃহচূড়া জাগে
বিস্মৃতির যুগ থেকে যেন; দোলা লাগে
রাখালের দীপ্ত মনে মেঠো পথে যেতে:
হরিয়াল ঝাঁক ওড়ে যাদুস্পর্শে মেতে।
এ সকালে সাজি ভরি রক্ত-গাঁদা ফুলে,
শাশ্বত মনের রঙ আরও কত অজস্র মুকুলে।
আমনের ধানক্ষেত, মাছরাঙা, হিজলের বুক:
হৃদয়ের অবারিত দ্বার খোলে কামনা-কৌতুক!
হিমেল আমেজ পেয়ে উদ্যমের জাল হয় বোনা,
ভূমিষ্ঠ শিশুর কণ্ঠে এই লগ্নে প্রাণের ঘোষণা।

বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণ শিক্ষা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

[সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ব্যঞ্জনাক্ষরের দক্ষিণ কোণে (০) থাকিলে বুঝিতে হইবে সে অক্ষর অকারান্ত উচ্চারণ করিতে হইবে। স° সংস্কৃত, বা° বাঙ্গালা ইত্যাদি 'কার' স° অর্থ ধ্বনি। যথা স-কার, সধ্বনি]

২৫।২৬ বৎসর পূর্বে একবার আমি এখানকার (বাঁকুড়ার) জেলা ইস্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক সভায় গিয়াছিলাম। তৎকালের শিক্ষামন্ত্রী নদীয়া কৃষ্ণনগর-নিবাসী আজিজল সাহেব সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় যথারীতি রিপোর্ট পাঠ করিলেন। পরে এক এক বালক ইংরেজি গদ্য পদ্য, কেহ বা সংস্কৃত শ্লোক, কেহ বা বাঙ্গালা পদ্য আবৃত্তি করিয়া তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। শেষে এক বালক রবীন্দ্রনাথের অতীত নামক কবিতাটি আবৃত্তি করিল। কবিতাটির মর্মস্পর্শা ভাবে, মনোহর ছন্দে ও বিষাদের সুরে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। কিন্তু বালকটি অতীত না বলিয়া ওতীৎ বলিতেছিল। আমার কর্ণপটহে সূচীভেদ বেদনা হইতে লাগিল। একি? বালকটি অতীত শব্দ জানে না?

কিছুদিন পরে শুনিলাম অমৃৎ, অমৃৎ নামে কেহ ডাকিতেছে। একি? "অমৃত" যে চিরতরে অমৃত, এ কি বাঁকুড়ার ভাখা? স্থান ভেদে শব্দের উচ্চারণের ভেদ হয়। কোথাও শব্দের বর্ণবিশেষে বলন্যাস, কোথাও শব্দের শেষ স্বরের দীর্ঘতা, কোথাও আদ্য স্বরের অনুনাসিকতা, কোথাও উচ্চারণের দ্রুততা ইত্যাদি নানা প্রকার উচ্চারণ বৈষম্য আছে। ইহার নাম ভাখা। ভাষা একটী, ভাখা বহু। শিক্ষার দ্বারা ভাখা দূর হয়। শব্দের উচ্চারণ সমতা প্রাপ্ত হয়।

পরম আশ্চর্যের বিষয় সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ইংরেজ সংস্কৃত ভাষার নাম সংস্কৃৎ, প্রাকৃত ভাষার নাম প্রাকৃৎ রাখিয়াছেন। তিনি এদেশের কোন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলেন। বলিতে পারি,ইনি বাঙ্গালী ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা সেই অশুদ্ধ উচ্চারণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিগুরু পারিতোষিক দানের সভায় উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয় মর্মপীড়িত হইতেন। তিনি এখানে একবার কর্ণপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। ইং ১৯৪০ সালে তিনি একবার বাঁকুড়া আসিয়াছিলেন। এক মহতী জনসভায় তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল। তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলে ৫।৬টী কিশোরী 'বন্দেমাতরম্' নামক বন্দনা আরম্ভ করিল। কবির মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন বোধ হইতে লাগিল। গানের প্রথম কলি সমাপ্ত হইলে তিনি ইঙ্গিত করিলেন, গান থামিয়া গেল। পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এরা এই বহুশ্রুত গানটি শিখিতে পারে নাই।" আর একি উচ্চারণ?

এই উচ্চারণ হ্রস্বদীর্ঘভেদে নয়, 'স' ধ্বনির প্রাবল্য। 'সস্য' স্যামলাং' শুনিলে চমকিয়া উঠিতে হয়। এখানকার সামান্য লোকে 'স' ভিন্ন শ, ষ উচ্চারণ করে না। কলেজের ছাত্রেরাও কেবল 'স' করে, বলে সুসীল, সেসে, ভূসণ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য ইংরেজি শব্দেও সেই 'স'। The moon is bright, see sines in the sky.

বহুকাল হইতে এই দন্ত স্পৃষ্ট 'স' প্রাকৃত জনের একমাত্র 'স' হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষিত জনে মুখ খুলিয়া কথা কহে—'শ' বহির্গত হয়। তথাপি শ্রম, শ্রী, শৃগাল ইত্যাদিতে 'স' আসিয়া পড়ে। আমরা ইংরেজিতে লিখিতেছি sri এখন 'ত' বর্গের সহিত যুক্ত হইলে 'স' উচ্চারিত হয় অন্যথায় "শকাল শব শময়" সেই কথা। 'ট' বর্গের সহিত যুক্ত হইলে 'ষ'। কেহ কেহ বিদেশী শব্দে 'ট' বর্গের সহিত 'স' জুড়িতেছেন। তাঁহারা লেখেন—মাস্টার, স্টেশন, কিন্তু ভুলিয়া যান আমরা বিদেশী শব্দ বাঙ্গালারূপে উচ্চারণ করি। আমরা আপিশ, পুলিশ, নোটিশ, ইস্কুল, ইত্যাদি উচ্চারণ করি ও লিখি। আমরা ষ্ট্রীট, ষ্ট্যাম্প, পোষ্ট ইত্যাদি লিখি, 'স' লিখি না। তদ্দারা বাঙ্গলা ভাষা অশুদ্ধ হয় না। ইংরেজী পড়িবার সময় ইংরেজী উচ্চারণ করিতে হইবে।

দেখেতেছি, মহাবিদ্যালয়ের, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কৃষ্ণ শব্দ কৃস্ন বলিতেছে। কিন্তু ইহার বাঙ্গলা উচ্চারণ

কৃষ্ট । ইহা হইতে কিষ্ট, কেষ্টা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে পুরোহিত ঠাকুর বিষ্ণু পূজা করিতেছেন। মহাবিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শব্দটি 'বিস্নু' হইয়াছে। বিদ্যালয় 'স'কার প্রীতি প্রদর্শন করিতেছেন।

আমরা 'ণ'কার উচ্চারণ প্রায় হারাইয়াছি। 'ট' বর্গের উর্দ্ধস্থিত 'ণ' কভু 'ন' উচ্চারিত হয় না। কণ্ঠ, কণ্ঠা শব্দে যে অনুনাসিক ধ্বনি তাহা কন্থ, কন্থা শব্দে নাই। উর্দ্ধস্থিত ণ ক্ষীণ, ন স্থূল।

অযুক্ত 'ণ' উচ্চারণে 'ড়ঁ' তুল্য। গুণ উচ্চারণে গুড়ঁ, 'ড়ঁ' উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া সামান্য লোকে ট করিয়াছে। তাহারা বলে উষ্ট, কৃপণকে কিপটা বলে। তাহারা বৈষ্ণব শব্দ হইতে বৈষ্ণঁব, বৈষ্ণঁম করিয়াছে। 'ষ্ণ' এই অক্ষরেও 'ষ' এর গায়ের পালানটি 'ট'। বস্তুতঃ 'ষ্ণ' এই অক্ষরটির নাম ষ্টঁ। সং রণ হইতে বাং বড়, লড় আসিয়াছে। সংস্কৃত 'শ্রেণী' বাং সিড়িঁ, সিঁড়ি। এইরূপ আরও আছে।

'জ্ঞ' এই অক্ষরটির নাম গিঁয়। জ্ঞ এই অক্ষরটি কেবল বালক নয়, যুবকদিকেও ধাঁধায় ফেলে। তাহারা যদি বা লিখিতে পারে, উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু এই অক্ষরটির প্রতি দৃষ্টি করিলে জ ও ঞ এই দুইটী অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। বামপার্শ্বে জ, দক্ষিণ পার্শে 'ঞ' এর পালান। অক্ষর নির্মাতার প্রশংসা করিতে হয়। জ অক্ষর+ঞ=গিঁঅ। যেহেতু 'য়' একফলা সেহেতু গিঁঅ=গ্যাঁ। জ্ঞান, উচ্চারণ গ্যাঁন। জিজ্ঞাসা উচ্চারণ জিগ্যাঁসা।

'ক্ষ' এই অক্ষরটির বাংলা নাম খিঅ। এই অক্ষরের নামের উৎপত্তি কৌতুকাবহ। ক্=ষ এই দুই ব্যঞ্জন মিলিত হইয়া 'ক্ষ' অক্ষর হইয়াছে। 'ষ' কোথাও কোথাও 'খ' উচ্চারিত হইত। ক্+ষ হইল ক্+খ। আদ্যে 'ক্ষ' থাকিলে খ থাকে। তখন ক্ষমা—খমা, ক্ষেত্র—খেত্র, কিন্তু বক্ষ—বক্‌খ। সখ্য শব্দের বাঙ্গলা উচ্চারণ সক্‌খ। তদ্দৃষ্টে বক্ষ—বখ্য-বখিঅ। এইরূপ উৎক্রমে, ব্যুৎক্রমে 'ক্ষ' অক্ষরটির নাম খিয় হইয়াছে। অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি করিলে উপরে কএর আঁকড়ি দেখা যাইতেছে নীচে 'ষ'। কিন্তু বাঁদিকে নীচের পুটলি আবশ্যক ছিল না। অক্ষরটির আকার সংশোধন কর্ত্তব্য।

বিদ্যালয়ে ফলার উচ্চারণে উন্নতি হয় নাই। য-ফলা উচ্চারণের অবনতি হইয়াছে। বাংলা ভাষায় অনেক সংযুক্ত ব্যঞ্জন আছে। এই সকল ব্যঞ্জন দুইভাগে পড়ে। অধিকাংশ সংযুক্ত ব্যঞ্জন পৃথক উচ্চারিত হয়। যেমন—দুগ্ধ, হস্ত, বদ্ধ, বন্ধ ইত্যাদি। ক্ষ, জ্ঞ, ষ্ণ এইভাবে পড়ে। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণ বিকৃত। অপর কতকগুলি সংযুক্ত ব্যঞ্জন পৃথক উচ্চারিত হয় না। স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া উভয়ে সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, য, ব, র, ল, ম, ণ, ন, অপর বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া সেইরূপ সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন ক্রম, ক্লেশ, স্নেহ ইত্যাদি। এই কয় বর্ণের নাম ফলা। সং ফলক হইতে বাং ফলা। ফলক শব্দের অর্থ ঢাল। ঢাল যেমন দেহ ঢাকিয়া রাখে, ফলার অক্ষর যোজ্য ব্যঞ্জনের অক্ষরকে তেমন ঢাকিয়া রাখে।

আদ্য ব্যঞ্জন ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জনে ফলা যুক্ত হইলে সে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন সত্য—সত্ত, বিপ্র—বিপ্‌প্র, বিপ্লব—বিপ্‌প্লব, বিশ্ব—বিশ্‌শ। ম ফলা যুক্ত হইলে ম স্থানে অর্দ্ধ অনুস্বার হয় যেমন, পদ্ম—পদ্দ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ন ণ ফলা হইলেও পৃথক উচ্চারিত হয়। যেমন অগ্নি, রত্ন, কৃষ্ণ ইতাদি। এই সূত্র অন্য ফলাতেও প্রয়োগ করিলে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না, ফলার উচ্চারণও শুদ্ধ হয়। যেমন পদ্ম—পদ্‌ম। এইরূপ বানান করিলে উচ্চারণের দুইটী দোষ সংশোধিত হয়, বালকেরাও স্বচ্ছন্দে ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর লিখিতে শেখে।

বহুকাল হইতে এই ফলার প্রকৃত উচ্চারণের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে—স্মরণ—সঙরণ, পদ্মা—প্রাচীন বাং পদুমা, শ্মশান—মশান, (অধুনা যুগ্ম, বাগ্মী শব্দের ম পৃথক উচ্চারিত হইতেছে) উদ্যোগ—উদ্‌যোগ, উদ্বেগ—উদ্‌বেগ, উদ্বিগ্ন—উদ্‌বিগ্ন।

'য়' অক্ষরটির নাম অন্তঃস্থ অ রাখা উচিত হয় নাই। অ স্বর অকার ভিন্ন আর কি হইবে। স্বরবর্ণ অ ও ব্যঞ্জনবর্ণ অ বলিলে বালককে ধাঁধায় ফেলা হয়।

৭০।৮০ বৎসর পূর্বে পাঠশালার বালকেরা ক, খ, অ, আ, কা, কি লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়া ক, বা কি অ ধরিত। উচ্চারণে কি অ কিন্তু লিখনে ক্য অর্থাৎ যাহা য় পড়া হইতেছে তাহার নাম ইঅ ছিল। এই কারণে কবিকঙ্কনের নিবাসগ্রাম দামিন্যা লিখিত হইত। অদ্যাপি

তদ্দেশবাসী দামিণ্ডা বলে, দামিন্না বলে না। কবিকঙ্কন খুল্লনার বারমাস্যা বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পড়িতেছে বারমাস্সা। এই উচ্চারণ যে কি রকম ভুল, তাহা মাস্যা শব্দের অর্থ চিন্তা করিলে জানা যাইবে। হা-স্যা—হাস্সা নয় হাসিআ, রান্ধ্যা—রাধিআ, কর্যা—করিআ ইত্যাদি। ই ইয় অক্ষরের মূলধ্বনি। এই কারণে সত্য শব্দ হইতে সত্তি, দিব্য হইতে দিব্বি আসিয়াছে। য়-ফলা পৃথক করিলে উচ্চারণ দোষ সংশোধিত হয়। তখন সত্য উচ্চারণে সতিঅ (ই—ঈষৎ)। বিদ্যা—বিদিআ (ই—ঈষৎ) ইত্যাদি। বাঁকুড়ায় য়-ফলা উচ্চারণ প্রায় অবিকৃত আছে। কেহ কন্যা শব্দ কন্না বলে না। বরকন্যা—বরকনিআ (ঈষৎ আ)।

বিদ্যালয়ের বালকেরা পড়ে স্বরে অ, অন্তঃস্থ 'য়'। অ-ধ্বনি অবশ্যই একটি, দুইটী হইতে পারে না। বালকেরা বর্ণমালা শিখিবার সময় অন্তঃস্থ অ না বলিয়া ইঅ বলিতে শিখিলে উচ্চারণ দোষ সংশোধিত হইতে পারে। য় অক্ষরের নাম কি? বালক বলিবে ইঅ। তাহারা জানে দয়া, দআ নয়। দ-য়া—দইআ। বিদ্যা—বিদ্দা নয়, বিদিআ। কিন্তু য় (ইঅ) বর্ণের অ লুপ্ত হইলে ই স্থানে একার হয়। যথা:—হয়—হ-এ (এ, হ্রস্ব), যায়—যা-এ (এ হ্রস্ব)। বিপদ এই য় অক্ষরের আরও প্রয়োজন আছে। সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক বাঙ্গলা শব্দ আসিয়াছে। কোন কোন শব্দের দুই এক ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে। যেমন সাগর—সাঅর, কিন্তু লেখা হয় সায়র। বিপদ এই বহুকাল হইতে য় অক্ষরটী স্বরবর্ণের বাহন হইয়াছে। এইরূপে য়, য়া, য়ি, য়ু, য়ে, য়ো অক্ষরের উচ্চারণ অ, আ, ই, উ, এ, ও। পরে পরে দুইটি স্বরবর্ণ লিখিতে হইলে দ্বিতীয়টিতে য় জুড়িতে হয়। সং কূপক হইতে বাং কুআ, কিন্তু লেখা হয় কুয়া। অবাঙ্গালী পড়িবে কুইআ। কুয়া একটি শব্দ আছে, ইহার মৌখিক রূপ কুয়ে, অর্থ কুবুদ্ধি।

সং শুক হইতে বাং শুআ পক্ষী। কিন্তু লেখা হয় শুয়া। এই বানান হইতে আগে শুইআ। ই-ও-রো-প —ইয়োরোপ। কর্ ধাতু হইতে করা, যা ধাতু হইতে যাআ, অনেকে যাওয়া না বলিয়া যাআ বলে। আমরা বলি ও লিখি যাওয়া। বাস্তবিক বলিতে চাই যাওআ। দুইটী স্বর পাশাপাশি বসিলে উভয়ের সন্ধি হইয়া একটী স্বর হয়। বোধ হয় এই আশঙ্কা করিয়া য় অক্ষরটির আবির্ভাব হইয়াছে। এক্ষণে পুঁথি ছাপা হইতেছে, স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে জুড়িয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। অতএব য় অক্ষরটিকে স্বরাক্ষররূপে লেখা অনাবশ্যক হইয়াছে। জানুআরী, একাএক, কুআ ইত্যাদি বানান করা উচিত।

বিদ্যালয়ের বালকেরা পড়ে বগায় ব, অন্তঃস্থ ব, কিন্তু দুইটী ব অক্ষর নাই। আর বাস্তবিক দুইটী ব-ধ্বনিও নয়, একটী ব, অপরটি 'উঅ' (যেমন ইঅ), উঅ প্রায়ই 'ওঅ'। বাঙ্গলায় এই উঅ ধ্বনির অক্ষর নাই, নাগরী ব লইতেছি। যাওয়া অর্থাৎ যাওআ=যাবা। যাওয়ার সময়=যাবার সময় একই অর্থ। বাঙ্গলা ভাষায় ব ধ্বনি প্রচুর আছে। ফলার ব এই ব। সোয়ামি, সোয়াস্তি, দুয়ার ইত্যাদি শব্দে পূর্বকালের ব অক্ষরের চিহ্ন আছে। সং আবাস হইতে বাং আওয়াস, আশ্বাস, কবির (আশোয়াস) অতএব সং বিশ্ব উচ্চারণে 'বিশ্ওঅ'।

এক্ষণে হিন্দী ভাষাই ভারত-রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় ফলা নাই। সকলেই বলে মহাত্মা, বিশ্বাস। হিন্দীর প্রভাবে বাঙ্গলা ফলার উচ্চারণ শুদ্ধ হইতে পারে অথবা বাঙ্গালী হিন্দী ভাষাকে বাঙ্গলারূপে উচ্চারণ করিবে। বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণকে বাঙ্গলা করিয়া ফেলিয়াছে। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পড়িতেছে—

"অথবা ক্রিত-বাগ্দারে বংশেষ্মিঁন্ পূর্বশূরিভিঃ।
মনৌ বজ্জ্রে শমুৎকীর্ণে শূত্রশ্শেবাশ্তি মে গতি॥"

ইহাতে শ্লোকের মাধুর্য্য নষ্ট হইতেছে। এই শ্লোকের যাবতীয় 'ব' অন্তঃস্থ 'ব'।

হ-কারে ফলা যুক্ত হইলে বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে। কিন্তু ব ফলা যুক্ত হইলে বিপর্যয় হয় না। ফলা উপরে উঠে, আর হ নীচে নামে, আর ফলার দ্বিত্ব হয়। যথা—ব্রহ্ম—উচ্চারণে ব্রম্(ম্হ)—ব্রম্ভঁ। প্রহ্লাদ—প্রল্(ল্হা)দ—প্রল্লাদ, বহ্নি—বন্নিহ—বন্হিঁ। বাহিঅ—বাজ্(জ্হ)—বাজ্ঝ অথবা বাঝ্য। কিন্তু আহ্বান, বিহ্বল, জিহ্বা। কেহ কেহ জিহ্বা না বলিয়া জিব্হা বলেন। তখন শব্দটী সংক্ষেপে জিভ হয়।

পুঁথিতে আছে "কালহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী"।

পণ্ডিত মহাশয় পড়িতেছেন, "কালহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী"। তিনি ভাবেন না, নিরক্ষর প্রাকৃতজন তাঁহার উচ্চারণের নিয়ামক।

হসন্ত হ্ উচ্চারণ অশিক্ষিতের দুঃসাধ্য। স্বরান্ত করিবার চেষ্টায় 'হ'কে নীচে নামিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য এখানেও ফলাকে পৃথক রাখিলে উচ্চারণ দোষ সংশোধিত হইবে। বালক বলিবে ব্রাহ্মণ!

এক্ষণে অতীত আবৃত্তি স্মরণ করি। 'অতীত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অতীতকে তিনবার অনুনয় করিয়াছেন। যথা—

'হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও।'
'হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও, কথা কও।'
'ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।'

অতীত চিরদিন অতীত. আছে, থাকিবে। "অতীত কাহিনী, মম বাণী শোন হিন্দুস্থান।"

কবিতার ছন্দ ও ভাব অনুসারে যেমন কোন স্বরকে হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ করিতে হয়, অন্যত্র হসন্ত উচ্চারিত হইলেও কবিতায় অকারান্ত না করিলে ভাবের গাম্ভীর্য রক্ষিত হয় না। উদাহরণ দিতেছি :—

(১) নির্মল. সলিলে
বহিছ সদা।
তট. শালিনী
সুন্দর. যমুনে ও॥

নির্মল, সুন্দর, তট অকারান্ত পড়িতেই হইবে।

(২) মধূক. কুসুম. সম., গণ্ড যুগ. নিরুপম.,
অলিকুল. অন্ধ. হ'য়ে ধায়।'

ইহার প্রত্যেক শব্দই অকারান্ত পড়িতে হইবে।

বালক ওতীৎ বলিতেছিল। অ—পরে ই কিংবা উ থাকিলে বাঙ্গলা ভাষায় অকার স্থানে ওকার উচ্চারিত হয়। যথা :—কোলিকাতা, ওতি, পোক্ষ, যোজ্ঞ, সোত্য, কোরি, চোলি, পোশু, যোদু, মোধু, ওনুগ্রহ ইত্যাদি। কিন্তু দ্রষ্টব্য এই, এই সকল শব্দে আকার উচ্চারিত হইলে বাঙ্গলা ভাষায় দোষ হয় না। কলিকাতা নামের ই কাটিতে হইলে লোপ চিহ্ন, উৎকলা (') দিতে হইবে। যথা—ক'লকাতা। নচেৎ কলকাতা ও কলতলা একপ্রকার হইয়া যায়। যদিও 'অ' স্থানে 'ও' উচ্চারণ বহুপ্রচলিত তথাপি এই উচ্চারণ বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি বলিতে পারি না। নিষেধার্থক অ কদাপি ও কার হয় না। যথা :—অবিনাশ, অক্ষয়, অসুখ, অমূল্য, অনুপস্থিত। কোথাও কোথাও আন্তস্বরে ওকার প্রীতি এত প্রবল যে সেখানে কোর্ত্তব্য, ওষ্টমী, রোজনী ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ভাখা বলিতে দ্বিধা হয় না।

কেহ কেহ বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণে অনুনাসিক ধ্বনি অকারণ আনিয়া থাকে। তাহারা লেখে তিনি, কিন্তু পড়ে তিঁনি। লেখে আম, পড়ে আঁম। পরে অনুনাসিক বর্ণ থাকিলে পূর্ববর্ণকেও অনুনাসিক করে। কর্তাকারকে ১বচনে গৌরবে তিনি, কর্মকারকে তাহাঁকে (পূর্ব্ববঙ্গে তেনাকে), সম্বন্ধে তাহাঁর (পূর্ব্ববঙ্গে তেনার)। কিন্তু অনেকেই লেখে তাঁহাকে, তাঁহার এবং পড়ে তাঁহাঁকে, তাঁহাঁর।

কোন জাতীয় শব্দের অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়, কোন জাতীয় শব্দের হয় না, তাহার নির্দেশ অতীব দুরূহ। মানুষ স্বভাবতঃ অলস, বিনা প্রয়োজনে শক্তি ক্ষয় করিতে চাহে না। আমরা যে সকল শব্দ সর্বদা কহিয়া থাকি সে সকল শব্দের রূপে ও উচ্চারণে শ্রমলাঘব ও সুখোচ্চারণ প্রধান লক্ষ্য হইয়া থাকে। আমরা দীর্ঘ শব্দকে হ্রস্ব করি, অন্ত্য অ স্বরকে লোপ করি। অন্য স্বর লোপ করা অসম্ভব, করিলে শব্দ চিনিতে পারা যায় না।

শব্দের অন্ত্য অ উচ্চারণের কয়েকটা সামান্য সূত্র করিতে পারা যায়। যথা :—

/০ ঋ, ঐ, ঔ, ং, ঃএর পরস্থিত অ উচ্চারিত হয়। যথা :—মৃগ, তৃণ, শৈল, বৈধ, শৈব, সৌর, সৌধ, মৌন, বংশ, দুঃখ। গৌর শব্দ অ লোপে গউর হয়। ব্যতিক্রম ঋণ।

৵০ হান্ত শব্দের অকার উচ্চারিত হয়। অ উচ্চারণ না করিলে শব্দ চিনিতে পারা যায় না। যথা :—দেহ, বিরহ।

৶০ তান্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা :—অতীত, পঠিত, চালিত, যত, তত, মত। নিত্য ব্যবহার হেতু পণ্ডিত, উচিত ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ হসন্ত হইয়াছে। ব্যতিক্রম শ্বেত, পীত, লোহিত, হরিৎ, পতিত, পণ্ডিত।

।০ স° যান্ত শব্দ। যথা :—দ্বিজ, অগ্রজ, মৃত্তিজ, খনিজ, বসুজ। ব্যতিক্রম, সহজ।

।/০ ই কিংবা এ পরস্থিত য়। যথা:—প্রিয়, প্রেয়, দেয়, অনুমেয়।

।৶৴ সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষরান্ত। যথা:—কথ্য, বিপ্র, বর্গ। অতএব মার্চমাস, পার্ক, পোষ্ট, কার্ড বানান অশুদ্ধ।

।৶০ সমাসবদ্ধ শব্দ। যথা:—বিষ-বৃক্ষ, মুখ-দর্শন, কাল-ক্রমে, পুরুষ-সিংহ, গুণ-কর্ম, জীব-ধর্ম।

৷৷০ অনেক দুই অক্ষরের বান্ত শব্দ ও পান্ত শব্দের অন্ত্য অ লুপ্ত হয় না। যথা:—ধ্রুব, ভব, তব, নব।

অনেক পান্ত শব্দের অ উচ্চারিত হয়। যথা—ভূপ, নৃপ, মধুপ।

দুই অক্ষরের বিশেষণ শব্দ। যথা:—কাল, ভাল, ছোট, বড়, জড়, দড়, ঘাড়, ঘন, বার, তের, পনের, ষোল, সতের, আঠার, কেন, যেন, তেন, হেন। ব্যতিক্রম খল।

৷৷/০ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অ উচ্চারিত হয়। যথা:—ইরম্মদ, ইষুর্বৃধ, প্রতীক, স্বস্তিক, মধুক, বৃন্দারক, বিনায়ক, ভট্টারক ইত্যাদি।

৷৷৶০ অনেক ধান্ত শব্দের অ উচ্চারিত হয়। যথা:—বিধ, বিবিধ, নানাবিধ, বহুবিধ, আয়ুধ, বিবুধ।

৷৷৶০ এইরূপ মান্ত শব্দ, যথা:—মম, মহিম, অসীম, সসীম।

পরিশেষে বক্তব্য ভাষা ও ভাখা এক নয়। আমি ও আমরা যে শব্দ যেমন উচ্চারণ করি, সে উচ্চারণ ভাষার প্রমাণ নয়। লিখনের দ্বারা ভাষা স্থিত আছে। যে উচ্চারণ সেই লিখনের যত নিকটবর্তী, সে উচ্চারণ তত শুদ্ধ।

আমাদিগকে সংস্কৃত ভাষা কহিতে হয় না। পড়িতে, বুঝিতে ও লিখিতে পারিলেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার বহুল প্রয়োজন আছে। নূতন মানুষ দেখিলে তাহার কথা শুনিয়া প্রথমে তাহাকে চিনিতে চেষ্টা করি। তাহার আকৃতি প্রকৃতি বেশভূষা লক্ষ্য করি, তাহার ভাষাও লক্ষ্য করি।

এক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর বালক ব্যাকরণে পড়িতেছে 'বিসেস্য,' 'বিসেসন,' লিঙ্গ, কারক ইত্যাদি। এখানে বালকের উচ্চারণের দুইটী দোষ ঘটিতেছে। প্রথমতঃ সর্বত্র স উচ্চারণ, দ্বিতীয়তঃ শব্দের শেষের স্বরে বলন্যাস। এই অভ্যাস সহজে ছাড়িতে পারে না। এক মহাবিদ্যালয়ের বি. এ.-পাঠী ছাত্র ডাকিতেছে 'সুসীল, সুসীল, সোন' আর এক ছাত্র ইংরেজি পড়িতেছে ডকটর, লিডার ইত্যাদি। এই প্রকার উচ্চারণ শুনিলে বুঝি বিদ্যার বুনিয়াদ পোক্ত হইতেছে না। যিনি এই প্রকার উচ্চারণ শুনিবেন, তিনিই ভাবিবেন এই ছাত্র বি-এ পরীক্ষা পার হইলেও অশিক্ষিত। কারণ বিদ্যা বাঙ্ময়ী। বাংলা ভাষায় অসংখ্য সংস্কৃত সমশব্দ আছে। সে সকল শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিলে বানান কণ্ঠস্থ করিতে হয় না।

যে সকল বর্ণের উচ্চারণ হারাইয়াছি, তাহাদের পুনরুদ্ধার চেষ্টা বিফল হইবে। কিন্তু যাহা আছে, যথাসাধ্য তাহা রক্ষা করিতে পারিলে বালক অল্পকালে বহু শব্দের শুদ্ধ বানান শিখিতে পারিবে। যখন বালক বিদ্যা আরম্ভ করে তখন যত্ন করিলে বর্ণের শুদ্ধ ধ্বনি শিখাইতে পারা যায়। বালক বলিতেছে 'অস্স'— লিখিতেছে 'অশ্ব,' বলিতেছে 'এাক,' লিখিতেছে 'এক'। বলিতেছে 'রাত্তি্র,' লিখিতেছে 'রাত্রি'।

ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা যুক্ত হইলে যেরূপ দ্বিত্ব হয়, সেইরূপ রেফযুক্ত হইলেও কোন কোন বর্ণে বানানে ও উচ্চারণে দ্বিত্ব হইত, এখনও হইতেছে, যথা:—অর্চ্চনা, অর্জ্জন, অর্দ্ধ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, সূর্য্য ইত্যাদি। এই দ্বিত্ব করিবার কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না। কিন্তু উচ্চারণে দ্বিত্ব না হইলে বানানে দ্বিত্ব হইত না। দ্বিত্ব বর্জন করাইতে আমাকে চল্লিশ বৎসর যত্ন করিতে হইয়াছে। কেহ কেহ ভুল করিতেছেন। কার্ত্তিক, মার্ত্তিক শব্দের দ্বিত্ব রেফ জন্য নহে। মূল কৃত্তিকা, মৃত্তিকা শব্দে দুইটী ত আছে। বাংলা তদ্ভব শব্দের উচ্চারণ শিখিলে শুদ্ধ বানান বলিতে পারা যায় না। ব্যাকরণের অনুরোধে আমরা মাসী, পিসী লিখি, কিন্তু শুদ্ধরূপ মাসি, পিসি ইত্যাদি। এখানে বানান বিচার করিব না।

এক্ষণে বাঙ্গলা দেশে বিদ্যাশিক্ষার বিপুল ব্যবস্থা হইয়াছে। বালকবালিকারা আদ্যবিদ্যালয়ে লিখিতে পড়িতে শিখিতেছে। যেমন লিখিতেছে, তেমন পড়িতেছে কি? বালক বালিকারা লিখিতেছে এ-ক, তাহারা 'এক' পড়িতেছে কি? একে পড়ে না তো? এাখন, এামন, উচ্চারণ শুনিলে বুঝি বালকের শিক্ষা পাকা হয় নাই।

বঙ্গরাজ স্থানে স্থানে লোক শিক্ষা (Social Education)এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। বয়স্ক নরনারী ভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখিতেছে। আর যে কত বিষয়ে তাহাদের মন প্রবুদ্ধ হইতেছে তাহা স্মরণ করিলে বিশ্বাস হয় আমরা সত্যই স্বাধীন হইয়াছি। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই "ভারতবর্ষে" যে চিত্র কল্পনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা কল্পনা নয়। সিনেমা লইয়া উপদেষ্টা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কিসে কি হয়, কি করিলে কি না হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করাইতেছেন। বঙ্গরাজ দুই হাতে জ্ঞানের বীজ ছড়াইতেছেন। কতক নষ্ট হইতেছে, হইবেই। আর কতক সে বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

কিন্তু বিদ্যা বাঙ্ময়ী। শ্রবণেন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয় শিক্ষিত না হইলে বিদ্যা লুক্কায়িত হ'ন। এই কারণেই বলিতেছি শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে উদাসীন হইবেন না।

স্বামী বিবেকানন্দ ও শিক্ষার আদর্শ

শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই তিনি ভারতের মুক্তিসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কিন্তু স্বদেশের আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ও কামনা ছিল না। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি কামনা করেছিলেন জগতের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণই। তিনি ছিলেন—True to the kindred points of Heaven and Home ভারতের অগণিত জনগণের সর্ববিধ কল্যাণসাধনই ছিল এই আত্মত্যাগী কর্মবীর মহাপুরুষের নাতিদীর্ঘ কর্মময় জীবনের মহাব্রত। উদাত্তকণ্ঠে স্বদেশবাসীর উদ্দেশে তাই তিনি বলেছিলেন—"বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" এই সুগভীর দেশাত্মবোধের দরদ তিনি বুঝেছিলেন দুঃখ দৈন্য নিপীড়িত, দুর্গত ভারতের সীমাহীন মর্মবেদনা। তাঁর সুদূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন স্বদেশের প্রকৃত অবস্থা ও স্বদেশবাসীর জাতিগত চারিত্রিক দুর্বলতা। তাঁর স্বদেশপ্রেম শুধু স্বপ্নবিলাস মাত্র ছিল না—ছিল বাস্তব-ধর্মী। বাস্তব জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর সুদৃঢ় ভিত্তি এবং নিরলস কর্মেই তা' রূপ পরিগ্রহ করেছিল। নিরবকাশ কর্মব্যস্ততায় কেটেছিল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের স্বল্পায়ু জীবনের দিনগুলি। ইউরোপ ভ্রমণের সময় ওখানকার গরীব লোকদের অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের দরিদ্রদের অবস্থার পার্থক্য তাঁর তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি এড়ায় নি। দেশব্যাপী অসীম অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারই যে এই বিপুল পার্থক্যের মূল কারণ তা'ও তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। স্বদেশবাসীর এই ব্যাপক মূর্খতা ও অজ্ঞতার অশেষ গ্লানি তাঁর একান্ত সংবেদনশীল কোমল অন্তরে বড়ই বেজেছিল। কিরূপে এই দেশব্যাপী অশিক্ষা, অজ্ঞান ও কুসংস্কার দূর করা যায় সে সম্বন্ধেও তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিবন্ধগুলিতে তাঁর সুগভীর চিন্তাশীলতা, মননশীলতা ও অনন্যসাধারণ হৃদয়বত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার দিনে, এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে তিনি দেখেছিলেন দেশের শিক্ষা-সমস্যাগুলি এবং আগ্রহশীল হয়েছিলেন সেগুলির সমাধান করতে। তিনি চেয়েছিলেন এক নতুন মহান শিক্ষাদর্শ স্থাপন করতে, যার ভিত্তি হবে ধর্মের উপরেই। আজকের এই স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে শিক্ষাধারা পরিবর্তনের এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের নানা পরিকল্পনা চলছে। আজকের দিনে তাই দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের—বিশেষ করে প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীরই স্বামী বিবেকানন্দের সুচিন্তিত মতামতগুলি পর্যালোচনা করা নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। স্বামীজি শিক্ষার যে উদার, মহান আদর্শটি তাঁর স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তার কিছুটাও যদি আজ আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি তো আমরা দেশে সত্যিকার মানুষ গড়ে তুলতে পারবো। তিনি যে "মানুষ গড়ার" শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, আজ সেই "মানুষ গড়ার" শিক্ষারই আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয়েছে। আজকের দৈন্য-অভাবগ্রস্ত ভারতে সত্যিকার মানুষ ও মনুষ্যত্বের অভাবও একটি মস্তো বড়ো অভাব।

দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত ত্রুটি ও গলদগুলি ধরতেও স্বামী বিবেকানন্দ মোটেই ভুল করেন নি। তিনি বলেছেন—"আমাদের শিক্ষা আসল মানুষ গড়ার জন্য নয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে নেতিমূলক।" তাঁর এই উক্তিটি বাস্তবিকই খুব ঠিক। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সচরাচর এই রকম "নেতিমূলক" শিক্ষারই ব্যবস্থা করা হয়, যাতে করে ছাত্রদের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না। তারা সত্যিকার মানুষ হয়েও গড়ে ওঠে না। ছেলেমেয়েরা শুধু শেখে—তারা কিছুই নয়, কিছু হতেও পারবে না। "ইতিমূলক" ও "উৎসাহপ্রদ" শিক্ষার অভাবে তারা ক্রমে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাও হারিয়ে ফেলে। পরবর্তী জীবনে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠ, নৈতিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। স্বদেশের অশেষ গৌরবময় অতীতের দিকে তাদের দৃষ্টি ফেরাবার কোনও চেষ্টাই হয় না। স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও পুরাতন সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাদের অপরিসীম অজ্ঞতা বাস্তবিকই অত্যন্ত শোচনীয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কেতাবী শিক্ষাকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়, যার ফলে পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া ও "তথ্যসংগ্রহ"ই হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষাদান ও বিদ্যার্জনের পরম ও চরম উদ্দেশ্য। স্বামী বিবেকানন্দ এই কেতাবী শিক্ষার প্রতিবাদকল্পেই বলেছেন—"যে শিক্ষা জনসাধারণকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে সাহায্য করে না, যাহা আমাদের সৎসাহস বৃদ্ধি করে না, যাহা পরোপকারের প্রবৃত্তি জাগায় না এবং মানুষকে সিংহতুল্য সাহসী করে না, তাহা কি শিক্ষানামের যোগ্য?" তবে আমরা কিরূপ শিক্ষা চাই? স্বামীজি বলেছেন—"আমরা সেই শিক্ষা চাই যাহার দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের জোর বাড়ে, বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে।" শিক্ষা বিষয়ে আমরা আজও বিদেশী প্রভাবমুক্ত হতে পারি নি। শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষার আদর্শ স্থাপনের জন্যে আমরা এখনও শুধু পাশ্চাত্য দেশের দিকেই চেয়ে আছি। স্বামী বিবেকানন্দের মতে স্বদেশের পুরাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও, যেমন ছেলেমেয়েদের জ্ঞান দিতে হবে তেমনি তাদের শেখাতে হবে ইংরিজি ভাষাও—যার মাধ্যমে তারা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও জীবিকামূলক শিল্প শিক্ষা করতে পারবে। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাকে

বর্জন করতে বলেন নি—কারণ তাতে করে দেশের উন্নতির অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্তই হবে। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটাতে। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে স্বদেশের শিল্পগুলির উন্নতি সাধন করতে না পারলে সেগুলি কোনও দিনই উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারবে না এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভব হবে না—একথাও স্বামীজি বুঝেছিলেন। তাঁর মতে "মানুষ গঠন করাই সকল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য" এবং "মানুষের মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টি সাধনই সকল শিক্ষার লক্ষ্য।" তাঁর ভাষায় বলি—চাই "লোহার মত শক্ত মাংসপেশী, ইস্পাতের মত বলশালী স্নায়ু এবং অদম্য বিপুল ইচ্ছাশক্তি।" এক কথায় অতুল দৈহিক ও মানসিক বলে বলীয়ান, দৃঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্যিকার মানুষ গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেই শিক্ষা হবে "মানুষের সর্বপ্রকার জীবন গঠনের সহায়ক।" রবীন্দ্রনাথও "সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপনকেই" শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে স্থির করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব সুপ্ত আছে, তাহার বিকাশসাধনই শিক্ষা। জ্ঞান মানুষের অন্তরে নিহিত, ইহা সহজাত। কোনও জ্ঞান বাহির হইতে আসে না, সমস্ত জ্ঞান ভিতরেই আছে। ইহা আত্মপ্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।" রুশোপ্রমুখ আধুনিক সকল শিক্ষাবিদের মতেই শিশুর অন্তর্নিহিত দৈহিক ও মানসিক শক্তি ও বৃত্তি সমূহের সম্যক বিকাশসাধন করাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁরা সবাই বলেছেন কেবল পুস্তকলব্ধ জ্ঞানদান ও জ্ঞানার্জনই শিক্ষা নয়। স্বামী বিবেকানন্দও সেই মতের পরিপোষক। তিনি বলেছেন—"মানবের অন্তরে অনন্ত জ্ঞানের খনি বিদ্যমান।" মানুষের সেই অন্তর্নিহিত জ্ঞান আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় সদাই উন্মুখ হয়ে রয়েছে। "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে"—শিশুদের "প্রাণ কোরকের গোপন মর্মস্থলে" এই "বিকাশ বেদনা"—আত্মপ্রকাশের জন্য এই গভীর আকুতিই নিয়ত জেগে আছে। ছেলে মেয়েরা যা শিক্ষা করে তা কিছু নতুন নয়—তারা শুধু "প্রচ্ছন্ন পুরাতনকে আবিষ্কার" করে মাত্র—শুধু অন্তরের প্রসুপ্ত জ্ঞানকেই "আবরণমুক্ত" করে। যেমন চকমকি পাথরে আগুন লুকিয়ে থাকে—ঘর্ষণের ফলে সেই আগুন আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে—তেমনিই মানুষের সুপ্ত জ্ঞানও শক্তিগুলি বাইরের উদ্দীপনাতেই জেগে ওঠে। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ সেই উদ্দীপনা জোগাবার নিমিত্তমাত্র। তাঁদের শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের উদ্বোধন হয়। তারা নিজ "অন্তরের আলোকে" সব বিষয় বুঝতে শেখে একটি অতি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যেই বিশাল মহীরুহের বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। স্বামীজী বলেছেন একটি চারাগাছকে যেমন কেউ জোর করে বাড়াতে পারে না—সে বেড়ে ওঠে, নিজ শক্তিতেই আপন স্বভাবের গতি ও প্রকৃতি অনুযায়ীই তেমনি একটি শিশুকেও চেষ্টা করে শিক্ষা দেওয়া যায় না। সে নিজেই নিজের শিক্ষক। শিক্ষক শুধু তার জ্ঞানলাভের বাধাগুলি দূর করে শিক্ষার পথটি সুগম করতে পারেন। ছাত্রের চারিপাশের "প্রতিকূল অবস্থার অপসারণ" এবং "অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি" করাই শিক্ষকের কাজ। "মানুষের অন্তঃস্বরূপটি জ্ঞানময়।" শিক্ষক সেই জ্ঞানের উদ্বোধনে সাহায্য করেন মাত্র। পিতামাতা বা অভিভাবকেরা কঠিন শাসনের নিগড়ে বেঁধে রাখতে চান মেয়েছেলেদের। তাতে করে শিশুদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে উঠবার সুযোগ পায় না। তাদের মনোবৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রবণতা নিহিত থাকে। সেইগুলির সম্যক্ পরিস্ফুরণই শিক্ষার উদ্দেশ্য। অত্যধিক শাসনের ফলে এই প্রবণতাগুলি বিকাশলাভে বাধা পায়। পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের সস্নেহ পরিচালনাতেই সেইগুলি উপযুক্তভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ শিশুদের সর্বদা "ইতিমূলক" শিক্ষা দেবারই নির্দেশ দিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের যদি কেবলই বলা যায় তারা অতি নির্বোধ, তারা কিছুই শিখতে পারবে না, তাহলে বাস্তবিকই তারা ক্রমশঃ সেইরকমই হয়ে যাবে। তারা ক্রমে নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে ফেলবে—সবল আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠবে না। তাদের ভুল ত্রুটিগুলিই শুধু দেখিয়ে দিলে চলবে না—কি উপায়ে সেগুলির সংশোধন করা যায় সেই নির্দেশ ও তাদের দিতে হবে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের এটিও একটি মূলনীতি। শিশুকে 'এটা করো না' টো করো না' —না বলে তাকে বলতে হবে কি করতে হবে। স্বামীজী বলেছেন ছাত্রছাত্রীদের "নিজস্ব প্রয়োজন" অনুযায়ী শিক্ষাদানকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এটিও শিক্ষাতত্ত্বের একটি মস্তো বাড়া কথা। সকল শিশুর প্রয়োজন কখনই এক প্রকার হতে পারে না। বিভিন্ন প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে একই প্রকার শিক্ষা দিলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হতে পারে না। কোন্ শিশুর কি প্রয়োজন, কার কি দুর্বলতা-তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষা দিতে হবে। স্বামীজী বলেছেন—"স্বাধীনতাই শিক্ষার প্রথম সোপান। আধুনিককালের সকল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদই এই সত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। রুশো বলেছেন—"Freedom, not power, is the greatest good. The man is truly free, who desires what he is able to perform. This is my fundamental maxim. Apply it to childhood and all the rules of education will spring from it.—"অর্থাৎ ক্ষমতা নয়, স্বাধীনতাই পরম ও চরম শ্রেয়। যে ব্যক্তি সে যা করতে পারে তাই করতে চায় সেই প্রকৃত স্বাধীন। এইটিই আমার মূলনীতি। শিক্ষাক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য এবং এর থেকেই সকল শিক্ষানীতির উদ্ভব।' মাদাম মন্টেসরী প্রবর্তিত বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতিতে এবং "ডাল্টন প্ল্যান" নামক শিক্ষাবিধিতে ও শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের স্বাধীনতার প্রয়োজন সমর্থিত ও বিশেষভাবে ঘোষিত হয়েছে। মাদাম মন্টেসরী শিশুদের স্বাধীন কার্যকলাপে (Self-activity) উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষক-শিক্ষিকা শুধু পরিদর্শকমাত্র, যাঁদের স্নেহ সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ত শিক্ষার্থী শিশুদের উপর নিবদ্ধ থাকবে। তাঁরা শুধু প্রয়োজনবোধে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করবেন। আধুনিককালের সকল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদই শিক্ষায়তনে ছাত্রছাত্রীদের স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের পক্ষপাতী। এর থেকে যথেষ্ট সুফল ও পাওয়া গিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের মনে শিশুদের নিজ নিজ সমস্যাগুলি তাদের নিজেদেরই

সমাধান করতে দিতে হবে। আধুনিক কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদান প্রণালীতেও (Project ও activity methods) অনুরূপ নির্দেশই দেওয়া হয়। এই প্রণালী অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যমূলক কাজের মাধ্যমে নিজ নিজ সমস্যা পূরণের সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে স্বাধীনভাবে কাজ করতেও দেওয়া হয়। শিক্ষকশিক্ষিকা শুধু অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করেন, পর্যবেক্ষণ করেন, প্রয়োজনবোধে সাহায্য করেন এবং সমস্যা সমাধানের উপকরণগুলি জোগান। স্বামীজি বলেছেন —"প্রত্যেক মানবের আত্মাই ঈশ্বরের আত্মা—পরমাত্মা।" সুতরাং সকলকেই "ঈশ্বরের সন্তান" বলে আমাদের সেবা করতে হবে। অজ্ঞান ও অশিক্ষিত জনকে শিক্ষাদান ও সেবা সকলের কর্তব্য। শিক্ষক যেন নিজেকে শিক্ষক মনে না করে "সেবক" বলে মনে করেন।

"ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ"—স্বামী বিবেকানন্দ ও এই মতের সমর্থক। তিনি বলেছেন—"জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় মনের একাগ্রতা।" একাগ্রতার দ্বারাই সাধনার সিদ্ধিলাভ হয়। সুতরাং বিদ্যার্জনের জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা, কঠিন সাধনা ও দুশ্চর তপস্যা প্রয়োজন। "জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র চাবিকাঠি"ই হচ্ছে "একাগ্রতা শক্তি"। পুরাকালে ছাত্রদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করবার রীতি প্রচলিত ছিল। এর ফলেই ছাত্রেরা চিন্তায়, কার্যে ও বাক্যে শুদ্ধ, সংযত, আত্মবশ হয়ে গড়ে উঠতো এবং তাতে করে তাদের মনে স্বতঃই আত্ম-প্রত্যয় ও শ্রদ্ধার ভাব জাগতো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"প্রবৃত্তির অকাল-বোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য। বস্তুত এই স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে সুখের অবস্থা। ইহাতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দলাভ করিতে পায়।" জড়বাদী পাশ্চাত্য দেশের লোকদের অসীম বিশ্বাস নিজেদের দৈহিক বল ও শক্তির উপরে। আত্মিক শক্তিতে তাঁদের তেমন আস্থা নেই। ভারতবাসীরা চিরদিনই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী। তাঁরা বিশ্বাস করেন—দেহের বলের চেয়ে আত্মার বল অনেক বেশী। স্বামীজি বলেছেন—মানুষের স্বভাব গঠিত হয় তার নিজ চিন্তাধারা অনুযায়ী। যে ব্যক্তি নিজেকে সদাই হীন ও দুর্বল মনে করে ক্রমে সে তাই হয়ে যায়। আমাদের মনে রাখা উচিত— "আমরা সর্বশক্তিমানের সন্তান, অসীমের স্ফুলিঙ্গ-দিব্যকণা।" ইংরেজ কবি ব্রাউনিংএর একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ে—

"Rejoice we are allied
To that which doth provide
And not partake, effect and not receive!"

আমরা এই অচল, অটল আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি বলেই আজ অধঃপাতের পথে এগিয়ে চলেছি। স্বামীজি বজ্রনির্ঘোষে এই অশেষ শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাসের বাণীই প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন—"এই আত্মবিশ্বাস মানবতার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।" তিনি ছেলেমেয়েদের "এই জীবনপ্রদ, মহান, গৌরবময়" তত্ত্বশিক্ষা দেবারই নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের দেশে আজকালকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কি এই রকম শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়? আজকাল প্রায়ই শিক্ষায়তনগুলিতে নিদারুণ ছাত্র-ছাত্রী বিক্ষোভের কথা শুনতে পাওয়া যায়। তাকে কি তাদের একাগ্রসাধনার পরিচয় পাওয়া যায়? আজকের দিনে ছাত্রছাত্রীদের সংযম ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেবার নিতান্তই প্রয়োজন হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে "গুরু গৃহই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।" রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—"যতদিন অধ্যয়নের কাল ততদিন ব্রহ্মচর্য পালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক।" একথা খুবই ঠিক যে শিক্ষকশিক্ষিকার ব্যক্তিগত জীবনের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে না এলে গুরুশিষ্যের মধ্যে গভীর আত্মীয়তার অতি নিবিড়, মধুর সম্পর্ক কখনই গড়ে উঠতে পারে না। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় 'হাউস সিষ্টেম' প্রথায় ও শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ট আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে তুলবার প্রয়াসই সূচিত হয়। পুরাকালে ছাত্রেরা গুরুগৃহে অবস্থান করে, কঠিন ব্রহ্মচর্য পালন দ্বারা বিদ্যাশিক্ষায় রত হতো। তখনকার দিনে গুরুর আদর্শ ছিল খুবই উচ্চ ও মহান। যাঁরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁরাই শুধু আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছেন বর্তমানকালেও যাঁরা শিক্ষাদানের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করবেন তাঁদের ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এই কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষাদানকে তাঁরা যেন পেশা বিশেষ বলে মনে না করেন। যেন একে একটি পবিত্র ব্রত বলেই গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র বিদ্যা বিক্রয়ই যেন তাঁদের উদ্দেশ্য না হয়। সেকালে শিক্ষাদান কার্য এতোই পবিত্র, মহান বলে বিবেচিত হতো যে বিদ্যাদানের বিনিময়ে গুরু তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকে কোনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। আজকের এই নিদারুণ অর্থসংকটের দিনে মানুষের জীবিকাসমস্যা এতোই কঠিন হয়ে উঠেছে যে দরিদ্র অভাবক্লিষ্ট শিক্ষকদের পক্ষে এই আত্মত্যাগ মোটেই সম্ভব নয়। সেকালে গুরুগণ ছাত্রদের কাছ থেকে কোনও বেতন তো নিতেনই না, উপরন্তু তাদের ভরণপোষণেরও যাবতীয় ভার বহন করতেন। দেশের ধনীব্যক্তিদের বদান্যতায়ই তাঁরা এই ভারবহনে সক্ষম হতেন। আজকাল দেশের ধনী সম্প্রদায়ের সেই উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোবৃত্তি কোথায়? আজ দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে আদর্শচ্যুত ও আত্মসর্বস্ব হয়ে উঠেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ছাত্রও শিক্ষক—উভয়েরই কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা উচিত—উভয়েরই কতকগুলি নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। পবিত্রতা, অধ্যবসায় ও জ্ঞানতৃষ্ণা প্রত্যেক ছাত্রেরই থাকা আবশ্যক। সে হবে চিন্তায়, কর্মে, ও বাক্যে একান্ত শুদ্ধাচারী ও সংযত। শিক্ষক নির্বাচনেও সেইরকম সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আজকের দিনে পুরাকালের সেই আদর্শ শিক্ষক বিরল নয় কি? আজকাল অন্যান্য পেশা বা ব্যবসার মতো শিক্ষাদানও একটি পেশা বিশেষে পর্যবসিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন শিক্ষকের চরিত্র সর্বতোভাবেই নিষ্পাপ ও নিষ্কলংক হওয়া দরকার। একথা সর্ববাদিসম্মত। শিক্ষক শুদ্ধচিত্ত ও চরিত্রবান না হলে তিনি

ছাত্রদের চরিত্র ঠিকভাবে প্রভাবিত করবেন কি করে? তিনি যেন শুধু দোকানদারই না হন—বিদ্যাদান যাঁর ব্যবসামাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয়, তাঁহারই জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন; তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত; সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে স্বভাবের নিয়মে, তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন।" গুরু তাঁর আদর্শ জীবন দ্বারা ছাত্রদের নতুন জীবনে উদ্বুদ্ধ করবেন। সেই জন্যে তাঁর থাকা চাই দৃঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। অর্থ, যশ, মান, প্রার্থী হয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে কেউ যেন শিক্ষাদান রূপ পবিত্র মহান কার্যে প্রবৃত্ত না হন। মানব সেবার উদার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি শিক্ষাদানকে জীবনের মহাব্রত বলে গ্রহণ করবেন। তবেই তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবেন। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্—" শ্রদ্ধার দ্বারা, নিষ্ঠার দ্বারাই জ্ঞানলাভ করা যায়। শিক্ষককে অর্জন করতে হবে ছাত্রদের অকুণ্ঠ ও স্বতঃ উৎসারিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তাদের অন্তরে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও 'বিনয়-নম্র আনুগত্য' না থাকলে তারা কখনই নিজেদের চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করতে পারবে না। গুরু শিষ্যের মধ্যে যদি এই আত্মিক সম্বন্ধ গড়ে না ওঠে তবে শিক্ষক শুধু বক্তা ও ছাত্র শুধু শ্রোতাতেই পরিণত হবেন। স্বামীজী গুরুকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতে বলেছেন। তাই বলে ছাত্রেরা অন্ধের মতো তাঁকে অনুসরণ ও করবে না। তারা সর্বদাই স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখবে—শিক্ষকের বাক্যকে যুক্তি বিচার না করে বেদবাক্য বলে মেনে নেবে না। আদর্শ শিক্ষক হবেন ছাত্রদের প্রতি স্নেহাসক্ত ও সহানুভূতিশীল। প্রয়োজনবোধে তাঁকে ও ছাত্রদের স্তরে নেমে আসতে হবে—নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে হবে তাদের সত্তার মধ্যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই সব কিছু দেখতে ও উপলব্ধি করতেও হবে তাঁকে। এই রকম শিক্ষকই প্রকৃত শিক্ষক-নাম-বাচ্য।

স্বামীজি বলেছেন চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাঁর মতে "মানুষের চরিত্র তাহার মানসিক প্রবৃত্তি সমূহের সমষ্টি—তার মনের গতি প্রকৃতির সমবায় মাত্র।" মানুষের চরিত্র গঠনে সুখ ও দুঃখ—উভয়েরই সমান অংশ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দুঃখ থেকেই আমরা মহত্তর শিক্ষা পাই। আমাদের প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি চিন্তাই মনের উপরে রেখাপাত করে—একটি ছাপ রেখে যায়। সেই ছাপটি আমাদের মনের অগোচরে অবচেতন মনে কাজ করতে থাকে। মনের এই ছাপ বা সংস্কার গুলিই আমাদের চরিত্রের উপাদান সৃষ্টি করে। সৎ সংস্কারগুলিই যদি প্রাধান্য লাভ করে তবে আমাদের চরিত্র সৎ হয়ে গড়ে ওঠে। সেই রকম অসৎ সংস্কার গুলিও আমাদের চিন্তা ও কাজের উপর প্রতি নিয়ত প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে ক্রমে আমরা সেইগুলিরই বশবর্তী হয়ে পড়ি। অবিরত সৎ কর্ম ও সৎ চিন্তা করতে থাকলে সৎ সংস্কারের প্রভাবে আমাদের সৎ প্রবৃত্তি জন্মায় এবং আমাদের মন ও সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইরূপে আমাদের সৎ ও অসৎ অভ্যাস গঠিত হয়। অভ্যাসকে 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' বলা হয়। বস্তুত, অভ্যাসই আমাদের সমগ্র প্রকৃতি। আমাদের চরিত্র অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র। সদভ্যাস গঠন করা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন। সদভ্যাসের দ্বারাই অসৎ অভ্যাস দূর করা যায়। নীচ প্রবৃত্তি দমন করবার একমাত্র উপায় অবিরাম সৎ কর্ম ও সৎ চিন্তা করা। সদভ্যাস গঠনের দ্বারাই চরিত্রের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করা যায়। এইখানেই স্বামীজির সঙ্গে রুশোর গভীর মতানৈক্য লক্ষিত হয়। রুশোর মতে শিক্ষা প্রধানতঃ নেতিমূলক! তাই তিনি বলেছেন—শিশুকে একটি মাত্র অভ্যাস গঠন করতে দেওয়া উচিত। সেটি হচ্ছে যে সে কোনও অভ্যাসেরই দাস হবে না। "The only habit which the child should be allowed to forus is to contiact no habit whatsoever"। স্বামীজি বলেছেন মানুষ নিজেই নিজের অদৃষ্টের নির্মাতা। অজ্ঞতাবশতঃ আমরা নিজ কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। সেই জাল থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের বাইরের কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না—আমাদের নিজেদের অন্তরের ভেতর থেকেই সেই সাহায্য আমরা পেতে পারি। অজ্ঞানজনিত ভুল আমরা সর্বদাই করে থাকি। এ যেন ঠিক নিজের চোখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধকার সৃষ্টি করা। চোখ থেকে হাত সরালেই আলোক দেখতে পাবো। মানবাত্মার প্রকৃতি "স্বয়ংভাস্বর"। এই আলোক লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজ অন্তরেই। "ইচ্ছাই সর্বশক্তিময়ী।" এই ইচ্ছাশক্তিরই অনুশীলন করতে হবে। এর দ্বারা আমরা উন্নততর মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হতে পারি। নিজের ভুল ভ্রান্তির জন্য সারাজীবন অনুশোচনা করে কেনেও লাভ নেই। তাতে করে আমরা ক্রমে আরও বেশী দুর্বল হয়ে পড়বো। স্বামীজির নির্দেশ—"দিব্য আলোক প্রজ্জ্বলিত কর." যার দ্বারা সকল মন্দ ও অকল্যাণ মুহূর্তের মধ্যে দূরীভূত হয়ে যাবে। আমাদের আসল ও প্রকৃত স্বরূপ জ্যোতির্ময়, দীপ্তশালী ও চির নির্মল।" শিক্ষার দ্বারা আমাদের সেই স্বরূপটিই প্রকাশ করতে চেষ্টা করতে হবে এবং অপর সকলের মধ্যেও সেই স্বরূপটি উদ্বোধিত করতে হবে।

ধর্ম শিক্ষা সম্বন্ধেও স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া সমীচীন বলে বিবেচিত হয় না, কারণ তাতে করে অনেক বাধার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আদর্শবিহীন, ধর্মবিবর্জিত শিক্ষাও আবার চরিত্র গঠন ও মানুষ গড়ার অনুপযোগী। "মানুষ গড়ার" শিক্ষার জন্যে চাই কতকগুলি শাশ্বত, চিরন্তন নৈতিক আদর্শ ও সেগুলির প্রতি অচল নিষ্ঠা। এর সঙ্গে ধর্ম গোঁড়ামির কোনও সম্পর্ক নেই। যুগে যুগে মানুষ ধর্মমত নিয়ে কতোই না হানাহানি করেছে! কিন্তু তেমনি আবার কতগুলি [illegible] নীতি ও

আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছে। স্বামীজী বলেছেন—"ধর্মই শিক্ষার অন্তর-তম মর্মস্থল। তিনি কোনও বিশেষ মতবাদ বা ধর্মমত প্রচার করতে বলেন নি" ধর্মের যে মূলনীতিগুলি চিরকাল সমগ্র জগতে সকল মানুষের অপার, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধালাভ করেছে, তিনি বলেছেন ছাত্রদের সামনে সেই আদর্শগুলিই তুলে ধরতে। বীরত্বের আদর্শকেই তিনি সবচেয়ে বড়ো স্থান দিয়েছেন—বলেছেন—"এখন আমরা সেই বীরপুরুষ চাই, যিনি সত্য উপলব্ধি" করতে জীবন উৎসর্গেও পশ্চাৎপদ হবেন না—ত্যাগ যাঁর ধর্ম এবং জ্ঞান যাঁর অসি। শ্রীরামচন্দ্র-সখা মহাবীর হনুমানের চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে একদিকে মানব-সেবার সুমহান আদর্শ, অপর-দিকে সিংহতুল্য সাহস। স্বামীজী এই অপূর্ব সাহসিকতা ও নিঃস্বার্থ মানবসেবার আদর্শ ই আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে বলেছেন। তিনি বলেছেন "শক্তিমত্তাই পুণ্য, দুর্বলতাই পাপ।" মানুষের সকল স্বার্থপরতার মূলে আছে এই দুর্বলতা। জগতের সকল মহাপুরুষেরই ছিল অতুলনীয় আত্মশক্তি ও অটল আত্মবিশ্বাস, যার বলে বলীয়ন হয়ে তাঁরা মহৎ ও উন্নত জীবনযাপন করেছেন এবং অপর সকলকেও পথ দেখিয়েছেন। স্বামীজি বলেছেন শিশুকে জন্মাবধি "সোঽহম্" মন্ত্রটিই জপতে শেখাতে হবে। "সত্যই আত্মার স্বরূপ।" এই সত্যই আমাদের শক্তি দেয়, আমাদের চিত্তকে আলোকিত করে—কর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগায়। এই সত্য লাভের জন্যে আমাদের উপনিষদেরই আশ্রয় নিতে হবে। উপনিষদের সত্যগুলি যদি আমরা পালন করতে ও জীবনের অঙ্গীভূত করতে পারি তবেই ভারতের মুক্তি হবে সহজসাধ্য ও অবশ্যম্ভাবী। সর্বপ্রথমে আমাদের দৈহিক দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা অলস, কর্মকুণ্ঠ। ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হবার শক্তি ও দৃঢ়তা আমাদের নেই। এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতিগত দুর্বলতা। দেহ সবল হলে ধর্মবল আপনা থেকেই আয়ত্ত হবে। দুর্বল মস্তিষ্ক কোন কাজ করবারই উপযোগী নয়। গীতায় শ্রীভগবান কর্মযোগে যে উদ্দীপনা দিয়েছেন তা দুর্বলের জন্যে নয়। যতদিন আমরা দৈহিক ও মানসিক বলে বলীয়ান্ হয়ে উঠতে না পারি ততোদিন উপনিষদের অর্থ ও আত্মার মাহাত্ম্য আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো না। বীর্যই উপনিষদের বাণী। 'অভীঃ', 'অভীঃ'—এই বাণীটিই বারবার উপনিষদে উদ্ভোসিত হয়েছে। উপনিষদ্ ঘোষণা করেছে—মানুষ সেই দেহ সর্বস্ব নয় সে "জন্মমৃত্যুবিরহিত" অমর আত্মা—গীতায় যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

—অর্থাৎ অস্ত্র যাকে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি যাকে দহন করতে পারে না, জল যাকে সিক্ত করতে পারে না বায়ু যাকে শুষ্ক করতে পারে না। এই উক্তির গভীর সত্যতা যিনি সত্যিই অন্তরে উপলব্ধি করতে পারবেন তাঁর—

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।"

উপনিষদই অনন্ত জ্ঞানের আকর—অফুরন্ত বীর্যের মহাভাণ্ডার। এই উপনিষদই সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল, দুঃখী অধঃপতিত মানুষকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হতে আহ্বান জানিয়েছে। "উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার অমর বাণী উপনিষদই জগতের লোককে শুনিয়েছে। স্বামীজি সত্যিই বলেছেন কোনও ধর্মশাস্ত্রই মানুষকে ধার্মিক করতে পারে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে ধর্মের বাণীকে কর্মের মধ্যে দিয়ে নিজ জীবনের অঙ্গীভূত করতে পারে—শাস্ত্রের বাণীকে নিজ জীবনে সার্থক করে তুলতে পারে। মতবাদ প্রচারে, বিচারতর্কে বা তত্ত্ববিশ্লেষণ ধর্ম নাই; আসল ধর্ম আত্মবোধে, আত্মোৎকর্ষসাধনে ও আত্মাভিব্যক্তিতে,—পাওয়া নয়, হওয়ায়। স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিতে গভীর সত্য নিহিত আছে। মস্তিষ্ক ও অন্তঃকরণের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন অন্তঃকরণকে অনুসরণ করবারই নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। বুদ্ধি যেখানে পৌছাতে পারে না, অন্তর সেখানে প্রেরণা দ্যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি মস্তো বড় ত্রুটি যে সে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনেরই চেষ্টা করেছে—উপেক্ষা করেছে হৃদয়কে। প্রত্যেক ধর্মেই কতোগুলি বিশিষ্ট মতবাদ আছে। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে সেইগুলিকেই অভ্রান্ত বলে মনে করেন এবং ঐগুলির অভ্রান্ততা প্রচার করবার জন্যেও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এর থেকেই ধর্মান্ধতার উৎপত্তি হয়। এই ধর্মগোঁড়ামি মানুষের মনের বিশেষ বিকার বিশেষ। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ধর্মজগতে এক যুগান্তর এনেছিল। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন সকল ধর্মের ভেতরেই সত্য আছে—বিভিন্ন ধর্ম পরস্পর বিরোধী নয়; ধর্মের বিভিন্ন স্তরমাত্র। তাই তিনি সর্বধর্মসমন্বয়ের উদার মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন—বলেছিলেন—'যতো মত ততো পথ'। তাঁর মতো পরম-সহিষ্ণু, বিশাল হৃদয়, মহাপ্রাণ মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছেন। তাঁর সমস্ত জীবনই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক বিপুল অভিযান। স্বামী বিবেকানন্দ এই ধর্মগুরুর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের উদার আদর্শটি। তাই তিনি বলেছেন—কোন ধর্মই বর্জনীয় নয়—ভবিষ্যতে জগতে যে নতুন মতবাদ প্রচারিত হতে পারে তাকেও সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবার জন্যে চাই আমাদের হৃদয়ের বিশালতা মনের অসীম ঔদার্য। তিনি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন বর্তমান জগতের ও অনাগত যুগের সকল মহাপুরুষের চরণোদ্দেশে। ধর্ম সম্বন্ধে চরম সত্য যে আজও আবিষ্কৃত হয় নি সে কথা আমরা ভুলে যাই। পরবর্তী যুগে মহাত্মা গান্ধীও অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার ঘোরতর বিরোধী হয়েছিলেন। "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম"—এই মহতী বাণীর জন্যে তিনি নিজ জীবনাহুতিও দিয়েছিলেন। আজকের দিনে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের এই অসাম্প্রদায়িকতার উদার মহান আদর্শেই গড়ে তুলতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এটাই হওয়া উচিত চরম লক্ষ্য। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতে।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট মতামতগুলি আলোচনা

করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি চেয়েছিলেন স্ত্রীশিক্ষার একটি অতি উচ্চ মহান আদর্শ স্থাপন করতে। আমাদের দেশে নারীজাতির প্রতি অবিচার তাঁর অন্তরকে গভীর পীড়া দিয়েছিল। পুণ্যশ্লোকা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী গার্গীর দেশে নারীজাতির বেদপাঠে অনধিকার বাস্তবিকই অতি বিস্ময়কর। সমাজের অকরুণ বিধিনিষেধ ও কঠিন অনুশাসনের ফলে পরবর্তী যুগে নারী শুধু প্রজননযন্ত্রবিশেষ বলে গণ্য হয়েছিল। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা"—নারীর এই মূল্যই ধার্য হয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের দেশের শাস্ত্রকারই বলেছেন—"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" মনুর এই মতের প্রতিধ্বনি করে স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন—"যে পরিবারে বা যে দেশে নারীরা দুঃখে যাতনায় জীবনযাপন করে সে পরিবারের বা দেশের উন্নতির কোন আশা নাই।" আমাদের দেশে নারীকে তার দলগত অধিকার—শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে তাকে অবলা. পরনির্ভরশীলা করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ—"কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"—এই হচ্ছে মনুর বিধান। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—নারীদের সবলা, আত্মবলসম্পন্না করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলেছেন—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা ?
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি'
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি'
দৈবাগত দিনে ?
শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লবো চিনে
সার্থকের পথ ?"

স্বামী বিবেকানন্দের মতে স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত ধর্মের উপরেই। সুতরাং মেয়েদের ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন ও ব্রহ্মচর্যপালনের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলেছেন। হিন্দুনারীর সতীত্বকেই তিনি সবচেয়ে বড়ো করে দেখেছেন এবং সেই আদর্শেই দেশের মেয়েদের গড়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছেন। ভারতের নারীজাতির শাশ্বত, চিরন্তন আদর্শ সীতা, যিনি অপরিসীম ত্যাগ, পবিত্রতা ও সহনশীলতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। স্বামীজি মেয়েদের নব্যভাবাপন্না আধুনিকা করে গড়ে তুলবার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। দেশের চিরন্তন আদর্শ থেকে যেন বিচ্যুতি না ঘটে সেদিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন দেশের কতকগুলিকে মেয়েকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা দিতে। এঁরা তেজোদৃপ্ত সতীত্বের অপূর্ববলে বলীয়সী ও আমরণ ব্রহ্মচারিণী হয়ে গড়ে উঠবেন—এই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর এই মহিমোজ্জ্বল নারীত্বের আদর্শটিই তাঁর আধ্যাত্মিক তনয়া ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যজীবনে বাস্তব রূপ পেয়েছিল। নিবেদিতার জীবনেই তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা সার্থক ও সফল হতে পেরেছিল অন্ততঃ কতক পরিমাণেও। স্বামীজি বলেছেন দেশের একজন মেয়েও ব্রহ্মজ্ঞা হলে দেশের অন্য সহস্র সহস্র নারীকে তিনি তাঁর পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হবেন। তাঁর নিজের হাতেই গড়া ভগিনী নিবেদিতার জীবন। এই সুমহান আদর্শ নিয়েই নিবেদিতা ভারতে স্ত্রীশিক্ষার পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি আজও তাঁর পবিত্র স্মৃতি বহন করছে। স্বামীজি বলেছেন—সুশিক্ষিতা, সুচরিত্রা ব্রহ্মচারিণীগণই যদি শিক্ষাদানে ব্রতী হন, তবেই দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত প্রচার সম্ভব হবে। তাঁরা তাঁদের আত্মত্যাগের গভীর নিষ্ঠার দ্বারা দেশের নারীসমাজকে আকৃষ্ট করবেন—শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি। মেয়েদের শিখাতে হবে ইতিহাস, পুরাণ, গৃহকর্ম ও শিল্প। তারা গার্হস্থ্যজীবনের কর্তব্য ও চরিত্রগঠনের মূলনীতিসমূহ, সূচীশিল্প, রন্ধন, শিশুপালন, নিত্যনৈমিত্তিক কাজের নিয়মাদি, জপতপ পূজাপদ্ধতি ও শিখবে। এই রকম শিক্ষায় তারা নির্ভীক, সাহসী ও দৃঢ়চিত্তা হয়ে গড়ে উঠবে। আজকালকার দিনে আত্মরক্ষা-কৌশলেও তাদের দক্ষ হতে হবে। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই, লীলাবতী, অহল্যাবাই, মীরাবাই ইত্যাদি ভারতীয় নারীদের পূত চরিত্রের আদর্শগুলিও তুলে ধরা দরকার আমাদের দেশের মেয়েদের সামনে। পবিত্রতা, নিষ্কলংকতা ও সাহসিকতার আদর্শেই তাদের জীবন গড়ে উঠবে। তাহলেই তারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শজায়া, আদর্শ গৃহিণী ও সন্তানের আদর্শ জননী হতে পারবে। তবেই তারা দেশে সুসন্তান গড়ে তুলবার উপযোগী হবে। The hand that rocks the cradle rules the world—জননীর যে কল্যাণ হস্ত শিশুকে লালন করে সেই হস্তই সমগ্র জগতকে পরিচালনা করে।

আজকের দিনে দেশের বিরাট শিক্ষাসমস্যার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ—জনশিক্ষা। যতদিন না দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা-বিস্তার হয় ততদিন দেশের উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করেই বলেছেন—"জনসাধারণের মধ্যে যে পরিমাণে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার হয় সেই পরিমাণেই জাতি উন্নতির পথে অগ্রগতি হয়।" তিনি বুঝেছিলেন—"ভারতের অধঃপতনের প্রধান কারণ মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে একচেটিয়া" করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন জগতের কোনও সভ্যদেশেই এমনি "সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই।" স্বদেশের নিদারুণ দারিদ্র্য ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের অশেষ দুঃখ ও দুরবস্থা স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরকে অত্যন্ত বেদনা দিয়েছিল। তাঁর মতে আমরা শিক্ষা দিয়েই তাদের প্রকৃত সেবা করতে পারি। তিনি বলেছেন—প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে অর্জন করতে হবে তার নিজ মুক্তি। আমরা শুধু সেই মুক্তি অর্জনে তাদের সহায্য করতে পারি। আমাদের শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলে সেগুলি সাধারণের কাছে চিরদিনই দুর্বোধ্য। সেইজন্যে দেশের ধর্মশাস্ত্র আজও জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারে নি। এই ভাষাগত অসুবিধা দূর করবার জন্যে মাতৃভাষার মাধ্যমেই জনশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই বলে সংস্কৃত শিক্ষা বন্ধ করলেও চলবে না। এই ভাষার

একটি পৃথক মর্যাদা ও গাম্ভীর্য আছে। স্বামীজি ঠিকই বলেছেন আমাদের "আসল জাতি বাস করে পল্লীর কুটীরে।" সহজ সরল ভাষায় শাস্ত্রের বাণী ও আধ্যাত্মিক সত্যগুলি পল্লীবাসী অজ্ঞ, অশিক্ষিত লোকদের বুঝিয়ে দিতে হবে। কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যগুলিও তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শেখাতে হবে। স্বামীজির মতে দেশের জনসাধারণ যদি উপনিষদের বাণী গ্রহণ করতে পারে, তবেই তারা আত্মিক-শক্তি অর্জন করতেও সমর্থ হবে। ভারতের অগণিত জনগণ এতোই নিঃস্ব ও দরিদ্র যে তারা স্বভাবতই চাইবে তাদের সন্তানেরা একটু বড়ো হলেই যেন আর বিদ্যালয়ে বৃথা সময় নষ্ট না করে—তারা যেন তাদের নিজেদের জীবিকা অর্জনে ও গৃহকর্মেই সাহায্য করে। তাই শিক্ষাকেই নিয়ে যেতে হবে জনসাধারণের কাছে। দেশের সাধারণ লোক নিজের গরজেই শিক্ষালাভ করতে আগ্রহান্বিত হবে না। এই উদ্দেশ্যে দেশের একদল লোককে লৌকিক ও ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাঁরা শুধু ধর্মশিক্ষাই দেবেন না—গ্রামে গ্রামে গিয়ে অজ্ঞ, অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের ব্যবহারিক বিষয়েও শিক্ষা দেবেন। গ্রামবাসীদের তাঁরা শেখাবেন ইতিহাস ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি। আজ দেশের জনসাধারণ জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত, বিক্ষুব্ধ ও অবসাদগ্রস্ত। তাদের লেখাপড়া শিখবার না আছে আগ্রহ—না আছে সময় বা সুযোগ। এদের জ্ঞানার্জনের পথটি সুগম করতে চেষ্টা করতে হবে। স্বামীজি বলেছেন—মহৎ কাজের প্রেরণা আসে মানুষের নিজ অন্তর থেকেই। সেইজন্য অজ্ঞ, অশিক্ষিত দরিদ্র লোকদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া চাই। শুধু বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়েই তাদের দুঃখ বুঝলে চলবে না—তাদের দৈন্য, অভাব ও বেদনা অনুভব করতে হবে নিজ অন্তরে। দেশের জনসাধারণের শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করতে হলে চাই আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অনমনীয় দৃঢ়তা ও অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি। তবেই আমরা এই কঠিন দুরূহ কাজে সফলকাম হতে পারবো। আজকের দিনে সরকারী শিক্ষাবিভাগের কয়েকজন মুষ্টিমেয় কর্মচারীর দ্বারা এই বিরাট কাজ কখনই নিষ্পন্ন হতে পারে না। এই কাজের জন্য আজ এগিয়ে আসতে হবে দেশের সকল শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকেই! মনে রাখতে হবে দেশের সকল উন্নতির মূলই শিক্ষা। সকলকেই বদ্ধপরিকর হতে হবে দেশের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার রূপ পাপ ও কলংক দূর করতে।

দুগ্ধ-সমস্যা

শ্রীবিমলকুমার চৌধুরী

বেবিলন আর ক্রীটের প্রাচীন সভ্যযুগ হইতে বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর দুগ্ধ সরবরাহ সামাজিক মঙ্গল বিধানের একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। বেদ, কোরাণ আর বাইবেলে দুগ্ধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য বলিয়া উল্লেখিত আছে।

খাদ্য হিসাবে দুগ্ধের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু বিশুদ্ধ দুগ্ধ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণ উদাসীন। যদিও পুষ্টিকর উপাদানযুক্ত হইবার জন্য দুগ্ধ একটি সম্পূর্ণ খাদ্য, অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় ইহার উৎপাদন এবং বিতরণ হইলে সাধারণের স্বাস্থ্যহানির বিশেষ কারণ ঘটিয়া থাকে। স্বাস্থ্য বিভাগের খবরে প্রায়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে যে দুষিত দুগ্ধ আমাশয়, টাইফয়েড জ্বর, প্যারা-টাইফয়েড জ্বর, ডিপথিরিয়া, সেপটিক গলার ঘা, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এইগুলি দুগ্ধপ্রসূত রোগ বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়।

বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের জন্য আমরা নিম্নলিখিত দুইটি উপায় অবলম্বন করিতে পারি।

(১) Pathogenic organism দ্বারা দুগ্ধ যাহাতে দুষিত না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হইবার জন্য সরবরাহের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত উৎপাদন ও প্রস্তুত কেন্দ্র পরিবেষ্টিত রাখিতে হইবে। (২) Pathogenic organism সংঘের জন্য উচিত মূল্যে সমস্ত দুগ্ধ সংগ্রহ এবং Pasteurisation.

বর্তমানে প্রত্যেক সভ্যদেশই উপযুক্ত ডেয়ারী ব্যবস্থাকে সহরের একটি বিশেষ বিধান বলিয়া বিবেচনা করে। কলিকাতায় প্রায় ৫০০০০ গরু এবং মহিষ আছে। কাজেই এখানে উপরিউক্ত প্রথম পন্থা অবলনের জন্য অবিবেচক গোয়ালাদের উপর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা বিশেষ কঠিন কাজ। সুতরাং দুগ্ধ দুষিত হইবার বিপদকে যথাসম্ভব হ্রাস করিবার দ্বিতীয় ও একমাত্র উপায় Pasteurisation.

Pasteurisation লুই পাস্তর প্রবর্তন করেন। ইহা দ্বারা দুগ্ধের পুষ্টিকর উপাদান নষ্ট না করিয়া দুগ্ধ হইতে সমস্ত রোগ উৎপাদনকারী organism দূরীভূত করা যায়। Pasteurisation ক্রীম নষ্ট করে না। Skimmingএর দ্বারা ক্রীম নষ্ট হয়। সুতরাং Pasteurisation এবং Skimming এক জিনিষ নয়। অনেকে এখন পর্যন্ত উহা ঠিকভাবে জানেন না, এবং প্রায়ই ঐ দুটিকে এক বিবেচনা করেন।

কোন ব্যক্তির পক্ষে সাজসরঞ্জাম ও cold storage Pasteurisation plant স্থাপন করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। দুগ্ধ উৎপাদনের কেন্দ্রীয় স্থানসমূহে ঐগুলি স্থাপন করা যায়। সেখানে দুগ্ধ সংগৃহীত হইতে পারে এবং নামমাত্র ব্যয়ে Pasteurisation হইতে পারে। গ্রাহকদিগের নিকট দুগ্ধ সরবরাহের পূর্বে এই দুগ্ধ গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট দিতে পারেন। বিনা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত দুগ্ধ সরবরাহের জন্য আইনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত হইবে। উপরিলিখিত প্ল্যান্ট স্থাপন করার প্রাথমিক ব্যয় কোন ব্যক্তি বা সুবিধা স্থলে গভর্ণমেন্ট বহন করিতে পারেন।

এইরূপ বিরাট কার্য্য হস্তে লইবার পূর্বে সাধারণকে Pasteurisation এর অপরিহার্যতা সম্বন্ধে শিক্ষিত করিতে হইবে। ছবিসহ ছোট ছোট গল্প শিখিয়া বিভিন্ন সিনেমা, শিক্ষায়তন ও সমাজ সেবক প্রতিষ্ঠানসমূহে দেখান যাইতে পারে। উহা দ্বারা গোশালা ও দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির বর্তমান অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখান যাইতে পারে। একদিকে দুগ্ধপ্রসূত রোগপ্রবণতার সম্ভাবনা অপরদিকে সংগৃহীত দুগ্ধ Pasteurised হইয়া বিক্রয়ের সুফল পাশাপাশি দেখান যাইতে পারে। সমস্ত বিষয়টি সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; তাহা হইলে গৃহবধূরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, কারণ তাঁহারাই সাধারণতঃ নিজ নিজ পরিবারের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে এই বিষয়টি রেডিওর 'মহিলা-মহলে' অঙ্গীভূত করিলে যথেষ্ট কার্যকরী হইবে।

খুব সুখের বিষয় যে গভর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন উভয়েই কলিকাতা হইতে নবনির্মিত হরিণঘাটা দুগ্ধ-কলোনীতে গবাদি সরাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহা হইলে ওখান হইতেই আলোচ্য পরিকল্পনাটির কার্য আরম্ভ হইতে পারে।
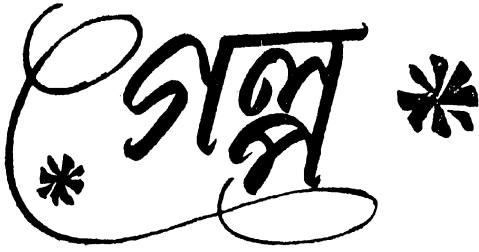
পরিহাস

প্রশান্তকুমার চৌধুরী

হাওড়া-রাঁচী-হাজারিবাগ এক্সপ্রেসে 'মুরি' জংশনে পৌঁছে ছোট লাইনের গাড়ীতে চেপে 'লোহারডাগা'র দিকে যদি যাও কোনদিন, তাহলে দোহাই তোমার, গতরাত্রির নিদ্রাহীন রেলভ্রমণের ক্লান্তির পর যাত্রীবিরল ছোটগাড়ীর ফাঁকা কামরাটি পেয়ে ঘুমিও না যেন। ঘুমিয়ে পড়লে প্রকৃতি নাম্নী চঞ্চলা বালিকাটি তার সমস্ত চপলতা বন্ধ করে দিয়ে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়াবে।

মুরি স্টেশন থেকে গাড়ী ছাড়তে না ছাড়তেই দেখতে পাবে বালিকা-প্রকৃতি গাছ-কোমর বেঁধে ছুটতে সুরু করে দিয়েছে তোমার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে। ছুটতে ছুটতে কখনো সে তরতরিয়ে উঠে যাচ্ছে পাথরের টিলার একেবারে মাথায়—কখনো বা লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে গালা-গাছের তলায়, যেখানে গালার রস পড়ে রয়েছে গাছের ছায়ার মতো হয়ে! কখনো তাকে মনে হবে শালবনের স্তব্ধতায় গম্ভীর—পরমুহূর্তেই দেখা যাবে ছোট ছোট নুড়ি-পাথরের সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে হেসে কুটিপাটি হচ্ছে সে একফালি পাহাড়ী ঝর্ণাধারায়। কখনো সে তোমার অত্যন্ত কাছে আসবে মহুয়ার মিষ্টি গন্ধে, তার পরেই দেখতে পাবে তার রাঙাশাড়ীর পাড়টুকু দেখা যাচ্ছে সেই কোন্ দূরের বনস্পতির ফাঁকে নাম-না-জানা বুনো রাঙা ফুলের ঝোপে।

এমনি করে প্রকৃতি নাম্নী চঞ্চলা মেয়েটির খেলা দেখতে দেখতে তুমি পেরিয়ে যাবে সিল্লি, কিটা, তাতিসিলোয়াই, পিস্কা, ইট্কি—একের পর এক সব স্টেশন। রেলগাড়ীর আওয়াজ পেয়ে স্টেশনে স্টেশনে দৌড়ে এসে দাঁড়াবে একদল সাঁওতালী তরুণী। বেজায় মোটা শাড়ীতে তারা জড়িয়ে রেখেছে তাদের দেহ;—শক্ত কাঠের বাক্সে যেমন কোরে রাখা হয় চালানি আঙুর।

ওদের মাথায় থাকে ছোট ছোট বাঁশের ডালা। তাতে কিছু ভিজে-ছোলা আর কিছু কেঁদ্ফল। সওদা নিয়ে এসেছে ওরা বেচবার জন্যে; কিন্তু রক্তে যে নেই ওদের কেনা-বেচার পাটোয়ারী বুদ্ধি। ওদের চোখ খদ্দের বাছাই করতে ভুলে যায়—সরল একজোড়া চোখ সকল যাত্রীর বিচিত্র বেশভূষা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির ওপর বুলিয়ে যায় অবাক হয়ে। কেউ কিছু কেনবার জন্যে ডাক দিলে হঠাৎ যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে চম্কে ওঠে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, মানুষ দেখতে আসেনি ওরা, এসেছে জিনিষ বেচতে। জোর করে নিজেদের অত্যন্ত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না প্রতিপন্ন করতে চায়। বলে, পয়সায় চারটের বেশি কেঁদ্ফল দেবে না সে কিছুতেই।

বুদ্ধিমান যাত্রী তাইতেই একবাক্যে রাজি হয়ে যায়। চারটি পয়সা তরুণীর হাতে দিয়ে পুরো ডালাটা হাত বাড়িয়ে ঢুকিয়ে নেয় কামরার মধ্যে। তারপর আটত্রিশটি কেঁদফল গামছায় বেঁধে ফেরৎ দেয় শূন্য ডালা। গাড়ী আবার চলতে থাকে।

ডালা নিয়ে ফিরে চলে ওরা ওদের কুটিরে। সামনের মেলায় তুলসীকাঠের মালা কিনে পরতে হবে গলায়, তাই পয়সা জমানো চাই। গাড়ী যখন ছেড়ে দেয়, তখন মনে হয়, এত কম রোজগার করলে সামনের মেলায় কিছুই যাবে না কেনা। আক্ষেপ হয়, কেন আরো খানিকটা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করা হল না গাড়ীর জানলায় জানলায়? কেন আরো করুণ আবেদন জানিয়ে বলা হল না—কেঁদফল চাইগো, ভিজে ছোলা?

ইট্কির পর গাড়ী এসে পৌঁছবে 'টাঙের বাঁশ্লী'তে। এই টাঙের বাঁশ্লীতে ট্রেন এসে দাঁড়ালে মাঝে মাঝেই দেখা যেত একজনকে। কালো চিকন্ ছিপ্ছিপে দেহ, মাথায় বাব্রি চুল, পরনে খাটো ধুতি, গায়ে একখানা মোটা চাদর বুকের ওপর দিয়ে বেঁকিয়ে জড়ানো সেকেলে-বড়লোকের শাল জড়ানোর ভঙ্গিতে, কানে লাল কাঠের

কুণ্ডল, হাতে লম্বা একটি বাঁশের বাঁশী। বাঁশীটাকে হাতে নিয়ে স্বপ্নময় সরল চোখে তাকিয়ে থাকত সে গাড়ীর যাত্রীদের দিকে। মনে হত, যাত্রীদের ওপর চোখ দুটোই রেখেছে শুধু ও',—মনটা চলে গেছে অনেকদূরে কোথাও। কিছুক্ষণ অমনি তাকিয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে হাতের বাঁশীটিকে তুলে নিত সে ঠোঁটের ওপর। তখন মনে হত, 'টাঙের বাঁশ্‌লী' কথাটার সঙ্গে 'শ্যামের বাঁশরী' কথাটার মিল খুব দূরের নয়।

টাঙের বাঁশ্‌লী স্টেশনের সেই বংশীবাদকের নাম ছিল পিন্দ্রাই।

রেলগাড়ী ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেলেই পিন্দ্রাই ফিরে যেত শালবনের পথ দিয়ে, গালা-গাছের তলা দিয়ে, মহুয়া গাছের ছায়ায় ছায়ায়। অনেক পথ হেঁটে পাহাড়ী নদীর ধারে এসে তার ছোট্ট ডিঙিটি বেয়ে চলে যেত ওপারে—যেখানে সাঁওতালী জেলেপল্লীতে তার কালোবৌ আর কচি ছেলে হেন্দে অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

নদীর ওপারে জেলেপল্লী, এপারে গড়ে উঠেছে হেল্‌থ্‌ রেসর্ট;—শহুরে কর্ম্মব্যস্ত মানুষের ডিস্‌পেপসিয়া সারাবার ঘাঁটি। পাথুরে উঁচুনিচু জমিকে যথাসম্ভব ভেঙ্গেচুরে গড়ে উঠেছে সব হালফ্যাশনের কোঠা বাড়ী। সামনে তাদের বিলিতি ফুলের বাগান, মাথার ওপর ধোঁয়া ওঠবার চিম্‌নি, জানলায় কট্‌কী-নক্সার পর্দ্দা, পার্লারে বেতের চেয়ার, ড্রইংরুমে সোফাকৌচ, রান্নাঘরে পোর্সিলেনের বাসন। পাথুরে উঁচুনিচু জমির ওপর ফিট্‌ফাট্‌ বাড়ীগুলোকে দেখলে মনে হয়, বড়লোকের বাড়ীর মেয়েরা যেন বনভোজন করতে এসে দামী শাড়ী-জামা পরেই ধুলোর ওপর বসে পড়েছে!

ওপারের সাঁওতালী পল্লীর ছোট ছোট কুটিরের দেয়ালে ওদের নিজে-হাতে-আঁকা ছবি, সামনে নিজে-হাতে-নিকোনো তকতকে আঙিনা। ঘর ওদের ছোট, তাই আকাশ ওদের অনেক বড়। ওদেরই আকাশে ওঠে চাঁদ, আর সে-চাঁদের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে শুধু ওরাই জানে নাচতে, ওরাই জানে গাইতে।

ওরা মাছ ধরে। নদীর বাঁকে জল যেখানে পাক খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে, সেখানে ওরা কাঠকুটো দিয়ে একরকমের খাঁচা তৈরী করে রেখেছে। রাত্রে সেই খাঁচায় জাল ছড়িয়ে রাখে। স্রোতের টানে মাছ ভেসে এসে আটকে পড়ে সেই খাঁচায়। ভোরবেলা তাই নিয়ে ওপারের শালের ডিঙি আসে এপারের বাবুদের ঘাটে।

মাছ কম, বাবু বেশি। ঐ কটা মাছে এপারের বাবুদের সকলের কুলোয় না। কাড়াকাড়ি করে' যে আগে পান মাছ তুলে নেন চুবড়িতে।

সাপ্লাই-এর চেয়ে ডিমাণ্ড বেশি। ব্যবসাদারী হিসেবে মাছের দাম ক্রমেই বেড়ে যাবার কথা। একটা মাছের জন্যে যেই চারটে হাত এগিয়ে আসে, তখুনি যে একটাকার মাছটা এক লহমায় 'চার টাকা' হয়ে উঠতে পারে, এত বড় যুদ্ধটা কেটে যাবার পরেও সেটা আজও ওদের মাথায় ঢোকেনি। ওপারের বোকা মানুষগুলো সেই প্রথম দিনটি থেকে একই দামে মাছ বেচে চলেছে। না বাড়ায় মাছের দাম, না বাড়ায় মাছ ধরবার খাঁচা।

সেবার পূজোর ছুটিতে এপারের কলোনীতে চেঞ্জারের ভিড় হয়েছে খুব। বিজয়া দশমীর ভোরে এপারের বাবুর দল নদীর ধারে গিয়ে দেখলেন ডিঙিগুলো সব বাঁধা রয়েছে ওপারে। মাঝে মাঝে শুধু দূর থেকে একটি-দুটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে কলসী নিয়ে নদীর কিনারে উঠতে নামতে। আর কোথাও মানুষজনের সাড়াশব্দটি নেই। সব যেন নিথর নিঝঝুম।

হল কি ওপারের লোকগুলোর? অস্থির হয়ে ওঠেন এপারের শহুরে বাবুর দল। কাল সারারাত বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঘ্‌লা আকাশ। নদী খুশীতে উচ্ছলা। পায়ের তলার বালি এখনো ভিজে। ইল্‌সেগুঁড়ির মতো ঝুরঝুরে বৃষ্টি এখনো লাগছে এসে গায়ে। বিজয়া দশমীর দিন সকলকে নিরামিষ খেতে হবে নাকি শেষকালে?

বোসমশাই কর্ম্মী লোক, তার ওপর নতুন জামাই এসেছে তাঁর বাড়ীতে! এপারের ডিঙি নিজেই বেয়ে নিয়ে নামলেন ওপারে। নদীর উঁচু কিনারে উঠে সাঁওতাল মেয়েদের শুধোলেন: মরদগুলো কোথায় রে তোদের?

: ঘরকে গো।

ওরা যেন ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কয়।

ঘরকে?—মাছ ধরেনি নাকি কেউ? হনহনিয়ে ঢুকলেন বোসমশাই জেলেদের ছোট্ট পল্লীটির ভেতর।

মনে হল, তিনি যেন সেই রূপকথার গল্পের রাজপুত্তুর, এসে পড়েছেন সেই রাজ্যে, যেখানে সবাই ঘুমন্ত, সাড়া নেই একটা পাখ্-পাখালীরও !

ছবির মতো সুন্দর মাটির ঘরগুলি, তারি কোলে তক্‌তকে করে নিকোনো আঙিনা। মরদগুলো যে যার আঙিনায় খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, মাথার নিচে হাত জড়ো কোরে। আর তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

: হ্যাঁরে, মাছ কৈ ?—শুধোন বোসমশাই। জবাব দেয় না কেউ। মনে হয়, শুনতেই পাচ্ছে না কেউ তাঁর কথা।

মাছ ওরা ধরেনি। ওদের খাঁচায় জাল ওরা ছড়াতেই ভুলে গেছে কাল রাতে। আকাশ থেকে নেমে এসেছে জল, ভিজিয়ে দিয়েছে মাটি, ধুইয়ে দিয়েছে গাছ-গাছালীর পাতা, ছড়িয়ে দিয়েছে ভিজে মাটির সৌরভ, আর সেই সঙ্গে ভুলিয়ে দিয়েছে ওদের স্থূল প্রয়োজনের কথা। সারারাত ওরা ওদের মাটির ঘরে বসে দুচোখ মেলে দেখেছে ধারাসম্পাত, দু-কান ভরে শুনেছে তার রিমিঝিমি। আর, সকালে উঠে, বর্ষণক্লান্ত আকাশের ম্লান রূপটির দিকে মেলে দিয়েছে ওদের স্বপ্নভরা দৃষ্টি।

মাছ ?—মাছ ওরা ধরেনি।

ওপারের ঘুমন্ত-পুরী থেকে ফিরে এলেন বোসমশাই শূন্য হাতে।

* * * *

সেই ঘুমন্তপুরীকে একদিন চঞ্চল করে তুলল একদল শিক্ষিত শহুরে মানুষ। কোদাল কুড়ুল ঝুড়ি হাতে সেই শহুরে মানুষের দল ওপারে গিয়ে যেদিন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে তালে তালে কোদাল চালিয়ে মাটি কোপাতে লেগে গেল—মুভী ক্যামেরা প্রচণ্ড তৎপরতায় তুলে যেতে লাগল ছবির পর ছবি—অস্থায়ী তাঁবুতে বাজতে লাগল এগিয়ে চলার রেকর্ড-সঙ্গীত—সেদিন ওপারের অবিষয়ী অশিক্ষিত অসভ্য মানুষগুলো কৌতূহলী হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, এসব করছো কি গো তোমরা ?

কৌতূহলী সাঁওতালী জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন স্বেচ্ছাশ্রমিক দলের নেতা। ওজস্বিনী ভাষা, অন্তরস্পর্শী ভঙ্গি, উদাত্ত কণ্ঠস্বর।—পথ তৈরী করতে এসেছি আমরা। মাইল কুড়ি দূর দিয়ে গেছে পাকা সড়ক। এখান থেকে একটা পথ কেটে মিলিয়ে দেব আমরা সেই সড়কে। এই পথ বেয়ে মিলবে গিয়ে তোমরা সেই রাজপথে;—পাবে শিক্ষা, পাবে জ্ঞান, পাবে রুচি, পাবে সভ্যতা। তোমাদের এমনভাবে অজ্ঞানতার অন্ধকারে কূপমণ্ডুকের মত থাকলে চলবে না। আমাদের পথের সঙ্গে তোমাদের পথ আমরা দেব মিলিয়ে। এই পথ তোমাদের বংশধরদের করবে উন্নত, করবে শিক্ষিত, করবে রুচিবান।

পিন্দ্রাই সবার সঙ্গে বসে অবাক হয়ে শুনছিল সব কথা। কোলে ছিল হেন্দে, হৃষ্টপুষ্ট কালো ছেলেটা;—আর, পাশে ছিল তার কালোবৌ। 'উন্নতি' কথাটার প্রকৃত অর্থটা যে কী, উন্নতি বলতে যে ঠিক কী বোঝায় তা' ও' জানে না। কিন্তু কথাটার কেমন যেন একটা মাদকতা আছে, কথাটা শুনলে কেমন যেন নেশা লাগে। পিন্দ্রাই শুনতে শুনতে হেন্দেকে বুকের ওপর আঁকড়ে ধরে তাকাল একবার কালোবৌয়ের দিকে।

উন্নতি !—উন্নতি !—উন্নতি !—বংশধরদের উন্নতি।—হেন্দের উন্নতি।—ঐ পথ দিয়ে একদিন আজকের এই বাচ্চা হেন্দে যাবে হেঁটে, তখন ওর শক্ত-সমর্থ চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল;—হাঁটতে হাঁটতে হেন্দে গিয়ে পড়বে পাকা সড়কে, যেখান দিয়ে বড় বড় সব গাড়ী ছোটে বিদ্যুতের মতো।—কিন্তু সেই সড়কে পৌছে কী করবে হেন্দে ?—কি যে করবে, তার সম্বন্ধে কোন একটা অস্পষ্ট ধারণাও করতে পারে না পিন্দ্রাই। প্রাণপণে ভেবে এইটুকু সে কোনক্রমে আন্দাজ করতে পারে যে, সেই সড়কের ধারে এমন একটা কিছু ব্যাপার আছে, যার সংস্পর্শে এসে তার হেন্দের এমন একটা কিছু হবে, যাকে বলে উন্নতি !

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ততক্ষণে উদাত্ত কণ্ঠে জানিয়েছেন আহ্বান—এসো, তোমরাও শ্রমদান কর, গড়ে তোল উন্নতির এই পথ। আকাশের দিকে, জলের দিকে, চাঁদের দিকে, পাখীর দিকে চেয়ে নষ্ট কোর না মহামূল্য সময়।

জেলেপল্লীর তরুণ সর্দার পিন্দ্রাই দাঁড়িয়ে উঠে হাঁক দিলে সকলকে—এসো পথ বানাই।

ঘুমন্তপুরীর অলস মানুষের দল শক্ত হাতে তুলে নিলে কোদাল।

ম্যুভী ক্যামেরার ফিল্ম এল ফুরিয়ে, স্বেচ্ছাশ্রমিক দল হয়ে এল পাতলা, অস্থায়ী তাঁবুর সংখ্যা কমে যেতে লাগল ক্রমেই। শেষকালে দেখা গেল, সাঁওতালী জেলেপল্লীর অলস মানুষের দলই শুধু কোদাল দিয়ে কুপিয়ে চলেছে মাটি, আর তাদের মেয়েরা মাথায় করে নিয়ে চলেছে মাটির চুবড়ি।

চাঁদ উঠল আকাশে—ওরা মাদলে দিলে না ঘা। মেঘ জমল কালো—ওরা তাকাল না তার দিকে। মহুয়া ফুল উঠল ফুটে—ওরা গুঁজল না তা' খোঁপায়। হাতের বাঁশী ফেলে ওরা চালাল শুধু কোদাল।

পথ বানাবে ওরা। পথ বানাবে পিল্লাই, পথ বানাবে তার কালবৌ, যে পথ দিয়ে তাদের হেন্দে একদিন এগিয়ে যাবে 'উন্নতি'র দিকে। এই উন্নতির পথ না বানিয়ে ওরা থামবে না কিছুতেই।

সেই পথ একদিন মিলল এসে কুড়ি মাইল দূরের পাকা সড়কে। নদীর জল যেমন কাটা-খালের ভেতরে এসে ঢোকে হুড়হুড় করে, তেমনি করে ঢুকল এসে সড়কের মানুষ। সেই স্বেচ্ছাশ্রমিক দলের নেতা আবার তাঁর দলবল নিয়ে তাঁবু ফেললেন পথের ধারে। ফিনিশিং টাচ্ দিলেন তাঁরা হাত গুটিয়ে। তার পর ঘোষণা করলেন, অমুক তারিখের সকালে দেশবিখ্যাত শিল্পপতি অমুকচন্দ্র তাঁর বহুমূল্য রোল্স্ রয়েস গাড়ী চালিয়ে এই পথের করবেন শুভ-উদ্বোধন।

উদ্বোধনের আগের দিন গভীর রাতে পিল্লাই আর তার কালোবৌ এসে দাঁড়াল সেই পথে। চাঁদের আলোয় পথটা যেন একটা চকচকে বল্লমের মত দেখাচ্ছে। তেমনি সোজা, তেমনি শক্ত, তেমনি তীক্ষ্ণ। কালোবৌয়ের হাতটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে আবছা গলায় পিল্লাই বললে: পথটা কী সুন্দর লাগছে বৌ?

কালোবৌ বললে: চমৎকার!

: এই পথ দিয়ে আমাদের হেন্দে যাবে হেঁটে ঐ পাকা সড়কে, তা' জানিস বৌ?

বলতে বলতে আশায় চকচক করে ওঠে পিল্লাইয়ের চোখ। শুনতে শুনতে আনন্দে জলজ্বলে হয়ে ওঠে কালোবৌয়ের সুডোল মুখ।

পিল্লাইয়ের কেমন যেন হঠাৎ ইচ্ছে করে, এই রাতে এক-ছুটে দাঁড়ায় গিয়ে সে এই পথের শেষ-কিনারে পাকা সড়কের মোড়ে, যেখানে তৈরী হয়েছে মস্ত তোরণ, যার তলা দিয়ে কাল সকালে আসবে দেশবিখ্যাত শিল্পপতির মহামূল্য মোটরযান।

এক সময় কালোবৌয়ের হাত থেকে নিজের হাতটা খুলে নিয়ে সত্যি সত্যিই দৌড়ল পিল্লাই। দৌড়তে দৌড়তে পিছন ফিরে চেঁচিয়ে বললে: তুই ঘরে যা কালোবৌ, আমি চললুম। কাল বিকেলে ফিরব।

মানুষটার ছেলেমানুষীতে মুচকি হেসে কালোবৌ ফিরে গেল নিজের ঘরে।

পরদিন ভোরে সুরু হল উদ্বোধন অনুষ্ঠান। পিল্লাই পৌছে গেছে ততক্ষণে। কলেরগানে বেজে উঠল জয়যাত্রার গান, লরীর ওপর দাঁড়িয়ে খাঁকি-কোর্ত্তা-পরা যুবকেরা বাজালে বিউগিল্, তোরণে-লাগানো পশমের সুতো ছিঁড়ে এগিয়ে চলল বিখ্যাত শিল্পপতির মহামূল্য মোটরকার, আর তার পিছনে সারি দিয়ে আরো অনেক ছোট-বড় গাড়ী। এক মুহূর্ত্তে ফাঁকা হয়ে গেল তোরণ, শুধু পিল্লাই দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল একা।

গাড়ীর দল যাবে সেই জেলেপল্লী অবধি। সেখানে ছোটখাট একটা জনসভায় স্বেচ্ছাশ্রমিকদলের নেতাকে অভিনন্দন দেওয়া হবে তাঁর এই মহৎ কীর্ত্তির জন্য। ফাঁকা তোরণের তলায় আদুড় গায়ে একা দাঁড়িয়ে রইল পিল্লাই কিছুক্ষণ, তারপর আবার দৌড়তে লাগল ঘরমুখো। কী একটা অজানা আনন্দের উত্তেজনা আজ ওকে কিছুতেই স্থির থাকতে দিচ্ছে না। পিল্লাই ছুটল।

কাল সারারাত ছুটে এসেছে পিল্লাই এখানে; পা দুটো ভারী লাগছে। তবু ছুটেছে পিল্লাই সেই পথ দিয়ে, যে পথ দিয়ে একদিন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে তার হেন্দে। পিল্লাই ছুটেছে।

মাঝে বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে হল পিল্লাইকে গাছের ছায়ায়—তারপর আবার ছুট্। চোখ দুটো ক্লান্তিতে যেন ঝাপসা হয়ে আসছে, পা দুটো অবাধ্য হচ্ছে থেকে থেকে—তবু ছুটেছে পিল্লাই।

হঠাৎ—ভঁ-অ-অ-অ-অপ্!

চম্‌কে উঠল পিন্দ্রাই! তার চোখের ঠিক সামনেই কখন্ এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে সেই মহামূল্য মোটর-গাড়ীটা! কী আশ্চর্য্য! গাড়ীটা এরি মধ্যে সেখানে গিয়ে আবার ফিরে চলেছে!

: উজবুক্ কাঁহাকা!—ধম্‌কে উঠল মহামূল্য মোটর-গাড়ীর উর্দ্দিআঁটা চালক।

শিল্পপতির পাশে বসে তাঁর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী বললেন: আর একটু হলে এটাও চলে গিয়েছিল স্যার গাড়ীর তলায়। ব্যাটারা গাড়ীর রাস্তায় হাঁটেনি ত' কখনো।

মহামূল্য গাড়ীর পিছনে ছোট-বড় গাড়ীর দল সব লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে সরে যায় পিন্দ্রাই পথ ছেড়ে।

মহামূল্য গাড়ী এবং তার পিছনের আরো সকলে একসঙ্গে গর্জ্জে উঠে স্টার্ট নেয় আবার। যাবার সময় সবকটা গাড়ীই যেন একবাক্যে ধমক্ দিয়ে যায় এই অপদার্থ সাঁওতালটাকে।

টল্‌তে টল্‌তে হেঁটে চলে পিন্দ্রাই ঘরের দিকে। ক্লান্ত শরীর—মন কিন্তু আশায় ভরপুর। তার হেন্দে যাবে একদিন ঐ পথ দিয়ে উন্নত হতে!

হেন্দে-এ-এ-এ-এ-এ !!!

কালোবৌয়ের কণ্ঠস্বর না?—শিউরে ওঠে পিন্দ্রাই! কালোবৌটা অমন কান্নার মতো চেঁচাচ্ছে কেন হেন্দের নাম ধোরে? ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে পিন্দ্রাই ঘরের দিকে!

* * * *

সাঁওতালদের হাতে-কাটা পথ শেষ করে মহামূল্য রোল্‌স্ রয়েস্ উঠল গিয়ে পাকা সড়কে। হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন এতক্ষণে সবাই। সাঁওতালদের ছোট্ট ছেলেটা আচম্‌কা গাড়ীর তলায় পড়বার পর থেকে সবাই সিঁটিয়ে ছিলেন এতক্ষণ। পাকা সড়কে এসে গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দেন নির্ভাবনায়। আর, সেই সঙ্গে তৈরী করে ফেলেন ভবিষ্যতের প্ল্যান্—রাস্তা ত হল, এইবার একটা কারখানা বসাতে হবে ওখানে। লেবারটা সস্তায় পাওয়া যাবে!

* * * *

পিন্দ্রাই একা এসে দাঁড়ায় পথের ধারে। কালো-বৌয়ের কান্না তখনো থামেনি। সূর্য্যাস্ত হয়ে গেছে। তারই লাল রঙ্ রক্তের মতো লেগে রয়েছে মেঘের গায়ে গায়ে। পিন্দ্রাই তাকায় একবার শূন্য পথটার দিকে।

কার?—কার উন্নতির জন্যে কাটা হল পথটা?

কবির মৃত্যু

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কবির হইল মৃত্যু—দারা পুত্র করিল রোদন
গভীর ব্যথায় আর্ত্ত যত বন্ধুজন।
জীবনে লয়নি কভু কবির সংবাদ
তারাই আগিয়ে এসে দিল তার শবাধারে কাঁধ।
জীবিত কবিরে যারা দেয়নিক একটিও ফুল
তোড়া তোড়া ফুলে তারা শবাধার করিল আকুল
সভায় সংবাদপত্রে বেধে গেল শোকের উৎসব,
চারিদিকে উদীরিত নানা ছন্দে স্তব।

পত্রে পত্রে চিত্রের ভূষণ
বৈরীদের রচনার ছত্রে ছত্রে গুণের কীর্ত্তন
মাতিল দেশের লোক চলে গেলে কবি
বহুদিন পরে যেন উৎসবের উপলক্ষ লভি'।
অসহায় নিরাশ্রয় কবিপরিবার
উৎসাহ কাহারো নাই তাহাদের দুঃখ হরিবার।
জানিল স্বজনগণ হেরি এই দেশব্যাপী শোক
তাহাদেরি মাঝে ছিল কত বড় লোক।

জীবনে আনন্দ যত দিল, কেহ করিল না ভোগ,
মরণের মহোৎসবে সবে দিল যোগ।

জন্মদিনে

কত কালের শূন্যতা মোর
আজ সকালে আকুল হ'ল :
'তোমার পুণ্য পরশ দিয়ে
আমায় পূর্ণ কোরে তোলো'।
কত যুগের আঁধার নিশা
মিটাতে চায় আলোর তৃষা,
তোমার করের তপনে তা'র
রূপান্তরের তোরণ খোলো ॥

কত জন্ম-জন্ম-পরে—
আমার জীবন আজ প্রভাতে
তিমির-হরণ অরুণ-বীণায়
বাজুক চিরন্তনের হাতে।
এসো এবার আমার প্রাণে
মরণহারা সুরের গানে :
'আমার জন্মদিনে তোমার
চিরদিনের বাণী বোলো' ॥

কথা : নিশিকান্ত (পণ্ডিচেরী) সুর ও স্বরলিপি : তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II রা জ্ঞা -সা | রা -া | ণা -ধা I ধণর্সা- র্সণা ধা | ণা -পা | পা -া I
ক ত ০ কা ০ লে র্ শূ০০ ০ ন্য তা ০ মো র্

I মা -পা ।ধ | মণা -ধণা | মা -পা I মপা মজ্ঞা -া | রা -সা | রা -া I
আ জ্ স কা০ ০০ লে ০ আ০ কু ল্ হ ০ ল ০

I রা জ্ঞা -া | রা -া | জ্ঞা -া I রমা জ্ঞা জ্ঞা | রসা -রা | সা -া I
তো মা র্ পু ০ ণ্য ০ প০ র শ দি০ ০ য়ে ০

I সা র্রা -র্সা | র্সর্রা -র্মজ্ঞা | জ্ঞর্রা -ণা I ণা ণধা -মা | পা -র্সণা | র্সা -া II
আ মা য়্ পু০ ০য় ণ ০ কো রে ০ তো ০ ০ লো ০

II মা মা -ণা | ধা -া | ণা -পা I পা পধা -নর্সা | র্সনা -া | র্সা -া I
ক ত ০ যু ০ গে র্ আঁ ধা০ ০র্ নি ০ শা ০

I র্সা র্সা -ধণা | র্সা -া | র্রর্গর্মা -র্গর্মা I র্রা র্রা -র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্র -া | র্সা -া I
মি টা ০ ০ তে ০ চা০০ ০য়্ আ লো র্ ভূ ০ যা ০

I না র্সা র্রা | ণধা -া | ণা -পা I পা ধা -মা | পা -া | পা -া I
তো মা র ক ০ রে র্ ত প ০ নে ০ তা র্

I মা মা -ণা | ধা -ণা | পা ধা I মপা মজ্ঞা জ্ঞা | রা -সা | রা -া I
রূ পা ন্ ত ০ রে র্ তো০ র ণ খো ০ লো ০

"তোমার পুণ্য............কোরে তোলো" II

II সা জ্ঞা -া | রা -া | জ্ঞা -া I রা -া জ্ঞা | মা -া | পা -া I
ক ত ০ জ ন্ ম ০ জ ন্ ম পা ০ রে ০

I মপা -মা -ণা | ধা -ণা | পা -ধা I মা পধা ধপা | মজ্ঞা -া | রা -া I
আমা ০ র্ জী ০ ব ন্ আ ০জ্ প্র ভা ০ তে ০

I রা জ্ঞা জ্ঞা | সরা -া | সা -া I রা মা মা | পা -া | পা -ধা I
তি মি র হ ০ র ণ্ অ রু ণ বী ০ ণা য়্

I মা পধা -ণর্সা | ধা -র্সা | র্সণা ধা I পা ধা মা | পা -া | পা -া I
বা জু০ ০ক্ চি ০ র ন্ ত নে র হা ০ তে ০

I মা মা -ণা | ধা -া | ণা -পা I পা পধা নর্সা | র্সনা -া | র্সা -া I
এ সো ০ এ ০ বা র আ মা০ ০র্ প্রা ০ ণে ০

I র্সা ধা ণা | র্সা -া | র্রর্গর্মা -র্গর্মা I র্রা র্রা -র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্রা -া | র্সা -া I
ম র ণ হা ০ রা০০ ০ ০ সু রে র্ গা ০ নে ০

I না র্সা র্রা | ণধা -া | ণা -পা I পা ধা -মা | পা -া | পা -া I
আ মা র জ ন্ ম ০ দি নে ০ তো ০ মা র্

I মা মা -ণা | ধা -ণা | পা ধা I মপা মজ্ঞা -া | রা সা | রা -া I
চি র ০ দি ০ নে র্ বা০ ণী ০ বো ০ লো ০

"তোমার পুণ্য............কোরে তোলো" II II

সমন্বয়-সন্ধানী আইনষ্টাইন

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিশ্রুত আইনস্টাইনকে লোকে বিরাট বৈজ্ঞানিক রূপেই প্রধানতঃ জানে। কিন্তু আজ তাঁকে আমরা দেখবো সমন্বয়সন্ধানী ঋষি রূপে, মানবপ্রেমের মূর্ত্তপ্রতীক রূপে, যুগপ্রবর্ত্তনকারী চিন্তানায়ক রূপে। আমাদের দেশে তপস্বীদের কণ্ঠে একদিন শোনা গিয়াছিল—হে রুদ্র গিরিশন্ত, সমস্ত প্রাণী যেন আমাদের মিত্রের দৃষ্টিতে দেখে, আমিও যেন সকল প্রাণীকে বন্ধুভাবে দর্শন করি। প্রাচীর এই প্রাচীন মন্ত্রের শরণ নিয়েই প্রতীচির বিজ্ঞান-তাপস জ্ঞান-সাধককে আজ আমরা বোঝবার চেষ্টা করবো, প্রণাম করবে, বলবো—পুনরেহি বাচস্পতি, আলোক মাতাল স্বর্গসভা থেকে এসো।

চিরকালের মানুষ চেয়েছে জানতে, বুঝতে, প্রকাশ করতে—তার চিরন্তন প্রশ্ন হচ্চে—কস্মৈ দেবায়, কে সে দেবতা, কোন সে শক্তি, কী সে ছন্দ—কোন পথ গ্রাহ্য, কোন পথ বাহ্য। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের মনে জাগরণে ধ্যানে তন্দ্রায়, কাজের উৎসাহে, চিন্তার বিশ্লেষণে এই প্রশ্নই নানা রূপে নানা ছন্দে জেগেছে, চরম আকুতি নিয়ে, পরম প্রার্থনা রূপে, অনন্ত জিজ্ঞাসা হয়ে— দেখা দাও, দেখা দাও। বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান মন্দিরও সেই তপস্বীর যজ্ঞশালা, সেখানেও চলেছে এই বিচিত্রের, এই অপরূপের, এই অনন্তের রহস্যভেদের প্রয়াস, সীমার মধ্যে অসীমকে ধরার চেষ্টা। জানবো, বুঝবো, দেখবো সেই জিনিষকে যা অনির্ব্বচনীয়, যা অপরূপ, যা রসস্বরূপ রহস্যঘন—যার মধ্যে সন্ধান পাব অজানার বিচিত্রলীলার—অথচ যা আমার বুদ্ধির অতীত হবে না, যার সৌন্দর্য্য মনকে আচ্ছন্ন করবে—এই যে জ্ঞান, এই যে বোধি, এই হচ্চে আইনস্টাইনের জীবনবেদ। তিনি ব্যক্তিগত ভগবানবাদ মানতেন না একথা ঠিক, কিন্তু অন্নময় ভূমি থেকে তিনি দেখেছেন প্রাণময়ী প্রকৃতিকে। এও তো একদিক দিয়ে বিশ্বরূপ-দর্শন। আইনস্টাইন বলতেন আমি এইটুকু ধারণা করতে পারি যে যুগযুগান্তর ধরে সৃষ্টির মধ্যে এক অনন্ত প্রাণের ধারা বহমান হয়ে রয়েছে, তারই তরঙ্গ উৎক্ষেপে অণুপরমাণুর ঘূর্ণীতে ঘুরছে এই বিরাট বিপুল বিশ্ব।

তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ তাপ আলোকে ছন্দায়িত সীমাহীন শূন্যের রূপ যখন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি তখন ভাবি, কী বিরাট বিশাল বিপুল এর পরিধি। অথচ এমন দিনও ছিল যখন সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, নক্ষত্র নয়, নীহারিকা নয়, বস্তুবিহীন আকাশ, দিশাহীন শূন্য, রং নেই, রূপ নেই, রেখা নেই। এরই মধ্যে জমাট বাঁধালো সৃষ্টির স্তর, এলো গতির যতিতে নৃত্যের আবেগ। নটরাজের তাণ্ডবে বিবশ বিশ্ব চেতনায় জাগলো—এতো শুধু কবির কল্পনা নয়, এ যে নিছক বৈজ্ঞানিক সত্য। তপের তাপের বাঁধন কাটিয়ে রসের বর্ষণে শ্যামল হয়ে এই সুন্দরী ধরণীই জেগে উঠছিল মহাশূন্যে—যে একদিন কায়াহীন মায়াবিনী রূপে আকাশ পথে তূর্য্য বাজিয়ে সূর্য্যের পিছনে ঘুরে বেড়াতো অভিসারিকার দাহ নিয়ে। কত লক্ষ কত কোটী ব্রহ্মাণ্ড এই রকম ঘুরছে তা কে জানছে। অবাক হয়ে মানুষ আজ কিছুটা বুঝতে পারছে যে এই অনন্তের বুকে ভাসমান ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ লক্ষ ছায়াপথে কি ছোটাছুটিই না চলছে। কোন অতি সুদূর অতীত হতে মহাজাগতিক রশ্মির খেলা চলছে, কত পরমাণুর হৃৎকেন্দ্রে এ আঘাত করছে। ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনে মহাজাগতিক বিকীরণের গূঢ়ত্ব আজ বৈজ্ঞানিকরা কিছুটা বুঝতে পারছেন। তাই তাঁরা ঐ তথ্য দিয়ে পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর সমন্বয়সূত্র খুঁজচেন, অণুর সঙ্গে মহতের। বৈজ্ঞানিক যখন এর ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন তখন একে কী বলবো—দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি।

আলবার্ট আইনস্টাইন সেই মনীষীদেরই একজন, যিনি দেবতাদের কাব্য বোঝবার চেষ্টা করেছেন, মহাতামসী প্রকৃতির ছন্দকে ধরবার প্রয়াস। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মনে এই "Continuous flight wonder"। পাঁচ বছর বয়সে কম্পাসের কাঁটা ঘোরাতে গিয়ে তাঁর মানসিক জগতে লাগলো প্রথম আলোড়ন—কেন কাঁটা ঘোরে। বারো বছরে সমস্ত ইউক্লিড হলো অধীত, সতেরো বছরে সমস্ত অঙ্কশাস্ত্র পদার্থ বিদ্যার তত্ত্ব আয়ত্ত। জুরিখের পলিটেকনিকে যখন তিনি ঢুকছেন তখন তাঁর চিন্তায় ধ্যানধারণায় মৌলিক ভাবে মিশে গেছে গতিব্যাপ্তি মাধ্যাকর্ষণের নতুন রীতি, বিশেষ করে Laws of Thermodynamics (উষ্মগতীয় নিয়মগুলি)। অধ্যাপক সত্যেন বসু বলেন, যে এই তত্ত্বের প্রতি শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁর শ্রদ্ধা সুগভীর ছিল। ১৯০৫ সালেই তিনি Electrodynamics of moving media নিয়ে গবেষণা শেষ করেন—যার ফলে সমস্ত পদার্থবিদ্যার মৌলিক তত্ত্বই বদলে যায়। ফ্রেসনেলের আলোর গতি তরঙ্গে নিউটনের সূত্রের মানগুলি বদলে গেলো। আইনস্টাইনই প্রমাণ করলেন যে একটা ঘড়ি একই সময়ে একই পট দেখাবে, কারণ কাল ত স্থির নয়—যা স্থির তা হচ্চে আলোর সঙ্কেতের গতিবেগ। অধ্যাপক বসু আরো বলেন যে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে ছাড়িয়ে এক সমন্বয়সন্ধানী আইনস্টাইনকে তিনি জানতেন—যিনি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্লেষণীবৃত্তি, ভাব ভাষা পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে স্বপ্ন দেখতেন যে যাতে তাড়িত চুম্বক মাধ্যাকর্ষণকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্লেষিত করা যায়, দ্রব্যের মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়। তাই আধুনিক যুগের সমস্ত মতবাদকেই তিনি অসম্পূর্ণ মনে করতেন। এইখানেই দার্শনিক সৃষ্টি সন্ধানী আইনস্টাইনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়—ততঃ কিম্। তাই তিনি Duantum Mechanicsএর Positivistic দিক বিশ্বাস করতেন না—তাঁর দৃষ্টি ছিল আরো গভীর, আরো ব্যাপক—Unified field theory—প্রাণচক্রের নিত্য

আবর্ত্তনশীল বিশাল পরিধিতে নিত্য নূতন পথহীন পথে ঘুরছে এই বিশাল বিশ্ব এক নিত্যসমৃদ্ধ নিয়মের নীতি অনুসারে। বিপুল নীলাকাশ, অগণ্য জ্যোতিলোক আর মানুষের মন—সবই বুঝি একই ছন্দে বাঁধা। আইনস্টাইন তারই নামকরণ করলেন—"Inner Harmony," তাই আইনস্টাইন প্রায় প্রাচ্য ঋষিদের পুনরাবৃত্তি করে বললেন—জীবনের আদর্শ হচ্ছে Goodness, Beauty, Truth—শিব সুন্দর সত্য। এই "Cosmic Religious feeling-এর মাধ্যমেই একটি উচ্চতর মানসের প্রকাশ পেলো তাঁর জীবনে। এই অনুভূতির চরম রূপকেই আমরা বলি শিবজ্ঞান—যে শক্তি মঙ্গলময় ময়োভব। বিজ্ঞানী, সাধক ও দার্শনিক মেশেন সেইখানেই। যে ছন্দকে, যে নিয়মকে তিনি ধরলেন চিন্তার গবেষণায় বীক্ষণশালায় সেই ছন্দই কি 'জগদবীজমাদ্যং নিরীহং' অর্থাৎ নিঃ ঈহং (ক্রিয়াশূন্য) নিরাকারম (আকারশূন্য)। এই শক্তি কি বিশ্বজন্যা, এই ছন্দ থেকেই কি "যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং—লীয়তে যেন…" সৃষ্টি স্থিতি লয় সবই কি একই সুরে বাঁধা। তাই ভক্ত যখন কল্পনা করেন যে তিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, অগ্নি নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, তাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, গ্রীষ্ম নেই, শীত নেই, বেশ নেই, দেশ নেই, তখন এই ছন্দই (harmony) অবস্থাত্রয়ের অতীত "পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্"। এরই তরঙ্গে সৃষ্টি গড়ছে, সৃষ্টি ভাঙ্গছে, আবর্ত্তিত হচ্ছে। এই তো প্রাণের লীলা। কবির ভাষায়—

এ আমার শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে
করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ

রূপনারাণের কূলে ডুব দিয়ে কবির দৃষ্টিতে যে জগৎ স্বপ্ন নয় বলে উদ্ভাসিত হয়, সাধকের নিরঙ্কুশ মানসে অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে ছন্দরূপে যে লীলা প্রতিভাত হয়, বৈজ্ঞানিকও সেই সত্যকে অন্যরূপে অনুধরণে দেখতে চান—বীক্ষণাগারে পরীক্ষা করে, জৈব ইতিহাসের মধ্য দিয়ে—অণুকে বিশ্লেষণ করে, আঁক কসে, জ্যামিতির রীতি দিয়ে, ত্রিকোণমিতির চতুষ্কোণে। এই বিশ্বপরিচয়কে ধরবার চেষ্টা করলেন আইনস্টাইন অঙ্কের ফাঁদে।

পঞ্চাশ বছর আগে ১৭ই জুলাই জার্ম্মানীর বিখ্যাত পত্রিকা আনালেন ডর ফিজিক (Annalen Der Physik) এ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ব প্রথম প্রকাশিত হোল। সাড়া পড়ে গোলো প্রতিটি দেশে। ব্যঙ্গচিত্র বেরুলো। একথা বোঝা যায় যে পদার্থও শক্তি—একটি অন্যেরই রূপান্তরিত সৃষ্টি—কিন্তু এতো শক্তি একটি অনু পেলে কোথা থেকে। এতদিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিল যে দেশ কাল ও বস্তু পৃথক পৃথক সত্তা এবং দেশ ও কাল বস্তুর আধার। বিজ্ঞানের দৃষ্টি ছিল কার্য্যকারণ সম্বন্ধ (Causality) ও প্রকৃতির নিয়মানুগত্য (Uniformity of nature)। তাঁরা আরও ধরেছিলেন যে ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে ইথার আছে আর ইথারই শক্তির আধার ও বাহন, আর জড়কণাই হচ্ছে বিশ্বের গোড়ার জিনিষ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকরা মনে করতেন এই বুঝি বিজ্ঞানের শেষ কথা। পদার্থ অবিনশ্বর, শক্তিরও হ্রাসবৃদ্ধি নেই, পদার্থ আর শক্তি একই অন্যের রূপান্তরিত অবস্থা হতে পারে, আর শক্তির উদ্ভব হয় অ্যাটম জুড়ে আর অ্যাটম্ ভেঙে (ফিউশন ও ফিশন) এই সত্যগুলি তাঁদের চোখে পড়েনি। আইনস্টাইন এসেই দুটি প্রশ্ন করলেন—এই যে বিপুলবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এখানে প্রাকৃতিক নিয়মগুলির ধারা ত বদলাচ্চে না, তাদের রূপ সংজ্ঞা বিবর্ত্তন ঠিকই রয়েছে আর এই যে আকাশে আলোর বেগ এর কি কিছু তারতম্য হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকরা এতদিন একটা "missing link" যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছিলেন না—অর্থাৎ Earth's absolute motion in space অর্থাৎ আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করি—একে ত মনে হয় বেশ শক্ত আর স্থাণু (stable), অথচ এটা ত জানি যে এই পৃথিবী গতিশীল—ঘুরছে সে—এর কক্ষপথ মাপা—সেই ঘূর্ণীর ফলে রাত হচ্চে—বর্ষ আসছে বর্ষ যাচ্চে—গ্রীষ্ম শরৎ বর্ষা হেমন্তের দিনান্তে শীতের তুহিনে এর আহ্নিক পথ বিবর্ত্তিত। শুধু এই পৃথিবীই ঘুরছে না—এই সৌরমণ্ডলও ঘুরছে—যে গ্যালারীতে আমরা আছি, যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা আছি সবই ঘুরছে। নটরাজের নাচের তালে আমরা নাচছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে একটা মহাকর্ষের মহাজালে বহু কোটি নক্ষত্র বেঁধে দিয়ে এই জগতটা লাটিমের মত পাক খাচ্চে। আমাদের নক্ষত্র জগতের দূরবর্ত্তী বাইরেকার জগতেও এই দুনির্ব্বার ঘূর্ণাপাক্। চলে বলেই জগৎ। এদিকে অনু-পরমাণুর জগতের অনুতম আকাশেও চলছে কালস্রোত বেয়ে ইলোকট্রোণ প্রোটনের ঘূর্ণা খাওয়া—তাহলে absolute motionটা কি? বৈজ্ঞানিকদৃষ্টি দিয়ে অঙ্ক কসে আইনস্টাইন সেই কথাতেই এলেন—absolute motion বলে কোন জিনিষ নেই, সবাই সবাইএর সঙ্গে বাঁধা—'relative to some system'. বন্ধনহীন কেউ নেই—তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা—মুক্তি কোথাও নেই। তিনি বোঝালেন—দেখো, একটা মানুষ সীমাহীন কালো সমুদ্রের মাঝে বসে আছে একটা নৌকায় ঘন কুয়াশার মাঝে (a man adrift in sea in a small boat in a fog); কিছুই দেখা যাচ্চে না—সে বুঝতে পারছে না তার গতিবিধি—শুধু অন্য যা কিছু ভাসচে, যা কিছু দুলচে, যে আলোক বিন্দু বা তীরের আভাস সে দেখতে পাচ্চে, তারি সঙ্গে তুলনায় তার গতিবিধি সে কিছুটা স্থির করতে পারছে। আর একটা উপমা দিলেন তিনি—এই বিশ্বটা যেন একটা সাবানের ফেনার (Soap bubble) বাইরের দিকটা বা ধরুন space বা শূন্যে বেড়াবার জন্য একটী এরোপ্লেন বা রকেটে চড়ে আমরা বেরুলাম। আকাশযানের গতিবেগ আলোর গতির বেগের চেয়ে কম। আমরা যখন ফিরবো তখন আমাদের ঘড়িতে যা সময় নির্দ্দেশ করবে তার চেয়ে ঢের বেশী সময় অতীত হয়ে যেতে পারে পৃথিবীতে। যেমন দেবতাদের একদিন পৃথিবীর এক বৎসর। অন্য রকমের আর একটা উপমা দেওয়া চলতে পারে। গরম উনুনের উপর একজনকে বসতে বলা হলো—একমিনিট মনে হবে এক ঘণ্টা—আবার সেই লোককেই একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে আলাপ করতে বলা হোক, মনে হতে পারে এক ঘণ্টাই এক মিনিট।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লুই ডি ব্রগলি বলেন—আলবার্ট আইনস্টাইনের—Works of quality are like blazing rocks which in the dark of the night suddenly cast a brief but powerful illumination over an immense unknown region, যেন দিগন্তভরা তিমির অমা নিবিড় রাতের ঘন অন্ধকারের মাঝে রকেটের আলো উদ্ভাসিত হয়ে কিছুটা অজানা দেশকে দেখিয়ে দিয়ে গেলো। মাইকেলসন ও মরলি, ফিটজ-জিরাল্ড, লোরেঞ্জ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা এগিয়ে এলেন। তাঁদের পরীক্ষার দ্বারা আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত দৃঢ় হলো। আইনস্টাইন ও আপেক্ষিতাবাদের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে দেশ কাল ও বস্তুর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। দেশ ও কাল আধারও নহে আধেয়ও নহে—Time and space are not containers nor are they contents—they are variants. তাহারা বস্তুর অবধারণ মাত্র—বস্তুর কোন মৌলিক গুণ (primary qualities) নেই, তার গতি (motion) ব্যাপ্তি (Extension) বা জড়মান (mass) সবই আপেক্ষিক (Relative) সমকালীন (Simultaneous) নয়। ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ এর উপরে দেখাদিল চতুর্থ dimension। কোয়ান্টাম থিয়োরী নতুন করে গড়ে উঠলো। সবই তেজ, সবই ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বৈদ্যুৎকণার সমষ্টি, অতি পরমাণুর ঘূর্ণী ও লাফ। জড়ের জড়ত্ব গেলো ঘুচে—তার ভিতরে বিশ্বপ্রাণের সাড়া পাই আর না পাই অরূপ বৈদ্যুতলোকে শক্তির লীলা দেখতে পেলাম।

হাইড্রোজেন সম্বন্ধে নীলসবহুরের গবেষণা, অ্যাশটনের আইসোট্রোপ সম্বন্ধে বিচার, স্ট্যান্‌লির ভাইরাস সম্বন্ধে আলোচনা, জিনস্ এডিংটনের নানা অনুসন্ধান—সবই বৈজ্ঞানিক মহলে এমন ঝড় তুলেছে যে আজকের আণবিক যুগে বিজ্ঞান বিশ্বকে নতুন দৃষ্টিতে দেখছে। হাইসেনবার্গ স্রডিঙ্গার ত বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করলেন না—তাঁরা দেখেছেন শুধু সম্ভাবনার তরঙ্গমালা (waves of probability), আধারবিহীন বৈদ্যুতিক ভরণের সমষ্টি দেশ কাল সমবায়ে ঘটনাপুঞ্জ যাহাদের গুণ নির্দ্দেশ করা যায় গাণিতিক সঙ্কেতের দ্বারা (a system of spatio temporal Entites whose qualities are Exclusively mathematical)।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—"বিপরীত ধর্ম্মী বৈদ্যুৎ কণার যুগল মিলনে যে সৃষ্টি হল সেই জগতটায় দুটি বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া—চলা আর টানা—মুক্তি আর বন্ধন—গতি আর সংযমের অসীম সামঞ্জস্য নিয়ে সব কিছু। আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আয়তনের স্বভাব অনুসারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকিতে বাধ্য। এ বাঁকাই হোল বিশ্বের ধারা ; যেন সেই চিরবঙ্কিম বিহারীই বিশ্ব ছন্দের মূল সত্য।

দার্শনিক আঁরি বের্গস,:লয়েড মরগ্যান্, হোয়াইটহেডও বলতে আরম্ভ করলেন. বস্তু জড় নয়, বস্তু চঞ্চল, তারও ভিতরে ভিতরে প্রবল আলোড়ন চলচে, বস্তু পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে উঠছে, নব নব রূপে বিকশিত হচ্ছে, নব নব গুণের উদ্ভব ঘটছে—এই দ্বন্দ্বের (Dialectic) পঞ্জরে মৃত্যু হয়ে উঠছে প্রাণ পলকেপলকে। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব উপমায় বলতে গেলে যেন একটি চঞ্চলা নদী আপন বেগের ঝলকে ঝলকে প্রবহমান ক্রমসঞ্চয়, ক্রমবর্দ্ধমান, যা থেকে উঠছে প্রাণলীলার এক নূতন প্রকাশ (Creative and emergent evolution)। কাল ধ্বংসশীল নয়, গতিশীল সৃষ্টিশীল (Enduring)। ভারতবর্ষীয় চিন্তায় মহাকাল শুধু ধ্বংসের দেবতা নন, সৃষ্টিরও দেবতা আর কালং কলয়তি যা সা তিনিই ত কালী—বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। মায়ার অর্থ কি এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা—তার কোন সত্তা নেই। তাতো নয়—মায়া হচ্চে অসীম বিশাল সত্যকে সীমার রেখায় "মিত" করে নাম ও রূপের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা। আমাদের রুদ্রযামলে দেবীকে বলা হয়েছে রূপাতীতা, রূপশূন্যা, বিরূপা রূপমোহিনী। তাই যোগী যখন গান করেন "নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি" তখন সেটাকে কল্পনা প্রসূত আস্তিক্যবুদ্ধি প্রণোদিত বলে স্বীকার করলেও এও স্বীকার করতে হয় যে এই ঘনান্ধকারের মাঝেই শক্তির স্পন্দন, নর্ত্তন, ও পরিবর্ত্তন চলেছে। মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের কল্পনাতেও এই রূপক্ অপূর্ব্বতম হয়ে ফুটে উঠেছে "সাবিত্রীতে"। কাব্যরসে সিঞ্চিত হয়ে যোগ ও বিজ্ঞানের মূল সূত্র দেখতে পাওয়া গেলো—আলোর সাধনাই মানুষের চিরন্তনী সাধনা The Symbol Dawn—Then Something in the inscrutable darkness stirred—a nameless movement,, an unthought Idea. জাগৃতির প্রথম ছন্দকে এইভাবেই আবাহন করেছিলেন বৈদিক ঋষিরা—মঘোনী, ঋতাবরী শাশ্বতী উষাকে—আলোর প্রথম অমল কমল দল—a long line of hesitating hue. বৈজ্ঞানিকের ফরমুলায় ফেলা যাক্—অমনি এ হোল ইলেকট্রণ প্রটোনের ঘূর্ণী ও লাফ, নিউক্লিয়ার বমবার্ডমেণ্ট, ফিশন ও ফিউশন্ মহাজাগতিক বিকিরণের রহস্য "In the Sweep of the worlds, in the Surge of the ages"। গ্রীক হেরেক্লিটাস, বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ বার্গসর প্রজ্ঞা সবই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিককে একই মূল সূত্রে নিয়ে আসবার চেষ্টা। আইনষ্টাইনের পরের যুগের বৈজ্ঞানিকরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। এডিংটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা এই জড়জগতের এর Structure বা আকার বোঝাতে গিয়ে "meaningless" বা অর্থহীন বলে ছেড়ে দিলেন। স্রডিঙ্গার বললেন—Form not substance is the fundamental কারণ বিজ্ঞান ধরে নিয়েছে "Continiuty of observation" কিন্তু আসলে তাতো হয় না, আর বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বারে বারে উদ্ভাসিত হয়েছে "discontinuous exchange of Energy." অর্থাৎ শক্তির রূপ পরিবর্ত্তনের মধ্যে মাঝে মাঝে ছেদ রয়ে যাচ্ছে—এ কী আকস্মিকের মালা গাঁথা না হয় বিবর্ত্তনীয় লাফ্ (evolutionary leap). যুদ্ধোত্তর কালের বিখ্যাত দার্শনিক যোশেপ অর্টেগা গ্যাসেট ও এই কথা বলেন "I am born into an environment, I know not when I came nor where I go nor who I am. This in my situation as yours every one of you. কোথা হতে এলুম,

কোথায় যাবো, কে আমি, কিছুই জানিনা, শুধু জানি আমি জন্মেছি এই পরিবেশের মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের একটি গল্প মনে পড়ে। গল্পটি উপনিষদের—ভৃগুবারুণি সংবাদ। বরুণ ঋষির পুত্র ভৃগু, বল্লেন—পিতা, আমায় ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন, ব্রহ্ম অর্থে কোন হস্ত পদ বিশিষ্ট দেবতার কথা নয়, সর্ব্বমগূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্ যে রহস্য তারি অনুসন্ধান। পিতা বললেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ ব্রহ্মেতি। ভৃগু বসলেন তপস্যায়—দিনের পর দিন যায় রাত্রির পর রাত্রি—চোখের উপর ফুটে উঠে—অন্নময়ী এই পৃথিবী, শস্যমালিনী এই বসুন্ধরা, রূপরসগন্ধ স্পর্শ নিয়ে শ্যামকান্তময়ী—এতো মিথ্যা নয়, অন্নই ব্রহ্ম—অন্নেই সব বাঁচিয়ে রেখেছে—এই জড়ের দেহে প্রতি অনুতে রয়েছে সেই অন্নময় বীর্য্যের মহাশক্তি অবরুদ্ধ। সত্যের একটি পর্দ্দা উঠে গেলো। জড়ের রহস্যের পিছনে আছে প্রাণের রহস্য—জড় ত প্রাণের কঞ্চুক, ভৃগু আবার বসলেন তপস্যায়—স তপোঽতপ্যত, প্রাণো ব্রহ্ম, যে প্রাণ এজতি—দুলচে কাঁপচে, বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিশে Elan Vital. আধুনিক বৈজ্ঞানিক হয়ত এইখানেই থামবেন, দেখবেন সেই প্রাণের স্পন্দনকে একটা ছন্দকে, নিয়মকে, Harmonyকে.

কিন্তু এও হচ্চে দৃষ্টির ভেদ—এক একটি পর্দ্দা খুলে যাচ্চে—একই সত্য তার বিভিন্নরূপ—ভৃগু দেখেছিলেন প্রাণেরও পিছনে আছে এক চিৎশক্তি বোধাত্মক মনঃশক্তি—মনোব্রহ্ম। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হননি—তিনি খুঁজেছিলেন ও পেয়েছিলেন বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি অর্থাৎ যে জ্ঞান, বিরাট বিশাল বিপুল; সর্ব্বং খল্বিদং—তার পরের কথা খুবই সোজা—এই জ্ঞান হলেই শান্ত শুদ্ধ সমাহিত হয়ে আসে মন—উদ্ভাসিত হয় আনন্দম্। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে এটা হয়ত কবিকল্পনার কাব্যময় রূপ কিন্তু যে ছন্দকে ভিত্তি করে এই রূপ গড়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে আইনস্টাইন বললেন "All knowledge about reality begins with experience and ends with it, Reason gives the structure to the system. ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্কও সেই কথাই বললেন—There can never be any real opposition between religion and Science. সত্যই ধর্ম্মবোধ ও বিজ্ঞানের মধ্যে সত্যকার বিরোধ নেই। আজ তাই জুলিয়ান হাক্সলীর মত নিরীশ্বরবাদী বৈজ্ঞানিকও বলছেন "I believe that there exists a scale or hierarchy of values ranging from simple physical comforts upto the highest satisfactiou of love, aesthetic enjoyment, intellect, creative achievment, virtue. I a do not believe these are absolte or transcendental in the esnse of being vonch safed by some external power or divinity, they are the product of human nature interacting with the outer world:" জুলিয়ান হাক্সলী তাই বল্লেন—My final belief is in lifi," আইনস্টাইনও এই কথাই বল্লেন—বিশ্বাস করি আমি—inner harmonyকে—জগৎজীবনের এই ছন্দকে। আজ যদি আমরা বলি যে বিশ্ব প্রকৃতির ছন্দ আর মানুষের জীবনের ছন্দ একই সূত্রে গ্রথিত তা হলেই কি সেটা কাব্য হয়ে গেল—ঋতস্য তন্তু বিততঃ পবিত্র—রহস্যের আধার আর রহস্যের প্রকাশ দুইই মূলতঃ এক—পূর্ণত্বই তার পরিচয়। চৈনিক তাও (Tao) এই কথাই বলেন। একদিকে আমার আমি আর একদিকে তোমার তুমি এই মিলিয়েই চলছে বিশ্বলীলা—একদিকে সেই মানুষী তনুমাশ্রিতম—আর একদিকে ঘোররাবা মহাতামসী প্রকৃতি, তারই মধ্যে ভাংচে গড়চে সৃষ্টির প্রবাহ, গড়ে উঠছে ঘটনার পুঞ্জ আর থেকে যাচ্চে নিত্যচক্রের আবর্ত্তনে সৃষ্টিশীল বীজে অমর একটি সত্তা, আইনস্টাইনের কথায়" "the creative and imperishable individualily—the personalily." তাই আজ সমালোচকরা কঠোর কণ্ঠে বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক তার পথ ভ্রষ্ট হচ্চেন, তাঁরা বিজ্ঞানকে নিয়ে যাচ্চেন কল্পনার রাজ্যে, প্রায় Intuitionএর কাছাকাছি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের বদলে সর্ব্বং খল্বিদং 'mathematical symbol'এ। তাদের কাছে শুধু এই কথাই নিবেদন করবার আছে যে বাস্তব অতিমাত্র বাস্তবভাবেই relative এই কথাটাই তাঁরা ভুলে যাচ্চেন। খণ্ড সত্য খণ্ড চেতনায় বিধৃত। অনুভূতির এবং পরীক্ষার নানা দিক আছে, নানা dimension আছে। আইনস্টাইনের চতুর্মাত্রিক কল্পনা নিউটনের ত্রিমাত্রিকের বাইরে সীমার মাঝে অসীমকে দাঁড় করিয়ে দিলে অঙ্কের মাপ জোঁকে। মিনকাউস্কির জগত প্রমাণ করলে যা কিছু ঘটছে তা ঘটছে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে, শক্তি নির্ভর করে পদার্থের ভর ও আলোর বেগের উপর, বস্তুর মাপ বা দুইটি কালান্তর নিত্যবস্তু নয়, এই আকাশ সমাকার নয় বক্রাকার। আর সবচেয়ে বড় কথা যা আইনস্টাইন বললেন যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের অধীন্। যেদিন এই কথা ঘোষিত হোল সেইদিনই বিজ্ঞানী কবি সাধক দার্শনিক সবাই দ্রষ্টাস্রষ্টার আসন নিয়ে বললেন আমরা দেখছি সেই অঘটনঘটন পটিয়সীকে নানা দিক থেকে—কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ত বিরুদ্ধ নয়। একে যে নামই দিই না কেন যে ছন্দ, যে নিয়ম, যে সৌষম্য, যে সামঞ্জস্য, যে সমঞ্জসা রতি এই বিশ্বের বিধান তাকেই আমরা ভারতবর্ষে বলেছি—সুং বা সুং বা সুং বা সুং তিনিই তিনি, বলেছি তুমিই বিশ্বস্য নিধানং এবং যেখানেই এই ছন্দ আছে সেইখানেই আছেন শান্ত, শিব, মঙ্গল, ময়োভব ময়স্কর—সর্ব্বদিকে সর্ব্বরূপে সর্ব্বচিত্তে মূলতঃ এই harmony আছে বলেই তাকে আমরা নামকরণ করেছি সর্ব্বতোভদ্র। সেই দক্ষিণের দাক্ষিণ্য নিয়মানুগ হয়ে রক্ষা করছে এই বিশ্বের নীতিকে রীতিকে আর সম্প্রীতিকে—তাই আমরা বারে বারে বলি—হে রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহিনিত্যাম—যন্ন ভদ্র তন্নাসুব, হে আবি তুমি বিশ্বছন্দ হয়ে প্রকাশিত হও। এই তো বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি। এই যে ছন্দ, এই যে সৌষম্য, এই যে নিয়ম এর ভিতরে যে বিশ্বজন্তা শক্তি কাজ

করছে সে শক্তি সচেতন না অচেতন এই নিয়েই ত মূল বিরোধ, এই নিয়েইত প্রশ্ন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে মনে হয় নাকি যে এই প্রশ্নের সমাধান বর্ত্তমান জ্ঞান দিয়ে অসম্ভব। ফসেট, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, আলেক্সিস ক্যারল সবাই বলছেন—Ultimate reality cannot be calculated—অপরিমেয় অবাঙ্মনসগোচর। সব চেয়ে অনাধ্যাত্মবাদী হ্যালেডেনও বলেন "প্রকৃতির পিছনে কিছু নেই এটা ধ্রুব সত্য কিন্তু আমাদের যা জ্ঞান তাতে করে প্রকৃতির পূর্ণ স্বরূপকে জানা যায় না—তার স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের গণ্ডীর চেয়ে ঢের বেশী।" এই যে আবরণ একে অপাবৃণু করার সাধনাই সব সাধনার ইতিহাস—সে বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটারীতেই হোক্ আর সাধকের অন্তরতম অনুভূতিতেই হোক। কবির কাব্য, দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী সবই সেই কল্যাণতম রূপের পরিচয় উন্মোচনের জন্য—সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। আলোর যেমন শেষ নেই, বিশ্বেরও তেমনি সীমা নেই, অনুভূতিরও অন্ত নেই। এই অসীম সত্যের শেষ পরিচয় কোথায় কেউ বলতে পারে না—সেইখানেই বিজ্ঞান দর্শন, সাধনা সকলের শেষ কথা অসীমের তীর্থে মিশেছে—সেই মহাসাগরেরই কূলে আমরা উপলখণ্ড খুঁজে বেড়াচ্ছি। রবীন্দ্রনাথেরই ভাষা সামান্য একটু অদল বদল করে বলা যায়

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার বীক্ষণে
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সঙ্গমতীর্থ পাবো আমি সেইক্ষণে
যুক্তির সঙ্গীতে
ইঙ্গিতে বুঝিব মনে, নাই নাই বস্তুর বন্ধন
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ প্রাণের স্পন্দন
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন
ছন্দেতালে ভুলিব আপনা
বিশ্বপদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্তভাবনা।

উদাসিনী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হয়ত এখনি হবে—বিদায়ের শেষ কথাটুকু
চোখের আড়াল হলে মুহূর্তে ভুলিয়া যাবে তুমি,
যেমন পথের দেখা মুছে যায় পথের ওপারে,
পরিচয় ক্ষণিকের ডুবে যায় কল কোলাহলে ;
কিছুই পড়ে না মনে, ভাসা ভাসা মেঘের মতন
উদাসী হাওয়ার ভরে' উড়ে যায় মেঘের কিনারে।

অথচ এ দেখা নয় একটি দিনের
একটি রাতের বুকে ক্ষণস্থায়ী কাকজ্যোৎস্না সম।
এ দেখার শেষ নাই, মিষ্ট হাসি আদর মাখান,
অল্প কথা মাজাঘষা অপ্রগল্ভ শোভন সুন্দর,
চোখে মুখে পরিতৃপ্তি, আকর্ষণ অনন্ত কালের
প্রভাতে সন্ধ্যায় তার ঘটে দৃশ্যান্তর
নিত্যই নূতন ছবি, পটভূমি সম্পূর্ণ নূতন।

একই পথে চলেছিনু আমরা দু'জনে
কেহ কারে জানেনাক ;
দুর্ণিবার একই আকর্ষণ
চিরজীবনের সঙ্গী—রূপ তার ছিল কল্পনায়
মনের বিচিত্র রঙে এঁকেছিনু অপরূপ ছবি
বহিরঙ্গে তারি তরে আমাদের ছিল অন্বেষণ।

হঠাৎ হয়েছে মনে এরই তরে কামনা আমার
আমার কল্পনা দিয়ে গড়েছিনু এই তনুদেহ
অন্তরঙ্গে রূপে রসে গন্ধে এরই করেছি সন্ধান।
কল্পনা ভেঙেছে মোর যত তার আসিয়াছি কাছে
দেহস্পর্শে সর্বদেহে আমার সে কী মর্মযাতনা
মানস প্রতিমা মোর ভেঙে গেছে নিষ্ঠুর আঘাতে।

তার পর তুমি এলে দীর্ঘ পথ আমারি সন্ধানে
আমিও যে এতকাল তোমারেই করেছি প্রার্থনা ;
আমার এ দু' নয়নে স্থির দৃষ্টি দু'টি আঁখি তারা
নিমেষে মেলিয়ে দিলে অসন্দিগ্ধ আত্মসমর্পণে।
তোমার আমার পথ শেষ হল সফল যাত্রায়
তোমার আমার ছবি মিলাইল অপরূপ রূপে।
যত কিছু আকিঞ্চন যত কিছু কামনা বাসনা
দুটি দেহে অসহিষ্ণু যত ছিল প্রমত্ত আবেগ
সব কিছু লুপ্ত হল সে এক আশ্চর্য শিহরণে ;
তোমারে পেলাম আমি
তুমি পেলে আমারে তোমার।

সে স্মৃতির মোহ নাই
সে মিলন বিচ্ছেদবিহীন
অনাদৃত সঙ্গীদের যাত্রাপথে দিয়েছি বিদায় ;
সে স্মৃতির ভগ্ন-অবশেষে
নির্বাসিত করিয়াছি দ্বিচারিণী মোহিনী মায়ারে।
আজি তাই আসন্ন সন্ধ্যায়
উদাসিনী মানসীরে ভয়বাসি মনে
বিদায়ের বাঁশী বাজে অন্তরে বাহিরে
সে সুরে মূর্ছনা নাই ; অন্তরা আভোগ
বহু দূর ভেসে ভেসে উদাসী উন্মনা
নিস্তব্ধ হইয়া যাবে রাত্রির আঁধারে।
তাই ভাবি বিদায়ের শেষ কথাটুকু
হয়ত হারায়ে যাবে বিস্মৃতির মাঝে
তুমি আমি হয়ত আবার
বিচ্ছিন্ন মেঘের মত অনন্ত আকাশে
কখন মিলায়ে যাব কেহ জানিবে না।

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

ঐতিহাসিক ১৯৫৫—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের আয়োজন আরম্ভ হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে আণবিক বোমার আঘাতে জাপানের দুই লক্ষ নরনারী মুহূর্ত্তের মধ্যে ভবপারে গিয়াছিল, সেই আণবিক বোমা হাতে করিয়া সমরকামীরা আন্তর্জ্জাতিক আসরে অবতীর্ণ হন। দিকে দিকে সামরিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতে থাকে; স্থাপিত হয় অসংখ্য সামরিক ঘাঁটী। ১৯৪৯ সালে অতলান্তিক সামরিক চুক্তি সংস্থা গঠিত হয়; পনরটি রাষ্ট্র এই সংস্থায় যোগ দিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে এই সংস্থার ১৬৫টি সামরিক বিমান ঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আটটি রাষ্ট্র লইয়া একটি সামরিক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্য প্রাচ্যে সামরিক সংস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বাগদাদ চুক্তিতে। অন্য পক্ষে পূর্ব্ব ইউরোপে কমুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিও সামরিক উদ্দেশ্যে দল বাঁধিতেছে। এবার এই যুদ্ধায়োজনের বৈশিষ্ট্য এই যে, শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইবার প্রস্তুতি অপেক্ষা আণবিক অস্ত্রের দ্বারা তড়িৎগতিতে শত্রুর সামরিক শক্তি বিনষ্ট করিবার উদ্যোগই বেশী। এই, আণবিক অস্ত্রের বিধ্বংসী ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি এবং দিকে দিকে বিমান আক্রমণের ঘাঁটী স্থাপনের প্রতি মনোযোগ অধিকতর। স্বভাবতঃ, আণবিক অস্ত্রসম্ভার উভয়পক্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অস্ত্রের ধ্বংস-শক্তিও বাড়িয়াছে বহু গুণ। এটম্ বোমার পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া যুদ্ধায়োজন এখন হাইড্রোজেন বোমার পর্য্যায়ে পৌছিয়াছে। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা হাইড্রোজেন্ বোমার ধ্বংসশক্তি নাকি পঁচিশ হাজার গুণ বেশী; এক একটি বোমায় নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন ও মস্কোর মত সহর অনায়াসে নিশ্চিহ্ন হইতে পারে। বোমা বিস্ফোরণের ফলে কত দূরবর্ত্তী অঞ্চল পর্য্যন্ত বায়ু ও জল দূষিত হইবে, সে সম্পর্ক বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। ১৯৫৪ সালে মার্চ্চ মাসে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার হাইড্রোজেন্ বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে সাত হাজার বর্গমাইল অঞ্চল মারাত্মকভাবে সংক্রামিত হইয়াছিল। ইহার অর্থ—ঐ বোমা লোকালয়ে পতিত হইলে প্রত্যক্ষ আঘাতে যাহাদের ভবলীলা সাঙ্গ হইত, তাহারা ছাড়া সাত হাজার বর্গমাইল অঞ্চলের মানুষ দূষিত জলবায়ু সেবন করিয়া এবং বিষদুষ্ট মাছ-মাংস খাইয়া মরিত। ভূপৃষ্ঠ জীবশূন্য করিবার এই অভিনব আয়ুধ এখন দুই পক্ষেই নির্ম্মিত হইতেছে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকা—উভয়েই এই সম্পর্কে প্রাধান্য দাবী করিতেছে।

আগ্নেয়গিরির মুখে—

শত্রুপক্ষের দেশকে শ্মশান করিবার এই অস্ত্র দুই পক্ষের হাতেই যখন রহিয়াছে, তখন উহা যুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না বলিয়া অনেক সরল বিশ্বাসী লোকের ধারণা। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের রণনীতিতে তড়িৎগতি আক্রমণের দ্বারা শত্রুর সামরিক শক্তি পঙ্গু করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে; ভবিষ্যৎ যুদ্ধে সেই উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা নিশ্চিত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র শত্রুর সামরিক ঘাঁটীগুলি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে হাইড্রোজেন্ বোমা ব্যবহারের প্রলোভন যুদ্ধকামীরা ত্যাগ করিবে, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। বস্তুতঃ, যুদ্ধের আয়োজনের দ্বারা ক্ষমতাপ্রিয় রাজনীতিকরা সমগ্র মানবসমাজকে এক বিশাল আগ্নেয়গিরির মুখে লইয়া গিয়াছেন। মাটিতে দাঁড়াইয়া মানুষ বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের সাধনা করে, যেখানে মাতা-ভগিনী-জায়াকে লইয়া শান্তির নীড় বাঁধে, সেই মাটির নীচে ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি ধূমায়িত হইতেছে। সাধারণ মানুষ এই ভীষণ বিপদের কথা জানে না; উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের দ্বারা তাহাদিগকে অজ্ঞ রাখা হয়। কিন্তু মানবপ্রেমী বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন যে, যাহারা জানে বেশী, অশান্তি তাদেরই বেশী। তিনি এবং অন্য বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মানবসমাজকে এই ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাইয়াছেন।

১৯৫৫ সালের প্রারম্ভে—

১৯৫৫ সালের প্রারম্ভে মানবসমাজ এই আত্মঘাতী মহাসমরের সম্মুখীন হইয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ফরমোসাকে কেন্দ্র করিয়া আণবিক ধ্বংসকাণ্ডের রণভেরী তখন প্রায় বাজিয়া উঠিয়াছিল। ফরমোসা চীনেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। চীনের প্রতিক্রিয়াহীন চিয়াংকাই-শেক চক্র স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া এই ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছেন, এবং আমেরিকার অনুগ্রহে সেখানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিকেছেন। শুধু তাহাই নহে, চীনের জনগণের গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বজনীন কূটনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করেন নাই; নূতন ও প্রকৃত চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার পায় নাই,—আমেরিকার জিদে ফরমোসার চিয়াং চক্রই সেখানে চীনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। গত বৎসর প্রথম দিকে ফরমোসা হইতে চীনের দক্ষিণ উপকূলে চিয়াং চক্রের উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এবং চীনা গভর্ণমেণ্ট তখন চীনেরই অঙ্গ এই দ্বৈপায়ন অঞ্চলকে সামরিক আক্রমণের দ্বারা মুক্ত করিতে প্রস্তুত হন। আমেরিকা হইতে হুমকী আসে যে, ফরমোসার গায়ে হাত দিলে চীনের আর রক্ষা নাই,—আমেরিকা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, এবং আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করিবে। আইসেনহাওয়ার গভর্ণমেণ্ট ফরমোসার সহিত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন, এবং চীনের বিরুদ্ধে মার্কিণ সৈন্য নিয়োগের

অধিকারও গ্রহণ করেন। কিন্তু বিশ্বের শান্তিকামী জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। পাশ্চাত্য শিবিরের মধ্যেও মতদ্বৈধ দেখা দেয়। ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাঙ্ককে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া আমরিক সংস্থার বৈঠকে স্যার এন্থনি ইডেন্ জানান যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আমেরিকার সমস্ত দায়িত্বের অংশ লইতে বৃটেন প্রস্তুত নয়। ফ্রান্স ও কমনওয়েল্থের রাষ্ট্রগুলি স্যার এন্থনি ইডেনকে সমর্থন করে। অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় যে, ফরমোসার পক্ষ লইয়া চীনের সহিত তথা সমগ্র কম্যুনিষ্ট জগতের সহিত লড়িতে হইলে আমেরিকাকে একাকী লড়িতে হইবে। আমেরিকার জনসাধারণ যে এই যুদ্ধ সমর্থন করিবে না, তাহা পূর্ব্বেই বোঝা গিয়াছিল; কোরিয়ায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের নামে যুদ্ধ চলে, এবং ষোলটি রাষ্ট্র সে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল; তবুও যুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব আমেরিকার স্কন্ধে পতিত হওয়ায় মার্কিণ জনমত অত্যন্ত রুষ্ট হয়। কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অতএব, ফরমোসার জন্য শুধু আমেরিকার যুবকরা মরিতে আরম্ভ করিলে মার্কিণ জনমত যে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইবে, তাহা নিশ্চিত। আইসেনহাওয়ার গভর্ণমেণ্ট চিয়াং চক্রের জন্য বড় বেশী আগাইয়া গিয়াছিলেন; এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহারা ফরমোসা প্রণালীতে যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে চেষ্টা করিতে থাকেন। শেষ পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ বিরতির কোনও চুক্তি হয় নাই; তবে, অবস্থাটা তখন সাময়িকভাবে চাপা পড়ে। উকূলবর্ত্তী কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ হইতে চিয়াংকাইশেকের সৈন্য সরাইয়া আনা হয়; চীনের উপকূলে চিয়াং চক্রের অতর্কিত আক্রমণ বন্ধ করা হয়।

বান্দুং সম্মেলন—

তাহার পর, এপ্রিল মাসে বান্দুং সম্মেলন। এশিয়া ও আফ্রিকার ত্রিশটি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল। উপনিবেশিকতার বিরোধিতা, সহ-অবস্থিতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিঘোষিত উদ্দেশ্য লইয়া ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংএ এই সম্মেলন আহূত হয়। কম্যুনিষ্ট চীন হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্যাসিস্ত থাইল্যাণ্ড ও প্রতিক্রিয়াপন্থী পাকিস্থান এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল। সুতরাং, এখানে গৃহীত প্রস্তাবগুলি ভাসাভাসা মামুলি ধরণের হইতে বাধ্য। কিন্তু সম্মেলনের প্রকৃত সাফল্য গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে নহে; এখানে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় বহু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইয়াছে, অনেকগুলি রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে প্রাচ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার সুকৌশলী প্রচার চলিতেছিল বহু পূর্ব্ব হইতে। এই আতঙ্ককে ভিত্তি করিয়া প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিকে সামরিক উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ করাই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য। এইভাবে ক্রমে, কম্যুনিষ্ট জগতের সহিত পাশ্চাত্যের যে বিরোধ, তাহাতে প্রাচ্যের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলিকে পাশ্চাত্যের সমরায়োজনের মধ্যে টানিয়া আনা যাইবে, এই আশা পোষণ করা হয়। দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (সিয়াটো) এই আশাতেই গঠন করা হইয়াছিল। বান্দুং সম্মেলনে ঠিক এই আয়োজনেরই বিরোধিতা করা হইয়াছে। এই সম্মেলনে চৈনিক প্রতিনিধি চৌ-এন্-লাই তাঁহার দেশ সম্বন্ধে আতঙ্কের ও ভুল ধারণার অবসান ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রবাসী চীনাদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে তিনি এখানে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন; ফরমোসা সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য তিনি আমেরিকার সহিত প্রত্যক্ষভাবে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তীব্র কম্যুনিষ্ট বিরোধী রাষ্ট্রনায়কদিগকে তিনি চীনে যাইয়া সেখানকার প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া আসিতে অনুরোধ জানান। বান্দুং-এ কম্যুনিষ্ট চীনের শান্তিকামী উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন হওয়ায় প্রাচ্যে কম্যুনিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক দল গড়িবার নৈতিক ভিত্তি অনেকখানি শিথিল হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (সিয়াটো) অতঃপর আর প্রসার লাভ করিবে কিনা, সন্দেহ। অবশ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, ফরমোসা ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মত আমেরিকার আশ্রিত রাজ্যগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে ইহার নৈতিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে না, এই চুক্তি সংস্থার প্রতি প্রাচ্যের জনসাধারণের সমর্থনও তাহাতে সূচিত হইবে না। বান্দুং-এ যোগদানকারী পাকিস্থান এবং মধ্য প্রাচ্যের ইরাক, ইরাণ ও তুরস্ক বাগ্দাদ্ চুক্তির মধ্য দিয়া অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) সহিত যুক্ত হইতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই; কারণ চীন সম্বন্ধে আতঙ্ক ইহাদিগকে পাশ্চাত্যের অনুগামী করে নাই,—করিয়াছে প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের চক্রান্ত। পক্ষান্তরে মিশর, সীরিয়া, সৌদী আরব, আফগনিস্থান প্রভৃতি রাষ্ট্র যে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিতেছে, এবং ভারত, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি নিরপেক্ষ প্রাচ্য রাষ্ট্রগুলির অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতেছে, ইহা বান্দুং সম্মেলনেরই পরোক্ষ ফল।

জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ—

পশ্চিম জার্ম্মানীকে অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করিবার আয়োজন পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল। গত বৎসরের প্রথম দিকে তথাকথিত প্যারিস চুক্তি অনুমোদিত হওয়ায় এই আয়োজন সফল হইয়াছে। ইহার অনুমোদন বন্ধ করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল; স্বাধীন নির্ব্বাচনের দ্বারা বিভক্ত জার্ম্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রস্তাবও সে করিয়াছিল। এই সময় সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া অষ্ট্রিয়ার সমস্যার সমাধান করে; অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে—এই আশ্বাসে তাহার সহিত রাষ্ট্র-চুক্তি সম্পাদিত হইয়া যায়। অষ্ট্রিয়া সংক্রান্ত নীতির দ্বারা জার্ম্মান জনসাধারণকে সোভিয়েট ইউনিয়ন বুঝাইতে চাহে যে, নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বিভক্ত জার্ম্মানী অনায়াসে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে; পক্ষান্তরে পশ্চিম জার্ম্মানী পাশ্চাত্যের সামরিক জোটে যোগ দিলে ঐক্যের পথে অলঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি হইবে। এই সময় যুগোশ্লেভিয়ার সহিত পুরাতন বিরোধের মীমাংসা করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহার শান্তিকামী মনোভাব প্রতিপন্ন করে। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কেও সে এক উদার প্রস্তাব উত্থাপন করে।

পশ্চিম জার্ম্মানী অতলান্তিক চুক্তি সংস্থায় (ন্যাটোর) অন্তর্ভুক্ত

হইবার পর সোভিয়েট ইউনিয়ন জার্ম্মানী সম্পর্কে এখন নূতন নীতি অবলম্বন করিয়াছে। পশ্চিম-জার্ম্মানীর সহিত সে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে এবং পূর্ব্ব-জার্ম্মানীর উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব শিথিল করিয়াছে। সে এখন স্পষ্টই বলিতেছে যে, সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম-জার্ম্মানীর সহিত পূর্ব্ব-জার্ম্মানীকে জুড়িয়া দিয়া তাহার প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থাকে সে বিপন্ন করিবে না ; জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ জার্ম্মান্ জাতির হাতে ; সুতরাং দুই অঞ্চলের গভর্ণমেণ্টের আপোষ আলোচনার দ্বারা সে ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হউক।

রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনের গুরুত্ব

ইউরোপের শান্তিকামী জনগণ বহু পূর্ব্ব হইতে দাবী করিতেছিল যে, ইউরোপীয় সমস্যাগুলির মীমাংসার জন্য এবং অস্ত্রসজ্জার নিয়ন্ত্রণের জন্য চারিটি রাষ্ট্রপ্রধানের সরাসরি আলোচনা হউক। জনগণের এই দাবী অনুসারে গত বৎসর জুলাই মাসে আইসেন-হাওয়ার, ইডেন্, ফার ও বুলগানিন জেনেভায় মিলিত হইয়াছিলেন। জার্ম্মান্ সমস্যা ও ইউরোপের নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ এবং কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট জগতের পারস্পরিক যোগাযোগের প্রসঙ্গ তাঁহাদের আলোচ্য ছিল। এই সকল বাস্তব বিষয়ের কোনও মীমাংসা জেনেভায় হয় নাই ; এইগুলি আনুপূর্ব্বিক আলোচনার ভার পরবর্ত্তী পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের উপর দেওয়া হয়। তবে, রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনে এই সত্য স্বীকৃত হয় যে, বর্ত্তমান হাইড্রোজেন্ বোমার যুগে যুদ্ধের দ্বারা কোনও সমস্যার মীমাংসা হইবে না—সমগ্র মানব-সমাজের ধ্বংসই শুধু অনিবার্য্য হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তি কামনা যে ঐকান্তিক, ইহা প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার স্বীকার করেন ; ব্যক্তিগতভাবে আইসেনহাওয়ারের উদারতা সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের মনে রেখাপাত করে। যুদ্ধের দ্বারা কোনও সমস্যার মীমাংসা হইবে না—এই বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি এবং দুই পক্ষের শান্তির কামনাকে ঐকান্তিক বলিয়া মানিয়া লওয়া, ইহাই জেনেভায় রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনের একমাত্র সাফল্য। ইহার গুরুত্ব অবশ্য কোনক্রমেই কম নহে ; কারণ যুদ্ধায়োজনের নৈতিক ভিত্তি ইহাতে ধ্বসিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের দ্বারা যদি সমস্যার সমাধান না হয় এবং দুই পক্ষ যদি ঐকান্তিকভাবেই শান্তিই চায়, তাহা হইলে জগৎ জুড়িয়া রণদুন্দুভিতে যষ্টির আঘাত আর কেন? বিশ্বাসের প্রাহা চমকাইয়া হাইড্রোজেন্ বোমার বিস্ফোরণই বা কেন? রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনে স্বীকৃত হইয়াছিল যে, যুদ্ধের পথ নয় ; কিন্তু কোন্ পথে যে বিবদমান দুই পক্ষের আপোষ সম্ভব, তাহা তখনও স্থির হয় নাই। অক্টোবর মাসে পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলনে কোনও পথের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। তবে, আশার কথা এই যে, এই সম্মেলনের আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলেও তিক্ততার সহিত ইহার অবসান ঘটে নাই।

নূতন অধ্যায়—

ইতিমধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন এক নূতন "রণক্ষেত্রে" প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইতে উদ্যোগী হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের আশ্রয়পুষ্ট ইস্রাইলের সহিত আরব রাষ্ট্রগুলি যে বিরোধ, তাহার সুযোগে সে এই অঞ্চলে কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সম্প্রতি মিশরকে চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হইয়াছে এবং তাহার পরই মিশরকে ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রকে সোভিয়েট ইউনিয়ন অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে চাহিয়াছে। সোভিয়েট-বিরোধী বাগদাদ্ চুক্তিতে ইরাণের যোগদানের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানাইয়াছে ; আবার তাহাকে অর্থনৈতিক সাহায্য দানের আগ্রহও প্রকাশ করিয়াছে। এদিকে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও আফগানিস্তানকে উদারভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে সোভিয়েট রুশিয়া। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গোয়া ও কাশ্মীরের প্রতি ভারতের দাবী, পাখতুনস্তানের জন্য আফগানিস্তানের দাবী, ম্যাকাও সম্পর্কে চীনের দাবী এবং ওলন্দাজ নিউগিনি সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার দাবী সে সমর্থন করিয়াছে। বস্তুতঃ, সোভিয়েট রুশিয়া এখন প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদ-শোষিত দেশগুলির উন্নয়নমূলক কার্য্যে সাহায্য দানে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতেছে এবং সে প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছে যে, এই সব জাতির রাজনৈতিক দাবীর সে ঐকান্তিক সমর্থক। লণ্ডন 'টাইমস্' সোভিয়েট ইউনিয়নের এই নূতন প্রচেষ্টাকে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে "নূতন অধ্যায়" আখ্যা দিয়াছেন। টাইমস্ লিখিয়াছেন, "Here is the "new phase" in world affairs. It is the phase opened by the sab of communist arms of Egypt end, still more clearly, by Russian courting of the neutral Asian states and the offers of economic and technical and to India and Burmah."—14. 12. 55.

১৯৫৫ সালের প্রথমে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধমান সমাজকে আণবিক বিপর্য্যয়ের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বৎসরের মধ্যভাগ হইতে এই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। যুদ্ধের আয়োজন এখনও বন্ধ হয় নাই ; বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও নিকটবর্ত্তী হয় নাই। তবে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রের তিক্ততা অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছে ; যুদ্ধের দ্বারা প্রকৃত সমাধান অসম্ভব স্বীকৃত হওয়ায় যুদ্ধায়োজনের নৈতিক ভিত্তি ধ্বসিয়া গিয়াছে। তাহার পর, সোভিয়েট রুশিয়া প্রতিপক্ষকে এক নূতন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতেছে ; আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সে "নূতন অধ্যায়ের" সূচনা করিতেছে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সোভিয়েট ইউনিয়নের এই নূতন "চ্যালঞ্জ" উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। রাজনৈতিক সর্ত্ত আরোপ না করিয়া এবং সামরিক উদ্দেশ্য বর্জ্জন করিয়া অনুন্নত দেশগুলিকে স্বদলে টানিতে তাঁহারাও সচেষ্ট হইবেন। সমাজতন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে যে আদর্শগত বিরোধ, উহা এখন বিধ্বংসী অস্ত্র শানাইবার পথ ত্যাগ করিয়া শান্তির পথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এই নব পর্য্যায়ে নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্ব-রাজনীতিতে ১৯৫৫ সালের গুরুত্ব ঐতিহাসিক।

কে সে ?

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মানুষের হৃদ্দেশে ভগবানের মন্দির। তাই আস্তিক্য বুদ্ধি সহজাত। জ্ঞানও মানুষের সহজ উপাধি—যার বলে সে প্রভুত্ব করে জগৎসাংসারে। বুদ্ধির বিকাশে মানুষ বিস্মিত হয় শক্তিমানের শক্তির প্রাচূর্য্যে। আজ বিজ্ঞান বহু অজানা শক্তিকে মানব মনীষার জ্ঞানগম্য করেছে। সূক্ষ্ম-পরমাণু ইলেকট্রনের চক্র-নৃত্যে নর পরিচয় পেয়েছে সূক্ষ্মতম শক্তির। আবার বিশাল হতে বিশাল তারকা ও নীহারিকা-বিশ্বের আভাসের বিস্ময়ে মানুষের জ্ঞান-তৃষা হয়েছে প্রবল ও তীক্ষ্ণ—আরও জানবার উৎসাহে। কে সে ? ভাবে সবাই নরনারী যার শক্তি অসীম অনন্ত। সকল শক্তি যে এক-কেন্দ্র একথা আজ স্বীকার করে সকল জড়-বাদী ও চৈতন্য-বাদী, যখনই প্রশ্ন ওঠে শক্তির মূল-উৎস-মুখের।

অজ্ঞ শিশু হতে মহা-পণ্ডিত সবাই অনুভব করে সূর্য্যের তাপ, যা ঝলসে দেয় নগ্নদেহ। বায়ুর বেগ উড়িয়ে নিয়ে যায় কত ঘরবাড়ী, গাছ-পালা। প্রতি সঙ্ঘের নেতা দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা—যার সিদ্ধান্তের শুদ্ধতা বা বিকারে আজ সারাবিশ্বের মানব-সমাজ যেতে পারে রসাতলে। নিজের সংসারে পিতা পরম বলবান শিশু-পুত্রের বিচারে। এ সব অনুভূতি উৎসাহিত করে বুদ্ধি-প্রবল-জীব মানবকে শক্তি-কেন্দ্রের সন্ধানে। এদের শক্তি আসে কোথা হতে ? সঙ্ঘ-নেতার শক্তির মূল কোথায় ? সূর্য্য ও বায়ুর প্রতাপও প্রচণ্ড। নদীর বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় দরিদ্রের কষ্টে-গড়া ঘর-বাড়ি, যত্নে রোপা গাছ-পালা। এ সব কার শক্তি ? সকল শক্তির এক নিয়ামক আছে—এ ধারণা মনে জাগে—কিন্তু অবিসম্বাদী সিদ্ধান্তে পৌছেনা উপলব্ধি। সে শক্তি জড় না চেতন ? অভিব্যক্তির মূলে আছে কি প্রকাশের সংকল্প ? জগতটা কি এক খাপছাড়া আকস্মিক শক্তির সংযোগ ?

শক্তিমানের শক্তি-বেদীতে সবাই শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। আজ মানুষ প্রচার করে—জনে জনে বিভেদ নাই ; কিন্তু দল-পতির প্রতাপ পুরাতন দিনের ভূপতির হতে কিছু কম নয়। শক্তির মূল কোথায় সে সমস্যার সমাধানে মানুষ চিরদিন আত্ম-নিয়োগ করেছে। তাই আদিম নর খণ্ড-বিভূতির কেন্দ্রকে শক্তিমান ভেবে বহু দেবতার পূজা করেছে।

শক্তির প্রচণ্ড উগ্রতা যেমন শিশু বা অপরিণতবুদ্ধিকে প্রভাবান্বিত করে, তেমনি স্নিগ্ধ মধুর চেতনায় উল্লসিত হয় জীব, শক্তির প্রাণারাম বিকাশে। জননীর স্বার্থ-হীন কোমল স্নেহ, পুষ্পের পেলব মাধুরী ও মন-মজানো সুবাস, চন্দ্রের সুললিত জ্যোতি মানুষকে বিমোহিত করে। এদের স্ফুরণে মানুষ মুগ্ধ হয়। বিচার আরম্ভ হয় সুখের অনুভূতির সাথে সাথে। কে সে ? এত উত্তাপ যার সেই কি বিভূ ? ফুল ফোটে শুকিয়ে যায়, আবার ফোটে কুসুম ফুলের গাছে—যেমন মানুষের প্রতাপ ধ্বংশ হয় তার দেহের অবসানে, তার বংশের সন্তান থাকে। এরা প্রকৃত শক্তি নয়—কোনো শক্তির লীলামাত্র। কী সে প্রাণ-শক্তি ?

মানুষ প্রবল শক্তিমানকে স্রষ্টা ভাবে। যে সূর্য্য-তেজের স্রষ্টাকে ভেবেছে সূর্য্য-দেবতা। তাই নর-জাতি রবিকে পূজা করেছে—ভগবান ভেবে, আদিযুগে। গ্রহ, তারা, চন্দ্র, নদ, নদী, সাগর, পর্ব্বত দেবতার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছে। তারা কেহ কোমল কেহ উগ্র। চন্দ্রমা, বালারুণ, সন্ধ্যার সূর্য্য ও অমানিশা রাতের গগন-ভরা তারকা-রাশি মুগ্ধ-ভাবের পোষক মানবচিত্তে। কবিতার জন্মভূমি, এরা প্রেমের দেবতা।

ক্রমে মানুষের পর্য্যবেক্ষণ সেই ভূমিতে পৌছে দেয় মনকে, যেথায় সে দেখে এরা সবাই এক অখণ্ড তেজের বিন্দু-মাত্র তেজ-মাত্রা। বহু-দেবতার পূজা পর্য্যবসিত হয় এক ঈশ্বরের ধারণায়।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা এ অজ্ঞ সংশয় মেনে নিয়েই যেন

অর্জ্জুনের মত জ্ঞানীকে একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ অর্জ্জুনের বিষাদের একটা কারণ ছিল—খণ্ডভাবে জগত দেখে, তার ধ্বংশের ছায়ায় আপনার চিত্তে উৎপীড়ক ঘন মেঘের ছায়ার অনুভূতি।

এ শিক্ষার বহুল প্রচার উপেক্ষণীয় নয়। আজিও বহু সম্প্রদায় ও মানব-গোষ্ঠী বিশ্ব-নিয়ন্তার পূর্ণ পরিচয় হতে বঞ্চিত। এ দেশেও খণ্ড-বিভূতির আধার ইষ্ট-দেবতাকে প্রধান মেনে মানুষ দ্বন্দ্বমোহে পড়েছে। এ দুরবস্থা গৌতমকে ব্যথিত করেছিল। তিনি দেব-দেবী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অবলুপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন নিজের প্রচারে। বহুক্ষেত্রে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা শোনা যায় অদ্যাবধি। হিন্দু মুসলমানের বিরোধের তো কথাই নাই।

মহাভারতের যুগে নিশ্চয়ই এমন সব সংস্কার সমাজকে করত খণ্ডিত। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ অখণ্ড ব্রহ্ম-তেজের ইঙ্গিত মাত্র। তাদের কারও ভিতর হতে পূর্ণ-তেজ প্রবাহিত হয় না। দেবতা দ্যোতন-শক্তি। সেই এক পরব্রহ্মের দ্যোতক। শাস্ত্র দেব-দেবীর পূজার বিধান করেছিল সসীম মনের সমাধির জন্য। খণ্ড-বিভূতিতে মন-সংযোগের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা বাড়াবার সংকল্পে। রবির প্রখরতায় শ্রীভগবানের বিশ্ব-ব্যাপী তেজের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই সূর্য্য দেবতা—ভগবানের দ্যোতক—দাহিকা, পোষক ও জ্যোতির্ময় বিভূতির।

ভক্তিহীন হতে খণ্ড-বিভূতির ভক্ত ভালো, কারণ সে সন্ধানী। আর্য্যশাস্ত্রের উদার সহনশীলতা এ দেশের বুদ্ধিকে নিশ্চয়াত্মিকা করেছে। গীতার শিক্ষা এ বিষয়ে প্রত্যেক নরকে করে আশাপথের যাত্রী। জনার্দন ভাবগ্রাহী! বুদ্ধির প্রখরতার অভাবে কেহ যদি শক্তির ছায়াকে পূর্ণ ব্রহ্মর তেজ ভেবে পূজা করে, তার সে পূজা ব্যর্থ হয় না। ভগবান সে শ্রদ্ধা গ্রহণ করেন। যে তাঁকে যেমন ভাবের চেতনায় পূজা করে, তিনি তাকে সেই ভাবে পোষণ করেন। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভজে তৈছে। সেই ভজনই ভক্তকে উচ্চ পথের সন্ধান দেয়। পত্রপুষ্পের উপহার ঊর্দ্ধপথের সন্ধানে অর্ঘ্য নিবেদন। আত্ম-নিবেদন সেই পথেরই উচ্চ-ভূমি। প্রয়োজন ভক্তি-চঞ্চল প্রাণ। প্রয়োজন নিষ্ঠা, আগ্রহ, বিশ্বাস, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—ব্যাকুলতা। সংশয় মানবের শত্রু এ পথে। সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়। অব্যবস্থিতচিত্ত মহতী বিনষ্টির পথে নিয়ে যায় সত্যানুসন্ধানী যাত্রীকে। ব্যাকুলতায় দর্শন পাওয়া যায় হৃদি-সন্নিবিষ্ট ভগবানের।

তাই গীতায় বিশ্ব-রূপ দর্শনের পূর্ব্বে আমরা শুনি বিভূতি বর্ণনা। তাই বুঝি একেশ্বরবাদের প্রধান পথ-চিত্র—সমস্ত বিশ্বের ধারণাকে মেনে নেওয়া। সে ধারণা মায়া—কিন্তু তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সত্য ধারণা হয় না সাধনা বিনা। খণ্ডের প্রতি ভক্তি ভ্রান্ত হলেও সে ভক্তি পরা-ভক্তির অনুশীলন,অঙ্গের মাধ্যমে মহা-লাভের সোপান।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে অন্য দেবতার পূজা করে, তারাও অজ্ঞানে আমাকেই পূজা করে। আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। তারা আমার প্রকৃত বিশেষত্ব জানেনা, তাই তাদের আবার প্রত্যাবর্ত্তন করতে হয়।*

একইজন্মে চিরনরক বা চিরস্বর্গের ব্যবস্থা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মে নাই। ভারতের কৃষ্টির এই বিশেষত্ব জানবার বিষয় যে অনন্ত, অসীম। মানব-মনের শক্তি কতটুকু? এ জগতে জীবের আয়ু অল্প, পিছন-টান অসংখ্য। সুতরাং ধীরে ধীরে বিকশিত হয় বুদ্ধি। খুলে যায় জ্ঞানের আবরণ, এক জন্মে নয়, কত জন্মে।

ভগবানের পূর্ণ বিভূতির উপলব্ধিই সম্যক জ্ঞান জাগাতে পারে মনের পটে। তখন তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়—যিনি চিরানন্দময়, বচন যাঁর সন্ধান পায় না, বাক্য যাঁর বর্ণনা দিতে পারে না। তাঁর আনন্দের আভাস পূর্ণ করে চিত্ত। সেই পথেই পৌছান যায় সেই অভিষ্ট ধামে, যেথা পৌছিলে, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দীনতাপূর্ণ সংসারে পুনরাবর্ত্তনের কবল হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। তখন উপলব্ধি হয় সম্যক জ্ঞান—কে সে ধ্যানের ঠাকুর।

মনুষ্য চরিত্র বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কতকগুলি ভাবের প্রতি স্বতঃই চিত্তের টান থাকে সংস্কার বশে। একদিকে এ প্রবৃত্তি আস্তিক্য বুদ্ধিরই ক্ষীণ আভাষ, এই সব সু-প্রবৃত্তি চেতনাকে ধীরে ধীরে পৌছে দেয় ভাবের উৎ-মুখে। পিতার প্রতি শ্রদ্ধা শিশু চিত্তের সহজ সংস্কার। পিতৃ চরিত্রে সে দেখে শক্তি এবং তার সঙ্গে স্নেহ। সর্ব্বশক্তিমান প্রগাঢ় স্নেহশীল পরমপুরুষের বিভূতির ছায়া দেখে শিশু সংস্কারে। শক্তি ও স্নেহের ধারণা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হ'লে মনে জাগে ভগবানের ধারণা। কারণ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারকা, বেগবান দুকুল ভাঙ্গা নদীর তেজের দৃশ্যে শিশু মানবের মনে বিরাট শক্তির ধারণা জন্মে। সকল সুষ্ঠুভাব সুমহান জ্যোতিতে উদ্দীপিত করতে পারে মন। এরা সোপান মানসিক বিকাশের।

* যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকম্।৯।২৩
অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে। ৯।২৪

মাতৃ-স্নেহ এক অপূর্ব্ব ভাব। সকল জীবকে অভিভূত করে এ ভাব। জগতে নিষ্ঠুরতার অসুর সদাই উদগ্রীব মানবের প্রবৃত্তিকে নির্দ্দয়তার পথে নিয়ে যেতে। সে অসুরকে বধ করতে পারে মাত্র মাতৃ-শক্তি। নিষ্ঠুরতার কদর্য্য মূর্ত্তি সদাই পরাহত প্রেমের অগাধ মাধুরীতে। প্রেমের উদাত্ত বিকাশ মাতৃ-স্নেহ। সকল ভাবকে সোনালী রঙে রাঙালে, এই সংসার বালু-বেলার প্রত্যেক বালু-কণা স্বর্গের বিরজা-বেলার স্বর্ণ রেণুতে পরিণত হতে পারে। জগত সৌন্দর্য্যে-ভরা অথচ এর সৌন্দর্য্য কুৎসিত আবরণের অন্তরালে। ভগবানের বিভূতি স্মরণ করে তাঁর শ্রীচরণ পূজায় প্রাণ-মন শুদ্ধ করলে বোঝা যায়, অরূপের রূপের লীলায় ভুবন ভরপুর।

মানুষের সহজ ভাবগুলিই আত্ম-দর্শনের সোপান। সত্যেরই সর্ব্বদা জয় হয়—মিথ্যার নয়। দেবযান পথ সত্যের দ্বারা সুগম। আত্মতৃপ্ত ঋষিরা এই সত্যের পথেই পরব্রহ্ম লাভ করেন*। সে পথে সমস্যা সমাধান হয়, কে সে ? সন্দেহের তো সে পথ নয়। সম্যক দৃষ্টির দ্বারা সম্যক জ্ঞানের প্রচেষ্টায় চিত্ত সংযোগের ফলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তেমন দৃষ্টি ও জ্ঞানের কথা আলোচনা করেছেন গীতা উপনিষদের সার। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে তার উপলব্ধি নিজের সাধনা সাপেক্ষ।

এই আত্মাকে বলহীন ব্যক্তি লাভ করতে পারে না অনবধানতা বা প্রমত্ত তপস্যার দ্বারা তিনি লভ্য নন। এই পূর্ণতার উপলব্ধির জন্য বল অর্জন হয় দৃঢ় ভক্তি, সংযত কর্ম এবং স্বচ্ছ জ্ঞানের দ্বারা। একান্ত চিত্ত হওয়া আবশ্যক। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অশেষ প্রকারে, অথচ বাস্তবকে স্বীকার ক'রে, বহু শক্তির উল্লেখে সীমার মাঝে অসীমের পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মদ্রোহিতার স্থান নাই প্রবল এক ভক্তির পথে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা অবগত হই তেজ বিশিষ্ট ভাবে। সেই জ্ঞানের সংশ্লেষণে পরিচয় পাই অসীম তেজের অধিকারীর। তখন মন ধায় আধ্যাত্মিক বিস্তার মার্গে। আমাদের জ্ঞান-পিপাসা মেটাবার জন্য ভগবান বলেছেন—আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। তা হতেও উচ্চ ধারণা যার সে তাঁকে আরও স্পষ্ট বোঝে যখন মন নিবিষ্ট হয় সত্যে—আমিই বেদ্য এবং পবিত্র। আমিই ওঁকার এবং ঋক্, সাম, যজুর্বেদ স্বরূপ।†

বেদের পবিত্রতা, ওঁকারের নিগূঢ় সঙ্কেত তাঁকে জানিয়ে না দিলে, মানুষের পক্ষে বেদাধ্যয়ন বা তপস্যার সার্থকতা কোথায় ? বেদের মন্ত্রশক্তি এবং ওঙ্কারের গভীরতায় ঈশ্বর প্রণিধান অবশ্য সম্ভব। তখন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় আত্মজ্ঞানের উজ্জ্বলতায়—কে সে ?

তাঁর পূর্ণতা, ব্যাপকতা বা প্রকাশ, দৈনন্দিন সুদ্ধকর্ম-প্রসূত ভাবের মাঝে উপলব্ধি করা সম্ভবপর। সংসারের মাঝে তাঁর উপাধি ক্ষীণাদপি ক্ষীণ ছায়া। সে ছায়ার অনুসরণ কর্মে, জ্ঞানে ও ভক্তিতে দৃঢ় করে নিজের সত্তার বিশাল অনুভূতি—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

শ্রীকৃষ্ণ এই সর্ব্বময়তার উপলব্ধিকে সুদৃঢ় করবার মানসে বলেছেন বহু কথা গীতায় নানা প্রসঙ্গে। তাদের সংশ্লেষণে বোঝা যায়, কে সে। তিনি বলেছেন—আমিই গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, দ্রষ্টা, নিবাস, রক্ষক ও সুহৃদ। আমিই প্রভব, প্রলয়, আমিই স্থিতির ভূমি, প্রলয়ের ভূমি, আমিই অবিনাশী বীজ। উত্তাপ আসে আমা হতে, আমিই জলকে বাষ্পরূপে আকর্ষণ করি, আবার বরষার বারিরূপে বর্ষণ করি। আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু। আমি চিরবিদ্যমান চিরপরিবর্ত্তনের মাঝে।*

বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হলে, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা সত্য পথের সন্ধান দেবে অনুধাবনের ফলে। তত্ত্বটুকু অবশিষ্ট থাকবে, নামরূপ লোপ পাবে। এই পরিদৃশ্যমান জগত, শত বিভেদের ভিতর দিয়ে এক অন্তিম অবিচ্ছিন্নতার প্রকাশ। পরিবর্ত্তনের অন্তরে বিদ্যমান শাশ্বত একতা। দিব্যজ্ঞান সেই নিরবচ্ছিন্ন তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলে, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের ভিতর দিয়ে।

যখন হৃদি পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, তখনই উপলব্ধি হবে কে সে। কারণ তিনি বর্ণনার অতীত। বিভূতি বর্ণনার প্রারম্ভে তিনি স্বয়ং বলেছেন—দেবগণ আমার প্রভাব জানেন না, মহর্ষিগণও অবগত নন কারণ আমি সর্ব্বতোভাবে মহর্ষি ও দেবগণের আদি।†

যতদিন ভিন্নব্যক্তিত্ব থাকবে এমন কি মহর্ষিরূপেও, ততদিন তো সম্যক জ্ঞান হবে না। যে জানে, যাঁকে জানা যায়—এক হলেই প্রকৃত জ্ঞান।

---

* সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্‌।
মুণ্ডক্য—৩।১।৩

† পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ। ৯।১৭

* গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌
তপাম্যহমহম্‌ বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসদাহমর্জ্জুন ৯।১০

† ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।১০।২

তদন্ত

শীলা গঙ্গোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

পর্দা উঠতে দেখা গেল, দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে যে যেমন অবস্থায় ছিলেন, ঠিক তাই রয়েছেন। আনন্দ দরজার কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো।

আনন্দ। (গুহকে) ইন্সপেক্টর, আপনি তা হ'লে সবই জানেন!

গুহ। হ্যাঁ। আমরা সকলেই জানি।

সুবালা। (আর্ত্তস্বরে) আনন্দ, আমি একটুও বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল আছে—এ হতেই পারে না। তুমি জান না আমরা এখুনি এ বিষয়ে কি বলছিলাম!

শীলা। ভাগ্যে আনন্দ সে সব কথা শোনে নি!

আনন্দ। কেন?

শীলা। মা বলছিলেন যে, যে-ছেলেটা মেয়েটিকে এই বিপদে ফেলেছিল তার কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার। সকলের সামনে তাকে নিজের মুখে দোষ স্বীকার করতে বাধ্য করা দরকার—

আনন্দ। মা, তুমি বিষয়টাকে আমার পক্ষে আরো শক্ত করে তুলেছ—

সুবালা। কিন্তু আনন্দ, আমি জানতাম না—স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আর সে ছেলেটির সঙ্গে ত তোমার কোন মিল নেই—সে একটা অসংযত, মাতাল—

শীলা। আনন্দও মদ খায়, মা—তুমি জানো। আমিই বলেছি।

আনন্দ। তুই মাকে বলেছিস্! এ আমি কখনো ভাবতে পারি নি—

শীলা। আমাকে ভুল বুঝিস্ না, আনন্দ। তুই ত জানিস্ আমি অনেক দিন আগেই বলতে পারতাম কিন্তু বলি নি। আজ আমাকে বলতেই হলো, কেন না দেখতে পাচ্ছিলাম যে সব প্রকাশ হ'য়ে পড়ছে। তাই মনে হলো আগে থেকে জানিয়ে রাখা ভাল—আঘাত তাতে কম লাগবে।

ব্যানার্জ্জী। আনন্দ, তোমাকে যে আমি কি বলবো তা ভেবে পাচ্ছি না। আমার সব আশা, সব ভরসা আজ শেষ হয়ে গেল। আমার ছেলে হয়ে তুমি কি এই শিক্ষাই পেলে? ছিঃ ছিঃ—আমার ছেলে মাতাল, লম্পট—এ লজ্জা আমি কেমন করে ঢাকবো?

গুহ। এক মিনিট মিঃ ব্যানার্জ্জী। আমি চলে যাবার পর আপনাদের সাংসারিক সমস্যা মেটাবার অনেক সময় পাবেন, কিন্তু এখন আপনার ছেলের কি বলবার আছে সেটাই আমি আগে শুনতে চাই। আপনারা যদি আর বাধা না দেন ত বাধিত হবো। (আনন্দকে) বলুন, আপনার কি বলবার আছে। মেয়েটির সঙ্গে কবে আপনার দেখা হয়?

আনন্দ। গত মার্চ্চ মাসে।

গুহ। কোথায়?

আনন্দ। একটা মাসাজ ক্লিনিকে—

সুবালা। আনন্দ, এ সব আমি কি শুনছি?

ব্যানার্জ্জী। শীলা, তোমার মাকে নিয়ে ভেতরে যাও।

শীলা। কিন্তু আমি সবটা শুনতে চাই—

ব্যানার্জ্জী। (চেঁচিয়ে) বারবার অবাধ্যতা কোর না, যা বলছি তার প্রতিবাদ শুনতে চাই না। (মিসেস ব্যানার্জ্জীকে নরম সুরে) সুবালা, এ তোমার না শোনাই ভাল। চলো, ভেতরে চলো।

এগিয়ে এসে মিসেস ব্যানার্জ্জীকে হাত ধরে তুললেন, তিনি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে আনন্দের দিকে চেয়েছিলেন, মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁকে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। শীলাও পেছনে গেল।

গুহ। মাসাজ ক্লিনিকে তার আগে কতবার গেছেন?

আনন্দ। সেই রাত্রেই প্রথম। এক বন্ধুর বাড়ীতে মজলিস বসে ছিল। সকলেরই একটু মাত্রাধিক্য হয়ে

গিয়েছিল। তারই মধ্যে একজন মাসাজ ক্লিনিকে যাবার কথা তোলাতে আমরা সকলেই রাজী হয়েছিলাম।

গুহ। তারপর ?

আনন্দ। সেখানে যখন গিয়ে পৌছাই, তখন তাদের বন্ধ হবার সময় হয়ে গিয়েছে। এক বন্ধুর সঙ্গে জানাশোনা ছিল বলে ম্যানেজার আমাদের খানিকক্ষণ বসতে দিয়েছিল। মেয়েরা ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। আমাদেরই একজন প্রস্তাব করলো যে আমরা প্রত্যেকে তাদের এক একজনকে বাড়ী পৌছে দোব। এ মেয়েটির ভার আমার ওপর পড়েছিল।

গুহ। কিন্তু মাসাজ ক্লিনিকে সে কেন গিয়েছিল জানতে পেরেছিলেন ?

আনন্দ। হ্যাঁ, পথে কথায় কথায় জানতে পেরেছিলাম যে মাসাজ ক্লিনিক তার কাছেও সেইদিনই প্রথম এবং সেখানে সে যা দেখেছিল তাতে আবার সেখানে যাওয়ার প্রবৃত্তি তার ছিল না। নিদারুণ অর্থাভাবে পড়ে পেটের দায়ে সেদিন যেতে বাধ্য হয়েছিল।

গুহ। তারপর ?

আনন্দ। তাকে পৌছে দিতে গিয়ে দেখলাম, বস্তির মধ্যে ছোট একটা খোলার ঘরে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকতে হয়। তাই আসবার আগে আমার কাছে যে কটা টাকা ছিল তার হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে এসেছিলাম।

গুহ। আবার তার সঙ্গে কবে দেখা হয়েছিল ?

আনন্দ। দিন তিন চার পরে। সেদিন বিকালে কিছু করবার ছিল না—তা ছাড়া দেখা হবার পর তার কথা অনেকবার ভেবেছিলাম। তাই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এরপর অবশ্য বহুবারই সেখানে গিয়েছি।

গুহ। তার অতীত সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিলেন ?

আনন্দ। হ্যাঁ, জেনেছিলাম যে সে খানিকটা লেখাপড়া শিখেছিল। বাবা মা যাওয়াতে পাকিস্থান থেকে কলকাতায় আসে। কলকাতায় তার জানাশোনা কেউ ছিল না। কয়েকবার চাকরী পেয়েছিল কিন্তু চাকরী থাকে নি।

গুহ। সে জেলে গিয়েছিল জানতেন ?

আনন্দ। হ্যাঁ, আমার কাছে সে কিছুই লুকোয় নি। কেন জেলে গিয়েছিল তাও বলেছিল। এটাই তার কাছে সবচেয়ে বড়ো দুঃখের ব্যাপার ছিল। যাকে সে মনে প্রাণে ভালবেসেছিল সেই যে বিনাদোষে মিথ্যা প্রমাণ দাঁড় করিয়ে তাকে জেলে পাঠাতে পারে তা সে কখনো কল্পনা করে নি।

গুহ। মিঃ ব্যানার্জ্জী, আপনি তার কাছে বারবার কেন যেতেন ?

আনন্দ। ইন্সপেক্টর, আমার বয়স হয়েছে, আমার দিকটা ও ভেবে দেখুন। মেয়েদের পূরোপুরি জানবার কৌতূহল হওয়া আমার পক্ষে বিচিত্র নয়। কিন্তু যে সহজ পন্থায় তাদের জানা যায় আমার তাতে ভয় ছিল, বিতৃষ্ণা ছিল। তাই—

গুহ। তাই একটা অসহায় মেয়েকে নিয়ে আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করলেন ?

আনন্দ। আমার দোষ আমি স্বীকার করছি, কিন্তু তার রূপ-যৌবনের মোহ আমাকে পাগল করে তুলেছিল। দিনের পর দিন একটা প্রচণ্ড আকর্ষণে তার কাছে ছুটে গিয়েছি। তারপর একদিন আর নিজেকে সংযত করতে পারলাম না—তার কোন বাধা আপত্তি গ্রাহ্য করলাম না। সে নিজেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু— (মুখ ঢাকলো)—

গুহ। (একটু চুপ করে থেকে) তারপর ?

আনন্দ। (মুখ তুলে) তারপর কিন্তু আর কোনদিন সে বাধা দেয় নি। এর কিছুদিন পরে জানতে পারলাম যে তাকে ঘোরতর বিপদে ফেলেছি। প্রথমে সন্দেহ ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইল না।

গুহ। নিশ্চয়ই এইজন্যে সে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল ?

আনন্দ। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় আমরা দুজনেই দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম।

গুহ। আপনাকে সে বিয়ে করতে বলে নি ?

আনন্দ। না, বরং আমি যখন বিয়ের কথা তুলেছিলাম তাতে কিছুতেই রাজী হয় নি।

গুহ। কেন ?

আনন্দ। বলেছিল, দায়ে পড়ে বিয়ে করলে আমি

সারাজীবন তাকে বোঝা বলে মনে করবো, কথনো সুখ পাবো না। বলেছিল, সে আমাকে ভালবাসে না, কথনো বাসতেও পারবে না, কেন না সে আর একজনকে ভালবাসে। তা ছাড়া—

গুহ। তা ছাড়া কি ?

আনন্দ। তা ছাড়া বলেছিল যে এই বিপদের জন্যে দোষ আমার নয়, দোষ তার ভাগ্যের। কোন দায়িত্বই সে আমাকে দিতে চায় নি।

মিঃ ব্যানার্জ্জী ঘরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। আনন্দ তাঁকে দেখতে পেল না

গুহ। তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত আপনি কি ব্যবস্থা করেছিলেন ?

আনন্দ। তার কোন চাকরী ছিল না, পাবার সম্ভাবনাও ছিল না। অন্য কোন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা সে আগেও করতে পারে নি, পরেও পারত না। আমি জানতাম যে তার হাতে কিছুই ছিল না, তাই জোর করে তাকে স্বীকার করিয়েছিলাম যে যতটা তার প্রয়োজন সে টাকাটা আমার কাছ থেকে নেবে। কিন্তু মাস কয়েক পরে সেটুকু নিতেও সে আর রাজী হয় নি।

গুহ। সবশুদ্ধ কত টাকা আপনি তাকে দিয়েছিলেন ?

আনন্দ। শ পাঁচেক হবে।

ব্যানার্জ্জী। (এগিয়ে এসে) পাঁচ শ ? অফিস থেকে তুমি যা পাও তা ত আমার জানা আছে! নিজের বাবুয়ানি বজায় রেখে এত টাকা পেলে কোথা থেকে ?

আনন্দ চুপ করে রইল

গুহ। আমারও ঠিক ঐ প্রশ্ন।

আনন্দ। অফিস থেকে নিয়েছিলাম।

ব্যানার্জ্জী। অফিসে মানে ? আমার অফিস ?

আনন্দ। হ্যাঁ।

গুহ। তার মানে আপনি টাকাটা চুরি করেছিলেন ?

আনন্দ। না, ঠিক তা নয়।

ব্যানার্জ্জী। ঠিক তা নয় ? তবে কী ?

আনন্দ চুপ করে রইল। মিসেস ব্যানার্জ্জী ও শীলা ঢুকলেন

শীলা। বাবা, আমার কিন্তু কোন দোষ নেই—

সুবালা। তুমি রাগ কোর না, ভেতরে আমি কিছুতেই থাকতে পারলাম না। কি হচ্ছে আমাকে জানতেই হবে।

ব্যানার্জ্জী। কি হচ্ছে তা হলে শোন। তোমার গুণধর পুত্র স্বীকার করেছে যে মেয়েটার বিপদের জন্যে ওই দায়ী। খালি তাই নয়, অফিস থেকে চুরি করে তাকে টাকা যোগাত!

সুবালা। আনন্দ, সত্যি তুমি টাকা চুরি করেছিলে ?

আনন্দ। না, মা। ঠিক তা নয়। আমি ভেবেছিলাম পরে ফেরত দিয়ে দোব।

ব্যানার্জ্জী। অমন সবাই বলে। ফেরৎ দিতে কি করে ?

আনন্দ। যেমন করেই হোক্। কিন্তু তখন আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল—

ব্যানার্জ্জী। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে সকলের অজ্ঞান্তে তুমি অতগুলো টাকা পেলে কোথা থেকে ?

আনন্দ। কয়েকটা খুচরো বিক্রীর টাকা পাওনা ছিল, চেকে না নিয়ে সেগুলো ক্যাশ নিয়েছিলাম।

ব্যানার্জ্জী। তার মানে রসিদ দিয়ে টাকাটা জমা করো নি ?

আনন্দ চুপ করে রইল

তোমার কি মতিভ্রম হয়েছিল ? জানো না আমাদের কোম্পানি লিমিটেড ? কাল সকালেই সেই সব রসিদের নম্বর আমাকে দেবে, দেখি চেষ্টা করে ব্যাপারটা ঢাকতে পারা যায় কি না। টাকার যদি এতই প্রয়োজন হয়েছিল, আমাকে জানাও নি কেন ?

আনন্দ। বিপদে পড়ে আপনার মত লোকের কাছে সাহায্য চাইতে যাওয়া বোকামি, তাই।

ব্যানার্জ্জী। এত দূর সাহস তোমার যে আমার সম্বন্ধে এমন কথা বলো ? তুমি একেবারে অধঃপাতে গিয়েছ!

গুহ। (বাধা দিয়ে) দেখুন মিঃ ব্যানার্জ্জী, আর আমার সময় নেই। আমি চলে যাবার পর আপনারা কার দোষ কতটা তার বিচার করবার অনেক সময় পাবেন। (আনন্দকে) আমার আর একটা প্রশ্ন করবার আছে। এটাই শেষ। মেয়েটি জানতে পেরেছিল যে আপনি তাকে চোরাই টাকা দিচ্ছেন, নয় কি ?

আনন্দ। হ্যাঁ। সেইটাই সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার। খালি টাকা নিতেই সে আপত্তি করে নি, আমার সঙ্গে আর দেখাশোনা করাতেও তার আপত্তি ছিল। আমি তার কথা না শোনাতে শেষ পর্য্যন্ত সে ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও উঠে গিয়েছিল। তার দেখা আমি আর পাই নি। (একটু থেমে) আচ্ছা ইন্সপেক্টর, আপনি এত কথা জানলেন কি করে? সে কি আপনাকে বলেছিল?

গুহ। না, আমাকে সে কিছুই বলে নি। বেঁচে থাকতে তার সঙ্গে আমার কখনো দেখাও হয় নি।

শীলা। মাকে কিন্তু সে সব কথাই বলেছিল।

সুবালা। শীলা—

শীলা। লুকিয়ে রেখে আর কোন লাভ নেই মা।

আনন্দ। (মিসেস্ ব্যানার্জ্জীকে) তোমাকে বলেছিল? কোথায়? এই বাড়ীতে? না, তা কি করে সম্ভব হবে, বাড়ীর ঠিকানা ত সে জানত না! (মিসেস্ ব্যানার্জ্জী মাথা নেড়ে 'না' বললেন—কিন্তু মুখে কোন উত্তর দিলেন না) মা, চুপ করে থেকো না। বলো, কি হয়েছিল বলো—

গুহ। আমি বলছি। শেষ পর্য্যন্ত অন্য কোন উপায় না দেখে সে নারীত্রাণ সমিতির কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল। সমিতির প্রেসিডেন্ট হিসাবে আপনার মা তাকে কোন সাহায্য দেন নি।

আনন্দ। (উত্তেজিত ভাবে) মা, তুমি তাকে সে অবস্থাতেও সাহায্য করো নি? সে এসেছিল তোমার কাছে আমাকে বাঁচাতে, যাতে আমাকে আর না চুরি করতে হয় সেইজন্যে, আর তুমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ? তুমিই তা হলে তাকে খুন করেছ, শুধু তাকে নয়, সেই সঙ্গে আরো একটা প্রাণকে! দুটো প্রাণীর মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী। মা, এ তুমি কি করলে, এ তুমি কি করলে—(মুখ ঢেকে বসে পড়লো)

সুবালা। (করুণ সুরে) আনন্দ, আনন্দ, আমি জানতাম না। আমি বুঝতে পারি নি।

আনন্দ। (হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। দুই হাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে মিসেস ব্যানার্জ্জীর দিকে এগিয়ে গেলো) তুমি কিছু বুঝতে পার নি? তোমার সারা জীবনে কখনো কিছু বোঝবার চেষ্টা করেছ?

শীলা। (ভীত স্বরে) আনন্দ, আনন্দ—

ব্যানার্জ্জী। (চেঁচিয়ে) তোমার এত দুর স্পর্দ্ধা হয়েছে? সরে দাঁড়াও, শীগ্‌গির সরে দাঁড়াও—(আনন্দের দিকে এগুলেন)

গুহ। (দৃঢ়স্বরে) চুপ করুন। একটু চুপ করে আমার কথাগুলো শুনুন। (সকলে তাঁর দিকে তাকালেন) আমার আর এর চেয়ে বেশী কিছু জানবার নেই, আপনাদেরও নেই। এই মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে, একটা বীভৎস মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু আপনারা প্রত্যেকে এই মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে দায়ী এটা সব সময় মনে রাখবেন, কখনো ভুলবেন না। (একে একে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন) না, আপনারা যে কখনো ভুলতে পারবেন তা মনে হয় না। (মিসেস ব্যানার্জ্জীকে) মিসেস ব্যানার্জ্জী, ভুলে যাবেন না আপনি কি করেছেন। যখন তার সবচেয়ে বেশী সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল তখন তাকে নিষ্ঠুরভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন, অকারণ বিদ্বেষে একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যও তাকে পেতে দেন নি। (আনন্দর দিকে চেয়ে) আর, আপনি মনে রাখবেন—

আনন্দ। এ আমি কখনো ভুলতে পারবো না।

গুহ। মনে রাখবেন যে তার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আপনি আপনার পাশবিক কৌতূহল মিটিয়েছেন। একবার ভেবে দেখেন নি যে সেও মানুষ, তারও হৃদয় ছিল, আত্মা ছিল। না, আপনি সারাজীবনে এটা ভুলতে পারবেন না—। (শীলার দিকে তাকালেন) আর, আপনি—

শীলা। আমাকে কিছু বলতে হবে না, আমি জানি। আমিই তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম।

গুহ। না, আপনি তার যথেষ্ট ক্ষতি করেছিলেন বটে, কিন্তু ধ্বংসের সুরু আপনি করেন নি। সে করেছেন—(প্রায় হিংস্রভাবে মিঃ ব্যানার্জ্জীর দিকে তাকিয়ে) সে করেছেন আপনি। মাত্র দশ টাকা বেশী মাইনে চাওয়ার জন্যে আপনি তাকে দুর করে দিয়েছিলেন! তার জন্যে তাকে কত বড় মূল্য দিতে হলো সেটা ভেবে দেখেছেন? সমস্ত জীবন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করলেও আপনার পাপের বোঝা কমবে না।

ব্যানার্জ্জী। দেখুন ইন্সপেক্টর, যত টাকা লাগে আমি দিতে রাজী আছি। দশহাজার, বিশহাজার—

গুহ। (তিক্ত হেসে) টাকাটা বড় ভুল-সময়ে দিতে চাইছেন মিঃ ব্যানার্জ্জী! এর এক শ ভাগের এক ভাগ দিলেই ইভা দত্ত আজ বেঁচে থাকতো। (যাবার উপক্রম করলেন, নোট বুক ইত্যাদি পকেটে পুরলেন, ছড়ি আর টুপী হাতে নিলেন। তারপর আবার সকলের দিকে তাকালেন) না, আপনারা যে কখনো ভুলতে পারবেন তা মনে হয় না। আপনারাও পারবেন না, আর মিঃ ভট্টাচার্য্যও পারবেন না। যাই হোক্ ইভা দত্ত আর নেই। আপনারা আর তার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না, সব ভাল মন্দর বাইরে সে চলে গেছে।

শীলা। (কাঁদতে কাঁদতে) তার আত্মা যেন আমাদের ক্ষমা করে।

গুহ। আর এই কথাগুলো মনে রাখবেন। এক ইভা দত্ত গেছে, কিন্তু এমন হাজার হাজার ইভা দত্ত এখনো বেঁচে আছে। তাদের জীবন, আশা ও বিশ্বাস, তাদের দুঃখদৈন্য, তাদের সুখশান্তি সমস্তই আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, আমরা কি ভাবি, কি বলি, কি করি তার সঙ্গে। আমরা কেউই কেবল একলা নিজের জীবন নিয়ে বাঁচতে পারি না। একটা প্রকাণ্ড সমষ্টির আমরা ছোট ছোট অংশ মাত্র, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য দায়ী। আর আমি বলে যাচ্ছি, এমন দিন আসছে যে আজ যদি আমাদের শিক্ষা না হয়ে থাকে তা হ'লে আগুন, বন্যা, রক্ত, মৃত্যু ও অশেষ লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে আমাদের সে শিক্ষা লাভ করতে হবে। নমস্কার।

সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সকলেই ভীত, ত্রস্ত, আশ্চর্য্যান্বিত চোখে সেইদিকে চেয়ে রইলেন। শীলা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো, মিসেস ব্যানার্জ্জী অবসন্নভাবে সোফার উপর এলিয়ে পড়লেন, আনন্দ বসে পড়ে মাথার চুল টানতে লাগলো। একমাত্র মিঃ ব্যানার্জ্জী দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেয়ে সম্বিত ফিরে পেলেন, বাইরের দিকের পর্দ্দা সরিয়ে দেখলেন, তারপর ফিরে এসে ডিক্যান্টার থেকে খানিকটা পোর্ট ঢেলে ঢক্‌ঢক্ করে খেলেন।

ব্যানার্জ্জী। (আনন্দকে) তুমিই যত নষ্টের মূল!

আনন্দ। (মুখ তুলে) তা আমি জানি।

ব্যানার্জ্জী। কি সর্ব্বনাশ যে তুমি করেছ, তা বোঝবার ক্ষমতাও তোমার নেই। এই সব ব্যাপার কাগজে বেরুবে, চারিদিকে আমাদের নামে ঢি ঢি পড়ে যাবে। একটা খেতাব পাওয়ার যে আশা ছিল, সেটা শেষ হয়ে গেল!

আনন্দ। (পাগলের মত হেসে) এখনো খেতাবের আশা করে আছ? এরপর খেতাব পাও কি না পাও তাতে কি আসে যায়?

ব্যানার্জ্জী। তোমার কাছে কিছুতেই কিছু আসে যায় না, কিন্তু মনে রেখ—যতদিন প্রতিটি পয়সা ফেরত দিতে না পারছ ততদিন অফিস থেকে আর কিচ্ছু পাবে না। আর আমি দেখতে চাই যে অফিস ছাড়া এক পাও তুমি কোথাও বেরুবে না। তোমার এই সব বেলেল্লাগিরি আর চলবে না।

সুবালা। আনন্দ, তোমার জন্যে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা গেছে।

আনন্দ। তোমাদের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এটাও মনে রেখ তোমাদের জন্যে আমারও কম লজ্জা নেই—, তোমাদের দুজনের জন্যেই।

ব্যানার্জ্জী। চুপ করো। তোমার মা আর আমি যা করেছি তার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল। আমাদের ভাগ্য-দোষে তার ফল অন্যরকম দাঁড়িয়েছে।

শীলা। ভাগ্যদোষ!

ব্যানার্জ্জী। তার মানে তুমি আমার কথা মানছো না। বেশ, তোমার কি বলবার আছে শুনি।

শীলা। আমি যে কোথা থেকে সুরু করবো, তাই ভেবে উঠতে পারছি না।

ব্যানার্জ্জী। তা হলে সুরু করবার দরকারও নেই।

শীলা। বাবা, আমি যা করেছি তার জন্যে নিজের দোষ কাটাতে চাই না, কিন্তু তোমরা এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন কিছুই হয় নি!

ব্যানার্জ্জী। কিছুই হয় নি? লোক জানাজানি হয়ে গেলে আমার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ? কারুর সামনে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না!

শীলা। না, আমি ওকথা বলছি না, ও বিষয়ে মাথা ঘামাবার দরকার আছে তাও মনে করি না। আমি

শুধু বলছি যে এর পরেও তোমাদের শিক্ষা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

ব্যানার্জ্জী। শিক্ষা আমার যথেষ্ট হয়েছে! (পায়চারী করতে লাগলেন) আমার খালি মনে হচ্ছে একটা যুগ কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় যখন সকলে একসঙ্গে এ ঘরে এসে বসেছিলাম, তখন কে জানতো যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে যাবে!

আনন্দ। হ্যাঁ, তুমি সে সময় আমাকে আর যতীনকে বলেছিলে, জীবনে জয়ী হতে হলে শুধু নিজের কথাই ভাবতে হবে, অন্য কারুর কথা ভাবলে চলবে না। পরের জন্যে চিন্তা করে—হয় মহাপুরুষরা, আর নয় ত পাগলরা। এ কথাগুলো তোমার মনে পড়ছে বাবা? কিন্তু ঠিক তার পরে ঐরকমই একজন এ ঘরে এসেছিল। কই, তাকে ত তুমি বলতে পারলে না যে মানুষ জীবনে সম্পূর্ণ একলা, তাই কারুর প্রতি তার কোন দায়িত্ব নেই?

শীলা। (সচকিত ভাবে) ইন্সপেক্টর যখন আসেন, বাবা বুঝি ঐসব কথা বলছিলেন?

আনন্দ। হ্যাঁ। কেন, কি হয়েছে?

সুবালা। কি ব্যাপার শীলা? তুই কি বলতে চাইছিস্?

শীলা। (থেমে থেমে) আশ্চর্য্য! বড় আশ্চর্য্য! সত্যিই কি লোকটা পুলিশ-ইন্সপেক্টর?

সুবালা। (উত্তেজিত ভাবে) তুই কি বলতে চাস বুঝেছি। আমারও সন্দেহ ছিল।

ব্যানার্জ্জী। যদি সে পুলিশ-ইন্সপেক্টর না হয়, তা হলে সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়।

শীলা। না বাবা, কোন তফাৎই হয় না।

ব্যানার্জ্জী। কি বাজে বকছো? নিশ্চয়ই হয়।

শীলা। আমার পক্ষে হয় না এবং তোমাদের পক্ষেও হওয়া উচিত নয়।

সুবালা। কি ছেলেমানুষের মত কথা বলছিস্?

শীলা। (রাগ করে) ছেলেমানুষের মত কথা বলছি আমি? না তোমরা? তোমরা দুজনে কিছুতেই সত্যি কথাটাকে মেনে নিতে পারছো না।

ব্যানার্জ্জী। তোমার মার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার আমি সহ্য করবো না শীলা। আর এবারও যদি ওরকম ভাবে কথা বলো তা হলে তোমাকে এ ঘর থেকে চলে যেতে হবে।

শীলা। বেশ, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। কিন্তু তোমরা কি বুঝতে পারছো না যে—যা আজ রাত্রে প্রকাশ পেলো এ যদি সত্যি হয়, তা হলে কে আমাদের স্বীকারোক্তি শুনে গেল সেটা বড় কথা নয়? আর, এ সবই সত্যি, নয় কি? তুমি তাকে একটা চাকরী থেকে তাড়িয়েছিলে, আমি আর একটা থেকে। মিঃ ভট্টাচার্য্য তাকে পাঠিয়েছিলেন জেলে। আর আনন্দ—আনন্দ যা করেছিল তা তোমরা জান। শেষ পর্য্যন্ত মা তাকে সোজাসুজি ঠেলে দিয়েছেন মৃত্যুর মুখে। এই কথাগুলোই বড়, এর কাছে যে লোকটা এসেছিল সে পুলিশ না অন্য কেউ তার কোনই গুরুত্ব নেই।

আনন্দ। আমাদের পক্ষে সে পুলিশ-ইন্সপেক্টর ঠিকই!

শীলা। আমিও এই কথাই বলতে চাইছি। তবে, প্রথম থেকেই কেন জানি না আমার মনে হচ্ছিল—সাধারণ পুলিশ-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে যেন এর ঠিক মিল নেই!

ব্যানার্জ্জী। আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

সুবালা। লোকটার কথাবার্ত্তা অদ্ভুত ধরণের—

ব্যানার্জ্জী। আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করছিল দেখ নি? কি রকম ধমক দিয়ে দিয়ে থামিয়ে দিচ্ছিল? আমি একজন কাউন্সিলর, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট—এ তার নিশ্চয়ই জানা ছিল! তা ছাড়া যে ধরণের কথাবার্ত্তা লোকটা বলে গেল সাধারণ পুলিশের মুখে ওরকম ত কখনো শুনি নি, কত পুলিশই ত দেখলাম!

শীলা। যদি নাও হয়, এখন তাতে কিছু যায় আসে না।

ব্যানার্জ্জী। নিশ্চয়ই যায় আসে। কেন বুঝতে পারছ না?

আনন্দ। না বাবা, শীলা ঠিকই বলছে। অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন তাতে হয় না।

ব্যানার্জ্জী। কি আশ্চর্য্য আনন্দ, তুমিও ওকথা বলছো? বুঝছো না যদি লোকটা সত্যি পুলিশ না হয়, তা হলে সবচেয়ে বেশী লাভ তোমারই? তুমি তার সামনে স্বীকার করেছ যে টাকা চুরি করেছ, এর জন্যে সে তোমাকে

কোর্টে দাঁড় করাতে পারে। আমার বা তোমার মার কিম্বা শীলার সে বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারবে না, বড়জোর জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের লজ্জায় পড়তে হবে। কিন্তু তুমি? তোমাকে সে একেবারে শেষ করে ফেলতে পারে, তা জান?

শীলা। (থেমে) তোমরা লক্ষ্য করেছ কি না জানি না, কিন্তু তাকে আমরা এমন কথা অল্পই বলেছি যা সে আগে জানত না!

ব্যানার্জ্জী। ওটা কিছুই নয়। আগে থেকে খানিকটা খোঁজ খবর নিয়ে এসেছিল আর কি! তবুও আমরা যদি অত কথা না বলতাম, তা হলে তার পক্ষে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হতো না। (হঠাৎ রাগ করে) সত্যি, জানা নেই শোনা নেই—একটা লোকের সামনে তোমরা সকলে একেবারে হাঁড়ির খবর দিতে সুরু করে দিলে! মাথায় যে সব কি আছে, সেটাই আমার জানতে ইচ্ছা করে।

শীলা। এখন বলা খুব সহজ। তখন কিন্তু সকলের পেটের কথা সে টেনে বার করছিল।

সুবালা। আমার কাছ থেকে সে কিছুই বার করতে পারে নি। আমি সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছি যে যা করেছি আমার কর্ত্তব্য হিসাবেই করেছি।

শীলা। মা!

ব্যানার্জ্জী। আসল কথা যে লোকটা একটা বড় ধাপ্পা দিয়ে গেল, কিন্তু তোমরা কেউ বুঝতে পারলে না।

সুবালা। ধাপ্পা? আমাকে?

ব্যানার্জ্জী। না, না তোমাকে নয়, এই দুটোকে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে লোকটার আমাদের ওপর রাগ আছে, হয়ত একটা কমিউনিষ্ট বা ঐ ধরণের লোক। বাগে পেয়ে আমাদের ওপর মনের ঝাল ঝেড়ে গেল। আর এ দুটো কোন প্রতিবাদ না করে তার ধাপ্পায় পড়ে একেবারে সব খবর দিয়ে বসে রইল!

আনন্দ। তোমাকেও যে বিশেষ প্রতিবাদ করতে শুনেছি, তা ত মনে পড়ছে না!

ব্যানার্জ্জী। প্রতিবাদ করবো কি করে? ততক্ষণে যে অফিস থেকে টাকা সরানর কথাটা তাকে বলে বসে আছ! তারপর আর আমি কি করতে পারি। আমি খালি ভাবছি—গোড়াতেই তাকে আলাদা কোন ঘরে নিয়ে গিয়ে কথাবার্ত্তা বলা উচিত ছিল। বড় বোকামি হয়ে গেছে।

আনন্দ। তাতে কোন লাভ হত না।

শীলা। সে যা করতে এসেছিল, করেই যেত।

সুবালা। তোরা দুজনে এমন সব কথা বলছিস যেন তোরা তারই পক্ষে। তার চেয়ে উনি এ বিষয়ে কি স্থির করেন সেটাই চুপ করে শোন্।

মিঃ ব্যানার্জ্জীর দিকে তাকালেন

ব্যানার্জ্জী। হ্যাঁ, একটা কিছু করা দরকার এবং খুব তাড়াতাড়ি করা দরকার। (চিন্তা করতে লাগলেন) কিন্তু এই রাত্রে—

হঠাৎ সজোরে calling bell বেজে উঠলো। সকলে চমকে উঠে এ ওর মুখের দিকে চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন

আবার কে এল? আমি দেখব না কি?

আনন্দ। আমি দেখছি। (উঠে বাইরে গেল)

সকলে দরজার দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরে যতীন ঘরে ঢুকলো, পিছনে আনন্দ

সুবালা। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে) ওঃ যতীন?

যতীন। এত রাত্রে ফিরে এসে আপনাদের বিরক্ত করছি না ত?

সুবালা। না, না, আমরা ত বসেই ছিলাম।

যতীন। আমার ফিরে আসার একটা কারণ আছে। ইন্সপেক্টর কি চলে গেছেন?

শীলা। এই কয়েক মিনিট আগে গেছেন। আমাদের যা করে গেছেন—

সুবালা। (বাধা দিয়ে) শীলা—

শীলা। ওঁর জানা দরকার, মা।

ব্যানার্জ্জী। কেন? কতগুলো বাজে কথা যতীনকে না শোনালেই নয়?

শীলা। বেশ। (যতীনকে) আমরা সকলেই এ ব্যাপারে আকণ্ঠ ডুবে আছি! তুমি যাবার পর অবস্থা আরো সঙ্গীণ হয়ে উঠল—

যতীন। আচ্ছা, তার ভাবগতিক দেখে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয় নি?

ব্যানার্জ্জী। এই নিয়ে আমাদের এখুনি কথা হচ্ছিল।

সত্য বলতে কি তার ব্যবহার আমাদের সকলেরই যেন কেমন কেমন ঠেকেছে—বেশ একটু সন্দেহজনক।

সুবালা। আমাদের সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করে গেছে যে ভদ্রতার কিছু জানে বলে মনে হয় না।

যতীন। (গম্ভীরভাবে) হুঁ।

সকলে তার দিকে চাইলেন

ব্যানার্জ্জী। (উত্তেজিতভাবে) তুমি কিছু একটা জান কি ?

যতীন। সে লোকটা পুলিশ-অফিসর নয়।

ব্যানার্জ্জী। কে বললে ?

সুবালা। ঠিক বলছো ?

যতীন। আমি ঠিকই বলছি। এই কথা বলতেই আমি ফিরে এলাম।

ব্যানার্জ্জী। কিন্তু তুমি জানলে কি করে ?

যতীন। এখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আমার জানা একজন সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাকে ইন্সপেক্টর গুহর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে বললে—ও নামের বা ও রকম চেহারার কোন ইন্সপেক্টর বালিগঞ্জ থানায় নেই ?

ব্যানার্জ্জী। তুমি এ ব্যাপারের কিছু বলে ফেল নি ত ?

যতীন। না, না। তাকে বলেছিলাম যে এই নিয়ে একজনের সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইন্সপেক্টর গুহ বলে যে এ তল্লাটে কোন পুলিশ অফিসর নেই—সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।

সুবালা। আমি আগেই বলি নি ? ও রকমভাবে যে কথাবার্ত্তা বলে, তার চোদ্দপুরুষ যে পুলিশ নয় তা আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

ব্যানার্জ্জী। তার মানে লোকটা সত্যি একটা ধাপ্পাবাজ।

যতীন। ঠিক বলেছেন। লোকটা আমাদের সকলকে বোকা বানিয়ে গেছে।

ব্যানার্জ্জী। (উঠে) এ সম্বন্ধে একেবারে পাকা খবর জানা দরকার ?

সুবালা। কি করতে চাও তুমি ?

ব্যানার্জ্জী। পুলিশ কমিশনার—মিঃ চ্যাটার্জ্জীকে ফোন করছি—

সুবালা। দেখো, বেফাঁস কিছু আবার বলে ফেল না যেন।

ব্যানার্জ্জী। (ফোনের কাছে গিয়ে) আরে না না, কিচ্ছু ভয় নেই। (ফোন তুলে ডায়াল করতে করতে) এ কাজটা অনেক আগেই করা উচিত ছিল। হ্যালো··· মিঃ চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?···মিঃ চ্যাটার্জ্জী ? আমি অনন্ত ব্যানার্জ্জী বলছি। এত রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি কিছু মনে করবেন না।···না না, কিছুই হয় নি, আমি খালি জানতে চাইছিলাম আপনার Calcutta force-এ ইন্সপেক্টর গুহ বলে কেউ আছেন ?···হ্যাঁ গুহ।···নতুন নয় ত ?···না না আপনি জানবেন না ত জানাবে কে ?··· বছর ৪৫ বয়স, মজবুত চেহারা (এখানে যিনি ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় অভিনয় করবেন তাঁর চেহারার বর্ণনা করতে হবে)।·· বুঝেছি।···না না এতেই হবে···ব্যাপার কিছুই নয়, একজন বন্ধুর সঙ্গে এই নিয়ে বাজি ধরেছে। আচ্ছা··· ধন্যবাদ। আচ্ছা···good night। (ফোন রেখে অন্যদের দিকে ঘুরলেন। সকলে এতক্ষণ উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন) ইন্সপেক্টর গুহ বলে Calcutta police forceএই কেউ নেই, অতএব লোকটা কিছুতেই পুলিশ হতে পারে না। যতীন ঠিকই বলেছে, আমাদের বেশ বোকা বানিয়ে গেছে।

সুবালা। আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ ছিল। না কথায়, না চেহারায় পুলিশ অফিসরের সঙ্গে লোকটার কোথাও মিল ছিল না।

ব্যানার্জ্জী। যাই হোক্ এখন অবস্থাটা অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে, নয় কি ?

যতীন। নিশ্চয়ই—

শীলা। সে পুলিশ না হলেই বুঝি আমরা সব সৎ আর ভদ্র হয়ে যাবো ?

ব্যানার্জ্জী। (বিরক্ত হয়ে) এর চেয়ে বুদ্ধি-বিবেচনার কথা যদি না বলতে পারো, তা হলে তোমার কথা বলবারই দরকার নেই।

আনন্দ। শীলা কিন্তু ঠিকই বলেছে।

ব্যানার্জ্জী। তোমারও যদি এই মত হয়, তা হলে তুমিও চুপ করতে পারো। নিজের মুখে যা স্বীকার করেছ, সত্যিকারের পুলিশ হলে—

সুবালা। (বাধা দিয়ে) শুনছো ? ও সব কথা নাই বা হল।

ব্যানার্জ্জী। (সামলে নিয়ে) ঠিক বলেছ, কিন্তু বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকলে কেউ এমন কথা বলে না।

শীলা। (যতীনকে) দেখেছ? আমাদের বোকামি আর অপরাধগুলো এমন—যে তোমার সামনেও বলা যায়না।

যতীন। তা আমি জানতেও চাই না। (মিঃ ব্যানার্জ্জীকে) তা হলে আপনি ব্যাপারটা কি বুঝছেন? ঠাট্টা না অন্য কিছু?

ব্যানার্জ্জী। ঠিক বুঝতে পারছি না। অকারণে আমাদের এ রকম বিব্রত করার উদ্দেশ্য কি? হয়ত কেউ আমাদের সঙ্গে একটা চালাকি করবার মতলবে ওকে পাঠিয়েছিল, জানই ত শত্রুর অভাব নেই! কিন্তু আমাদের প্রথমেই বোঝা উচিত ছিল। এমনিতে হয়ত ধরে ফেলতে পারতাম কিন্তু এমন হঠাৎ ব্যাপারটা হয়ে গেল যে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

সুবালা। প্রথম থেকে আমি থাকলে এমনটা হতে পারত না। ও কোন প্রশ্ন করবার আগেই আমি কয়েকটা প্রশ্ন করে নিতাম।

শীলা। এখন অমন কথা বলা খুবই সহজ।

সুবালা। শুধু আমার কাছ থেকেই শেষ পর্য্যন্ত কোন কথা বার করতে পারে নি। যাই হোক্ আমার মনে হয় এখন সকলে বসে মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখা উচিত যে—এর জন্যে কিছু করা সম্ভব কি না।

ব্যানার্জ্জী। ঠিক বলেছ সুবালা। আমরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছি, ঠাণ্ডা মাথায় বসে ভাবলেই একটা কিছু উপায় বেরিয়ে যাবে। (বসলেন) আমরা এখন জানতে পেরেছি যে লোকটা একটা ধাপ্পাবাজ, imposter, আমাদের বোকা বানিয়ে গেছে, কিন্তু ব্যাপারটার এখানেই শেষ কি না কে জানে!

আনন্দ পায়চারী করতে লাগলো

যতীন। কি জানি, আমার মনে হচ্ছে এর পেছনে আরো কিছু আছে।

ব্যানার্জ্জী। আমিও তাই ভাবছি। (আনন্দকে) ও রকম ছট্‌ফট্ করছো কেন? একটু শান্ত হয়ে বস না।

আনন্দ। আমি ঠিক আছি।

ব্যানার্জ্জী। তুমি যে কেমন ঠিক আছ খুব বুঝেছি। তোমার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে যেন, যেন—

আনন্দ। যেন?

ব্যানার্জ্জী। যেন এ ব্যাপারে তোমার কোন সম্পর্কই নেই! কিন্তু নিজের অবস্থাটা ভেবে দেখ। যদি কেউ সত্যি জড়িয়ে থাকে সে হচ্ছে তুমি। তোমার ভালর জন্যেই এর একটা সুরাহা হওয়া দরকার।

আনন্দ। আমিও তাতে কোন আপত্তি করি নি!

শীলা। আমিও না, কিন্তু করবার আছেই বা কি!

ব্যানার্জ্জী। তোমাদের দু'জনের যদি মতিস্থির না হয়ে থাকে তা হলে আমাদের ওপরই ছেড়ে দাও না। (একটু ভেবে) নাঃ, লোকটা আমাকেও বেশ ধাক্কা দিয়ে গেছে। যাই হোক্—তার কায়দা যখন আমরা ধরে ফেলতে পেরেছি, তখন এবার আমাদের পালা।

শীলা। আমাদের পালা? কিসের জন্যে?

সুবালা। একটু সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়ার জন্যে। তুই যেন কী শীলা!

আনন্দ। সুবুদ্ধি বা মাথা ঠাণ্ডা করে ভাববার কথা বলে কি হবে? তোমরা এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন কেউ এসে তোমাদের সঙ্গে তামাসা করে গেছে! কোন গুরুত্বই ছিল না। আমি কিন্তু কিছুতেই তা মনে করতে পারছি না। মেয়েটা মারা গেছে এটা ত ঠিক? তাকে কেউ বাঁচিয়ে তোলে নি নিশ্চয়।

শীলা। তোমরা কেউ এটা বুঝতে চাইছ না যে, যা ঘটেছে তা বদলাবার নয়।

আনন্দ। লোকটা সত্যি ইন্সপেক্টর হোক্ বা না হোক্, আমরা যা করেছি তা ত মুছে ফেলবার নয়! সেটা পুলিশের লোক জানলো—কি অন্য কেউ জানলো—তাতে কি এসে যায়? বাবা তুমি বলছো বটে যে তাতে সবচেয়ে লাভ আমারই, কিন্তু এটাও ঠিক নয়। (যতীনকে) যতীন, তোমার জানা নেই, আমি অফিস থেকে টাকা চুরি করে মেয়েটিকে দিয়েছিলাম। (মিঃ ব্যানার্জ্জী বাধা দিতে গেলেন) না, বাবা আমি কোন কথা লুকোতে চাই না। টাকাটাই এখানে বড় কথা নয়। মেয়েটির শেষ পর্য্যন্ত যা পরিণাম দাঁড়িয়েছে, আমরা সকলে মিলে তার কি করেছি, এইগুলোই বড় কথা। তোমরা যাই বলো না কেন, আমি আর অন্য কোন কথা ভাবতে পারছি না।

ব্যানার্জ্জী। নাঃ, তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা বৃথা।

নিজেদের মধ্যে একটা ব্যাপার যদি জানাজানিও হয় তাতে খুব ক্ষতি নেই, কিন্তু সেটাই যদি একেবারে হাটে হাঁড়িভাঙ্গা হয়ে যায় তা হলে আমাদের আর মুখ তুলে দাঁড়ানর অবস্থা থাকবে না। এই তফাতটুকু বোঝা কি এতই শক্ত ?

আনন্দ। (চেঁচিয়ে) কিন্তু মেয়েটা মারা গেছে, আর আমরা সকলে মিলে তাকে মেরেছি এইটাই সত্যি কথা। সেটা তোমার ঘরের কোণেই প্রকাশ হোক্—বা হাটের মাঝখানেই হোক্, কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

ব্যানার্জ্জী। (আরো চেঁচিয়ে) হাজার বার আছে। চেঁচাতে যদি চাও তা হলে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে চেঁচাও। (একটু থেমে নীচু গলায়) অন্য বাপ হলে তোমার কীর্ত্তির জন্য এতক্ষণে লাথি মেরে তোমাকে বাড়ী থেকে বার করে দিত। আমি তাই সহ্য করছি। মুখ বুজে যদি না থাকতে পারো এখানে তোমার থাকবার কোন দরকার নেই।

আনন্দ। (আস্তে) বেশ, আমি যাচ্ছি—(বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলো)

ব্যানার্জ্জী। (আবার চেঁচিয়ে) যতক্ষণ না যে টাকা তুমি নিয়েছ তার পাই পয়সার হিসাব দিচ্ছ, ততক্ষণ তোমাকে এখানে থাকতে হবে।

শীলা। তাতে ইভা দত্ত কি প্রাণ ফিরে পাবে ?

আনন্দ। না আমরা সকলে মিলে তাকে খুন করেছি সে কথাটা বদলে যাবে !

যতীন। তোমাদের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সকলে মিলে খুন করেছ মানে ?

আনন্দ। ঠিক যা বল্লাম তাই। পুরো কাহিনীটা শোন নি তাই বুঝতে পারছ না।

শীলা। (যতীনকে) কাহিনীর বিশেষত্ব কিছু নেই, প্রায় তোমারই মত। এবার তুমিও হয়ত বলবে যে মেয়েটাকে জেলে পাঠাও নি !

যতীন। আমার দোষ ত আমি স্বীকার করেছি শীলা।

শীলা। তা করেছ বটে, কিন্তু সেটা যে একটা গুরুতর অপরাধ তা ভাবছ না। আর বাবা মা ত এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন তাঁরা কিছুই করেন নি! লোকটা আসল পুলিশ কি নকল পুলিশ—তার সঙ্গে আমরা যা করেছি তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে !

যতীন। কিন্তু লোকটা যে সত্যিই পুলিশ-ইন্সপেক্টর নয়।

শীলা। না হোক্, আমাদের তদন্ত সে পুরোপুরিই করে গেছে। প্রমাণ করে গেছে যে আমরা সকলে মিলে মেয়েটিকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছি।

যতীন। তুমি কেন বুঝছ না শীলা ? লোকটা যেমন নকল তেমনি একটা মিথ্যা ব্যাপারকে বেশ সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রেখে গেছে।

শীলা। তার মানে ?

যতীন। সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে মনে করে দেখ। অজানা লোক এসে নিজেকে পুলিশ-ইন্সপেক্টর বলে পরিচয় দিলে, আর বেশ কায়দা করে একটা কাহিনী আমাদের সামনে দাঁড় করালে।

শীলা। কাহিনী বলছো কেন ? কিন্তু পুলিশ যদি না হয়, এত খবর সে জানলো কোথা থেকে ?

যতীন। এদিক ওদিক থেকে খানিকটা খোঁজখবর যোগাড় করে আনা এতই শক্ত না কি! তবে বাহাদুরী আছে স্বীকার করতেই হবে। এমন সময়ে আর এমন ভাবে সে ব্যাপারটাকে প্রকাশ করল যে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে এই মেয়েটার জীবনের সঙ্গে আমরা সকলেই খানিকটা জড়িয়ে আছি।

আনন্দ। আছিই ত। সেটা ত আর মিথ্যা নয় !

যতীন। কিন্তু প্রমাণ কি যে, সে কেবল একটি মেয়ের সম্বন্ধেই বলছিল ?

সুবালা। } তার মানে ?
ব্যানার্জ্জী। } তুমি কি বলতে চাইছ, যতীন ?

আনন্দ। আমরা সকলেই ত তা স্বীকার করেছি।

যতীন। করেছি। কিন্তু সেটা যে একটা মেয়েকে নিয়ে তার কি প্রমাণ আছে ?

সকলে না বুঝে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন

দেখুন মিঃ ব্যানার্জ্জী। আপনি দু বছর আগে ইভা দত্ত বলে একটা মেয়েকে বরখাস্ত করেছিলেন। তার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন, লোকটা একটা ফটো দেখাতে মনে পড়ে গেল, নয় কি ?

ব্যানার্জ্জী। হ্যাঁ, এ পর্য্যন্ত বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু তারপর ?

যতীন। তারপর, লোকটা জানতো যে শীলা

Milwards-এ একটা sales woman-এর নামে রিপোর্ট করেছিল। ব্যস্, শীলাকে বললো যে সেই মেয়েটাই ইভা দত্ত। একটা ফটোও দেখালে যাতে শীলা চিনতে পারে।

শীলা। বাবাকে যেটা দেখায় সেইটাই আমাকেও দেখিয়েছিল।

যতীন। তা তুমি জানলে কি করে? মিঃ ব্যানার্জ্জী যখন দেখছিলেন তখন তুমি দেখেছিলে?

শীলা। না, তা অবশ্য দেখি নি।

যতীন। আর তুমি যখন দেখছিলে তখন মিঃ ব্যানার্জ্জী দেখেছিলেন?

ব্যানার্জ্জী। না ত। শীলাকে আলাদা করে আলোর কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল।

যতীন। তা হলে? সে যে দুজনকে দুটো আলাদা ফটো দেখায় নি, তার কোন প্রমাণ আছে? এবার আমার বেলায় কি হল মনে করে দেখুন। আমি কোন ফটো দেখি নি। ইভা দত্ত তার নাম বদলে রত্না সেন নাম নিয়েছে শুনেই আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে ইভা দত্তই রত্না সেন, কেন না রত্না সেন বলে একটি মেয়েকে আমি জানতাম।

ব্যানার্জ্জী। অথচ ইভা দত্তই যে রত্না সেন তার কোন প্রমাণ নেই। লোকটা নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিল। এটাও যে মিথ্যা নয় তা বিশ্বাস হয় না।

যতীন। না, মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বরং যে ভাবে সে একজনের পর আর একজনকে জেরা করছিল তাতে মনে হয় সমস্ত গল্পটাই সে আগে থেকে তৈরী করে এনেছিল। যাই হোক্, আমি যাবার পর আর কি হয়েছিল?

সুবালা। আনন্দ হঠাৎ বাইরে যাওয়াতে আমার মনটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল—এমন সময় লোকটা বললে যে আনন্দ যদি ফিরে না আসে তাকে ধরে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে। বুঝছই ত, ও রকম কথাবার্ত্তা একটা পুলিশ-অফিসরের মুখে শুনে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। নিজেকে সামলাবার আগেই সে বললে যে আমি ইভা দত্তকে এক সপ্তাহ আগে দেখেছি। আমিও স্বীকার করে ফেললাম।

ব্যানার্জ্জী। কিন্তু তুমি স্বীকার করলে কেন? তোমাদের কাছে মেয়েটা যখন দেখা করতে এসেছিল, তখন ত নিজের পরিচয় ইভা দত্ত বলে দেয় নি।

সুবালা। না, তা দেয় নি? কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে হঠাৎ এ প্রশ্নটা করাতে আমি একেবারে হকচকিয়ে গেলাম, তাই বোধহয় ঠিক যা চাইছিল মুখ দিয়ে তাই বেরিয়ে গেল।

শীলা। কিন্তু মা, তোমাকে যে ফটোটা দেখিয়েছিল, সেটা ত তুমি চিনতে পেরেছিলে!

যতীন। আর কেউ আপনার সঙ্গে ফটোটা দেখেছিল?

সুবালা। না, শুধু আমাকেই দেখিয়েছিল।

যতীন। তা হলেই দেখতে পাচ্ছেন যে এখনো প্রমাণ হয় না একটা মেয়ের ফটোই সে সকলকে দেখিয়েছিল। এমনও ত হতে পারে যে আপনাদের সমিতিতে যে ক'জন মেয়ে দেখা করতে এসেছিল তাদেরই কারু একজনের ফটো আপনাকে দেখিয়েছিল? আর সেই মেয়েটিই যে ইভা দত্ত বা রত্না সেন তা কে জানে?

ব্যানার্জ্জী। যতীন, তুমি ঠিক বলেছ। সে যদি প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ফটো দেখিয়ে থাকে তা হলে? হয় ত আমরা এক একজন যে ফটো দেখে চিনতে পেরেছি সেগুলো সব বিভিন্ন মেয়েদের!

যতীন। আমার ধারণা নিশ্চয়ই তাই। আচ্ছা আনন্দ, তোমাকে কোনও ফটো দেখিয়েছিল?

আনন্দ। না। আমাকে কোন ফটো দেখাবার দরকার হয় নি। যে মেয়েটি মার কাছে এসেছিল তাকে যে আমি জানতাম তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যতীন। কি করে জানলে?

আনন্দ। মাকে বলেছিল, চুরির টাকা নেবে না বলেই সে সাহায্য চাইতে এসেছে। আমি যাকে জানতাম সেও বলেছিল যে চুরির টাকা নেবে না।

যতীন। তা হলেও এমন ত হতে পারে যে হঠাৎ এ রকম একটা মিল হয়ে গিয়েছে।

আনন্দ। তুমি যাই বলো, যেমন ভাবেই সমস্ত ব্যাপারটাকে খাড়া করতে চাও, আমি জানি যে মেয়েটির আত্মহত্যার জন্যে আমি দায়ী। শুধু আমি নয়, মাও। মানতে না চাইলেই এটা মিথ্যা হয়ে যাবে না—

ব্যানার্জ্জী। (বাধা দিয়ে) এক মিনিট, আনন্দ। (যতীনকে) দেখো যতীন, এর পেছনে একটা ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে হচ্ছে। হয় ত আনন্দর ব্যাপারটা জেনে একটা মেয়েকে শিখিয়ে পড়িয়ে নারীত্রাণ সমিতির কাছে পাঠান হয়েছিল!

আনন্দ। অসম্ভব। মেয়েটি মারা গেছে, নয় কি?

যতীন। কোন মেয়েটি? হয় ত চার পাঁচজন মেয়েকে নিয়ে এটাকে তৈরী করা হয়েছে।

আনন্দ। তাতে কিছু আসে যায় না। আমি যাকে জানতাম সে আর বেঁচে নেই।

যতীন। তা তুমি জানলে কি করে? সত্যি বলতে কি, কোনও মেয়েই যে আজ আত্মহত্যা করেছে তার প্রমাণ আছে কিছু?

ব্যানার্জ্জী। দাও, এর কি উত্তর দেবে দাও। কি আশ্চর্য্য, এটা যে একটা মিথ্যা ষড়যন্ত্র সেটা কেন বুঝতে চাইছ না? (উঠে পায়চারী করতে লাগলেন) আচ্ছা, এবার ও লোকটার দিক থেকে ব্যাপারটা বুঝে দেখবার চেষ্টা করা যাক। ও জানতো যে আজ আমাদের একটা উৎসব আছে—আর আমরা সকলেই বেশ উৎফুল্ল থাকবো, তাই বেছে বেছে আজ রাতটাই ঠিক করেছিল। তাতে আমাদের আঘাত দেওয়াও হবে, আর উৎসবটাকে পণ্ড করাও হবে। জানতো যে আচম্বিতে ও-রকম একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করলে আমরা এমন স্তম্ভিত হয়ে যাবো যে তার ধাপ্পা বা চালাকি করা খুব সোজা হয়ে যাবে। তাই এসেই একেবারে বজ্রাঘাত করলে—একটা মেয়ে মারা গেছে, এসিড খেয়ে, অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে—

আনন্দ। যথেষ্ট হয়েছে বাবা। বারবার একই কথা আর ভাল লাগছে না।

ব্যানার্জ্জী। দেখছো? আমার মুখ থেকেই কথাটা আর একবার শুনে তুমি সহ্য করতে পারছ না! সেও ঠিক এই করতে চেয়েছিল, আমাদের সকলকে হতবাক্ করে দিয়ে এমন সব প্রশ্ন শুরু করবে যে আমরা নিজেদের নাম পর্য্যন্ত ভুলে যাব! আর করেও গেছে তাই। আমাদের নিয়ে বেশ একটু মজা করে গেল।

আনন্দ। যতই মজা করে যাক্, আমার আপত্তি নেই, যদি ব্যাপারটা মিথ্যা হয়।

ব্যানার্জ্জী। সমস্ত মিথ্যা। পুলিশের তদন্ত ও নয়, কেউ মরেও নি।

শীলা। তুমি বলছো যে কেউ আত্মহত্যা করে নি?

যতীন। এটা ত এখুনি জানা যেতে পারে।

শীলা। কেমন করে?

যতীন। কেন, হাঁসপাতালে ফোন করে। তারা নিশ্চয়ই বলতে পারবে সেখানে কোন মেয়ে এসিড খেয়ে মরেছে কি না।

ব্যানার্জ্জী। তা বটে, কিন্তু এত রাত্রে সেখানে খোঁজ করলে তাদের সন্দেহ হবে না ত?

যতীন। হয় হোক্। আর হবেই বা কেন? একটা accident সম্বন্ধে খোঁজ করলে কি ক্ষতি হতে পারে?

সুবালা। বিশেষতঃ যখন সত্যিই সেখানে একটা মেয়ে মরেছে তা আমরা জানি না।

যতীন। দেখাই যাক্ না। (ফোনের কাছে গেল এবং ডাইরেক্টরী খুলে নম্বর দেখলো। তারপর ডায়াল করতে লাগলো। সকলে তার দিকে চেয়ে রইলেন) হ্যালো, মেডিকেল কলেজ হস্পিটাল? আমি যতীন ভট্টাচার্য্য বলছি, Bhattacharya Industrials থেকে। দেখুন আমাদের ফ্যাক্টরীর একটা মেয়ের সম্বন্ধে খোঁজ করছি। আজ বিকালে কি কোন মেয়েকে এসিড খাওয়া অবস্থায় ওখানে আনা হয়েছে?…হ্যাঁ, আত্মহত্যারই চেষ্টা…বেশ, আমি ধরে থাকছি…

যতীন ফোন ধরে রইল। বাকী সকলে এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন উৎকণ্ঠায় তাঁরা আর ধৈর্য্য রাখতে পারছেন না। কেউ কপাল মুছলেন, কেউ বা হাত কচলাতে লাগলেন।

হ্যাঁ, বলুন…আচ্ছা, আপনার ভুল হয় নি ত?…না, না আমি তা বলছি না, মানে, অন্য কোথাও ত যেতে পারে? …পুলিশ কেস ওখানে যেতেই হবে?…বেশ,…আচ্ছা… আচ্ছা। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। (ফোন রাখলেন) মেডিকেল কলেজের casualty ward থেকে বললে যে আজ সেখানে কোন মেয়েকে এসিড খাওয়া অবস্থায় আনা হয় নি। সমস্ত পুলিশ কেস্ ওদের ওখানে যেতে বাধ্য। মৃত অবস্থাতেও কারুকে আনা হয় নি। সারা সপ্তাহেই কোন আত্মহত্যার কেস্ ওখানে আসে নি।

ব্যানার্জ্জী। (প্রায় লাফিয়ে উঠে) দেখলে? কি বলেছিলাম! সমস্ত ব্যাপারটাই একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা। অথচ আমাদের কি অবস্থা করে তুলেছিল! আঃ বাঁচা গেল, এবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। (পোর্ট ঢাললেন) যতীন, কফি খাবে না কি?

যতীন। পেলে মন্দ হতো না।

সুবালা। যা শীলা, আমাদের সকলের জন্যেই কফি করে আন্।

শীলা। যাচ্ছি মা। (কিন্তু বসেই রইল)

সুবালা। যতীন, তুমি যদি ব্যাপারটা এমন পরিষ্কার-ভাবে না ধরে ফেলতে—তা হলে কি অবস্থায় যে আমাদের রাত কাটতো তাই ভাবছি।

যতীন। হাঁ, এখান থেকে বেরুবার পর মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো, তাই সমস্ত ঘটনাটাকে ভালভাবে বুঝে দেখবার সময় পেলাম।

ব্যানার্জ্জী। লোকটা আমাদের সকলের মাথা যেমন ঘুরিয়ে দিয়েছিল, ভাগ্যিস তোমার তা পারে নি! সত্যি বলতে কি, আমি ত রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! এই সময়ে এ রকম একটা কেলেঙ্কারী আমাকে একেবারে ডুবিয়ে দিত। যাক্ সব ভাল যার শেষ ভাল। (পোর্ট খেলেন) শীলা, ও রকমভাবে বসে রয়েছ যে? কফি করবে না?

শীলা। এই যাচ্ছি। খালি ভাবছিলাম, আমরা যে যা বলেছি তা ত সত্যিই ঘটেছিল! আমাদের ভাগ্য ভাল তাই শেষটা মেলে নি, কেউ মারা যায় নি। কিন্তু যেতেও ত পারত?

ব্যানার্জ্জী। যায় নি ত, তা'হলেই হল। কি হতে পারত তা নিয়ে এখন মাথা ঘামান সম্পূর্ণ নিরর্থক। (হঠাৎ জোরে হেসে) কিন্তু কি ভয়টাই না দেখিয়ে গেল! (গুহর কথার নকল করে) আপনারা, প্রত্যেকে, এ মৃত্যুর জন্যে দায়ী। এটা সব সময় মনে রাখবেন, কখনো ভুলবেন না। (আবার হেসে) সে সময় সব মুখের যা চেহারা হয়েছিল, একেবারে দেখবার মতন! (আনন্দ উঠে দাঁড়াল, তার দিকে চেয়ে) উঠলে যে? শুতে যাচ্ছ?

আনন্দ। হ্যাঁ, আমার আর থাকতে ভাল লাগছে না। তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে আমার ভয় হচ্ছে।

ব্যানার্জ্জী। ভয়? Nonsense! কাল সকালেই আজ রাতের কথা ভাবলে হাসি পাবে। শীলা, তুমিও যতীনকে কফি খাইয়ে তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে ফেল।

শীলা। (উত্তেজিতভাবে) তোমরা সকলে এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন সব কিছুই ঠিক আগের মতই আছে!

আনন্দ। আমি দেখাচ্ছি না—

শীলা। না, তুই নয়। কিন্তু বাকী সকলে?

ব্যানার্জ্জী। দেখাচ্ছিই ত! হয়েছেই বা কি? একটা বদমায়েস লোক এসে কতগুলো যা তা বলে গেছে বলে সব বদলে যাবে?

শীলা। তার মানে তুমি বলতে চাইছ যে কিছুই হয় নি! দুঃখিত হবার কিছু হয় নি, শিক্ষা পাবার কিছু হয় নি! আমরা আগে যেমন ছিলাম ঠিক তাই আছি।

সুবালা। নেই বা কেন?

শীলা। সে লোকটা ইন্সপেক্টরই হোক্ বা যাই হোক্, আমি বলছি যে সে যা বলে গেল তা ঠাট্টাও নয়, তামাসাও নয়। তোমরাও সে সময়ে তা বুঝতে পেরেছিলে কিন্তু এখন আবার বুঝতে চাইছ না। ঠিক আগের মতই আবার গড্ডালিকা প্রবাহে চলতে চাইছ, কোন শিক্ষাই তোমাদের হয় নি।

সুবালা। তোর ত হয়েছে, তা হলেই হল।

শীলা। হ্যাঁ হয়েছে। সে যা বলে গেছে আমি তা কখনো ভুলবো না। নিজের সম্বন্ধে সব ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে। আমি বুঝেছি যদি এতেও আমাদের শিক্ষা না হয়ে থাকে, তা হলে সত্যিই অশেষ লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে আমাদের আবার শিক্ষা পেতে হবে। তাই তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে আমার ভয় হচ্ছে। চল্ আনন্দ, আমরা যাই।

ব্যানার্জ্জী। বেশ তাই যাও। এত রাত্রে তোমাদের এই বাড়াবাড়ি আমারও আর ভাল লাগছে না।

সুবালা। আহা, রাগ কোর না। দেখছ না, ছেলে-মানুষ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাত ত কম হয় নি!

শীলা ও আনন্দ যাবার উপক্রম করল

যতীন। শীলা, আমি যদি আবার আসি তুমি আপত্তি করবে না ত?

শীলা। (ঘুরে) না, না, এত তাড়াতাড়ি নয়। আমাকে কিছুদিন ভাববার সময় দাও।

ব্যানার্জ্জী। (শীলা ও আনন্দকে দেখিয়ে) দেখ, আজকালকার ছেলেমেয়েদের দেখ। না আছে সাহস, না আছে বোঝবার মত বুদ্ধি। একটা ঠাট্টা তামাসাকেও এরা ধরতে পারে না, বুঝতে পারে না। অথচ এরাই—

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। এক মুহূর্ত্ত সকলে স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর মিঃ ব্যানার্জ্জী ফোন ধরলেন

হ্যালো,···হ্যাঁ, অনন্ত ব্যানার্জ্জী বলছি······কি বললেন? দেখুন···হ্যালো, হ্যালো···

বোঝা গেল অপর পক্ষ ছেড়ে দিয়েছে। আস্তে আস্তে ফোন নামিয়ে রাখলেন। অন্যদের দিকে যখন তাকালেন তখন তাঁর দু চোখ ভয় ও বিস্ময়ে ভরা। অভিভূতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেমে থেমে বললেন

পুলিশ ফোন করছিল। এইমাত্র একটা মেয়ে আত্মহত্যা করেছে—এসিড খেয়ে। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর আসছে—তদন্ত করতে।

সকলে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইলেন। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজতে লাগলো। ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল।

নাটকের শেষ

প্রতিভা-পরিচিতি

কর্ম্মবীর কার্ণেগি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শেষ জীবনে যাঁর উপার্জ্জিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দশ কোটি পাউণ্ড এবং যাঁর দানের অঙ্ক ছিল সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা দানবীর অ্যানড্রু কার্ণেগির শৈশবকালের দারিদ্র্য আর কৃচ্ছ-সাধনের ইতিবৃত্ত পড়ে অবাক হোয়ে ভাবতে হয়, কী থেকে মানুষ কী না হোতে পারে !

১৮৪০ সালের কথা। ইংলণ্ডের এক অখ্যাত জনপদে অ্যানড্রু কার্ণেগির বাবা-মা বাস করছেন। নিতান্ত গরীবের সংসার। দিন আনা দিন খাওয়া। ঘরে ছিল পাঁচখানা হাতে-চালানো তাঁত। সেই তাঁত চালিয়ে স্বামী-স্ত্রী ছোট ছোট তোয়ালে তৈরী করতেন, আর সেই সব তোয়ালে বাজারে নিয়ে গিয়ে অ্যানড্রুর বাবা উইলিয়ম বিক্রি করে আসতেন এবং অর্ডার সংগ্রহ করতেন। মাঝে মাঝে বাজারে মন্দা পড়ত। না হ'ত মালের বিক্রি, না পেতেন অর্ডার। তখন সংসারের যা হাল হ'ত, তা সহজেই অনুমেয়। এমনি অবস্থায় অ্যানড্রু কার্ণেগি মানুষ হয়েছিলেন।

বাড়ীতে জলের কল ছিল না। রাস্তার কল থেকে জল আনতে হ'ত এবং সে কাজের ভার ছিল শিশু অ্যানড্রুর উপর। ইস্কুলে যাবার আগে বাল্‌তি হাতে নিয়ে রাস্তার কলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন তিনি। কলতলায় তখন লাইন লেগে গেছে। সব শেষে জল নিতে গেলে ইস্কুলে যাবার দফা রফা ! প্রত্যেক দিন নানা ছলছুতো ক'রে আগেই জল নিয়ে আসতেন তিনি। কলতলার মেয়ে-পুরুষ তাঁকে বলত, "পাড়ার বজ্জাত ছেলে অ্যানড্রু কার্ণেগি।"

সে-সময় ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করবার খুব হিড়িক পড়েছিল। ব্যবসাকর্ম্মে বা অন্নসংস্থানের ব্যাপারে যাঁরা সুবিধা করতে পারছিলেন না, "নতুন ইংলণ্ড" আমেরিকা-দেশে গিয়ে তাঁরা নানান সুযোগ সুবিধা পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, এমন ধারা সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছিল। অ্যানড্রুর বাবা উইলিয়ম কার্ণেগিও শেষ পর্য্যন্ত নিজের দেশে রুজি-রোজগারের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হোয়ে আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করবার সংকল্প করলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁর তাঁত মাকু আর ঘটিবাটি বিক্রি ক'রে, উপরন্তু আত্মীয়দের কাছ থেকে কিছু টাকা কর্জ্জ নিয়ে, স্ত্রীপুত্রদের হাত ধ'রে উইলিয়ম কার্ণেগি আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন।

পিট্‌স্‌বার্গ সহরের কাছে বাসা নিলেন উইলিয়ম। কিন্তু রোজগারের কোন সুরাহা করতে পারলেন না। স্থির করলেন, একটা ঝুড়ির মধ্যে ছোটখাটো সস্তা দামের জিনিষ ভর্ত্তি করে ছেলেকে সেই সব জিনিষ ফেরী করতে পাঠাবেন। অ্যানড্রুর মা বাধা দিলেন। ছেলে হবে ফেরীওয়ালা!

ইংলণ্ডের এক অখ্যাত জনপদের এই কুটিরে কার্ণেগি জন্মগ্রহণ করেন

যত সব নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে সে মিশে বেড়াবে! অসহ্য সে কল্পনা! অন্য কোন কাজ দেখ।

অবশেষে কাজ পেলেন উইলিয়ম। কাছেই এক সুতোর কারখানায় মিস্ত্রির কাজ। বাপের কাজ ছিল মেসিন চালানো, ছেলের কাজ হল ববিনে সুতো পরানো। অ্যানড্রুর মাইনে নির্দ্ধারিত হল সপ্তাহে পাঁচ সিলিং, অর্থাৎ তিন টাকার কিছু বেশী। ভবিষ্যত-শতকোটিপতির কাছে সেদিন সেই পাঁচ সিলিং যেন পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড বলে মনে হয়েছিল। পরে আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন—'সপ্তাহের শেষে প্রথম যেদিন মাইনে পেলাম, সেদিন যে কতখানি আনন্দ আর গর্ব্ব অনুভব করেছিলাম তা বলে বোঝানো যাবে না। আনন্দ এই জন্যে যে এবার আমি পিতা-মাতাকে কিছু সাহায্য করতে পারলাম, আর গর্ব্ব এই জন্যে যে, আমাদের পরিবারে আমি ফাল্‌তু নই, আমারও দাম আছে?'

* * *

নিজের প্রিয় কুকুরের সঙ্গে অবসর জীবনে অ্যানড্রু কার্ণেগি

চৌদ্দ বছর বয়সে পিটসবার্গ টেলিগ্রাফ আপিসে অ্যানড্রু পিওনের কাজ পেলেন। বিপুল উৎসাহ আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে একবছর কাজ করবার পর তিনি কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরে পড়লেন। তাঁর মাইনে বাড়ল। তখন তাঁর সে কী আনন্দ। বাড়তি মাইনেটি পকেটে রেখে যথারীতি মাসকাবারের টাকা মার হাতে তুলে দিলেন। তারপর রাতের বেলায় দুইভায়ে একত্রে যখন নিজেদের শোবার ঘরে ঢুকলেন, তখন দাদার ভাবভঙ্গী দেখে ছোট ভাই জিজ্ঞেস করলে—"দাদা, আজ তোমার কি হয়েছে?" অ্যানড্রু বললেন—"দশ সিলিং মূলধন আজ দু'ভায়ের নামে ব্যবসা করবার জন্যে জমা রাখলাম। আজ আমাদের মস্ত দিন।"

তারপর তিনি পেনসিলভেনিয়া রেলওয়ে আপিসে কাজ পেলেন। আপিসের কর্ত্তা ছিলেন—টি, এ, স্কট। কার্ণেগির সময়ানুবর্ত্তিতা, শ্রমশীলতা, কাজে আন্তরিকতা এবং সদা-সক্রিয় মনের পরিচয় পেয়ে স্কট সাহেব তাকে বিশেষ পছন্দ করতেন। যদিও কার্ণেগির চেয়ে পুরানো এবং পদস্থ

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননা সভায় ডক্টর কার্ণেগি

কর্ম্মচারী আরও অনেকে সে আপিসে ছিলেন, তাহলেও কোন কাজে ঠেকলেই স্কট সাহেব কার্ণেগিকে ডেকে তাঁর মতামত নিতেন।

একদিন এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল। সেদিন কার্ণেগি অন্যদিনের তুলনায় আগেই আপিসে গেছেন। কর্ত্তা স্কট সাহেব তখনো আসেন নি।

১৯০৩ সালে এই হেগ সহরে শান্তি-প্রাসাদ নির্ম্মাণে কার্ণেগি ৫ লক্ষ পাউণ্ড দান করেন

তাঁর আসবার সময় পার হল তখনো তাঁর দেখা নেই। এমন সময় এক দুর্ঘটনার খবর এলো। পেনসিলভেনিয়া রেলপথে মালগাড়ীতে আর

মেল-ট্রেনে ধাক্কা লেগেছে, লোকাল ট্রেনগুলো রাস্তা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এখন দোসরা লাইন দিয়ে ডাউন গাড়ী বন্ধ রেখে লোকাল ট্রেন ছেড়ে দেওয়া হবে কি না সে-সম্বন্ধে নির্দ্দেশ চাই। মহাসংকটময় অবস্থা। কর্ত্তা স্কট সাহেব যে কখন আসবেন তার ঠিক নেই! কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলেন কার্ণেগি, তারপর নির্দ্দেশ পাঠালেন—লাইন ক্লীয়ার করা হোক; লোকাল ট্রেন আগে চলুক; আপিসের কর্ম্মীরা দেরীতে পৌঁছলে ব্যবসা-জগতে বিশৃঙ্খলা ঘটবে—তাই তাদের ব্যবস্থা আগে করতে হবে।

কর্ম্মকর্ত্তা স্কট সাহেব বেলায় আপিসে পৌঁছে শুনলেন, দুর্ঘটনা ঘটেছিল বটে এবং একুশখানা ট্রেন আটকে পড়েছিল বটে, কিন্তু কার্ণেগির নিপুণ নির্দ্দেশের ফলে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নি।

ভয়ে ভয়ে মনিবের সামনে দাঁড়ালেন কার্ণেগি। তাঁর হুকুম জারী

সাদারল্যাণ্ডশায়ারের স্কিবো-প্রাসাদ

করা কর্ত্তা পছন্দ করবেন কি না, কে জানে। মুখে কিছুই বললেন না স্কট। পরদিন কার্ণেগি আপিসে পৌঁছোতেই একজন বেহারা সেলাম করে জানালে যে তাঁর বসবার জন্যে আলাদা ঘর নির্দ্দিষ্ট হোয়েছে এবং এখন থেকে আপিসে বড় সাহেবের হুকুমের পরেই তাঁর হুকুম সবাই মানবে।

* * *

চাকরিতে পদোন্নতি হল। কিন্তু সারাজীবন কি পরের দাসত্ব করেই কাটাবেন তিনি? ছোট ভাইকে নিয়ে পাঁচ শিলিং মূলধন দিয়ে ব্যবসা করবার যে পরিকল্পনা মাথায় ছিল তা কি কোনদিন রূপলাভ করবে না?

গ্রামের এক উৎসাহী ছাত্র রেলপথের "স্লিপিং কার" অর্থাৎ ঘুমাবার কামরার একটি নক্সা তৈরি করেছিল। কার্ণেগি সেই নক্সাটি সংগ্রহ করলেন। এই নক্সা দিয়েই তিনি ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। ঘুম-কামরার প্রবর্তন তিনি যদি করতে পারেন তাহলে তাঁকে আর পায় কে?

পেনসিলভেনিয়া রেলপথে ঘুম-কামরা তৈরী করবার জন্যে কোম্পানী গঠিত হল। কার্ণেগিরা দুই ভাই, নক্সা-অঙ্কনকারী সেই ছাত্র এবং একজন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী যিনি টাকার যোগান দিলেন।

ইতিমধ্যে ১৮৬১ সালে আমেরিকায় প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ বাধলো। কার্ণেগির ভূতপূর্ব মনিব কর্ণেল স্কট হলেন যুদ্ধ-দপ্তরের সহকারী সচিব।

কার্ণেগিকে ওয়াশিংটনের সর্ব্ব বৃহৎ রেলপথের সমস্ত ভার দেওয়া হল। রেলপথের নানাস্থানে ভাঙন্ ধরেছে, সংস্কারের অভাবে বহু জায়গা রীতিমতো উদ্বেগজনক, যে-কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে—সেই সমস্ত কাজ কার্ণেগিকে দেখতে হবে।

বিপুল দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে দিবারাত্র রেলপথের নানা স্থান পরিদর্শন করে, সময়োপযোগী ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং মিস্ত্রিদের রোজ বাড়িয়ে কাজে উৎসাহ দিয়ে একমাসের মধ্যে কার্ণেগি যে কাজ সম্পাদন করলেন, এক বছরেও অন্য কেউ সেরকম কাজ করতে পারতেন কি না সন্দেহ।

এদিকে তাঁদের নিজের ব্যবসায়ের কাজ পুরোদমে চলেছে। ঘুম কামরা তৈরী হয়েছে। গভর্মেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকার অর্ডার দিয়েছেন। কাঁচা মালের জন্যে কার্ণেগি কোম্পানীর লোকজন চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে।

* * *

পেটা লোহা আর ঢালাই লোহা—লোহার ব্যবসাতেই কার্ণেগির কর্মশক্তি এবং প্রতিভা পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছিল। ঢালাই লোহার চেয়ে পেটা লোহা যে অনেক বেশী কার্য্যকরী এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পেটা লোহাকে যে ইস্পাতে পরিণত করা যেতে পারে, কার্ণেগির আগে অন্য কেউ তা এমন গভীরভাবে চিন্তা করেননি।

তখনো পর্য্যন্ত ইস্পাত উৎপাদনের খরচ ছিল অত্যন্ত বেশী, সেকারণেই ইস্পাতের প্রচলনও ছিল অনুল্লেখযোগ্য। নিজের জীবনীতে কার্ণেগি লিখেছেন—"১৮৬৪ সালে ইস্পাত-উৎপাদনে বিপ্লব ঘটল। আমরা আশাতীত সস্তা দামে খাঁটি ইস্পাত উৎপাদন করতে লাগলাম। লৌহযুগের অন্তে ইস্পাতের যুগ দেখা দিল, আমাদের কারখানা থেকে ইস্পাত তৈরী হয়ে রাজ্যসরকারের নানা কাজে ব্যবহৃত হোতে লাগল।"

দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যবসায়ীরূপে কার্ণেগি প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। তাঁর সাফল্যের মধ্যে কোন গোপনীয়তা ছিল না। তাঁর ব্যবসায়-নীতির মধ্যে ছিল না কোন কপটতা বা লুকোচুরী। কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু হোয়ে যারা তাঁর কাছে আসতো তাদের সবাইকে তিনি অম্লানবদনে সব

কথা বুঝিয়ে দিতেন, কেমন করে একবেলা খেয়ে আর অন্য বেলায় উপোস করে তিনি ব্যবসা করবার জন্যে টাকা জমাতেন সে-সংবাদও গোপন রাখতেন না।

ইস্পাত-ব্যবসাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে কার্ণেগি তেলের খনির ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে তেলের খনি থেকে এত অপর্য্যাপ্ত তেল পাওয়া গেল যে এক বছরে তাঁর কোম্পানীর যে লাভ হল, তার মধ্যে কার্ণেগির অংশ দাঁড়াল দশ লক্ষ পাউণ্ড।

১৮৬৬ সালে কার্ণেগি পিটসবার্গে এক ইস্পাত-কল বসালেন। অন্য একদল ব্যবসায়ী তাঁর আগে থেকেই ঐ শহরের প্রান্তে একটি স্থান নির্বাচন করে ঐ ধরণের একটি কল বসানোর পরিকল্পনা করেছিল। কার্ণেগির মধ্যে কোন আত্মাভিমান বা সংকীর্ণতা ছিল না। তিনি সেই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন, দু'জনে দু'দিকে দুটি কল বসিয়ে রেষারেষি করার চেয়ে সবাই মিলে একটা কল বসালে উভয়ের পক্ষেই তা অধিকতর লাভজনক হবে।

কার্ণেগির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে যারা ইস্পাত-কারখানা গড়বার আয়োজন করেছিল, শেষ পর্যন্ত তারা বুঝলো যে কার্ণেগির কর্ম-নৈপুণ্য, সুনাম আর টাকার জোরের কাছে তারা দাঁড়াতে পারবে না, তারা জান তো, টাকার জন্যে কার্ণেগি যদি জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান তাহলে দেশের কোটিপতিরা অকাতরে তাঁকে টাকা ধার দেবে, স্বয়ং গভর্ণমেন্ট তাঁকে অর্থ সাহায্য করবে, এমনিই ছিল তার সুনাম এবং লোক-প্রিয়তা! তারা একথাও জানতো যে কার্ণেগির সঙ্গে একজোট হয়ে নামলে তাদের টাকা কোনদিন মারা যাবে না, কার্ণেগির কাছে তাদের ঠকতে হবে না কোনদিন! একজন ব্যবসায়ীর স্বপক্ষে এর চেয়ে বড় কথা আর কি হতে পারে?

* * *

বিবাহের পর কার্ণেগি স্কটল্যাণ্ডের সাদারল্যাণ্ডশায়ারে স্কিবো দুর্গটি বহু টাকা দিয়ে ক্রয় করলেন। এই প্রাসাদ কিনে তার সংস্কার করতে কার্ণেগি যে অর্থ ব্যয় করেছিলেন তা দিয়ে যে-কোন শহরের প্রান্তে সমগ্র একটি গ্রাম খরিদ করা যেতে পারতো।

যে-সম্পত্তি ক্রয় করে তিনি জীবনে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলেন তা হচ্ছে তাঁর জন্মস্থানের কাছে দুশো দশ বিঘা একটি ভূখণ্ড, যার নাম ছিল পিটেনক্রিফ্ গ্লেন। কার্ণেগিরা যে-গ্রামে বাস করতেন সেই গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে পাশের গ্রামের অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী নাগরিকদের অনেকদিনের বিরোধ ছিল এই মনোরম লতাগুল্ম-পরিবৃত গ্লেনের সত্ব সম্পর্কে। বিপরীত দিকের ধনশালী গ্রামবাসীরা কার্ণেগির গ্রামের লোকদের গ্লেনের মধ্যে ঢুকতে দিত না। ছোট খাটো দাঙ্গা যে লাগতো না, তাও নয়। কার্ণেগির ঠাকুরদাদা একবার একদল অনুচর নিয়ে সেই অরণ্যভূমির প্রান্তবর্ত্তী একটি আড়াল-দেওয়া দেওয়াল ভেঙে দিয়েছিলেন। অ্যান্ড্রু কার্ণেগির সে সব মনে ছিল। মনে ছিল, ছেলেবেলায় তিনি কত সময় সেই বাগানের মধ্যে ঢোকবার জন্যে দূরে দাঁড়িয়ে লোলুপ নেত্রে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতেন। গুণে শেষ করা যায় না অর্থ যখন তাঁর হাতে এলো, তখন তারই কিয়দংশ দিয়ে তিনি চড়া দামে সেই উদ্যান-ভূখণ্ড কিনে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই রেজেষ্ট্রি করে তা দান করে দিলেন তাঁর গ্রামের অধিবাসীদের!—একদিন তিনি যে বাগানের মধ্যে ঢুকে খেলা করবার অধিকার পান নি, তাঁর গ্রামের ছেলে-মেয়েরা যেন সে অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়—পিটেনক্রিফ গ্লেন কারুর একার সম্পত্তি নয়, তার প্রতি সমস্ত গ্রামবাসীদের অধিকার থাকবে চিরকাল।

পিটেনক্রিফ্ গ্লেনের ধারে দাঁড়িয়ে বালক কার্ণেগি সতৃষ্ণ নয়নে উদ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বাগানের মধ্যে প্রবেশের অধিকার তাঁর গ্রামের লোকজনদের ছিল না

ব্যবসায়ী ও কর্মবীর অ্যান্ড্রু কার্ণেগির জীবনের সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি হল তাঁর অপরিমেয় দানশীলতা।

পঁচিশ কোটি পাউণ্ড মূলধন নিয়ে তাঁর লোহার কারবার চলেছে, তাঁর ধনভাণ্ডারের স্ফীতি দেখে স্বয়ং কুবেরও বুঝি লজ্জায় ও বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে, এমন সময় ১৯০১ সালে কার্ণেগি উপলব্ধি করলেন, টাকা তাঁকে গ্রাস করেছে এবং তিনি টাকার ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু

কারুর দাসত্ব করবার জন্যে তো তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। সুতরাং অর্থের অক্টোপাশ থেকে মুক্তি চাই।

আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন—"সর্বরকমের স্বাধীনতাই হল মানুষের চরম কাম্য। টাকা রোজগার করে স্বাধীন হলাম, সেটাই কিন্তু মানুষের জীবনের শেষ কথা নয়। প্রতিবেশীর প্রতি তার কর্তব্য আছে। জগতকে যা দেখছো তার চেয়ে যদি আর-একটু ভাল দেখতে চাও তো সেইটেই সবচেয়ে বড় কাজ! তোমার বাড়তি টাকা আগ্‌লে না রেখে দশের উপকারে লাগাও, তবেই তোমার ধন-উপার্জন সার্থক।"

কর্ম থেকে তিনি অবসর নিলেন। অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়েছে। আমেরিকা ষ্টীল ট্রাষ্ট্‌ নামে একটি সংস্থা গঠিত হল, সেই প্রতিষ্ঠান তাঁর সব ক'টি ব্যবসাকে পরিচালনা করবার ভার নিলে। ববিন্‌-বয় অ্যান্ড্‌ কার্ণেগি যখন অবসর গ্রহণ করলেন তখন তাঁর নিজের অংশের টাকার পরিমাণ দাঁড়াল ১০ কোটি পাউণ্ড।

অবসর-জীবনে তিনি যে দান-খয়রাত করলেন তার ইতিবৃত্তও বিস্ময়কর। বিনাচাঁদার গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন, বৃত্তি ও অন্যান্য নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠনে তিনি ৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দান করলেন। ১৯১৯ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পর তাঁর নগদ টাকা ও সম্পত্তির মূল্য ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী ছিল না।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ঋগ্বেদের দেবতাগণ

ঋকবেদ সংহিতার সূক্ত সংখ্যা ১০১৭। এই সকল সূক্তে ১০,৬০০ ঋক্ (শ্লোক) আছে। সমগ্র সংহিতা আট অষ্টকে বিভক্ত। প্রত্যেক অষ্টকে আট অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায় আবার সতকগুলি বর্গে বিভক্ত। কখনও কখনও সমগ্র সংহিতাকে দশ মণ্ডলেও বিভক্ত দেখা যায়। প্রথম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত, পনের জন ঋষি রচিত। অগ্নির স্তোত্র মণ্ডলের প্রথমে স্থাপিত। অগ্নিস্তোত্রের পরে ইন্দ্রস্তোত্র, তাহার পরে অন্যান্য দেবতার স্তোত্র। পরবর্ত্তী ছয়টি মণ্ডলের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঋষি কর্ত্তৃক রচিত এবং একই ভাবে সজ্জিত। অষ্টম মণ্ডল কয়েকজন বিভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক রচিত। নবম মণ্ডলে কেবল সোম দেবতার স্তোত্র আছে। অষ্টম ও নবম মণ্ডলের অনেক সূক্ত সামবেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। দশম মণ্ডলে বৈদিক যুগের শেষ ভাগে প্রচলিত অনেক বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়; দার্শনিক চিন্তাও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে কল্পনার বিকাশও এই মণ্ডলের সূক্তদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। এতদ্‌ব্যতীত অথর্ব্ববেদের যুগের অনেক যাদুমন্ত্রও এই মণ্ডলে আছে। ইহা হইতে মনে হয় এই মণ্ডলরচনার সময় ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের সহিত আর্য্যদিগের পরিচয় সংঘটিত হইয়াছিল।*

* Dr. Radha Krishnan, Indian Philosophy. vol. I. p. 68.

মিত্র ও বরুণ

বেদে মিত্র কোথায়ও সূর্য্যের সহিত অভিন্ন, কোথায়ও আলোকের দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদর্শী, সত্য তাঁহার অতি প্রিয়। বহুস্থলে মিত্র ও বরুণের নাম এক সঙ্গে যুগল দেবতারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। মিত্র ও বরুণ এক সঙ্গে ঋতের রক্ষক এবং পাপের মার্জ্জনা-দাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পরে মিত্র ঊষার আলোকের এবং বরুণ নৈশ আকাশের দেবতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। উভয়কেই অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে।

"বৃ" ধাতু (আবরণ করা) হইতে "বরুণ" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি সমগ্র আকাশ আবৃত করিয়া আছেন, তিনিই বরুণ—আকাশের দেবতা। গ্রীক-দেবতা ঔরেনস্ এবং আবেস্তার অহুরমজদা ও বরুণ অভিন্ন। মিত্র বরুণের নিত্য সঙ্গী। মিত্র ও বরুণ রাত্রি ও দিন, অন্ধকার ও আলোকের দেবতা। বরুণের আদেশে নদীসকল প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হয়, তাঁহার ভয়ে চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ স্ব স্ব পথে ধাবিত হয়। তাঁহারই নিদেশে পৃথিবী ও আকাশ (দ্যাবা পৃথিবী) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্ত্তমান। সমগ্র জড়জগৎ ও বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থা (moral order) তিনিই ধারণ করিয়া আছেন। অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহার অধীন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। একটি চড়ুই পাখার মৃত্যুও তাঁহার অজ্ঞাতসারে হয় না। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে পরমদেবতা—মহেশ্বর, পাপীর শাস্তা, অনুতপ্তের প্রতি প্রসন্ন, নৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও ধারক হইলেও

পাপীর প্রতি অনুকম্পাশীল। পাপী যদি তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন। অধিকাংশ বরুণ-স্তোত্রে পাপস্বীকৃতি, অনুতাপ ও ক্ষমাভিক্ষা দৃষ্ট হয়। ম্যাকডোনাল্ড বলেন—উন্নত ঈশ্বরবাদের ঈশ্বর ও বরুণের চরিত্র একরূপ। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মতে ভাগবত-ধর্ম্মের ঈশ্বরবাদের মূল বরুণ-চরিত্র।* বরুণ স্থানে স্থানে জলের দেবতা ও জলেশ্বর বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন।

সূর্য্য ও সবিতা

কোনও কোনও সূক্তে সূর্য্য ও সবিতা অভিন্ন বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। কোনও সূক্তে তাহাদের মধ্যে পার্থক্যও সূচিত হইয়াছে। সূর্য্য মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু, তিনি দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়া আছেন। তিনি স্থাবর-জঙ্গম জগতের (জগতঃ তস্থুষশ্চ) আত্মা। তিনি দেবতাদিগের অনীক (তেজ)। তাঁহার এক নাম জাতবেদ (সর্ব্বজ্ঞ—সকল জাতবস্তু যিনি জানেন। এই নাম অগ্নিকেও প্রদত্ত হইয়াছে)। তিনি বিশ্বচক্ষু (বিশ্বদ্রষ্টা), তিনি তরণি, তিনি জ্যোতিষ্কৃৎ (জ্যোতিষ্কদিগের স্রষ্টা)।

দিবাভাগের জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য ও রাত্রির অদৃশ্য সূর্য্য উভয়েরই বাচক "সবিতা"। অনুতপ্ত পাপী তাঁহার নিকট পাপের মার্জ্জনা ভিক্ষা করে। কেহ কেহ বলেন, গায়ত্রী মন্ত্র এই সবিতারই উপাসনা। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এবং আরও অনেকে গায়ত্রীর সবিতাকে ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৪।১৮ মন্ত্রে "সবিতুর্ব্বরেণ্যং অক্ষরং" এর কথা আছে। এই শ্লোকের সহিত গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থেরও প্রচুর সাদৃশ্য আছে।† "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী"—(সবিতার বরেণ্য [সম্ভজনীয়] অক্ষর হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল) এবং "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ" (যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন) একই অর্থদ্যোতক। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে শ্বেতাশ্বতরের ঋষি গায়ত্রী মন্ত্রকে ব্রহ্মের উপাসনা অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। "সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গঃ" এখানে "সবিতু" শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তি যেমন "সম্বন্ধে" তেমনি কর্ত্তাতেও হইতে পারে। সবিতা যে তেজের ভজনা করেন সেই তেজ—এই অর্থ গ্রহণ করিলে সবিতা সূর্য্য হইলেও সমস্ত মন্ত্রটি ব্রহ্মের উপাসনাই দাঁড়ায়।

সূর্য্যের উপাসনা প্রাচীন গ্রীসে ও পারস্য দেশেও প্রচলিত ছিল। প্লেটো তাঁহার Republic গ্রন্থে সূর্য্যকে পরম শ্রেয়ের সন্তান (offspring of the Chief Good) এবং তৎকর্তৃক আপনার সাদৃশ্যে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরম শ্রেয়ের সহিত বুদ্ধিজগতে বিশুদ্ধপ্রজ্ঞা এবং তাহার বিষয়দিগের যে সম্বন্ধ সূর্য্যের সহিত দৃষ্টিশক্তিও দৃশ্য বিষয়ের সেই সম্বন্ধ, বলিয়াছেন। সূর্য্যকে তিনি এই প্রসঙ্গে দেবতা বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। বেদে সূর্য্যকে আলোকের এবং প্রাণের স্রষ্টা ও সর্বদ্রষ্টা বলা হইয়াছে। তিনি সকল জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন (কর্ম্মদায়ী), তিনি মানবের কৃত পাপ ও পুণ্য দর্শন করেন, তিনি "সবিতা" (জগৎ স্রষ্টা) এবং জগতের শাসনকর্ত্তা।

প্রাচীন মিশরবাসিরা, অসাইরিস্ হার্পোক্রাটিস্ প্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতে সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। প্রাচীন সিরীয় ও আসিরীয়গণও সূর্য্যের উপাসনা করিতেন।

সূর্য্যের উপাসনা রোমেও প্রসারিত হইয়াছিল। সেখানে সূর্য্যের নাম হইয়াছিল এলোগবল্। এলোগবলের হেলিওগবল্স নামক এক পুরোহিত রোমের সম্রাট হইয়াছিলেন। রোম খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরেও খৃষ্টের উপাসনার সঙ্গে কিছুকাল সূর্য্যের উপাসনাও চলিয়াছিল। খৃষ্টমাস উৎসবে সূর্য্যোপাসনার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। বেদুইন আরবেরা মুসলমান হইলেও এখনও সূর্য্যের উপাসনা করে।*

সূর্য্যের আর এক নাম পূষণ। তিনি মানুষের বন্ধু; পশুদিগের রক্ষক, পথিক ও কৃষকদিগের দেবতা। ঈশোপনিষদে সূর্য্যকে পূষণ, একর্ষি (একাকী গমনশীল) যম (সংযমনকর্ত্তা) ও প্রাজাপত্য নামে সম্বোধন করা হইয়াছে।

দ্যাবা-পৃথিবী

বেদের দ্যৌঃ আকাশ দেবতা। বরুণ, অদিতি, ইন্দ্র

* Vedic Mythology. p, 3.

† Radha Krishnan's Indian Philosophy. vol. I pp 77-78.

* Plato' Republic, Book VI.

ও আকাশ দেবতা। বৃষ্টিবর্ষী আকাশ ইন্দ্র, অনন্ত আকাশ অদিতি এবং আবরণরূপী আকাশ বরুণ। দ্যৌঃ জনক মূর্ত্তি। বেদে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ে দ্যাবা-পৃথিবী এই যুক্ত নামে স্তুত হইয়াছেন। ইহারা দম্পতী এবং সমস্ত জীবের পিতা ও মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পিতা দ্যৌঃ গ্রীকদিগের Zeus Pater এবং রোমকদিগের Jupiter। আকাশ বা দ্যৌপিতা হইতে যে সকল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ঋকবেদে আছে। দ্যৌঃ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। গ্রীক পুরাণে পৃথিবী (Gain—গো=পৃথিবী) Ouranosএর পত্নী। Ouranos বরুণ (আবরক আকাশ) *

চীন দেশেও আকাশকে পিতা এবং পৃথিবীকে মাতা বলা হইয়াছে। চৈনিক দার্শনিকদিগের মতে সৃষ্টিতে দুই তত্ত্ব, একটি পুরুষ স্বর্গায়, দ্বিতীয়টি স্ত্রী পার্থিব। (আমাদের প্রকৃতিও পুরুষের মতো) একটির নাম ইন্, অন্যটীর নাম ইয়ং।

ইন্দ্র

বেদে ইন্দ্র আদিত্য বা অদিতির পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অদিতি শব্দের অর্থ মোক্ষমূলারের মতে অসীম। পুরাণে ইন্দ্র অদিতি ও কশ্যপের পুত্র। বেদে কচ্ছপ অর্থে কশ্যপ শব্দের প্রয়োগ আছে। কচ্ছপ—কূর্ম্ম। কূর্ম্ম শব্দের অর্থ কর্ত্তা। সুতরাং কচ্ছপ অর্থ কর্ত্তা, সর্ব্ববস্তুর স্রষ্টা, প্রজাপতি। শতপথ ব্রাহ্মণে (৭।৪।১৫) আছে "প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন। যাহা তিনি সৃষ্টি করিলেন, তাহা তিনি করিলেন বলিয়া তিনি কূর্ম্ম।" কশ্যপও কূর্ম্ম। সুতরাং বলা যায় প্রজাপতিই কশ্যপ।

ইন্দ ধাতুর অর্থ বর্ষণ করা। সুতরাং ইন্দ্র বর্ষণকারী, বর্ষণকারী আকাশ। অনন্ত আকাশ অদিতি। বৃষ্টিকারী আকাশ ইন্দ্র, আলোকময় আকাশ দ্যৌঃ। আবরক আকাশ বরুণ।

ঋকবেদে আছে ইন্দ্র বৃত্র, নমুচি, সম্বর প্রভৃতি অসুরদিগকে বধ করিয়াছিলেন। এই সকল অসুর যে বৃষ্টিরোধকারী প্রাকৃতিক শক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দ্র যখন বজ্রপাত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ করেন তখন অসুরদিগের মৃত্যু হয়। বৃত্রাসুর হত হইলে রুদ্ধগতি নদী সকল সবেগে সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল।" (১।৩২।২)

আর্য্য জাতির অন্য কোনও শাখায় ইন্দ্রদেবতার পূজার উল্লেখ নাই। কিন্তু পর্জন্যের নাম পাওয়া যায়। লুথিনীয়গণ আর্য্য জাতির এক শাখা। তাহারা পারকুনাস নামে এক দেবতার উপাসনা করিত। পারকুনাস বজ্রধ্বনি ও বজ্রের দেবতা। তিনি জগতের অধীশ্বর। যাবতীয় দেবতাদিগের উপরে তাঁহার স্থান। তিনি বায়ু, মেঘ, বজ্র, বজ্রধ্বনির প্রভু। নয় জন পারকুনাসের অস্তিত্বে লিথুনিয়ানগণ বিশ্বাস করিত। এই পারকুনাস যে ভারতবর্ষে পর্জন্য এবং পরে ইন্দ্র হইয়াছিলেন ইহা অনুমিত হয়। বেদে পর্জন্য আকাশের নাম। অথর্ব্ববেদে পৃথিবীকে পর্জন্যের স্ত্রী বলা হইয়াছে। তিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের প্রভু। পর্জন্য শব্দ মেঘ এবং বৃষ্টি অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদে ইন্দ্রের বহু স্তোত্র আছে। ভারতবর্ষে বৃষ্টির উপরই কৃষি নির্ভর করিত। এইজন্য বৃষ্টির দেবতার স্থান অতি উচ্চে।* গ্রীসে জিউসের যে স্থান ভারতবর্ষে ইন্দ্রের স্থান সেইরূপ ছিল। দেবতাদিগের মধ্যে তিনিই এক সময় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পরে বৃষ্টি ও মেঘের সহিত ইন্দ্রের সম্বন্ধ চাপা পড়ে এবং ইন্দ্র আত্মারূপে এবং বিশ্বের প্রভুরূপে উপাসিত হন। তখন আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে তাহার সাহায্য ভিক্ষা করিতেন এবং তিনি আর্য্য জাতির রক্ষাকর্ত্তা ও জয়দাতা বলিয়া পূজিত হইতে থাকেন। তিনি পৃথিবী ও পর্ব্বত সমূহ স্ব স্ব স্থানে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আকাশকে ধারণ করিয়া আছেন। যিনি সর্পকে (বৃত্রকে) বধ করিয়াছিলেন, সপ্ত নদীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া গাভীদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যুদ্ধে (শক্রদিগকে) বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত জয়লাভ করা যায় না। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে দুর্ব্বৃত্তগণ নিহত হয়। ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে বরুণকে স্থানচ্যুত করিয়া শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পরিগণিত হন।

যে সকল অসুরের সহিত ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাদের অনেকে অন্যান্য জাতির দেবতা। বৃত্রাসুর (অহি) সম্ভবতঃ অনার্য্যদিগের দেবতা। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের

* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দেবতত্ত্ব (সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী)।

* হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি—সুরেশচন্দ্র সিংহরায় রচিত। শৈব ধর্ম্ম—৫ম পৃষ্ঠা।

সহিত ইন্দ্রের বিরোধের এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্র যজ্ঞের নিষেধের কথা আছে। ঋকবেদে কৃষ্ণনামা এক জাতির দেবতা কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের শত্রুতার কথা বর্ণিত আছে। অংশুমতী (যমুনা) নদীর তীরে ছিল কৃষ্ণের নিবাস। তাহার দশ সহস্র সৈন্য ছিল। ইন্দ্র সেই সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করেন। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞের নিষেধ সংক্রান্ত উপাখ্যানের মূল হয়তো এইখানে।

সোম

আবেস্তার "হওমা" এবং গ্রীসের ডায়োনিসাস্ ও বেদের সোম একই দেবতা। বেদে সোমরসের কথা বহুস্থানে আছে। সোমরস পানে মন উৎফুল্ল হয় ও দুঃখ শোক দূরে যায়। সোমপান হইতে উদ্ভূত নেশাকে মনের একটা উন্নততর অবস্থা মনে করা অস্বাভাবিক নহে। যাহাকে দিব্যদৃষ্টি বলে, যে অবস্থায় অপার্থিব অলৌকিক বস্তু ও ব্যাপারের দর্শন হয় এবং অন্তর্দৃষ্টিলাভ হয়, বুদ্ধির প্রসার বর্দ্ধিত হয়, তাহা চিত্তের আবিষ্ট অবস্থা। সোমপানে যে অবস্থা উদ্ভূত হইত, তাহাকে একটি পবিত্র ও উন্নত অবস্থা গণ্য করিয়া 'সোম'কে দেবত্বে উন্নীত করা হইয়াছিল। হুইট্নি লিখিয়াছেন "যাহাদিগের ধর্ম্ম ছিল প্রকৃতির আশ্চর্য্যজনক শক্তি এবং ব্যাপারের উপাসনা, সেই সরলমতি আর্য্যগণ যখনই দেখিতে পাইলেন যে এই তরল পদার্থের (সোমরসের) মনকে উল্লসিত এবং প্রবলভাবে উত্তেজিত করিবার শক্তি আছে, এবং সেই শক্তি বলে সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্য উৎসন্ন হয়, তখন তাহারা তাহার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ বর্ত্তমান বলিয়া মনে করিলেন। তাহাদের বুদ্ধিতে সোমলতা দেবতারূপে প্রতিভাত হইল এবং ইহা হইতে দৈবশক্তি লাভ হয় বলিয়া তাহারা ধারণা করিলেন। সোমলতা উদ্ভিদদিগের রাজা এবং তাহা হইতে রসনিষ্কাশন প্রণালী যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইল। সোমরস প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সকলও পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইল।* সোমলতা হইতে রস নিষ্কর্ষণের সময় সোমের স্তোত্রপাঠ করা হইত। একমন্ত্রে আছে "সোমং অপাম, অমৃতা অভূম" আমরা সোমপান করিয়া অমর হইয়াছি। কালক্রমে সোমরসের পীড়াশান্তি করিবার শক্তি আছে, এবং সোমপানে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে, খঞ্জ চলিতে পারে, এই বিশ্বাসও উৎপন্ন হয়।

আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের জন্য শারীরিক মত্ততাজনক পদার্থের ব্যবহার কেবল বৈদিকযুগেরই বিশেষত্ব নহে। উইলিয়াম জেম্‌স্ বলেন—মনের যে অবস্থায় অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান হয় (Mystic Consciousious) মদ্য কর্তৃক উৎপন্ন উন্মত্ত মানসিক অবস্থা তাহারই একটা ক্ষুদ্র অংশ।*

অগ্নি ও রুদ্র

ঋক্‌বেদে অগ্নির স্থান কেবল ইন্দ্রের নিম্নে। অন্ততঃ দুইশত সূক্তে অগ্নির স্তোত্র আছে। অগ্নির উৎপত্তির নানা স্থান—সূর্য্যতাপ, মেঘ (বিদ্যুৎ-অগ্নির স্থান), অরণি কাষ্ঠ, প্রস্তর (চকমকি পাথর)। মাতরিশ্বন্ অগ্নিকে আকাশ হইতে আনিয়া ভৃগুদিগের নিকট রাখিয়াছিলেন। স্বর্ণবর্ণ শ্মশ্রুধারী অগ্নির দন্ত তীক্ষ্ণ। কাষ্ঠ এবং ঘৃত তাহার খাদ্য। সূর্য্যের মত তিনি দীপ্তিমান। বজ্রধ্বনির ন্যায় তাহার কণ্ঠস্বর। ধূম্র তাহার পতাকা, তাই তিনি ধূমকেতু। আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তিনি বিস্তৃত। তিনিই যজ্ঞে প্রদত্ত উপহার দেবতাদিগের নিকট বহন করেন। তিনি দেবতাদিগের মুখ (অগ্নিঃ মুখং দেবতানাম্)। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে মুখ্য (অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ)।

এই অগ্নি পরে রুদ্র দেবতার সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। পৃথিবীর দেবতা অগ্নি, দ্যুঃলোকের দেবতা মিত্র, উভয়ে স্বরূপে এক। উভয় লোকের মধ্যবর্ত্তী অন্তরিক্ষ লোকে অগ্নি বিদ্যুৎরূপে বর্ত্তমান। এই বিদ্যুদগ্নিই রুদ্র। প্রকৃতির মঙ্গলময় মূর্ত্তির পশ্চাতে যে ভীষণ মূর্ত্তি বর্ত্তমান তাহাই রুদ্র। রুদ্র অতি কোপন স্বভাব। "ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্ বীরায় প্রভরামহে মতীঃ"। মহৎ কপর্দী (জটাধারী) বীরনাশী রুদ্রকে আমরা স্তুতি করিতেছি। সায়নের মতে রুদ্র শব্দের অর্থ ক্রূর। যাস্ক বলেন "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।" রুদ্রের কোপানল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেক স্তুতি বেদে আছে। সকল অমঙ্গল রুদ্রের কোপ হইতে উদ্ভূত হয়। "হে রুদ্র

---

* Quoted in Radhakrishnans' Indian Philosophy vol. 1 P. 83-84.

বৃদ্ধদিগকে বধ করিও না, বালকদিগকে, সন্তান জনয়িতাকে, গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না। আমাদের পিতাকে, আমাদের মাতাকে বধ করিও না, আমাদের শরীরের অনিষ্ট করিও না।" "আমাদিগের পুত্রকে, তাহার সন্তানকে, অপরাপরকে, হে রুদ্র তুমি হিংসা করিও না, আমাদের গো অশ্বদিগকে হিংসা করিও না, তোমার ক্রোধানল যেন আমাদের বীরদিগকে হিংসা না করে।" এমন কোনও অশুভ নাই, যাহা রুদ্রের ক্রোধ হইতে উদ্‌ভূত না হইতে পারে। রুদ্রের প্রসন্নতা লাভ করিয়া মনু রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার ক্রোধ হইলে "বীরক্ষয়কারী" রোগের আবির্ভাব হয়। তিনি সন্তুষ্ট হইলে সে রোগ হইতে আরোগ্যলাভও হয়। ফলে রুদ্র চিকিৎসকরূপে পরিগণিত ও পরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হন। "ভেষজেভিঃ ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি" (২৪-৩৩ সূ) সহস্র ঔষধি তাঁহার জানা আছে।

এই রুদ্র দেবতারও একটা প্রশান্ত মূর্ত্তির কথা আছে। "তিনি স্তুতিপালক, যজ্ঞপালক, ঔষধিনাথ, দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি মানুষ, গো, অশ্ব, মেষাদি সকলকে সুখ প্রদান করেন।" *

বেদের অর্থ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শ্রীঅরবিন্দের মতে বেদের মধ্যে এমন অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাহা হইতে মনে হয় যে বেদসকল গুহ্যবাদ ও দার্শনিক মতে পূর্ণ। তাঁহার মতে বৈদিক দেবতাগণ মানসিক ক্রিয়ার (Psychological functions) প্রতীক; সূর্য্য বুদ্ধির প্রতীক, অগ্নি ইচ্ছার প্রতীক, এবং সোম অনুভূতির প্রতীক এবং প্রাচীন গ্রীসের অর্‌ফিক এবং এলিউসিনীয় মতের ন্যায় একটি গুহ্য ধর্ম্ম বেদে প্রকাশিত। মানব চিন্তার আদিম অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় অর্‌ফিক এবং এলিউসিনীয় গুহ্যবাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। বর্ত্তমানে ঋগ্বেদই তাহার একমাত্র ঐতিহাসিক লিখিত প্রমাণ। আধ্যাত্মিক এবং মনস্তাত্ত্বিক মানবীয় জ্ঞান কি জন্য স্থূল জড় মূর্ত্তি ও প্রতীকরূপে যবনিকার অন্তরালে সাধারণ লোকের অনধিগম্য করিয়া কেবলমাত্র দীক্ষিতদিগের বোধগম্য করিয়া রাখা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গুহ্যবাদিগণের মতে আত্মতত্ত্ব ও দেবতত্ত্বের জ্ঞান অতিগুহ্য, সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। অসংস্কৃত সাধারণ মনের নিকট এই জ্ঞান প্রকাশিত হইলে ইহার অসৎ ব্যবহার এবং ফলে ধর্ম্মহানি সম্ভবপর। এইজন্য ঋষিগণ দুই প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—একটি বাহ্য, সাধারণের জন্য, নির্দোষ না হইলেও ফলদায়ক। অন্যটি আন্তর—দীক্ষিতদিগের জন্য। তাঁহাদের ভাবপ্রকাশের জন্য তাঁহারা যে সকল শব্দের এবং কাল্পনিক রূপের ব্যবহার করিয়াছিলেন, দীক্ষিতগণ আধ্যাত্মিক অর্থেই তাহাদিগকে বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ উপাসকগণ তাহাদিগকে স্থূল অর্থে গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের এই মত ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ গ্রহণ করেন নাই। কেননা পূর্ব্ব-মীমাংসা এবং সায়নভাষ্যের সহিত এই মতের সামঞ্জস্য নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এইভাবে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই। সর্ব্বোত্তম আধ্যাত্মিক সত্য বেদমন্ত্রে নিহিত আছে, কিন্তু বুঝিতে না পারিয়া ভারতীয় চিন্তা তাহা হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া আসিয়াছে ইহা সম্ভবপর নহে। বেদের পরবর্ত্তী ধর্ম্ম ও দর্শনসকল প্রাচীনকালের স্থূল ইঙ্গিত ও সুনীতির প্রাথমিক ধারণা এবং আধ্যাত্মিক আস্পৃহা হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছে, ইহা মনে করাই সহজ। মানবচিন্তার বিকাশের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, তাহার সহিত এই ধারণার সামঞ্জস্য আছে। *

'ঋত'

"ঋতে"র রক্ষক বরুণ। যে নিয়মে বিশ্ব পরিচালিত, তাহাই ঋত। ঋত বিশ্বে অনুস্যূত। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণ, সকলের গতিই নিয়ন্ত্রিত। দিবার পরে রাত্রি আসে, রাত্রির পরে দিন। যড় ঋতু একটির পরে একটি নিয়মানুসারে আসে, ব্যতিক্রম হয় না। প্রত্যেক মাসেই কৃষ্ণপক্ষের পরে শুক্লপক্ষ, অমাবস্যার পরে পূর্ণিমা, নিয়মানুসারে আসে ও যায়। সর্ব্বত্রই নিয়মের রাজত্ব। এই নিয়মই ঋত। অধ্যাপক ডাঃ রাধাকৃষ্ণের মতে প্লেটোর সামান্যগণের (Universals, Ideas) সহিত ঋতের সাদৃশ্য

* সুরেশচন্দ্র সিংহরায়ের হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি—শৈবধর্ম্ম—১২

* Vide Indian Philosophy by Radhakrishnan. P A. 69–70.

আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ঋতেরই প্রকাশ—ঋতের ছায়া বা প্রতিফলন, পরিণামশীল জগতের অন্তরালে অবস্থিত অপরিণামী তত্ত্ব। সার্ব্বিক বিশেষের পূর্ব্ববর্ত্তী। বৈদিক ঋষির মতে যাবতীয় সমুৎপাদের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋত। সনাতন ঋতেরই প্রকাশ নিত্য পরিবর্ত্তমান জাগতিক ঘটনাবলীর মধ্যে। ঋতই সেইজন্য জগতের পিতা। দূরস্থিত ঋতের নিবাস হইতে মরুৎগণ আগমন করে। স্বর্গ ও মর্ত্ত ঋত হইতেই উদ্‌ভূত। ঋতই অপরিণামী সৎ বস্তু। অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মই সৎ। যাহা দেখা যায়, তাহা সেই সতের অপূর্ণ প্রকাশ। সৎ এক ও নিরংশ এবং অপরিণামী। কিন্তু যাহা নানা, তাহা পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী। অপরিবর্ত্তনীয় চিরস্থায়ী সতের ধারণা ইহা হইতেই উদ্‌ভূত হইয়াছিল। এই ঋতই পরে ঈশ্বরের ইচ্ছারূপে কল্পিত হইয়াছিল এবং সুনীতি ও ধর্ম্মের নিয়ম ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ঋতকে উল্লঙ্ঘন করা দেবতাদিগেরও সাধ্য ছিল না। "উষা ঋতের মার্গ অনুসরণ করে, সূর্য্য ঋতের মার্গ অনুসরণ করে।" * বহির্জগতে যে নিয়ম তাহাই নৈতিক জগতের ধর্ম্ম (virtue)। বিশ্বনিয়মের ধারক বরুণ নৈতিক ব্যবস্থারও (moral order) ধারক। তিনি "ঋতের গোপ" (রক্ষাকর্ত্তা) এবং পাপের শাস্তা। "হে, ইন্দ্র, আমাদিগকে ঋতের পথে মঙ্গলের পথে চালিত কর।"

মূর্ত্তিপূজা

বেদে মন্দির এবং এক "তাও"র কথা বলিয়াছেন। মূর্ত্তিপূজার কথা নাই। কেহ কেহ বলেন তখন পিতামাতার শ্রাদ্ধও ছিল না। কিন্তু ইহা সত্য নহে, পরলোকগত "পিতৃ"দিগকে দেবতাদিগের সঙ্গে আহ্বান করা হইত এবং যজ্ঞে প্রদত্ত দ্রব্য তাঁহারা গ্রহণ করিতেন, ইহা বেদে আছে।

কেহ কেহ বলেন বেদে পাপের কথা নাই। এই ধারণাও ভ্রান্ত। বহুস্থলে পাপের কথা এবং তাহার ক্ষমার জন্য প্রার্থনাও আছে।

* এই প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ লিখিয়াছেন: হেগেল তর্কশাস্ত্রের সাধকদিগকে (categories or universals) জগতের অথবা গ্রহদিগের সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী ঈশ্বর বলিয়াছেন। চৈনিক পণ্ডিত লাও তাও এই "তাও" (বিশ্বের নিয়ম) তাঁহার চরিত্রনীতি, দর্শন ও ধর্ম্মের ভিত্তি।

আমার প্রথম পড়ার বই*

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

ছোট বেলার সব প্রথম গল্পের বই কে কি পড়েছেন লোকের মনে রাখা খুব সহজ নয়, বিশেষ করে আধুনিককালের মানুষের। কেন না গত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে যে আমাদের কালের হাতে গোনা বই পড়ার দুঃখ আর এযুগের বড় হওয়া মানুষের নেই। তাঁরা জ্ঞান হবার সঙ্গেই ছবির বই দেখতে পেয়েছেন। ছবিতে অক্ষর পরিচয় করতে পেরেছেন। আশে-পাশে অসংখ্য বই পেয়েছেন। মাসিকপত্র পেয়েছেন, পেলেন বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা পুরাণের নানা রকমের রূপকথার ঝুলি। তাঁরা সেকালের শিশুদের চেয়ে ভাগ্যবান সন্দেহ নেই।

আমাদের সেকালে পিতামহী বা গুরুজনের কাছে রূপকথা ও পুরাণ-কথায় শোনাতেই আনন্দ ও জ্ঞান অর্জ্জনের ব্যবস্থা ছিল। পরে পড়তে আরম্ভ করা হলে প্রথম ভাগের পর দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গেই একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তে দেওয়া হ'ত। যুক্তাক্ষর শেখা হলে তার পরে শিশুবোধকের চাণক্যশ্লোক মুখস্থ করানো হ'ত।

একচন্দ্র পৃথিবীর অন্ধকার হরে,
লক্ষ লক্ষ তারা বল কি করিতে পারে।"

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

আলমারীভরা বাংলা বই সেদিনের অসাধারণ লোকদের বাড়ীও দেখা যেত না। যাঁরা সাহিত্য-রসিক তাঁদের বাড়ীতে বই থাকত বটে—কিন্তু আলমারী ভরে যাবে এত বই সেকালে ছিল না।

* * *

আমরা ছিলাম সুদূর প্রবাসে জয়পুরে রাজপুতানায়। অনেকের মনে হবে—সেখানে বই পাওয়া আরো দুর্লভ। দুর্লভ নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা আশে পাশে বইয়ের পাঠকপাঠিকা ও বই দেখতে পেয়েছি।

হেনকালে একদিন কেমন করে হাতে পড়ল একখানি আনন্দমঠ। বহু হাত ঘুরে বইখানির মলাট মলিন, একদিকে আধখানা উড়ে গেছে। বড়দিদি পাশে এসে দাঁড়ালেন, কি বইটা তিনিই পেলেন, মনে নেই।

* (নৈহাটী কাঁটালপাড়ায়) ৺বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।

দুজনেরই আগে পড়ার আকাঙ্ক্ষা। কেউ কারুকে আগে দিতে রাজী নয়। অগত্যা দুইবোনে পাশাপাশি বসে বই পড়তে আরম্ভ করলাম।

১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের কথা দিয়ে আরম্ভ। সকলেই জানেন ছোটবেলায় ছেলেমেয়েরা কথা আলাপ পড়তেই ভালবাসে। সরস সমৃদ্ধ ভাষায় বর্ণনার বা অলঙ্কার উপমার মধুর কাব্যরসের উপভোগের আনন্দ সে বয়সে মনে অনুভূত হয় না।

দু'এক পাতা উল্টে তবে গল্প পাওয়া গেল। গল্পের মানুষ বা পাত্রপাত্রী পেলাম, পদচিহ্ন গ্রামের জমিদার মহেন্দ্র সিংহ, কল্যাণী সুকুমারীকে পেলাম।

সে বয়সের মতে তখন গল্প সুরু হ'ল!

মহেন্দ্রের গ্রাম ত্যাগ, কল্যাণীর কন্যাসহ শ্রান্তি ও পিপাসা, মহেন্দ্রের জল অন্বেষণে যাওয়া, কল্যাণীর কন্যাসহ ক্ষুধিত নরখাদক দস্যুর হাতে পড়া—তারপর পলায়ন। রোমাঞ্চকর গল্প পাতার পর পাতায় এগিয়ে চলল।

সহসা ভ্রান্ত ভীত পলায়নমানা কল্যাণীর কানে এক অভয় সঙ্গীত এলো

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।'

এবং বনের পথে এক মহাত্মা সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হ'ল।

তারপর ইতিহাস তথ্য গল্প মিলিয়ে কাহিনী আরো এগিয়ে চলল। কিন্তু কেবা জানে সেদিন, কেবা সুবা বাঙলার নবাব, কেবা ইংরেজ, কায়া বা দুর্ভিক্ষপীড়িত করভারে বিপর্য্যস্ত বাঙলা দেশ বাসী! স্বদেশ কাকে বলে বা বিদেশীই কারা কিছুই বুঝি না। আর সন্তানই বা কারা তাও জানি না। সে হিসাবে এখনকার বালকবালিকারা ছোটরাও কিছু কিছু বোঝে মনে হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় বলেছেন, সমস্ত বুঝতে পারাটাই সব নয়, জীবনস্মৃতি না বুঝতে পেরে কিছু অনুভব করাটাও কম জিনিষ নয়।

সেকথা যাক্। আমরা পাতার পর পাতা উল্টে গল্প আলাপ কথা সংগ্রহ করি। আর এক অপূর্ব্ব ভাষায় অপূর্ব্ব মানুষের আশ্চর্য্য কাহিনী পড়ি যা পুরাণ রামায়ণ মহাভারতের গল্পের মত নয়, অন্য এক রকম। এবং ভাষাও যে সব বুঝি তাও না, তবু পড়ার সখ ছাড়ে না।

* * *

সহসা এলো অমর সঙ্গীত বা অমর মন্ত্র গায় বন্দেমাতরম্। সেও বোঝবার বয়স সেদিন নয়।

কিন্তু সত্যানন্দের মহেন্দ্র সিংহকে মা যা' ছিলেন, মা যা আছেন, মা যা' হবেন—দেখানো তো গল্পেরই অঙ্গীভূত। মায়ের রাজরাজেশ্বরী ঐশ্বর্য্যময়ী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি কথা পড়লাম। মায়ের শ্মশানকালী মূর্ত্তি—মার নগ্নিকা কঙ্কালমালিনী মূর্ত্তির কথাও সভয়ে পড়লাম। আবার মা যা হবেন, দিক্‌ভুজা নানাপ্রহরণধারিণী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, অসুর মর্দ্দিনী। দক্ষিণে ভাগ্যরূপিনী লক্ষ্মী, বামে বিদ্যাদায়িনী বাণী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্য সিদ্ধিরূপী গণেশকে নিয়ে জগন্মাতা মূর্ত্তি সত্যানন্দ গদগদ কণ্ঠে বলে দেখালেন। তাও পড়লাম।

কতকাল পরে বুঝলাম বঙ্কিমচন্দ্রই দেশবাসীকে দেশমাতৃকার ঐ অপূর্ব্ব দুর্গা দুর্গতিনাশিনী রূপ দেখালেন। দেখালেন আনন্দ সন্তানের কাছে দেশ ও দুর্গা একত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী। তারপর ঘটনার পর ঘটনায় গল্প চলল, কিন্তু কখন যে কেমন করে শেষ করেছিলাম তা আর মনে নেই। মনে রইল শুধু নামগুলি আর সন্ন্যাসী সন্তানদের আর তাদের কাহিনী গল্পটুকু। আর মনে রইল ছোটবেলায় বড় ভালোলাগা বড়ই কৌতুকময় কাহিনা, জীবানন্দের ভোজন বর্ণনা। কাঁচা কলাইয়ের দাল, জঙ্গুলে ডুমুরের ডালনা, পুকুরের মাছের ঝোল দিয়ে বোনের ভগিনীপতির সমস্ত অন্ন উদরসাৎ করা। নিমাইমণিকে জিজ্ঞাসা করা 'আর' কি আছে? তারপর একটা সমগ্র কাঁটাল ভক্ষণ! এবারে নিমাইমণি বল্লেন, 'দাদা আর কিছু নেই!'

তিনটী মধুর নারী চরিত্র নিমাইমণি, কল্যাণী, শান্তি। শান্তি চরিত্র আবার প্রদীপ্ত ও অনন্যসাধারণও বটে। তবু কোনোদিন আজো সেটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি, আশ্চর্য্য অসাধারণ মনে হয়েছে বটে। কিন্তু নিঃসংশয়ে মনে হয় যেন শান্তির মানুষ হবার ধরণে কপালকুণ্ডলার মত তারও ঐরকম অসাধারণ কিছু করা চলত।

একটু অবান্তর কথা হ'লেও বলি—আজকের দিনের অনেক সমালোচক, লেখক ও পাঠকের বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো নারীচরিত্র সম্বন্ধে নানারকম মত দেখা গেছে। সবচেয়ে বেশী আলোচনা হয়েছে রোহিণী হত্যা সম্বন্ধে। কিন্তু সহসা রূপ-মোহান্ধ গোবিন্দলালের দ্রুত পতনের পর অজ্ঞাতবাসের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি বঞ্চিত হওয়ার মানসিক সংঘাতের সঙ্গে প্রথমে আদর্শবাদী শেষে দুর্ব্বলচিত্ত ধনী তনয়ের মনোবৃত্তি হিসাবে এই ধরণের উন্মত্ত আকস্মিক হত্যা করা হয়ত অসম্ভব নয়।

আমাদের সমালোচকরা বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক আদর্শ অনুসারে ঐ হত্যা ঘটেছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয় শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের ভাষায় তার "অজ্ঞাতবাসের" বইয়ের ভূমিকা থেকে বলি, পাত্রপাত্রী আমি সৃষ্টি করি বটে, তাদের আমারি একটী আদর্শে গড়ি তাও সত্য। কিন্তু শেষকালে দেখি আমার আর তাদের উপর হাত নেই। তারা প্রাণ পেয়েছে এবং নিজেরা নিজের মতেই চলাফেরা করে। ("সত্যাসত্য" ভূমিকা)।

গোবিন্দলালের চরিত্র যেভাবে বিপথে চলেছিল সেখানে রোহিণীর এইরকম পরিণতি হয়ত অস্বাভাবিক নয়। এখন একথা যাক্। এর আগে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য বই পড়িনি। সেকালে আবার নভেল পড়ায় বা বই পড়ায় বিধি নিষেধ কিছু কঠোর ছিল। শুধু আশ্চর্য্য হয়ে পড়েছিলাম আনন্দমঠ। অবশ্য তার পরে ক্রমশঃ বঙ্কিমচন্দ্রের আরো অন্য সব বই পড়েছিলাম, কিন্তু কিছুই বিশেষ ভাবে মনে লাগেনি। শুধু মনে আঁকা রইল আনন্দমঠের কথা। সত্যানন্দ জীবানন্দ ভবানন্দের কথা। "সন্তান" নামে অসংখ্য বীর সন্ন্যাসীদের কথা। শান্তি নিমাই কল্যাণীদের কথা।

এই "আনন্দমঠই" যে কতবার পড়েছি বলা শক্ত। কখনো বইয়ের

আলমারী ঝাড়তে বসে, কখনো গোছাতে বসে, কখনো এমনি হাতের কাছে পেয়ে আর না পড়ে রাখা যায়নি।

* * *

সহসা এলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

সেদিন আর এই অপূর্ব্ব মাতৃমন্ত্র উদ্গাতা দেশমাতৃকার আরাধনার প্রথম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি জীবিত ছিলেন না এবং দেশ প্রথম কেমন করে কার মুখে ঐ মন্ত্র দীক্ষা নিল তাও কেউই হয়ত জানেন না। কিন্তু সেদিন আমরা ঐ সুদূর প্রবাসেও যেন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনেছিলাম। কানে নয়—যেন মনে মনেই শুনেছিলাম। কেন না স্বদেশী আন্দোলন সেদিন রাজোয়াড়ায় বিদ্রোহ বলে গণ্য ছিল। (মাসিকপত্রে সাপ্তাহিকের পাতায় সে শোনা)।

সেদিন ছোটরা আমরা কে বা জানি—বাংলাদেশ কোথা, কেমন করে ভাগ হ'ল—তাতে কার বা লাভ, কার বা ক্ষতি! রেলে চড়ে যাওয়া আসা করেছি মাত্র উৎসবেও প্রয়োজনে। কিন্তু স্বপ্নে দীক্ষা পাওয়া যায় একটা কথা শোনা যায়, আনন্দমঠের ঋষির দেশ যেদিন সুমন্ত ছিল, সেদিন প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে, তাকে তিনি স্বদেশ প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। যেন নিদ্রিত বালক দেশ স্বপ্নেই দেশমাতৃকার ধ্যান বন্দনা শুনেছিল শিখেছিল।

শুনেছিল এক মহামন্ত্রময় মাতৃবন্দনা, বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

* * *

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
নমামি অমলাং কমলাং অতুলাং সরলাম্।
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

অবাক হয়ে শুনেছিল, মাতৃভূমির এক অপূর্ব্ব রূপ বর্ণনা, আগে কেউ কখনো ভাবেনি কল্পনা করেনি এমন রূপের। অথচ এই বন্দেমাতরম্ গানটী তো আনন্দমঠের আগের রচনা। প্রায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রচিত। কমলাকান্তের দপ্তরের সমসাময়িক বলে বঙ্কিম-জীবনীতে অনুমান করা হয়।

* * *

এমনো মনে হয় এক এক সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সেবাব্রতী দেশসেবক সাধু সন্তানেরাও কি এই আনন্দমঠ থেকেই 'আনন্দ' দেওয়া নাম গ্রহণ করেছেন! জানিনা অবশ্য।

তবে দেশ যে 'বন্দে মাতরম্‌কে মন্ত্রের মত গ্রহণ করেছিল। আবাল-বৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে তা' তো নিজেরাই অনুভব করতে পারি। সেদিন অবুঝের মত দেশের মানুষ অজানা কি বেদনায়, কি অভাবে, নিদারুণ কি এক মনঃপীড়ায় বলেছিল, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

আর হাজার হাজার মানুষ আবালবৃদ্ধবনিতা বেরিয়ে এলো পথে ধন নিয়ে, প্রাণ নিয়ে,—সমস্ত জীবন নিয়ে। হাতে তাদের আনন্দমঠ ছিল, আর মুখে বন্দেমাতরম্।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 'শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে'—তেমনি করে তারা সেদিন অবুঝের মত ডেকেছিল, বলেছিল বন্দেমাতরম্।

তার পরে এলো শ্রীঅরবিন্দ—বারীন্দ্র রচিত অগ্নিযুগ। 'ফাঁসীর মঞ্চে' কতজন 'জীবনের জয় গান' গেয়ে আত্মবলি দিল আনন্দমঠের সন্তানদের মতই। সেদিনেও তাদের মুখে ছিল বন্দেমাতরম্।

ডাকার এই অময় মন্ত্র—স্বাধীনতার বীজমন্ত্র কমলাকান্তের দপ্তর আনন্দমঠের অমর লেখক কবি দীর্ঘকাল আগে দেশকে দিয়ে গিয়েছিলেন। দেশ সেদিন জানেও নি সেকথা।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক,...শেষজীবনে তিনি জাতীয়তাবোধের প্রেরণা-দাতা ঋষিত্ব লাভ করেছিলেন...।

বাল্মীকির রামায়ণে যেমন পড়ি, যতদিন পৃথিবীতে নদনদী গিরিপর্ব্বত থাকবে ততদিন এই অমর রামায়ণ কথা ভূতলে থাকবে। তেমনি আমরাও বলি যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে বাঙলাদেশও বাঙলা ভাষা থাকবে, বাঙালী থাকবেন, বন্দে মাতরমের কবি বাংলার সাহিত্য গুরু জাতীয়তাবোধের গুরু জাতির মনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

তাঁর জন্মবার্ষিকী পালন করে তাঁকে স্মরণ করে দেশবাসীই ধন্য হবেন, কৃতার্থ হবেন। বন্দে মাতরম্।

অভীপ্সার কবিতা

সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়

এই ধূধূ পৃথিবীর বহুমুখী চেতনার ত্রাস,
আকাশ-সীমান্ত রেখা বেদনায় বিবর্ণ ঘাস,
এই মাটি, এই দিন, এই ক্ষীণ জিজ্ঞীবিষা আর
মানুষ খোলস ছেড়ে, ভুলে গিয়ে চেনা জনতার
ভীষণ নিকটে থাকা, চলো যাই অন্য কোনখানে,
যেখানে পৃথিবী আর অতলান্ত বেদনা না জানে।

শুধু সুখ, শুধু মায়া, আর দেখে সাগরিক কোন বালিহাঁস
দিন যাবে চলে, হৃদয়ের অনুভূতি-রাশ,
সরল-স্বচ্ছন্দমনে খুলে দেবো, হোক্ আজ
অরণ্যের সাথে আমার মনের মাখামাখি,
আছি আমি এই ভালো, পৃথিবী সুন্দর আজ,
আমি যেন চিরদিন এই আমি থাকি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্ম্মসংস্থান ও গ্রাম্যশিল্প

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সমাপ্তির পর্য্যায়ে আসিয়াছে, আগামী মার্চ্চ মাসে ইহার মেয়াদ শেষ হইবে। সমগ্রভাবে পরিকল্পনাটি লক্ষণীয় সাফল্যলাভ করিয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট সকলেরই উৎসাহিত হওয়া স্বাভাবিক এবং তজ্জন্যই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রস্তুতি সারা দেশে উল্লেখযোগ্য আলোড়ন আনিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্তরূপ পায় নাই, খসড়া আকারেই রহিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় সাধারণ দেশবাসীর মনোযোগ দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রতি অধিকতর নিবদ্ধ হওয়ায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া সম্পর্কে বেসরকারী মহলে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে। বলা বাহুল্য, এই সকল আলোচনা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপদানে প্রভূত সাহায্য করিবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রধানতঃ মূলধন-আত্যন্তিক (Capital intensive)। এই পরিকল্পনায় প্রচুর টাকা সংগৃহীত ও ব্যয়িত হইয়াছে, পণ্যের উৎপাদনও বাড়িয়াছে লক্ষণীয়ভাবে—* কিন্তু এই সাফল্য সত্ত্বেও দেশের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি যে পরিলক্ষিত হয় নাই, তাহার কারণ এই পরিকল্পনার আমলে দেশবাসীর আশানুরূপ কর্ম্মসংস্থান হয় নাই। পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে পরিকল্পনা সংশ্লেষে সর্ব্বসমেত ১ কোটি লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে বলিয়া পরিকল্পনাকারগণ আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে বড় জোর ৫০ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। ভারতে বৎসরে অন্ততঃ ৩৫ লক্ষ লোক বাড়ে, কাজেই কর্ম্মসংস্থান ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ ব্যতীত কোন পুনর্গঠন পরিকল্পনাই সাধারণ দেশবাসীর আর্থিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে না। বেকার-সমস্যা ভারতের ভয়াবহ এক পুরাতন সমস্যা, ভারতে পূর্ণবেকারের সংখ্যা ৪ কোটির বেশি এবং অর্দ্ধবেকারের (যাহাদের পারিশ্রমিক জীবনধারণের নিম্নতম ব্যয়েরও নীচে) সংখ্যা অন্ততঃ ১৩ কোটি। কাজেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের সম্পদ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইলেও জনগণ এখনও তাহার দ্বারা সমানানুপাতে উপকৃত হয় নাই। অবশ্য, ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরিকল্পনার সামগ্রিক সফলতা পরিকল্পনাকারদের বা কর্ত্তৃপক্ষকে দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নিরিখে আশান্বিত করিয়াছে। বিশেষ করিয়া অন্তর্দ্দেশীয় মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন বলিয়াও অতঃপর আরও অগ্রসর হইবার ব্যাপারে তাঁহারা উৎসাহ-বোধ করিতেছেন। †

কাজেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষপাদে পরিকল্পনাকারগণের নিকট স্বভাবতঃই আশা করা যায় যে, তাঁহারা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় বিগত কয়েক বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইবেন। এ হিসাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্ম্মসংস্থানের উপর জোর থাকাই স্বাভাবিক। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, কর্ম্মসংস্থানের দিক হইতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ত্রুটি পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যেই সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়িয়াছিল এবং পরিকল্পনা কমিশনকে শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া দেশব্যাপী তীব্র বেকার-সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানের জন্য পরিকল্পনার বরাদ্দখাতে নূতন করিয়া ১৭৫ কোটি টাকা যোগ করিতে হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ যাহাতে বেশি হয়, তজ্জন্য সকল মহল হইতেই চাপ আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত পরিকল্পনার যে খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় ৪,৮০০ কোটি টাকার এই পরিকল্পনায় ১ কোটি ১০ লক্ষ লোকের কাজ জুটিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। এই কর্ম্মসংস্থানের হিসাব নিম্নরূপ :—

কৃষি ও তৎসম্পর্কিত কার্য্যাদি—১৫ লক্ষ, খনি ও কলকারখানা—১১ লক্ষ, গৃহনির্ম্মাণ ও ক্ষুদ্র শিল্প—৩০ লক্ষ, রেল, ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠান—৪ লক্ষ, অন্যান্য পরিবহন, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি—২০ লক্ষ, পেশা ও চাকুরী—২৪ লক্ষ।

---

* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২,২৪৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে। অর্থব্যয়ের সহিত পরিকল্পনার আমলে এদেশে পণ্যোৎপাদনও যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পণ্যের বা বিষয়ের ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দের অতিরিক্ত উৎপাদনের বা সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে :—খাদ্যশস্য—১ কোটি ১৪ লক্ষ টন, সেচের সুবিধাপ্রাপ্ত জমি—৮১ লক্ষ একর, শক্তিসম্পদ—১২ লক্ষ কিলোওয়াট, নূতন রাজপথ—৪৪৭ মাইল, কম্যুনিটি প্রজেক্ট্ বা সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থা (জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনাসহ)—৬০,৬০০ গ্রাম, নূতন বিদ্যালয়—(প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদি)—১৮,৪৫৫, নূতন হাসপাতাল—৪৭৯২টি, চা—৬ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, তূলা—১০ লক্ষ গাঁইট, সিমেণ্ট—১৩ লক্ষ টন, বস্ত্র (মিল ও তাঁতসহ)—১৬৫ কোটি গজ, কয়লা ৪০ লক্ষ টন।

সমগ্রভাবে ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ ১২ শতাংশের কিছু বেশি বাড়িয়াছে।

† জাতীয় আয়ের হিসাবে জাতীয় মূলধন গঠনের অর্থ সংগ্রহ বৃদ্ধি পাইলে সেই অবস্থা জাতীয় আর্থিক উন্নতিরই পরিচয় দেয়। ভারতে ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আয়ের শতকরা ৬.২ ভাগ জাতীয় মূলধন গঠনে মিলিয়াছিল, ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ৬.৮ ভাগ মিলিয়াছে।

এই ভাবে পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে ১ কোটি [illegible] লক্ষ লোকের কাজের আশা করিলেও খসড়া আলোচনাকালে কর্ম্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনাসূচক যে কোন পরামর্শ যে মনোযোগের সহিত বিবেচিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্ম্মসংস্থানের হিসাবে আশানুরূপ সাফল্য হয় নাই বলিয়া স্বভাবতঃই কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অধিকতর সচেতন হইয়াছেন। এজন্য বর্ত্তমানে নানা ভাবে কর্ম্মসংস্থানের নূতন পথ সন্ধানের চেষ্টা চলিতেছে।

কৃষি, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প—কর্ম্মসংস্থানের এই তিনটিই রাজপথ। কৃষির কথা বিবেচনা করিলে বলা যায় যে, কৃষি হইতে এদেশের বেকার-সমস্যা সমাধানের আশা দুরাশামাত্র। ভারতের কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত ও অত্যধিক জনসংখ্যার নির্ভরতায় ভারগ্রস্ত। কৃষিতে নূতন লোকের কাজের সুযোগ দূরে থাক, কৃষি হইতে অতিরিক্ত বিপুল লোকসংখ্যার একাংশ অন্ততঃ অবিলম্বে সরাইয়া আনাই এখন সমস্যা। ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রসারণে বহু লোকের কাজ জুটিতে পারে সত্য, কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যে মূলধনের প্রশ্ন বড় বলিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি ঘটিলে বা তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা মোটামুটি বৃদ্ধি পাইলে তবেই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার আশা করা যায়। আবার পক্ষান্তরে কর্ম্মসংস্থান যথেষ্ট হইয়া দেশের অভ্যন্তরভাগে সচ্ছলতা সৃষ্টি হইলে তবেই ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারিত হইয়া সাধারণ মানুষের সচ্ছলতা সৃষ্টি করিতে পারে।

তাহা হইলে বাকী থাকে শিল্পের ক্ষেত্র। অর্থনীতির দিক হইতে শিল্পকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, বৃহৎ যন্ত্রশিল্প এবং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। বৃহৎ শিল্পে উৎপাদন বেশি হয় বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে, সেখানে যন্ত্র সহায়তা করে বলিয়া পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সমানানুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে না। এই কারণেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে বৃহৎ শিল্পের লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখা গেলেও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা তদনুসারে বৃদ্ধি পায় নাই।* বলা নিষ্প্রয়োজন, এ অবস্থা জনস্বার্থের হিসাবে শুভ নয়। সম্প্রতি শিল্পোন্নয়নের নামে শিল্পসংস্কার বা র‍্যাশানালাইজেসনের যে ধূয়া উঠিয়াছে, তাহাতে উন্নততর উৎপাদনপ্রণালী অতিরিক্ত লোক নিয়োগের সম্ভাবনাকে বহুলাংশে সঙ্কুচিত করিয়াছে। শিল্পের এককগত বা প্রতিষ্ঠানগত স্বার্থে ইহা যতই শুভ হউক, বেকার-সমস্যার মত জাতীয় সমস্যার দিক হইতে ইহা হতাশারই সৃষ্টি করে। ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথাবিলোপের প্রয়াসে এবং বহুসংখ্যক শিল্পকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণার দ্বারা সরকার শিল্পক্ষেত্রে অন্যায় মুনাফাবৃত্তি বা জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলতা বন্ধের চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু তবু বেকার সমস্যার সমাধানসূচক না হইলে এই সব চেষ্টা আশানুরূপ জনপ্রিয় হইতেই পারে না। উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভারতের বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা বেশি না হইলে যথেষ্টসংখ্যক নূতন লোকের কর্ম্মসংস্থানের আশা নাই।

গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে অবস্থা একটু অন্যরকম। ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে এলাকাগতভাবে এবং সহরাঞ্চলে। এই শিল্পের প্রত্যক্ষ সংযোগ একাংশ দেশবাসীর সঙ্গে মাত্র। ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮২ ভাগ পল্লীঅঞ্চলে বাস করে। এই পল্লীগুলি শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে প্রায়শঃই বিচ্ছিন্ন। পল্লীবাসীদের কৃষিক্ষেত্রই প্রধান নির্ভরস্থল, কৃষিই প্রধান উপজীবিকা। ব্যক্তিগত অর্থাভাব ও প্রয়োজনীয় বহিঃসংযোগের অভাবে বৃহৎ-শিল্পজাত পণ্য তাহারা খুবই কম ব্যবহার করে, আবশ্যকীয় পণ্যের জন্য তাহারা মূলতঃ নির্ভর করে কুটীর শিল্পের উপর। কাজেই গ্রাম্য শিল্পের প্রকৃত উন্নতি-সূচক কার্য্যকরী কোন পরিকল্পনা হইলে ২৯ কোটি ভারতবাসীর সরাসরি উপকৃত হইবার কথা। গ্রামময় ভারতের পল্লীঅঞ্চলে বেকার-সমস্যা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সেখানে অধিকাংশ লোকই অর্দ্ধ বেকার। কাজেই ভারতের সত্যকার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হইলে এবং বেকার সমস্যার কার্য্যকরী সমাধান করিতে হইলে পল্লী-ভারতের অধিগম্য পরিকল্পনারই দরকার। এ হিসাবে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পের প্রসারের গুরুত্ব অপরিমেয়। ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষ ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুসরণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গান্ধীজীর সর্বোদয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে এবং ইহার উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন। ইহা সত্য হইলে অসহায় ও অবজ্ঞাত পল্লীবাসীর কর্ম্মসংস্থানের তথা আর্থিক সাচ্ছল্য সম্পাদনের প্রশ্ন সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। কুটীর শিল্পের আয়োজন সামান্য বলিয়া ইহার প্রসার অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের মত মানুষের শ্রমলাঘব করিয়া অধিকতর সংখ্যক লোককে আয় ও কাজ হইতে বঞ্চিত করার পরিবর্ত্তে ইহা অধিকতর সংখ্যক লোকের কাজের ব্যবস্থা করে। এইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখে নূতন কর্ম্মসংস্থানের পথ-সন্ধানে আগ্রহশীল পরিকল্পনা-কমিশন ভারতের গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতিসূচক সুপারিশের জন্য শ্রী ডি জি কার্ভের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটিতে শ্রী কার্ভে ছাড়া অধ্যাপক ডি আর গ্যাডগিল, শ্রী ভি এল মেটা প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। কার্ভে কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং কমিটি দৃঢ়তার সহিত গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পের বিপুল প্রসার-সম্ভাবনার কথা বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সুপারিশ মত ২৫৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এই শিল্পের জন্য বরাদ্দ হইলে ইহা হইতে ৪৫ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হইতে পারে। বিষয়টি তাঁহারা এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করিয়াছেন

* বৃহৎশিল্পে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি যে সমানানুপাতিক নয়, তাহা নিম্নের হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে :—

বৎসর	শিল্পোৎপাদনের সূচকসংখ্যা (১৯৪৬=১০০)	শিল্পশ্রমিক সংখ্যা
১৯৫০	১০৫'০	২৫,০৪,৩৯৯
১৯৫১	১১৭'২	২৫,৩৬,৫৪৪
১৯৫২	১২৮'৯	২৫,৬৭,৪৫৩
১৯৫৩	১৩৫'২	২৫,২৮,০২৬

যে, এই শিল্প পরিচালনার সুবিধার জন্য তাঁহারা কেন্দ্রে এক স্বতন্ত্র সচিব-দপ্তর দাবী করিয়াছেন। তাঁহাদের হিসাবমত এই শিল্পসম্প্রসারণে কেন্দ্রীয় খাতে ২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং রাজ্যসমূহের হিসাবে ২৩৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যায়ত হওয়া দরকার। রাজ্যের ক্ষেত্রে সমবায়-মন্ত্রীকে এই বিভাগের ভার লইতে বলা হইয়াছে, কারণ গ্রাম্য শিল্প বা কুটীর শিল্পের আগাগোড়া পরিচালনা সমবায় সমিতির সাহায্যে না হইলে অজ্ঞ, অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রাম্যশিল্পীর ক্ষতিগ্রস্ত হইবারই সম্ভাবনা। কার্ভে কমিটি তাঁহাদের প্রস্তাবিত ব্যয় যে সব খাতে বরাদ্দ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

হস্তচালিত তাঁতশিল্পে তুলাজাত বস্ত্রবয়ন—৮০ কোটি টাকা, বিকেন্দ্রীভূতভাবে তুলাজাত সূতা ও খাদির জন্য—২৩ কোটি টাকা, তাঁতে রেশম ও পশমের বস্ত্রবয়ন—৫ কোটি টাকা, গ্রাম্য তৈলশিল্প—১৩ কোটি টাকা, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—৬৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া কমিটি পরিকল্পনা পরিচালনা, শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করিয়াছেন।

গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের খাতে (গৃহনির্ম্মাণ সমেত) পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় ৩০ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থানের আশা করিলেও কার্ভে কমিটি তাহার স্থলে এ হিসাবে ৪৫ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান অনুমান করিয়াছেন। এদিক হইতে কার্ভে কমিটির আশাবাদী মনোভাব খসড়া পরিকল্পনা বিবেচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত বিবরণে দেখা যাইতেছে, কার্ভে কমিটি গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন সর্ব্বপ্রকার শিল্পের মধ্যে হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের উপর সর্ব্বাধিক জোর দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মিল ও শক্তিচালিত তাঁতের উৎপাদন বর্ত্তমানের বার্ষিক ৫০০ কোটি গজ ও ২০ কোটি গজ হইতে আর বাড়াইয়া কাজ নাই, সেস্থলে তাঁহারা হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদন বর্ত্তমানের ১৫৫ কোটি গজের স্থলে ৩২০ কোটি গজ পর্য্যন্ত বাড়াইবার কথা বলিয়াছেন।

কর্ম্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কার্ভে কমিটি সমস্ত গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উপর সর্ব্বাধিক জোর দেওয়ায় এ বিষয়টির প্রতি এখন চিন্তাশীল সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ উচ্ছ্বসিতভাবে ইহার সমর্থন করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ইহার অসম্ভাব্যতার উল্লেখ করিয়া তীব্র প্রতিবাদও জানাইয়াছেন। শ্রীবৈকুণ্ঠলাল মেটা পরিচালিত 'নিখিল ভারত পল্লীশিল্প বোর্ড' এই প্রসঙ্গে আরও একধাপ আগাইয়া গিয়াছেন। বলিতে গেলে কার্ভে কমিটির হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিতের পরিপূরক প্রতিশ্রুতি হিসাবে তাঁহারা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যদি ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫ লক্ষ অম্বর চরখা চালু করা হয়, তাহা হইলে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের হিসাবে কর্ম্মসংস্থান সমস্যার আরও সুষ্ঠু সমাধান হইবে। তাঁহাদের মতে ইহাতে সূতা উৎপাদনে ৫ লক্ষ লোকের, ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার তাঁতীর ও তাহাদের ৪ লক্ষ ২৫ হাজার সহকর্ম্মীর, ৭২ হাজার ছুতোর মিস্ত্রি ও এই শ্রেণীর লোকের এবং ২০ হাজার পরিচালকশ্রেণীর কর্ম্মীর কর্ম্মসংস্থান হইবে। সমগ্রভাবে ইহাতে কাজ হইবে ৪০ লক্ষ লোকের। কাজেই দেখা যাইতেছে, এই পল্লীশিল্প বোর্ড গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অপর সব হিসাব বাদ দিয়া শুধু নূতন ধরণের অম্বর-চরখা প্রবর্ত্তন দ্বারাই ৪০ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থানের আশা রাখেন, কাজেই এই হিসাব যথার্থ হইলে সমগ্রভাবে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতে কর্ম্মসংস্থান কার্ভে কমিটির অনুমিত ৪৫ লক্ষ অবশ্যই ছাড়াইয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ার ৩০ লক্ষ লোকের তুলনায় এই খাতে কর্ম্মসংস্থানের প্রকৃত সংখ্যা হইবে অনেক বেশি।

জাতীয় স্বার্থে আশাবাদী হওয়া ভাল, কিন্তু অপরিমিত আশাবাদী সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব অনেক সময়ই পরিকল্পনাদির ক্ষেত্রে অনর্থ সৃষ্টি করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি লোকের কর্ম্মসংস্থানের যে আশা করা হইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে মূলতঃ বেকার-সমস্যা খাতে ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াও সেই প্রাথমিক আশার অর্দ্ধাংশ পূরিত হয় নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়া উচিত। অবশ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ায় জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিমূল কিছুটা দৃঢ় হইয়াছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থের বরাদ্দও যেমন বেশি হইতেছে (২২৪৩ কোটির স্থলে ৪,৮০০ কোটি টাকা), কর্ম্মসংস্থানোপযোগী শিল্পপ্রসারের উপরও তেমনি জোর পড়িতেছে, কাজেই হয় তো ১ কোটি ১০ লক্ষ বা ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান এবারের পরিকল্পনায় অসম্ভব নয়। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের মূল হিসাব অতিক্রম করিয়া অধিকতর আশাপ্রদ কোন হিসাব উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। এইভাবে হিসাব হইলে তজ্জন্য ব্যয়সাপেক্ষ আয়োজনও করিতে হয় এবং ফলে লক্ষ্য পূর্ণ না হইলে মানুষের মূল্যবান কর্ম্মোৎসাহ ও শ্রমশক্তি সমেত জাতীয় অর্থের নিদারুণ অপচয় ঘটিবার আশঙ্কা আছে।

এই দৃষ্টিকোণ হইতেই পল্লীশিল্প বোর্ডের তথা কার্ভে কমিটির গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কর্ম্মসংস্থানের অনুমান বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইতে ভয় হয়। গ্রাম্যশিল্পের সবচেয়ে বড় ভরসা তাঁতশিল্প। এ হিসাবে নিখিল ভারত পল্লীশিল্প বোর্ড ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে অম্বর চরখার প্রবর্ত্তন করিয়া যে ৪০ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থানের আশা করিতেছেন, তাহা সফল হইবে কি না সে সম্পর্কে আমাদেরও সন্দেহ আছে। হস্তচালিত এই তাঁতশিল্পের সম্প্রসারণের জন্য মিলের সূতা এবং বস্ত্রোৎপাদন একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, অথচ এক্ষেত্রে তাঁতের জন্য প্রয়োজনীয় সূতা এবং তাঁতের কাপড়ের দাম মিলের উৎপাদনের হিসাবে অধিক হইবে বলিয়া তাহা হয়তো জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক হইবে না। এইভাবে উৎপন্ন কাপড় মোটা হইবে, তাহার আশানুরূপ বাজার পাওয়া কঠিন। কর্ত্তৃপক্ষ সমবায় সমিতির সাহায্যে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ আশা করেন, আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন

এখনও বলিষ্ঠ হয় নাই বলিয়া যেদিক হইতেও সাফল্য কতটা হইবে বলা যায় না।

তাছাড়া এভাবে যে ৪০ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থানের আশা করা হইয়াছে, তাহাদের পারিশ্রমিক অন্নসংস্থানের পক্ষে যথেষ্ট কি না, সে প্রশ্নও সাবধানতার সহিত বিবেচ্য। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাদের তরুণ গ্রাম্যশিল্পী একম্বরনাথম্ পরিকল্পিত চরখার ইতিমধ্যেই প্রভূত সংশোধন হইয়াছে এবং এখনও ইহার কার্য্যকারিতার মান অনিশ্চিত। তদুপরি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই চরখায় একজন ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে তাহার আয় হইবে মাত্র একটাকা। দিনে নিয়মিতভাবে আট ঘণ্টার বেশি কাজ করা কঠিন। বলা নিষ্প্রয়োজন, আজকাল নিম্নতম পারিশ্রমিক নির্দ্ধারক আইন (Minimum Wages Act) প্রচলিত হইবার পর দিনে আট ঘণ্টা পরিশ্রমে মাত্র একটাকা রোজগার কল্পনাও করা যায় না এবং এভাবে একজনের কর্ম্মসংস্থানের অর্থ তাহাকে স্থায়ীভাবে অর্দ্ধ-বেকার করিয়া রাখা। বেকার ব্যক্তি তবু ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে পারে, আন্দোলন করিতে পারে, ভাগ্যান্বেষণে দেশান্তরীও হইতে পারে। অর্দ্ধবেকারের অবস্থা ইহার চেয়ে অনেক বেশি শোচনীয়। সে ধীরে ধীরে ক্ষয় পায়, কাজ থাকার মোহজালে বদ্ধ হইয়া ক্রমেই জীবন-সংগ্রামে অক্ষম হইয়া উঠে। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এরূপ অর্দ্ধবেকারেরা নিঃসন্দেহে ভারস্বরূপ। ইহার পর যদি তাহাদের ভাগ্য লইয়া পরীক্ষা চলে, অর্থাৎ পর্ব্বত প্রমাণ জাতীয় অর্থের অপচয়ের পর ব্যর্থতার জন্য পরিকল্পনাটি বাতিল হইয়া যায়, তাহা হইলে অবস্থার ভয়াবহতা সহজেই অনুমেয়। একখানি অম্বর চরখার জন্য খরচ একশত টাকার মত, দরিদ্র গ্রাম্যশিল্পী এই চরখা নিজে কিনিতেতো পারিবেই না, আমাদের দেশে সমবায় সমিতিগুলির যে অবস্থা, সমবায় সমিতিও উহা প্রায় ক্ষেত্রেই যোগাইতে পারিবে না। কাজেই এ পরিকল্পনা চালু করিতে সরকারকেই চরখা ও তুলা যোগাইতে হইবে এবং বস্ত্র বাজারে কাটাইবার দায়িত্ব লইতে হইবে। পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য অর্থব্যয় সম্ভব বলিয়া সরকার হয়তো সমখিক ভাবে চরখা ও তুলা যোগাইলেন, কিন্তু তৈয়ারী পণ্যের গুণের উপর বাজার নির্ভর করে বলিয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এভাবে উৎপন্ন বস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বাজারজাতকরণে স্থির নিশ্চয় হইতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে যুদ্ধকালীন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের কথা স্মরণযোগ্য। সকলেই জানেন, সে সময় বাজারে চরম বস্ত্রাভাব সত্ত্বেও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ মোটেই জনপ্রিয় হয় নাই।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে পণ্যোৎপাদন ক্রমেই বৃহৎশিল্পের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইতেছে। এ সময় ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে কুটিরশিল্প প্রসারের যুক্তি যাহাই থাক, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের উৎপাদন-মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের উপর এবং সবচেয়ে বড় করিয়া উচ্চমানের পণ্য চাহিদা অনুযায়ী বাজারে সরবরাহ করার উপর দৃষ্টি রাখিতেই হইবে। সে হিসাবে মিলের সুতা ও কাপড় উৎপাদন বাধ্যতামূলকভাবে বর্ত্তমানের হারে আটকাইয়া রাখার যৌক্তিকতা অবশ্যই সন্দেহের অতীত নয়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মাদ্রাজের প্রকাশম-মন্ত্রীসভা একবার খাদিশিল্পের প্রসারের জন্য মাদ্রাজে নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা বন্ধ করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সে সময় দেশে জনমত এখনকার মত সচেতন ও সক্রিয় ছিল না, তবু অনেকেই গ্রাম্য অর্থনীতি উন্নয়নের এই প্রয়াসকে আধুনিককালের একান্ত অনুপযোগী মনে করিয়া প্রচণ্ড আপত্তি করায় সঙ্কল্পটি শেষ পর্য্যন্ত রূপায়িত হয় নাই। গান্ধীজীর অর্থনীতিতে গ্রাম্য কৃষিশিল্পের বিকাশই বড় কথা, কিন্তু পৃথিবী বর্ত্তমানে দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া আধুনিক জগতের ধারাকে অস্বীকার করাও কাজের কথা নয়। সংরক্ষণনীতি অতি সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই মূল্যবান, দীর্ঘদিনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের মূল্যে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রাকার শিল্প সংরক্ষিত হইলে অনিবার্য্যভাবে বিদেশী পণ্যের আমদানী বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস এবং সেক্ষেত্রেও সংরক্ষণনীতির প্রয়োগ আমাদের বৈদেশিক নীতির পক্ষে শুভ নয়। মিলে প্রয়োজনানুযায়ী বস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং উৎপন্ন বস্ত্রের মানরক্ষার নিশ্চয়তা আছে, কাজেই অম্বর চরখা প্রবর্ত্তনের জন্য মিলের অতিরিক্ত উৎপাদন সরকারী হস্তক্ষেপে বন্ধ করিয়া দিলে পণ্যাভাবগ্রস্ত এদেশে অদূর ভবিষ্যতেই কাপড়ের চাহিদা ও যোগানে অসামঞ্জস্য ঘটা স্বাভাবিক।* হস্তচালিত তাঁতে বর্ত্তমানে কাপড় উৎপন্ন হইতেছে ১৫৫ কোটি গজ, এই উৎপাদন ৩২০ কোটি গজে তোলা নিঃসন্দেহে অতি কঠিন কাজ। অথচ ভারতের এখন যে অবস্থা তাহাতে অবিলম্বে বস্ত্রোৎপাদন বাড়াইতেই হইবে।† খাদ্য, আশ্রয় ও বস্ত্র মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু। বেকার মানুষের ভাগ্য লইয়া নাড়াচাড়া করিবার পূর্ব্বেতো বটেই, বস্ত্রোৎপাদন সম্পর্কিত কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার পূর্ব্বেও প্রচেষ্টার সার্থকতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা অত্যাবশ্যক। এই অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বাহিরের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া ভারতের শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীটি টি কৃষ্ণমাচারী স্বয়ং ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ের অম্বর চরখার প্রস্তাব এবং প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বস্ত্রোৎপাদন হইতে মিলগুলিকে বঞ্চিত করিবার প্রস্তাবে সুস্পষ্ট আপত্তি জানাইয়াছেন।

---

* মিলে এই অতিরিক্ত বস্ত্রোৎপাদন অবশ্যই বড় কথা নয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল অতিরিক্ত ৪৭০ কোটি গজ উৎপাদন, পরিকল্পনার মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই মিলে অতিরিক্ত উৎপাদন ৪৯১ কোটি গজে পৌঁছিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধোত্তর বস্ত্র শিল্পের পুনর্গঠন সম্পর্কে ভারতসরকার ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ ডি এম খাটাউয়ের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠন করেন, তাঁহাদের রিপোর্টে বলা হইয়াছিল যে, অনুকূল আবহাওয়ায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বৎসরে ৮০০ কোটি গজ কাপড় উৎপাদন মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

† জীবনযাত্রার মান যতই বাড়িতেছে, ভারতবাসী এখন ক্রমশঃ ততই বেশি কাপড় ব্যবহার করিতেছে। আগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবাসী মাথাপিছু ১১·৮৬ গজ কাপড় ব্যবহার করিয়াছিল, ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবহার করিয়াছে ১৫·৩০ গজ। ভারতের লোকসংখ্যা অবিরাম বাড়িতেছে বলিয়া ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের লোকসংখ্যা ৪০ কোটি মত দাঁড়াইবে। এ হিসাবে সভ্যসমাজের সাধারণ নিম্নতম পরিমাণ বৎসরে মাথাপিছু ১৮ গজ কাপড় ধরিলে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে মাথাপিছু যথাক্রমে ৬৪ গজ ও ৩৫ গজ) অপরিহার্য্য রপ্তানীর হিসাব বাদ দিয়া ভারতের অতিরিক্ত ২০০ কোটি গজের মত কাপড় লাগিবে। এই অত্যাবশ্যক বস্ত্রোৎপাদন অম্বর চরখা তথা গ্রাম্য-শিল্পের উপর সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিলে ইচ্ছা করিয়া অনিশ্চয়তার মধ্যে ঢুকিয়া পড়া হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীচন্দন গুপ্ত

অরোরা ফিল্মস্-এর 'মহানিশা' সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মঞ্চে 'মহানিশা' অভিনীত হইয়াছে ও চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। আলোচ্য চিত্রকে ছবির দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যায়। অনুরূপা দেবীর এই বহুপঠিত উপন্যাসটির চিত্ররূপ যে এবার আমাদের এমনভাবে হতাশ করিবে, ইহা কেহই ধারণা করিতে পারেন নাই। চিত্র-নাট্য, কোন চেষ্টা করা হয় নাই। শিল্পী নির্ব্বাচনে আনুসঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপারে প্রযোজক যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ার মূল কারণ চিত্র-নাট্য, দৃশ্যসজ্জা, বেশ-বিন্যাস প্রভৃতি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাধিকা-প্রসন্নরূপী ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের মাথার পরচুলাটি যাত্রাদলকেও লজ্জা দিয়াছে। দীর্ঘদিন সুটিং-এর মধ্যেও কি উহা পরিচালক প্রযোজকের চোখে পড়ে নাই? 'মহানিশা' দেখিতে বসিয়া মনে হইয়াছে, আমরা দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের কঠোর সাধনায় চিত্রশিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া চলিয়াছিলাম সহসা তাহার যেন অবনতি ঘটিল।

চিত্র-শিল্পের গোড়ার যুগে যে কয়েকজন বাঙ্গালী

ভারতে উজবেকীস্থানের আগন্তুক মহিলা প্রতিনিধিদের নৃত্যানুষ্ঠান

চিত্রগ্রহণ, পরিচালনা সর্ব্ববিষয়ের দুর্ব্বলতা ছবিটির সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেকার গৃহীত ছবির সহিত তুলনা-মূলক বিচারে ছবিটি যে দর্শকদের মনে আদৌ রেখাপাত করিতে পারে নাই সেকথা বলাই বাহুল্য। আঙ্গিকের দিক হইতে ছবিটিকে যতটুকু ভাল করা যাইত তাহারও এ ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছিলেন অরোরা ফিল্মসের মালিকেরা তাঁহাদের অন্যতম। চিত্র-শিল্পের বহু দুর্য্যোগ দুর্দ্দিনে তাঁহারা এই শিল্পটিকে বাংলাদেশে যথারীতি জিয়াইয়া রাখিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং প্রযোজনার ক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আলোচ্য চিত্রে যন্ত্রের

একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় শুভানুধ্যায়ী হিসাবেই তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

*   *   *

সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের হিন্দী 'দেবদাস' মুক্তিলাভ করিয়াছে। প্রযোজনা ও পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীবিমল রায়। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'দেবদাস' বাংলা ও বাঙ্গালীর চিত্ত যে ভাবে জয় করিয়াছিল তাহার কাছে পরিচালক বিমল রায়ের 'দেবদাস' ততটা সুনাম অর্জন করিতে পারে নাই। দীর্ঘদিন আগে দেখা বাংলা 'দেবদাস' সম্পর্কে যতদূর মনে আছে, সেখানে 'দেবদাসের' নিকট পার্ব্বতী যেন ছিল নিষ্প্রভ। আর হিন্দী 'দেবদাসে' তাহার উল্টো হইয়াছে। অর্থাৎ পার্ব্বতীর তুলনায় দেবদাস নিষ্প্রভ। কেন এমন হইল তাহা একটু চিন্তা করিলেই সহজে অনুমান করা যায়। সেবার পার্ব্বতী ছিলেন অবাঙ্গালী, আর এবার দেবদাস হইয়াছেন তাহাই। 'দেবদাস' বাংলা বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাবধারা ও দেশাচারে গঠিত কাহিনী। যাহার রূপ ও রসের সহিত সম্পর্ক নাই, তাহাকে যথাযথ রূপায়িত করা কষ্টসাধ্য। তথাপি দিলীপকুমার অভিনয়কে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। দেবদাসকে শরৎচন্দ্র যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার তুলনায় দিলীপকুমার যেন একটু সামঞ্জস্যহীন। Romantic hero হিসাবে হিন্দী ছবিতে দিলীপকুমার যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, দেবদাস অন্ততঃ সে ধরণের Romantic hero নয়। এদিক হইতে বিচার করিলে দিলীপকুমারকে একটু বেমানান বলিয়াও মনে হইয়াছে। শ্রীমতী সুচিত্রা সেন পার্ব্বতীকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় দেখিতে দেখিতে মনে হইয়াছে—হিন্দীর পরিবর্ত্তে যদি বাংলা সংলাপ বলিবার তাঁহার সুযোগ হইত তাহা হইলে অভিনয় অধিকতর সাফল্য লাভ করিত। সংলাপের দিকে বিশেষ যত্ন লওয়ার ফলে তাঁহার অভিনয়ের গতি মধ্যে মধ্যে ব্যাহত হইয়াছে। তথাপি শরৎচন্দ্রের পার্ব্বতী সুচিত্রার মাধ্যমে যে পরিপূর্ণ রূপ পাইয়াছে তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। পরিচালনার দিক হইতে শ্রীবিমল রায় তাঁহার পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কয়েক স্থানে নাটকীয় গতি ও প্রকৃতির সহিত তিনি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র shot সংযোজিত করিয়াছেন, তাহাতে যে কেবলমাত্র তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, তাহা তাঁহার গভীর মননশীলতার পরিচায়ক।

*   *   *

গত ১৩ই জানুয়ারী শুক্রবার রাত্রি ১২টায় মঞ্চ ও চিত্রজগতের খ্যাতনামা অভিনেতা রবীন্দ্রমোহন রায় (রবি রায়) কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যয়নকালে ছাত্রাবস্থায় তিনি শিশিরকুমারের সংস্পর্শে আসেন এবং ইয়ুনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউটে শিশির-

রবীন্দ্রমোহন রায়

কুমারের সহিত বহু নাটকে অভিনয় করেন। পরে ১৯২১ সালে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। দীর্ঘ ৩৫ বৎসরাধিকাল তিনি বিভিন্ন মঞ্চে ও চিত্রে বহু ধরণের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া শিল্পীজীবনে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি একাধারে শিল্পী, সাহিত্যানুরাগী ও গীতিকার ছিলেন। সঙ্গীতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। বহু নাটকে তিনি সঙ্গীতেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রঙমহল থিয়েটারের সংগঠকদের অন্যতম। তাঁহারই প্রচেষ্টায়

রঙমহল থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং তিনিই উহার নামকরণ করেন। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত 'শ্যামলী' নাটকে পীতাম্বরের ভূমিকায় তিনি শেষ মঞ্চাবতরণ করেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ষ্টার থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি চক্ষুরোগে ভুগিতেছিলেন। চক্ষুর অস্ত্রোপচারের পরে তিনি অকস্মাৎ রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত হন। মেডিকেল কলেজের চক্ষুবিভাগ হইতে সাধারণ বিভাগে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বহু বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাহিত্যিক-নাট্যকার ও চিত্র-পরিচালক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও নিমতলা শ্মশানঘাটে সমবেত হন। তাঁহার মৃত্যুতে রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। মৃত্যুকালে স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, নাতি-নাতনি ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

* * *

খ্যাতনামা শিল্পী ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্প্রতি পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিনি অন্যতম বংশধর ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকায় তিনি এক সময় সহ-সম্পাদক ছিলেন। 'শ্যামা' প্রভৃতি নাটক লিখিয়া তিনি রঙ্গজগতে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি একাধারে চিত্র-শিল্পী, সাহিত্যিক-নাট্যকার এবং অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলি সাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার অসুস্থ হইলে তিনি একসময়ে 'বিজয়া' নাটকে শিশিরকুমারের স্থলে রাসবিহারীর ভূমিকায় অবতরণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

* * *

১৯৫৫ সালে মোট ৪৯খানি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে ৫-৬টী ছবি ব্যবসার দিক হইতে লাভবান হইয়াছে। ৮-১০টী ছবি খরচ তুলিয়া যৎসামান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাকী ছবিগুলি কতদিনে খরচা তুলিতে পারিবে তাহা বলা যায় না। ইহার মধ্যে এমনও কতকগুলি ছবি আছে, যাহার আদৌ খরচা উঠিবে

ফ্লোরা কাইদানী—উজবেকী নৃত্যশিল্পী

কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বাংলা ছবির ব্যবসা-ক্ষেত্রের বর্ত্তমান নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখিয়া ছবি নির্ম্মাণ বিষয়ে প্রযোজকদের অতঃপর সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

বসন্তের একটি প্রভাত

সুনীল বসু

নীল ভোর মুছে গিয়ে লাল সকাল শুরু হোলো। পাখিদের কিচিরমিচির সেও স্তব্ধ হোলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আঙুর তার শুভ্র মুখটি দেখলো—একটু মুচ্‌কি হাসলো সেই সংগে। ক্ষীণ কটি, তরল মদির চোখ, আর সামান্য বাঁকা ভুরু ঈষৎ কাঁপলো। তারপর সরে এলো সেখান থেকে। নিজের মনে আস্তে আস্তে উচ্চারণ ক'রলে—যেন রেশমের চেয়েও মিহি কণ্ঠে—আঃ সুইট, কী সুন্দর সকাল—কী সুন্দর! জানালার বাইরে শিশির ঝরেছে—সবুজ একফালি লনে—সেই শিশিরের ছোঁয়ায় জানালার ধার গিয়েছে ভিজে—সেই নরম তুলতুলে শিশিরটুক্‌রো তুলে নিয়ে আঙুর ওর মুখে মাখতে লাগলো—আঃ কী ঠাণ্ডা এরা, কী পাত্‌লা!

হঠাৎ যেন আঙুরের শাঁখের মতো শুভ্র কণ্ঠে গানের ঢেউ এলো—ছিট্‌কে বেরুতে চাইলো একমুঠো রঙিন সুর—সে গাইলো,—In such a glorious morn, I remember thee oh,—যেন আজ আঙুরের সমস্ত ইন্দ্রিয় আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে গেছে। এই যে প্রবাল-প্রান্ত-দুর্লভ সকাল, এ যেন তাকে একরাশ সুগন্ধি উপহার এনে দিয়েছে। সে নাচবে, না গাইবে, না ছবি আঁকবে না চুপচাপ ব'সে ব'সে রবিঠাকুর পড়বে, না প্রাণের আনন্দে সুইন্‌বর্ন আওড়াবে—কোনটা—কোনটা? কোনোটাই সে তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রতে পারছে না।

তার এই তেইশ বছরের জীবনে এম্নি অনির্বচনীয় ভোর অনেকবার উদিত হয়েছে—কিন্তু এম্নি আনন্দ, এম্নি মনোরম রোমাঞ্চ—যা শিরার মধ্যে দিয়ে হৃৎপিণ্ডে সোনালি আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে—তা খুব বেশি আসেনি।

এইবার নিয়ে আঙুর তিনবার ভালোবেসেছে। পনেরো থেকে তেইশের কোঠায় তিনবার সুধার পেয়ালা তার ঠোঁটের কাছে এসেছে এগিয়ে। প্রথম দু'বারের নাটক বিচ্ছেদের মধ্যে—করুণ রসের যবনিকায় কম্পমান। 'হোআয়েট্‌ওএজ' থেকে উপহার পাওয়া ডজন ডজন রুমালে—পুরোনো স্মৃতির স্বাক্ষরগুলি ফিকে হ'য়ে গেছে ইভিনিং ইন্‌প্যারিসের মোহ-নির্য্যাসে। অতীত শুধু স্মৃতি—আর স্মৃতি। শীতের বিকেলে লম্বা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবার সে যাহোক একটা সময় কাটাবার খোরাক। এখনো ট্যান করা কুমীরের চামড়ার পোর্ট-ম্যান্টোর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে কোনো দরকারী ক্যাসমেমো, অথবা কুরুশকাঠি খোঁজবার সময় ছবির এ্যালবাম, পুরোনো প্রণয়ীর যুবক-বয়সের আবেগখিল্য চিঠি—অক্ষরগুলো আজও কত স্মরণীয় দিনের পুঁজি আর মিয়েনো হৃদয়ের ছেঁড়া পাপড়িকে নিজেদের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। এখনো আঙুরের তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন হৃদয়ে দু'একখানা হোআয়েট্‌ওএজ-এর রুমাল কী বিজ্ঞপ্তি আনে কে জানে—কিন্তু তার বুকটা যেন আকস্মিক ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে—যেন কোন দূর অতীতের হল্‌দে কুয়াশায় একটা নীলচে শিখা দপ্‌ ক'রে জ্বলতে থাকে।

হোআইট্‌ওআশ করা ধব্‌ধবে ঘরখানায়—আয়নার ফলকে আঙুরের অনিন্দ্য মুখশ্রী আর একবার প্রতিভাত হোলো। নিজের নীলাভ চোখের কাঁচমণি—ঠোঁটের নিটোল কারু—নিজের চোখেই তার আনলো বিস্ময়। আর এই বিস্ময়ই সে একদা আবিষ্কার ক'রেছিলো তার পনেরোয় পা দেওয়া বয়সে আর একটি ছেলের চোখে। রূপেন যে কী ভেবেছিলো! সে ভাবনাটাই আঙুরকে খেপিয়েছে। অমন ক'রে কী ত্থাখে ওরা মেয়েদের!

রয়স্ট্রীটের দোতলা ফ্লাটের চারঘরওয়ালার বসতির স্মৃতি-পাণ্ডুর বিবর্ণধূসর দিন—আর যার মন থেকে লোপাট হ'য়ে হারিয়ে যাক, আঙুরের মন থেকে তা হারায় নি।

কিপ্‌লিং থেকে মুখ তুলে, চশমা সাফ্‌ ক'রতে ক'রতে অনিলাংগবাবু আঙুরকেও খানিকটা বটে—আবার খানিক স্বভাবোক্তির মতও বটে—উচ্চারণ করেছিলেন কথাটা—কেন তোমার ছেলেটিকে পছন্দ নয়—রীতিমতো সায়ান্স পড়ছে, বি. এস. সি. কোর্স। তুমি ওর কাছে অংক আর পিয়ানো দু'টোই শিখতে পারো—কী নাম যেন, —সেই লম্বা—ছিপছিপে-ফিকে-ফর্সা-করুণ-চোখটানা—চুল-ওলটানো—আস্তিন গোটানো ছেলেটির নাম ?—রূপেন চৌধুরী—স্পষ্টই মনে পড়ে আঙুরের।

পাশের ফাঁকা ফ্ল্যাট-টায় মা আর ছেলেতে সংসার পাত্‌লে। কার্পেটমোড়া কাঠের সিঁড়িতে নামা-ওঠার সময় দেখা হ'য়ে যায় দু'জনের। তারপর—কোনো নাটকীয় সমাবেশের জায়গা না রেখেই আলাপ। অনিলাংগ ভাব জমাতে চাইলেন ;—ছুতো ক'রে চায়ের নিমন্ত্রণ—মা আর ছেলে টেব্‌লে পৌছলেন—এদের পক্ষ থেকে কর্তা-গৃহিণী দুই-ই সেই আঙুর। কথায় কথায় ছড়ালো রূপেন অংকটায় একটু বেশি স্ট্রং—আর বাপের আমলের পুরোনো ফ্যাশানের পিয়ানোয় ওর হাত পাকা এবং রূপেনের মা প্রমীলা দেবী কবুল ক'রলেন—ঐটিই একমাত্র পৈতৃক ঐতিহ্য—যা তার ছেলের চরিত্রে বর্তিয়েছে। আলাপটা দেখতে দেখতে ঘন হোলো। এমন কী এপক্ষের সদ্যজাত কুকুরের বাচ্চা পর্যন্ত উপহার হ'য়ে পৌছোলো প্রমীলাদের ফ্ল্যাটকৃত সংসারে। তারপরই বোধহয় অনিলাংগ কিপ্‌লিং থেকে চোখ উন্মোচন ক'রে মেয়েকে—রূপেনের কাছে পিয়ানো আর অংকশাস্ত্রের চর্চায় লিপ্ত হবার হিতোপদেশ দিয়েছিলেন। মনে পড়ে বৈকি—রাত্রে যখন টেবিলে পাঁটার মাংস আর ভাত পৌছুতো—ভেট্‌কি ফ্রাই আর স্যালাড—তখন ওপার থেকে মাত্র ন'টা রাত্রে রূপেনের পিয়ানোর কান্না ভেসে আসতো। বাপ ব'লতেন—ছেলেটা বাজায় ভালো, শিখলে পারিস একটু। কয়েকদিন গিয়েছিলই বুঝিবা আঙুর। শাড়ির গন্ধে আর নরম চুলের ছায়ায় হাল্কাভাবে চোখ তুলে তাকাতো রূপেন—চোখে ওর বিস্ময় থাকতো না—যেন একটা লিক্‌লিকে ভাববিহ্বল স্বপ্নছোঁয়া নিস্তেজ চাহনি মেলতো,—তেমনি হাল্কাভাবেই বলতো,—ও আপনি! কী সৌভাগ্য—বাজনা শুনতে এলেন? বসুন না ঐ সোফাটায়!

কী আল্গা কথা—কী মৃদু অথচ কী স্পষ্ট। তারপর? কয়েক মাস ; মাত্র কয়েক মাসই বোধহয় যথেষ্ট মানুষের ভুল ভাঙতে। রূপেনই প্রস্তাব ক'রেছিলো একদিন—আপনি যাবেন আমাদের সংগে পিক্‌নিকে? আঙুর জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল—'আমাদের' কথাটার ওপরই যেন তার প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠতে চায়।

রূপেন স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রলে—আমি আর বার্থা। এতো সুন্দর বাংলা বলে ও, আপনার একটুও অসুবিধে হবে না।

আঙুর অর্থপূর্ণ ভাবেই কথাটার জের টেনেছিলো বুঝি,—আমি গেলেই বা আপনাদের কী সুবিধে?

আপনাকে নিয়ে গেলে মার চোখে ধুলো দেওয়া যাবে—

কী বিশ্রী। আঙুরের কিছুমাত্র দুর্বলতা যে ছিলো রূপেনের প্রতি—সেদিন তা' সে বুঝতে পেরেছিলো। কিন্তু সেদিনই শেষ। অনধিকার প্রবেশ ক'রতে পারবে না—বার্থা আর রূপেনের হৃদয়চর্চার ভেতরে। সরে এলো আস্তে আস্তে পাশের ফ্লাটের আত্মীয়তা থেকে। তারপর রূপেন চৌধুরী আর তার মা কবে পার্কসার্কাসে নতুন বসতিতে উঠে গেছে—বছর দু'য়ের ফাঁক আর ঘটনাস্রোতে কী ক'রে তারা উপে গেলো—তার প্রতি আঙুরের কোনো দুর্বলতা বা অনুসন্ধিৎসা নেই।

সেই মিয়োনো হৃদয় আবার তার জলে উঠ্‌লো গোপালপুরের নির্জন সী-বীচে। কোনো একটি পরিক্লান্ত বিকেল। আঙুর কোনোরকমে তার জর্জেটের আঁচলটাকে সামলাতে সামলাতে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ খানিকদূরে তার চোখ আটকে গেলো। এক সুদর্শন যুবক—হাত পা নেড়ে—একটি বিশিষ্ট ভংগীতে কিছু প্রকাশ ক'রতে চাইছে। বিস্ময় জাগলো আঙুরের। কাছে গিয়ে কান পেতে শুনলো—ছেলেটি 'হ্যাম্‌লেট্‌' আওড়াচ্ছে। ভাবে মনে হোলো নিদারুণ অভিনয় বাতিক। পরিষ্কার স্বচ্ছ ইংরাজী উচ্চারণ—তীক্ষ্ণ চোখের মণি থেকে দীপ্তি ঠিক্‌রে বার হ'চ্ছে। যে আলাপ লোকালয়ে কিংবা সহরের অভিজাত সোসাইটি-তে বিসদৃশ ঠেক্‌তো—গোপালপুরের নির্জন সমুদ্রতীরে তাকে মানিয়ে নেওয়া গেলো। উৎপল রায় একটু অসাধারণ টাইপ।

তরুণী শ্রোতা পেয়ে অভিনয়ের উৎসাহ তার দ্বিগুণ হোলো, —বললে—আমার হোটেল নিকটেই। আশা করি চায়ের নিমন্ত্রণ আপনি নিশ্চয়ই বাতিল করবেন না?

এতোটা ভাবেনি আঙুর। কিন্তু সে রাতে সে অনেক কথাই ভেবেছিলো। রূপেনের স্মৃতি তখনো জুড়োয় নি। কিন্তু উৎপলের অতিদৃপ্ত চেহারা প্রমিথিউসকে মনে করিয়ে দেয়। পরের দিন চায়ের নিমন্ত্রণে—টেবিলের পরে দাঁড়ানো উৎপল রায়ের অভিনয় দেখা—এবং সেই সাথে আদরের উপহার নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত আঙুরের যেন জ্ঞান ছিলো না। আয়নায় তাকিয়ে সে বার বার জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো—Am I so beautiful as they say!

কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসেই আঙুরের দ্বিতীয় প্রেমের স্বপ্ন ভাঙলো। পোর্টম্যান্টো গুছিয়ে হোল্‌ডলের বেল্ট টানতে টানতে উৎপল রায় ব'লেছিলো—ধরে ফেল্লে!—ইচ্ছে ছিলো তোমাকে ফাঁকি দিয়েই পালাবো—

আঙুর মুহূর্তে তার অকল্পিত সর্বনাশের কথা বুঝতে পারলে। উৎপলের গলা জড়িয়ে সে কাঁদুতে কাঁদতে ভেঙে পড়লো—না, উৎপল, তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না। তুমি জানো না—মেয়েরা ভালোবাসলে ছাড়তে পারে না।

কিন্তু তোমাকে যে ছাড়তে হবেই লক্ষ্মীটি। বুকে আমার রাজযক্ষ্মার বাসা। আমি জেনে শুনে তোমাকে কী ক'রে শাস্তি দেবো। কেঁদো না আঙুর! তুমি আমায় যতো ভালোবাসো—তেম্নি ভালোবাসতুম আমি আর্টকে—সেও তো আমার ভেঙে গেলো।

কোথায় যাবে তুমি?

আপাতত মদীনাপল্লীর স্যানাটোরিয়ামে। যতদিন বাঁচি চিঠি দিও। বিদায়। বিদায়।

বিদায় দিতে না চাইলেও—বিদায় দিতে হোলো—দিতে হয়। ধরে রাখা যায় না। প্রেমও ধরে রাখতে পারে না। পড়াশুনোয় ডুবে গেলো আঙুর। তাকাতে পারলো না নিজের দিকে। অভিশাপ দিলো না কাউকে। কাঁচের পুতুলের মতো গিয়ে বসে চৌরঙ্গী পাড়ার সিনেমায়, —কফির আড্ডায় তার অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু সেই সংগে থাকে না উত্তাপ; কথা কম বলা অভ্যাস ক'রতে ক'রতে —সে এমন অবিশ্বাস্য গম্ভীর হ'য়েছে—যে কোনোদিন পুরো চব্বিশঘণ্টাই সে নির্বাক কাটায়।

অনেকদিন থেকেই আঙুর একটি ছেলেকে লক্ষ্য ক'রছিলো। কিন্তু তাকে আমল দেয়নি। আর পাঁচ বছর অন্তেও যখন ছেলেটির প্রেমসাধনায় চিড় ধরলো না—তখন আঙুরের সন্দেহ হোলো। সত্যিই কী এ ভালোবাসে? চেয়ে দেখলো আঙুর—আর যাই হোক্ সুমেরু বোস তথাকথিত উড়ুক্কু ছোক্‌রা নয়। বিমান থেকে ভৌগোলিক জরিপে সে সিদ্ধহস্ত। চেহারার দিক দিয়ে সুমেরু বোস গ্রীক-দেবতার মতো না হ'লেও—সামাজিক খ্যাতি হিসাবে তার মূল্য কম নেই। অন্ততঃ লোকমহলে সে একজন প্রখ্যাত প্রেমিক। আর এও আঙুরের চোখে উদ্ভাসিত হোলো যে, ছেলেটি স্মার্টনেস্ বিশারদ—এবং উপরন্তু রঙিন কথার ফেরিওলা—আর সে জিনিষের পুঁজি নিয়ে সে অভিজাত মেয়েদের হামেশাই তাক লাগায়। ম্যাগ্‌নোলিয়া, রডোডেনড্রন, ক্রিসেন্থিমামের অজস্র উপহারে আঙুরকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে দেওয়াই না কী তার প্রণয়-ব্যাপারের চূড়ান্ত নিদর্শন। আঙুর যে দোকানে মার্কেটিং করে, সেখানে সুমেরুর গতিবিধি প্রচুর। যে ফোটোর দোকানে আঙুর ফোটোর নেগেটিভ্ প্রিণ্ট ক'রতে দেয়—সারা কলকাতায় সুমেরু বোস সেই দোকানকেই পছন্দ করে—ক্যামেরা বাতিকগ্রস্ত বন্ধুমহলে সেই দোকানের তারিফ করে। যে দোকান থেকে আঙুরের প্যাস্‌ট্রি কেনা অভ্যাস—সারা নিউমার্কেটে সেই দোকানকেই সুমেরু ইংরাজী খাবার কেনার পক্ষে সব থেকে বেশী পছন্দ করে।

চোখে চোখে দু'জনের আলাপ পাঁচ বছরের—মুখে মুখে সে আলাপ হোলো হালে এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটিয়েছিল না কী সুমেরু বোস হঠাৎ একদিন হাতীর দাঁতের ছবির ফ্রেম আর তার সংগে হালের বিলিতি লেখকের একসেট্ নভেল উপহার হিসাবে আঙুরকে দিয়ে। কপালের উপর থেকে চুলের পারিপাট্য এম্নি নিখুঁত—ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আল্‌তো ভাবে কথা বেরিয়ে আসা এতো অনায়াস—যে আঙুর হার মানলো। ঘনিষ্ঠ আলাপই ক'রতে হোলো এম্নি তুখোড় একটি ছেলের সংগে; কেননা যেটুকু লজ্জা মেয়েদের 'গ্রেস্' এবং পুরুষের

'স্মার্টনেস্' নামক বস্তুটিকে আচ্ছন্ন করে না—সেটুকু এর আছে। ইংরিজী মতে এর মাপ চাইবার ঢং-টুকু যেম্নি নিপুণ—বিদায় নেবার রেওয়াজটুকু তেম্নি রপ্ত—দুর্লভ 'এটিকেট্' থেকে নেক্‌টাই-এর পিন্ পর্যন্ত নির্ভুল।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত রয়ষ্ট্রীটের আনাচে-কানাচে সুমেরু বোসের চক্কর এম্নি নৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালো আর এম্নি সে দু'বেলা আঙুরের চোখে থামকা প্রতিভাত হ'তে থাকলো যে আঙুর যখন একদিন আলাপের সুযোগ হাতড়াচ্ছে তখন আকস্মিক আলাপ হোলো চীনে আর্ট-গ্যালারিতে। চীনে ছবির মানে যে সুমেরু বোস এমন দক্ষতার সংগে ব্যাখ্যা ক'রতে পারে—ভাবতেই পারেনি—তাক লাগলো আঙুরের এবং তদীয় পিতা সেই অনিলাংগের, আর সেই থেকে চায়ের নিমন্ত্রণ বরাদ্দ। খালি পার্লারে যখন দু'জন ওরা—সুমেরু বোস প্রায়ই বলে,—পাঁচ বছরের অক্লান্ত সাধনা—বাঙালী ছেলের আশ্চর্য স্ট্যামিনা।

আঙুর লাল হ'য়ে তর্জনী শাসাতো,—সুমেরু কতবার মনে করাবে তুমি ও-কথা ?

সুমেরু অন্যকথা আরম্ভ করবার পূর্বমুহূর্তে আঙুর শুরু করে,—তুমি কী আশ্চর্যভাবে একেবারে শব্দ না ক'রে গরম চা খেতে পারো।

সুমেরু সেই সংগে সংগেই ব'লে ওঠে,—দরকার হ'লে তোমার নেক্ নজর লুঠে নেবার জন্যে আমি লিফ্‌টে না উঠে চারতলার হাড়ভাঙা সিঁড়ি অক্লেশে ডিঙোতে পারি, জানো ?

আঙুর হেসে বলে,—সত্যি ?

Really—এবং তুমি যদি বলো, আমি অন্যকোনো মেরুদণ্ডহীন বাঙালী ছোঁড়াকে পছন্দ করি তবে সেই দুঃখে আমি মনুমেন্টের উপর থেকে লাফিয়ে পড়তে পারি সেটাও তোমার জেনে রাখা দরকার! আর তাহ'লে তোমার দিকে আমার হৃদয়ের depth-টা বুঝতে পারছ ?

এম্নিভাবে কথাবার্তা চালায় ওরা—যে কথার কোনো মানে নেই, অথচ যে কথার ছোঁয়াচে হাসির বারুদ-ঠাসা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তৃতীয় প্রেমের স্রোতে আঙুর গা ভাসিয়েছে। সুমেরুর অনুপস্থিতির চিন্তায় আঙুর যেদিন ছিন্নমনা, সেদিন অনিলাংগ বলেন—তোর শাড়ির আঁচলের কোনটা যে ছেঁড়া সেটা আজ খেয়ালই করিস নি মা!

আজ সুন্দর প্রবাল-প্রান্ত সকালটিতে সুমেরুর আসবার কথা। ঘুম-ভাঙা ভোর থেকে আঙুরের শরীরে তাই একটা স্বগায় সুখের জোয়ার নেমেছে। মূর্তিমতী উষা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। মহানগরী তাঁর আশীর্বাদ মাথায় তুলে নিচ্ছে। কী ক'রবে আঙুর সুমেরু না আসা পর্যন্ত! ঘরে কোথাও এতটুকু ধুলো নেই—যে সে তাই পরিষ্কার ক'রবে। আজ এই সকালে রয় ষ্ট্রীটের একটি বাড়ির এই ফ্লাটে একটি তেইশ বছরের প্রজাপতি-চঞ্চল মেয়ে কী বিভোর আনন্দে মগ্ন হ'য়ে যাচ্ছে। কত ভোর এই মহানগরীর স্মৃতির পুঁজিতে পুরোনো হ'য়ে ঝরে গিয়েছে—কিন্তু আঙুরের জীবনে তার প্রণয়ীর প্রতীক্ষায় দোদুল্যমান এম্নি ভোর কটি এসেছে? না, না, সুমেরু তাকে ব্যথা দেবে না। তাকে কখনো ছেড়ে যাবে না। এই সুন্দর ভোর কখনো মিথ্যা হয় না—হবে না। এই সুন্দর ভোর উতরে যাওয়া সকালে রোদ্দুর-খচিত ঝকঝকে দিনে—সোনা-চিকণ দিবসে আঙুর কণ্ঠ উঁচু ক'রে গান গাইবে—রবিঠাকুর আবৃত্তি ক'রবে—ধুলো না ছোঁয়া সকালে অজস্র সুখচিন্তা ছাড়া সে ছোট্ট একটিপ্ কালো দুঃখের কথা কিছুতেই ভাবতে পারবে না।

মাদ্রাজে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

সন্তোষকুমার দে

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একত্রিংশ অধিবেশন গত ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১লা ও ২রা জানুয়ারী বাংলা দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে মাদ্রাজ শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠানের প্রতিটি কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার ধারাবাহিক ও সচিত্র বিবরণ মাদ্রাজ ও বাংলা দেশের সকল দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। একজন সদস্য হিসাবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য অর্জন করায় আরও যা কিছু তাতে আনন্দে গর্বে মন ভরে গেছে। বাংলা দেশ আজ বিভক্ত, বাঙ্গালী জাতি বিপন্ন বিপর্যস্ত, বাংলা সাহিত্যেরও সর্বাঙ্গীণ ক্রমোন্নতি সেই বিপাকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু বাঙ্গালীর সাহিত্যপ্রীতি ও প্রাণশক্তি যে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত আছে তারই জীবন্ত নিদর্শন মাদ্রাজ অধিবেশনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। আর প্রমাণিত হয়েছিল বাংলার বাইরে বাংলা দেশকে, বাঙ্গালী জাতিকে, বাংলা সাহিত্যকে অবাঙ্গালীরা, বিশেষ করে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মদ্রদেশবাসী কতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। অবশ্য এই শ্রদ্ধা ও সম্মান বর্তমানের বাঙ্গালীর জন্য ততটা নয়, যতটা তার পূর্বপুরুষ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী ও মহাপুরুষদের জন্য। আমরা যদি তাঁদের যোগ্য উত্তরসাধক হতে পারি তবেই আমাদের বাঙ্গালী জীবনের সার্থকতা।

অধিবেশনের সাফল্য কামনা করে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, মাদ্রাজের রাজ্যপাল প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যে সব শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন তার মধ্যে বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি সূচিত হয়। খ্যাতনামা শিল্পপতি ও চলচ্চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত ভাসন তাঁর শুভেচ্ছা বাণীর একাংশে বলেন—"Madras is deeply indebted to Bengal for its political, cultural and spiritual renaissance and it is therefore with the greatest pleasure and thankfulness that we welcome with both hands the living symbol of that great renaissance—The all India Bengali Literary Conference—to our midst." আর কথাগুলি

মাদ্রাজ—নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন। রাজাজী হলে প্রতিনিধিদের একাংশ
ফটো—শ্রীজ্যোতির্ময় সিংহ
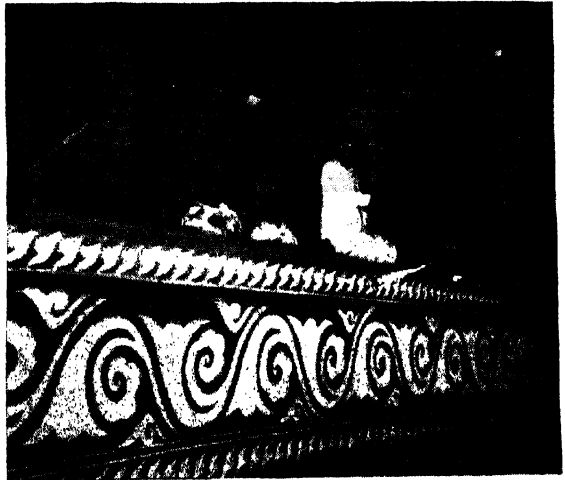
সম্মেলনে বক্তৃতাদানরত শ্রীরাজাগোপালাচারী ফটো—শ্রীজ্যোতির্ময় সিংহ

যে কেবল কথার কথাই নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধাসঞ্জাত, তার প্রমাণ সমগ্র অধিবেশনে প্রতিনিয়ত অনুভব করেছি।

মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীশ্রীপ্রকাশ অধিবেশনের উদ্বোধন করছেন। পিছনে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শ্রীদেবেশ দাশ ও শ্রীবিরাজ মোহন দাশ উপবিষ্ট ফটো—বাসুদেব লাহিড়ী

বাংলার সঙ্গে মাদ্রাজ আর সমগ্র দাক্ষিণাত্যের যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা সুদূর অতীত থেকে আজ অবধি প্রবহমান আছে তারই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ বর্ণনা শোনান সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশ। তাঁর অভিভাষণটি মূলত বাংলায় লেখা হলেও সভায় মুদ্রিত ইংরাজি পুস্তিকাও অবাঙ্গালীদের মধ্যে বিতরিত হয়। এই মনোজ্ঞ ভাষণটি বাংলা দেশের দৈনিক পত্রিকাগুলিতেও বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—এই অভিভাষণটি বহু ছোট বড় মাঝারি তামিল ও তেলেগু পত্র পত্রিকাও নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশ করে এবং তার ফলে মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের সর্বত্র এই সাহিত্য সম্মেলনের বিষয়ে যে প্রাণচাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় তা সত্যই অভূতপূর্ব। দেবেশবাবু তাঁর নিবন্ধের প্রারম্ভেই বলেছিলেন,—"আজ আমরা ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।" মাদ্রাজ অধিবেশনে সত্যই ইতিহাস সৃষ্টি হল। দেবেশবাবুর প্রবন্ধটি পূর্ব হতেই প্রচারিত হওয়ায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যের লোক যেন বাঙ্গালীদের সম্বর্ধনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল বলা চলে।

৩১শে ডিসেম্বর সকাল ৮-৩০ মিনিটে মাদ্রাজের সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত সিনেট হলের সুসজ্জিত কক্ষে মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী পি. ভি. রাজামান্নার একটি শিল্পপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। এই প্রদর্শনীটিতে সংক্ষেপে দাক্ষিণাত্যের শিল্পকলার বিচিত্র বিকাশের পরিচয় দেওয়া হয়—যাতে উপস্থিত বাঙ্গালী সদস্যেরা দাক্ষিণাত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্যক রূপের সন্ধান পান। এই প্রদর্শনীটির ব্যবস্থাপনা করেন স্থানীয় শিল্পমহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জগদ্বিখ্যাত ভাস্কর চিত্রকর ও লেখক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সুযোগ্য পত্নী মহোদয়া। রাজামান্নার তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বাঙ্গালীর শিল্পপ্রতিভার উল্লেখ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, দেবীপ্রসাদ প্রভৃতির কথা বলেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ঐদিন (৩১. ১২. ৫৫) অপরাহ্ণে মাদ্রাজের 'রাজাজী' হলে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ছোট একটি পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বয়ং মাদ্রাজের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রীশ্রীপ্রকাশ। অতঃপর 'রাজাজী' হলের সুসজ্জিত মণ্ডপে সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল স্বয়ং। তাঁর বক্তৃতায় তিনি একটি সর্বভারতীয় লিপি প্রচলনের প্রস্তাব করেন, যাতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সহজে অপরের নিকট পাঠযোগ্য হবে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল-আচারীও সভায় বক্তৃতা করেন। তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দাশ, সম্মেলনের কেন্দ্রিয় সমিতির স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশ এবং বর্তমান সম্মেলনের মূল সভাপতি শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তাঁদের নিজ নিজ অভিভাষণ পাঠ করেন। শেষে সম্মেলনের পরিচালনায় গৃহীত বাংলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সমাবর্তন সভায় স্মারক পত্র প্রদান করা হয়।
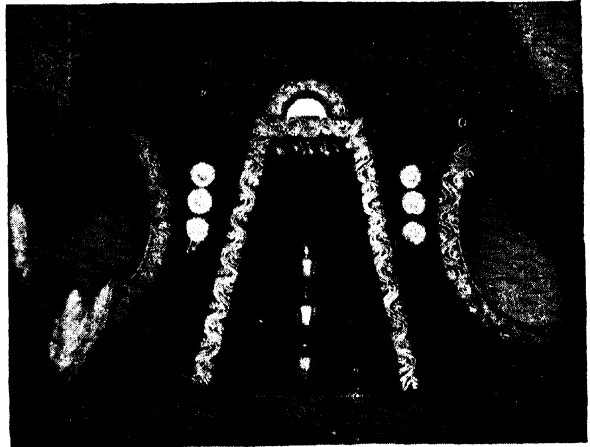
রাজাজী হলের সুসজ্জিত প্রবেশ দ্বার ফটো—বাসুদেব লাহিড়ী

ঐ দিন সায়াহ্ন ৬-৩০ মিনিটে সেনেট হলে যে সংস্কৃতি-উৎসবের আয়োজন করা হয়, তাতে অংশ গ্রহণ করেন ভরতনাট্যকুশলী শ্রীমতী

কমলা লক্ষণম্ এবং বিখ্যাত নৃত্যবিদ গোপীনাথের সম্প্রদায়। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃত্য কথাকলি ও ভরতনাট্যের বহু বিচিত্র লীলামাধুর্যে অনুষ্ঠান এতই মনোজ্ঞ হয়েছিল যে প্রতিটি দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মতো শেষ পর্যন্ত বসেছিলেন। নৃত্যের পূর্বে রবিশঙ্করের সেতারও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

১লা জানুয়ারী সকালে 'রাজাজী' হলে সাহিত্য শাখার উদ্বোধনে সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অপূর্ব ভাষণটি পাঠ করেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি কথ্যভাষার বদলে লিখিত ভাষায় সাহিত্য রচনার গুরুত্ব বর্ণনা করেন, যাতে বাংলা ভাষা তথা সাহিত্য সহজে সকল প্রদেশের লোকের নিকট সহজবোধ্য হয়। সমাজ ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যে তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দান করেন তাতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি ও অদূর ভবিষ্যতের সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনার সুস্পষ্ট আলোচনা থাকে। অতঃপর শ্রীমতী রাধারাণী দেবী একটি কবিতা এবং শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী, অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মাদ্রাজের রাজাজী হল

ফটো—অনিলেন্দ্র চৌধুরী
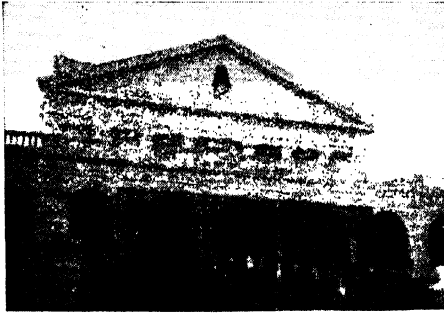
অপরাহ্ণে 'রাজাজী' হলেই তামিল শাখার উদ্বোধন হয়। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত কামরাজ নাদারের অনিবার্য কারণে অনুপস্থিতিতে মন্ত্রী মাননীয় শ্রী এম, ভক্তবৎসল উদ্বোধন করেন। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তামিল শিক্ষার প্রধান অধ্যাপক শ্রীটি. পি. মীনাক্ষিসুন্দরম্ পিল্লাই, 'আনন্দ বিকাতন' সম্পাদক ও তামিল লেখক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমহাদেবন্, বিবেকানন্দ কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—পরিচালক অধ্যাপক শ্রীসুব্রহ্মনীয়ম্, বক্তৃতা করেন। অসংখ্য বাংলা বইয়ের তামিল অনুবাদের লেখক শ্রীটি, আর. কুমারস্বামী বাংলায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীগজপতি নায়ার এম. এল. এ. তিরুকারুল গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ সম্মেলনের সভাপতিকে উপহার দেন। তামিল শাখার অধিবেশনে তামিলনাদ ও বাংলার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ঐ দিন সন্ধ্যায় সিনেট হলে শ্রীমতী সুব্বালক্ষী, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের গান এবং একজন দক্ষিণ ভারতীয় বাদকের বীণা বাদ্য হয়। গানের আসরের পর সঙ্গীত বিভাগের উদ্বোধন করেন মাদ্রাজের অর্থ ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসি, সুব্রহ্মনীয়ম্ এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। যদিও তখন গভীর রাত্রি তবু বহু দর্শক ও শ্রোতা শ্রীযুক্ত মল্লিকের ভাষণ ও তৎসহ বহু প্রকার গানের নমুনা শুনতে থাকেন। এই বক্তৃতাটি কিছু পূর্বে আরম্ভ করতে পারলে আরো ভালো হত। অতঃপর শ্রীসুখেন্দু গোস্বামীর গানের পর সঙ্গীত বিভাগের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

২রা জানুয়ারী সকালে তেলেগু বিভাগের উদ্বোধন করেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীবি. গোপাল রেড্ডি। তিনি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং রবীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁর ভাষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হয়েছিল। লেখক ও অভিনেতা ডক্টর জি. ডি. সীতাপতি,

বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের সম্বর্ধনা সভায় ভারতনাট্যম্ নৃত্যরত ডাঃ এস-এন-বসুর কন্যা কুমারী রীতা বসু (৯ বৎসর)

ফটো—বাসুদেব লাহিড়ী

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী, বেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রাজালু, শ্রীমল্লিকার্জুন রাও, শ্রীপদ্মরাজু, শ্রীযুক্ত রাও প্রমুখ বহু তেলেগু কবি ও কথাশিল্পী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তেলেগু সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের প্রভাবের উল্লেখ করেন। অতঃপর শিশুসাহিত্য বিভাগের সভাপতি ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর মনোজ্ঞ ও মূল্যবান ভাষণটি পাঠ করেন। ঐ দিন সম্মেলনের কর্মী পরিষদের নির্বাচন হয়, তাতে পরিচালক সমিতিতে আছেন—সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ, সম্পাদক

—শ্রীবঙ্কিমচরণ মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সেন, বিরাজমোহন দাস, বি. এম, কর ও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহ-সভাপতিমণ্ডলী। ত্রিশজন সদস্যের মধ্যে কলিকাতা হতে নির্বাচিত হয়েছেন—শ্রীসুধাংশু-

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (মাদ্রাজ অধিবেশন) সাহিত্য শাখার সভাপতি—সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমার বসু, নরেন্দ্র দেব, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়।

এইদিন বৈকালে মাদ্রাজবাসী বাঙ্গালীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বেঙ্গলি এসোসিএশনের নিজস্ব ভবনে সম্মেলনের অতিথিবর্গকে আপ্যায়িত করা হয়। সেখানে সভাপতি শ্রীবিরাজমোহন দাসের ভাষণের পর এক নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

৩রা জানুয়ারী সদস্যদিগকে কাঞ্চীপুরম্, পক্ষীতীর্থম ও মহাবলীপুরম্ তীর্থক্ষেত্রগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

এবার মাদ্রাজ অধিবেশনে যে অভূতপূর্ব আয়োজন করা হয় তা নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অতিথিদের সুখ সুবিধার এত বৃহৎ ও সর্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন ইতিপূর্বে আর কোথাও হয়নি। যে ব্যাজটি সদস্যদিগকে দেওয়া হয়েছিল তার থেকে সুরু করে প্রতিটি বিষয়েই অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার পশ্চাতে যে কর্মী পরিষদ কাজ করেছেন, তাঁদের সবাই অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী করতে পারেন। এমন কি অবাঙ্গালী ভলান্টিয়ারদেরও ব্যবহার ও সেবাপরায়ণতার তুলনা হয় না। বিশেষ করে যাঁদের সহযোগিতায় এই বিরাট উৎসব সম্পন্ন হয়েছে তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করব—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দাশ, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী চারুলতা রায়চৌধুরী, ডক্টর বিমানবিহারী দে, অমল ঘোষ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দু দাশ, তদীয় পত্নী শ্রীমতী চিত্রা দেবী, শ্রীএস. সান্যাল, শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন গুহরায়, শ্রীমতী দীপা রায়, সুহাস সরকার ও শ্রীমতী অঞ্জলি সরকার, চুণী বিশ্বাস, প্রভাত সমীর রায়, শ্রীমতী নির্মলা সেনগুপ্ত, শ্রীমতী সাবিত্রী সেন, কুমারী কল্পনা দে, শ্রীযুক্ত জে. সি. দে, শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী এল. এম. রায়, শ্রীমতী সান্যাল, সর্বশ্রী নীহার রায়, গৌরাঙ্গমোহন মুখোপাধ্যায়, ডি. মুখার্জি, অমিয়কুমার মুখার্জি, অভয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, এন. এন, ঘোষ, দেবেন রায়, সুধাংশুকুমার সেন, রবীন্দ্রনাথ দাস, এস দত্তগুপ্ত, অসিতরঞ্জন দাস, ত্যাগরাজ মুদালিয়র, লোকনাথ দে, রামনাথ গোয়েঙ্কা, কৃষ্ণ শাস্ত্রী, জি. ডি, সীতাপতি, বিমান মৈত্র প্রভৃতি। মাদ্রাজের প্রবাসী বাঙ্গালীদের অজস্র ধন্যবাদ জানাই।

সাড়া

শ্রীমীনাক্ষী রায় এম্-এ

ছিঁড়ে দাও মোর বন্ধন ঘোর, ভেঙ্গে দাও মোর কারা
সুপ্ত নিশীথ-তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া জাগাও আলোর সাড়া।
দীপ্ত প্রাণের মৃত্যুপণের নিত্যচলার গান—
রুদ্র তেজ আর সত্য বিভব আমায় কর দান।
নিত্য দিনের জীর্ণতা আর মিথ্যা পরিচয়,
ছিন্ন করি চিত্তে আমার এস জ্যোতির্ময়।

মর্তমাটির বিত্ত বিপুল চাইনা কোনমতে
শক্তি দিও তুচ্ছ করার বিঘ্ন সকল পথে।
ছন্দেতে মোর স্পন্দিত হোক্ মরণ-জয়ী প্রাণ
কর্মেতে মোর উঠুক বেজে তোমার আহ্বান।
জীবন-স্বপন সফল করার শিল্পী কর মোরে
কল্পনা নয়, জীবন-বাণী বিলাই বিশ্ব ভরে।

রক্তে আমার নৃত্য জাগে—চক্ষু স্বপন ভরা
হাতছানি দে' ডাকছে মোরে ঐ যে বিপুল ধরা।

নরেন্দ্র দেব

(তেলেগু সাহিত্যে বাংলার প্রভাব)

ভজন-ভ্রমর ত্যাগীরাজকে প্রণাম করি। অতীত যুগের নমস্যদের নমস্কার জানাই।

প্রাচীন তেলেগু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব না। বাংলার চেয়ে সংস্কৃতের প্রভাবই তার মধ্যে বেশি ছিল সেদিন। বর্তমানে তেলেগু সাহিত্যের যে প্রগতি দেখা যায় তা' প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বেই শুরু হয়েছিল বলা চলে।

তখনও দক্ষিণ ভারত জাতিভেদাদি নানা কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন ও ধর্মের গোঁড়ামিতে অন্ধ ছিল। ইংরাজী শিক্ষার আলো সবে এসে পড়ছে তখন। অল্প কয়েকজন এর সুযোগ পেয়ে মানুষ হয়ে উঠেছিল, আর অধিকাংশই ছিল অজ্ঞানতার তমসায় সমাচ্ছন্ন। এমন কি, উচ্চশিক্ষিত অনেকেও জাতি ও ধর্মগত কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে সাহস করেন নি। পৈতে-টিকি ও ফোঁটা-তিলক নিয়ে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরাও ঘুরে বেড়াতেন। লুঙ্গীর সঙ্গে নেকটাই পরে কোট গায়ে চলেছেন, এমন লোক পঁচিশ বছর আগেও এদেশে কম দেখা যেত না!

চপ্পল ছেড়ে 'সু' পায়ে দেন নি তখনও কেউ। খৃষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের গুণে ইংরিজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম, অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজেরা দলে দলে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু সমাজের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন।

ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের এই ভাঙাগড়ার ভোরে তেলেগু সাহিত্যও নিয়েছিল এক নূতন পথ। এর প্রধান পথিকৃৎ হিসেবে নাম করা চলে তেলেগু-সূর্য বীরেশ-লিঙ্গমের।

দেশবাসীর অন্ধ বিশ্বাস ও সমাজের বদ্ধমূল কুসংস্কার দেখে ব্যথিত বীরেশলিঙ্গম মুক্তির উপায় অন্বেষণ করছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজমহেন্দ্রবরমে এঁর জন্ম হয়েছিল। শৈশবে পিতৃহীন এই বালকের অল্প বয়স থেকেই পড়াশুনায় বড় বেশি আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁর জ্ঞানস্পৃহাও বর্ধিত হতে থাকে।

এই সময় তিনি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের স্বাধীন চিন্তাশীল জ্ঞানী মনীষীদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন। বিশেষ ভাবে রাজা রামমোহন রায়ের রচনাবলী তাঁর মনকে একটু বেশি রকম নাড়া দিয়েছিল। রামমোহনের হিন্দু-ধর্ম-সংস্কার, গোঁড়ামী ও সতীদাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত তাঁর অকাট্য যুক্তিজাল দেশপ্রেমিক বীরেশলিঙ্গমকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সময় বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বাল্যবিবাহ নিরোধ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু করেন। বাংলাদেশের মনীষীগণের এই সব সংস্কারমূলক আন্দোলনের তরঙ্গ বীরেশলিঙ্গমের চিত্তে একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। তিনিও স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণের জন্য সংস্কারপন্থী হয়ে উঠেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে তিনি রাজা রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কার প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। সংকল্পকে কার্যে পরিণত করবার জন্য তিনি দু' দুখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তেলেগু সাহিত্যে সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে বীরেশলিঙ্গমের সম্পাদিত "বিবেকবর্ধিনী" ও "হাস্য-সঞ্জীবনী" শীর্ষক পত্রিকা দু'খানির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পাখা যেমন একটিমাত্র পক্ষে ভর দিয়ে আকাশে উড়তে পারে না—তেমনি সমাজ সংস্কারই বলুন, আর ধর্ম সংস্কারই বলুন, কোনও প্রকার জাতীয় আন্দোলনই প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারে না—যে পর্যন্ত না দেশের অন্তঃপুরচারিণী জননী, জায়া ও কন্যাগণ সেই আন্দোলন প্রচারে গৃহে গৃহে সহযোগিতা করেন।

এই সত্য উপলব্ধি করতে বীরেশ-লিঙ্গমের বেশি সময় লাগে নি। দেশের মহিলাদের মধ্যেও তাঁর সংস্কারবাদী আন্দোলনের সাড়া জাগিয়ে তোলবার জন্য তিনি 'সাহিত্য-বোধিনী' নামে একটি বিশেষ ধরণের পত্রিকা প্রকাশ করেন যা ভারতনারীকে ধর্মের সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে সমাজ-সচেতন ও মানবিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে।

ধর্মসংস্কার এবং যুগোপযোগী ন্যায় ও নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্যকে অবলম্বন করলেও কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থের পরিধির মধ্যেই তাঁর প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল না। বিরাট প্রতিভাবানের উদার হৃদয়ের আহ্বান স্বভাবতই হয়ে উঠে বহুমুখী। তাই তেলেগু সাহিত্যের নানা বিভাগ বীরেশলিঙ্গমের অজস্র দানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি কি কবিতায়, কি উপন্যাসে, নাটকে, প্রহসনে, জীবনী রচনায়, আত্ম-স্মৃতি-কথায় তেলেগু সাহিত্যকে প্লাবিত করে দিয়েছিলেন। এই সঙ্গে সমানে চলেছিল তাঁর ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত বিবিধ সমালোচনা। তিনি নানা ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের মূল বা মর্মানুবাদের দ্বারা তেলেগু সাহিত্যকেই শুধু সমৃদ্ধ করেন নি, জাতীয় জীবনে একটা প্রবল সমাজ-সচেতনতাও সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। এইখানেই তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর তেলেগু সাহিত্যাকাশে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ভক্ত কান্দুকুরী বীরেশ লিঙ্গম ছিলেন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তেলেগু ভাষায় অনূদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ লিঙ্গমের চেষ্টায় অন্ধ্রে উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম হয়। কিন্তু সেগুলি সবই অনুবাদ। অর্ধশতাব্দী আগেও তেলেগু সাহিত্যে মৌলিক উপন্যাস বলে কিছু ছিল না। তারপর দেখা দিলেন—চিল্‌কামার্তি লক্ষ্মী নরসিংহম উন্নাভা লক্ষ্মীনারায়ণ। ইনি জন্মভূমির স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর লবণ আন্দোলন, ১৯৪২এর বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁর দেশপ্রেম ও সমাজ সংস্কারমূলক উপন্যাস গুলি তেলেগু কথা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নবযুগের শ্রেষ্ঠ কবি সত্যনারায়ণ বিশ্বনাথও কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তেলেগু কথাসাহিত্যেরও সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। তেলেগু সাহিত্যে নরনারীর জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষী মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস প্রথম রচনা করেন ভেঙ্কট শুব্বারাও। বর্তমানে নূতন কথাসাহিত্যিকেরা তেলেগু ভাষায় য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ লেখক-গণের উপন্যাস অনুবাদ করে তেলেগু সাহিত্যকে নব নব ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে তুলেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তেলেগু সাহিত্য অনেক দিক থেকেই উৎকর্ষলাভ করেছিল। এই সময় তেলেগু সাহিত্যের দু'জন কর্ণধারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনীষী আপ্পারাও ও বিপ্লবী লেখক রামমূর্তি আধুনিক তেলেগু সাহিত্যকে একেবারে শতাব্দীকাল উত্তীর্ণ করে নিয়ে এসেছিলেন। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে আপ্পারাও চিরদিন সম্মানিত হ'য়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, সঙ্গীত-শিল্পী ও কথাশিল্পী। তেলেগু সাহিত্য নানাভাবে এঁর কাছে ঋণী। ইনিই প্রথম মহাকাব্য রচনা না করেও মহাকবির খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ভাষাকে সহজবোধ্য করা, ব্যাকরণের জটিল বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত ক'রে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা—আপ্পারাওয়ের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

তিনি সমাজের অবহেলিত, দীন-দুঃখী ও মূঢ়-মৌন জনগণের মধ্যে একটা মানব অধিকার-বোধ ও আত্মচেতনাকে উদ্বোধিত করে তুলেছিলেন। নিরক্ষর গ্রাম্য শ্রমিক ও চাষাভুষাদের জীবনের মধ্যে এই জাগরণ সঞ্চারিত করবার জন্য তিনি নাট্য-সাহিত্যকেই উপযুক্ত বাহন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। শক্তিশালী লেখক আপ্পারাওয়ের মজবুদ লেখনী এমন নাটক সৃষ্টি করেছে যা শুধু তেলেগু সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যে স্থানলাভ করতে পারে। জীবন, সংসার ও সমাজের বাস্তবতার ভিত্তির উপর রচিত, সহজবোধ্য সরল সংলাপ সমম্বিত তাঁর নাটকগুলিকে তেলেগু সাহিত্যের অমূল্য রত্ন বলা চলে। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'কন্যাশুল্কম্' ও 'মুক্তিয়ালা সারাণু' নাটক দুখানির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নাটক দুখানি কেবলমাত্র তেলেগু নাট্য-সাহিত্যেই যুগান্তর আনে নি, অন্ধ্রের সমাজ জীবনে, ধর্মজীবনে ও ব্যক্তি-জীবনে এনেছিল এক বিপ্লবের নূতন জোয়ার—যার বেগে টলে উঠেছিল দেশের ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সুদৃঢ় ভিত্তি।

আপ্পারাও শক্তিশালী কবি হলেও তেলেগু সাহিত্যের বিচারে তিনি মহাকবি বলে স্বীকৃত হতে পারেন না। কারণ, তিনি কোনও মহাকাব্য রচনা করেন নি। তাছাড়া, তেলেগু সাহিত্যে তিনিই প্রথম কবি—যিনি সংস্কৃতবহুল দুর্বোধ্য সাধুভাষা পরিত্যাগ করে তেলেগু কাব্য-সাহিত্যে চলতি গ্রাম্যভাষা ব্যবহার করতে সাহসী হয়েছিলেন। তাই সাধু ভাষার গোঁড়া লেখকসম্প্রদায় তাঁকে মহাকবির যোগ্য সম্মান দিতে চান নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও তেলেগু সাহিত্য পুরাতনের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তাই আগামী যুগের বিপ্লবী সাহিত্যিকেরা সেদিন অপাংক্তেয় হয়েছিলেন। আপ্পারাওয়ের তাতে কোনও ক্ষতি হয় নি। কারণ দেশের অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে তাঁর সরল ভাষায় রচিত সহজবোধ্য কবিতাগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ফলে আপ্পারাও জনগণের কবি হিসাবে যে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তা আজও ম্লান হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও অন্ধ্রের গ্রামে গ্রামে কৃষক ও শ্রমিকের মুখে মুখে তাঁর কবিতা ধ্বনিত হ'তে শোনা যায়। আপ্পারাও ছিলেন অন্ধ্রের কাব্যলোকে সর্বহারাদের জীবনের দুঃখ বেদনার প্রথম উদ্গাতা। এইখানেই তিনি মহাকবি।

অতি-আধুনিক তেলেগু সাহিত্যের আদি পথিকৃৎ হিসাবে কবি ও নাট্যকার গুড়াজাড়া আপ্পারাও নবযুগের সাহিত্য সাধকদের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তার মূলে ছিল অন্ধ্রের অন্যতম শক্তিশালী কবি ও সাহিত্যিক গিদিগু রামমূর্তি। আপ্পারাও কবি, আপ্পারাও নাট্যকার, আপ্পারাও কথাশিল্পী। এই শক্তিশালী লেখকের রচিত ছোট গল্পগুলিই প্রথম তেলেগু সাহিত্যে—ধর্মের নামে অনাচারের বিরুদ্ধে, অন্যায় সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রার অসমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বহন করে এনেছিল। জনগণের মনকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল।

রামমূর্তি দেখা দিলেন এঁরই এক ভক্ত, অনুরাগী ও প্রচারক হিসাবে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সাহিত্যরসিক রামমূর্তি যৌবন অতিক্রম করে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তেলেগু সাহিত্য এ সময় উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। জার শাসনের বিরুদ্ধে রুশের গণ-বিদ্রোহ সফল হওয়ায় তার প্রভাব এসে পড়েছে বিশ্বের সর্বহারাদের মধ্যে। অন্ধ্রও সে ভুবনব্যাপী তরঙ্গ তাড়নে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। তাদের জাতীয় চেতনা ক্রমে সমাজ-সচেতনার সংস্পর্শে প্রবল হয়ে উঠলো—স্বাধীনতা চাই! পৃথক স্বাধীন অন্ধ্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা চাই। অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তার চাই। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা চাই—ইত্যাদি দাবির পর দাবি উঠে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকে দৃঢ়তর করে তুলতে লাগলো।

রামমূর্তি এগিয়ে এলেন তাঁদের জাতীয় সাহিত্যের দাবি নিয়ে। ইংরেজ শাসনের চাপে তেলেগু ছিল অবহেলিত। রামমূর্তি চাইলেন 'আমার মাতৃভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি দিতে হবে।' দেশব্যাপী এক বিরাট আন্দোলন শুরু করলেন তিনি। জাতীয় আন্দোলনকে পুষ্ট করে জাতীয় সাহিত্য। রামমূর্তি নিজে সাহিত্যিক না হলেও দেশের প্রয়োজনে

গড়ে তুললেন এক তেলেগু সাহিত্য-পরিষদ। গিডুগু রামমূর্তি কিশোর বয়স থেকেই নানা ভাষা শিক্ষায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। কিন্তু দেশের দাবী তাঁর তপোভঙ্গ করলে। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে। প্রত্যেকটি তেলেগু ভাষাভাষীকে সচেতন ক'রে তোলবার জন্য তিনি নিজেই শেষে লেখনী ধারণ করলেন। তিনি ভাষাতত্ত্ববিদ। তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, কানাড়ী, মালয়ালাম প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের সবকটি ভাষাতেই তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। তিনিও গুরাজাড়া আপ্পারাওর পদাঙ্ক অনুসরণে জনসাধারণের সহজবোধ্য গ্রামীণ কথ্য ভাষায় নব-আদর্শ-প্রণোদিত সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত হন।

সহজবোধ্য কথ্য ভাষাকে অন্ধ্রের অভিজাত সাহিত্যিকেরা অপাংক্তেয় করে রেখেছিল। এমন কি আপ্পারাওর মত শক্তিশালী লেখককেও তাঁরা সাহিত্যিক বলে স্বীকার করতে চান নি। রামমূর্তি এঁদের বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা শুরু করলেন। নানা প্রবন্ধে নিবন্ধে যুক্তিপূর্ণ তর্ক ও আলোচনা দ্বারা তিনি রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকদের ভুল ধারণাকে দূর করবার চেষ্টা করেন। তাঁর এই প্রবন্ধগুলিকে তেলেগু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলা চলে। চলতি ভাষাকে সাহিত্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'তেলেগু' নামে একখানি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সমাজের প্রগতির দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি জাতিভেদ দূর করবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। অচ্ছুৎ, পঞ্চম ও জংলী শবর জাতীয় অন্ত্যজদের শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তিনি নিজে এদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে এই সব নীচ অবহেলিত মানুষদের লেখাপড়া শিখিয়ে সমাজের মধ্যে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং আধুনিক তেলেগু সাহিত্য ও অন্ধ্রের বর্তমান জাতীয়তা বহুল পরিমাণে আপ্পারাও ও রামমূর্তি এই দুই প্রতিভাবান সাহিত্যরথীর নিকটই ঋণী। কাব্যে নাটকে, শ্রেষ্ঠ গল্পে, উপন্যাসে, তেলেগু সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বাংলার শক্তিশালী কবি ও সাহিত্যিকগণের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। প্রসিদ্ধ তেলেগু গীতিকবি রায় প্রোলুমুক্কা রাও দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে অবস্থান করে কবির সঙ্গ ও সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যের ভাবধারাকে তেলেগু সাহিত্যের মধ্যে প্রথম আমদানী করেছিলেন ইনিই। অন্ধ্রের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডীও শান্তিনিকেতনের ছাত্র।

মহাকবি আপ্পারাও প্রথম চলতি ভাষায় কবিতা রচনা করে তেলেগু কাব্য সাহিত্যে যে নূতন পথ প্রদর্শন করেছিলেন, মহামনীষী রামমূর্তি সে পথকে দৃঢ়পদে অনুসরণ ক'রে তেলেগু সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর এসেছে এঁদের পিছু পিছু কত তরুণ কবি ও সাহিত্যিকের দল রবীন্দ্রপ্রভাবে দীপ্ত হয়ে। বাংলার অতি-আধুনিক বিপ্লবী কবিদের ভাবধারাকেও এঁরা সমাদরে গ্রহণ করে তেলেগু সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেছেন। সুব্বা রাওয়ের রচিত 'জাড়া কুচ্চুলু', 'তেবৃগুতোটা', 'রম্যালোকামু' প্রভৃতি গীতকবিতার গ্রন্থগুলি খুবই জনপ্রিয়। পল্লী-কবি শ্রীদেওয়ালাও মানব জীবনের বাস্তব সুখদুঃখের চিত্র নিয়ে যে সব মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেছেন সাম্প্রতিক সাহিত্য-রসিক সমাজে তা বিশেষভাবে সমাদর লাভ করেছে। কবি সত্যনারায়ণ বিশ্বনাথের নামও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইনি যেমন ছন্দবদ্ধ কবিতা রচনা করতে পারেন, তেমনি গদ্য কবিতা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে আধুনিকতার নব-রচিত সরণীতে যাঁরা অভয় বীর্যে পা বাড়িয়েছিলেন সত্যনারায়ণ তাদেরই অন্যতম। পরবর্তী কবি ভেঙ্কট সুব্বারাওকে ঠিক এঁদের ছন্দানুবর্তী বলা চলে না, কারণ, তিনি আরও অগ্রসর। কিন্তু, একটা কথা মনে রাখতে হবে, সমাজ বিপ্লবের গান এঁদের কণ্ঠে কিন্তু ধ্বনিত হয়নি। সংস্কার মুক্তির মন্ত্র এঁরা উচ্চারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত বিদ্রোহের বাণী ও বিপ্লবের সুর বেজে উঠেছিল শ্রীনিবাসরাও শ্রীরঙ্গমের ওর্জস্বিনী কাব্য রচনার মধ্যে। এঁর 'মহাপ্রস্থানম্' একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংগ্রহ। পরবর্তী নূতন কবিরা এঁরই অনুসরণ করে চলেছেন।

উদ্বাসন

শ্রীরণেশ মুখোপাধ্যায়

কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের পাথার স্পন্দনে কাঁপে প্রাণ,
নিঃসহায় নৈরাজ্যের নিরালম্ব নগ্ন নিমন্ত্রণ :
অসমাপ্ত আশ্লেষের শিহরণে ইথারের মান ;
অবাস্তব বেদনায় ফিরে চায় ভগ্ন সন্ধিক্ষণ।
অযাচিত অতীতের অকারণ কম্প্র সম্ভাবনা,
বিদেহী বিচ্ছেদে কবে চেয়েছিল অন্তিম চুম্বন :
ঔদার্যের উজ্জীবন উৎসারিল প্রগল্ভ ঘোষণা ;
অবরোহী আকাংখায় শিখাইল ওষ্ঠের কুঞ্চন।
সহস্র শিখায় দীপ্ত অনিবার্য অচেনা আবাস,
সম্মানের সমারোহে নক্ষত্রের নর্ম অভিসারে :
কোটি বীজাণুর বক্ষে মদালস বৈদুর্য বিলাস ;
প্রাণের পরম রতি খুঁজে ফেরে কল্প-প্রোষিতারে।
রেখাহীন বিপ্রতীপে অসংলগ্ন উৎভ্রান্তির যতি,
অনন্তের সিংহদ্বারে থামিবে কি নক্ষত্রের গতি!

বদ্রিয়াজিন্

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবর-খনক বুড়ো বদ্রিয়াজিন্,—সর্ব্বাঙ্গে লোম ; এক চোখ কানা। বহুদিন থেকে একটি 'কনসার্টিনা'র সখ তার। দিলাম যখন তাই উপহার, নিজের ডান হাতখানা বেশ ক'রে একবার সজোরে বুকের উপর চেপে ধরলে ; শান্ত স্থির অথচ মাঝে মাঝে কেমন যেন একটু অপার্থিব রহস্য-মেদুর চোখটি তার আনন্দের আতিশয্যে মুদে এল।

"ও-ও-হো"···গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

তারপর একটু সামলে নিয়ে কেশ-বিরল মাথাটি নাড়্তে নাড়্তে একদমে ব'লে গেল,—"মোটের উপর নিশ্চিন্ত হতে পারো এবার এ্যালেক্সি-ম্যাক্সিমিচ্, তুমি ম'র্‌লে বেশ ভাল রকম যত্নই আমি নেব তোমার।"

গোরস্থানেও সে তার এই "কন্‌সার্টিনা"-টি সঙ্গে নিয়ে যায়, কবর খুঁড়তে খুঁড়তে শ্রান্ত হ'লে আগ্রহ ভরে 'পোল্‌কা' ভাঁজে। এই গদ্‌খানাই কেবল সে বাজাতে শিখেছিল। ফরাসী ধরণে উচ্চারণ ক'রে কখনো সে একে বলত' 'ট্রাঙ্-ব্লাঙ্' কখনো বা 'ডার্ণ-ব্লার্ণ'।

একদিন তারই নিকটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কোন পুরোহিতের সামনেই বদ্রিয়াজিন্ এই বাজ্‌না সুরু করে। বাজ্‌না থামলে পুরোহিত তাকে ডেকে ধমকে দিলেন।

"হারামজাদ্, মৃতের অবমাননা!"—তিনি বল্লেন।

বদ্রিয়াজিন্ এসে আমায় অভিযোগ জানায়।

বলে—"আচ্ছা, আমারই অপরাধ না হয় মানলুম ; কিন্তু মৃতের অপমান হ'ল তিনিই বা জানলেন কি ক'রে ?"

তার দৃঢ় বিশ্বাস নরক ব'লে কিছুই নেই। তার ধারণা, মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মাদের আত্মা-শরীর ত্যাগ ক'রে "আনন্দ-লোকে" চ'লে যায় ; আর পাপীদের আত্মা সমাহিত দেহটাকে পোকায় না খেয়ে ফেলা পর্য্যন্ত, কবরের অন্ধকারেই সেই শব আশ্রয় ক'রে থাকে।—তারপর, মাটির নিঃশ্বাসরূপে সেই আত্মা মিশিয়ে যায় বাতাসে, বাতাস থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধূলি কণায়।

ছ' বছরের কচি মেয়ে, আমার প্রিয়তমা নিকোলেভাকে সে-দিন সমাহিত ক'রে সবাই গোরস্থান ছেড়ে চলে গেল ; কোদাল দিয়ে মাটি সমান করতে ক'রতে কোষ্টিয়া বদ্রিয়াজিন্ আমায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।—

বলে,—"দুঃখ কেন ভাই, ওখানের লোকেরা হয়ত' আমাদের চেয়েও ঢের মিষ্টি সুললিত স্বরে কথা কয়। কিংবা বুঝি কথাই বলে না, হয়ত' কেবল বেহালাই বাজায়।"

বদ্রিয়াজিনের এই সঙ্গীতানুরাগ অদ্ভুত এবং মাঝে মাঝে বড় মারাত্মক। এ যেন তাকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়ে দেয়। মিলিটারি ব্যাণ্ড, ষ্ট্রীট অরগ্যান্, বা পিয়ানো শুনলে, সে-দিক পানে উৎকর্ণ হ'য়ে সে ঘাড় ফিরিয়ে একেবারে নিশ্চল!—হাত দু'খানি পিছনে বদ্ধ, কৃষ্ণায়ত অতল চক্ষে বিস্তীর্ণতা! যেন সে চোখ দিয়েই শুনছে! পথে বেরুলেই বদ্রিয়াজিনের এমনি তন্ময়গত অবস্থা, বাহ্যজ্ঞান শূন্যতা! বিপদের সহস্র সঙ্কেতেও উদাসীন নির্বাক! কতবারই সে ঘোড়ার লাথি আর ক্যাব্‌ম্যানের চাবুক খেয়েছে, কিন্তু বেহুস!

সে বোঝাতে চেষ্টা করে, "গান শুনতে শুনতে আমি যেন কোন্ নদীর অতলে তলিয়ে যাই।"

চারের কোঠা পেরিয়েও কিনা এই বদ্রিয়াজিন তার চেয়েও বছর পনেরোর বড়, একটা মাতাল, গির্জার ভিখারী সেরোকিনা বুড়ীকেই শেষটা ভালোবাসে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম,—"একী কাণ্ড তোমার!"

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

খিলান

ফটো : এস্, কে, চ্যাটার্জ্জী
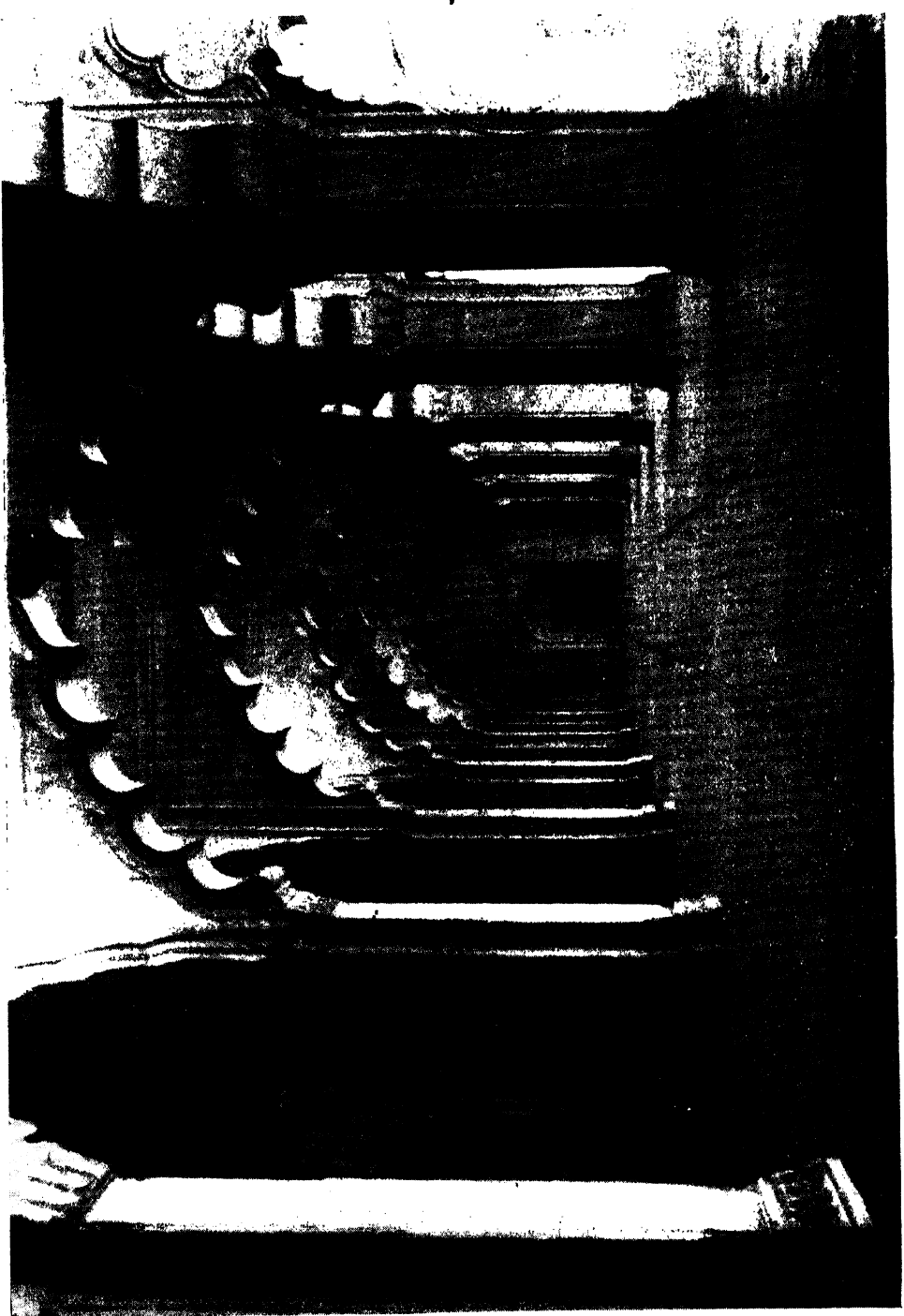
উত্তর দিলে, বাঃ আমি ছাড়া কে আর দরদী আছে ওর? আমি—আমি যে বঞ্চিতদের সান্ত্বনা দিতেই ভালবাসি; নিজের ত' কোনো খেদই আমার নেই কিনা, তাই—হ্যাঁ তাই পরের দুঃখের বোঝাকে চাই একটু লাঘব ক'রতে।"

একটা ভূর্জ্জ-গাছের তলায় আমাদের কথা হচ্ছিল। হঠাৎ জুনের এক পশলা জল হয়ে গেল। কোষ্টিয়া আহ্লাদে আটখানা!—তার বেল-মাথার কাটে বৃষ্টির জল পড়েছে। বললে, "সকলের চোখের জল মুছিয়ে দিতেই আমার কেমন ভাল লাগে।"

শ্বাস-প্রশ্বাসের দুর্গন্ধে স্পষ্টই বুঝা গেল, সে ক্যান্‌সারে ভুগছে। কিছুই খেত না; থেকে থেকে বমি করত। কিন্তু তবুও বেশ স্বচ্ছন্দে নিজের কাজ ক'রে নির্বিবাদে গোরস্থানে বেড়িয়ে বেড়াত। আর, ম'র্‌লেও আর একটা মুদ্দোফরাসের সঙ্গে তাস খেল্‌তে খেল্‌তে।

* ম্যাক্সিম গোর্কি

কাকীমা

অনুবাদক—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী

সেদিন হঠাৎ খুব ভোর বেলায় শ্যামুর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখল ওর কাকীমা মাটিতে একটা কম্বলের ওপর শুয়ে রয়েছে, আপাদমস্তক তার কাপড়ে ঢাকা। বাড়ির লোকেরা সবাই তাকে ঘিরে বিলাপ করছে। তাদের হাহাকারে সারা বাড়ি ভ'রে উঠেছে।

অবশেষে তারা যখন শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য উমাকে তুলতে গেল শ্যামু আর স্থির থাকতে পারল না। সবার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে কাকীমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলতে লাগল, "কাকীমা তো ঘুমুচ্ছে। ওকে তোমরা এমনি ক'রে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমি যেতে দেবো না।"

অতি কষ্টে তারা শ্যামুকে সরাল। কাকীমার শেষকৃত্যে ও উপস্থিত থাকতে পেল না। রামনাম করতে করতে একজন ঝি ওকে বাড়িতেই আগলে রাখল।

বুদ্ধিমান গুরুজনরা ওকে বোঝাল যে কাকীমা বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে। কিন্তু মিথ্যার আড়ালে সত্য বেশিদিন গোপন রইল না, আশে-পাশের অবোধ বালকদের মুখ থেকেই একদিন তা প্রকাশিত হয়ে গেল। একথা আর ওর অজানা রইল না যে কাকীমা আর কোথাও নয়, ওপরে—রামের কাছে গেছে। কাকীমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে একদিন ওর কান্না বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু দুঃখ দূর হ'ল না। বর্ষা শেষ হলে দু' একদিনেই মাটির ওপর থেকে জল স'রে যায় কিন্তু আর্দ্রতা যায় না বহুদিনেও। শ্যামুর শোকও চোখের জল থেকে বিদায় নিয়ে হৃদয়ের অন্তস্তলে গিয়ে বাসা বাঁধল। সারাদিন একলা বসে শ্যামু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

একদিন ওর চোখে পড়ল আকাশে একটা ঘুড়ি উড়ছে। কী যেন মনে করে হঠাৎ ও আনন্দে নেচে উঠল। ছুটে কাকার কাছে গিয়ে বলল, "আমাকে একটা ঘুড়ি আনিয়ে দাও কাকা। এখুনি আনিয়ে দাও।"

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক থাকেন বিশ্বেশ্বর। "আচ্ছা আনিয়ে দেবো," একথা ব'লে উদাস ভাবে বাইরে চ'লে গেলেন।

কিন্তু অধৈর্য শ্যামু কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না মনের আকাঙ্ক্ষা। একটা দড়িতে টানানো রয়েছিল বিশ্বেশ্বরের কোট। এদিক ওদিক তাকিয়ে ও একটা টুল কাছে টেনে আনল। টুলের ওপর উঠে কোটের পকেট হাতড়াতে লাগল। একটা সিকি পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে পালাল।

সুখিয়া ঝির ছেলে ভোলা, শ্যামুরই সমবয়সী সঙ্গী। সিকিটা তাকে দিয়ে বলল, "তোর দিদিকে দিয়ে একটা ঘুড়ি আর সুতো আনিয়ে দে ভোলা। খুব সাবধানে আনাস কিন্তু, কেউ যেন টের না পায়।"

ঘুড়ি এসেছে। একটা অন্ধকার ঘরে ঘুড়িতে সুতো

বাঁধা হচ্ছে। শ্যামু চুপিচুপি বলল, "ভোলা, কাউকে যদি না জানাস, একটা কথা বলব ?"

ভোলা মাথা নাড়ল, "না, কাউকে বলব না।"

এতক্ষণে শ্যামু আসল রহস্য খুলল : "এই ঘুড়ি আমি ওপরে—রামের কাছে পাঠাব। এই ঘুড়ি ধ'রে কাকীমা নিচে নেমে আসবে। আমি লিখতে জানি না, নইলে ঘুড়িতে কাকীমার নাম লিখে দিতাম।"

ভোলা শ্যামুর চাইতে বেশি বুদ্ধিমান। বলল, "সে তো খুব ভাল হবে কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ? সুতোটা যে বড্ড পাতলা। এ সুতো বেয়ে কাকীমা নামতে পারবে না, ছিঁড়ে যেতে পারে। ঘুড়িতে মোটা দড়ি বাঁধাই সব চেয়ে ভাল।"

শ্যামু চিন্তিত হয়ে পড়ল। কথাটা ওর কাছে অতি মূল্যবান মনে হ'ল। কিন্তু মোটা দড়ি ও কোথা থেকে জোগাড় করবে ? ওর নিজের কাছে পয়সা নেই আর বাড়ির লোকেরা, যারা দয়ামায়া ত্যাগ ক'রে কাকীমাকে পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে তারা যে এ কাজের জন্য ওকে কিছু দেবে না তা ও ভালভাবেই জানে। ভাবতে ভাবতে অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন ওর চোখে ঘুম এল না।

পরদিন শ্যামু বিশ্বেশ্বরের কোটের পকেট থেকে একটা টাকা জোগাড় করল একই উপায়ে। ভোলাকে টাকাটা দিয়ে বলল, "দেখিস ভোলা, কেউ যেন টের না পায়। খুব ভাল দেখে দুটো দড়ি আনিয়ে দে, একটাতে হবে না। জহরদাকে দিয়ে আমি একটা কাগজে 'কাকীমা' লিখিয়ে রাখব। নাম লেখা থাকলে ঘুড়িটা ঠিক কাকীমার কাছে চ'লে যাবে।"

ঘণ্টা দুয়েক পর। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শ্যামু আর ভোলা অন্ধকার ঘরটায় ব'সে ঘুড়িতে দড়ি বাঁধছে। অকস্মাৎ বিশ্বেশ্বর উগ্রমূর্তি ধারণ ক'রে সেখানে উপস্থিত হলেন। চোখ রাঙিয়ে বললেন, "আমার কোটের পকেট থেকে তোরা টাকা বের করেছিস ?"

ভোলা এক ধমকেই সব ব'লে ফেলল "শ্যামুদা টাকা বের করেছে, দড়ি আর ঘুড়ি কিনবে ব'লে।"

শ্যামুর দু'গালে দুটো চড় কষিয়ে দিয়ে বিশ্বেশ্বর বললেন, "চুরি শিখে জেলে যেতে চাস ? দাঁড়া, আজ তোকে ভাল ক'রে শিখিয়ে দিচ্ছি।" আরো কয়েকটা চড়-চাপড় মেরে ঘুড়িটা ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর দড়ির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এগুলো কে এনেছে ?"

ভোলা বলল, "ওই আনিয়েছে। বলছিল কি এই দড়ি-বাঁধা ঘুড়ি রামের কাছে পাঠিয়ে কাকীমাকে নামিয়ে আনবে।"

ক্ষণিকের জন্য বিশ্বেশ্বর বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ছেঁড়া ঘুড়িটা তুলে ধরলেন। ঘুড়িটার গায়ে একটা কাগজ লাগানো আর তাতে লেখা, "কাকীমা।"

খ্যাতনামা হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীযুত সিয়ারামশরণ গুপ্ত লিখিত "কাকী" নামক গল্পের অসংক্ষেপিত ভাবানুবাদ।
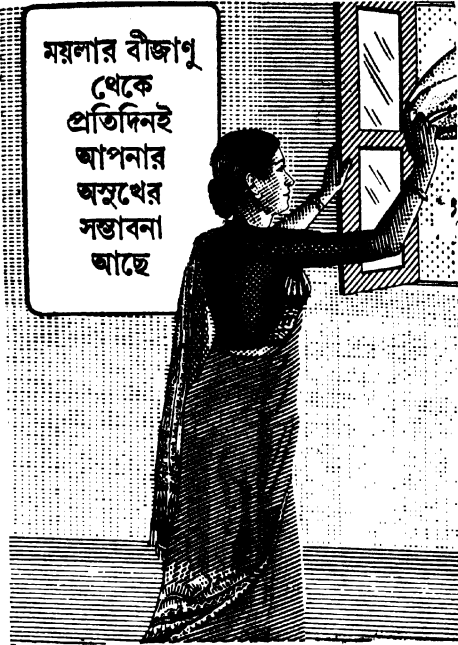
লা ই ফ ব য় সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু
থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 254-X52 BG

২৬
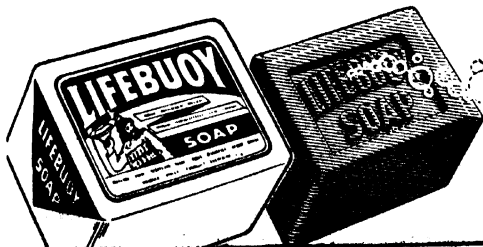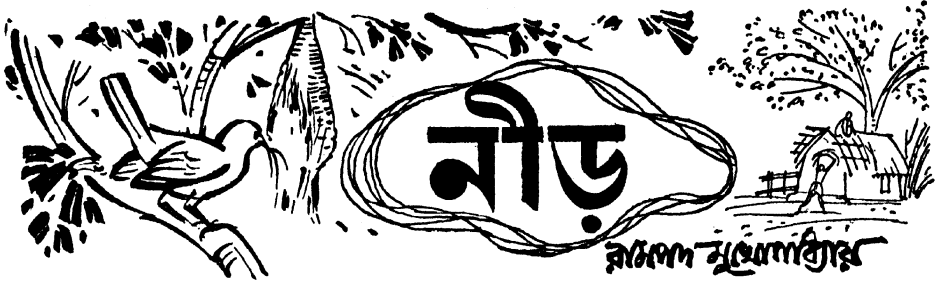
আঘাত এল অন্যদিক থেকে। সন্তুর বার্ষিক পরীক্ষার ফল বা'র হলে—ভগবতী নতুন করে যেন অমরনাথের বিয়োগ-বেদনা অনুভব করলেন। হায়, আজ তিনি যদি থাকতেন!

সন্তু মাথা নীচু করে বললে, তাহলে প্রমোশন নেব না?

কি জানি—কাকে জিজ্ঞাসা করব! তোমার মাষ্টার-মশায় কি বলেন? ভগবতী বিহ্বল ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

উনি বলেন—উঁচু ক্লাসে রেজাল্ট খারাপ করে প্রমোশন না নেওয়াই উচিত। তবে যদি মনোযোগ দিয়ে পড়—ফল ভালই হবে।

তুই কি বলিস?

ভাল করেই পড়ব মা। সন্তু উত্তর দেয়। একটু থেমে বললে, তোমার একটা সই দিয়ে দিও এই কাগজখানায়।

কিসের কাগজ?

এই গার্জেন মানে অভিভাবক ছেলের পড়ার যত্ন নেবেন, এই কথা লেখা আছে ওতে।

ভগবতী সই করে দিয়ে বললেন, ভাল করে মন দিয়ে পড়বি। আর দেখ—কেষ্টর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করবি নে।

কেষ্টদা তো ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছে।

তাহলে কি করছে? চানাচুর বিক্রীও তো করে না শুনি।

না—রমাদির সঙ্গে ঝগড়া করে সিনেমায় নাম লিখিয়েছে। আজকাল ছবি তোলাতে যায় সুধীনবাবুর সঙ্গে।

শুনেছি ওখানে গেলে মানুষ খারাপ হয়ে যায়। ভগবতী গম্ভীর মুখে বললেন।

না মা—চমৎকার জায়গা। কত যে শেখবার জিনিস আছে—না দেখলে বোঝানো যায় না। দেশের যাঁরা সেরা লোক—তাঁরা পর্য্যন্ত ওখানে যান। কত নাম-করা লোক—কত—

ছেলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভগবতী বিস্মিত হলেন। বললেন, তবে যে উনি তোকে যেতে দেন নি সেবার?

আমরা ইস্কুলে পড়ি কিনা—তাই। কিন্তু না গিয়েই বা কি ভাল রেজাল্ট করলাম!—একটি ছেলে প্রত্যেকবার ক্লাসে প্রথম হয়ে ওঠে—ছবিতেও নামে—

ও যার যেমন ভাগ্য—ভগবতী বললেন। তবে—ইস্কুলের ছেলের ওদিকে মন না দেয়াই ভাল।

সন্তু মনোক্ষুণ্ণ হ'ল—কোন উত্তর দিলে না।

ভগবতী পারতপক্ষে সন্তুর পড়ার ব্যাঘাত জন্মাতে চান না—কিন্তু মধ্যবিত্ত-ঘরে অন্য পুরুষ অভিভাবক না থাকলে সংসারের নানান দিকের চাপ এসে পড়েই। তা থেকে আত্মরক্ষা করা সুকঠিন। হাট বাজার থেকে রেশন—ঠাকুরপূজো থেকে ঔষধ পথ্য—কোনটার দাবী কখন প্রবল হয়ে উঠবে—কেউ বলতে পারে না। সে দাবী সঙ্গে সঙ্গে না মিটিয়েও উপায় নাই। মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু পাঠেই ব্যাঘাত জন্মায় না—হাটবাজার ডাক্তারখানা ছাড়িয়েও মন চলে যায় আরও অনেক জায়গায়। খেলার মাঠে—সিনেমায়—সভাসমিতিতে—ক্যারম বোর্ডে বা সংবাদ পত্রের স্তম্ভে—কোন মেলায় কিংবা যাত্রাগানের আসরে। মনের এমনিধারা কেন্দ্রচ্যুতি ঘটলে—নানান বিষয়ের ঢেউ তাকে দোলাতে থাকে অনবরত—ডাইনে থেকে বামে—উপরে থেকে নীচেয়।

এদিকে কমে আসতে লাগল টাকার সংখ্যা। উপরের ঘরের ভাড়া গুনে—এতগুলি প্রাণীর দু'বেলার অন্নসংস্থান···

ভাবের ভিত্তিমূল নড়ে উঠল।—কার সঙ্গেই বা পরামর্শ করেন ভগবতী—কমলাকে ডেকে বললেন, মাস মাস একশোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে—অন্য উপায় না হলে এখানে থাকব কি করে!

কমলা বললে, আমাদের তো কিছুই করতে দেবে না তুমি।

কি করবি? ঠোঙা তৈরী? বাচস্পতি বাড়ীর মেয়ে-বউ হয়ে তা পারব না। তোর রমাদির মত কল নেই যে—জামা সেলাই করে বেচবি।

অতএব সঞ্চিত অর্থ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত—সম্মানের সজ্জা গা থেকে নামানো চলবে না।

ক্রমে চৈত্র শেষ হয়ে নতুন বছর পড়ল। অক্ষয় তৃতীয়ার চন্দন মেলা শেষ হল—শেষ হ'ল রবীন্দ্র-জন্মোৎসব। এ বাড়ীর ছেলেমেয়েরাই সতরঞ্চি পেতে ছাদে গান ও আবৃত্তির ব্যবস্থা করলে। সে আসরে শ্রোতা হতে হ'ল—এই বাড়ীর প্রত্যেক বাসিন্দাকে।

মনে হ'ল সন্তুর আবৃত্তিটা সব চেয়ে ভাল হয়েছে। যেমন জোরালো মিষ্টি গলা—তেমনি ভাবভঙ্গী—কথা বলার কায়দা। সভাপতি ছিলেন—সুধীনবাবু। যথেষ্ট প্রশংসা করলেন সন্তুর।

পরের দিন সকালে তিনি নিজে এলেন ভগবতীর কাছে। ডেকে বললেন, আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে—বউদি।

অন্তরালবর্ত্তিনী দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতী ভগবতী মৃদু স্বরে বললেন, সামান্য বুদ্ধি আমার—আমি আপনাকে কি পরামর্শ দেব!

এ পরামর্শ আপনিই দিতে পারেন—সন্তুর যা-কিছু ভার আপনার পরেই রয়েছে যখন। একটু থেমে বললেন, জানেন তো আমরা ছবি তৈরীর সঙ্গে ঘুরি ফিরি—ও কাজের দৌলতেই উপার্জ্জন। আপনার সন্তুকে মাস-খানেকের জন্য দিন না—এখন তো গ্রীষ্মের বন্ধ আসচে—রোজ দু'এক ঘণ্টার জন্য মাত্র। পড়ার কোন ক্ষতি হবে না। অথচ কিছু টাকাও পেয়ে যাবেন। টাকাটাও আপনার পক্ষে দরকার। একটু হেসে বললেন, আর কারই বা দরকার নয়।

আচ্ছা—কাল জানাব আপনাকে।

সন্তুকে বললেন, গেলবারের কথা মনে আছে? উনি রাজী হন নি।

সন্তু বললে, বাবা বুঝতে পারেননি ঠিক। এতে পড়ার কোন ক্ষতি হবে না—অথচ অনেক টাকা পেয়ে যাব। টাকা না পেলে—এই ঘরও ছাড়তে হবে আমাদের।

এই ঘর ছাড়ার বেদনাও কম নয় ভগবতীর।

সন্তু বললে, ভগবান বার বার সুযোগ দেন না মা। এই সুযোগ যদি হাত ছাড়া হয়—

ভগবতীর মনে দ্বন্দ্ব সুরু হল। পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় কোন্ জিনিস? মান সম্মান বিদ্যা প্রতিপত্তি সবই সার্থক হয় যদি সম্পদের স্পর্শ থাকে। অর্থ-ই হল এগুলিকে উজ্জ্বল করে তোলার আয়না। সে আয়না যদি হাতে না রইল···

বললেন, বেশ করে ভেবে দেখ বাবা—যদি ভাল করে পাস করতে না পারিস—

নিশ্চয় পারব। এখনও পরীক্ষার অনেক দেরী।

কমলা বললে, তুমি না বল না মা—টাকার দরকার আমাদের খুবই আছে।

জানি না—যা ভাল মনে হয়—তাই কর। উনি বলতেন—ছেলেমেয়েরা যদি বিদ্যে না শেখে তাতেও আমি দুঃখু করব না—যেন তারা চরিত্রবান হয়। দেখিস বাবা—তাঁর আশা যেন নষ্ট না হয়।

সুধীনবাবু বিকেলে বণ্ড সই করাতে এসে বললেন, বড় খুসি হয়েছি বউদি—আপনি বোকামি করেননি।

মধুসূদনের কাছে গলবস্ত্রে প্রণাম করে মনের কথা জানালেন ভগবতী। আমি মেয়েমানুষ, জানি না ভাল করলাম কি মন্দ করলাম! তুমিই সব জান ঠাকুর। মানুষের অভাব সৃষ্টি করেছ তুমি—অর্থও তোমার সৃষ্টি। সন্তু দুধের বালক—ও যেন মতিভ্রষ্ট না হয়—দেখো তুমি।

আষাঢ়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইস্কুল খুলল—তারপর বসল অর্দ্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারলে না সন্তু। সেজন্য মনে ওর দুঃখ হল, দাগ পড়ল না। বিক্ষিপ্ত মন নানান দিকে প্রসারিত হয়েছে তখন—দুঃখের বাষ্প একই জায়গায় জমে মেঘের আকার নিলে না।

কেষ্টর সঙ্গে দেখা হল ষ্টুডিওতে। সন্তুকে দেখে ও

খুসি হল খুব। বললে, চমৎকার জায়গা রে। টো টো করে ঘোরা নেই—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মাল বিক্রীর কসরৎ নেই—খালি রঙীন কাপড় জামা পরে—মুখে রঙ মেখে ফ্লোরে গিয়ে দাঁড়াও। দু' একটি কথা—ব্যস অমনি কাট্। কাট্ বুঝিস তো?

গল্প শেষ করে কেষ্ট বললে, হাঁরে রমাদি খুব রাগ করেছে তো? ঠোঙা—চানাচুর—এসব বিক্রী হচ্ছে না কিনা। ওতে নগদ পয়সা ছিল, কাজ কিন্তু ছ্যাঁচড়া। খালি পাঁচজনের পায়ে তেল ঢাল!

সন্তু বললে, তুমি কাজ করবে তো?

কি কাজ? চানাচুর বিক্রী? গরম মশলাদার চানাচুর। আরে ভাই মুখের বুলিটাই যা গরম। নইলে প্যাকেটের চানাচুর যদি কথা কইতে পারত—তো আমাদের হাড় এক ঠাঁই মাস অন্য ঠাঁই হয়ে যেত।

কেন—কেন?

আর একটু বড় হ—বলব। কাছে সরে এসে চুপি চুপি বললে, হাঁরে—রমাদি এখনও সেলাই করে?

হাঁ—। তা ছাড়া বাইরে যায় সেলাই শেখাতে।

জানি—আর পড়তে।

পড়তে! সন্তু অবাক হয়ে গেল।

হাঁ রে, যেখানে পড়ে—জানি। ওর ইচ্ছে ম্যাট্রিক দেবে—ডাক্তারী পড়বে।

বল কি—!

খুব ভাল মেয়ে রমাদি—পড়াশোনায় আমার মত বুদ্ধু নয়—বুঝলি?

এত পড়ে করবে কি? চাকরি করবে? সন্তু শুধোলে।

যা-তা চাকরি না—ভাল চাকরি। দুশো—চারশো মাইনে। তা হোক, এই ছবি তোলার চাকরিই সব চেয়ে ভাল। দু'চার ঘণ্টার মামলা—দশ বিশ টাকা কামিয়ে নাও। দিব্যি রেষ্টুরেণ্টে যাও—পাশ নিয়ে সিনেমা দেখ—বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ কর···আর লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে···হা-হা করে হেসে উঠল কেষ্ট।

ওর উজ্জ্বল মুখের পানে চেয়ে সন্তুও স্বপ্ন দেখতে সুরু করলে। ফলে বাৎসরিক পরীক্ষাতেও সন্তু উত্তীর্ণ হতে পারলে না।

ভগবতী সব শুনে আশ্চর্য্য স্থিরকণ্ঠে বললেন, এও কি অদৃষ্টের দোষ?

মাথা নীচু করে সন্তু বললে, লেখাপড়া শেখা তো অর্থ উপায়ের জন্য, যদি উপায় করতে পারি?

একথা তোমার মুখে শুনব আশা করিনি। উনি-চরিত্র আর বিদ্যা এই দুটি জিনিসকে বলতেন মানুষের পোষাক। চরিত্রকে বলতেন, গায়ের জামা—আর বিদ্যা হল তার উপরের পাট করা চাদর। সভাতে দুটিরই আদর।

সন্তু মাথা নীচু করেই জবাব দিলে, কিন্তু টাকা না থাকলে, মানুষকে কেউ পোঁছেও না। যার যত টাকা—তার তত সম্মান।

স্তম্ভিত হলেন ভগবতী। সেই সন্তু—ভীরু অবোধ মুখচোরা ছেলে—মুখের একটি কথা বলার সাহস যার ছিল না, সে তর্ক করছে তাঁর সঙ্গে! বলছে—পৃথিবীতে টাকাই সব!

ভগবতী সেখানে আর দাঁড়ালেন না—কলতলায় নেমে এলেন। প্রতিবাদ করবেন—সে জোর কই তাঁর কণ্ঠে। মানুষকে সামাজিক মর্য্যাদা দেয় টাকা—এ তো প্রত্যক্ষ দেখছেন। প্রতিদিন অনুভব করছেন—এর অভাবে সংসারে কি বিশৃঙ্খলা ঘটে। তবু এইটেই কি মানুষের সব চেয়ে বড় বস্তু? মানুষ কেন সৃষ্টি করল এমন জিনিস—কেন স্বীকার করল এর দাবীকে সকলের চেয়ে বড় বলে? সংসারের হিসাব-নিকাশে কেন এটি অপরিহার্য্য হয়ে উঠল! সেকালের যে-কথা পুরাণে মহাভারতে আছে সে সব কি পুরাণেরই গল্প? ···ব্রহ্মজ্ঞান—লাভ করতে মানুষ ধন সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল—একি পাগল মানুষেরই কল্পনা? মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান মনে পড়ল—কতদিন শুনেছেন স্বামীর মুখে সেই উপাখ্যান। দুঃখ-জয়ের অমৃত-ময় উপাখ্যান। এককালে যা দুঃখকে জয় করেছিল—আজ তা দুঃখেরই কারণ হ'ল শুধু? ওই অর্থ—কি অনর্থই বাধাচ্ছে শুধু? না-না, অর্থের অভাবে এইতো মাস কয়েক আগে—পূজোর ঠিক আগে পাশের বাড়ীতে যা ঘটে গেল—তা ভাবলে এখনও হৃদকম্প হয়। কি প্রকাণ্ড বাড়ী—ওই মিত্তির বাড়ী।···অতবড় সদর দুয়োর একালে আর চোখে পড়ে না—ওই দুয়োরের মধ্যে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে আসা—নিয়ে যাওয়া চলত—ভিতরের পাঁচ ফুকরের ঠাকুর

গীতা সিংহ বলেন

"লাক্স টয়লেট সাবানের নতুন সুগন্ধ সত্যিই অপূর্ব—বহুক্ষণ গা'য়ে লেগে থাকে।"

বিশুদ্ধ শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের অপূর্ব সুরভিত ফেনা দুনিয়ার কমনীয়া সুন্দরীদের ত্বক্ তাজা, মোলায়েম ও রূপোজ্জ্বল করে রেখেছে।

আপনার দৈনিক সৌন্দর্য্যস্নান বড় সাইজের সাবান মেখে উপভোগ করুন।

ভারতে প্রস্তুত

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS, 462-X52 BG

দালান থেকে। দুয়োরের কাঠ আজ খসে খসে পড়ছে—সাতটা শস্তা কাঠের তালি ওর সর্ব্বাঙ্গে। ভিতরের দালান পায়রা চামচিকায় ঠাসা, রাজ্যের ভাঙ্গাচোরা কাঠ আর লোহার টুক্‌রোতে ভর্ত্তি। চুণ বালির চিহ্ন কোনকালে হয়তো ছিল—আজ সারা বাড়ীখানা···পাতলা ইটের অসংখ্য লাল দাঁত বার করে—হাসছে। নোনাধরা দেওয়ালের গহ্বর বেড়েই চলেছে দিন দিন—কোনদিন বা হুড়মুড় করে পড়ে যাবে বাড়ীখানা। সত্যিই একদিন বাড়ীখানা পড়ে গেল। হুড়মুড় করেই ভেঙ্গে পড়ল। যারা যত্ন করে তৈরী করেছিল ভোগ দখল করবে বলে—তারা অবশ্য তার আগেই বিদায় নিয়েছে। কিন্তু সে বিষাদের দৃশ্যে আজও প্রাণ কেঁপে ওঠে—, বাসা ভাঙ্গার এমন মর্ম্মান্তিক দৃশ্য ভগবতীর চোখে কোনদিন পড়েনি।

পূজার আগের দিন রাত্রিতে তুমুল ঝগড়া বাধল ও বাড়ীতে। ঝগড়া প্রায়ই বাধে। ও বাড়ীর বউয়ের গলা—অনেক দেয়াল পেরিয়ে এবাড়ীতেও আসে। কিন্তু এই সন্ধ্যারাত্রির ঝগড়ার তুলনা হয় না। মত্তপ স্বামীকে নিয়ে ওর জ্বালা যন্ত্রণা কম নয়। যাই হোক—সেদিনকার ঝগড়ার সার মর্ম্ম—ছাদে গিয়ে যা সংগ্রহ করে আনলে মিত্তির বউ—তাতে এইটুকু বোঝা গেল—দেনার দায়ে বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে অনেকদিন আগে—কোর্ট ডিগ্রি দিয়েছে বাড়ী দখলের—পূজোর আগেই বাড়ী ছাড়তে হবে—সকাল বেলায় নোটিশ দিয়ে গেছে। পূজোর আগে! যে বাড়ীতে ফি বছর এসেছেন মহামায়া—সে বাড়ীর পুরস্ত্রীরা তাঁরই আসার দিনে পথে গিয়ে দাঁড়াবে! নূতন বস্ত্র কেনার সামর্থ্য নেই—ছেলেমেয়েরা বাড়ী থেকে আর পথে বেরুবে না ঠাকুর দেখতে—পথে পথেই ঘুরবে, ফিরে আসবে না বাড়ীতে। তুমুল ঝগড়া চলল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সকালবেলার কাণ্ড।—চারদিকে লোকজনের হৈ হৈ—হট্টগোল। ব্যাপার কি? ওই ঠাকুরদালানের মাঝখানে যে লোহার শিকে একশো বাতির বেলোয়ারী ঝাড় ঝুলত—সেই শিকে—সৌখিন চাদরে ফাঁস তৈরী করে ঝুলছেন ও বাড়ীর কর্ত্তা—সান্থ মিত্তির। কি সাজসজ্জা তাঁর! পরণে ফিনফিনে শান্তিপুরী ধুতি বহুকাল আগের কেনা, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী—সেও বহু পুরাতন—তার উপর একখানি কাশ্মিরী শাল, যার আগাগোড়া হাতের কাজ করা—অবশ্য পোকায় বহু ছিদ্র করেছে তার গায়ে—পায়ে চকচকে পাম্প-সু। এই বেশে বিজয়া দশমীর দিন ঠাকুর ভাসান দেখে ফিরতো সান্থ মিত্তির। এই বেশেই বাইরের বৈঠকখানায় বসে আগন্তুককে করতেন বিজয়া-সম্ভাষণ—গ্রহণ করতেন প্রণাম—দিতেন আলিঙ্গন। পাশে একটি গামলায় থাকত রসগোল্লা—আর একটি বড় পাথরের পাত্রে সিদ্ধির সরবত। সান্থ মিত্তিরের মেজ মেয়ে সারদা ছোট্ট গেলাসটি এগিয়ে দিত সরবতের—ছোট ডিসে দু'টি রসগোল্লা তুলে সামনে নামিয়ে দিত। পাশের বাড়ী বলে সন্তু অন্য অন্য ছেলেদের সঙ্গে বিজয়া জানাতে গিয়েছিল সেবার—তারই মুখে শোনা।

একটা দুঃস্বপ্নের মত ঘটনাটি মনে পড়ছে। সান্থ মিত্তির চলে গেলেন—দিন কতক বাদে টুকিটাকি জিনিসে দু'টি গরুর গাড়ী বোঝাই করে হরিলক্ষ্মী বাড়ী ছাড়লেন। দখলদার কেউ বাড়ীতে অবশ্য আসে নি—এল কতকগুলি মিস্ত্রি মজুর। তারা হাতুড়ি শাবল গাঁইতি দিয়ে নোনা ধরা ইঁট খসিয়ে বাড়ীখানাকে ভূমিসাৎ করলে। একটা দুঃস্বপ্নের যেন অবসান হল।

যদি টাকা থাকত সান্থ মিত্তিরের? এভাবে ঘর-ভাঙ্গার বেদনা বইতে হত কি হরিলক্ষ্মীকে? কে জানে—কোথায় আজ হরিলক্ষ্মী—? এই বিশাল অট্টালিকা-পুরীর মাঝে কোথায় হারিয়ে গেছে সে। এমনি করেই একদিন বাঁধা ঘর ভেঙ্গে যায়—মানুষ ছোট একটি ঢেউয়ের মত হারিয়ে যায় অনন্ত নর-সমুদ্রের বুকে।

আরও একটা ঘটনা মনে পড়ছে। অমরনাথের মৃত্যুর পর এই বাড়ীতেই ঘটেছে সেটি। মিত্তির বউয়ের পাশের ঘরে থাকতেন একঘর স্যাকরার ব্রাহ্মণ। ছেলেমেয়ে নিয়ে আটজন লোক সংসারে। কোন আপিসে চাকরি করতেন না ব্রাহ্মণ—ঘরে বসে তৈরী করতেন মাদুলি। স্বপ্নাদ্য মাদুলি—ছোট বড় মাঝারি—নানান সাইজের। সেই মাদুলির বিজ্ঞাপন নাকি কাগজে বেরুত। ঠিকানা থাকত এই গলির শেষ প্রান্তে অবস্থিত চাটুজ্জ্যেদের আস্তাবল বাড়ীর। এককালে ফিটন ব্রুহাম আর সহিস কোচম্যানে—আস্তাবল জমজমাট ছিল। এখনও আস্তাবল জমজমাট থাকে; তবে ঘরের ফিটন ব্রুহাম সহিস কোচম্যান বিদায় নিয়ে—তার বদলে এসেছে

ক্যাডিল্ * যুক্ত রেক্সো-
না'কে আপনার অবগুণ্ঠিত
রূপকে উন্মোচন করতে দিন

রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়-তায় ভরে তুলেছে।

* ত্বক্-পোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈল সমূহের এক বিশেষ সংমিশ্রণের মালি-কানী নাম।

Rexona
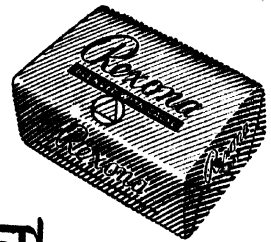
রেক্সোনা

ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান

বড় সাইজেও পাওয়া যায়

রেক্সোনা প্রোপাইটারী লিঃ-এর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

R.P. 131-X52 BG

কয়েকখানা ছ্যাকড়া গাড়ি—কয়েকজন লুঙ্গিপরা মুসলমান গাড়োয়ান। তারা ভাড়া নিয়েছে আস্তাবল। তাদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত ছিল ব্রাহ্মণের, যা কিছু চিঠিপত্র আসবে—'স্বামী অভয়ানন্দ—সর্ব্বশান্তি আশ্রমের' নামে তা যেন ব্রাহ্মণের হাতে পৌছে দেয়। বিনিময়ে কিছু দক্ষিণা দিতে হোত। মাদুলি বিক্রয় হতো মফঃস্বলে—উপার্জ্জন ভালই হত। টাকার গরবে ব্রাহ্মণীর পা পড়তো না ভূঁয়ে। কারও সঙ্গে মিশত না সে। নিজের ঘরে বসে হাপর জ্বালিয়ে মাদুলি ঝালাত আর বলত, এ বাড়ীতে মানুষের মত মানুষ কে আছে যে তার সঙ্গে কথা কইব!

এই আয় ছাড়া বিয়ে অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে কিছু আয়ও ছিল ব্রাহ্মণের।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ব্যবসায়ে ভাঙ্গন সুরু হয়েছিল। ব্রাহ্মণী ঘর থেকে বেরুতে আরম্ভ করল। নীচেয় নামল। কলতলা পেরিয়ে দলিজে মন্মথ স্যাক্‌রার দোকান পর্য্যন্ত যাওয়া আসা চলতে লাগল। একে একে নাকের নথ—কানের দুল—গলার হার—হাতের বালা অদৃশ্য হয়ে গেল। সুরু হল—কলহ কচকচি।—কর্ত্তায় গিন্নীতে, ছেলে মেয়েতে—খালি কথা কাটাকাটি—খালি পরস্পরের ওপর দোষারোপ। একদিন কর্ত্তা রক্তাক্ত দেহে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী এসে শয্যা নিলেন। ডাক্তার এল—চিকিৎসা চলল। প্রকাশ পেল—রাস্তায় আসতে আসতে মোটর গাড়ীর সামনে পড়ে নাকি এই দুর্দ্দশা হয়েছে। জনশ্রুতি বয়ে আনলে অন্য কাহিনী। কোন প্রতারিত মাদুলি ধারণকারী সন্ধান নিয়ে—প্রকৃত ঠিকানা আর মানুষটাকে আবিষ্কার করে যথারীতি উত্তম-মধ্যম দিয়ে গেছে। শাসিয়েছে এই প্রতারণা বন্ধ না করলে—আরও গুরুতর শাস্তি দিয়ে যাবে।

কিন্তু আঘাত হয়েছিল গুরুতর। ব্রাহ্মণ যথাসর্ব্বস্ব শেষ করে—শেষ হয়ে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে ছেলে-মেয়ের হাত ধরে ব্রাহ্মণী পথে গিয়ে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল পাঁচজনের দয়াতে। কোথায় গেলেন ব্রাহ্মণী? আর কোথাও তো মাথা গোঁজবার ঠাঁই ছিল না তাঁর। ভিটে-ছাড়া পাঁচ পুরুষ—কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত মাকুর মত আনা-গোনা করেছে এতকাল। খবর এল, খোলার বস্তীতেই চলে গেছে ব্রাহ্মণী। ঘর সেখানে কোথায়? সেই নরককুণ্ডে ঘর বাঁধার কল্পনা কেউ কোন দিনই করে না। জনশ্রুতি যা বয়ে এনেছে—তাতে দু' কানে আঙুল দিয়ে ভগবতী শিউরে উঠেছেন। নারায়ণ রক্ষা কর—সুমতি দাও ওদের।

কে জানে—ওরা কোন্ পথে চলেছে! শহরে সবই নূতন সৃষ্টি—অনাসৃষ্টি। এর আঁচ তাঁর সংসারে এসেও লাগছে। ছেলে শিখেছে তর্ক করতে—মেয়ের কথার বাঁধুনি হয়েছে পাকা। এ ছাড়া অর্থ না থাকলে মানুষের কি দশাই না ঘটতে পারে—স্বচক্ষে দেখছেন। তবু মনে অশান্তি জমে কেন? সন্তু মোটা টাকা এনে দিয়েছে হাতে—কিছুদিনের মত নিশ্চিন্ত হয়েছেন—তবু ভগবতীর চিন্তার বোঝা বেড়ে উঠছে কেন?

বহুদিন পরে—অমরনাথের খড়ম জোড়ার সামনে মাথা নামিয়ে নিঃশব্দে—চোখের জল ফেলতে লাগলেন ভগবতী।

এমনি করে আরও একটি বছর গড়িয়ে গেল কাল-সমুদ্রে। (ক্রমশঃ)
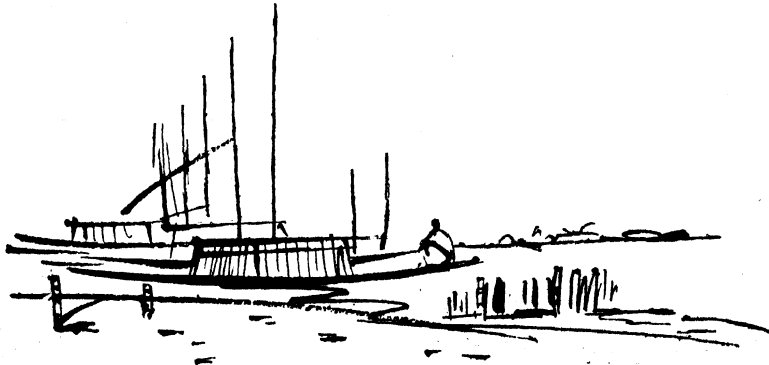
পরিচালক—উপানন্দ

তীর্থ-পরিক্রমা

এবার নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগদান করবার জন্তে আমন্ত্রণ এলো। ইতিপূর্ব্বে সম্মেলনের দাক্ষিণ্য পেয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত পরিক্রমা হয়েছিল। ভাব্‌লাম—এ সুযোগ ত্যাগ করা যায় না। দক্ষিণ ভারত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র আর স্থাপত্য শিল্পের সর্ব্বোত্তম নিদর্শন ভূমি। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধন হয়েছে এই দক্ষিণ ভারতে। বহুদিন ধরেই পুণ্য-লোভাতুর মন পথ চেয়েছিল কবে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গময় শিবমূর্ত্তিকে প্রণাম করবার সুযোগ পাবে আর, শ্রীরাম-নাথ স্বামীকে দেখে ধন্য হবে। সুযোগ পেলে, কে আর ছাড়ে!

কলিকাতা হাইকোর্ট বড়দিনের উপলক্ষে বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তেইশে ডিসেম্বর রাত্রে জনতা এক্সপ্রেসে যাত্রা সুরু কর্‌লাম। সহযাত্রী হোলেন আমার তিনজন ভক্ত ও অনুরাগী। এঁরা বরাবরই আমার দূরের ভ্রাম্যমাণ দিনগুলিকে মধুময় করে রাখেন। এঁদের সাহচর্য্য পেয়ে আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাব্‌বার বা দেখ্‌বার দরকার হয় না। এবারও এঁদের সেবা ও সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হইনি। হয় তো শ্রীরামনাথ স্বামীরই নেপথ্য নির্দ্দেশ ছিল, তাই ইচ্ছা হোলো একটানা দেড় হাজার মাইল চলে গিয়ে কয়েক দিন রামেশ্বরম্ তীর্থে বাস কর্‌বো।

আশা আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় উদ্বেলিত হোলো। অন্তরে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ কর্‌লাম। মানুষ চির-যাযাবর। তার মন নূতনত্বেরই অন্বেষণ করে। অজানাকে জান্‌বার, অদেখাকে দেখ্‌বার আর অচেনাকে চিন্‌বার জন্তে মানুষের আগ্রহের সীমা নেই, এক্ষেত্রে আমারই পক্ষে বা ব্যতিক্রম হবে কেন!

শ্রীভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি একমাত্র ভারতবর্ষেই হয়েছে। তার মহিমা উপলব্ধি কর্‌বার উপযুক্ত ক্ষেত্র ভারতভূমি—ভক্ত ভগবানের সংযোগ-স্নায়ু এই ভারত। তাই এখানেই ভগবান যুগে যুগে মানুষের রূপ ধারণ করে অপ্রাকৃত লীলা দেখিয়ে গেছেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্ সে লীলার পরমপ্রকাশ। সেতুবন্ধে এসে তার নিদর্শন পেলাম—সাগরের জলে যে ধরণের অসংখ্য শিলা দেখ্‌লাম, তা দক্ষিণ ভারতে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ। কি ভাবে এই সব শিলাখণ্ড দূর থেকে এনে,

সেতুবন্ধ রামেশ্বর সেতু। শ্রীরামচন্দ্রের রচিত ভগ্ন শিলাসেতুর ওপর এই রেলসেতু নির্ম্মিত হয়েছে

স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাগর বন্ধনের ব্যবস্থা হয়েছিল, তা ভাব্‌লে আজও বিস্মিত হোতে হয়।

চলেছি বাংলা দেশ ছেড়ে অচেনা পথের উদ্দেশ্যে। এঁকে বেঁকে চলেছে বাষ্পীয় যান—শীতার্ত্ত রাত্রি। কামরাগুলি ভিড়াক্রান্ত। পরদিন ভুবনেশ্বরে গাড়ী এলো—কয়েকজন উড়িয়া ছাত্র এখান থেকে উঠ্‌লো। ওরা যখন আমার সহযাত্রীদের কাছ থেকে আমার পরিচয় পেলো, তখন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ধারা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা সুরু কর্‌লো। ওরা যে আমাদের কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে জান্‌বার জন্যে ব্যগ্র, তা ওদের কথাবার্ত্তা থেকে বুঝলাম। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালকেই ওরা চেনে, আর কারও সম্বন্ধে ওরা ওয়াকিবহাল নয়। রবীন্দ্রোত্তর যুগ পর্য্যন্ত কাব্য-সাহিত্য নিয়ে কিছু আলোচনা করতে হোলো। বাংলার বহু কবি ও সাহিত্যিকের প্রসঙ্গ তুলে ওদের মনে রঙ ধরিয়ে দিলাম। ওরা সবাই কলেজের ছাত্র, গঞ্জামের বহরমপুর ষ্টেশনে ওরা নাম্‌লো।

উড়িষ্যার সীমানা পেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ কামরাটী ক্রমে ফাঁকা হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। পথে চিল্কা হ্রদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌লাম। এই হ্রদ থেকে মৎস্য ধরে কল্‌কাতায় রপ্তানী করা হয়। একটি অন্ধ্রদেশীয় তরুণ সাংবাদিক আমাদের কামরায় ছিলেন। তিনি আমাকে বাংলার সাহিত্য, কাব্য, সমাজ ও দেশাচার সম্বন্ধে নানা প্রশ্নে জর্জ্জরিত করলেন। পরে জান্‌তে পারলাম, তিনি হিন্দুস্থান টাইমসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পথে তিনি আমাকে প্রচুর কাজু বাদাম, চা, কেক্‌ দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন।

ওয়াল্‌টেয়ার থেকে একটী মাদ্রাজী তরুণ উঠ্‌লেন—আমারই কাছাকাছি জায়গায় বসে রবীন্দ্রনাথের গোরার ইংরাজী অনুবাদ পড়তে সুরু করলেন। ওঁর হাতে গোরা দেখে আমিই প্রথম ওঁর সঙ্গে গোরা সম্বন্ধে দুটি চারটী কথা বল্‌তেই উনি তার উত্তর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কিছু জান্‌বার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ক্রমে প্রসঙ্গ জমে উঠ্‌লো। দেখ্‌লাম উড়িষ্যা থেকে সুরু করে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যত শিক্ষিত ও শিক্ষিতা তরুণ তরুণীর সান্নিধ্যে এসেছি, তাঁদের প্রত্যেকেরই মুখে একই কথা—কবিগুরু সম্বন্ধে কিছু বলো, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলো—তাঁরা অন্য কারও কথা শুনতে চান না।

দু' রাত্রি ট্রেনে অতিবাহিত করে মাদ্রাজের সেন্ট্রাল ষ্টেসনে এসে পৌঁছুলাম রবিবার সায়াহ্নে। নবপরিচিত সহযাত্রীরা আমার কাছ থেকে একে একে বিদায় নিলেন। নমস্কার প্রতি-নমস্কারের পর যাবার সময়ে এঁদের মধ্যে কয়েকজন বল্‌লেন—'কবি, আমাদের কথা মনে রেখো—' এর পর আর যাতায়াতের পথে কোথাও কোন অ-বাঙালীকে যেচে পড়ে আলাপ জমিয়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে দেখি নি।

মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশন থেকে এগ্‌মোর ষ্টেশনে ট্যাক্সিতে আসা গেল। ভাড়া পড়্‌লো দেড় টাকা। ষ্টেশনে যাত্রীদের বিশ্রামাগারে বোঁচ্‌কা বুঁচ্‌কি রেখে স্নান করে নিতে হোলো। ইতিপূর্ব্বেই গরমের জন্যে শীতের পোষাক ছাড়তে হয়েছিল। সন্ধ্যায় রেলওয়ে হোটেলে নৈশভোজন সারা কর্‌লাম। ভোজনই করলাম, রসনার তৃপ্তি হোলো না। মদ্রদেশীয় ভোজ্যবস্তুগুলি আমাদের পক্ষে রুচিপ্রদ নয়—উদরের পক্ষেও প্রতিকূল। ইণ্ডো-সিলন এক্সপ্রেস প্লাটফর্ম্মে বহু আগেই এসে যাত্রীদের জন্যে অপেক্ষা করছিল, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যে জানালার দিকে একটি কোণ নিলাম। রাত্রি আটটায় রবিবারে সুরু হোলো ধনুষ্কোটীর দিকে যাত্রা। এদিকে সব মিটার-গজের গাড়ী।

বাঙ্‌লার হাড়ভাঙা কন্‌কনে শীত এখানে নেই। পেলাম বসন্তের হাওয়া। মধ্যরাত্রে শীতের আমেজ পাওয়া গিয়েছিল। দিনের বেলা রীতিমত বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে গ্রীষ্মের প্রখরতা ও ঘর্ম্মের প্রাবল্য আংশিক-ভাবে দূর করতে হয়েছিল। পথের ক্লান্তি তখনও আসে নি, ট্রেনে একভাবে বসে থাকার যে বিড়ম্বনা, তাই ভোগ করতে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে ঘুমের আমেজ চোখে ছিল।

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল যাত্রীবাহী সুন্দর আকারের ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন—পৃথক ভাবে নেই এর এঞ্জিন, এর পরিচালক আছেন গাড়ীর মধ্যে। বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে ট্রেনের যে সংযোগ, তা বাইরে থেকে ধরতে একটু সময় নেয়। সংযোগটা ভিন্ন ধরণের—কল্‌কাতার ট্রামের মত নয়। আমরা ট্রেনের বৈদ্যুতিক গতি প্রত্যক্ষ করলাম, যেন এক নিমেষে ট্রেনখানি দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেল। যানবাহনের যান্ত্রিকতা কী পরিবর্ত্তনই না এনেছে!

ট্রেনে যেতে যেতে গাইড খুলে দেখ্‌লাম ত্রিবান্দ্রম থেকে প্রায় ছাপান্ন মাইল দূরে কন্যাকুমারিকা। এখানে ট্যাক্সি বা বাসে যাওয়া যায়। বাংলো ও ধর্ম্মশালা আছে। সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত একই স্থানে দাঁড়িয়ে উপভোগ করবার স্থান এখানেই। ত্রিবান্দ্রাম আরব সাগরের উপকূল, শ্রীরঙ্গমে কাবেরী-সঙ্গমতীর্থে স্নান, মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির, বাঙ্গালোরে টিপুসুলতানের প্রাসাদ, মহীশূরে বৃন্দাবন কানন, তাঞ্জোরের মন্দির প্রভৃতি সম্বন্ধে সহযাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করা গেল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি দেখে ওঠা সম্ভব হবে না ভেবেই সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হোলো।

ডিসেম্বরের প্রথমে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে যে সব স্থান ঝঞ্ঝাপ্লাবনে বিধ্বস্ত হয়েছিল, সেগুলি দেখে অন্তরে বেদনা অনুভব করা গেল—কত লোকেরই না ধনপ্রাণ নষ্ট হয়েছে! স্থানে স্থানে রেলপথ মেরামত হচ্ছিল, এজন্যে মধ্যে মধ্যে ট্রেণ থেমেছে আর ধীরে ধীরে এগিয়েছে। কাজেই গন্তব্য স্থানে এর পক্ষে পৌঁছুতে বিলম্বই হচ্ছিল। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব, ভাষায় প্রকাশ করে ওঠা যায় না। কোথাও দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত্রে তালনারিকেলবীথি মাথা উঁচু করে আছে, কোথাও উচ্চমান ভূমিতে ফসল হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে, কোথাও তামাকের ক্ষেতে এক একটি কুটীর মাথায় লোহার দণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বিচিত্র আকারের ছোট ছোট নগ্ন পাহাড় মানুষের পায়ে চলা পথের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে—কোন কোনটীর কিছু কিছু অংশ বিরাট হ্রদ বা জলাশয়ের ভিতর প্রবেশ করেছে—কোথাও বা গৈরিক প্রস্তরের শৈলশ্রেণী পথিকের মন হরণ করছে—কোথাও বা বালিয়াড়ি, কোথাও বা সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে বিরাট জলরাশি

মাঝখান দিয়ে বালির পাহাড়ের প্রাচীর তুলে, কোথাও বা ধূধূ করছে বহুদূর বিস্তৃত বালুকাক্ষেত্র।

এদিকে শীতে ও গ্রীষ্মে দু'বার বর্ষা আসে—ঝড় ওঠে, আর সমুদ্রের উপকূল কাঁপিয়ে তোলে। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করে, তারা সমুদ্র-তরঙ্গেই পেতেছে খেলাঘর। তারা সমুদ্রের সন্তান। তারা ডিঙ্গি নিয়ে সমুদ্রের তরঙ্গদোলায় দুলতে দুলতে মাছ ধরতে যায়—শুক্তি সংগ্রহ করে।

পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে অন্ধ্রা রাজ্য, পশ্চিমে মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, আর আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর—এই চতুঃসীমার মধ্যে মন্ত্রভূমিতে এসেছি তীর্থ দর্শনে, আর বঙ্গ-ভারতীর যজ্ঞস্থলে আহুতি প্রদান করতে। এসেই বিস্মিত হয়েছি এর সুন্দর রূপ দেখে—ট্রেনে না ঘুমিয়ে শুধু ওর রূপসুধা প্রাণভরে পান করেছি। মায়াভরম, তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, মনমাদুরাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ষ্টেশনগুলি পার হয়ে আমাদের ট্রেন চলতে থাকে সমুদ্রসঙ্গমে।

এ সব অঞ্চলে চায়ের পরিবর্ত্তে কফির প্রচলনই খুব বেশী। ট্রেনে বসে খেতে পাওয়া যায় কাগজে মোড়া দইভাত, বিরিয়ানী, নারিকেল-তেলে ভাজা ফুলুরি, বড়া, পাউরুটী, কেক, চিনাবাদাম, কাজু বাদাম, দুধ, ডাব, লেবু, ডালিম, কলা প্রভৃতি। মিষ্টান্ন এদিকে অপ্রচলিত। দুধ ও দইয়ের দর কলকাতারই মত। রামেশ্বরম্ ধর্ম্মশালায় চিঁড়ে পেয়েছিলাম, পথে নয়। দই ভীষণ টক।

ইণ্ডো-সিলন এক্সপ্রেসে রেস্তোরা গাড়ী ছিল। কারে উঠে চা পান করতে হোলো না, মাংস ও ভাত ছাড়া অন্য সব তরকারী আদৌ মুখরোচক নয়। নিরামিষ তরকারীতেও পেঁয়াজ ছিল। পাঁপর ভাজাও পাওয়া গেল। পান খাওয়া নিয়ে হোলো সমস্যা। সাজা পান পাওয়া যায় না। পানে খয়েরের প্রচলন নেই। আস্ত পান নিয়ে চুণ সুপারির সংযোগে মুখশুদ্ধির ব্যাপারটা স্থগিত রাখতে হোলো।

বৈকালের দিকে আমাদের ট্রেন উঠলো পামবান ব্রিজে। শ্রীরামচন্দ্রের রচিত বিক্ষিপ্ত ভগ্ন শৈল সেতুর ওপর এটা নির্ম্মিত হয়েছে। প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত সেতু। যখন এ পথে জাহাজ এসে দাঁড়ায়, তখন সেতু দুভাগ হয়ে ওপরের দিকে উঠে দুটী স্তম্ভের মত হয়। তারপর জাহাজ চলাচল হোতে থাকে। সেতুর অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৌশল দেখলে সত্যই বিস্ময়-বিহ্বল হোতে হয়।

সেতুর ওপর দিয়ে ট্রেন ধীরে চলতে লাগলো। ট্রেন থেকে দেখলাম—বাম দিকে বঙ্গোপসাগর উন্মাদের মত নৃত্য করছে তার ফেনিলোচ্ছ্বাস নিয়ে; মনে হোলো যেন নীল জলের ওপর শ্বেতসমুদ্র পরীরা দল বেঁধে খেলা করছে। ডান দিকে ধ্যানমৌন প্রশান্ত রূপ ধারণ করে ভারত মহাসাগর রয়েছে—দুইটী সাগরের মিলনের রূপ দেখে পুলকিত হওয়া গেল।

পামবান জংসনে নেমে রামেশ্বরমগামী গাড়ীতে উঠলাম। প্রায় সন্ধ্যার সময়ে তীর্থভূমিতে অবতরণ করা গেল। ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক সুবিস্তৃত দ্বীপের ওপর রামেশ্বরম্ তীর্থ অবস্থিত—এর শেষ প্রান্তে ধনুষ্কোটী। ডিসেম্বরের প্রথমে যে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ হয়েছিল তার ফলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ায় ভারত থেকে মাল আমদানী হোতে পারেনি, ফলে এখানে খাদ্য-সঙ্কট হয়েছিল।

মন্দিরের খুব কাছেই পাণ্ডা রামচন্দ্র পূজারী একটি ধর্ম্মশালার দ্বিতলে একখানি উৎকৃষ্ট ঘর দিলেন, রাত্রে একটু মশার উপদ্রব হয়েছিল। আশে পাশে ও নীচে যে সব যাত্রী ছিলেন, তাঁরা মশা ও ছারপোকার উপদ্রবে কাতর হয়েছিলেন। আমাদের ঘরে একদিন মাত্র বানর প্রবেশ করে বিব্রত করেছিল। এখানে তিন রাত্রি বাস করতে হোলো। সাগরের ধার থেকে সুরু করে রামেশ্বরম্ মন্দিরে এবং এর উপকণ্ঠে লক্ষ্মণকুণ্ডে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান ও পূজার্চ্চনা করতে হোলো। দুদিন ধরে পাণ্ডারা তীর্থকৃত্যাদি করালেন। তৃতীয় দিনেই আমি

রামেশ্বরম্ মন্দির

অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তান্ত্রিক হোম করলাম। এখানে বিল্বকাষ্ঠ ও বিল্বপত্র পাওয়া গিয়েছিল। তৃতীয় দিনেই দেবাদিদেব রামনাথ স্বামীর খিঁচুড়ী ভোগ প্রসাদ পেলাম।

প্রতিরাত্রে আড়াইটার সময় থেকে মন্দিরের রেকর্ড বাজিয়ে লাউড স্পীকারের মারফৎ দেবতার স্তব শোনানো হয়, বহুদূর পর্য্যন্ত সে আওয়াজ যায়। পূর্ণিমার রজনীতে সমুদ্রের উপকূলে বসে ১২ই পৌষের রাত্রি পরমানন্দে অতিবাহিত করে ঐ দিন ভোর বেলায় ট্রেনে উঠে

সকাল বেলায় পামবান এলাম। এখান থেকে ট্রেনে চেপে ধনুষ্কোটী যাওয়া গেল।

মালপত্র একজন রেলওয়ে কুলির হেপাজতে রেখে একটি পথপ্রদর্শক ও তল্পিবাহককে নিয়ে দু'মাইলের ওপর বিস্তৃত বালুরাশি ভেদ করে আমরা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের মিলনস্থলে এলাম। স্নান ও তীর্থকৃত্যাদি বঙ্গোপসাগরেই করতে হোলো। এখানে রামচন্দ্র অবাধ্য সমুদ্রকে দণ্ড দেবার জন্যে ধনুতে শর যোজনা করতেই সমুদ্র নররূপ ধারণ করে এসে ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে বশ্যতা স্বীকার করলো। উনি বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে লঙ্কায় যাবার জন্যে সমুদ্রকে পথ করে দিতে বললেন। ও ভেতরটা ফাঁক করে পথ করে দিতেই উনি সদলবলে লঙ্কায় চলে গেলেন।

বর্ত্তমানে লঙ্কা সমুদ্রগর্ভে অবলুপ্ত। বহু যোজন বিস্তৃত লঙ্কাদ্বীপের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশরূপে সিংহল দূরে সাক্ষ্য দিচ্ছে—সেখানে নাকি কিছু কিছু ত্রেতাযুগের স্মৃতিবিজড়িত ভগ্নাবশেষ কতকগুলি স্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। দুপুরে ধনুষ্কোটী পায়ার থেকে ট্রেনে উঠে তিরিশে জানুয়ারী প্রাতঃকালে এগ্‌মোর ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম।
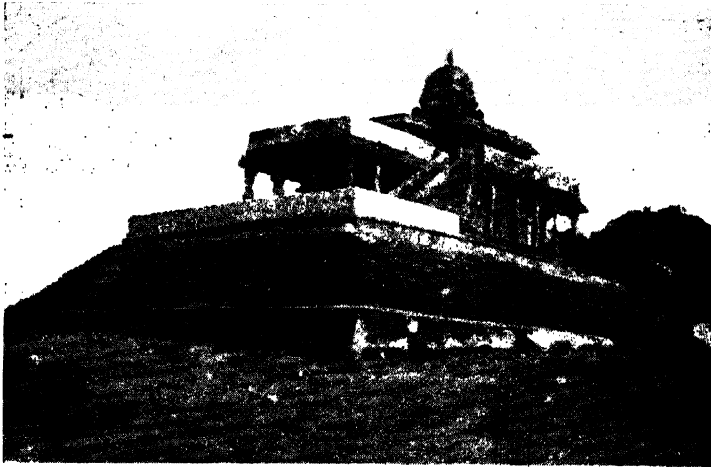
গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপর শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির

রামেশ্বরম্ মন্দিরে বহু যাত্রীর ভিড় দেখেছি। মন্দিরের বহির্গাত্রে পাথর খোদাই করা নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি। গোপুরমের ভেতর অনেকগুলি দোকান। শঙ্খ ও পাথরের নানাপ্রকার জিনিষ রয়েছে। এখান থেকে শাঁখ, ঝিনুকের সৌখীন দ্রব্য, খেলনা ও শঙ্খ মালা কেনা গেল। রামেশ্বরম্ মন্দিরের ভিতরটা পরিক্রমা করতে গেলে বহুক্ষণ সময় লাগে—অনেকটা গোলক ধাঁধাঁর মত। ভিতরে কুণ্ড আছে, এর ধারে বসে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদি করতে হয়েছিল। মন্দিরের অভ্যন্তর দেখে মনে হোলো যেন নতুন তৈরী হয়েছে। মন্দির আর গোপুরম দেখে সত্যই বিস্মিত হোতে হয়। কি ভাবে এখানে সব সুন্দর সুন্দর পাথর এনে নভোচুম্বী মন্দির আর গোপুরম রচিত হয়েছে তা চিন্তা করবার বিষয়। সুপ্রাচীনকালে তো যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না!

দেবায়তনটী অতিপ্রাচীন এবং দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য শিল্পের অতীব উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সাগর পারের এই দ্বীপে দেখলাম মন্দির নয়—পাথরের স্বর্গপুরী। অনবদ্য শিল্পশ্রী প্রতিটী প্রস্তরে মহাকাব্যের মতই সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন রামচন্দ্র স্বয়ং। মন্দিরের বহির্দৃশ্যও অতীব মনোহর। এখানে অবস্থানকালে প্রথম দিন এক মাইলের ওপর পদব্রজে গিয়ে গন্ধমাদন পর্ব্বতে রামচন্দ্রের পাদপদ্ম দেখে এলাম। এখানে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা জয়ের পর বিশ্রাম করেছিলেন।

তিরিশে জানুয়ারী মাদ্রাজের এয়ার লাইন হোটেলে প্রাতরাশ শেষ করা গেল, তারপর মাদ্রাজ রাজভবনের এলাকাভুক্ত মাদ্রাজ বিধান পরিষদের সভ্যদের বিরাট আবাসিক সৌধে থাকবার স্থান পেলাম। সৌধ সংলগ্ন রাজাজী হলে আমাদের সম্মেলন হোলো—তামিল ও তেলেগু সাহিত্যের অধিবেশন এখানেই হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে হয়েছে প্রত্যহ অপরাহ্নে সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন—এখানে শিল্পকলা প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল। ভরত নাট্যম্‌এর নৃত্য গীতাদি উপভোগ করা গেছে আর, শোনা গেছে শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর অতুলনীয় গান। পঙ্কজ মল্লিক, দিলীপ রায় প্রভৃতিও গেয়েছিলেন।

বাঙ্গালীর রসনাতৃপ্তিদায়ক উপযোগী খাদ্য-সম্ভারের ব্যবস্থা হয়েছিল, এমন কি টাটকা রোহিত মৎস্য পর্য্যন্ত। সম্মেলনের শেষে ৩রা জানুয়ারী ভোর বেলা থেকে সুরু করে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাসে তুলে আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হোলো একশো পঁচাত্তর মাইল—মন্দিরে মন্দিরে দেখলাম বিগ্রহের অঙ্গে খোদিত যন্ত্র। এ যন্ত্র এদেশে লুকিয়ে রাখার পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এই সব যন্ত্র দেখে আর মন্দির গঠনের প্রণালী লক্ষ্য করে বুঝা গেল দক্ষিণভারত অতি প্রাচীনকালে তন্ত্র সাধনায় বহু উর্দ্ধে উঠেছিল। প্রত্যেক স্থানেই স্থাপত্য শিল্পের অভিনবত্ব পাওয়া গেছে—মহাবলীপুরম্, কাঞ্চিভেরম্, পক্ষীতীর্থম্ প্রভৃতি আমাদের দেখানো হোলো। পক্ষীতীর্থম্‌এ উঠবার সময়ে আমাদের এক সাহিত্যিক-বন্ধু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় ছয় শত সিঁড়ি উঠে আমরা পাহাড়ের ওপর দুটী সাদা রঙের চিল জাতীয় পাখী দেখলাম। এই

পক্ষীমিথুন সংখ্যাতীত কাল থেকে এখানে প্রত্যহ দুপুর বেলায় ঠিক বারোটা বাজ্‌বার কয়েক মিনিট আগে এসে পুরোহিতের প্রদত্ত প্রসাদ খেয়ে বারোটার কিছু পরে চলে যায়। পাহাড়ের শীর্ষে শিব মন্দির, তাও দেখা গেল। পল্লব যুগের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন রয়েছে অতীত সমুদ্র বন্দর মহাবলীপুরম্‌এ—দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। কাঞ্চিভেরম্‌ দেখে কাঞ্চিতীর্থের পুণ্য সঞ্চয় করা গেছে। বেঙ্গলী ক্লাবে আমাদের আমন্ত্রণ হয়েছিল, তা ছাড়া মদ্রবন্ধুদের কাছ থেকেও আমন্ত্রণ এসেছিল, আরও থাক্‌লে বহু নিমন্ত্রণ হয়তো আস্‌তো। যাহোক্‌ সব আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হোলো না, ৩রা জানুয়ারী রাত্রি আটটায় মাদ্রাজ মেলে রওনা হওয়া গেল। ৫ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রে হাড়ভাঙ্গা শীতের ভেতর খুর্দ্দা রোড জংসনে নেমে যাত্রীদের বিশ্রামাগারে আশ্রয় নিলাম। তার পরদিন সকালে পুরী এক্‌সপ্রেস ধরে শ্রীক্ষেত্রে এলাম। এখানে ভারত সেবাশ্রমে থেকে সমুদ্র স্নান, জগন্নাথ দর্শন, ভোগ প্রসাদ গ্রহণ ও তীর্থকৃত্যাদি সাঙ্গ করে ৮ই জানুয়ারী কল্‌কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করা গেল।

লঙ্কা বিজয়ের পূর্ব্বে সমুদ্র তীরে লিঙ্গময় মহাদেবের অর্চ্চনায়রত রাম লক্ষ্মণ ও হনুমান

তোমরা বোধ হয় জানো গ্রন্থ পাঠে যে সব জ্ঞান সম্যক্‌ভাবে স্ফুরণ হয় না, দেশ ভ্রমণের ফলে সেগুলি স্ফুরিত হয়। চিত্তের সঙ্কীর্ণতা, ভ্রান্ত ধারণা, আত্মাভিমান, ধর্ম্মান্ধতা, শুচিবায়ু ও নানাপ্রকার কুসংস্কার দেশ ভ্রমণের দ্বারা দূর হোতে পারে। বহু বিচিত্র বর্ণের ও বিভিন্ন ভাষাভাষী নরনারীর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে এসে অন্তরের মালিন্য দূর হয়,—নানাভাবের আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে অনেকের সঙ্গে সখ্যতা হয়। আর হয়েছিলও তাই সুইস যুবক জ্যাকিকে-নিয়ে। জ্যাকির পুরো নাম হচ্ছে জ্যাকি জে বেশন—জেনিভার কোন শিল্পপতি ও পুঁজিবাদীর একমাত্র পুত্র। ও বিমানযোগে জেনিভা থেকে নয়াদিল্লীতে এসে নিউ দিল্লীর ইউনিয়ন একাডেমির অধ্যক্ষ বন্ধুবর ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্যের আতিথ্য গ্রহণ করে। কুড়ি বছরের ছেলে প্রথম এবার এলো ভারতে। ওঁর সঙ্গে ও দক্ষিণ ভারতের নানা তীর্থ ও সহর পল্লী ঘুরে সম্মেলনে এলো। এয়ার লাইন হোটেলে অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য আমার সঙ্গে জ্যাকিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওকে সম্মেলনের সভ্য করে বুকে ব্যাজ দিয়ে দেওয়া গেল। ওর বাঙালী হবার ভয়ানক সাধ, বাংলা ভাষা শিখে আমাদেরই মত একজন হোতে চায়, বিয়ে করতে ইচ্ছুক বাঙালী মেয়েকে। অদ্ভুত ওর বাঙালী প্রীতি। যাহোক ও আমাদের সঙ্গে একপংক্তিতে বসে ভারতীয় ভাবে হাঁটুগেড়ে বসে খেয়েছে। ওকে নিয়ে শুধু আমরা নয়, মেয়েরাও বেশ রঙ্গ রসে দিন কাটিয়েছেন।

ওকে পরিয়ে দেওয়া হোলো ধুতি, পাঞ্জাবী ও জহরকোট,—ও তাই পরে বেশীর ভাগ সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। ও বলে গেছে, আগামী বৎসর নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে বিমান-যোগে আবার আস্‌বে।

পারোতো, রেলওয়ে কন্‌সেসানের সুযোগ নিয়ে তোমরা দল বেঁধে দক্ষিণ ভারত ঘুরে এসো—সেখানকার ছেলেমেয়েরা তোমাদের সমাদরই করবে, উপসংহারে এই কথা বলেই আমার ভ্রমণ বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি রেখা টেনে দিলাম।

—

চিতোর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

শুক্‌নো মাটীতে, পাথরে—নুড়িতে, পথ হয়ে আছে কীর্ণ ;
শুধু উঠে যাও, আরও উঠে যাও, পাহাড়ের বুক দীর্ণ।
পাহাড়ের বুকে বেদনা র'য়েছে জমা ;
শ্যামল-হরিতে মুছাতে গেলেও ওর বুকে নেই ক্ষমা।
ওর বুক-ছেঁচা চোখের জলের বাণী,
আজও কল্‌কল্‌ বহে উচ্ছ্বাস, ভোলা-সুর টানিটানি।
শুধু কয় মুঠী ধুলোর পাহাড়,—
তবু ওরা কার পাঁজরার হাড়
জানো, জানো কি-গো কেউ ?···
···কালের স্রোতের সীমানা পারানো ঢেউ

থরে থরে এর জমে আছে প'ড়ে, পাথর-চোয়ানো লিপি।
বাবলা-বাসক-আতার পাতারা কথা কয় চুপিচুপি।
ঐখানে প'ড়ে পুত্তের হাড়;
জয়মল্লের শেষ সৎকার,
ঐখানে শিখা দারুণ জ্বেলেছে
রাণা মুকুলের শোক;
এমনি কতোই প'ড়ে হেথা হোথা জলন্ত নির্মোক।
কুম্ভ-মীরার, পদ্মিনী আর পান্নার দিনরাত
এখানে ওখানে বাড়ায় ইশারা হাত।
প্রতাপের গান গায়—
গরীব চাষীরা; নবান্ন-হোলী,
রাখিবন্ধন, দশরা, দেয়ালি,—
অবসর মতো মন-ঝরোখায় সেদিনের পানে চায়।
এই ঝরাপাতা বাসকের বনে
মহাকাল আছে প'ড়ে;—
প্রণয় হেথায়, শক্তি হেথায়, হিংসা দ্বন্দ্ব বন্ধুর দায়,
দেশের বেদনা, দশের সাহস,—একই চিতায় পোড়ে।

* * * *

তবু তো এখনো মীরামন্দিরে শান্ত দুপুর বেলা,
কাঠবিড়ালিরা অনায়াসে করে খেলা।
তেমনি ফাগুন ছড়ায় আগুন বনে;
গিরিধারী হায় বাঁশরী বাজায় অকারণে ক্ষণে ক্ষণে॥

—

শিশু সাহিত্যের দু'চার কথা

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

"জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা ক'রে মেলা,
জানে না তা'রা সাঁতার দেওয়া জানে না জাল ফেলা।
নুড়ি তা'রা কুড়িয়ে পেয়ে সাজায় বসি' ঢেলা।"
—"রবীন্দ্রনাথ।"

শিশুদের প্রতি কবি গুরুর দরদ অসীম। তিনি নির্দ্দেশ করেছেন শিশুই প্রকৃতির সৃজন। আর বয়স্ক লোক বা মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তাঁর ধারণা স্বভাব-সুন্দর শিশুরা চির চঞ্চল, আলো ঝলমল্ পৃথিবীর আনন্দ আহরণে তারা অহরহ আত্মহারা। এই শিশুদের মনোরাজ্য যেমন সুন্দর, আবার তেমনি কোমল ও সরল। সেখানে স্বার্থের গ্লানি নেই,—নেই সংসারের কলুষ-মালিন্য। শারদোৎসবে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলছেন: "ঠাকুরদা, আর তো দেরী করলে চলবে না। লোক ছুটতে আরম্ভ করেছে। পুত্র দাও, ধন দাও, ক'রে আমাকে একেবারে মাটি কোরে দেবে। ছেলেগুলোকে—এইবার একবার ডাকো, তা'রা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সংগে খেলা জুড়ে দিলেই, পুত্র-ধনের কাঙ্গালরা আমায় ত্যাগ কোরবে।"

এই হ'চ্ছে শিশুদের সত্যিকার রূপ। যে যুক্তিহীন নির্য্যাতন শিশু চরিত্রের এই মাধুর্য্যকে পিষ্ট ক'রে, তিনি তা'র একান্ত বিরোধী। শিশুর অন্তরের আনন্দ অনুভূতিকে অস্বীকার ক'রে, প্রীতিহীন শাসন ব্যবস্থার ধ্বংসের ইংগিতই বারে বারে দিয়েছেন। তাই কবিগুরু বলেছেন:—

"খোকা আমার কতখানি, সেকি তোমরা বোঝ?
তোমরা শুধু দোষগুণ তা'র খোঁজো,
আমি তা'রে শাসন করি বুকেতে বেঁধে;
আমি তা'রে কাঁদাই যে গো আপনি কেঁদে।"

রবীন্দ্রনাথের শিশু যাদুকরেরা তাদের সংগের সোনার কাঠি দিয়ে অনেক কঠিন বয়োজ্যেষ্ঠকেও করেছে তাদেরই মতো সরল, আনন্দ-পাগল। শারদোৎসবে ঠাকুরদা বলছেন—"হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া আমার বয়েসের হিসেবে প্রায় পঞ্চাশ. পঞ্চান্নর গরমিল হোয়ে যায়।"

রবীন্দ্রনাথের কোন শিশু চরিত্রই শরৎচন্দ্রের "রামের-সুমতি"-র রামের মতো সর্ব্ব অবয়ব পুষ্ট হোয়ে সৃষ্ট হয়নি। তিনি ফুটিয়েছেন তা'দের *Relation* বা জ্ঞাতিত্ব, দেখিয়েছেন তাদের মধ্য দিয়ে জটিল সমস্যার নিষ্পত্তি। এই সমস্যার নিষ্পত্তি করতে গিয়ে অনেক স্থলে তাঁর লেখা হোয়ে পড়ছে *Symbolical* অর্থাৎ নিদর্শন স্বরূপ বা সাঙ্কেতিক। তিনি বড় বেশী *mystic* বা দর্শনবাদী। এ কথা মোটেই অস্বীকার করা যায় না—যে বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকাশের ভাব-ভঙ্গিমা অনেক স্থলে দিয়েছে তাঁর চিত্রিত চরিত্রকে দাবিয়ে। কিন্তু তিনি যা' সৃষ্টি কোরেছেন তা' কোন শ্রেণী বা জাতি—বিশেষের আকার ও অবয়ব প্রাপ্ত হয় নি। তাঁর চিত্রিত শিশুরা সর্ব্বদেশের বা সর্ব্বকালের। তিনি যে ডাকঘরের অমলের মধ্যে অজানাকে জানার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা সৃজন কোরেছেন তা' সারা বিশ্বের বালকেরই অন্তরের কথা। অমল তা'র পিসেমশাইকে বলেছে:—"আমি, যা' আছে সব দেখ্‌বো। অসুখ ভালো হোয়ে গেলে কেবলি দেখে বেড়াব।"

সুতরাং পৃথিবীর সেরা শিশু-সাহিত্যিকদের মধ্যে আমাদের রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। বাংলা শিশু-সাহিত্য রচনায় প্রাথমিক পর্য্যায়ে যাঁরা আত্মনিয়োগ কোরেছেন তাঁদের মধ্যে "সখা" পত্রিকার সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন। তিনি 'সখা' পত্রিকার মারফতে ও "বেণু" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক নৃপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। তিনি তাঁ'র "বেণু"র মাধ্যমে একযুগান্তকারী শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি কোরতে চেয়েছিলেন। বেণু পত্রিকাটির পেছনে গভীর সহানুভূতি ছিলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী), এবং কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের। উপেন্দ্রকিশোর চৌধুরী মশায়ের সম্পাদিত মাসিক "সন্দেশ"ও এককালে বাংলার ঘরে ঘরে শিশুদের কাছে সন্দেশ বিতরণের ভার নিয়েছিলো। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শিশু-সাহিত্যের দিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরই দৃষ্টি পড়েছিলো। তিনি চেয়েছিলেন এক শিশু-সাহিত্যিক গোষ্ঠি গঠন করতে। তিনিই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রভৃতি লেখকগণকে শিশু-সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেন, যা'র ফলে দক্ষিণারঞ্জনের "ঠাকুরমা'র ঝুলি" ও অন্যান্য রূপকথা এবং অবনীন্দ্রনাথের "ভূতপরির-দেশ"—"বুড়ো আংলো"—"নালক" প্রভৃতি শিশু-উপযোগী পুস্তক রচনা চল্‌তে থাকে। এই সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলানো ছড়ার দিকে মন দিলেন। সুকুমার রায়ের "আবোল-তাবোল"—"হ-য-ব-র-ল" প্রভৃতি তখন বেশ ছেলেমেয়ে মহলে হাসি ও আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে। "আবোল-তাবোলের" ছন্দগুলিকে ইংরেজীতে বলে—*"Nonsense Rhymes"* অর্থাৎ অর্থহীন শব্দ-ধ্বনি। এই শব্দের ধ্বনিগুলিই এই কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য। যেমন উদাহরণস্বরূপ দিতে পারা যায় :—

"হ্যাংলা হাতী চ্যাং দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরাণী পক্ষিরাজ
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।"

*   *   *   *

আবার :—

"প্যাঁচা কয় প্যাঁচানী,
খাসা তোর চেঁচানী।
শুনে শুনে আনমন,
নাচে মোর প্রাণমন।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, তিনিও এধরণের ছন্দের অবতারণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে :—

"মারহাট্টা, ওরে মারহাট্টা,
মার মার রব কোরে মারগাট্টা।
নাক মুখ'থে'তো কোরে ক'র ঠাট্টা।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প-বয়স থেকেই কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। প্রায় আট-নয় বৎসর বয়স থেকেই কা'কেও না জানিয়ে চুপি-চুপি কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বহির্বাটির কাছারী ঘরে গিয়ে বুড়ো গোমস্তাদের কাছ থেকে পুরাণো খাতা চেয়ে নিয়ে তা'তে বড়ো বড়ো লাইন টেনে বড় বড় অক্ষরে কবিতা রচনা অভ্যাস করতেন। এইভাবে শিশুসাহিত্যের ভেতর দিয়েই কবিগুরু শিশুদের মনোরাজ্যে প্রবেশ করেন। বর্ত্তমানেও শিশু-সাহিত্য প্রসার লাভ করেছে। আসর-দপ্তর এবং বেতারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদির মাধ্যমেও শিশুসাহিত্য রচিত ও পরিচালিত হচ্ছে। শিশুসাহিত্যে যাঁ'রা আত্মনিয়োগ ক'রে চলেছেন তাঁদের সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা গেল।

কবি শ্রী সুনির্ম্মল বসু। শিশু-কবিতার ছবি-ছড়ায় শিশু-মনের ছন্দ-রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। হাসির কবিতাতেও ছেলেমেয়েদের মন খুশীতেই ভরে ওঠে। নমুনা স্বরূপ কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল :—

"তুব্‌ড়ো-মুখো গুব্‌রে পোকার সাধ হলো সে করবে বিয়ে,
ঠিক হ'ল সব, ঠেক্‌ল শুধু মনের মতন পাত্রী নিয়ে।
অ্যাং-এর মেয়ে ব্যাংয়ের-এর মেয়ে নিজের চোখেই দেখ্‌লো কত,
বোঁচকা বোঁচা হাড়গিলে সব—কেউ হলো না মনের মতন।"

—"বাদুড় বৌ।"

কবি ও শিশুনাট্যকার শ্রীঅখিল নিয়োগী ('স্বপন বুড়ো', যুগান্তর পাত্‌তাড়ি)। তাঁ'র রচনার প্রাঞ্জল ভাষাগুলি প্রত্যেকটি শিশুমনে গভীর দোলা দেয়। গীতিনাট্যের ভেতর দিয়ে নেহেরুজীর—"শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান" বাণীটিকে তিনি রূপদান করেছেন তাঁর "এশিয়ার-নৃত্য ছন্দে।" তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে ভিয়েনাতে আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে যোগদান করেন।

কবি শ্রীবিমল ঘোষ ('মৌমাছি', আনন্দবাজার, "আনন্দমেলা")। তিনি শিশুদের মাঝে বেশ কিছু আনন্দ পরিবেশন কোরছেন তাঁর সরল ও মধু-প্রাঞ্জল ছন্দ-দোলায়। "আনন্দ মেলার" মাধ্যমে তিনি যে বিরাট কিশোর সংঘ গঠন করেছেন তা' সকল ছেলেমেয়েরাই জানে। মানুষ পৃথিবীতে আসার সংগে সংগেই বয়োজ্যেষ্ঠরা শিশুর মুখে প্রথমেই মধুদান করে থাকেন। অর্থাৎ শিশুটির পরিণত জীবনের প্রতিটি অধ্যায় এমনই মধুময় হ'য়ে গ'ড়ে উঠুক্। মধুর সংগ্রহকারী ত হ'লো মৌমাছি। প্রতি ফুলে মধু-আহরণই তা'র কাজ। সুতরাং আমরা "মৌমাছি"র তারিফ কোরতে পারি।

কবি শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ('উপানন্দ', ভারতবর্ষ)। তিনি বর্ত্তমানে শিশুসাহিত্যের ওপর যে "কিশোর জীবনের পথ নির্দ্দেশ" দিচ্ছেন সেটি খুবই মূল্যবান্। গল্পচ্ছলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার দিন এখন এসেছে। কবি সেই অনুসন্ধিৎসু শিশুমনের তথ্য সংগ্রহ করবার প্রয়াস পেয়েছেন, আর সেইভাবে ছোটদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি "শিশুসাথা"তে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর শিশুমনের অনেক নোতুন নোতুন খোরাক জুগিয়েছেন।

কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব। তিনি 'পাঠশালা'-র মাধ্যমেও বিভিন্নভাবে শিশুমনের তথ্য ও কলাকৌশল ছন্দে পরিবেশন করেছেন বা এখনও করছেন। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব গল্পদাদু কলিকাতা বেতার কেন্দ্র) শ্রীজয়ন্ত চৌধুরী (বর্ত্তমানে বেতারে ইনি গল্পদাদুর স্থান নিয়েছেন) প্রভৃতি শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছেন।

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত (জয়যাত্রা, শিশুমাসিক)। তাঁর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস কিশোর মনের সুন্দর খোরাক জোগায়।

শ্রীপ্রশান্ত চৌধুরী—ভূতপূর্ব্ব পথের সাথী (দৈনিক বসুমতী)। বসুমতীর ছোটদের বিভাগ "আমাদের পাতা" তিনি কিছুকাল পরিচালনা করেন। তাঁর হাতের মিষ্টি ছবি ছড়ায় অনেক শিশুরই মন ভুলেছে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু) তিনি কিছুকাল শিশুদের সাথে মেলামেশা করে "ভাইবোন" পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তা'র মাধ্যমে অনেক ছেলেমেয়ের দলও তিনি গঠন করেছিলেন, এখনও তিনি সাহিত্যসেবায় সচেষ্ট আছেন।

শ্রীশান্তশীল দাশ—বাঙলা-বাঙালী ও নব্যবাঙলা পত্রিকার শিশুমহলে বহুদিন পরিচালক ছিলেন। তাঁর কিশোর নাটকগুলি অধিকাংশই স্ত্রীভূমিকা বর্জিত। নাটকগুলির ভাব ও ভাষাতে সুন্দর সুরুচি-পূর্ণ এবং গঠনমূলক কার্য্যাবলী দেখা যায়। ছেলেমেয়েরা বহু স্থানে বিশেষ পার্ব্বণ উপলক্ষে অভিনয় করে সুনামও পেয়ে থাকে।

শ্রীবিজন গঙ্গোপাধ্যায় (ছুটির ঘণ্টা, দীপালী)। অনেক মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ ক'রে শিশুদের উৎসাহিত করেছেন। শ্রীরমেন দাশ (সবুজ সাথী, লোকসেবক), শ্রীকল্যাণ গুহ (ছোটদের মহল), শ্রীবৈদ্যনাথ গুপ্ত (প্রভাতী, হিন্দু সাপ্তাহিক), শ্রীমন্ত ওরফে গজেন্দ্র মিত্র (সপ্তডিঙ্গা—জন-সেবক), শ্রীসুধীর সরকার (মৌচাক), শ্রীক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য (রামধনু), শ্রীহরিশরণ ধর (শিশুসাথী) প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সম্পাদকগণ বিভিন্ন পত্র পত্রিকাদির মাধ্যমে শিশু-সাহিত্যের সেবা করে চলেছেন।

শিশু-সাহিত্যের ভেতর দিয়েই শিশুদের চরিত্র গঠন করা যায়। তাদের কোমল-কুসুম মনরাজ্য জয় করা যায়। পরন্তু মনের শক্তিকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় ছবি-ছড়ার শিক্ষা-দীক্ষায়। এই প্রসংগে আমরা বাঙলার বীরসিংহের শিশুটিকেও বাদ দিতে পারবো না। বড় হ'য়ে তিনি কী ভাবে শিশুদের সংগে মিশে ছিলেন সে সম্বন্ধে বল্‌ছি। একবার "*Director of Public Instruction*" পাঠশালা পরিদর্শন কোরতে এসেছিলেন—বিদ্যাসাগর মশাই শিশুদের নিয়ে পাঠশালাতে তন্ময় হোয়ে পড়াচ্ছেন—ঠিক যেন ছোট ছেলে হ'য়ে ছেলেদের সংগে মিশে গেছেন। তাদের ব্যাকুল আগ্রহকে সরল ও সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। অলক্ষ্যে পরিদর্শক মশাই সবই লক্ষ্য করছিলেন, কিছুক্ষণ বাদে তিনি পাঠশালায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "*Well, why do you waste your time taking the little ?*" একটু হেসে, তা'র উত্তরে সাহেবকে বিদ্যাসাগর মশাই বলেছিলেন—"*Children are the parents of the nation.*"

বাস্তবিক তাঁর এই উদার ভাবধারাকে যদি আমরা সকলে তাঁরই অনুকরণে অনুপ্রাণিত কোরতে পারি, তবেই ভাঙনেও নব সংস্কার আসবে। জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হ'বে। তখনই দেখা যাবে যে শিশুরাই এগিয়ে চলেছে মহত্বের পথে—বুকে তাদের হ'বে অদম্য উৎসাহ ও গভীর সাহস। এইটাই আমরা ভাবীকালে ছেলেমেয়েদের কাছে নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করবো।

—

ছোট্টপাখি

শ্রীকল্যাণ গুহ

ঘুম ভেঙে অই মুখ তুলে,
ছোট্টপাখি চোখ খুলে—
কি বলে ?
বলে সে—"মা উড়তে দাও,
নীল আকাশে উড়তে দাও,
যাই চলে।"
মা' বলে তার, "থাক্ এখন
ডানায় নাহি জোর তেমন ;
যাক্ দু'দিন,
তার পরেতে জোর পেলে
নীল আকাশে পাখ্ মেলে
হোস্ বিলীন।"
ছোট্টপাখি তাই শুনে,
ব'সে ব'সে দিন গোণে
চুপ্ ক'রে,
তার পরেতে জোর পেলে
ছোট্টপাখি দেয় মেলে
টুপ্ ক'রে ॥*

* ইংরাজি কবিতার ছায়া অবলম্বনে।

—

নীল-আলো

শ্রীহরিপদ গুহ

(রূপকথা)

বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। পড়ার আর বেশী চাপ নেই। ক'দিন থেকে নতুন-বৌদি'র খোসামোদ কর্‌ছি, একটা গল্প বলবার জন্য। রোজই একটা না একটা ছুতো করে গল্প বল্‌বার সময় পান না তিনি।

সে'দিন দুপুরবেলা চুপি চুপি আমার ঘরে ঢুকে নতুন বৌদি' আমাকে বল্‌লেন—'পিন্টু, আমার একটা উপকার

করবে ভাই ! টেবিল গুছোতে গিয়ে তোমার দাদার ঘড়ির কাঁচটা ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখ্‌লে হয়তো রাগ কর্‌বেন। তুমি একটা ঘড়ির দোকানে গিয়ে একটা নতুন কাঁচ লাগিয়ে, আনো না ভাই !' বলে তিনি আমার হাতে ঘড়ি ও একটা টাকা দিলেন। আমি একটু হেসে তাঁকে বল্‌তে যাচ্ছিলুম—কিন্তু তিনি বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝ্‌তে পেরে মৃদু হেসে বল্‌লেন—'আজ সন্ধ্যের পর তোমায় ঠিক গল্প বল্‌ব !' আমার মনটা খুসীতে ভরে গেল। এক ছুটে আমি নীচে নেমে গেলুম। সাম্‌নেই একটা ঘড়ির দোকান ছিল, সেখানে গিয়ে ঘড়িটা দিয়ে বল্‌লুম—'চট্‌ করে একটা কাঁচ লাগিয়ে দিন না !' দোকানদারের ছেলে গোরা আমার সঙ্গে পড়ে। তিনি আমাকে চিন্‌তেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা কাঁচ ফিটিং করে দিলেন। আমি তাঁর হাতে টাকাটা দিলুম। তিনি আমায় আট আনা ফেরৎ দিয়ে একটু হেসে বল্‌লেন—"তুমি গোরার বন্ধু, তোমার থেকে তো বেশী নিতে পারি না, কেনা দামেই রাখলুম !" ঘড়ি নিয়ে আবার এক ছুট্‌ দিলুম। বৌদি' ডালমুট খুব ভালবাসেন, বাড়ী ঢোকবার আগে তাঁর জন্যে দু' আনার ডালমুট কিনে নিলুম।

উপরে গিয়ে বৌদি'র হাতে ঘড়ি দিলুম। তিনি নেড়ে চেড়ে দেখে খুব খুসী হলেন। তারপর যখন ছ' আনা পয়সা এবং ডালমুটের ঠোঙ্গা তাঁর হাতে দিলুম, তখন তাঁর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, আনন্দ আর চাপতে পার্‌লেন না, আমাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে কত আদর করতে লাগ্‌লেন। আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে ঘড়িটা টেবিলের উপর রেখে দিলেন। তারপর আমাকে নিয়ে গিয়ে জান্‌লার ধারে বসিয়ে হাত ভরে ডালমুট দিলেন এবং তিনিও আমার পাশে বসে পড়্‌লেন। ডালমুট খেতে খেতে তিনি বল্‌লেন—'আজ তুমি আমার যা উপকার কর্‌লে ভাই, এখনই একটা গল্প বল্‌ব।' বলে তিনি আরম্ভ কর্‌লেন—"অনেক দিনের কথা। একজন সৈনিক বহুদিন এক রাজার কাছে চাকরী কর্‌বার পর রাজামশাই হঠাৎ একদিন তার ওপর বিরক্ত হয়ে দুর করে তাকে তাড়িয়ে দিলেন এবং প্রাপ্য মাইনেও তাকে দিলেন না।'

হতভাগ্য সৈনিক কিছুতেই ভেবে কূল পেলে না—কেমন করে সে দিনাতিপাত কর্‌বে। তার মন ভেঙ্গে পড়্‌ল। ভাবতে ভাবতে সে তার বাড়ীর দিকে চল্‌ল। এতদিন সাহস ও বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ কর্‌বার এই তার পুরস্কার !

চল্‌তে চল্‌তে সন্ধ্যার দিকে সে একটা গভীর বনের ধারে এসে উপস্থিত হলো। একটা সরু পথ-রেখা দেখে সে সেইদিকে এগিয়ে চল্‌ল। একটুখানি যেতেই সে গাছের ফাঁক দিয়ে একটা ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখ্‌তে পেলো। সে সেইদিকে এগিয়ে চল্‌লো। এক কদম যেতেই একখানি কুঁড়ে ঘর তার নজরে পড়্‌ল। এই ঘরে বাস করে এক বৃদ্ধা ডাইনী। সে তার কাছে গিয়ে তাকে কিছু খাদ্য ও রাত্রে থাক্‌বার মত একটু জায়গা দিতে বার বার অনুরোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। বৃদ্ধা কিন্তু কিছুতেই রাজী নয়, বলে—এখানে কিছু হবে না, আর কোথাও যাও !

সৈনিকও নাছোড়বান্দা। বলে—আমি বড় ক্লান্ত, আর চল্‌তে পারছি না, একটু দয়া করো। অনেক সাধ্য-সাধনার পর বৃদ্ধার মনটা একটু নরম হলো। সে বল্‌লে—এবারের মত থাক্‌তে দিতে পারি, যদি তুমি কাল আমার বাগানের মাটি কুপিয়ে দিয়ে যাও। সে তখনই রাজী হয়ে গেল, বৃদ্ধা তাকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ কর্‌লে।

পরদিন সকালে সৈনিক তার কথামত বৃদ্ধার বাগান কুপিয়ে দিতে লাগ্‌ল। কাজে কোন ফাঁকি দিলে না সে, বেশ ভাল ভাবেই কাজ কর্‌তে লাগ্‌ল। তার কাজ যখন শেষ হলো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বুড়ী ভাল করে সব পরীক্ষা করে বল্‌লে—বেশ, এবার তুমি যেতে পার !

সে বল্‌লে—আমি বড় ক্লান্ত, পা চলে না, রাতে আমি কোথা যাব ? দয়া করে আজকের রাতটাও এখানে থাক্‌তে দাও !

বুড়ী তার কথায় প্রথম তো কোন কানই দিলে না। তারপর অনেক খোসামোদের পর সে বল্‌লে—থাক্‌তে দিতে পারি, যদি তুমি বন থেকে আমায় এক গাড়ী কাঠ এনে দাও !

সৈনিক কি কর্‌বে ? রাজী হওয়া ছাড়া তার উপায়ই বা কি ? অনেক ভেবে-চিন্তে সে বৃদ্ধার প্রস্তাবে রাজী হলো। বৃদ্ধাও তাকে আহার এবং পানীয় এনে দিলে।

পরদিন ভোরে সে গাড়ী নিয়ে কাঠ আনতে বনে চলে গেল। কাঠ কেটে গাড়ী বোঝাই করে বাড়ী আসতে সৈনিকের রাত হয়ে গেল। সারাদিনের পরিশ্রমে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এখান থেকে চলে যাবার আর শক্তি ছিল না তার। কাজেই তাকে বুড়ীর কাছে সে রাত্রের জন্যও আশ্রয় চাইতে হলো। এই সর্তে বুড়ী রাজী হলো যে, পরদিন তাকে কূয়ার তলা হতে জলন্ত-প্রদীপটা এনে দিতে হবে। সে সানন্দে স্বীকার করল যে, কূপে নেমে প্রদীপ এনে দেবে তাকে।

পরদিন বুড়ী তাকে নিয়ে সেই কূপের কাছে গেল। তার কোমরে একটা দড়ি বেঁধে তাকে কূয়োর ভিতরে নামিয়ে দিলে।

নীচে নেমে সৈনিক দেখ্‌লে—অদূরে একটা প্রদীপ জ্বল্‌ছে, সেখান থেকে একটা নীল-আলোক-শিখা বিচ্ছুরিত হয়ে সমস্ত স্থানটা আলোকিত হয়ে গেছে। সে দীপটা তুলে নিয়ে, তাকে উপরে তোল্‌বার জন্য সঙ্কেত করলে। বুড়ী তাকে টেনে উপরে তুল্‌তে লাগ্‌ল, কাছাকাছি আস্‌তেই বুড়ী হাত বাড়িয়ে প্রদীপটা আগে চাইল। সৈনিক তার মনোভাব বুঝ্‌তে পেরেছিল—আলোটা হাতে পেলেই সে তাকে আবার নীচে ফেলে দেবে। তাই সে বল্‌লে—আগে আমায় তোল, পরে প্রদীপ দেব'। সে বার বার বল্‌তে লাগ্‌ল—আগে আলো দাও, পরে তোমায় তুল্‌ব। সে এতে কিছুতেই রাজী নয়। অবাধ্য হওয়ায় বুড়ী ভয়ানক রেগে গেল। বুড়ী তখন কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌লে—যা তবে মর্‌গে যা। সঙ্গে সঙ্গে সে দড়িটা ছেড়ে দিলে। সৈনিক কূয়োর নীচে এসে পড়্‌লো। সেঁত-সেঁতে জমিতে বসে তার কেমন শীত শীত কর্‌তে লাগ্‌ল। কি করে যে সে এখান থেকে উদ্ধার পাবে ভেবে পেল না। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়্‌ল। তার পকেটে তখনও কিছু তামাক ছিল, পাইপটা বের করে সে ভাব্‌লে—বাঁচ্‌ব না তো, তবে একটা শেষ টান দিয়ে নি। পাইপে তামাক ভরে ঐ নীল আলোয় সেটা ধরিয়ে মনের সুখে ধূমপান কর্‌তে লাগ্‌লো। ধোঁয়ায় সমস্ত স্থানটা ভরে গেল। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধুম উপর দিকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সেই ধোঁয়ায় দেখা গেল—এক বামন দাঁড়িয়ে আছে। সে তার দিকে এগিয়ে এসে বল্‌লে—সৈনিক, কি চাও তুমি?

সৈনিক বল্‌লে—'তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।'

বামন বল্‌লে—'তুমি এই নীল-আলোর মালিক। আমি তোমার আদেশ পালন কর্‌তে বাধ্য। কি চাই বলো?' তখন সৈনিক বল্‌লে—'তবে আগে আমায় এই অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করো!' বলে সে প্রদীপটা তুলে নিলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বামন তাকে কূয়োর বাইরে উপরে নিয়ে এলো। সৈনিক বল্‌লে—'তোমাকে আর একটু দয়া করতে হবে। ঐ ডাইনী বুড়ীকে কূয়োর ভেতর আমার যায়গায় রেখে এসো।' সঙ্গে সঙ্গে বামন ঐ বুড়ীর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে কূয়োর তলায় রেখে এলো।

সৈনিক তখন বুড়ীর সোনাদানা যা ছিল, একটা পুঁটলীতে বেঁধে নিলে। বামন যাবার সময় বলে গেল—'আমাকে যখন তোমার প্রয়োজন হবে, এই নীল-আলোয় তোমার পাইপ জ্বালিও তবেই আমাকে পাবে।'

সৈনিক প্রদীপ ও পুঁটলী নিয়ে পথ চল্‌তে লাগ্‌ল। সে প্রথম যে শহরে এলো, একটা ভাল সরাইখানা দেখে সেখানে গিয়ে উঠল। একটু বিশ্রাম করে তার পর প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিষ কিন্‌তে বাজারের দিকে বেরিয়ে পড়্‌ল। একটা বড় দোকানে গিয়ে ভাল দেখে কয়েকটা পোষাক কিনে নিলে। বাজার শেষ হলে হোটেলে ফিরে এসে ম্যানেজারকে বলে ভাল দেখে আলাদা একটা ঘরও চেয়ে নিলে।

খাওয়া দাওয়ার পর সৈনিক তার ঘরে বসে নীল আলোয় পাইপ ধরাল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বামন এসে হাজির হলো।

তখন সৈনিক তাকে বল্‌লে—'আমি যেখানে কাজ কর্‌তুম, সেই রাজা আমাকে এক কপর্দ্দকও না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই আলো না পেলে আমি অনাহারে মরতুম। এইবার আমি তার প্রতিশোধ নেবো। তুমি

তার মেয়েকে এখানে এনে দাও! সারা রাত সে এখানে থাক্‌বে, আমি যা' আদেশ কর্‌ব, তাকে তাই কর্‌তে হবে।'

'এ কিন্তু খুব বিপদজনক কাজ। তবে তুমি যখন আদেশ কর্‌ছ, আমি কর্‌তে বাধ্য।' বলে সে চলে গেল।

রাজকুমারী তার শয্যায় নিদ্রিত ছিল। বামন ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে সৈনিকের কাছে নিয়ে এলো।···ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বামন আবার তাকে তার বিছানায় রেখে এলো।

রাজকুমারীর ঘুম ভাঙ্গলে গত রজনীর ঘটনাটা তার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হলো। পিতাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাঁর কাছে গত রাত্রির সব কথা বল্‌লে। সব শুনে রাজামশাইও বড় কম আশ্চর্য্য হলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তা করে তিনি মেয়েকে বল্‌লেন—'তোমার জামার পকেট ফুটো করে তাতে সর্ষে ভরে রাখো। যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তবে তোমাকে যে পথ দিয়ে নিয়ে যাবে, সেই পথে সর্ষে পড়্‌তে পড়্‌তে যাবে। আমার লোকেরা সেই সর্ষে অনুসরণ করে সৈনিকের বাড়ী চিনে আস্‌তে পার্‌বে।'

রাজকন্যা পিতার উপদেশ মতই কাজ করে ছিল, কিন্তু বামন রাজামশাইএর কথা আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর সৈনিক বামনকে ডেকে বল্‌লে—'রাজকুমারীকে আজ আবার এখানে নিয়ে এসো।'

বামন চলে গেল। যাবার সময় সে শহরের সমস্ত পথে সর্ষে ছড়াতে ছড়াতে গেল। যাতে সব রাস্তায় সর্ষে দেখে তারা বুঝ্‌তে না পারে যে কোন্ দিকে গিয়েছে।···

পরদিন রাজকুমারী পিতাকে দ্বিতীয় দিনের ঘটনা বল্‌লে। সব শুনে রাজামশাই বল্‌লেন—'তোমাকে যে ঘরে নিয়ে রাখ্‌বে, সেখানে তোমার একপাটি জুতো লুকিয়ে রেখো।'

বামনের কাছে এ কথাও গোপন ছিল না।

সেদিন যখন সৈনিক বামনকে আবার সেই রাজ-কন্যাকে আনতে বল্‌লে, বামন তাকে জানালে—এবার আর তোমাকে রক্ষা করা গেল না। তোমার এ' দুর্ব্বুদ্ধিই তোমার বিপদের সূচনা কর্‌বে। আমার মনে হয়—তুমি ধরা পড়বেই।'

বামন যখন বুঝ্‌লে যে, সৈনিক তার মত বদলাবে না, তখন বল্‌লে—'তবে খুব ভোরেই তুমি শহরের ফটকের বাইরে চলে যেও, নইলে তোমার খুব বিপদ হবে জেনো।'

পিতার উপদেশ মত রাজকুমারী তার একপাটি জুতো সৈনিকের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। রাজপ্রাসাদে সে ফিরে আস্‌বার পর পিতাকে সে কথা বল্‌তেই তিনি শহরের প্রত্যেক বাড়ী খানাতল্লাসের হুকুম দিলেন। যেখানে রাজ-দুহিতার জুতো পাওয়া যাবে, সেখান থেকে যাকে পাওয়া যাবে তাকে গ্রেফ্‌তার করে আন্‌বার কথাও বল্‌লেন। রাজ-কর্ম্মচারীরা তখনই দলে দলে সব চারিদিকে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

কিছুক্ষণ পরেই সৈনিকের ঘরে একদল লোক ঢুকে পড়্‌ল। খোঁজাখুঁজি কর্‌তেই সেই ঘরে রাজকুমারীর জুতো পাওয়া গেল। বেগতিক দেখে সৈনিক তখন প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করেছে। শহরের ফটক বন্ধ, পালাবেই বা কোথা? চারদিক থেকে লোকজন এসে তাকে ধরে ফেল্‌লে। তারপর তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে বন্দী করে রাখ্‌লে।

প্রাণভয়ে পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে সে নীল-আলো ও সোনাদানার থলিটা ফেলে গেল। কারাগারে বসে সে তার দুরদৃষ্টের কথাই ভাব্‌তে লাগ্‌লো। যদি নীল-আলোটা কাছে থাক্‌তো, তবে হয় তো এ' বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো! হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখ্‌লে—একটা মোহর রয়েছে। সেই সময় সেখান দিয়ে তার পরিচিত একজন লোক যাচ্ছিল, সে তাকে ডেকে বল্‌লে—'বন্ধু, আমার ঘরে একটা বাণ্ডিল ফেলে এসেছি, তুমি সেটা আমায় এনে দাও না! এনে দিলে তোমাকে এই মোহরটা পুরস্কার দেবো।' মনে মনে খুব খুসী হয়ে সে ছুটে বাণ্ডিল আন্‌তে গেল। একটু পরেই সে বাণ্ডিলটা এনে সৈনিকের হাতে দিলে। সে তাকে মোহর দিয়ে পুরস্কৃত কর্‌লে। এই সামান্য কাজের বিনিময়ে একটা মোহর পেয়ে তার মনে আনন্দ আর ধরে না! সে শিস্ দিতে দিতে চলে গেলো।

সে চলে যেতেই সৈনিক নীল-আলোয় তার পাইপ ধরিয়ে ধূমপান কর্‌তে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সে দেখ্‌তে

পেলে—সেই বামন এসে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে। বামন বল্‌লে—'প্রভু, তোমার কোন ভয় নেই। মনে সাহস এনে বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করো! যা হবার হোক্, শুধু নীল-আলোটী কাছ-ছাড়া করো না।' তারপর সে ভাল ভাল খাবার এনে তাকে পেট ভরে খাইয়ে চলে গেল।

তারপর একদিন সৈনিকের বিচার পর্ব্ব শেষ হলো। রাজামশাই রায় দিলেন—মৃত্যুই এর উপযুক্ত শাস্তি। ফাঁসিকাঠে একে বধ করা হোক্।

যখন তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল, সে রাজামশাইকে করজোড়ে বল্‌লে—'আমার একটী শেষ প্রার্থনা আছে মহারাজ!'

তিনি বল্‌লেন—'বলো, কি তোমার প্রার্থনা!'

সে বল্‌লে—'যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে আমার পাইপে পথে একবার ধূমপান করতে ইচ্ছে করি।'

রাজামশাই হেসে বল্‌লেন—'এই তোমার অন্তিম বাসনা? আমি অনুমতি দিচ্ছি—তোমার যতবার ইচ্ছে ধূমপান করো!'

তখন সে নীল-আলোয় পাইপ ধরিয়ে মনের সুখে টান্‌তে লাগ্‌লো। মুহূর্ত্তে বামন এসে তার সাম্‌নে দাঁড়ালো। সে তাকে আদেশ কর্‌লে—'সমস্ত লোককে তুমি এখনি হত্যা করো!' তার কথা শেষ হবার আগেই বামন তীক্ষ্ণ তরোয়াল দিয়ে এক একজনের মাথা কাট্‌তে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত স্থানটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। তারপর সৈনিক রাজামশাইকে দেখিয়ে বল্‌লে—'একে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাটো!'

রাজামশাই বার বার তার কাছে ক্ষমা চাওয়ায়, তার রাগ একটু নরম হলো!

রাজামশাই বল্‌লেন—'রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো এবং আমার মৃত্যুর পর তুমিই এই রাজ্যের রাজা হবে। এখন দয়া করে আমার প্রাণ বাঁচাও;'

তখন সে বামনকে নিরস্ত্র কর্‌লে। আর একটু দেরী হলেই বামন রাজাকেও শেষ করে দিতো!

তারপর এক শুভদিনে রাজকুমারীর সঙ্গে সৈনিকের বিয়ে হয়ে গেল। তারা মনের সুখে বাস করতে লাগ্‌ল।

আমার কথাটি ফুরুলো।

বাসন্তীকে বাড়ী থাকতে হোল
মেলায়
নীনা ! বাসন্তী কই !
দেখি বাসন্তীর বাড়ী গিয়ে
বাসন্তী ! বাড়ী বসে করছিস্ কী?
মেলায় যাই কী করে ভাই। আমার কাপড় যে বড্ড ছিঁড়ে গেছে।
বুঝেছি - এ বিষয়ে তোর সঙ্গে কথা কইবো ভেবেছিলুম ...
কাপড় কাচবার সময় ওগুলোকে আছড়াস্ নাকি বাসন্তী ?
অবশ্যই! পরিস্কার করে কাচতে গেলে এ ছাড়া আর অন্য উপায় কই?
সানলাইট সাবান ব্যবহার করে দেখ - যা আমি করি ! দেখ্‌বি আর আছড়ে কাচার দরকার হবে না। আছড়ে কাচলে কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায় আর তাতেই তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে দেখানো হয়েছে)
দেখ্‌, সানলাইটে কী পরিষ্কার করে আমার কাপড় কাচা হ'য়েছে।
আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো
সানলাইটের অপর্যাপ্ত ফেনা বিনা আছাড়ে কাপড় সাদা আর ঝক্‌ঝকে করে কাচে। এখন আমার কাপড়-চোপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমার পয়সা বাঁচিয়েছে।
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
ভারতে প্রস্তুত
S 236-X52 BG
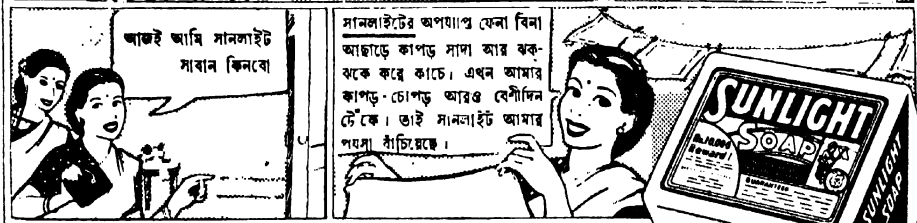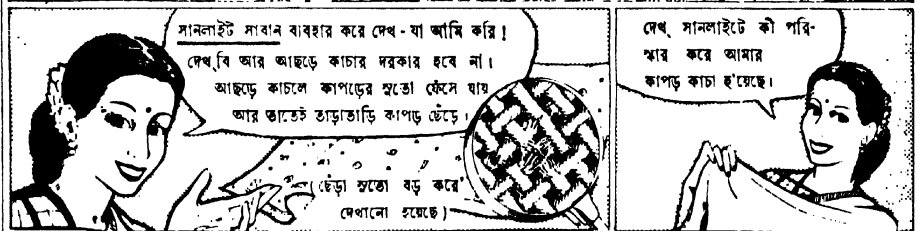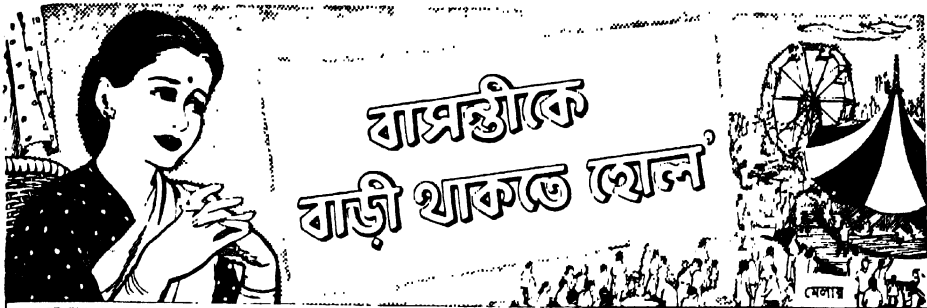
মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন—

পশ্চিমবঙ্গে অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন ও প্রসারের উদ্দেশ্যে গত ২ বৎসরে নিম্নলিখিতভাবে প্রাথমিক পর্য্যায়ের কাজ করা হইয়াছে। (১) বিবিধার্থক উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য ইতিমধ্যে ৬৮টি উচ্চ বিদ্যালয়কে নির্বাচন করা হইয়াছে। এই নির্বাচনের নীতি ছিল এইরূপ (ক) আঞ্চলিক বিবেচনা (খ) বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও অতীত ইতিহাস (গ) বিদ্যালয়ের অবস্থান, ভবন ও আর্থিক অবস্থা (ঘ) নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুখ সুবিধা। (২) গবেষণাগার স্থাপন ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উন্নতি বিধানের জন্য ১৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিকে (বালক ও বালিকা) ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। (৩) বিজ্ঞান ও ভূগোল শিক্ষাদানের উন্নতি বিধানের জন্য বালিকাদের ২৮টি হাইস্কুলে ২২,৭২৫ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (৪) পরিসর বৃদ্ধি ও শিক্ষাদানের যন্ত্রপাতির উন্নতি বিধানের জন্য ৮৫টি হাইস্কুলে (বালক ও বালিকা) ১৫ হাজার টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়া হইয়াছে (৫) বিজ্ঞান ও অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক ক্রয়ের জন্য ৬৮টি উচ্চ বিদ্যালকে ৫ হাজার টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়া হইয়াছে (৬) কারুশিল্প শিক্ষাদানের জন্য ১২৯টি জুনিয়ার হাইস্কুলকে ৩ হাজার টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। (৭) পুস্তকাগারের উন্নতি বিধানের জন্য ১০২টি হাইস্কুলকে ২৫০০ টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। (৮) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কারুশিল্প-শিক্ষকগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ৩টি শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে—প্রত্যেকটি শিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ৬০ হাজার টাকা করিয়া খরচ করা হইবে। (৯) উপজাতি ও অনুন্নত অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকার নিজেই উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। এক দিকে যেমন প্রাথমিক শিক্ষা সর্বত্র অবৈতনিক করা হইতেছে এবং শত শত বুনিয়াদি বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষার ধারা প্রথম পর্য্যায় হইতেই পরিবর্তনের ব্যবস্থা হইতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া তাহা সময়োপযোগী করার জন্য বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থায় অর্থব্যয় করা হইতেছে। ৬৮টি বিদ্যালয় বিবিধার্থক স্কুলে পরিণত হইলে বহুসংখ্যক ছাত্র প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনের সুবিধা পাইবে। সরকারী ব্যবস্থাকে সাহায্য করার জন্য এখন দেশবাসীর সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। দেশবাসী জনগণের উদ্যোগ ব্যতীত এই বিরাট পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে না।

কলিকাতায় নুতন আদালত—

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শনিবার বিকালে পশ্চিমবঙ্গের বিচার ও রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু ২নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটে কলিকাতার "নগর দেওয়ানী ও দায়রা আদালতের" ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। নুতন সরকারী দপ্তরখানার পাশে ও হাইকোর্টের নিকট পৌণে ২ বিঘা জমীর উপর ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নুতন গৃহ নির্মিত হইবে। পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। নুতন আদালত গৃহ নির্মিত হইলে বিচারের ব্যয় কমিবে, তাড়াতাড়ি বিচার শেষ হইবে ও লোককে ভিড় সহ্য করিতে হইবে না। জনকল্যাণের জন্য ত নানাভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইতেছে—ইহা তাহাদের অন্যতম। তবে ঐ স্থানে যাতায়াতের যানবাহনের অধিকতর সহজ ব্যবস্থা না হইলে লোকের দুঃখ যাইবে না।

পুরীতে তিন কোটি টাকা নষ্ট—

রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের নির্দ্দেশ লইয়া উড়িষ্যায় যে আন্দোলন হয়, তাহাতে পুরী রেল ষ্টেশনটি একেবারে ধ্বংস করা হইয়াছে। ফলে রেলের প্রায় তিন কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। রাজ্য সরকারেরও ২ লক্ষ টাকার গৃহাদি ধ্বংস করা হইয়াছে। সমগ্র রাজ্যে কত টাকা নষ্ট হইয়াছে, তাহার এখনও কোন হিসাব হয় নাই। যাহা হউক, এই আত্মঘাতী কার্য্যের ফলে যে আমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের প্রদত্ত অর্থ দ্বারাই আমাদিগকে ঐ ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে হিন্দু বিতাড়ন—

পূর্ব পাকিস্তান হইতে এ পর্য্যন্ত ৩৬ লক্ষ হিন্দু তাহাদের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই নমশূদ্র চাষী। ১৯৫৫ সালেই প্রায় ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৮ শত ১৪ জন হিন্দু ভারতে আসিয়াছে। ১৯৫৪ সালে ১ লক্ষ ২১ হাজার হিন্দু ভারতে আসিয়াছে। ছোটখাটো সহর ও গ্রামাঞ্চলের হিন্দুদের প্রতি পাকিস্তানের নিম্নতম স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সহানুভূতিহীন মনোভাবই এত অধিক উদ্বাস্তু সমাগমের মুখ্য কারণ। অর্থনৈতিক ব্যাপারে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং পাকিস্তানের অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থাও পূর্বপাকিস্তানবাসী হিন্দুদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিতেছে। এ বিষয়ে বহুবার বহু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোন ফল হয় নাই। কাজেই আর কিছুদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান যে হিন্দু শূন্য হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী করাচীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে পাকিস্তানে উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহা বাঙ্গালীদের পক্ষে অবশ্যই আনন্দের বিষয়।

ডালডা
আমার
পক্ষে
ভালো
DALDA
ডালডা
ডালডা মার্কা বনস্পতি
দিয়ে রান্না করুন
শুধু রান্নার জন্যই ভালো নয় — পুষ্টিকরও বটে!
HVM. 253-50 BO

কিন্তু পাকিস্তান হইতে যে ভাবে হিন্দু বিতাড়ন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে ২।১ বৎসর পরে পূর্ব-পাকিস্তানে আর কোন হিন্দু থাকিবে না। তবে মুসলমানগণ যদি বাঙ্গালা ভাষাকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন, সে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

কেন্দ্রে নূতন মন্ত্রী—

শ্রীযুত ভি-কে কৃষ্ণমেনন সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘে ভারতের প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার নিয়োগের সঙ্গে দুইজন সহকারী মন্ত্রী—সংযোগ রক্ষা বিভাগের শ্রীরাজ বাহাদুর ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের শ্রীবি-এন দাতারকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু সর্বতোমুখী চেষ্টার ত্রুটি করেন না।

যন্ত্র নির্মাণের শিল্প প্রতিষ্ঠা—

কলিকাতা ট্যাংরার ইউ, পি, সি, সি, নামক এক প্রতিষ্ঠান কৃষি কার্য্যের জন্য ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্র নির্মাণ করিয়া থাকেন। গত ৩১শে জানুয়ারী সকালে ঐ প্রতিষ্ঠানের শ্রী এস এম ওয়াহি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি কলেজে ব্যবহারের জন্য একটি ট্র্যাক্টর ও কিছু যন্ত্র দান করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নিজে যাইয়া এক অনুষ্ঠানে ঐ দান গ্রহণ করেন। তথায় তিনি দেশের শিল্পপতিগণকে আবেদন জানান—যন্ত্রনির্মাণ-শিল্প যাহাতে দেশে সত্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিস্তারিত হয়, সে জন্য প্রত্যেক ধনী শিল্পপতির সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। দুঃখের কথা, বহু রকমের বহু যন্ত্র আজও আমাদিগকে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। ভবিষ্যতে যাহাতে তাহা না করিতে হয়, সেজন্য প্রত্যেক দেশবাসীর চিন্তা ও চেষ্টা করা প্রয়োজন।

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীপদ—

পশ্চিম বাংলার দুইজন রাজ্যমন্ত্রী ডাক্তার অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার জীবনরতন ধর গত ২৭শে জানুয়ারী পুরাপুরি মন্ত্রীপদ লাভ করিয়াছেন। উপমন্ত্রী ও চিফ হুইপ শ্রীগোপিকাবিলাস সেনও রাজ্যমন্ত্রী পদে উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যে যোগ্যতা প্রদর্শন দ্বারা এই উন্নতি লাভ করিলেন—ইহা অবশ্যই দেশবাসীর পক্ষে আনন্দের বিষয়।

নেপালে নূতন মন্ত্রিসভা—

শ্রীটঙ্কপ্রসাদ আচার্য্যকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া এবং প্রজাপরিষদের ৪ জন ও স্বতন্ত্র দলের ২ জন—মোট ৭ জন লইয়া নেপালে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। শ্রীবালচাঁদ শর্মা, শ্রীচাঁদপ্রসাদ শর্মা, শ্রীপশুপতিনাথ ঘোষ, সর্দার গুঞ্জমন সিং, সাহেবজী পুরন্দ্র বিক্রম সাহ ও শ্রীঅনুরুদ্ধপ্রসাদ সিং—মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। গত ৫ বৎসরে ৫ বার নেপালে মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। রাজা মহেন্দ্র কিছুদিন ৫ জন পরামর্শদাতা লইয়া নেপাল শাসন করিয়াছিলেন—মন্ত্রীসভা গঠিত করিয়া রাজা সে ব্যবস্থার শেষ করিয়া দিয়াছেন।

দেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান—

গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার সকালে কলিকাতা নর্দার্ণ পার্কে দক্ষিণ কলিকাতা ভারত স্কাউট ও গাইডদের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব হইয়া গিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সে উৎসবে যাইয়া কিশোর কিশোরী ও যুবা সমাজকে ভারতের আত্মা কিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ডাক্তার রায় বলেন—অনেক প্রাচীন সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটিয়াছে—কিন্তু বহু বিপ্লবের পরেও ভারতের আত্মা আজও জীবিত। তাহার কারণ মনের দারিদ্র্য ভারতে এখনও দেখা দেয় নাই। কাব ও স্কাউটগণ যাহাতে ভবিষ্যতে দেশ সেবা করিতে পারে, সেজন্য তিনি তাহাদের মনে ভারত সম্পর্কে গরিমা বোধ জাগ্রত করিয়া দিবার জন্য সংস্থাকে অনুরোধ জানান। দেশের তরুণগণকে নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া পরার্থপরতা, ত্যাগ, সেবা প্রভৃতির কথা শিক্ষা দিবার ব্যাপক ব্যবস্থা না করিলে আমরা সত্বর বা সহজে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব না।

শ্রীবিরাজমোহন দাস—

মাদ্রাজের বাঙ্গালী সমিতির সভাপতি ও মাদ্রাজস্থ চর্ম শিল্পের জাতীয় গবেষণাগারের অধ্যক্ষ শ্রীবিরাজমোহন দাস এবার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ফরিদপুর জেলার ব্রাহ্মণদি গ্রামের অধিবাসী। প্রথম হইয়া এম-এ পাশ করিয়া তিনি সরকারী বৃত্তি পান ও বেঙ্গল কেমিকেলে সালফিউরিক এসিড সম্বন্ধে গবেষণা করেন। পরে ইংলণ্ড, ইটালী ও জার্মানীতে চর্ম শিল্প শিক্ষা করেন ও কলিকাতায় ট্যানারীর কাজ করিতে করিতে বেঙ্গল ট্যানিং ইনিষ্টিটিউট গড়িয়া তোলেন। ১৯৫১ সাল হইতে মাদ্রাজে আছেন এবং তাঁহার চেষ্টায় তথায় বাঙ্গালী সমিতির নূতন নিজস্ব গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

গোবি মরুভূমির মধ্যে রেল—

৩১শে ডিসেম্বর রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া ও চীনের মধ্যে সংযোগকারী ৪৪০ মাইল রেলপথের উদ্বোধন উৎসব হইয়াছে। রেলটি মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবেতর হইয়া গোবি মরুভূমির মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রেলপথ নির্মিত হওয়ায় পিকিন ও মস্কোর দূরত্ব ছয় শত মাইল কমিয়া যাইবে।

বেসরকারী উদ্যমকে সাহায্য দান—

সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে নিখিল ভারত বাণিজ্য সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনকালে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যমকে সাহায্য দানের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তিনি বলেন—"৩৬ কোটি লোকের দেশে কোন বিশেষ এক শ্রেণীর লোক—তাহারা যত ধনীই হউক না কেন—নিজেদের খেয়াল খুসী মত চলিতে পারে না। পরিণামে সাধারণ মানুষের নিকটই সকলকে মাথা নত করিতে হইবে। উচ্চহারে কর আদায়, শ্রমিক আইন প্রণয়ন ও মুনাফার কিছু অংশ লগ্নী করার বাধ্যবাধকতার দ্বারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে অর্থ স্তুপীকৃত হওয়ার সুযোগ আরও কমিয়া যাইবে।" এই ভাবে ধীরে ধীরে সমাজের ধনতান্ত্রিকতা ধ্বংস করা হইবে।

চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা—

গত জানুয়ারী মাসে আগ্রায় ন্যাশানাল ইনিষ্টিটিউট অফ সায়েন্সেস্ অব ইণ্ডিয়ার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ডাক্তার এ-সি-উকীল বলেন—ভারতে চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা ব্যবস্থার পরিবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার তুলনায় ভারতে চিকিৎসা গবেষণা ও জীবতত্ত্ব গবেষণা উপেক্ষিত হইতেছে। অধিকাংশ মেডিকেল কলেজেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও উৎসাহ পাওয়া যায় না। ডাক্তার উকীল অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান লোক—তিনি অন্তরের সহিত এই অভাব অনুভব করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার কথায় লোক পরে এ বিষয়ে অধিক উৎসাহী হইবে।

এগারো

কৃতান্ত হৈ-হৈ করে এসে পড়ল। কাগজে লেখার অপ্রতুল হলে যেমন এসে পড়ে। সরমা ইদানীং আর বিরূপ হন না, সাড়া পেয়েই দরজা খুলে দেন।

দাদা কোথায় বৌদি?

যথারীতি দরজার অন্তরালে গিয়েছিলেন সরমা। মৃদু-কণ্ঠে বললেন, থাকবেন আর কোথা? যেখানে থাকেন দিবারাত্রি।

বলেই চলেছেন, ডুবে আছেন কাগজপত্রের মধ্যে। সংসারের কোন-কিছু কানে নেবেন না। একটিমাত্র সন্তান—তার হিতাহিত ভেবে দেখবেন না একটিবার—

স্বর ভারী-ভারী। কৃতান্ত বলে, নতুন আবার কি হল বৌদি? এ তো বারমেসে কথা—

মেয়ের কথা ভেবে আমি চোখে অন্ধকার দেখি ঠাকুরপো। ও-মেয়ের বিয়ে হবে না—ট্যুইশানি করে চাকরি করে চিরকাল ওর এমনি যাবে।

কৃতান্ত হেসে উঠল, হ্যাঁ—চুল পেকেছে, দাঁত পড়ে গেছে, বুড়ো-থুত্থুড়ে ও-মেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে? ঠিক বলেছেন—কক্ষণো বিয়ে হবে না।

আপনারা হাসেন। আমি কোন রকম উপায় ভেবে পাইনে। আজই সকালে এক জায়গা থেকে দেখতে আসবার কথা ছিল—

কৃতান্ত লুফে নিয়ে বলে, অম্বুজ ডাক্তারের আসবার কথা। আসেননি তিনি।

সরমা বলেন, আপনি তো জানেন ঠাকুরপো—

সমস্ত জানি। অম্বুজ ডাক্তার আসেনি, আসবেও না। প্রতুল বিশ্বাসের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করছে। উঠে পড়ে লেগেছে। ইলেকসনে নেমেছে—বুঝতে পারলেন না, বিশ্বাসকে রেহাই করতে পারলে ঐখানেই তো অর্ধেক কেল্লা ফতে। যা গতিক, লেগেও যাবে। বিশ্বাসের মত হয়ে গেছে শুনলাম।

ইরাবতীকে দেখা গেল। রান্নাঘর থেকে বালতি হাতে বারাণ্ডা মুছতে বেরিয়ে এলো। কথা সবই শুনেছে। কিন্তু মুখ দেখে তা বুঝবেন না। যেন অন্য কাদের কথা হচ্ছে, তার এ সম্পর্কে স্পৃহা নেই। কৃতান্ত তখন ভরসা দেওয়ার ভাবে আরও জোর দিয়ে বলে, মুশড়ে পড়ছেন কেন বৌদি, এক দুয়োর বন্ধ তো শতেক দুয়োর খোলা। একা অম্বুজ ডাক্তারেরই ছেলে নাকি? অঢেল রয়েছে, ক'টা চাই—দরে বনলেই মাথায় টোপর চড়িয়ে ছাতনাতলায় বসে যাবে। বরঞ্চ এ ভালই। ও-ঘরে কুটুম্বিতে করে সুখ হবে না। নামের কাঙাল, নামযশের জন্য সব করতে পারে। এই প্রতুল বিশ্বাস সেবারে কুকুর-বিড়ালের মতন ব্যাভার করেছিল, তার কাছে ছেলে পাঠিয়ে দিল, দেখে-শুনে বাজিয়ে নিয়ে যদি জামাই করে। দেখুন তাই, আত্ম-সম্মান বলে কিছু নেই ওদের। যেমন বাপ, তেমনি বেটা। 'যুগচক্র' কি এমনি-এমনি অত গালিগালাজ করেছিল?

আর দাঁড়াল না, সিঁড়ি বেয়ে বিশ্বেশ্বরের তপোবনে উঠে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে হাসতে হাসতে নামল। অর্থাৎ, পেয়ে গেছে। গালভরা হাসি দেখে বোঝা যাচ্ছে, পেয়েছে ভালরকমই। যাবার সময় হাঁক দিয়ে বলে, কিছু ভাববেন না বৌদি। ভাল ঘরে মেয়ে যাবে। খুঁজে-পেতে এমন পাত্তোর আনব, অম্বুজ ডাক্তারের ছেলে তার গাড়ু-গামছা বওয়ার যুগ্যি নয়।

পরদিন ভোরবেলা কৃতান্ত হানা দিল অম্বুজাক্ষের বাড়ি। লোক জমেনি এখনো। বৈঠকখানায় চেপে বসে সে উপরে খবর পাঠিয়ে দিল। অম্বুজাক্ষ ওঠেন রাত থাকতে, অনেক কালের অভ্যাস। উঠে হাত-মুখ ধুয়ে

চিঠি লিখছিলেন খানকয়েক। ইলেকসনের তোড়জোড়। এ ছাড়া ইদানীং অন্য কোন ভাবনাচিন্তা নেই। হেনকালে কৃতান্তর নাম এসে পৌঁছল। গোঁফের আড়ালে হাসি ফুটল তাঁর। মরশুম এসেছে, মধুলোভীরা অমনি ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। কি জাতীয় লোক এরা, এতেই বোঝা যায়। 'যুগচক্রের' পাতায় যে বিষ উদ্গীরণ করেছে, নিতান্ত চক্ষুলজ্জা-বিহীন হলেই তার পরে এ-বাড়ির দরজায় পা দেবার আশা করা যায়।

যা-ই হোক, অম্বুজাক্ষ এবারে সেয়ানা হয়েছেন—চটানো হবে না লোকটাকে। কাজ করিয়ে নিতে হবে। উপযাচক হয়ে এসেছে, পুরানো কথা তুলবেন না কোন-কিছু। চা-খাবার দেবার কথা বলে দিলেন। বেশ ভারী রকমের হয় যেন। তারপর সহাস্য মুখে নিচে বসলেন।

আছেন ভালো কৃতান্তবাবু? দেখাসাক্ষাৎ হয় না, আমিই যাবো-যাবো করছিলাম। যা কাণ্ড—অহরহ রোগির ভিড়। সকলের দায়ঝক্কি বুঝিয়ে তারপরে সমাজ-সামাজিকতা বজায় রাখা আর হয়ে ওঠে না।

কৃতান্ত বলে, আমিও ভাবছিলাম তাই। সময় হয়ে এলো, এখনো দেখা নেই—'যুগচক্রের' কথা এ সময়টা ভুলে থাকবেন, তা হতে পারে না। মণিরামপুর থেকে দাঁড়ালেন বুঝি? তা ভালো—গাঁয়ের মানুষগুলো মোটের উপর সরল, শহরের মতন এত ফেরেব্বাজ নয়—

দু-পাটি দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাকে জড়িয়েই বলছি, আমিও বাদ নই। দেখুন, মানুষ আজকাল বাজে ধাপ্পায় ভোলে না, টাকাপয়সা ছড়াচ্ছেন—হাত পেতে নিয়ে খুশিমুখে পকেট ভরতি করছে, চর্বচোষ্যের আয়োজন করেছেন—গাণ্ডেগণ্ডে গিলছে আর বাহবা দিচ্ছে, বাপান্তপিতান্ত করছে—ভোটটা নিশ্চিত দেবে আপনাকে। কিন্তু মজার বস্তু ঐ ব্যালট-বাক্স। পরদার পিছনে গিয়ে কোন বাক্সে ভোটের কাগজ ঢোকাচ্ছে অন্তর্যামীর বাবাও তা ধরতে পারবেন না।

এ সত্য অম্বুজাক্ষের চেয়ে বেশি কে জানে? হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। ভোটের পরেও তো যে-লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, ভূতনাথ গুঁইয়ের নামে নিন্দেমন্দ গালিগালাজ করেছে। অথচ যত ভোট জমল গিয়ে ভূতনাথের বাক্সে, তাঁর বাক্স হা-হা করছে।

কৃতান্ত ভরসা দিয়ে বলে, এবারে সে রকম হবে না—বাজার খুব গরম আপনার। শহীদের বংশাবতংস হয়ে দাঁড়িয়েছেন। স্বাধীন-ভারতে ঐ বস্তুর বিষম কদর। মণিরামপুর থেকে দাঁড়িয়ে আরও সেটা জোরদার হচ্ছে। এই নামটুকু শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারলে তরতর করে বেরিয়ে যাবেন, কোন বেটা রুখতে পারবে না। প্রতুল বিশ্বাসের খোশামুদি না করেও তা হবে। বাপ-বাপ বলে ওরা নমিনেশন দেবে, না দিলে নিন্দের ভাগী হবে—'যুগচক্র' জানেন তো সত্য বলতে পিছপাও হয় না, আমিই মুখোস খুলে দেবো ওদের।

এই কিছুদিন সকলের মধ্যে ঘোরাফেরা করে অম্বুজাক্ষেরও সেই রকম আত্মবিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে। জয় এবারে নির্ঘাৎ। সুযোগ পেয়ে কৃতান্তকে দুটো কথা শোনাতে ছাড়েন না।—সত্যের ধড়াই করছেন, কই, সেবারে তো যাচ্ছেতাই করে লিখলেন। ইংরেজের থয়ের খাঁ, জেনে-তেনো কত কি—

কৃতান্ত লজ্জা পায় না।

তখন যে তাই ছিলেন ডাক্তারবাবু। দেশসুদ্ধ মানুষ তাই জানত। বিশ্বেশ্বর দাদার কৃপায় পাশা এবারে উল্টে গেল। সত্যসন্ধ আমার কাগজ—আমিও উল্টো লিখব। না লিখে উপায় কোথায়? কাশীশ্বরের সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে লিখেছিও অনেকটা। শুনবেন নাকি, এই শুনুন—

ফোলিওব্যাগ খুলে কান-ফোঁড়া একতাড়া কাগজ বের করল। আরম্ভের খানিকক্ষণ পরে অম্বুজাক্ষের হাতে দিল। তিনিও উল্টেপাল্টে দেখলেন। অসমাপ্ত—কিন্তু লিখেছে ভাল সত্যিই। শেষ হলে অতি চমৎকার হবে। লিখতে জানে লোকটা, কলমের জোর আছে। কৃতান্তর হাতে লেখাটা ফিরিয়ে দিয়ে প্রসন্ন হাস্যে অম্বুজাক্ষ বললেন, খাসা হচ্ছে—শেষ করে ফেলুন।

কৃতান্ত মুখ শুকনো করে বলে, ইচ্ছে তো তাই। কিন্তু উৎসাহ চুপসে যাচ্ছে। করেই বা কি হবে, ছাপি কোথায়?

কেন, কেন? নিজের কাগজ রয়েছে আপনার, কাগজ নিয়ে জাঁক করছিলেন—

উৎসাহভরে বলে ফেলেই অম্বুজাক্ষ প্রমাদ গণেন। অবস্থা বোধগম্য হল। এমনি একটা প্রশ্ন আন্দারের

জন্যই কৃতান্ত এই লেখা ফেঁদেছে, এতদূরে এই বাড়ি বয়ে এসেছে। ঠিক তাই।

কৃতান্ত বলে, কাগজের কি দশা দাঁড়িয়েছে, উল্টে-পাল্টে দেখেন কি আপনারা? দেখলে সার একথা বলতেন না। ভাঙা টাইপ, নড়বড়ে মেশিন। অর্ধেক ছাপা তো ওঠেই না। যেটুকু উঠল, কালির ধ্যাবড়া—একবর্ণ আলাদা করে পাওয়া যাবে না। তা আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন, আপনারই কাজে লাগবে। খেটেখুটে মনের মতন একটা লেখা দাঁড় করালাম, সাজিয়ে গুছিয়ে সেইটে যাতে সকলের চোখে তুলে ধরতে পারি।

অর্থাৎ সাদা বাংলায়, টাকা ঢালো। যে বিয়ের যে মন্তোর—ইলেকসনে নেমেছ তো টাকার মায়া করতে গেলে হবে না। ধরে নাও রেস খেলার মতন এক ব্যাপার। লেগে গেল তো খরচের বিশগুণ ঘরে উঠবে, না লাগল তো বরবাদ। কিন্তু কৃতান্তর এ ফরমাশ তো দু-একশ'র ব্যাপার নয়,—কতদূর তার মনের আঁচ, কিছুই আন্দাজ হচ্ছে না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কত লাগতে পারে? মানে এখন তো বুঝতেই পারছেন, নানান দিকে খরচখরচা—

কৃতান্ত সায় দিয়ে বলে, বটেই তো! বেশি এখন চাইতে যাবো কোন বিবেচনায়? তালিতুলি-দেওয়া পুরানো মেশিন নিয়ে নেবো আমি, দেখে এসেছি, দাম কিস্তিতে কিস্তিতে দিলে চলবে। মেশিন আর টাইপের দরুণ সবসুদ্ধ হাজার দশেক দিন আমায়—ধার হিসাবে দিন। বাকিটা আমি যা হোক করে জোগাড় করব।

অম্বুজাক্ষ চমক খেলেন, কৃতান্তর দৃষ্টি এড়াল না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলে, বেশি বলে ঠেকছে? হয়তো বা মনে করছেন, 'যুগচক্র'কে বাঁচিয়ে তুলে লাভ তেমন কিছু হবে না। তা হলে চাই নে। অন্য লোক আছে—আপনার বাড়ি এসে আমি আজ্ঞে-আজ্ঞে করছি, তারা ওদিকে আমাদের অফিসে ধন্না দিয়ে আছে।

রাগ করে কৃতান্ত উঠে পড়ল তো অম্বুজাক্ষ হাতে ধরে বসালেন।

না না না, সে কি কথা! তবে কিনা, এখন নানান দায়ঝক্কি—এক সঙ্গে পেরে উঠছিনে। আপাতত যেমন চালাচ্ছেন চলুক। ইলেকসনের পরে আমায় যা বলেন সমস্ত করবো।

কৃতান্ত আবার বসেছে। বসে পড়ে সে হাসতে লাগল। এই মানুষটি এত রেগেছিল এখন কে বলবে?

ইলেকসনের জন্যেই তো দরকার ডাক্তারবাবু। পরে যখন কাজ থাকবে না, তখন এক ঢাউস প্রেস আর টাইপের গাদা নিয়ে কি করব? আর বলতে কি—হপ্তায় হপ্তায় 'যুগচক্রের' ধুনী জ্বালিয়ে আসছি, মচ্ছবের সময় এই রকম আপনাদের কাজে লাগতে পারব বলেই তো!

হেসে উঠে আবার বলল, ইলেকসন চুকে গেলে তখন আর কি মনে করতে পারবেন অধমের কথা? কেউ করে না, আপনিই বা করতে যাবেন কেন?

বোঝা যাচ্ছে, মুখের কথাবার্তায় নিরস্ত হবার মানুষ এইজন নয়। যতই কিছু চেষ্টা করেন, ঘুরে ফিরে এক জায়গায় আসছে। অসহায়ভাবে তখন বললেন, আচ্ছা, দেখি একটু বিবেচনা করে। মানে, আর কিছু নয়—অবস্থাটা একবার ভেবেচিন্তে দেখা।

কৃতান্ত বলে, বেশ তো, করুন আপনি বিবেচনা। টাকাকড়ির ব্যাপার—লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখতে হবে বই কি! চার দিন পরে শনিবারে আমি আসব। এসে সমস্ত জেনে যাব।

লেখাটা ফোলিও-র খোপে পুরে ভিন্ন এক খোপ থেকে আর এক ফর্দ কাগজ বের করল।

এই দেখুন—লেখার উপসংহার যে রকম হবে, তা-ও ফেঁদে ফেলেছি। কিস্তিতে কিস্তিতে ছাপব, শেষ কিস্তিটা ইলেকশনের আগে দিচ্ছি নে। তাতে অসুবিধা হবে আপনার।

বলে উৎসাহ ভরে নিজেই খানিকটা পড়ে গেল—কাশীশ্বর রায় অত্যন্ত চতুর বলিয়া তাঁহার ছদ্মরূপ দেশবাসী তখন ধরিতে পারে নাই। আসলে তিনি অতি ইতর, স্বদেশদ্রোহী, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক—

কাগজটা টেনে নিয়ে আদ্যোপান্ত পড়ে অম্বুজাক্ষ মুখ-চোখ লাল করে বললেন, ডাহা মিথ্যে। কাশীশ্বর থেকে শুরু করে আমাদের বংশ ধরে কালি ছিটিয়েছেন। এই সমস্ত ছাপলে বিপদে পড়বেন আপনি—

কৃতান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে বলে, তা পড়ব না—বড় খুঁটোর জোর আছে। আজ না হোক দু-পাঁচ মাস পরে ছাপা তো হবেই, লেখা আধখিচুড়ি করে রাখা যাবে না। তবে ইলেকসনের আগে ছাপতে চাই নে। তা হলে, ঐ যা বললাম, গো-হারা হেরে যাবেন; আপনার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে—

অম্বুজাক্ষ বাধা দিয়ে বলেন, খুঁটোটা কে আন্দাজ পাচ্ছি। লড়াইয়ের কালোবাজারিকে—একজন ঝুঁকেছে নাকি। তা সে যা-ই হোক, বিশ্বেশ্বর সরকারের মতো পণ্ডিত মানুষ অত প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়ে যা বলেছেন, তার

উপরে এই সব লিখলে কোন রকমে নিষ্কৃতি পাবেন না। মানহানির দায়ে পড়ে যাবেন, সেইটে যেন খেয়াল থাকে।

কৃতান্ত কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। বলে, বেশ তো, শনিবারের দিন এসে যদি ফয়শালা না হয়, তার পরে সেটার পরখ হবে। লেখাটা রেখে যাচ্ছি—আমার কাপি আছে। ইতিমধ্যে আপনি বরঞ্চ দু' এক জন উকিলের কাছে মানহানির শলাপরামর্শ সেরে রাখুন। ইচ্ছে হলে বিশ্বেশ্বর-দা'র কাছেও গিয়ে দেখতে পারেন।

বলে নমস্কার করে রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে সে বেরিয়ে গেল।

অম্বুজাক্ষ গুম হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। শয়তানটা গত বারের পন্থা নিয়েছে, টাকা না দিলে 'যুগচক্রে' গালিগালাজ শুরু করবে। সেবারে লিখত তাঁকে নিয়ে —টাকার কুমীর হচ্ছেন ডাক্তারি ব্যবসায়ে, তিলেক দয়াধর্ম নেই, যে তাঁর কাছে আসে সে রোগিমাত্র, মানুষ বলে বিবেচনা করেন না তাকে। সাধারণের সঙ্গে ক্ষীণতম যোগাযোগ নেই, সেই লোক যাবে করপোরেশনে দশের প্রতিনিধিত্ব করতে! অনেক রকম গল্পও ছেপেছিল তার নামে। ভিজিট না দিতে পারায় পাড়ারই মধ্যে কোন বাড়ি তিনি গেলেন না, ফলে রোগি মারা পড়ল। কোথায় গিয়ে দেখলেন রোগি মারা গেছে, তা সত্ত্বেও ষোল আনা ভিজিট গুণে নিয়ে নির্বিকার ভাবে চলে এলেন। নাম-ধাম-পরিচয়ও দিয়ে দিয়েছে। সেই সব রোগির কথা তখন খুব তিক্ত লাগত, ইলেকসনের ডামাডোল মিটে গেলে শান্ত চিত্তে পরে আগাগোড়া ভেবে দেখেছেন। বানানো গল্প বিস্তর; কিন্তু সত্যিও আছে দু-চারটে—বর্ণনা দিয়েছে অবশ্য বিস্তর ফলাও করে। আত্মজিজ্ঞাসা জাগল নিজের মনে, নতুন দিকে নজর পড়ল। স্তাবকেরা সামনে বসে যা বলে, তাই তো সবখানি নয়—আড়ালে ভিন্ন ধরণের বলবারও মানুষ আছে, সেই সব খবর 'যুগচক্রে' গিয়ে পৌঁচেছে। তারপরে এই বছর দুয়েকে অম্বুজাক্ষ অনেকখানি বদলেছেনও সত্যি, সকলের সঙ্গে সমান হয়ে মেলামেশা করতে চান। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পড়ে থাকেন, এসেম্বলিতে দাঁড়াচ্ছেন সেও পল্লী এলাকা থেকে। মওকা বুঝে কৃতান্তও এগিয়ে এসেছে। এবারের গালিগালাজ তাঁর সম্পর্ক নয়, পূর্বপুরুষ কাশীশ্বরকে নিয়ে। মৃতের দোষ-অপরাধ মানুষে মার্জনা করে নেয়—আর এদের কাণ্ড দেখ, বন্ধুবৎসল সজ্জন দেশপ্রেমিককে নরকের কীট বলে চিত্রিত করবে, তারই পাঁয়তারা ভাঁজছে। টানতেই হবে কাশীশ্বরকে। কারণ, মণিরামপুর থেকে দাঁড়াচ্ছেন—ও-অঞ্চলে গতায়াত বেশি দিনের নয়, অম্বুজ ডাক্তারের গুণপনা লোকে সামান্যই জানে। রামনিধির নাম পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে তারা বলাবলি করে আসছে, কাশীশ্বরকে সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মহিমা ভাগাভাগি করে নেওয়া হচ্ছে। কাশীশ্বরকেই অতএব ধরাশায়ী করবার ষড়যন্ত্র। ঝানু লোক, আসল জায়গায় ঠিক ঘা দিচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর সরকার ভরসা এখন। কৃতান্তকে ঠাণ্ডা করবার একমাত্র পাশুপত-অস্ত্র। কাশীশ্বর সম্পর্কিত বিশ্বেশ্বরের লেখাগুলো অঞ্চলময় ভাল করে ছড়াতে হবে। ঘরে ঘরে ছেলেবুড়ো কাশীশ্বরের গল্প পড়বে যেমন রামনিধির কথা চলে আসছে এ যাবৎ। কৃতান্তর মন-গড়া কথার তখন দাম হবে না।

এনগেজমেণ্ট বই উল্টাচ্ছেন, কোন সময়টা ফাঁকা আছে আজকে। হ্যাঁ, আজকেই যাবেন বিশ্বেশ্বরের কাছে সকল কাজকর্ম বন্ধ রেখে। কোমর বেঁধে লাগতে হবে কাশীশ্বরের ব্যাপার নিয়ে। এমনিই দেরি হয়ে গেছে, তিলার্ধ আর গড়িমসি নয়।

অরুণাক্ষকে ডেকে পাঠালেন।

আজকাল গিয়ে থাক সরকার মশায়ের ওখানে?

হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে বললেন, বিশ্বেশ্বর সরকারের কথা বলছি। ভাল আছেন তাঁরা সব? সেই যে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে এলেন, নতুন কিছু লেখা-জোখা হল তার উপরে?

অরুণ বলে, আমি জানি নে—

কেন, জানো না কেন তুমি? নতুন গবেষণার খবরাখবর নেবে না, তা হলে ইতিহাস বেছে নিলে কেন?

ছেলের সঙ্গে সঙ্গে সুহাসিনী এসেছেন। তিনি বলে উঠলেন, কোন মুখ নিয়ে যায় সেখানে? মুখে বলে থাকো, পরম উপকারী তাঁরা। এতবার এমন ভাবে ডাকাডাকি করছেন, এক ঘণ্টার তরে যাচ্ছ না তবু। বিয়ে-থাওয়া না-ই হোক, চোখের দেখাটা দেখে আসতে দোষ কি? কি মনে করছেন বলো দিকি তাঁরা?

অম্বুজাক্ষ বললেন, যাবো আমি। পঞ্চানন ছোঁড়াটা আসছে না, ঠিকানাও জানা নেই—যাই কার সঙ্গে?

সে আর আসবে না, কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে বলে গেছে। যেদিন আসে, তোমার দেখা পায় না। কথা দিয়ে কথা রাখ না, খুব রাগ করে গেছে।

অম্বুজাক্ষও রেগে যান।

বড্ড কুলীন হয়েছে ওরা আজকাল। একবারের বেশি দু-বার আসতে হলে মান যায়। গ্রাহ্য করি নে। ওদের ছাড়াও যেতে পারব। ওদের বাদ দিয়েই জিতে যাবো, পাড়াগাঁয়ের মানুষ কাগজে কি লিখল না লিখল ভারি তার তোয়াক্কা রাখে!

ছেলেকে বললেন, চলো, তুমি নিয়ে যাবে আমায় সরকার মশায়ের কাছে। গাড়ি বের করো। ক্রমশঃ

মেয়েদের কথা

সমাজ-আবর্তনে নারী

রেবা চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান যুগে আমাদের নারী-সমাজ জটিল এক সমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ আর কেবল মাত্র সাংসারিক কাজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী পুত্রকন্যা প্রভৃতির সেবা করে, তাদের মনস্তুষ্টি ক'রে দিনাতিপাত করলেই চলবে না। একদা হয়তো চলতো কিন্তু আজ আর চলবে না। আজ আরো বৃহত্তর কর্মের আহ্বান এসেছে আমাদের বাঙালী নারী-সমাজের দ্বারে। পুরুষের সঙ্গে সমান তালে তাল দিয়ে আজ নারীকে জীবন-বীণার সুর আলাপ করতে হবে। আলাপ করতে হবে প্রাচীন ও আধুনিক যুগ-সংমিশ্রণে নবতম রাগিণীর।

অতি প্রাচীন যুগে শিক্ষায় জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যের প্রতিযোগিতায় অনেক নারী পুরুষের প্রতিভাকে ম্লান করে দিতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। তখন ছিল ঘরে বাইরে নারীর সমান সম্মান, সমান প্রতিপত্তি। তখন ছিল নারী পুরুষের সহধর্মিণী সহকর্মিণী। নরনারীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় তখন সমাজ সংসার মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতো। সে যুগের নরনারীকে স্মরণ করে তাই এ যুগের কবি গেয়েছেন—

শস্যক্ষেত্র উর্বর হ'ল পুরুষ চালাল হ'ল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হ'ল, নারী বহে জল, সেই জল ও মাটিতে মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শিষে

সেদিনের নারী পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে করেছে সহযোগিতা। দিয়েছে শুভ মন্ত্রণা। প্রয়োজন বোধে জীবন-সংগ্রামে করেছে সাহায্য দান। ইতিহাসে পাওয়া যাবে এ সবের সাক্ষ্য। ইতিহাস দেখেছে সেদিনের নারীকে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে। দেখেছে শিল্পে সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে, দেখেছে মুক্ত কৃপাণ হস্তে রণক্ষেত্রে অরাতি দলন করতে।

তারপর এলো এক যুগ, যে যুগে পুরুষ-সমাজ নারীকে বন্দী করলে গৃহাভ্যন্তরে। বললে—সমাজের প্রয়োজন! বললে—নারীর কাজ শুধু গৃহ মধ্যে আবদ্ধ। নারীকে করতে হবে স্বামী-পুত্র পরিজনের পরিচর্যা। করতে হবে সন্তান ধারণ, সন্তান পালন। রন্ধনশালার পূর্ণ দায়িত্ব, গৃহস্থালীর সকল দায়িত্ব কেবলমাত্র থাকবে নারীর ওপর। এই সীমা অতিক্রম করা চলবে না নারীর। বিদ্যা শিক্ষা নারীর পক্ষে অপরাধ বলে বিবেচনা করলেন সমাজ। কঠোর শাসনের মধ্যে গৃহাবদ্ধ নারী সারা অঙ্গে অলংকার বিলাস করে, সংসার আর আত্মীয়-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করতে লাগলো। এমনি করে অতীত হল বহুদিন। নারী বিস্মৃত হ'ল তার অতীত গৌরব। ভুলে গেল যে একদিন তারা সব বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, প্রতিযোগিতা করেছে। তারা অজ্ঞ নয়, তারা ভীরু নয়, তাদের মস্তিষ্ক অনুর্বর নয়। এ বিশ্বাস তারা হারিয়ে ফেলল। তারা ক্রমেই আবদ্ধ হয়ে পড়লো অন্ধ সংস্কারের তামসী গণ্ডীর মধ্যে।

কোনো একটি নারীকে যদি দেখা যেতো অন্য নারী অপেক্ষা শিক্ষায় কিছু উন্নত, কিছু স্বাবলম্বিনী, পুরুষের মুখাপেক্ষিণী নয় তাহলেই সমাজ আতঙ্কে শিউরে উঠতো। এ ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারতো না সমাজ। গৃহের প্রাচীন গৃহিণীরা সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে বলতেন (বলতেন কেন, এখনো অনেক অনগ্রসর প্রাচীন গৃহে বলে থাকেন): অবাক কাণ্ড মা, কালে কালে কি হ'ল! মেয়েমানুষ ইস্কুল কলেজে মদ্দদের মতো নেকাপড়া শিখবে কি কথা গো!—ফোড়ন কেটে অপর সঙ্গিনী বলতেন: বিবি হবেন গো দিদি ওরা। মদ্দদের সঙ্গে সায়েব বাড়ি চাকরী করতে যাবেন। কী ঘেন্নার কথা!—সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বউঝিদের সাবধান করে দিতেন—যেন ওই শিক্ষিতা আধুনিক মেয়েটির সঙ্গে না মেশে কেউ।

এমন সময় এসেছিল তখন যে, মেয়েদের পক্ষে ধর্ম-গ্রন্থাদি পাঠ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হ'য়েছিল। সর্ববিষয়ে নারী

হ'য়ে পড়েছিল পুরুষের একান্ত মুখাপেক্ষী। আপন স্বত্বা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু নদীতে যখন জোয়ার আসে তখন দুকূল ভাসিয়ে দিয়ে যায়। তীর-সঞ্চিত সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে মুছে নিয়ে চলে যায়। সমাজেরও সেই রকম পরিবর্তনের জোয়ার আজ এসেছে। এর শেষ কোথা—সমাপ্তি কোথা কেউ জানে না।

একদিন একান্নবর্তী পরিবারে পুরুষ-সমাজ নারীকে অন্তঃপুরে বন্দী করে রেখেছিল। গৃহস্থালীর কাজ ব্যতীত নারীর অন্য কাজের প্রয়োজন ছিল না। শ্বশুর ভাসুর স্বামী দেবর সকলের আয় মিলিত হয়ে নিশ্চিন্তে সংসার প্রতিপালিত হ'ত। গৃহবধুদের সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তার কারণ ছিল না, অবসরও ছিল না। এখনো অনেক গৃহে তাই আছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে-একান্নবর্তী পরিবার ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে। হ'য়ে গেছে অবশ্য অর্থনৈতিক কারণে এবং এ কারণও ঘটেছে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তাগিদে। পূর্বে একশত টাকায় যে সংসার স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হ'ত—আজ সে সংসার পাঁচশত টাকাতেও কায়ক্লেশে প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং সংসারে অর্থ উপার্জন আরো চাই। এখন একলা পুরুষের উপায়ে সংসার প্রতিপালন সম্ভব নয়, নারীর 'পরেও উপার্জনের কিছু দায়িত্ব এসে পড়েছে। কিন্তু উপার্জন করতে গেলেই তো হবে না; সেজন্য শিক্ষার প্রয়োজন আছে। আর সে শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার সঙ্গে পৃথক নয়।

আধুনিক যুগে নারীশিক্ষার রীতিমত আলোড়ন এসেছে সমাজে। এ আলোড়ন শুভ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হ'চ্ছে যে, এখনো অনেক বাড়ির প্রাচীনারা নারীর এই উচ্চশিক্ষা মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁরা উপায় বিহিনাদের দাসীবৃত্তি কিংবা পাচিকাবৃত্তি অনুমোদন করেন, কিন্তু লেখাপড়া শিখে শিক্ষিকাবৃত্তি বা কোনো অফিসে চাকরী অনুমোদন করেন না। তাঁদের ধারণা অনাত্মীয় পুরুষের সান্নিধ্যে এলে মেয়েরা নিজেদের সম্ভ্রম নষ্ট করে ফেলবে। সমাজে ব্যভিচারের ঢেউ বয়ে যাবে। এ কুসংস্কার থেকে তাঁরা এখনো মুক্ত হতে পারেননি। কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করতে সাধ হয় যে, যেদিন মেয়েদের বাইরে বেরুবার দরকার হয় নি—যেদিন তাদের অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশা করার প্রয়োজন ছিল না সেদিন কি সমাজে নারীর কোনো ব্যভিচারের ইতিহাস নেই ?

আমি যে ভাড়া বাড়িতে বাস করি সেই বাড়ির বাড়িওয়ালি—ওই কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনাদের একজন। এককালে অবস্থা তাঁদের ভালো ছিল। এখন অতি সাধারণ। শিক্ষার কোনো বালাই তাঁদের গৃহে নেই। পুরুষদের মধ্যেও নয়, মেয়েদের মধ্যে তো নয়ই। সেই বৃদ্ধা আমাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। সহ্য করতে না পারার কারণ আমি একা পুরুষের সহায়তা ভিন্ন বাইরে বেরুই। অবাধে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করি। ইস্কুল কলেজে পড়ে সামান্য লেখাপড়া শিখেছি। এই আমার অপরাধ। আরো অপরাধ শিক্ষার ব্যাপারে পাড়ার অনেকগুলি মেয়ে আমার কাছে আসে। তাঁর বাড়ির বউদের আমার সঙ্গে বেশি মাথামাখি করতে দিতে তিনি নারাজ। কারণ আমার সঙ্গে মিশলে তাঁর বউরা বাচাল হয়ে যাবে। পরনিন্দা আর পরচর্চায় দিন কাটুক কিন্তু মেয়েদের লেখাপড়ার আলোচনা তাঁর অসহ্য। অথচ অনেক ব্যাপারে আমার সাহায্যও তাঁকে নিতে হয়।

কিন্তু সে যাই হোক। এ কুসংস্কার মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কালের তালে পা ফেলে চলাই সকলের উচিত বলে আমি মনে করি। আজ নারী-সমাজ যে জীবন-জিজ্ঞাসারই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আজ শুধু গৃহে আবদ্ধ হ'য়ে থাকলেই নারীর চলবে না। আজ বৃহত্তর জগতের বৃহত্তর আহ্বান এসেছে নারীর। নারীর কাজ সংসার জীবনে পুরুষের চেয়ে বড়। নারীর ওপর ভার রয়েছে সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার। ভার রয়েছে সংসারের শান্তি প্রতিষ্ঠার। সুমাতার সুসন্তান শান্তির সংসারে বর্ধিত হয়ে জগৎ সভায় জন্মভূমির সুনাম বৃদ্ধি করবে। নারী শুধু পুরুষের জননী, ভগ্নী, জায়া ও দুহিতা নয়, নারী পুরুষের সহকর্মিণী—সহধর্মিণী। নারীকে গৃহকোণে আবদ্ধ করে রেখে তার মনকে সাবেক কুসংস্কারের মোহে পঙ্গু করে রাখা উচিত নয়। তাতে কোনো পক্ষই লাভবান হবে না। প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে সংস্কারকে আঁকড়ে থাকলে নরনারী কেউই লাভবান হবেন না।

আমরা—নারীরা আজ কর্মক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে যাতে কাজ করতে পারি, যাতে প্রমাণ করতে পারি আমাদের যোগ্যতা তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। অবশ্য বহু ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করেছি, কিন্তু আরো চাই। আর চাই সেই সঙ্গে পুরুষ-সমাজের উদার ব্যবহার। যার অনেক ক্ষেত্রে এখনো অভাব আছে। এখনো পথে ঘাটে কোনো একটি বয়স্থা মেয়েকে একা যেতে দেখলে অভব্য যুবকদের অশ্লীল পরিহাস শোনা যায়। এটা উচিত নয়। আরো অনেক ব্যাপারে এই সব যুবকদল মেয়েদের যোগ্য সম্মান দেয় না। তারা নারীকে কেবল ভোগবিলাসের বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু ভাবতে শেখেনি এখনো। কিন্তু এ দৃষ্টি এ চিন্তা বদলানো প্রয়োজন। যে কোনো নারীকে একান্ত আত্মীয়ার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হতে হবে। যতোদিন এ না হবে ততোদিন নারী স্বাধীনতা সম্যক রূপ গ্রহণ করবে না। আশা করি এ সম্বন্ধে নরনারী উভয় সমাজই একটু চিন্তা করবেন। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরো কিছু আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

উলের জিনিস রাখার নিয়ম

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় বি-এ

ফাল্গুনের মৃদু হাওয়া বইবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার উলের জিনিসগুলো বাক্সবন্দী করে তুলে রেখে দেন তো? অবশ্য তাই যদি করে থাকেন তো ঠিক কাজই করেন। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতের দুই তিন মাস ছাড়া উলের জিনিসগুলো ব্যবহার করবার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না। সেইজন্যে উলের জিনিস রাখার দিকে বিশেষ নজর না দিলে পোকায় কেটে সমস্ত নষ্ট করে দেবে। সব সময় উলের জিনিস কেচে তার পর উঠিয়ে রাখবেন। ময়লা জিনিসে পোকা লাগার সম্ভাবনা বেশী।

এখন উলের জিনিস কি ভাবে কেচে তুলে রাখবেন, সেই সম্বন্ধে কিছু বলবো—আপনাদের বোধ হয় কাজে লাগবে। সুতির আর উলের জিনিস কাচার মধ্যে কিন্তু বেশ কিছু পার্থক্য আছে। উলের জিনিস খুব সাবধানে কাচতে হয়। গরম জল ব্যবহার করবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন নেই। প্রথমে ঠাণ্ডা জলে সাবান গুলুন, আর যখন ঐ জলে বেশ ফেনা হবে তখন উলের জিনিস সাবান জলে ফেলে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে কেচে আধ ঘণ্টাকাল আন্দাজ ভিজিয়ে রাখুন। এই আধ ঘণ্টা ভিজানর পর পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে আবার আস্তে আস্তে কেচে নিন। দু'তিন বার ভাল করে ঠাণ্ডা জলে কেচে নিলে সমস্ত সাবান বেরিয়ে যাবে।

উলের জিনিসের ওপর কখনো সাবান ঘসবেন না, আর নেহাৎ বাজে সাবানও ব্যবহার করবেন না। সাবানের মধ্যে লাক্স ও রিন্‌সো প্রভৃতিই ভাল। উলের জিনিস কখনোও বেশী গরম জলে কাচবেন না। যদি আপনি ইচ্ছে করেন তো অল্প হাতসহা গরমজলে কাচতে পারেন। বেশী গরমজল বা খারাপ সাবান ব্যবহার করলে ঐ জিনিস কেটে যাবার বা ছোটো হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। রঙের উজ্জ্বলতাও নষ্ট হবে আর সাদা রঙ খারাপ হয়ে অল্প হলদে রঙে পরিণত হবে। সাদা রঙের উলের জিনিস কাচার সময় সাবান জলে অল্প একটু য়্যামোনিয়া (Ammonia) মিশিয়ে নিলে রঙের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় না। যেখানে রঙ খুব ফিকে বা কাঁচা, সেই সব জিনিস কাচার সময় আন্দাজ তিন সের জলে বড় চামচের এক চামচ ভিনিগার (Vinegar) ব্যবহার করবেন, তাহলে রঙ নষ্ট হবে না। ভিনিগারের বদলে পাতিলেবুর রসও ব্যবহার করতে পারেন।

কাচার পর জিনিসটি দু'হাতের ভেতর নিয়ে চাপ দিন, জল ঝরে যাবে। উলের জিনিস কখনো নিংড়াবেন না। যদি দেখেন যে আরও জল নিংড়াবার প্রয়োজন আছে, তাহলে পরিষ্কার তোয়ালেতে জিনিসটি জড়িয়ে বেশ করে আবার চাপ দেবেন। এই রকম করলে পুরো নিংড়ানর কাজ হবে। এইবার জিনিসটি খুব রোদ না লাগে অথচ রোদের তাপ লাগে এমন জায়গায় বিছিয়ে শুকোতে দিন। বেশী রোদ লাগলে রঙ নষ্ট হয়ে যাবে। উলের জিনিস দড়ি বা তারে ঝুলিয়ে শুকোতে দেবেন না। ঝুলিয়ে দিলে জলের ভারে জিনিসটি লম্বা হয়ে যাবে। উলের জিনিস কাচার আগে কাগজের উপরে জিনিসটি রেখে পেন্সিল দিয়ে তার বাইরের রেখা এঁকে নেবেন। কাচা হয়ে যাবার পরে জিনিসটি কাগজের মাপের উপর রেখে আগেকার আকৃতির মতন টেনে ঠিক করে নেবেন।

উলের জিনিসে অনেক সময় দাগ লাগতে পারে। টিনচার আওডিন (Tinchure Iodine) লাগলে কাগজি বা পাতিলেবুর রস ব্যবহার করবেন। কলের তেলের কালি তুলতে হলে পেট্রোল (Petrol) দিয়ে সেই জায়গা বেশ ভাল করে ধুয়ে দেবেন, এতে কালি উঠে যাবে। ফলের রস, চা ও কফির দাগ ওঠাতে হলে মেথিলেটেড স্পিরিট (Methylated Spirit) অথবা পেট্রোল ব্যবহার করতে পারেন।

উলের জিনিস কাচা হয়ে যাবার পরে বাক্সে তুলে রাখবেন। উঠিয়ে রাখবার সময় জিনিসের ভাঁজের মধ্যে মধ্যে কালজিরা ও শুকনো নিমপাতা ছড়িয়ে দেবেন। ন্যাপথালিন্ (Naphthaline) বা কর্পূরও দিতে পারেন।

গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে উলের জিনিসগুলি রোদে দেবেন, তাহলে কখনও পোকা ধরবে না।

ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন—

বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য দাবী করা হইতেছিল এবং কংগ্রেস সে দাবী স্বীকার করিয়া তাহার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের হাতে দেশ-শাসনের ভার আসিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সেজন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এক কমিটী গঠন করেন এবং কয় মাস পূর্বে সে কমিটী তাহার অভিমত প্রকাশ করে। কমিটীর সিদ্ধান্ত সকল রাজ্যের লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, কাজেই কমিটীর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর বহু রাজ্যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন সৃষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা উক্ত সিদ্ধান্তের অদল-বদলের জন্য শ্রীনেহরু, মৌলনা আজাদ, পণ্ডিত পন্থ ও শ্রীডেবরকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করেন। পশ্চিম বঙ্গের পক্ষ হইতে যে সকল অঞ্চল পাইবার জন্য দাবী করা হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ব কমিটী সম্মত হইতে পারে নাই। তাহারা বিহার হইতে মাত্র মানভূম জেলার কতকাংশ ও পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জের একাংশ পশ্চিম-বঙ্গকে দিবার সিদ্ধান্ত করেন। আসাম সম্মত না হওয়ায় গোয়ালপাড়ায় বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও কমিটী সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। সমগ্র মানভূম জেলা দাবী করা হইলেও কমিটী বিহারের আর্থিক ক্ষতির অজুহাতে ঐ জেলার মাত্র একাংশ পশ্চিমবঙ্গকে দিবার সিদ্ধান্ত করে। উত্তরবঙ্গে যাতায়াতের পথ না থাকায় মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে উত্তরবঙ্গে যাইবার পথ তৈয়ারীর জন্য কিষণগঞ্জের একফালি জমি পশ্চিমবঙ্গকে দিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বিহারের অধিবাসীরা এই সামান্য জমি দিতেও সম্মত হয় নাই। তাহার ফলে নেহরু কমিটী মানভূম জেলার যে অংশ ফজল আলি কমিটী (রাজ্য পুনর্গঠন কমিটী মিঃ ফজল আলির নেতৃত্বে গঠিত হইয়াছিল) দিবার সিদ্ধান্ত করেন, তাহারও কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গকে না দিয়া বিহারে থাকার সিদ্ধান্ত করেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গে যেমন, বিহারেও তেমনই দারুণ বিক্ষোভ ও আন্দোলন সুরু হয়। গত ২১শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সম্পূর্ণ হরতাল পালন করিয়া দেশবাসী সে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। উড়িয়া ভাষাভাষী অধ্যুষিত বিহার সীমান্তের খরসোয়ান ও সেরাইকেল্লা জেলা দুটি বহুদিন পূর্বে জোর করিয়া বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল—উড়িষ্যা তাহা ফিরাইয়া পাইবার দাবী করে—রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বা নেহরু কমিটী কেহই সে দাবী রক্ষা করেন নাই। ফলে উড়িষ্যায় যে গণবিক্ষোভ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শুধু পুরী রেল ষ্টেশনের প্রায় ৩ কোটি টাকার জিনিষ ভস্মীভূত হইয়াছে। সমগ্র রাজ্যের ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই। যদি উড়িষ্যাবাসীদের দাবীতে কর্ণপাত করা না হয়, তাহার পরিণাম কি ভয়াবহ তাহা চিন্তা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য রাজ্যের সীমার পরিধি বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন জানিয়াও রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বা নেহরু কমিটী কেহই পশ্চিমবঙ্গের দাবী মানিয়া লইলেন না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী উভয়েই এ বিষয়ে দাবী জানাইয়াও সফলকাম হন নাই। তদুপরি কমিশনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া নেহরু কমিটী পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য জমির পরিমাণ কমাইয়া দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গবাসী মনে করিতেছে—কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গবাসী কি করিবে বা কি করিলে তাহাদের দাবী পূর্ণ হওয়া সম্ভব, সে বিষয়ে চিন্তাকুল হইয়াছে। এমন সময়ে বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়া উভয় প্রদেশকে মিলিত করিয়া একটি রাজ্যে পরিণত করার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ডাক্তার রায় এখনও উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণাদি প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মকর্তারা ও কলিকাতা কর্পোরেশন এই মিলনের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মিলনের পক্ষে হইলেও পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা ও বিধান পরিষদের সদস্যগণ এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত নহেন। তাঁহারা কংগ্রেস দলের সভায় বিধানবাবুকে এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সহসা কোন মত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সমীচীন হয় নাই—এ কথা সকলেই প্রকাশ করিতেছেন। উভয় রাষ্ট্রের মিলনে কাহার অধিক লাভ হইবে, পশ্চিমবঙ্গ তদ্দ্বারা উপকৃত হইবে কি না—এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ সকলের পক্ষে স্বাভাবিক। সেজন্য মিলনের বিরুদ্ধে সর্বত্র সভা করিয়া প্রতিবাদ করা হইতেছে। অমৃতসহরে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন আসন্ন, তথায় হয়ত কংগ্রেস হইতে এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হইবে। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীডেবর ইতিপূর্বেই কলিকাতায় আসিয়া মিলন-প্রস্তাবের

জন্য বিধানবাবু ও শ্রীবাবুকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর মন এই মিলনকে সমর্থন করিতে চাহে না। বাঙ্গালী আজ দারুণ সঙ্কটাপন্ন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যদি মিলনকে সমর্থন করে, তাহা হইলে জনগণের প্রতিবাদ কোন ফল উৎপাদন করিতে পারিবে কি না সন্দেহজনক। বিষয়টি সম্বন্ধে যতদিন না বিস্তারিত আলোচনা হয়, ততদিন বিবেচক ও বুদ্ধিমান লোকদের পক্ষে শুধু ভাবালুতার দিক দিয়া ইহার বিরুদ্ধাচরণও অনেকে সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। আজ বাংলা দেশে বিধানবাবুর মত কর্মী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বিতীয় আছেন কি না সন্দেহ—তাঁহার প্রস্তাবও সেজন্য এক কথায় নস্যাৎ করা উচিত হইবে না। আমরা দেশবাসী সকলকে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তার পর উভয় পক্ষে যুক্তিতর্ক করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনুরোধ করি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—

১০ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে জাতীয় উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতির লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ৫ বৎসরে (১৯৫৬-১৯৬১) উন্নয়ন বাবদ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ৪৮০০ কোটি টাকা। বেসরকারী উদ্যোগেও এই সময়ে ২৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইবে জনগণের জীবন ধারণের মান-উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা, দ্রুত শিল্পায়ন—তবে মূল ও বৃহৎ শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ, কর্মসংস্থানে বিরাট সম্প্রসারণ, সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য দূরীকরণ এবং অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা অধিকতর সুসম বণ্টন। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনই হইবে এই পরিকল্পনার একমাত্র আদর্শ। শিল্প ও খনিজ সম্পদের উন্নয়নকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হইবে। পরিকল্পনা কোটি কোটি দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিবে। আবার দারিদ্র্য মোচন এবং জীবন ধারণের মান উন্নয়নের জাতীয় উদ্যোগে দেশবাসী প্রত্যেকের সম্মুখেই সেবার এক মহান সুযোগ আনিয়া দিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী বিনিয়োগের শতকরা ৪৮ ভাগ পরিবহন ও যোগাযোগ সহ শিল্প ও খনিজ সম্পদ খাতে, ১৮ ভাগ সেচ ও বিদ্যুৎ খাতে, ১২ ভাগ সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনাসহ কৃষি খাতে এবং ২০ ভাগ গৃহ নির্মাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনসহ সমাজ-সেবা খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে। জনসাধারণের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্য লইয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়ার সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করা হইয়াছে। সকলের মতামত পরিপূর্ণরূপে বিবেচনা করিয়া পরে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনাটি প্রকাশ করা হইবে। সংক্ষিপ্ত খসড়াটিতে ১৪টি পরিচ্ছেদ ও মোট দুই শতাধিক পৃষ্ঠা আছে। দেশের চিন্তানায়কগণেরও প্রতি অংশের মতামত লইয়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের বিভিন্ন স্তরের বহু কর্মীর পরিশ্রমে এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন সমাজের সর্বস্তরের নরনারীর সহযোগিতা লাভ করিয়াছেন। পরিকল্পনা রচনাকালে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও ব্যাপক সহযোগিতা লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহাই ইহার সার্থক রূপায়ণের শুভ ইঙ্গিত। প্রগতিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তনই ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। তখন দেশে খাদ্য ও শিল্পোপকরণের একান্ত অভাব এবং গুরুতর মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা বর্তমান। কাজেই এগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ দিতে হয় এবং ভবিষ্যতে দ্রুততর অগ্রগতির প্রস্তুতি হিসাবেই প্রধানত এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অর্থ-নৈতিক সমস্যাগুলি বিচার করিয়া দেখিয়া উন্নয়ন কার্যসূচিগুলি এমনভাবে রচিত হইয়াছিল যাহাতে আপাত প্রয়োজন মিটাইয়া ও সুসমঞ্জস ও সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক উন্নতির কর্মপন্থা প্রবর্তন করা যাইতে পারে। প্রথম পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যসূচি রূপায়ণে যে সাফল্য অর্জন করা গিয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ চলিবে এবং আরব্ধ কর্ম-প্রচেষ্টাকে প্রগতির পথে লইয়া যাইতে হইবে। আরও ভবিষ্যতে ৩।৪টি পরিকল্পনা রচনার বৃহত্তর সম্ভাবনা লইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনা করা হইবে। গত ৫ বৎসরে ১ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের শক্তি ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে বাড়িয়া ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট হইয়াছে। গত ৫ বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ১১ টাকা করিয়া বাড়িবে আশা করা গিয়াছে, তাহা শতকরা ১৮ টাকা করিয়া বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মূলত এইরূপ—(১) দেশে জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা (২) দ্রুত শিল্পায়ন—তবে মূল ও বৃহৎ শিল্পের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। (৩) অধিকতর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা (৪) ধন বৈষম্য হ্রাস ও অর্থনীতিক ক্ষমতা বিভাজনে অধিকতর সামঞ্জস্য বিধান। এই লক্ষ্যগুলি পরস্পর সংযুক্ত। উৎপাদন ও অর্থ বিনিয়োগের বিশেষভাবে বৃদ্ধি না করিতে পারিলে জাতীয় আয় ও জীবনধারণের মান উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এই অর্থনীতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার, খনিজ সম্পদের ব্যাপক সমীক্ষা ও উন্নয়ন, ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, কয়লা শিল্পে ব্যবহার্য্য রসায়ন

প্রভৃতি মূল শিল্পের উন্নতিবিধান একান্ত আবশ্যক। সকল দিকে একই সময়ে উন্নতি করিতে হইলে লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। ভারতে লোকবলের অভাব নাই। কাজেই এখানে কর্ম সংস্থান ব্যবস্থার সম্প্রসারণই অন্যতম উদ্দেশ্য। কমিশনের নির্দেশগুলি সম্বন্ধে দেশে সর্বত্র আলোচনা প্রয়োজন। দেশবাসীকে ইহার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হইবে। একদিকে যেমন ধনীর অর্থ গ্রহণের চেষ্টা, অপরদিকে তেমনই শ্রমিকের শ্রমের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা—উভয় চেষ্টা মিলিত হইয়া পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে সাফল্যদান করিবে। প্রচার কার্য্যের জন্য আমরা দেশের সকল শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতা কামনা করি।

সম্মান প্রদান—

বালী বিমল স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে গত ৯ই অক্টোবর রবিবার উত্তর পাড়াস্থিত 'রাজেন্দ্র বিশ্রাম'এ অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতীর স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্থানাধিকারের জন্য বিশ্বভারতীর চীনা ভাষার অধ্যাপক তানুউন সেনএর কন্যা শ্রীমতী তানওয়েনকে রবীন্দ্রপদক প্রদান করা হয়। এছাড়া স্কুলফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম শ্রীমান সুভাষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম শ্রীমতী মঞ্জুলা মজুমদার, উত্তরপাড়া কেন্দ্রে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রীমান তুলসীরঞ্জন সেন এবং ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী শান্তা চট্টোপাধ্যায়কে যথাক্রমে বঙ্কিম স্মৃতিপদক, শরৎ স্মৃতিপদক ও বিমল স্মৃতিপদক প্রদান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়া পুরস্কার বিতরণ করেন।

শ্রীমতী তান্ ওয়েন (১৯৫৫)

ফটো—সত্যেন গঙ্গোপাধ্যায়

পরলোকে ফণিভূষণ গুপ্ত—

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ফণিভূষণ গুপ্ত গত ৩১শে জানুয়ারী মঙ্গলবার ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত দশ বৎসর যাবৎ তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। আই-এ পাশ করিয়া ১৯২১ খৃঃ তিনি গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন এবং ১৯২৮ খৃঃ কৃতিত্বের সহিত ফাইন আর্টস্ পাশ করিয়া কিছুকাল ঐ স্কুলেই শিক্ষকতার কার্য্য করেন। অতঃপর শিশু-সাহিত্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ শুধু মাত্র শিশু সাহিত্যের চিত্রই তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন। স্কুল-পাঠ্য পুস্তকেও সর্বপ্রথম একক শিল্পী হিসাবে গুপ্তের নাম করা যায়। তিনি সর্বপ্রথম আমাদের দেশের রেখা-চিত্রগুলির মধ্যে grooping বা compositionএর

ফণিভূষণ গুপ্ত

আমদানী করিয়া গিয়াছেন। একখানি ৩½ × ২½ সাইজের ছোট ছবিতেও তিনি অতি সুন্দরভাবে বহু চরিত্রের সমাবেশ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিত্রের পুস্তকের সংখ্যা (বাজারে চলতি ও অধুনালুপ্ত) হাজারের মত হইবে। ইহা ছাড়া ছোটদের মাসিক 'শিশু-সাথী' ও বার্ষিক 'শিশু-সাথী' তিনি একাই ২৫ বৎসর এবং 'রামধনু' ১৫ বৎসর চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত সদাহাস্যময় বন্ধুবৎসল কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক এ যুগে বিরল। গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার সুন্দর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি পত্নী ও দুই কন্যা এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

সন্তোষ ট্রফি ঃ

১৯৫৫ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ১—০ গোলে মহীশূরকে পরাজিত ক'রে সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে। ১৯৫৪ সাল ছাড়া বাংলা প্রতি বছরের ফাইনাল খেলেছে। ১২ বছরের খেলায় বাংলা ১১ বার ফাইনাল খেলেছে এবং জয়ী হয়েছে ৮বার। বাকি চারবারের ফাইনালে জয়ী হয়েছে ১৯৪৪ সালে দিল্লী, ১৯৪৬ ও ১৯৫১ সালে মহীশূর এবং ১৯৫৪ সালে বোম্বাই। বাংলা সব থেকে বেশী বার এবং উপর্যুপরি ৪ বার (১৯৪৭—১৯৫১ ; ১৯৪৮ খেলা হয়নি) সন্তোষ ট্রফি পাওয়ার রেকর্ড করেছে।

আলোচ্য বছরের খেলায় আমেদ খানের নেতৃত্বে বাংলাদল এর্নাকুলামে খেলতে যায়। বাংলা ৪—০ গোলে উত্তর প্রদেশকে, কোয়ার্টার ফাইনালে ১, ২,—১, ০ গোলে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে সার্ভিসেস দলের কাছে প্রবল বাধা পায়। প্রথম দিন খেলা ড্র যায়, উভয় পক্ষেই একটা ক'রে গোল হয়। দ্বিতীয় দিনও খেলার ফলাফল ড্র গেল, গোল কোন পক্ষেই হ'ল না। তৃতীয় দিন বাংলা ১—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে মহীশূর ১—০ গোলে আসামকে হারায়। ফাইনালে বাংলার পক্ষে পি কে ব্যানার্জি গোল করেন।

ফাইনালে খেলোয়াড়দের নাম

গোল—সনৎ শেঠ ; ব্যাক—রহমন এবং এস গুহ ; হাফ্-ব্যাক্—সোম, এস সর্ব্বাধিকারী এবং নন্দী ; ফরওয়ার্ড—পি কে ব্যানার্জি, সি গোস্বামী, এস ঘোষ, আমেদ খান (অধিনায়ক) এবং কিট্টু।

সার্ভিসেস ৩—১ গোলে আসামকে পরাজিত ক'রে সাম্পাঙ্গী ট্রফি জয়ী হয়েছে। এ খেলা হয় সেমি-ফাইনালে পরাজিত দুইদলের মধ্যে।

মানকাদের কৃতিত্ব ঃ

সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একই খেলোয়াড়ের পক্ষে ১,০০০ রান করা এবং ১০০ উইকেট পাওয়া এক বিরাট কৃতিত্বের পরিচয়। খেলোয়াড়ের এ কৃতিত্বকে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে বলা হয় 'টেষ্ট ডবল'। এ পর্য্যন্ত মাত্র ৯জন খেলোয়াড় এ সম্মান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। ইংলণ্ডের পক্ষে এ সম্মান পেয়েছেন ডব্লিউ রোড্স, মরিস টেট্ এবং উইকেট-কিপার টম ইভান্স ; অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এম এ নোবল, জর্জ্জ গিফেন, কিথ মিলার, আর আর লিণ্ডওয়াল এবং উইকেট-কিপার ডব্লিউ ওল্ডফিল্ড এবং ভারতবর্ষের পক্ষে ভিন্নু মানকাদ। এঁদের মধ্যে মানকাদই সবার থেকে কম ২৩টি টেষ্ট ম্যাচ খেলায় এ সম্মান লাভ করেন।

নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে তাঁর ৪টি টেষ্ট খেলার ফলাফল ধরে বর্ত্তমানে টেষ্ট খেলায় মানকাদের মোট রানসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,০০২ এবং উইকেট পাওয়ার মোট সংখ্যা ১৪৭। ফলে মানকাদ ইংলণ্ডের ডব্লিউ রোডস-এর রেকর্ডের সমান অংশীদার হ'লেন। রোডস (২,৩২৫ রান এবং ১২৭ উইকেট) এবং ভিন্নু মানকাদ (২,০০২ রান এবং ১৪৭ উইকেট) ছাড়া আর কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ২,০০০ রান করার এবং ১০০ উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করতে পারেন নি।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

তিনদিনের খেলায় বাংলা ৯ উইকেটে বিহারকে পরাজিত করে।

বিহার ঃ ৬০ (এস সোম ২৭ রানে ৫ উইকেট) ও **১৩৫** (ফাদকার ৫৫ রানে ৫ এবং সোম ২২ রানে ৪ উইঃ)

বাংলা ঃ **১৫৭ ও ৩৯** (১ উইকেটে ডিক্লে:)

অল্-ইণ্ডিয়া গল্‌ফ ঃ

মহিলাদের 'অল্-ইণ্ডিয়া গল্‌ফ চ্যাম্পিয়ানসীপ' প্রতিযোগিতায় মিসেস আর সি টেগার্ট ফাইনালে মিসেস সি এ বাক্সটনকে পরাজিত করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস ঃ

১৯৫৬ সালের বার্ষিক স্পোর্টসে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ৬৬ পয়েণ্ট (সম্ভাব্য ১৪১ পয়েণ্টের মধ্যে) পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র হরিচন্দ্র।

ইংলণ্ড-পাকিস্তান ক্রিকেট ঃ

লাহোরে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তান দলের ১ম বে-সরকারী টেষ্ট খেলা ড্র গেছে।

ইংলণ্ড ঃ ২০৪ (সুজাউদ্দিন ৩৩ রানে ৫ উইঃ ফজল মামুদ ৫৫ রানে ৩ উইঃ) ও **৩২২** (৭ উইকেটে। রিচার্ডসন ১০৩, টম্পকিন ৫৭ নট আউট)

পাকিস্তানঃ ৩৬৩ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ; হানিফ ১৪২, ওয়াকার হোসেন ৬২)

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২য় বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় পাকিস্তান এক ইনিংস এবং ১০ রানে ইংলণ্ডকে (এম সি সি 'এ' টীম) পরাজিত করেছে।

ইংলণ্ড ঃ ১৭২ (খান মহম্মদ ৮৪ রানে ৭ এবং ফজল মামুদ ৫১ রানে ৩ উইঃ) ও **১০৫** (রিচার্ডসন ৫৯। ফজল মামুদ ৪২ রানে ৫ এবং খান মহম্মদ ৫৫ রানে ৫ উইঃ)

পাকিস্তানঃ ২৮৭ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওয়াজির মহম্মদ ৮৬, কারদার ৬৮, হানিফ মহম্মদ ৫২। লক ৯০ রানে ৫ এবং মস্ ৮৯ রানে ৪ উইঃ)

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ঃ

এ বছরের ফাইনালে উপর্যুপরি গত তিন বছরের বিজয়ী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল ১ উইকেটে দিল্লী দলকে পরাজিত করে।

দিল্লী ঃ ১৭৬ ও ৪৩৩।

বোম্বাই ঃ ৩৪৭ ও ২৬৩ (৯ উইকেটে)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—নিউজিল্যাণ্ড টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ডার্বানে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যাণ্ড দলের প্রথম টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ৭১ রানে জয়ী হয়েছে।

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ৭৪ (রামাধীন ২৩ রানে ৬ উইকেট) ও **২০৮** (বার্ট সাটক্লিফ ৪৮, বেক ৬৬। রামাধীন ৫৮ রানে ৩ এবং স্মিথ ৪২ রানে ৩)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৩৫৩ (এভার্টন উইকস ১২৩, স্মিথ ৬৪)

ধ্যানচাঁদ এবং সি কে নাইডু সম্মানিত ঃ

১৯৫৬ সালে ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারতের রাষ্ট্রপতি যে সব বিশিষ্ট ভারতীয়গণকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্রীয় উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছেন তাঁদের মধ্যে দু'জন কীর্ত্তিমান খেলোয়াড় আছেন—একজন হ'লেন বিশ্বের হকি 'যাদুকর' নামে খ্যাত ধ্যানচাঁদ এবং অপরজন ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কর্ণেল সি কে নাইডু। এঁরা দু'জনেই 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেছেন। স্বাধীন ভারতে খেলাধূলায় ভারতীয় সুধীজনের দান এই সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় উপাধি দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করলো।

অলিম্পিক ও বিশ্ব আইস হকি ঃ

'উইণ্টার অলিম্পিক গেমস' প্রতিযোগিতায় রাশিয়া অলিম্পিক এবং বিশ্ব আইস হকি খেতাব লাভ করেছে। ২য় স্থান পেয়েছে আমেরিকা এবং ৩য় স্থান কানাডা।

শীতকালীন অলিম্পিক ক্রীড়া ঃ

ইটালীতে অনুষ্ঠিত সপ্তম শীতকালীন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর ৩২টি দেশ যোগদান করে। রাশিয়া এই প্রথম যোগদান ক'রে দল হিসাবে বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। রাশিয়া মোট ১৬টি (স্বর্ণ পদক ৭, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ৬) পদক লাভ ক'রে সব থেকে বেশী পদক পাওয়ার গৌরব লাভ করেছে। বে-সরকারীভাবে রাশিয়া ১০৩ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম হয়েছে।

সাহিত্য সংবাদ

হে মহাজীবন : অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বইখানি গল্পও নয় উপন্যাসও নয়, কিন্তু মনে হয় গল্প উপন্যাস অপেক্ষা কোনো অংশে বইটি কম চিত্তগ্রাহী নয়। পৃথিবীকে জানার আগ্রহ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে মানুষের। আজ পৃথিবীর একপ্রান্তে বসে অন্যপ্রান্তের অধিবাসীর সংবাদ জানতে মানুষ ব্যাকুল। দেশ বিদেশের শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চায়। শিক্ষার আলোক যতোই চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে মানুষের জানার স্পৃহা ততোই বেড়ে চলেছে। তাই আজ অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজন হয়েছে দেশে। পূর্বের তুলনায় অনুবাদ সাহিত্য তাই আজ প্রকাশও হ'চ্ছে বেশি। এবং এর সত্যকার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য।

আলোচ্য বইখানি ঠিক সে পর্যায়ের নয়। এ কোনো বিখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্যানুবাদও নয়। এর বিষয়বস্তু ভিন্ন। এতে আছে ওদেশের কয়েকজন সুবিখ্যাত মনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁদের অদ্ভুত কার্যক্রম। সক্রেটিস, দান্তে, টলস্টয়, চার্লস্ ডিকেন্স, রাফেল, বায়রন, বেঠোফেন প্রভৃতি সতেরো জন স্বনামধন্য পাশ্চাত্ত্য মহাপুরুষের কথা ও কাহিনী সন্নিবেশ করা হয়েছে গ্রন্থখানির মধ্যে। অত্যন্ত সংযম ও সতর্কতার সঙ্গে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখক অমরেন্দ্রবাবু ওই সব মহা-মনীষীর জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। অমরেন্দ্রবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত নন, পাঠকসমাজে এঁর পরিচিতি আছে। বহু গ্রন্থ ইনি রচনা করেছেন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রচনা করেছেন অমরেন্দ্রবাবু।

বইখানি সুধীসমাজের ও ছাত্রসমাজের সমাদর লাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদসজ্জা মনোরম।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩/১/১, কর্নওআলিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—৩৲ টাকা]

বি. না. চ.

সাতদিন : শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মূলতঃ ঔপন্যাসিক এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি সার্থকনামা। বহুকাল ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে তাঁহার খ্যাতি এবং সে খ্যাতি আজও অম্লান। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার যতগুলি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় তাঁহার ছোট গল্পের বই সংখ্যায় কম। সংখ্যায় কম হইলেও তাঁহার গল্পের চাহিদা কম নহে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঘটনার সংস্থাপন এবং চরিত্রবিকাশে যেমন তিনি সুদক্ষ, ছোট গল্প রচনায় তেমনই ছোটখাটো কথার মালা রচনা এবং স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি সার্থকতম শিল্পী। শুধু পরিবেশকে লইয়া যে গল্প তাহাও যেমন অনবদ্য, আবার শুধু চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া যে সৃষ্টি, তাহাও তেমনি মহিমাময়। ছোট গল্পের ইতিহাসে উপেন্দ্রনাথের 'বিভ্রম' এবং 'সারদামংগল' তাই শিল্প সুন্দর ব্যঞ্জনার চিরস্মরণীয় অবদান। 'সাতদিন' উপেন্দ্রনাথের আধুনিকতম গল্পগ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থে 'সাতদিন' 'সবুজ মাঠ', ''লালীর প্রেম', 'বেচুলাল', 'অভিনয়', 'রামের সুমতি', 'বন্যার জল', 'নূতন লেখক' ও 'প্রেরণা'—এই নয়টি গল্প স্থানলাভ করিয়াছে। গল্পগুলি তাহাদের স্বকীয়তায় ভাস্বর। 'সাতদিনের' মধ্যে একই নায়কের দুইটি চরিত্র ভূমিকায় অভিনয় কৌতুকপূর্ণ। 'সবুজ মাঠ' মনস্তত্ত্বমূলক। লালীর প্রেম একটি কুকুরের আখ্যান। 'বেচুলালে' একটি ছাগশিশুকে কেন্দ্র করিয়া মানব শিশুর প্রেমের কথা। অপরাপর গল্পগুলির মধ্যে রামের চরিত্র সম্ভাবনাময় চরিত্র সৃষ্টি। এ যুগের গল্পে যে জটিলতা, উপেন্দ্রনাথ তাহা হইতে মুক্ত এবং সংস্কার বর্জনই তাঁহার অসাধারণত্ব।

[প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—২॥০ আনা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা :

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক সংশোধিত ও বঙ্গভাষায় অনূদিত :

মুখবন্ধে ডক্টর চৌধুরী "এই গীতা-প্লাবিত বঙ্গদেশে আর একটি গীতার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করা কেন ?" এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—

(১) গীতার অনেক সংস্করণ আছে সত্যি, কিন্তু কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যুগে যুগে গীতাপ্রচার বিষয়ে ধারাবাহিক পর্যালোচনা আছে।

(২) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের মতানুসারে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। গীতার সম্প্রদায় নিরপেক্ষ অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল।

(৩) গীতার কত ভাষ্য, কত টীকা, কত অনুবাদ রয়েছে, তা অনেকেরই জানা নেই। এ তথ্য গীতা-সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধিৎসু মাত্রেরই জ্ঞাতব্য।

উপরোক্ত তিনটি অভাব সত্যিই গীতার অনুরক্ত পাঠকমাত্রেই অনুভব করে থাকবেন। ডাঃ চৌধুরীর এ সংস্করণে এ-অভাব পূর্ণ হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। প্রথমতঃ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ

তর্কসাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা, মহামহোপাধ্যায় শ্রীচিন্তস্বামী শাস্ত্রী, ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী, অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী, তারানাথ স্মায়তর্কতীর্থ, ডক্টর বিনোদবিহারী দত্ত ও ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর রচিত কর্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান্ গভীর পণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে পাঠকের অনেক জিজ্ঞাসা তৃপ্তিলাভ করবে। এ সম্বন্ধে এরও উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তিনি সে বিষয়েই আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীধরের টীকা অনুসরণ করায় এ সংস্করণের অনুবাদ সর্বসম্প্রদায়-গ্রাহ্য হবে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক পাঠকের চিন্তাধাকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি দান করবে।

তৃতীয়তঃ ডাঃ চৌধুরী রচিত "শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ভাষ্য ও টীকাকারগণ" শীর্ষক প্রবন্ধ গীতার অনুসন্ধিৎসু গবেষক মাত্রের কাছেই অমূল্য সম্পদ্। "শ্রেষ্ঠ টীকার, ভাষ্যকার প্রভৃতির মতাবলীর সার নিষ্কর্ষ" একত্রিত করে ডাঃ চৌধুরী এ সংস্করণটিকে এমন একটি অপূর্ব অভিনবত্ব দিয়েছেন, যার তুলনা অন্য কোন সংস্করণে মেলে না। তাই এ সংস্করণটির বিশেষ সমাদর হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

[প্রাচ্য বাণীমন্দির হইতে প্রকাশিত। ৩নং, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ৩৲ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বাণী ও বীণা : শ্রীরণেশ মুখোপাধ্যায়

উদীয়মান্ কবি শ্রীমান্ রণেশ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে পরিচয় ঘটেছে। আলোচ্য গ্রন্থে চব্বিশটী কবিতা মিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত হয়েছে। এগুলির ছন্দোমাধুর্য্য, ভাববৈচিত্র্য ও রসব্যঞ্জনা চিত্তাকর্ষক হওয়ায় কাব্যরসিক পাঠক-পাঠিকাদের কাছে 'বাণী ও বীণা' সমাদৃত হবে।

[বাণীবিতান, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র]

স্বপনবুড়োর শৈশব : স্বপনবুড়ো

ছেলেমেয়েদের পরম প্রিয় কবি ও কথাশিল্পী স্বপনবুড়োর শৈশব অবলম্বন করে আলোচ্য গ্রন্থখানির আবির্ভাব হয়েছে। গ্রন্থকারের বাল্যজীবন ঘটনাবহুল ও কৌতূহলোদ্দীপক। পদ্মাপারে ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার ভেতর সাকরাইল নামে একটি সবুজ ঘোম্‌টা ঢাকা খালবিলবহুল নীরব নিঝুম লাজুক গ্রামে এঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। নয়াবাড়ীর বিল, গাইজ্যাবাড়ীর খাল, ধানের ক্ষেত, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ, যাত্রা কথকতা প্রভৃতি এঁর কবি মনকে পুষ্ট করেছে। পাটা চুরির কাহিনী থেকে সুরু করে ছেলেবেলাকার বহু কাহিনী মনোরম ও উপভোগ্য। সাকরাইলের অভিজাত সমাজের উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত মুন্সী-বাড়ীর ছেলে কিভাবে মামার বাড়ীতে মানুষ হয়ে বাংলার শিল্প সাহিত্য কাব্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উত্তরকালে মুন্সিয়ানা দেখালেন তা ভাবলেও বিস্মিত হোতে হয়, তাই এঁর বাল্যজীবন জানবার দিকে সকলেরই আগ্রহ। নানা মজার গল্প আর নানা ঘটনার বিবরণী আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া গেছে। ছেলেমেয়েরা পড়ে খুব আমোদ পাবে। সুচিত্রিত সুন্দর প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

[প্রকাশক : ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। ৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩৲ টাকা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "উপনিবেশ" (১ম পর্ব—৪র্থ সং)—২৷৷৹

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "পতঙ্গ" (১ম পর্ব—২য় সং)—২৷৷৹

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রামের সুমতি" (২৮শ সং)—৷৷৵১০, "বিপ্রদাস" (১৫শ সং)—৪৲, "নিষ্কৃতি" (৩২শ সং)—১৷৷৹

শ্রীনীতিশকুমার বসু প্রণীত সমালোচনা-গ্রন্থ "মধুসূদন হইতে শ্রীমধুসূদন"—১৵৹

মানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-অনূদিত "দি লাইটহাউস এ্যাট দি এণ্ড অব্ দি ওয়ার্লড্"—১৷৷৹

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত "কর্ম্মজীবনে জ্যোতিষ"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—সতীন্দ্রনাথ লাহা এম-এ

প্রতীক্ষা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

প্রথম ব্যাখ্যান

(১)

১. গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের বিশেষ স্থান।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ গীতার অতিশয় প্রসিদ্ধ বিষয়। সেই প্রাচীন যুগ হতে আজ অবধি গীতার প্রায় অপর কোন অংশ এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। কারণও আছে। স্থিতপ্রজ্ঞ গীতার আদর্শ পুরুষ-বিশেষ। ঐ শব্দটিই গীতার নিজস্ব। গীতার পূর্ববর্তী গ্রন্থে তা পাওয়া যায় না। গীতার পরেকার গ্রন্থে খুব দেখা যায়। স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় গীতায় আদর্শ পুরুষের আরও বর্ণনা আছে। কর্মযোগী, জীবন্মুক্ত, যোগারূঢ়, ভগবদ্‌ভক্ত, গুণাতীত, জ্ঞাননিষ্ঠ ইত্যাদি নানা নামে নানা আদর্শ-চিত্র বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। কিন্তু এ সব আদর্শ অপর অনেকেও উপস্থিত করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন সাধনার আলোচনা প্রসঙ্গে এ সব আদর্শ গীতায় উপস্থিত করা হয়েছে। স্থিতপ্রজ্ঞ থেকে তাঁরা কিছু আলাদা পুরুষ, তা নয়। সে সব স্থিতপ্রজ্ঞেরই বিবিধ দিক। ঐ সবের বর্ণনায় প্রায় সর্বত্র স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ গীতা

শ্রীবিনোবা ভাবেজী বর্তমানকালে শুধু মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যের উত্তর-সাধক নহেন, ভাব প্রচারেও তাঁহার সর্বতোভাবে অনুগামী। গান্ধীজীর মতই তিনি গীতার মধ্য দিয়া সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত মারাঠী 'গীতা প্রবচন' শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। [ভাঃ সঃ]

গ্রথিত করেছে। যথা—পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাসী অথবা যোগী পুরুষের বর্ণনায় 'স্থির-বুদ্ধি' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্ত-লক্ষণের পরিসমাপ্তি 'স্থিরমতি' শব্দ দিয়ে করা হয়েছে। বুদ্ধির স্থিরতা লাভ না হলে কোন আদর্শই পুরা হয় না। তাই এ প্রকরণকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। জীবনমুক্তির সিদ্ধির প্রমাণ দিতে গিয়ে ভাষ্যকার * স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ উপস্থিত করেছেন। সাধকের দৃষ্টিতে অন্তিম আদর্শের, ধৈর্য্যমূর্তির ইহাই একমাত্র সবিস্তার আলোচনা।

২. পূর্ব ভূমিকা—সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বুঝতে হলে তার আগেকার ভূমিকা বিচার করে দেখা আবশ্যক। এ প্রকরণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তে অবস্থিত। এর আগে দু' বিষয়ের বিচার করা হয়েছে—(১) সাংখ্য-বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান কিংবা ব্রহ্মবিদ্যা-শাস্ত্র আর (২) যোগবুদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অনুযায়ী জীবনকলা। শাস্ত্র ও কলার সংযোগে ব্রহ্মবিদ্যা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। যে কোন বিদ্যা সম্পর্কে এ কথা খাটে। সঙ্গীত-বিদ্যার কথা ধরুন। সঙ্গীত-শাস্ত্র কেউ শিখেছে, কিন্তু কণ্ঠ থেকে সঙ্গীত ব্যঞ্জনার কলা যদি না সেধে থাকে ত সে সঙ্গীত কোন কাজে আসবে? এর উল্টো, কণ্ঠে কলা আছে কিন্তু শাস্ত্র-জ্ঞান নেই। সে স্থলে প্রগতির পথ রুদ্ধ। অধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধে ঐ কথা, বস্, মনুষ্য জীবন সম্বন্ধেও। মানুষের তত্ত্বজ্ঞান তার বুদ্ধিতে গুপ্ত থাকবে। প্রকাশ পাবে তার আচরণ। আচরণ থেকে তার তত্ত্বজ্ঞানের পরিমাপ সংসার পাবে আর সে নিজেও পাবে। আচরণ ও জ্ঞানে ব্যবধান থাক কিন্তু বিরোধ যেন কোন মতেই না থাকে। আর ব্যবধানও সতত ঘুচাতে হবে। এ কাজ যোগবুদ্ধির। তুলসীদাস সাধুদের তুলনা করেছেন ত্রিবেণীর সঙ্গে। ভক্তিকে বলেছেন গঙ্গা, আর কর্মযোগকে যমুনা, আর ব্রহ্মবিদ্যার তুলনা করেছেন গুপ্ত সরস্বতীর সঙ্গে। ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপতঃ সদা অপ্রকটই থাকবে, উপমাতে একথাই তিনি বলেছেন। যোগবুদ্ধি তাকে প্রকট করবে। সাধককে প্রত্যক্ষ পথপ্রদর্শন করে যোগবুদ্ধি। সাংখ্যবুদ্ধি যোগবুদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ। ভিত্তি বই ঘর তৈরি হয় না, ঘর ছাড়া ভিত্তি অকেজো। দেশলাইতে আগুন অব্যক্তরূপে থাকে। কাঠি ঘষেছেন তো ব্যক্ত হয়। অব্যক্ত বিজলীর কার্য, সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাছেই মাত্র ধরা পড়ে। ব্যক্ত হলে তার শক্তির পরিচয় যে কেউ পায়। সাংখ্য-বুদ্ধি ও যোগ-বুদ্ধির পারস্পরিক সম্বন্ধ এরূপই বটে।

৩. যোগ-বুদ্ধির অন্তিম গন্তব্য—স্থির সমাধি অর্থাৎ স্থিত-প্রজ্ঞতা।

যোগ-বুদ্ধির প্রথম স্বরূপ কর্তব্য-নিশ্চয়। কর্তব্য নিশ্চয় না হলে সাধনা আরম্ভ হয় না। নিশ্চয়ের পরে একাগ্রতা অর্থাৎ সাধনায় তন্ময়তা। দ্বিতীয় ধাপে আসে ফলের দিকে না তাকিয়ে সাধনায় ডুবে যাওয়ার বৃত্তি, সাধনৈকশরণতা, কিংবা সাধন-নিষ্ঠা। এর পরের ধাপ হচ্ছে চিত্তের নির্বিকার দশা অথবা সমতা অর্থাৎ সমাধি। তা যখন স্থির হয়, অচল হয়, কোন ধাক্কাতেই টলে না তখন স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থা লাভ হয়। যে বিকার মাত্রের, বিচার মাত্রের, এমন কি বেদবচনের প্রভাবেরও উর্দ্ধে উঠেছে, যার সমাধি অচল হয়েছে, স্থির হয়েছে সে স্থিতপ্রজ্ঞ। যোগ-বুদ্ধি এভাবে চার ধাপে বিভক্ত—(১) সাধন-নিশ্চয়, (২) ফল-নিরপেক্ষ একাগ্রতা, (৩) সমতা বা সমাধি ও (৪) স্থির সমাধি—অখণ্ড, নিশ্চল, সহজ। তাহাই স্থিত-প্রজ্ঞাবস্থা।

৪. তদ্‌বিষয়ক জিজ্ঞাসা।

যোগ-বুদ্ধির অন্তিম পরিপাক সমাধিতে, স্থিতপ্রজ্ঞতায়—ভগবানের এ বিশ্লেষণ থেকে অর্জুন প্রশ্নবীজ পেলেন। অর্থাৎ সেই সব শব্দ ধরেই, সমাধিতে স্থির-নিশ্চল স্থিতপ্রজ্ঞ কিভাবে থাকেন, তাহা জানার জন্য অর্জুন প্রশ্ন করলেন। এরূপ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? সে কিভাবে বলে, কি-ভাবে থাকে, কিভাবে চলে, এ সব আমায় বলুন, একথা তিনি বললেন। তার উত্তরে ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করেছেন। আর তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

(২)

৫. সমাধি দ্বিবিধ: বৃত্তিরূপ ও স্থিতিরূপ।

ভগবানের বক্তব্য বিবেচনা করার আগে এখানে সমাধি শব্দটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে। কারণ, শব্দটি

* শংকরাচার্য

বড়ই গোলমেলে। সমাধি মানে ধ্যান-সমাধি, সাধারণতঃ এরূপ অর্থ করা হয়। অমুকে সমাধিতে আছে—এর মানে যদি এ হয় যে—চিন্তা ত সে করছেই, তা বাদে অন্য কোন সংবেদনা তার নেই, তবে সমাধিস্থ পুরুষ কিভাবে বলে, কিভাবে চলে—অর্জুনের এ প্রশ্ন নিরাধার হয়ে যায়! এই অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে কোন কোন টীকাকার স্থিতপ্রজ্ঞ-দশাকে দু' ভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) স্থিত-প্রজ্ঞ সমাধিকালে কিভাবে চলেন আর সমাধি ভিন্ন অন্য সময়েই বা কিভাবে চলেন, এরূপ দুই ভাগে ভাগ করে দেখেছেন। কল্পনার চাতুর্য এ বিশ্লেষণে আছে। কিন্তু বিচার-দোষও আছে। গীতা-প্রতিবাদিত এ স্থানে উক্ত সমাধি যে প্রকারে ভিন্ন সে কথাটা হিসাব করা হয় নি। যে সমাধি লাগে ও ভাঙ্গে তাহা ধ্যান-সমাধি। স্থিত-প্রজ্ঞের সমাধি তাহা থেকে ভিন্ন। তাহা জ্ঞান-সমাধি। তাহা লাগেও না, ভাঙ্গেও না। "নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি" এই কথায় তার বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাহা স্থিতি। বৃত্তি নয়। ধ্যান-সমাধি বৃত্তি। চার চার দিন টিকলেও তা ভাঙ্গবে এ আশা আছে। এ সমাধি তদ্রূপ নয়।

৬. স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি বৃত্তি নয়।

স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি বৃত্তি নয়। তাহা নিবৃত্তি। নিবৃত্তি শব্দে লোকে আঁতকে ওঠে। তারা বলে, "এ ত চুপচাপ বসে যাওয়া"। কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। মৌন বসা সেও এক বৃত্তিই বটে। স্থিতপ্রজ্ঞে এ বৃত্তি নেই। তার মানে এ নয় যে সে ধ্যান করবে না। সেবা কার্যের জন্য চিন্তন দরকার হলে অথবা অবসর মত কিছু কাল ধ্যানাদি করবে। কিন্তু তাহা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নয়। স্থির-বুদ্ধি তার লক্ষণ। কর্মযোগ যেমন এক আবশ্যক সাধন, ধ্যানও তেমন আবশ্যক সাধন। কিন্তু কর্মযোগেরই মত ধ্যানও স্থিত-প্রজ্ঞের স্থিতি নহে।

৭. এ বিষয়ে গীতা ও যোগ-সূত্র এক মত।

পাতঞ্জলির যোগ-শাস্ত্রের কারণে সমাধি শব্দের অর্থ ধ্যান-সমাধি বলে গণ্য হয়ে গেছে। কিন্তু পাতঞ্জলি ধ্যান-সমাধিকে অন্তিম স্থিতি বলেন নাই। পাতঞ্জলি-সূত্র সুব্যবস্থিত ও অনুভবসিদ্ধ শাস্ত্র। ১৯৫ সূত্র তাতে আছে। প্রথম তিন সূত্র সারভূত। ব্রহ্ম-সূত্রে যেমন চতুঃসূত্রী, যোগ-সূত্রে তেমন এই ত্রিসূত্রী: (১) অথ যোগানুশাসনম্ (২) যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ (৩) তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্) এই তিন সূত্রে সারা শাস্ত্র গুটিকয়েক কথায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এতে সমাধির ত নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। প্রাপ্তব্য হচ্ছে যোগ আর চিত্তবৃত্তি-নিরোধ তার ব্যাখ্যা। সমাধি অর্থাৎ ধ্যান-সমাধিও এক বৃত্তিই বটে। তাই তার উপযোগকে বৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ লাভের পক্ষে পাতঞ্জলি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলে গণ্য করেছেন। 'শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা-পূর্বকঃ' যোগারোহণের এই ধাপ তিনি নির্দেশ করেছেন। প্রথমে শ্রদ্ধা, তা থেকে উৎসাহ, তৎপূর্বক স্মৃতি অর্থাৎ আত্মস্মরণ, তৎপরিপাক তন্ময়তারূপ ধ্যান-সমাধি, তা হতে প্রজ্ঞা—আর প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে ত হল যোগ। এই ধাপ পরম্পরায় যোগলাভ হয় একথা তিনি স্পষ্ট বলেছেন। অর্থাৎ যোগপ্রাপ্তির পক্ষে সমাধির পরে প্রজ্ঞার কথা তিনি বলেছেন। এই প্রজ্ঞা শব্দ গীতা থেকেই পতঞ্জলি নিয়েছেন। অর্জুনের প্রশ্নের ঠিক পূর্ব শ্লোকে ভগবান বলছেন যে তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিতে অচল হবে তখন তোমার যোগ-প্রাপ্তি ঘটবে। যোগ-ই পাতঞ্জলির অন্তিম শব্দ। তার সাধন প্রজ্ঞা আর প্রজ্ঞা-লাভের সাধন সমাধি একথা তিনি বলেছেন। সমাধির ধ্যান-স্বরূপ চলে গিয়ে তাতে অনুক্ষণের সহজ স্থিতির স্বরূপ আসে। এ-ভাবে পাতঞ্জলির সূত্রে ও গীতার বিশ্লেষণে সমন্বয় রয়েছে।

(৩)

৮. 'স্থিত' প্রজ্ঞে কম্প নাই, বক্রতা নাই।

স্থিতপ্রজ্ঞের কল্পনায় বুদ্ধিবাদের পরাকাষ্ঠা হয়েছে। বুদ্ধি, শুদ্ধবুদ্ধি বোধের সাধন বলে গণ্য হয়েছে। রাগ-দ্বেষাদি বিকার হতে অলিপ্ত বুদ্ধিই কেবল জ্ঞানের যথার্থ সাধন হতে পারে। আমরা বলে থাকি অমুক কথা আমার বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। গীতা বলে, 'আমার বুদ্ধি' বলো না। 'আমার' বিশেষণ ফেলে দিয়ে স্রেফ শুদ্ধ বুদ্ধি কি বলে তা দেখ। আমিত্বে অহংকার আছে বিকার আছে। সংসারের গোলামী আছে, পরিস্থিতির বন্ধন আছে। তুমি 'মদ্-

বুদ্ধিবাদী' কি বুদ্ধিবাদী ? বুদ্ধি যখন বিকার রহিত হয়, সব ঝঞ্ঝাট হতে আলগোছ হয় তখন তা স্থিত হয়। স্থিত হয় মানে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। হেলে না, দোলে না। কম্প তাতে থাকে না। 'সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে,' তার নিষকম্প যোগ লাভ হয়, পরে দশম অধ্যায়ে এরূপ যে বলা হয়েছে, তার অর্থ এই। বুদ্ধিতে কম্পের বা হেলা-দোলার, ইতস্ততের, অসোয়াস্তির, অনিশ্চয়তার লেশও যেন না থাকে। তবেই সে বুদ্ধি কাজ দেবে, আর তবেই তাকে বুদ্ধি বলা যাবে। স্থিত শব্দের অপর অর্থ সরল। বুদ্ধি একেবারে সরল হওয়া চাই। তাতে লেশমাত্র বক্রতাও থাকবে না। চরকার টেকোর কথা ধরুন। এতটুকু বাঁকা হলে মিহি সুতা কাটা যায় না। একদম সিধা, সরল হলেই তা কাজ দেয়। বুদ্ধি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। চরকার সরল টেকো স্থিতপ্রজ্ঞের বুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপমা। সরল টেকোকে ইংরেজিতে ট্রু বলা হয়। শব্দটিতে অতীব বিশেষত্ব আছে। বক্রতার লেশও নেই এমন টেকোকে ট্রু অর্থাৎ অচুক বলা হয়। তদ্রূপ, বুদ্ধি ট্রু অর্থাৎ অচুক হওয়া চাই।

৯. কম্প ও বক্রতার আরও বিশ্লেষণ।

কম্প ও বক্রতা এ দুই দোষের পার্থক্য একটু দেখে নেয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ এ দুইয়ে মিলে একই দোষ। চরকার টেকো হতে একথা বোঝা যাবে। যে টেকো টেরা তা কাঁপে। বুদ্ধি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। সরল সিধা বুদ্ধি কখনও কাঁপে না। এ দৃষ্টিতে কম্প ও বক্রতা একরূপ হল, তবু বিচারের দৃষ্টিতে এ দুইয়ের অর্থ পৃথক পৃথক ভাবে দেখে নেয়া ভাল। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন ত দেখা যাবে যে কম্প মুখ্যতঃ বুদ্ধির দোষ, আর বক্রতা মনের দোষ। এক দিক থেকে মন বুদ্ধিরই অংশ। তা হলেও বিচারকালে তাকে বুদ্ধি থেকে আলাদা করে নিতে হয়। শিশুদের মন একদম সরল। তাই ঝট্ করে তারা জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে। তাই জ্ঞান-দৃষ্টির দিক থেকে ঋজুতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গুণ মনে করতে হবে। ঋজুতা ছাড়া নিশ্চিত ও নিষ্কম্প জ্ঞান লাভ হওয়ার নয়। অর্জুন শব্দের অর্থই আসলে 'ঋজুবুদ্ধিসম্পন্ন।'

১০. বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় ভেদ।

গীতার প্রজ্ঞা শব্দ বিশেষ অর্থের দ্যোতক। বুদ্ধি শব্দ সাধারণ। মনোবিকার অনুসারে বুদ্ধি বদলায়! মানুষের মানসিক কল্পনার ছোপে বুদ্ধি ছুপিয়ে যায়। এই রঙীণ বুদ্ধি নির্ভুল নির্ণয় দিতে অসমর্থ। যে বুদ্ধি বিবিধ চিন্তার, বিকারের, পছন্দ-না পছন্দের বৃত্তির রঙে ছোপিয়ে যায় না, যে বুদ্ধি কেবল জ্ঞানের কার্য করে তাহা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা তটস্থ। বুদ্ধিতে রঙের ছোপ লাগে ত এক বুদ্ধি অনেক বুদ্ধি হয়ে যায়। দয়ার ছোপ লাগে ত দয়াবুদ্ধি, দ্বেষের ছোপ ত দ্বেষবুদ্ধি। এরূপ বহু বুদ্ধি মানুষকে বহু দিকে টলাতে থাকে, হয়রাণ করতে, ব্যাকুল করতে, দিশেহারা করতে থাকে। এরূপ হাজার বুদ্ধি পথপ্রদর্শক করতে অক্ষম। শুদ্ধ বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞাই অভ্রান্ত নির্ণয় দেয়। কারণ, তার নিজের কোন রঙ নেই। তা থারমোমিটরের মত। থারমোমিটরের নিজের জ্বর হয় না। তাই অঙ্গের তাপ তা মাপতে পারে।

১১. শরীর-শক্তি হতে বুদ্ধিশক্তির বিশেষতা।

বুদ্ধি কারো কম, কারো বেশী, এর কোন গুরুত্ব নেই। গুরুত্ব স্বচ্ছ বুদ্ধির। হোক না আগুনের ফুলকি ক্ষুদ্র, তবু তা কার্যকরী হতে পারে। রাশীকৃত তুলা তা ভস্মসাৎ করতে পারে। তদ্বিপরীত, মস্ত বড় কয়লার ডেলা রাখুন, তা তুলায় বসে যাবে। প্রশ্ন কমবেশী বুদ্ধির নয়। শুদ্ধ বুদ্ধির এক ছোট ফুলকি, ক্ষুদ্র এক শিখা, বস্, পর্যাপ্ত ইহাই বুদ্ধির শক্তির বিশেষত্ব। শারীরিক শক্তির তদ্রূপ নয়। কোন ছিপছিপে পালোয়ান এ জন্মে গামা হতে পারবে কি পারবে না সে বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে। অল্প বুদ্ধি কোন কোন লোকের পক্ষে দেশশাসনের উপযোগী নেতৃত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু নেহাত অল্প বুদ্ধি ও অশিক্ষিত মানুষেও এ জন্মে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার শক্তি নিঃসন্দেহ আছে। তার জন্য গাঁটরি-ভর বুদ্ধির দরকার নেই। দিগ্‌গজ বুদ্ধি জগতে যদৃচ্ছ যত মস্ত কাজ আর ওলট-পালট করুক না কেন, কিন্তু ত্রিভুবন ভস্মসাৎ করার সামর্থ্য কেবল প্রজ্ঞার স্ফুলিঙ্গেরই আছে।

২৭

কেষ্টর মা বললে, দিদি—একটা কথা বলব—রাগ করবে না তো ?

রাগ করব কেন ভাই ! বল।

তা জানি—রাগ করবার মানুষ তুমি নও। তবু মিত্তির বউয়ের সঙ্গে বলাবলি করছিলাম—এত যে কাণ্ড চলছে দিদি কেউ কিছুই জানে না ? মিত্তির বউ বললে – জানে বৈকি—না জানলে কখনো···। আমি বললাম, কখনো জানে না দিদি···। কেষ্টর মা আর একটু সরে এসে গলা নামিয়ে বললে, কমলার কথাই বলছি—গান শিখছে শিখুক—অত হাসি ইয়ারকি কেন ! সুধীন তো আর মায়ের পেটের ভাই নয়—

ভগবতী বললেন, কি করব ভাই ? শহরের সব মেয়েই দেখি গান শেখে—ছবি দেখে—

কই আমাদের মেয়েরা তো পারে না ! অবিশ্যি ছবি দেখে। তা বাপ-মা ভাই-বোনদের সঙ্গে বসে ছবি দেখলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধু হয়ে যায় না। কিন্তু সিনেমায় খারাপ মেয়েছেলের সঙ্গে মেলামেশা করা যাদের অভ্যাস—তাদের চরিত্তির কেউ যদি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে দিব্যি গেলে বলে ভাল—ত আমি বিশ্বেস করি নে। যার তার সঙ্গে কমলাকে মিশতে দিও না দিদি। একটু থেমে বললে, শুনলাম—মাঝে মাঝে নাকি ওদের সঙ্গে গাড়ী চেপে বেড়াতে যায় ? ছবি তোলাতে যায় না তো ?

পাথরের মূর্ত্তির মত বসে রইলেন ভগবতী। ও ঘর থেকে তখন কমলার গলা ভেসে আসছে।

এই করেছ ভাল নিঠুর—এই করেছ ভাল।

আশ্চর্য্য কণ্ঠ আর আশ্চর্য্য সুর ! মনের মাঝেকার জমানো দুঃখকে চোখের জলে গলিয়ে নামিয়ে দিতে চায়। সেদিন যখন গাইলে :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে
সকল অহঙ্কার, হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

তখন এ ঘরে নারায়ণের সম্মুখে বসে তিনিও দরবিগলিত ধারায় অশ্রুমোচন করেছিলেন। সে অশ্রু উত্তপ্ত নয়—শীতল। অমরনাথ যেন একদিন বলেছিলেন, অশ্রু আছে তিন প্রকার। শোকাশ্রু, আনন্দাশ্রু আর প্রেমাশ্রু। দারুণ শোকে মানুষের চোখ দিয়ে যে জল বার হয়—হাত দিয়ে স্পর্শ করলে বুঝবে তা উষ্ণ। আনন্দে যে অশ্রু ঝরে—তার স্পর্শ শীতল। আর ভগবানের অর্পিত চিত্তের ভালবাসা সঞ্জাত অশ্রু হল—নাতি-শীতোষ্ণ অর্থাৎ ঠাণ্ডাও নয়—গরমও নয়। কমলার গান শুনলে আনন্দ হয় মনে—কেমন করে নিষেধ করবেন মেয়েকে—এই গান শেখা ভাল নয়। কেমন করে বলবেন—এই ঘরের গণ্ডী ছেড়ে কোথাও যেও না তুমি। না হাসি—না খেলা—না সমবয়সীর সঙ্গে মেলামেশা, দিনরাত সংসারের কাজের বোঝা বয়ে বয়ে মেয়ে যে শুকিয়ে যাবে ? জানেন—শহরের আবহাওয়া ভাল নয়—কিন্তু নিষেধের দেয়াল তুলে ওকে শাসন করার নিষ্ঠুরতাও তিনি সঞ্চয় করতে পারেন নি। তারই ফলে মঞ্জুর সঙ্গে কয়েক দিন বাইরে গেছে কমলা।

কোনদিন এসে বলেছে, মা চমৎকার ছবি দেখে এলাম। কোনদিন বা বলেছে, আজ শহরের অনেক জিনিস দেখলাম মা। কেল্লা—মনুমেণ্ট, কত সুন্দর সুন্দর বাড়া—চিড়িয়াখানা—যাদুঘর। মেয়ের চোখের আনন্দ তাঁকেও তৃপ্তি দিয়েছে। আহা—দেখুক, আনন্দ পাক। উনি বলতেন—পৃথিবী-সৃষ্টির মূলেই রয়েছে আনন্দ।

একদিন সৃষ্টিকর্ত্তার আনন্দ হয়েছিল অত্যন্ত—যার ফলে আরম্ভ হল সৃষ্টির কাজ। সেই আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে আজও—পৃথিবী তাতেই রয়েছে বেঁচে। আর পৃথিবী একদিন শেষ হয়ে যাবে এই আনন্দের মাঝখানেই।

কমলাকে নিষেধ করতে পারেন নি তিনি।

অথচ মনের আর একটা দিক মাঝে মাঝে এই আনন্দ সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। পাঁচজনে যা বলে—তা যেন তাঁরই মনের প্রতিধ্বনি। যে আনন্দে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে—এই আনন্দ কি সেই জাতীয়? নীতি-শিথিল লঘুহাস্য-পরিহাস নিশ্চয়ই সে জাতের নয়। আজ বেশী করে মনে পড়ছে অমরনাথের কথা। যথাকালে কন্যাকে পাত্রস্থা করা পিতামাতার কর্ত্তব্য। কন্যা পণ্য নয় যে এভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে তাকে দিয়ে মনোহরণের অভিনয় করাতে হবে।

কমলা এলে তাকে এই কথাই বললেন।

কমলা বললে, মা—আগেকার কালেও এই ব্যবস্থা ছিল। লেখাপড়া শেখার সঙ্গে নাচ গান—আল্‌পনা দেওয়া, ছবি আঁকা এসব করতেন সেকালের মেয়েরা।

কই আমি তো শুনিনি।

সেকি—তাহলে ইন্দ্রের রাজসভায় বেহুলা কি করে নাচলেন? সাবিত্রী যদি বিদুষী না হবেন তো যমরাজকে কথার ছলে কেমন করে হারিয়ে দিলেন? তুমি তো কতবার বলেছ মৈত্রেয়ীর কথা। সরস্বতী আমাদের গানের দেবী—তিনিও তো দেবতা।

ভগবতী যত না আশ্চর্য্য হন ওর যুক্তিতে—তত বিস্ময় বাড়ে ওর কথা বলার ধরণে। কেমন গুছিয়ে কথা বলে কমলা। ওর ভীরুতা, কুণো লাজুক স্বভাব, সাজ-পোষাকের জড়তা—সবই ঘুচে গেছে। অত্যন্ত সপ্রতিভ হয়ে কথা বলে—কুঁচিয়ে কাপড়ও পরে চমৎকার—লোকের সঙ্গে ব্যবহার—তার মধ্যেও শহরের ছাপ পড়েছে। ফুল যেন এলোমেলো গাছের ডাল থেকে—মালীর বাঁধা তোড়াতে স্থান পেয়েছে।

কমলা ভাল কাপড় পরে মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

কোথাও বেরুবি তো?

হাঁ—বউদি ~~বলছেন~~—মার্কেটে ঘুরে আসি চল। কিছু ফুল কিনবেন।

তা আজ আর নাই বা গেলি। ক্ষীণ আপত্তি তোলেন ভগবতী। আজ আমার শরীরটা কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে—এবেলার রান্না—

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ঘুরে আসছি। তুমি শুয়ে থাক মা, আমি এসে রান্না করে নেব।

ইচ্ছে করছে—একটু মহাভারত শুনি। আপত্তির স্বরে খানিকটা অনুনয় মিশল।

বেশ তো, সন্ধ্যের পর শান্তিপর্ব্ব থেকে খানিকটা পড়ে তোমায় শোনাব।

আর আপত্তি তুলবেন তেমন জোর ভগবতীর কণ্ঠে রইল না। কি হবে আপত্তি তুলে—তা খণ্ডনের দশটা যুক্তি রয়েছে যখন। বললেন, সন্ধ্যের আগেই ফেরা চাই কিন্তু!

সন্ধ্যের অনেক আগে ফিরে আসব—দেখো। কমলা দ্রুতপদে চলে গেল।

মা দিদিকে বল না—আমাদের একদিন মোটর চড়াতে। একদিনও মোটর চড়তে পাই নে আমরা। মিণ্ট আব্দারের ভঙ্গিতে বললে।

বলব—এখন খেলা করগে লক্ষ্মী ছেলের মত।

আচ্ছা মা—দাদা বুঝি আর পড়বে না?

কে বললে? চমকে উঠলেন ভগবতী।

ওরাই তো বলছিল—কেষ্টদার মা—আর শানুদা, বিভুদা। বলছিল—চাকরি পেয়ে গেলে পড়া-শোনার কি দরকার—দাদা তো টাকা রোজগার করছে।

ওসব কথা আলোচনা করতে নেই তোমাদের। তোমরা ছাত্র—শুধু পড়াশোনা করে যাবে।

হাঁ মা, অনেকদিন তো দেশে যাওনি—যাবে?

যাব।

কবে যাবে মা?

ছেলের আগ্রহ ভগবতীর মনেও সঞ্চারিত হল। সত্যই কবে যে ফিরবেন দেশে! সেই দেশ—বনজঙ্গল গাছ-পালায় ঢাকা, বর্ষায় কাদা-পিছল পথে পা টিপে টিপে পুকুরঘাটে যাওয়া, পা টিপে টিপে কলসী ভরে জল আনা। সন্ধ্যা রাত্রিতে জলজলে তারাটা পূব আকাশে জলে—শেষ রাত্রিতে সেই তারাটাই পশ্চিমের আকাশে ছল ছল করে ওঠে।

গাছপালায় শিশির ঝরে টুপ্ টুপ্ করে—প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে—দূর থেকে ভেসে আসে কালপেঁচার হুংকার। ভোরের হাওয়া পেয়ে মোরগ ডাকে—কোঁকড়-কোঁ—ফরসা হল—বউ ওঠ। গ্রীষ্মকালের সকালে দোয়েল শিস দেয়—দুপুরে শালিকে কাকে ঝগড়া বাধে এঁটো বাসনের উপর। সকাল হলেই—এ-ও-সে অনেকে আসে। খবর নেয়। সবাইকে কেমন আপন বলে মনে হয়। আজ সকলের জন্যই মন টানছে। আমডালে বসে যে হাঁড়িচাঁচা পাখীটা নিত্য ঠোঁট ঘসে আর কুক্ কুক্ শব্দ করে ডাকে তার জন্যও। পৌষের শীতের রাত্রিতে ঢেঁকির পাড় পড়ে দমাদ্দম—দমাদ্দম। কারা চিঁড়ে কুটতে থাকে।

দত্তদের গরুটা বেড়ার ধারে এসে তার বাছুরকে ডাকে—হাম্বা—

গ্রাম বলতে এরা সবাই—এই চেতন অচেতন পদার্থ—এই শব্দ—বৈচিত্র্য—এই আলো-ছায়া-ভরা নিঃশব্দ প্রকৃতি রূপে-রসে-শব্দে মেশানো সচেতন প্রকৃতি।

সন্তুকে বললেন, হাঁরে—দেশের ঘরখানা আছে, না ভূঁইসার হয়ে গেছে?

জানি না তো।

চিঠি লেখ তোর কাকাকে। আমি দিনকতকের জন্য ওখানে গিয়ে থাকব।

আচ্ছা।

পরীক্ষার তাড়া আছে—সন্তু সবদিন সময়মত নারায়ণের পূজা করতে পারে না। কোন কোনদিন বা ভুলে ইস্কুলে চলে যায়। ভগবতী ফাঁপরে পড়েন। কেষ্টর মাকে, কখনো বা পুরুত-গিন্নীকে অনুনয় করেন, দিদি—একবার বটঠাকুরকে বল না—নারায়ণের মাথায় তুলসী চন্দন দিয়ে যাবেন। সন্তু আজ ভুলে গেছে।

একদিন পুরুত-গিন্নী বললেন, রোজ রোজই ভুল হয় তোমার খোকার—তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন? ওনাকে বলে পূজোর একটা বন্দোবস্ত করে নাও। বেশী কি দেবে—একসঙ্গে এতদিন আছ—আপনার লোকের মত তোমরা—পাঁচটি করে টাকা মাসে মাসে দিও।

ভগবতী বলিলেন, জানই তো দিদি—মাথার ওপর রোজগারের মানুষ নেই—কোন রকমে দিন চলে—

পুরুত-গিন্নী বললেন, ওমা,—সে কি কথা! তবে যে শুনি সনাও রোজগার করছে—কি ছাই বায়স্কোপের ছবি তোলায়, মোটা টাকা কামায়।

ভগবতীর কর্ণমূল আরক্ত হয়ে ওঠে। অধোমুখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমাদের আশীর্ব্বাদে সেইদিন আসুক আমার—আমি নারায়ণকে রূপোর সিংহাসন গড়িয়ে দেব।

সনা তবে নতুন ভাড়াটেদের গাড়ী চেপে কোথায় যেত?

দিনকতক ঝোঁক হয়েছিল—ছবি তুলবে। তা সে ঝোঁক কেটে গেছে।

কেটে গেলেই ভাল! পুরুত-গিন্নী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন। ওনারা বলেন—বয়াটে ছেলে মেয়েরাই নাকি ঐসব করে। নাচ গান এ্যাক্টো ওকি ভদ্দর লোকের কাজ!···তাহলে শোন ভাই—ওনাকে ধরা-পড়া করে যাতে তিন টাকায় হয় করে দেব'খন।

সন্তু সব শুনে বললে, তাই ঠিক করে ফেল মা—ও তিন টাকা ছেলে পড়িয়ে আমি দিয়ে দেব।

ভগবতী বললেন, কুলদেবতার পূজো—এক জন্ম মৃত্যুর অশৌচ ছাড়া—অন্য লোকে করেনি। শুনেছি—তোর প্রপিতামহ কেদার-বদরী গিয়েছিলেন যেবার—সেইবার এক সাধু এই শালগ্রাম শিলা দিয়ে বলেছিলেন—নিজের হাতে সেবা পূজো করবি বেটা—তোর উন্নতি হবে।··· আমরা যখন বাসায় আসি—আমি বলেছিলাম নারায়ণকে গুরুর বাড়ী রেখে এস—বছরে কিছু টাকা প্রণামী দিও তাঁকে। উনি বলেছিলেন, দায়-সারা পূজো করবার জন্য ঠাকুরদা মশায় দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন নি—বংশের লোকের সেবা যাতে পান ঠাকুর—সেই উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল।

সন্তু বললে, এখন ঠাকুর পূজো করতে গেলে—আমার যে পড়ার ক্ষতি হবে। বড় হয়ে আমিও ঠাকুর সেবা করব—মা।

তোর ঠাকুরদা মশায়—দশ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। ন' বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়—সেই থেকে নিজের হাতে ঠাকুরের সেবা-পূজো করে এসেছেন। এই ঠাকুরের মায়াতেই ভিটে ছেড়ে কোন দিন বাইরে বেরুতে পারলেন না।

ঠাকুরদা মশায় তো চাকরি করতেন না। তখন শস্তার

বাজার ছিল—শুনেছি দু' টাকা ছিল চালের মণ। সত্যি মা?

হাঁ—যুদ্ধের আগে আমরাই দেখেছি—তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা মণ চাল। দু' টাকা জোড়া কাপড়। সে সব দিন আর ফিরবে না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভগবতী উঠে যান।

সন্ধ্যাবেলায় ভট্টাচার্য্য মশায় মুড়কি বাতাসা জলপান শীতল দিতে এলেন। বললেন, বউমা—ঠাকুর দেবতায় ভক্তি রেখো—পৃথিবীতে পারের কড়ি যোগাড় না করলে মাঝি নৌকা নিয়ে আসেন না পার করতে। বিষ্ণুর সেবা করা প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য। উনিই তো—সকলকার পালনকর্ত্তা, ওঁকে প্রসন্ন না করলে—জীব প্রতিপালিত হবে কেমন করে!

ভগবতী চুপ করে রইলেন। মনে খটকা লাগল—এ কেমন কথা হ'ল? এতদিন তো শুনে এসেছেন এর বিপরীত কথা। পালন কর্ত্তা—পূজা পাবার লোভে জীবকুলকে পরিপোষণ করেন না। তিনি যে অহেতুক—কৃপাসিন্ধু, তিনরূপে লীলা তাঁর। তিনি সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করেন তিনরূপে। কামনারূপ নাভিমণ্ডল থেকে উদ্ভূত হয়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মা করেন জীবসৃষ্টি। ঐ কমণ্ডলু মধ্যে—সৃষ্টি-বীজ নিহিত রয়েছে। তিনি পরম আনন্দে সৃষ্টি করে চলেছেন—বহু রূপ, বিচিত্র জীবন—বৈচিত্র্য ভরা প্রকৃতি। সৃষ্টি প্রত্যূষের অরুণবর্ণ দেহ তাই ব্রহ্মার—কামনায় লাল বর্ণ। বিষ্ণু এই সৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করছেন, পালন করছেন—তাঁর ঐশ্বর্য্যের দ্বারা। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম—কল্যাণ, নিয়ম, শাসন ও প্রেম—যা দিয়ে পিতা পালন করেন পুত্রকে—পুত্রকে উন্নীত করেন—প্রকৃত মানসম্পদের সুরম্য হর্ম্ম্যে। নীল রঙ—জীবন ধারণের অর্থকেই প্রকাশ করে। আর সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর করেন ধ্বংস। জ্ঞানরূপী শুভ্রবর্ণ তাঁর—সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিহীন। সৃষ্টির স্রোতকে—মৃত্যুর ঐশ্বর্য্য দিয়ে তিনি অবিকৃত রেখেছেন—আনন্দ সলিল রয়েছে নির্ম্মল। করে তাঁর শিঙ্গা—ডমরু। তার গুরুগম্ভীর নির্ঘোষ জানাচ্ছে—পার্থিব সত্তার উর্দ্ধে রয়েছে মহাজীবনের সত্তা। এক অখণ্ড চৈতন্যময়—আনন্দময়—নিত্য বোধযুক্ত সত্তা। যা একটি মানুষের মৃত্যুতে শেষ হয় না—একটি জলধির শোষণে নিশ্চিহ্ন না, একটি মহীরুহ অথবা একটি অদ্রির বিনাশে নির্ম্মূলিত হয় না; বৃক্ষ লতা গিরি মরু চৌরাশী লক্ষ কীট পতঙ্গকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হচ্ছে। সুবৃহৎ বট-অশ্বত্থ কালের আঘাতে কোথায় মিলিয়ে যায়—ক্ষুদ্র বীজ-কণায় রেখে যায় জীবনের পরম বার্ত্তা। এমনি নবজীবন কীর্ত্তন-কথা বসুন্ধরার প্রতি অণু পরমাণুতে সক্রিয়। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—এক দেবতার—তিন গুণ—তিন রূপের আধারে লীলা। এসব কথা একবার নয়—বহুবার শুনেছেন ভগবতী। অমরনাথ বহুবার বলেছেন। স্তুতিবাদে প্রসন্ন হন দেবতা এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁকে ভুলিয়ে মঙ্গল আদায় করা তেমনই অসাধ্য ব্যাপার। কিসের লোভে দেবতা মানুষের অভীষ্ট পূর্ণ করবেন?

দেবতার পূজা যথারীতি চলে—ভগবতীর মন ভরে না। ভাবেন—এই পূজাতে সত্যই কি পরিতৃপ্ত হবেন দেবতা? দেবতার মনের অগোচর কিছুই তো পৃথিবীতে নাই। যে শ্রদ্ধার আসনখানি বিছিয়ে এই বংশের মানুষরা তাঁর আবাহন করেছেন—সে আসনখানি অন্তঃপুর থেকে টেনে যেন আঙিনায় বিছিয়ে দেওয়া হল।

২৮

সন্তুদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

ভগবতী মনে করেছিলেন—সংসারের কাজে ওকে এইবার সর্ব্বক্ষণের জন্য পাবেন। অন্ততঃ নারায়ণ-সেবাটি ওর দ্বারা চলবে। বুঝলেন সে আশা ভুল। পড়ার চাপ চলে যেতেই—বাইরে থেকে বন্ধুরা এসে ওর সময়টুকু যেন কাড়াকাড়ি করে লুটে নিলে। সব কাজই ওর ঘরের বাইরে। সকাল সাতটা থেকে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত কাজের অন্ত নেই সন্তুর। কোথায় ক্রিকেট—ভলিবল, কোন ক্লাবে কিসের সভা, দুঃস্থের সেবা নিয়ে কত কথা কাটাকাটি, তা ছাড়া তর্ক। যে কোন বিষয় নিয়ে তর্ক। খেলা, রাজনীতি, সিনেমা, বিদেশের কথা, ভারতের ভবিষ্যৎ, সংস্কৃতি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি—কোন্‌টা না তর্কের রাজ্যে প্রবেশ করে! অত্যন্ত অনায়াসে এরা তর্কের বস্তু হয়ে ওঠে। হয়তো আলোচনা হচ্ছে বাজার দরের, সেই প্রসঙ্গে আসে শাসননীতির গলদের কথা, তা থেকে রাজনীতি সহজেই আসতে পারে। সুতরাং বিদেশের সঙ্গে আমাদের

সম্পর্কটি কতদূরে কিভাবে প্রসারিত হয়েছে—তার আলোচনা স্বাভাবিক। ভারতের সংস্কৃতি যেমন আর্য্যযুগ থেকে বিকাশ পেয়ে ক্রমপরিণতি লাভ করে বর্ত্তমানে পৌছেচে—তেমনি পরমাণু-বোমা পুরানো হয়ে সদ্য-আবিষ্কৃত উদ্‌যান-বোমার কুক্ষীগত হয়েছে। বিজ্ঞানের এই উন্নতি—নরজাতির নিশ্চিহ্ন হওয়ার ভ্রূকুটিতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। এর শেষ পরিণতি—দ্বাদশ সূর্য্যের কিরণে পৃথিবী দগ্ধ হয়ে যাবে একদিন—এই কল্পনা-বাক্যের মত আশা-আশ্বাস হয়।

তর্কই চলে শুধু।

ভগবতী অবাক হয়ে ভাবেন—কেন এই উদ্দাম কথা কাটাকাটি! এতে কার লাভ কতটুকু! তর্কে হেরে গেলে কেনই বা দুঃখ বেদনা—জিতলে কিসের আনন্দ?

এদিকে সংসারের বহু কাজ। বাইরের কাজ—আনা নেওয়ার। সপ্তাহের শেষে চালের কিছু অনটন হয়ই—বাড়তিটা বেশী দর দিয়ে বাজার থেকে কিনতে হয়। ময়দা খাওয়া অভ্যাস নেই ছেলেদের—খুঁত খুঁত করে। অন্য জল-খাবারে পেট ভরাবার ব্যবস্থা নাই—ডালের খরচ বেশীই হয়।

সন্তুকে বললেন, তোর তো সময় নেই—এদিকে ঘরে যে চাল বাড়ন্ত।

সন্তু বললে, পয়সা দাও—আজ কিছু এনে দিচ্ছি। এক জায়গায় চাল ভারি সস্তা—অনেকে আনতে যায়। যাব আজকে?

তা সস্তা যদি হয়—আনতে যদি পারিস—

পারব। আমার চেয়ে ছোট ছোট ছেলেরা সব আনচে, আমি পারব না! গোটা কুড়ি টাকা—আর দুটো ব্যাগ যোগাড় করে রেখো।

অত টাকার চাল কি হবে রে?

রোজ রোজ আনার চেয়ে—একেবারে বেশী করে এনে রাখা ভাল নয়?

খাওয়া দাওয়া সেরে সন্তু বললে, আজ যদি না ফিরতে পারি যেন ভেবো না।

সেকিরে, কোথায় যাবি?

সে ট্রেনে করে এক জায়গায় যেতে হয়। অনেক লোক যায়—ভয় নেই।

না বাপু—কাজ নেই আমার চালে। ভগবতী শঙ্কা-শুষ্ক মুখে আপত্তি তোলেন।

মা যেন কি! সন্তু হেসে ওঠে। সবাই যাচ্ছে—কত দেশ-বিদেশে—কত ছোট ছোট ছেলে। তাদের মায়েরা তো এমন করে না!

না—করে না, তুই জানিস?

জানিই তো। এই বিষয়ে আমাদের কবিতার বইতে একটি ভারি সুন্দর কবিতা আছে। লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি। তিনি বলছেন—যেন বাংলা দেশ আমাদের মা—তাঁকে বলছেন:

সপ্ত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙালী করি, মানুষ করনি।

আজকাল সন্তু এমনি করেই সব জিনিস হেসে উড়িয়ে দেয়।...যে তর্কের মাথামুণ্ড খুঁজে পান না ভগবতী—সেই তর্ক সর্ব্বদাই করে। বুদ্ধি যেন ওদেরই বেশী—বড়দের চেয়ে। লেখাপড়া জানেন না বলে—কিসে ভালো—কিসে মন্দ—এ জ্ঞানটুকুও যেন ভগবতীর নেই।

সত্যিই রাত্রিতে ফিরল না সন্তু। বলে গেলেও ভাবনার হাত থেকে রেহাই দেবে কে? সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় কাটল। সকাল বেলাতেই ফিরে এল সন্তু। হাসি মুখ। চালের ব্যাগটা ঘরের মধ্যে রেখে বললে, একটু চা খাওয়াতে পারিস দিদি?

আজকাল—কোন কোন দিন চা তৈরী হয়। গোটা দুই কাপ ডিস, খানিকটা চা ও এক কৌটো গুঁড়ো দুধ এনে রেখেছে সন্তু।

ভগবতী বললেন, আর একটা ব্যাগ কোথায় রে?

সেটা আর একজন নিয়েছে—তার ব্যাগ ছিল না কিনা, পরশু ফিরিয়ে দেবে।

চা খেতে খেতে বললে, জানিস দিদি—মেলাই লোক যায় চাল আনতে। ওখানে সতেরো-আঠারো টাকা চালের মণ—যো-সো করে আনতে পারলে—এখানে সাতাশ আটাশে বিক্রী হবেই। তা সব্বাইকে দিয়ে থুয়ে—পাঁচটা টাকা নিট্ লাভ হয়।

দিতে হয় কেন? কমলা জিজ্ঞাসা করে।

বাঃ রে—দিতে হবে না? ট্রেনের চেকার—গার্ড,

পুলিশের লোক ; তাই কি এক জায়গায়—দু' তিন জায়গায় পুজো দিয়ে তবে চাল আনতে হয়। কলকাতায় যে রেশন চালু—তাই বাইরের থেকে চাল আনা বারণ। আনলে সাজা হয়।

কেউ ধরা পড়ে না ?

পড়বে না কেন—যারা বোকা তারাই ধরা পড়ে। যারা কাউকে কিছু না ঠেকিয়ে একেবারে ফাঁকি দিতে চায়—তারাও কখনো কখনো ধরা পড়ে।

ধরা পড়লে কি হয় ?

বিচার হয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। জরিমানা হয়, না দিতে পারলে জেল।

তবে কাজ কি ভাই—ওসব হাঙ্গামায়।

ভয় পেলি তো ? সন্তু হাসলে। জানিস, নো রিস্ক—নো গেন।

কেন—যেমন সিনেমায় সেবার ছবি তুলিয়ে কিছু পেলি—

সিনেমার তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—তাই রোজ রোজ ডাকবে আমাকে! সুধীনদা কি বলেন জানিস, ছবিটায় যদি নাম কিনতে পারি, তাহলে অবশ্য আমার ডিম্যাণ্ড হবে।

ভগবতী আসাতে ওদের আলোচনা বন্ধ হল।

দুপুর বেলায় সন্তুকে একলা পেয়ে কমলা বললে, হাঁরে—কেষ্টা নাকি সিনেমা কোম্পানীর সঙ্গে কি গোলমাল করেছে ? শুনলাম মঞ্জুদির মুখে।

সন্তু বললে, হাঁ—সিনেমা-ডিরেক্টার ওকে নাকি তিন দিন রঙ মাখিয়ে ছবি তোলায় নি। তার পর একদিন বলেছিল—এমন চড়া রঙ মেখে বাঁদর সেজে আসতে কে বলেছে তোমাকে ? হাতের ছড়ি উঁচিয়ে বলেছিল, গেট আউট। কেষ্টদার ছিল রাগ—ক'দিনই ফিরে আসছিল তো। যাঁহাতক এই কথা বলা, রাগ সামলাতে না পেরে—ডিরেক্টারের হাতের ছড়ি কেড়ে না নিয়ে—তাকেই সপাসপ দু' চার ঘা দিয়ে—দে চম্পট। সেই থেকে আর ওমুখো হয় নি।

এখন বুঝি চাল আনছে তোদের মত ?

না—একদিন মাত্র গিয়েছিল। হাঙ্গামা দেখে বললে, না ভাই, এ ব্ল্যাকের ব্যাপারে আমি নেই। আবার রমাদির কাছে যাবার জন্ম ঘুর ঘুর করছে।

রমাদি তো আর জামা সেলাই করে না দেখি।

না—খুব পড়াশোনা করে। এইবার ম্যাট্রিক দেবে কিনা—তাই খাটছে।

তা ম্যাট্রিক দিয়ে কি করবে ? চাকরি করবে ?

তাতে কি—কত মেয়েছেলেই তো চাকরি করছে। বাবার আপিসে দেখেছি।

সন্তুকে জামা গায়ে দিতে দেখে কমলা বললে, আবার বেরুচ্ছিস তো ?

হাঁ—একজনের কাছে দরকার আছে—আসছি এখুনি।

বদ্ধ ঘরে ওর মন বসে না। শহর কত বিস্তৃত—আর বৈচিত্র্য-ভরা। চলে যাও এ পথ দিয়ে সে পথে—নূতন পথে—দৃষ্টিও মুগ্ধ হবার উপকরণ পাবে প্রচুর। ট্রাম চলেছে—বাস মোটর চলেছে, নানান আকারের গোযান অশ্বযান চলেছে, ঠেলাগাড়ী আর রিক্সাও চলেছে—তার সঙ্গে চলেছে মানুষ। চলার একটি অবিচ্ছিন্ন স্রোত—শহরের সর্ব্বত্র ভাসিয়ে দিচ্ছে। দৃষ্টি এই রূপের বন্যায় ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর আভাস পায়। কিন্তু বালক মনে তার পরিচয় নাই—সে মন শুধু আনন্দ সঞ্চয় করে পরিতৃপ্ত হয়। কার্য্য কারণহীন আনন্দ। স্রষ্টা কে, সৃষ্টি কেন, মানুষের সঙ্গে কি সম্বন্ধ সেই পরমপুরুষের, এসব তত্ত্ব তার জ্ঞান-সীমার অতীত। শুধু গতির আনন্দ, বৈচিত্র্যের আনন্দ—অজানার রহস্য অবগুণ্ঠন উম্মোচনের আনন্দ, কর্ম্ম-উদ্দীপনার আনন্দ—কিশোর মন যত পারে—দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ আর স্পর্শ দুয়ার দিয়ে মনের মন্দিরে পৌছে দেয়। মন সঙ্কীর্ণ বিন্দু থেকে চলে আসে বিস্তারে—রাত্রির অন্ধকার থেকে প্রত্যুষের আলোয়, জাড্যের আলস্য ছেড়ে কর্ম্মের উদ্দীপনায়। কিশোর মন পথে পথে ঘোরে—কোলাহলে ডুব দেয়—কল্পনায় আকাশকে টেনে নামায়—মাটিকে উর্দ্ধে তোলে। চঞ্চল স্রোতে ওরা যেন চলন্ত ফুল। কূলে স্থিতি লাভের মোহ নেই—ঘাটে অঘাটে ভেসে চলাতেই তৃপ্তি।

এমনি করে ভেসে চলে সন্তু—ভগবতীর স্নেহের বাঁধন—ওকে ধরে রাখতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

সোভিয়েটে স্থাপত্য শিল্প

মৈত্রেয়ী দেবী

সম্প্রতি খবরের কাগজে দেখলাম ভারতবর্ষের মাননীয় অতিথি সোভিয়েৎ নেতা শ্রীযুক্ত ক্রুশ্চেভ—অবশ্য উচ্চারণ ক্রুশ্চেভ্ না ক্রুশেভ্ না ক্রুশোভ্ তা জানি না—তবে চট্টোপাধ্যায় যখন চ্যাটার্জি হয়েছেন তখন রাশিয়ান যাই হোক বাঙ্গালা ক্রুশ্চেভ ভুল হবে না—বর্মা পরিভ্রমণকালে প্যাগোডা দেখতে গিয়ে সাংবাদিকের সঙ্গে এক বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই তর্কের রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্য্য ও ঔচিত্য নিয়ে আলোচনা করব না, কিন্তু সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তাঁদের স্থাপত্যে অলঙ্করণের বাহুল্য আছে বলে তাঁদের নিন্দা হয় বটে কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রাখছেন—এবং তাদের স্থপতিরা বিরুদ্ধ সমালোচনাও শুনতে প্রস্তুত আছেন। এর মর্মার্থ কি এই দাঁড়ায় যে অলঙ্করণের বাহুল্যের জন্য তাঁদের সমালোচনা শুনতে হয়? কোন দেশে কে সে সমালোচনা করে তা আমরা জানি না। আমাদের কাছে তাঁদের দেশ সম্বন্ধে যে সব নিন্দা দীর্ঘদিন ধরে পৌঁচেছে তার মধ্যে রূপসজ্জার বাহুল্য একটি নয়। আমরা বরাবর শুনছি যে জড়বাদী এই নূতন মত ও তন্ত্র মানুষের জৈব প্রয়োজনকেই সব চেয়ে বড় করে দেখছে—তার যে অপ্রয়োজনের আবেদন, যার প্রকাশ শিল্পে কলায় ধর্মে, তার ঘটেছে মহতী বিনষ্টি। মানুষ শিখছে তার দৈহিক ও ঐহিক প্রয়োজনটাই সবচেয়ে বড়, তাই তার বিরাট মানস পরিধি—সেখানে সৌন্দর্য সাধনা অপ্রয়োজনের আনন্দে "কারণহীন সুখে" পরিব্যাপ্ত, তার খবর সে হারিয়ে ফেলেছে। এমন কি সে দেশের মেয়েরা সাজতেও ভুলেছে। মনে আছে—দুবছর আগে সুইজারল্যাণ্ডে ট্রেনে, একটী জার্মাণভাষী ধনী ও সুপুরুষ সুইস্ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কমিউনিষ্ট দেশের নিন্দাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "ওদের প্রধান গর্ব এই যে মেয়েদের দিয়ে ওরা হাতুড়ি পেটায়, রাস্তা করায়, পাথর ভাঙ্গায়, কিন্তু তাদের সাজায় না। ফ্যাসানের বাহুল্য নেই—সাদাসিধে নেহাৎই মোটা কাপড় পরে ওদের মেয়েরা ট্রাক্টার চালাতে পারলেই ওদের জাতীয় গৌরব—আমরা তাদের শোভায়, সজ্জায়, রূপে রসে, আনন্দে ভরে রাখতে চাই। তাদের রঙীণ বসন-ভূষণ, কোমল দেহ মন দিয়ে আমাদের যে ঐশ্বর্যে ভরে দেয়, তার সন্ধান ওরা জানে না, ওরা যারা কেবলই কাজের বড়াই করে।" জীবনের প্রধান দিকগুলিকে নিরলঙ্কার করেছে, প্রয়োজনের তাগিদে, এই নিন্দাই বরাবর শুনেছি—অবশ্য বিশেষ করে স্থাপত্য সম্বন্ধে কোনো দিন কিছু শুনিনি।

গত জুলাই মাসে আমরা যখন সোভিয়েতে যাবার সুযোগ পেলাম—তখন ওদের স্থাপত্যশিল্প ও নগরের হর্ম্যসংস্থান আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগিয়েছে। আমরা সকালবেলা মস্কোর কীভ স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। স্টেশনে এত লোক এত ফুল এত সমারোহ ও সমাদর ছিল যে স্টেশনটার দিকে তাকিয়ে দেখতেই পাই নি, ভীড়ের আদরে আমাদের মাটিতে পা পড়ে নি। এটা অবশ্য রূপক অর্থে বলা নয় সত্যিই পা পড়তে পারে নি—আমরা একরকম বাহিত হয়েছিলাম, তার মধ্যে কোথায় ব্যাগ কোথায় কোট তাই ঠিক রাখতে পারি নি—কাজেই স্টেশনের স্থাপত্য যে কিছু দেখতে পাই নি সেজন্য দোষ নেই। যা হোক এখানে সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা বা ভারতবর্ষের প্রতি সে দেশের জনসাধারণের কী শ্রদ্ধা ও কৌতূহল দেখেছিলাম তা নিয়ে আলোচনা
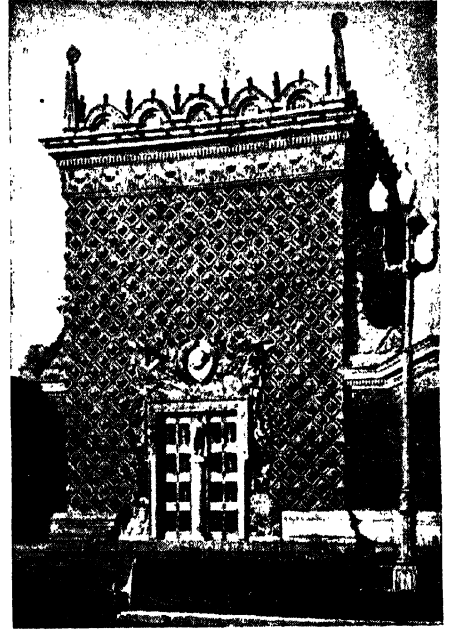
মস্কোতে স্থায়ী কৃষি প্রদর্শনীর একটি সৌধ

করব না, যে প্রসঙ্গে সুরু করেছিলাম, সেই স্থাপত্য সম্বন্ধেই যা বিশেষত্ব লক্ষ্য হয়েছিল তাই বলব।

আমাদের পনের জনের দলটি নিয়ে মস্কো শহরের সুপ্রসিদ্ধ গর্কি ষ্ট্রীট দিয়ে সুসজ্জিত গাড়ীটি চলেছিল—কিন্তু আমার পাশে বসে জর্জিয়া-নিবাসিনী একটি স্থূলাঙ্গী রিপোর্টার মহিলা গোটা দশেক ইংরাজি শব্দের সাহায্যে আমার জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, আমার অকিঞ্চিৎকর জীবন বিশেষ বৃত্তান্তপূর্ণ না হলেও মাত্র আট দশটি শব্দ দিয়ে বুঝিয়ে ওঠা সহজ ছিল না, সেই দুরূহ কার্যে নিযুক্ত থাকায় আমাদের

সঙ্গী দোভাষী অল্গা তাসিয়া প্রভৃতি পথের দুধারের হর্ম্যরাজির যে পরিচয় দিতে দিতে চলেছিল সে সব কিছুই শুনতে পাই নি। হঠাৎ কানে গেল "রেড্-স্কোয়ার" ও "ক্রেমলিন"। সেই অতিপরিচিত ঐতিহাসিক শব্দ দুটি কানে যেতেই আমি জীবনবৃত্তান্ত আচমকা খতম করে দিয়ে বিস্মিত চোখে প্রাচীর-বেষ্টিত সকালের কুয়াশা-ঢাকা সেই বহুশ্রুত প্রাসাদ দেখতে পেলাম। একপাশে লম্বা চূড়ার শীর্ষে একটি লাল রঙের তারা। বহুদূর থেকে রাত্রে ঐ রক্তবর্ণ তারকা জ্বল জ্বল করে, দেখতে পাওয়া যায়। শুনলাম ওটি দামী চুণী দিয়ে তৈরী। দূর থেকে ক্রেমলিনের প্রাচীরের মধ্যে অনেক গম্বুজসদৃশ আকৃতি দেখে রুশদেশে ইসলামীয় প্রভাবের কথা স্মরণ হল। ক্রেমলিন ও রেড স্কোয়ার পার হয়েই আমাদের গাড়ী একটি ধূসরবর্ণের বিরাট অট্টালিকার সামনে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে আমাদের নামাতে নামাতে কর্ত্রী নাদিয়া বললেন,

মস্কো য়ুনিভারসিটি

এই হোটেল মস্কোয়া। এদেশে এই একটিই হোটেল মস্কোয়া আছে অতএব যদি কোনো সময় পথ ভোলো তো যে কোনো পথচারীকে বল্লেই চলবে "হোটেল মস্কোয়া"—যথাস্থানে পৌঁছে দেবে। হোটেলের আকৃতি বিরাট, তবে স্থাপত্যের বিশেষত্ব কিছু লক্ষ্য হল না, লণ্ডনের কালো কালো বড় বড় বাড়িগুলির মতই একটা চৌকা বাড়ি, আধুনিক ষ্ট্রীম লাইনের চিহ্ন কোথাও চোখে পড়ল না, হোটেলে ঢুকতেই দুপাশে বিপণি-সম্ভার নিতান্তই 'আটপৌরে—ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের মত "Shop-window"র ইন্দ্রজাল রাশিয়াতে কোথাও লক্ষ্য হল না—তারপরই প্রশস্ত শ্বেতপাথরের ঘরের মাঝখানে স্টালিনের বৃহৎ মর্মর মূর্তি। মূর্তিটি মানুষের আকৃতির চেয়ে অনেক বড়—প্রায় মিকালাঞ্জেলোর মূর্তিগুলির মত বিরাট—কিন্তু সে অবিকল প্রতিকৃতি, তার মধ্যে পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমাদের দেশের সর্বত্রই চিত্রশিল্পের যে সব বিশেষত্ব আধুনিক শিল্পীর মনকে আবিষ্ট করেছে তার কোনো প্রভাব দেখলাম না। একেবারেই নিখুঁৎ প্রট্রেট—শিল্পীর বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনা অস্তিত্বের ব্যক্তি স্বরূপের সঙ্গে যোজিত হয়ে যে আকার গ্রহণ করলে আজকের শিল্পী মন সন্তুষ্ট হয় সে রকম নয়—স্টালিন যে রকম দেখতে ছিলেন ঠিক সেই রকম। স্টালিন ও লেনিনের অনেক মূর্তি সারা সোভিয়েতে দেখলুম, সবই তাই, অর্থাৎ তাঁদের চেহারার অবিকল প্রতিমূর্তি। অবিকল বলতে দ্বিধা নেই কারণ তাঁদেরও আমরা সশরীরে দেখলাম কি না। প্রথমে কে সুরু করেছিল জানি না, তারপর একে একে সকলেই হাতের ফুলের বিরাট বোঝাগুলি মূর্তিটির পাদপীঠে রেখে দিল। দেখলাম ওরা বেশ খুশী হল, মূর্তি পূজার ভাবটি ওদের মধ্যে যে নেই তা নয়, সেটি আরো লক্ষ্য হল, যেদিন স্টালিন ও লেনিনকে দেখতে গিয়েছিলাম। সে গল্প অবশ্য এখানে করবার নয়—যথাস্থানে বলা যাবে।

প্রথম দিন পৌঁছেই আমাদের হাতে বেশী সময় ছিল না স্নানাহার ও স্থানীয় কর্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সেরে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়া গেল। প্রথমেই নিয়ে গেল বলশোয়ে থিয়েটারের সামনে। বড় বড় মোটা মোটা থামগুলা পুরাণো ইটালীয়ান ধরণের বাড়ি—অনেকটা আমাদের কলকাতা য়ুনিভার্সিটির সেনেট হলের সামনের মত। অতি প্রসিদ্ধ বলশোয়ে থিয়েটার এমন কিছু চমকপ্রদ মনে হল না। তার ভিতরের রূপ-সজ্জাও সাবেক কালের। সোনার জলের ছোপ লাগান লতাপাতার নক্সার বেড় দেওয়া ও ইলেকট্রিকের বাল্ব লাগান সান্দেলিয়ার বাতিদান। হলের ভিতরে ষ্টেজের ঠিক উল্টো দিকে দোতালায় প্রধান বক্সটি ঠিক মাঝখানে আছে। সেখানে সোভিয়েৎ পরিভ্রমণকালে জহরলালের ছবি সকলেই দেখে থাকবেন। ঐ বক্সটিতে বসে জার ও জারবংশীয়েরা অভিনয় দেখতেন। দুপাশে বাঁকা ঢেউ খেলান মখমলের পর্দা। একতলা থেকে একটু উঁচুতে ঘরটিকে ঘিরে দুসারি বক্স, রূপসজ্জা মধ্যযুগের। দেখে আশ্চর্য হলাম যে আধুনিক সিনেমা গৃহের যে চমকপ্রদ নূতনত্ব সে রকম কিছুই নয়। হোটেলের ভিতরের সাজও Mid-victorian বলা চলে। এরা সাজগোজটা বিশেষ বদলায়নি বরং ঝাড়লণ্ঠনের বাতিদান সর্বত্রই দেখেছি—নূতন তৈরী সভাগৃহেও মোমবাতির শিখার অনুকরণে ইলেকট্রিক লাইটে বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে। বলশোয়ে থিয়েটার পার হয়ে ক্রেমলিনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমাদের দোভাষী দেখিয়ে দিলেন—লাল পাথরের একটা বিরাট বাড়ি—শুনলাম ঐ পাথরগুলি নাকি জার্মানরা গত যুদ্ধের

সময় এনেছিল রুশ-বিজয়ের পর মস্কোতে হিটলারের বিজয়স্তম্ভ গাঁথবে বলে!

পথ চলতে নানা জায়গাতেই মসজিদ-সদৃশ গম্বুজাকৃতি চূড়া দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে আবার অনেকগুলিই রঙীন। ক্রেমলিনের ভিতর জারদের নিজস্ব চার্চটির শীর্ষ দেশে অনেকগুলি গম্বুজে সাজান—একেবারেই মসজিদের মত। দীর্ঘদিন এদেশ তুর্কীদের অধীন ছিল—ইসলাম কৃষ্টিও সংস্কৃতির প্রভাব-স্থাপত্যে যথেষ্ট রয়েছে।

মস্কো আটশ বছরের পুরানো শহর—কাজেই অনেক জায়গাতেই অপরিসর পথ ও গৃহ, অস্বাস্থ্যকর ও অসুবিধাজনক বলে নগর-সংস্কারকরা শহরের শোভা বর্দ্ধনের জন্য এক আশ্চর্য কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাঁরা গোটা বাড়িটাই সরিয়ে ফেলে জায়গা পরিষ্কার করে ফেলছেন। আমাদের এক প্রশস্ত চত্বরে নিয়ে গেলেন তার নাম সোভিয়েৎ স্কোয়ার—সেখানে একটি প্রিন্সের মূর্তি দূর থেকে সরিয়ে এনে ঠিক মাঝখানে রাখা হয়েছে ও চারপাশ থেকে বাড়ি সরিয়ে মাঝখানটা বেশ প্রশস্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হয়, সোভিয়েতে নানা স্থানেই প্রিন্স প্রভৃতির মূর্তি আজও আছে, সাম্রাজ্ঞী ও রাজাদের মূর্তি আছে। তারা সে সব ধ্বংস করেনি। আমরা যেমন গড়ের মাঠের ইংরাজ পুরুষদের মূর্তিগুলি নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা করছি ও ওগুলির ধ্বংসের প্রস্তাব করছি, ভেবে দেখলে এটা কিছু সুস্থ মনোভাবের লক্ষণ নয়। আজকের সোভিয়েৎ উড়িয়ে দিতে পারে না যে একদিন জারের আমল ছিল, ভালো হোক, মন্দ হোক, সেই অতীত যুগ তাদের দেশের অতীত, সে ইতিহাসকে মুছে ফেলবার জন্য সিকি পয়সা শক্তি ক্ষয় করবার দরকার নেই—বরং ইতিহাসের বইর মতন সে স্মৃতি লেখা আছে দেশের অঙ্গে অঙ্গে।

ওরা শহরটাকে আধুনিক ভাবে সাজিয়ে ফেলতে চায়, অথচ ভালো ভালো শক্ত বাড়িগুলি ভেঙ্গে ফেলতেও চায় না, তাই বাড়ি সরানর কৌশল বের করেছে। আলাদিনের দৈত্যের মত বিরাট বিরাট অতিকায় ইমারতগুলি সরিয়ে মাঝে মাঝে চত্বর বের করে ফেলছে ও সেখানে ফুলের বাগান ফোয়ারায় আলোতে সাজিয়ে রাতারাতি চেহারা বদলে দিচ্ছে। শুনলাম যুদ্ধের মধ্যে ৫৪টি বড় বড় বাড়ি সরান হয়েছে। একটি বাড়ি দেখলাম ১০০ মিটার সরান হয়েছে এবং ৯০ ডিগ্রী ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ বাড়ির সদর যে দিকে মুখ ফেরান ছিল তার পাশ দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এই সব বাড়ি যখন স্থানান্তরিত করা হয় তখন ভিতরের কাজ কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই বলতে থাকে। একটা চক্ষু চিকিৎসালয় দেখলাম, যখন সেই বিরাট বাড়িটা সরান এবং ঘোরান হয় তখন তার ভিতরে কাজ চলছিল অর্থাৎ চক্ষু চিকিৎসকরা চোখ দেখছিলেন! হয়ত বা ছানি কাটছিলেন! পুস্কিনের একটি মূর্তি বিরাট চত্বরে সরিয়ে আনা হয়েছে। ১৯১৮ সালে ঐ মূর্তিটি তৈরী ও স্থাপিত হয়েছিল, ১৯৫০ সালে সেটি স্থানান্তরিত হয়।

প্যারিসের মাঝখানে যেমন সিন নদী মস্কোর মাঝখানে তেমনি নদী মস্কোয়া—এদের ঠিক নদী বলা যায় না, আমাদের দেশের নদীর তুলনায় খালের মত। তবু সেই নদীর দুধার এরা সাজিয়ে রাখে। কলকাতা বা পাটনায় বাস করেও যেমন "সুরনর নিস্তারিণী, পতিতপাবনী সাগর-গামিনী" গঙ্গার কোনো চিহ্নই কেউ নগরবাসী দেখতে পায় না তেমন নয়। ঐ ছোট্ট নদীটির ক্ষীণ ধারাও নগরকে সৌন্দর্য ধৌত করে রেখেছে। তার একপাশে দুর্গ পরিখা বেষ্টিত প্রতাপান্বিত ক্রেমলিনকে ভোরের আলোয় দেখায় ভালো। য়ুনিভার্সিটির বৃহৎ অট্টালিকা শহর থেকে দূরে। একটু উঁচু সুন্দর লেনিন হিল পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছন গেল। দুধারে গাছের শ্রেণী শোভিত পথের ধারা ফুলের বাগানে এখন থেমেছে। ২০০ বছর আগে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতার প্রকাণ্ড কালো পাথরের মূর্তি সেই বাগানের

ক্যাথরিন দি গ্রেটের প্রস্তরমূর্ত্তি—লেনিনগ্রাদ

মাঝখানে বসান। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য আমাদের চোখে অতি সুন্দর লাগল। দুধারে দুটি সমান মাপের চূড়া আর মাঝখানটি উঠে গেছে দীর্ঘ হয়ে তাতে অনেকটা চাটুর মত দেখাচ্ছে। বুঝলাম এই বাহারটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কিন্তু তার মধ্যে বিশেষত্ব আনবার চেষ্টায় কোনো উগ্রতা নেই। ২০ তলা প্রকাণ্ড সৌধ, তাতে পঁয়তাল্লিশ হাজার ঘর, আমাদের বন্ধুরা বল্লেন—প্রত্যেক ঘরে যদি কেউ এক রাত কাটাতে চায় তবে তাকে বাঁচতে হবে শারদংশত। প্রকাণ্ড সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিরাট পাথরে বাঁধান চত্বর পার হয়ে প্রবেশ দ্বার। ভিতরে আগাগোড়া সাদা ঝকঝকে মার্বেলে মোড়া। বিশ্ববিদ্যালয় না বলে বাদশাহী প্রাসাদ বলা চলে। মনে হয় না সেখানে হাজারে হাজারে ছেলে প্রত্যহ যাতায়াত

করছে, যেমন সুন্দর দামী জমকালো ব্যবস্থা তেমনি নিখুঁৎ পরিচ্ছন্নতা মনকে অভিভূত করে দেয়। কত বিরাট বিরাট ঘর, করিডর, রঙ্গমঞ্চ, কত বসবার রাজকীয় আসন—চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দেয়—। দেখে মনে হল না—এরা নিরলঙ্কার নিরাভরণ করেছে দেশকে। রূপসজ্জাকে ব্যক্তি বিশেষেরই আয়ত্ত করে রাখেনি করেছে সকলের অনায়াস লভ্য! বিরাট সাজান ঘর একটিতে ঢুকলাম পালিশ করা মসৃণ আসবাবে সাজান উজ্জ্বল বাতি দানে বিচিত্র কারুকার্য—রঙ্গীণ রেশমের দড়ি দিয়ে আটকান মখমলের পর্দা সরিয়ে যেন ইন্দ্রপুরীতে ঢুকলাম—শুনলাম ঐখানে ছাত্রছাত্রীরা অভিনয়ের রিহার্সাল করে। লেকচার রুমগুলিও ঢুকলে মনে হয় খুব উঁচুদরের সিনেমা-ঘরের ভিতর এলাম—গদী মোড়া ঝকঝকে চেয়ারে মখমলের ঝালর দোলান ঘরে বসে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে—দেখে আশ্চর্য ও তৃপ্ত হলাম। বলা যেতে পারে অহমিকা পড়ে উঠতে পারছে না—কারণ সেটা কারু নিজস্ব সম্পত্তি নয়। ভোগটা হচ্ছে, অথচ লোভটা বাদ পড়ছে এ একটা মজার কৌশল।

মস্কোর স্থাপত্যের কথা বলতে গেলে tube station, যাকে ওরা Metro বলে তার উল্লেখ করতেই হবে। মেট্রো নামের উৎপত্তি কিসের থেকে জানি না, ইউরোপে অনেক বড় বড় সহরেই রাস্তার ভীড় কমাবার জন্য, মাটির নীচ দিয়ে electric train চলেছে। বেশীর ভাগ লোকই পথে যাতায়াত করে। ইংল্যাণ্ডে তাকে বলে tube ও tube station এ্যামেরিকায় under-ground—প্যারিসে বলে Metro—মস্কোতেও Metro বলে দেখলুম। এই 'Metro' মস্কোবাসীর একটা গৌরব। কারণ পৃথিবীর কোথাও এমন রাজপথ নেই। প্রত্যেকটা মেট্রো ষ্টেশন একটা সুন্দর মিউজিয়ামের মত সাজান, প্রাসাদের মত কারুকার্য্যখচিত। অনেক দিন থেকেই শুনেছি সে একটা দ্রষ্টব্য মহান। মেট্রোর অধিকর্ত্রী একজন মহিলা জেনারেল। গত যুদ্ধে ইনি জেনারেল হয়েছেন এবং বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। মিলিটারী পোষাকে সজ্জিত লম্বা চওড়া চেহারা কিন্তু অতি কোমল স্নিগ্ধ একখানি মুখের অধিকারিণী মেট্রোর সর্বময়ীকর্ত্রী আমাদের নিয়ে চলমান সিড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন। চারিদিকে কৌতুহলী জনতার দৃষ্টি পার হয়ে আমরা নামছি তো নামছিই। ইংল্যাণ্ডের চেয়ে অনেকটা নিচে নামতে হল—নেমে এক মর্মর প্রাসাদে পৌছে গেলাম। ইংল্যাণ্ডের টিউব ষ্টেশন একটা অন্ধকার রেল ষ্টেশনের মত। নোংরা নয় তবে যথেষ্ট মলিন। কিন্তু এ যেন একটা সাজান ইন্দ্রপুরী। বিচিত্র ঝাড় লণ্ঠন স্ফটিকের বাতিদান আলো ঝলমল করছে চতুর্দিক, দেওয়ালে কত নক্সা, কত স্থাপত্য, মূর্তি কত ছবি। আর পালিশ করা মার্বেলের মেজের মসৃণতার উপর জুতো পায়ে চলতে সঙ্কোচ হয়। হ্যারিসন রোডের মোড়টাকে হঠাৎ যদি কেউ অস্ত্র বলে নিজামের প্যালেসে পরিণত করে তাহলে যেমন বিস্মিত হতে হয়, তেমনি হলাম। কারণ সে তো হ্যারিসন রোডের মোড়ই! সেখান দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যহ যাতায়াত করছে। সেই জনপথটিকে 'এরা ধুলোকাদা মাখা নানা রকম বর্জনীয় শরীর ক্লেদের নর্দামা বানায়নি। ইয়োরোপের পথ কোথাও সে রকম নয়—পরিচ্ছন্নতা, নিখুঁৎ পরিচ্ছন্নতায় সমস্ত পথঘাট জনসাধারণের ব্যবহার্য সমস্ত স্থান অমলিন থেকে সে দেশের প্রত্যেক লোকের সংযম, সহিষ্ণুতা, ধৈর্ব ও নগরবাসের যোগ্যতা প্রমাণ করে।

লেনিন ও স্টালিনের স্মৃতি মন্দির। এইস্থানে ওঁদের দেহ সযত্নে সংরক্ষিত (দূরে ক্রেমলিন)
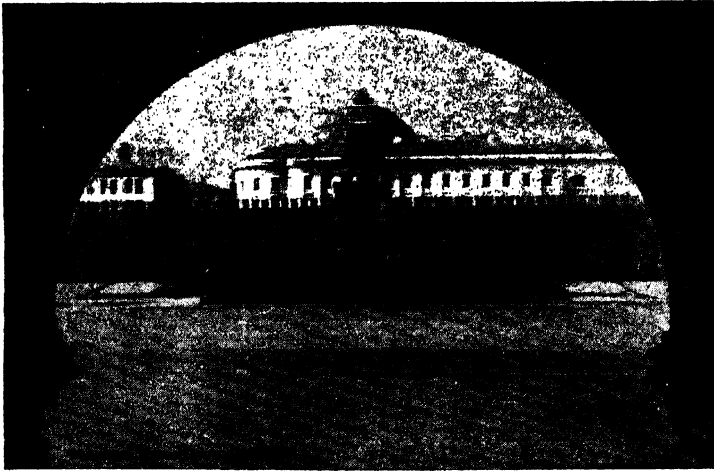
অধ্যয়নের জন্য এমন ইন্দ্রপুরীর প্রয়োজন কি? প্রয়োজন অবশ্য অধ্যয়নের জন্য নয়। গাছতলায় বসে 'ভারতবর্ষের সাধনা তার চরম লক্ষ্যে পৌছে ছিল, সেই তপোবনের বাণী এযুগেও আবার বারবার করে আমাদের পরম পূজনীয়েরা বলছেন। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশের বিদ্যালয় গুলিতে তপোবনের ছায়াঘন স্নিগ্ধতা বিকীর্ণ হয় না। নিষ্কলুষ পবিত্র বায়ু সেবিত স্বাস্থ্যশ্রী প্রবেশ করে না—নীরব গভীর মহিমায় চিত্তশক্তি উদ্বোধিত করে না, দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ। ভাঙ্গা চোরা টেবিল, টুল, ডেস্ক, ছড়ান কালি ঝুল মাখা ধুলি মলিন শ্রীহীন ছোট ছোট খুপরি ঘরে ঠেলাঠেলি করে বসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুলি আকীর্ণ দেওয়াল, পানের ছোপ পরা সিঁড়ি বারান্দা, শুধু চিত্তের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। দৃষ্টিতে আনে দারিদ্র্য। রাজপ্রাসাদে বাস করবার যে আনন্দ, ছেলেমেয়েরা তা পূর্ণ মাত্রায় পাচ্ছে অথচ, রাজকীয়

কিন্তু তাই বলে সাধারণের চলতি সড়ককে এমন মার্বেল-মোড়া মসৃণ করে রাখা সম্ভব বলে মনেও করিনি। এক একটি মেট্রোর এক এক রকম সাজ—এক এক রকম স্থাপত্য। কোথাও বা বিপ্লবের ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি কোথাও বা নেতাদের প্রট্রেট ও মূর্তি—কত রকমারি আলোর সজ্জা—তার কোনটা কেউ নষ্ট করে না—কোথাও কেউ দাগ ফেলে না, মূর্তি ভাঙ্গাচোরা তো দূরের কথা। সাধারণের কোনো জিনিষ নষ্ট করবার কথা কেউ ভাবতেও পারে না—কারণ যা সকলের তাই আমার—যা আমার তাই সকলের বিস্ময়ের সঙ্গে একথার সত্যতা লক্ষ্য করলুম প্রত্যেকটি দেওয়ালে, আনাচে কানাচে পথে পথে।

মস্কোর এগ্রিকালচারাল একজিবিশন আর একটি স্থাপত্য কীর্ত্তি। অনেক মাইল জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে এই স্থায়ী প্রদর্শনী গৃহগুলি রয়েছে। সোভিয়েৎ ইউনিয়ানের ষোলটি রিপাব্লিকের প্রত্যেকটির জন্য এক একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা। এছাড়া নানা রকম কাজের প্রদর্শনীর জন্য আলাদা আলাদা প্রাসাদ। যেমন কোনোটাতে কৃষি-যন্ত্রপাতি, কোনোটাতে পশুপক্ষী, কোনোটাতে গোপালক ইত্যাদি, কোনোটাতে নানা দেশের গাছপালা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ গোটা রাশিয়াতে যা কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য আছে তা সবই ঐ স্থায়ী প্রদর্শনীটি ভালো করে ঘুরে দেখলেই জানা যায়। এই প্রদর্শনীতে ঢুকতে বহু দূর থেকে গেটের উপরে একটি নরনারীর যুগলমূর্তি দেখা যায়, শস্যের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে চলেছে,—কৃষি-জীবনের প্রতীক। প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বিচিত্র ফোয়ারা। ফোয়ারাগুলি পদ্মের দলের মত আকৃতি। ফোয়ারা-গুলি উরাল ও ককেশাশ পর্বত থেকে আনা দামী রঙীণ পাথরে খচিত। বুঝলাম তার উপরে আলো পড়লে রাত্রে নানা রঙ্গের প্রভা বিকীর্ণ করে। এগুলি ইয়োরোপীয় শিল্পের মত নয়। রঙ্গের সমাবেশে মুসলিম ও পার্সিয়ান আর্টের প্রভাব স্পষ্ট। চারিদিকে দূরে দূরে প্রকাণ্ড বাগানের প্রান্তে প্রান্তে এক একটি প্যাভেলিয়ান—তার স্থাপত্য এক এক বিশেষ দেশের ও যুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—কিন্তু নূতনত্বের মোহ বা উৎকট প্রয়াস দেখলাম না। বড় বড় স্তম্ভ ও কারুকার্যে অতীতের সঙ্গে জীবন্ত যোগ রয়েছে সেই স্থাপত্যে।

মস্কোতে এখন প্রচুর নূতন বাড়ি উঠছে, জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী এক একটি ফ্ল্যাট থাকবে তাতে। সেই বাড়িগুলি এক একটি ছোটখাট শহর বল্লেও চলে। বাইরে থেকে দেখতে অনেকটা য়ুনিভার্সিটির বাড়িটার মতই নক্সা—আমাদের বার বার ভুল হত। গাড়ী করে যেতে যেতে চতুর্দিকেই ইউনিভার্সিটির বাড়ি দেখতে পেতাম। শুনলাম ঐ রকম চৌদ্দটি বড় বড় বাড়ি উঠছে। অবিশ্বাস্য রকম কম সময়ে এক একটা বাড়ি তৈরী হয়। আধুনিক যুগের সব রকম সুযোগ-সুবিধাযুক্ত অসংখ্য ফ্ল্যাট রয়েছে এক একটা বাড়িতে। কলকাতায় আধুনিক যে সব বাড়ি হচ্ছে যেমন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বা সরকারী দপ্তর তার বাইরেটা সাদাসিদে একটা চৌখুপি পিঞ্জর। আশ্চর্যের বিষয় ও দেশে তা নয়, একটু বাহার করতে চায় ওরা—আশ্চর্য নয় কি? ওরা যারা এত কাজের লোক তাদের কাছে এটা আশা করিনি—আশঙ্কা করেছিলুম নূতন যা কিছু সবই কেবল প্রয়োজনীয়তা সাধনের মূল্য পাবে—নেড়া বোঁচা সোজা সোজা হওয়াই নূতন বিধান। সবচেয়ে এ ভুল ভাঙ্গল উজবেকিস্থানে গিয়ে।

ধূসর মরুরাজ্য পার হয়ে পৌছন গেল উজবেকিস্থানের রাজধানী তাস্কেন্দে। ভারতবর্ষের কত কাছে এসে গিয়েছি প্রথমে বুঝতে পারিনি। শহরের মধ্যে চলতে চলতে গাছপালা ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর ও বাংলো দেশের কথা মনে পড়িয়ে দিল। এখানে দেখলুম বিরাট বিরাট flat বাড়ি বা যাকে ওরা বলে apartment-house সে রকম বিশেষ নেই, বরং ছোট ছোট বাংলো ধরণের বাড়ি। এখনও তাস্কেন্দকে নূতন ছাঁচে ঢেলে সাজান হয়নি। পুরাণো মাটির বাড়ি, মাটির দেওয়াল, ও মেঠো পথে আমাদের মত মেটে রংএর নরনারী ঘোরা ফেরা করছে—বেশ মনে হচ্ছিল দেশের কাছে কাছে এসে পড়েছি। পরদিন সকালে তাস্কেন শহরের প্রধান স্থপতি আমাদের শহর দেখাবার জন্য নিয়ে যেতে এলেন। তাঁর কাছে শুনলাম—সোভিয়েটের বিভিন্ন রিপাব্লিক তাদের নিজের নিজের বিশেষ স্থাপত্য বজায় রাখতে চায়। উজবেকিস্থানের মত গরম দেশে—"বেল-রাশিয়া" অর্থাৎ "শ্বেত রাশিয়া"র মত বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে ছোট ছোট ফ্ল্যাট আরামপ্রদ হবে না। কাজেই এখানে বেশীর ভাগই ছোট ছোট সংলগ্ন বাংলো ধরণের বাড়ি হচ্ছে। তিনি বল্লেন—সব প্রদেশের বাড়ি ঘরের বিশেষত্বগুলি নষ্ট করবার পক্ষপাতী তাঁরা নন। তাদের একটি মত আছে যে পৃথিবীতে সব বাসস্থান ও বাড়িগুলি একরকম হওয়া দরকার কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে স্থাপত্য হবে আকৃতিতে জাতীয় ও প্রকৃতিতে সাম্যবাদী। অর্থাৎ আধুনিক যুগের সব রকম সুযোগ সুবিধাগুলি সকল শ্রেণীর বাড়িতেই থাকবে, কিন্তু তার গড়নও তাই বলে এক ছাঁচের হবার দরকার নেই।

তাস্কেন্দ শহরটি বহুদিনের পুরানো হলেও সেগুলি উসনের পূর্বে একেবারেই অনগ্রসর ছিল—। কোনো রকম আধুনিক সুযোগ সুবিধা ছিল না বল্লেই চলে—নিরক্ষর ছিল শতকরা ৯৮ জন। সবই গত বিশ বছরে হয়েছে। সিনেমা থিয়েটার হল বিশেষ কিছু ছিল না—নূতন তৈরী একটি থিয়েটার বাড়ি দেখতে গেলাম। গত যুদ্ধের সময় এর নির্মাণ কার্য চলছিল। ঐ বিরাট গৃহটির এক একটি অংশে এক এক রকম স্থাপত্য কৌশল ও কারুকার্য। সেগুলি সবই বিভিন্ন Classical architectureএর Styleএ তৈরী—যাতে একটা বাড়িতেই অনেক রকম স্থাপত্য শিল্পের নমুনা দেখা যায়। কিন্তু সংমিশ্রণটি এমন সুন্দর ভাবে হয়েছে যে তাতে খাপছাড়া দেখায় না। বিশেষ করে মধ্য এশিয়ার ঐ সব প্রদেশের নক্সার মধ্যে প্রচুর মিল থাকায়, পার্থক্যগুলি প্রকট নয়। বেশীর ভাগই পাথরের ফিলিগ্রাকাজ মুশলিম আর্টের জন্মভূমি বলে আমাদের আগ্রা দিল্লীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ওরাও শুনলাম শ্বেতপাথরকে বলে 'মার্মার'। আমাদের মর্মর আর কি? একটা ঘর দেখলাম ফরগনা ভ্যালির লোকদিগের অনুকরণে তৈরী—হাতের নীচটা পাথরের তৈরি কিন্তু দেখতে কাঠের বীমের মত। আমাদের দেশেও সাঁচি প্রভৃতি জায়গায় পুরানো স্থাপত্যে পাথরের রেলিংএ কাঠের তক্তার

অনুকরণ দেখা যায়। একটা ঘর পনের শতকের সমরকন্দের ষ্টাইলে বানান—আর একটা ঘর আমুদরিয়ার উপর একটা পুরাণো শহরের স্থাপত্যর অনুকরণে তৈরী। ঐ সব দেশের পুরানো বংশানুক্রমিক স্থপতিদের খুঁজে যে যেটুকু পারে তাদের দিয়ে সেটুকু করিয়ে এরা পুরাণো শিল্পের পুনরুদ্ধার করাচ্ছে আশ্চর্য ভাবে। কলকাতা শহরে লাইট হাউস বা 'পূর্ণ' 'বিজলী' প্রভৃতি সিনেমা গৃহ যদি আমরা 'গোপুরম্' মীনাক্ষী মন্দির বা আগ্রা ফোর্টের মত বানাই তাহলে যেমন হয় তেমনি ব্যাপার। ফরগণার পুরান আর্টের একটি সিনেমা গৃহ দেখেছি বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা দূর থেকে পাথর খোদাই করে পাঠিয়েছে—সেগুলি জুড়ে জুড়ে ঘরের দেওয়ালে বসান হয়েছে। ঐ কাজগুলি নিপুণ মধ্যযুগীয় শিল্প। একটা বোখারার ঘর—বোখারার শিল্পীদের তৈরী, আয়নার উপরে প্লাস্টারের জালিকাজ করা হয়েছে, তাতে প্লাস্টারের খোলের ভিতর থেকে আয়নাগুলি ঝক ঝক করছে। উজবেকি কারুকার্যও বিচিত্র—কোনোগুলি সূক্ষ্ম, কাছ থেকে দেখবার—কোনোগুলি মোটা কাজ যা দূর থেকে লক্ষ্য হবে। কোনো দেওয়াল বা পাথরের নক্সায় খচিত আবার তার পাশেই খানিকটা করে ফাঁক—তাতে নক্সার সৌন্দর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ধরণের কারু শিল্প ও স্টাইল, আগ্রা দিল্লীর মোগল স্থাপত্যে দেখেছি। বস্তুত মনে হচ্ছিল উত্তর ভারতের ঐতিহাসিক স্থাপত্য দেখছি। অনেকদিন আগে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে একজন পাণ্ডা দেওয়ালে দুফুট আন্দাজ একটি জায়গায় মূর্তি খচিত নূতন দেওয়ালের অংশ দেখিয়ে বলেছিল ঐ জায়গাটি ভেঙ্গে যাওয়ায় বহু অনুসন্ধানে পুরানো শিল্পীদের বংশধরদের খুঁজে ঐটুকু মেরামত হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে। উদয়পুরের রাজপ্রাসাদগুলির দেওয়ালের প্লাস্টার মার্বেল পাথর ঘষে চন্দনের মত করে তারি প্রলেপ। ঐ ভাবে নাকি সে সময়ে প্লাস্টার দেওয়া হত। সেই দেওয়ালের মসৃণ ঠাণ্ডা পালিশের তুলনা নেই। আজকাল ঐ শিল্প লোপ পাচ্ছে, খুব অল্পসংখ্যক লোকই ঐ কাজ করতে পারে। যে গাইড আমাদের 'প্যালেস'গুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল তাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তোমাদের রাজার যে এতগুলি প্রাসাদ আছে কোনোটা পাহাড়ে কোনোটা জঙ্গলে কোনোটা জলে কোনোটা বা ডাঙ্গায় আর তোমরা দেশের অধিকাংশ লোক এত গরীব, এতে তোমাদের রাজার উপর রাগ হয় না? তাতে সে বিস্মিত হয়ে বল্লে, "তা কেন হবে? আমাদের মহারাজা নিজের ভোগের জন্যই তো প্রাসাদ বানায় না—ঐ যে পহাড়ের উপর প্রাসাদ ওখানে তিনি তো কখনো যানইনি যাবেনও না কিন্তু এগুলো তৈরি হয় বলে আজও পাথর শিল্পীরা খেতে পায়, আজও দুচারজন আছে যারা একাজ ভুলে যায়নি।"

তাস্কেন্দের সাধারণের ব্যবহার্য স্থানগুলিকে দেখে আমার প্রশ্ন ও গাইডের উত্তরের সামঞ্জস্য ও সমাধান পেলাম। ভারতবর্ষের আদর্শ কোনোদিনই কোনো জিনিষকে সম্পূর্ণ নিজের বলে আঁকড়ে ধরতে শেখায়নি,—"গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার"—কিন্তু তবু "আমার" এই লোভের ছাপটা তুলে নিলে সমস্যার আরো সমাধান হয়। প্রাসাদ বানাও কিন্তু দরজা খুলে দাও, বানাও সকলের জন্য!

যারা ফতেপুর সিক্রী বানিয়েছিল, যারা আগ্রা ফোর্ড বানিয়েছিল, বানিয়েছিল তাজমহল, তাদের বংশধররা কোথায় গেল? আমরা মনে করি ও এক মধ্যযুগীয় ব্যাপার এ যুগে ওর পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়, অনেকে বলেন উচিতও নয়—সেই মর্মর অলিন্দে অলিন্দে "পুরসুন্দরীদের নূপুর নিক্কণ" আর ধ্বনিত করা যাবে না। ঐ চারু কারু বিংশশতাব্দীর নয়। বিংশশতাব্দীর স্থাপত্য হবে একই ছাঁচে ঢালা—সমস্ত বিশেষত্ব ঘুচিয়ে সে হবে সরল—প্রয়োজন সাধনের নিয়মে।

আশ্চর্য হলাম সোভিয়েৎ রাজ্যে এই পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস দেখে। নূতন তৈরী সিনেমা ঘরে ঢুকে মনে হল যেন ইতিহাসের রাজ্যে এসে পড়েছি। যা কিছু দেশের কীর্তি তাকে এরা রক্ষা করতে চায়—আর আমরা কেবলি হারাই। মহাবলিপুরম্‌এর সেই আশ্চর্য মনোলিথগুলি অচিরেই সমুদ্রে চলে যাবে—কঞ্জিভরমের বিশাল মন্দিরগুলি প্রায় ধ্বংস স্তূপ হয়ে আসছে—কোথায় গেল সেই সব অদ্ভুৎকর্মা স্থপতিরা—নূতন করে তেমন কাজ করা দূরে থাক তাদের আশ্চর্য কীর্তিকে রক্ষা করে ওঠাই শক্ত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে জড়বাদী সোভিয়েৎ যারা খালি পার্থিব প্রয়োজন নিয়েই মশগুল বলে আমরা নিন্দা করি, তারা কিন্তু সৌন্দর্যের অপার্থিব স্বরূপকে দেখেছে, রক্ষা করতে চাইছে তার ধ্বংসকে, রক্ষা করতে চাইছে অতীতের কীর্তি ও বিশেষত্ব বর্তমানের জীবনের মধ্যে—সাম্যবাদ ও ষ্ট্রীম লাইনের মোহে পড়ে স্থাপত্যকে রসাতলের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও 'শুদ্ধি'

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

প্রশ্ন হইতে পারে, মুসলমান শাসকগণের ধর্ম্মান্তরীকরণ কার্য্য কতদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল? কি ভাবেই বা এই বলপূর্ব্বক মুসলমান করার কাজ বন্ধ হইয়াছিল? যাহাদিগকে তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুসলমান করা হইয়াছিল, তাহারা পুনরায় হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেও কেন তাহাদিগকে লওয়া হয় নাই? হিন্দু শাস্ত্রে কি 'শুদ্ধি' করিবার ব্যবস্থা ছিল না? যদি থাকে, তবে কেন তাহাদিগকে হিন্দু-সমাজভুক্ত করিতে পারা যায় নাই?

এই সকল জটিল প্রশ্নের সমাধান দু'এক কথায় হইতে পারে না। তবে ঐ সব প্রশ্নের প্রত্যেকটিরই সংক্ষিপ্ত জবাব জানিয়া রাখা ভাল।

প্রথম কথা হইল—তুর্কীদের আক্রমণের সময় হইতে যে ধর্ম্মান্তরিত করিবার স্রোত বহিয়া আসিয়াছিল তাহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসিয়া দারুণ বাধা পাইল। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। শ্রীগৌরাঙ্গকে শুধু ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলেই তাঁহার অসাধারণ অবদানের কথা ঠিকমত বলা হইল না। তিনি আবির্ভূত হইয়া সেদিন যে প্রেমবন্যা বহাইয়াছিলেন, তাহাতেই ধর্ম্মান্তরগ্রহণের স্রোতোধারা এককালেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, ভারতের ইতিহাসের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিল, হিন্দুসমাজে অবদমিত প্রাণশক্তি আবার উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতীয় সত্তা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল, মুসলমান হইবার ঝোঁক ও মুসলমান করিবার দাপট—দুইই যুগপৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই পরম সত্যটিও ইতিহাসের চক্রান্তে যথাযথভাবে ফুটিতে পায় নাই। একজন সাধারণ ধর্ম্মপ্রচারক সন্ন্যাসী বলিয়া বর্ত্তমানের ইতিহাস-লেখকেরা দুইছত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াই ইতি করিয়াছেন। বিদেশী শাসনে মোহগ্রস্ত মানুষের মন হইতে বিজাতীয় সভ্যতার প্রতি সমস্ত অনুরাগ উৎখাত করিয়া ভারতের সনাতন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে শ্রীগৌরাঙ্গের সেদিনকার সেই দান যে কত মহীয়ান্—স্বাধীন ভারতে আজও তাহার যথোচিত স্বীকৃতির পরিচয় কোথায়?

নবদ্বীপে কাজী দলন—এক যুগান্তকারী ঘটনা। সমগ্র ভারতে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে এক নিরস্ত্র সন্ন্যাসীর সেদিনকার সেই বৈপ্লবিক অভিযান বিপ্লবের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ব্যাপার। দুর্দান্ত কাজীর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া একই রাত্রিতে লক্ষাধিক অনুচর সহ কাজীর বাড়ী ধাওয়া-করা ও বিনা অস্ত্রে তাঁহার অন্যায় আদেশ প্রত্যাহার করাইয়া লওয়ার মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ দেখিয়া কাজী পর্য্যন্ত যখন তাঁহাকে জীন্দাপীর বলিয়া সম্মান করিলেন, তখন সাধারণ মানুষ যে তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করিবে, ইহা আদৌ বিচিত্র নহে। কিন্তু এই একটি মাত্র ঘটনার ভিতর দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যে অসাধারণ সংগঠনী শক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী কালে তাহাই মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বীজ বলিয়া অনেকেই আজও বুঝিতে পারেন নাই।

বিদেশী শাসনে যখন জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছিল, বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে যখন ঐক্যবদ্ধ হইবার কোন ধারণাই ছিল না, সেই সময় এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সন্তান সারা ভারতবর্ষ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বাঙালী উড়িয়া রাজপুত ও বিহারীকে নিজ দলভুক্ত করিয়া এক বিরাট সংঘশক্তি গড়িয়া তুলিলেন—ইহা যে কতবড় ঘটনা ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। একজন সাধারণ প্রেমধর্ম্ম-প্রচারক সন্ন্যাসী নামেই গৌরাঙ্গকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, ইহাও কি ইতিহাসেরই চক্রান্ত নহে।

মোগল বাদশাদিগের বীর্যবিলাসের দম্ভ-স্তম্ভের ভিত্তি টলাইবার জন্য ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অলৌকিক ঘটনা। অদূরে আগ্রার সৌধচুম্বী দম্ভপ্রাসাদকে যেন challenge করিয়াই মথুরার কেশব মন্দিরে আবার শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতেন—এই মথুরা কতবার লুণ্ঠিত হইয়াছে।

মোগল পাঠান সারা সহর ছাইয়া ফেলিয়াছে। তথাপি এই বীর-সন্ন্যাসী শাসক-শক্তির ভ্রূকুটি ভঙ্গী উপেক্ষা করিয়া মথুরা বৃন্দাবনে লুপ্তপ্রায় ভারত সংস্কৃতির বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন। মরণোন্মুখ জাতি প্রাণে বল পাইল। শাসক গোষ্ঠী বিভ্রান্ত হইয়া গেল। মুসলমানের মধ্য হইতেও বহু লোক আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমশিবিরের শান্তি শীতল ছায়ায় প্রাণ জুড়াইল।

যৌবনে নবদ্বীপে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যগর্ব্ব চূর্ণ করিয়া আজ গৌরাঙ্গ দেখাইলেন—পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয়ী হওয়া যায় না—দিগ্বিজয়ী হইতে হয় প্রেমে। সারা ভারত প্রেমপ্লুত হইয়া উঠিল। দিকে দিকে দেশপ্রেমী সংস্কৃতির সেবকগণ মাথা চাড়া দিয়া উঠিলেন। পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় রামানন্দ ও বল্লভাচার্য্যের চেষ্টায় দলে দলে লোক সংঘবদ্ধ হইল। মহারাষ্ট্রে একনাথ অস্পৃশ্যজাতিদের লোক দিয়া নবজাগরণের সূচনা করিলেন। কবীরের উদার প্রচার-মাহাত্ম্যে লোক বুঝিল—ভগবানের উপাসনায় হিন্দু ও মুসলমানে কোন ভেদ নাই। নানক নির্ভয়ে হিন্দু ও মুসলমানকে শিষ্য করিয়া স্বতন্ত্র এক শক্তিশালী শিখ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। এই শিখই যে পরবর্ত্তী কালে মোগলের পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল সকলেই তাহা জানেন। মুসলমান হইবার স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ বিপন্ন ভারতকে বাঁচাইয়া দিলেন, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন?

বিদেশীগণের ধর্ম্মপ্রচারের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধসভ্য শ্রেণীকে তাহারা যত শীঘ্র ধর্ম্মান্তরিত করিতে পারিয়াছে, শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীকে তেমন পারে নাই। শেষোক্ত-

শ্রেণী প্রায় সহরেই প্রাধান্য বিস্তার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবন্যা যেদিন পূর্ব্ববঙ্গকে আলোড়িত করিল, সেদিন নিম্নশ্রেণীরাও মনে বল পাইল। লক্ষ লক্ষ পোদ ও নমঃশূদ্র পূর্ব্বে যেমন দলে দলে মুসলমান হইয়াছিল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমপ্রচারের পর মুসলমান হইবার ঝোঁক তাহাদের একেবারেই কাটিয়া গেল। সহরের শিক্ষিত লোকেরা অর্থে সামর্থ্যে বলীয়ান্ থাকা স্বত্বেও নানা প্রয়োজনে সময় সময় অনেককেই মুসলমান হইতে হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর নিম্ন-শ্রেণীর সহযোগিতা লাভ করায় মুসলমান করিবার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল।

কি করিয়া এই অঘটন ঘটল, তাহা অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে, এ দেশের হিন্দুকে মুসলমান করার ব্যাপার এতই সহজ ছিল যে, সেই সহজ পথটি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান হওয়াও বন্ধ হওয়া আদৌ বিচিত্র নয়।

মাত্র বদ্‌নার পানি মুখে ছিটাইয়া দিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে মুসলমান বলিয়া যে ঘোষণা করা হইত, প্রাচীন সাহিত্য হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কাহারও উপর কাহারও রাগ হইলে এইভাবে মুসলমান করিয়া দিয়া প্রতিশোধ লইবার নীচ মনোবৃত্তিরও পরিচয় রহিয়াছে। পরাধীনতার চাপে মনোবল ভাঙ্গিয়া গেলে জাতির যে অধঃপতন হয়, সমাজের সেই শোচনীয় চিত্র রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্মের আকর্ষণে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুও হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ উদারতার স্পর্শ পাইয়া বিদেশাগত সাম্যবাদের অনুষ্ঠানে আর প্রলুব্ধ হইল না। উচ্চশ্রেণীর মনে যে বৃথা আভিজাত্যের অহমিকা থাকায় উচ্চ-নীচ ভেদের বিষময় ফলে লোকে মুসলমান হইতে চাহিত, সেই অহমিকা দুরীভূত হওয়ায় নিম্নশ্রেণীদের সহিত তাহাদের সান্নিধ্য বাড়িয়া গেল। ফলে হিন্দুদের মধ্যে একতার জাগরণ পরধর্ম্মগ্রহণের সমস্ত প্রবৃত্তিই রুদ্ধ করিয়া দিল। শ্রীগৌরাঙ্গের উপদিষ্ট সদাচার পালন করিয়া মনে ও দেহে অপূর্ব্ব শক্তিলাভ করিয়া উচ্চ ও নীচ ভেদ ভুলিয়া একটা বিরাট ধর্ম্মমূলক সামাজিক সংঘ গড়িয়া উঠিল। ইহার বিরুদ্ধে তখন একদিকে গোঁড়া হিন্দুর দল, অন্যদিকে বিদেশী শাসক—উভয়েই হীনবল হইয়া পড়িল।

ফলে পল্লী অঞ্চলেও নিম্নশ্রেণীরা আর মুসলমান হইতে চাহিল না। সহর অঞ্চলের হিন্দু প্রাধান্য অক্ষুণ্ণই থাকিয়া গেল। মোগল পাঠান ও ভুঞাদের শাসনকালে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজসাহী, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান শাসনের প্রচুর কড়াকড়ি থাকা স্বত্বেও ঐ সকল সহরের হিন্দু সংখ্যা পাকিস্থান পত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কতবেশী ছিল, নিম্নের তালিকাতেই তাহা প্রমাণিত।

		অমুসলমান	মুসলমান
(১)	ঢাকা	১,৩০,৫২৫	৮২,৬৯৩
(২)	ময়মনসিংহ	৪১,৪৮৫	১১,৪৬৫
(৩)	বরিশাল	৪৩,০৯৬	১৮,২২০
(৪)	ফরিদপুর	১৭,৫৬৫	৮,১০৬
(৫)	রংপুর	২৬,৫৮৭	৭,৪৫২
(৬)	দিনাজপুর	২০,৪১১	৭,৭৭৯
(৭)	যশোহর	১৪,১৯৬	৬,২১৭

মণিপুর ও ত্রিপুরার রাজশক্তি করতলগত করিয়া এবং আসামে প্রভাব বিস্তার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ব সীমান্ত সুদৃঢ় করিলেন এবং উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজা গজপতির রাজ্যে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া সমগ্র পূর্ব্বভারতে মুসলমান সভ্যতা বিস্তারের সমগ্র সম্ভাবনা দূরীভূত করিলেন। তাহার পর পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত মুসলমান শাসকেরা শাসন করিয়াছে সত্য, কিন্তু মুসলিম প্রভাব একেবারেই খর্ব্ব হইয়া যায়। হিন্দু সংস্কৃতি টিকিয়া যায়।

মুসলমানের যে সংখ্যাগরিষ্টতা দেখাইবার জন্য ইংরাজকে আজ যত সব কুটকৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহার কিছুই করিতে হইত না। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ যদি আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে বাংলাদেশও আজ আফগানিস্থান, পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের মত মুস্লিমসংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বলিয়াই গণ্য হইয়া পড়িত। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আসিয়া বাঙ্গালী জাতিকে তাহার আত্মসম্বিদ্ ফিরিয়া পাইবার সুযোগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, এজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আজ তাঁহার চরণে পরমকৃতজ্ঞ। ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই অসাধারণ ঘটনাটিকে একেবারে পাশ কাটাইয়া যাওয়া হইয়াছে—ইহাও একরূপ ইতিহাসের চক্রান্ত ছাড়া আর কি বলিব?

পরবর্ত্তী প্রশ্ন সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দুসমাজ কোনদিনই রাজনৈতিক বুদ্ধিতে ধর্ম্মান্তরীকরণের পোষকতা করে নাই। কিন্তু যে কোন মানুষের ধর্ম্মজীবন উন্নততর করিবার আকাঙ্ক্ষায় হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণের পথে কোন বাধাই সৃষ্টি করে নাই।

আর্য্যগণ বহু অনার্য্যজাতিকে যে হিন্দুধর্ম্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন পুরাণা-দিতে তাহার বিবরণ আছে। মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে অনার্য্য কন্যা বিবাহের উল্লেখ আছে। অর্জ্জুন নাগকন্যা উলুপীকে ও ভীম রাক্ষসকন্যা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে গ্রীস, ইরান, মধ্যএসিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে যে সকল গ্রীক (যবন) পহ্লব (পার্থিয়ান) হুন, শক, ইউচি, কুশাণ প্রভৃতি জাতি ভারতে প্রবেশ করেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের অঙ্গে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার "প্রণব" পত্রিকায় 'হিন্দুধর্ম্মে শুদ্ধিবাদ' শীর্ষক যে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহারই কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্মান্তর (conversion) ছিল বটে, কিন্তু বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিতকরণ ছিল না। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম, মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্ম্মও আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরীকরণ নূতন ব্যাপার নয়। প্রাচীন ব্রাত্যষ্টোম প্রথায় বহু অহিন্দু ও আদিবাসী হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত হয়েছিল।***

ঐতিহাসিকদের মতে ৫০ হাজার গ্রীক সৈন্য হিন্দুসামাজের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। ** হেলিওডোরাস্ (Heliodoras) ক্রমে এক গ্রীক্ রাজদূত ভাগবত ধর্ম্ম গ্রহণ করে এক হিন্দু বালিকাকে বিবাহ করে-ছিলেন। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর পরমভক্তছিলেন। ** কুষাণ রাজবংশের কয়েকজন পরাক্রান্ত রাজা শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।** ২য় ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে কাথিয়াবাড়ের শক রাজগণ সকলেই শৈব ছিলেন।** পঞ্চম ও

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে আগত হূণ জাতিও হিন্দুধর্ম্মের অংশীভূত হয়ে পড়েছিল। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, হূণরাজ মিহিরগুলো (মিহিরকুল) শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ** বোর্ণিওতে প্রাপ্ত একটি যজ্ঞস্তম্ভ থেকে জানা যায়, একব্যক্তি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। **খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্মান্তর অনেকখানি শিথিল হয়ে যায়।* কিন্তু পুনধর্ম্মান্তরিতকরণ (Re-conversion) পুরোদমেই চলত। হাজার হাজার ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে ও সমাজে গৃহীত হয়। ** অগ্নিপুরাণ পুনর্ধর্ম্মান্তরীকরণ ও শুদ্ধির স্বীকৃতি আছে। ** মুসলমান ঐতিহাসিক অল্ বিনৌরীর মতে অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধুপ্রদেশে মুসলমান প্রভাব নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে। সেই সময় বহু ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু পুনরায় হিন্দু হয়ে গিয়েছে। পঞ্জাবের রাজা জয়পালের এক পৌত্র ইস্লামে ধর্ম্মান্তরিত হয় এবং তাঁর নামকরণ হয় নবাব শাহ্। গজনীর সুলতান মামুদ তাকে পঞ্জাবের একটি জেলার শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি পরে হিন্দুধর্ম্মে পুনরায় ধর্ম্মান্তরিত হন্।** পাণিপথের যুদ্ধের পর নরহরি নবলেকার নামে এক মারাঠী ব্রাহ্মণ মুসলমান ধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত হইয়া যান, বার বৎসর পরে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের কাশী পৈঠানের ব্রাহ্মণগণ তাঁর পুনর্ধর্ম্মান্তরিতকরণের স্বপক্ষে সমর্থন জানান। ফলে তিনি আবার হিন্দু হতে পেরেছিলেন। নিম্বলকার বংশের এক সর্দ্দারকে শিবাজী পুনরায় হিন্দুধর্ম্মান্তরিত করেছিলেন এবং নিজের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। ছত্রপতি শিবাজীকে হিন্দুধর্ম্মের একনিষ্ঠসেবক বলিয়াই সকলে জানেন। তিনি নিজে একজন ধর্ম্মান্তরিতকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিয়া জামাতা করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সুতরাং শিবাজীর সময় পর্য্যন্ত যে এই-ভাবে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ চলিয়াছিল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ তো গেল ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুর স্বধর্ম্মে গ্রহণের কথা। একেবারে বিদেশী ও বিধর্ম্মীকে পর্য্যন্ত শুদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে পরম উদার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভক্ত হরিদাসের কথা ও বল্লালদীঘির কাজীবংশের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিজলীখান্ প্রভৃতি অসংখ্য পাঠানকে 'পাঠান বৈষ্ণবে' পরিণত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হিন্দু সমাজের বিপুল প্রাণসত্তার যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফলে আজ পর্য্যন্ত এদেশে গ্রীক্ মার্কিণ ইংরাজ ও ফরাসী প্রভৃতি অসংখ্য অহিন্দুর হিন্দুধর্ম্মের গৌরকীর্ত্তন করিবার সুযোগ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী এনিবেশান্ত, ভগ্নী নিবেদিতা, শ্রীসুমহিলা সাবিত্রী দেবী, পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের mother প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলিতে গেলে শ্রীগৌরাঙ্গের শুদ্ধি প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তক।**

পূর্ব্ব প্রবন্ধের পরই প্রশ্ন উঠিবে, তাহা হইলে, ধর্ম্মান্তরিতগণ-মধ্যে যাহারা ফিরিয়া আসিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের পুনরায় স্বধর্ম্মে গ্রহণ করা হয় নাই কেন?

এই কেমর উত্তর দিতে হইলেই রাজনৈতিক চক্রান্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। সাহস করিয়া রাজপুরুষদের মতবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবার শক্তি থাকে না। এক্ষেত্রেও কতকটা সেই মতই ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—ধীর ভাবেই তাহা পর্য্যালোচনা করা উচিত।

ইংরাজ যতদিন শাসক ছিল, ততদিন খ্রীষ্টান করার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। ইংরাজ মিশনারীরা একদিকে ধর্ম্মান্তরিত করিত, আর অন্যদিকে এদেশে ইংরাজ শাসন কায়েম রাখিবার কাজে কতকটা গুপ্তচরের মতই কাজ করিত? স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কুষ্টিয়ার পাদ্রী হিকেন্‌বোথামকে হত্যা ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ বাঘা যতীন্ প্রভৃতির জড়িত হইয়া পড়ার মূলে এই রাজনৈতিক ব্যাপারই ধরা পড়িয়া যায়। ঠিক এইভাবেই মোগল পাঠানদের আমলেও কাহাকেও মুসলমান করিলেও কেহ কথা কহিতে সাহস করিত না; আবার তেমনি কোন ধর্ম্মান্তরিত মুসলমানকে হিন্দু ধর্ম্মে শুদ্ধি করিয়া লইবার কথা উত্থাপন করিতেও কেহ সাহস করিতে পারিত না।

অবশ্য গোঁড়া হিন্দুর দলও এই সব ধর্ম্মান্তরিতগণকে পুনর্গ্রহণের বিরোধীই ছিলেন। তাহারও প্রধান কারণ,—তাঁহারা মনে করিতেন—তাহাতে স্বধর্ম্মের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। সকলেই যে ধর্ম্ম বুদ্ধিতে এই শুদ্ধি দ্বারা পুনর্গ্রহণের বিরোধী ছিলেন তাহা মনে করা যায় না, কারণ তাহা হইলে ছত্রপতি শিবাজী বা দক্ষিণ ভারতের কাশী পৈঠানের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শুদ্ধি করিবার মত দিতেন না। রাজার অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় ও রাজার বিরাগভাজন হইবার ভয়ে যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তখন ধর্ম্মান্তরিতগণকে শুদ্ধি করিয়া লইবার বিপক্ষেই পাঁতি দিতেন, সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ যদুনাথ সরকার তাহার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন।

সকলেই জানেন যে, কাশ্মীর রাজ্য সুপ্রাচীনকাল হইতে হিন্দু রাজ্য—রাজ্যের নরনারী চিরদিনই ছিল হিন্দু। সুপ্রসিদ্ধ 'রাজতরঙ্গিনী' নামক কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে, এই সত্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কালক্রমে ঐ রাজ্য মুসলমান আক্রমণকারীদের কবলিত হয়? পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান জয়নুল আবেদীন কাশ্মীর অধিকার করতঃ দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে মুসলমান হইতে বাধ্য করে। শুধু মুসলমানই করিল—উহাদের উন্নতিরও ব্যবস্থা করে নাই—উহাদিগকে শোষণ করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে 'ডোগরা' ক্ষত্রিয়দের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মুসলমানেরা কাশ্মীর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবার পর ঐ সকল বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত মুসলমান পুনরায় হিন্দু হইবার জন্য আকুলতা প্রকাশ করা সত্ত্বেও কি ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, ইতিহাসাচার্য্য যদুনাথ সে সম্বন্ধে Hindusthan Standard পত্রিকায় ৮ই আগষ্ট (১৯৫৪) তারিখে Hindu Unity—a dream' শীর্ষক যে মর্ম্মান্তিক প্রবন্ধ লিখেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—

"প্রায় পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে সুলতান জয়নুল আবেদীন্ ব্যাপকভাবে কাশ্মীরের হিন্দুগণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণের' কোনরূপ সামাজিক মর্য্যাদা ছিলনা। রাজপুরুষেরা ইহাদের সহিত নানারূপ উৎপীড়ন ও দুর্ব্যবহার করিত

—শিক্ষা দীক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ রণধীর সিংহের নিকট ঐ সব উৎপীড়িত ও ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণ পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য আবেদন জানায়। কাশ্মীররাজ কাশী ও প্রয়াগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট ইহাদিগকে পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইবার জন্য আবেদন জানান্। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র বিচার করিয়া 'শুদ্ধীকরণ' সম্ভবপর নয় বলিয়া চরম অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু সনাতনপন্থী গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিলেও আর্য্যসমাজীরা 'শুদ্ধি' করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার ও সনাতনপন্থী গোঁড়াদের প্রবল বিরোধিতায় এই মহৎকার্য্য সম্পাদন সম্ভবপর হয় নাই। ফলে কাশ্মীরের কয়েক লক্ষ হিন্দু হিন্দুসমাজদেহ হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও হিন্দুদের চরম অন্ধ গোঁড়ামীর জন্য আর ফিরিয়া আসিতে পারিল না।"

স্যার যদুনাথ সবই বলিয়াছেন, ইতিহাস হিসাবে সত্য ঘটনাটিই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজ সরকার সে কি ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছিল, তাহাই মাত্র বলিয়াছেন। আসল কথা ইংরাজ ঐ সময় হইতেই ভবিষ্যচ্চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল—কাশ্মীরকে ঘাঁটি করিবার দুরদৃষ্টি হইতেই মহারাজ রণধীরের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্যই একদিকে গোঁড়া পণ্ডিতগণকে আর্য্যসমাজীদের বিরুদ্ধে ও অন্যদিকে গোঁড়া মোল্লাগণকে হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া অতগুলি আগ্রহান্বিত কাশ্মীরীর হিন্দু হইবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছে। ১৮৮০ সালে আগ্রহান্বিত মুসলমানেরা আজ যদি হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে পাইত, তাহা হইলে কাশ্মীর সমস্যা আজ কোথায় থাকিত? এই সব কথা এখনকার ইতিহাসে প্রকাশিত নাই কেন?

ধর্ম্মভীরু দেশমাত্রেই ধর্ম্মাচার্য্যগণ জনসাধারণের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন? এজন্য হিন্দুরাজাগণের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যাঁহারাই শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, সকলেই এই শ্রেণীটিকে হাতে রাখিবার চেষ্টা করেন।

মোগল আমলেও জায়গীর খেলাৎ ইনাম প্রভৃতি দ্বারা হিন্দু পণ্ডিতগণকে তোয়াজ করিবার ব্যবস্থা ছিল। ফলে "দীল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" ইত্যাদি স্তাবকতামূলক শ্লোকের রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল। ইংরাজও এই নীতি হুবহু অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে (ফলে দু'একজন পণ্ডিতকে রাজসম্মান দিয়া ও দুইচারিটী বিরাট লাভজনক পণ্ডিতীপদ সৃষ্টি করিয়া হাজার হাজার পণ্ডিতবাহিনীকে বকাণ্ড প্রত্যাশা স্যায়ে ইংরাজ শাসকগণেরই মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছিল। সাহেবের ইঙ্গিত অনুসারে কথা বলিতে তাঁহারা সব সময়ই অনুকূল শাস্ত্রের দোহাই দিতে কিছুমাত্র কশুর করেন নাই। বর্ত্তমানকালেও বেশ দেখা যাইতেছে হিন্দুকোড বিলের অসংখ্য ধারা হিন্দুশাস্ত্রের বিধিবহির্ভূত সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও পণ্ডিতগণ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন না। এমন কি যে ডাইভোর্স বিল হিন্দুনারীত্বের মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব খর্ব্ব করিল, রাজপুরুষগণের তৎপ্রতি বেজায় ঝোঁক্ দেখিয়া পাছে তাঁহাদের অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়, সেজন্য তাঁহারা ইহারও বিরুদ্ধে কোন সংঘবদ্ধ আন্দোলন করেন নাই।

পূর্ব্বোক্তকারণেই যে কাশী ও প্রয়াগের পণ্ডিতগণ কাশ্মীরী মুসলমানগণের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। একদিকে সরকারের কৃপাপুষ্ট হিন্দুপণ্ডিতগণের পক্ষ হইতে করুণ চীৎকার—এই সব ধর্ম্মান্তরিত মুসলমানকে পুনরায় হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিলে হিন্দু ধর্ম্মের পরম পবিত্রতা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে; আর অন্য দিক্ হইতে তুল্যভাবেই সরকারের পক্ষ পুটাশ্রিত মুসলমান মৌলভী ও সামসুলউলেমাগণের কাতর প্রার্থনা—এই সব মুসলমান যদি পুনরায় কাফেরের ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহা হইলে ইসলামের এত বড় অসম্মান কদাপি সহ্য করিতে পারা যাইবে না অর্থাৎ রক্তারক্তি কাণ্ডকারখানা বাধাইয়া ইহাদের অনাসক্ত চিত্তের মাঝখানে পবিত্র ইসলামকে কায়েম করিয়া রাখিতেই হইবে। এহেন উভয় সঙ্কটে পড়িয়া পরম বকধার্ম্মিক নিরপেক্ষতার কঞ্চুকাবৃত ইংরাজকে যেন বাধ্য হইয়াই কাশ্মীররাজ রণধীর সিংহকে দাব্ড়ি দিতে হইল—অশান্তি মূলক কাজ হইতে যেন তিনি নিবৃত্ত হন্। অন্যথা তাঁহার যে গদীচ্যুত হইবার ভয় ছিল না, একথা লর্ড ড্যালহৌসীর উত্তরাধিকারীদের যাঁহারা চিনেন, তাঁহারা কেহই বলিতে পারিবেন না।

শুধু কাশ্মীর নয়, এইভাবে ভারতের সকল স্থানেরই ধর্ম্মান্তরিতগণ উপেক্ষিত হইয়া হিন্দুর প্রতি ঘোরতর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে। আর এই বিদ্বেষের সুযোগ গ্রহণ করিয়াই রাজশক্তি যুগে যুগে হিন্দু ও মুসলমান উভয় প্রজাকেই শাসন ও শোষণ করিয়া আসিয়াছে।

বাদশার দলবল যখন উত্তর ভারতে মুসলমান করিতেছিল, ইউরোপীয় বণিকেরা তখন দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর গুলিতে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিতেছিল। সুখের বিষয়, সে সময় বহু হিন্দুরাজা এই সব বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিতগণকে পুনরায় হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন। তাঞ্জোরের রাজারা এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, অমুক সময় মধ্যে যদি তাহারা হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ না করে তবে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এই কড়া ব্যবস্থার ফলেই তৎকালীন বহু খৃষ্টধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিকে পুনরায় হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। কথাগুলি অবশ্য বলিয়াছেন—ইতালীয় পর্যটক মেনুচী মহাশয় (menuchi) তিনি নিজে খ্রীষ্টান ছিলেন, হিন্দু খ্রীষ্টানরা পুনরায় হিন্দু হইতেছে দেখিয়া হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলাও স্বাভাবিক। তবে একথা খুবই সত্য, হিন্দু রাজাদের পতনের পর ইউরোপীয়গণ যে নির্ব্বিবাদে খ্রীষ্টান করিবার পবিত্র কাজ করিয়া চলিয়াছেন, ইহা আজও প্রকট প্রত্যক্ষ হইয়া উৎকট ত্রাসেরই সঞ্চার করিয়াছে।

কথাটা উল্লেখ করিলাম, কারণ তৎকালে দাক্ষিণাত্যের মত উত্তর ভারতে ধর্ম্মান্তরিত মুসলমানগণকে (হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেও) পুনগ্রহণে কাহারও সামর্থ্য ছিল না। ১৯৪৬ সালে "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান" বিষয়ক দাঙ্গার সময় 'বলাদ্ ধর্ষিতা' এবং 'রজসা শুধ্যতি নারী' প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রবচনে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুকে পুনরায় হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল, ঐ সকল শাস্ত্র পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণও নিশ্চয়ই জানিতেন, কিন্তু ইতিহাসের চক্রান্তে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

বিষকন্যা

প্রফুল্লকুমার বসু

প্রথম যখন দেখি ওকে, অতীতে-শোনা ঢিমে-তালের অথচ আবেগময় এক অপূর্ব সঙ্গীতের কথা আমার মনে পড়ে। গীতিকারের নাম মনে নেই, কিন্তু গানের কথাগুলো আজো স্পষ্ট—স্বর্ণাক্ষরের মতো উজ্জ্বল আমার স্মৃতির পাতায়। অনিন্দ্যসুন্দরী একটি মেয়ে, কোমল রেশমের মতো কুঞ্চিত কেশদাম বাতাসের দোলায় অজস্র সোনার সুতোর মতো উড়ছে। দয়িতের মনে সৃষ্টি হয়েছে মোহজাল—বসন্তের আগুনে-রাঙা। দয়িতার মৃত্যুর পর দয়িত সেই সোনা-ঝরান কেশগুচ্ছ কেটে, তাই দিয়ে বেহালার ছড়ি বানায়। ব্যথা-কাতর চোখে বিরহী বাজায়। উদাসী-বাউল বাতাসে সে সুর ভেসে বেড়ায়—সুর তো নয়—যেন কান্না। অতীতের গর্ভ থেকে উঠে-আসা একটা বোবা-কান্না মুক্তির পথ খুজে খুঁজে ফেরে। শ্রোতাদের চোখে দেখা দেয় মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু।

চোখে ওর অতল সমুদ্রের রহস্য—মৃত্যুর মতো কালো, আবার মৃত্যুর মতোই মোহময়। কতো লোক সেই রহস্যের অতলে গেছে তলিয়ে, আবার কতো লোক লাভ করেছে অজস্র প্রসাদ। ঠোঁটে মনালিসার রহস্যগূঢ় হাসির আলপনা ওর। চতুর্দিকের উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারের আবিলতা তার কুমারী হৃদয়ের শ্বেত পদ্মটিকে ম্লান করতে পারেনি। ইন্দ্রাণীর মতো রূপ—ঋজু বরদেহ। শিশুর মতো পবিত্র, রজনীগন্ধার মতো কোমল দুটি হাত। বহুবার দেখেছি। স্থির বিদ্যুতের মতো চিত্রার্পিত—সারস্বত-কুঞ্জে যেন হংসবাহিনী অধিষ্ঠিতা, চারপাশে শত শত শ্বেত-পদ্ম যেন ভারতীর বাঙ্ময়ী শুভ্রতার কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর জীবনেও একদিন যৌবনের বান ডেকেছিল—আর সেই কামনা-মধুর স্রোতাবর্তে ভেসে গিয়েছিল ও। যে-কেউ এসেছে ওর জীবনে—সেই পুড়েছে রূপের আগুনে। ডুবেছে চোখের নীল দরিয়ায়।

কণ্ঠস্বর কিশোরীর মতো স্নেহ-কোমল, বিয়ের রাতের মতো স্বপ্নময়। মাঝে মাঝে ওর পায়ের কাছে বসে কৌতুক-উচ্ছল কণ্ঠে বলতুম—দেবী, তোমার জয় হোক।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা দুজনে পুরীর সমুদ্রতীরে বসে। সারাদিনের রৌদ্র-দহনে আকাশ বড় ক্লান্ত-নিরানন্দ। সমুদ্রের কালো জলরাশি উচ্ছ্বসিত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ এসে তীরের ওপর উন্মাদের মতো আছড়ে পড়ছে। অবাক বিস্ময়ে সমুদ্রের পাগলামি দেখছে ও—ওর নির্নিমেষ চোখেও কি এক পাগলামি। বালির ওপর গোড়ালি দিয়ে ছোট ছোট গর্ত করতে করতে নিজের হারিয়ে-যাওয়া অতীতের কথা বলে ফেললে—হয়তো এর জন্যে একদিন আফসোসের সীমা থাকবে না।

—দেখ বন্ধু, তোমার এতখানি ভক্তি-মুগ্ধ প্রীতির যোগ্য নই আমি। ভাবছ বিনয়! তা নয় কিন্তু। জীবনটা আমার অনেকটা নাটকের মতো—বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ। পৌরাণিক পবিত্রতা আদৌ নেই। জ্ঞান হয়ে অবধি, যতদূর মনে পড়ে, এক নারীর কোলে পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছি। গায়ে মাখম-নরম সিল্কের পোশাক, গলায় সোনার হার, হাতে বালা। সদাসর্বদা আমাকে নিয়ে সে কী হৈ হৈ—!

—ছেলেবেলার কথা আজো ভুলতে পারিনি—হয়তো কোনদিনই সে স্মৃতি এতটুকু ম্লান হবে না। সেই সব স্বপ্ন-মধুর দিনের আশীর্বাদ আজও অনুভব করি আমার দেহে মনে। অন্তরের মণিকোঠায় অনির্বাণ দীপশিখার মতো সে ছবি আজও সমান উজ্জ্বল।

—আয়নায় নিজের মুখ দেখতে যাই। দেখতে দেখতে একসময় চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, আমার মুখখানা আস্তে আস্তে কখন অদৃশ্য হয়ে যায়, সেখানে আর একখানা মুখ ভেসে ওঠে। নীল অম্বরে স্থির বিদ্যুতের মতো মুখ। স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি। চিনতে পারি—হ্যাঁ, সেই জ্যোতির্ময়ী নারী—যাঁর আদর আর স্নেহে, চুম্বন আর আশীর্বাদে, মিষ্টি

কথা ও সদা-সতর্ক যত্নে আমার ছোট্ট হৃদয়খানি সন্ধ্যাকাশের মতো রাঙা হয়ে থাকতো। তারপর কি হ'ল জান? আমিই জানি না ভালো করে।

—হয়তো কোনো বিশ্বাস-ঘাতক চাকর আমাকে চুরি করে কোন ভ্রাম্যমান সার্কাসদলের সত্বাধিকারীর কাছে বিক্রী করে আসে। আমার কাছে সেটা আজো 'হয়তো'ই রয়ে গেল। কোনদিন আর সে কথা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু বেশ মনে আছে আমার শৈশব কাটে এক সার্কাস দলে। দলটী দেশ-দেশান্তরে মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াত। সঙ্গে যেত মাল-বোঝাই গাড়ি, জন্তু-জানোয়ারের মিছিল—আর যেত সার্কাসের সেই চিরন্তন যন্ত্র-সঙ্গীত—বিকট, কর্ণভেদী অসহ্য।

—খুবই ছোট আমি তখন, ওরা আমায় হরেক-রকম খেলা শেখাত—আঁট-করে-বাঁধা তারের ওপর নাচ, ঢিলে তারের ওপর খেলা, আরো কতো রকমের। শেখাতে শেখাতে কী মারটাই না মারতো। খেতে পেতুম শুকনো পোড়া রুটি। মাংস স্বপ্নেরও অতীত। একদিন চুরি করে খেয়েছিলুম—একটা ক্লাউন তার কুকুরের জন্যে মাংস রেঁধেছিল—তাই চুরি করে মালগাড়ির মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে খাই। সেদিন কি আনন্দ, কি তৃপ্তি যে পেয়েছিলুম তা তোমায় বলে বোঝাতে পারব না।

—বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ ছিল না। সার্কাসের আস্তাবলের কাজ—এই রকম আরও কতো নোংরা কাজ আমাকে দিয়ে করাতো। সারা গায়ে আমার কালসিটে আর ক্ষতচিহ্ন। দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মারধোর করতো মালিক স্বয়ং—বুড়ো শয়তানটা আমায় ঠেঙিয়ে যেন আনন্দ পেত। সকলে ওকে ভয় করতো। ব্যাটা কৃপণের জাসু, গদির নিচে টাকা লুকিয়ে রাখতো, সেই টাকা জমা দিত ব্যাঙ্কে। লোকজনকে মাইনের টাকা দিতেও বুক ওর ফেটে যেত।

—অন্য কোন মেয়ে হলে এতদিনে শেষ হয়ে যেত, আমি কিন্তু দিন দিন বাড়তে লাগলুম। যত বয়স বাড়ে, ততই যেন আমার রূপ খুলতে থাকে। দিন দিন সকলের কামনার ধন হয়ে উঠি। পনেরয় পা দিতে দিতেই প্রেম-পত্র পেতে শুরু করি। সার্কাসের বেড়ার ফুলের ভেতর তোড়া ছুঁড়তো দর্শকরা। ওরা আমায় কামনা করে, আমি যেন ওদের শিকার। আমার গোলাপী রংয়ের দেহের-সঙ্গে-মিশে-যাওয়া পোশাকে ওদের কামনা-পীড়িত দৃষ্টি। একদিক-থেকে-আর-একদিক-পর্যন্ত-টাঙান তারের ওপর নাচতে নাচতে যখন দর্শকদের বিশেষ কোন ভঙ্গিমায় অভিনন্দন করতুম, দেহের মোহময়ী আবেষ্টনীর চার-পাশে তখন শত শত আশ্লেষ-তৃষিতা আঁখি-মক্ষিকার মধুপান উৎসব। কি আনন্দই না হোত তখন। মনে হত আমি যেন সাম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা—আর ভুবনবিজয়ী সীজার আমার পদতলে। কিন্তু কিছুদিন যেতে ওরা সব কেমন বদলে গেল। একেবারে অন্যভাবে আমার সঙ্গে কথা বলে। সাজঘরে পোশাক ছাড়ছি, দেখি জানলার ফাঁকে দু'টি চোখ। কেউ কেউ আবার সাজঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করে। কিন্তু মালিকের মাথা একবারে ঘুরে গেছে। আমার কাছে এলে ওর মন চঞ্চল হয়ে উঠতো, একটা তীব্র জ্বালা ওর সর্বাঙ্গে—বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হোত না। একদিন তো বিয়ের প্রস্তাবই করে ফেললে বুড়ো। শুনে রাগে লজ্জায় মুখ আমার রাঙা হয়ে গেল। পৈশাচিক উল্লাসে ওর মুখের ওপরই হো হো করে হেসে উঠি। ওর প্রতি আমার মন ছিল বিষিয়ে, কখনোই ওকে দেখতে পারতুম না। আমার ওপর কী অত্যাচারই না করেছে। তার শাস্তি পাবে না? এ কখনো হয়? জীবন ভোর মানসিক নির্যাতন ভোগ করুক—এই ছিল ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা। কামনার তীব্র জ্বালায় ওর এই আত্ম-পীড়ন দেখে আমার লাঞ্ছিত নারীত্ব গর্বে আনন্দে নাগিনীর মতো ফণা তুলে নেচে উঠতো। ক্ষমা? নৈব নৈব চ।

—আমার তূণে যতো বাণ ছিল, সব ওর ওপর প্রয়োগ করি। ছল-চাতুরি, একটু সোহাগ, একটু মিষ্টি-কথা, রহস্য-ভরা আবেদন-বহ তীর্যক কটাক্ষ, এক টুকরো খুশিয়াল হাসি—নারীর সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগে ওকে একেবারে ভেড়া বানাই। যাই হোক, ও কিন্তু সত্যিই আমায় ভাল-বাসতো। ওর কাছে অবশ্য মেয়েমানুষের কোন দাম নেই—মেয়েমানুষ যেন মাটির ঢেলা, মন বলে যে আমাদেরও একটা বস্তু আছে—সে-কথা ও বিশ্বাস করতে চাইত না। মেয়েমানুষ ওর কাছে শুধু আরাম ও বিস্মরণের পাসপোর্ট মাত্র। বুড়োরা যেমন করে তরুণীদের ভাল-

বাসে—ঠিক তেমনি করে ও আমায় ভালবাসতো—বার্ধক্যের সমস্ত উত্তাপ আর কামনা দিয়ে ভালবাসতো আমায়—মানে আমার যৌবন-টলটল দেহকে। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে বিলিয়ে দেয়—আমিও ওকে নিয়ে যা-ইচ্ছা তাই করি।

—তারপর এক সময় আমিই সার্কাসের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে উঠি। আর বেচারা বৃথা আশা আর অর্থহীন মোহে তিল তিল করে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলে। আমার দেহ স্পর্শ করার মতো সাহস কোনদিনও হয়নি ওর। আমার শাড়ি, জুতো, জামা—এদের আদর করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। এক একদিন আমার পায়ের তলায় বসে প্রেম ভিক্ষা চায়—বিয়ের কথা বলতে বলতে চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ে। আর আমি? হাসি-উচ্ছল ঝরণার মতো আনন্দে গড়িয়ে পড়ি। স্মরণ করিয়ে দিই অতীতের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা। উর্ধ্বাঙ্গের আবরণ খুলে দেখাই ওর বর্বরতার স্বাক্ষর। মাথা নত করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে মদের বোতল খোলে। সুরার তীব্র জ্বালায় ওর ভেতরের জ্বালা ডুবে যায়।

—সোনা-দানায় আমার সর্বাঙ্গ ভরা। কতো রকমে ও আমার মন পাবার চেষ্টা করতো। কাঁচা বয়েস, তবু আমার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতো না। একদিন সন্ধ্যাবেলা বুড়ো আমার পাশে বসে। ঘরের ভেতর আলোছায়ার লুকোচুরি। সেই আলো-আঁধারে আমরা দুজনে—এক কামনা-কাতর বৃদ্ধ আর এক রহস্যময়ী তরুণী। পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেই একেবারে জল হয়ে গেল। আমিও সেই সুযোগে ওকে দিয়ে উইল করিয়ে নিই—টাকাকড়ি, বাড়ি-ঘর মায় সার্কাস শুদ্ধু আমার নামে লিখিয়ে নিলুম। কোন আপত্তি করলে না, নিঃশব্দে সই করে দিলে।

—শীতের মাঝামাঝি। আমরা তখন শ্রীনগরে। ডাল হ্রদের পাশে আমাদের তাঁবু। সারাদিন ঝির ঝির তুষার-পাত। হাড়-কাঁপান কনকনে হাওয়া। উনুনের ধারে বসে হাত-পা না সেঁকলে কিছুতেই শীত যায় না। রাত্তিরে খেলা শেষ হবার পর আমরা দু'জনে খাচ্ছি। খেতে খেতে নানা গল্প। খাবার সময় প্রচুর মদ পান করে ও। কেন জানি না সেদিন ওর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করি। জীবনে কোনদিন যা করিনি। বার বার ওর গেলাস ভর্তি করে দিয়েছি উগ্র গোলাপী পানীয়ে। ও-ও নিঃশেষ করেছে খুশী মনে। অজস্র চুম্বনের অভাবনীয় আকস্মিকতায় ওর মনের আগল চূর্ণ-বিচূর্ণ। প্রেমের মদিরা আর মদের নেশায় বন্যাস্রোতে ভেসে-যাওয়া তৃণ-খণ্ডের মতো অবস্থা তখন ওর। উত্তেজনায় দেহ থরথর। হঠাৎ দেখি চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়েছে—বজ্রাহত বনস্পতির মতো দেহ মাটিতে লুটিয়ে—চোখ দু'টি চিরতরে নিমীলিত, বক্ষ স্পন্দনহীন।

—সকলে ঘুমে অচেতন। গা-ছম-ছম অন্ধকার। নিঝুম রাত। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু অবিরাম ঝিরঝির বরফ পড়ার শব্দ। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আমারও কেমন ভয় ভয় করছে। আস্তে আস্তে উঠে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিলাম। তারপর দরজা খুলে মাতালটাকে পাটের গাঁটের মতো টানতে টানতে বাইরে—একেবারে বাইরে—তাঁবু থেকে অনেক—অনেক দূরে—।

—সকালে ওর মৃতদেহ সবার চোখে পড়ে। ঠাণ্ডা পাথর—বরফের চাদরে ঢাকা। ও যে কি রকম দুর্দান্ত মাতাল ছিল, তা সকলেই জানতো। কেউ তাই আমাকে এতটুকু সন্দেহ করলে না।

—দেখ, শাস্ত্রে বলে ক্ষমা করা, ভালবাসা নাকি ধর্ম। হয়তো হবে। কিন্তু লাভ কি বলতে পার? এই দেখ না, বুড়োটাকে ক্ষমা না করে আজ আমি কেমন রাণীর মতো আছি। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। ওসব কথা থাক এখন। চল, কোন রেস্তোরাঁয় যাই। গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে হবে। জীবনে কোনদিন একসঙ্গে এত বকবক করিনি।

সিপাহীবিদ্রোহ

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

১। উপক্রমণিকা

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে ভীষণ বিপ্লববহ্নি জলিয়া ওঠে—ইতিহাসে তাহা সাধারণত সিপাহী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয় তখন হইতেই কেহ কেহ এই বিপ্লবকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই আখ্যা দিয়া থাকেন। ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বীর সাভারকর উপরোক্ত নাম দিয়া ইংরেজীতে এই বিপ্লবের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লেখেন। ভারতে এই গ্রন্থের প্রচার নিষিদ্ধ হইলেও গোপনে ইহার কতকগুলি সংখ্যা ভারতে পৌছে। যুবক সিকন্দর হায়াৎ খাঁ, যিনি পরে পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন, বিলাত হইতে ফিরিবার সময় নিজের বাক্সের তলায় একটি ছদ্ম আবরণ জোড়া লাগাইয়া কয়েক খণ্ড গ্রন্থ এদেশে নিয়া আসেন। এ বইর তখন খুব আদর ছিল—গোপনে লোকের হাতে হাতে ফিরিত। সেকালের বিপ্লবীরা এই বই হইতে যথেষ্ট প্রেরণা পাইয়াছিল। বাংলা দেশে লোকসঙ্গীত ও ছড়া গানে বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই, কুমারসিংহ প্রভৃতি নায়ক-নায়িকার কীর্ত্তিগাথা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় জনসাধারণকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিত। বস্তুত ১৮৫৭ সনের বিপ্লব-কাহিনী স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হইয়া বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রামে যে প্রচুর উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সেদিক দিয়া দেখিলে বীর সাভারকরের বই এবং তাহার মূলভাবধারা যে সেকালের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতে সে প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। যাহাতে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় তাহার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়াছে। সুতরাং ১৮৫৭ সনের যে বিপ্লব তাহা প্রধানত সিপাহীদের বিদ্রোহ অথবা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ইহা ধীরভাবে বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। যাহাতে ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারে তাহার জন্য ভারত সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন এবং একজন প্রবীণ ঐতিহাসিককে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ঐতিহাসিকগণ যদি নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া এই বিষয়টি নানাদিক হইতে আলোচনা করেন তাহা হইলে ভারত সরকারের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই উদ্দেশ্যেই আজ এই বিখ্যাত বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে সমসাময়িক ও পরবর্ত্তীকালে লিখিত বহুসংখ্যক গ্রন্থ আছে। ইহার অধিকাংশই ইংরেজের লেখা। এই সমুদয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রথম হইতেই সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় শ্রেণীর লেখকদের মধ্যেই দুইটি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল। একদল মনে করিতেন যে প্রথমে সিপাহীরাই ধর্ম্মনাশের ভয়ে এবং অন্যান্য কারণে বিদ্রোহী হয়—তাহাদের সফলতায় উৎসাহিত হইয়া অযোধ্যা প্রদেশের ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানের নানা শ্রেণীর বেসামরিক লোকও ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। কারণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যা প্রদেশ দখল করায় এবং বহু তালুকদার ও রায়তের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় ইংরেজের প্রতি তাহাদের বিশেষ আক্রোশ ছিল। তাহারা প্রতিশোধ লইবার এবং হৃত জমি পুনরায় অধিকার করিবার সুযোগ পাইয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহা ছাড়া গুণ্ডা বদমায়েসের দল—যাহারা যে কোন সুযোগ পাইলেই লুঠ-তরাজ করিতে অভ্যস্ত—তাহারাও দলে দলে এই যুদ্ধে ভিড়িয়া গেল—এবং ভারত ও ইংরাজ উভয়ের প্রতিই সমান অত্যাচার করিত। এদেশীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবংশীয় ব্যক্তি ইংরেজের হস্তে লাঞ্ছিত ও বিশেষ

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই, কুমারসিংহ প্রভৃতি যে কয়েকজন বিশেষরূপে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ছিলেন তাঁহারাও সিপাহীদের প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া স্বেচ্ছায় অথবা ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া এই বিদ্রোহে যোগদান এবং নায়কত্ব করেন।

দ্বিতীয় মত এই যে সিপাহীবিদ্রোহ একটি গভীর ষড়যন্ত্রের ফল। বহুদিন পর্য্যন্ত গোপনে এই ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—যাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া ওঠে। সিপাহীরা উপলক্ষ মাত্র—তাহাদের সাহায্যে ইংরেজ শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের নায়কগণ নানা উপায়ে তাহাদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলেন।

প্রথমে এই দ্বিতীয় মতটির আলোচনা করা যাউক। কোন ষড়যন্ত্র এবং তাহার ফলে পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত বিশেষ কোন পরিকল্পনা অনুসারে ব্যাপকভাবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল—এই মত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে যে ষড়যন্ত্রকারীরা কে এবং পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা কি ছিল? যাঁহারা এই মতের সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন, অথবা প্রকারান্তরে স্বীকার করেন যে নানাসাহেব, বাহাদুর শাহ, লক্ষ্মীবাই, কুমারসিংহ প্রভৃতিই এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। কেহ কেহ ইহার সঙ্গে মৌলবী আহমদ উল্লার নামও যোগ করেন। তাঁতিয়া টোপী প্রথমে নানা ও পরে লক্ষ্মীবাইর অনুচর হিসাবেই কার্য্য করিয়াছেন। এই কয়জন ব্যতীত আর এমন কেহ এই বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই, যিনি কোন রকমে এই ষড়যন্ত্রের নায়কত্ব দাবী করিতে পারেন।

যে কয়েকজনের নাম করা হইল তাঁহারা এই বিদ্রোহে কে কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পৃথকভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ বিদ্রোহের পূর্ব্বে যে তাঁহারা কখনও একত্র মিলিত হইয়াছেন অথবা তাঁহাদের মধ্যে কোনপ্রকার যোগাযোগ ছিল ইহার কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

২। বাহাদুর শাহ

মীরাটের বিদ্রোহী সিপাহীরা যখন দিল্লী আসিয়া পৌঁছিল এবং রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইল—তখন পর্য্যন্ত বাহাদুর শাহ এই বিদ্রোহের কোন সংবাদই জানিতেন না। গোলমাল শুনিয়া তিনি প্রাসাদরক্ষীগণের নায়ক কাপ্তান ডগলাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি? ডগলাস বলিলেন তিনি কিছুই জানেন না—তবে নীচে গিয়া সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ ভীত হইয়া তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। সিপাহীদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করা তো দূরের কথা—তিনি যে বিদ্রোহের কোন সংবাদও জানিতেন না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন বিদ্রোহের খবর শুনিলেন তখনও তাঁহার সহানুভূতি ছিল ইংরেজদের দিকে। ডগলাস সিপাহীদের হাতে প্রাণ হারাইবার অল্পকাল পূর্ব্বে বাহাদুর শাহকে অনুরোধ করিলেন—তিনি যেন পাল্কী পাঠাইয়া ইংরেজ রমণীদিগকে রাণীর মহলে লইয়া যান। বাহাদুর শাহ কেবল এই ব্যবস্থাই করেন নাই—লোক পাঠাইয়া বিদ্রোহের বার্ত্তা আগ্রায় ইংরেজ শাসনকর্ত্তার নিকট জ্ঞাপন করেন, এ কথাও সমসাময়িক একজন লেখক বলিয়াছেন। সিপাহীরা যখন বাহাদুর শাহকে তাঁহাদের নেতা পদে বরণ করিতে চায় তখন তিনি প্রথমে স্বীকার করেন নাই। পরে নিরুপায় হইয়াই রাজী হইয়াছিলেন। সিপাহীরা তাঁহার সহিত বিশেষ অসম্মানসূচক ব্যবহার করিত। তাহারা যখন তখন দরবার কক্ষে ঢুকিয়া তাঁহাকে অভদ্রভাবে সম্ভাষণ করিত—'ওরে বাদসা ওরে বুড্‌ঢা'। তাহারা বাহাদুর শাহকে বিশ্বাস করিত না—সন্দেহ করিত যে তলে তলে তিনি ইংরেজের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টায় আছেন। একদিন তাহারা ভয় দেখাইল যে বাদশাহের প্রিয়তমা মহিষী জিনৎমহল বেগমকে ধরিয়া লইয়া যাইবে—ইহা লইয়া প্রাসাদের রক্ষী ও সিপাহীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ বাধিল। সিপাহীদের সন্দেহ যে একেবারে অমূলক ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জুন মাসে দিল্লীর অবরোধ আরম্ভ হয়। নানা স্থান হইতে বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীতে মিলিত হইয়া অবরোধকারী ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করে। সকলেই জানিত দিল্লী রক্ষা না পাইলে বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে। সুতরাং সিপাহীরা ইহা রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে।

ইহার জন্য যখন তাহারা দলে দলে প্রাণ দিতেছে তখন বাহাদুর শাহের পুত্রগণ ও বেগম জিনৎমহল নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতে বিরত হন নাই।

ইংরেজেরা যখন দিল্লী অবরোধ করেন তখন মীরাটের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের এজেণ্টরূপে দিল্লীর ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে ছিলেন। তিনি যে সমুদয় চিঠিপত্র লিখিতেন তাহা ছাপা হইয়াছে।

১৮৫৮ সনের ১৯শে অগষ্ট তিনি লিখিতেছেন—"বাদশাহ-জাদারা পত্র লিখিয়া জানাইতেছেন যে তাঁহারা চিরকালই আমাদের পক্ষে এবং কিভাবে আমাদের উপকার করিতে পারেন তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।" ২৩শে অগষ্ট তিনি লিখিতেছেন—"বাদশাহের প্রিয় বেগম জিনৎমহল লোক পাঠাইয়াছেন। দরবারে ইহার খুব প্রতিপত্তি। লোক-মুখে তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে ইংরেজদের সহিত একটা মিটমাট করিবার জন্য তিনি বাহাদুর শাহকে রাজী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন—অর্থাৎ বাদশাহের উপর তাঁহার যাহা কিছু প্রভাব আছে তাহা সম্পূর্ণ নিয়োগ করিবেন।" সুতরাং বিদ্রোহী সিপাহীরা যখন ভয় দেখাইয়াছিল যে বাহাদুর শাহের অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া জিনৎমহলকে ধরিয়া নিয়া জামিন স্বরূপ আটক করিয়া রাখিবে—যাহাতে বাদশাহ ইংরেজের পক্ষে যোগদান করিতে না পারেন, তখন আপাতত খুব গর্হিত মনে হইলেও তাহাদের আচরণ খুব নিন্দনীয় ছিল একথা বলা যায় না। দিল্লীতে যে বিরাট কারখানায় সিপাহীদের বারুদ তৈরী হইত তাহা একদিন অকস্মাৎ আগুন লাগিয়া ধ্বংস হইল—সিপাহীদের সন্দেহ হইল—ইহাও বাহাদুর শাহের পক্ষীয় লোকের কাজ। এইজন্য তাহারা বাহাদুর শাহের বিশ্বস্ত পরামর্শ-দাতা আহ্‌সান উল্লাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছিল—এবং অনেক কষ্টে তিনি রক্ষা পান—এইরূপ সংবাদও পাওয়া যায়। সিপাহীরা একবার বাহাদুর শাহকে স্বয়ং যাইয়া সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করে। বাহাদুর শাহ অন্য একজনকে তাহার পোষাক পরাইয়া ঘুরাইয়া আনেন। এই সমুদয় কারণে সিপাহীরা তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হয় এবং যখন তখন বিনা অনুমতিতে দেওয়ান-ই-খাসে ঢুকিয়া অপমান করিতে ত্রুটি করে নাই। নৈমুদ্দিন হাসান খাঁ—এবং মুন্সী জীবনলাল এই সময় দিল্লীতে ছিলেন; তাঁহারা যে বিবরণ লিখিয়াছেন তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে বাহাদুর শাহ নামে-মাত্র বাদশাহ ছিলেন এবং তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না। সিপাহী-দের হাতে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়া তিনি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার করিতেন—কথনও সিপাহীদের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহাদিগকে কৌশলে দিল্লীর বাহিরে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেন, বিফল-মনোরথ হইয়া নিজেই বাদশাহী তক্ত্‌ ত্যাগ করিয়া ফকিরী লইবেন এরূপ সংকল্পও করিয়াছিলেন। মুন্সী জীবনলাল ১৭ই মে তারিখে তাহার দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন—"আজ বিদ্রোহী সিপাহীরা ঘোষণা করিল যে বাহাদুর শাহ বৃদ্ধ ও অক্ষম, সুতরাং তাহারা আবু বকরকে রাজপদে বরণ করিল। হকিমুল্লা বাহাদুর শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন যে বিদ্রোহী সিপাহীরা বিশ্বাসঘাতক ও নৃশংস—তাহাদের উপর কোন নির্ভর করা যায় না।" বাহাদুর শাহ তাঁহার বিচারকালে সিপাহীদের ব্যবহার সম্বন্ধে অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। সমসাময়িক ইংরেজ লেখকগণের বিবরণও ইহা সমর্থন করে। সুতরাং আপাততঃ যে সমুদয় প্রমাণ আমাদের হাতে আছে তাহার বলে কোন মতেই একথা বলা চলে না যে বাহাদুর শাহের চক্রান্তের ফলেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করে, এবং বাহাদুর শাহ এই বিপ্লবের প্রকৃত নেতা ছিলেন। বস্তুত নেতৃত্বের যোগ্যতা যে বিন্দুমাত্রও তাঁহার ছিল না এবং সিপাহীরা তাঁহাকে সাক্ষীগোপালরূপে দাঁড় করাইয়াছিল মাত্র, ইহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। বাহাদুর শাহ যে সত্যই এই বিপ্লবের নায়ক ছিলেন—তাহার প্রমাণ স্বরূপ কেহ কেহ উল্লেখ করেন যে তিনি ভারতের রাজন্যবর্গকে এই বিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এ সমস্তই বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার অনেক পরের ঘটনা—এবং সিপাহীদের আদেশেই যে বাহাদুর শাহ এই সমুদয় পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ আছে। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় পত্রে বিশেষ কোন ফল হয় নাই এবং ভারতীয় রাজারা কেহই এই বিপ্লবে যোগ দেয় নাই। কেহ কেহ বলেন—বাহাদুর শাহ পারস্যেও একজন দূত

পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভরসা ছিল পারস্যরাজ ইংরেজদিগকে পরাভূত করিয়া হিন্দুস্থান দখল করিবেন এবং তাঁহাকেই ভারত শাসনের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। রাশিয়াও ভারত আক্রমণ করিবে ইহাও নাকি তিনি বিশ্বাস করিতেন। এই সমুদয় কথা কতদূর সত্য তাহা বিচার করিবার আবশ্যক নাই—কারণ ১৮৫৭ সালে যে বিপ্লব হইয়াছিল তাহার সহিত পারস্য বা রাশিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন যোগাযোগই ছিল না।

৩। নানা সাহেব

সমসাময়িক অনেক ইংরেজ ও ভারতবাসী বিশ্বাস করিতেন যে নানা সাহেবই চক্রান্ত করিয়া ১৮৫৭ সনের বিপ্লব ঘটান। এখনও অনেক ভারতবাসীই ইহা দৃঢ় সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ সিপাহী-যুদ্ধের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কেই সাহেব লিখিয়াছেন যে বহু বৎসর যাবৎ নানা সাহেব ভারতের রাজন্যবর্গের নিকট দূত পাঠাইয়া এই বিপ্লবের গোড়াপত্তন করিয়াছেন। বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ-সম্বন্ধীয় বহু দলিলপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু নানা সম্বন্ধে কেই সাহেবের উক্তি প্রমাণিত হইতে পারে এরূপ কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ১৮৫৮ সনের জানুয়ারী মাসে নানার অনুচর সন্দেহে মহীশূরে এক ব্যক্তিকে আটক করিয়া তাহার জবানবন্দী লওয়া হয়। তিনি এইরূপ পত্র প্রেরণের অথবা লোক পাঠাইবার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কেই সাহেবের এবং এই সাক্ষীর উল্লিখিত বহুসংখ্যক পত্রের মধ্যে একখানিও এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। নানা সাহেব বিদ্রোহের অল্পদিন পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে ইহাই ভারতব্যাপী বিরাট ষড়যন্ত্রের সূচনা। কিন্তু এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও ফলাফল কিছুই সঠিক ভাবে জানা যায় না। তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন—তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে নানার চেষ্টা কিছুমাত্র ফলবতী হয় নাই। কারণ বিদ্রোহী সিপাহীরা ভারতের রাজন্যবর্গের নিকট হইতে কোন সাহায্য পায় নাই। যদি সিপাহীদিগের বিদ্রোহ নানার চক্রান্তের ফলে ঘটিত তবে বিদ্রোহী সিপাহীরা প্রথমেই নানার অথবা যে সমুদয় রাজন্যবর্গ এই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন তাহাদের সাহায্য দাবী করিত এবং তাহাদের রাজ্য কেন্দ্র করিয়াই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার অনেক পরে বাহাদুর শাহ সিপাহীদের নির্দ্দেশক্রমে অনেক রাজাকে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে এমন কোন কথা নাই যে তাঁহারা পূর্ব্বে যোগদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন। বস্তুত বাহিরের কোন চক্রান্তের ফলে যদি এই বিদ্রোহ ঘটিত তাহা হইলে সেই চক্রান্তের নায়কেরা সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান না করায় সিপাহীরা নিশ্চয়ই তাহাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনিত। নানা সাহেব এবং ঝান্সীর রাণী উভয়েই বাহাদুর শাহের ন্যায় বিদ্রোহের প্রথম অবস্থায় ইংরেজের বন্ধু ছিলেন এবং বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার অনেক পরে সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। ইহা হইতে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে সিপাহীরা জ্ঞাতসারে তাঁহাদের পরামর্শে, চক্রান্তে অথবা ভরসায় বিদ্রোহী হয় নাই।

বিদ্রোহের পরে নানা সাহেবের আচরণ দেখিলেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। মীরাটে সিপাহীদের বিদ্রোহ সংবাদ কানপুরে পৌছিলে নানা পুরাতন বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া ইংরেজদিগকে সাহায্য করিতে চাহিলেন এবং ইংরেজরাও সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ইহা নানার ছল মাত্র। কিন্তু কানপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া যখন মীরাটের বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত যোগদান করিবার জন্য দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইল তখন নানাই তাহাদিগকে নানা কৌশলে কানপুরে ফিরাইয়া আনিলেন এবং মহা জাঁকজমক সহকারে নিজে পেশোয়ার গদীতে আরোহণ করিয়া রাজোচিত ফর্ম্মাণ জারি করিতে লাগিলেন। দিল্লীতে সিপাহীরা বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলিয়া ঘোষিত করিল—কানপুরে নানা সাহেব ভারতে পেশোয়ার পূর্ব্বতন গৌরব ও সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। যখন দিল্লী অবরুদ্ধ হইল এবং সকলেই বুঝিতে পারিল যে দিল্লীর পতন হইলে বিদ্রোহের

ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী—তখনও নানা সাহেব দিল্লীর সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠান নাই অথবা কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। কানপুর হইতে দিল্লীর পথ তখন মুক্ত ছিল—কিন্তু নানা ও বাহাদুর শাহের কোন যোগাযোগ ছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। বাহাদুর শাহ সিপাহীদের নির্দ্দেশে যে সমুদয় রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নিকট সাহায্যের জন্য চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নানার নামের উল্লেখ না থাকায় বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে উভয়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না।

এই সমুদয় বিবেচনা করিলে স্বতই মনে হয় যে সিপাহীদের বিদ্রোহে নানার হাত ছিল না। বিশ্বস্ত প্রমাণ না পাইলে একথা স্বীকার করা কঠিন যে ১৮৫৭ সনের বিপ্লব নানার চক্রান্তের ফল—কিন্তু এরূপ কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। নানা সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী কোন প্রকার ব্যাপক ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন—ইহা অনুমান মাত্র ও ইহাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু থাকিলেও সে পরিকল্পনা যে কার্য্যকরী হয় নাই—এবং সিপাহীদের বিদ্রোহ যে তাহার অন্তর্গত নহে ইহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে।

৪। ঝাঁসীর রাণী

ইংরেজেরা অন্যায়রূপে ঝাঁসী রাজ্য দখল করায় রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের তাহাদের প্রতি ক্রোধের যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু তথাপি তিনি ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করিয়াই চলিতেন। মীরাটের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ৮ই জুন ঝান্সীর সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া অনেক ইংরেজকে নিহত করিল। তখনও রাণী সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করেন নাই। ঐতিহাসিক কেই বলেন যে রাণী এই বিদ্রোহের মূলে ছিলেন। কেইর মতে রাণী স্বয়ং এক বিরাট মিছিলের পুরোভাগে থাকিয়া সহর হইতে সৈন্যদলের সঙ্গে ক্যাণ্টনমেণ্টে পৌছেন এবং ইহার ফলেই অল্পক্ষণের মধ্যে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

পরবর্ত্তীকালে রাণী এই অঞ্চলে বিদ্রোহের নেত্রী হইয়াছিলেন। এই কারণে রাণীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত প্রকারের অভিযোগ অনেকে আনিয়াছেন—আবার অনেকে এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ কেহই দিতে পারে নাই।

সাভারকর লিখিয়াছেন যে রাণী লক্ষ্মণরাও নামে তাঁহার এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ অনুচরের সাহায্যে সিপাহীদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছিলেন এবং ইহার সূচনাস্বরূপ ইংরেজ-কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করেন। এই মর্ম্মের কয়েকখানি চিঠি নাকি ঝাঁসীর ইংরেজ কমিশনারের হস্তগত হয়। ইহার কোন চিঠি এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু বিদ্রোহের কয়েকদিন পরে রাণী সগর বিভাগের ইংরেজ কমিশনারকে যে চিঠি লেখেন—তাহাতে তিনি ঝান্সীর বিদ্রোহী সিপাহীদের নিষ্ঠুর আচরণের তীব্র নিন্দা করেন এবং ইংরেজদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে অশক্ত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি যে ইংরেজদেরই আশ্রিত ইহা অকপটে ব্যক্ত করিয়া তিনি বলেন যে, সিপাহীরা জোর জবরদস্তি করিয়া ও ভয় দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করিয়াছে। তিনি প্রাণ ও সম্মান বাঁচাইবার জন্য তাহাদের দাবী পূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দোসরা জুলাই কমিশনর রাণীকে এক চিঠি লেখেন। ১২ই ও ১৪ই জুন লিখিত রাণীর দুইখানি চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া তিনি রাণীকে জানান যে ঝাঁসীতে শান্তি স্থাপনের জন্য শীঘ্রই ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হইবে এবং যতদিন তাহারা না পৌছে ততদিন পর্য্যন্ত ইংরেজ সরকারের তরফ হইতে ঝাঁসীর শাসন কার্য্য রাণীই পরিচালনা করিবেন—এবং রাজস্ব আদায় ও শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশবাহিনীর গঠন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবেন। এই মর্ম্মে কমিশনারের সহি ও শীলমোহরযুক্ত ঘোষণা পত্রও বাহির হয় এবং ইহার এক প্রতিলিপিও কমিশনার রাণীর কাছে পাঠান।

ঝাঁসীতে সিপাহীরা বিদ্রোহ করিবার ২৪ দিন পরে এই চিঠি লিখিত হয়। যে যুগে বিদ্রোহের সহিত যোগদানের কিছুমাত্র সন্দেহের জন্য সরাসরি বিচারে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইত, সেই যুগে ইংরেজ কমিশনার স্বেচ্ছায় যাঁহার হস্তে তাঁহাদের তরফে রাজ্যশাসন—রাজস্ব আদায়, পুলিশবাহিনী গঠন প্রভৃতির ভার দিয়াছিলেন—বিদ্রোহীদলের সঙ্গে তাঁহার যে কোন প্রকার যোগাযোগ

অথবা সহানুভূতি ছিল একথা বিশ্বাস করা কঠিন। ঝাঁসীর বিদ্রোহী সিপাহীরা যে রাণীর সহিত কোন বোঝাপড়া না করিয়া দিল্লী রওনা হইয়া গেল ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে এই বিদ্রোহ রাণীর কোন চক্রান্তের ফল নহে। ১৮ই অগষ্ট এক সরকারী বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে সাধারণের ধারণা রাণীই সিপাহীদিগকে ঝাঁসীর দুর্গ আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ বিদ্রোহের দুই মাস দশ দিন পরেও সরকার এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পান নাই, সুতরাং কেই সাহেব বর্ণিত রাণী কর্তৃক পরিচালিত মিছিলের কথা সর্বৈব মিথ্যা—কারণ এরূপ মিছিল বাহির হইয়া থাকিলে সরকার অনায়াসেই ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিতেন—কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিতেন না; এবং সগরের কমিশনারও নিতান্ত বিকৃত-মস্তিষ্ক না হইলে রাণীর উপর ঝাঁসীর শাসনভার অর্পণ করিতেন না। সুতরাং সিপাহী-বিদ্রোহ যদি কোন চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রের ফলে হইয়া থাকে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইর তাহাতে কোন অংশ ছিল না—ইহা নিশ্চিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৫। কুমার সিং

আরার নিকটবর্ত্তী জগদীশপুরের তালুকদার রাজপুত-জাতীয় কুমার সিং সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে বীরত্ব ও সামরিক কৌশলের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও প্রথমে ইংরেজের বন্ধু ছিলেন। সরকার তাঁহার প্রতি অবিবেচনা করায় তিনি পরে ইংরেজের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। পাটনার কমিশনর টেলর সাহেব, যিনি বিদ্রোহের সময় সামান্যমাত্র সন্দেহে বহু লোককে কয়েদ করিয়াছেন, তিনিও কুমার সিংহের রাজভক্তির প্রশংসা ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে 'বাংলা সরকারের অদূর-দর্শিতার ফলেই কুমার সিং বিদ্রোহীদলে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন'। ব্যক্তিগত কারণে ইংরেজের প্রতি ক্রোধই যে কুমার সিংয়ের বিদ্রোহীদলে যোগদানের কারণ ঐতিহাসিক হোলনস্‌ও তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কুমার সিং যে ইংরেজের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন, বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বেও ইংরেজ সরকারের দুর্ব্যবহারের ফলে এই বন্ধুত্ব কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইলেও অক্ষুণ্ণ ছিল এবং শেষ মুহূর্ত্তে সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে একটি মোকদ্দমায় হারিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার সংবাদ না পাইলে যে ইংরেজের দলেই থাকিতেন, বিদ্রোহে যোগ দিতেন না, হোলনস্‌ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

কুমার সিংয়ের একজন বিশ্বস্ত অনুচর নিশান সিং বিদ্রোহের আরম্ভ হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইতিমধ্যে দানাপুরের বিদ্রোহী সিপাহীগণ আরায় পৌঁছিয়া সহরটি লুট করিল। কুমার সিংয়ের ভৃত্যগণকে তাহারা এই বলিয়া শাসাইতে লাগিল যে শীঘ্র কুমার সিংকে এখানে লইয়া আস, নচেৎ আমরা জগদীশপুর লুট করিব। আমি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলাম না—অন্যের নিকট একথা শুনিয়াছি—ইহার ফলে সেইদিনই কুমার সিং জগদীশপুর হইতে আরায় আসিলেন। ইহার দুই তিন দিন পরে ইংরেজী ফৌজ আরায় আসে এবং দানাপুরের বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কুমার সিং বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করেন।'

নিশান সিংয়ের বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে দানাপুরের সিপাহী-বিদ্রোহ কুমার সিংয়ের চক্রান্তের ফল নহে। সিপাহীরা যে কুমার সিংয়ের ভৃত্যদিগকে শাসাইয়াছিল—ইহা সত্য না হইলেও এইরূপ একটা ধারণা যে প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কুমার সিং বিদ্রোহের নায়ক হইলে এইরূপ ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই প্রসঙ্গে আরার ম্যাজিষ্ট্রেটের সরকারী রিপোর্টও উল্লেখযোগ্য।

"২৭শে জুলাই সোমবার বিদ্রোহী সিপাহীরা সহরে পৌঁছিয়া খাজাঞ্চীখানা লুট করে এবং আমাদের বাংলো আক্রমণ করে। কুমারসিংয়ের লোক তাহাদের সহিত যোগ দেয় এবং সিপাহীরা পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকে যে তাহারা কুমার সিংয়ের নির্দ্দেশমত কাজ করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে কুমার সিং উপস্থিত হইলেন"। ঐতিহাসিক বল যিনি এই রিপোর্ট ও অন্যান্য দলিলপত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনি কুমার সিংকে বিদ্রোহীদলের সাময়িক নেতা (improvised leader) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নিশান সিংয়ের বর্ণনার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

৬। সিদ্ধান্ত

এই প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় সিপাহী-বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে দুইটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়াছি—এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা তাহার দ্বিতীয়টির আলোচনা করিলাম। আলোচনার ফলে দেখা গেল যে বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, ঝাঁসীর রাণী ও কুমারসিং একযোগে অথবা পৃথকভাবে গোপনে এক বিরাট ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত করেন এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারেই সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়—এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। সুতরাং সিপাহীরাই যে প্রথমে বিদ্রোহ করে এবং পরে নানা কারণে উক্ত 'নায়করা' এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোক ইহাতে যোগদান করে—এই মতটিই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। সিপাহীবিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।

কিন্তু উপসংহারে আর একটি প্রশ্ন বিচার করা আবশ্যক—সিপাহীবিদ্রোহের মূল প্রেরণা কি?

যে সমস্ত বিবরণ বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় নানারূপ অসন্তোষের কারণ থাকিলেও ধর্ম্মনাশের ভয়ই এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ। একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইংরেজের সিপাহীরা ১৮৫৭ সনেই প্রথম বিদ্রোহ করে নাই। ইহার পূর্ব্বে বহুবার সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছে। ১৮০৯ সালে ভেলোরে যে সিপাহী-বিদ্রোহ হয় তাহার সহিত ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। শেষবারে যেমন বাহাদুর শাহকে কেন্দ্র করিয়া ইহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, আগের বারে তেমনি টিপু সুলতানের বংশধরদের প্রভাব ছিল। ধর্ম্মহানির ভয় প্রথমবারে পোষাক পরিবর্ত্তন, দ্বিতীয়বারে চর্ব্বিমিশ্রিত কার্তুজ। সমুদ্র পার হইলে এবং অন্যান্য কারণে ধর্ম্ম ও জাতিনাশের ভয়েও একাধিকবার সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল। আর্থিক লোকসানের সম্ভাবনাও একাধিক বিদ্রোহের কারণ। এইরূপ নানা প্রকার অসন্তোষের ফলে স্থানীয় বিদ্রোহ ১৮৫৭ সনের পূর্ব্বে বহুবার হইয়াছে। ভেলোরের বিদ্রোহীরা ব্যাপকভাবে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহের চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু সফল হয় নাই। ১৮৫৭ সনে বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সিপাহীদের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল—তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে—এবং এ বিষয়ে কিছু কিছু প্রমাণও আছে। মৌলবী আহমদ উলা এবং সম্ভবত এই শ্রেণীর অন্যান্য লোক যে সিপাহীদের উত্তেজনায় ইন্ধন জোগাইয়াছিল তাহাও খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে, অথবা অনিষ্টকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার জন্য অযোধ্যার রাজপরিবার অথবা তালুকদার প্রভৃতি সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন—কিন্তু ইহার সপক্ষে স্পষ্ট কোন প্রমাণ আছে বলিয়া জানি না। সিপাহীরা অনেকেই অযোধ্যা অঞ্চলের লোক ছিল। মাত্র তিন চার বৎসর পূর্ব্বে ডালহৌসী অযোধ্যার নবাবকে জোর-জবরদস্তি করিয়া যে-ভাবে নির্ব্বাসিত করেন এবং অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করেন, তাহাতে অযোধ্যার জনসাধারণ বিশেষ ক্ষুব্ধ ও বিচলিত ছিল। এই জন্যই সিপাহীবিদ্রোহের ফলে বিদ্রোহভাব অযোধ্যায় জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল ভারতের অন্যত্র তেমন হয় নাই। বস্তুত অযোধ্যায় ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সকল শ্রেণীর লোক যে রকম যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাকে বিদ্রোহ বলা সঙ্গত নহে। অযোধ্যা নামে ব্রিটিশের অধীন হইলেও ইহার অধিবাসীরা মনে-প্রাণে এই অধীনতা স্বীকার করে নাই—এবং অন্যায়-ভাবে অল্পদিন পূর্ব্বে হৃত গৌরব ও অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। তৎকালীন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই মত পোষণ করিতেন এবং এই কারণে অযোধ্যার লোকদিগকে বিদ্রোহীর দণ্ড না দিয়া তাহাদের প্রতি যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকদের ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

সিপাহীবিদ্রোহের আরম্ভে এই ভাব কতটা কাজ করিয়াছিল তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। বহরমপুর ও বারাকপুরে যখন বিদ্রোহের সূচনা দেখা দেয় তখন সিপাহীদের মধ্যে এই ভাবের কোন অস্তিত্ব বা প্রভাব ছিল ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যেটুকু প্রমাণ আমাদের হাতে আছে তাহাতে চর্ব্বিমিশ্রিত কার্ত্তুজের ব্যবহারই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ—ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ

অনুমান করা যায় না। বহরমপুর, বারাকপুর, মিরাট প্রভৃতি স্থানের সিপাহীরা পুনঃ পুনঃ কর্তৃপক্ষের নিকট ইহার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করিয়াছিল—এবং এই কার্ত্তুজ ব্যবহারে আপত্তি করা ব্যতীত আর কোন আদেশ লঙ্ঘন করে নাই, বা অন্য কোন রকম অভিযোগ করে নাই। এই কার্ত্তুজ ব্যবহারে অস্বীকৃত হওয়ায় মীরাটের একদল সিপাহী সর্ব্বসমক্ষে যেরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়, তাহাতেই অন্যান্য সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করে। অন্যান্য অনেক প্রকার অসন্তোষের ও বিক্ষোভের কারণ তাহাদের ছিল, হয়ত সেই সব কারণে বিদ্রোহের ভাব তাহাদের মনের মধ্যে জাগিয়াছিল এবং ব্যাপকভাবে বিদ্রোহের কল্পনা এবং কিছু ব্যবস্থাও হইয়াছিল—কিন্তু তাহা সুনির্দ্দিষ্ট কোন পরিকল্পনার আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বেই মীরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল। সুতরাং ধর্ম্মনাশের ভয়ই যে সিপাহীবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ—আর সমুদয়ই গৌণ এবং অনেক পরিমাণে অনির্দ্দেশ্য ও অস্পষ্ট, এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু কারণ যাহাই হউক কার্য্যকালে সিপাহীরা এবং তাহাদের নায়কগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তাহা দেশের গৌরব এবং তাহাদের প্রতিপত্তি কোনটির পক্ষেই অনুকূল নহে। দিল্লীতে সিপাহীদের মতিগতি ও আচরণ সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, ইংরেজ সমসাময়িক লেখকের মন্তব্য এবং স্বয়ং বাহাদুর শাহের বিবৃতিতে যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সিপাহীদের কলঙ্ক এবং দেশের অগৌরবের নিদর্শন। তাহাদের অর্থলোলুপতা ও তজ্জনিত দেশবাসীর প্রতি অত্যাচার এত বাড়িয়াছিল যে বাহাদুর শাহ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারে নাই। বাহাদুর শাহের প্রতি তাহাদের ব্যবহারের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দোকান-দারেরা তাহাদের ভয়ে দোকান বন্ধ করিত, জোর করিয়া দোকান খুলিতে হইত। লোকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত, শীঘ্রই যেন ইংরেজেরা দিল্লী অধিকার করিয়া এই অত্যাচারের হাত হইতে তাহাদিগকে বাঁচায়—ইহা ইংরেজের উক্তি নহে—দিল্লীর একজন হিন্দু অধিবাসী ইহা লিখিয়াছেন। সিপাহীরা রীতিমত বেতন না পাইলে চলিয়া যাইবে এইরূপ ভয় দেখাইত এবং তাহাদের মধ্যে কতক সত্য সত্যই যথেষ্ট টাকা লুট করিয়া নিজদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল ইহাও তাঁহারই উক্তি। মিরাটের সিপাহীরা নালিশ করিল যে দিল্লীর সিপাহীরাই খাজাঞ্চীখানার সব টাকা নিয়াছে—এবং লুট পাট করিয়া বহু টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে—তাহাদের কোন ভাগ দেয় নাই—তাহারা লুট বা ডাকাতি করিতে না পারায় দিল্লীর সিপাহীদের মত ধনী হইতে পারে নাই। সুতরাং তাহারা নয় টাকা মাসিক বেতন লইবে না। দিল্লীর সিপাহীরা উত্তর দিল—মীরাটের সিপাহীরা অতি বদ্, তাহারাই প্রথমে ইংরেজের নিমক খাইয়া তাহাদেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ইংরেজ কর্ম্মচারী হত্যা করিয়া কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। যখন তাহারা দিল্লী পৌছিল তখনই নিমকহারামীর জন্য তাহাদের তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া উচিত ছিল—এই কর্ত্তব্য পালন না করায় তাহারা (দিল্লীর সিপাহীরা) এখন বিশেষ অনুতপ্ত। এইরূপ বাকবিতণ্ডার ফলে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ আসন্ন দেখিয়া বাহাদুর শাহের অনুচরবর্গ কোন রকমে তাহাদের মধ্যে পড়িয়া তাহাদের নিবৃত্ত করিল এবং মহবুব আলী মীরাট অশ্বারোহীদের বেতন বাড়াইয়া ২০ টাকা করিয়া দিবেন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাহারা শান্ত হইল।

এই দুঃসময়ে হিন্দু মুসলমানদের বিরোধও দিল্লীর আর এক কলঙ্ক। প্রত্যক্ষদর্শী হিন্দু জীবনলাল মুন্সী বলেন যে মুসলমানেরা হিন্দুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার জন্য ১৯শে মে জুম্মা মসজিদে পতাকা উড়াইয়া দেয়। বাহাদুর শাহের নিকট এই মর্ম্মে নিবেদন করা হয় যে হিন্দুরা ইংরেজদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছুক; মুসলমানদের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি নাই—এবং ইতিমধ্যেই তাহারা মুসলমানদের হইতে পৃথক হইয়াছে। উক্ত জীবনলাল মুন্সী ২১শে মে তারিখের দৈনন্দিন বিবরণে লিখিয়াছেন—"রাজপ্রাসাদের দ্বারে আজ বিরাট জনতা সমবেত হইয়া বেতন পাইবার জন্য তুমুল কলরব করিয়াছে। বাহাদুর শাহের নিকট আবেদন করা হইয়াছে যে আগামীকাল রমজানের শেষ দিন, সুতরাং তিনি যেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার আদেশ দেন। বাদশাহ ও তাহার সদস্যবর্গ ইহাতে রাগিয়া উত্তর করিলেন যে বিদ্রোহীদের অধিকাংশই হিন্দু এবং তাহাদের যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্রও আছে,

তাহারা অনায়াসে জিহাদীদের ধ্বংস করিতে সমর্থ।··· বাহাদুর শাহ ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করিলেন যে হিন্দু মুসলমানেরা যেন পরস্পর বিবাদ না করে।"

এই কলঙ্কের কাহিনী ভারতবাসী মাত্রেরই পীড়াদায়ক। সুতরাং আর অধিক বর্ণনার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সিপাহী-বিদ্রোহকে 'জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম' বলিয়া অভিহিত করেন তাঁহাদের জন্যই কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম। সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান-কেন্দ্র দিল্লীর এই সময়কার বিবরণ পাঠ করিলে আশা করি তাঁহাদের ভ্রম দূর হইবে। সিপাহীরা যে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের স্বাধীনতা লাভের মহান উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। অপরপক্ষে দিল্লীর সিপাহীদের যে বিবরণ আমরা পাই তাহা ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল ধারণাই সৃষ্টি করে।

যুদ্ধবিদ্যায় বিদ্রোহী সিপাহীরা ইংরেজের তুলনায় যে কত অপদার্থ ছিল বিদ্রোহের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌতে কোন সুদৃঢ় দুর্গ ছিল না—মুষ্টিমেয় সৈন্য এই অরক্ষিত পুরীতে ছিল। তথাপি অগণিত বিদ্রোহী সেনা মাসের পর মাস অবরোধ করিয়াও ইহা দখল করিতে পারিল না। দিল্লীতে সুদৃঢ় দুর্গ ও বড় বড় কামান ছিল, বিদ্রোহী সিপাহীরা বহু-সংখ্যায় ছিল এবং অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত যোগাযোগের পথ মুক্ত ছিল—অথচ তিন মাসের মধ্যেই ইহা ইংরেজেরা অধিকার করিল। বিদ্রোহীরা কানপুরের ছাউনী অথবা এলাহাবাদের প্রায় অরক্ষিত দুর্গ দখল করিতে পারিল না—কিন্তু ইংরেজেরা ঝাঁসী ও গোয়ালিয়রের দুর্গ অনায়াসে দখল করিল। সংখ্যায় দশ বিশগুণ অধিক সিপাহী সৈন্য পুনঃ পুনঃ ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইয়াছে। সামান্য দুই একটি খণ্ড-যুদ্ধ ব্যতীত সিপাহী-সৈন্য কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। ঝাঁসীর দুর্গ অবরোধ কালে তাঁতিয়া টোপী বিরাট সৈন্য লইয়া পশ্চাৎ হইতে ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বল্প ইংরেজ সৈন্য যেভাবে তাঁহাকে হারাইল এবং দুর্গও দখল করিল—তাহা ইংরেজ সেনাপতির পক্ষে যেমন কৃতিত্বের পরিচায়ক, দেশীয় সেনানায়কদের পক্ষে তেমনি কলঙ্ক ও অগৌরবের পরাকাষ্ঠা। তাঁতিয়া গেরিলা যুদ্ধে অশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করায় রাণী লক্ষ্মীবাইর (যদি ইহা তাঁহারই কল্পনানুযায়ী হইয়া থাকে) দূরদর্শী সামরিক নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কুমার সিংহ দুই তিনটি যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব ও কৌশল দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহা বাদ দিলে সিপাহীদের যুদ্ধের কাহিনী তাহাদের সামরিক অক্ষমতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

স্বাধীন ভারতে ১৯৫৭ সনে এই বিপ্লবের যে শতবার্ষিকী উৎসবের পরিকল্পনা হইয়াছে তাহা লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হইলেই সঙ্গত হয়। কারণ এই বিপ্লব দমনে ইংরেজেরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যে সমর-কৌশল, সাহস, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছে তাহা যে কোন দেশের গৌরবের বিষয়।

ইহার পার্শ্বে আমাদের দেশের চিত্র সকল বিষয়েই তুলনায় ম্লান হইয়া পড়ে। যে সমুদয় বীর ও বীরাঙ্গনার স্মৃতি এই উৎসবে পূজিত হইবে তাঁহাদের মধ্যে বাহাদুর শাহ, নানা সাহেব ও জিনৎমহল বেগমও আছেন। জিনৎমহলের বিশ্বাসঘাতকতার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তাঁহার স্বার্থপ্রণোদিত ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্রের আরও কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। তাঁহার ছবি সংগ্রহের জন্য দিল্লীতে চেষ্টা চলিতেছে। যেদিন এই ছবির গলায় জয়মাল্য পরাণ হইবে হয়ত কবরের মধ্যেও মৃত সিপাহীদের দেহ শিহরিয়া উঠিবে।

নানার নায়কত্বের দাবী কি এবং তাহা কতদূর সত্য তাহা আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব কানপুরের অসহায় শিশু ও নারীর হত্যা—ভারতের মুখে যে চিরকলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছে তাহা কখনও মুছিবে না। সত্য বটে যে ইংরেজ ইহার তুল্য নিষ্ঠুর ও অধিক-সংখ্যক হত্যাকাণ্ড করিয়াছে—কিন্তু তাহাতে আমাদের কলঙ্ক মুছিবার নহে। অন্ততঃ এই কীর্ত্তিই যাঁহার প্রধান অবলম্বন, তাঁহার গলায় জয়মাল্য দিলে ভারতমাতা সন্তুষ্ট হইবেন না।

অথর্ব্ব ও অকর্ম্মণ্য বাহাদুর শাহ কৃপার পাত্র হইতে পারেন—কিন্তু বিশেষ কোন সম্মানের অধিকার তাঁহার নাই।

যাহাতে ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের শতবার্ষিকী উৎসবের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে ভারতবাসীরা কেবলমাত্র সংস্কার ও ভাবের আবেগে চালিত না হইয়া ধীরভাবে ইহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয়ে বিচার করিতে পারেন আশা করি এই প্রবন্ধ তাহার সহায়তা করিবে।

১৮৪৭ সালের বসং
তিনজন যুবক ব'সে আ
সময় দেশে চালু ছিল, তার ৫
তিনজনেই বিশ্বাস করত, গড্ডলিক
শিল্পনিদর্শন তারা জগতের কাছে রেখে ৫
মধ্যে যে বর্ণসাংকর্য ঘটেছে তা থেকে শিল্পকে মুক্ত...
প্রাচীন শুদ্ধ রূপরেখার মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা—চিত্রশিল্পীরা
কাজ তাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত এবং এই ব্রত উদ্‌যাপনে তারা যে প্রতিকূল সমালোচনা আর বাধার সম্মুখীন হবে তার আঘাতে তাদের ভেঙে পড়লে চলবে না।

তিন বন্ধু। হোলম্যান হান্ট্, জন এভারেট্ মিলায়েস এবং দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি। চিত্রশিল্পের দুরূহ সাধনায় তিন নবীন পথিক প্রচলিত শিল্পরীতিকে বর্জ্জন ক'রে তাঁরা স্থির করলেন রাফেল যে আদর্শের প্রবর্ত্তন করে গেছেন, তা যত মনোহরই হোক, তার মধ্যে ভেজাল আছে, তাই তাঁরা ফিরে যাবেন আরও প্রাচীনদের কাছে যাঁদের শিল্পকর্মে আছে সৃষ্টির প্রথম মৌলিক অবদানের ইঙ্গিত, যাঁদের সৃষ্টির মধ্যে আছে আকাশের নির্ম্মলতা আর প্রকৃতির বিশুদ্ধতা।

এই চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে চিত্রশিল্পজগতে সেদিন একটি নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত হল—প্রি-র‍্যাফেলাইট আন্দোলন এবং সেই নতুন মতবাদের মুখপাত্র হলেন অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী, একাধারে কবি ও শিল্পী, দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি।

যৌবনে রসেটি

১৮২৮ সালের ১২ই মে লণ্ডনে রসেটির জন্ম হয়। শিশুর নামকরণ হল দান্তে চার্লস্ গ্যাব্রিয়েল রসেটি। নামটি তাৎপর্য্যপূর্ণ। গ্যাব্রিয়েল ছিল তাঁর বাবার নাম। তাঁর এক পিতৃবন্ধু ছিলেন চার্লস্—শিশুকালে রসেটিকে তিনি নিজের ছেলের মতো কিছুদিন কাছে রেখেছিলেন; তাই তাঁর নামটিও শিশুর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। রসেটির পিতার সবচেয়ে প্রিয় কবি ছিলেন দান্তে, তাই সেই কবির নামও পুত্রের নামের সঙ্গে সংযোজিত করা হয়েছিল। বয়সকালে রসেটি নিজের নাম লিখতেন—দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি।

রসেটির বাবা ছিলেন দান্তের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর দাদামশায় ইতালীর অধিবাসী গিটানো পলিডোরি একজন বড়দরের অন্য সকলে কবি দান্তের ভক্ত। রসেটিও দান্তের কবিতার প্রতি অনুরক্ত হলেন। শুধু দান্তে নয়, মধ্যযুগের বহু কবির কাব্যের আমেজ লাগল তাঁর মনে।

১৮৪২ সালে ছ-বছর স্কুলে পড়বার পর রসেটি এক স্থানীয় চিত্রশিল্প শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হলেন। ইতিমধ্যে খাতার পাতায় বহু ছবি আঁকা হয়েছিল। চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আসক্তি দেখে তাঁর বাবা তাঁকে ১৮৪৬ সালে রয়েল আকাদামিতে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন।

কিন্তু প্রথম প্রথম ছবি আঁকার কাজে তেমন সুবিধা করতে পারলেন না তিনি। বড় এলোমেলো স্বভাব। তেমনি অগোছাল আঁকার পদ্ধতি।

।নি ছবি
দর পুরা
চনথানির
.র একটি

ncilla
ছবিখানি
আঁকা এই
লো। প্রাক-

রসেটির বিখ্যাত ছবি "আবির্ভাবের ঘোষণা"

রসেটির আর একখানি ছবি "দিবাস্বপ্ন"

জীবনের পথ যখন অনিশ্চয়তার কুয়াশায় ঘোলাটে, কোন্ দিকে পা বাড়াবেন তা যখন ঠাহর করতে পারছেন না, সেই সময় শিল্পী মিলায়েসের সঙ্গে রসেটির আলাপ হল। পরিচয় নিবিড় হ'তে সময় লাগল না। তারপর দলে যোগ দিলেন হাণ্ট্। তিনজনে মিলে অনেক আলোচনার পর জীবনের যে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তার কথা এই কাহিনীর আরম্ভেই বলা হয়েছে।

র‍্যাফেলিয় শিল্পীদের সম্বন্ধে নানা মতামত শোনা যেতে লাগল। বিরুদ্ধ সমালোচনারও অন্ত রইল না। টাইম্‌স্ পত্রিকা লিখলেন-- "উদ্ধত বিদ্রোহী প্রাক র‍্যাফেলিয় শিল্পীদের মধ্যে কোন মৌলিকতা নেই ; তাদের মধ্যে আছে উৎকেন্দ্রিকতা আর বাহাদুরী ; ছবির মধ্যে যে সারল্য তারা সঞ্চার করতে চায় তা একান্ত কৃত্রিম, তাদের ছবিগুলি নানা শিল্পগত-দোষে দুষ্ট।" অন্য অনেক সমালোচক টাইম্‌স্-এর

সমালোচনার প্রতিধ্বনি ক'রে তিনজন নবীন শিল্পীকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন।

সেই সময় তাঁদের পক্ষ নিয়ে এগিয়ে এলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক রাস্কিন্। টাইম্‌স্ পত্রিকায় দু'খানি পত্র লিখে তিনি মত দিলেন যে শতাব্দীকালের মধ্যে "আবির্ভাবের ঘোষণার" তুল্য ছবি আঁকা হয়নি এবং প্রাক-রাফেলিয় শিল্পীরা চিত্রশিল্পে যে নতুন পথ ও আদর্শের প্রবর্তন করেছেন তা উপেক্ষণীয় নয়।

তখন আবার নতুন ক'রে আলোচনা আরম্ভ হল। রাস্কিনের সুরে সুর মিলিয়ে অনেক চিত্ররসিক প্রাক-রাফেলিয় শিল্পীদের অভিনন্দন জানালেন। চারিদিকে তাঁদের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

দুর্দমনীয় প্রতিভার তেজে তখন জেগে উঠেছেন রসেটি। ছবির পর ছবি আঁকছেন। কবিতাও লিখছেন অজস্র। সব্যসাচীর মতো একই সঙ্গে দুই অস্ত্র সমানে চলেছে। কয়েকজন অনুরাগী বন্ধু এবং [illegible] নিয়ে বার করলেন একটি সাময়িক পত্র। নাম দি[illegible]—The Germ। পত্রিকাটি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি বটে, কি[illegible] তার অ[illegible] আয়ুর মধ্যেই সে তার উদ্দেশ্যকে সফল করেছিল। তার মাধ্যমে রসে[illegible] তাঁর কাব্য এবং শিল্পসৃষ্টির অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে দেশের লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন; প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে এবং তাঁদের প্রবর্তিত শিল্পআন্দোলনকে। জার্ম্ পত্রিকায় রসেটির কয়েকটি সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা ছাপা হয়েছিল।

বন্ধুদের কাছে রসেটি ছিলেন যেমন দুর্জ্ঞেয় তেমনি প্রিয়। সুশ্রী চেহারা; গভীর শান্ত দুই চোখে সুদূর প্রসারিত অন্যমনস্ক দৃষ্টি; এলোমেলো স্বভাব; তেজোদৃপ্ত ভাষণভঙ্গী; সব সময়েই প্রাণ চঞ্চল এবং জীবন্ত এই মানুষটির সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই বিমোহিত হয়েছেন। এমন কি রাস্কিন পর্য্যন্ত বলতেন যে রসেটির সঙ্গে শিল্প বা কাব্যের আলোচনার সময় তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা বলার সময় যেন নিস্তেজ হোয়ে পড়তে হয়। এমনিই ছিল রসেটির প্রখর ব্যক্তিত্ব।

* * *

রসেটির জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘট্‌ল তাঁর বাইশ বছর বয়সে। শেফিল্ড্-এর এক ব্যবসাদারের মেয়ে এলিজাবেথ এলিওনোর সিডল এক পোষাকের দোকানে কাজ করতেন। একদিন সেই দোকানে ঢুকে রসেটি মেয়েটিকে দেখলেন।

এলিজাবেথ ছিলেন অদ্ভুত সুন্দরী। ঘনকুন্তলা, আয়তলোচনা, পক্কবিম্বাধরা এবং হরিণীর মতো চঞ্চলা মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হলেন রসেটি। শিল্পীর মডেল বটে! এমনি রূপই যে তিনি আজীবন কল্পনা করেছেন! এতদিনে তিনি যেন তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিতার দেখা পেলেন।

এক বন্ধুর সাহায্যে দু'জনের পরিচয় হল। রসেটির অনুরাগ লাভ করা যে কোন মেয়ের পক্ষেই ভাগ্যের কথা। কবি-শিল্পীর প্রণয়াবেগে যেন ডুবে গেলেন এলিজাবেথ। ১৮৫১ সালে দু'জনের মধ্যে বাকদানের বিনিময় হল চিত্তবিনিময়ের সঙ্গে।

তারপর এলিজাবেথ অসুস্থ হোয়ে পড়লেন। বিবাহ পিছিয়ে যেতে লাগল, বছরের পর বছর।

এলিজাবেথ এলিওনোর সিডল্

প্রণয়বিহ্বল রসেটি তাঁর এই অধীর অপেক্ষার অবসরে ছবি আঁকতে লাগলেন, আর লিখতে লাগলেন কবিতা। দীর্ঘ ন'বছর পরে দু'জনের সেই প্রতীক্ষার শেষ হল। ১৮৬০ সালের ১ই মে উভয়ের পরিণয় সম্পন্ন হল। তারপর দু'বছর কাটল যেন স্বপ্নের মতো। পরের বছর বেরুলো রসেটির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ছবির প্রদর্শনী হল অনেকগুলি। কবি ও চিত্রশিল্পীরূপে রসেটির অনন্যসাধারণ প্রতিভা জগতে স্বীকৃত হল বহু জয়ধ্বনির সঙ্গে।

কিন্তু অকস্মাৎ সুখের দিন চরম দুঃখের কালো মেঘে অন্ধকার হোয়ে গেল। রসেটির প্রাণের চেয়ে প্রিয় এলিজাবেথ মারা গেলেন। কিছুদিন ধরে তিনি শরীরের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা বোধ করছিলেন। ডাক্তার তাঁর জন্যে বিশেষ এক প্রকার ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা করেছিলেন। একদিন রাত্রে সে বিষওষুধ অধিক মাত্রায় সেবন ক'রে এলিজাবেথ অজ্ঞান হোয়ে পড়লেন। রসেটি তখন ক্লাবে গিয়েছেন। সেখানে খবর গেল। পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে তিনি বাড়ি এলেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হোয়ে গেছে।

রসেটি যেন বজ্রাহত হলেন, যেন নিমেষে ফুরিয়ে গেলেন। তাঁর অবস্থা দেখে বন্ধুরা শংকিত হল। শেষ পর্য্যন্ত কি তাঁর মাথা খারাপ হোয়ে যাবে? সুখের নীড় রচনা করেছিলেন যে বাড়ীতে, যে-বাড়িতে দিনে দিনে গড়ে উঠেছিল তাঁর প্রিয়তমার স্বহস্ত-রচিত গৃহস্থালী, সে বাড়ীতে থাকতে পারলেন না তিনি। কিছুদিন কাটালেন এক বন্ধুর গৃহে, তারপর এক আত্মীয়ের বাড়ী। বছর দুই পরে চেল্‌সিয়ায় এক বাসা নিলেন। এই বাসায় দুই বন্ধু তাঁর সঙ্গে ছিলেন অনেকদিন

পর্য্যন্ত ; একজন জর্জ্জ মেরিডিথ, অপরজন চার্লস সুইন্‌বার্ণ। এঁদের সংসর্গ তাঁর শোকজর্জ্জর জীবনে অনেকখানি সান্ত্বনা জুগিয়েছিল।

পরিণত বয়সে রসেটি

১৮৬৯ সালে বন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে রসেটি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন। বইখানির সমাদর হল প্রচুর। কিন্তু ভাঙা মন আর ভাঙাস্বাস্থ্য কিছুতেই আর জোড়া লাগলনা। পরবর্ত্তী দশ বছর জীর্ণ শরীর নিয়ে সমাজ এবং লোক-সংসর্গ থেকে দূরে রইলেন তিনি। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা শুধু তাঁর কাছে আসতেন। তাঁদের সংখ্যা বেশী না। আসতেন রাসকিন, মেরিডিথ, সুইনবার্ণ, মিলায়েস। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে তৃপ্তি পেতেন রসেটি। সভাসমিতি, সম্বর্দ্ধনা. তাঁর জীবনে সে-সবের প্রয়োজন ফুরিয়েছে চিরকালের মতো।

বিবাদমথিত অন্তর দিয়ে সেই সময়তিনি যে ক'খানিছবিআঁকলেন তাদের আখ্যা দিলেন—"আত্মার চিত্রণ"। সেই সময়কালেই তিনি এঁকেছিলেন তাঁর বহুল আলোচিত ছবি—"দান্তের স্বপ্ন"।

পর পর কাব্যগ্রন্থও বেরুলো তিনখানি, "গাথা ও সনেট", "কবিতা-গুচ্ছ", 'কাব্যকাহিনী'। চিত্র-রসিকরা মুখর হল তাঁর ছবির জয়গানে ; কাব্যসমালোচকরা দীর্ঘ সমালোচনায় অভিনন্দন জানালেন কবিকে। কিন্তু কোথায় সেই লোকপ্রিয় কবি আর চিত্রশিল্পী ? সকল কোলাহল আর স্তবগান থেকে দূরে নিরালায় ঘরের মধ্যে বসে আছেন তিনি। ক্লান্ত দুই চোখে যেন ধ্যানের আভাস, বহু দূর পথ পেরিয়ে এসে নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে যেন তিনি শেষ খেয়ার অপেক্ষা করছেন, সময় গুণছেন কতক্ষণে সেই নদী পার হোয়ে তিনি পৌছবেন পরপারে যেখানে অপেক্ষা করছে তাঁর মর্ম্মরূপা প্রিয়তমা এলিজাবেথ এলিওনোর !

শেষের দিনে বন্ধুরা ঘিরে রইলেন তাঁকে। সকলের কাছে ক্লান্ত করুণ হাসিমুখে বিদায় নিলেন তিনি। শেষের দিনে তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব যেন আরও মধু ছড়িয়ে দিলে বন্ধুদের প্রাণে ! এমন মানুষকে হারাণো যে কতখানি বেদনার তা যেন সকলে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলেন।

সারা দেশ জুড়ে যখন তাঁর নামে জয়গান উঠেছে, সার্থক কবি ও শিল্পীরূপে যখন তাঁর যশ সর্ব্বোচ্চ শিখরে পৌচেছে সেই সময় ১৮৮২ সালের ১৯শে এপ্রিল দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি পৃথিবীর কাছে চির-বিদায় নিলেন।

সহরতলীর এই বাড়ীতে রসেটি জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন
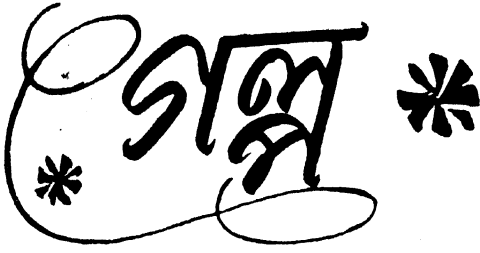
দুঃস্বপ্ন

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শীতের সকাল। তাড়াতাড়ি দাড়ি কামাইয়া আফিসে যাইতে হইবে। ভগবান-দত্ত এই অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বস্তুটার ক্ষমতা ও ঘনিষ্ঠতাহেতু ক্ষৌরকর্ম্মের নামে আতঙ্ক হয়, তৎসহ শীতকালে কর্ম্মান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তকণিকা দেখা দেয়। গৃহিণী রান্নাঘরে দ্রুত রন্ধন কার্য্য করিতেছেন, ন'টায় ভাত দিতে হইবে। সভয়ে কহিলাম—একটু গরম জল দিতে পারো গো!

গরম জল দিলে আর ভাত হবে না, বলে দিচ্ছি—পোড়া উনুনটার আবার কপাল পুড়েছে আজ—

চুপ করিলাম। ভাল করিয়া সাবান দিয়া একটা টান দিয়াছি, আর মনে হইল প্রাণটা ধড়ে নাই। ব্লেডটায় ধার নাই—ছেলেটা কি এই ব্লেডটা দিয়াই পেন্সিল কাটিয়াছে? হতাশভাবে বসিয়া আছি, গৃহিণী কহিলেন—কি হলো?

—বড্ডো লাগছে—পুরুষ মানুষ হলে বুঝতে এ তোমাদের ওই প্রসব-বেদনার চেয়েও বেশী, আর সেও ত ২।৪ বছর অন্তে, এ যে রোজ, নিত্যনৈমিত্তিক।

মেয়ে-মানুষ হয়ে একবার দেখ্‌লে পারতে প্রসব বেদনা কি। এই হাঁড়ি ঠেলা, আর ছেলে-পুলে মানুষ করা—একদণ্ড কি স্বস্তি আছে—

হাসিয়া কহিলাম—যদি জান্‌তে বড় বাবুর হুমকি কি, যদি জান্‌তে শ্রমিক ধর্ম্মঘট কি, যদি জান্‌তে ব্যাঙ্ক-ষ্ট্রাইক কি, যদি জান্‌তে চাকুরী করে বিবিধ ভর্ত্তার মনোরঞ্জন করা কি—তবে বল্‌তে এই-ই ভাল।

—তবুও স্বাধীন ত! আমরা পরাধীন—কোন ইচ্ছা নেই, কিছু করবার যো নেই—

বলিলাম—সত্যিকার স্বাধীন ত তোমরা, গৃহে স্বাধীন। আমি ত টাকা রোজকার করা কল মাত্র, তোমার হুকুমে চল্‌ছি—বাইরে সম্মানিতা—ট্রামে বাসে সর্ব্বত্র।

গৃহিণী কহিলেন—তাই হোক্‌, পরজন্মে তুমি গৃহিণী হয়ে স্বাধীন হ'য়ো আর আমি যেন চাকরী করে এনে দি তোমার হাতে।

—খুব—আজই যদি হ'ত তবে আরও ভাল হ'ত। আফিসে যা বকমারি আজকাল—

গৃহিণীর উনুনে কি যেন চড়বড় করিয়া উঠিল—সে শব্দপ্রবাহ ভেদ করিয়া আমার কথা সম্ভবতঃ তাঁহার কর্ণে পৌঁছাইল না।

সেই কথাটাই ভাবিতেছিলাম—নিশ্চিন্তে পরের অর্জ্জিত অর্থ ব্যয় করা ও কর্ত্তৃত্ব করা বেশ ত! বড়বাবুর খিঁচুনী নেই, কর্ত্তার কৈফিয়ৎ তলব নেই। রাঁধা-বাড়া, ছেলে রাখা অনেক সহজ, অনেক আনন্দময়।

সন্ধ্যায় আবার একটা নিমন্ত্রণ ছিল,—দালদাঘটিত লুচি ও কড়া হিং ঘটিত ডাল খাইয়া অম্বল হইয়াছে। একটু অধিক রাত্রেই গৃহে ফিরিলাম, গৃহিণী সকালের সুর ধরিয়া কহিলেন—দেখ, কেমন বেড়িয়ে এলে, দশজনের সঙ্গে দেখা হল—স্বাধীন! আর আমি হাঁড়ি ধরে বসে আছি সারাদিন—

উদরের অবস্থা বিদিকিচ্ছি হইয়াছে, হাত বুলাইয়া কহিলাম—ভগবান করুন তুমি যেন স্বাধীন হও। আমি যেন পরজন্মে তোমার মত পরাধীনই হই—

শুইয়া পড়িয়া ঐ চিন্তাটাই করিতে লাগিলাম—এ স্বাধীনতা বড় কষ্টকর। তাঁবেদারীয় স্বাধীনতা! গায়ের জোরে সব অন্যায় করবে, আর দুর্ব্বল বলে চাকুরীর ভয়ে সব সহ্য করতে হবে—

ঘুমাইয়া পড়িলাম—ঘুমটা ঠিক জমে নাই। এমন সময়ে প্রায়শঃই নানা স্বপ্ন দেখি তা আপনারা সকলেই জানেন।

হঠাৎ দেখি উদরদেশ অসম্ভব স্ফীত হইয়াছে এবং

বেদনাও করিতেছে। বেদনা ক্রমশঃ গুরু, তাহার পর গুরুতর হইয়া প্রায় অসহনীয় হইল—হয়ত প্রসব বেদনা এইরূপই হইবে। কি করি। আশে পাশে গৃহিণী ছেলে মেয়েরা কেহ নাই। চাকরটাকে বলিলাম—রিকসা ডেকে দে। জহর ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, বড্ড অসুখ। চাকর রিকসা ডাকিতে গেল। জহর ডাক্তারই ভাল—অনেক দিনের চেনা, হাতযশও যথেষ্ট। ফি সাধারণতঃই নেন না—কেবল অষুধের দাম মাত্র।

রিকসা করিয়া ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে গেলাম—পেটটা ক্রমশঃই যেন ফুটিয়া বা ফাটিয়া যাইতে পারে। বেদনাও যথেষ্ট—

জহর ডাক্তার দেখিয়া কহিলেন—এই যে এসেছেন, বেশ বসুন, তা পেটটা অত ফুলেছে কেন?

—সেই ত রোগ—বেদনাও হয়েছে, মনে হচ্ছে—

—সে জানি—আচ্ছা, শুয়ে পড়ুন।

রোগী দেখিবার টেবিলের উপর শুইয়া পড়িলাম—ডাক্তার ষ্টেথিস্কোপ বাহির করিয়া পেটে বসাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রশ্ন করিলাম—ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে পেটে কি দেখ্‌লেন—

—দাঁড়ান, ভাল করে দেখে নি—

অনেকক্ষণ দেখিয়া একটু বিষণ্ণ মুখে কহিলেন, —হুঁ।

—হুঁ কি—ডাক্তারবাবু?

—হুঁ।

—হুঁ—মানে কি?

—বেঁচে আছে—ভয় নেই—

—কি বেঁচে আছে—পেটের মধ্যে বেঁচে থাক্‌বে কি?

—বলছি, সন্তানটা এখনও বেঁচে আছে।

—তার মানে?

—সন্তান হ'য়েছে পেটে—আপনি পূর্ণ গর্ভবতী, তবে প্রসবের কাল ঠিক হয়ত হয় নি?

—তার মানে? রসিকতার আর স্থানকাল নেই? আমি শ্রীভোলানাথ ঘোষাল, আমাদের আফিসের একটা ডিপার্টমেণ্টের হেড, আমার ভয়ে বেয়ারাগুলো হাসে না, আর আমি গর্ভবতী, সন্তান রয়েছে পেটে?

ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—তা আমি কি করবো? জ্যান্ত সন্তান রয়েছে পেটে, যন্ত্রে তার হৃদস্পন্দন পাচ্ছি?

—আমি পুরুষ মানুষ, আমার পেটে সন্তান রয়েছে?

জহর ডাক্তার বিরক্ত ভাবে কহিলেন—আপনি পুরুষ মানুষ তার কি প্রমাণ আছে জানি না, তবে পেটে জ্যান্ত সন্তান রয়েছে এর প্রমাণ আছে। আর যদি তাই হয়ই, তবে পেট কেটে সন্তানটা বের করতে হবে—সিজারিয়ান সেক্‌সন। সন্তান ত বাঁচাতে হবে, প্রসূতিকেও বাঁচাতে হবে। কত পুরুষ মানুষের সন্তান হচ্ছে আজকাল।

ডাক্তার পাগল নাকি, বলে কি?

ডাক্তার কহিলেন—এখন যান, বিশ্রাম নিন্‌ গিয়ে, এখনও সময় হয়নি, সময়ে ঠিক কেটে বের করে দেব। আপনার ভয় কি? আপনার লোক, পুরোনো রোগী, টাকাকড়ি বিশেষ কিছু লাগবে না—এই বড়িগুলো খাবেন যাতে রক্তাল্পতা না হয়।

বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম—কিন্তু পেটের বেদনা কমে নাই। বেদনা একটু একটু আছেই। রিক্সা হইতে ঘরে ঢুকিলাম। কে একজন কোট প্যাণ্ট পরিয়া আয়নার সাম্‌নে বসিয়া গোঁফ ছাঁটিতেছেন। গৃহে আবার কোন অতিথি আসিলেন। পদশব্দে মুখ ফিরাইতেই চিনিলাম গৃহিণী। গোঁফ গজাইলেও সেই মুখ, সেই চোক, সেই চারু কুন্তলদাম। কহিলাম—আমার কোট প্যাণ্ট পরেছ কেন?

—আমি শাড়ীগুলো রেখে দিয়েছি, তুমি প'রো।

—তার মানে?

—মানে আবার কি? আয়নায় ত্মাখো গিয়ে—

গৃহিণী গোঁফে তা দিয়া ছড়ি হাতে যাইতে উদ্যত হইলেন, কহিলাম—কোথায় যাচ্ছো?

একটু বেড়িয়ে আসি—হাওয়া খেয়ে। সংসার করাটা কেমন একটু দেখো।

আয়নার দিকে তাকাইয়া বিষণ্ণ মুখে কহিলাম—তা না হয় করলাম, কিন্তু চাকুরীটাও রাখতে হবে নইলে খাবো কি? তুমিই বা কি খাবে? তুমি তাহ'লে আফিসে যাও—বড় সাহেবকে সব বল গিয়ে, চাকুরী করে টাকা আনো—

গৃহিণী দাঁত খিচাইয়া কহিলেন—চাকুরী করবো কি ক'রে? লেখাপড়া শিখেছি, না তোমার আফিসের কাজ জানি? বড় সাহেবকে বল্‌লেই চাকুরী হবে—হ'লেই থাক্‌বে? ওসব পারবো কেন?

—তবে না হয় ঘরে ছেলেপুলে রাখো, আমিই এই অবস্থায় রিক্সা করে যাই।

—আবার ছেলেপুলে রাখবো কেন? আমি কি মেয়েমানুষ?

—না হয় পুরুষ মানুষই হ'লে, তবুও সংসার রক্ষে করতে হবে ত?

—সংসার আমার কিসের, তোমার—আমি হাওয়া খেতে বেরুবো—

—শুধু শুধু হাওয়া খেয়ে কি হবে—একটা কিছু করো। আমি ঘর আগলাবো, ছেলেপুলে মানুষ ক'রবো, ধারণ করবো—আর তুমি হাওয়া খাবে!

—খাবো বই কি? আমি ঘুরে ঘুরে ভোট নেব, এম, এল, এ, হব—

—এম, এল, এ, হ'লেই বা কি করবে, যদি চাকুরীই না করতে পারো তবে—

—সে পারবো না কেন? মন্ত্রীরা বললে, না হয় দলের কর্তা বল্‌লে হাত তোলা—সে পারবো। এত দিন তোমার কথামত ত সবই করেছি' ওটা পারবো—টাকাও আস্‌বে—

গৃহিণী যাইতে উদ্যত হইলে কহিলাম—শোনো, কোথায় যাচ্ছো—

গৃহিণী সরোষে কহিলেন—তোমাকে সবই বলতে হবে নাকি? রাত্রি দশটায় ফিরবো, ভাত যেন গরম থাকে।

গৃহিণী চলিয়া গেলেন—

হায় হায়! আমি কি করি!

বড় মেয়েটা বিষন্ন মুখে দাঁড়াইয়া আছে। ছোট ছেলেটা সবে কথা বলিতে শিখিয়াছে। সে কহিল—বাবু, মা কোথা গেল?

—বেড়াতে গেল বাবা!

—মা যাবো। বলিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। আমি সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম—আমিই মা তোর বাবা, তোর মা বাবু হ'য়ে গেছে—

—না, তুমি বাবু—

—না, আমিই মা—

—না বাবু,—মা যাই—সে ঠুস্ হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

হায় অবোধ শিশু, কেমন করিয়া তাহাকে বুঝাইব যে আমি আকস্মিকভাবে তাহার মা হইয়াছি, কেবল তাহাই নহে তাহার ভ্রাতা বা ভগ্নীর গর্ভধারিণীও বটে!

বড় মেয়েটাকে কহিলাম—যা উনুনে আঁচ দে।

—তুমি রাঁধবে বাবা? মা কোথায় গেল?

—তা জানি না, না রাঁধলে খাবি কি? আমাকে আর বাবা বলিস্ না—

হায় বিধাতা! ছেলেমেয়ের সামনে এমন করিয়া অসম্মান না করিলেই কি নয়!

পেট ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠিতেছে, দমশম্ ঠেকিতেছে, বেদনাও বাড়িয়াছে। কিন্তু কি করি? রান্না নামে নাই, ছেলেমেয়েদের কি করি? বেদনা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল। কোনমতে বাহির হইয়া একটা রিক্সায় উঠিয়া কহিলাম, জহর ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারীতে চল্—

রিক্সা ঠন্ ঠন্ করিয়া চলিল—

জহর ডাক্তার ডাক্তারখানাতেই ছিলেন। আমাকে দেখিয়া কহিলেন—আসুন—চলুন পরীক্ষা করি।

টেবিলের উপর শুইয়া পড়িলাম। জহরবাবু পেট টিপিয়া টেথিস্কোপ দিয়া পেট পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—ঠিক আছে,—ঠিক সময়ই এসেছেন—

—কি ঠিক আছে ডাক্তারবাবু—

—তা দিয়ে দরকার কি? ঠিক আছে—আচ্ছা দেখি—

তিনি পুনরায় নাভিদেশ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—আপনার ত আর একবারও পেট কাটা হয়েছিল।

—আজ্ঞে না—এই প্রথম আমার—বাকীটুকু বলিতে লজ্জিত হইলাম।

—আপনার মনে নেই, কাটা হয়েছিল, আচ্ছা দেখি পুরোনো ডাইরী বইটা। তিনি আলমারী হইতে একটা বিরাট খাতা লইয়া দেখিলেন, কিছুক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া কহিলেন এই যে, এই যে! ঠিক ১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে

কাটা হয়, র‍্যাডক্লিফ সাহেব কাটেন, আমি রাজেনবাবু বিধু-ডাক্তার সব এ্যাসিস্টান্ট ছিলাম।

হতাশভাবে বলিলাম—তাহবে—অনেক দিনের কথা—

—হ্যাঁ জানি, তোমাদের ঘা শুকোলেই আর ডাক্তারের কথা মনে থাকে না। যাক্ বড় কঠিন অপারেশন্। এ্যাসিষ্টাণ্ট না হলে হয় না—রাজেনবাবু আর বিধুবাবুকে আনাতে হবে। রাজেনবাবু অজ্ঞান করবেন, আর বিধু ডাক্তার দরকার হলে কোরামাইন দেবেন।

—তবে ডাকুন—বড্ডো বেদনা, আর সহ্য করতে পারি না—

—হ্যাঁ ডাকছি।

অপারেশন টেবিলে শুইয়া আছি। রাজেনবাবু কহিলেন, এ আর ক্লোরোফরম করে কি হবে—লোকাল এনেস্থেসিয়া দিয়েই কেটে দিন—

জহরবাবু কহিলেন—হ্যাঁ তাই, আপনি নাড়ীটা ধরে থাকুন, বিধুবাবু কোরামিন দিয়ে দেবেন দরকার হ'লে—

ক্ষীণকণ্ঠে কহিলাম—বড্ডো ব্যথা লাগবে—

জহরবাবু কহিলেন—কিছু না, ব্যথা কি? সামান্য পিনের খোঁচা। ধরবো কি ঘ্যাঁচ করে কেটে দেবো—সঙ্গে সঙ্গে হালকা হ'য়ে যাবেন, দৌড়ে বেড়াবেন—

ডাক্তারবাবু শাণিত ছুরিকার ধার পরীক্ষা করিয়া পেট চিরিয়া ফেলিলেন, কোকেন দিয়া দাঁত তুলিবার মত বুঝিলাম—কিন্তু ঔষধের ক্রিয়ায় বেদনা বুঝিলাম না। জহরবাবু কি যেন টানিয়া বাহির করিতেছেন—কাগজ ভাঁজ করিবার মত শব্দ হইতেছে।

—কি ডাক্তারবাবু—

—কাগজ—

—কাগজ—কাগজ এল কোথা থেকে?

—ঢুকেছে কি করে, বের করলেই হালকা হ'বে।

—কিসের কাগজ?

এই ত এস, আর, সির রিপোর্ট, হাই পাওয়ার রিপোর্ট এই সব।…কেমন হাল্‌কা বোধ হ'চ্ছে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভারটা কমেছে—তবে সড়্ সড়্ করছে কি? বেদনা ক'রছে—

—ও কিছু না, সামান্য বেদনা। উঁই পোকা। এর আগের বার অপারেশনের সময় কতকগুলো উঁই ঢুকেছিল, —সেগুলোর পাখা হ'য়েছে তাই উড়ছে—

—উড়ে কোথায় যাচ্ছে? উড়ছে কেন?

—উঁই উড়লে কি হয় জানেন না—কাক, চিল, চড়ুই পাখীরা বসে আছে, উড়লেই খাবে—তাদের ত আজ ফিষ্টি লেগে গেল। বাদলা দিনে যেমন উড়ে উড়ে খায়—

—উঁই সব বেরিয়ে গেছে?

—প্রায়ই বেরিয়েছে—তাদের ওড়াও জীবনের মত শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, ভয় নেই, এখন সেলাই করে দিলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

—আজ্ঞে, ডাক্তারবাবু শুনি মাঝে মাঝে কলেজে পেটের মধ্যে তোয়ালে, কাঁচি রেখে সেলাই করে দেয়—সেরকমটি যেন না হয়—

—না না তা হবে কেন? তবে আপনার পেটটা যেরকম কমে গেছে তাতে একটু কিছু ভিতরে না দিয়ে সেলাই করলে মানাবে না।

রাজেনবাবু বললেন—ন্যাকড়া দিয়ে, সেলাই করে দাও—পেটটা বড়ও দেখা যাবে, তেমন ভারীও হবে না—

আমি কহিলাম—ছেঁড়া ন্যাকড়া?

জহর ডাক্তার তাড়াতাড়ি আমারই কাপড়ের কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া পেটের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া সেলাই আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেলাই করিতে করিতে কহিলেন—চমৎকার মানানসই হবে—বেশ নেয়াপাতি রকমটা থাকবে—

দেখিতে দেখিতে সেলাই শেষ হইয়া গেল। রক্তাক্ত-জাত তোয়ালেতে ফুঁদিতে ফুঁদিতে ডাক্তারবাবু কহিলেন—বিধুবাবু, যদি বেদনা হয় একটু সেঁকের ব্যবস্থা করবেন আর যদি একটু বেসামাল হয় তবে একটু সান্ত্বনা দিয়ে একটা গ্লুকোজ দিয়ে দেবেন। ওকে রিক্সাতে তুলে পৌঁছে দিয়ে আসুন—তাতে একটু নির্ভয় হবে—ছেলেমানুষ ত!

নাভিদেশে কেমন একটা বেদনায় মোচড় দিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দ্রুত বাহিরে যাইতে বাধ্য হইলাম। পথেই গৃহিণীর সহিত দেখা—তিনি শাড়ীই পরিয়াছেন—মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম গোঁফ গজায় নাই।

তিনি কহিলেন—কি হ'ল গো? ছুটছ কেন?

—সকালে উঠে তোমার মুখ দেখলে দিনটা ভাল যায় তাই তোমার মুখ দেখতে এলাম।

গৃহিণী গ্রীবা ভঙ্গি করিয়া কহিলেন—ভীমরতিতে ধরেছে—

খুব বাঁচা গেল—ভাগ্যিস্ স্বপ্ন স্বপ্নই।
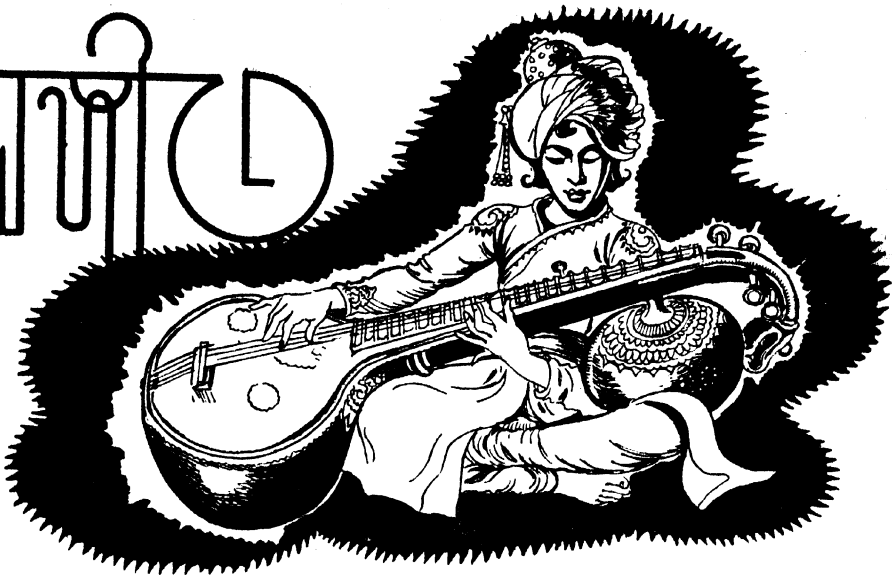
খাম্বাজ—দাদরা

ভজন

হে যোগেশ হে যোগেন্দ্র
তুমি গুণের আধার,
মগন হয়েছ বিষম তপে
উজলী চারিধার।
জয় জয় ধ্বনি রবে সবে নাচে
আনন্দে অপার,

তব অনুপম রূপের অন্ত
ত্রিভুবনে পাওয়া ভার।
সুরাসুর যোগী-ঋষি গুণী-জ্ঞানী
ধ্যান ধরে অনিবার
গোপেশ তোমার গুণ গানে রত
রাখ হে পদে তোমার॥

রচয়িতা ॥ গীত-সম্রাট শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরলিপি ॥ গীত-বিশারদ মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
পধা র্সনা ধা | পমা গরা গা | গমা পা মা | পা -া পা | গা মা পা | ধা ধা ণা |
হে০ ০০ যো গে০ ০০ শ হে০ ০ যো গে - ন্দ্র তু মি গু ণে র আ

পধা পধা র্সনা | ধা -া -া | পা না না | না না না | র্সা র্সা র্সা | না র্রর্সা নর্সা |
ধা০ ০০ ০০ র - - ম গ ন হ য়ে ছ বি ষ ম ত পে০ ০০

ধা র্সা ণধা | পা মা গা | রা -া গা | পা -া ধা | পধা র্সনা ধণা | পা -া -া II
উ জ লী০ ০ চা রি ধা - ০ ০ - ০ ০০০০০০ র - -

গা মা ধা | ণা ধপা ধা | না না র্সা | না র্সা র্সা | পা র্সা না | র্সা না র্রা |
(১) জ য় জ য় ধ ০ নি র বে স বে না চে আ ০ ন ০ ন্দে অ
(২) সু রা সু র যো• গী ঋ ষি গু ণী জ্ঞা নী ধ্যা ন ধ রে অ নি

সর্সা ণধা ণা | ধা -া -া | র্সা র্গা র্গা | র্গা র্গা র্গা | র্গা র্মা র্রা | র্সা না সা |
(১) পা০ ০ ০ ০ র - - ত ব অ নু প ম রূ পে র অ ০ ন্ত
(২) বা০ ০ ০ ০ র - - গো পে শ নি য় ত গু ণ গা নে র ত

ধা সা ণা | ধা পা মগা | রা -া গা | পা -া ধা | পধা সণা ধণা | পা -া -া II
(১) ত্রি ভু ব নে পা ওয়া০ ভা - ০ ০ - ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র - -
(২) রা থ হে প দে তো০ মা - ০ ০ - ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র - -

সৌভ্রাত্র্য

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু এম-এ

রামায়ণ ও মহাভারত অপার অগাধ বারিধিতুল্য। ঐ বারিধি-গর্ভে তত্ত্ব, নীতি, উপদেশরূপ মণি মুক্তা প্রবাল যে কত লুক্কায়িত আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও গার্হস্থ্য-নীতির কত কথা যে আছে, যাহার মধ্যে ব্যক্তিগত তথা সমষ্টিগত জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান মিলে। মহাভারতের ত কথাই নাই—তাহা একাধারে বিশাল বনানী ও অসীম সাগরের মত। মানব-জীবনের নানাবিধ গূঢ় জটিল সমস্যা বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়া বিভিন্ন অবস্থার পরিবেশে আলোচিত, ব্যাখ্যাত ও মীমাংসিত হইয়াছে—মহাভারতে। "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।" ভারতীয় জীবনের এমন কোন রহস্য নাই যাহা মহাভারতে স্থান পায় নাই। রামায়ণ-মহাভারত-গ্রথিত উপদেশ-রত্ন-মালার মধ্য হইতে আজ একটী সহজ সাধারণ সর্ব্বজনবোধ্য শিক্ষার কথা বাছিয়া লইতেছি—তাহা হইতেছে সৌভ্রাত্র্য।

রামায়ণে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন চারি ভ্রাতার মধ্যে এমন স্নেহ যে তাহাদিগকে এক নারায়ণেরই চারি অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিংবদন্তী বা শাস্ত্র যে চারি ভাইকে এক নারায়ণের চারি অংশ বলিয়া প্রচার করিয়াছে তাহার তাৎপর্য্য গূঢ়। এখানে একে চার। আবার চারি ভাইএর মধ্যে এমন মিল যে তাহাদিগকে আলাদা করিয়া ভাবা যায় না—চা'রে এক। সৌভ্রাত্র্য দৈবী সম্পদ; দাশরথি-চতুষ্টয়ের সৌভ্রাত্র্য স্বয়ং দেব-শ্রেষ্ঠ নারায়ণের অবতারত্বের কথাই মনে উদ্রেক করে। নারায়ণের বিভূতি-বিশেষ যেন মানবের ঘরে সৌভ্রাত্র্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা যাইতে পারে যে ভ্রাতৃত্ব দেবত্বের স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে, অথবা দেবত্বই মর্ত্ত্যে নামিয়া ভ্রাতৃত্বের মধ্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই চারি ভ্রাতার মধ্যে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সহোদর, আর সকলেই পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভাই। বিমাতার বিদ্বেষ স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক বলিয়া ধরা হয় এবং রূপকথা হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্য পুরাণ পর্য্যন্ত দেশীয় সকল সাহিত্যেই তাহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সুতরাং বৈমাত্রেয় ভাইদের মধ্যে সদ্ভাব অতি বিরল। বিমাতার জন্যই রাম রাজ্যভ্রষ্ট ও বনবাসী হইলেন। তথাপি রামচন্দ্রের ও ভরতের মধ্যে যে সৌভ্রাত্র্য তাহার উপর বৈমাত্রেয় বিরূপতার বিন্দুমাত্র ছায়া পড়ে নাই—বরং বিমাতার বিরূপতার পটভূমিতে ভ্রাতৃত্ব যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে, মাতা-পুত্রের অচ্ছেদ্য গূঢ় জৈব সম্পর্কের উপর, নাড়ীর টানের উপর, জয়ী হইয়াছে সৌভ্রাত্র্যের আত্মিক সম্পর্ক। বিশ্ব-সাহিত্যে আর কোথাও ভ্রাতৃত্বের এমন চিত্র আছে কি না জানি না।

রাজ্যভ্রষ্ট বনচারী সহায়-সম্বলহীন রামের পাশে লক্ষ্মণ—বিরাট শক্তি-স্তম্ভ। ত্রিভুবনজয়ী রাবণ তাঁহার সকল শক্তি সম্পদ লইয়া বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; স-লক্ষ্মণ রাম ভরা, পূরা, এক অখণ্ড রাশি। অপর দিকে বিভীষণকে হারাইয়া রাবণ বিশ্বের সমগ্র ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও হীন, উন, ভগ্নাংশ।

ভ্রাতৃ বলে বলীয়ান রামের সঙ্গে ভ্রাতৃপরিত্যক্ত রাবণ পারিয়া উঠিবেন কেন? এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভ্রাতৃহীনের পরাজয় অনিবার্য্য। রাম লক্ষ্মণের জয় সৌভ্রাত্রেরই জয়, রাবণের পরাজয় ভ্রাতৃ বিরোধেরই মর্ম্মন্তুদ পরিণাম। দেবতা, ধর্ম্ম, নীতি রামের পক্ষে—কেন না তিনি ভাইকে অচ্ছেদ্য স্নেহপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। যেখানে সৌভ্রাত্র্য, সেখানেই ধর্ম্ম, সেখানেই জয়—ইহাই রামায়ণের শিক্ষা। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের কাহিনীতেও এই শিক্ষারই পুনরুক্তি। বালী সুগ্রীব দুই ভাই যতদিন মিলিয়া মিশিয়া ছিল ততদিন কিষ্কিন্ধ্যার রাজশ্রী অম্লান ছিল। সেখানে ভ্রাতৃ-কলহের ফলে বালীর মত মহাবীরেরও পতন ঘটিল।

মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবও সহোদর নহেন—তিন ভাই কুন্তী-গর্ভজাত, যমজ দুই ভাই মাদ্রীর গর্ভে জন্মিয়াছে। পাঁচ ভাই মিলিয়া শত কৌরবের বিরুদ্ধে সমর-অভিযান চালাইলেন এবং জয়লাভ করিলেন, কর্ণহীন পঞ্চপাণ্ডব একদিকে, আর একদিকে শত কৌরব। কর্ণ পাণ্ডবপক্ষে থাকিলে অথবা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃ বলে উন হইলে কৌরবের পরাভব আগেই ঘটিত।

কর্ণের মৃত্যুর পর তাহার জন্মরহস্য প্রকাশিত হইল। যুধিষ্ঠির মর্ম্মপীড়ায় কাতর—কুন্তী অনুশোচনানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, রাজ্য পাইয়াও পাণ্ডবেরা সুখী হইতে পারিলেন না। একদিকে কর্ণের মত ভাইকে, অপর দিকে একশত জ্যেষ্ঠতাত পুত্রকে হারাইয়াছেন; মহাপ্রস্থানের আহ্বান আসিয়া পাণ্ডবদিগকে বিবাগী করিল।

শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের উদ্দেশে রামচন্দ্রের সেই মর্ম্মভেদী-বিলাপ কাল-সমুদ্রের বহু তরঙ্গের উপর দিয়া ভাসিয়া আসিয়া আজও ভ্রাতৃহারার কর্ণকুহরে করুণ প্রতিধ্বনি জাগাইতেছে—"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ। তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥" দশানন সীতাকে হরণ করিল, লোকাপবাদ ভয়ে রাম নিজে সীতাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইলেন এবং শেষকাণ্ডে সীতা রামের চোখের সম্মুখে পাতাল প্রবেশ করিলেন—এসবই রাম সহিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ-বর্জ্জনের পর তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ-বর্জ্জনই রামায়ণের এবং রামের জীবনের শেষ ও চরম ট্রাজেডি। পত্নী-বিয়োগ বেদনা-দায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ একেবারে প্রাণান্তকর।

আজ আমাদের বাঙালী পরিবারের ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—তাই বাঙালীর গৃহ আজ শ্রীহীন। ভায়ের সঙ্গে ভাই না মিলিলে মায়ের চোখের জল মুছিবে না; মায়ের চোখের জল না মুছিলে উন্নতির আশা নাই। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি কখনই সম্ভবপর হইবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে ভাই ভাই একত্র না হইয়াছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িবার আগে, বড় বড় সভা সমিতির উদ্যোগআয়োজন করিবার আগে, ভায়েরা মায়ের কোলে মিলিত হউন, সৌভ্রাত্র্য-ধর্ম্ম ঘরে ঘরে পালিত হউক। ভ্রাতৃদ্রোহী হইলেই প্রকারান্তরে—মাতৃদ্রোহী হইতে হয়—কারণ মায়ের সন্তানকে ভাল না বাসিলে সন্তানের মাতা তুষ্ট হইতে পারেন না। সুতরাং বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ভায়ের হাতে রাখী পরাইতে হইবে। ভাইকে ভাল না-বাসিলে স্বদেশ-বাসীর প্রতি সত্যিকার মমতা জাগিতে পারে না, বিশ্ববাসীর প্রতি ত দূরের কথা। 'Charity begins at home' প্রবচনটী অতি সত্য। গর্ভধারিণী জননীর প্রতি ভক্তি না জন্মিলে দেশমাতার প্রতি মমতা সত্য হইয়া উঠে না; মায়ের পেটের ভাইকে যে ভালবাসিতে পারে না তাহার মুখে বিশ্ব-মৈত্রীর বাণী সাজে না। সৌভ্রাত্রের অনুশীলন ও বিকাশ হইলে শুধু যে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান হইবে তাহা নয়, জাতীয় আন্তর্জাতিক বহু সমস্যার সমাধানও অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। খণ্ডিত বঙ্গে এবং বৃহত্তর বঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের সাধন ও রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান আবার সত্য ও সার্থক হউক।

বৈষ্ণব, সহজিয়া ও বাউল

ডঃ ক্ষেত্রমোহন বসু

॥ ১ ॥

আমরা মানুষ, মর্ত্যের জীব। ইন্দ্রিয়গ্রামকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়া উঠে; মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বিষয় উপভোগ করিয়া থাকি। আহার, নিদ্রাদি জৈবিক ও শরীর প্রয়োজন ব্যতীতও উপভোগের সহস্র উপকরণ আমাদের প্ররোচিত করিতেছে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে বিষয়-পুষ্পে,—তাহাকে দর্শনে, স্পর্শে, আঘ্রাণে, আস্বাদে নানা রস নিঙড়াইবার দুর্নিবার এষণা। এখন কথা হইতেছে এই যে, যে বস্তুজগতকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, অনুভব করিতেছি, উপলব্ধি করিতেছি—নানারূপে গন্ধে রসে ছন্দে—তাহাতে সার বস্তু কই? যে রস পাইতেছি তাহাত রস নয়! অভাবের তাড়না, অতৃপ্ত বাসনা, লালসার জ্বালা আমাদের ত কমিতেছে না! আহারান্তে ক্ষুৎক্ষামত্ব রহিয়া যায়, উপভোগে অতৃপ্তি আসে, কামনার পুষ্পে-পুষ্পে মনোভৃংগ ঘুরিয়া বেড়ায়; জগতের মানুষ যযাতি পুত্রযৌবন কাড়িয়া লইতে অভিলাষ করে, কামনায় বহ্নিশিখা উপ-ভোগের প্রয়াসকে নিরন্তর উদ্দীপ্ত করিয়া চলে। এসবের কারণ কি এই নয় যে আমরা ছায়ার ব্যাপারী। পরমা অতৃপ্তি, পরিপূর্ণ নীরসতা, সর্বাতিশয়া শুষ্কতা কী রস? রস কোথায়? কায়িক যাহা তাহাতে রসের স্ফূর্তি নাই। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, 'মৈত্রেয়ী! আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তোমার বিষয়াশয় সপত্নী কাত্যায়নী হইতে পৃথক করিয়া লও'। প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বলিলেন,—

"কিমহং তেন কুর্যাম্ যেনাহং নামৃতং স্যাম"

অমৃত [রস] নেই যাহাতে তাহা লইয়া আমি কি করিব ?

রসই তিনি—রসো বৈ সঃ। "সঃ" এর প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে, ধাবিত হইতে হইবে—তবেই না রসোপলব্ধি! 'সঃ' এর অভিমুখে গমনই তপস্যা। এই যে অভিগমন, রসের আসককে ধরিবার জন্য অভিসার, ইহাই আদর্শরূপে স্থান পাইয়াছে বৈষ্ণব দর্শনে ও সাহিত্যে। রসই আনন্দ। শ্রুতি বলিতেছেন,—প্রাণিগণ আনন্দ হইতে উদ্‌ভূত হয়, 'আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে এবং সেই আনন্দ-সাগরেই মিশিয়া যায়।

"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভুতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।"

আনন্দই যাবতীয় সৃষ্টির মূলে, আনন্দশক্তিই [হ্লাদিনী] উচ্ছলিত হইয়া সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। সৃষ্টিরও বিরাম নাই, আনন্দশক্তিরও শেষ নাই।

"আনন্দোচ্ছলিতা শক্তিঃ সৃজত্যাত্মানমাত্মনা" (বিজ্ঞানভৈরব) ॥

মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি স্থাবর জংগমে যাহা আনন্দ প্রতিভাত দেখি, তাহা পরমানন্দময় শক্তিরই আনন্দ-রস-বিভ্রম মাত্র, আনন্দ-স্রোত যেন বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিসরিত [refracted] হইয়া লহরী তুলিতেছে !

সংসারে যাবতীয় সৃষ্টি হইয়াছে যেন এক আনন্দময় প্রকাশের জন্যই। আনন্দ সংসারের আদিতে, সংসারের মধ্যে ও সংসারের অন্তে। আনন্দ ছাড়া জগতে যেন কিছুই নাই। কারণ, ভগবান আনন্দ-স্বরূপ হওয়ায় আনন্দ ছড়িয়ে দিতেছেন—সূর্যের তাপ কিরণের মত—দশদিকে, তিন কালে, সর্বত্র। ভগবানের এই যে হ্লাদিনী শক্তি সেই শক্তিবলে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতেছেন ও জীবনিচয়কে আত্মানন্দ অনুভব করাইতেছেন। এই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন তিনি আনন্দ-স্বরূপ, রসস্বরূপ, রসোবৈসঃ।

'রস বই বস্তু নাই এ তিন ভুবনে'—

॥ ২ ॥

বাস্তব সত্তার দুই রূপ,—আস্বাদক ও আস্বাদ্য। কৃষ্ণ ও রাধা। শাশ্বত সত্তার এই রূপ নিত্য। একটি রসস্বরূপ, অপরটি প্রেম বা আনন্দস্বরূপ। ইহা অপ্রাকৃত জগতের কথা। প্রাকৃত জগতে প্রকট-বৃন্দাবনে যে গোপগোপীরূপে রাধাকৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া থাকি তাহা এই নিত্যরূপেরই ক্ষণিক প্রকাশ, যাহাতে অনিত্যের মাধ্যমে নিত্যের সন্ধান পাইতে পারি। বৈষ্ণব মহাজনরা মর্ত্যেরই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিলাসকে আশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃতধামে [শ্রীবৃন্দাবনে] যে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা চলিতেছে তাহার ইশারা করিয়াছেন। বৈষ্ণব সহজিয়ারা বলেন—

'রস আস্বাদন লাগি হইলা দুই মূর্তি।
এই হেতু কৃষ্ণ হয় পুরুষ প্রকৃতি॥
প্রকৃতি না হইলে কৃষ্ণ সেবা অন্য নয়।
এই হেতু প্রকৃতি ভাব করয়ে আশ্রয়॥' দীপকোজ্জ্বল গ্রন্থ॥

একের যে দুইটি ধারা রাধাকৃষ্ণের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, তাহা প্রাকৃত নরনারীর ভিতর দিয়াও প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাকৃতগুণের ছোঁয়াচ লাগায় তাহাতে মলিনতা প্রবেশ করিয়াছে, সাধন সাহায্যে নির্মলতার স্বচ্ছপ্রবাহে পরিণত হইলেই প্রেমস্বরূপের উপলব্ধি হয়। সহজিয়াগণ মানুষকেই উচ্চাসন দিয়াছেন—

'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—(চণ্ডিদাস)

তাঁহাদের মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই অপ্রাকৃতরূপের ['মনের মানুষ'] সন্ধান পাওয়া যায়। নরের সাধারণ রূপের মধ্যে যে কৃষ্ণ-রূপ [শাশ্বত আস্বাদক রস] আছেন তাহাকে বলা হয় সেই নরের "স্বরূপ"; পক্ষান্তরে, নারীর বাহ্যরূপের অভ্যন্তরে যে রাধারূপ [শাশ্বত আস্বাদ্য রতি] আছেন তাহাকে বলা হয় সেই নারীর "স্বরূপ"। সাধারণ কাম হইল 'এই রূপ হইতে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন'। এই 'রস' ও 'রতির সংযোগ বিধায়ক যে বস্তু ['রমণ'] তাহাকে বলে প্রেম [প্রেমা-পিরিতি]। সহজিয়াদের মতে নরনারীর মধ্যে এই রাধাকৃষ্ণের রূপলীলা ও স্বরূপ-লীলাকে বলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতলীলা। তাহা হইল নর ও নারী হইলেন স্বরূপে কৃষ্ণ ও রাধা, অথবা কাম [রস] ও মদন [রতি]। সহজ সাধনের মুখ্য হইল 'আরোপ'-সাধন। উদ্দেশ্য এই, যতক্ষণ পর্যন্ত রূপের ভিতরে স্বরূপের উপলব্ধি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রূপের ভিতর স্বরূপের আরোপ করা, এজন্য নরনারীর পরস্পর পরস্পরকে রাধা-কৃষ্ণ স্বরূপে আরোপ করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হয়।

'রূপেতে স্বরূপে দুই একু করি
মিশাল করিয়া থুবে'। (চণ্ডিদাস)

চণ্ডিদাস রজকিনী রামীর মধ্যে রাধাতত্ত্বের আস্বাদন করিয়াছিলেন।

সহজিয়ারা সুন্দরী স্ত্রীর সাহায্যে মিলিত সাধনা করিয়া থাকেন। ইহা এক গুহ্য সাধনা। ইহাকে নায়িকা সাধন বলে। ইহার আটটি অংগ—সাধনা, স্মরণ, আরোপ, মনন, ধ্যান, পুজা, জপ ও আরাধনা। প্রত্যেকটিতে আসন আছে, মন্ত্র আছে, ক্রিয়াকলাপ আছে। ক্লীং ক্রীং হ্রীং স্বাহা প্রভৃতি যুক্ত নানা মন্ত্রের সাহচর্যে তান্ত্রিকতামূলক বিভিন্ন পর্যায় আছে। কিন্তু তন্ত্রের বামাচার পদ্ধতিতে যেরূপ মৎস্য, মাংস, মন্ত্রের ব্যবহার আছে, সহজিয়া সাধনে সেরূপ কিছু নাই। তন্ত্রে স্ত্রীর প্রয়োজন হয় যন্ত্র হিসাবে mechanical ভাবে, প্রেমের সংগে তাহার কোন সংস্রব নাই। কিন্তু সহজিয়ারা পরকীয়া স্ত্রী গ্রহণ করেন, প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য। তন্ত্রে হৃদয়ের কোন যোগ নাই, অনুভূতির বালাই নাই, সহজিয়া-র অনুভূতিই সর্বস্ব।

'সহজ' সম্বন্ধে কবীর বলিতেছেন যে সহজ এমন বস্তু যাহার সাহায্যে মানুষ সর্ববাসনার জিনিস ত্যাগ করে, পঞ্চেন্দ্রিয়কে বশে রাখে, পুত্রকলত্র-পরিজনাদির বাসনা ডুবে থাকে এবং কবীর রামের প্রেমাস্পদ হয়। অর্থাৎ

সহজ হইল ভগবৎপ্রেম, সহজ হইল সেই মূলরস যে রসে ডুবিয়া "রসিক" হওয়া যায়। দীপকোজ্জ্বল-পুঁথিতে আছে—

'রসবস্তু থাকে সেই রসিক শরীরে
'পিরিতি মূরতি হয় প্রেম নাম ধরে।'

বৈষ্ণবাচার্যগণ অনেক সময় এই প্রেমকে (পিরিতি চণ্ডীদাস) কাম বলিয়াছেন, যদিচ উভয়ের মধ্যে মূলতঃ প্রভেদ আছে। এই কাম হইল সিসৃক্ষা—Primordial emotion—যাহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে—

'স ঐক্ষত। অহং প্রজায়েয়।'

এই কামই হইল 'আনন্দবিস্ময়রস'। যে রসের আকর্ষণী শক্তিতে প্রেমাস্পদ আকৃষ্ট হন। সহজিয়াদের ধারণা সহজের স্থান হইল কোন তুরীয় অবস্থা—নিত্যের দেশ—নিত্য বৃন্দাবন ('গুপ্তচন্দ্রপুর'); এখানেই কাম প্রেমে পরিণত হইয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের যে বিশুদ্ধ প্রেম 'নিকষিত হেম' তাহা এই গুপ্তচন্দ্রপুরেই চিরন্তন প্রবাহিত। মর্ত্যের (অপ্রাকৃতের) লীলাভূমিতে পৌছাইবার পথ একটি আছে—সেই পথ Psychological discipline এর পথ। সে সাধনার পথে উজান বেয়ে যেতে হবে। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সেখানে মেশামেশি কোলাকুলি করিয়া আছে।

চণ্ডীদাস বলিতেছেন:

সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর
জানায় সকল লোকে।
সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে—
এ কথা কয়ো না কাকে॥ ('সহজিয়া-সাহিত্য)

॥৩॥

শহর হইতে দূরে নিভৃত পল্লীর নিরালা নিকুঞ্জে বাস করে এক দল গায়ক। তাহাদের গানের যন্ত্র হইল একতারা বা গোপীযন্ত্র; অনাড়ম্বর, সহজলভ্য একটি বাঁশের চোঙা ও চামড়ার একটি আস্তরণ। ইহাদের গানে আছে—সারল্যের ছন্দ. পরিচিত ভাষা ও সহজ আবেদন, কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে মোটেই খেলো নয় তাহার ভাবসম্পদ। ইহাঁদের গোষ্ঠী বিভিন্ন। কেহ সহজিয়া, কেহ নাথসম্প্রদায়ী, কেহ কবীরপন্থী। কেহ আউল বা কর্তাভজা, কেহ বা বাউল অথবা সুফি। সমাজের নিম্নস্তরে ইহাঁদের জীবনযাত্রা, জাতিতে ইহাঁরা হিন্দু বা মুসলমান। বাউল যাঁহারা তাঁহারা গৃহস্থ হইতে পারেন, অথবা ভিক্ষু-সন্ন্যাসীও হইতে পারেন। হিন্দু বা 'বৈষ্ণব, মুসলমানরা সুফি। উভয় ধর্মের সাধনার মধ্যে একটা ভগবৎ প্রেম সম্বন্ধে ধ্যানরসিকতা (mysticism) সুস্পষ্ট। আউল, বাউল, দিবানা, বাওরা, প্রভৃতির তাৎপর্য যাবতীয় সামজিক দায়িত্বপাশ হইতে মুক্ত। ইংরাজীতে যাহাকে convention বলা হয় সেই convention হইতে মুক্ত হইলেন ইহাঁরা, বাঁধা ছাদা নিয়মকানুনের ধার ইহাঁরা ধারেন না। ইহাঁদের একরূপ গুহ্যসাধনা আছে। অদ্ভুত মানুষ এই বাউল, —আচরণ অদ্ভুত, রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান সবই ইহাঁদের অদ্ভুত। কোন নিয়মকানুন দিয়ে তাঁহাদের বাঁধা যায় না—কী সামাজিক, কী নৈতিক, কী ধর্মতাত্ত্বিক। জীবনের মূল সুরটী হইল তাঁহাদের—স্বাধীনতা। যে-সব ধর্মের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি অথবা গোঁড়ামি-ভণ্ডামির বাহুল্য তাহার দিক দিয়ে তাঁহারা যান না, অর্থাৎ যাহাতে নাকি আত্মার সহজ নিঃশ্বাসটি চাপা পড়িবার সম্ভাবনা। ইহাঁদের ধর্মপথে যাত্রা হইল স্রোতের বিপরীত মুখে। উলটা পথের সাধক হইলেন বাউল, নাথযোগী ও সুফি। বাউলগণ সহজিয়াপথের পথিক। জিনিসটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

সৃষ্টির বিপরীতমুখী স্রোত হইল উজান স্রোত; এই উজান বাহিয়া সাধনার বলে সিদ্ধগণ শাশ্বতপুরুষের দিকে ['সং'এর দিকে] গমন করিতে প্রযত্ন করিয়া থাকেন। নিত্যের দুই দিক,—শিব ও শক্তি। শিব হইলেন প্রপঞ্চের বাহিরের বস্তু, শুদ্ধসত্ত্ব, শান্ত, মুক্ত। শক্তি হইলেন প্রপঞ্চের ক্রিয়াশীলতা, পরিবর্তপ্রবাহ, সৃষ্টিলহরী—dynamism; জাগতিক অভিব্যক্তি সব তাঁহাতেই বিধৃত, অনুস্যূত। এখন, ভাণ্ড যদি ব্রহ্মাণ্ডেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়, তবে ভাণ্ডেও ঐ দুই গুণ থাকিবে—শিব ও শক্তি, বা পুরুষ ও প্রকৃতি। জন্ম, মৃত্যু, জগতে আনাগোনা নিম্নাভিমুখী স্রোত, ভাঁটার দিক,—শক্তির গণ্ডী jurisdictionএর অন্তর্গত। শিব হইলেন স্বরূপে স্থিতি, শান্তাবস্থা, উচ্চাভিমুখী, স্রোতের উজান দিকস্থ শাশ্বত পুরুষ। যোগীর [সাধকের] লক্ষ্য হইল এই সাধারণ [নিম্নাভিমুখী] স্রোতকে কোনও রূপ গুহ্য কায়িক ও মনস্তাত্ত্বিক [psychophysical] সাধনার সাহায্যে 'উল্টা পথে' চালিত করা যাহাতে শক্তি শিবের সহিত মিলিত হইতে পারে। শিব শক্তির মিলনে পরমসুখের উপলব্ধি হয় [বৌদ্ধ 'মহাসুখ'; তন্ত্র 'সামরস্য-সুখ'; বৈষ্ণব 'মহাভাব'] —কুলকুণ্ডলিনীর সহস্রারে মিলিত হওয়া [যোগ] একই কথা। মহাযানী সহজিয়া-বৌদ্ধদের "সহজ" হইল 'উপায় ও প্রজ্ঞা'র সাহায্যে দ্বৈতের রাহিত্যে পৌছান। সাধক ও সহজিয়াদের ভাষায় এখন 'রসিক' হইলেন, অর্থাৎ রসময় হইলেন। চণ্ডিদাসের গানে আছে—

"প্রেম সরোবরে দুইটি ধারা
আস্বাদন করে রসিক যারা॥
দুই ধারায় যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিকযুগল দেখে॥"

ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন: "হিন্দু ও বৌদ্ধতান্ত্রিক পদ্ধতিতে—এমন কি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভিতরেও যাহা ছিল মূলতঃ একটি যোগসাধনা, বৈষ্ণব সহজিয়ার ভিতরে তাহা যোগসাধনাকে অবলম্বন করিয়াই একটি প্রেম-সাধনায় রূপান্তরিত হইল।"

বৌদ্ধ-সহজিয়া ও বৈষ্ণব-সহজিয়া এই দুই পদ্ধতির সাধনা হইতে উদ্‌ভূত হইল বাউলদের সহজিয়া সাধনা—উল্টা সাধনা। আলিরেজা প্রণীত জ্ঞানসাগর গ্রন্থে এই উল্টা সাধনার কথা আছে।

"পিরিতি উলটা রীত না বুঝে চতুরে।
যে না চিনে উলটা সে না জিয়ে সংসারে॥

সমুখ বিমুখ হে বিমুখ সমুখ।
পাল্‌টা নিয়মে সব জগৎ সংযোগ ॥"

মরমের কথা গানের মাধ্যমে উজাড় করিয়া দেখান বাউল-ধর্মের প্রধান অংগ। সুফীসম্প্রদায়ে প্রচলিত 'সমা' [গান ও নৃত্য] এই বাউলগণকে অনেক পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। প্রেম ও ধ্যানরসে অনুপ্রাণিত সুফীধর্মে আছে অগোঁড়ামির একটানা সুর। ধ্যানরসিক যাঁরা তাঁদের আচার-অনুষ্ঠানের বালাই নেই, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা মননশীলতাদ্যোতক সাহিত্য ইহাঁদের ঐতিহ্যের বহির্ভূত. ধর্মসূত্র ইহাঁরা পরিহার করিয়া চলেন। তর্কবিজ্ঞান ও নব নবোন্মেষশালিনী গবেষণার সাহায্যে হৃদয়-কন্দরে নিহিত সত্যকে জানা যায় না, কিন্তু 'সহজ' পন্থায় উপলব্ধি করা যায় প্রেমের যোগসূত্রে। জাগতিক রহস্যের দ্বার প্রেমেই উদ্‌ঘাটিত হয়। বাউল গানে মনের মানুষের কথা প্রায়শঃ শোনা যায়। যাহার বাস দেহাভ্যন্তরে ও আসন হৃদয়কন্দরে। এই মনের মানুষই হইল প্রেমঘনবিগ্রহ এবং কবি হইলেন তাঁহার উপাসক ও তাঁহার প্রেমে প্রেমিক। বাউলগীতিতে ঝংকৃত হইতেছে সেই সহজ বিরহবেদনাপ্লুত মিলনাকাঙ্ক্ষার সুর।

বৈষ্ণবের পরিচিত প্রেমধর্ম হইতে এই বাউল গানে রস নিংড়ে লওয়া হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে যে যুগলতত্ত্বের নির্দেশ আছে, জীব ও ভগবানের দ্বৈত সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা দার্শনিকতার কৌঠায় পৌঁছে মিলে গেছে অচিন্ত্যভেদাভেদে। জীব ও ভগবানের মধ্যে যোগসূত্র যে প্রেম—কৃষ্ণের রস ও রাধার হ্লাদিনী রহিয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মানুসারে বাউলগণ এই প্রেমকে মাঝে রাখিলেও ভগবানের স্বরূপকে—সহজকে—নিজের মধ্যে ব্যক্তিগত করিয়া লইয়াছে, মনের মানুষে পরিণত করিয়াছে প্রেমসাধনার ভিতর দিয়া। বাউলের প্রেম হইল আত্মপ্রীতি, অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে প্রেম সেটা উর্দ্ধে উঠিয়া [sublimation] মানুষের 'স্বরূপে' পৌঁছাইয়া দেয়। রাধা ও কৃষ্ণ বাহিরের কোন সত্তা নয় অথচ নরনারীর সর্বস্ব। প্রাকৃতকেই সাধনা [প্রেম] দ্বারা অপ্রাকৃতে রূপান্তরিত করিতে হয়—ইহাই সহজিয়াদের প্রধান উপজীব্য। তখন—

'শ্রীরূপ স্বরূপ হয় স্বরূপ শ্রীরূপ' ('রত্নসার')। রূপের ভিতরে স্বরূপের—প্রতিষ্ঠা—আত্মসাক্ষাৎকার—self-realisation, চণ্ডিদাসের একটি পদ আছে—

'স্বরূপে আরোপ এই রসকূপ
সকল সাধনা পার।
স্বরূপ বুঝিয়া সাধন করিলে
সাধক হইতে পারে ॥

নরনারীর ভিতরে যে কান্তাকান্তভাবজনিত ভোগবতী প্রেমের ধারা বহিতেছে তাহার কামজ প্রাকৃতগুণ সাধনার সাহায্যে বিদূরিত হইলে তবে তাহা নির্মল কামগন্ধহীন হইয়া অপ্রাকৃত ব্রজপ্রেমে পরিণত হয়। রূপের মধ্যে স্বরূপের উপলব্ধি সহজ নহে। সহজোপলব্ধির দ্বারা সহজ হইলে বাউলদের Bohemian life সকলেই বরণ করিত, পৃথিবীতে ধর্মান্তর কিছু থাকিত না ॥

পুণ্যতীর্থে

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য

(বার্ণার্ড শ'র সাধনা ক্ষেত্র)

বহু মনীষীর জন্মভূমি এই পাশ্চাত্য খণ্ড। বহু মনীষার ধারক এদেশের মাটি পরিপোষক এদেশের পরিবেশ। একালের বিখ্যাত মনীষী বার্ণার্ড শ'র জন্মভূমি দেখবার আশা নিয়ে যাত্রা করলাম দ্বিচক্রযানে। লণ্ডন থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল।—এক নির্জন পল্লী—নাম এ্যাতট্ সেণ্টলরেন্স। ত্রস্ত জনতার মধ্যে দিয়ে লণ্ডনের বিশাল সীমা ছাড়াতে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। সহরের বাইরে এসে প্রথম পল্লীতে প্রবেশ করলাম—Porter's Bar—লণ্ডনের সংগে এর যেন তুলনা হয় না—ছোট ছোট বাড়ী—দুই একটি দোকান ও সরাইখানা। কোথাও গ্যাসের আলো—কোথাও বিজলী বাতি। পথও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। ছোট গ্রাম পেরিয়ে আবার পিচ ঢালা পথ। পথের দুধারে কোথাও লন, কোথাও বা শস্যক্ষেত্র। গমের ক্ষেতগুলো দেখে মনে পড়ে যায় আমাদের দেশের ধানক্ষেতের কথা।

গ্রামের পর গ্রাম, এমনি চারখানি গ্রাম পেরিয়ে পৌঁছান গেল একটি পথের সংগম স্থলে। সেখান থেকে এক একদিকে চলে গেছে এক একটি পথ। রৌদ্রে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছি। এখানে আবার সরাইখানা-গুলোতে জল পাওয়া ভাগ্যের কথা। যাই হোক, একটি সরাইখানায় কিছু cake নিয়ে সংকোচ কাটিয়ে একগ্লাস জলের কথা বলতে শুধু একটু বিস্ময়ের হাসি হাসলেন। পরে একটু বিরক্ত হয়েই বোধহয় একগ্লাস জল দিলেন। কিন্তু এ তৃষ্ণা কি এক গ্লাস জলে মেটে? কিন্তু আর জল চাইতে সাহস হ'ল না। বুকে তৃষ্ণা নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। এখনও প্রায় পাঁচ ছ' মাইল রাস্তা। একেবারে গ্রামের মাঝে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়—সদর রাস্তা থেকে গ্রামখানি বেশ নিচুতে। কাজেই গ্রামের ছবিখানি বেশ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এত এঁকে বেঁকে সরু রাস্তা চলে গিয়েছে যে, খুব সাবধানে সাইকেল চালাতে হয়। যেতে যেতে একটি প্রাচীন গীর্জা চোখে পড়লো। পাশে খানিকটা খোলা মাঠ—গ্রামের

ছেলেমেয়েরা খেলা করে। এবার প্রবেশ করলাম একেবারে গাঁয়ের নিভৃত পথে। পথের দুপাশে বন ও লতা নুয়ে পড়েছে—যেতে গেলে গতি ব্যাহত হয় মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে বকুলের গন্ধ ও ছোট ছোট পাখার কিচ্ কিচ্ শব্দ। কোথাও পাশের চাষীদের কাটা শস্যের স্তূপ—দূর থেকে কুটীর বলে মনে হয়। মনে হ'ল পথ বুঝি আর শেষ হয় না—দূরে সেই শান্তিনিকেতন। পল্লীর শুদ্ধতা ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছিলো—মনে পড়ছিলো সাহিত্য সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন এই মনীষী। মাঝে মাঝে আমারি মত টুরিষ্টদের সংগে পথে দেখা হয়—চোখেমুখে এক মোহাবেশ। মন যতই চঞ্চল হয়ে উঠছে—পথও যেন ততোই দূরে—আরও দূরে এগিয়ে চলেছে এঁকে বেঁকে।

শেষে সেণ্ট-লরেন্স গ্রামে পা দিলাম। মন আচ্ছন্ন হয়ে এলো এই শান্ত

দর্শকদের ভিড় বেশি হলে এই ছোট্ট ঘরে তিনি আত্মগোপন করে লিখতেন

পরিবেশে। গতিবাদের রাজত্বে এ যেন এক স্বপ্নপুরী। কোথাও কোনও ব্যস্ততা নেই—পথে আলো নেই—কোন বিলাসের চিহ্ন নেই। একটি বিশাল বৃক্ষের তলায় এসে দাঁড়ালাম—যেখান থেকে বার্ণার্ড শ'র বাসস্থান কয়েক গজ দূরে। বাড়ীর সামনে কোন সমারোহ নেই—ছোট্ট দোতলা বাড়ী—আভিজাত্যের কোন চিহ্ন নেই বাইরে থেকে। উদ্যানের লতাগুলো বাড়ীর দেওয়ালকে আশ্রয় করে আছে। দূর থেকে শ্যামল পর্ণকুটীরের মত মনে হয় এই নিকেতন।

দুই শিলিং দক্ষিণা দিয়ে যখন প্রবেশাধিকার পেলাম, তখন মনে হ'ল যে, এই সাধনার ক্ষেত্রে সত্যিকার প্রবেশাধিকার পাওয়ার পাথেয় কই! এক তলায় চারখানি ঘর—একখানিতে বার্ণার্ড শ'র সাধনার কেন্দ্র বিরাট একটী পাঠাগার—চারদিকে নানা বিষয়ের গ্রন্থ। তার মধ্যে স্থান পেয়েছে জহরলাল রচিত গান্ধীর জীবন-ইতিহাস। বহু মূল্যবান ফটো ও পেণ্টিং এ কক্ষটির দেওয়ালগুলি শোভিত। সামনে একটি ছোট টেবিল—তার উপরে একটী টাইপ-রাইটার। বার্ণার্ড শ'র অধিকাংশ সময় না কি ঐ চেয়ার টেবিলেই কাট্‌তো। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য মনীষীবৃন্দের ফটো আর একটী ঘরে শোভা পাচ্ছে। তার মধ্যে গান্ধীজির প্রতিকৃতি সত্যই লক্ষণীয়। একটি এ্যাল্‌বামে 'শ' এর স্মৃতিজড়িত নানা মূল্যবান ফটো আছে। আর একটি কক্ষে প্রবেশ করলে একজন মহিলা তাঁর সম্পর্কে নানা কথা মুগ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন। এই কক্ষে নাকি তাঁর স্ত্রী বাস করতেন। তাঁর ব্যবহৃত জিনিষগুলো সবই এখনও সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কয়েকটি সুন্দর পাথরের মূর্তি রয়েছে। এমন কি ছোট ছোট কয়েকটি উপহার—তাঁর স্মৃতি বহন করছে। সমগ্র কক্ষ

বার্ণার্ড শ'-এর বাড়ির এক পাশে লতাগুল্ম নিবিড় হ'য়ে পরিবেশকে স্নিগ্ধ করে তুলেছে

জুড়ে যেন তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ। সত্যিই এক তীক্ষ্ণধী শক্তি নিয়ে এই মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সাধারণের উর্ধ্বে ছিলেন তিনি, তাই সাধারণ তাঁর নাগাল পায় নি। দূরদর্শিতা তাঁর নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত। তাই তিনি ছিলেন ভাবীকালের অগ্রদূত। কালের গণ্ডী দিয়ে যাঁরা তাঁর বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর রচনার মর্যাদা দিতে পারেন নি। কিন্তু আজ ক্রমশই সেই প্রতিভার আলো দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ হিসেবে তাঁকে বুঝতে গেলেও মনে হয়—তিনি যত বেশী সাধারণ ছিলেন, অসাধারণ ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রবল ব্যক্তিত্ব ও তীক্ষ্ণধীশক্তি ছিল তাঁর। পরবর্তী জীবনে যখন তাঁর নাটকের বিশেষ সমাদর হয়েছে—তখনও তাঁর সাধনার অন্ত নেই। তাঁর বই প্রকাশ

করার জন্যে, তাঁকে দেখার জন্যে ভিড় যেন ক্রমশই বাড়তে লাগলো। শেষে মানুষের ভিড় এড়ানোর জন্যে তিনি নির্জন পল্লীপ্রান্তে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাকেও এড়ানোর উপায় খুঁজতে লাগলেন। এই দীপ্ত প্রতিভার পরশ পাওয়ার জন্য এই বনভূমিতেও জনসমাগম ঘটতে লাগলো। এ যেন জন্ম-চাপা হীরকখণ্ড। শেষে তিনি নিজের ঘর ছেড়ে তাঁর বাড়ীর পিছনে একটি ছোট কুটীরে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। সেই ছোট্ট কুটীরে সব সরঞ্জামই আছে—একটি ছোট শয্যা পর্যন্ত।

বার্ণার্ড শ'র বাড়ির পুরা দৃশ্য

উদ্যানটিকে ঘিরে আছে নানা তরুশ্রেণী ও তারই মধ্যে দিয়ে যেন একটি ছায়াপথ চলে গিয়েছে পল্লী প্রান্তরে।

রাত্রিদিন যখন সাধনামগ্ন থাকতেন তখন মাঝে মাঝে পল্লী-পরিক্রমা করতেন। গ্রামের লোক সকলেই তাঁকে নতি জানাতো দূর থেকে—ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে সাহস করত না। তিনি যেন তাদের কাছে দেবতা। একদিন এক চাষীকে ক্ষেত্রে কাজ করতে দেখে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন—তার সৃষ্টিকার্য্য মনে মনে ভাবছিলেন তাঁর সাথে এই চাষীর যেন কোথাও মিল আছে। চাষী তাঁর এই তন্ময়তা দেখে তাঁকে বললো—"আমি কতবার তোমাকে দেখেছি, কিন্তু কোনদিন তুমি আমাকে তোমার একটি কিছু দিলে না। আমি যে তোমার স্মৃতি রাখতে চাই।" এই সরল সাধারণ কথাগুলো যেন এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে স্পর্শ করলো। তিনি বাড়ী ফিরে তাঁর একখানি ফটো নিয়ে তার পেছনে লিখে পাঠালেন সেই চাষীর কাছে—"From man of Pen to the man of Plough." এমনি আরও কত ছোট ছোট ঘটনা জড়িত আছে তাঁর জীবনের সংগে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল সাধারণতঃ অনমনীয়। তাই তাঁর নাটককে মঞ্চস্থ করতে গেলে তাঁর রচনার একটি শব্দও অদল বদল করা সম্ভব হ'ত না। কিন্তু হঠাৎ যদি তিনি কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা সপ্রতিভ রুচির পরিচয় পেতেন তাহলে তাঁর দরদ জাগতো।

তাঁর জীবনের ইতিহাস এই পরিচয়ই দেয় যে তিনি এই জগতের ক্লিন্নতা ক্ষুদ্রতাকে লঙ্ঘন করে এক নূতন সৌধ রচনা করতে চেয়েছিলেন। রূঢ় বাস্তব-এর সংগে সংঘাত তাই পদে পদে—তাঁর নগ্ন রূপকে প্রকাশ করবার জন্যে তাই তাঁর লেখনী হয়েছে তীব্র। অথচ প্রকৃত প্রতিভাকে স্বীকার করে নেওয়ার সদগুণ তাঁর মধ্যে ছিল। হৃদয়ের যোগাযোগকেই তিনি মূল্য দিতেন। তাই গান্ধীজির প্রতিকৃতি ও জীবনীকে তিনি হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন। তাই এই মহামনীষীর কাছে থেকেও অনেকে তাঁর হৃদয়ের কোনও নাগালই পেতে পারেন নি। আবার দু'একটি প্রতিভা দূরে থেকেও যেন কত নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়েছেন। প্রতিভার মধ্যে এই পারস্পরিক আকর্ষণ—এতো অস্বাভাবিক নয়।

অসামান্য এই প্রতিভার—যেখানে স্ফুরণ হয়েছিল—সেও এক পরম-তীর্থ। তাই বাণীপূজারী যারা, তারা এই মনীষীর উদ্দেশ্যে এখানে এসে অর্ঘ্য দিয়ে যায়। অথচ এই মনীষী কোনদিনই কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। বোধ হয় এই বাঁধাধাতের শিক্ষা তাঁর মত অসাধারণ প্রতিভাবানদের পরিপোষক নয়।

এই তীর্থে নতি জানিয়ে যখন ফিরতে চাইলাম তখন দেখি সূর্য পাটে নেমেছে। পল্লীর মায়া জড়ানো গাছপালার ফাঁক দিয়ে রক্তরবির রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে সেই স্বপ্নপুরীর মত পরমতীর্থে। মন প্রাণ ভরে উঠেছে এই ক্ষণিকের পুলকে। তাই ফেরার পথে সময় কখন কেটে গেছে—রাত্রি প্রায় নটায় ফিরলাম আবার সেই স্পন্দনমুখর নগরীর বুকে। কিন্তু সেই স্মৃতি মনে রইল আঁকা চিরদিনের মত।

অতুল দত্ত

গত বৎসর জুলাই মাসে জেনেভায় রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনের পর আন্তর্জাতিক অবস্থার যে সুস্পষ্ট উন্নতি দেখা দিয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে তাহার পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই চীনের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধের মীমাংসার জন্য দুই দেশের দুই জন রাষ্ট্রদূত জেনেভায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বৈঠকে অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে; আলোচনার ব্যর্থতা ঘোষণায় বোধ হয় আর বিলম্ব নাই। রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনের পর সোভিয়েট রুশিয়া প্রাচ্য রাষ্ট্রগুলিকে অর্থ-নৈতিক সাহায্যদানে উদ্যোগী হইয়া পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিবার কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। সমরায়োজনের এবং প্রধানতঃ সামরিক উদ্দেশ্যে বৈদেশিক রাষ্ট্রকে সাহায্যদানের পূর্ব্বানুসৃত নীতিতে সে এখনও অটল রহিয়াছে। সম্প্রতি মিঃ ডালেস্ এক বিবৃতিতে সামরিক শক্তির দম্ভ প্রকাশ করিয়া আন্তর্জাতিক আসর গরম করিয়াছেন। সোভিয়েট রুশিয়া পূর্ব্ব জার্ম্মানীর সেনাবাহিনীকে কম্যুনিষ্ট সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অতলান্তিক সামরিক সংস্থার (ন্যাটোর) পাল্টা প্রতিষ্ঠান গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছে। মার্শাল বুলগ্যানিন্ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নিকট ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়া মার্কিণ-সোভিয়েট মৈত্রী-চুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিলেন; সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

চীন-মার্কিণ বিরোধ

চীন-মার্কিণ বিরোধের মীমাংসার জন্য গত বৎসর অগাষ্ট মাসে চীনের পক্ষ হইতে মিঃ ওয়াং পিং নান্ এবং আমেরিকার পক্ষ হইতে মিঃ জনসন্ (দুই জনই রাষ্ট্রদূত) জেনেভায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চীনে আটক মার্কিণ নাগরিক এবং আমেরিকায় আটক চৈনিক নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা এই আলোচনার আশু উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া, দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধেও তাহাদের আলোচনা করিবার কথা। এই আলোচনা সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইলে চীন ও আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব—চৌ-এন্-লাই ও ডালেস্ এক বৈঠকে মিলিত হইবেন, এইরূপ আশ্বাস তখন দেওয়া হইয়াছিল। জেনেভায় রাষ্ট্রদূতদের আলোচনার প্রথম দিকে দুই দেশের কিছুসংখ্যক নাগরিককে তাহাদের স্বদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহার পর হইতে এই বৈঠকে দুই পক্ষের প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাবের নিস্ফল লড়াই চলিতেছে। বর্ত্তমানে এই বৈঠকে সম্পূর্ণ অচল অবস্থা। আমেরিকার পক্ষ হইতে চীনের নিকট এই আশ্বাস চাওয়া হইয়াছিল যে, ফরমোসার বিরুদ্ধে সে কখনও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিবে না; এই প্রস্তাবিত আশ্বাসের বিনিময়ে চীন ফরমোসা হইতে মার্কিণ সৈন্যের অপসারণ দাবী করে। চিয়াং-চক্রের সহিত সামরিক চুক্তির অজুহাত দেখাইয়া আমেরিকা এই সর্ত্ত মানিয়া লইতে রাজী হয় নাই। সম্প্রতি পিকিং বেতারবার্ত্তায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জেনেভায় আলোচনা টানিয়া চালাইয়া আর লাভ নাই; ফরমোসা প্রণালীর অশান্ত অবস্থা দূর করিবার জন্য চীনের ও আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিবদের আলোচনার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমেরিকা এই প্রস্তাব গ্রহণে রাজী নয়।

ফরমোসাকে কেন্দ্র করিয়া চীন সম্পর্কে আমেরিকার যে নীতি, উহা নিছক গায়ের জোরের নীতি। উহার সহিত কোনও আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন গভর্ণমেণ্টের মীমাংসা সম্ভব নয়। চীনের মাটিতে মার্কিণ কামান বন্দুক, ট্যাঙ্ক-বিমান গিজ গিজ করিবে, মার্কিণ সৈন্য চীনের মাটিতে দাঁড়াইয়া চীনের তলপেটে সঙ্গীণ ছোঁয়াইয়া রাখিবে; কিন্তু চীন টুঁ শব্দটি করিতে পারিবে না—ইহাই আমেরিকার দাবী। আমেরিকার চতুঃসীমার মধ্যে এই দাবীর কিছু সমর্থক জুটিতে পারে; কিন্তু বহির্জ্জগতের নিরপেক্ষ জনমত ইহাকে নূতন ধরণের সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্য বলিয়াই মনে করে। এই প্রসঙ্গে লণ্ডনের "নিউ ষ্টেটসম্যান্ এণ্ড নেশানের" এই মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—"কালিফোর্নিয়ার নিরাপত্তার জন্য ফরমোসা প্রয়োজন, এই তত্ত্ব আমেরিকার বাহিরে কেহ মানিয়া লইবে না; বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও বিদ্রোহীদের আক্রমণাশঙ্কা নিবারণের জন্য চীনের যে সঙ্গত পণ, তাহা বিশ্বযুদ্ধ বাধাইবার কারণ হইতে পারে, ইহাও কেহ বিশ্বাস করিবে না।"

অপরিবর্ত্তিত মার্কিণ নীতি

মধ্যপ্রাচ্যে ও এশিয়ায় বিভিন্ন অনুন্নত রাষ্ট্রকে সোভিয়েট রুশিয়া সম্প্রতি অর্থ-নৈতিক সাহায্য দিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার এই আগ্রহ তাহার বৈদেশিক নীতির নূতনত্ব। পাশ্চাত্য রাজনীতিকরা ইহাকে সোভিয়েট রুশিয়ার অভিসন্ধিমূলক নূতন চাল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যদি ইহা নিছক চাল হয়, তাহা হইলেও আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট। অনুন্নত রাষ্ট্রগুলি যদি রাজনৈতিক ও সামরিক সর্ত্ত ব্যতিরেকে বৈদেশিক সাহায্য পায়, তাহা হইলে বিশ্ব-রাজনীতিক্ষেত্রে নিরপেক্ষ শক্তি প্রবল হইতে পারে—তথাকথিত "শান্তির এলেকা" (নেহরুর ভাষায়) আরও প্রসারিত হয়। পাশ্চাত্য জগতের অনেকে সোভিয়েট রুশিয়ার এই নূতন "চ্যালেঞ্জের" সম্মুখীন হইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছেন; তাহাদের আশঙ্কা—এই নূতন কম্যুনিষ্ট

নীতির প্রভাবে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি ক্রমে পাশ্চাত্যের প্রতি বিমুখ হইতে পারে। কিন্তু আমেরিকা সোভিয়েট রুশিয়ার কূটনৈতিক চালের প্রত্যুত্তরে "শান্তির এলেকা" প্রসারিত হইতে দিতে প্রস্তুত নয়। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মার্কিণ কংগ্রেসে যে বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে সমরায়োজনের উপরই পূর্ব্বের ন্যায় গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে; দেশরক্ষা এবং "পারস্পরিক নিরাপত্তা সাহায্য" দানেই (সামরিক উদ্দেশ্যে বৈদেশিক রাষ্ট্রকে সাহায্য) মোট বরাদ্দের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। নূতন সোভিয়েট নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিণ বাজেটের সমালোচনায় একখানি উদারনৈতিক বৃটিশ পত্রিকা লিখিয়াছেন, "বৈদেশিক সাহায্যরূপে যাহা দেওয়া হইবে, তাহা প্রধানতঃ সামরিক সাহায্য।...শীতল সংগ্রামের জন্য আমেরিকা যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিল, আজ মিঃ ক্রুশ্চেভের জবাবেও তাহার সেই ব্যবস্থা।" বাজেট প্রস্তাবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্য আমেরিকার কোনও কোনও মহলে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি ডালেস-আইসেনহাওয়ারের নিজস্ব রাজনৈতিক দলেও (রিপাবলিক্যান্ দল) অসন্তুষ্টি দেখা দিয়াছে। বাজেট প্রস্তাব সম্পর্কে মতদ্বৈধের জন্য প্রেসিডেন্টের অন্যতম সহকারী মিঃ নেল্‌সন্ রকফেলার পদত্যাগ করিয়াছেন। সোভিয়েট রুশিয়ার নূতন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানের সম্মুখীন হইতে আইসেনহাওয়ার গভর্ণমেন্টের অনিচ্ছাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ।

মিঃ ডালেসের দম্ভ

মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ডালেস সম্প্রতি আমেরিকার 'লাইফ' পত্রিকায় তাঁহার এক বিবৃতিতে দাবী করিয়াছেন যে, মার্কিণ সরকারের কঠোর নীতির জন্যই সুদূর প্রাচ্যে তিনটি ক্ষেত্রে চীন সংযত ছিল। তিনি বলেন, "কোরীয় যুদ্ধের ব্যাপৃতি সম্পর্কে, ফরমোসার ব্যাপারে এবং ইন্দোচীন সম্পর্কে আমরা যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। আমরা যুদ্ধের সীমান্তে পৌঁছাই এবং কঠোর নীতি অবলম্বন করি।" এই বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ১৯৫৪ সালে দিয়েন্-বিয়েন্-ফুতে ফরাসী বাহিনী যখন বিপন্ন হয়, তখন মিঃ ডালেস্ এই যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ হস্তক্ষেপের এবং চীনে বোমা বর্ষণের প্রস্তাব করেন; কিন্তু বৃটেন এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব এই বলিয়া তাঁহার "গায়ের জোরের নীতি" সম্পর্কে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,—"যুদ্ধে জড়াইয়া না পড়িয়া যুদ্ধের সীমানা পর্য্যন্ত আগাইয়া যাওয়ার সামর্থ্য একটি প্রয়োজনীয় শিল্প; এই শিল্প আয়ত্ত করিতে না পারিলে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী।" মিঃ ডালেসের বিবৃতি তাঁহার স্বদেশে ও বিদেশে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে: বৃটেনের বিভিন্ন পত্রিকা তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিয়াছে; মার্কিণ পত্রিকাগুলিও তাঁহাকে "বেপরোয়া জুয়াড়ী", "রাজনৈতিক কাপুরুষ" "কূটনৈতিক পরাজয়কে বিজয় বলিয়া জাহির করিতে প্রয়াসী" প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছে। বিশিষ্ট মার্কিণ নাগরিকরা এই বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নিকট পত্র লিখিয়াছেন।

এই বৎসর আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবে। মিঃ ডালেস্ যদি তাঁহার এই "প্রলয়-সীমান্ত" সম্পর্কিত বিবৃতির দ্বারা মার্কিণ জনমতকে প্রভাবিত করিতে চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। চীন ও সোভিয়েট রুশিয়ার মনে ত্রাস সঞ্চারের প্রয়াসও অর্থহীন; কারণ তাঁহার নীতি ও গোপন প্রচেষ্টার কথা তাহাদের অজানা নাই; বস্তুতঃ, প্রাচ্যে মার্কিণ নীতি সম্পর্কে মিঃ ডালেসের এই দম্ভ মিথ্যা। ইন্দোচীনে দিয়েন্-বিয়েন-ফুতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিপর্য্যয়ের সময় মিঃ ডালেস্, "বিপুলাকার প্রতিশোধের" (মাসিভ্ রিটালিয়েশন) হুমকী দিয়াছিলেন। সে হুমকীতে ভীত হইয়া উত্তর ভিয়েৎনাম নতি স্বীকার করে নাই। পাশ্চাত্য শিবিরেই এই সম্পর্কে মতদ্বৈধ সৃষ্টি হয়, মিঃ ডালেসের জঙ্গী নীতির কোনও সমর্থক জোটে নাই। তাঁহার আপত্তি উপেক্ষা করিয়াই উত্তর ভিয়েৎনামের গ্রহণযোগ্য সর্ত্তে যুদ্ধ-বিরোধী চুক্তি (জেনেভা চুক্তি) সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহা "প্রলয়-সীমান্ত-নীতির" বিজয় নহে,—ইহা ঐ নীতির অবমাননাকর পরাজয়।

কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে চীন বলিয়াছিল যে, মার্কিণ সেনাবাহিনী ৩৮শ অক্ষরেক্ষা অতিক্রম করিলে সে নিষ্ক্রিয় থাকিবে না। ভারতের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া মার্কিণ সেনাবাহিনী ৩৮শ অক্ষরেক্ষা অতিক্রম করিয়াছিল এবং চীনও নিষ্ক্রিয় থাকে নাই। তবুও চীনে বোমাবর্ষণ করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবার সাহস ডালেস্-পন্থীদের হয় নাই; কারণ মার্কিণ সেনাবাহিনীর ৩৮শ অক্ষরেখা অতিক্রম করা যে অন্যায় হইয়াছিল, ইহা শান্তিকামী মার্কিণ জনসাধারণও মনে করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ৩৮শ অক্ষরেখাকেই সীমানা ধরিয়া যুদ্ধ-বিরোধী ঘটাইতে ডালেস্‌পন্থীরা বাধ্য হইয়াছেন। অর্থাৎ, আড়াই বৎসর ধরিয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে শ্মশান করিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে মার্কিণ রক্ত ও অর্থ ঢালিয়া কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

গত বৎসর ফরমোসাকে কেন্দ্র করিয়া সুদূর প্রাচ্যে যখন সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার উপক্রম হয়, তখন মিঃ ডালেস্ এটম্ বোমার হুমকী দিয়াছিলেন। কিন্তু চীন সে হুমকীর জন্য সংযত হয় নাই,—সংযত হইয়াছিল তাহার শান্তিকামী মিত্রদের অনুরোধে। চীন জানে যে, ফরমোসা সম্পর্কে বিশ্বের জনমত তাহার পক্ষে। সে ইহাও জানে যে, ফরমোসাকে রক্ষার জন্য চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার তথা বিশ্ব-যুদ্ধ বাধাইবার যে মার্কিণী হুমকী, তাহার পক্ষে পাশ্চাত্য শিবিরেও কোনও সমর্থক নাই। ফরমোসার ব্যাপারে নিঃসঙ্গ আমেরিকার অন্যায় জিদ্ যে শেষ পর্য্যন্ত টিকিবে না, শান্তিকামী জনমতের চাপে চিয়াং-চক্র ফরমোসা হইতে অপসরণে বাধ্য হইবে,—মিত্রশক্তিগুলির এই সঙ্গত যুক্তি শুনিয়া চীন প্রতীক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, আজও ফরমোসা সম্পর্কে চীন তাহার নীতিতে অটল রহিয়াছে।

প্রত্যাখ্যাত সোভিয়েট প্রস্তাব

জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগ্যানিন্ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নিকট এক ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়া দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব

করিয়াছিলেন। এই পত্র যখন ওয়াশিংটনে পৌঁছায়, তখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সার এন্টনী ইডেন্ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য আমেরিকা অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। পাশ্চাত্য শিবিরের বহু বিশিষ্ট রাজনীতিক মনে করেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে মৈত্রী চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া মার্শাল বুলগ্যানিন্ ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির সহিত তাহাদের মিত্রদের বিভেদ ঘটাইতে চাহিয়াছেন; বস্তুতঃ উদ্দেশ্যমূলক প্রচারই এই প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্দেশ্য। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এই যুক্তিতে সোভিয়েট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন যে, বাস্তবক্ষেত্রে নীতির পরিবর্ত্তন যদি না হয়, তাহা হইলে এইরূপ চুক্তি সম্পাদন করিয়া লাভ নাই; আর, যে ভিত্তিতে এই চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেই ভিত্তিতে রচিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বাক্ষর করিয়াছে; সুতরাং নূতন করিয়া মৈত্রীর কথা বলা অপ্রয়োজন।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারে যুক্তি তাঁহার স্বদলে সমর্থন লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, চুক্তিপত্র চোতা কাগজে পরিণত হইতে দেরী হয় না; সাম্প্রতিক ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সনদ সম্পর্কেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। জাতিতে জাতিতে মৈত্রী ও বিশ্ব-শান্তি স্থাপনের সুউচ্চ আদর্শে রচিত এই বাইবেল স্পর্শ করিয়া যাঁহারা শপথ করিয়াছেন, তাহারাই পৃথিবীকে আর একবার মানবরক্তে প্লাবিত করিবার ব্যাপক আয়োজনে মাতিয়াছেন। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সনদ যদি চোতা কাগজে পরিণত হইতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে সোভিয়েট-মার্কিণ মৈত্রী-চুক্তি চোতা কাগজে পরিণত হইবার সম্ভাবনা মানিয়া লইয়া এই চুক্তি করিলে কী এমন নৈতিক ক্ষতি হইত? চুক্তির দ্বারা যুদ্ধ নিবারিত হয় না সত্য; কিন্তু যুদ্ধ নিবারণের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টিতে ইহা সাহায্য করিতে পারে। বর্ত্তমানে যে পুঁজিবাদী শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে বিরোধের ফলে সমগ্র মানব-সমাজ ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে, আমেরিকা ও সোভিয়েট রুশিয়া সেই দুই শিবিরের নেতা। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান বিরোধকে তাহাদেরই রাষ্ট্রগত বিরোধ বলিয়া অনেকে মনে করে। ইহাদের মধ্যে যদি মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদিত হয়;—ইহারা যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করিবার এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা বিভিন্ন সমস্যা মীমাংসা করিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে, তাহা হইলে বাস্তবক্ষেত্রে সমরোত্তেজনা অনেকখানি হ্রাস পাইবে, জনসাধারণ অনেকটা স্বস্তি বোধ করিবে। অবশ্য, যাহারা এই সমরোত্তেজনার,—তথাকথিত "শীতল সংগ্রামের" রাজনৈতিক মুনাফা লুটিতেছে, (যেমন সিগ্ম্যান্ রী, চিয়াং কাই-শেক, নো দীয়েন্ এম্ প্রভৃতি) তাহাদের পক্ষে ইহা নৈরাশ্যের কথা। তাহাদের এই নৈরাশ্যকে যদি পাশ্চাত্য শিবিরের বিভেদ মনে করা হয়, তাহা হইলে এই শিবিরের কূটনীতির দেউলিয়া ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। তাহার পর, মার্শাল বুলগ্যানিনের এই প্রস্তাব যদি সোভিয়েট রুশিয়ার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার মাত্র হয়, তাহা হইলেও এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনায় সম্মত হইয়া কম্যুনিষ্ট প্রচার-কৌশলের মুখোস উন্মোচন করাটাই কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক হইত। সরাসরি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় প্রচারের দিক হইতে সোভিয়েট রুশিয়ার জয়ই হইয়াছে।

জর্ডানে বিক্ষোভ

কিছুকাল পূর্ব্বে রাষ্ট্র-সঙ্ঘে সাইপ্রাসের প্রসঙ্গ আলোচনার সময় বৃটিশ প্রতিনিধি মন্তব্য করেন যে, আরব জগৎকে রক্ষার জন্য সাইপ্রাস্ বৃটেনের প্রয়োজন। সীরিয়ার প্রতিনিধি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রশ্ন করেন—কাহার বিরুদ্ধে এই রক্ষার ব্যবস্থা?—বিগত দুই শত বৎসর ধরিয়া বৃটেনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করাই তো আরব রাজ্যগুলির সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। জাতীয় চেতনাসম্পন্ন আরবদের এই মনোভাব সম্প্রতি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল জর্ডানে।

মধ্য প্রাচ্যে তুরস্ক অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) সভ্য। ইহাকে রাজনৈতিক এজেণ্টরূপে ব্যবহার করিয়া মধ্য প্রাচ্যের এক একটি রাষ্ট্রকে পাশ্চাত্যের সমরায়োজনের সহিত যুক্ত করিবার নীতি কিছুকাল পূর্ব্বে স্থির হইয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বাগ্দাদে তুর্কি-ইরাক্ চুক্তিতে এই নীতির প্রথম বাস্তব প্রকাশ। ইরাক্ আরব-লীগের সভ্য; লীগের একটি সভ্যরাষ্ট্র স্বতন্ত্রভাবে এই চুক্তি করায় তখন আরব জগতে প্রবল বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার পর, গত এক বৎসরে বৃটেন্, পাকিস্থান ও ইরাণ বাগ্দাদ চুক্তিতে যোগ দিয়াছে। কিন্তু অন্য কোনও আরব রাষ্ট্রকে এই চুক্তিতে ভিড়ানো সম্ভব হয় নাই। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জর্ডান্ বৃটেনের প্রায় আশ্রিত রাজ্য। আরব লীগ হইতে ইরাককে বিচ্ছিন্ন করিবার পর মনোযোগ পড়ে এই রাজ্যটির উপর। ইহাকে বাগ্দাদ চুক্তিতে টানিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে গত ডিসেম্বর মাসে বৃটেন হইতে স্যার জেরাল্ড টেম্পলার জর্ডানের রাজধানী আম্মানে যান। তিনি জর্ডান্ মন্ত্রিসভাকে চাপ দেওয়া মাত্র চার জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন, এবং উত্তর ও পশ্চিম জর্ডানে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। অবস্থা তখন এরূপ গুরুতর হইয়া ওঠে যে, পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ দেওয়া হয়। জানুয়ারী মাসে আম্মান, জেরুজালেম্ প্রভৃতি স্থানে প্রবল বৃটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ চলিয়াছিল। অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। জর্ডান সম্পর্কে আলোচনার জন্য সম্প্রতি লণ্ডনে মধ্যপ্রাচ্যস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূতদের এক সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। এই সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, জর্ডানকে আপাততঃ বাগ্দাদ্ চুক্তিতে যোগ দিবার জন্য আর চাপ দেওয়া হইবে না।

ফরাসী নির্ব্বাচন

জানুয়ারী মাসের প্রথমে ফ্রান্সে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকার সমস্যা লইয়া ফরাসী রাজনীতিতে যে গোলযোগ চলিতেছিল, তাহার জন্য গত নভেম্বর মাসে ফরাসী আইন-সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়; তৎকালীন ফরে গভর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে, নূতন আইন সভায় তাঁহাদের দল (র‍্যাডিক্যাল) অধিকতর সুদৃঢ় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইবেন। কিন্তু নূতন নির্ব্বাচনে ফরাসী রাজনীতির চিরন্তন ধারাই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; নূতন আইন সভার কোনও দলের পক্ষেই শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নির্ব্বাচনের প্রথমেই রেডিক্যাল পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। দলের এই দুই অংশের মাত্র ৬৮টি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, এক মাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টি (১৫১টি আসন) ব্যতীত অন্য কোনও দল এক শত আসনও লাভ করে নাই। কম্যুনিষ্ঠ পার্টির পর সোস্যালিষ্টদের আসন-সংখ্যা ৯৩। এই নির্ব্বাচনের নূতন বৈশিষ্ট্য—পুজাদো নামক এক ব্যক্তির (ইনি নিজে প্রার্থী হন নাই) নেতৃত্বে একটি আধা ফ্যাসিস্ত দলের উদ্ভব। এই দলের প্রতিনিধিরা ৪৯টি আসন অধিকার করিয়াছে। মঃ মোলেতের নেতৃত্বে সোস্যালিষ্ট-র‍্যাডিক্যাল-সম্মিলিত গভর্ণমেণ্ট ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি এতই শিথিল যে, উত্তর আফ্রিকার (বিশেষতঃ আল্জেরিয়ার) সমস্যা সমাধানে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় নীতি অনুসরণে তাঁহারা সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করা যায় না।

কণ্ঠহার

আশা গংগোপাধ্যায়

গত বৎসরের বিবাহ রজনী উপলক্ষে স্বামীর দেওয়া দামী মুক্তাকণ্ঠী অমিতা কিন্তু হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেনি।

ও বলে মুক্তার চেয়ে সোনা অনে—ক বেশী সুন্দর, বেশী আদরের। তাই মুক্তাহারটি একবার মাত্র পরেছে—সে নেহাতই অমলেন্দুর মনরাখার জন্য।

অভিমানভরে ও মালা দ্বিতীয়বার কণ্ঠে দোলায় নি।

এ বছরের নির্দিষ্ট দিনটিতে অমলেন্দু পত্নীর কণ্ঠবেষ্টন কোরে স্বর্ণহার পরিয়ে দিয়েছে। একাধারে চমকিত ও চমৎকৃত হয়ে গেছে অমিতা।

অভিমানের মেঘ আদরের হাওয়া লেগে কোথায় হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ। এমন যে বৈচিত্র্যময় স্মারক, সেটি সে অসাবধানতায় কোথায় হারাল? স্নানাগারে ছুটল অমিতা।

টুথব্রাশ-সাবান-ইত্যাদি রাখা র‍্যাকে, তোয়ালের ব্র্যাকেটে, দরজার ছিটকিনিতে, দেয়ালের পেরেকে—জানলার ধারে, বাথটাবের কিনারে, বেসিনের পাশে—কোথাও নেই।

একটু আগে ছেড়ে-যাওয়া কাপড়ের স্তূপে, কক্ষতলে প্রবাহমান ফেনায়িত জলধারায় তন্ন তন্ন কোরে খুঁজে বেড়াল অমিতা। না, কোথাও চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না।

ছি ছি, কি ভুলো মনই না হয়েছে ওর। কোথায় কি রাখে কিছু মনে থাকে না। এই বিস্মৃতির জন্য অমলেন্দুর কাছে, দেবর প্রীতেন্দুর কাছে কত যে তিরস্কার, বিদ্রূপ হজম কোরতে হয় ওকে। অথচ কিছুতেই মনে রাখতে পারে না সাধারণ ঘটনা, অতি সামান্য কথাগুলি। সবচেয়ে খারাপ লাগল ওর—

স্বামীর প্রেমের দান ও প্রায় বলতে গেলে অবহেলায় হারাল।

আয়নার ফলকে গলার দিকে চোখ পড়তেই চিরুণীর প্রান্ত থেকে সিঁদূরের চুর্ণ ঝরে পড়ল—হাত গেছে কেঁপে।

অমিতা বৈকালিক স্নান সেরে প্রসাধন করতে বসেছে নিজের ঘরে, সুসজ্জিত ড্রেসিং টেবিলের সামনে।

ঘসে ঘসে মুখে মেখেছে সুগন্ধি স্নো, নরম পালকের সাদা তুলিতে কোরে সুরভি-পাউডার লাগিয়েছে গালে, গ্রীবায়, গলায়। ডাগর দু'টি আয়ত চোখে সুরমা টেনে দিয়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে এনেছে মদির-বিহ্বলতা।

তারপর সবশেষে সরু চিরুণীর ডগায় সিঁদুর মাখিয়ে ঘনকৃষ্ণ কেশের মাঝে সূক্ষ্ম সীমন্তটিতে রক্তরেখা আঁকতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল। চোখে পড়ল—বিধবার কণ্ঠের মত তার শুভ্র কণ্ঠের অস্বাভাবিক নিরাভরণতা।

আশ্চর্য, পাউডারে তুলি বোলাবার সময়ে কিন্তু একেবারেই খেয়াল হয়নি। গলায় হাত দিয়েও যার লক্ষ্য পড়েনি তার টনক নড়ল কিনা ছায়ায় চোখ পড়ে। আজকে যদি ও প্রসাধন নাই করত, নাই আসত দর্পণের সামনে, সীঁথিতে সিঁদুর নাই টানত—তাহলে হয়ত—তাহলে হয়ত মনেই পড়ত না, হুঁশই হত না তার এই শাঁখ-ধবল কণ্ঠের রিক্ততা সম্বন্ধে। কোথায় গেল মটর-শুঁটির দানার মত সুবর্ণদানার তার এই কণ্ঠমালা? একেবারে নতুন ঝক্‌ঝকে?

বিবাহ-বার্ষিকে স্বামীর সোহাগের নিদর্শন?

বহুমূল্য হীরকের চেয়েও মূল্যবান্?

এই মালা নিয়েই গত রাত্রে অমলেন্দুর সংগে হয়ে গেছে সামান্য একটু মিঠে-কড়া বচসা।

বহুদিন থেকে অমিতার একটি মটরমালা পরবার সখ—কিন্তু স্বামীর পছন্দ মুক্তার মালা। সাদা মনোমুগ্ধকর গোটা গোটা মুক্তা অশ্রুবিন্দুর মত স্নিগ্ধ, সুন্দর।

আচ্ছা, অতবড় হারছড়াটা যাবেই বা কোথায়? এত আর কানের দুল বা হাতের আংটী নয় যে টুপ্ কোরে ছিট্‌কে পড়ে সবার দৃষ্টির আড়ালে যেখানে সেখানে থেকে যাবে।

রীতিমত তিন-চার ভরির পুষ্ট একছড়া ভারি মালা— এত চোখের বাইরে পড়ে থাকবার নয়।

আর—স্বামীই বা বলবে কি? কি ভাববেই বা ঠাকুরপো?

এতদিনের সাধ যদিও বা পূর্ণ হল, আশা মিটল না। ওর নিটোল কণ্ঠকে শুধু একটি রাত্রের ছোঁওয়া দিয়ে মিলিয়ে গেল সোনার স্বপ্ন। রাগে দুঃখে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হল অমিতার, চীৎকার কোরে কাঁদতে ইচ্ছে হল।

ক্রিং ক্রিং।

কক্ষান্তরে টেলিফোন বাজছে। অমিতা ছুটে গেল।

হ্যালো, কে ঠাকুরপো?

ও তাই নাকি? ইস্ বেচারা।

বেশ—সাবধানে যেও কিন্তু। আচ্ছা, আসছে রবিবার সকালে কলকাতায় পৌচাচ্ছ তাহলে।

ঠিক আছে। দাদার জন্য ভেবো না। সেদিকটা আমি সামলে দোব।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল। উত্তেজনায় সুন্দর মুখখানা অস্তরাঙা দিগ্‌বধূর মত রক্তিম হয়ে উঠেছে।

প্রীতেন্দু এম্-এস্‌সি পড়ে। হঠাৎ বন্ধুর মায়ের অসুখ শুনে বর্ধমান চলে যাচ্ছে আজই সন্ধ্যায়।

দিন সাতেক পরে ফিরবে।

ঠাকুরপোর সবচেয়ে প্রিয় সতীর্থ। মাস দুই আগে পিতৃবিয়োগ হয়েছে—আজ বুঝি মাকেও হারাতে বসেছে। বন্ধুত্বের দাবী ও স্নেহ এড়াতে পারে নি, তাই তাকেও যেতে হচ্ছে দেশের বাড়ীতে মায়ের কাছে।

মনটা একেবারেই মুষ্‌ড়ে পড়ল অমিতার।

তার নিজেরও ত কম দুঃসময় নয়। এই বিপদে ঠাকুরপো থাকলে তার পক্ষ নিয়ে অন্ততঃ অগ্রজের সংগে কিছুক্ষণ বাক্‌যুদ্ধ চালাতে পারত। না, ওর কপালই খারাপ।

চরণদা, চরণদা—।

হাঁকতে লাগল অমিতা।

বিশু ও বিশু—কোথায় সব।

চল্লিশ বছরের পুরানো ভৃত্য তারাচরণ পক্ককেশে হাত বুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

বৌমা, কি বলছ। বিশু ত বাড়ী নেই। তাকে দোকানে পাঠিয়েছি বড়বাবার তরে সিগারেট আনতে।

চরণদা—ঠাকুরপো আজ বন্ধুর বাড়ীতে বর্ধমানে যাচ্ছে। রাত্রে ওর রান্না কোরো না। সাত দিন পরে ফিরবে।

আর হ্যাঁ, শোনো। বিশু কোথায়, এঁ্যা?—অমিতার গলায় প্রশ্নর বাকী অংশটুকু যেন আটকে গেল।

এই যে বল্লাম—দোকানে গেছে। তা, কি বলবে আমাকে বল না।

ও, হ্যাঁ, চরণদা শোনো, আমার গলার মটর মালাটা খুঁজে পাচ্ছি না।

সে কি বৌমা। খুঁজে দেখ, ঠিক পাবে অখন। ঘরে দোরে আছে, খোঁজ না—যাবে কোথায়? দিনের বেলাতে ত আর চোর ঢোকেনি বাড়ীর ভিতরে। তুমি কোন ঠাঁই থুয়েছ—স্মরণ কোরে দেখ। তুমি ত সব জিনিষ বিস্মরণ যাও। চারদিকে দেখ ভাল কোরে।

শ্বশুরের মত উপদেশ দিয়ে ধীরপদে পা চালাল রান্না-ঘরের উদ্দেশে।

এ বাড়ীতে ওর অসীম প্রতাপ। অমলেন্দুর জন্মের বহুপূর্বের লোকও।

ভূতপূর্ব কর্তাগিন্নীর খাস-বেয়ারা। এখন বয়স ষাটের উপর। দেশ থেকে আনিয়েছে শেষ বয়সের একমাত্র মাতৃহীন পুত্র বিশুকে। অমিতাকে পুত্রবধূর মত স্নেহ করে—কেয়ার করে না। প্রয়োজন হলে ভ্রাতৃদ্বয়কে শাসন করে, বধূকে দেয় উপদেশ।

অমিতার এই অসাবধানতা, প্রমাদ-প্রবণতা ওর খুবই বিরক্তিকর মনে হয়। আজকাল মেয়েছেলেরা লেখাপড়া কোরে কোরে মনটাকে শুধু শুধু ব্যস্ত করে। নানারকম বাজে চিন্তা করে—আসল কথা, সংসারের খুঁটিনাটি কথা মনে রাখতে পারে না। ও ভাবে স্বামী, সংসার আর সন্তান ছাড়া ঘরের বৌ-ঝিদের অত ভাববার

দরকার কি? তবে আর সংসারে পুরুষ মানুষ আছে কেন?

বৌমার বাপু বড্ড ভুলো মন। এ-কথা, সে-কথা, এ-কাজ, সে-জিনিষ—সবই ভুলে যায়। সে যেন একরকম হল। কিন্তু তাই বলে অমন ঝকমকে দামী জবর হার-গাছটা কোথায় রেখেছে মনে পড়ে না। এ কেমন ধারা বাহাত্তুরে মন বাপু অতটুকু মেয়ের?

এদিকে এ সময়ে আবার বিশুটাও দোকানে গিয়ে বসে রইল। কোথায় বড়বাবা আসবার আগে খুঁজে দেখবে সবাই মিলে।

তা নয়, ছোঁড়াটা সহরে এসে বড়ই আড্ডাবাজ হয়ে উঠেছে। খালি ফুড়ুত্ ফুড়ুত্ দোকানে যাবার ছুতো।

রোসো, আজ আসুক বেটাচ্ছেলে—কেমন বাপের বেটা দেখে নেব একবার।

আমার বলে এই সংসারে দু'কুড়ি বছর কেটে গেল। একদিনও বাইরের আড্ডা কাকে বলে জানলাম না—পাড়াতে একটা লোককেও চিনলাম না। এই ষাট্ বছর বয়সেও যে নতুন—সেই নতুন হয়ে রইলাম পাড়ার চাকর-বাকরদের কাছে। আর তুই কিনা দুই মাস আসতে না আসতে গল্প, সিনেমা, যাত্রা কোরে বেড়াচ্ছিস্। নাঃ, ওটাকে এবার দেশে পাঠিয়ে দোব, কলকাতার হাওয়া আর আগের মত নেই—এখনকার হাওয়া গায়ে লাগলে দুষ্ট রোগ জন্মায় লোকের।

আসুক আজ বাড়ী একবার—সব বলে দোব বড়-বাবাকে।

আপনার মনে বকে চলল বৃদ্ধ তারাচরণ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে গৃহে ফিরল অমলেন্দু।

জলযোগ কোরতে গিয়ে নজরে পড়ল স্ত্রীর সদা-হাসি-মাখা মুখে যেন আষাঢ়ে মেঘের গাম্ভীর্য।

আরও লক্ষ্য করল চোখের দৃষ্টি, রক্তিম অধর যেন ক্লান্তিতে ম্লান। কি ব্যাপার অমিতা? শুকনো কেন মুখ?

শুধু এই প্রশ্নটুকুর অপেক্ষা। ঝরঝর কোরে ঝরে পড়ল পুঞ্জীভূত মেঘের রাশি। ভয়ে ক্ষোভে লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢাকল অমিতা।

তার পর সব বলে গেল একে একে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ-চোখে-পড়ার মুহূর্তটুকু থেকে ঠাকুরপোর বিদেশ যাত্রা—তারাচরণের উপদেশ, বিশুর বিকেল থেকে সিগারেট আনতে যাওয়া এবং তখন পর্যন্ত গৃহে না ফেরা—কিছুই বাদ দিতে দিল না তীক্ষ্ণধী অমলেন্দু।

কি কোরে তিন-কামরা ফ্ল্যাটের সমস্ত ঘর, সমস্ত কোণ, রান্নাঘর থেকে স্নানঘর, শোবার ঘর থেকে বাইরের ফটক, ওলট পালট কোরে খুঁজেছে ও আর চরণদা—কিন্তু ঈপ্সিত দ্রব্যের মেলেনি হদিশ্। কোথাও নজরে পড়েনি একটু ঝিকিমিকি, একটু স্বর্ণচূর্ণের আভাস।

বহুদিন অভিমান কোরে থেকে যে অলংকার সে জয় কোরেছিল পুরস্কারস্বরূপ—বারোটা ঘণ্টার স্পর্শ সুখটুকু মাত্র রইল স্মৃতি হয়ে। আফশোষ রাখবার আর জায়গা পেল না অমিতা।

রাত্রি যত এগিয়ে চলে রান্নাঘরে, উনানের ধারে বসে আর একজনের ভীত হৃদয় আরও ভীত, কম্পিত হতে থাকে—অমংগলের ইসারায়, সন্দেহের কালো ছায়ায়।

তারাচরণ—

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ডাকল অমলেন্দু। ও রেগে গেলে চরণদা বলে না—এ কথা সবার জানা আছে।

কি বড়বাবা।—ধীর পদক্ষেপে বৃদ্ধ এসে দাঁড়ায় দোর-গোড়ায়।

বিশু কোথায়—কোথায় ও এত রাত পর্যন্ত?

আমি ত বলতে পারি না, বাবা। ওকে ত তোমার সিগারেট আনতে পাঠানু ঐ মোড়ের পানের দোকানে। হোথা থেকে কোথায় গেছে আমি ত বলতে পারি না।—

চুপ্ শয়তান।—দারুণ চীৎকারে থামিয়ে দেয় অমলেন্দু।

এত বছরের নিমক খেয়ে শেষকালে বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে তোর। বল্, বল্ শীগ গির হার-শুদ্ধ বিশুকে কোথায় চালান কোরেছিস্? সাত-তাড়াতাড়ি সিগারেট আনাবার তোমার কি দরকারটা হয়েছিল শুনি? আমি আসা পর্যন্ত সবুর সইল না, না?

প্রচণ্ড ক্রোধে এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের জীর্ণ দুই কাঁধ ধরে সবেগে ঝাঁকুনি দেয় ভৃত্য-হাতে-গড়া তরুণ মনিব।

স্বাস্থ্যবান লোকেরা
লাইফবয় সাবান দিয়ে
নিত্য স্নান করেন
রোজকার * ময়লা জনিত বীজানু ইহা ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজানু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেই-জন্য স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজানু ধুয়ে সাফ করেন আর এইভাবে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন।
লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
L. 256-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

অভিমানে, অপমানে পাথর হয়ে যায় পিতৃতুল্য স্নেহময় পরিচারক।

কি, কথা বেরোচ্ছে না যে। কোথায় তোর ছেলে—যাচ্ছি আমি থানাতে। ভালো চাস্ এখনও বল খুলে—নতুবা বাপ্‌বেটাকে হাজতবাস করিয়ে ছাড়ব। বল্ বেটা—

সজোরে আঘাত করে মুখে। নাক বেয়ে গড়িয়ে পড়ে তাজা রক্ত—তার সংগে মেশে অভিমানের আর অনুতাপের উত্তপ্ত অশ্রু। অভিমান—স্বহস্তে লালিত পুত্রাধিক প্রিয়তম গৃহকর্তার এই হীন জঘন্য অভিযোগের জন্য।

অনুতাপ—নিজ পুত্র বিশুর সন্দেহজনকভাবে অলংকার হারাণোর সংগে সংগে অন্তর্ধান। কি আহাম্মকিই না কোরেছে সে পল্লীগ্রামের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে এই বন্য জীবকে। নিজ হাতে বিষবৃক্ষ রোপণ কোরেছে—কোরেছে সযত্নলালন।

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ ভেদ কোরে শুধু একটি বাক্য বেরিয়ে আসে—আমি জানি না, বাবা।

প্রহারের মাত্রা বাড়ে—কিন্তু এর চেয়ে বেশী জানা যায় না কিছুই। অবশেষে বাধ্য হয়েই অমলেন্দুকে হতে হয় পুলিশের শরণাপন্ন। কোমলচিত্ত স্ত্রীর মিনতি শোনে না—কোনো নিষেধই কানে তোলে না অনুতপ্ত অমিতার।

জিদ্ চেপে যায় চোরকে শাস্তি দেবার জন্য। তাছাড়া অপরাধীর দণ্ডবিধান ত একটা সামাজিক কর্তব্যও বটে।

থানার দারোগা আসেন—সংগে দুজন পুলিশ।

বৃদ্ধের কিন্তু এক কথা। অনেক আঘাত-লাঞ্ছনা কোরেও শুধু ওই একটি নির্দিষ্ট বাক্যের পুনরুক্তি ছাড়া কিছুই প্রকাশ পায় না।

পরদিন ভোরবেলা ফিরে আসে বিশু—পুলিশের তাড়নায় নয়—ক্ষুধার তাগিদে।

বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে সিগারেট নিয়ে আর ঘরে ফেরা হয়ে ওঠেনি—চলে গেছে সারারাতব্যাপী এক যাত্রার আসরে।

প্রাগংনে পা দিয়েই কি যেন মনে হয়—একটা দুর্ঘটনার আভাস পায় অবচেতন মনে। ভয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে শরীর মন। চারিদিকে থম্‌থমে নিস্তব্ধতা।

অমিতা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে সেই মুহূর্তে—দেখে বিশু চোরের মত নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথায় বিপর্যস্ত এক বোঝা চুল, রাত্রি জাগরণে চোখ দুটি লাল জবাফুলের মত, ছিপ্‌ছিপে সুগঠিত শ্যামল বালক অজ্ঞাত আশংকায় যেন মুহ্যমান।

মমতায় নারীহৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে, হাত ধরে আকর্ষণ কোরে নিয়ে যায় একেবারে রন্ধনশালায়। মাথায় হাত বুলিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলে – দে, দে বিশু, হারছড়া আমাকে দিয়ে দে ত। কেউ টেরও পাবে না। আমি বলব ভুলে কোথায় রেখেছিলাম। দে বাবা, তোর বাবু টের পেলে আর রক্ষে রাখবে না। এখনি পুলিশ এল বলে। লক্ষ্মী সোনা আমার—দিয়ে দে বাবা, তোর দুটি হাতে ধরছি।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে তাকিয়ে থাকে প্রভুপত্নীর সকাতর মুখের দিকে দশমবর্ষীয় স্নেহভিক্ষু বালক।

কিসের হার মা?

কেন তুই হার নিসনি আমার? সোনার হার?

তোমার হার আমি নেব কেন? আমি কি করব হার নিয়ে?

তবে তুই ছিলি কোথায় পালিয়ে কাল বিকেল থেকে—বাঁদর কোথাকার? রাগে ফেটে পড়ে অমিতা—দাঁতে দাঁত ঘসতে থাকে।

চুরি কোরে আবার মিছে কথা। যেমন বাপ্ তার তেমনি ছেলে হবে ত? এত মার খেয়েও জানি না, জানি না—এক বুলি। যা তবে জেলেই যা—তোর কপালে রয়েছে মার-খাওয়া আর হাজতবাস। আমি কি করব?

কিন্তু আমি ত হার নিইনি মা।—সরলভাবে একই কথার পুনরুল্লেখ করে বিশু।

তবে যে গয়লা বললে—বিকেলে তোকে স্নানঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে?

আমি ত ওইখানেই গলার হার খুলে সাবান মেখেছি। তার পর পরতে গেছি ভুলে।

সে ত আমাকে ছোটবাবু বললে—তোয়ালেটা ফেলে এসেছি এনে দে তো বিশু—তাই আমি এনে দিচ্ছিলাম।

আর অমনি দেখতে পেয়ে সোনার মালাটাও ট্যাঁকে গুঁজলি নারে হতভাগা, পাজি। তোর চালাকি আর বুঝি

না আমরা? বল্, কোথায় ফেলেছিস্ আমার অত সাধের মটরমালা?

—চোখ ফেটে জল এল অমিতার। হায়, হায়, একটা দিনও পুরোপুরি ভোগে লাগল না এই অপগণ্ড ডাকাতগুলোর জ্বালায়।

মা, বাবা কোথায়—আস্তে আস্তে শুধায় বিশু—

আমার বাবা?

দাঁড়া, দাঁড়া ব্যস্ত কেন? তুইও যাবি সেখানে। গারদখানাই তোদের যোগ্য ঠাঁই।—ক্রোধে কাঁপতে থাকে অমিতা।

অমলেন্দু আসে, আসে দারোগা পুলিশ।

চলে জেরা, উৎপীড়ন।

মাঝে মাঝে অমিতা চীৎকার কোরে কঁকিয়ে ওঠে—

থামাও থামাও, চাই না, চাই না আমার হার। ছেড়ে দাও, আহা দুধের বাছা।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। চোরের ভার তখন পুলিশের হাতে—সে ত আর অমিতার বালক-ভৃত্য নয়।

রক্তমাখা দেহ নিয়ে ভূমিশয্যা থেকে উঠে বসে বিশু—

টেনে টেনে নিঃশ্বাস নেয়।

অবশেষে স্বীকার করে অপরাধ।

হ্যাঁ আমিই নিয়েছি হার।···

উল্লসিত আনন্দে চীৎকার কোরে ওঠে অমলেন্দু, দারোগা, পুলিশ, গোয়ালা, বাড়ীর ঝি, সামনের দোকানের পানওয়ালা।

এদিকে কানে হাত দিয়ে—চোখে আঁচল চাপা দিয়ে পড়েছিল অমিতা—সেও নড়ে চড়ে উঠে বসে, আশার আলো দেখতে পায়।

ব্যস্, এতক্ষণে অত্যাচারের শেষ হল। এই ত স্বীকার করলি—গোড়ায় করলি না কেন রে? মিথ্যেমিথ্যে মার খেয়ে মরছিস্। কোথায় রেখেছিস বল্?

সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে জনতা।

ওই—ওখানে কয়লার গাদার ভেতর।—

তখুনি ছোটে লোক রাশিকৃত কয়লা সরিয়ে ফেলে। উন্মুক্ত বক্ষ ধরাতল যেন দন্তবিকশিত কোরে উপহাস করে। নেই, কিছু নেই।

কি রে, শয়তান, সত্যি কথা বলবি? না হায়রাণি করাবি?

প্রচণ্ড পদাঘাতে ধরাশায়ী হল বিশু।

—না না, আছে—আছে ওই কাঠের বাক্সের তলায়।

ছুটল সবাই—খোঁজা হোল উল্‌টে ফেলে। না শুধুই ধোঁকাবাজি, কিছু নয়—কিছু নেই।

তবে চল্ বেটা, ফাটকে আটক্ থাকবি।—এই বলে বগলদাবা কোরে নিয়ে চলল প্রহরী-যুগল রক্তাক্ত অবসন্ন বিশুকে টেনে হিঁচড়ে। এই ভাবে চলল উৎপীড়ন ছেলের উপর। বাবা পেয়ে গেল ছাড়া।

বিশু বলেছে—বাবা কিছু জানে না। সে নিজেই চুরি কোরে বাপের ভয়ে সরিয়ে ফেলেছে চুপে চুপে।

কিন্তু—অবাক্ কাণ্ড! কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করলে উন্মাদের মত আবোল-তাবোল জবাব দেয়—বেঠিক উত্তর।

অথচ কবুল করে অপরাধ। অদ্ভুত শয়তান—ক্ষুদে ডাকাত। বেটা পাকা চোর হবে—বলেন দারোগা অমলেন্দুকে।

এদিকে তারাচরণ শয্যা নিয়েছে ঘরে ফিরে। সারাদিন পড়ে থাকে, মাথা তোলে না—করে না জলস্পর্শ—টুঁ শব্দ নেই মুখে।

শুধু দুই চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা—সিক্ত করে লোলচর্ম গণ্ডদেশ, আঁধার গৃহতল।

দিন চারেক পর সংবাদ পাওয়া যায় জ্বরে বেহুঁস হয়ে কয়েদী গেছে হাসপাতালে। সুস্থ হলে চলবে কথা-জানবার জন্য যথারীতি বলপ্রয়োগ, পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু জ্বর নিরাময় হয় না—বেড়েই চলে উত্তরোত্তর।

অপরাধের গ্লানি সর্বাংগ ঘিরে যেন শাসনের আগুন জ্বালায়। পঞ্চমদিবসে অজ্ঞান অবস্থায় বিশু চলে যায় মর্তের কারাগার ছেড়ে অন্য এক বিচারকের কাছে তার জবাবদিহি ক'রতে।

ব্যাপারটাকে চেপে দেয় অমলেন্দু আর পুলিশের দারোগা। সংসারচক্র স্বাভাবিক গতি ফিরে পায়। সহজ হয়ে আসে জীবনযাত্রা।

অন্ধকার ঘরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে চল্লিশ বছরের পুরাতন রিক্তসন্তান বৃদ্ধ—কেউ খোঁজ নিতে সাহস করে না।

ও যেন জীবনপণ কোরেছে—এ অপমানের কণ্টক-মুকুটিত মাথা আর কোনও দিনও তুলে ধরবে না দিনের প্রখর আলোকে।

রবিবার সকালে প্রীতেন্দু ফেরে কলকাতায়।

বন্ধুর মা এ যাত্রা সামলে গেছেন। এখন রোগীকে নিরাপদ দেখে গৃহে প্রত্যাবর্তন কোরছে সে।

বৌদি—বৌদি—

হাঁক দিতে দিতে ফটক পার হয়ে সদর দরজায় প্রবেশ করে প্রীতেন্দু।

অমলেন্দু গেছে বাজারে।

সমস্ত বাড়ী নির্জীব, নীরব। কী যেন অমংগল ঘটে গেছে কার—একটা অসংগতির ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্র।

বিশু—এই বিশে। চরণদা—বৌদি—

অমিতা এসে শুকনো মুখে দাঁড়ায়—সব বলে যায় একে একে, শেষে চোখে তুলে দেয় অঞ্চল প্রান্ত।

সোনার শোক ও ভুলে গেছে। এখন নিঃসন্তান এই তরুণীর অন্তর জুড়ে শুধু জেগে রয়েছে পুত্রশোকের হাহাকার, ক্ষমাহীন অনুশোচনা।

তাই নাকি?—ইস্, দাঁড়াও, দাঁড়াও—।

ছুটে গিয়ে তাকের উপরে সাজানো পুস্তকের অরণ্য-আড়াল থেকে টেনে বের কোরে আনে—সুদৃশ্য স্বর্ণহার—গোটা গোটা মটরের দানা। ভোরের আলো লেগে চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল সুবর্ণজ্যোতি। প্রীতেন্দুর প্রসারিত করতলের উপরে ঝল্‌মলিয়ে হেসে উঠল অমিতার বিবাহ-বার্ষিকের সোহাগের উপহার-ফাঁস।

ডুকরে কেঁদে উঠলো অমিতা।

—ঠাকুরপো। কি ভুল কোরলে। চরণদাকে দেখ তুমি।—অশ্রুবন্যায় কণ্ঠ রোধ হল।

প্রীতেন্দু ধাবিত হ'ল অবহেলিত নির্যাতিত ভৃত্যের তামসকুঠুরির পানে।

ভেজানো কপাট খুলতেই এক ঝলক্ সোনালী রোদ শূন্য ঘরের মেঝেয় আছড়ে পড়ল।

অরুণা

সৌমেন দত্ত

পূর্বাশায় প্রত্যুষের স্বপ্ন ঐ জাগে
আরক্তিম আলিম্পন রাগে।
অনাগত দিবসের চলচিত্রায়ণে
রাত্রির বিদায়ক্ষণে
কারে যেন দেখি
সরমগুণ্ঠনতলে, এ কি!

কে সে?
মৃদু মৃদু হেসে
নিশীথ-সমুদ্রকূলে
পুনর্বার আঁধারের ঊর্মিমালা তুলে
আগামী অরুণোদয়ে
চকিতে মিলায় শুধু, দ্রুততর পূরবীর লয়ে।

দিগন্তের দূর ছায়াপটে
বর্ণসমারোহে শুধু রূপান্তর ঘটে
নিরন্তর তার।
তবু সেই চিরক্ষণিকার
প্রতি মূর্ত্তমুহূর্ত্তের সঞ্চয়সম্ভারে
তিমিরাঙ্গনের ধারে ধারে
অরুণসম্ভব স্বপ্নবীজ যায় বুনে
সে'ই গুণে গুণে।

তাই বুঝি সারারাত্রি ধরি
ধরণীর রোমাঞ্চিত শ্যামাঞ্চল ভরি
বিলাইতে উষারতি-আলোকের অপার করুণা
জাগরপ্রতীক্ষারতা অরুণের দূতী সে অরুণা।

গুণের বাঁধন

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

আমাদের মনে সদাই জাগে সংশয়—ভোগে যদি সুখ, ত্যাগের বৃথা আস্ফালন নিশ্চয়ই আত্ম-প্রবঞ্চনা। প্রাণ যা চায় তার অভাবে ক্লেশ। সে ক্লেশ নিশ্চয়ই বিড়ম্বনা। নিষ্ঠায় এবং সংযমে উপস্থিত সুখ ও সাংসারিক লাভের পথ বন্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। আত্ম-নিগ্রহে পক্ষপাতিত্বের শিক্ষা কেন? বিশেষ পরকে যখন দেখি ভোগের সম্পদে প্রসন্ন, নানা রত্ন-ভূষণে গর্ব্বিত, মনে জাগে ঈর্ষা, আপনাকে মনে হয় ক্ষুদ্র, অকর্ম্মণ্য, অভিশপ্ত। বাস্তবিক ভোগে যদি সুখ, দেহের পুষ্টি, তা'হলে বৃথা কাল্পনিক পরমপদ বা আনন্দময় পরব্রহ্মের রহস্য-আবরণ নিয়ে টানাটানি কেন? এ সমস্যা সমাধান করতে চায় মন।

আত্ম-পরীক্ষায় এ সব প্রশ্নের উত্তর পাই। সংসারে সুখের পরে সদাই আসে দুঃখ, পুষ্টির পরেই গ্লানি, ক্ষণিক মিলনের অন্তরালে থাকে বিরহ। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, চাকার মত পরিবর্ত্তিত হ'চ্চে সুখ ও দুঃখ। যাকে ঈর্ষা করি, যার জীবন ভাবি আদর্শ—বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় সুখ দুঃখের চক্র ঘূর্ণায়মান সেথায়। হয়তো দুঃখের তীব্রতা ভিন্ন শ্রেণীর। যেমন পথের ধুলায় লুণ্ঠিত ক্ষুৎ-পিপাসা-ক্লিষ্ট দুঃখ-নিবৃত্তির চিন্তা-পীড়িত, তেমনি আজীবন সম্পন্ন ব্যক্তিও দুঃখের অভিযান অতিক্রমের উপায় সন্ধানে ব্যস্ত। তাদের সংসার ভাবে ভাগ্যবান।

অবশ্য এই ক্ষণিক সুখের পর দুঃখের চক্র-খেলা সবার জীবনে সমান নয়। কেহ জন্মান্ধ! কেহ মনীষী অথচ চিররুগ্ন। কেহ মুখে মুখে দুরূহ অঙ্ক কষতে পারে, কেহ আজীবন পুস্তক পাঠ ক'রেও মূর্খ। কাজেই ঋষিদের বাক্যে আমরা সত্য অনুসন্ধান করি। তার আভাসও পাই। এ জীবনের পূর্ব্বেও জীবন ছিল এবং পরেও থাকবে। জীবন মাত্র ব্যক্তমধ্য। এ মাঝখানের অভিনয়। পূর্ব্বে কি ছিল তা স্পষ্টরূপে জানি না। অথচ বুঝি, সংস্কার-পূর্ব্ব জীবনে অর্জ্জিত কর্ম্মের সার বৃত্তি। ভবিষ্যতে কি অভিনয় হবে তাও জানি না—অথচ এই জীবনেই বুঝি যখন বর্ত্তমান অতীতের পরিণতি তখন ভবিষ্যতের কর্ম্ম স্পৃহা ও ভাবধারা হবে বর্ত্তমানের ফল।

সাধারণ দৃষ্টিতে অল্পমেধার ফলে দেখি—গড্ডালিকার মত চলেছে মানবকুল ভ্রান্ত পথে। দিনের পর দিন বুঝি নদী-স্রোতে ভাসমান তৃণের মত মানবকুল চলেছে ভেসে। নিজের প্রবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি সংযত বা একমুখ নয়। সে তো আমার কর্ম্মফল নয়—স্রোতের মুখ যে কারণে পাক্ খায় সে কারণ মৌলিক, প্রকৃতিগত। তিন রকমের প্রেরণা জাগে একই মনে হয়তো নিমেষে। কখনও জানবার প্রবৃত্তি হয় প্রবল, কখনও বা অসমস্পৃহা ওঠে কর্ম্মের, কভু বা মেঘের পরে মেঘ উঠে মনের আকাশকে করে সমাচ্ছন্ন। আলস্য-অভিভূত করে মনের শক্তিকে। এই ত্রি-শক্তি সত্ত্ব, রজ, তম—জীবনের সাথী, এদের সমষ্টিই জীবনের বাঁধন। জন্ম মৃত্যু, জরা, দুঃখের আধার-জীবন—এ ত্রিগুণে বাঁধা।

তাই যখন শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শুনি আশ্বাসের বাণী, তখন হৃদয়ে অনুভব করি আশার পুলক।

দেহ হতে সমুদ্ভূত এই তিন গুণের অতীত হ'লে, জন্ম-মৃত্যু জরা-দুঃখ হ'তে মুক্তিলাভ ক'রে অমৃত অবস্থা লাভ করা যায়। *

এ ত্রি-গুণের কবল হ'তে বিমুক্ত হ'লে আর জন্ম হয় না। জন্ম না হ'লে পৃথিবীতে দুলতে হয় না সদাই—সুখ দুঃখের দোলায়। পুনরাবর্ত্তন বন্ধ হয় ত্রিগুণ অতিক্রম করলে। কিন্তু সে কর্ম সম্পাদিত হ'তে পারে কোন্ উপায়ে। জীবনের এই তো প্রধান সমস্যা।

শাস্ত্র বলে তাঁকে পেলে এ সুখ-দুঃখের অনিত্যের আলয়ে জন্মজন্ম পরিভ্রমণ করতে হয় না। পরম সিদ্ধিলাভ ক'রে মহাত্মারা তাঁকে লাভ করেন। তাঁকে পেলে আর জন্ম-মৃত্যুর অভিনয় থাকে না। সুতরাং তাপ-তপ্ত-জীবনের দুর্বিসহ চক্র-ব্যূহের অত্যাচার অতিক্রম করা যায়।

---

* গুণানেতানতীত্য ত্রীণ দেহী দেহসমুদ্ভবান্
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈ বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

দুঃখালয় অশাশ্বত পুনর্জন্ম আর গ্রহণ করতে হয় না। আমাকে লাভ করলে পরমসংসিদ্ধিলাভ করেন মহাত্মারা।*

মাত্র জীবই কি এই বিশ্বধারার ভাঙ্গা-গড়ার নিয়মের অধীন? কত সূর্য্য কত তারা কালের স্রোতে চূর্ণ বিচূর্ণ হচ্চে। তাদের ধ্বংশের পর অণু-পরমাণু কত নূতন নূতন নভোমণ্ডল সৃষ্টি করছে। পুনরাবর্ত্তন বিশ্বের নিয়ম। ভগবান লাভ করলে আর পুনর্জন্ম থাকে না—সৃষ্টির রূপ পরিবর্ত্তনের অভিনয়ে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় না। তাই তিনি বলেছেন—

হে অর্জুন ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোকনিবাসীগণ পুনরাবর্তিত হয়। কেবল একমাত্র আমাকে লাভ করলে পুনরাবর্ত্তন হয় না। †

ব্রহ্মলোক পৌছেও জীব ফিরতে পারে—যদি বাসনার লেশ থাকে অন্তরাত্মায়। তাঁকে লাভ করা চাই গুণাতীত অবস্থায়।

কারণ তিনি গুণাতীত। ত্রিগুণ—সত্ব, রজ, তম, পরব্রহ্ম হ'তে উদ্ভূত। অথচ তিনি তাদের অতীত।‡

ভগবান বুদ্ধও বলেছেন ব্রহ্মলোক হতে ফিরতে হয় তৃষ্ণার শেষ না হ'লে। তিনি ব্রহ্ম লাভের কথা বলেন নি। বলেছেন নির্বাণ লাভের কথা। নির্বাণে পুনর্জন্মের অবসান।

মায়াতীত ব্রহ্ম। জগৎ মায়ায় মুগ্ধ। আত্ম-দর্শনের ফলে বুঝি, ধন রত্ন মান-অভিমান রসহীন শাস্ত্র-জ্ঞান বা দারুণ আত্মম্ভরিতা—কিছুই চরম সুখ বা শান্তির বিধান করতে পারে না। জীবন চপল। যৌবন স্থায়ী নয়। দেহ ক্ষণভঙ্গুর। মনের শক্তি অসীম। কিন্তু সে শক্তিকে বাড়াতে হয় সাধনার আবাহনে। রাজ-রাজেশ্বরের রাজ্য যায়, পথের কাঙাল রাজ-সম্মান লাভ করে, আবার নিজ কর্মদোষে, অবিমৃষ্যকারিতার ফলে নিহত হয়, লাঞ্ছিত হয়, স্বপক্ষের বা বিপক্ষের নিষ্ঠুরতার আবেগে। একথা আমরা বুঝি—তবু ছুটি সেই পথে যেথা সুখ চপল, চঞ্চল।

এই ক্ষণিক সুখদুঃখের চক্রের আবর্ত্তনে মানুষ কিন্তু চিরদিন আভাস পায় অব্যয় অনন্ত সুখের, যার ছায়া মাত্র পৃথিবীর চরম সুখ। উপলব্ধি হয় আনন্দ—আয়ত্ব করলে নশ্বর সুখ দুঃখের কবল হতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। সম্মুখ সমরে দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করলে ক্ষণিক শান্তিলাভের সম্ভাবনা। কিন্তু সেই আবর্ত্তের উর্দ্ধভূমিতে ওঠা যায় না। সুতরাং এথন ভূমিতে পৌছান আবশ্যক পার্থিব জাল-জঞ্জালের কবল হতে মুক্তি পেতে গেলে, যেথায় সংসারের সুখ দুঃখ পৌছায় না। সে ভূমিতে বাক্য পৌছতে পারে না, অসীম মন পৌছে না, কিন্তু ভয় হয় না ব্রহ্মের আনন্দের রস উপলব্ধির সঙ্কেতে।*

সংক্ষেপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে কথা বলেছেন গীতায়। —গুণময়ী মায়া উত্তীর্ণ হওয়া দুষ্কর। এই দৈবী মায়া উত্তীর্ণ হবার উপায় আছে। যে আমাকে পায় সে এই মায়া সাগরের পরপারে পৌছায়।†

গুণময়ী মায়া কি? গুণ রজ্জু বাঁধন দড়ি। তিন খেই দড়ি—সত্ব রজ তম—তারাই সংসারে বেঁধে রাখে জীবকে। এরা জীব-প্রকৃতির উপাদান, মানবজাতির সহজাত সংস্কার। ইংরাজ কবি বলেছিলেন—তুমি সুখের অম্বেষণ করছ—হায় অদৃষ্ট, তুমি তো সুখ পাওনা বিলাসে স্বর্ণে বা যশে। সেই হিংসিত আধিপত্যেও সুখ নাই, যা লাভের জন্য, হে স্বেচ্ছায়-গড়া কৃতদাস, তোমাদের হৃদয় বিক্রয় করেছ পূর্বাপর আচরিত অভ্যাসে যে কঠোর কর্ম নির্দেশিকা।‡

এই ওতপ্রোতভাবে আবদ্ধ প্রকৃতির বশে, এক এক

---

* মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ। গীতা ৮।১৫

† আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ৮।১৬

‡ যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।

* যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

† দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। ৭।১৪

‡ Ye seek for happiness—alas the day.
Ye find it not in luxury nor in gold,
Nor in the fame, nor in the envied sway,
For which, O willing slaves to Custum old,
Swere Task-Mistress! Ye your hearts have sold.
Shelley
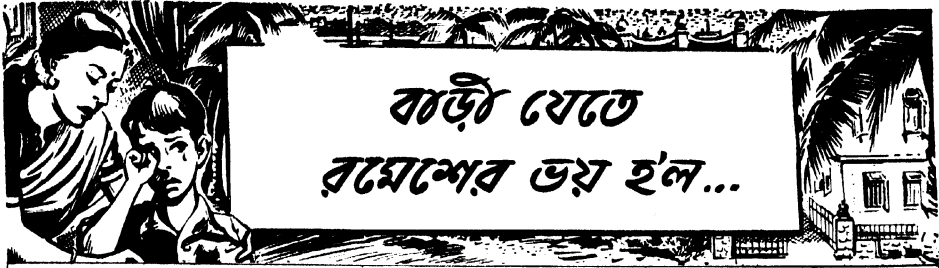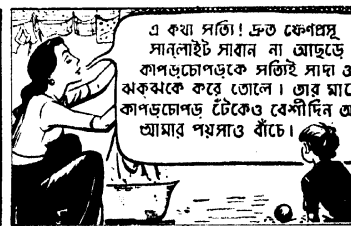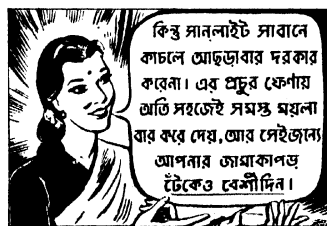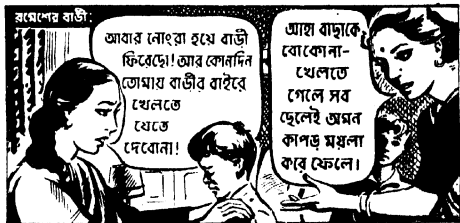
সময় আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যেন তীক্ষ্ণতা বাড়ে, অন্তরাত্মায় জ্ঞানের উপঢৌকন নিবেদন করবার জন্য। প্রকাশের প্রবৃত্তির স্ফুরণ সাত্ত্বিক গুণের প্রাবল্যের ফল। তেমনি অতি সংযত ব্যক্তির মনে লোভ জন্মে—যশের লোভ, অর্থের লোভ, মানের লোভ, পার্থিব প্রেমের লোভ। হাতে পায়ে চঞ্চলতা অনুভূত হয় কর্মে আত্মনিয়োগের তাগিদে। সে প্রবৃত্তির বসে বিলাস-শয্যায় কালাতিপাত রমণীয় বোধ হয় না—আরাম শয্যা হয় কণ্টক-শয্যা, কর্মারম্ভের বাসনা জাগে মনে স্পৃহা-প্রণোদিত কর্মে। এ রজোগুণের বৃদ্ধির লক্ষণ। তেমনি তমোগুণ আমাদের শুদ্ধ-চেতনার অন্তরায়। সে জ্ঞান ও কর্ম-স্পৃহাকে শুদ্ধ করে। যেন যবনিকা ঢেকে দেয় আমাদের অন্তরাত্মার উপর। অপ্রবৃত্তি, প্রমোদ, মোহ—এ সব তমোগুণের কার্য্য।

এই তিন প্রকার সংস্কার মানুষের প্রকৃতি। অবশ্য এরা মিশিয়ে থাকে। আলস্যের মাঝেও জ্ঞানের তৃষা অনুভূত হয়। জানবার সময়ও আলস্য আছে। কোথা হতে যেন কাজ করবার ইচ্ছা উপস্থিত হয়। আমাদের কর্মেও ঠিক বোঝা যায় না সে কোন্ গুণের খেলা। মানুষ সাত্ত্বিক মহত্ত্বে দান করে, রাজসিক দান করে, আবার আলস্যের বশে দান করে। প্রকৃতির এই সব কর্মই মায়ার ডোরে বাঁধে মানুষকে। বহুক্ষেত্রে এরা পরস্পর-বিরোধী নয়, অথচ বিভিন্ন আচরণের প্রেরণা আনে। এই তিন গুণে বাঁধা জীব-প্রকৃতি।

যতদিন জীব থাকবে, ত্রিগুণের কর্ম থাকবে মনে প্রাণে, এদের প্রভাব অতিক্রম করলে মানুষ পারে নিজের আদর্শ মত আত্মোন্নতির প্রচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করতে। সত্যই এরা জীবকে বেঁধে রাখে। মনের নিভৃত নিলয় হতে বাসনা জাগে মায়ার বন্ধন লোপের। জ্ঞান ও প্রকাশ যথেষ্ট নয় যদি সে আত্মাকে প্রকাশ না করে। সে কর্ম সাধনা-সাপেক্ষ। আত্ম-জ্ঞান পূর্ণ না হলে আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি না এ সত্য—আমাদের আত্মা পরমাত্মায় সমাহিত, সমস্তই বাসুদেব।

আবার আমরা ফিরে সেই পুরাতন সমস্যার সম্মুখীন হলাম। সমস্তই ভগবান এ সূক্ষ্ম শুদ্ধ প্রকাশ আসে কোথা হতে। জীবনে কর্মত্যাগ তো সহজসাধ্য নয়। মাত্র প্রাণ-ধারণের জন্যও প্রয়োজন কর্মের।

তাই প্রথম শিক্ষা দিলেন ভগবান নিষ্কাম কর্মের। কর্মের ফলে অনাসক্তি, সুখদুঃখ মানাভিমানে সমদৃষ্টি প্রভৃতি নীতি কর্মের কৌশল—যার ফলে আমরা কর্মের বন্ধনকে উপেক্ষা করতে পারি।

কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম করতে গেলে জ্ঞানের আবশ্যক। কেন নিছক কাজ করবে মানুষ লাভের লোভ বর্জন করে? স্থিরিই বা হবে কেন শক্তি? স্পষ্ট জ্ঞানে যথন বুঝি, গুণ তার কর্ম করবে, আমাদের কর্তব্য সম্যক জ্ঞানের বিচারে গুণাতীত হওয়া। চিত্তকে স্থির না রাখলে উপায় কি? সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হলেও রাখতে হবে আপনাকে অচল অটল—রাজসিক বা তামসিক ভাবের অভ্যুদয়ের তো কথাই নাই। প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা নিজ কর্মপথ নির্বাচন ক'রে চলতে হ'বে সংসার পথে। নিঃস্বার্থ হতে পারে না জীব প্রকৃতির বশে, প্রবৃত্তির উপর দ্বেষ করলেও আবার বন্ধনের মাঝে পড়তে হবে। প্রকৃতি এবং সংস্কারের বশে মনে জাগে লোভ বা কর্মপ্রবৃত্তি। তারা তামসিক আবরণ সৃষ্টি করে মনে। প্রবৃত্তির ওপর ক্রোধে কোনও শুভফল ফলতে পারে না। ক্রোধের ফল স্মৃতি-বিভ্রম যার পরিণাম বুদ্ধিনাশ।

নিজের লক্ষ্য যদি অভ্রান্ত হয়, লক্ষ্যে যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহলে হেঁসে উপেক্ষা করা সম্ভব সব আকস্মিক আগন্তুক চিন্তাপ্রবাহকে, গুণ বিদ্যমান গুণে এই ধারণায়। উদাসীনতা পারে তাদের প্রতিহত করতে। রাজসিক বা তামসিক ভাব দুঃখ আনে। তারাও ক্ষণিকের অতিথি—নিজেদের স্বভাব বশে উপনীত। একটুকরা জ্ঞানের উদয়েও সারা জীবনের আদর্শ পথে বিচলিত হলে, লাভ কোথায়। যোগের অভ্যুদয়ে প্রতি সোপানে বিভূতি লাভ হয়। প্রতি মুহূর্তে ভক্ত যথন ঈশ্বরের কথা ভাবেন, তাঁর আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন, তথন আনন্দ ভাগিরথীর মধুর কল্লোলে তাঁর প্রাণে মাধুরী সঞ্চার করে। তাতে উৎফুল্ল হয়ে মোহের গর্তে পড়লে সর্বনাশ। ভক্ত মদোন্মত্ত হয়ে অভক্ত পাষণ্ডীর প্রতি বিদ্বিষ্ট হলে, ভক্তিমার্গে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অথচ সাত্ত্বিক প্রকাশের পর রাজসিক বা তামসিক ভাবের আবেগের তো পরিচয় পাই নিত্য। আবার লোভ বা মোহের অকৃত-কার্য্য সন্ধানীকে হতোস্মির আবেগ যথন নিরাশার

অতল জলে নিমজ্জিত করে, সাত্ত্বিক প্রকাশ পথ দেখায় শান্তির।

তাই ভগবান উপদেশ দিয়েছেন—গুণের অভ্যুদয়ে অবিচল থাকবার। গুণের কার্য্য স্ফুরিত হচ্ছে, চাঞ্চল্য তো তাকে বদ্ধ করবে না, বদ্ধ করবে সাত্ত্বিক ভাবনার ফলে উদাসীনতা। সামনে গাড়ি এলে যেমন তাকে পথ ছেড়ে দিলে, জীবন-সংশয় হয় না, তেমনি কু-প্রবৃত্তির প্রকাশে অভিভূত না হয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিলে, শান্তি অনিবার্য্য। উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষোভিত সমুদ্রতটে স্নান করবার প্রক্রিয়া এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টান্ত স্থল হতে পারে। তরঙ্গ যখন তাণ্ডব-নৃত্যের তালে সম্মুখে আসে, দক্ষ স্নাতা মাথা নিচু করে, না হয় লাফিয়ে ওঠে। জল শরীর ধুয়ে চলে যায়, মাথার উপর দিয়ে না হয় পায়ের নিচে দিয়ে। রাগ, হিংসা, দ্বেষ বা বিফলতার বেগ এলে সে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—যার ফলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অথচ তাকে এড়িয়ে গেলে হওয়া যায় নিরাপদ। তাই অর্জ্জুনকে বল্লেন শ্রীভগবান—

প্রকাশরূপ জ্ঞান, প্রবৃত্তি বা মোহ উদিত হলে যিনি কখনও দ্বেষ করেন না এবং তাদের নিবৃত্তিতে আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি উদাসীনের মত অবস্থিত, সত্ত্বাদি গুণ যাঁকে বিচলিত করতে পারে না, গুণ-পরম্পরা যোগেই সমস্ত কার্য্য হচ্ছে এইরূপ নিশ্চয় করে যিনি ধীরভাবে অবস্থান করেন তিনি গুণাতীত পুরুষ। *

আমরা দৈনন্দিন জীবনে সংসারাশ্রমে এ সত্য পরীক্ষা করি সদাই। রোগের সময় অধীর হলে যন্ত্রণা বাড়ে। শোকের তো কথা নাই। অদৃষ্টের দোষ দিয়ে বহু সময় মানুষ জয়ী হয়। কিন্তু তারও প্রতিক্রিয়া আছে। জ্ঞানে এ সত্য উপলব্ধি করলে মুক্ত হওয়া যায় উৎপীড়নের কবল হতে।

সাধারণ ভাবে উপদেশ দিয়ে শ্রীভগবান একের পর এক উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন গুণের হ্রাস বৃদ্ধির কবল হ'তে মুক্তি পাবার। সাধারণ গৃহস্থাশ্রমে চরিত্র গঠনে সে উপায়গুলি বড় হিতকর। পরস্পর-বিরোধী হিল্লোলে সুখদুঃখের দোলায় ভাসমান হতে হয় না সে চরিত্রের আচরণে। তিনি বলেছেন—

যাঁর সুখে দুঃখে সমান ভাব, যিনি নিজের স্বরূপে অবস্থিত, প্রস্তর ও কাঞ্চন যাঁর দৃষ্টিতে সমান, প্রিয় ও অপ্রিয় তুল্য, যিনি ধীর, যাঁর পক্ষে নিন্দা ও আত্ম-সংস্তুতি সমান, মান-অপমান, মিত্র ও অরিপক্ষ তুল্যমূল্য এবং সকল প্রকার আরম্ভ পরিত্যাগী যিনি—তেমন ব্যক্তিকে গুণাতীত বলা হয়। *

একথায় সন্দেহ হয় সর্বারম্ভ পরিত্যাগীর উল্লেখে। সর্বারম্ভ পরিত্যাগ বুঝতে হবে সেই সব পথের বর্জন যা শ্লোকে বলা হল—অর্থাৎ অলীক মান-অপমান, শত্রুতা ও মিত্রতা প্রভৃতির প্রয়াণে মায়ার ঘুর্ণীপাকে পতন। প্রত্যেক কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে বহুবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। স্বকর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

গীতার উপদেশ কোনোটি পূর্বাপরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। সংশ্লিষ্টভাবে সম্যক জ্ঞানে না বুঝলে কোনো ধর্ম-শাস্ত্রের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ধর্ম সাধনা। তার প্রথম সোপান স্পষ্ট উপলব্ধি।

তাই গুণত্রয় বিভাগ যোগের প্রসঙ্গে শেষ কথা বল্লেন শ্রীভগবান—যিনি আমাকে অনন্যযোগে ভক্তিসহ সেবা করেন, তিনি গুণত্রয় অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভে সমর্থ হন। †

পবিত্র ভক্তি আনে বিশুদ্ধ জ্ঞান। স্পষ্ট জ্ঞান পথ দেখায় নিত্য কর্মের। সে পথেই কাটে গুণের বাঁধন।

---

* প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।
উদাসীনবদাসীনো গুণৈ র্যো ন বিচাল্যতে
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে। ১৪।২২-২৩

* সমদুঃখসুখঃস্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যোমিত্রারি পক্ষয়োঃ
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে। ১৪।২৫

† গীতা ১৪।২৬

লীলা নাটক

আদ্যলীলা

"কি সুন্দর নর লীলা যাই বলিহারি।
হৃদয়ে উদয় যাহা আঁকিতে না পারি॥
সাধ্যাতীত যদ্যপিহ প্রাণ নাহি মানে।
সতত প্রমত্ত মন লীলা আন্দোলনে॥
মায়ের সহিত হৃদে উরহ ঠাকুর।
যেতে পথে বাধাবিঘ্ন সব করি দূর॥"

"জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগত জননী।
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—

প্রথম দৃশ্য

১২৭৮, চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ। জয়রামবাটী। শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহ-প্রাঙ্গণ। সকাল বেলা। এক আঁটি দল-ঘাস স্কন্ধে লইয়া বাহির হইতে সারদা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নেপথ্যে গ্রামের অম্বিকা চৌকিদারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

অম্বিকা॥ (নেপথ্যে) মুখুজ্জ্যেমশাই বাড়ী আছেন গো?

ঘাসের বোঝা নামাইয়া রাখিলেন

সারদা॥ কে?

অম্বিকা॥ আমি তোমাদের ছেচরণের অম্বিকে চৌকিদার গো।

সারদা॥ অম্বিকা দা! তা বাইরে কেন, ভেতরে এসো।

অম্বিকার প্রবেশ

অম্বিকা॥ তোমার বাবা কোথায় সারুদিদি? চিঠি আছে যে।

সারদা॥ চিঠি? কার চিঠি? কে লিখেছে? কোত্থেকে এসেছে?

অম্বিকা॥ অতশত কথা কে জানবে দিদি? কাল শিহরের হাটে রামু ডাক পিওন চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে—তোমাদের রামচন্দ্র মুখুজ্জ্যের চিঠি গো। ঐটুকুই যা জানি। কে লিখেছে, কোত্থেকে এসেছে, সে মুখুজ্জ্যে মশাই দেখলেই বুঝবেন। কোথায় তিনি?

সারদা॥ বাবা পূজোয় বসেছেন। দাওনা আমায় তুমি চিঠিটা।

অম্বিকা॥ না, না। এ বাবা সরকারী ডাক। এই দেখছ না—টিকিট মারা আছে—রাণীর মাথা! দিতে হবে একেবারে খোদ্ কর্তার হাতে। রামু পিওন আমায় পই পই করে বলে দিয়েছে।

জলের কলসী কাঁখে সারদার মাতা শ্যামাসুন্দরী ঘাট হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন

অম্বিকা! এই যে মা-ঠাকরুণ। পেন্নাম হই।

প্রণাম করিল

চিঠি এসেছে কর্তার নামে। এই দেখ না।

চিঠিটা দেখাইল

শ্যামাসুন্দরী॥ কে লিখেছে বাবা অম্বিকা?

অম্বিকা॥ তাই যদি বলতে পারব মা—তবে চৌকিদার না হয়ে দারোগা হ'ত তোমার এই অম্বিকা দাস। আমার যে 'ক' অক্ষর গো-মাংস।

শ্যামা॥ উনি তো পূজোয় বসেছেন। আমি দেখছি। তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন সারু? অম্বিকাকে বস্‌তে দে।

শ্যামাসুন্দরী ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন। সারদা অম্বিকাকে বসিবার জন্য বারান্দায় একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন

সারদা॥ চিঠিটা একটিবার আমার হাতে দাও অম্বিকা-দা। পড়তে পারি না আমি সত্যি, কিন্তু তাঁর হাতের লেখাটা আমি দেখেছি কিনা, আমি চিনি।

অম্বিকা॥ কার লেখা দিদি?

সারদা॥ তুমি যে কি। তুমি কিচ্ছু বোঝ না অম্বিকা দা।

অম্বিকা॥ ও! আমাদের সেই ক্ষ্যাপা জামাইএর কথা বলছিস্? দেখ—দেখ।

অম্বিকা পীড়িতে বসিল এবং ঝোলা হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া দিল। সারদা সাগ্রহে পত্রখানি লইয়া হাতের লেখা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিরোনামার হস্তাক্ষর পরিচিত নয় দেখিয়া বিষণ্ণ মনে চিঠিখানি ফেরৎ দিলেন। অম্বিকা চিঠিখানি হাতে লইল

অম্বিকা॥ কেমন, তার লেখা নয় তো? তুমিও যেমন! সে লিখবে চিঠি! আরে মাথা ঠিক থাকলে তবে তো লিখবে চিঠি! কি বলব দিদি! দক্ষিণেশ্বর তো এমন কিছু দূর নয়! লোকের মুখে মুখে খবর সবই আসে। যা সব শুনি! কানে আঙুল দিতে হয়।

সারদা॥ অম্বিকা দা!

অম্বিকা॥ সে সব দিদি তোমার না শোনাই ভালো। কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুজ্জ্যে সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন। তাঁর ছেলে গদাধর তোকে যখন বিয়ে করতে এলো—তখন তো তুই ছ'বছরের খুকী। কিন্তু বরের চেহারা দেখে আমাদের মন গলে গেলো। মনে হলো পিঁড়িতে বসে আছেন সাক্ষাৎ মহাদেব। তা সেই লোকটাই কি না—

সারদা॥ (ম্লান হাসি হাসিয়া) দক্ষিণেশ্বরের শ্মশানে-মশানে দিগম্বর হয়ে বাঁশ কাঁধে ঘুরে বেড়ায়। কাঙালীদের এঁটো খায়। কখনও বসে থাকে অসাড় হয়ে। কখনও বা পড়ে থাকে গঙ্গার কাদাতে মাথা গুজে, মুখ ঢেকে। কখনও বা সন্ন্যাসী হয়ে রামনাম জপছে, আবার কখনও ফকির হয়ে—আল্লা আল্লা জপছে। মহাদেব নয়তো কী অম্বিকা দা?

গৃহাভ্যন্তর হইতে পূজা সারিয়া রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তৎপশ্চাৎ শ্যামাসুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইলেন

রামচন্দ্র॥ কি অম্বিকা—আমার নাকি কি চিটি এসেছে?

রামচন্দ্র মুখুজ্জ্যেকে প্রণাম করিল অম্বিকা

অম্বিকা॥ হ্যাঁ কর্ত্তা।

চিঠি প্রদান করিল

রামচন্দ্র॥ হৃদয় মুখুজ্জ্যেকে চিঠি দিয়েছিলুম। বোধহয় তারই উত্তর। (চিঠি খুলিয়া চোখ বুলাইয়া) হ্যাঁ, হৃদুই লিখেছে বটে।

শ্রীশ্রীমা

আবির্ভাব—১২৬০, ৮ই পৌষ তিরোভাব—১৩২৭, ৪ঠা শ্রাবণ

শ্যামা। কি লিখেছে? পড়ো।

রামচন্দ্র॥ (অম্বিকার দিকে তাকাইয়া) আচ্ছা তুমি তাহ'লে এসো অম্বিকা।

অম্বিকা॥ অম্বিকা তোমাদের চিঠি শুনতে চায় না কর্তা। শুধু জানতে চায় সব কুশল তো?

রামচন্দ্র॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ সব কুশল।

অম্বিকা॥ বাস্—হয়ে গেলো। আমরা হলুম গিয়ে চিনির বলদ। এই যা পেলুম—এইটুকুই লাভ।

অম্বিকার প্রস্থান

শ্যামা॥ তুমি চিঠিটা পড়ো।

রামচন্দ্র॥ (সারদার দিকে তাকাইয়া, একটু ইতস্তত করিয়া) সারু···

সারদা॥ আমি যাচ্ছি বাবা।

শ্যামা॥ না, না, সারু থাক। কপাল যা পোড়বার তা পুড়েছে। এখন আর ওর কাছে লুকোবার কি আছে? তুমি পড়ো।

রামচন্দ্র॥ (চিঠি পড়িতে লাগিলেন)

"শতকোটি প্রণামমিদং, শ্রীচরণ আশীর্বাদী পত্র প্রাপ্ত হইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। লোকে বলে তীর্থ করিলে সুফল হয়। আপনার জামাতা জীবন—আমার পরামারাধ্য মাতুল মহাশয় কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া রাণী রাসমণির সেজ জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসের সহিত কত তীর্থ-ই তো ঘুরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাহাতে সুফল হইল কি? আমার স্ত্রীর অকালমৃত্যু হইল। দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে হইল। মাতুল মহাশয়ের অশেষ স্নেহভাজন ভাতিজা অক্ষয়ের বিবাহ হইল। মৃত্যুও হইল। বিশেষ পরিতাপের বিষয় গত ১লা শ্রাবণ সেজবাবু মথুরামোহন বিশ্বাসেরও স্বর্গ লাভ হইয়াছে। অদৃষ্টে আরও কি আছে জানি না।

মাতুল মহাশয়ের কর্ণে আপনার কন্যা সম্বন্ধে কোন কথাই তুলিতে সাহস পাইতেছি না। তাঁহার মনের অবস্থা ভাল বোধ হয় না। নিবেদন ইতি—

সেবকাধম

শ্রীহৃদয়নাথ দেবশর্মণঃ।"

শ্যামা॥ মেয়ে স্বামীর ঘর করতে যাবে—তোমার কত আশা! নাও, হ'লো তো! (সারদার প্রতি) দল-ঘাস কেটে এনেছিস্?

সারদা॥ এনেছি মা।

শ্যামা॥ আনবি না তো কি! বাপের বাড়ী বসে ঐ দল-ঘাস কেটেই তোর জীবন যাবে। যাই আমি হেঁসেলে যাই। (সারদার প্রতি) গরুটাকে খাইয়ে পারিস্ তো তুইও আয়—তরকারিগুলো কুটে দে। ছেলেপুলেগুলো সব ক্ষেতে গেছে। ফিরে এসে খাই-খাই করবে।

শ্যামা ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন

রামচন্দ্র॥ আমি মা, মণ্ডলদের বাড়ীর ষষ্ঠি পুজোটা সেরে আসি। তুই ভাবিস্ নে সারু। এখনও আমার মন বলছে, আমি তোকে জলে ফেলে দিই নি রে—জলে ফেলে দিই নি।

সারদা॥ না বাবা, তা কেন! তবে···

রামচন্দ্র॥ ও। আর যদি দিয়েই থাকি, কূল তুই একদিন পাবিই পাবি।

সারদা॥ আমি জানি বাবা। তুমি মন খারাপ করো না।

রামচন্দ্র॥ হা ভগবান! ও আমায় বলছে মন খারাপ করো না।

হাত দিয়া উদ্গত অশ্রু ঢাকিয়া ত্বরিৎপদে বাহিরে চলিয়া গেলেন। সারদা ঘাসের বোঝা মাথায় লইয়া গোয়াল ঘরের দিকে যাইবে, এমন সময় বিধবা ভানু দাসীর প্রবেশ

ভানু॥ সারু।

সারদা॥ ভানুপিসি এসো।

ঘাসের বোঝা নামাইয়া রাখিল

ভানু॥ তোর বাবার চোখে জল দেখলুম কেন রে সারু?

সারদা॥ ও বাবার চোখে যখন-তখন জল আসে। চোখের অসুখ ভানুপিসি।

ভানু॥ কিন্তু এতো দুঃখেও চোখে যদি জল না আসে—সেটাও চোখের অসুখ। সে অসুখটা হয়েছে তোর। আশ্চর্য, তোকে একদিনও কাঁদতে দেখলুম না সারু!

সারদা॥ দুঃখ আমার কই পিসি যে কাঁদতে যাব। লোকে তাঁকে যা খুশি বলুক, কিন্তু সেই যে চার বছর আগে দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে এসে আমায় নিয়ে গেলেন কাছে, সেই ক'মাসেই তাঁর যে-পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে তাঁকে ভুল বুঝব না আমি কোনদিন—তিনি যে কী—তিনি যে কে—সে আমি ভালভাবেই বুঝে এসেছি।

ভানু॥ তবু সারু—যা রটে তার কিছুটা বটে। স্বামী হয়ে কেনই বা স্ত্রীকে ভুলে যান—কেন তোকে এ দুঃখ দেন।

সারদা॥ দুঃখ তিনি দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু দুঃখ সইবার শক্তিও তিনিই দিয়ে গেছেন। তোমায় বলেছি তো পিসী, যে-আনন্দের পূর্ণঘট তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন, এই চার বছরেও তার এতটুকু ক্ষয় হয় নি। আমি কি ভাবি জানো পিসি ?···

ভানু॥ কি সারু ?

সারদা॥ আজ বাবার কাছে হৃদয়-ভাগ্‌নের চিঠি এসেছে। হৃদয়-ভাগ্‌নে লিখেছেন—তাঁর বউ মারা গেছেন, অক্ষয় মারা গেছে। ওদের ওখানকার কর্তা মথুরবাবু মারা গেছেন। এতে তোমাদের জামাইএর মনের অবস্থা ভালো নয়। এঁরাই সব তাঁকে দেখাশোনা করতেন—সেবা-যত্ন করতেন। আজ না জানি তাঁর কত অযত্ন হচ্ছে। কিন্তু আমি তো রয়েছি। কেন আমি যাব না তাঁর কাছে ? কেন করবো না আমি তাঁর সেবা—আমার যা কাজ।

হন্তদন্ত হইয়া রাম মুখোপাধ্যায়ের পুনঃ প্রবেশ

রামচন্দ্র॥ এই যে সারু, মণ্ডলবাড়ীতে গিয়েই শুনলুম সামনের এই ফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্য জন্মতিথিতে এখান থেকে ওরা যাচ্ছে গঙ্গা নাইতে কলকাতায়। রওয়ানা হচ্ছে কাল ভোরে। আমিও যাব ঐ সঙ্গে। কাপড়-টাপড়গুলো এখনই কেচে দে।

সারদা॥ বাবা—

রামচন্দ্র॥ হ্যাঁ—আর কথার সময় নেই। এখুনি কেচে দে। নইলে ওগুলো শুকোবে না। তাই তো ছুটে এলুম পূজোয় না বসে। তুই যা—তুই যা···আমি পূজো সেরে এসে আর সব গুছিয়ে নিচ্ছি।

ভানু॥ আমি বলছিলুম কি দাদা, সারুকেও তবে সঙ্গে নিন্।

রামচন্দ্র॥ কি বিপদ! সারু যাবে বলেই না আমি যাচ্ছি। এমনি তোদের বুদ্ধি বলেই দশ হাত কাপড়েও তোদের কাছা হয় না।

রামচন্দ্রের দ্রুত প্রস্থান

সারদা॥ পিসি···

আবেগে ভানুর বুকে মুখ লুকাইল

ভানু॥ নে হলো তো! রথ দেখা, কলাও বেচা—দুইই হবে। গঙ্গা নাওয়াও হবে, আর দেখেও আসবি লোকে যা বলছে তা সত্যি কি না।

সারদা॥ লোকে যা বলে বলুক। পাগল হোন আর যাই হোন—তিনিই আমার দেবতা—তাঁর পায়েই আমার ঠাঁই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

১২৭৮, চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের গঙ্গাতীরবর্তী কক্ষ।

দীনু পূজারী ও শ্রীরামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ॥ হরিবোল—হরিবোল। হরি গুরু, গুরু হরি। মনকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ। জ্ঞানকৃষ্ণ, ধ্যানকৃষ্ণ। বোধ-কৃষ্ণ, বুদ্ধিকৃষ্ণ। জগৎ তুমি—জগৎ তোমাতে। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।

এই বলিয়া হাততালি দিয়া বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দীনু পূজারীর প্রবেশ।

দীনু॥ ওকি ঠাকুর, ওকি হচ্ছে! পাগলের মতন অমন হাততালি দিচ্ছেন কেন ?

রামকৃষ্ণ॥ গাছ জুড়ে কাক বসেছে। নীচে দাঁড়িয়ে হাততালি দাও। সব উড়ে যাবে তো!

দীনু॥ তা যাবে বৈ কি।

রামকৃষ্ণ॥ তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে বিষয়-বাসনা, পাপচিন্তা সব শালা উড়ে পালাবে। এমনি করে মন নির্মল করে তবে না ধ্যানজপ।

দীনু॥ আচ্ছা ঠাকুর, আপনার এত জ্ঞান। তবে আপনার এমন হয় কেন ?

রামকৃষ্ণ॥ কি হয় ?

দীনু॥ কখনো বালকের মত স্বভাব হয়। আবার পাগলের মতন কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন।

রামকৃষ্ণ॥ ঈশ্বর দর্শন হোক, তোমারও হবে। যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নেই। আবার শুচি-অশুচি তার কাছে দুই-ই সমান; তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত কভু হাসে, কভু কাঁদে; এই বাবুর মত সাজে-

গোজে, আবার খানিক পরে ন্যাংটা, বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে। তাই উন্মাদবৎ। আবার কখনো বা জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে আছে—জড়বৎ।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনের হৃদয়ের প্রবেশ

হৃদয়॥ ও মামা, আছ কোথায়? এদিকে যে জয়রামবাটি থেকে ছোটমামী এসে উপস্থিত।

রামকৃষ্ণ॥ কোথায় রে হৃদু?

হৃদয়॥ কোথায় আবার—এই দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে। বল্লেন বাপের সঙ্গে এসেছেন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গঙ্গা নাইতে।

রামকৃষ্ণ॥ তা বেশ, তা বেশ। কিন্তু ও দীনুঠাকুর—আজ না বিষ্যুৎবার?

হৃদয়॥ আমিও তো তাই বল্লুম। তা দেখলুম ছোটমামীর জ্ঞানের নাড়ী টন্‌টনে। বল্লেন কিনা—আমি গঙ্গার ওপরেই নৌকোয় বিষ্যুদের বারবেলা কাটিয়ে এসেছি। বুঝলে মামা, এ যেন এঁচোড়ের আঠা।

রামকৃষ্ণ॥ আরে ম'লো। লোকটা কোথায় তা' না বলে বক্তিমে শুরু করে দিয়েছে!

হৃদয়॥ আরে লোকটা তো তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে। দীনুঠাকুর, আমার পূজোর দফা তো আজ গয়া। যাও—পূজোটুজোগুলো তুমি দেখো।

দীনুকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল। দীনু পূবের দরজা দিয়া চলিয়া গেল। হৃদয় পশ্চিমের দরজায় গিয়া ডাকিল—

এসো মামী, এসো। হুকুম হয়ে গেছে।

অবগুণ্ঠিতা সারদা দেবীর প্রবেশ

রামকৃষ্ণ॥ এসেছ, বেশ করেছ। ওরে হৃদে, মাদুর পেতে দে রে। সেই এলে—দুদিন আগে এলে না কেন? আহা, আর কি আমার সেজবাবু আছে যে তোমার যত্ন হবে? আরে সেই যে মথুরবাবু গো—রাণী রাসমণির জামাই, কি ভালোই না আমায় বাসতো। তা এই পয়লা শ্রাবণ সজ্ঞানে দিব্যধামে চলে গেল।

হৃদয় মাদুর পাতিয়া দিল

হৃদয়॥ আমি যাই, মুখুজ্যে মশায়ের আদর আপ্যায়ন করে আসি।

হৃদয়ের প্রস্থান

রামকৃষ্ণ॥ কি গো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।

সারদা অগ্রসর হইয়া রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে গেলেন

আমায় তো প্রণাম করছো। মন্দিরে গিয়ে ভবতারিণী মাকে প্রণাম করেছ? নহবৎখানায় গিয়ে আমার চন্দ্রমণি মাকে প্রণাম করেছ?

সারদা॥ এইবার যাবো।

ঠাকুরের পায়ে মাথা রাখিয়া সারদা প্রণাম করিলেন। সারদার জ্বর-সন্তপ্ত কপাল স্পর্শে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—

রামকৃষ্ণ॥ আরে, তোমার কপালটা যে আগুনের মত গরম। জ্বর হয়েছে নাকি?

সারদা॥ পথে জ্বরে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলুম। আর দেখা হবে ভাবিনি। জ্বরের ঘোরে দেখলুম, একটি কালো মেয়ে—আহা কি তার রূপ—আমার মাথায় হাত বুলিয়ে গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে দিলে।

রামকৃষ্ণ॥ বটে! তা ঐ বেটিই তোমাকে টেনে এনেছে। তা বেশ করেছে। কিন্তু এখন ঠ্যালা সামলায় কে?

হৃদয়ের পুনঃ প্রবেশ

হৃদয়॥ কি আবার ঠ্যালা?

রামকৃষ্ণ॥ ও হৃদু। ন্যাখ দেখি গায়ে জ্বর। ঠাণ্ডা লেগে এখনি হু হু করে বেড়ে যাবে। আমার এই ঘরেই আর একটা বিছানা করে দে, কোবরেজকেও ডাকতে হবে। আর ন্যাখ, একটু সাবু বার্লি, তাও ভুলিস নি হৃদু।

সারদা॥ আমি বরং নহবতে মার কাছে যাই।

রামকৃষ্ণ॥ ওরে হৃদে, নহবতে যেতে চাইছে। ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধে হবে—এ ঘরেই থাক। ঐ ছোট খাট্‌টায় একটা বিছানা করে দিস্। হ্যাঁরে হৃদে—কব্‌রেজকে একবার খবর দিতে পারিস—

হৃদয় যাইতে উদ্যত

আচ্ছা থাক, এত রাতে থাক। তুই বরং একটু জলপটি···

হৃদয় যাইতেছিল

আচ্ছা সে হবে'খন। ভাঁড়ার বন্ধ হয়ে যাবে। তুই বরং আগে একটু সাবু বার্লির চেষ্টা দেখ্।

হৃদয় গেল না

দাঁড়িয়ে আছিস্ যে? যা।

হৃদয়॥ আর যদি কিছু থাকে তো একেবারে বলো মামা।

রামকৃষ্ণ॥ আগে তো এই হোক, তারপর দেখা যাবে—তুই যা।

হৃদয় চলিয়া গেল

সারদা॥ না, না, আমার জন্যে তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন?

রামকৃষ্ণ॥ কেন গো? তুমি কি আমার পর? তুমি কি আমার ফেলনা?

সারদা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল

সে কি গো? তুমি কাঁদছ কেনে গো?

সারদা॥ সবাই বলেছিল—তুমি আমাকে ভুলে গেছ। আরও কত কি বলেছিল।

এবার চোখে আসিল আনন্দাশ্রু

রামকৃষ্ণ॥ তুমি তাই বিশ্বাস করেছিলে? অগ্নিসাক্ষী করে তোমাকে আমি অর্দ্ধাঙ্গিনী করে নিয়েছি, তোমাকে নিয়েই না আজ আমি গো। এ কি তুমি কাঁপছ যে! এসো, বসো।

তাহাকে ধরিয়া ঠাকুরের খাটে বসাইলেন

ওরে হৃদে, কোথায় গেলি তুই?

প্রকাণ্ড এক ধামা মুড়ি লইয়া ছুটিয়া হৃদয়ের প্রবেশ

হৃদয়॥ এই যে মামা, ভাঁড়ার বন্ধ। দুধ-সাবু কাল হবে। আজ এই ক'টি মুড়ি এনেছি মামীর জন্যে।

তৃতীয় দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বরে নহবতখানা। রামকৃষ্ণ-জননী গঙ্গা-স্নানে যাইতেছিলেন

চন্দ্রমণি॥ বৌমা, ও বৌমা…

সারদা॥ (নেপথ্যে) দুধের কড়াটা নামিয়ে আসছি মা।

চন্দ্রমণি॥ আসতে হবে না মা, আমি গঙ্গায় ডুবটা দিয়ে আসছি।

রামকৃষ্ণের প্রবেশ

এই যে গদাধর, আয় বাবা আয়। ছাখ এসে—নহবৎখানার ওপরের ঐটুকু ঘরে একদিনের ভেতর বৌমা আমার কেমন সংসার সাজিয়েছে! যত বলি জ্বর থেকে উঠেছো, ও শরীরে অত সইবে না, তা শুনছে কে?

রামকৃষ্ণ॥ কিন্তু তার আগে বল দেখি মা, নহবৎখানার এই ঘরে ঢুকতে ওর চৌকাঠে ক'বার মাথা ঠুকেছে?

চন্দ্রমণি॥ (হাসিয়া) সে ঠুকবে তোর। বৌমা আমার হিসেবী আছে রে। ছাখ না একদিনেই কেমন গোছগাছ করেছে। আমাকে রাঁধতেও দিলে না।

রামকৃষ্ণ॥ ইঃ, বৌয়ের হাতে সেবাযত্ন পেয়ে তোমার মুখখানি চিকমিক করছে যে! আনন্দ আর ধরে না দেখছি।

চন্দ্রমণি॥ মন তো এসব চায়। কিন্তু হবে কি? তুই বোস্, আমি গঙ্গায় ডুবটা দিয়ে আসি।

একটি ভিখারীর প্রবেশ

ভিখারী॥ এই যে মা, গঙ্গা নাইতে চললে?

চন্দ্রমণি॥ হ্যাঁ বাবা, বসো। গানটান গাও। বৌমা আমার ভিক্ষে দেবে এখন। আমি ডুবটা দিয়ে আসি।

চন্দ্রমণির প্রস্থান

ভিখারী॥ 'ডুব দেরে মন কালী বলে'—ঠাকুর, তোমার গাওয়া এ রামপ্রসাদী গানটা আমি লিখে নিয়েছি। গাইছি।

খঞ্জনী বাজাইয়া গান শুরু করিল

'ডুব দে রে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকর জলে।'

গানের মধ্যে দেখা গেল দরজার আড়ালে ভিক্ষা লইয়া সারদা দাঁড়াইয়া আছেন। গান শেষ হইতেই অবগুণ্ঠিতা সারদা অগ্রসর হইয়া ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে আসিলেন

ভিখারী॥ এ যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মা গো।

প্রণাম করিয়া ভিক্ষা লইতে লইতে

এই কৈলাসপুরী ছেড়ে আবার বাপের বাড়ী পালিয়ো না। তুমি মা ছিলে না, তাই পাগলা বাবা আমার শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান। বাঁধ মা, বাবাকে আমার বাঁধ।

ভিখারীর প্রস্থান

সারদা গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর চমকিয়া উঠিলেন

রামকৃষ্ণ॥ এঁ্যা—তুমি আমায় বাঁধবে নাকি গো?

সারদা॥ সে কি! বাঁধব কেন?

রামকৃষ্ণ॥ তা একদিনেই যে রকম জাঁকিয়ে বসেছ···

সারদা॥ জান তো—বসতে পেলেই শুতে চায়।

রামকৃষ্ণ॥ (ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন) বলো কি গো! তুমি কি আমাকে সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ?

সারদা॥ না, না, আমি তোমাকে সংসার-পথে কেন টানতে যাব? আমি যে তোমার সহধর্মিণী গো। তোমার ধর্মই আমার ধর্ম। তুমি যা চাও—আমিও তাই চাই। তুমি যা চাও না—আমিও তা চাই না।

রামকৃষ্ণ॥ তবে কি তাই তুমি এসেছ?

সারদা। হাঁ গো। তোমার ইষ্টপথে সাহায্য করতেই আমি এসেছি। তাও বলি—তুমি যদি বলো থাকো—তবেই থাকব। তুমি যদি বলো—না—আমি থাকব না।

রামকৃষ্ণ॥ (উৎফুল্ল হইয়া) সহধর্মিণীর কথাই বলেছ! সহধর্মিণী যখন—কেন থাকবে না? একশ'বার থাকবে—লাখোবার থাকবে। আমি গিয়ে এখনি শ্বশুরমশায়কে বলে দিচ্ছি—আপনি মশায় আসুন, ইনি মশায় যাবেন না।

রামকৃষ্ণ দুই পা যাইতেই সারদার পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ

রামকৃষ্ণ॥ এই যে, মেঘ না চাইতেই জল।

রামচন্দ্র॥ সে কি বাবা গদাধর!

রামকৃষ্ণ॥ আপনার কাছেই ছুটছিলুম। তা আপনি এসে গেছেন। ভালই হয়েছে। ইনি মশায় যাবেন না। আপনি মশায় আসুন।

রামচন্দ্র॥ আমিও তো বাবা, তাই চেয়েছিলুম। তোমার কথা শুনে বড় আনন্দ হলো বাবা। সুখে স্বচ্ছন্দে তোমরা ঘর-সংসার করো, এই আশীর্বাদই করি।

রামকৃষ্ণ॥ ঘরই নেই তো ঘর-সংসার। এ যা দেখছেন, এসবই মা ভবতারিণীর। তা সে বেটিও কম নয়। কী পরীক্ষায় ফেলেছিল—জানেন না তো, বসুন।

সারদা একটি আসন আনিয়া দিল। রাম মুখোপাধ্যায় বসিলেন

না গো—তুমিও শুনে যাও। তোমারও শোনা দরকার। এবার আমি আমার চন্দ্রমণি মা'র কথা বলছি।···ঐ যে সেই মথুরবাবু—রাণী রাসমণির জামাই—কী ভালই না আমায় বাসতো! কোন কালে আমার ভরণপোষণের কোন কষ্ট না হয়—শালার সব সময় সেই চেষ্টা। আমার কাছে তাড়া খেয়ে কেবলই পালিয়ে যায়। কিন্তু শালার ভারী কূট বুদ্ধি! শেষটায় ধরে পড়লো আমার বুড়ী মাকে। ইনিয়ে—বিনিয়ে একথা সে কথা ব'লে—বলে কিনা, আমার অভাবে তোমরা মায়েপোয়ে কষ্ট না পাও তাই তোমার কাছে এসেছি দিদিমা। তোমার কি অভাব আছে, আমায় বলো দিদিমা। আমি তোমাদের সব দিচ্ছি।

রামচন্দ্র॥ তাতো ঠিকই। জোতজমি, ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি তিনি কী না দিতে পারতেন। তা বেয়ান-ঠাকরুণ কি চাইলেন?

গঙ্গাস্নানান্তে চন্দ্রমণির প্রবেশ

রামকৃষ্ণ॥ বলো মা—তোমার বেয়াই মশাইকে বলো।—সেজবাবুর কাছে তুমি কী চেয়েছিলে?

চন্দ্রমণি॥ যা চেয়েছিলুম—তা দিলে কই? কেবলই বলে—কি তোমার অভাব? অভাব যে কি—আমি তো ভেবে পাই না। ভেবেচিন্তে দেখলুম—মুখে দেবার গুল নেই। বললুম—এক আনার দোক্তা-তামাক আনিয়ে দাও। তা এই কথায় কিনা মথুরের চোখে জল এলো।

রামচন্দ্র॥ আমার চোখেও জল আসছে বেয়ান। এমন মা না হ'লে কি এমন ছেলে হয়! সারু, মা! তোকে এই ধর্মের সংসারে রেখে মহা আনন্দে আজ আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি মা। গিয়ে তোর গর্ভধারিণীকে বলছি আমি আমার মা উমাকে কৈলাসে রেখে এলুম, কৈলাসে রেখে এলুম।

চতুর্থ দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কক্ষ। রামকৃষ্ণ এক জোড়া ডায়মণ্ড-কাটা বালা দেখিতেছেন। পাশে সারদা দাঁড়াইয়া আছেন। হৃদয় রামকৃষ্ণের কাপড় কোঁচাইতেছে

রামকৃষ্ণ॥ (সারদার প্রতি) তোমাকে যখন বিয়ে করে নিয়ে এলুম কামারপুকুরে, লাহাবাবুদের বাড়া থেকে খান কতক গয়না ধার করে আনলেন মা। তাই দিয়ে বৌ-পরিচয় করালেন তিনি। তোমার মনে পড়ে গো?

সারদা॥ (ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—'না'।)

সাবিত্রী চ্যাটার্জী

হৃদয়॥ মামী তখন আমার সাত বছরের খুকী: মামীর মনে থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমার মনে আছে। জানো মামী—তোমার সেই ধার-করা গয়নাগুলো তোমার গা থেকে চুরি করে খুলে নিয়েছিলেন—ঐ আজ যিনি এত বড় ধর্মাবতার। ঘুম থেকে জেগে উঠে যখন তুমি দেখলে গায়ে গয়না নেই, তখন তোমার সে কি কান্না মামী! কুলের আচার, তেঁতুলের আচার এসব দিয়েও আমরা তোমাকে ঠাণ্ডা করতে পারিনি বাপু। ঠাণ্ডা হলে কখন জানো? যখন আমার দিদিমা, তোমার ঐ শাশুড়ী বুড়ী তোমায় কোলে নিয়ে বললেন—'আমার গদাই তোমাকে এর চেয়ে ঢের ভালো গয়না গড়িয়ে দেবে।'

রামকৃষ্ণ। তুমি এখানে আসার পর থেকে মা'র সেই কথাটা বড্ড বেশি মনে পড়ছিল আমার। পূজুরী বামুন আমি, যা দু'পয়সা জমেছিল। বাক্স খুলে হৃদুকে নিতে বলেছিলুম, তোমাকে একজোড়া ডায়মনকাটা বালা গড়ে দিতে। বের করে দে হৃদে—

হৃদয় বাক্স খুলিয়া ডায়মণ্ডকাটা বালাজোড়া
রামকৃষ্ণের হাতে আনিয়া দিল

এসো গো—পরিয়ে দিই। মাতৃসত্য পালন হোক্।

সারদা কাছে আসিয়া বসিলেন। রামকৃষ্ণ বালাজোড়া হাতে
লইয়া, বালা পরাইতে পরাইতে

এর নাম নাকি ডায়মনকাটা বালা!—পঞ্চবটীতে বসে সেদিন রামসীতার ধ্যান করছিলুম। ধ্যানে দেখলুম—সীতার হাতে এই বালা। মন বল্‌লে 'যে সীতা সেই সারদা।' যেটুকু বাদ ছিল সেটা আজ পূরণ করছি।

হৃদয়॥ তুমি যে কি বলো মামা! শুনলেও পাপ হয়।

হৃদয়ের প্রস্থান

সারদা॥ তুমি অমন করে বলো না।

রামকৃষ্ণ॥ কেনে গো? বলব না কেনে? ছাইচাপা আগুন তো। লোকে অশুদ্ধ মনে দেখবে বলে এবার রূপ ঢেকে আসা—তাই নয় গো?

সারদা॥ রাত হয়েছে, তুমি শোও। আমি তোমার গায়ে—মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই।

রামকৃষ্ণ॥ না, না, এখনি শোব কি গো! বরং তুমি শুয়ে পড়ো। হ্যাঁ, ভাল কথা—দেখ সারদামণি, রাতে যখনই আমি জেগে উঠি—দেখি তুমিও জেগে রয়েছ। এক একদিন মনে হয়—যেন তুমি কাঁদছিলে। কেন বলোতো?

সারদা॥ রোজ রাতে শুতে এসে দেখি তোমার ভাব-সমাধি হয়। এক একদিন অল্পতেই জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু এক-একদিন এমন হয় যে, আমি ভারি ভয় পাই। ভয়ে রাতে আমার ঘুম হয় না।

রামকৃষ্ণ॥ বটে! তাই তো! এই ক'মাস তুমি সারারাত জেগে কাটিয়েছ? ত্যাখো সারদামণি, তুমি যদি এই ভাবে সারা-রাত জেগে বসে থাক, তবে নহবতখানায় মা'র কাছে তোমার শোবার ব্যবস্থা করি—কি বল?

সারদা॥ আমি কি বলবো, তোমার যা ইচ্ছে।

রামকৃষ্ণ॥ রাত হয়েছে। একা যেতে পারবে?

সারদা॥ (দরজার কাছে গিয়া) কেন পারব না! (হাসিয়া) আকাশে চাঁদা-মামা পাহারা দিচ্ছেন।

রামকৃষ্ণ॥ শোন সারদামণি, শোন। কাছে এসো।

সারদামণি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন

রামকৃষ্ণ॥ (সারদাকে সস্নেহে বিছানায় বসাইয়া) বড় সুন্দর কথাটি তুমি বলেছ সারদামণি—"চাঁদা-মামা পাহারা দিচ্ছেন।" চাঁদা-মামা যেমন সকলের মামা—তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে, যে ডাকবে তিনি তাকেই দর্শন দানে কৃতার্থ করবেন, তুমি ডাকো তো তুমিও তাঁর দেখা পাবে।

সারদা॥ ডাকবো। তোমার মতন যাতে ডাকতে পারি—তুমি আমায় শিখিয়ে দিও।

রামকৃষ্ণ॥ ওদেশে দেখিছি, সব চিঁড়ে কোটে; একজন স্ত্রীলোক এক হাতে ঢেঁকির গড়ের ভেতর হাত দিয়ে নাড়ছে, আর এক হাতে ছেলে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াচ্ছে। ওর ভেতর আবার খদ্দের আস্‌ছে, তার সঙ্গে হিসেব কয়ছে—'তোমার কাছে ওদিনের এত পাওনা আছে, আজকের এত দাম হ'ল।' এই রকম সে সব কাজ কয়ছে বটে, কিন্তু তার মন সর্বক্ষণ ঢেঁকির মুষলের দিকে আছে; সে জানে যে, ঢেঁকিটি হাতে পড়ে গেলে হাতটি জন্মের মত যাবে। সেই রকম সংসারে থেকে সকল

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কুঁড়ির আশা

ফটো : কনক দত্ত

কাজ কর; কিন্তু মন রেখো তাঁর প্রতি। তাঁকে ছাড়লে সব অনর্থ ঘটবে। এই দেখ, তোমার সঙ্গে কথায় কথায় কত রাত হয়ে গেলো!

সারদা॥ তোমার শোবার সময় হয়েছে।

রামকৃষ্ণ॥ কিন্তু আমার ঘুম পাচ্ছে না।

সারদা॥ তুমি শোও, আমি তোমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

রামকৃষ্ণ॥ তা মন্দ বলো নি।

রামকৃষ্ণ শুইলেন। সারদা তাঁহার পা টিপিতে লাগিলেন

সারদা॥ আচ্ছা, আমাকে তোমার কি মনে হয়?

রামকৃষ্ণ॥ যে-মা মন্দিরে রয়েছেন, তিনি এই দেহকে জন্ম দিয়েছেন। হাঁগো—এখন নহবৎখানায় বাস করছেন। আবার তিনিই এই মুহূর্ত্তে আমার পদসেবা করছেন। সবই সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ।

কক্ষ অন্ধকার হইয়া গেল। পরে যখন আলো জ্বলিয়া উঠিল—তখন দেখা গেল শয্যায় নিদ্রিতা সারদামণি, পার্শে দণ্ডায়মান রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ॥ মন—এরই নাম স্ত্রী-শরীর। লোকে একে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু ব'লে জানে—ভোগ করবার জন্যে সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু একে গ্রহণ করলে দেহেই আবদ্ধ থাকতে হয়, সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মন, ভাবের ঘরে চুরি করো না, পেটে একখানা মুখে একখানা রেখো না। সত্যি বলো, তুমি এ চাও, না ঈশ্বরকে চাও। যদি এ-ই চাও, তো এই তোমার সুমুখে রয়েছে, নাও!

এই রূপবিচারপূর্বক রামকৃষ্ণ সারদামণির অঙ্গস্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন কুণ্ঠিত হইয়া সহসা সমাধিপথে বিলীন হইয়া গেল। কক্ষ পুনরায় অন্ধকার হইয়া গেল। এবার যখন আলোকিত হইল তখন ১২৮০, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রি। দেখা গেলো অর্ধ-বাহ্যদশাপ্রাপ্তা, মন্ত্রমুগ্ধা সারদামণি আলিম্পনভূষিত পীঠাসনে রামকৃষ্ণের দক্ষিণ ভাগে উত্তরাস্যা হইয়া উপবিষ্টা। রামকৃষ্ণ সারদামণিকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন।

রামকৃষ্ণ॥ হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরি মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, এঁর শরীর মনকে পবিত্র ক'রে এঁর মধ্যে আবির্ভূতা হ'য়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর।

প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। তিনিও অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া আপনার সহিত সাধনার ফল ও জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব সারদা দেবীর পাদপদ্মে বিসর্জনপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম।

রামকৃষ্ণ সারদাকে প্রণাম করিলেন। সারদা তাহা গ্রহণ করিলেন—প্রতি প্রণাম করিলেন না।

বিরাম (ক্রমশঃ)

গান

শ্রীরাধাকিশোর পাল এম-এ

(তুমি) ভুলে যাবে মোরে জানি,
তবু জানাবো না অভিমান,
পারো যদি মনে রেখো
আমি রেখে গেনু যেই গান।
রচিব তোমারে নতুন করিয়া,
গানে গানে সুরে রাখিব ধরিয়া,:
বাঁধিব তোমারে কল্পনা-হারে
রাখিব ভরিয়া প্রাণ।

যত দূরে থাকো কল্পনা মোর
তোমারে আনিবে কাছে,
প্রেম দিয়ে তোমা নাহি পাই যদি
স্বপন আমার আছে।
সেথায় ত কিছু—নাহি বাধা নাই,
স্বপনের মাঝে নিতি যেন পাই,
স্বপন-চারিণী—স্বপনে-গোপনে
দিও মোরে তব দান।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সংহিতা ও উপনিষৎ যুগের মধ্যবর্ত্তী "ব্রাহ্মণ" যুগ

বেদের "ব্রাহ্মণ"ভাগ সংহিতার পরবর্ত্তী। এই ভাগে যাগযজ্ঞের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং শতপথ ব্রাহ্মণ "ব্রাহ্মণ"দিগের মধ্যে প্রধান। ঋকবেদের পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের কথা আছে। ব্রাহ্মণযুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাগযজ্ঞের গুরুত্বও বর্দ্ধিত হয়। বেদের সনাতনত্ব কীর্ত্তিত হয়।

সংহিতাযুগে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজেই তাঁহার পুরোহিত ছিলেন, স্বতন্ত্র পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি হয় নাই। ঋকমন্ত্রগুলি যখন রচিত হয় তখনও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। সে যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থ নিজেই সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু যজ্ঞের জটিলতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং নানা বিধি উদ্‌ভাবিত হয়। এই সকল বিধি অধিগত করিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হইল এবং একজনের পক্ষে বিধি অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। প্রত্যেক যজ্ঞে অন্ততঃ চারিজন পুরোহিতের প্রয়োজন উপলব্ধ হইল। ইহার ফলেই পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণভাগে কয়েকটি নূতন দেবতার নাম পাওয়া যায় এবং প্রাচীন দেবতাদিগের মধ্যে কাহার কাহারও স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়। ঋকবেদে রুদ্র দেবতার প্রকৃতি ছিল ভীষণ। কিন্তু "ব্রাহ্মণে" তাঁহার মঙ্গলময় রূপ প্রকটিত হয়। যজুর্ব্বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে তাঁহাকেই "যজ্ঞ" বলা হয়। এই ব্রাহ্মণে নারায়ণের উল্লেখও আছে, কিন্তু বিষ্ণুর সহিত তাঁহার অভিন্নতা ব্যক্ত হয় নাই। ঋক্‌বেদের প্রজাপতি "ব্রাহ্মণে" জগতের স্রষ্টা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ঋক্‌বেদে ঋক্‌মন্ত্র অথবা স্তোত্রকেই "ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। "ব্রাহ্মণে" ব্রহ্মশব্দ জগতের সৃষ্টি-শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণ"ভাগে মন্ত্রশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র যথাযথ উচ্চারিত হইলে তাহার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ফলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা অমর হইয়াছিলেন। যজ্ঞ করিয়া অমর হইবার আকাঙ্ক্ষাতেই এবং পার্থিব সম্পৎ লাভের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। বিশ্ব-জগৎ যজ্ঞ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হইলে সূর্য্য উদিত হইবে না। একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ইন্দ্রকেও স্বর্গরাজ্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারা যায়। দেবগণ যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া অভিলষিত ফল প্রদান করেন। পূর্ব্বে যজ্ঞ উপাসনার একটি অঙ্গমাত্র ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণযুগে যজ্ঞই প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে সমাজে পুরোহিতদিগের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি হয় এবং পৌরোহিত্য বংশানু ক্রমিক বৃত্তিতে পরিণত হয়। যজমান যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপকরণ সরবরাহ করিতেন। অবশিষ্ট যাহা কিছু তাহা পুরোহিতগণ করিতেন। পুরোহিতগণ দেবতার সম্মান দাবি করিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে "দুই প্রকারের দেবতা আছেন—দেবতারা তো দেবতাই বটেন, যাহারা বেদবিৎ ও বেদ-শিক্ষা দেন, তাঁহারাও দেবতা"*

কিন্তু পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদা বৃদ্ধির প্রধান কারণ বৈদিক সাহিত্যের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। ব্রাহ্মণদিগের উপর এই ভার ন্যস্ত ছিল! তাঁহারা সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। এই জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বহুদিন ধরিয়া ব্রাহ্মণ সন্তানকে বেদবিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইত। পার্থিব সুখসম্পদের দ্বার তাহাদের নিকট রুদ্ধ ছিল। এই কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণগণ যে সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণযুগে বেদের সনাতনত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব বিনা প্রতিবাদে স্বীকৃত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে ইহা অস্বীকৃত হয় এবং দর্শনশাস্ত্র আস্তিক ও নাস্তিক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু "ব্রাহ্মণ"যুগে কেহই ইহা অস্বীকার করে নাই। বেদের অপৌরুষেয়ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্রকারগণ দিয়াছেন। বৈদিক ঋষিগণ আপনাদিগকে সত্যের দ্রষ্টা বলিতেন, বৈদিক মন্ত্রসকল তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল এবং তাঁহারা মানস চক্ষুতে তাহাদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন, বলিতেন। যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে তাঁহারা বেদের সত্য লাভ করেন নাই। এই অর্থেই তাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলিতেন। অপ্রাকৃত কিছু ইহার মধ্যে আছে বলিতেন না। ব্রাহ্মণযুগে বেদের প্রতি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয় এবং বেদ অভ্রান্ত ও পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়। শতপথব্রাহ্মণে (এবং পুরুষসূক্তে) বেদকে স্বয়ম্ভু হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় নির্গত বলা হইয়াছে। ঈশ্বরই বেদ ঋষিদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, এই মত ও পরে ব্যক্ত হইয়াছিল। বেদ সম্বন্ধে এই ধারণা দ্বারা ভারতীয় দর্শন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। বেদের সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য বেদ বচনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল।

"ব্রাহ্মণে" চরিত্র-নীতি

ব্রাহ্মণে গৃহস্থের কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অতি উন্নত নৈতিকবোধের পরিচায়ক। প্রত্যেক মানুষেরই ঋষি, দেবতা, ভূত, মনুষ্য ও পিতৃগণের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। এই কর্ত্তব্য ঋণ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ঋণ পরিশোধ করিয়াই মানুষ জগতের সহিত

---

* Dr. Radha Krishnan's Indian Philosophy. vol I, p. 126.

শান্তিরক্ষা করিয়া বাস করিতে সমর্থ হয়। বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষি ঋণ, যজ্ঞ দ্বারা দেব ঋণ, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃ ঋণ, এবং জীবে দয়া দ্বারা মনুষ্য ও ভূত ঋণের পরিশোধ হয়। মানুষের অধিকারের দিকে "ব্রাহ্মণে"র ঋষিদিগের ততটা দৃষ্টি ছিল না, যতটা ছিল তাহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের দিকে। সত্যকে তাঁহারা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্যাগ তাঁহাদের মতে পরম ধর্ম্ম। শতপথ ব্রাহ্মণে সর্ব্বমেধযজ্ঞে সর্ব্বস্ব ত্যাগের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। কেবল যাগযজ্ঞ ধর্ম্ম নহে। সৎকর্ম্ম এবং উপাসনাই ধর্ম্ম। পরদার-গমন ভয়ানক পাপ এবং পাপের স্বীকার পাপক্ষয়ের একটি উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সত্য, পবিত্রতা, পিতৃমাতৃভক্তি, জীবে দয়া, চৌর্য্য, নরহত্যা এবং পরদারগমন হইতে নিবৃত্তি ধর্ম্মজীবনের জন্য অপরিহার্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যজ্ঞে পশুবধের বিধি থাকিলেও, অন্যত্র জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ ঋষিদিগের নৈতিকবোধের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক কর্ম্মেরই শুভ অথবা অশুভ ফল আছে। ইহজন্মে সে ফলভোগ না হইলে জন্মান্তরের ভোগ করিতে হইবে। অধ্যাপক ডয়সেন বলেন ঋকবেদ সংহিতায় জন্মান্তরবাদের কোনও পরিচয়প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ঋকবেদ সংহিতায় জন্মান্তরবাদের ইঙ্গিত আছে। ঋক্‌বেদের ৪।২৭।১ মন্ত্রে আছে, বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে বলিয়াছিলেন—"এই সকল দেবতার সমস্ত জন্ম আমি জানিয়াছি।" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "জন্মান্তরীণ সংস্কারশুদ্ধির ফলে বামদেব এইরূপ বলিয়াছিলেন।" উক্ত বেদের ৪।২৬।১ শ্লোকে আছে "আমি মনু হইয়াছি,"। ঋষি পূর্ব্বজন্মে মনু হইয়াছিলেন, ইহাই ইহার অর্থ। শতপথব্রাহ্মণে জন্মান্তরবাদ স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ যে বেদের সময় হইতে প্রচলিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋকবেদ সংহিতা যজ্ঞে যে সকল মন্ত্রের ব্যবহার হইত, তাহাদেরই সংকলন মাত্র, ঋষিদিগের অধ্যাত্ম জ্ঞান বিজ্ঞানের সংকলন নহে। আরণ্যক ও উপনিষৎ অংশে তাহাদের অনেক তত্ত্ব উপদেশ সংকলিত হইয়াছিল। *

পাপের শাস্তি অনন্ত-নরক-বাস এবং পুণ্যের পুরস্কার অনন্ত স্বর্গবাস নহে। পাপ ও পুণ্যের ফল, শাস্তি ও পুরস্কার, উভয়ই জন্মজন্মান্তরের ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই জন্ম-মৃত্যু-চক্র হইতে মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। আত্মার সত্যজ্ঞান দ্বারা এই মুক্তি লাভ হয়।

মহাকাব্যের যুগ

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সাধারণতঃ চারি যুগে বিভক্ত—বৈদিক যুগ, মহাকাব্যের যুগ, বৌদ্ধ যুগ ও পৌরাণিক যুগ। দর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে বৈদিক যুগ তিনভাগে বিভক্ত—সংহিতা যুগ, ব্রাহ্মণ যুগ এবং আরণ্যক-উপনিষদ যুগ। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষভাগে দার্শনিক চিন্তা যে কেবল উপনিষদের খাতেই প্রবাহিত ছিল, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। উপনিষদদিগের মধ্যেই অন্যবিধ চিন্তার অস্তিত্বের পরিচয়-প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রাচীনতম উপনিষদদিগের অন্যতম। তাহার প্রজাপতি ও ইন্দ্রাবিরোচন সংবাদে আসুরী উপনিষদের বর্ণনা আছে। এই উপনিষদ্ অনুসারে দেহের পূজা ও পরিচর্য্যাই ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভের উপায়। কঠোপনিষদে যাহারা কেবল ইহলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং পরলোক মানে না, তাহাদের কথা আছে। (২।৬)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রথমেই নানাবিধ মতের উল্লেখ আছে। কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা অথবা পঞ্চভূত ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি কারণ, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।। বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত ব্রহ্মজাল সূক্তে ৬২ প্রকার দার্শনিক মতের উল্লেখ আছে। বুদ্ধ নিজে এই সকল মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধের আবির্ভাবকালে এই সকল মত প্রচলিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী বুদ্ধের আবির্ভাব কাল। ম্যাক্‌স্ মূলারের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৭০০ বৎসর হইতে উপনিষদ যুগের আরম্ভ। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন—আর্য্যগণ যখন গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসতি স্থাপন করিতেছিলেন, তখনই মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়—এই সময়েই চতুর্ব্বেদের মন্ত্রগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংকলিত হয়। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই সংকলন কার্য্য সম্পাদন করেন বলিয়া কথিত আছে। এই জন্যই তাহার নাম বেদব্যাস। দুর্যোধনের পিতা ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া মহাভারতে লিখিত হইয়াছে। এই ব্যাসই আবার মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও মহাভারতের রচনার মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান অসম্ভব। কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার কৃষ্ণচরিত্রে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৩০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। তাহা হইলে ঐ শতাব্দীতেই—খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে—মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলিতে হয়। এই মতের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের মিল নাই। এই মত সত্য হইলে বৈদিক যুগকে মহাকাব্যের যুগের (খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর) কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হয়। সে যাহা হউক মহাকাব্যের যুগ যে বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই যুগে যে উপনিষদ দর্শন ব্যতীত আরও বহু দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল, তাহাও নিশ্চিত। কিন্তু এই সকল দার্শনিক মত তখন মুখেমুখেই চলিত ছিল, লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইহাদের মধ্যে প্রধান মতগুলি পরে সূত্রাকারে রক্ষিত হয়।

সেই অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তার এতাদৃশ প্রবৃদ্ধির কারণ কি? আর্য্যদিগের মধ্যে জগৎ-তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য এই ঐকান্তিক আগ্রহ, মৃত্যুর যবনিকা-ভেদ-প্রয়াসী পরলোক-সম্বন্ধে এই কৌতুহলের মূল কোথায়? তখন দেশের অবস্থা কি এরূপ ছিল, যে

* হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উপনিষৎ—জড় ও জীবতত্ত্ব—৪২৪-৪২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লোকে ইহলোকে সুখলাভে হতাশ হইয়া অন্যত্র সুখের কল্পনায় মগ্ন ছিল? গৌতমবুদ্ধ মানবজীবনকে দুঃখের আগার গণ্য করিয়া দুঃখ বলতে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহার কি কোনও নৈসর্গিক অথবা সামাজিক কারণ ছিল? ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ লিখিয়াছেন —এই যুগে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক সংকটে লোকের মন স্থৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিল। ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ ও বহিরাগত শত্রুর আক্রমণে দেশের শান্তি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। লোকের লোভ ও রাজাদিগের ইন্দ্রিয়লালসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ধনীদিগের সম্বন্ধে একটি বৌদ্ধসূত্রে আছে "মূর্খতার বশে তাহারা যে সকল সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার কিছুই তাহারা কাহাকেও দেয় না। তাহারা অনবরত অর্থ সঞ্চয়ই করিতেছে। যে রাজার রাজ্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহারও সমুদ্রপারের দেশের প্রতি লোভ। এইরূপ রাজ্য ও অতৃপ্তকাম অন্যান্য সকল লোকই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। তাহাদের আত্মীয় বা বন্ধু কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ তাহাদের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়; আর তাহারা প্রাপ্ত হয় তাহাদের কর্ম্মের ফল। স্ত্রী, পুত্র, ধন, রাজ্য, সম্পদ কিছুই মৃতের সঙ্গে যায় না।" "জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি, রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যর্থতার বোধ, সংসারে সুখ-লাভে নৈরাশ্য এবং মানুষের উপর বিশ্বাসের অভাববশতঃ অনেকের দৃষ্টি তাহাদের অন্তরস্থ আত্মার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ লোকেরও অভাব ছিল না, যাঁহার নিষ্পাপ জীবনের অনুসরণে এই নশ্বর অপূর্ণ জীবনকে তুচ্ছ করিয়া দূরবর্ত্তী এমন এক কাল্পনিক লোকপ্রাপ্তির জন্য প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, যাহা অবিনশ্বর, সর্ব্বকালেই একরূপ, যেখানে পাপ নাই, যাহার ক্ষয় নাই। অধিকাংশ লোকই ক্লান্তি, ঘৃণা এবং নৈরাশ্যে জীবনের প্রতি বিমুখ হইয়াছিল। ভবিষ্যতের আশা তাহাদিগকে বর্ত্তমানের প্রলোভন হইতে মুক্ত করিয়াছিল। লোকে মুক্তিলাভের সহজ পন্থার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সংসার-সংগ্রামে পরাজয়ের গভীর অনুভূতি হইতে এই যুগের কর্ম্ম প্রেরণা উদ্ভূত হইয়াছিল। জগতের মূলে এক নৈতিক ব্যবস্থা আছে, নৈতিক নিয়মদ্বারা জগৎ শাসিত, এই বিশ্বাস এবং ন্যায়বান ও দয়ালু ঈশ্বরে বিশ্বাস স্বভাবতঃই পরস্পরের সহযোগী। কিন্তু যখন সকলেই জীবনকে দুঃখময় বলিয়া গণ্য করে অথবা জীবনের মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয় তখন এই বিশ্বাসে স্থির থাকা সহজ হয় না। এই যুগে বহু শতাব্দীর বিশ্বাস স্বপ্নের মত শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছিল। শাস্ত্রের মর্য্যাদা হ্রাস প্রাপ্ত এবং ঐতিহ্যের বন্ধন শিথিল হইয়াছিল। বিশ্বাসের বিলুপ্তির ফলে যে চিন্তার বিপ্লব উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা এবং মানবচিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণার ফলে বহুসংখ্যক দার্শনিক কল্পনা এবং বৃথা গবেষণার উদ্ভব হইয়াছিল। নৈতিক দুর্বলতার বোধপীড়িত যুগের লোকে আধ্যাত্মিক যে কোনও অবলম্বন গ্রহণ করিতে ব্যাকুল হয়। এই জন্যই প্রত্যক্ষ জগতের উপর নির্ভরশীল জড়বাদীদিগের পার্শ্বে মনস্তাত্ত্বিক এবং নীতিবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের উদ্ভব হইয়াছিল। জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় আকুল আগ্রহে বেদাবলম্বী লোকের অভাব না থাকিলেও, সংস্কার-পন্থিগণ মৃত্যুর পর কি হইবে, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া পবিত্র জীবন যাপন এবং পরের মঙ্গল সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন।" *

ডাঃ রাধাকৃষ্ণের এই বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। নূতন যে সকল দর্শনের উদ্ভবের কথা ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন, তাহাদের বীজ এই যুগের পূর্ব্বেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। জড়বাদ যে উপনিষদ যুগেও ছিল, উপনিষদের তাহার প্রমাণের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈদিক যাগযজ্ঞ বিরোধী হইলেও উপনিষদ হইতে ভিন্ন কোনও নূতন ধর্ম্ম প্রচার করে নাই, ইহাই অনেক পণ্ডিতের মত। বৌদ্ধ নির্ব্বাণ এবং বেদান্তের মুক্তিকে অনেকে অভিন্ন বলিয়াই গণ্য করেন। দেশ তখন খণ্ডখণ্ড বহুরাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই সকল রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটনও বিরল ছিল না, ইহা সত্য। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে পৃথিবীর সকল দেশের অবস্থাই এইরূপ ছিল। ভারতের ধনী-শ্রেণী অন্য দেশের ধনী-শ্রেণী হইতে যে অধিকতর স্বার্থপর ও লোভী ছিল, তাহাও মনে করিবার হেতু নাই। দেশে জীবিকা সুলভ ছিল, জমি উর্ব্বর ছিল সুতরাং জীবনের ব্যর্থতার গ্লানিও বহুলোকের অনুভব করিবার কোনও কারণ ছিল না। জীবনে দুঃখের অনুভূতি চিন্তাশীল লোকদিগের প্রবল ছিল। কিন্তু মহাকাব্যের যুগের পূর্ব্বেও তাহা ছিল। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা আনন্দ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং জগতে আনন্দ আছে বলিয়াই প্রাণিগণ জীবিত আছে ইহা জানিতেন এবং শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু তাহারা ইহাও জানিতেন যে জাগতিক ভোগসুখ নশ্বর। তাই তাঁহারা অবিনশ্বর ভূমার সুখের জন্য লালায়িত ছিলেন। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস থাকায় এই ভূমার সুখ ইহজন্মে লব্ধ না হইলেও স্বকীয় চেষ্টার ফলে জন্মান্তরে লব্ধ হইবে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাস মহাকাব্যের যুগেও অধিকাংশ লোকেরই ছিল; সুতরাং জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বহুলোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে ব্যাপক দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা সত্য। কিন্তু তাহার ফলেই যে লোকের বিশ্বাসে আঘাত লাগিয়াছিল এবং বহুবিধ নূতন মতের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা নহে। এই সকল মতের অনেকগুলি যে উপনিষদ যুগেও প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দুঃখবাদের প্রধানশাস্ত্র সাংখ্য দর্শনের মূল কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। চিন্তার স্বাধীনতা ভারতীয় আর্য্যসমাজে চিরকালই ছিল। মহাকাব্যের যুগে চিন্তা বন্ধনমুক্ত হয়, ইহা বলিবারও সংগত কারণের অভাব।

তবে এই যুগের দার্শনিক চিন্তার সমৃদ্ধির কারণ কি? অতি প্রাচীনকালে ভারতে দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার

* Radha Krishnan, Indian Philosophy, vol. I. p. p. 273-74.

যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই ; "অতি প্রাচীনকালে ভারতের রাজা, মানী ও পণ্ডিতগণ যে দার্শনিক আলোচনায় মগ্ন ছিলেন, তাহা আমাদিগের নিকট আশ্চর্য্য মনে হয়। তাহার কারণ, যতদিনের সংবাদ আমরা জানি, ততদিন হইতে ইয়োরোপীয়দিগের শক্তি সাংসারিক ব্যাপার এবং বিদ্যার চর্চ্চা এই দুইদিকে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে সাংসারিক ব্যাপারেই এই শক্তি অধিকতর প্রযুক্ত হইত। কিন্তু যে দেশে কৃষকদিগের অধিক পরিশ্রম ব্যতীতও জীবনধারণের জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন, তাহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত, যে দেশ তিনদিকে সমুদ্র এবং একদিকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভিন্ন অন্য যুদ্ধে যে দেশ লিপ্ত হয় নাই, সে দেশে ইয়োরোপীয় জীবন হইতে ভিন্ন প্রকারের জীবন অসম্ভব মনে করিবার কারণ নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যখন দেখিলেন তাঁহারা এই পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছেন, কিন্তু কেন ও কিরূপে, তাহার কিছুই অবগত নহেন, তখন তাঁহারা কে, কোথা হইতে তাহারা আসিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে পৃথিবীতে স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্য কি, এই সকল প্রশ্ন তাহাদের পক্ষে অতিপ্রশ্ন নহে, বিশেষতঃ যখন জীবন সংগ্রাম বলিয়া কিছু ছিল না।" * উপনিষদ যুগে বিদ্যার যে বহুল চর্চ্চা ছিল উপনিষদেই তাহার প্রমাণ আছে। নারদ সনৎকুমারের নিকট শিক্ষার্থী হইয়া গমন করিলে, সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি কি কি শিক্ষা করিয়াছ?" নারদ তখন যে যে বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা এই : চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত শাস্ত্র, দৈব উৎপাত বিদ্যা, কালতত্ত্ব, বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), নীতিশাস্ত্র, দেবিবিদ্যা (নিরুক্ত Etymology), ব্রহ্মবিদ্যা (শিক্ষাকল্পাদি—শঙ্কর ও ম্যাক্সমুলার), সর্প ও দেবজন বিদ্যা (সর্প ও সর্প বিষ—সংক্রান্ত বিদ্যা = সর্প বিদ্যা। দেবজন = গন্ধর্ব্ব, দেবজন বিদ্যা = গন্ধর্ব্ব বিদ্যা, গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী ও নৃত্যগীতাদি বিদ্যা) নক্ষত্র বিদ্যা (জ্যোতিষশাস্ত্র)।" এত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্য নারদ সনৎকুমারের নিকট গিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিদ্যার মধ্যে বাকোবাক্যের (Logic) উল্লেখ লক্ষণীয়। প্রত্যেক আর্য্যদিগের পক্ষে গুরুগৃহে দ্বাদশ বৎসর বিদ্যার্জ্জনের জন্য বাস কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত ছিল। রাজগণ যে দার্শনিক আলোচনায় উৎসাহ দান করিতেন, তাহার পরিচয় উপনিষদেই আছে। রাজসভায় বিভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকদিগের মধ্যে তর্ক যুদ্ধ হইত, এবং বিজেতাকে রাজা পুরস্কার দান করিতেন। উপনিষদের যুগেই বৈদিক যাগযজ্ঞ নিকৃষ্ট শ্রেণীর উপাসনা স্বীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং তথাকথিত মহাকাব্যের যুগে চিন্তার স্বাধীনতা, বৈদিক ধর্ম্মে সংশয় ও দুঃখ কষ্টের নবোদ্ভূত বাহুল্য এবং জীবনের ব্যর্থতার বোধ হইতে যে নূতন নূতন দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা মনে করা যায় না। জীবন অস্থায়ী, পার্থিব ভোগ্যবস্তু নশ্বর, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এই বোধ ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মনে সংহিতার যুগ হইতে ছিল। অসৎ হইতে সতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে উত্তীর্ণ হইবার প্রার্থনা ঋষিদিগের কণ্ঠ হইতে যজ্ঞকালেই ধ্বনিত হইত (বৃঃ আঃ ১৩।২৮)। সুতরাং উপনিষদের পরবর্ত্তী যুগে দার্শনিক আলোচনার বিবৃদ্ধি ভারতীয় সমাজে জ্ঞান বৃদ্ধির সহগামী সংশয়িত মনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

* Sex systenes of Indian Philosophy—p, 10.

গান

মধু গুপ্ত

নিজ দেহ-দীপ জ্বালায় জোনাকী,
আলো দিতে ভালোবেসে
আঁধারে কোথাও লুকায় প্রিয়া কি,
কৌতুকহাসি হেসে !!
মন যে আমার ওই-জোনাকীর মত
নিজেরে জ্বালায় আলো দিতে চায় কত :

ওগো লীলাময়ী তুমি সরে' যাও,
অধরা-আঁধার দেশে !!
জীবনে আমার ব্যথা-নিশ্চুপ রাতি,
ছলছল ওই তারার ইসারা নিয়েছি নয়ন পাতি !!
ফিরে' চাহিবার সময় যদি গো হয়
এসে দেখে যেয়ো কিছু যদি বাকী রয়,

ফাগুনের-শিখা নিভিবে জানিও,
চৈতালী-ক্ষণে এসে !!

শেষ পড়া

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

লেখক : আলফঁশ দোদে : ফরাশী গল্প

সকালে সেদিন স্কুলে যেতে বেশ দেরী করলুম। তার কারণ, টীচার হামেল সাহেব বলে দিয়েছেন—ব্যাকরণের প্রত্যয়-গুলো ভালো করে বুঝে মুখস্থ করে যেতে হবে, তিনি ও-সম্বন্ধে সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন—আমি ব্যাকরণের কিছু বুঝি না···পড়া করিনি—প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারবো না—খুব ধমক খাবো! ভেবেছিলুম, স্কুলে যাবো না আজ···বাহিরে বাহিরে ঘুরে এবেলা কাটিয়ে দেবো! দিনটাও ভারী চমৎকার লাগছিল। ঠাণ্ডা নেই—মিষ্টি মিষ্টি গরম ভাব···গাছে গাছে পাখীর গান·· করাত-মিলের মাঠে প্রাশিয়ান ফৌজের দল কুচ-কাওয়াজ করছে···দেখবো···কিন্তু না—অনেক কষ্টে লোভ সম্বরণ করে চললুম স্কুলের দিকে।

টাউন-হলের সামনে এসে দেখি হলের বাহিরে যোড়ে যে খবর-ছাপা কাগজ আঁটা হয় সেখানে খুব ভিড়···বহু লোক জমেছে বোর্ডের সামনে। জানি, ওখানে যে কাগজ আঁটা হয় তাতে থাকে শুধু যুদ্ধের খবর···কত ফৌজ মরেছে আমাদের, কোথায় হার হলো···প্রাশিয়ানরা জিততে জিততে ফ্রান্সের কতদুর পর্য্যন্ত এলো···তাছাড়া জার্ম্মানদের পরোয়ানা, হুকুম—এই সব! ওসব খবর শুনে গা ছমছমিয়ে উঠতো। কিন্তু এখন তো যুদ্ধ নেই··· জার্ম্মানদের জিত—আমরা ফরাশী-জাত এখন জার্ম্মানীর তাঁবেদার! মনে হলো এখন আবার কি এমন নতুন খবর এলো! আমার মাথা ব্যথা ছিল না খবরের জন্য··· স্কুলের দেরী হয়ে গেছে আমি বেশ হনহনিয়ে পা চালিয়ে টাউন-হল পার হয়ে চলেছি, হঠাৎ পিছন থেকে গাঁয়ের কামার ওয়াতার বললে হেঁকে—বলি, ও ছোকরা, ছুটচো কেন? স্কুল বসতে দেরী আছে এখনো। আস্তে যাও—হুঁচোট খাবে না হলে।

তামাসা—আমাকে নিয়ে তামাসা···বটে! আমার বয়ে গেছে তার কথা শুনতে—আমি হনহনিয়ে চললুম···

স্কুল বসবার সময় রোজ একটা গুনগুনুনি ওঠে—রীতিমত কোলাহল···অনেক দূর থেকে সে গুনগুনুনি শোনা যায়···ছেলেরা দরজা খুলছে বন্ধ করছে—ডেস্ক ধরে টানাটানি···চীৎকার চ্যাঁচামেচি—সেই সঙ্গে ছেলেদের একজোটে গলা মিলিয়ে পড়া বলা—এমন জোরে যে কানে তালা ধরে যায়! আমি যখন স্কুলে পৌঁছুলুম, তখন স্কুল বসে গেছে। আমাদের ক্লাশের দরজা ভেজানো—আমি দরজা ঠেলে খুললুম—ক্যাঁচ করে শব্দ—আমি গিয়ে বসলুম আমার বেঞ্চে। ক্লাশে ছেলেরা সব বেঞ্চে বসে—সামনে ডেস্কে বই খোলা—টীচার হামেল সাহেব চেয়ারে নেই···গম্ভীরভাবে তিনি ক্লাশে পায়চারি করছেন। আমি ক্লাশে ঢুকতেই তিনি চেয়ে দেখলেন। আমার বুকখানা ধ্বক্ করে উঠলো! দেরীর জন্য এখনি বকুনি খাবো! কিন্তু তার কিছু না। টীচার বললেন—যাও—নিজের জায়গায় বসো গিয়ে···তোমার জন্য এখনো পড়া আরম্ভ করিনি।

টীচারের সাজ-পোষাক আজ অন্যদিনের মতো নয়—জমকালো সাজ। গায়ে দিব্যি সবুজ-রঙের কোট··· ফ্রিল-দেওয়া সার্ট—মাথায় কালো রঙের সিল্কের ক্যাপ, তাতে এমব্রয়ডারির কাজ···ইন্সপেক্টর স্কুল দেখতে এলে, কিম্বা স্কুলের প্রাইজের উৎসবেই শুধু তিনি এ পোষাক পরেন। তাছাড়া সারা স্কুলের চেহারাই আজ অন্য রকম।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, ক্লাশের সব শেষের বেঞ্চে···যে সব বেঞ্চ খালি থাকে চিরদিন, দেখি, সে সব বেঞ্চে বসে আছেন গ্রামের যত মাতব্বর লোক। তাঁদের মধ্যে আছেন মাথায় তিনরঙা হ্যাট ফ্রান্সের সাবেক-মেয়র বুড়ো হুশার-সাহেব, পুরোনো পোষ্ট-মাষ্টার—কবে তাঁর পেন্সন হয়েছে! এমনি আরো কজন ভদ্রলোক। হুশার-সাহেবের হাতে কবেকার পুরোনো প্রাইমার-রীডার বই···ছেলেবেলায় তিনি এ বই পড়েছিলেন।

আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি···টীচার হামেল সাহেব বসলেন তাঁর চেয়ারে—তার পর বেশ গম্ভীর গলায় বললেন—শোনো ছেলেরা···আজ আমি শেষ পড়া পড়াচ্ছি তোমাদের। আজ হলেই আমার বিদায়। বার্লিন থেকে খবর এসেছে, আমাদের আর গাঁয়ের যত স্কুল আছে—সে সব স্কুলে কাল থেকে জার্মান ভাষায় পড়ানো হবে। আমাদের দেশের ভাষা ফরাশী ভাষার পড়ানো আজ শেষ। নতুন টীচার আসবেন কাল—কাজেই আমি ফরাশী ভাষায় আজ শেষ পড়া পড়াচ্ছি তোমাদের···তোমরা সকলে মন দিয়ে শোনো।

কথা শুনে আমার মনে হলো বুকখানা বুঝি এখনি ফেটে চার-চির হয়ে যাবে! হতভাগা জার্মানরা···এই খবরই তাহলে কাগজে ছেপে টাউন-হলের বোর্ডে আজ এঁটে দিয়েছে!

ফরাশী ভাষার শেষ পড়া আজ···মনটা ভারী হয়ে উঠলো। হায় রে, কেন এতদিন পড়ায় এমন অবহেলা করেছি! কেন পড়ায় মন দিই নি! শুধু গাছে গাছে পাখীর ডিম চুরি করে বেড়িয়েছি—নদীর বুকে জমাট বরফে ছুটোছুটি করে দিন কাটিয়েছি। যে বইগুলোকে এতকাল মনে হতো বাঘ—ফরাশী গ্রামার, দেশের যত বড় বড় লোকের কাহিনী···কখনো এসবের পানে চেয়ে দেখিনি! কেবলি মনে হতে লাগলো, এরা আমার কত আপন—আমার রক্ত-মাংস···কেন এসবের অনাদর অবহেলা করেছি! আর টীচার হামেল সাহেব···উনি চলে যাচ্ছেন চিরদিনের মতো—জীবনে কখনো আর ওঁকে দেখতে পাবো না! ওঁর ঐ মোটা রুলগাছটা···পিঠে কতবার ও রুলের ঘা দিয়েছেন···সে রুলের স্পর্শও পাবো না আর!

বেচারী টীচার সাহেব! আজ শেষ আমাদের পড়াচ্ছেন ···তাই এমন পোশাকআশাক পরেছেন। বুঝলুম, গ্রামের এই সব মাতব্বর বড়লোক কেন আজ স্কুলে এসেছেন! ওঁকে সম্মান দেখাতে! এই স্কুলে ওঁর কাছে পড়েই ওঁরা মানুষ হয়েছেন—ফ্রান্সের মাতব্বর হয়েছেন···সেকথা ভুলতে পারেননি—তাই তাঁরা ওঁর বিদায়-দিনে ওঁরা এসেছেন অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে—শ্রদ্ধা সম্ভাষণ জানাতে।

কোনোদিকে আমার মন নেই। ক্লাশে কি হচ্ছে, হুঁশ নেই! হুঁশ হলো আমার নাম-ডাকা হলো সে ডাক শুনে। চেয়ে দেখি আমার পালা—টীচার আমার দিকে চেয়ে আছেন—আমাকে মুখস্থ পড়া বলতে হবে—গ্রামার প্রত্যয়ের বিধি নিয়মগুলো। আমি উঠে দাঁড়ালুম—কিন্তু কি বলবো? মুখে কথা ফোটে না।

হামেল সাহেব বললেন—না, তোমাকে বকবো না··· ফ্রাঁজ। তোমার একার দোষ নয়···আমাদেরও দোষ আছে। আমাদের ঐ যে স্বভাব—আজ হলো না, আচ্ছা, কাল হবে, কাল শিখে নেবো। কাল-কাল করে কাল কেটে যায় এমনি করে···শেখার কাল আর আসে না! তোমার বাবা মা তোমাকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন—ভাবছেন, তাতেই তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ! কখনো খোঁজ নেন না—পড়াশুনা কতদূর কি হচ্ছে। আমিও ভেবেছি আজ পড়া করেনি—কাল করবে। আমাদের দোষ। কেন, সত্ত সত্ত ধরে পড়া তৈরী করাইনি! ত্থাখো দিকিনি এখন—ফরাশী জাতের ছেলে—নিজে ফরাশী, অথচ ফরাশী ভাষা ভালো করে শেখোনি—ফরাশী ব্যাকরণ জানো না! এখন জার্মান ভাষা শিখতে হবে—জার্মান গ্রামার মুখস্থ করতে হবে—জার্মান হয়ে যাবে। ফরাশী ভাষা—নিজের মাতৃভাষা—

তাঁর কথা শেষ হলো না—তিনি নিশ্বাস ফেললেন।···

গ্রামারের পর হাতের লেখা। টীচার হামেল বোর্ডে লিখলেন ফরাশী ভাষায় দুটি নাম—তার পর লিখলেন ফ্রান্স—আলজাক ফ্রান্স আলজাক। আমার মনে হলো, হাতের লেখা নয়, ফ্রান্সের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন! পাশের ছাদে কতকগুলো পায়রা উড়ে এসে বসলো—বসেই তাদের কূজন বকবকম্ বকবম্! আমার মনে হলো, ওরা গান গাইছে। ও কি ফরাশী ভাষা? বুকখান ছ্যাঁৎ করে উঠলো। পায়রাগুলো···মনে হলো, জার্মান ভাষায় কূজন করচে?

টীচার হামেল বোর্ডটা লেখায় ভরিয়ে চেয়ারে বসলেন,

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ডালডায় ভিটামিন রয়েছে

আমাদের সকলের শরীরের জন্য যে প্রয়োজনীয় শক্তিদায়ী তাজা স্নেহপদার্থের প্রয়োজন, ডালডা বনস্পতি তা যোগায়,—আর ডালডায় ভিটামিন 'এ' এবং ডি'ও আছে।

সব সময়েই নিরাপদ কারণ ইহা বিশুদ্ধ !

যে স্নেহ পদার্থ আপনি খান তা সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া দরকার—রোগউৎপত্তিকর কোনরকম বীজাণু বা নোংরা জিনিষ তাতে থাকলে চলবেনা; উদ্ভিদজাত বিশুদ্ধ তাজা তেল থেকে ডালডা তৈরী হয় এবং বায়ুরোধক শীল করা টিনে প্যাক করা থাকে বলে ডালডা বনস্পতি সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ।

ডালডা মার্কা
বনস্পতি
দিয়ে রান্না করুন

শুধু রান্নার জন্যই ভালো নয়-পুষ্টিকরও বটে!

HVM. 209-X52 BG

তার পর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন—বাহিরে ঐ গাছপালা—পাশাপাশি কটা বাড়ীর ছাদ—ঐ পার্ক… বাগান…বাগানের ওদিকে দেখা যায় নদীর জলরেখা… তার পর ক্লাশের দিকে তাকালেন। ডেস্কে-বোর্ড দেয়ালে কালির দাগ…জানলার একটা পাল্লার কবজা আলগা হয়ে রয়েছে।

হামেল নিশ্বাস ফেললেন—এ ওঁর ক্লাশ—ওঁর মনে গাঁথা হয়ে আছে…নিজের অস্থিমজ্জার সঙ্গে রক্ত মাংসের মতো! কাল থেকে এই কথাই উনি ভাবছেন—নিশ্চয়! এ ক্লাশ ওঁর পৃথিবী! কাল…ওঁর পৃথিবী জন্মের মতো লোপ পাবে উনি কি নিয়ে কি করে বাঁচবেন!…

ক্লাশ নিঝুম নিস্তব্ধ—কারো মুখে কথা নেই। আমার মনে হচ্ছে, যেন অত্যন্ত প্রিয়জনকে কবরে রাখতে এসেছি! যেন—যেন…

হঠাৎ ঢং ঢং করে বাজলো চার্চের ঘড়ি…বারোটা বাজলো।

নিশ্বাস ফেলে হামেল বললেন—ছেলেরা—আমি… আমি! তাঁর কণ্ঠটা যেন চেপে ধরেছে—কথা বলতে পারলেন না।

তার পর তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাতে চকখড়ি…বোর্ডের কাছে গেলেন…বোর্ডের উপর লিখলেন খড়ি দিয়ে…

বেঁচে থাকুক ফ্রান্স—দীর্ঘ অনন্ত জীবন হোক ফ্রান্সের!

লিখে তিনি পাশের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালেন—দেয়ালে মাথা হেলিয়ে। পা টলছে। তার পর হঠাৎ আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন—মলিন মৃদু হাসি—হামেল বললেন—বারোটা…স্কুলের ছুটী। এবারে বাড়ী যাও ছেলেরা।

দ্রুত ঝরো জগতের জীর্ণপত্র

সুমিত্রানন্দন পন্ত

—অনুবাদ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী

দ্রুত ঝরো জগতের জীর্ণ পত্র!
হে ত্রস্ত-ধ্বস্ত! হে শুষ্ক-শীর্ণ!
হিমতাপপীত, মধুবাতভীত,
তুমি বীতরাগ, জড়, সুপ্রাচীন!
নিষ্প্রাণ গত যুগের মৃত বিহঙ্গ,
শুষ্কস্পন্দন বক্ষ, প্রাণবায়ুহীন,
ছিন্ন ভগ্ন চ্যুত পক্ষ লয়ে তুমি
নিঃসীম অনন্তে হও বিলীন।
আবার ধরায় বহুক নূতন রুধির।
পত্র-পল্লবে নূতন লালিমা,
প্রাণের স্পন্দনে মুখরিত হ'ক
জীবনের মাংসল শ্যামলিমা।
যৌবনের মঞ্জরিত ধরাতলে
জাগো আজি জগতের পিকা,
অমর প্রণয় গীতি-মদিরাতে
পূর্ণ করো নূতনের জীবন-পিয়াসা।

কবিবরের "পত্রঝর" নামক হিন্দী কবিতার প্রায়াক্ষরিক বঙ্গানুবাদ

তবুও *

অনুপম রায়

কোমল কণ্ঠে গান ঝ'রে যায় যদি,
তবু গুন্-গুন্ সুরে-সুরে তার রেশ—
ঝংকৃত হ'য়ে অন্তরে নিরবধি
জাগাবে স্মৃতির আনন্দ-আশ্লেষ!
ভায়োলেট্ ফুল, কী-যে অপরূপ হায়!
ক্লান্ত বৃন্তে সে-ও বুঝি নতশির?
ঝির্‌ঝিরে তবু সুরধুনী ব'য়ে যায়
উতলা হাওয়ায় তার মধু-সুরভির!
বসুন্ধরার ধুলোয় কঠিন চিতা:
রূপসী গোলাপ জ্'লে-পুড়ে বুঝি ছাই?
তবু তার পাতা—তারা যে প্রাণের মিতা,
বিরহ-অশ্রু হ'য়ে ঝ'রে পড়ে তাই!
তেমনি তোমাকে হারাই কখনো যদি,
ভাবনা তোমার তবুও ভেবো না ভুল:
ভালোবাসা সে-তো অপরূপ এক নদী—
এলোমেলো ঢেউ-এ নাচে অতনুর ফুল!

* Shelly-র বিখ্যাত—"Music, when soft voices die, vibrates in the memory"—কবিতার ছায়ানুসরণে।

মৃত্যুর পরে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। 'রবি-বাসরে'র প্রথমবর্ষের এক অধিবেশনে অধুনা স্বর্গত কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। সেদিন সভায় ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুর, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যিক চারুচন্দ্র মিত্র, ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"মানসী ও মর্ম্মবাণী" পরিচালক সুবোধচন্দ্র দত্ত, কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব, জীবনচরিতকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, প্রথম বর্ষের সভাপতি সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি আমরা অনেক সদস্যই উপস্থিত ছিলাম। শ্রোতাদের মধ্যে এখন অনেকেই পরলোকগত হইলেও, এখনও যাহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই সেই কাহিনীটি স্মরণ আছে। কবি করুণানিধান যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেই ভাবেই আমি এখানে যথাযথ তাহা বিবৃত করিলাম।

*   *   *   *   *

—"আমার এক সম্পর্কিত-ভাই হুগলী কলেক্টরী অফিসে কেরাণীর কাজ কোরত। খেয়ালী অবিবাহিত যুবক, সংসারে তার কোন বন্ধন বা দায়িত্ব ছিল না। প্রতি শনিবার অফিসের পর সে কলকাতায় এসে, সোমবার সকাল পর্য্যন্ত আমাদের বাড়িতে আনন্দে কাটিয়ে কাজের যায়গায়—হুগলী-চুঁচুড়াতে ফিরে যেত। আমরা সকলে তাকে ভালবাসতাম। কোন কোন বার, সে শুক্রবার সন্ধ্যার পরেই এসে হাজির হো'ত। বিনাকারণে এরূপ ভাবে শনিবারটা অফিস কামাইকরা আমি মোটেই পছন্দ করতাম না। কিন্তু সে জন্যে তাকে তিরস্কার কোরেও কোন ফল হয় নি।

কিছুকাল আগে, এক শুক্রবার সন্ধ্যার পরই সে এসে হাজির। এবার আমি তাকে আর কিছু বলিনি। কিন্তু সে নিজেই উপযাচক হোয়ে আমায় জানিয়ে দিলে,—শনিবারটা ছুটি নিয়ে এসেচে। দুটো দিন বেশীর ভাগ সময় সে বাইরে ঘুরেই কাটিয়েছিল। রবিবার সকালে সে যে মাংস কিনে নিয়ে আসে, রাত্রে সেই মাংস রান্না আমরা একসঙ্গে বসে বেশ আনন্দ কোরেই খেয়েছিলাম। অমূল্য বিদ্যাভূষণ মশায়ের 'এডওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসনে', আমাদের প্রাত্যহিক বৈঠক স্থানেও সে একবার হাজির দিয়েছিল। আমার বন্ধু বান্ধবেরা অনেকেই তাকে চিনতেন।

সোমবার সকালে প্রায় নটার সময়, সে চুঁচুড়ায় ফেরার জন্যে বাড়ি থেকে বার হয়—আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। হেদোর কোণে. কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তাকে ট্রামে তুলে দিয়ে, আমি ছাতুবাবুর বাজারে চলে যাই। বাজারে কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরে আসতে আমার আধঘণ্টার বেশী সময় লাগেনি।

বাড়িতে এসে দেখি, একজন টেলিগ্রাফ পিয়ন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার নামেই একটা তার এসেছে—কোথা থেকে তা কে জানে! সই দিয়ে টেলিগ্রাফ্‌টা নিয়ে, খুলে পড়েই একবারে অবাক। টেলিগ্রাফের মর্ম্ম ছিল—'আপনার ভাই (অমুক) গত শুক্রবার সন্ধ্যায় কলেরা রোগে হাসপাতালে মারা গেছে। বিলম্বে খবর দেওয়ার জন্যে ক্ষমা করবেন।—জনৈক বন্ধু।'

আমার সঙ্গে এ পরিহাসের অর্থ কি। এই আধঘণ্টা আগে নিজে যাকে ট্রামে তুলে দিয়ে এসেছি, সে দু-দিন আগে মারা গেছে, এ কি আজগুবি খবর! বিরক্তির সঙ্গে কিন্তু মনে একটা বিস্ময়েরও উদয় হো'ল। বাড়িতে লোকে বল্‌লে, 'পাগল নাকি! এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই—টেলিগ্রামটা ছিঁড়ে ফেলে দাও।'

যথাসময়ে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম, কিন্তু নিজের মনকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারলাম না। অগত্যা দুপুরের ট্রেণেই চুঁচুড়া রওনা হোতে হো'ল।

চুঁচুড়া ষ্টেশনে নেমে সটান কলেক্টরী অফিসে হাজির হলাম। কেরাণীবন্ধুরা যেন আমারই অপেক্ষায় ছিল, আমাকে দেখেই ৫।৭ জন এসে আমায় ঘিরে ধরলে। তাদেরই একজনের চেয়ারে স্থির হোয়ে বসে শুনলাম—'বৃহস্পতিবার রাত্রে ভায়ের কলেরা রোগ প্রকাশ পায়। শুক্রবার সকালেই তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়, কিন্তু ডাক্তারদের সকল চেষ্টা বিফল কোরে সন্ধ্যার সময় তার মৃত্যু ঘটে। রাত্রেই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার কোরে শনিবার সকালে বাসায় ফিরতে বন্ধুদের দেরী হোয়ে গিয়েছিল। সকলে বিশেষ ক্লান্ত হোয়ে পড়ায়, সেদিন আর টেলিগ্রাফ করা সম্ভব হয় নি। রবিবারটা গোলমালেই কেটে গেছে। সোমবার সকালে প্রথম সুযোগেই তাঁরা আমার নামে টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছেন।' এই দেরীর জন্যে তাঁরা বার বার ক্ষমা চাইলেন।

আমি সমস্ত কথা শুনে বিস্ময়ে একবারে হতবাক হোয়ে গিয়েছিলাম। লোকে মনে করেছিল যে, ভায়ের শোকে আমি বিশেষ অভিভূত হোয়ে পড়েছি। কিছুক্ষণের জন্যে সকলে আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। সেখানে বসে নিজের মনে ভেবে দেখলাম—'শুক্রবার এখানে মারা যাবার পরেই আমরা তাকে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে হাজির হোতে দেখেছি। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, সোমবার সকালে ট্রামে তুলে দিয়ে বাড়ি ফেরার আগে পর্য্যন্ত তার মৃত্যুর খবর কিছুই জানতে পারি নি। তিন রাত্রি ও দুটো সম্পূর্ণ দিন একজন মৃত লোক আমাদের মধ্যে বাস কোরে গেল, এটা কি কোরে সম্ভব হয়! আমরা তার মধ্যে অস্বাভাবিক কোন কিছু লক্ষ্য করি নি—লক্ষ্য করবার কোন আবশ্যকও ছিল না।'

চুঁচুড়ায় সেদিন কোন কথা প্রকাশ না কোরে বাড়ি ফিরে আসি।

তারপর কদিন ধরে অবিরত চিন্তা কোরেও এই অতি আশ্চর্য্য ঘটনার কোন রহস্যভেদ কোরতে পারি নি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই ঘটনাটা শুনে একবারে অবাক হোয়ে গিয়েছেন।

* * * * *

সেদিন রবি-বাসরের সভায় কবি করুণানিধানের মুখ হইতে উক্ত কাহিনীটি শুনিয়া আমরা সকলেই সবিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও চারুবাবু উভয়েই সভাস্থলে স্বীকার করেন যে, তাঁহারা মৃত যুবককে উল্লিখিত রবিবারে 'এডওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন্' ভবনে দেখিয়াছেন, এ বিষয়ে কোনই ভুল নাই।

ঘটনাটা সম্পর্কে সভায় নানারূপ আলোচনার পর অনেকে মন্তব্য করিয়াছিলেন—'লোকে পরলোকগত প্রিয়জনের দর্শন পায় এরূপ ঘটনা জগতে বিরল নহে। কিন্তু কিরূপে যে ইহা সম্ভবপর হয়, তাহার কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। তবে, মৃত ব্যক্তি দুইদিন ধরিয়া আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বাস করিয়া গেল, এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার কথা, ইতিপূর্ব্বে আমরা কেহ কখনও শুনি নাই।'

কবি করুণানিধানের মুখ হইতে স্বকর্ণে তাঁহার বিবৃত অদ্ভুত কাহিনীটি শুনিয়াছি, তিনি যে অসত্য বলিয়াছেন ইহা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। আমার ধারণা, জগতে নিত্য যে কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার সকলগুলির সমাধানের শক্তি মানুষের নাই।

ইলামবাজার—অজয়সেতু

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ, বি-টি, ডিপ-এড (এডিনবরা ও ডাবলেন)

প্রাচীন যুগের রাজপথ, বাণিজ্য পথ, ড্রেনেজ, টানেল, সাঁকো প্রভৃতি স্থাপত্যের মূল্যবান নিদর্শনসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়া আজও পাহাড়পুর, বিহারাইল, মহেঞ্জদারো, মহাস্থান, সুবর্ণবিহার, মহানাদ ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমানে বাঁধ, সেতু, রাজপথ ও জলপথ নির্ম্মাণের বিরাট পরিকল্পনা প্রাচীন ভারতের অগ্রগতির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সাঁওতাল পরগণা মালভূমি হইতে বহির্গত হইয়া বীরভূম ও বর্দ্ধমান এই দুই জেলার সীমানির্দ্দেশ করিয়া বাহিত হইয়া অবশেষে অজয় কাটোয়ার নিকটে যাইয়া ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের জলপথ হিসাবে খ্যাত এই নদীর তীরে বীরভূমের অন্তর্গত ইলামবাজার এক সময়ে বন্দরের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। এখন বোলপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বাসে চড়িয়া ১৪ মাইলের মধ্যে শালবনের ভিতর দিয়া শেষ ছয় মাইল আন্দাজ পথ অতিক্রম করিলে ইলামবাজার পৌঁছান যায়। এখনও ইহার পূর্ব গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ বহু প্রাচীন অট্টালিকা, প্রাচীন সামাজিক ও পৌরাণিক চিত্রাঙ্কিত টেরাকোটার ইটের শিবমন্দির, দুর্গামণ্ডপ, নীলকর আর্সকিন পরিবারের বিষাদময় সমাধি ও নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার প্রসিদ্ধ গালাশিল্প আজ সরকারী বা বেসরকারী উৎসাহের অভাবে মুমূর্ষু। পানাগড় হইতে চৌদ্দ মাইল দীর্ঘ একটী পথ শালবনের ভিতর দিয়া ইলামবাজারের অজয়ঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের সহিত উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের যোগাযোগের অজয়ঘাট সড়কটীতে বর্ষা ভিন্ন ঋতুতে নদীর বুকের উপর দিয়া গাড়ী চলাচলও সম্ভব হয়। বর্ষার অনিয়মিত প্লাবনের সময়ে 'বেনো পাথীর' ডাকের সঙ্গে সঙ্গে অথচ হঠাৎ প্লাবন আসে গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া। সে সময়ে নৌকায় থাকিলে বিপদ হয়। সকল সময়েই পারাপারে সুবিধার জন্য 'পঞ্চ-বার্ষিকী'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া 'লী ম্যাক্কল' প্রণালীতে ভারতে সামগ্রিক ভাবে নির্ম্মিত—কার্য্যতঃ এই প্রথম সেতুর পরিকল্পনায় সরকার হাত দিয়াছেন। পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত সেদিন ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে যথার্থই বলিয়াছেন, অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পর নির্ভরশীল শিল্পবাণিজ্য, কৃষি ও সমৃদ্ধির পথ এই 'সেতুর' দ্বারাই সুগম হইবে। চন্দ্রা ইঞ্জিনিয়ার্স' ইণ্ডিয়া লিমিটেডের সেতু নির্ম্মাণ বিশেষজ্ঞ শ্রীকমলপ্রসাদ রায় ও সরকার পক্ষে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আবশ্যক এই সেতুটীর নির্ম্মাণ কার্য্য ইতিমধ্যেই খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে।

১৫৭০ ফুট প্রশস্ত জলপথ রাখিয়া সেতুর পরিকল্পনায় মধ্যবর্ত্তী নয়টী প্রধান সেতুখণ্ডের প্রত্যেকটীতে পর পর স্তম্ভগুলি ব্যবধান থাকবে ১৪৮ ফুট এবং দুই পাশের তীরলগ্ন খণ্ড সেতুর ব্যবধান রহিবে ১১৮ ফুট করিয়া। ডিম্বাকার কংক্রীট ইন্দারার উপর এই স্তম্ভগুলি পর পর কাঁধ দিয়া দাঁড়াইবে। নদীর মধ্যে মাঝারি রকমের বালি ও নদীর পাড় হলদে কাদা মিশানো মুরামে গঠিত। প্রবল বন্যা প্রতিরোধের জন্য স্তম্ভ কূপগুলি ভূগর্ভে ৬০ ফুট দাবাইয়া দেওয়া হইবে। নদীর তির্য্যক স্রোত নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধও তৈরী হইতেছে। পানাগড় হইতে আগত রাস্তাটী অজয়ঘাটে আসিয়া নদী পার হইয়া জয়দেব কেন্দুলি বামপাশে ফেলিয়া যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাতবাসের স্মৃতি বহন করিয়া পত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভুবরাজপুরের শিলাখণ্ডময় পাহাড় ঘেঁষিয়া সিউড়ী, মহম্মদবাজার, মল্লারপুর, আত্মপীঠ নলহাটি, মোরগ্রাম হইয়া ধুলিয়ান পর্য্যন্ত গিয়া কলিকাতা শিলিগুড়ি ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এইরূপে এই রাজপথ দ্বারা বাঁকুড়া, বীরভূম, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শোভার সমাবেশে মনোরম মশাঞ্জোর বাঁধ, হরিণ ও ময়ূর অধ্যুষিত দুমকার জঙ্গলময় পার্ব্বত্যভূমি ও মুর্শিদাবাদের বহু প্রয়োজনীয় স্থানের যোগাযোগ হইল। ইলামবাজার বোলপুর সড়ক টারম্যাকাডাম রোডের শ্রেণীতে সম্প্রতি উন্নীত হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিশ্বের অতিথিশালা, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী রেলওয়ের অভাবে মোটর সার্ভিসের দ্বারা আসানসোল, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের সহিত যোগযুক্ত হইল। ইলামবাজারের অজয়সেতু নির্ম্মিত হইলে এইভাবে দেশের আঞ্চলিক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় ইহার প্রাপ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিবে।

—বারো—
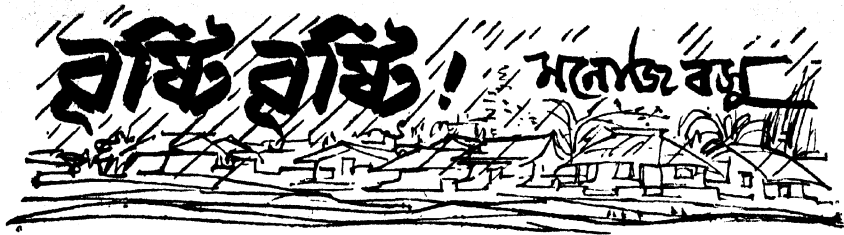
আকাশের চাঁদ-সূর্য মাটির উপরে। গলিতে নেমে হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বেশ্বরের দরজায়। সরমা যথারীতি দরজা খুলে দিলেন। অরুণাক্ষ বাপকে নিয়ে উপরে চলল। হাসিতে ডগমগ মুখ, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে সিঁড়ি দিয়ে। কি ভেবে একটুখানি সরে এসে ফিসফিসিয়ে সরমাকে পরিচয় দিল, বাবা। আসবেন-আসবেন করছিলেন, ষোল আনা মনস্থির করে মা'র সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিজে এসেছেন। বাড়ি চিনিয়ে দিতে সঙ্গে এসেছি আমি।

আবার গিয়ে সে অম্বুজাক্ষের পিছন ধরল।

সরমার এখন মুশকিলটা বোঝ। মেয়ে এ সময়টা বাড়ি থাকে না, পড়াতে গেছে। একটা থলি নিয়ে যায় কাগজে জড়িয়ে—সেই থলি ভরতি সওদা নিয়ে বাড়ি ফেরে। ঐ আর এক ভাবনা। আধ-ময়লা কাপড় পরণে, ঘামে নেয়ে উঠেছে, হাতে বাজার-থলি—কনে হেন-অবস্থায় অম্বুজ ডাক্তারের সামনে না পড়ে যায়। এক কাজ করতে হবে—কিশোরীবালা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়াবে। ইরার হাত থেকে বাজার-থলি নিয়ে নেবে সে, কুটুম্বরা উপরে রয়েছেন শব্দসাড়া না করে চুপিসারে ঢুকে পড় দিদিমণি। তারপর কাপড়চোপড় বদলে চুল বেঁধে একটু ঘসামাজা করে জানান দেওয়া হবে, দেখতে পার এবারে মেয়ে। ওদিকটা সামলানো যাবে এক রকম। কিন্তু এ-বাড়ির হালচাল সমস্ত জেনে অরুণাক্ষ এ কি করে বসল, বাপকে সরাসরি তপোবনের ঐ নোংরা কাগজের আণ্ডিলের মধ্যে নিয়ে তুলল, নিচের ঘরে বসাতে পারল না? তিন মাস ধরে তারিখের পর তারিখ দিয়ে, এলেন না—হঠাৎ খবরবাদ নেই, ঝুপ করে আজ এসে উঠলেন। নতুন কুটুম্বর আদর-অভ্যর্থনার উপায় কি করা যায়? কলকাতা শহর—জলযোগের যা হোক ব্যবস্থা হবে। কিন্তু ঐ যে এক মানুষ—দুটো কথা গুছিয়েও বলতে পারেন না, আগে টের পেলে পঞ্চানন কৃতান্ত কিম্বা পাড়ার দু-একজনকে খবর দিয়ে আনা যেত। কি কথার উপর কি বলে বসেন কিছু ঠিকঠিকানা নেই।

চুপচাপ ভাবনারও আর সময় নেই, তপোবনে ঢুকে গেছেন ওঁরা। কিশোরীবালাকে বললেন, ছুটে যা মিষ্টির দোকানে। যাবি আর আসবি। কুটুম্ব এসেছে। এর পরে মেয়ে দেখানোর বন্দোবস্ত আছে।

মেঘলা দিন, হাওয়া দিচ্ছে। কি জানি কখন বাদল নামে, টুকরো কাগজ উড়েটুড়ে যায় কিনা—সাবধানী বিশ্বেশ্বর জানলাগুলো এঁটে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে আলো জেলে কাজ করছেন। দরজা ঠেলে দু-দুটো মানুষ ঢুকল, তা-ও ভাল করে খেয়ালে এলো না। ঘাড় হেঁট করে কাজ করে যাচ্ছেন। নাকের উপর চশমা—তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে আছেন জীর্ণ একটুকরো কাগজের উপর। চশমার শক্তিতে কুলোচ্ছে না যেন, চশমা ফেলে অণুবীক্ষণ ধরতে পারলে সুবিধা হয়।

মুখ তুলে তারপরে ধমকে উঠলেন, কে? কারা?

চিনলেনই না হয়তো। তাহলে এমন বলতে যাবেন কেন? বললেন, কি চাই এখানে? নিচে যান, নিচে নেমে গিয়ে বসুন। কাজের সময় গণ্ডগোল করবেন না, ঘর ছেড়ে নিচে চলে যান।

ভাব দেখে অম্বুজাক্ষ হাসেন। বললেন, আপনার সাধনপীঠ দেখতে এলাম ভায়া। নিচে গেলে তো হবে না। এরই মধ্যে কোন একখানে বসে যাবো একটু।

বলে এদিক-ওদিক চেয়ে বিশ্বেশ্বরের বিছানার প্রান্তে কাগজপত্র ঠেলে দিয়ে বসে পড়লেন।

সরমা মনের উদ্বেগে সিঁড়ির খানিকটা অবধি উঠে এসেছিলেন। সেখানে থেকে গর্জাচ্ছেন, দেখ, যা ভেবেছি ঠিক তাই। পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তার রকম শোন একবার। সমস্ত দেবতার উদ্দেশে বারম্বার মাথা খুঁড়ছেন, ওঁরা বিরক্ত না হন, দেখো তুমি ঠাকুর। রাগ করে ফিরে না যান। ও মানুষ নিতান্ত অবোধ, সংসারের কিছু জানেন না। মানিয়ে-গুছিয়ে সমস্ত বুঝসমঝ করে দিও ঠাকুর।

অম্বুজাক্ষ ওদিকে বিছানাটা একটু ঠেলে দিয়ে মাদুরের উপর চেপে বসে চতুর্দিক চেয়ে চেয়ে মুগ্ধকণ্ঠে তারিপ করছেন, বাঃ বাঃ, বই-কাগজপত্র ছড়িয়ে নৈমিষারণ্য বানিয়ে নিয়েছেন। অমল বলছিল, ঘরের নাম তপোবন। তপস্যার জায়গাই বটে। শহরের মাঝখানে এমন একটা শান্তির জায়গা ভাবতে পারা যায় না। কেন যে অমল পাগল হয়ে এ বাড়ি ছোটে, শতকণ্ঠে আপনার নাম করে, এখন বুঝতে পারছি।

এখন আর বিশ্বেশ্বরের না চেনার অবস্থা নয়। চিনে ফেলে তটস্থ হয়ে উঠেছেন। আহা, এটা কি হল? ঐখানে কাগজপত্রের মধ্যে বসে গেলেন যে! ওরে কিশোরীবালা, গেলি কোথা তোরা? এত বড় মানুষটা মাদুরের উপর বসে পড়লেন—

অম্বুজাক্ষ বাধা দিয়ে বললেন, আহা, এমন পর ভাবছেন কেন বলুন তো আমায়? রামনিধি আর কাশীশ্বর—সে আমলের দুই দিক্‌পাল—তাঁদের দেহ দুটোই শুধু আলাদা ছিল, প্রাণ একটা—

বিশ্বেশ্বর সবেগে ঘাড় নাড়েন, উঁহু, তা হবে কেন? ওকি, ওকি?

ভূমিকা ফেঁদে নিয়ে অম্বুজাক্ষ ওরই ফাঁকে চুরুট মুখে পুরেছিলেন। দেশলাই ধরাতে যাচ্ছেন, ভয়-ব্যাকুল বিশ্বেশ্বর আর্তনাদ করে উঠলেন, ওকি, ওকি? বাইরে যান আপনি। বারাণ্ডায় চেয়ার আনিয়ে দিচ্ছি। এত কাগজ-পত্র—একটা ফুলকি যদি পড়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এই থাকল ভায়া। বিদঘুটে এক নেশা—স্থান-কালের বাছবিচার থাকে না।

চুরুট অম্বুজাক্ষ পকেটে পুরে ফেললেন। খুব হাসছেন, রাগ করেন নি। বললেন, বাইরে গিয়ে ঘটকর্পূর হলে যদি চলত, এত কাজকর্মের ভিতর নিজে তবে ছুটে আসতাম না। কতদিন থেকে আসব-আসব করছি! 'কোম্পানির আমল' পড়বার পর থেকে বড় লোভ এই জায়গায় আসবার। অর্থাৎ গঙ্গার জল পান করলাম, সেই জল যে-গোমুখী থেকে আসে সেইটে দেখবার বাসনা।

বলে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে তারপর বললেন, সেই এক গাদা কাগজ বয়ে নিয়ে এলেন, কিছু কাজ হল তা দিয়ে?

কাজ হবে না মানে? হাতে ছুঁয়েই বলতে পারি কোন জিনিষের কি দাম। যত্ন করে নিয়ে এলাম তো সেইজন্যে। দিনরাত্রি এই দেখুন আপনার সেই কাগজ-পত্রের মধ্যে মজে আছি।

বলতে বলতে গদগদ হয়ে উঠলেন, বিস্তর অনুগ্রহ আপনার। যা দিয়েছেন, হীরের ওজনে তার দাম হয়। বিস্তর নতুন নতুন কথা জানা যাচ্ছে। ইতিহাস কী বস্তু তাই দেখুন। কাশীশ্বর রায়ের চিঠি-চাপাটি এমন কি সংসারের জমাখরচের ভিত্তর থেকেও টুঁটি টিপে খবর বের করে আনছি। হাঁদারামেরা ইতিহাস ঘাঁটতে আসে! তৈরি রুটি ফয়তা দিতে পারে তারা শুধু। ইতিহাস যে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে নানান দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, সে সব খুঁটে তোলবার তাগত নেই।

অম্বুজাক্ষ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, কাশীশ্বরের সম্বন্ধে নতুন কিছু পেলেন?

পাই নি আবার! যত পাচ্ছি, আমার তো তাক লেগে যাচ্ছে। এখন দেখছি, পুরানো 'কোম্পানির আমল' লোকের কাছে হাজির করাই মুশকিল। অন্তত পক্ষে নতুন এক পরিশিষ্ট জুড়ে না দিলে কিছুতে চলবে না। সেইটেই তৈরি করছি। বেশি নয়, শ দেড়েক পাতার মতো হবে। সেটা না থাকলে মানুষ উল্টো রকম বুঝে বসে থাকবে।

অম্বুজাক্ষ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, পরিশিষ্ট ছাপানোর খরচ কিন্তু আমার। লিখবার শক্তি তো নেই, কয়েকটা টাকা খরচ করে পুণ্যকর্মে একটু ভাগ নেওয়ার লোভ। তা কাপি পুরোপুরি তৈরি থাকে তো এক্ষুণি প্রেসে

পাঠিয়ে দিন। মাসখানেকের মধ্যে যাতে বেরিয়ে যায়।

একটু হেসে বলেন, একটু কাজেও লাগাতে পারব। স্পষ্টাস্পষ্টি বলছি, ইলেকসনে দাঁড়িয়েছি। তাড়াতাড়ি করুন, চট করে বই বের করে যাতে লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। বড্ড কাজ হবে।

বিশ্বেশ্বর আনন্দে দিশা করতে পারেন না, হেঁ-হেঁ করছেন। কিশোরীবালা ঘরে ঢুকে চাপা গলায় কি বলছে অরুণাক্ষকে। অম্বুজাক্ষ হেসে বলেন, বুঝেছি—বুঝতে পেরেছি। না খেয়ে নড়ছিনে। তোমার মা'কে বলো চায়ের জল চাপিয়ে দিতে। মিষ্টি একদম চলবে না, চায়েও চিনি নয়। চিনির একটু ছোটখাট ফ্যাক্টরি আছে কিনা দেহের মধ্যে। মিষ্টি বাদ দিয়ে আর যাতে তিনি খুশি হন তাই সমস্ত দিতে বলোগে। এ তো নিজেরই বাড়িঘর এক হিসাবে। আজকের সম্পর্ক নয়, প্রথম যখন রামনিধি আর কাশীশ্বর দুই বন্ধু এক তল্লাটে গিয়ে বসতি করলেন। সে জায়গার বর্ণনাটাও অতি চমৎকার হয়েছে সরকার মশায়। এক ধ্যান এক জ্ঞান—দেহটাই কেবলমাত্র পৃথক ছিল। সমস্ত মনে নেই আমার, অমন ঝঙ্কার-অলঙ্কার—মনে রাখা সোজা নয়। কিন্তু খাসা হয়েছে।

লেখার প্রশংসায় অন্য সময়ের মতো বিশ্বেশ্বর খুসি তো হলেন না, না-না করে উঠলেন। ভুল, বিলকুল মিথ্যে। রামনিধি ভাবতেন বটে তাই, কিন্তু কাশীশ্বর বরাবর ছলনা করে এসেছেন তাঁর সঙ্গে। ঐ ছলনা রামনিধি সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলেন, আমরাও এতকাল জেনে এসেছি সেই রকম।

বাপ-ছেলেয় সবিস্ময়ে ঘাড় তুলে ঐতিহাসিকের দিকে তাকান। হেসে ঘাড় দুলিয়ে বিশ্বেশ্বর বলতে লাগলেন, ইতিহাস কি বস্তু তবেই বুঝে দেখুন। পাঁচ বছর সর্বস্ব ছেড়েছুড়ে এই কর্মে লেগেছি। অহরহ ভাবনা-চিন্তা—রাতের বেলা যেটুকু সময় চোখ বুঁজি, তারও মধ্যে এই সমস্ত স্বপ্ন দেখি। পাঁচ-পাঁচটা বছরের যত খাটনি তিন মাসের মধ্যে সমস্ত উলটে-পালটে গেল। এই তো মজা ইতিহাসের। আগের লেখার কোন দাম রইল না। বিশেষ করে কাশীশ্বরকে নিয়ে যত-কিছু লিখেছি।

অম্বুজাক্ষের এই দিক দিয়ে একেবারে যে সন্দেহ হয় নি, এমন নয়। কৃতান্তের খোঁটাটি তা হলে এই বিশ্বেশ্বর সরকারই। অরুণের মুখ শুকনো, কোনো কিছুই যেন তার মাথায় ঢুকছে না।

বলছেন কি মেসোমশায় ?

তাই দেখ বাবা, এতকালের পরিশ্রম সমস্ত পণ্ড। দেশসুদ্ধ মানুষ জানত রামনিধির পরম বন্ধু কাশীশ্বর। ফাঁসির সময় অবধি রামনিধিও তাই জেনে গেলেন। আসলে নীলকর সাহেবদের চর তিনি। চাষাভুষোদের কাছে রামনিধি দেবতা-গোঁসাই ছিলেন, গাঁ-অঞ্চলে থাকলে তাঁকে কেউ ধরতে পারত না। কাশীশ্বর বন্ধু সেজে তাকে কলকাতায় নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে চক্রান্ত করে ধরিয়ে দিলেন। বিস্তর টাকা খেয়েছিলেন এই বাবদে।

অম্বুজাক্ষ বললেন, আপনি লিখেছেন এই কথা ?

বিশ্বেশ্বর বললেন, আমায় কিছু বানিয়ে লিখতে হয় নি। চিঠিপত্র রয়েছে—পাটোয়ারি কাশীশ্বর যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, সাহেবরা কাজ হাসিল করিয়ে নিয়ে শেষটা কলা দেখায়।

অরুণ প্রতিবাদ করে, হতে পারে না মেসোমশাই। কাশীশ্বর ভাল লোক।

বিশ্বেশ্বর সহজ ভাবে বলেন, অসম্ভব নয়। কিন্তু যতক্ষণ আবার উল্টো কিছু না পাচ্ছি, আমাকে এই লিখে যেতে হবে বাবা—

অম্বুজাক্ষ বলেন, দেখুন—নিজে চলে এসেছি আপনার কাছে। কাগজপত্র আমিই তো সমস্ত সরবরাহ করেছিলাম—

বিশ্বেশ্বর গভীর কণ্ঠে বলেন, বিদ্যোৎসাহী আপনি—অতিশয় মহানুভব। কাগজপত্র দিলেন, আর কি সমাদরটাই করলেন বাড়িতে নিয়ে! সে আমি কোন দিন ভুলব না।

কঠিন কণ্ঠে অম্বুজাক্ষ বললেন, এই তার প্রতিদান বটে! বংশ ধরে কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিচ্ছেন, লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় রাখবেন না।

বিশ্বেশ্বর মরমে মরে গেলেন। আমি কি করলাম, আলাদা কিছু করবার এক্তিয়ার আছে আমার ? কাগজ-পত্র পড়ে দেখুন, তারপর আপনার হাতে কলম গুঁজে দিলে আপনিও ঠিক এই লিখবেন।

অরুণ অনুনয় করে বলে, 'কোম্পানির আমলে' যা লিখেছেন, সেই অবধি থাকুক মেসোমশায়। মনে করুন, পরের কাগজ কিছু আপনি পান নি। আমাদের বাড়ি থেকে কত কাগজ নষ্ট হয়ে গেছে, এ-ও ধরে নিন তাই।

বিশ্বেশ্বর বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন এক মুহূর্ত। ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুমি এ কথা বলছ বাবা, ইতিহাসের ছাত্র হয়ে বলছ? জানতে পারতাম না—সে এক রকম। কিন্তু জেনে শুনে সত্য গুম করে ফেলব—সেটা কেমন করে হয়।

অম্বুজাক্ষ ধৈর্য হারিয়ে বললেন, হতেই হবে। হবে এই জন্য যে আপনার কন্যাদায়। আমার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে। আমি আজকে পাকাপাকি করে যাব বলে এসেছি। আপনার মেয়ের শ্বশুরকুল অসম্মানিত হবে, এটা নিশ্চয় চান না আপনি।

বিশ্বেশ্বর তটস্থ হয়ে বলেন, সে কি কথা! নিশ্চয় নয়, কখনো নয়—

অম্বুজাক্ষ বলতে লাগলেন, অজানা অচেনা সেকেলে ক'টা মরামানুষের চেয়ে মেয়ে নিশ্চয় বেশি আপনার; মেয়ের প্রতি আপনার কর্তব্য আছে। যা-কিছু লিখেছেন, ছিঁড়ে ফেলুন। পচা কাগজপত্র যা নিয়ে এসেছেন, দেশলাই জেলে পুড়িয়ে দিন। আপনার মায়া লাগে তো আমায় বলুন।

বিশ্বেশ্বর ব্যাকুল ভাবে কাগজপত্র আগলে বসেন। ঝুঁকে পড়েছেন, কাগজে বুকে চেপে শুয়ে পড়েন আর কি! এখনই যেন অম্বুজাক্ষ ডাকাতি করে নিয়ে নিচ্ছেন। ভাব দেখে হাসি পায়, রাগে গা জ্বালা করে। বিরক্ত অম্বুজাক্ষ উঠে দাঁড়ালেন।

আচ্ছা, ভাবুন আপনি দুটো-পাঁচটা দিন। মত বদলালে খবর পাঠাবেন। এই মাসের ক'টা দিন আমি চুপচাপ থাকব। তার পরে সকল সম্বন্ধ শেষ আপনাদের সঙ্গে।

নেমে গেলেন। আসন পাতা বারাণ্ডায়। সরমা দাঁড়িয়েছিলেন, অম্বুজাক্ষকে দেখে ঘোমটা টেনে দিলেন একটু। অম্বুজাক্ষও দাঁড়ালেন একটু। বললেন, মন বড্ড বিচলিত। খেতে বসবার অবস্থা নেই, ক্ষমা করবেন। বেয়ান বলে ডেকে যাব, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম আজকে। বাধা পড়ে যাচ্ছে। সুরাহা যদি হয়ে যায়, আপনার মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী করে নিতে পারি—সেই তখন আমোদ-স্ফূর্তি করে খেয়ে যাব।

সরমা লজ্জা করে থাকতে পারেন না। মৃদুস্বরে অরুণাক্ষকে ডাকলেন, হল কি বাবা?

অরুণাক্ষ বলে, মেসোমশায় কি জেদ ধরেছেন, তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন। নতুন যা লিখেছেন, কিছু বাদ-সাদ দিয়ে মোলায়েম ভাবেও তো লেখা যায়। পুরোপুরি মিথ্যে হয় না, অথচ সকল দিক বজায় থাকে। ওঁকে বলবেন একটু আপনি।

অনতিপরে সরমা অগ্নিমূর্তি হয়ে পড়লেন, কি সব ছাইভস্ম লিখেছ নাকি?

এমন কথায় বিশ্বেশ্বর রেহাই করেন না তা তিনি যত বড় ব্যক্তিই হোন। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, ছাইভস্ম লিখি আমি? তুমি বলছ—কিন্তু একটু যার বুঝ সমঝ আছে, সে এমন কথা উচ্চারণ করবে না।

অরুণদের বংশের উপর কালি ছিটিয়েছ তুমি—

বিশ্বেশ্বর বলেন, আমি কিছু করিনি। যা করবার, কাশীশ্বর রায়ই করে গেছেন। অভিনয় করেছেন সারা জীবন, মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে এসেছেন। পড়ে দেখতে পারো খানিক, এর মধ্যে একটা কথাও আন্দাজি লেখা নয়—

হালের লেখা ক'খানা ফর্দ সরমার হাতে দিলেন। কয়েক ছত্র পড়ে ফস করে ছিঁড়ে ফেললেন তিনি; বিশ্বেশ্বর হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, এটা কি হল বড় বউ? ছিঁড়ে ফেললে কি সত্য উড়ে যাবে। এত সব প্রমাণ প্রয়োগ রয়েছে—আমারই শুধু ডবল খাটনি।

এ পাগল মানুষের সঙ্গে এমন ভাবে হবে না, সরমার চেয়ে কে বেশি জানে? ফল এই হল, ছেঁড়া অংশ নতুন করে লিখতে বসে যাবেন এখন—একটা শব্দেরও যাতে হেরফের না হয়। শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাথা খুঁড়ে মরলেও ওঠানো যাবে না, নাওয়া আজ সেই সন্ধ্যাবেলা।

কাতর হয়ে তখন বলছেন, চোখ নেই তোমার দেখতে পাও না কি হাল করেছ সংসারের? চাকরি ছেড়ে দিয়ে বসে আছ, মেয়েটা ট্যুইশানি করে নানান ধান্দায় সংসার চালায়—

মেয়ের কথায় বিশ্বেশ্বরের কণ্ঠ আর এক রকম হয়ে

যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললেন, সত্যি, বড় গুণের মেয়ে ইরাবতী। ও আমার ছেলে। ও না থাকলে কিছু হত না, কেরাণি হয়ে চিরকাল কলম ঘষতে যেতে হত।

সেই মেয়ের সর্বনাশ করছ বাপ হয়ে। ছেলের বাপ আজ কথা বলতে এসেছিলেন, বাপ হয়ে তুমি দুয়োর থেকে ফিরিয়ে দিলে।

সরমার দু-চোখে অশ্রু টলটল করে উঠল। বলেন, দেখ, জীবনে আমি তোমার কাছে কিছু চাইনি। বলো, কখনো কোন বয়সে চেয়েছি কিনা কিছু—

বিশ্বেশ্বর গাঢ় স্বরে বললেন, আমি যে বড্ড গরীব। শখের জিনিস দেবো কি—শুধু খাওয়াপরা জোটাতেই দেহের কালঘাম ঝরেছে।

আজকে ঐ মেয়ের মুখ চেয়ে চাইছি তোমার কাছে এই জিনিসটা। তিন সন্তান গিয়ে, আমার ইরাবতী—তোমার একটুকু লেখার জন্য তার সুখশান্তি হবে না—তোমার হাত ধরে বলছি, তোমার পায়ে পড়ি আমি—

সরমা সত্যি সত্যি উপুড় হ'য়ে পড়লেন বিশ্বেশ্বরের পায়ে। কি করবেন বিশ্বেশ্বর ভেবে পান না। আহা-হা, পাগল হলে বড়বউ? ওঠো, ঠাণ্ডা হয়ে উঠে পড়। মেয়ে তো একলা তোমার নয়! এমন সম্বন্ধ বেহাত হয়ে যাচ্ছে, উপায় একটা ভাবতে হবে বই কি।

সরমা চোখ মুছে বললেন, কথাগুলো অন্য ভাবে ঘুরিয়ে লিখে দাও। অরুণও তাই বলে গেল। লেখো এমন ভাবে—যাতে সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙে।

বিশ্বেশ্বর দোমনা হয়ে বললেন, কিছু করতে হবে বই কি! করতেই হবে মেয়ের জন্য। দেখি আরও ঘাঁটাঘাঁটি করে, নতুন জিনিষ কিছু যদি পাওয়া যায়।

অধীর কণ্ঠে সরমা বললেন, নতুন জিনিস এই হল যে ইরার বিয়ে অরুণাক্ষের সঙ্গে। কি লিখবে তুমিই জানো, কিন্তু লিখতে হবে নতুন করে।

আচ্ছা আচ্ছা—বলে সায় দিয়ে বিশ্বেশ্বর ভাবতে লাগলেন।

ভেবে ভেবে তো থই পাওয়া যায় না। নাটক-নবেলের মতন মন-গড়া কিছু লিখবার উপায় নেই। মেয়ের সুখ শান্তি হবে—সেই খাতিরে চিরকালের মানুষদের ভুলের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে বলছেন ওঁরা। জ্ঞানের ভাণ্ডারে ইচ্ছে করে মেকি বস্তু ঢুকিয়ে রাখা। কাশীশ্বরের চেয়ে এ অপরাধ কম হল কিসে? কম তো নয়ই, লক্ষগুণ কোটিগুণ বেশি। কাশীশ্বরের বিশ্বাসঘাতকতা একটি মানুষের সম্পর্কে, বিশ্বেশ্বর অপরাধী হবেন—এখন যত আছে আর ভাবীকালে যত জন্মাবে—সকল মানুষের কাছে। ভগবান, দাও কিছু নতুন তথ্য! কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে ধরো একটুকরা কাগজ বেরিয়ে পড়ল, যার বলে নিঃসংশয়ে বুঝে যাচ্ছি টমাস কুঠিয়ালের ঐ চিঠিগুলো আগাগোড়া জাল। এমন তো আকচার হচ্ছে ইতিহাসের ব্যাপারে। কাশীশ্বর কলঙ্কমুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসুন। 'কোম্পানির আমলের' পরিশিষ্টে বিশ্বেশ্বর সেই খবর জাহির করে দেবেন—দেখ, এমন কৌশলী নীলকররা—কাশীশ্বর হেন মানুষকেও ভণ্ড বানাতে চেয়েছিল···

স্তূপাকার কাগজপত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে বিশ্বেশ্বর ভাবছেন, আহা তাই যদি ঘটে সত্যি সত্যি, বেরিয়ে পড়ে এমনি-কিছু ঐ গন্ধমাদনের অন্ধিসন্ধি থেকে!

অরুণাক্ষ আকাশ-পাতাল ভাবছে বাড়িতে বসে। বিশ্বেশ্বরের কাছে যাতায়াত কম দিন তো হল না, তাঁকে জানে সে ভাল রকম। সৃষ্টিছাড়া মানুষ—ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না, সংসারের ক্ষতি-দুঃখ টলাতে পারে না এ মানুষকে। আদর্শের জন্য হাসতে হাসতে যে সব বঙ্গবাসী ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিল, ইনিও প্রায় সেই জাতের।

অতএব আর কোন উপায় হতে পারে? ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না। হেঁটে হেঁটে চলল সে বিশ্বেশ্বরের বাড়ি।

ভেবেছিল সরমাকে একলা পাবে। সারাদিনের বৃত্তান্ত শুনবে, উপায় চিন্তা করা যাবে। কিন্তু তিনি নন, যে মানুষটিকে পাওয়া গেল সে হল ইরা।

বাবা তো নেই এখন। অনর্থক এলেন।

অরুণাক্ষ বলে, লাইব্রেরিতে আছেন—সে তো জানিই। কিন্তু একেবারে অনর্থক হবে কেন?

একটু হেসে বলে, এসেছি যখন, দেখা হয়ে গেল সামনাসামনি—কিছু গালিগালাজ খেয়ে যাই।

মুখ শুকনো করে ইরা বলে, সত্যি, আমি বড় কুঁদুলে।

নিজেই তা বুঝতে পারি। স্বভাব কি করে শোধরাবো জানিনে। দুনিয়ার কেউ দেখতে পারে না এইজন্যে।

দেখতে পারে না আবার! কোঁদল করেই তো ভালবাসা কেড়ে নেন—

ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কথাটা। বলে ফেলে সভয়ে তাকায়। এই রেঃ, দাবানল ও জলোচ্ছ্বাসে সৃষ্টি তোলপাড় হয় বুঝি! কিন্তু না, কিছুই হল না। বাড়ি ফিরে এসে আদ্যোপান্ত নিশ্চয় শুনেছে ইরাবতী। তা সত্ত্বেও দেবীর মেজাজ অবিশ্বাস্য রকম ভালো।

সাহস পেয়ে অরুণাক্ষ শুরু করে, আপনি শুনেছেন বোধ হয়—

শুনেছি অনেক কিছু। কোনটা বলছেন ধরতে পারছিনে তো—

গাঢ়স্বরে অরুণাক্ষ বলে, মনে মনে কতদিন ধরে আমি এক স্বপ্ন লালন করছি ?

ইরা ফিক করে হেসে ফেলে, কত কথাই শুনলাম, এটা কেউ বলল না তো ?

বাইরের লোকের বলবার কথা তো নয়। একদিন আমিই বলব—সেই পরম ক্ষণের আশায় গোপন রেখেছিলাম।

কি হল ইরাবতীর—আর সে কৌতুক করে না, রাগও নেই। চোখ দুটো তুলে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল অরুণের দিকে। আচ্ছন্নভাবে অরুণ দাঁড়িয়ে আছে। খানিক পরে তন্দ্রা ভেঙে যেন জেগে উঠল।

আপনি যদি একটু বলে দেন—

নিরীহ নির্বোধের ভাবে ইরা বলে, কাকে কি বলতে হবে ?

বলবেন মেসোমশাইকে। যেমন বললে ভাল হয়, তাই বলবেন। আমি কি বুঝি, কি আপনাকে বোঝাতে যাবো ?

চলে যায় অরুণাক্ষ। মন তার ভরে গেছে।

ইরা বলে, মা আছেন উপরে—

থাক, আজকে থাক। কাউকে আর কিছু বলবার নেই। সমস্ত আমার বলা হয়ে গেছে।

হেঁটে যাচ্ছে না, পাখনা মেলে উড়ে চলেছে সে এবার। মাটির উপর পা নেই।

ক্রমশঃ

পরিচালক—উপানন্দ

অভিজ্ঞতার বাণী

তোমরা জেনে রেখো তরমুজ আর মানুষের ওপর দেখে পরিচয় পাওয়া সুকঠিন। উভয়েই বর্ণচোরা। এদের ভেতরটা যতক্ষণ না দেখ্‌তে পাচ্ছ ততক্ষণ এদের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করোনা। নির্ব্বোধের হৃদয় তার মুখে, নির্ব্বোধ হাঁ করলেই হৃদয়ের ভাব বুঝতে পারা যায়—কিন্তু জ্ঞানীর মুখই হৃদয়ে। শত্রুকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করতে নেই। রকমারি খাবার খেলে রকমারি পীড়া হোতে পারে, আর অসংখ্য ঔষধ সেবন করলে আরোগ্যলাভ করা যায় না, বরং রোগ জটিল হয়ে ওঠে। জীবন সুদীর্ঘ করতে হোলে আহার কমাতে হবে। যারা বেশী আহার করে, তারা দীর্ঘজীবী হয় না, মেদগ্রস্ত হয়ে অকালে জীবন হারায়। জীবন রক্ষার জন্যে আহার করবে, যেন আহার করবার জন্যেই জীবন ধারণ করোনা।

যে ব্যক্তি যত বেশী অমিতব্যয়ী, সে ততই অভাবগ্রস্ত হয়ে শেষে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে লোকের কাছে দাঁড়ায়, ভিক্ষাপেলেও তার স্বভাবের দোষ পরিবর্ত্তন করে না। পূর্ব্বের মতই অমিতব্যয় করে আরও কষ্ট পায়। যার ধর্ম্মের আবরণ নেই, যে যত বস্ত্রই পরুক না কেন, তার দরিদ্রবেশ।

মানুষের চারিদিকে বিপদ, অসতর্ক হলেই সুখের সংসার শ্মশান হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা প্রত্যেক বিষয়ে সতর্ক হয়ে কাজ করবে, আর সেই মত শিক্ষা নেবার জন্যে মন দেবে। ভালো কাজে স্বার্থত্যাগ করবে, এর দ্বারা হৃদয় উচ্চ হবে, সমাজের উপকার হবে। ভালো কাজের জন্যে মুক্তহস্ত হওয়া উচিত, তা না হোলে সমাজের কোন কল্যাণ করা যাবে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে, তোমরা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করবার জন্যে কাজ করবার চেষ্টা করবে একটু অবসর পেলেই।

পরিমিত আহার, পরিমিত ব্যয়, পরিমিত কথা—এইগুলি সৎগুণ। এইরূপ সৎগুণসম্পন্ন লোকের সংস্রবে আসবে, এঁর অনুকরণ করবার চেষ্টা করবে, তা হোলে একদিন দেখবে যে তোমরা কায়িক ও মানসিক উন্নতি লাভ করে অনেকখানি উন্নত হয়েছ। পর-চর্চ্চায় শত্রু বৃদ্ধি হয়, এদোষ পরিহার করবে। সকলকে আপনার ভাবলেই সকলে আপনার ভাববে—এইটাই সুখের উৎকৃষ্ট পথ, আর মানুষের সেরা ধর্ম্ম।

ভগবান আছেন, এটা বিশ্বাস করবে—তর্ক করে হেসে তথাকথিত বাস্তববাদীদের মত উড়িয়ে দিওনা, তা'তে ফল ভালো হয় না। নাস্তিকরা সুখী হয় না, কেন না তাদের পশ্চাতে কোন অবলম্বন বা আদর্শ নেই। যারা দেহে মনে প্রাণে নির্ম্মল আর সৎচিন্তা করে, তারাই ভগবানের দর্শন লাভ করে। ভগবান ন্যায় অন্যায়ের বিচার করেন, এটা ভুলো না। স্মরণ রেখো, ভগবানের দেওয়া ফুরোয় না, আর মানুষের দেওয়া কুলোয় না।

সুখের জন্যেই সংসার করা, এজন্যে সরল, সত্যবাদী, দয়ালু আর সর্ব্বদা প্রসন্ন হয়ে থাকবে। উচ্চ আদর্শ দেখিয়ে অসরলকে সরল করে নিতে হয়। শান্ত, ধীর আর নিরহঙ্কার হবে, প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীকে কখন ঘৃণা করো না, তা হোলে সুখী হোতে পারবে না। কর্ম্মক্ষেত্রেও এইসব গুণ না থাকলে কখন উন্নতি করতে পারবে না।

পবিত্র হৃদয়েই রয়েছে সন্তোষের নিভৃত কক্ষ। স্বাস্থ্যই সমস্ত সুখের আকর, কোন মতেই স্বাস্থ্য নষ্ট হোতে দিও না। যৌবন মদগর্ব্বে যে স্বাস্থ্য নষ্ট করে, বয়স কালে তাকে অনুতাপ করতে হয়। তোমরা যদি অন্ততঃ কুড়ি বছর বয়স পর্য্যন্ত ফুলের মত নির্ম্মল হয়ে আর সংযমী হয়ে কাটাতে পারো, তা হোলে তারপর স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন সাংঘাতিক অবস্থা হবে না। একরকম অপ্রতিহত ভাবে চলে যাবে, এজন্যেই কৈশোরে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার কথা বলে গেছেন ঋষিরা। তোমরা ঋষিদেরই সন্তান, তাঁদের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

পদব্রজে দীর্ঘ পথ ভ্রমণে ব্যাধি সারে, ঔষধ ও পথ্যেও তত সারে না। দিনের হাওয়া অপেক্ষা রাত্রের হাওয়া শরীরের পক্ষে উপকারী। যে ভোগ ত্যাগের দ্বারা সংযত নয়, সে ভোগ দানবীয় ভোগ, তা কখনই কল্যাণকর হোতে পারে না। ভোগ ও ত্যাগের সংযোগ ও সামঞ্জস্যের

মাধ্যমে যথার্থ লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠে। ভোগকে সংযমের দ্বারা মধুর করতে আর্য্যজাতি যেমন শিখেছিলেন, জগতের আর কোন জাতি তেমন শেখেনি।

জীবনের প্রভাতই কাজ করবার উপযুক্ত সময়—জীবনের অপরাহ্ণে সময়ের কিছু মূল্য নেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঅভ্যাস একটু একটু করেই শেষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বিন্দু বিন্দু বারি যেমন ক্ষুদ্র সরিৎ উৎপন্ন করে শেষে নদীর রূপ ধরে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তেমনই নগণ্য কুঅভ্যাসগুলি ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে মানুষকে সাংঘাতিক অবস্থায় টেনে নিয়ে যায়। অনেক নির্ব্বোধ ব্যক্তি উপদেশ অবহেলা করে ধ্বংসের অগাধ সলিলে মিশে যায়।

বরং তিনঘণ্টা পূর্ব্বে যাওয়া ভালো, তবু এক মিনিট বিলম্বে সকল উদ্দেশ্য পণ্ড করে দেওয়া উচিত নয়। বন্ধুত্বের প্রসার ও সংস্কার নিত্য আবশ্যক। পুরাতন নিয়েই চিরদিনের কারবার চলে না। যিনি এটুকু না বুঝতে পারেন, তিনি শেষ জীবনে নির্ব্বান্ধব ও নিরালম্বভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়ে থাকেন।

যে কোন বিষয় বা বস্তু দেখেই যিনি শত মুখে তার গুণকীর্ত্তনে মত্ত হয়ে ওঠেন, তাঁর কথায় বেশী আস্থাস্থাপন করো না। যিনি সকল বস্তুর নিন্দাবাদেই কেবল পটু, তাঁর কথা তার চেয়েও কম বিশ্বাসযোগ্য। আর যাঁর মুখে কোন বিষয়ের সুখ্যাতি বা নিন্দা কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না, তাঁর কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়।

কৌতূহল বশে সখ করেও কখন পাপের পথে পদার্পণ করো না। পাপের মোহিনী শক্তির তুলনা হয় না—এক মুহূর্ত্তে সমগ্র মন অধিকার করে ফেলে শেষে পাপ সর্ব্বনাশ ঘটাবেই, আর জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করাবেই।

লোকের গুণ পরীক্ষা করবার আগে স্বভাব পরীক্ষা করা উচিত, কেননা স্বভাবই সমস্ত গুণ অতিক্রম করে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসে। গুরুজনের সম্মুখে নানা ভঙ্গিমায় দাঁড়ান, অপ্রাসঙ্গিক আলাপ, অসহনীয় তার্কিকতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অছিলায় অবাধ্যতা, আমোদ-প্রমোদে সময় কাটানোর অজুহাতে অহোরাত্র গান বাজনা করা—এ সকল দোষ সর্ব্বদা বর্জ্জন করবে।

আড়ম্বরশূন্য জীবন ও উচ্চ চিন্তা উন্নতির বিশিষ্ট উপাদান। আহার, বিহার ও বেশভূষায় অধিক আড়ম্বর করে জীবনটা কাটাবার চেষ্টা করলে, উচ্চ চিন্তা তোমাদের দ্বারা হওয়া সম্ভব হোতে পারে না। যেখানে মিতব্যয়ের অভাব, সেখানে আত্মরক্ষা করাই দায় হয়ে ওঠে।

'প্রত্যেক মানুষের জীবনই এক এক একখানি নিখুঁত শিক্ষাপ্রদ জীবন্ত উপন্যাস। চিত্তের প্রফুল্লতা উৎকৃষ্ট ভেষজতুল্য হিতকর। গুণবান ব্যক্তি আপনার সৌরভেই সর্ব্বত্র বিদিত হয়ে থাকেন। সুখের সময়ে সংযম, আর দুঃখের সময়ে সহিষ্ণুতাই পরম গুণ। দুঃখ ও ক্ষতির তীব্র কষাঘাতেই মানুষ বিজ্ঞ ও নতশির হোতে শিক্ষা করে।

সর্ব্বদা কালের গতির অনুকূলে যাবে, কখন এর প্রতিকূলতা আচরণ করতে সাহসী হোয়ো না। প্রকৃতির অনুবর্ত্তনই সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা। সংসারে অশান্তির কারণ হচ্ছে প্রথম পরস্পর পরস্পরের অনৈক্য ও অসহযোগ ভাব—এইটী জন্মায় কর্ত্তব্যের অবহেলা হোতে।

তোমাদের নিজের সঙ্গে যুদ্ধই বড় যুদ্ধ, আর তাতে জয়লাভ করাই আসল লাভ। এই জগতটা যেন একটা মড়া, আর জগতের সুখের জন্যে যারা ব্যস্ত, তারা কুকুর—এক টুকরোর জন্যে কামড়াকামড়ি করে মরছে। ভালো করে কাজের আরম্ভ ভালো, কিন্তু ভালো করে কাজ শেষ করা তার চেয়েও ভালো। শেষ ভালোই ভালো।

কাক পথপ্রদর্শক হোলে সে কখন ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারে না, ঠিক একেবারে নিয়ে যায় মরা কুকুরের ভাগাড়ে। নীচের সঙ্গে মিশলে নীচই হ'য়ে যেতে হয়। যত দেখ্‌বে বড় বড় বাক্যবাগীশ ততই বুঝ্‌বে তারা অকর্ম্মা। যারা প্রকৃত কর্ম্মী, তারা নীরবে কাজ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীর মধ্যে বলেছেন—'যাহার ধৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত।' 'কমলাকান্তের দপ্তরে' আছে—'তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না…ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়।'

নিজে সব কথা বলা, আর নিজের সম্বন্ধে কথা বলা কথোপকথনের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে—আর অহংমন্যতার পরিচায়ক হয়। আলাপ আলোচনায় এরূপ এক চেটিয়া কথা বলা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। আমাদের বাঙালী সাহেবদের মধ্যে শতকরা আশীজনের এই দোষ আছে। তোমরা এঁদের স্বভাবটী যেন গ্রহণ করো না, কারণ তোমরা সকলেই তো আর হোমরা-চোমরা হ'য়ে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গতে পারবে না? মনে রেখো, নিজেরা যে ভুল করি, সেটা ভুলে যাই।

বায়রণ বলেছেন—'যা আমরা ঘৃণা করি, তাই ভালোবাসি।' হৃদয়ের ভাষা হৃদয়ই জানে।

গেটে বলেছেন—'যার ভালোবাসা নেই সেই দোষ দেখে, সুতরাং দোষ দেখ্‌তে হোলে মানুষকে হৃদয়হীন হোতে হয়।' এজন্যেই দেখা যায়—হৃদয়হীন ব্যক্তিরাই পর-দোষদর্শী ও দুর্ম্মুখ।

ইরাসমাস বলেছেন—'সূক্ষ্মতম চুলেরও ছায়া আছে'—দোষ দেখা খুব সহজ, গুণ দেখাই কষ্ট। নিজের দোষ কেউ দেখে না। দোষ দৃষ্টি থাক্‌লে নিজের জীবন নষ্ট হয়ে যায়, শেষে অনুতপ্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে হয়।

যাঁরা পদমর্য্যাদায় প্রভু-সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে বহু লোকের ওপর কর্তৃত্ব প্রকাশ করে থাকেন তাঁরা নিজেদের মনে করেন ভগবানের সমতুল্য, কিন্তু ভগবান অলক্ষে হেসে বলেন—'ওরে মূর্খ, যে কোন সময়ে তোর চাপরাস যদি কেড়ে নিই, তা হোলে তোর চাপরাসির চেয়েও যে অধম অবস্থা তোর হ'বে—।' একথা কয়জন ভাবে? যেটা দেওয়া যায়, সেইটাই ফিরে পেতে হয়। প্রতিক্রিয়া দ্বারাই চরিত্র ঠিক মত ধরা যায়।

তোমরা আমার কথাই শুনো—যদি শান্তি চাও, সবাইকে আপনার করে নাও। কারো দোষ না দেখাই ভালো। নিজের দোষ দেখ।

—

রূপ আর গুণ

শ্রীঅনিন্দিতা সিংহ বি-এ

এক পাহাড়ে দেশ আছে—নাম তার কাশ্মীর। এ দেশ যেন প্রকৃতি দেবীর হাতের নিভৃত পটচিত্র। পাহাড়ের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে গড়া বিরাট দেশ—তারই মাঝে শ্যামল গহন অরণ্য, নদনদী ঐশ্বর্যে সম্পদে উজ্জ্বল জনপদ—সবই যেন সাজানো। এই প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ-ভরা দেশে ছিলো এক গরীব কাঠুরে। পাহাড়ের কোলে জঙ্গলে সে থাকতো কুটীর বেঁধে। নদীর স্রোতে ভেসে-আসা কাঠ আর জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করে সে সহরে নিয়ে যেতো তার গাধার পিঠে করে। একটি গাধা ও একটি কাঠ্‌ঠোকরা পাখী ছাড়া আর তার কোনও সঙ্গী ছিলো না।

একদিন মংরু সহর থেকে কাঠ বেচে তার গাধার পিঠে চড়ে বাড়ী ফিরে আসছে, আর আনমনে ভাবছে নানা কথা। আজ হাতে তার দু' টাকা লাভ হয়েছে। কি করে পয়সা বাড়্‌বে—বাড়লে একটা উট কিন্‌তে হবে। তাহোলে তার কাজের সুবিধা হবে।

বাড়ীর কাছাকাছি আসতে-আসতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ একটা কাতরাণির শব্দে মংরুর চিন্তাজাল ছিঁড়ে গেলো। গাধা থামিয়ে মংরু জঙ্গল-ভরা পাহাড়ে পথে নেমে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে—খানিকটা দূরে এক বৃদ্ধা ধুলা মাটি রক্তে জড়িয়ে অসহায়ভাবে পথের ওপর-পড়ে আছে। পাশেই বেচারীর বোঁচকা তছনছ হয়ে পড়ে—আটা, তেল, চিনি, নুন সব গড়িয়ে ধুলায় মিশে একাকার। লাঠিখানাও পড়েছে বেশ খানিকটা দূরে ছিট্‌কে!—"আহা হা! আই মা! বড্ড লেগেচে কি? এমন পড়ে গেলে কি কোরে?"···বলতে বলতে মংরু তাড়াতাড়ি বৃদ্ধাকে তুলে বসালে—তারপর দৌড়ে রাস্তার বাঁকের ছোট্ট ঝরণার স্রোত হ'তে জল এনে বুড়ীর মুখে চোখে দিয়ে তাকে সুস্থ করলে। জল খেয়ে, একটু হাঁফ্‌ ছেড়ে বুড়ী মংরুর দিকে চাইলে—মংরু তখন তার ছড়ানো জিনিষগুলি গুছিয়ে তুলছে—"বেঁচে থাকো মাণিক। ভগবান তোমার ভালো করবেন—দয়াল দাদা আমার—"বৃদ্ধা প্রাণভরা আশীর্বাদ করতে লাগলো মংরুকে সজল চোখে।

"এমন পড়ে গেলে কি কোরে আই মা?"

"রাস্তা দিয়ে মহাজনের উটের সারি যাচ্ছিলো—তারা ইচ্ছে কোরে মজা দেখবার জন্য আমায় ধাক্কা দিলে। সহর থেকে সওদা কোরে ঘরে ফিরছিলুম ভাই—"

"তা উটের সওয়াররা দেখলে না তোমায়?" ক্ষুব্ধ স্বরে মংরু প্রশ্ন করে।

"না ভাই—তারা খুব হাসতে লাগলো।"

মংরু চুপ করে রইলো। মনে মনে বললে—বড়লোক হওয়া ভালো নয়।

ওদিকে আকাশে চাঁদ উঠে গেছে। এমন জঙ্গলভরা পাহাড়ে পথে পড়ে থাকা ঠিক নয় আর। মংরু খুব সাবধানে বুড়ীকে তার গাধায় তুলে বাড়ীতে নিয়ে এলো। কুটীরে পৌছে ভালো করে বিছানা পেতে বুড়ীকে কম্বল ঢাকা দিয়ে শুইয়ে দিলে। বুড়ীর বেশ জ্বর তখন। যাই হোক, মংরুর নিপুণ সেবা-শুশ্রূষার গুণে বৃদ্ধা দুই চারদিনেই সুস্থ হয়ে উঠলো। তবে এতদিন মংরু আর কাঠ খুঁজতে যেতে পারেনি। বুড়ী তাকে চোখের আড়াল করতে চায় না—বড্ড ভালোবেসে ফেলেছে সে মংরুকে।

"আমায় তো এবার যেতে হবে দাদা—নাতনীটা একা রয়েচে—কতো না জানি কাঁদচে ভাবনায়।" পাঁচদিনের দিন ভোরে মংরুকে ডেকে বুড়ী বললে জলভরা চোখে—"তুমি আমার সত্যিকারের আর জন্মের আপন জন—নইলে এমন সেবা কে করতে পারে?"

"সত্যি যাবে আই-মা? ঘরখানি ফাঁকা হয়ে যাবে একেবারে!" একটু চুপ করে থেকে মংরু আবার বলে, "না সত্যিই তোমার নাতনী কতো ভাবনায় আছে··· বেশ তুমি ও-বেলা যেয়ো।" বিকেলে সহর হতে ফিরে মংরু বুড়ীকে গাধায় তুলে তার বাড়ী পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এলো—সঙ্গে দিলো প্রচুর আটা, চিনি, তেল আর একটি নতুন লাঠি। মংরুর সেই লাভের দুটাকা খরচ হয়ে গেলো এতেই। পাহাড়ে-পথের আরও চার ধাপ উপরের সমতলে বুড়ীর দুই তিনটি কুঁড়ে এক সাথে বাঁধা। চার পাশে ক্ষেত—ঝরণা কাছে, ঝরঝরানি গান গেয়ে বইছে—ভারী ভালো লাগলো মংরুর। বুড়ী বাড়ীর সমুখে এসে তার হাত ধরে মিনতি করলে—"এসো না মানিক—

ভিতরে নূরুর সঙ্গে আলাপ করবে—" "না আইমা। আজ রাত হয়ে গেছে, আর একদিন আসবো!'

এরপর কিন্তু বছরখানেকের মধ্যে মংরু কিছুতেই সময় করে উঠতে পারলো না বুড়ীর কাছে যাবার। বুড়ী চলে যাবার পর হ'তেই ওর কাঠ খুব বিক্রী হ'তে লাগলো—বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লো মংরু কাজে! হাতে ওর বেশ কিছু টাকা জমে গেলো, কুটীরখানি নতুন কোরে বেঁধে আর পাঁচ ছয়টি ছাগাল-ভেড়া কিনেও। দুটি ছোট ক্ষেতও মংরু করে ফেলেছে এর মধ্যে। কাঠের চাহিদা বেশী হয়েছে—গাধায় আর যোগান দেওয়া ভার। তাই মংরু এবারই একটি উট কেনার কথা ভাবতে লাগলো। ওর প্রতিবেশীরা বড় ভালোবাসতো এই সরলমনা একা তরুণটিকে—তাদের কাছে পরামর্শ চাইতে তারা বললে—"তার চেয়ে তুই এবার বিয়ে করে ফেল্ মংরু—নইলে তোর ঘরবাড়ী, ক্ষেতিপাতি আর ছাগল ভেড়া দেখবে কে?" মংরু তো সত্যই ভাবনায় পড়ে গেলো। রাতে ঝাঁপ এঁটে ঘরের মেঝের একজায়গায় খুঁড়ে তার সঞ্চয় বার করে গুণে দেখলো। তারপর মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো—যা সঞ্চয় হয়েচে তাতে সে উটও কিনতে পারে বা বিয়েও কোরতে পারে—তারপরেও হাতে কিছু থাকবে। কি করা যায়? কিছুদিন থেকে একা আর ভালোও লাগে না। এদিকে উট কিনলে রোজগার আরও বাড়বে। হঠাৎ তার মনে পড়লো আই-মার কথা! "ঠিক্!" বলে মংরু লাফিয়ে উঠলো—"কালই ভোরে যাবো আইমার কাছে! আইমা-ই দিতে পারবে ঠিক পরামর্শ।"

পরদিন দুপুরে খেয়ে-দেয়ে মংরু রওনা হলো বুড়ীর বাড়ীর দিকে। বিকেল গড়িয়ে এলো বাড়ী পৌছুতে। বুড়ী তো তাকে দেখে প্রথমে অভিমানে আনন্দে দিশেহারা—"এতোদিনে মনে পড়লো ভাই? ভাবলুম বুঝি ভুলেই গেলে!" ·বলে আদর করে বসিয়ে তাড়াতাড়ি ছাগল-দুধ দুয়ে গরম করে খাওয়ালো, আর সঙ্গে দিলো কতোরকম মেওয়া আর বাড়ীতে গড়া পিঠে। মংরু আরাম করে চারপাইতে শুয়ে নানা গল্প করতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে তার সমস্যার কথা ভেঙ্গে বললো আইমার কাছে। বুড়ী কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে ভেবে বললে—"না! উট পরে হবে! তুমি বিয়ে করো বাছা—নইলে তোমার ঘরসংসার কে দেখবে?···আচ্ছা! এখুনি আমার নাতনী নূরু ভেড়া চরিয়ে বাড়ী ফিরবে—তাকে তোমার মনে লাগে কিনা দেখো তো দাদা—আহা! ভগবান এতো আনন্দও আমার জন্যে দেবেন কি?" বুড়ীর চোখে জল আসে।

—দিনের শেষে ছাগল-ভেড়ার পাল নিয়ে কুকুর সঙ্গে বিদ্যুৎ-শিখার মতো সুন্দরী নূরু বাড়ী ফিরলো—তার শুভ্র ঘাড়ের ওপর লতিয়ে আঁকড়ে আছে একটি ছোট কালো ভেড়ার ছানা। ঐ বাচ্চাটিকে একদিনের রেখে নাকি তার মা মরে যায়—নূরুই রেখেচে ওকে বাঁচিয়ে।

মংরুর ভারী পছন্দ হয়ে গেলো নূরুকে—এমনই দয়ামায়াভরা কাজের মেয়েকে বৌ করতে চায় সে। চঞ্চলা রূপসী কিশোরীর দুই সুডোল শুভ্র হাতে যেন মন্ত্রের মতো গৃহকর্মগুলি সমাধা হয়ে যাচ্ছে—ঐ তো দৌড়ে কাঁকে কলস নিয়ে ঝরণা হতে আনলো জল—ছাগল-ভেড়াদের দিলে সযত্নে ঝাঁপের ভেতর রেখে। ক্ষিপ্র চরণে ত্বরিত হাতে রান্নার রকমারি সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে বসলো হেঁসেলে! আহা! রুনু-ঝুনু বাজচে তার হাতের দুটি কাঁকন, আর দুলচে গলায় বিচিত্র হার কাজের তালে। মাথার টুপী হতে কপাল বেড়ে রয়েচে রূপোর ঝিক্‌মিকে কাজকরা গোল দোলকটি। মংরু মুখভরা সুখের হাসি নিয়ে বুড়ীর পানে চাইলো। নূরুর সামনে আর কোনও কথা হলো না। বুড়ী আনন্দের স্বরে তাকে দরজায় এগিয়ে এসে বললে "তাহলে দাদাভাই আসছে শুক্রবার তুমি বিকালে এসো—দিনক্ষণ ঠিক করা যাবে।"

মনভরা আশা-আনন্দ নিয়ে মংরু বাড়ী ফিরে এলো।

এ তিনদিন বড়ই উৎসাহে আনন্দে মংরুর কেটে গেলো। নতুন কম্বল, দামী পশমের আসন—নূরুর জন্য মংরু ঘরে সাজিয়ে রাখলো। এই দীন কুটীরের রাণী এতোদিনে আসচে। গোটাকতোক মনমাতানো ফুলের গাছও লাগিয়ে ফেললো মংরু কুঁড়ের দুই পাশে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় মংরুর সঙ্গে বুড়ীর বাড়ীর পথের সামনেই দেখা হয়ে গেলো। বুড়ীর ম্লান মুখ দেখে মংরু বড়ো দমে গেলো—আর একটু পরেই তার সব আশা আনন্দ চূর্ণ হয়ে গেলো বুড়ীর মুখে শুনে যে নূরু তাকে

বিয়ে কোরতে রাজী নয়। সহরের কোন এক ব্যবসায়ীর ছেলে তাকে পছন্দ করেছিল—তাকেই বিয়ে কোরবে নুরু। বলতে বলতে বুড়ী দুঃখে ভেঙ্গে পড়তে মংরু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ী এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলো। পথেই ভেবে ঠিক করলো—তাহলে এবার ও একটা উটই কিনে ফেলবে।

মংরুর উট এসে গেছে—তারপর কাটতে থাকে দিনের পর দিন। মংরুর এখন শুধু কাজ আর কাজ। ক্রমশঃ সহরের কাছে একটি ছোট্ট বাড়ী আর ছোট্ট কারবার উঠলো মংরুর। আট দশটি লোক আর দশ বারোটি উটও যেন আর যোগান দিয়ে উঠতে পারে না সে।

তিন বছর কেটে চার বছর শুরু হলো নুরুর প্রত্যাখানের পর। মংরুরও আর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। বিয়ে করার কথা ভাবলেই তার বুকটা দুঃখে টনটন করে উঠতো। তবু সবটাই যেন ভুলেই গেছে মংরু। সেই ঘটনার পর আই-মার খবরও আর জানে না।

সেদিন বাজার যাচ্ছে মংরু উটের সারি আর লোকজন নিয়ে—হঠাৎ দেখে পথে আই-মা—বৃদ্ধা যেন অতিবৃদ্ধা হয়ে পড়েছে এই অল্প সময়েই—জীর্ণ বসন, শুকনো মুখ! মংরু খুব দুঃখিত হয়ে তাড়াতাড়ি উট হতে নেমে পড়লো। বৃদ্ধা তাকে দেখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো, তারপরই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বললে, "নুরুর বোধহয় আর বিয়ে হবে না। তোমায় প্রত্যাখ্যান করবার পরই তার জীবন-সংশয় বসন্ত রোগ হয়েছিল······এরপর আর কেউ—বিশেষতঃ যে ছেলেটি তাকে বিয়ে কোরতে চেয়েছিলো—সেও আর চায় না তাকে···" মংরুরও দুই চোখ সজল হয়ে উঠলো বৃদ্ধার ও নুরুর দুর্দশার কাহিনীতে!—দেখবার লোক না থাকায় ভেড়া-ছাগল অর্ধেক জঙ্গলে অর্ধেক খাদে নেকড়ের পেটে নুরুর অসুখের সময়ে গেছে।

—মংরু বুড়ীকে তুলে নিলে উটের ওপর। ঠুন-ঠুন আওয়াজ করতে করতে উট শিগ্‌গিরই এসে পৌছুলো বুড়ীর কুটীর দ্বারে। বুড়ীকে সযত্নে নামাতেই দেখে সুমুখেই নুরু কলস-কাঁখে জল নিয়ে ফিরছে ঝরণা হ'তে।—কোথায় নুরু? মংরুর দৃষ্টি যেন বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেলো—সেই পরম সুন্দর চিবুক, পাতলা ঠোঁট, সুডোল হাত দুটি—সেই রকমই চিকণ চুল পাটি কোরে বাঁধা—গলায় হারের ঝালর, হাতে কাঁকন—সবই আছে—তবু এ যেন আর কেউ! দুরন্ত রোগের নির্মম ক্ষতচিহ্নে রূপের প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দিয়েচে!

নুরু কলস ফেলে দুহাতে মুখ চেপে কেঁদে উঠলো। মংরু কাছে এসে নুরুর হাত দুটি ধরে বললে—"নুরু। তোমার রূপ দেখে বিয়ে কোরতে চাইনি আমি একথা বিশ্বাস করো—আমার ঘর আজও তোমার জন্যে খোলা আছে।"

নুরুকে বিয়ে করে নিয়ে যাবার সময়ে মংরু বুড়ী আই-মাকেও নিয়ে যেতে ভোলেনি।

তিন-দিন

হাসিরাশি দেবী

উনত্রিশে ডিসেম্বর—ক'লকাতার শীত চলন সই—কিন্তু যেতে হবে মাদ্রাজে;—কারণ এবারকার অধিবেশন হ'চ্ছে সেখানে। নিখিল-ভারত-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন।

অতএব কাঁথা-কম্বল বেঁধে রওনা হওয়া গেল একহাজার একত্রিশ মাইলের পথে—মাদ্রাজ মেলে। যথাসময়ে দেহ ও মনে দোলা দিয়ে গাড়ী ছাড়লো হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম থেকে। সম্মেলনে যোগ দেবার শেষ ট্রেণ এটা,—আগের দিন রওনা হ'য়েছেন অনেকে।

কামরার ভিড় বড় মন্দ মনে হ'লো না। সুতরাং খড়্গপুর ষ্টেশনে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে মাথাগুটানো—আর পা ছড়ানো গোছের বিছানা পেতে শোওয়া গেল, কিন্তু ইচ্ছা রইল 'চিল্কা' দেখার।

রাত আড়াইটায় প'ড়বে চিল্কা ষ্টেশন! পূর্ণিমার রাত। অন্ততঃ সে আলোয় কিছুটাও তো দেখা যাবে চিল্কার।

অতএব এ ওকে—সে তাকে—সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে চোখ বুজলো—যেন, চিল্কা এলে সজাগ ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু, রাত আড়াইটার সময়—বিশেষ কারো সাড়া মিললো না। ডাকাডাকিতে—দিগন্তের দিকে তাকিয়ে—অস্পষ্ট জলরেখা নজরে পড়লো,—আর কানে এলো তন্দ্রাকাতর সহযাত্রীদের এক একজনের প্রশ্ন—

—কৈ চিল্কা? চলে গেল বুঝি।

ঘুম আর এলো না।

ভাবতে লাগলাম—দাক্ষিণাত্য-যাত্রা। শাস্ত্রীয় নজীরটা বিশেষ সুবিধার নয় এ যাত্রার পক্ষে—কিন্তু বর্ত্তমানের সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। তার ওপোরেও একতার দোহাই দিয়ে বলা যায়—'সবে বেথা যাই আজ'

—তার সঙ্গে ফেরা না ফেরার কৈফিয়ৎ অচল। যেখানে যাই—খোড় বড়ি-খাড়া'র সমাজ-জীবন আমরা গড়িয়ে নেবার তাগাদা অনুভব করছি—

সুতরাং, অগস্ত্য-মুনির-বিয়োগ বেদনা—এখন আর সে যুগের মত কাতর না করলেও দোষণীয় নয়।

একত্রিশ তারিখে যখন পৌঁছালাম—তখন বেশ বেলা হ'য়েছে। প্রথমে যেখানে আমরা গিয়ে উঠি সেখান থেকে সম্মেলনের জন্য নির্দ্দিষ্ট 'রাজাজী হল' অনেক দূরে ; সুতরাং ফিরে আসতে হলো রাজাজী হলের পাশের বাড়ীটিতে।
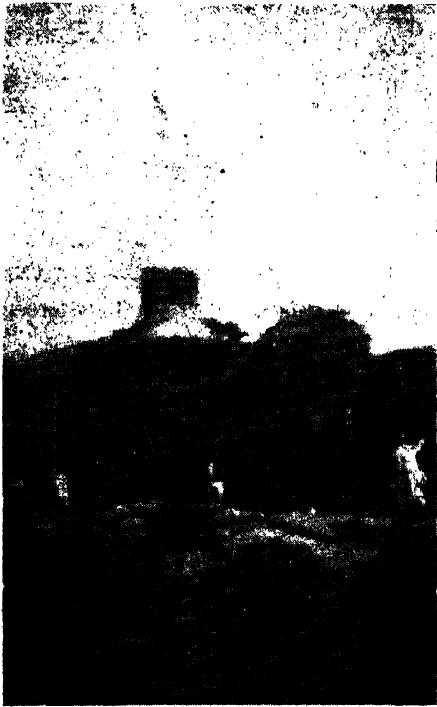
মহাবলীপুরমের ধ্বংসাবশেষ ও পুরান লাইট্‌হাউস

দুপুরের আলোয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম কিছু দূরের নীল সমুদ্র। দূরে দূরে জাহাজ ভাসছে। আকাশ ছুঁয়ে আছে সমুদ্রের নীল জল। তীরে এসে আছড়াচ্ছে ওর ঢেউ।

সে যেন একটি অশান্ত শিশু।

পানা-পচা পুকুর, খাল-বিল আর বড়জোর নদী নালা দেখাই আমাদের প্রাত্যহিক কাজ,—এমন কি অভ্যাসও ; তার মধ্যে এ দৃশ্য কিছু নতুনত্ব আনবে বৈকি ! তবে আশার কথা, যে ঐতিহাসিকেরা বাংলা আর দাক্ষিণাত্যের যোগাযোগ পথটি পরিষ্কার ক'রে রেখেছেন—অনেক চেষ্টায়। দেড় হাজার বছর আগে থেকে আবিষ্কৃত হ'য়েছে তার সূত্র। তার পরেও যে সব বাঙ্গালীরা পর পর দাক্ষিণাত্যে আসেন, বসবাস করেন ও বঙ্গ-সংস্কৃতির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সভ্যতা সংস্কৃতির যোগাযোগ স্থাপন করেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনও তাঁদের নাম উজ্জ্বল। সুতরাং বৈচিত্র্যবোধে যে বাঙ্গালীরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে সে কথা মানতেই হবে।

যাই হোক—এসব ভাববার সময় কম,—সুতরাং খাওয়া সেরে দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য তৈরী হওয়া গেল।

অধিবেশনের জায়গা—'রাজাজী হল'। শোনা যায়—একশো আট বছর আগে এ হলটি তৈরী হয়েছিল—এবং ভারত স্বাধীনতা লাভ করার আগে পর্য্যন্ত এটি এখানকার গভর্ণরের 'ডিনার হল' রূপে ব্যবহৃত হ'তো।

যাই হোক,—হলে উপস্থিত হ'য়েই চোখ বুলিয়ে নিতে হ'লো চারিদিকে। অধিকাংশই চেনা মুখ। বাংলার বাইরে এসে বাঙ্গালী নতুন ক'রে আপন হয় বাঙ্গালীর। এখানেও তাই হ'লো—অর্থাৎ পরস্পর কুশল-সম্ভাষণ। তারপর যথা নিয়মে চ'ললো এক একজন সভাপতির ভাষণ শোনা। শুনতে শুনতে বেলা গেল,—এলো চায়ের সময়। চায়ের পরে গান ও নাচের পালা। সমুদ্রতীরের সেনেট হল—তার স্থান। গান ও নাচ দেখে ফেরা ও খাওয়া শেষে শুয়েও পড়া হ'লো রাত এগারোটার মধ্যে। ঘুম ভাঙ্গলো রাত চারটেয়। সমুদ্রতরঙ্গের চেয়েও আকর্ষণীয় হ'য়ে কানে এসেছিল ষ্টোভের শব্দ। উঠে ব'সতেই মিসেস বাগচি চায়ের গ্লাস আগিয়ে দিয়ে বললেন—তাড়াতাড়ি। সূর্য্যোদয় দেখতে যেতে হবে।

কিন্তু উদয় দেখা ভাগ্যে নেই,—তাই মেঘের আড়ালে থেকে সূর্য্যদেব বোধহয় বিদ্রূপ করলেন সে কথায়।

—অগত্যা বালুতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ঢেউ দেখা ছাড়া উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মাউণ্ট রোড ধরে ফিরে এলাম নিজেদের আস্তানায়। সেদিনটাও কাটলো অধিবেশনের পর অধিবেশন—নাচ গান আর দোকান দেখা নিয়ে। তৃতীয় দিন সকাল ছটায় যাত্রা করা হ'লো 'এক্সকারশনে'। সারাদিনের প্রোগ্রাম। সুতরাং পাঁচ-ছয়খানা দর্শক-বাহী বাসের মাঝে মাঝে ছুটেছে 'টিফিনকার'খানা। এছাড়া আরও পাঁচ ছয়খানি ট্যাক্সি।

দুপাশের ধানক্ষেত, জলসেচের পাল, আর তালবনের মাঝে মাঝে পাহাড়গুলোও মাথা উঁচু করতে লাগলো মাঝে মাঝে। প্রথম কাঞ্চীপুরমের মন্দিরের সামনে যখন নামা হ'লো, তখন শিশির ভেজা ধানক্ষেতের মাথায় মাথায় ঝলসাচ্ছে নতুন রোদের সোনালী আলো। চারিদিকে বালি। এপাশে ওপাশে ক্ষেত, চাষীরা কাজ করছে—আর দেখা যাচ্ছে ওদের কুঁড়ে ঘর। সবই প্রায় তালপাতায় ছাওয়া।

মন্দিরের সামনেই একটি ষাঁড়ের মূর্ত্তি। হাঁটুমুড়ে ব'সে পাহারা দিচ্ছে তাই মন্দির দেবতাকে অনন্তকাল ধরে। সর্ব্বাঙ্গে তার শক্তির দাম্ভিকতা কিন্তু প্রসন্নমুখচ্ছবি। নাম শুনলাম—নন্দীকেশ্বর।

কাঞ্চীভরমের গোপুরম্

মন্দির মধ্যের মূর্ত্তিগুলি কিছু পাথরের, কিছু বালি জমাট-বাঁধা অবস্থার তৈরী। পরবর্ত্তী যুগে এগুলি রক্ষার চেষ্টায় যতটুকু মেরামত হয়েছিল
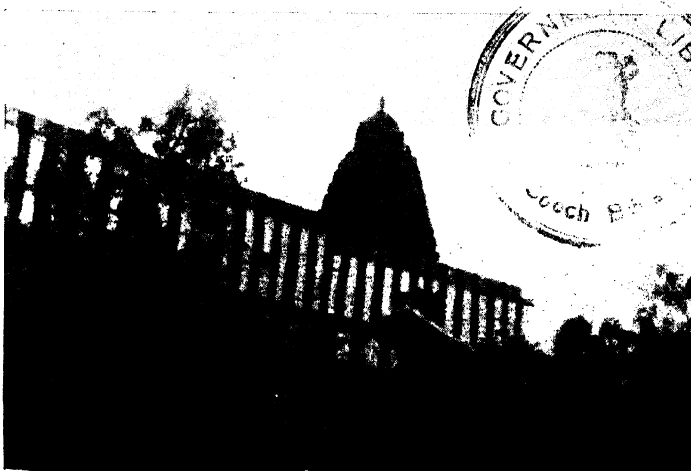
তারও কিছু খসে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। কতকগুলি মূর্ত্তি আকারে বড়, কতকগুলি ছোট। বলিষ্ঠ দেহভঙ্গি ও শান্ত মুখচ্ছবি বাংলার প্রতিমা-মূর্ত্তিকে মনে আনে। মন্দিরের গায়ে বেশীর ভাগই বিষ্ণুমূর্ত্তির বিভিন্ন রূপায়ণ ব'লে মনে হয়। পুরাণ-কাহিনীগুলিকে অবলম্বন ক'রে আলেখ্য রচনা করা হ'য়েছে—মন্দির ও মন্দির-বেষ্টিত প্রাচীর-গাত্রে —কাঞ্চীপুরমের আর একটি মন্দিরের থাম ও দরদালানের পাথর প্রাচীরে যেসব খোদিত দেব-দেবী মূর্ত্তি দেখেছি, সেগুলির আকার আরও ছোট। অনেকটা বাংলার পাল-যুগের নির্ম্মিত দেবদেবী মূর্ত্তির মত। মূর্ত্তিগুলির বেশীর ভাগই ক্ষীণ-কটী, প্রশস্ত বক্ষ ও বিচিত্র বসন ভূষণ পালযুগীয়-মূর্ত্তিগুলির সাদৃশ্য মনে আনে।

এই প্রসঙ্গে কোনারক মন্দিরের সূর্য্য মূর্ত্তির কথা মনে পড়ে। সে মূর্ত্তির মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পাল-যুগীয় শিল্পীর স্পর্শ। চোখ, মুখ, সুগঠিত দেহ ও অলঙ্করণের যে বিচিত্র সজ্জা, পালযুগের তৈরী প্রস্তর শিল্পে তা রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে,—কোনারকের সূর্য্যমূর্ত্তিতে তা লক্ষ্যণীয়। কিন্তু, যে মুখ-ব্যাদানরত উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তি উৎকল ও মান্দ্রাজের এই দুইটি মন্দিরের গায়ে দেখতে পেয়েছি, সে প্রায় একরকম ;—আর এরকম সিংহমূর্ত্তি বাংলার কোনও মন্দিরে দেখেছি ব'লে মনে হয়না।

এরপরে এসে নামা গেল—তিরুকুলে কুন্দ্রম'এ। 'পক্ষীতীর্থ' এর নাম। পাঁচশত ফুট উঁচু এই পাহাড়ের চূড়ায়—এক শিবমন্দির। সেখানে প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে একটার মধ্যে দুটি পাখী এসে নামে, আবার উড়ে যায়। এ ঘটনা যুগ যুগান্তর,—তাই এর নাম পক্ষীতীর্থ।

পক্ষীদেখা ভাগ্যে নেই—কারণ প্রায় ছয়শত সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপোরে উঠতে দৈহিক শক্তি-সাপেক্ষ! অতএব আকাশের দিকে তাকিয়ে উঠতে উঠতেই সময় কেটে গেল। এর মধ্যে যারা ভাগ্যবান, তারা পাখী দেখে ব'ললে—জটায়ুর বংশধর বলে মনে হয়না, কারণ, রামায়ণ বর্ণিত দেহধারী জটায়ুর সঙ্গে এদের দেহের সাদৃশ্য নেই ;—এরা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বড় জোর দেড় ফুট, আকৃতি সাধারণ বাজের মত ; তবে পালকের বর্ণ শাদা ; এই যা বৈশিষ্ট্য।...

এবার দুপুরের খাওয়া! খেতে যেতে হ'লো রেলওয়ে রেষ্টুরেন্টে। স্থানীয় খাবার পরিবেশন করলেন তাঁরা। খেয়ে দেয়ে রওনা হওয়া গেল—মহাবলী-পুরম—।

পক্ষীতীর্থ পাশে ফেলে বাসগুলো ছুটে চ'লেছে। দু'পাশে উড়ছে

পক্ষীতীর্থ

লাল ধুলো; সে ধুলোয় ধুসর হ'য়ে গেছি আমরা। তবু আনন্দ আর উৎসাহের শেষ নাই।—নামা হ'লো মহাবলীপুরমের একটা দিকে। মনে হ'লো জনপরিত্যক্ত কোন মহানগরী আজ এমন ঘুমে ঘুমিয়ে আছে, যে ঘুম আর ভাঙ্গবেনা। শুধু ওর স্মৃতি-রেখা বুকে নিয়ে আছে এখানকার এই পাথর,—ঐ পাহাড়।...পাহাড়ের গায়ে কিছু কিছু খোদাই-করা শেষ হ'য়েছিল সেদিন! সেদিনের মানব সভ্যতা এখানে রূপায়িত করে রেখে গেছে—সংস্কৃতির ইতিহাস। সে ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়ে চ'লেছে গৃহী, চ'লেছে তপস্বী, চ'লেছে পশুপাখী, জীব-জন্তু। সহস্রফণা নাগমূর্ত্তি যেন কোন বাঁশীর স্বর কানে আসতেই উঠে দাঁড়িয়েছে লেজে ভর দিয়ে।—চ'লেছে বন্যহাতীরা।—

এর চারিদিক অসম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে আবার হ'য়েছে মন্দির দালান তৈরী,—আবার সেই পাথরের গায়ে গায়ে দেখা দিয়েছে শিল্পীর নব রূপ-কল্পনা। কাঞ্চীপুরমের দেওয়ালে যে দুর্গামূর্ত্তিকে শত্রুবধের পর শান্তরূপে ধনুর ওপোরে দেহভার ন্যস্ত ক'রতে দেখেছি—সেই মূর্ত্তিকেই এখানকার পাথরে খোদিত দেখলাম—প্রসারিত বাহুতে শত্রুকে রণে আহ্বান করতে।—মহিষ-মর্দ্দিনীর বিচিত্র রূপায়ন এই পাথরের বুকেও যেন—যুগযুগান্ত থেকে জীবন্ত হ'য়ে আছে। এছাড়া এখানে যে কৃষ্ণলীলা ও অর্জুনের তপস্যা-বিষয়ক মূর্ত্তি গুলি দেখা যায়—সেগুলি মানবসমাজের—সভ্য ও উন্নততর জীবন যাপনের প্রতিচ্ছবি ব'লে মনে হয়।

মহাবলীপুরমের সমুদ্রতীরে রথাকৃতি মন্দির

একটু দূরে "পঞ্চ-পাণ্ডবের রথ" নামে ছোট ছোট পাহাড় কাটা চারটি মন্দির। চক্রচিহ্ন এরথের কোথাও নাই, কিন্তু ভিতর ও বাহির খোদাই করা কাজের মধ্যে নর ও নারীর মূর্ত্তি স্পষ্ট। অন্যদিকের সমুদ্রতীরে আজও একটি 'প্যাগোডা' দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো অন্যগুলির মত সেটিকেও একদিন সমুদ্র-তরঙ্গ এসে গ্রাস করবে। এ 'প্যাগোডা'টিও পাহাড় কাটা একটি ছোট মন্দির।

কত যুগযুগান্তের মানবসভ্যতার এইসব সাক্ষ্য এখনও এখানকার পাথরে পাথরে বর্ত্তমান, কিন্তু সেদিনের মানুষ নাই, এদিনের মানুষও এগুলি আঁকড়ে সেখানে বাস করছে না, কেবল বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে—ফিরে দেখছে নিজের অতীতকে, আর শ্রদ্ধাবনত অন্তর নিয়ে ব'লছে—

"কথা কও।...কথা কও!!..."

ফিরলাম। বহুদূরের যাত্রী আমরা!—রাত আটটায় ঠিক কলকাতা ফিরবার ট্রেণ! তার আগে মাদ্রাজ ষ্টেশনে পৌছানো দরকার।

...বাস ছুটে চলেছে—! অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্ষেত, পাহাড় আর তালতলার বন! কেবল শোনা যাচ্ছে—বনঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাস।...

ফিরে তাকালাম মহাবলীপুরমের নতুন লাইট-হাউসের আলোটা এখনও দেখা যাচ্ছে কি?—হাঁ! কিন্তু, আর একটু পরে?...মনে মনে বলি,—বিদায় মহাবলীপুরম! আর দেখা নাও হ'তে পারে,—কিন্তু, আজকের কথা ভুলবো না।
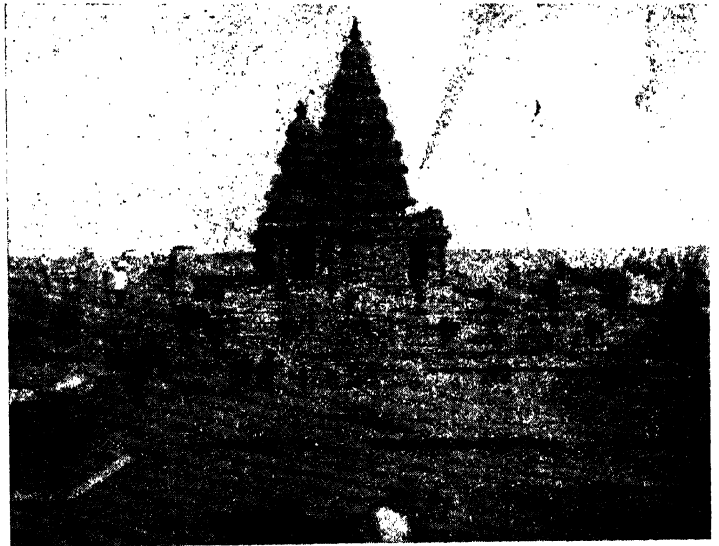
সবজান্তা নন্তু

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী

বাহাদুর ছেলে বটে আমাদের নন্তু
পৃথিবীর সব জানে, জায়গা ও জন্তু—
নাগাসাকি হংকং
জেব্রা ও কিংকং
জিরাফের গলাটা
আল্‌প্‌সের তলাটা,
এই যেন দেখে এল ইয়ালু ও ভল্‌গা
মিসিসিপি প্রাহা রোম হনলুলু ওল্‌গা।
শুধালেন বাবা, 'ওরে "নর্ম্মদা" কোথা বল?
ওপাড়ার নন্তু পিসি, যার ছেলে টলমল?

নিয়েছে সে শয্যা।
ওমা কি যে লজ্জা!
টলমল হল ফেল,
ডাক্তার সরখেল
বলে, "হার্ট-ফেইলিং নির্ঘাৎ মাদারের।"
দু'টি হাত নিস্‌পিস্ নন্তুর ফাদারের।
'দেখেছিস্ বেজি কভু ?' 'দেখি নাই বল কি ?
রামু গোয়ালার মেয়ে, দুধ ওঠে ছল্‌কি।
রাণাঘাট মেবারে
কি লড়াই সেবারে
ক্লাইবে ও বাপ্পায়
অবশেষে ধাপ্পায়
জিতে নিল দেশটাই মাঠে ওই ধাপাতে,
রাণা জোরে ছুট্ দেয় হাঁপাতে ও লাফাতে।'
'রামায়ণ পড়েছিস্ ?' 'লিখেছিল মিল্টন,
বাজারে না পাওয়া যায় পড়িয়াছি বাইরণ,

টাইগ্রিস্ টেম্‌সে
স্নান কর প্রেম্‌সে—
প্রয়াগেতে ? দুত্তোর!
সে তো ওই উত্তোর

মেরুতে বরফ ঢাকা! তার চেয়ে চল্ ডন্—
মধুপুর ?—হিমালয়ে, মৌমাছি ভন্‌ভন্।'
'বোম্বাই মক্কায়, হজ করে হাজিরা
কাজাকেতে শীতকালে বাস করে কাজীরা—

প্যাসিফিকে পাণিপথ
ভগামামা ভগীরথ
শিলং তো সিলোনে
টিটাগড় টুলোনে'—

বাবা বলে জু'তে যাও এইবার আলিপুর'!
নন্তু বেজায় খুশী, 'কি মজা! ফরিন্ টুর্।

সাহিত্য কর্মশালা

শ্রীঅমরনাথ রায়

বাণীপুর। ২৪পরগণা জেলার ছোট একটি গ্রাম। শিয়ালদহ-বনগাঁ লাইনের হাবড়া স্টেশন থেকে দেড় মাইল মাত্র পথ। অপরূপ এর পরিবেশ। পশ্চিম বাংলায় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের মূল কেন্দ্রটি এখানে প্রতিষ্ঠিত। এই পরিবেশের মাঝে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে কুড়িজন সাহিত্যসেবী আজ এক নূতন সাধনায় ব্যাপৃত। নূতন লিখন-পঠনক্ষম বয়স্কদের জন্য সাহিত্য রচনার জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের এখানে পাঠিয়েছেন। তারই জন্য এখানে স্থাপিত হয়েছে একটি সাহিত্য কর্মশালা।

আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় ভারত সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের সংকল্প নিয়ে এই সাহিত্য কর্মশালার কাজ সুরু করেছেন। প্রথম কর্মশালাটি স্থাপিত হয় গত বছর শান্তিনিকেতনে। গত বৎসরের সাহিত্য কর্মশালায় চারটি ভাষাভাষী রাজ্যের সাহিত্য-সেবীরা উপস্থিত থেকে তাঁদের আপন আপন ভাষায় সাহিত্য রচনা করে গেছেন। সে সব বইএর অধিকাংশই মুদ্রিত হয়নি, শুধু কয়েকখানি হয়েছে।

সদ্য সাক্ষর বয়স্কদের সাক্ষরতাকে বাঁচিয়ে রাখা আজ একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, তাদের মত সাহিত্য আজ দেশে প্রায় নেই বললেই চলে। আসলে কাজটা একটু শক্ত বলেই শিক্ষাবিদদের কাছে মনে হয়েছে। অনেক কিছু ভাববার আছে এদের বিষয়। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, এরা বয়স্ক। এরা নিরক্ষর অথবা অল্প-শিক্ষিত যাই হোক না কেন, মনোবিদদের মতে একজন পূর্ণবয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তির মতই এদের বুদ্ধিবৃত্তি। কোন অংশেই কম নয়। একমাত্র পার্থক্য—এরা শিক্ষিত, আর ওরা নিরক্ষর বা সদ্যসাক্ষর।

আজকাল সদ্যসাক্ষরদের নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। এই গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, এদের যে-কোন বিষয়েই জানবার ও শিখবার ইচ্ছা আছে। শিক্ষিত লোকের মতই এরা জানতে চায় দেশ-বিদেশের খবর, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ও এমনি আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে এসব শিক্ষা দিতে হলে সে সাহিত্যকে করতে হবে সহজ ও সরল। এর জন্য মূল বক্তব্য বিষয়কে যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল ভাষার মধ্য দিয়েই পরিবেশন করতে হবে। রচনার প্রতিটি ছত্রেই বক্তব্য বিষয় যেন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ভাষা আর অলঙ্কারের চাতুর্য থেকে এ সাহিত্যকে সর্বতোভাবে মুক্ত রাখতে হবে। তাছাড়া, সাহিত্যের পটভূমিকা হবে এদের পরিচিত। বিষয়বস্তু যতই নীরস হোক, এদের কাছে তাকে যথেষ্ট সরস ক'রে পরিবেশন করতে হবে। লেখার মধ্যে এমন সব শব্দ ব্যবহার করতে বা যার অর্থ বুঝতে তাদের বেগ পেতে না হয়। তাই লেখার মধ্যে শব্দ বিন্যাসের দিকে লেখককে বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে। বাক্যগুলি হবে খুব ছোট ছোট।

এর পরের সমস্যা দেখা দেয় এই সাহিত্য পুস্তকাকারে মুদ্রিত করার সময়। মুদ্রিত বইটি হবে বেশ ঝরঝরে আর সুন্দর। বেশ বড় বড় অক্ষরে ছাপতে হবে, যাতে সদ্যসাক্ষরদের পড়তে কষ্ট না হয়। বইএর কলেবর বেশী হবে না। মাত্র ১৫।১৬ পাতার মধ্যেই বইএর কলেবর সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। বিষয়বস্তুতে ভালভাবে বোঝাবার জন্য কিছু কিছু ছবি সন্নিবেশিত করতে হবে। সর্বোপরি বইএর দাম হবে সামান্য—যাতে করে দরিদ্র সদ্যসাক্ষরদের ঘরে ঘরে এ বই স্থান পায়। দেশের অর্থনৈতিক সংকটের দিকে লক্ষ্য রেখে যত কম দামে বই বিক্রী করা যায়, ততই মঙ্গল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার সদ্যসাক্ষর বয়স্কদের শিক্ষাসমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে স্থাপিত হয়েছে নৈশ বিদ্যালয়। হাজার হাজার জনশিক্ষক এই নৈশ-বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করার দুশ্চর তপস্যায় নিমগ্ন রয়েছেন।

ছিলেন। এই ভ্রমণের ফলে ভারতের সহিত ইরাণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইবে।

কোচবিহারে উদ্বাস্তু সমস্যা—

গত ২রা মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় সীমান্তের শেষ রেল ষ্টেশন গীতালদহ হইয়া ৯ হাজারেরও অধিক উদ্বাস্তু কোচ-বিহারে প্রবেশ করিয়াছে ও ষ্টেশন প্ল্যাটফরমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ফলে চাউল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমানও আছে। কোচবিহার সহরেও বহু উদ্বাস্তু পরিবার আসিয়া ষ্টেশন প্ল্যাটফরমে, রাস্তার পাশে, গাছতলায় ও অফিস এলাকায় আশ্রয় লইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। যদি পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু-আগমন বন্ধ করা না হয়, তবে পশ্চিমবাংলার বহু জিলাকে কোচবিহারের মত সমস্যায় পড়িতে হইবে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে।

পাকিস্তানে নূতন নিয়োগ—

মৌলবী এ-কে-ফজলুল হক ৮২ বৎসর বয়সে পূর্ববঙ্গের গভর্ণর পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি আজীবন দেশসেবা ও রাজনীতি চর্চা করিতেছেন। সংযুক্ত বাংলার শাসন ব্যাপারে ও তাঁহার দান কম ছিল না। তাঁহার নিয়োগে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। মিঃ ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনিও বাঙ্গালী, মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের লোক। তাঁহার নিয়োগেও বাঙ্গালীরা আনন্দিত হইবেন। তিনিও নানাভাবে সারাজীবন দেশসেবা ও জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ—

কলিকাতাস্থিত ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ ১৯১৫ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ৩০ বৎসরে ১১ ইঞ্চি বসিয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতে গত ১০ বৎসরে মাত্র সিকি ইঞ্চি বসিয়াছে। তাহাতে সৌধের কোন ক্ষতি হয় নাই। ঐ স্মৃতি সৌধকে বর্ত্তমানে কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইলে দেশবাসীর বিপুল অর্থব্যয় সার্থকতা লাভ করিবে।

বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা—

ভারতের অন্যতম খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও লোকসভার সদস্য অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী সকাল সওয়া দশটায় দিল্লীতে সহসা হৃদরোগে ৬২ বৎসর বয়সে রাষ্ট্রপতি ভবন হইতে কয়েক গজ দূরে মাটিতে পড়িয়া গিয়া পরলোকগমন করেন। তিনি পরিকল্পনা-কমিশনের বৈঠকে যোগদান করিতে যাইতেছিলেন। গত ১০ বৎসর রক্তের চাপে তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন। মৃত্যুর পরেই তাঁহার শব বিমানযোগে কলিকাতায় আনা হয় এবং সন্ধ্যার পর দমদম বিমানঘাঁটি হইতে ১৫ মাইল পথ শোভাযাত্রা করিয়া শব তাঁহার সাদার্ণ এভেনিউস্থ বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। পথে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের সম্মুখে কিছুক্ষণ রাখা হইয়াছিল। পরদিন সকাল ৯টায় শব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ১৮৯৩ সালে ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বহুকষ্টে তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে হয়। ১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন—১৯১৯ সালে তিনি ডি-এস্‌সি ও ১৯২০ সালে পি-আর-এস হন। ১৯২১ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক ছিলেন ও ১৯২৩ হইতে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসর কাল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৮ সাল হইতে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যাপক হন এবং মৃত্যুর ২ বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত সে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার সদস্য হন ও মৃত্যুর দিনও সে কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি দামোদর বন্যা সাহায্যে ও ১৯২৩ সালে উত্তরবঙ্গ বন্যা সাহায্যে কাজ করিয়াছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনের সহিত তিনি প্রথম হইতে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি ভারতের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন।

ডাক্তার জেম্‌স ক্যাজিন্স—

খ্যাতনামা কোবিদ ও ভারতবন্ধু ডাক্তার জেম্‌স কাজিন্স গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৮৩ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ মদনাপল্লীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৭৩ সালে আয়র্লণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯১৫ সালে তিনি ভারতে আসেন। তদবধি ডাক্তার এনি বেসান্টের সহকর্ম্মীরূপে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মদনপল্লী কলেজের সভাপতি ও আদিয়ার কলাক্ষেত্রের সহ-সভাপতি ছিলেন। যে সকল শ্বেতাঙ্গ এদেশে আসিয়া ভারতীয় ভাবধারা জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ডাক্তার কাজিন্স তাঁহাদের অন্যতম।

শিল্পপতি অতীন্দ্রনাথ দে—

হাওড়া মোটর কোং লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা অতীন্দ্রনাথ দে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। হাওড়া কোনা গ্রামে জন্মলাভ করিয়া তিনি প্রথম জীবনে খিদিরপুর ডকে সামান্য চাকরী করিতেন। ১৯২০ সালে ৪০ বৎসর বয়সে তিনি মোটর গাড়ীর মেশিনের অংশ বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। অনেক চেষ্টার ফলে ব্যবসা সাফল্যমণ্ডিত হয় ও ১৯৩৭ সালে তিনি লিমিটেড কোম্পানী গঠন করিয়া ব্যবসার বিস্তার করেন। কলিকাতায় বিরাট কারখানা ও দোকান ছাড়াও বর্ত্তমানে দিল্লী, বোম্বাই, পাটনা, কটক, ধানবাদ ও গৌহাটীতে ব্যবসার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি গ্রামকে ভালবাসিতেন ও গ্রামের উন্নতির জন্য বহু অর্থ দান করিতেন। তাঁহার ৪ পুত্র—সুশীলকুমার, সুনীলকুমার, হেমন্তকুমার ও কানাইলাল। সুশীলবাবু খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও সমাজ-সেবায় আগ্রহশীল কর্মীহিসাবে সর্বজনপরিচিত।

নেতাজী জীবিত—

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ডেপুটী চেয়ারম্যান শ্রীমথুরাম থেভর এম-এল-এ (মাদ্রাজ) গত ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মিলনে বলিয়াছেন যে তিনি গত ৭ বৎসর ধরিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত যোগ রাখিয়াছেন। নেতাজী আসাম সীমান্তে সিংকিয়াংয়ে চীনা সরকারের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লইয়া আছেন। তিনি এখন আত্মপ্রকাশ করিবেন না। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি আত্মপ্রকাশ করিবেন। শ্রীথেভর সম্প্রতি ব্রহ্মে যাইয়া নেতাজীর সহিত সংযোগ দৃঢ় করিয়া আসিয়াছেন। সংবাদটি চাঞ্চল্যকর বটে !

পরলোকে বিজন কুমার—

ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ৬৫ বৎসর বয়সে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বুধবার কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বিপত্নীক ছিলেন—একমাত্র পুত্র বর্তমান। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকায়-গত জানুয়ারী মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯১ সালের ১৫ই আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার পিতা চুঁচড়ায় উকীল ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ইতিহাসে এম-এ ছিলেন। এম-এল পরীক্ষায় ও তিনি প্রথম হইয়াছিলেন। পরে ডি-এল হইয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে আইন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ১৯৩৪ সালে জুনিয়র গভর্ণমেণ্ট উকীল, ১৯৩৬ সালে সিনিয়র সরকারী উকীল ও সেই বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হন। ১৯৪৮ সালে ফেডারেল কোর্টের ও ১৯৫০ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ও ১৯৫৪ সালে তথায় প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সভাপতি রূপে এদেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারে ব্রতী ছিলেন।

আচার্য্য নরেন্দ্র দেও—

নিখিল ভারত প্রজা-সোসালিষ্ট দলের সভাপতি আচার্য্য নরেন্দ্র দেও গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিকালে মাদ্রাজ-কইম্বাটোর হইতে ৫৫ মাইল দূরে পেরুন্দুরাই স্বাস্থ্যনিবাস হইতে ১১ মাইল দূরে এরোদ প্রজেক্ট হাউসে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীজহরলাল নেহরুর ৪০ বৎসরের সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহার শব উড়োজাহাজে করিয়া পরদিন লক্ষ্ণৌয়ে নীত হয় ও তথায় দাহ করা হয়। তিনি বহুদিন যাবৎ শ্বাসকষ্টে ভুগিতেছিলেন ও গত ৬ই জানুয়ারী কইম্বাটোরে গিয়াছিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁহাকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করিয়াছিল। ফয়জাবাদে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯২০ সালে তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। তিনি কাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, চীনে প্রেরিত ভারতীয় সংস্কৃতি মিশনের সদস্য, উত্তর-প্রদেশ রাজ্য কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য, উত্তরপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য প্রভৃতি পদে কাজ করিয়াছেন। তিনি ৪ বার কারাবরণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি কংগ্রেস দল ত্যাগ করিয়া সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করিয়াছিলেন।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন—

১৯৫৫-৫৬ সালের বিজ্ঞান বিষয়ে ৫ হাজার টাকা মূল্যের রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' নামক গ্রন্থের লেখক শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেনকে প্রদান করা হইয়াছে। তিনি কলিকাতা যাদবপুরস্থ ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সম্পাদক এবং ভারতবর্ষের লেখক। আমরা তাঁহার এই সম্মানপ্রাপ্তিতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীযোগীন্দ্রলাল সাহা—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য প্রফুল্লকুমার গুহ (দমদম মিউ-নিসিপালিটীর চেয়ারম্যান) পরলোকগমন করায় কংগ্রেসপক্ষের শ্রীযোগীন্দ্রলাল সাহা সেই আসনে নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। তাঁহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রার্থী ছিলেন না।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা—

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার জন্য এ পর্য্যন্ত ১৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বিহারস্থ মাসাঞ্জোরে ২১০০ ফিট লম্বা একটি পাকা বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। বাঁধ হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে তিলপাড়ায় ১০১৩ ফিট লম্বা একটি জলাধার নির্মিত হইয়াছে। তিলপাড়া জলাধার হইতে দুই দিকে দুইটি খাল এবং বাঁধ হইতে একটি খাল খনন করা হইয়াছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে ৬ লক্ষ একর জমীতে জল-সেচের ব্যবস্থা হইবে ও বিহারে ২৩ হাজার একর জমী জল পাইবে। বাঁধের গোড়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ৪ হাজার কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করা যাইবে। তাহার ফলে বীরভূম জেলাকে উর্বর করা চলিবে। বীরভূমের অনুর্বর জমীতে সেচের ব্যবস্থা হইলে ঐ অঞ্চলে বহু উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হইবে, খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়িবে, মানুষের অন্যান্য সুখসম্পদও বৃদ্ধি পাইবে।

বাঙ্গালী লেখকের পুরস্কারলাভ—

ভারত সরকার জনপ্রিয় সাহিত্যপ্রসারের জন্য যে দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন, দিল্লীতে তাহার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। "ঋষিদের চোখে প্রাচীন ভারত" পুস্তক লিখিয়া শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৫ শত টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এইরূপ নানা ভাবে লেখকদিগকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মিত্র—

আলীপুর দেওয়ানী আদালতের প্রবীণ উকীল শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতা ৯।১৩ বেলতলা রোড ভবানীপুর নিবাসী শ্রীরথীন্দ্রনাথ মিত্র গত জানুয়ারী মাসে এটর্ণী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বেলচেম্বার স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। কামনা করি, তাঁহার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হউক।

মেয়েদের কথা

নারী ও নরক

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

অতি প্রাচীনকাল থেকে পতিতাবৃত্তি পৃথিবীর নানাদেশে চলে আস্‌ছে। আমাদের দেশের বৈদিক সাহিত্যে এবং পৌরাণিক কাহিনীতে এ সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়েছে, এমন কি স্বর্গে পর্য্যন্ত এই দূষিত ক্ষত বিস্তৃত হওয়ার কথাও অবগত হওয়া গেছে। কর্কট রোগের মতই এর প্রবর্দ্ধন যুগে যুগে মনুষ্য সমাজের ওপর প্রত্যক্ষ হয়ে আস্‌ছে, ফলে বহু পরিবার বিধ্বস্ত হয়ে নানা দুর্ভোগের ভেতর দুর্ভাগ্যের দ্বারে এসে আর্ত্তনাদ করে চলেছে। এই বৃত্তি অবলম্বনের পশ্চাতে নানারকম যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে, যা হৃদয়গ্রাহ্য কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। অনেকে বলেন—'সভ্য জীবনের পক্ষে এটা অপরিহার্য্য ছিল, আছে এবং থাক্‌বে, একে উচ্ছেদ করা যায় না।' ইন্দ্রিয়লোলুপ পশু-মানবের কবল থেকে নারী সমাজকে রক্ষার জন্যে যুগে যুগে পতিতালয়গুলোকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে—আমাদের দেশে পূর্ব্ব যুগে পতিতালয়গুলি সহরের উপকণ্ঠে থাক্‌তো, এখন সহরের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছে। সভ্যতার অগ্রগতির প্রতি স্তরেই মানুষের মনে এর অস্তিত্বজনক নৈতিক অস্বাস্থ্যকর দূষিত আবহাওয়া অস্বচ্ছন্দতা এনে দিচ্ছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে Calcutta Immoral Traffic Act আইন প্রবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও এখনও এই সহরে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে পতিতাবৃত্তি ব্যবসায় চলেছে। সামাজিক সুস্থতার মারাত্মক প্রতিরোধক এই জঘন্যবৃত্তি মেয়েরা বাধ্য হয়ে ঘটনাচক্রেই গ্রহণ করে এবং তা যে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বে, এর প্রামাণিক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বান্ধবতার সুযোগ নিয়ে বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত পুরুষ বহু পরিবারের তরুণী ও মহিলাগণকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়েছে।

পতিতা ও পতিতাবৃত্তির সংরক্ষণ ও অবলোপ এই দুইটী ভিন্নমুখী ধারা বহুদেশে বহু সমস্যার উদ্ভবই করেছে—এর গ্রহণ ও বর্জ্জন নিয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রকর্ণধারগণ নানা প্রকার গবেষণা করেছেন, অবশ্য কেহই নারীর এই ঘৃণ্য বৃত্তি-অবলম্বনকে সমর্থন করেন নি। কোন রাষ্ট্র সহনশীলতার মাধ্যমে একে সমাজের অঙ্গীভূত করে গেছেন, আর কোন রাষ্ট্র বা এর উচ্ছেদ সাধন করেছেন। পতিতাবৃত্তির সমস্যাটী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এককভাবে পর্য্যালোচনা করা যায় না। কেননা আমাদের জাতীয় বৃহত্তর সমস্যারই একটি অংশ-বিশেষ হিসাবে একে দেখা দরকার। মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর ভিতর যৌনতার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়ে গেছে। সঙ্গ নির্ব্বাচনে নারী সম্প্রদায়ের পক্ষে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক—কেননা প্রলুব্ধ করাই পুরুষের প্রবৃত্তি।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে আর্থিক উপার্জ্জন ভারাক্রান্ত পতিতাবৃত্তি লুব্ধ ব্যবসায়ে পর্য্যবসিত হয়েছে। দালাল, আড়্‌কাঠি প্রভৃতির মারফৎ নারীর দেহ-পণ্য অর্থ বিনিময়ে ইন্দ্রিয়লোলুপ পশু-মানবের উপভোগ্য হয়ে থাকে। এই বিড়ম্বনাভোগ করে করে শেষে নারীর জীবম বিষময় হয়ে ওঠে, আর এই সব পতিতালয়েই খুন, জখম, রাহাজানি মারপিঠ হয়ে থাকে। কারণ কদর্য্য পতিতালয়ে যারা আসে আর থাকে, তাদের কারোই সুস্থ মন নয়। পুলিসের বিবিধ রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়,—অধিকাংশ খুনের পশ্চাতে নারীকেই কেন্দ্র করে মানুষের বর্ব্বরতা প্রকাশ পায়। নারী খুন করে, খুনও হয়।

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যে উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে যেখানে মেয়ে পুরুষ একত্র হয়েছে, সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে অবৈধ মেলামেশা লক্ষ্য করা গেছে। আর্থিক সঙ্কটাপন্ন অনেক পরিবারকে দেখা গেছে যারা মেয়েদের এই হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে,—অনেক স্বামীও বিরল নয় যারা স্ত্রীকে এই পথে

টেনে এনে তার রোজগারে বাবুয়ানি করে, আর আত্মপ্রসাদ লাভ করে। স্ত্রীর অনুমতিও এ ক্ষেত্রে অরণ্যে রোদনের সামিল হয়ে ওঠে।

কিছুকাল আগে কোন বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের সময়ে হাইকোর্টে তাঁর পক্ষ সমর্থনের সওয়াল জবাবে বলেছিলেন যে—তাঁর স্বামীই তাঁকে প্রথম মদ্যপানে বাধ্য করান উত্তমভাবে নৃত্যকুশলী হবার জন্যে, বর্ত্তমানে তাঁর অতিরিক্ত মদ্যপানে আত্মসম্বিৎ হারানোর মূলে তাঁর স্বামী, আর তাঁর স্বামীই তাঁকে বড় বড় পুঁজিবাদী ও চিত্র প্রযোজকের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ ঘটিয়ে নিজের অর্থগৃধ্নুতার চরিতার্থতা করেছেন, ফলে যৌবনের দৈহিক সম্পদ শোষণ অতিরিক্তভাবে হওয়ায় ও ব্যভিচারপরায়ণতা চরম স্তরে আসায় তাঁর পক্ষে চিত্রাভিনয় করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, এ কারণে স্বার্থকেন্দ্রিক স্বামী তাঁকে বর্জ্জন করার জন্যই বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। বিবাহ বিচ্ছেদের পর অভিনেত্রীর অবস্থা শোচনীয়ই হয়ে উঠেছে, আর চিত্রজগত থেকে তাঁকে একরকম অবসরই নিতে হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তথাকথিত ভদ্রশিক্ষিত পুরুষেরা যে কতখানি মহিলা-সমাজের শত্রুতা তা সহজেই অনুমেয়।

পতিতাবৃত্তির দিকে মেয়েদের টেনে এনে যারা পতিতা ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে, তারা নাচ, গান, জলসা, মজলিস প্রভৃতির আয়োজন করে গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের একত্র করে এবং অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পুরুষদের ভেতর রেখে ককটেল, সুরা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় উত্তেজক খাদ্য সম্ভারে আনন্দবর্দ্ধন করিয়ে শেষে তাদের বিপথগামী করে। পরে রঙ্গমঞ্চে, ছায়াচিত্রে এবং সঙ্গীতের সংস্থায় অভিনেত্রী বা নর্ত্তকী হয়ে তাদের আসতে হয়। আজকাল শিক্ষামন্দিরেও ছাত্রীর অবৈধ প্রণয় বিশেষ চিন্তার কারণ স্বরূপ হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জ্জাতিক স্তরে এনে পতিতাবৃত্তি অবলম্বনের মূলগত গতিপ্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নারীর প্রতি অতিরিক্ত পুরুষের আকর্ষণ কতিপয় স্থানে বা সাময়িক নারীদেহপণ্যবীথিতে আসার ফলে একটা বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তজ্জন্য নারীসমাজে ভাঙ্গন আসে, শান্তিশৃঙ্খলাসমন্বিত পারিবারিক জীবন শোচনীয় হয়ে ওঠে। সৈন্যদল ও ভ্রাম্যমান ব্যক্তিদের আবির্ভাবই মারাত্মক পরিস্থিতির মূলে থাকে। স্থানীয় মহিলার প্রতি আসক্তি জ্ঞাপনের জন্যে এই সব বৈদেশিক পুরুষ অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে থাকে ও নারীকে প্রলুব্ধ করে নিজেদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। অশ্লীল গ্রন্থ, অশ্লীল চিত্র এবং উত্তেজক মাদক দ্রব্যাদির প্রচলন মারফৎ নারীকে বিভ্রান্ত করে তাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা হয়ে থাকে। যে সব পতিতা নিজেদের দেশে আর সুবিধা না করতে পারায় পর দেশে যায়, তারা সেখানে কিছুটা সুবিধা করে নিয়ে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা আনে। অর্দ্ধপাতিত্যজীবী বা নর্ত্তকী শ্রেণীর মেয়েরা পুরুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য বহু রকমের কৌশল অবলম্বন করে শেষে তাদের ফাঁদের মধ্যে এনে তার পরিবারবর্গকে বিপন্ন করে তোলে। ভ্রাম্যমান ব্যক্তিদের সঙ্গে এক শ্রেণীর তরুণী থাকে, যারা অপরকে আকর্ষণ করে অর্থোপার্জ্জন করে। আন্তর্জ্জাতিক সমাজের ভেতর এরা পঙ্গপালের মধ্যে প্রবেশ করে বহু স্থানের লোকদের সর্ব্বনাশ করে সাধন থাকে এবং পুরুষকে কি ভাবে সম্মোহিত করতে হয় সে সম্বন্ধে এরা বিশেষভাবেই জানে।

পতিতাবৃত্তি ভারতবর্ষে নানারূপে আছে, অন্যান্য দেশেও অবশ্য এ বৃত্তির অভাব নেই, তবে সেটাকে স্বীকৃতির মধ্যে আনা হয় না, এই যা পার্থক্য। বৈদেশিকগণকে আনন্দ দেবার জন্যে বৃটিশ যুগেই পতিতালয়গুলি সৃষ্টি হয়েছিল, আর এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এদের পশ্চাতে এদেশে অতি-অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণেরও পৃষ্ঠপোষকতা রয়ে গেছে, তাই আজও ভারতবর্ষে নানাপ্রকার আইন-কানুনের নাগপাশের মধ্যেও অবাধগতিতে সর্ব্বত্র ঘরে বাহিরে পাতিত্যধর্ম্ম অবলম্বনের প্রতি অনেকেরই আগ্রহ সম্পূর্ণভাবে রয়েছে। পাশ্চাত্য প্রগতির প্রাধান্য ও ভোগবিলাসিতার প্রতি বিশেষ ঝোঁকই আধুনিক নারী সমাজের মধ্যে চারিত্রিক অধঃপতনের ইন্ধন জোগাচ্ছে। তাছাড়া অবাধ মেলামেশা অবৈধ-প্রণয়ের বীজ বপন করে সংসারক্ষেত্রে কণ্টক-মহীরুহই সৃষ্টি করছে। সতীত্বের মর্য্যাদা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। কারণ আমাদের মহিলা সমাজে এক শ্রেণীর নারীর আবির্ভাব হয়েছে যারা পরলোক স্বীকার করে না, ঈশ্বর বিশ্বাস বা ভীতি নেই আর নেই চারিত্রিক আদর্শ। এদের সঙ্গই বিপথগামী করছে সাম্প্রতিক নারী সভ্যতাকে।

প্রণয়ঘটিত বিবাহের পরিণতি যে ক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যাপার এনে দিচ্ছে, সেই ক্ষেত্রেই অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্ছে পতিতাবৃত্তি। চারিত্রিক অধঃপতনের সমর্থনসূচক কথা প্রসঙ্গে বলা হয়, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি অসতীরা প্রাতঃ-স্মরণীয়া যদি হয়ে থাকেন, তাহোলে একাধিক পুরুষের সংস্পর্শে এসে চরিত্র দূষিত কর্‌লেই মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। এই সব পৌরাণিক উপাখ্যানকে বিকৃত নজির করে অনেকে এক থেকে একাধিক পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠেন এবং নিজেদের পারিবারিক আবহাওয়াকেও দূষিত করে তোলেন। এই শ্রেণীর মেয়েদের অনেককে পরে পতিতাবৃত্তি কর্‌তেও দেখা গেছে। অনেক মহিলা সতীত্বকে খুব বড় করে দেখেন না বা মর্য্যাদা দেন না। তাঁরা এটাকে মামুলি সামাজিকরীতিসিদ্ধ বলে মন্তব্য করেন, আর এ প্রসঙ্গে উন্নাসিকতার ভাব দেখান। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রবর্ত্তনের ফলে এদের স্বরূপ শীঘ্রই খুব সহজে ধরা পড়বে, এরূপ আশা করা বোধহয় অন্যায় হবে না।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সর্ব্বত্র পতিতাবৃত্তি থাক্‌লেও সমাজ তাকে বেশ মানিয়ে গুছিয়ে স্থান দিয়েছে। ও-দেশের বলনৃত্য ব্যভিচারেরই উত্তেজনা আনে। বলনৃত্যে যে সব মহিলা যোগদান করে থাকেন, তাদের পক্ষে চারিত্রিক শুচিতা রক্ষা একপ্রকার অসম্ভব। ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে অবৈধ-বিহার এই সব নৃত্য মারফৎ যা ঘটে থাকে, তা সভ্য সমাজের চোখে বিসদৃশ হয় না। এরূপ বিহারও একপ্রকার পতিতাবৃত্তির রূপান্তর। বিশিষ্ট অতিথিগণকে আপ্যায়নের জন্য বহু সুন্দরী মহিলা নানা দেশের রাষ্ট্রচালকরা নিযুক্ত করে রাখেন। অন্তরালে কুৎসিত কার্য্যপদ্ধতিকে প্রশ্রয় দিয়ে নীতিবিগর্হিত কাজ করা হয়, এখানে আইনের কোন ধারাই দণ্ডপ্রয়োগের পক্ষে সক্রিয় হয় না।

প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে দেবদাসী রাখার প্রচলন হয়ে আস্‌ছে। এই সব দেবদাসীকে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এদেরই মত মহারাষ্ট্রে আছে মুরলী, কর্ণাটে বাসি আর কানাড়ায় নায়ক। দেবতার উদ্দেশ্যে কৈশোরে এরা মন্দিরে প্রবেশ করে, আর শেষে বহু মানুষের ভোগের বস্তু হয়ে ওঠে। বালিকাদেরই মত বহু বালকের জীবনও দেবতার জন্যে মন্দিরে উৎসর্গিত হয়, তারাও ব্যভিচারের অংশ গ্রহণ করে। অনেক পুরুষকে ও এই বৃত্তিতে এনে একশ্রেণীর নারী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

সুদূর পূর্ব্ব ও মধ্য এশিয়াতে বিভিন্ন জাতীয় সতরো হাজার নারীকে প্রকাশ্যভাবে পতিতাবৃত্তি কর্‌তে দেখেছেন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুসন্ধান সমিতি, তন্মধ্যে ১৭৫ জন পশ্চিম ভূখণ্ডের নারী। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁদের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে—গুপ্ত পতিতার সংখ্যা যে অনেক বেশী তা দোকানে, অফিসে এবং অন্যান্য কর্ম্মস্থলে একটু অনুসন্ধান কর্‌লেই বেশ বুঝা যায়।

গায়িকা, নর্ত্তকী, পরিচারিকা, সেবিকা ও উপসেবিকাদের মধ্যেও এই দূষিত আবহাওয়া প্রবল। রাজ-অতিথিগণের সন্তোষবিধানের জন্যেও বহু সুন্দরীকে নিযুক্ত করে রাখা হয়ে থাকে। তাঁরা বলেছেন, এই ব্যাপারে এশিয়ার মধ্যে সব চেয়ে সংখ্যায় বেশী চৈনিক মহিলা, তৎপরে জাপান এবং ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে রুষিয়ার এশিয়া ভূভাগে এবং মালয় শ্যাম ফিলিপাইন, পারস্য, ইরাণ ও সিরিয়ায় এ শ্রেণীর মেয়েদের স্থান দেখা যায়। ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অনুসন্ধানের রিপোর্টেও ঐ একই ধরণের মন্তব্য পাওয়া গেছে, সাম্প্রতিক যুদ্ধোত্তর অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ফলে বিধ্বস্ত সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েরা পতিতা-বৃত্তিকে গোচরে ও অগোচরে খুব বেশী গ্রহণ করেছে, এ মন্তব্য ও পরিলক্ষিত হচ্ছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ, ভারত বিভাগ প্রভৃতির ফলে আমাদের দেশের বহু নারী ও সন্তান এই কদর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌ছে। গত যুদ্ধের সময়ে সর্ব্বদেশেই এই দূষিতক্ষত সমাজের অঙ্গে গভীরভাবে স্থান অধিকার করেছিল, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে কয়েকটি সিগারেটের জন্য নারীকে দেহদান কর্‌তে হয়েছে এরূপ সংবাদও বিরল নয়। ব্যভিচারে মার্কিণ দেশের মহিলারা পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন, এঁদের পরই ফরাসী মহিলাদের স্থান। ইংলণ্ড সংরক্ষণশীল হওয়ায় এখানে ব্যভিচারিণীদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও চলেছে মেয়ে পুরুষের অবাধগতিতে অবৈধ যৌন ব্যভিচার, কিন্তু একে সমাজের অঙ্গে পুষ্টিলাভ কর্‌বার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কলিকাতায় ১৯২৫ সালে ১৯,২২০ জন পতিতা ছিল, ১৯৪৫ সালে ৫০০০ হাজার হয়েছে।

বর্ত্তমানে এই অনুপাতে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বোম্বাই সহরে ত্রিশ হাজার গণিকার সংখ্যা পাওয়া যায়, এবং দুই হাজার গণিকালয়ও সেখানে আছে। বিহারে আছে ১৩৭টী পতিতাশ্রম।

বর্ত্তমানে চৈনিক শাসনতন্ত্রের আনুকূল্যে পতিতাবৃত্তির উচ্ছেদ হয়েছে এবং পতিতালয়গুলি এখন প্রবিধানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভারতবর্ষে অবস্থার তারতম্য দেখা যায়। গণিকাবৃত্তিনিরোধ আইন ও সন্তান-সংরক্ষণ আইনের চাপে বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে এই বৃত্তি দমন করবার ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু প্রকাশ্যভাবে না দেখা গেলেও গুপ্তভাবে বহু রমণী এই বৃত্তির দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে থাকে। নামেমাত্র একজনকে স্বামী হিসাবে রেখে এরা আইনের চোখে ধূলো দেয়। জাপান পতিতাবৃত্তি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ। ব্যক্তিগতভাবে যারা এই ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাদের নাম রেজেষ্ট্রি করতে হয়। ১৯৪৮ সালে আইনের দ্বারা বিধিসঙ্গত গণিকাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন কোরিয়াতে হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া ও সাংহাইতে রেজেষ্ট্রি করে এই বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়, ফিলিপাইন, ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট, মালয় ও হংকংএ গণিকাবৃত্তি নিষিদ্ধ। শ্যামে প্রত্যেক পতিতাকে রেজেষ্ট্রি করে এই কুৎসিতবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আড়্কাটিদের মারফৎ নারী সংগ্রহ করে এনে পতিতালয়গুলির সংগঠন কার্য্য করা হয়। এখনও রীতিমতভাবে চল্ছে। বহু বালিকা, তরুণী ও মহিলার নিরুদ্দেশের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এই সব আড়্কাটি সুযোগ ও সুবিধামত এদের অপহরণ করে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে। ফলে দেখা যায় কোন মহিলা সিনেমা দেখ্তে গিয়ে আর বাড়ী ফিরলো না, কোন মেয়ে স্কুলে বা কলেজে পড়্তে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোন তরুণী ট্রেণে উঠে শেষ পর্য্যন্ত গন্তব্য স্থানে পৌছুলো না। পুলিস এই সব আড়্কাটিদের সম্বন্ধে সম্যক অবগত হয়েও অনেক সময় অন্তরালেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং এদের উচ্ছেদ সাধনের কোন উল্লেখ-যোগ্য প্রচেষ্টা করে না এরূপ অভিযোগও সংবাদ পাওয়া গেছে। বহু পতিতার পোষ্য হিসাবে যে সব মেয়ে থাকে তাদেরও শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তি নিতে হয়। পতিতাদের অনুগত ব্যক্তিদের অনেকেই গুণ্ডাশ্রেণীর, এরাই পতিতালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখে। পতিতাদের সঙ্গে যে সব পুরুষ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাদের চল্তি কথায় 'ভেড়ুয়া' বলা হয়। মাতাপিতা, স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও আত্মীয়স্বজনের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে আত্ম-রক্ষার উদ্দেশ্যে বহু মহিলা, তরুণী ও বালিকাকে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয় একান্ত অনিচ্ছা সত্বে। পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার ফলেও বহু মেয়েকে এ পথে আস্তে হয়। ইন্দ্রিয় উত্তেজনার অসহিষ্ণুতা, অর্থ গৃধ্নুতা, ভোগবিলাসের মাত্রাধিক্য ও অতিরিক্ত সামাজিক ঘনিষ্ঠতার জন্য ক্লাবে হোটেলে, রেস্তোরাঁয় ও পার্কে বহু পুরুষের সম্মিলনে আসার ফলে অবৈধভাবে ব্যভিচারের মাত্রাধিক্য ঘটিয়ে শেষে মেয়েরা পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করে, আর তার পরিণাম হয়ে ওঠে আত্মদহন ও আত্মনিধন। তাদের সাময়িক-ভাবে কুবৃত্তি সমাজ-জীবনে দুষ্প্রবৃত্তির বহুধা বিস্তৃত পথ রচনা করে, আর সুস্থ জীবনাদর্শকে ধ্বংস করে। এর প্রতিকারের জন্যে রাষ্ট্র সমাজচেতনার একান্ত প্রয়োজন এবং পারিবারিক জীবনকে শান্তিময় করে গড়ে তোলার জন্য সকলের দায়িত্ব গ্রহণ ব্যতীত শুধু আইনের দ্বারা এ বৃত্তি দমন করা সম্ভব নয়, তা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি দরকার যাতে মেয়েরা নারী ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রেখে সংসার ও সমাজের আদর্শ মাতৃত্বের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে ভারতীয় মহান্ আদর্শে গড়ে তুলতে পারে। সর্ব্বংসহা নারী শক্তিরূপিণী। সে ছিন্নমস্তারূপ ধারণও করতে পারে, আবার মহামায়াও হোতে পারে, আবার অসুর-দলনী হয়ে সৃষ্টি রক্ষা করতে পারে। সুতরাং এই নারীকে সম্পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়ে যাতে তার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুন্দরভাবে গঠিত হয়, সেদিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের পথে এদিকটা নিয়ে সম্যক্‌ভাবে আলোচনা হওয়া বিধেয়। ভারতীয় নারী-সমাজের চির-বৈশিষ্ট্য, সতীত্বগৌরব ও আদর্শ মাতৃত্ব। এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সাম্প্রতিক প্রগতিশীল নারী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ছোটোদের পোষাক পরিচ্ছদ

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় বি-এ

আপনার যদি ছোটোদের পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করবার ইচ্ছে থাকে তাহলে রঙ আর স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। ছোটোদের পোষাক ফিকে রঙের হলেই

গলায় বুকে ও হাতায় ফ্রিল দেওয়া সার্ট

ভাল হয়। সবুজ, নীল, গোলাপী, হলদে আর সাদা হচ্ছে ছোটোদের পক্ষে খুব উপযোগী রঙ। বর্ডার, কলার, বেল্ট প্রভৃতিতে ঘোর রঙ যেমন লাল বা কালো, ব্যবহার করা যেতে পারে। খুব ঘোর রঙের ফ্রক ছোটো মেয়েদের

অর্গানডির ফ্রকে চিকনের ফ্রিল

কখনও পরাবেন না। অনেক মহিলাদের দেখেছি কালো রঙের ভেলভেট বা বেগ্‌নে রঙের সাটিনের ফ্রক্ ছোটোদের

সুতির হাত কাটা ফ্রকের ওপর ছোট কোট

পরাতে। এরকম পরানো কিন্তু ঠিক নয়। শীতকালের গরম পোষাকে ঘোর রঙ ব্যবহার করতে পারেন, যেমন

লাল রঙের কোট বা ঘোর নীল রঙের প্যাণ্ট। গ্রীষ্মকালে ফিকে রঙ পরালে গরম কম হয় আর সুন্দরও দেখায়।
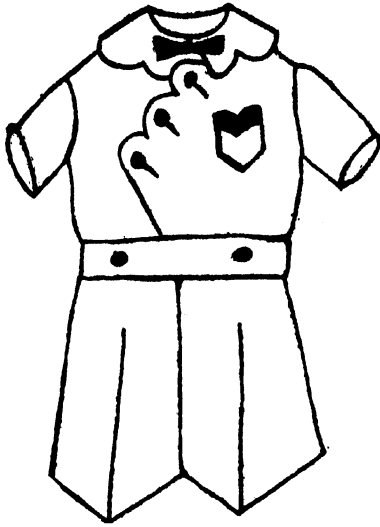
ঘোর রঙের পকেট, বো, আর বোতাম দেওয়া সার্ট

ছোটোদের পোষাক পরিচ্ছদ যেন কখনও খুব বড় বা আঁট সাঁট না হয়। বরঞ্চ একটু ঢিলে হওয়া উচিত, যাতে

প্যাণ্টও হাঁটুর ওপরে থাকা উচিত। ছেলেদের সার্টের বুকের কাছে হানিকোম্বের কাজ করলে বেশ সুন্দর দেখতে হবে। প্যাণ্টের বা সার্টের পকেটে নামের প্রথম অক্ষর এমব্রইডারি করে দিতে পারেন। ছোটো ছেলেদের নিজস্ব

ছেলেদের চাইনিজ্ কোটে খরগোস্ বসানো

পছন্দ মত জন্তু বা পাখী রঙিন কাপড় কেটে তৈরী করে হাওয়াই সার্টের তলায় বা পকেটে বসালে ভাল দেখাবে। রঙিন কাপড়ে আগে পছন্দ মত জন্তু বা পাখী এঁকে, সেইটে কেটে নেবেন। তার পর খুব সরু করে ফিকে

ফ্রিলে এমব্রইডারি করা অর্গানডির ফ্রক্

ছোট ছেলেদের হাওরাইন সার্টে হানিকোম্বের কাজ
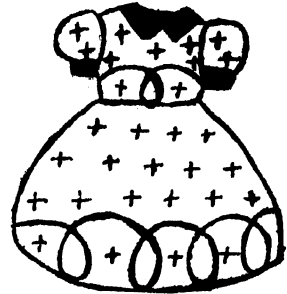
ছিটের ফ্রকে ঘোর রঙের কলার, হাতার বর্ডার ও নক্সা

তাদের চলন ভঙ্গিতে ব্যঘাত না ঘটে। ছোটো মেয়েদের ফ্রকের যে অংশ কোমরের নিচে ঝোলে (অর্থাৎ Skirt) যেন বেশ ঘেরওলা হয়, আর হাঁটুর দুই বা তিন ইঞ্চি ওপরে থাকে। জামার তলায়, কোমরে, আর অন্যান্য যায়গায় ভেতরে কাপড় মুড়ে রেখে দিলে সময় মতো জামা ছোটো হয়ে গেলেও বাড়িয়ে নিতে পারা যাবে। ছোটো ছেলেদের

রঙের নখের পালিস (যেমন কুাটেক্স) জন্তু বা পাখীটির চতুর্দ্দিকে লাগিয়ে দেবেন, এতে কাপড়ের জন্তুটি বেশ দৃঢ় থাকবে আর সেলাই করবার সময় সুবিধে হবে। খুব ছোটো করে বোতাম ঘরের সেলাই দিয়ে জামায় বসাতে পারেন। জন্তুর চোখ বা অন্যান্য ক্ষুদ্র অংশ রঙিন সুতো দিয়ে সেলাই করে নেবেন।

ছোটোদের পোষাক করাবার সময় কাপড় ঠিক মত পছন্দ করবেন, যেন জামার প্যাটার্ণের সঙ্গে ভালভাবে মানায়। অর্গানডির ফ্রক করাবার সময় খুব কুঁচি দেওয়া ঘের আর ফুলো ধরণের প্যাটার্ণ দেবেন। বাজারে নানা রকম সুন্দর ছিটের কাপড় বেরিয়েছে। আমাদের দেশী তাঁতের কাপড়ের ছিটগুলো খুব মনোহর আর লোভনীয়। ছোটোদের পছন্দ মত জন্তু জানোয়ার আঁকা ছিটগুলো আকর্ষণীয়, আর এদের পরতেও বেশ ভাল লাগে ছোটোদের। এই সব কাপড়ের জামাতে সাদাসিদে প্যাটার্ণ দিলে, দৈনন্দিন ব্যবহারের পক্ষে চমৎকার হবে। কিছু পোষাকের প্যাটার্ণ মোটামুটি ভাবে চিত্রিত করেছি এখানে। এগুলি বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময়ে ব্যবহারের উপযোগী।

বন্ধু

জয়তী লাহিড়ী

বন্ধু ! তোমার দান পথে পথে পাওয়া
পুষ্পের সুরভি সম শেষ হ'য়ে যাওয়া,
অনিমেষ মালার গ্রন্থন :
হৃদয় বন্ধন
ভার নয়, মুক্তিরসে সে অপরূপ সুর,
করিয়াছে পথ সুমধুর।
তোমাদের ভরে দেওয়া দান,
পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
বার বার জানিয়াছি আমি নই একা,
শূন্য গগন পথে ওড়ে যে বলাকা,
তারে ডাকে গভীর প্রত্যাশা ;
তুই নয়নের ভালবাসা।
প্রথম কুসুম-ফোটা প্রাতে,
অন্ধকার রাতে,
নীল-ঘন দিবসের উদাস হাওয়ায়,
গোধুলি বেলায়
তোমারে যে কত রূপে কতবার পাই,
তার শেষ নাই।
বারবার ঘুরি ফিরি স্থান হ'তে স্থানে
তোমার সন্ধানে।
ছেড়ে যাই কত বনভূমি,
ভাবি মনে দূরে আছ তুমি।
তবু কভু ছিন্ন নাহি হয়
জীবনের স্মৃতির সঞ্চয়,
বলে সে অন্তরে—
বন্ধু ! তোমার দেশ সব ঘরে ঘরে।
আমারি লাগিয়া তুমি বাহিরে যে আস,
প্রাণ ভরে মোরে ভালবাস।
তাই এই পথ মাঝে দক্ষিণ বাতাস
আশ্বিনের সুনীল আকাশ
বন্ধু ব'লে আমারে যে ডাকে ;
জীবনের পটে মোর হৃদয়ের রং দিয়ে আঁকে।
পথে মোর ধূলির অন্তরে যারে পাই,
কোনদিন তার ক্ষয় নাই।

প্রস্থায়িনী

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তুমি যদি বল তোমার তৃষ্ণা মিটেছে অনেক দিন
আকণ্ঠ ভরি' মধুযামিনীতে করেছ অমৃত পান
জোৎস্নামদির আবেশে তোমার নয়ন নিদ্রাহীন
স্তুতিগান তুমি অনেক শুনেছ প্রণয়ের ব্যাখ্যান।

তৃষ্ণা এখনো মেটেনিক প্রিয়া, নয়নে তৃষ্ণা জাগে
শুষ্ক অধরে মধু আস্বাদ, তাই বিস্ময় লাগে।

তুমি যদি বল ও দেহ-দেউলে আরতির দীপ জ্বালি
মুগ্ধ পূজারী দিয়েছে অর্ঘ অযাচিত বৈভবে,
ভোগ বাসনার রাঙা শতদলে সাজায়ে হৃদয়-ডালি
তুমি কি রাখনি ? মত্ত বাসনা অবসিত কৈ তবে ?

নখরে বাসনা, অধরে কামনা অতৃপ্তি জাগে বুকে
মীনকেতনের অদৃশ্যলীলা চলিছে সকৌতুকে।

তুমি যদি বল মনের নিভৃতে নামিয়াছে অবসাদ
তনুদেহে নাই উছল প্রবাহ, নিস্তরঙ্গ নদী,
যদি দেখে থাকি খর তরঙ্গ, সে কি মোর অপরাধ
তোমার গভীরে কলকল্লোল চলিতেছে নিরবধি।

দুকুল ভাসান শ্রাবণের নদী, ক্ষীণধারা বৈশাখে
দেহতটে তার প্রমত্ত বেগ, দূর সাগরের ডাকে।

সে সাগর আজ ডেকে ফিরে যাবে ? তুমি রবে উদাসীন,
তুষার গলান প্লাবন কখনো শুনেছে কাহারো মানা ?
মরুতৃষ্ণার বালুবেলা কাঁদে, মৃত্যু সম্মুখীন
তোমার আমার ভাগ্যে কি আছে, সেকথা আছে ত জানা।

তাই বলি আজ দু'হাতে ঘুচাও বাধানিষেধের আঁধি
মিলন-বাসরে দেহ ও মনেরে অটুট বাঁধনে বাঁধি।

পাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

সম্প্রতি আজ প্রোডাকসনস্-এর 'অসবর্ণা' কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। 'অসবর্ণা' বলিতে যা বোঝায়, আলোচ্য চিত্রের কাহিনী কিন্তু তা নয়। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বৈষম্য সেই বৈষম্যকে লক্ষ্য করিয়াই আলোচ্য কাহিনীর নাম দেওয়া হইয়াছে—'অসবর্ণা'। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আলোচ্য কাহিনী সম্পূর্ণ মনঃস্তত্ত্বমূলক। চিত্র-নাট্য রচনায় এই মনঃস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র কাহিনী বিন্যাসের চেষ্টা করায় চিত্রটি সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সাড়ে পনের হাজার ফিট ছবির দৈর্ঘ্য হইয়াছে। ছবিকে দীর্ঘ করার মূলে কাহিনীকে জমানোর বহু প্রচেষ্টা যে করা হইয়াছে তাহার ছাপ ছবির সর্ব্বাঙ্গে সুপরিস্ফুট। তথাপি কোন জায়গার সংঘাত দর্শক-মনে রেখাপাত করিতে পারে নাই। বরং অবান্তর দৃশ্যগুলি দর্শকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছে। মূল-পাঠ্য কাহিনী হইতেই যে তাহা উপভোগ্য চিত্র হইবে এমনতর ধারণা করা অমূলক। কেননা যেখানে হৃদয় লইয়া কারবার, সেখানে নাট্য-রচনার মাধ্যমে হৃদয়কে ছুঁইতে যদি না পারা যায়, তাহা হইলে নাটকে যতরকম কসরৎ অথবা যত ভাল শিল্পী নির্ব্বাচনই করা যাক্ না কেন, কোনটাই কার্য্যকরী হয় না। আলোচ্য চিত্রেও তাহাই হইয়াছে।

* * * *

বিশ্ববিখ্যাত হাস্যরসাভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন তাঁহার আগামী চিত্রের নাম দিয়াছেন 'এ কিং ইন্ নিউ ইয়র্ক'। সম্প্রতি লণ্ডনে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে চার্লি জানাইয়াছেন যে, ইহা নিউ ইয়র্কের সিংহাসনচ্যুত কোন এক রাজার দুঃসাহসিক কাহিনী। এই সিংহাসনচ্যুত রাজার ভূমিকায় স্বয়ং চার্লিচ্যাপলিনকে দেখা যাইবে এবং নায়িকার ভূমিকায় দেখা দিবেন জনৈকা বৃটীশ অভিনেত্রী। চার্লি আশা করেন যে, আলোচ্য চিত্রটিই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ এবং চমকপ্রদ চিত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।

* * * *
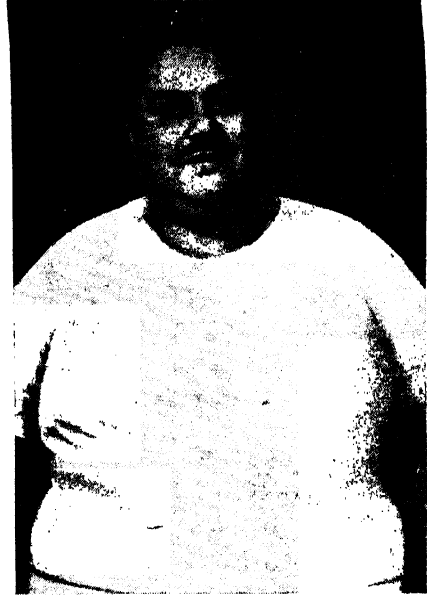
রবিপ্রসাদ গুপ্ত প্রযোজিত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাদুড়ী মশাই' কথাচিত্রে 'ভাদুড়ী মশাই'—'মোহন মুখার্জী' (এ্যাং)
ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

১৯৫৫ সালে অস্কার পুরস্কারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিত ছবিগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। (১) লেভ্ ইজ্ এ মেনি-স্পেণ্ডার্ড থিং' (২) মার্টি (৩) মিঃ রবার্টস্ (৪) পিক্‌নিক্ (৫) দি রোজ টাট্টু। আগামী ২১শে মার্চ্চ আকাডেমী অব মোশান পি কচার আর্ট এণ্ড সায়েন্স-এর সভ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্ব্বাচিত হইবেন।

* * * *

বোম্বাই-এর ইণ্ডো-ইউরোপীয় ফিল্মস্ লিমিটেড্ বৃটেনের প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহারা শীঘ্রই ছয়টি হিন্দী ছবি বৃটেনে দেখাইতে পারিবেন বলিয়া আশা

করেন। মার্চ্চ মাসে 'দো বিঘা জমিন্' এপ্রিল মাসে 'ট্যাক্সি ড্রাইভার' এবং মে মাসে 'মুন্না' ছবিটি দেখানো হইবে।

*   *   *   *

লাহোরের চিত্র গৃহগুলিতে শতকরা ৭৫টি ফ্রী পাশ সরকারী কর্ম্মচারীরা গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া প্রকাশ। লাহোরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এক আদেশ বলে স্থানীয় কোন চিত্রগৃহে আকস্মিক হানা দেওয়ার ফলে দেখা গিয়াছে যে উচ্চশ্রেণীয় ১৯৯জন দর্শকের মধ্যে ১৬৯ দর্শক ফ্রী পাশ গ্রহণকারী। সরকারী নিয়মানুযায়ী কোন সরকারী কর্ম্মচারী যেমন কোন ফ্রী পাশ গ্রহণ করিতে পারেন না তেমনি কোন চিত্রগৃহের মালিকও সরকারী কর্ম্মচারীদের সন্তুষ্টর জন্ম ফ্রী পাশ দিতে পারেন না।

*   *   *   *

বহুরূপী সম্প্রদায়ের শক্তিময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র
ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

এ বৎসর মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে পৌরাণিক ২খানি, ঐতিহাসিক ১খানি, জীবনীচিত্র ২খানি, কমেডী ২খানি, অপরাধমূলক ৩খানি, নৃত্যগীত বহুল ১খানি, ধর্ম্মমূলক ১খানি এবং ৩৭টা সামাজিক কাহিনী।

*   *   *   *

১৯৫৫ সালে বাংলা ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ৫৬খানি চিত্র সেন্সর করিয়াছেন তন্মধ্যে ২১খানি চিত্র ট্রাম্লার চিহ্নিত হইয়াছে। অর্থাৎ পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন সাপেক্ষে সেন্সর সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে।

*   *   *   *

জেমিনী পিক্চার্স সিনেমাস্কোপে একটি রঙীন্ চিত্র তৈয়ারী করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এর জন্ম নাকি একটি বিরাট পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হইয়াছে। শোনা যাইতেছে প্রযোজক এতদ্বিষয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকবার নাকি লণ্ডনে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ভারতীয় চিত্রের পক্ষে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সন্দেহ নাই।

*   *   *   *

রাশিয়ার চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভারতে আসিয়াছেন ছবি তৈয়ারীর পরিকল্পনা নিয়া। শোনা যাইতেছে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটী প্রামাণ্য ছবি তাঁহারা তৈয়ারী করিবেন।

*   *   *   *

'দেবদাস' কথা-চিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী নীলিমা মজুমদার জানাইয়াছেন যে, বাংলা 'দেবদাসের' দেবদাস অর্থাৎ প্রমথেশ বড়ুয়াও অবাঙ্গালী ছিলেন। স্বর্গত বড়ুয়া যে সময় 'দেবদাস' কথা-চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন, সে সময় বাংলা ও আসাম একই প্রাদেশিক রাজ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিষয়েই আমাদের আত্মবোধ ছিল। স্বর্গত বড়ুয়াও একসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আজিকার দিনে অবশ্য শ্রীমতী মজুমদারের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

*   *   *   *

গত ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার সায়াহ্নে ষ্টার থিয়েটারে পরিণীতা নাটকের পঞ্চাশৎ অভিনয় উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী—নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও মঞ্চের নেপথ্য কর্ম্মিদের ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারী

শ্রীসলিলকুমার মিত্রের পক্ষে পুরস্কার বিতরণ করেন। এতদুপলক্ষে বহু মূল্যবান পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, ষ্টার থিয়েটার বাংলা, রঙ্গমঞ্চের যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 'অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন—"মেয়েদের বিবাহ বাংলা দেশে এক বিরাট সমস্যা। পারিবারিক জীবনে এত বেদনা, এত বিক্ষোভ জমা হইয়াছে কেন? শরৎচন্দ্র শেখর ও ললিতার চরিত্র সৃষ্টি করিয়া সমাজ জীবনের যে চরিত্র আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন আমরা তাহা যেন বিস্মৃত না হই। নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত সুন্দরভাবে কথা শিল্পীর সেই চরিত্রগুলি তুলিয়া ধরিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটার যে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন আমি আশা করি, তাহা এই 'পরিণীতা' নাটকের মধ্য দিয়া রক্ষিত হইবে। বাঙ্গালার কলা, ললিত-কলা এবং বাঙ্গালা ভাষাকে যেন আমরা বিসর্জ্জন না দিই। বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমেই এই রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গ-মঞ্চ বাংলা-বাঙ্গালীর প্রাণস্বরূপ। রঙ্গমঞ্চ আরো গৌরব-দীপ্ত হউক।

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'পরিণীতা' নাটকের ৫০ রাত্রি অভিনয় সাফল্যে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক নাট্যকার ও সাংবাদিকগণ যোগদান করেন। চিত্রে—বাম হইতে দক্ষিণে: শ্রীরাধারাণী দেবী, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এবং বক্তৃতারত শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবসন্তদত্ত প্রযোজিত রমা চিত্রম-এর 'সিঁথির সিঁদুর' কথাচিত্রের মহরতানুষ্ঠান

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

প্রধান অতিথি ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার ভাষণে বলেন—"ষ্টার থিয়েটারের একমাত্র সত্বাধিকারী শ্রীসলিল-কুমার মিত্র ষ্টার রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটক লইয়া এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। মহাকবি গিরিশচন্দ্র প্রমুখ এই স্থানে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। এই রঙ্গমঞ্চ বাঙ্গালীর আদর্শস্থল। পরিণীতার নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত সম্প্রতি ছায়াচিত্রের জন্য "গিরিশচন্দ্রের যে জীবনী চিত্র-নাট্য রচনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন—এই সকল মননশীলতার দ্বারা থিয়েটারের ঐতিহ্য রক্ষিত হউক।"

নটসূর্য্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী বলেন—সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়, নাট্যশালাও সেইরূপ। সাধারণ রঙ্গালয় ৮০।৮৫ বৎসর কোনরূপ সাহায্য না লইয়াই চলিয়া আসিয়াছে। ইহার সুখদুঃখের সঙ্গে আমি জড়িত। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি দেখিয়া যাইতে চাই যে, পাদ-প্রদীপ আরো উজ্জ্বল হইয়াছে—নির্ব্বাপিত হয় নাই।

ষ্টার থিয়েটারের পক্ষ হইতে শ্রীজহর গাঙ্গুলী সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীনরেন্দ্র দেব, 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনোজ বসু, রাজারাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক-গণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রীসলিলকুমার মিত্র ও পরিচালক শ্রীশিশির মল্লিক সকলকে আদর আপ্যায়ন করেন।

অসমাপ্ত

শ্রীকালিদাস রায়

সমাপ্ত দশটি কাজ দিল যশ, দিল লাজ
চারিদিকে অসমাপ্ত শত শত জাগে।
সমাপ্তে গৌরব পেয়ে অসমাপ্ত পানে চেয়ে
সে গৌরব হয় ম্লান, ভোগে নাহি লাগে।
যাহাদের দাবি সারা হয় নাই হায় তারা
আকাবাকি ক'রে মোরে করে ডাকাডাকি।

কারে থুই কারে ছাড়ি করে সবে কাড়াকাড়ি
কাহারে আদরে ধরি কারে ফেলে রাখি!
জরুরি তাগিদ পাই ফেলে সবি চলে যাই
যেন মথুরার ডাকে রাজকীয় রথে।
অসমাপ্ত হায় যারা পিছে দেখি কাঁদে তারা
গোকুলের সখাসখী যেন পথে পথে।

মিনতি

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

(গান)

আপনার করে যেই দীপখানি জ্বেলেছিলে তুমি প্রিয়,—
নিভিয়া না যায়, ঢাকা দাও তা'য় তোমারি উত্তরীয়॥
তব আদরের মাধবীলতাটি হায়,
অযতনে সখা, আজি তা' শুকা'য়ে যায়,
ঢালি' প্রেম-বারি, কর গো তাহারে—
ফুলে ফুলে রমণীয়॥
শুভ-মিলনের মালাগাছি ওই প'ড়ে,
একে-একে তার ফুলগুলি যায় ঝরে!
নব-বসন্তের পুষ্পে ভরিয়া সাজি,
নতুন করিয়া যে-মালা গেঁথেছি আজি,
মাধবা নিশায়, ওগো প্রিয় তা'য়
কণ্ঠে জড়া'য়ে নিয়ো॥

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা—

গত ৭ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা অতঃপর সরাসরি সরকারী তত্ত্বাবধানে আনা হইবে। ১৯৫৪ সালে গঠিত মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের বিবরণী অনুসারে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষার সকল ব্যাপারে কেবলমাত্র পরামর্শ দানের জন্য একটি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠিত হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, নূতন বিদ্যালয় অনুমোদন প্রভৃতি ব্যাপারে পর্ষদের অভিমত বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে। স্থির হইয়াছে যে সরকারী শিক্ষা বিভাগের পরিচালককেই উক্ত পর্ষদের সভাপতি করা হইবে। প্রাইমারী বা জুনিয়ার বুনিয়াদি শিক্ষাকাল ৫ বৎসর, জুনিয়ার হাই বা সিনিয়ার বুনিয়াদি শিক্ষাকাল ৩ বৎসর এবং উচ্চ বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকাল ৩ বৎসর হইবে। বর্তমান বিদ্যালয়গুলিকে নিম্নোক্ত যে কোন একটি শ্রেণীতে গঠন করা হইবে—(ক) প্রাইমারী বা জুনিয়ার বুনিয়াদি স্তরের প্রথম হইতে ৫টি শ্রেণী সহ ১১টি শ্রেণী লইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় (খ) ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শ্রেণী পর্য্যন্ত উচ্চ বিদ্যালয়। (গ) প্রথম হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পূর্ণাঙ্গ জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয় (ঘ) ৯ম হইতে ১১ শ্রেণী পর্য্যন্ত তিনটি শ্রেণী লইয়া উচ্চ বিদ্যালয়। নূতন ব্যবস্থায় ৪ শ্রেণীর স্কুল হইবে। ১ম হইতে ১১শ শ্রেণী পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় একত্র করা হইবে। ১ম হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত লইয়া গঠিত জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়—তাহার দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ—এই ৬ শ্রেণী যুক্ত বিদ্যালয় বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুরূপ হইবে। শুধু ৯ম হইতে ১১শ শ্রেণী—৩ শ্রেণী যুক্ত বিদ্যালয় বর্তমান বি গ্রেড কলেজের মত হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত প্রথম ২ স্তরের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বতন্ত্রভাবে জেলা শিক্ষাপর্ষদ—সমূহের অধীনে থাকিয়া যাইবে। তাহাদের সম্বন্ধে এই বিবরণে কোন কথা নাই। শুধু এই নূতন ব্যবস্থা নহে, নূতন পাঠ্যতালিকাও সত্বর প্রস্তুত করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করা প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আদৌ দেশ, কাল ও পাত্রের উপযোগী নহে।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা

রুস নেতাদের শরৎ সাহিত্য দান—

কলিকাতার শরৎ সাহিত্য সম্মেলন নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রুস নেতা মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভের কলিকাতা আগমনের সময় তাঁহাদের এক সেট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছেন। শ্রীদুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ বেদজ্ঞ ও শ্রীবিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। যে আধারে গ্রন্থগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শরৎচন্দ্রের

তৈলচিত্র ও অন্যান্য চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়া তাহাকে সুন্দর করা হইয়াছিল। এইভাবে বাঙ্গালার অপরাজেয় কথা-শিল্পীর অবদান রুস নেতাদের উপহার দিয়া সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, রুসিয়ায় বহু গবেষক-ছাত্র রাংলাভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। কাজেই এই উপহার বাংলায় অভিজ্ঞ রুসীয়দের কাজে লাগিবে ও হয় ত তাহাদের দ্বারা শরৎ-সাহিত্য রুসীয় ভাষায় অনূদিত হইবে।

বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

গান্ধী স্মারক নিধি—

মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ও তাঁহার কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মরণ করার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতে ১২টি গান্ধী স্মৃতি সৌধ ও ১২৫টি স্মৃতি ফলক নির্মিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে গান্ধী স্মারকনিধির কার্য্যনির্বাহক পরিষদ তিন লক্ষাধিক টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। নিধির কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজকর্মের জন্য ২০ লক্ষ টাকা ও বিভিন্ন রাজ্যের শাখা সংস্থাগুলির কাজের জন্য প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। আপাততঃ দিল্লী, আমেদাবাদ ও মাদুরাতে তিনটি কেন্দ্রীয় গান্ধী স্মারক মিউজিয়াম করার জন্য ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। কয়েকটি ডকুমেণ্টারী চিত্র প্রস্তুতের জন্যও ৩লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। মহাত্মা গান্ধীর পশ্চিমবঙ্গ বাসের অধিকাংশ সময় সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে ব্যয়িত হইয়াছে—তথায় একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হইলে স্থায়ীভাবে তাহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে। গান্ধীজি পদব্রজে পানিহাটীর (২৪পরগণা) যে তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, তথায় একটি স্মৃতি-ফলক রাখাও প্রয়োজন।

ভাগলপুরে সাহিত্য পরিষদ—

গত ৩রা ফাল্গুন সরস্বতী পূজার দিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাগলপুর শাখার একটি বিশেষ সাহিত্য অধিবেশন হইয়াছিল। প্রতি বৎসরই ঐ দিন পরিষদের কর্তৃপক্ষ কলিকাতা হইতে একজন লোক উৎসবের সভাপতিরূপে লইয়া গিয়া থাকেন। এবার শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিরূপে উৎসবে যোগদান করেন এবং স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগিরধর চক্রবর্ত্তী প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষের উদ্যোগে উৎসব সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। স্থানীয় খ্যাতনামা সাহিত্যিক ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ভাগলপুরের সাহিত্যিক সমাজের প্রাণস্বরূপ। তিনি সমগ্র উৎসব পরিচালনা করার ফলে তাহা ত্রুটিশূন্য হইয়াছিল। ভাগলপুরবাসী বাঙ্গালী সমাজের ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার ফলে স্থানীয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া আছে।

পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রেতাদের সম্মিলন—

সম্প্রতি দিল্লীতে সর্ব ভারতের পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি-সংঘের বার্ষিক সম্মিলনে শ্রীনেহরু বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি অবশ্য গ্রন্থ লেখকগণ যাহাতে প্রকাশকদের নিকট উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করেন, সকলকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদিগকে তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, আমাদের বিশ্বাস তাহা শ্রীনেহরুকে জানানো হইয়াছে। এদেশে

অন্যান্য শিল্পের সহিত কাগজ তৈয়ারী শিল্প সম্বন্ধে সরকার যদি অবহিত হন, তবে কাগজের মূল্য কমিবে ও সুলভে পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হইবে। মুদ্রণ যন্ত্র নির্মাণ সম্বন্ধেও সরকারী কোন প্রচেষ্টার কথা শুনা যায় নাই। বর্তমানে যে মূল্যে মুদ্রণ যন্ত্র ক্রয় করিতে হয়, তাহা সুলভে গ্রন্থ প্রচারের পক্ষে অন্যতম বাধা। তাহা ছাড়া বিক্রয় কর, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদিগকে, বিশেষভাবে বিব্রত করে। দিল্লীর সম্মিলনের ফলে যদি বর্তমান অসুবিধা দুরীভূত হয়, তবেই সম্মিলনের সার্থকতা বুঝা যাইবে। সরকারী ব্যবস্থায় কাগজ ও মুদ্রণ যন্ত্র সুলভ ও সহজলভ্য করা না হইলে সুলভে গ্রন্থ প্রচারের কথা চিন্তা করাই অসম্ভব থাকিয়া যাইবে।
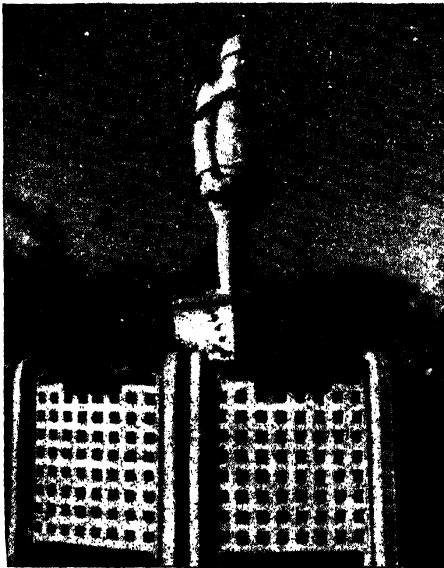
নব নির্মিত নেতাজীর পূর্ণাঙ্গ বিরাট মর্মর মূর্তি

পরলোকে সুন্দরলাল হোরা—

খ্যাতনামা পণ্ডিত, ভারতসরকারের প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক ডাক্তার সুন্দরলাল হোরা ৬০ বৎসর বয়সে গত ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পূর্বে পশ্চিমবঙ্গসরকারের মৎস্য চাষ বিভাগের পরিচালক ছিলেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবের হাফিজাবাদে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ৫ই ডিসেম্বর এসিয়াটিক সোসাইটী হলে বক্তৃতা দিবার সময় তিনি অজ্ঞান হইয়া যান ও তখনই কারনানি হাসপাতালে নীত হন। তথায় ৩ দিন পরে তাহার মৃত্যু হয়। বন্য পশু ও মৎস্যচাষ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। গত ৩৫ বৎসর ধরিয়া তিনি ৪০০ প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তির অভাব হইল।

ছাত্রীর কৃতিত্ব—

শ্রীমতী ঝর্ণা ভট্টাচার্য্য এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান
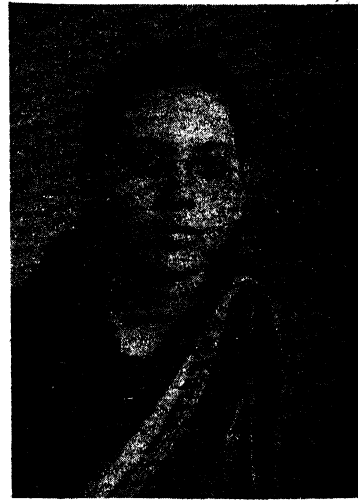
শ্রীমতী ঝর্ণা ভট্টাচার্য্য

অধিকার করিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী ঝর্ণা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অবসর-প্রাপ্ত প্রবীণ অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম্-এ, এম্-আর এ এস্ মহাশয়ের পৌত্রী, ডাঃ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এম্ বি মহাশয়ের কন্যা। শ্রীমতী ঝর্ণা বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ইতোমধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মহামায়া সুবর্ণপদক, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী সুবর্ণপদক ও

৺শ্রীশ্রীগৌরী মাতা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। বিদ্যালয় জীবনে তিনি ৺শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের ছাত্রী ছিলেন। শ্রীমতী ঝর্ণা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বঙ্গভাষায় প্রথম স্থান ও বি-এ অনার্স পরীক্ষায় সংস্কৃতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী ঝর্ণা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী—

খ্যাতনামা দেশকর্মী ও বক্তা জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় তাঁহার কর্মস্থল কলিকাতা রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ ওয়্যার্কিংম্যান্স ইনিষ্টিটিউটে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের লোক ছিলেন—১৮৯১ সালে গয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নববিধান
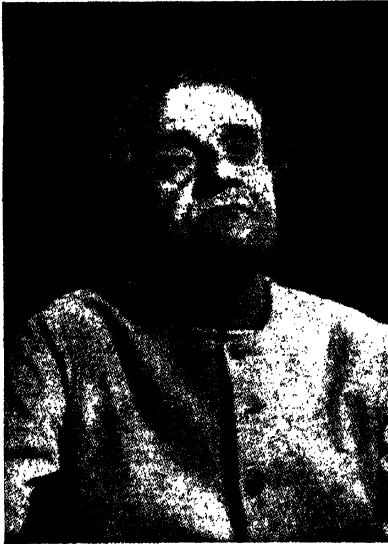
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরূপে তিনি জন্মাবধি সমাজ সেবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ম্যাজিক-লণ্ঠন বক্তৃতা সব সময়ে সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি বহুদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের পরিচালক ও প্রচার বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলাদেশে প্রদর্শনীর আয়োজনে তাঁহার অপূর্ব দক্ষতা ছিল। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কার্য্যে তিনি গত কয়েক বৎসর আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার একজন মহাপ্রাণ কর্মীর অভাব হইল।

কাশীপুর শ্মশানে স্বর্গত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-স্মৃতি-মন্দির

জি-ভি-মবলঙ্কর—

ভারতীয় পার্লামেণ্ট অর্থাৎ লোকসভার অধ্যক্ষ জি-ভি-মবলঙ্কর গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী সকালে আমেদাবাদে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। লোকসভার অধ্যক্ষরূপে তিনি যে সাহস ও নিরপেক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে। তিনি দেশসেবক ছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর সহকর্মীরূপে গত ৩৫ বৎসর কাল কাজ করিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন—

অমৃতসর শহীদনগরে কংগ্রেসের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে মধ্যভারতে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন হইবে। আগামী ১লা, ২রা ও ৩রা জুন বোম্বায়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির

পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। কংগ্রেস কর্মীদের সংগঠন বিষয়ে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করার জন্য শ্রীনেহরু, শ্রীজি-এল নন্দ, শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, বলবন্ত মেটা, ইন্দিরা গান্ধী ও মাধবন নায়ারকে লইয়া একটি সাবকমিটী গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী অমৃতসরে গঠন করা হইয়াছে।

উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার্থে য়ুরোপ যাত্রা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অন্যতম অধ্যাপক ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জীববিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণার জন্য য়ুরোপে গিয়াছেন। ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায় সাংবাদিক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র।

ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তিনি হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণি, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে গবেষণা ও পরিদর্শন করিবেন। কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীও গবেষণার জন্য য়ুরোপে গিয়াছেন।

কৃতী বাঙ্গালী সম্মানিত—

এ বৎসর কলিকাতায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ অন্যান্য বিবিধ অনুষ্ঠানের সহিত তিন জন কৃতী বাঙ্গালীকে সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহারা—(১) ৯৭ বৎসর বয়স্ক খ্যাতনামা কোবিদ বাঁকুড়াবাসী শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (২) শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও অভিধান লেখক সুপণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ বাংলার কোবিদদিগকে সম্মানিত করিলে তাঁহাদের ও গৌরব বর্দ্ধিত হইবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী ও ভারতের প্রথম আই-সি-এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সম্প্রতি শান্তিনিকেতনস্থ বিশ্বভারতী বিশ্ব-

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শিল্পী—শোভা সেন (শান্তিনিকেতন)

বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলার নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) পত্নী। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর। সারা জীবন তিনি সংস্কৃতি, সঙ্গীত প্রভৃতির আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। ভারতে তিনি দ্বিতীয় মহিলা ভাইস-চ্যান্সেলার। ইতিপূর্বে শ্রীমতী হংস মেটা বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়াছেন। একজন বাঙ্গালী মহিলার এই সম্মানলাভ বাঙ্গালী মাত্রেরই আনন্দের বিষয়।

সেওড়াফুলীতে লেখক সম্মিলন—

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী রবিবার হুগলী জেলার সেওড়াফুলীতে শরৎ স্মৃতি ভবনের বিরাট হলে মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে এক নবীন লেখক ও লেখিকা সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন, হুগলী জেলা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি শ্রীঅবনীমোহন মজুমদার সভাপতিত্ব করেন এবং বারাকপুরের শ্রীতুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় কলিকাতা, সেওড়াফুলী, বৈদ্যবাটী, চাতরা, শ্রীরামপুর, কোননগর, রিষড়া, চন্দননগর, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বহু নবীন লেখক লেখিকা সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। স্থানীয় তরুণ কর্মীদের চেষ্টায় এই সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং ইহার ফলে তরুণদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়।

সেওড়াফুলিতে নবীন লেখক-লেখিকা সম্মেলনে বিশিষ্ট অতিথিগণ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে গবেষণা—

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা ও গবেষক ছাত্রগণকে সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ৪টি বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন করিয়া ৪জন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে বিভাগীয় কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ সুশীল কুমার দে কাব্য বিভাগে, ডক্টর রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা স্মৃতি পুরাণ বিভাগে, শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য বেদ-বিভাগে ও শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য দর্শন বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা কমিয়া যাইতেছিল। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে তাহা বর্দ্ধিত হইলে দেশ উপকৃত হইবে—দেশের সংস্কৃতির প্রচার সহায়তা লাভ করিবে। আমরা এই সরকারী প্রচেষ্টার প্রশংসা করি। উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে ও কলেজে যাহাতে অধিকসংখ্যক ছাত্র সংস্কৃত পড়িতে উৎসাহ লাভ করে, সে বিষয়ে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

সিঁথি পাঠাগারে রজত জয়ন্তী—

গত ২৫শে হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার উত্তর সীমান্তে সিঁথি বনমালী-বিপিন পাব্‌লিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুমের রজত জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন তরুণের চেষ্টায় অতি ছোট অবস্থা হইতে এই পাঠাগার প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, অধ্যাপক কালিদাস নাগ, পণ্ডিত গৌরীনাথ লাহিড়ী, আচার্য্য অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীকানাইলাল ঢোল ও সম্পাদক শ্রীনলিনী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীরাধারমণ দাসের চেষ্টায় উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সাধারণের দ্বারা অনুষ্ঠিত এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান পাঠাগারগুলিকে সর্বতোভাবে সরকারী সাহায্য দ্বারা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।

কবি কুমুদরঞ্জনের জন্মজয়ন্তী—

কলিকাতাস্থ সাহিত্য-তীর্থের উদ্যোগে গত ১৯শে ফাল্গুন শনিবার কলিকাতা হইতে একদল সাহিত্যিক বাংলার প্রাচীনতম কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামস্থ গৃহে যাইয়া তাঁহার ৭৭তম জন্মদিবসে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। ঐ দলে বিশিষ্ট কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তীর্থ-সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, কবি শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, সুলেখক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। সম্বর্দ্ধনার পরে কুমুদরঞ্জনের সভাপতিত্বে সাহিত্য-তীর্থের বসন্ত উৎসব হয়। পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন অজয় নদ ও কুন্নর নদের সংযোগ স্থলে চৈতন্যমঙ্গলের কবি লোচন দাসের শ্রীপাটের নিকট নিজ পৈতৃক গৃহে বাস করেন। সাহিত্যিকগণ সেই পল্লী পরিবেশে যাইয়া সরল, উদার, অনাড়ম্বর, বালকসুলভ নির্মল চরিত্র কবিবরের সহিত মিশিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আমরা কবিবর কুমুদরঞ্জনের এই জন্মজয়ন্তীতে তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-প্রণাম জানাই ও প্রার্থনা করি, তিনি শতায়ু হন।

'সাহিত্য তীর্থে'র উদ্যোগে কবি কুমুদরঞ্জন সংবর্ধনা

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বিভিন্ন রাজ্য—

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না জানাইয়াছেন—ভারতের ১২টি বিভিন্ন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ১৫ হাজার একর জমী দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। বিহার ১০ হাজার একর ও হায়দ্রাবাদ ৫ হাজার একর জমী এখনই দান করিবে। আপাততঃ কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের ঐ সকল স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। যদি জমীগুলি কৃষি কার্য্যের উপযোগী না হয়, তবে তথায় শিল্প প্রতিষ্ঠায়ও সাহায্য করা হইবে। এ ব্যবস্থা সত্বর সম্পাদিত হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গে বহু ক্যাম্পে এখনও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পুরুষ মহিলা ও শিশু বাস করিতেছে। তাহাদের অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে প্রেরণ করা প্রয়োজন। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যাপারে ঐ সকল স্থানে সরকারী প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক, সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ শুধু বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা এ কার্য্য সুসম্পাদিত হইবে না! আমরা সরকারকে এ বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী—

গত ২৪শে ডিসেম্বর বর্দ্ধমান জেলা স্কুল বোর্ডের নব নির্বাচিত সদস্যদের সভায় বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এম-এ সর্বসম্মতিক্রমে বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ২৭জন সদস্যের মধ্যে ২৩জন সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও বিদায়ী সভাপতি শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। নারায়ণের বয়স মাত্র ৩৬ বৎসর। আমরা তাঁহার নির্বাচনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারত-পাক ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ

দিল্লীর ন্যাশন্যাল ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তানের তিনদিনব্যাপী প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতবর্ষ শীর্ষস্থান লাভ করেছে। ২১টি বিষয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ ১৩টিতে এবং পাকিস্তান ৮টিতে প্রথম স্থান লাভ করে। ৮টি বিষয়ে ভারতীয় রেকর্ড এবং ৮টি বিষয়ে এশিয়ান রেকর্ড স্থাপিত হয়।

স্থান লাভের ফলাফল

	১ম স্থান	২য় স্থান	৩য় স্থান
ভারতবর্ষ	১৩	১৩	৯
পাকিস্তান	৮	৮	১০

নতুন এশিয়ান রেকর্ড

১০,০০০ মিটার দৌড় : লালচাঁদ (ভারতবর্ষ); সময় — ৩১ মি: ৩৪ সে:।

১০০ মিটার দৌড় : আব্দুল খালেক (পাকিস্তান); সময়—১০.৪ সে: (হেলসিঙ্কি অলিম্পিক রেকর্ডের সমান)

হামার থ্রো : মহম্মদ ইক্‌বাল (পাকিস্তান); দূরত্ব —১৮৪ ফিট ৯ ইঞ্চি।

ডিস্‌কাস থ্রো : প্রদ্যুম্ন সিং (ভারতবর্ষ); দূরত্ব —১৪৮ ফিট ৮ ইঞ্চি।

১১০ মিটার হার্ডলস : মহম্মদ হানিফ (পাকিস্তান); সময়—১৪.৫ সে:।

ম্যারাথন রেস : গুরুচরণ সিং (ভারতবর্ষ); সময়— ২ ঘণ্টা ৩২ মি: ৩৭.২ সে:।

২০০ মিটার দৌড় : আব্দুল খালেক (পাকিস্তান); সময়—২১.৪ সে:।

সটপুট : প্রদ্যুম্ন সিং (ভারতবর্ষ); দূরত্ব—৪৭ ফিট ২½ ইঞ্চি।

ভারতের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ

পাতিয়ালার যাদবীন্দ্র ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় ক্রীড়ার সপ্তদশ অনুষ্ঠানে ১৬টি বিভাগে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে সার্ভিসেস দল। মোট ২৭টি প্রদেশ যোগদান করে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (পুরুষ বিভাগ): ১ম সার্ভিসেস (১৪৫ পয়েন্ট); ২য় পাঞ্জাব (২৭); ৩য় পেপসু (২৫)

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (মহিলা বিভাগ): ১ম বোম্বাই (৩৪)

নতুন ভারতীয় রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ

২০০ মিটার দৌড়—লেভি পিণ্টো (বোম্বাই) ২১.৫ সেকেণ্ড*। ৮০০ মিটার দৌড়—সোহন সিং (সার্ভিসেস) ১ মিনিট ৫২.৫ সেকেণ্ড। ১৫০০ মিটার দৌড়—কুলবন্ত সিং (সার্ভিসেস) ৩ মি: ৫৬.৮ সেকেণ্ড। ১০০০০ মিটার দৌড়—লালচাঁদ (সার্ভিসেস) ৩২ মি: ২৪.৪ সেকেণ্ড*। ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ—অজিত সিং (সার্ভিসেস) ৪ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ২৯.৬ সেকেণ্ড*।

১১০ মিটার হার্ডল রেস—শ্রীচাঁদরাম (সার্ভিসেস) ১৪.৮ সেকেণ্ড।

হাইজাম্প—অজিত সিং (পাঞ্জাব); ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি*।

বর্শা নিক্ষেপ—সারোয়ান সিং (সার্ভিসেস); দূরত্ব ১৯২ ফুট ½ ইঞ্চি।

ডিসকাস থ্রো—প্রদ্যুম্‌ন সিং (সার্ভিসেস); দূরত্ব ১৫১ ফুট ৬½ ইঞ্চি*।

সট সুট—প্রদ্যুম্‌ন সিং (সার্ভিসেস); দূরত্ব ৪৮ ফিঃ ১০½ ইঞ্চি*।

ব্রডজাম্প—রাম মেহার সিং (সার্ভিসেস); দূরত্ব ২৩ ফুট ৭½ ইঞ্চি*।

৪০০ মিটার রিলে রেস—(সার্ভিসেস)—(এ সিং, এস সিং, সোহন সিং ও যোগীন্দর সিং); ৩ মিঃ ১৬.৪*।

৪×৪০০ মিটার হার্ডল—(সার্ভিসেস) ৩ মিঃ ১৬৪ সেকেণ্ড।

মহিলা বিভাগ

২০০ মিটার দৌড়—মেরি ডিসুজা (বোম্বাই) ২৫.৭ সেকেণ্ড*।

শটপুট—এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট (বিহার); ৩৩ ফুট ৩ ইঞ্চি।

ডিস্‌কাস—কলিন ওকোনেল (মহীশূর); দূরত্ব ৯৯ ফুট ১১ ইঞ্চি।

ব্রডজাম্প—রোসিতা কামাথ (মহীশূর); ১৭ ফুট ½ ইঞ্চি।

জাতীয় জিমনাষ্টিক চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

সার্ভিসেস দল (৫০৪.৯৩ পয়েণ্ট) প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৫২ সাল থেকে এই নিয়ে উপর্যুপরি ৪ বার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো।

জাতীয় ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

১ম সার্ভিসেস (১৯ পয়েণ্ট); ২য় পেপসু (১১ পয়েণ্ট) এবং ৩য় দিল্লী (৯ পয়েণ্ট)।

জাতীয় ভলিবল চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

পাঞ্জাব ১৫-১০, ১১-১৫, ১৫-১৭, ১১ ১৫, ১৫-১২ পয়েন্টে দিল্লীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে।

হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ
ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেছেন

জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতা ঃ

গত দু' বছরের বিজয়ী মধ্যপ্রদেশ ফাইনালে ১-০ গোলে বোম্বাই দলকে পরাজিত করে। প্রথম দু'দিন খেলাটি গোল শূন্যভাবে ড্র যায়।

---

* উপরের তারকা চিহ্নিত রেকর্ডগুলি এশিয়ান রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে।

বিড়লা ব্যায়ামশালা ঃ

নয়াদিল্লীর বিড়লা আর্য্য ব্যায়ামশালা বহুদিন যাবৎ শরীর চর্চ্চায় দিল্লীর যুবকবৃন্দকে উৎসাহিত করে আসছে। এই ব্যায়ামগারের শিক্ষক শ্রীরণজিৎ মজুমদারের (Steelman 1933) অধীনে ছাত্ররা ব্যায়াম শিক্ষায় বিশেষ

নয়া দিল্লীর বিড়লা আর্য্য ব্যায়ামশালার শিক্ষক সহ ছাত্রবৃন্দ

বাম দিক থেকে দণ্ডায়মান :—বিত্থাভূষণ, এ পি শেঠ, রামলাল, বলবীর সিং, মিঃ চাড্ডা, জয় সিং, কারতার সিং

মধ্যে উপবিষ্ট :— হরিহরণ, শ্রীরণজিৎ মজুমদার (Physical Instructor,) মিঃ জ্যাট্‌লে

নীচে উপবিষ্ট :— এ প্রসাদ, শ্রীসমীর ঘোষ (Mr. Delhi—1956)

সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। এই ব্যায়ামাগারের বাঙ্গালী ছাত্র শ্রীসমীর ঘোষ এবার Mr. Delhi 1956 সম্মানলাভ করেছেন।

রঞ্জি ট্রফি

সেমি ফাইনালে বাংলা ১০ উইকেটে মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত ক'রে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে। এই নিয়ে বাংলা পাঁচবার ফাইনাল খেলবে। মাত্র একবার ১৯৩৮-৩৯ সালে বাংলা রঞ্জি ট্রফি পায়।

মধ্যপ্রদেশ ঃ ১৫৫ (পি চ্যাটার্জ্জি ৫০ রানে ৭ উঃ) ও ১৫৫ (পি চ্যাটার্জি ৫৯ রানে ৮ উঃ)।

বাংলা ঃ ২৮৯ (বি দাশগুপ্ত ৮১, বি চন্দ্র ১১৬। রহিম ১১২ রানে ৫ উঃ) ও ২২ (কোন উইকেট না হারিয়ে)।

রঞ্জিট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে বাংলা প্রদেশ এক ইনিংস ও ৫৬ রানে উড়িষ্যাকে পরাজিত করে।

বাংলা ঃ ৩৭৩ (এস থাম্মা ১২৪ নট আউট)

উড়িষ্যা ঃ ১৪৩ (এস পট্টনায়ক ৫৫ ; ফাদকার ৪৬ রানে ৪ এবং কে বিশ্বাস ২৯ রানে ৩ উইকেট) ও ১৭৪ (রামপ্রকাশ ৪০। ফাদকার ৩৫ রানে ৩ এবং ঘোষাল ৩৪ রানে ৩ উইকেট)

বাংলা প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে সেণ্ট্রালজোন বিজয়ী মধ্যপ্রদেশ দলের সঙ্গে খেলে।

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বোম্বাই ১ ইনিংস এবং ২৪৪ রানে গত বছরের রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী মাদ্রাজ দলকে পরাজিত করেছে। ফাইনালে বোম্বাই বাংলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

মাদ্রাজ : ১২৪ (দেশাই ৪৯ রানে ৪ উইঃ) ও ৮৯ (উমরীগড় ৪৩ রানে ৬ এবং দেশাই ৩৪ রানে ৪ উইঃ)

বোম্বাই : ৪৫৭ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মানকাদ ১০৭, উমরীগড় ৬৭, মন্ত্রী ১২২, দালভি ৫৫)

বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব ঃ

শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় বিলাতের ইনষ্টিটিউট অফ্ লোকোমোটিভ ইঞ্জিনীয়ার প্রতিষ্ঠানের স্নাতক। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি লাঙ্কাশায়ার-স্থিত অতি বিখ্যাত ভালকান্ ওয়ার্কস নামক কারখানায় যোগদান করেন। তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব, বিলাতে ক্রিকেট খেলায় ইনি প্রচুর সুনাম অর্জ্জন করেছেন। বিলাতের কাউন্টি ক্রিকেটের বহু ম্যাচে ব্যাটিং এবং বোলিং উভয়েই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি ওয়েষ্ট ল্যাঙ্কাশায়ার ক্রিকেট লীগের নির্ব্বাচন কমিটিতে প্রথম ভারতীয় হিসাবে নির্ব্বাচিত হন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—নিউজিল্যাণ্ড টেষ্ট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের ২য় টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৭১ রানে নিউজিল্যাণ্ড দলকে পরাজিত করে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৩৮৬ (উইকস ১০৩, এ্যাটকিনসন ৮৫, গডার্ড ৮৩ নট আউট। রীড ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

নিউজিল্যাণ্ড : ১৫৮ (রামাধীন ৪৬ রানে ৫ উইঃ) ও ১৬৪ (ভ্যালেনটাইন ৩২ রানে ৫, স্মিথ ৭৫ রানে ৪ উইকেট)

ওয়েলিংটনে অনুষ্ঠিত ৩য় টেষ্ট ম্যাচে নিউজিল্যাণ্ড সফররত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ৯ উইকেটে নিউজিল্যাণ্ড দলকে পরাজিত করেছে। এই টেষ্ট সিরিজের ৪টি টেষ্ট খেলার মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ তিনটি খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করেছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৪০৪ (উইকস ১৫৬, পিয়ারুডিউ ৬৮, এ্যাটকিন্সন ৬০। রীড ৮৫ রানে ৩ উইঃ) ও ১৪ (১ উইকেটে)

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়কে প্রখ্যাত খেলোয়াড় ফ্রেডী ব্রাউন্ একটি ক্রিকেট ব্যাট উপহার দিচ্ছেন

নিউজিল্যাণ্ড : ২০৮ (বেক ৫৫) ও ২০৮ (ডন টেলার ৭৭। এ্যাটকিন্সন ৬৬ রানে ৫ উইঃ)

পাক-ইংলণ্ড টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

পেশওয়ারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান বনাম ইংলণ্ডের (এম সি সি এ দল) ৩য় বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় পাকিস্তান ৭ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে।

ইংলণ্ড ঃ ১৮৮ (কারদার ৪০ রানে ৬ উইকেটে) ও ১১১ (খান মহম্মদ ৬৫ রানে ৫ এবং কারদার ২৬ রানে ৫ উইকেট)

পাকিস্তান ঃ ১৫২ (লক ৪৪ রানে ৫) ও ১৪৯ (৩ উইকেটে। আলিমুদ্দিন ৫৯)

ইণ্টার-সার্ভিসেস ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ

আম্বালায় অনুষ্ঠিত 'ইণ্টার সার্ভিসেস এ্যাথেলেটিক

চ্যাম্পিয়ানসীপ' প্রতিযোগিতায় ইস্টার্ণ কম্যাণ্ড ৯৪ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই অনুষ্ঠানে ২৬টি নতুন রেকর্ড হয়েছে—এই নতুন রেকর্ডের মধ্যে আছে এশিয়ান, ন্যাশনাল (ভারতীয়) এবং সার্ভিসেস রেকর্ড।

ফলাফল: ১ম ইস্টার্ণ কম্যাণ্ড (৯৪ পয়েণ্ট); ২য় ওয়েষ্টার্ণ কম্যাণ্ড (৭৭); ৩য় সাউদার্ন কম্যাণ্ড (২৩); ৪র্থ নেভী (৪) এবং এয়ারফোর্স (১)।

আই-এফ-এর হীরকজয়ন্তী উৎসব ঃ

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন ১৮৯৩ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সালে অল্-ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্য্যন্ত সারা ভারতের ফুটবল খেলা সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনই সর্ব্বময় নিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ ক'রে এসেছে। ১৯৪৩ সালে এসোসিয়েশন রজতজয়ন্তী বৎসর পালন করে। হিসাবমত ১৯৫৩ সালই প্রতিষ্ঠানের হীরক জয়ন্তী বৎসর; কিন্তু অনিবার্য্য কারণে ঐ বছর পালন করা সম্ভব হয়নি বলে ১৯৫৬ সালে পালন করা হ'ল। এই উপলক্ষে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব মাঠে আই-এফ-এ-র অনুমোদিত ৫৩টি ফুটবল ক্লাব নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পতাকাসহ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

এ ছাড়া হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে অষ্ট্রিয়া থেকে আগত একটি ফুটবলদল ক'লকাতায় দু'টি ফুটবল ম্যাচ খেলে।

খেলার ফলাফল—ওয়াইনার স্পোর্টস ক্লাব (অষ্ট্রিয়া) ২ : আই-এফ-এ দল—১। ওয়াইনার স্পোর্টস—২ : মোহনবাগান—০।

নিখিল ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রাইফেল সুটিং ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল এসোসিয়েশন পরিচালিত ৪র্থ বার্ষিক নিখিল ভারত এবং ৫ম বার্ষিক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রাইফেল সুটিং প্রতিযোগিতায় ক্যালকাটা সেণ্টার ক্লাব 'এ' দল দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। রাইফেল সুটিংয়ে সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশকর ব্যাপার অলিম্পিক ফ্রি রাইফেল প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানে ডাঃ হরিহর ব্যানার্জ্জী প্রথম স্থান লাভ করেন। সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের শ্রীমতী গীতা রায় এ বছর "গোল্ড ব্যাজ" পেয়েছেন। মোট ৭০০ পয়েণ্টের মধ্যে তিনি ৬৭৮ পয়েণ্ট করেন। গত বছর ঐ ক্লাবেরই সুনীল গাঙ্গুলী "গোল্ড ব্যাজ" পেয়েছিলেন। তাঁর পয়েণ্ট ছিল ৬৮৭, মোট ৭০০ পয়েণ্টের মধ্যে। এ পর্য্যন্ত এ দু'জন ছাড়া আর কেউ এই সম্মান লাভ করেননি।

ছবি

ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ রায়

শ্রীমতী মুরতি আঁকে কার ?
নানা ছাঁদে ছবি আঁকে, বিভোর হইয়া দেখে,—
কোনো দিকে নাহি দিঠি আর,

ঘনশ্যাম তনুখানি, আঁখিতে বিজুরী হানি—
অধরে মুরলী আঁকে তার ;
নয়ানে কাজর রেখা, কপালে তিলক লেখা,
আঁকে গলে বনফুল হার।

কটী-বেড়ি পীতধরা, মাথায় মোহন চূড়া
বেড়ি তাহে কুসুম সম্ভার ;
তুলিকা লইল টানি, আঁকিল না পা-দুখানি,
পাছে চলে যায় আর বার।
শ্যামের চরণে আজ শ্রীমতীর নাহি কাজ,
এ সুমতি থাকুক তাহার।
চরণ কমল দুটি নিতি যেন রহে ফুটি
"দীনরায়" হৃদে অনিবার॥

একাঙ্কিকা : মন্মথ রায়

এই পুস্তকে একুশটি একাঙ্কিকা নাটিকা সংকলিত হইয়াছে, একাঙ্কিকা নাটিকা একটি স্বতন্ত্র আর্ট। ইহা নাটকও নয় ছোটগল্পও নয়—দুইএর মাঝামাঝি। নাটকের আবেদন প্রত্যক্ষ, ইহার ভাব-ধারাকে ঘনীভূত করিয়া প্রকট করিয়া তুলিতে হয়। একাঙ্কিকাতে আরো বেশি মাত্রায় ঘনীভূত করিতে হয়। রঙ্গমঞ্চে অভিনেয় নাটকে ব্যঞ্জনার স্থান নাই। একাঙ্কিকা প্রধানতঃ অভিনয়ের জন্য নয়—সেজন্য ইহা সাধারণ ব্যঞ্জনা-গর্ভ হয়। ছোট গল্পে ব্যঞ্জনার স্থান থাকিলেও একাঙ্কিকার তুলনায় তরলতর।

একাঙ্কিকা নাটিকা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। মন্মথবাবুই কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর একাঙ্কিকা রচনা করিয়াছেন। J. O. Francisএর Birds of a Feather, L. Housemanএর Brother wolf, I. M. squgeএর Riders of the sea. Hughste wartএর A Room in the Tower, Foe corrica Howers of Coal —ইত্যাদি One Act playর সঙ্গে অনেকের পরিচয় আছে। ইংরাজি সাহিত্যে একাঙ্কিকা একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এত বিচিত্র পরিস্থিতির কল্পনা আমাদের দেশের একাঙ্কিকার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহার কারণ আমাদের জাতীয় জীবনের দেশকালপাত্রগত পরিসর সংকীর্ণ।

মন্মথবাবুর একাঙ্কিকাগুলিতে যতদূর সম্ভব বিষয় বৈচিত্র্য ও পরিস্থিতি বৈচিত্র্য দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। লেখক অধিকাংশ রচনাকে ব্যঞ্জনা-গর্ভ করিয়া তুলিয়াছেন। যেগুলি অতীতকালের বিষয় বস্তু অবলম্বনে রচিত সেগুলিতে যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টির কুশলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষা তাহাদের মুখ ও বুক দুইএর উপযোগী। একাঙ্কিকা বঙ্গ সাহিত্যে একটি অনন্যসাধারণ অবদান। আশা করি এই-গুলি রসজ্ঞ পাঠকের সমাদর লাভ করিবে।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য ৫৲ টাকা।]

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি : (প্রাক্ মুসলিম যুগ)

—গুরুদাস সরকার

মানুষের সভ্যতার পরিচয় মেলে তার সৃষ্টির মধ্যে। তার শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে তার সভ্যতার উচ্চতা। প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্র ইরাণ। তার সভ্যতার ইতিহাস—শিল্প সৃষ্টির ইতিহাস সুপণ্ডিত লেখক শ্রীগুরুদাস সরকারের রচনায় সম্যক্ বর্ণিত হয়েছে। জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রেই এ গ্রন্থ পাঠে তৃপ্ত হবেন।

[প্রকাশক : দেবকুমার বসু, ৭ জে, পণ্ডিত্যা রোড, কলিকাতা—২৯। মূল্য—৩৲ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

শকুন্তলা : শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য

বর্তমানে বিদেশী সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ খুবই প্রচলিত হয়েছে আমাদের দেশে; কিন্তু আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে যে সব অভাবনীয় সৃষ্টি লুকিয়ে আছে তার প্রতি তেমন অনুরাগ ও উৎসাহ বিশেষ দেখা যায় না; অথচ বিশ্বসাহিত্যের রাজ্যে সে সব সাহিত্য রত্নসিংহাসনে বসে আজো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করছে। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই পর্যায়েরই একটি বিশেষ গ্রন্থ। শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য শকুন্তলার আধুনিক গদ্যে বাংলা অনুবাদ করেছেন। রচনা-ভঙ্গী সুন্দর সরল। আজকাল লোকে প্রাচীন সাহিত্যের গ্রন্থাদি তেমন পড়েন না। কিন্তু আলোচ্য অনুবাদটির ন্যায় স্বচ্ছ সরল ভাষায় আধুনিক ছন্দে যদি সে সকল বইয়ের অনুবাদ করা যায় তাহলে অতীত সাহিত্যের প্রতি মানুষের অনুরাগ বাড়বে।

বইখানির মুদ্রণ পারিপাট্য ও অঙ্গসজ্জা প্রশংসনীয়। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক : হরিপদ ভট্টাচার্য; দি কলিকাতা ওরিয়েন্টেল বুক ডিপো। ১বি, নিয়োগী লেন, কলিকাতা—৫। দাম—১৷৷০ আনা]

বি. না. চ.

শশী-শ্যামলের সাঁকো : স্বপনবুড়ো প্রণীত

আলোচ্য উপন্যাস খানি স্বপনবুড়ো নতুন টেকনিকে লিখেছেন, ভাবা ও উপমা প্রয়োগে চল্‌তি প্রথা থেকে সরে এসে নতুন ভাবে বল্‌বার বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন, এমনকি নামকরণেও অভিনবত্ব দেখা গেল যেমন চন্দন, ফাল্গুন প্রভৃতি—এরাই উপন্যাসে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কাহিনী রোমাঞ্চকর, উপসংহার বড় করুণ। জলবিছুটি গাঁয়ের পুব-পাড়া আর পশ্চিম-পাড়ায় নটখট বারো মাসে তের পার্ব্বণের মত লেগেই ছিল, এখানকার আমোদ-উৎসব, পালপার্বণ, যাত্রাগান আর সামাজিক অনুষ্ঠানে

যেসব বিশৃঙ্খল ব্যাপার ঘটতো তার মূলে ছিল পুব পাড়ার চৌধুরি-পরিবারের ছেলে চন্দন আর পশ্চিম পাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ীর ফাল্গুন। গ্রাম্য দ্বন্দ্ব কলহের অবসান ঘটলো দুটি আদর্শ ছেলে শশী আর শ্যামলের আত্মোৎসর্গে। ওদের দুজনের রক্তে জলবিছুটি গাঁয়ের খালের জল রাঙা হয়ে গেল! মায়ের বোধনের আগেই অকাল বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠ্‌ল। জলবিছুটি গাঁয়ের বাগ্‌দীরা সেই রক্তে রাঙা খালের ওপরে বেঁধে দিয়েছে এক বাঁশের সাঁকো। শশী আর শ্যামলের আত্মোৎসর্গে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। আমরা গ্রন্থখানি পড়ে তৃপ্তিলাভ করেছি, ছেলেমেয়েরা পড়েও আনন্দ পাবে। প্রচ্ছদপট বিশেষ চিত্তাকর্ষক, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

[প্রকাশক: শ্রীসত্যব্রত গুহ। সত্যব্রত লাইব্রেরী। ১৯৭ নং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২॥০ আনা]

তুমি শুধু ছবি: শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

আলোচ্য গ্রন্থে সতরটী ছোট গল্প আছে, তন্মধ্যে স্বপ্ন গল্পটী আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় আড়াই হাজার বাংলা রসরচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছে। রচনা-শৈলী ও আঙ্গিকতার বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়—স্বপ্ন, দেশ নাই, ড্রেসিং টেবল আর তুমি শুধু ছবি। ঘটনাকে স্বল্প আয়োজনে স্বল্প পরিসরে ফুটিয়ে তুলে গ্রন্থকর্ত্রী অনাবশ্যক ব্যাপ্তিতে তা ভারাক্রান্ত করেননি। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে আলোচ্য গ্রন্থের ছোট গল্পগুলি পরিপুষ্ট, ভাষায় পারিপাট্যে সুন্দর ভাবে রূপায়িত আর ভাবের ব্যঞ্জনাও চমৎকার পরিবেশে চিত্তাকর্ষক। মধ্যবিত্ত সমাজের স্ত্রীপুরুষের চরিত্রের বিভিন্ন বিকাশ ও হৃদয়বৃত্তির ঘাত প্রতিঘাত ও রোমান্টিক আবেষ্টনী লেখিকার 'এক ফোঁটা অশ্রু' 'ভাঙ্গা গড়া' প্রভৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। অনেকগুলি গল্পের পটভূমিকা হচ্ছে হাসপাতাল। বাংলার সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলির ভিতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। পড়ে আনন্দ পাওয়া গেছে, সুকুমার সাহিত্যরসামোদীরাও পড়ে আনন্দ পাবেন, এরূপ আশা করা যায়। রেখাঙ্কিত প্রচ্ছদপট, উত্তম ছাপা ও বাঁধাই। এ গ্রন্থখানি প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত হয়েছে।

[প্রকাশক: এশিয়া পাবলিসিং কোং, ১৬।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩॥০ আনা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

উপনদী: অনিলকুমার ভট্টাচার্য

অনিলকুমার জীবনাশ্রয়ী শিল্পী। জীবনকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার শিল্প সাধনা—তাই সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনা অনিলকুমারের শিল্পানুভূতিতে আশ্রিত। কিন্তু সমাজ ও জীবনের কেন্দ্রে বাস করিয়াও তিনি ক্ষেত্র বিশেষে কল্পনাশ্রয়ী। এই উভয়বিধ সমন্বয় সাধনে অনিলকুমার কৃতী শিল্পী। "উপনদী" লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস—লেখকের কয়েকখানি ছোট গল্পের বই ও কবিতার বই তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত করিয়াছে। উপনদীর কাহিনী সরল ও নীতিদীর্ঘ। ইংরাজি শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্তা বিগত যৌবনা নাগরিক সুলেখার জীবনের একটি হতশ্রী পরিচ্ছেদকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসের সুরু। এই পরিচ্ছেদে সুলেখা এক দূর পল্লীগ্রামের শিক্ষয়িত্রী। পল্লীর পথে হঠাৎ ভ্রাতৃবন্ধু অশোক মিত্তিরের সহিত তাহার দেখা। পুরাতন পরিচয় ঘনীভূত হইয়া উঠিল। অশোক মিত্তির জেলা বোর্ডের ডাক্তার। সে নিপীড়িত মানুষের দুঃখ দূর করিয়া আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে। সুলেখাকে লইয়া এই আদর্শবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। লেখকের ভাবের সঙ্গে ভাষার ঐশ্বর্য্য অনস্বীকার্য্য। অনিলকুমারের কবিধর্মী মনের প্রকাশ সহজেই দেখা যায়। উপনদীর বন্যার বর্ণনায় বা সুলেখা-জীবনের সহিত উপনদী-প্রবাহের রূপক-কল্পনায় অনিলকুমারের প্রকৃতি-প্রিয়তা ও বর্ণন-শৈলী চোখে পড়ে এবং উপন্যাসের "উপনদী" নামকরণের সার্থকতা প্রকাশ পায়।

[প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—২৲ টাকা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "পতঙ্গ" (১ম—২য় সং)—২॥০, "পতিতা ধরিত্রী" (৩য় সং)—২॥০

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "লণ্ডনে শক্রচর" (২য় সং)—২৲

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কর্ণার্জ্জুন" (২৪শ সং)—২॥০

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "সিরাজদ্দৌলা" (১৭শ সং)—২৲

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "দেনাপাওনা" (১২শ সং)—৪৲, "অনুরাধা, সতী ও পরেশ" (৯ম সং)—১।০, "বড়দিদি" (২৪শ সং)—১॥০

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "শাদা পৃথিবী" (২য় সং)—৩৲

নিশিকান্ত বসু রায় প্রণীত নাটক "পথের শেষে" (১৭শ সং)—২॥০

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত "ফ্রাঙ্কেনষ্টিন"—১॥০

শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "জবানবন্দী"—॥০

পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "নাম-প্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ"—৩৲

[illegible] প্রণীত "যুগে যুগে ভগবান"—৷৵০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতির অরণ্য-যাত্রা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
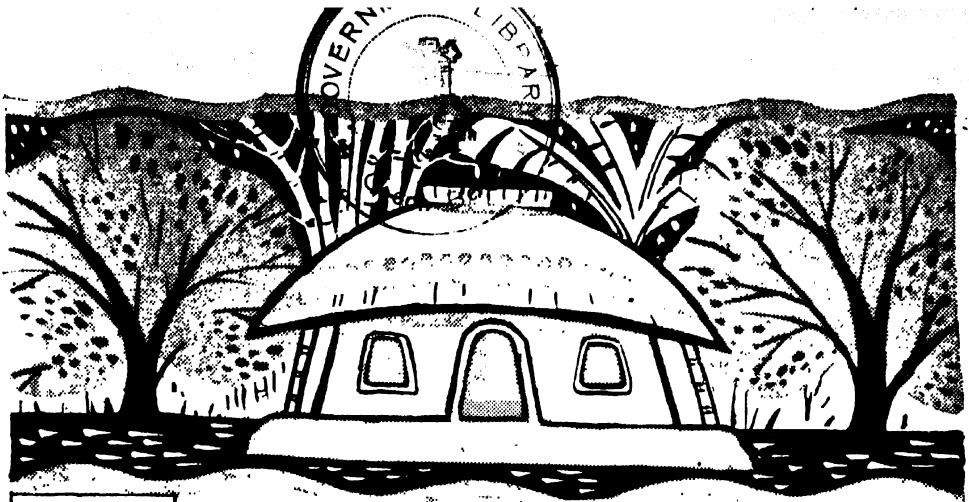
বৈশাখ—১৩৬৩

দ্বিতীয় খণ্ড	ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

বৈষ্ণব-কবির ধ্যানলোকে শ্রীগৌরাঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

বৈষ্ণব কবির যেমন একটি কাব্যলোক আছে, তেমনি আছে একটি ধ্যানলোক। কাব্যলোকে আছে রস-সাধনা, আর ধ্যানলোকে আনন্দরূপের জ্যোতি-সন্ধানের নীরব ব্যাকুলতা। ধ্যানলোকের মানস-ভাবনা যখন যাইয়া নিবিড় হইয়া ওঠে কাব্যলোকে, তখনই যে আনন্দ-মাধুর্যের বাণী-মূর্তিটি গড়িয়া ওঠে, তাহার আর তুলনা মিলে না। বৈষ্ণব কবির ধ্যানলোকে 'গৌরতনু লাবণি'র যে-মূর্তিটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা কাব্যের রসাশ্রয়ে যখন দেখা দিল, তখন তাহাও অপূর্ব। স্নিগ্ধমধুর ভুবন-ভুলানো ভাবময় সে-মূর্তি; অনুভূতির সুধাস্বাদে অভাবনীয় এক আবিষ্কার!

সর্বপ্রথম যে-একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যানরূপ আঁকিয়াছিলেন, সেই রূপ তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণেরই ছবি; আর সেই ছবিটি ফুটিয়াছিল এইভাবে—

> আজু কে গো মুরলী বাজায়।
> এ তো কভু নহে শ্যামরায়॥
> ইহার গৌর বরণে করে আলো।
> চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥
>
> *　*　*
>
> বনমালা গলে দোলে ভালো।
> এ-না বেশ কোন্ দেশে ছিল॥

এই বিশ্বের দিকে চাহিয়া তাহার বিস্ময় এবং মুগ্ধতার সীমা নাই! আনন্দময় ভাবভূমিতে আত্মিক মাধুর্যকে স্থির

করিয়া রাখিয়া দিয়া এই অপরূপ রূপের সঙ্গে গাঁথা মুরলী যেমন দেখিতেছেন, তেমনি দেখিতেছেন মাথায় বাঁধা চূড়া—আর গলে দোলানো বনমালা। কিন্তু সে-রূপে সুস্নিগ্ধ-শ্যাম সৌন্দর্যের বদলে গৌরবর্ণের দিব্যদীপ্তি! তখন ধ্যানের অতল হইতে প্রশ্ন জাগে কবির মনে—'এরূপ হইবে কোন্ দেশে?'

যে-দেশে এ-রূপের আবির্ভাব ঘটিল, সে-দেশ শ্যামলা কোমলা বাঙলা দেশ—আর সে-দেশের কবিরা চির-আরাধ্যকে খুঁজিয়া ফিরেন দৈনন্দিন জীবনের চিরপরিচিত স্নেহ সম্পর্কের মধ্যে। সৃষ্টির পরমপ্রাপ্তির সার্থকতাকে পাইতে চান মর্ম-মাধুর্যের আদান-প্রদানে। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই আদান-প্রদানের প্রেমভাবঘন মূর্তি!

বৈষ্ণব সাধকের চির-উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ এবং উপাসনার চেতনা শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধা উপাসনার চেতনা এইজন্য যে, সত্যিকারের রাধাভাব না হইলে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা চলে না। সত্যসুন্দরের রূপপ্রতীককে ধ্যানের ডোরে বাঁধা চলে না পরমার্থের পরিতৃপ্তিতে। বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ আনন্দরসের অমৃতবর্তি, আর শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব কবির কাছে সেই আনন্দময়ের প্রকাশরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় তাই বৈষ্ণব কবির কাছে ব্রজলীলা ধরা দিয়াছে—প্রেম-বিভোর ঢল ঢল রূপের সেই ব্রজলীলা। প্রেমবাহিনী যমুনার কল্লোল জাগিয়া উঠিয়াছে অশ্রুধারায়। তাঁহাদের ভক্তি তাই রাগানুগা ভক্তি, আর ভাব রাধাভাব বা গোপী-ভাব। ব্রজ-নিকুঞ্জের স্বর্গ-সুরভিত সেই ভাব-কদম্ব, যার মাঝে ধরা পড়ে,—

'তুয়া ভাব কান্তি ধরি, তুয়া প্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করব উদয়।'

(বলরাম দাস)

কিন্তু এই রাধাভাবের ভাগে আছে আর একটি ভাব—সে-ভাব ব্রজলীলার আদিস্তরের সঙ্গে গাঁথা। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে যে-কয়েকজন স্বচক্ষে সেই লীলা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই শচীদেবীর বাৎসল্যকে অবলম্বন করিয়া বহুপদ রচনা করিয়াছেন। যশোদার আঙিনায় বালগোপালের সঙ্গে তুলনা করিয়া হাস্য-সুন্দর নৃত্যরত নিমাইর ছবিটি আঁকিয়াছেন,—

কিয়ে হাম পেখনু কনক পুতলিয়া।
শচীর আঙিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া॥

(বাসুদেব ঘোষ)

স্নিগ্ধকান্তি বালক নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রত্যক্ষদর্শী কবি বাসুদেব ঘোষের আনন্দ-গলা বাৎসল্য ঝরিয়া পড়িতেছে। চাঁদ-চুয়ানো দেহবর্ণের লাবণ্যে দু'টি চোখ যেন বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। সর্ব-প্রেম-রসশ্রেয়ের মোহন ভঙ্গীর প্রথম লীলা এই, আর বাৎসল্য রসের সুধা-উৎসারে প্রাণভূমিতে সুধা-সিঞ্চন!

আর নবযৌবনের স্বর্ণকান্তি নিমাই যখন নাচিতেন, তখন এক ভক্তিবিহ্বল কবি মানস নয়নে সেই নৃত্য-বিভোর রূপটিকে দেখিয়াছেন, আর ছন্দ-তূলিতে আঁকিয়াও লইয়াছেন,—

গৌরাঙ্গ-সুন্দর যায় নাচিয়া নাচিয়া।
আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলিয়া ঢলিয়া॥

* * *

বাহুর হেলান কিবা ভালি গোরা রায়।
প্রতি অঙ্গের চালনে অমিয়া খসায়॥

(লোচনদাস)

চৈতন্যোত্তর কবির ভক্তি-মাধুর্যের অপরূপ মর্মধ্বনি, আর রূপ-অঙ্কনের মানস-সাধনা এই কবিতায়! এই নৃত্যমধুর রূপটিকে অবলম্বন করিয়া বহু কবি বহুভাবে নিজস্ব ধ্যানের জগৎটি গড়িয়া তুলিয়াছেন; বহু আনন্দের নীরব লগ্নে আপন মনে গান গাহিয়াছেন—'নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত গায়ত কত কত ভকত হিঁ মেলি।' ভক্তির ভাব-ভূমিতে আবেশ-ঢুলু-ঢুলু গৌরাঙ্গ-মূর্তিকে চোখের জলের মালায় নীরবে সাজাইয়া লইয়াছেন। ভাবের সজ্জাকরণে এ-এক অপরূপের রূপস্বপ্ন!

নবদ্বীপে যে-গৌরাঙ্গলীলা, সে-লীলায় কৃষ্ণভাবের প্রাধান্য বেশি। ভগবৎসত্তার স্বর্ণকমলের রূপ-বিস্তার সেখানে। 'রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায়।' এই লীলায় যাঁহারা সহচর, তাঁহারা কেউ আরাধনা করিয়াছেন নাগরীরূপে, কেউ করিয়াছেন মধুর রসের আবেশময়তায়। নাগরীভাবের সাধক নরহরি ঠাকুর আর মধুরভাবের সাধক বাসুদেব ঘোষ। প্রাণ-প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের আসনে

শ্রীগৌরাঙ্গকে বসাইয়া তাঁহারা যেমন অর্ঘ্য রচনা করিয়াছেন পূজার, তেমনি পূর্বরাগ, বিরহ ও মান-অভিমানের আলো-ছায়ায় চির-আকুলতার রাগিণীও রচনা করিয়াছেন। রাধারূপিণী কবি-আত্মা পূর্বরাগের মধুর আস্বাদ-পাওয়া ব্যাকুলতার সঙ্গে শুধু এই কথা বলিয়াছে—

কি কহব রে সখি আজুক ভাব।
অযতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ॥
একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ।
মুকুরে নিরখি মুখ বান্ধল কেশ॥
তৈখনে মিলল গোরা নটরাজ।
ধৈরজ ভাঙল কুলবতী-লাজ॥
দরশনে পুলকে পুরল তনু মোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে করল হি কোর॥

হৃদয়-মৌনতার মাঝখানে এই পূর্বরাগের রসাবেশকে গোপনে লালন করিয়া তখন শুধু এই কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়—'গোরার পিরীতি মরমে রহে গাঁথা।' নয়ন-ইংগিতে যে-প্রাণ হরণ করিয়া লইল, শয়নে স্বপনে যে-রূপ নয়নে লাগিয়া রহিয়াছে, সে-রূপের ধ্যান-চিন্তায় হৃদয় তো আকুল হইবেই! কৃষ্ণরূপের শ্যামল-স্নিগ্ধতা গৌর-অঙ্গের অমৃতদ্যুতিতে মিশিয়া আকুল করিয়া তুলিয়াছে রাধা-রূপিণী কবি-মানসকে। চিত্রে যেমন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধা আকুল হইয়া উঠিয়াছেন, তেমনি ভক্ত কবিগণও নিজেদের বুকের পটে আঁকা গৌরাঙ্গ রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। এক মনে সেই মূর্তিকে দেখিয়াও তাঁহাদের সাধ মিটে নাই,—শ্রীকৃষ্ণের অনুভাবে চিত্র আঁকিতে আঁকিতে কেবল বলিয়াছেন—

মন্দ মধুর মৃদু হাস,
কুন্দ কুসুম পরকাশ। (কবিশেখর)

আবার বিরহবোধের অতলান্ততায় হৃদয় যখন দিকহারা হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে, তখন ঠিক তেমনি শ্রীরাধার সকরুণ আর্তিই জাগিয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের কাব্যচ্ছন্দে—

হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল এবে কোথা লুকাইল
আগে মোর চিত্ত করি চুরি।
আপনে মোরে ডাকিল মন আমার ভুলে' গেল,
এবে করে মো সনে চাতুরি॥ (বলরাম দাস)

গৌর-ভাবনার প্রতিটি মুহূর্ত তখন বিরহের ব্যাকুলতায় বেদনাময়, প্রেমান্বেষী বক্ষপুটে সঞ্চিত হইয়াছে অজস্রক্ষরণ ভক্তির অশ্রু। স্থির লক্ষ্য প্রেমের অনির্বচনীয়তায় অন্তর তার পরিপূর্ণ। ভাব-সম্মেলনের আবেশ-আশ্বাস কখনো বা কবিকণ্ঠে বাজিয়া উঠিয়াছে—

সখি— গৌর যদি হত কালো,
অঞ্জন করিয়া রাখিতাম, আঁখি শোভা যে হৈত ভালো।
সখি— গৌর যদি হৈত মধু,
জ্ঞানদাস কহে আস্বাদ করিয়া মজিত কুলের বধূ।

কুলবধূর প্রেমাকুল প্রাণের অধিকারী তখন কবি নিজে। আনন্দ-বেদনার মোহনায় দাঁড়াইয়া কবি-আত্মা অপূর্ব প্রেমস্পর্শে বিভোর। সন্ধানের উৎকণ্ঠা আছে, পরি-তৃপ্তির হাসিও আছে। তখন যে—'প্রেমরসে হৈয়া ভোরা, সংকীর্তন-মাঝে গোরা রাধা নাম জীবেরে বুঝায়।'

তারপর যখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধার প্রেমভাবিত, বৈষ্ণব কবিগণ তখন তাঁহাকে আঁকিয়াছেন শ্রীরাধার ভাবশ্রী দিয়া। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন যেন—'রাইয়ের অঙ্গের সৌরভ লইয়ে চলিল শ্যামের পাশে।' মহাভাবের রসস্পর্শে সব কিছু তখন আনন্দময়। শ্যামরূপের অঞ্জন নয়নে লাগাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সমগ্র জগতকে তখন কৃষ্ণময় দেখিতেছেন, জগতের সমস্ত কাজের মধ্যে নিজ হৃদয়ের অনুভূতিকে মিশাইয়া দিয়া অনুভব করিতেছেন কৃষ্ণলীলাকে—গীত-গোবিন্দের 'কিং করিষ্যতি, কিং বদিষ্যতি' গান শুনিয়া অভিসারিণী শ্রীরাধার মত পাগল হইয়া ছুটিয়া যান;—তখন যেন 'তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী জীবই বহু পুণ ভাগ।' আর সর্ব নিবেদনের ইংগিতে দেহমন আবেশময়, —চোখে অশ্রুধারার অবিরল প্রবাহ! গৌরবর্ণ দেহ-মাধুর্যের ছন্দে যেন এক ঝলক আত্মসমর্পণের মিনতি। সেই রাধাভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নিজের সত্তাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া অভিসার-যাত্রায় বাহির হইয়াছে বৈষ্ণব-কবিমন। শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলাইয়া একান্তভাবে মিলিত হইতে চান অখিলরসামৃত মূর্তি প্রেমময়ের সঙ্গে। প্রেমভরা হৃদয়ের অলক্ষ্য স্পর্শ-সান্নিধ্যে

ধ্যানপরায়ণ হৃদয়ের এই অপূর্ব জাগরণ! প্রেম-চেতনার গোপন-লীলায় বৈষ্ণব-চিত্তও তখন আবেগ-মুখর। এই যে রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন, ইহা দেখিয়াই কবি বলেন—

যদি গৌর না হ'ত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে'।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা, জগতে জানাত কে?
(বাসু ঘোষ)

আর তখনই গাহিতে পারিয়াছেন—

শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার। (বাসু ঘোষ)

নিভৃততম ধ্যানের জগতটিতে চির-তপস্যার নিবিড়তা মিশাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণ-সাধনায় মগ্ন হইয়াছেন। অনুরাগ ও বিরহের ভরা লাবণ্যে শতদল পদ্মের মত প্রাণগ্রন্থিটিকে রসাইয়া লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকেও বাঁধিতে চাহিয়াছেন ধ্যানের গভীরতায়। প্রেমরহস্যের অগাধ সমুদ্রে সাঁতার দিয়া পৌছিতে চাহিয়াছেন অপরূপ আনন্দের তটভূমিতে। তাই চৈতন্য পর যুগেও ভক্ত কবির কণ্ঠে জাগিয়াছে প্রাণ-ঝরানো সংগীত ধ্বনি—

সো রস জলধি মাঝে মণি গেহ।
তঁহি রহি গোরী মুখ্যামর দেহ॥
সারথি সেই মিলাধর তায়।
গোবিন্দ দাস গৌরগুণ গায়॥

"সেই লীলাজলধির মাঝখানে আছে একটি মণি-মন্দির, বিরাজ করেন তাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ। মহাপ্রভুর চরণ-দুটিকে সারথি করিয়া পৌছিতে পারা যাইবে সেই মণি-মন্দিরটিতে।

চিরদিনকার ধ্যানের জগতে শ্রীগৌরাঙ্গ—আর সেই ধ্যানের জগতটিকে ছন্দোময় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন ভক্ত বৈষ্ণব কবি। ধ্যান ও ছন্দের মিলনভূমিতে চির মধুরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা!

পথের পাঁচালী

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

পথ চলি আর পথের পাঁচালী
আপনার মনে গাই,
কেবা শোনে আর কেবা নাহি শোনে
খবর রাখি না ভাই?
পাখী কভু নাহি চাহে ধনমান,—
সুরের নেশায় বিভোর পরাণ,
নহে রাজসভা—তরুশাখা 'পরে
এতটুকু মাগে ঠাঁই?
আহা, এই পথে কত পথিকের
অচিন্ পায়ের দাগ,
এ ধূলির মাঝে কত হাসাকাঁদা,
অভিমান-অনুরাগ!

গান গাই আর কেবল কুড়াই—
যেতে যেতে আমি যাহা কিছু পাই,—
স্নেহ ভালবাসা, মরমের প্রীতি,
মমতার রাঙা ফাগ!
কোন্ পথে তুমি,—আমি কোথা যাবো
ঠিকানা তাহার নাই,
ক্ষতি কি?—তোমারে শুনায়ে এ গান
যদি আনন্দ পাই!
একটু দরদ—তার বেশী আর
এ জীবনে কিছু নাহি চাহিবার,
দুদিনের লাগি' সবার প্রাণের
প্রেমের প্রসাদ চাই!

প্রশ্ন

শ্রীশান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

রেল লাইন পার হচ্ছিলাম, দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিজেই কাছে এসে দাঁড়ালো সুরজপতি। ডানহাতখানা টেনে নিয়ে মুখের একটা ভঙ্গি করে হাতের তালুতে লিখলে "কেমন আছেন?" তারপর মুখের দিকে তাকালে।

অপ্রস্তুত হলাম একটু। হেসে ইংগিতে বললুম "ভাল। তুমি?"

নিচের ঠোঁটটা উল্টে হাত দু'টো নাড়লে সুরজপতি। জড়িত স্বরে টেনে টেনে বললে "বালনা।"

মুখের অপ্রস্তুত হাসিটুকু মিয়িয়ে এলো আমার। আপাদমস্তক একবার দেখলুম তাকে। একটু যেন রোগা হয়েছে। মুখের আদলে দুশ্চিন্তার ছাপ। বললুম "কেন?"

চওড়া কপালের উপর আঙুল ঠুকলো সুরজপতি। তারপর জিভ নেড়ে, চোখ টান করে হাতের মুদ্রায় বুঝিয়ে বললে "কপাল। আর কেন। চাইলেই কি সুখ মেলে? পকেটে নেই পয়সা, মনে নেই শক্তি, ঘরেও একই অবস্থা। সুখ আসবে কোথা থেকে।"

ক্রমে এক এক করে আরো খবর দিলে। পাবলিসিটি অফিসের চাকরিটা গেছে আজ চার মাস—শুধু কথা না বুঝবার জন্যে। অনেক করে অবশ্য বুঝিয়ে ছিল নিজের অবস্থা। বলেছিল "না হয় তুমি কাগজে-কলমে অর্ডার দিও, আমি সেই মত তোমার কাজ করে দেবো। একবারের জায়গায় না হয় চারবার স্কেচ দেখাবো।" কিন্তু ফল হয়নি কোন। সাহেব এক কথার মানুষ। সেই থেকে বেকার। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না। একটা কিছু করা চাই। নইলে মুখের গ্রাস আসবে কোত্থেকে?

জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকালো সুরজপতি। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলাম দু'জনে। পাশে একটা লাইট পোষ্ট। তারই আলো পড়ে চক্‌চক্‌ করছে ওর চোখ দু'টি। বুঝলাম, অনেক দুঃখ জমেছে মনে।

বললুম "দমলে কি চলে? আবার চেষ্টা কর।"

চেষ্টা? আধো স্বরে যেন ডুকরে উঠলো সুরজপতি। বললে, "বসে আছি কি? রাতদিনই তো দোরে দোরে ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু—" তেমনি আবার ঠোঁট উল্টে হাতের মুদ্রায় কথা শেষ করলে সে! অর্থাৎ 'কিছুই হচ্ছে না।'

দু' একজন করে লোক দাঁড়াচ্ছিল আসে-পাশে। চোখের ইসারা করলুম সুরজপতিকে। বললুম "চল পোলের ওপর বসে গল্প করা যাক।"

সুরজপতি আমার বাল্য বন্ধু নয়, তবে পুরোনো পরিচিত। অবশ্য আলাপটাও বিচিত্রভাবেই হয়েছিল। বছর তিনেক আগে একবার ঝাড়গ্রাম গিয়েছিলাম। ট্রেনের কামরায় হাওড়া থেকে মাত্র দু'টি যাত্রী। আমি আর সুরজপতি। সেই ট্রেনে যেতে যেতেই একটা ষ্টেশনে কি নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল সুরজপতির। প্রথমটা খেয়াল করিনি। উঠে কাছে যেতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হোলো! ভাঙা ভাঙা ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে একটা শোডা-ওয়াটার ভেণ্ডারকে। আমি কাছে যেতেই অসহায় ভাবে বললে "দেখুন তো কি অন্যায়। দোকানে দু' আনা দশ পয়সা, এরা নিচ্ছে চৌদ্দ পয়সা চার আনা। অন্যায় নয়?"

অবস্থা বুঝে নিজেই ব্যাপারটা মিটমাট করে দিলাম। সুরজপতিকে এনে বসালাম নিজের পাশে।

সেই প্রথম আলাপ। একটু প্রকৃতিস্থ হবার পর বললে "আপনাকে আমি চিনি।"

: কি করে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলুম আমি।

: আমিও ঢাকুরেতেই থাকি যে।

তারপর থেকে মাঝে মধ্যে পথে ঘাটে দেখা হতে হতে

অজানিতেই একদিন ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল সুরজপতি। মাঝে মাঝে অবাক হতাম। কি আনন্দ পায় ও আমার সঙ্গে কথা বলে? প্রশ্ন করলে দুঃখ প্রকাশ করে বলতো, "তুমি আমার দুঃখটা বোঝ যে। আর সবাই তো এড়িয়ে যায়। কথা বোঝে না আমার।"

ঘরের কথা তুলেও অনেক সময় দুঃখ করতো। অত বড় সংসারের সব মানুষের মুখে ভাষা দিলেন ভগবান, শত্রুতা করলেন শুধু আমার সঙ্গে। এ নিয়ে সবাই খোঁটা দেয়। বলে, অলক্ষুণে। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে সে তৃতীয়। অথচ কেউ মুখ তুলে দু'টো কথাও বলে না। মা রাত্রি-দিন গাল পাড়েন। বলে, এ একটা আপদ এসে জুটেছে আমার কপালে। বাবা অবশ্য অতটা বলেন না, তবে কাছে গেলেই কেমন উসখুস করেন, তবু তিনি অনেক করেছেন। ডেফ এণ্ড ডামে দিয়ে পড়িয়েছেন, আর্ট স্কুলের খরচা যুগিয়েছেন।

চিত্রবিদ্যায় অবশ্য বাবারও আশ্চর্য্য অনুরাগ ছিল। ডেফ এণ্ড ডাম থেকে পাশ করে বেরুবার পর তিনি নিজেই জোর করে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন আর্ট স্কুলে। বলেছিলেন, "সুকুমার চর্চা। তা'ছাড়া আজকাল আর্টের কমার্সিয়াল ভ্যালু প্রচুর। শিল্পের দাম বেড়েছে।"

সে সব দিন গেছে। মনে দুঃখ ছিল, কিন্তু অভাবের আঁচটি পর্য্যন্ত লাগতে দেন নি বাবা। কিন্তু সেখান থেকে পাশ করে বেরুবার পরই দিন বদলালো। বাবা বললেন "সাধ্য মত তোমায় দাঁড়াবার পথ করে দিয়েছি, এবার নিজের ওপর বিশ্বাস করতে শেখ।"

ভগবান মুখের কথায় বঞ্চিত করেছিলেন তাকে, কিন্তু সেটুকু পুরণ করে দিয়েছিলেন অন্যদিক দিয়ে। বুঝবার মত শক্তি ছিল তার। বুঝলো বাবার ইংগিত।

প্রথম প্রথম লাইব্রেরীতে বসে কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন-নিবেদন করলে এদিক ওদিক। তারপর ধরপাকড়। বছর খানেকের মাথায় একটা কাজ জুটলো। সাইন বোর্ড আঁকার কাজ। বেতন পঁয়তিরিশ টাকা।

সেখানে থাকতে থাকতেই আচমকা একটা ভাল কাজ পেয়ে গেল কোলকাতার বাইরে। দৈনিক পত্রিকার কাজ। প্রথম তিন মাস অস্থায়ী। কাজ ভাল দেখালে তারপর স্থায়ী। কিন্তু দু'টো মাসও ভাল করে কাটলো না, ফিরে এলো বাড়ীতে।

বাবা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, বললেন, "অমন চাকরীটা ছেড়ে এলি? অপদার্থ।"

ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলো সুরজপতি। কথা বোঝে না, তাই নিয়ে খিটিমিটি। তারও পর গুচ্ছার কাজ, চারজনের কাজ একজনকে দিয়ে করিয়ে নেবার চেষ্টা। দু'টো হাতে একটা মানুষ কত আর কাজ করতে পারে।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন বাবা। সেই যে মুখ বন্ধ করলেন, আর সে মুখে সহজ কথা ফুটলো না আজ পর্য্যন্ত।

আবার হাঁটাহাঁটি করে একটা কাজ জুটিয়ে নিলে। প্রেসের লে আউটের কাজ। চল্লিশ টাকা মাইনে। কাজ দেখাতে পারলে ক্রমে বাড়বে। কিন্তু এবারেও চাকরীটা স্থায়ী হোলো না। ছ'মাস চলে যাবার পর মাঝে মাঝে অনুযোগ দিত সুরজপতি। এত কম মাইনেয় একটা মানুষের কি করে চলে? গাড়ী ভাড়াতেই তো অর্দ্ধেক টাকা চলে যায়।

প্রথম প্রথম ভরসা দিত প্রেসের ম্যানেজার। 'হবে' 'হচ্ছে' করেও আবার তিনটে মাস কেটে গেল। সেই মুখেই একদিন কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। কিন্তু বেশী বাড়তে দিলে না ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে বাকি হিসেব মিটিয়ে দিয়ে বললে—"কাল থেকে আর আসবার দরকার নেই তোমার।"

প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে কথা শুনলে, তারপরে আর দাঁড়ানো চলে না। মুখের ওপরেই ম্যানেজার জানিয়ে দিলে, এতদিন তাকে সে করুণাই করেছিল। বোবা ব'লে সহানুভূতিতে অন্ধ হয়ে থাকেনি।

সেই কথাটা অনেক দিন পর্য্যন্ত খচ্ খচ্ করেছে মনে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে চোখের জল ফেলেছে। তারপর আবার নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছে, মিথ্যে তো নয় কথাটা। অস্বীকার করলে হবে কেন।

আবার সেই পুরোনো দিনের পুনরাবৃত্তি। কাগজ ঘেঁটে আবেদন পেশ করা, পরিচিতের পত্র নিয়ে এখানে ওখানে ধর্না দে'য়া। শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ঠিকে কাজ আরম্ভ করলো। কিন্তু সেখানেও ফাঁকি। কাজ করিয়ে পয়সা দেয়না। দশ টাকার জায়গায় দু'টাকা ঠেকায়।

অথচ কাজ দেবার বেলা যত কড়াকড়ি। ফলে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠলো। হিসেব করে দেখলো, রং তুলির দাম পর্য্যন্ত ওঠেনি। উল্টে দু'চার জায়গায় ধারের অঙ্ক বেড়েছে।

বাবা এবার কড়া ধমক দিলেন। বললেন "এ সব ছাই পিণ্ডি ছেড়ে কোন অফিসে কাজ দেখ।" তিনি তো বলেই খালাস। কিন্তু সে পথও যে বন্ধ, তবু আবার দু'বেলা শুরু গেলো হাঁটাহাঁটি।

ঠিক এই সময়ই আর্ট এক্সজিবিসনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। সব শুনে বললেন "আমার মেয়ের ভারি সখ ছবি আঁকার, তুমি বরং যে ক'দিন চাকরী না পাও ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দাও। যা হোক একটা হাত খরচা দেবো তোমায়।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলে সুরজপতি। বাবার কাছে হাত পাততে পাততে ইদানিং সেটা ভীতিজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছায়া মাড়াতে পর্য্যন্ত ভয় করতো। মাঝের দিনগুলি যেন দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে তার।

ভোর বেলা বেরুতো। ফিরতো সবাই অফিসে গেলে। দু'টি কোন রকমে মুখে দিয়ে বেরিয়ে আবার ফিরতো সবাই শুয়ে পড়লে। রান্না ঘরের দাওয়ায় ভাত চাপা থাকতো। সেই খেয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে শুয়ে পড়তো ছোট ভাই বোনদের পড়বার ঘরে।

এবার অন্তত সে উৎকণ্ঠাটুকু কমলো।

সেই কাজকে জড়িয়ে একটা কাহিনী বলেছিল সুরজপতি।

প্রথম আলাপেই ভালো লেগে গেল ছাত্রীকে। ভাল লাগার একটা বড় কারণ ছিল, তার প্রতি মেয়েটির অকুণ্ঠ সহানুভূতি। এতদিন তাকে লোকে হাবা জেনে কৌতুকই করতো। এ যেন সেদিক থেকে বিরাট ব্যতিক্রম।

ছবি আঁকার ওপরও অত্যন্ত কৌতূহল। একবার ও কাগজ-তুলি নিয়ে বসলে আর খেয়ালই থাকে না কোন কিছুর।

যত ঘনিষ্ট হোলো ততই যেন আকর্ষণীয় হয়ে এলো সে। সপ্তাহে তিন দিনের জায়গায় ক্রমে পাঁচ দিন বরাদ্দ হোলো। দু' এক ঘণ্টার বদলে চার-পাঁচ ঘণ্টা। উঠতে গেলে হাত চেপে ধরে। বলে, আর একটু।

ক্রমে সুরজপতির কাছেও এটা নেশার মত হয়ে দাঁড়ালো। মাঝে মাঝে এমন হয়েছে সকালে গিয়ে রাত্রে ফিরেছে। দু'বেলাই অন্নগ্রহণ করতে হয়েছে সে বাড়ীতে।

কর্ত্তা গিন্নি দু'জনেই খুসী এ নিয়ে। বলেন, ক'টাই বা টাকা দিচ্ছি, কিন্তু কি নিষ্ঠা। দুঃখও করতেন অবশ্য কখনো কখনো। আহা, এমন একটা ছেলেকে কিনা ভগবান হাবা করে রাখলেন।

কিন্তু সে দুঃখটুকু পূরণ করেছিল সুমিত্রা তার সহানুভূতি দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে। ক্রমে বিশ্বাস করতেও শিখলো। ভালো এক্সজিবিসন হ'লে, উল্লেখযোগ্য ছবি এলে তার ওপরই নির্ভর করতো।

সেই তখনই সে নিজেকে আবিষ্কার করলো। মনে মনে তাই ভেবে অবাক হোতো, একটা উদগ্র প্রশ্ন ক্বচিৎ উঁকি দিত চিন্তায়। সুমিত্রা তাকে ভালবাসে? একটা হাবা অথর্ব পুরুষকে বিশ্বাস করবার মত বল নইলে কোথা থেকে পেলো সে! মনে পড়লেও ওলট-পালট হয়ে যেতো সব। ঝিমঝিম করতো মাথাটা।

আর সেই অগোছাল চিন্তার মধ্যেই ধরা পড়লো একদিন সে নিজের কাছে। সুমিত্রা তার নির্বাক মনে ঝড় তুলেছে, টেনে এনে দাঁড় করিয়েছে আর দশটা সুস্থ মানুষের পাশে।

মাঝে মাঝে তাই ভুল হয়ে যেতো নিজের পরিচয়, এলোমেলো হয়ে যেতো পারিপার্শ্বিক চিন্তা।

কিন্তু ভুল বুঝেছিল সুরজপতি। সুমিত্রা তাকে ভালবাসে না, করুণা করে মাত্র। এবং সেই সঙ্গে হয় তো খানিকটা বিশ্বাস।

শেষের দিকে বাইরে ঘোরাঘুরিটা রীতিমত বেড়ে গিয়েছিল সুমিত্রার। আর সেই ঘোরাঘুরির মাঝেই একদিন সুমিত্রার মনকে আবিষ্কার করলে সুরজপতি।

পার্ক ষ্ট্রীটের এক আর্ট এক্সজিবিসান থেকে বেরিয়েই কথাটা বললে সুমিত্রা, "তোমার সঙ্গে আজ একটা নতুন মানুষের আলাপ করিয়ে দি এসো। অবশ্য তোমার পরিচয় আগেই জানে।"

চোখ তুলে চাইতে গিয়েই দেখলে, ওপাশের ফুটপাথ থেকে ত্রস্তে এগিয়ে আসছে একটি পুরুষ। মুখোমুখি

হতেই হাত তুললে সে। সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে "তোমার মাষ্টার তো?"

আপাদমস্তক দেখলে একবারে তাকে সুরজপতি। আর সেই দেখতে গিয়ে খচ্ করে উঠলো বুকের ভেতরে, দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে গেল মুহূর্ত্তে।

সেদিন ফিরবার পথে হেসে প্রশ্ন করেছিল সুমিত্রা "কেমন লাগলো অসিতকে!"

সে প্রশ্নের আর উত্তর দেয়নি সুরজপতি। শুধু বাড়ীর দুয়ারে এসে একবার মাত্র চোখ তুলেই ফিরে এসেছিল। আর সেই অব্যক্ত চাহনিতেই মনের কথাটা বলে চমকে দিয়ে এসেছিল সুমিত্রাকে।

ঘটনাটা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল সেবার সুরজপতি। অবাক হয়েছিলাম তার চোখে জল দেখে। আরো অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে, এমন একটা মন সে পেলো কি করে।

পোলে এসে পাশাপাশি বসলুম দু'জনে। লোকজন বড় একটা নেই আশেপাশে। মাথার ওপর পূর্ণচন্দ্র। জ্যোছনায় ঝক্‌ঝক্ করছে চারদিক।

পোলের ঠিক নিচু দিয়ে সামনে পেছনে লম্বা চলে গেছে দু'জোড়া রেল লাইন। সামনের দিকে চোখ রেখে অনেকক্ষণ বসে রইলো সুরজপতি।

একটা লোকাল ট্রেণ মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে পার হয়ে গেল। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মুখ খুললে সুরজপতি। বললে "মাঝে মাঝে আপনাকে জ্বালাতন করি বলে কিছু মনে করেন না তো?"

বিব্রত হয়ে বাধা দিলাম তাকে। বললুম "এ কথা মনে স্থান দাও কেন। তোমার বিশ্বাসের একটা দাম নেই?"

সহজভাবে একটু হাসলে সুরজপতি এবার। বললে "কি জানি, আজকাল বড় ভয় হয়। চারদিক থেকেই লোকে ছিছি করে, উপহাস করে। বাবা তো খড়্গহস্ত। মুখোমুখি হলেই বলেন 'সরে যাও চোখের ওপর থেকে।' তাই চেনা মানুষ দেখলেই আজকাল ভয় হয়।"

চুপ করলে সুরজপতি। দূরে সার্চ লাইট ফেলে একটা ট্রেন আসছিল। সেটা পার হয়ে যেতেই আবার মুখ খুললে সে, বললে "কিন্তু আমার কি দোষ বল। আমি বাঁচতে চাই না? আমার দুঃখকষ্টের বোধ নেই? যেখানে যাই সেখান থেকেই এক কথা শুনে আসি। চাকরী নেই, কাজ নেই। অথচ কাজ আছে, লোকেরও প্রয়োজন হয় তাদের। তা' কি আমি বুঝি না বলতে চাও?"

আর একটু ঘেঁসে বসলো সুরজপতি। মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলে। কিন্তু তবু কেন সবাই এমন করে বিমুখ করে আমায়? ভগবান মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে শত্রুতা করলে আমি কি করতে পারি। সে কি আমার অপরাধ? আমি বাঁচবো না? আমার বাঁচবার সাধ নেই?"

মুখের দিকে স্পষ্ট করে তাকালো সুরজপতি। বুঝলাম, উত্তর চায় সে। কিন্তু কি বলতে পারি, কোন্ কথা বলে সান্ত্বনা দিতে পারি তাকে আমি।

চুপ করে ছিলাম। এবার হাত দু'খানা ধরে বললে "হাবা কালা বোবা অন্ধ নিয়ে আপনারা গল্প লেখেন, কত নাটক উপন্যাস লিখে নাম করেছেন। কিন্তু সে সবই মেয়েদের নিয়ে। আমাদের দিকে একবারও চোখ তুলে চেয়েছেন? কেন আমাদের কি দুঃখ নেই, বলবার কথা নেই?

অবাক হয়ে গেলাম সুরজপতির অভিযোগ শুনে। আশ্চর্য! এমন করে কে ওকে বলতে শেখালো। কে ঘুম ভাঙালো ওর মনের।

হাসলে সুরজপতি। বড় দুঃখে যেন হেসে ফেললে সে। বললে আপনারা বড় স্বার্থপর। মেয়েদের কথা ছাড়া আপনাদের বলবার কিছু থাকেনা আর।"

তারপরই তার কথা বললে।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জোগাড় করেছিলাম এই পাবলিসিটি অফিসের কাজটা। তাও কি এমনি? প্রথমে তিনটে মাস ঘুরেছি, তারপর হাতের কাজ দেখিয়েছি। সেও কি এক আধবার? তারপর জুটেছিল কাজটা। কিন্তু তিনটে মাসও গেলনা, দিলে বরখাস্ত করে হাবা-বোবা বলে। কিন্তু সেটাই কি সত্যি? ক'দিন পরেই জানলুম ব্যাপারটা। ওখানকারই একজন বলেছেন। আর্ট স্কুলের থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। তার সুপারিস নিয়ে দু'দিন ঘোরাঘুরি করেছিল। তাতেই বাবুর মন টললো। আর

সেই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেই আমায় পথে নামালেন ম্যানেজার।

কথাগুলি ঠিক এই ভাষাতে নয়, তবে এমনি ব্যঙ্গের সুরেই বললে সুরজপতি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—"ও কথা যাক। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।"

: কি অনুরোধ। আকাশের দিকে চেয়েছিলাম, চোখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলাম।

: একটা কাজের জোগাড় করে দেবেন? যে কোন কাজ। পেলেই কোন একটা হোটেলে উঠে যেতাম। আপনার তো কত চেনা-জানা আছে।

কুণ্ঠিত হলাম একটু। বললাম "অবশ্যই চেষ্টা কোরবো। কিন্তু সম্পূর্ণ ভরসা দিতে পারছি না। আমাদের সাধ্য তো জান।"

আস্তে আস্তে এবার হাতখানা ছেড়ে দিল সুরজপতি। বললে—"তবু বললুম আমার দুঃখটা বুঝবেন বলে। বাড়ীর লোকের চোখে তো আমি বিষ।"

এবার ভীত হলাম একটু। বুঝতে পারলুম, আবার কথার মোড় ফিরছে। প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলুম "সুমিত্রার খবর কি।"

চোখ তুলে চাইলে সুরজপতি। একবার ঝলক দিয়ে উঠলো তার দু'চোখ। বললে "ভালই আছে।"

: দেখা সাক্ষাৎ হয়?

: না।

: কেন?

মুখ ঘুরিয়ে নিলে সুরজপতি। ষ্টেশনের অটোমেটিক সিগন্যালে সবুজ আলো দিয়েছিল, সেই দিকে চেয়ে অস্ফুটে বললে—"বিয়ে হয়ে গেছে তার।"

যেন ধাক্কা খেয়ে সিধে হয়ে বসলুম—"তার আগেও দেখা হয়নি?"

হাসলে সুরজপতি। বললে—"সে সব কথা ভুলে গেছি আজকাল।"

: কেন?

: আমাদের মত হাবা-বোবা অক্ষম মানুষের কি ও সব সাজে? স্বপ্ন দেখাও পাপ। আমার দুঃখু বুঝবে কে?

অস্বাভাবিকভাবে এবার হাত মুখ নেড়ে চোখের ভাব প্রকাশ করলে সুরজপতি। তারপরই উঠে হাত দু'টো ঝেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো।

হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্ম্মের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালাম দু'জনে। এদিক ওদিক চাইলো একনজর সুরজ-পতি। ইসারায় প্রশ্ন করলে—"ক'টা বাজলো বলতে পারেন?"

আসবার সময় অফিসের ঘড়িটা চোখে পড়েছিল। বললুম "সাতটা কুড়ি বোধ হয়।"

আচমকা আমার হাত দু'টো চেপে ধরলো সে। ঘড়্‌ঘড়্‌ ক'রে একটা শব্দ বেরুলো তার গলা দিয়ে। ফাটা ফাটা আওয়াজ করে বললে—"কিছু মনে করবেন না যেন সময় নষ্ট করলুম বলে। চলি।"

বললুম "কোথায়?"

: "পাবলিক লাইব্রেরীতে" বললে সুরজপতি।

: কেন?

সেই আগের মতই আবার কপালে দু'টো আঙুল তুলে ঠুকলো বারকয়েক। তারপর হাত দু'টো ছেড়ে দিয়ে, চটর-পটর করে চটির শব্দ তুলে নেমে গেল সুরজপতি।

প্রবাসী বাঙালীর সমস্যা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

প্রবাসী বাঙালীরা বাঙালীর গোত্র কুল ছাড়া নয়—তারা সেই একই বাঙালী—কেবল কার্যগতিকে বাংলাদেশের চতুঃসীমার পরিবর্তে বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিতি করচে। তাদের দুঃখ কষ্ট সমস্যার সমাধানের ভার বাংলাদেশের বাঙালী না নিলে আর কে নেবে? কারণ তত্রত্য দেশের রাজ্যসরকার নেবেন না সেটা তাঁদের স্বার্থের অনুকূল নয় ব'লে।

বাংলা দেশের বাইরে থাকার ফলে প্রবাসী বাঙালীর জীবনে যেটা সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয়েচে সেটা চোখের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট—অর্থাৎ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় না। সেটা মনের দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিতে হয়। সে ক্ষতির একটু ইঙ্গিত আগেকার প্রবন্ধে দিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে বাংলা দেশের সংস্কৃতিগত ভাবধারার যে ধারাবাহিকতা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুর্ভাগ্য। বাংলা দেশের জলহাওয়ার এবং বাঙালীর জীবনের যে একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি (culture) আছে তা সকলেই স্বীকার করবেন। এই সংস্কৃতিই তাকে অন্য প্রদেশের অধিবাসী থেকে স্বতন্ত্র করেছে। এ দম্ভ বা প্রাদেশিকতার (parochialism) কথা নয়, এ factএর কথা। বাঙালীর কথা-বলার পারিপাট্য, বুদ্ধিদীপ্ত বচনভঙ্গী, মুখশ্রীর কমনীয়তা, বেশভূষার সহজ সাবলীলতা, চরিত্রের সলজ্জতা, ব্যবহারের অ্যারিস্টোক্র্যাসি, হিউমার বোধ প্রভৃতি লক্ষণগুলি অন্য প্রদেশবাসীর মধ্যে সুলভ নয়। এইগুলিকেই আমি বাঙালী-চরিত্রের বিশিষ্টতা ব'লে আখ্যা দিচ্ছি। বাংলা দেশে কোন শিশু (ছেলে অথবা মেয়ে) জন্ম নিলেই নিজের অজ্ঞাতসারে এই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এ আর তাকে আলাদা ক'রে অর্জন করতে হয় না। বাঙালীর পরিবারে এবং বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে এর স্রোত পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে—নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে সে স্রোত বাঙালীর সত্ত্বায় নিমজ্জিত হয়ে তাকে বাঙালী ক'রে গড়ে তুলচে। বাংলা দেশের বাইরে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেচেন তাঁদের এই সৌভাগ্য হয় নি। তাঁদের গড়ে তোলার দায়িত্ব সেই সেই দেশের পারিপার্শ্বিকের। যেমন ধরুন রাজপুতানার রুক্ষ বর্বর পাহাড়ের প্রান্তীয় (extreme) আবহাওয়ায় যে প্রবাসী বাঙালী শিশুটি জন্মাল, তার মুখে আপনি বাঙালী-সুলভ কমনীয়তা আশা করতে পারেন না, তার বেশভূষার আপনি বাঙালীর ঢলঢলে পাঞ্জাবীর ঢিলেমি আশা করতে পারেন না, তার কথাবার্তায় আপনি বুদ্ধিদীপ্ত সরসতা আশা করতে পারেন না। তার মুখে নিশ্চিত থাকবে পার্বত্য মায়ের কঠোর কাঠিন্য, তার পোষাক হবে আঁটসাট জিনিষের বাহুল্য, তার কথাবার্তা হবে নিতান্তই matter-of fact. এ হতেই হবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমি ময়মনসিংহ সহরে একবার মিলিটারি রেজিমেন্টে একাউন্ট্যান্ট হ'য়ে গিয়েছিলাম। পল্টনের নাম ছিল 1/9 Jats অর্থাৎ দিল্লীর এবং রাজপুতানার সীমান্ত (border) অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়ে এই পল্টনের বাহিনী গঠিত হয়েছিল। পল্টনের অ্যাড্‌জুট্যান্ট (Adjutant) সাহেবের জবরদস্তিতে আমাকে সন্ধ্যার সময় এই পল্টনের ক্লাবে গিয়ে একবার বসতে হ'ত। অনেক রকম গল্পসল্প হ'ত। একদিন এক সুবেদার-মেজর সায়েব আমাকে হাসতে হাসতে বল্লেন, একাউন্ট্যান্ট সায়েব, এ মাসে আমার মাইনেটা এখনো পাই নি—আপনার টাকা তৈরি করার মিণ্ট (mint) কি বন্ধ হয়ে গেছে? উত্তরে আমি নিরীহ ভাবে বল্লুম, সুবেদার-মেজর সায়েব, টাকা তৈরি করার মিণ্ট ত আমার কাছে নেই—যদি থাকতো তবে ত সকলের আগে আমি নিজেই অনেক টাকা তৈরি ক'রে নিতুম—আপনাদের দিতুম না।

সমস্ত ক্লাবে একটা হাসির হররা পড়ে গেল। উপস্থিত সবাই একেবারে হো হো ক'রে অট্টহাস্য ক'রে গড়িয়ে পড়তে লাগলেন। অথচ আমি কি একটা খুব বড় রকমের রসিকতা করেছিলুম? অতটুকুর ধাক্কাই ওঁরা সহ্য করতে পারেন না। তা হ'লে মনে করুন—রবীন্দ্রনাথের মত রসরাজের উপর্যুপরি রসিকতার বাণ নিক্ষিপ্ত হ'লে এঁরা কোথায় থাকতেন?

রসবোধ, শোভনতা-বোধ প্রভৃতি চারিত্রিক বিশেষত্বগুলি বাঙালীর চরিত্রে বেশি, এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। বাঙালীকে কল্পনাপ্রিয় বলা হয়, কথাটা সত্যি। এর দোষ এবং গুণ দুই-ই বাঙালী পেয়েছে। দোষ এই যে কল্পনার দৌড়ে ভেসে গিয়ে এ জাতি বাস্তববাদী হ'তে পারলো না—কিছুটা আদর্শ তার জীবনে থাকবেই। তাই পাঞ্জাবের মত কেবল কন্‌ট্রাকটর এবং ফৌজী অফিসার আর সিপাহি—বাংলা মায়ের কোলে জন্মাল না—জন্মাল বড় বড় উকীল, ব্যারিষ্টার—যাঁরা বড় আদর্শ ধরে জাতির নেতা হলেন, আবার একদিনে সর্বস্ব ত্যাগ করে ফকিরি গ্রহণ করলেন। জন্মাল কবি, সাহিত্যিক, ত্যাগী বিপ্লবী বীর। এর জন্যে জাতি হিসাবে বাঙালী ধনবান অর্থাৎ অর্থবান (possessing money) হ'ল না, যেমন পাঞ্জাব হয়েছে টাকা পয়সার দিক দিয়ে। তাই সাংসারিক দিক দিয়ে এটা লোকসান। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে দিন গুজরান করতে গিয়ে যদি দেখি যার সঙ্গে ঘর করি সে ঠাট্টা হাসি তামাসা বোঝে না, শ্লীলতার শালীনতার তেমন কোন বোধ নেই, পয়সা রোজগারের জন্যে সে সব কিছু করতে পারে, তবে এমন সঙ্গী নিয়ে আর যে-ই হোক্, বাঙালী খুশী হবে না। জাতি হিসাবে বাঙালী যে অর্থবান নয় সেটা বোঝা গিয়েছে এই উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের দিক দিয়ে। পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু যাঁরাই এদেশে এসেছেন তাঁদের হাতে নগদ অর্থ, গহনাপত্র, দামী পোষাক প্রভৃতি কিছুরই

অপ্রতুলতা ছিল না। কেবল তাঁরা নিয়ে আসতে পারেন নি তাঁদের স্থাবর সম্পত্তি। কিন্তু বাঙালী উদ্বাস্তু একেবারে সর্বপ্রকারেই নিঃস্ব—ছোট ছেলেমেয়ে স্ত্রীর হাত ধরে কটিবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় শিয়ালদা ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কল্পনা না থাকলে শোভনতা বোধ আসে না। উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। ধরুন জন্মদিন বা জন্মতিথি পালন করার যে তাগিদ মানুষ বোধ করে, সেটা তার কল্পনাপ্রসূত। নয়ত এর মধ্যে তেল নুন লকড়ির যে সমস্যা তা সমাধানের কোন সুবিধা নেই। বাংলা দেশে সকলে লক্ষ্য ক'রে থাকবেন কবির, দেশ নেতার সাহিত্যিকের জন্মদিন পালনের অবধি নেই—আর শহীদ দিবস ত লেগেই আছে। এখানে এই ইচ্ছাটি শুধু দেশগত এবং জাতিগত নয়, পরিবারগতও বটে। তাই বাড়িতে বাড়িতে আমরা দেখতে পাই ছেলের জন্মদিন, মেয়ের জন্মদিন, পিতার জন্মদিন প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে উৎসব হচ্ছে। কিন্তু প্রবাসী বাঙালীর মধ্যে এটি কম দেখেছি। অবশ্য যাঁরা নতুন নতুন বাংলা দেশের বাইরে গেছেন এবং এখনো মনের গঠনে এবং ভাবের ধারাবাহিকতায় বাঙালীই আছেন, তাঁদের মধ্যে আছে। কিন্তু যাঁরা পুরুষানুক্রমে প্রবাসেই বাস করেছেন এবং সেই সেই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাদের আচার ব্যবহার কতকটা তাঁদের মনকে প্রভাবান্বিত করেছে, তাঁদের মধ্যে এই সব শোভন প্রথা লোপ পেয়ে গেছে। আমার এক আত্মীয় আছেন যাঁরা কয়েক পুরুষ ধরে প্রবাসী। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিষ্ট্রার ছিলেন—অধিকন্তু রায় সাহেব। সুতরাং শিক্ষিত ব্যক্তি বলে সকলেই স্বীকার করবেন। অবশ্য এই শিক্ষা বাংলা শিক্ষা নয়—তিনি আমাকে যত চিঠি লেখেন সব ইংরাজিতে, পাছে বাংলা লিখতে গিয়ে বানান কিংবা ব্যাকরণ ভুল হয়। আর লিখিত বাংলার চেয়ে উর্দু জানেন ভাল। তিনি একদিন কথায় কথায় আমাকে বল্লেন যে তাঁর জন্মদিন রামনবমী তিথি। আমি বল্লাম যে তা হ'লে ত সুবিধাই হয়েছে—কারণ রামনবমীর তারিখটা মনে রাখা কিছুই শক্ত নয়। উত্তর প্রদেশে সেটা একটা পূজার এবং মাঙ্গলিকের তারিখ। কোন কোন আপিসে ছুটিও থাকে। এই কথাবার্তার পর যেদিন রামনবমী পড়লো সেইদিন আমি ফুলের মালা এবং কিছু ফল নিয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। ফুলের মালা তাঁর গলায় দুলিয়ে দিলুম এবং হাতে কমলালেবু দিলুম। তাঁর ছেলেরা ত দেখে অবাক। তাঁর জ্যেষ্ঠা দিদি বেরিয়ে এসে বল্লেন, এ সব কি কাণ্ড! কারণ তাঁদের নিজের বাড়িতে এই দিনটি পালন করার কোন আগ্রহ বা ব্যবস্থা কিছুই নেই। তাঁর উকীল ছেলেকে বিশেষ ক'রে বল্লুম, দেখ, পর্বতের আড়ালে রয়েছ, তাই এই দিনটির মহিমা কিছুই বুঝতে পারো না। বুড়ো চোখ বুজলে তখন হয়ত হুঁস হবে। যে বৃদ্ধ তোমাদের মধ্যে এখনো নাতি-পুতি নিয়ে হাসিমুখে বসে রয়েছেন তাঁর জন্মদিনটি কত আদরের, কত শ্রদ্ধার। এদিনকে সর্বান্তঃকরণে পালন কোরো—মনে বিশুদ্ধ আনন্দ পাবে। মনে ভেবেছিলুম এবার না হয় জান্‌তো না—পরের বছর নিশ্চয় এই তারিখটির বিশেষত্ব ওঁদের মনে থাক্‌বে। কিন্তু পরের বছর যথাদিনে ফুলের মালা এবং ফল হাতে ক'রে নিয়ে গিয়ে দেখলুম, বৃথা আশা। এই বিশেষ দিনটি কোন্ সকালে এসে আবির্ভূত হয়েচে ওঁদের কারোরই খেয়াল নেই। উকীল-পুত্র তাঁর নথিপত্রের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। তাঁদের মনে শোভনতা বোধ জাগাতে গিয়ে তখন আমার মনে লজ্জা এল। আমি মনে করলুম, শুধু শুধু বৃদ্ধকে বিব্রত করছি না ত! কেননা যে বৃদ্ধের বাড়িতে তাঁর আত্মীয়স্বজন এই দিনটির সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতন নয়; সেই বাড়িতে একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের এই দিনটি পালন করার ঝোঁক একটু বাড়াবাড়ির মতই ঠেক্‌বে।

উপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে যে প্রবাসী বাঙালীর মধ্যে কল্পনার প্রসারতা সম্বন্ধে আমি অত্যুক্তি করিনি।

প্রবাসে দীর্ঘদিন থাকার ফলে ক্রমশ প্রবাসী বাঙালীদের আচার ব্যবহার বাংলা দেশের থেকে পৃথক হ'য়ে গেছে এমনও দেখেছি। মিরাট থেকে মজঃফরনগর (পাকিস্থানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকাৎ আলি খাঁয়ের বাড়ি এখানে ছিল) একবার বিয়ের বরযাত্রী গিয়েছিলাম। প্রথমেই ত বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা হ'ল তামাকু সেবন করতে দিয়ে। একজন বল্লেন, 'নারিয়েলটা ধরুন।' আমি তামাক খাই না, প্রথমে বুঝতেও পারি নি যে আমাকেই কেউ কিছু বল্‌ছেন। পরে দেখি আমার দিকে এক ভদ্রলোক হুঁকোটা বাড়িয়ে ধরেছেন। আমি সবিনয়ে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলুম, কিন্তু হুঁকোর নাম কি ক'রে 'নারিয়েল' হ'ল বুঝতে পারলুম না। পরে ভেবে দেখলুম যে নারিকেলের হুঁকো—আর নারিকেলের হিন্দি হ'ল 'নারিয়েল'—অতএব হুঁকোর নাম হ'ল নারিয়েল। এই কথা শুনে আমার হঠাৎ মনে পড়লো যে এখানকার একটি মেয়েকেই আমার অপর এক বন্ধু বিয়ে করেছেন। তাঁর কাছে গল্প শুনেছি যে সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেখাতে হবে ব'লে তাঁর স্ত্রী তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মা, সাম হুয়া, দিয়া বার দুঁ? এখন আপনারাই বিচার করবেন যে এই প্রশ্নটির মধ্যে বাংলা ভাষা কতখানি আছে। পাশের ঘরেই হুঁকোর ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অবশ্য তামাক খাচ্চেন পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক বোঝা যাচ্ছিল না। মেয়েরাও যে ওদেশে তামাক খান সেকথা শুনেছিলাম। যেমন বাংলা দেশেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে তামাক খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। রান্না করতে করতে উনোন থেকে চ্যালা কাঠ বের করে তার অগ্নিশিখার সাহায্যে বিড়ি ধরাচ্চেন এমন মহিলাকেও চট্টগ্রামে দেখা যায়।

আসল ঘটনাটি যা বলতে যাচ্ছি তা ঘট্‌লো পরের দিন। বিয়ের পর আমরা বরবধূ নিয়ে ফিরে আসছিলাম। স্থান মিরাট সিটি ষ্টেশন, কাল দুপুর, অত্যন্ত গরম। নববধূ তৃষ্ণার্ত হ'য়ে জল খেতে চাইলেন। হাতের কাছে জলের কুঁজো বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না। একজন তাড়াতাড়ি এক বোতল লেমনেড কিনে এনে দিলেন। খাবেন কি করে? কিন্তু এ বিষয়ে বেশি মাথা ঘামানোর আগেই কেউ একজন আঙুলের গুঁতো দিয়ে লেমনেডের বোতলের মুখটা খুলে ফেললেন, আর

বিবাহ-বেনারসী পরিহিতা নববধূ হাত দুটো এক জায়গায় ক'রে অঞ্জলিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ালেন, তাঁর প্রসারিত অঞ্জলিতে লেমনেডের রসধারা ঢেলে দেওয়া হ'ল, তিনি ঢক্ ঢক্ ক'রে তা আকণ্ঠ পান করলেন। উত্তরপ্রদেশে, বিহারে, শীতে গ্রামের সময় এই রকম ক'রে পথযাত্রীদের জল খাওয়ানো হয়—তার নাম "পিয়াও"। বলা বাহুল্য ঘটনাটির মধ্যে দোষের কিছুই নেই। তৃষ্ণা পেয়েছে, জল খেয়েছেন—এর মধ্যে আর দোষ কোথায়? কিন্তু বাংলা দেশের শালীনতা এবং শোভনতার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে আমরা কল্পনাও করতে পারি নে যে বিয়ের কনে এক হাট লোকের মধ্যে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মের উন্মুক্ততায় অঞ্জলিবদ্ধ হ'য়ে ঢক্ ঢক্ শব্দে জল খাচ্চেন। বাংলা দেশের মেয়ে বরঞ্চ তেষ্টা সহ্য করতে থাক্‌তো, কিন্তু এই কাণ্ডটি করতো না। সেটা ভাল হ'ত কি মন্দ হ'ত তা জানি নে কিন্তু বাঙালী মেয়ের ঐতিহ্য অনুগামী হ'ত।

বাংলা দেশের ভাবধারা থেকে দীর্ঘকাল ধ'রে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে যে এই মনের পরিবর্তন ঘটে, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। আর মানুষের মনের চিন্তাধারাটাই হচ্চে আসল—মানুষ ভাল কি মন্দ সেটা ঐ নিরিখেই নিরূপিত হয়, একথা সকলেই মানবেন।

প্রবাসী বাঙালীর আর একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা আজকাল হয়েছে চাকরির। বাংলা দেশের বাইরে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে না পারলে সে-দেশের গবর্ণমেণ্টে চাকরি পাওয়া দুর্ঘট। যাঁদের ফ্যামিলি বাংলা দেশে আছেন, ছেলেমেয়েরা বাংলা দেশে লেখাপড়া করছেন, তাঁরা আশা করি ভবিষ্যতে বাংলাদেশেই চাকরি খুঁজবেন। কারণ প্রবাসে তাঁদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এইজন্যে যে তাঁরা প্রবাসে বাস করেন নি এবং সেখানকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট বা ছাত্র নন। আর যে সব চাকুরিয়া ভদ্রলোকেরা কয়েক বছর বিহার, কয়েক বছর উত্তর প্রদেশ, কয়েক বছর দিল্লী (কেন্দ্রীয় সরকারে) প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে ঘুরে চাকরি করছেন, তাঁদের বা তাঁদের পুত্রদের পক্ষেও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ কোন জায়গায় একাদিক্রমে ১২ বছর বসবাস না করলে এই সার্টিফিকেট পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রবাসী বাঙালীর ছেলেমেয়েদের চাকরি পাওয়া একটা মস্ত বড় সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। আর খেয়ে পরে যখন মানুষকে বাঁচতে হবে তখন এই সমস্যার একটা ফলদায়ক সমাধান যত শীঘ্র সম্ভব করা দরকার।

হরিনাম টহলগান

শ্রীজয়দেব রায়

বাঙ্‌লা দেশে গ্রামে গ্রামে কত অজ্ঞাত কবি কত যে সুরে হরিগুণগান করিয়া নামপ্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। এ সমস্ত গানের অধিকাংশের রচয়িতা কে জানা নাই, এমন অপূর্ব সুরই বা কাঁহারা দিয়াছেন, সুরের মধ্য দিয়া এত আকুল আর্তি কাহারাই বা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম পর্যন্ত হারাইয়া গিয়াছে।

কেবল বাঙ্‌লার গ্রামে গ্রামে প্রাতঃস্নানার্থীরা আর বৈরাগী ভিখারীরা বছরের পর বছর সেই একই গানগুলি একই সুরে, একই ঢঙে গাহিয়া আসিতেছে। শরৎ হেমন্তের নিশা শেষে বৈরাগী টহলদাররা ঐ সুরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, হাটে বাটে নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ফিরে। এসব গান জনসাধারণের নিজস্ব সম্পত্তি, তাহারা নিজেরাই মনোমত সুরের রদবদল করে, প্রয়োজন মত গানের কলি রূপান্তর করিয়া লয়।

বাঙলা দেশে কত পরিবর্তন ঘটিল। কতবার কত রাজা ও শাসকের বদল হইল। গ্রামগুলি রেলপথ ও জলপথের প্রসাদে শহরের কাছে আগাইয়া আসিল। শিক্ষার প্রসার ঘটিল, সাহিত্য এবং সঙ্গীতে নূতন সুর নূতন ধারা আসিল, কিন্তু বাঙলার গ্রামবাসীদের সেই হরিনাম গান সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে।

সদ্যঃপ্রয়াত রামদাস বাবাজীর কণ্ঠে যাঁহারা নাম গান শুনিয়াছেন, তাহারাই সাক্ষ্য দিবেন—নামগানের অপূর্ব সুরলহরী বাঙলা দেশে আজিও হারায় নাই। সারাদিনের কর্ম অবসানে সন্ধ্যাবেলার গ্রামবাসীরা যে নাম গাহে, পালাপার্বণে, রাস-দোল-ঝুলনে, বারোয়ারী-তলায় যে হরি-সংকীর্তনের আসরে নাম গান হয় তাইতো পল্লীবাসীর প্রধান উপাসনা—

হরিবল হরিবল হরিবল ভাই.
হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই ॥
হরিনামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই,
হরি নামের নৌকা করে ভবপারে যাই।
হরিনাম মহামন্ত্র এই কর সার।
হরিনাম বিনা জীবের অন্যগতি নাই ॥

এমন অল্প কথায় এত সহজভাবে ভগবানের নাম গান আর কোথাও নাই। বাঙালীর ধর্মজীবন এবং সংসার জীবনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে এই শ্রেণীর হরিনাম গান। শ্রীচৈতন্যদেব সকলকেই সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে বলেন নাই, সংসারী লোকদের মুক্তির উপায় বলিয়া তিনি নির্দেশ দেন হরিনাম গান করিবার। সবাই যদি সন্ন্যাস লয়, তবে মানব-সংসার চলিবে কেমন করিয়া? বাঙালী জানে এ ভাবে হরিনাম কীর্তন করিলেও সন্ন্যাসের সমতুল্য ফল পাওয়া যাইবে। সেজন্য এই গানগুলি সংসারী লোকদের সাধন ভজনের গান—

মনের আনন্দে হরিগুণ গাও।
গাওরে আনন্দে হরিগুণ গাও॥
একবার গাওরে আনন্দময় নাম
এনাম বদনভরে গাও (হরিনাম বদনভরে গাও)॥
এ নাম দিনান্তে গাওরে,
সদা সর্ব্বক্ষণে গাও (হরিনাম সর্ব্বক্ষণে গাও)॥
এ নাম শয়নে স্বপনে গাওরে,
হরিনাম যথা তথা গাও (সে নাম যথা তথা গাও)॥
এনাম নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে
গেয়ে জগৎ মাতাও (নামে জগৎ মাতাও)॥
এনাম গাইতে গাইতে পথে (সংসারের দুর্গম পথে রে)
আনন্দে চলে যাও॥

এ সব গানের মধ্যে কোন গভীর তত্ত্বচিন্তা, আধ্যাত্মিকতা, কোন গূঢ় গহন ইঙ্গিত, কবিত্ব, সুরের স্পর্ধিত কারুকার্য বা কসরৎ, পদ বিন্যাসের ঘটা ছটা প্রভৃতি কিছুই নাই। এইগুলি আমাদের সংসার জীবনকে বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে রাঙাইয়া দেয় এবং প্রতিদিনের কর্মক্লেদ দূর করিয়া দিনান্তের বিশ্রামকে নিশ্চিন্ত শুচিতায় মণ্ডিত করে।

হরি বলে ডাকরে রসনা,
ও তোর যাবে ভব যন্ত্রণা॥
হরি বলে ডাকরে আমার মন
অন্তিমকালে জানবি হরিনামের গুণ,
আবার হরি বলে যাবে চলে, যমে ছুঁতে পারবে না।
হরি ভবকাণ্ডারী, নিজগুণে পার করিতে রেখেছেন তরী,
আবার দুঃখী তাপী পারে যাবে
তাদের মাশুল লাগবে না॥

নীলকণ্ঠ অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী মধুসূদন কিন্নর, কাঙাল ফিকির চাঁদ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গীতিকারের রচিত অনেক সুপরিচিত গানের ঈষৎ রূপান্তরিত রূপও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাঁহাদের স্বরচিত সুরকে অবলম্বন করিয়া আবার পল্লী কবিরা নব নব গান রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। নিম্নের বিখ্যাত হরিনাম গানটি গোবিন্দ অধিকারীর রচনা—

হরি হরি বলরে ও আমার মন
হরি বিনে কে আর আছে শমন দমন॥
ভাবিলি না সে কালো বরণ কিসে হবে কাল নিবারণ
সদা যেমন মত্ত বারণ, করেছ ভ্রমণ॥
মত্ত হয়ে রাজ্য সম্পদে, না মজিলি হরি পদে,
প্রতিফল তোর পদে, দিবে সে শমন॥
সে পদে লক্ষ্মীর সম্পদ, ভাবিলি না সে হরিপদ
ঘটালি আপন আপদ. এ আর কেমন।
কারে বল আপন আপন করবে মন!
কি আলাপন. সে নহে কথন আপন, যেমন স্বপন।
আপন সে চিনালি না তাঁরে, যে ভব দুস্তরে তারে
গোবিন্দ কয় ভাব্‌লে তারে, পালাবে শমন॥

বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজলীলা অথবা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলার সাহিত্যরসঘন অলঙ্কৃত বাগ্‌বিন্যাস ইহাতে নাই, ভাগবত অথবা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সঙ্গেও ইহার যোগ নাই। তত্ত্ব অথবা তথ্যের ভারে অযথা গানগুলিকে বুদ্ধিগম্য করা হয় নাই। তাই বলিয়া এইগুলিতে আন্তরিকতারও অভাব নাই।

বাঙ্‌লাদেশের প্রেমধর্মপ্রচারের ভার ছিল নিত্যানন্দ প্রভুর উপর। মহাপ্রভুর লীলাবসানের পরেও নিত্যানন্দের লীলা প্রকট ছিল। গৃহস্থ ভক্তরা গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিয়াও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই কারণে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অপেক্ষাও নিতাই বাঙ্‌লার বাউল গায়কদের অধিকতর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছেন—

তোরা কে নিবি লুট লুটে নে নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে।
প্রেমের কর্তা শ্রীচৈতন্য, পাত্র হইল নিত্যানন্দ,
মুন্সীগিরি দিল অদ্বৈতরে।
ও রে হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে প্রেম বিলাচ্ছে নগরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর
ধ্যান করিয়ে না পাইল যাহারে,
ওরে নারদমুনি মগ্ন হয়ে বীণা-যন্ত্রে গান করে॥
ওরে নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে।
রূপ সনাতন দু'ভাই আসি প্রেমের বাজারে বসি;
আনন্দেতে বেচাকিনি করে,
ও রে রাঙ্‌ দস্তা ফেলে সোনা নিতেছে ওজন করে॥

বাঙালী পল্লীবাসীরা জানে এবং বিশ্বাস করে জগাই মাধাই-এর মতন পাষণ্ড নাস্তিক তাঁহার নাম করিয়া উদ্ধার পাইয়াছে, রূপ-সনাতনের মতন বিষয়াসক্ত গৃহীও হরিনাম করিয়া মুক্তি পাইয়াছেন—তখন যে কেহই তাঁহার নান করিয়া ভবপারাবার পার হইতে পারিবে। বিষয়ীদের সময় থাকিতে সতর্ক হইবার জন্য গ্রাম্য কবিরা তাই গান ধরিলেন—

জীবের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল
দিন গেল, দিন গেলরে মন, দিন গেল দিন গেল॥
ওরে জগাই-মাধাই পাপী ছিল, তারা হরির নামে তরে গেল।
ওরে রূপ-সনাতন দু'ভাই ছিল, তারা বিষয় ছেড়ে ফকির হ'ল॥
(ওরে) রত্নাকর দস্যু ছিল, সে যে হরির নামে
(সে যে ও নামে) তরে গেল।
(ওরে) অহল্যা পাষাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে মানব হ'ল॥
(ওরে) মনরে তোর পায়ে ধরি, এবার আমায় নিয়ে,
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল॥

এ সমস্ত গানের সুরেও মৌলিকতা আছে। বাঙ্‌লার দুইটি প্রধান গ্রাম্য-সঙ্গীতের সুর কীর্তন এবং বাউলকে—কথকতা এবং পাঁচালীর ভঙ্গীতে সরস করিয়া টহলদাররা এক বিচিত্র সুরে 'নাম টহল গান' গাহিয়া থাকে।

নাম গানেরই বিশিষ্ট সুর আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে (জন-গন-মন-অধিনায়ক জয়হে) আশ্রয় করিয়াছে—'হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার'—এই সুরেই আমরা গাই—

"জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয় হে॥"

ভিয়েনার আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন

শ্রীচিত্রিতা গুপ্ত

P. E. N. Congress—অর্থাৎ কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিকের সম্মেলন,—শুধু সম্মেলন নয়, উৎসবও। যদিও সম্মেলনের সভায় সাহিত্যের একটী বিশেষ দিক নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ এবং তর্কের আয়োজন করা হয়েছিল, তবু তারো উপরে বড় হয়ে উঠেছিল উৎসবটাই। হাওয়ায় ছিল ছুটীর সুর, আর মনে ছিল খুশি। সবে স্বাধীনতা লাভের প্রতিজ্ঞাপত্র পেয়ে অষ্ট্রিয়া তখন ভিতরে ভিতরে আবেগে টলমল করছে। উৎসবের সুযোগ পেয়ে ওরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। শোনা গেল প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও অষ্ট্রিয়ার সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার মুহূর্তে এই ভিয়েনাতেই হয়েছিল সেবারও বিশ্বসাহিত্য সঙ্গম। সেবারেও নাকি এইরকম রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল ওরা।

মেয়রের সংবর্ধনা সভায়

ভিয়েনীজ জাতটা সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তার ওপরে হ্রদে আর পাহাড়ে, আর ফুলে আর ফলে, প্রকৃতি অকৃপণ ভাবে অষ্ট্রিয়ায় ঢেলেছে রূপের সুরা,—সুইজারল্যাণ্ডের চেয়ে কোন কোন স্থানে তা কম নয়, বরং বেশী। কিন্তু দশ বছরের পরাধীনতার চাপে এরা এখন বেশ একটু ম্লান, বিপর্য্যস্ত, এবং ইয়োরোপের অন্যান্য জাতের তুলনায় অনেক দরিদ্র। এদের বহু ব্যবসা এখন পরহস্তগত,—অর্থাভাবে অনেক অনুশীলনাগার বিলুপ্ত। শ্রমের মূল্য অন্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। প্রতি বৎসর বহু অষ্ট্রিয়ান স্ত্রীপুরুষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি সমৃদ্ধতর প্রদেশগুলিতে স্বল্প বেতনে ভৃত্যের কাজের জন্যে যায়। আর যারা দেশে এই ধরণের নিম্নতর শ্রেণীর সাধারণ কাজ করছে তাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা দেখেও বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্য্যন্ত একই মেয়ে হোটেলে অথবা রেস্তোঁরায় সমানে খাটছে। এ দৃশ্য ইংলণ্ডে কল্পনাও করা যায় না। যাইহোক, ওরি মধ্যে মুখে হাসি এবং অধরে রং মাখবার সময় ওরা কি করে পায় এও আর এক আশ্চর্য্য। কোথায় আছে ওদের শক্তির উৎব, কে জানে!

ভিয়েনা সহরের এখানে ওখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন প্রাসাদ। সবগুলিই শ্বেতপাথরে গড়া সোনার জলের গিল্টির তক্‌মা আঁটা, ভেলভেটের পর্দা ঝোলান—হাজার বাতির ঝাড়লণ্ঠন দোলা, দেয়ালে মধ্যযুগের ইয়োরোপের বিখ্যাত শিল্পীর চিত্রাবলী। এই রকম ৫।৬টা প্রাসাদে বিভিন্ন ব্যবস্থায় বিরাট ভোজ ও পানোৎসবের নমুনা দেখলাম। কোথাও লাঞ্চ, কোথাও "মোরগের ল্যাজ" (কক্‌টেল) পান। কোথাও "বুফো" ডিনার। কোথাও শুধু তৃষ্ণাতৃপ্তি ও নৃত্য।

সকালবেলা বসতো সাহিত্য-সভার অধিবেশন, আর দ্বিপ্রহরে লাঞ্চ তথা বিশ্রাম—অথবা কোন দূর জায়গায় কিছু দেখাতে নিয়ে যাওয়া ও চা পান। আর প্রত্যহ সন্ধ্যায় উৎসবের রোশনাই। এর মধ্যে সম্মেলনের কর্মিক-কমিটীতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ভাগ্যে দুএকটী বৈকালিক ও সান্ধ্য নিমন্ত্রণ বাদ পড়ে গেল। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আমিও ছিলাম সেই গূঢ় মন্ত্রসভাতে। গিয়ে দেখি বেশ মজা,—বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকদের শুধু যে কথার মালা সাজানোর ক্ষমতা আছে তা নয়

বাগ্‌যুদ্ধেও তাঁরা কিছু কম পটু নয়। বাঙ্গালীদের তার্কিক দুর্নামটা আমি সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে সাহিত্যিকদের তর্কযুদ্ধের উদাহরণটুকু আমি নোট করে নিলাম। তর্ক করতে করতে নাওয়া খাওয়া ভুলুক ক্ষতি নেই, কিন্তু যখন দেখলাম 'ককটেল' অবধি ভুলে গেল, তখন বুঝলাম সাঙ্ঘাতিক বটে। মন্ত্রণাসভার বিচারবিষয়গুলি সাধারণত গোপনীয় হয়ে থাকে, কিন্তু প্রায়ই দেখতাম, যে কাগজে বিকৃত আকারে তার খানিকটা খবর বেরিয়ে গেছে। ওরি মধ্যে একদল লেখক খবরের কাগজের ভয়ে অস্থির, আর একদল তাদের বিদ্রূপ করে বলত,—খবরের কাগজের ভয়ে সাহিত্যের আদর্শ বিকিয়ে দিতে চাও নাকি?

একটা কথা এখানে বলা উচিত মনে করছি।—কমিটির প্রায় প্রতি অধিবেশনেই পাকিস্থানের তরুণ প্রতিনিধিটি সর্বদা আমার পাশে পাশেই থাকতেন। ভারতবর্ষের মত যেখানেই তাঁর সুবিবেচিত বলে মনে হয়েছে, সেখানেই নিজে থেকে আমার স্বপক্ষে ভোট দিতে তিনি দ্বিধা করেন নি। ভদ্রলোক বাঙালী, এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার যুগল সাহিত্যের সংযুক্ত প্রগতি এবং সম্মিলন কি করে সম্ভাব্য করে তোলা যায় সে বিষয়ে অনেক আলোচনা করলেন। বল্লেন, আমরা তো সত্যি সত্যি প্রাণপাত করে বাংলাকে আমাদের জাতীয় ভাষা করে তুল্লাম—আপনারা তো হেরে গেলেন। হিন্দির হামলায়—হারুন আর যাই করুন, দোহাই আপনাদের বাংলা ভাষাকে যেন হারিয়ে ফেলবেন না। এই প্রসঙ্গে একটু অবান্তর কথা বলে নাই,—লণ্ডনে দেখেছি বাংলা ভাষার ব্যবহার সেখানে যেন লজ্জাকর হয়ে উঠেছে। লণ্ডনে যে কয়েক হাজার ভারতীয় আছেন, তাদের প্রায় অর্দ্ধেকই বাঙালী। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আলোচনা তো দূরে থাক, তাঁরা নিজেদের মধ্যেও বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে যেন লজ্জা পান, পাছে লোকে প্রাদেশিক বলে। রবীন্দ্রনাথের গান করতেও লজ্জা—পাছে ঐ প্রাদেশিকতার ছোঁয়া লাগে!—আমি বলি,—বাংলা একটা প্রদেশ বটে, কিন্তু সে তো ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ। রবীন্দ্রনাথ হিন্দীতে না লিখে বাংলায় লিখেছেন এ আর এমন কি অপরাধ? রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা সুর ও ছন্দ—এবং তাঁর মণীষার দান সে তো ভারতেরই জাতীয় সম্পদ। রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা না করলে, তাঁর দু' হাতে দিয়ে পাওয়া অজস্র সম্পদ কাজে না লাগালে ভারতবর্ষ যে নিজের ধনেই নিজে বঞ্চিত হবে!—থাক এসব কথা। আজ শুধু বলি, ভিয়েনাতে কি দেখলাম। এক কথায় বলতে গেলে, দেখলাম, "বাঁধা আছে একই মাল্যবাঁধনে লক্ষ্মী-সরস্বতী"। যদিও এই দুই দেবীর চিরপ্রসিদ্ধ আড়াআড়ি তবু একথা মানতেই হবে যে, লক্ষ্মীর আঁচলেই চাবিকাঠি বাঁধা। ইয়োরোপ কিন্তু বরাবরই দুই দেবীর মধ্যে একটা আপোষ রফা ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। লক্ষ্মীর সেবায় সরস্বতীর সৃষ্টি, আবার সরস্বতীর প্রেরণায় লক্ষ্মীর পুষ্টি। —ঐশ্বর্যের প্রভাবে ইয়োরোপের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা বাণিজ্য লক্ষ্মীর নবনব সৃষ্টিধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে আবার বাণীর বরদানে সেই বিভিন্ন ধারার অজস্র সৃষ্টি যুগকল্পে সংহত হ'য়ে কমলার সম্পদ সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলছে দেশের ভাঁড়ার ঘরে। এত সম্পদ, এত সমারোহ, এত আয়োজন, এত বিলাস প্রাচুর্য্য,—দেখে দেখে অবাক হয়ে থমকে যেতে হয়, মনে হয় সত্যিই এর প্রয়োজন আছে কী?—অষ্টাদশ শতাব্দীর যে সামন্ততান্ত্রিক বিলাসপ্রাচুর্য্য, যে অমিত ঐশ্বর্য্যসম্ভারের বর্ণনা বইএ পড়ি, বিংশ শতাব্দীর এই গণযুগেও দেখলাম তার চেয়ে কিছু কম নয়, বরং যেন আরো উজ্জ্বল—আরও মনোহর। তেমনি হাজার ডালে লক্ষবাতী পলকাটা কাঁচের কত অসংখ্য ঝাড়-লণ্ঠন, তবে, মোমের দীপের বদলে বিজলীর আলো। আরো উজ্জ্বল। অবশ্য, এ উৎসবে সে যুগের মতো হরেক রকম রাজা বাদশা ধনী ব্যবসায়ী ক্রোড়পতিদের বদলে শুধু সাহিত্যিকদের ভীড়। তিন চার শ' সাহিত্যিক পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ভিয়েনায় জড় হয়েছে। এখানে এবার বিশ্বসাহিত্য সম্মেলন,—সর্বদেশের সর্বজাতের সাহিত্যের প্রতিনিধিরা এসে সমবেত হয়েছেন। কিন্তু, সাদা ছাড়া আর কোনো রঙের

জার্মাণ নাট্যকারের চায়ের আসরে

চেহারা নজরেই পড়ে না, পুবদেশের শামলা রঙের অতিক্ষীণ আভাস দু' একজনের মুখে। দুজন জাপানী, একজন কোরীয়ান, একজন মালয় আর তিনজন ভারতীয়। তবে কি সাহিত্য বলতে যা কিছু, তাও বিজ্ঞানের মতই এই পৃথিবীর পশ্চিম দেশগুলির মধ্যেই আবদ্ধ। সমবেত সাহিত্যিকরা সকলেই—যাকে এককথায় বলা চলে—সাহেব। সেই সাহেব সাহিত্যিকদের সকলেরই গায়ে সেই চিরাচরিত কালো নৈশ পোষাক, কণ্ঠে কালো টাই। তারা তেমনিই মধ্যযুগীয় নায়কোচিত ভঙ্গীতে ঈষৎ নত হয়ে মহিলা অভ্যাগতাদের করপল্লবখানি অতি সন্তর্পণে ধরে চুম্বন করছে।—আর মহিলা সাহিত্যিকদের রক্ত নখরলাঞ্ছিত শ্বেতমর্মরসন্নিভ কোমল হস্তাঙ্গুলিতে কালো লেসের দস্তানা। কত বিচিত্র সাজে পোষাকে, অলংকারে আভরণে বিচিত্রতর রুচি। অর্থ ও কামনার নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন। নকল হীরে ও কাঁচের টুকরোর ভূষণজালে তরুণীর সঙ্গে বৃদ্ধারও লোল অঙ্গে সমানে ঝলমল করছে। দু' একজনের মাথায় আবার হীরের টায়রা।

মেয়েলি স্বভাব কিন্তু সর্বত্রই এক। সাহিত্য-আলোচনাও এই সাগর পারের মেয়েদের মুখে গহনার আলোচনায় এসে দাঁড়ায়। সেকথা যাক, এত সমারোহ আড়ম্বরের মাঝখানে আমাদের পুর্বদেশীয় গৃহস্থের প্রাণ কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। সন্দিগ্ধ মনে প্রশ্ন জাগে,—বাইরের এত আড়ম্বরে, ভেতরকার সত্য সারটুকু ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট হয়ে যায় নি তো? না। ইয়োরোপের সত্য নষ্ট হয় নি। দুঃখের মধ্যে, অবমাননার মধ্যে, যন্ত্রণার মধ্যে, দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে। জিদ্ ধরে জিৎবার শক্তিও তো এদেরি আছে দেখি। ভিতরে কোথাও শক্তির উৎসমুল নিশ্চয়ই খোলা আছে, না হলে এই জোর, এই উৎসাহ দুদিনেই যেত শুকিয়ে। একদিকে যেমন ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর, উপকরণের প্রাচুর্য্য, বিলাসের নগ্নতা, অন্যদিকে আবার এও তো দেখি দলে দলে সাধারণ লোক সহর থেকে বেরিয়ে পড়ছে—শুধু দু'একদিন মাত্র কোথাও গিয়ে খানিকটা নির্জনতা ভোগ করে আসার জন্যে। কাজের চাপে পিষে যাওয়া, অন্যমনে হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত্তগুলি থেকে যে টুকে পাবে কেড়ে

ভিয়েনার ফ্যাশান স্কুলে

কুড়িয়ে রাখতে চাইছে একান্তভাবে নিজের জন্যে। সপ্তাহে অন্তত একটী দিনের কয়েক ঘণ্টার জন্যেও নিঃসঙ্গ হতে চাইছে নিজের সঙ্গে। ইয়োরোপের সংবেদনশীল মন মরেনি এখনো ঐশ্বর্য্যের চাপে, ডোবেনি বিলাসের তলায়। রোমের মতই আধুনিক ইয়োরোপও উপকরণ প্রাচুর্য্যকে সর্বান্তকরণে কামনা করে। তবু মনে হয়, দুটি জিনিষের জন্যে ইয়োরোপ আজও আপন প্রাণশক্তিকে উপকরণের স্তুপের নীচে পিষ্ট হয়ে যেতে দেয় নি। তার একটি হচ্ছে, আরাম বিলাসের মধ্যেও তার নিরলস কর্মপ্রতিভা; অন্যটী হচ্ছে সর্বমানবের স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি অন্তর্নিহিত বিশ্বাস। যদিও বলব না, এই বিশ্বাসের মর্য্যাদা সে অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে। বারে বারেই পথচ্যুত, আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে বটে,, কিন্তু মত ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করেনি। এই পথচ্যুতির একটা সামান্য উদাহরণ দিচ্ছি, জামাইকার সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করিতে এসেছিলেন একজন খাঁটি ইংলিশম্যান। ইংলিশম্যানের বিশেষত্ব সর্বত্রই এই যে সে আগে ইংলিশম্যান পরে সাহিত্যিক। কথাটা একদিন পাড়তে, অনেকেই দেখলাম মেনে নিল। এমন কি ইংলিশম্যানরাও। শুধু একজন গোঁজ হয়ে বল্লে, তোমরাও কি তাই নও? অর্থাৎ, আগে ভারতীয় পরে সাহিত্যিক? আমি দ্বিধাভরে বল্লাম, আমরা সবাই অর্থাৎ সাহিত্যিক অসাহিত্যিক, লেখক, পাঠক, কেরাণী, মুদি, এমন কি সৈন্য পুলিশ, সবাই প্রথমে দার্শনিক. তারপরে উদাসীন ও সবশেষে ভারতীয়। অনেকেই আমার রসিকতাটা ঠিক ধরতে পারল না,—কেউবা ভাবল, আমি ভারতবর্ষের চিরন্তন স্পিরিচুয়ালিসম্ নিয়ে বড়াই করছি। যারা বুঝল তারা চোখ টিপে হাসল, ওদের তর্কে বাধা দিল না। একজন কলহের সুরে বল্লে তোমরা spiritualist আর ফিলজফীর বলেই বুঝি দেশে এই দারিদ্র্য allow করছ?—আমাদের দারিদ্র্য-কাহিনী ইয়োরোপের অলিতে গলিতে সর্বত্র জয়ঢকায় প্রচারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আমি বল্লাম, দেখ, ভারতীয়রা ফিলজফার বলেই রক্ষে। শুধু দারিদ্র্য allow করেই ক্ষান্ত হচ্ছি না, দারিদ্র্যের কারণ সেই শোষক ইয়োরোপকে এতকাল ধরে অনায়াসে সহ্য করে আসছে। একজন রাগ করে বল্লে—"কেন সহ্য করেছ,—কেন টুটি টিপে বের করে দাও নি?" "কি করব বল।" আমি বল্লাম,—"আমাদের রক্তে সে প্যাশন্ নেই,—উগ্র প্রতিহিংসার সে জোর নেই। আমাদের প্যাশন্ সমস্ত চিন্তার রাজ্যে। নতুন কথা, নতুন ভাব, নতুন আদর্শের সন্ধান পেলে আমাদের শতপ্রথাবন্দী সমাজও আনন্দে নেচে ওঠে। একবার ইতিহাস খুলে দেখ,—কোন নতুন কথা কখনো আমাদের দেশে ব্যহত হয় নি, কোন নুতন আদর্শকে কেউ গলা টিপে হত্যা করে নি। যুগে যুগে কত ধর্ম প্রবর্তক, কত মহামানব কত নতুন কথা বলে গেলেন। তাঁদের কথা কেউ শুনল, কেউবা শুনল না, কেউ বুঝল, কেউবা বুঝল না। যারা বুঝল না, তারাও নতমস্তকে ঘরে ফিরেই গেল। তা বলে, যা আমার বুদ্ধির অগোচর তার অস্তিত্বই দেব লুপ্ত করে, এমন অহঙ্কার আমাদের দেশে ছিল না। বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে নানক, কবীর, চৈতন্য কত মহাপুরুষ কত কথা বলে গেলেন। কিন্তু কোন যীশুখৃষ্ট, কোন জোয়ান অব আর্ক, কোন গ্যালিলিওর ঘটনা এদেশে ঘটেনি। মহাত্মা গান্ধীই ভারতের প্রথম শহীদ যাঁকে মতের জন্যে প্রাণ দিতে হোল। ইয়োরোপকে গুরু করায় এই প্রথম ভারত আত্মপথ থেকে ভ্রষ্ট হোল।

সেদিনের ভোজসভায় অনেক আলো, অনেক বাজনা অনেক সমারোহ ছিল,—ভীয়েনার সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাসাদ 'সনব্রুন' সৌধে (অর্থাৎ সুন্দর দুর্গ।)—অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার P. E. N.কে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। মাইলখানেক লম্বা বাগান পেরিয়ে আমাদের রিজার্ভ করা বাসগুলি এসে থামল প্রাসাদ সোপান সান্নিধ্যে। বাজনা বাজছে আধচেনা সুরে—বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পীরা এদেশে সুরের সাধনা করে গেছেন। সুবার্ট, মোৎসার্ট, বীঠোভেন, তাদেরই কোন সুর, নানা যন্ত্রের একতানে বাজছে। সিঁড়ির সামনে এসে থমকে গেলাম। এমন পুষ্পসজ্জা দেখিনি কখনো। প্রদীপ্ত প্রচণ্ড পুষ্পসজ্জা যাকে অনায়াসে বলা চলে aggressive! সিঁড়ির প্রত্যেকটা রেলিংএ একটা গাছ তাতে একটি করে বিশাল রক্ত গোলাপ—সমান মাপের সমান রঙের!

আর দেয়ালে থামে থামে তেমনি ফুলের কারিগরী। উপরে উঠতেই দেখা গেল চ্যান্সেলার তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—পুরুষদের সঙ্গে করমর্দন আর মহিলাদের কাছে নত হয়ে হস্তে অধর স্পর্শ করে চলেছেন। পলকাটা কাঁচের ঝলকানির ভিতর দিয়ে বিজলী আলোর হাজার রোশনাই—পুরোণো ছাঁচে নবীনের প্রবেশ যেন আরো উজ্জ্বল, আরো সুদীপ্ত। এমনি হলের পরে হল। দু'পাশে সাদা পাথরের মেঝের পাড়, মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে নরম পুরু কার্পেট। মাঝে মাঝে পানপাত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে—বিচিত্র বেশবাসে সজ্জিত নারী পুরুষের দল। একপাশে দু'চারটে লম্বা টেবিলে খাদ্যসম্ভার। চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়টা সকলের হাতে হাতে। কিন্তু খাওয়াটা এখানে গৌণ, মুখ্য হলো—পরকলাকাটা বিচিত্র পানপাত্র হাতে পরীর মত হাওয়ায় ভেসে এখান থেকে ওখান আর ওখান থেকে সেখানে ঘুরে ঘুরে উড়ে যাওয়া। এখানে একটু হাসি, ওখানে দুটো কথা, সেখানে কিছু ঠাট্টা। তারি মধ্যে একটা দুটো কথা জমে কোথাও খানিকটা আলোচনার সূত্রপাত।

আয়র্ল্যাণ্ডের মেম্বাররা সকলেই ভারতের খুব ভক্ত। একটী আইরীশ মেয়ে বলেছিল একজন ইংরেজ মেয়ে কিছুদিন আয়র্ল্যাণ্ডে ঘুরে এসে নাকি অবাক হয়ে গেছে আমাদের বিশ্রী গেঁয়োপনা দেখে। তুমি বুঝি জান না—আমরাও তোমাদের মতই primitive। আমরা বালতি করে কুয়ো থেকে জল তুলি, কাঠের আঁচে সেই জল গরম করি, টিনের টবে ঢেলে মাঝে মাঝে স্নান করে নিই।—কেমন? তোমাদের মত নয়?—মাথা নেড়ে বলি মোটেই না। কুয়ো থেকে আমরাও জল তুলি বটে, তবে গরম করবার দরকার হয় না, আর মাঝে মাঝে নয়, রোজই স্নান করতে হয়। আর টবে ঢেলে নয়। পুকুরে ডুব দিয়ে বা বালতি শুদ্ধ একেবারে মাথার উপরে হুড় হুড় করে ঢেলে।—ওরা চোখ বড় করে বল্লে, বল কি, মাথার উপরে ঢেলে?

পাকীস্থানের সঙ্গে ভারতের ঝগড়ার কথাটাও অবশ্য বিশ্বশুদ্ধ সবাই জানে। পাকীস্থানের প্রতিনিধিকে সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকতে দেখে—বল্লে—একি! তোমরা লড়াই করছ না তো? বল্লাম—কি করি বল। ও যে আমার একদেশের লোক,—আমার স্বামী খুব গম্ভীরভাবে বল্লেন, হ্যাঁ ওরা দুজনেই ঝাল খায়, যা আমি পারিনে। আমি বল্লাম, বলতে গেলে আমাদের এক গ্রামেই বাড়ী।—ওরা পর্য্যবেক্ষণ করে বল্লে, রংটা অন্তত তোমাদের সকলেরই একই রকম চমৎকার অলিভ্। মনে মনে বল্লাম, হবে না? কেষ্ট ঠাকুরের বংশ যে! একজন বল্লে, তবে কেন কিছুতেই তোমাদের বনে না, এত কেন বিরোধ। আমি বল্লাম, বিরোধের অনেকখানিই বানিয়ে তোলা। পাকীস্তান বল্লে, না এমন কথা আমি স্বীকার করি না—মূলগত বিরোধও যথেষ্ট আছে। আমি বল্লাম—বিরোধ কোথায় নেই? ইস্লাম ও হিন্দুসমাজের নিজের ভিতরেও কি বিরোধ নেই। ইয়োরোপে কি বিরোধ নেই? লর্ড পেথিক লরেন্স ছিলেন সেখানে।—চুরাশী বছরের বৃদ্ধ, স্বল্প কগাছি সাদা চুল, নুয়ে পড়া চেহারা—আমাকে ডেকে নিলেন পাশে। বল্লেন, দেখ, কেবিনেট মিশন থেকে ফিরে এই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমার প্রাণান্ত হয়েছিল। সবার মুখে এক প্রশ্ন—কেন ওরা মিটমাট করতে পারছে না। আমি তখন এই জবাবটাই সবাইকে দিয়েছিলাম, যে ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমা রাশিয়া বাদ দিলে ইয়োরোপের চেয়ে কম নয়।—জাতি বর্ণ ও ভাষাগত পার্থক্য আচার বিচার ও ধর্মের প্রভেদ ইয়োরোপের দেশগুলির তুলনায় আরো অনেক বেশী। তা ইয়োরোপই যখন নিজের মধ্যে শান্তি আনতে পারছে না তখন ভারতবর্ষের দোষ কি।—ওঁর সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা হোল।—বৃদ্ধের সঙ্গে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রায় শেষের দিকের একটা ছোট গোল ঘরের মধ্যে এসে পড়লাম। তার ছাদের সবটা জোড়া প্রকাণ্ড কাটগ্লাসের ঝাড়ে, আলো ঠিকরে ঠিকরে ছিটকে পড়ছে।—আর দেয়ালগুলি সব আয়নার! হঠাৎ সহস্র দিক থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। প্রায় সেই ইন্দ্রপ্রস্থের সভায় দুর্য্যোধনের মত অবস্থা আর কি?—পেথিক লরেন্স ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে বল্লেন, জানো? এটা ছিল এম্প্রেস মারিয় থেরেসার ড্রেসিংরুম।—দেখে দেখে আমার চোখ ঝলসে গেল। প্রাণ

সাম্রাজ্ঞী মারিয়া থিরেসার 'সনব্রুণ' প্রাসাদোদ্যানে

হাঁপিয়ে উঠল। আমি বল্লাম,—একটা কথা আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।—এর পরিণাম কি?—কোথায় গিয়ে এর সিদ্ধি?—একজন সাহিত্যিক ছিলেন পাশে। বল্লেন, পথের শেষ কে জানে—? জেনে লাভই বা কি? কিন্তু এতেই বা লাভ কি বল্লাম, এত প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও আয়োজনের প্রয়োজনের সীমা তো প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।—এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাতে পারে এমন ক্ষমতা কি এই ছোট বসুন্ধরার আছে? যতই তিনি বসু ধারণ করুন তবু কতই বা করবেন?—পেথিক লরেন্স জোর দিয়ে বল্লেন, উপায় নেই, চলতেই হবে—মানুষের আশা থামতে জানে না। বল্লাম, না হয় শুধু আপনাদের দেশটুকুকে বিলাসের উপকরণে সাজালেন।—এতকাল তাতে বাধা হয়নি। কারণ পুবের রস নিংড়ে পশ্চিমের বিলাস ক্ষুধা মিটত—কিন্তু আজ?—আজ তো east ক্রমশই আপনাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।—এখনো অবশ্য আফ্রিকা বাকী আছে। তবু, ধরণীর সামর্থ্যের সীমা আছে আর মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই?

সত্যিই কি মনে করেন সব মানুষের জন্যে এমনি সুখের আয়োজন আপনারা করতে পারবেন ?—পেথিক লরেন্স আবেগের সঙ্গে বল্লেন।—ইয়োরোপ মরবে না। Eastকে আমরা এককালে দোহন করেছি, এ সত্য এবং আজ তাকে হারিয়েছি এও সত্য। কিন্তু আমরা আবিষ্কার করেছি অণু। এই আণবিক শক্তিকে মানুষের উন্নতির কাজে লাগালে এই ছোট পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হতে পারে। ইয়োরোপ এখন ক্রোধ ও ক্ষোভের বশে যাই করুক, ও যাই বলুক, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে স্বর্গ গড়ার কাজই সে নেবে। মাথা নেড়ে সায় দিলুম বটে, কিন্তু মনে তর্ক এল। না মরলে

জনৈক আইরীশ প্রতিনিধির সঙ্গে

তো আর স্বর্গে যাওয়া যায় না! সুতরাং আগে পৃথিবীর ধ্বংস, তার পরে স্বর্গ।

—আমি চুপ করে গেলুন বটে, কিন্তু তাঁর কথাটা মেনে নিলুম কিনা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বলে চল্লেন, তোমরা একদিক থেকে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছো,—পাতার কুটীরে দারিদ্র্যের সাধনা, আমরা অন্যদিক থেকে সেই সমস্যার মূল ধরেছি।—আমি চুপ করেই রইলাম বটে, কিন্তু মনেমনে মাথা নাড়লাম।—ভাবলাম, সমস্যা ওপর ওপর কিছু দূর করলেও, মূল ধরতে তোমরা কিছুতেই পারোনি, মূল ধরতে তোমরা জানো না, মূল সেই বাসনা নিবৃত্তির অতি পুরোনো কথাটা। কিন্তু এসব কথা এদের কাছে এখন বলার চেষ্টা করা বৃথা। যতক্ষণ না এরা নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিজেরা কোনদিন এই সত্যের মুখোমুখি পৌঁছুতে পারে, ততক্ষণ এদের কাছে এসব কথার কোন অর্থ নেই।—আর কে জানে সত্যিই কোন পথে সিদ্ধি। যে ধর্মের জন্যে আমাদের দারিদ্র্যের সাধনা—ভিক্ষাব্রত গ্রহণ—সেই ধর্ম, সেই সত্যপ্রাণসম্পদ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দলিত পিষ্ট হয়ে মরে গেছে—এও তো প্রত্যহ দেখতে পাচ্ছি—আমাদেরই দেশে আমাদেরি চোখের সামনে। সাহিত্যিক বন্ধু বল্লেন—আমাদের উপকরণ প্রিয়তাকে দোষ দিচ্ছ। দেখ দেখি তোমাদের ঈশ্বরই বা কি এমন কম উপকরণপ্রিয়—সোনারূপার গিল্টি করা প্রকাণ্ড জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখি—মস্ত বড় একটা পূর্ণ চাঁদ আকাশের মাঝখানে ঝলমল করছে। আর বাগানের গাছ আর লতাকুঞ্জ প্লাবিত করে, শ্বেতপাথরের মূর্তিগুলির ছায়ায় ছায়ায় থমকে আছে।

এই তো গেল পেন সম্মিলনের বহিরঙ্গের দিকটা, কিন্তু এইদিকেই ছিল তার প্রাণ, অন্যদিকটায় কাজ, সেখানে সাহিত্য আলোচনা, কিন্তু সেদিকটা রসশূন্য প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল যেন। শুধু প্রথম ও শেষ অধিবেশনেই সব সভ্য সভ্যারা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিনগুলিতে, খুবই কম লোক হোত। অর্থাৎ যার যার বক্তৃতা তার বন্ধুবান্ধবের দলই বেশী। প্রথম দিনে অধিবেশন সুরু হোল, প্রকাণ্ড একটা থিয়েটারে, শেষ হোল ইউনিভার্সিটিতে। সভাপতি ছিলেন চার্লস মরগ্যান,—বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার। অষ্ট্রিয়ান গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকেও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক চেয়ারে earphone ঝুলছিল, ছোট ছোট কাঁচের ডোমের মত ঘরে বসে ট্রান্সলেটাররা সমানে বিভিন্ন ভাষায় ট্রান্সলেট্ করে চলেছে—ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ এবং জার্মাণ ভাষায়। এও অবশ্য সবই বহিরঙ্গ। এত বহিরঙ্গের ভিড়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ কি আর টিঁকতে পারে। এত আয়োজন, কিন্তু ভিতরের সারাংশে যেন ঘাটতি পড়েছে। বক্তৃতা এবং অনুবাদ কোনটাই তেমন করে অন্তরে প্রবেশ করতে যেন পারল না। বড় বড় সাহিত্যিকরা বক্তৃতা দিলেন,—লেখা এবং বিচার বিতর্কে মুন্সীয়ানার পরিচয় প্রচুর, কিন্তু কেমন যেন প্রাণে লাগল না। সাহিত্যের মূলগত অর্থ, যে সাহচর্য্যে, যে মিলনে, যে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত—তার কোন আস্বাদ যেন তেমন করে পাওয়া গেল না। মনে হচ্ছিল যাঁরা এইসব earphone ইত্যাদি আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের বক্তৃতা যদি শুনতে পেতাম,—যদি এই ব্যবস্থার মধ্যে মিল, বেন্থাম, বার্কলে-কে শুনতাম,—মার্কস, এঙ্গেলস্‌কে শুনতাম, টলস্টয় গর্কিকে শুনতে পেতাম। যদি এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পৃথিবী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথকে শুনত। কিন্তু পৃথিবীর কপাল খারাপ, যখন শোনাবার লোক ছিল তখন এমন ব্যবস্থা ছিল না। যখন ব্যবস্থা হোল তখন শোনাবার লোকেরা অন্তর্ধান করল। আজকের দিনে বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই যে ঘাটতি পড়েছে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। লক্ষ্মীর পাদপীঠ বহন করে করে বোধহয় বীণাপাণি একটু হাঁপিয়ে উঠেছেন।

আলোচনার বিষয় ছিল Theatre as an expression of

modern age.—প্রতি অধিবেশনে এই বিষয়ে কতগুলি প্রবন্ধ পাঠ হোত, তারপরে মেম্বাররা আলোচনা করতেন। যার যা ইচ্ছে হাত তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন। গত মহাযুদ্ধ কিভাবে ড্রামা ও থিয়েটারকে প্রভাবান্বিত করেছিল, এ মহাযুদ্ধই বা কতটা করেছে, এরই তুলনামূলক সমালোচনা হোল বেশী। কেউ বা একেবারে সেক্সপীয়ারের সময়কার ড্রামা নিয়েও বল্লেন,—সবাই নিজের লেখা শোনাতেই ব্যস্ত, অন্যের লেখা শোনার ধৈর্য্য বা উৎসাহ দুইই কম, বিশেষত পুরুষদের মধ্যে। মেয়েরা ওরি মধ্যে অনেক ধৈর্য্যশীলা। ব্যাপারটা আমার বেশ পরিচিত লাগল, একটু খুশীও হলাম মনে মনে। প্রবন্ধ পাঠের কোন নিয়ম-ক্রমও তেমন দেখলাম না। আমি ভেবেছিলাম সব দেশের প্রতিনিধিদেরই কিছু কিছু বলতে বলবে। তা কিছু নয়। অনেক দেশ থেকে দু' তিনজন বললেন। অনেক দেশ একেবারে বোবা। আমাদের দেশে যদি কখনো P.E.N. সম্মিলন হয় তাহলে এই জিনিষটা ঠিক করতে হবে। সব দেশকে বলার সুযোগ দিতে হবে। সব দেশ থেকেই প্রবন্ধ চেয়ে পাঠাতে হবে। কোন দেশ যদি ৪।৫ কি ততোধিক প্রবন্ধ পাঠায়, তবে সেগুলির জন্যে একটা নির্বাচনী সমিতি করে নির্বাচন করা যেতে পারে—যাক্ সে এখন বহু দূরের কথা। শুধু একথা এইজন্যে তুললাম,—যে P.E.N.-এর সাধারণ সভ্য সভ্যারা সকলেই একবার ভারতবর্ষে সম্মিলন করবার জন্যে উৎসুক।—আমাকে সবাই প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি বল্লাম, এত অভ্যর্থনা করব কি করে। আমাদের সব টাকা এখন দেশ গড়বার কাজে লাগছে। ওরা বললে, "তোমরা ডাল ভাত যা দেবে তাই আমরা সোনামুখ করে খাব, আরে ভারতবর্ষে যাওয়াটাই তো সবচেয়ে বড় অভ্যর্থনা।" আমি বল্লাম,—"কিন্তু মদের বদলে ডাবের জল খেতে হবে।" ওরা বল্লে "তাই সই,—সেজন্যে ভাবছি না, কিন্তু অতদূরে যাব কি করে। সাহিত্যিক-দের অবস্থা তো তোমার অজানা নয়।" আমি বল্লাম "তবে আর কি? আশা ছাড়। কারণ আমরা যে টাকা খরচ করে তোমাদের সাপ বাঘ আর মহারাজা দেখাতে নিয়ে যাব, এ অসম্ভব। আর কি দেখতেই বা যাবে। সাপ বাঘ দু' একটা তাড়া করলেও করতে পারে, কিন্তু মহারাজা আর পাবে না।" ওরা বল্লে, দুর দুর, তোমরা কেন টাকা দিতে যাবে। Uuescoকে বল না, ওদের অতটাকা ওরা অর্দ্ধেক খরচ যদি দেয়, বাকী অর্দ্ধেক writer-রা পকেট থেকে দিতে পারে। ওরা আমাকে নিয়ে গেল, unescoর যিনি P.E.N. representative তাঁর কাছে। তিনি জার্মাণ,—একবর্ণ ইংরেজী বোঝেন না—সঙ্গে সর্বদা বহুভাষণ পটীয়সী মহিলা Secretary। তিনি বল্লেন, unescoর next meeting তো তোমাদের দেশেই হবে। তখন কথা পেড়ো,—যদি তোমাদের সরকার রাজী হয়, তাহলে unesco নিশ্চয় খানিকটা ব্যবস্থা করবে। আমি ওকে এই সুযোগে ট্রানসে্‌শন্ স্কীমের কথা জিগ্যেস করলাম। বিভিন্ন ভাষার বই অনুবাদ করার জন্যে unescoর একটা বিভাগ আছে। আমার প্রশ্নে তিনি ভেবে চিন্তে বললেন—সম্প্রতি একটা আধুনিক বাংলা বই তাঁরা অনুবাদ করিয়েছেন।—আধুনিক বইএর নাম জিগ্যেস করায় জানা গেল—"কৃষ্ণকান্তের উইল।"

এ বিষয়ে সকলেই আমাকে অনেক অনুযোগ করেছেন যে কেন আমরা ভাল বই অনুবাদ করি না। P.E.N.এর যে নতুন পশ্চিমবঙ্গ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হোল তা থেকে যদি আমরা মাসে একটা দুটা নতুন বইএর সারাংশ সমালোচনা, এবং প্রতিমাসের নতুন ভালো বইএর list পাঠাই তাহলে সেও একটা কাজের কাজ হয়। লোকে জানতে পারে বাংলা দেশে কি ধরণের এবং কত ব্যাপক সাহিত্য চর্চা হচ্ছে। অনুবাদ বিভাগ একটা করতে পারলে তো সবচেয়ে ভালো হয়। অন্তত রবীন্দ্রনাথের সব বইগুলির অনুবাদ নেই, বেশীর ভাগই out of print, এও আশ্চর্য্য।

যাই হোক, এখন এই কথাটি বলে আমি শেষ করব, যে P.E.N.এর এই সম্মিলনে আমি এইটুকু লক্ষ্য করতে পেরেছি যে সাধারণ সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৌতুহল মিশ্রিত এক রহস্যময় মোহ এবং তাকে একটু ভালো করে জানবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার উঁচুভুরু সাহিত্যিকদের কেন্দ্র-গোষ্ঠীতে ভারতের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা অতিক্ষীণ ভদ্রতার পালিশকরা আবরণে আবৃত।

সূর্য-প্রণাম

রত্নেশ্বর হাজরা

প্রতি পদক্ষেপে পার হয়েছি প্রান্তর
ক্ষত-ঝরা শোণিতের ছোঁয়া দিয়ে ঘাসের আগায়
নানা দেশে নানা বেশে আমি দূত খুঁজেছি তোমায়,
প্রাণসূর্য! তোমার কামনালালে রক্তিম অন্তর।
শিখান্বিত অগ্নিরথ ভেঙ্গে পুঞ্জমেঘ
শতাব্দীর জিজ্ঞাসার উন্মোচিত ক'রে রুদ্ধদ্বার
বন্ধ্যাভীতা পৃথিবীর পটে দাও আলোর আবেগ
এবার উন্মুক্ত করো, হে গোলক, নিজের আকার!

দারিদ্র্যের দেশে এসো জ্যোতি হিরণ্ময়!
বিরাট আকাশ ভ'রে সর্বোদয় পড়ুক স্বাক্ষর
পর্বত প্রাচীরে হোক্ খোদিত প্রস্তর;
আগ্নেয় গিরির বুক স্বাগত জানাতে
লাভাময়।

উদ্ধত রথের বেগে কালীয় মেঘেরে করো লীন:
প্রাণসূর্য শতাব্দীর তোমারে প্রণাম।

২৯

রাত্রি সাড়ে দশটায় দোতলায় নিত্য যে সাড়া জাগে—আজ যেন তা জাগল না। দু'জোড়া জুতোর চট্‌পট্‌ শব্দ—মিহি হাসি ও ভরাট গলার ধ্বনি মিশিয়ে অদ্ভুত আলাপ—তালার সঙ্গে লোহার কড়ার সংঘর্ষ—সেই সঙ্গে বহু মিশ্র ফুলের গন্ধ—বাড়ীটার বুকে নিত্য ছড়িয়ে পড়ে। কুম্ভকর্ণায় নিদ্রা থেকে বাড়ীটা যেন হঠাৎ জাগবার ভান করে। কিন্তু জাগে না। ঘরের দুয়োর খুলে ওরা ভিতরে চলে যায়। খট্‌ করে শব্দ হয় টেবিল ল্যাম্প জ্বালার—বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে চেরা আলো ছড়িয়ে পড়ে বারান্দায়—টেবিলে এটা ওটা রাখবার সঙ্গে মৃদুস্বরে আলাপ চলে। রান্না তরকারির গন্ধ—কখনো ষ্টোভের গর্জ্জন; চা এবং খাবার খেয়ে আলো নিভিয়ে ওরা শুয়ে পড়ে। একঘণ্টার মধ্যে বাড়ীটা নিশুতি হয়ে যায়। ঘড়ি না দেখেও অন্য বাসিন্দারা সময়ের হিসাব করেন—এই সাড়ে এগারোটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে গীর্জ্জার পেটা ঘড়ি ঢং করে একটি শব্দে—সে কথা সমর্থন করে।

একখানা ঘরের পরই ভগবতীর ঘর। ওঁদের ঘরে ঘড়ি নাই—হিসাবটা ওঁদেরই কাজে লাগে। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েন—শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বলে। আজ যেন ব্যতিক্রম হল। জুতার শব্দ কানে এল—কেমন ক্ষীণতর শব্দ। কড়া-কুলুপের সংঘর্ষ বাঁচিয়ে এক সময়ে তালাটাও যেন খুলে গেল। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলল কিনা—কে জানে। ষ্টোভ জ্বলল না—হাসি গল্প শোনা গেল না—তরকারির গন্ধ বা ফুলের গন্ধ কিছুই না। দুয়োরে খিল আঁটার শব্দ হল একবার—নিঃশব্দ হয়ে গেল ঘরখানি। ব্যাপার কি ?

ভগবতী দুয়োর খুলে বারান্দায় এলেন। চারিদিকে নিস্তব্ধ। দূরে মোটরযানের হর্ন দেওয়ার শব্দ—ট্যাক্সির হাল্কা চলনের আভাস। রাত্রি নিশ্চয় গভীর হয়েছে—আকাশ দেখা গেলে—উত্তরের ধ্রুবতারা দেখে বোঝা যেত—চেনা জানা তারাগুলি সীমানা বদল করে কোন দিক থেকে কোন দিকে হেলেছে ! নীচেয় মঙ্গলা-বুড়ি আপন মনে কি যেন হিসাব করছে। এইমাত্র ওর রাত্রির আহার শেষ হল। এর পর বাসন ক'খানায় জল বুলিয়ে দুয়োর বন্ধ করবে। যে দিন শেষ হল তাকে বিদায় দেবার আয়োজন নেই—যে রাত্রি আসছে তার অভ্যর্থনা সন্ধ্যাবেলায় সারা হয়েছে। চৌকাটে গঙ্গাজল ছিটিয়ে—ধূনোর ধোঁয়া ছড়িয়ে আর শাঁকের ফুৎকার তুলে—সন্ধ্যা বন্দনা শেষ করেছে সবাই। দিনের অভ্যর্থনা পাড়াগাঁয়েই চলে—শহরে কোথায় উঠোন, কোথায় বা গোবর জল ! দিন কাজের তাড়নায় কোথা দিয়ে চলে যায়— কেউ তার হিসাব রাখে না।

কিন্তু একের হিসাব অন্যের কাছে কিছুটা থাকে। মানুষ নিজের কাজের ফাঁকে অপরের তথ্য যথাসম্ভব সংগ্রহ করে হৃষ্ট হয়—এবং আরও অনেকের কাছে তা রঞ্জিত বর্ণে প্রচারিত করে তৃপ্তি অনুভব করে।

বিকেলে পুরুত-গিন্নী এলেন—মঙ্গলা বুড়ির একতলায়—সঙ্গে আরও অনেককে দেখা গেল।

মাসী গো—তোমার দোতলার ওই ভাড়াটেকে তাড়াও—গতিক সুবিধের বুঝছি নে।

কেন ব্যাপার কি ?

কাল মিনসে একা চোরের মত পা টিপে টিপে এল। দোর খুললে কি খুললে না বোঝা গেল না। আলো জ্বাললে না, খেলে না। আজ সকালেই বেরিয়ে গেল। মাগীটাকে দেখলাম না।

তাতে কি হয়েছে! কারও কি কোথাও যেতে নেই?

এমন চুপি চুপি কে পালায় বল! কেষ্টা নাকি দেখেছে—কোন সায়েবি হোটেল থেকে খানা খেয়ে বেরুচ্ছে মাগীটা। সঙ্গে আর একটা মিন্‌সে। তার সঙ্গে হাসাহাসি—ঢলাঢলি কি!

বন্ধুবান্ধব হবে বোধ হয়।

বন্ধু, না যম!

এমনি চলল কয়েকদিন। সন্দেহের ভিত্তি দৃঢ় হল। তারপর দু'দিন ও ঘরের তালা খুলল না—সুধীনও বুঝি উধাও হ'ল!

সুধীন এল তৃতীয় দিনে। ঘর খুললে—সন্তুকে ডাকলে। বললে, আসচে মাসে ঘরটা ছেড়ে দেব।

আর কোথাও বাসা পেয়েছেন বুঝি?

না, কলকাতা থেকে অনেক দূরে যাচ্ছি। কয়েকটা জিনিস তোমাদের ঘরে রেখে যেতে ইচ্ছে করি। রাখবে?

মাকে জিজ্ঞাসা করি।

বেশী কিছু নয়—হারমোনিয়ামটা আর টিপয়টা। চেয়ার দু'খানা রাখতে পারলেও ভাল। তা এক কাজ কর না কেন,—ওগুলো তুমিই নিয়ে যাও না!

আমরা…বিহ্বল ভাবে সন্তু বললে, আমরা পয়সা পাব কোথায়!

পয়সা? না—না—টাকা পয়সার কথা নয়—এমনি দিয়ে যাব।

তা কি করে হবে?

সন্তুর দৃঢ় সঙ্কল্পভরা মুখের ভাষা বুঝতে পারলে সুধীন। বললে, এ দেওয়া—ভালবাসার দেওয়া—স্নেহের দেওয়া। তোমায় ভালবাসি বলেই বললাম একথা। নইলে আমি কি বুঝি না এই কথা বলায় অসম্মান কতখানি।

সন্তু অপ্রতিভ হল। মুখ নামিয়ে বললে, কেন চলে যাচ্ছেন আপনি? আর কি কখনও আসবেন না?

দুটো কথার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তবে পাড়াগাঁয়ের ছেলে তো তুমি—নদীর ধারের চোরা বালি নিশ্চয় দেখেছ। দেখেছ তো তার ওপর পা পড়লে মানুষের কি অবস্থা হয়। এক পা তুলতে আর এক পা পুঁতে যায়। তেমনি এই সংসার—কোনখানে এর চোরা বালি লুকিয়ে থাকে—কেউ জানে না।…হঠাৎ হেসে উঠলেন সুধীনবাবু। বললেন, যাক, এসব কথা বুঝবে না। তোমার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করে এসো তো।

সন্তু ফিরে এসে বললে, মা জিজ্ঞাসা করলেন—বউ কোথায়? তিনি কি আর আসবেন না?

না।

কেন?

সব কেন'র জবাব হয় না। হেসে প্রসঙ্গান্তরে এলেন তিনি। তোমাদের ঠিকানা টুকে রাখলাম নোট বইয়ে—দরকার হলে ডাকব। যাবে তো?

যাব।

বড় তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সুধীরবাবু।

দুদিন যেতে না-যেতেই ভাড়াটে এল। রুগ্না একটি মেয়ে—খিট্‌মিটে মেজাজের, সর্ব্বসহিষ্ণু স্বামী অক্রোধী ও নিরীহ, বিষণ্নমুখ একটি ছেলে—বয়সের অনুপাতে বড় বেশী গম্ভীর। হাল্কা হাসি-কৌতুকের পাট চুকিয়ে—ঘরখানি এবার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে থম থম করতে লাগল।

সুধীনবাবুরা চলে যাওয়ার এক মাস পরে—সন্তুরা যে বইখানিতে অভিনয় করেছিল,—সেটা শহরের তিনটি ছবিঘরে এক সঙ্গে মুক্তিলাভ করল।

এ বাড়ীতেও সাড়া জাগল। ছেলেবুড়ো সবারই কেমন ঔৎসুক্য—বই দেখবার জন্য।

মিত্তির বউ বললে ভগবতীকে, চল না দিদি—আমাদের সঙ্গে। শুনছি নাকি খুব ভাল বই হয়েছে।

ছবি কখনও দেখেন নি ভগবতী। সেজন্য ওঁর আক্ষেপ ছিল না। তবু অজানা জিনিস দেখবার বা জানবার জন্য মানুষের কৌতূহল কিছু থাকেই। এ ছাড়া শুনলেন—সন্তু নাকি ওই ছবির মধ্যে আছে। মায়ের মন—ছেলেকে নানান ভাবে দেখবার সাধ জাগে—আগ্রহ বোধ করলেন ছবি দেখবার জন্য। তবু মুখে বললেন, না ভাই—আমাদের কি ছবি দেখবার বয়স—না সময়ই আছে!

কমলা বললে, না মা—চল।

সন্তুও জিদ ধরলে—চল।

মিত্তির-বউ বললে, তা তুই তো নেমেছিস বইতে—আমাদের জন্যে পাস নিয়ে আয়।

সে সুধীনদা থাকলে হ'ত—আমাকে আপিসে ঢুকতেই হ'ব না। কার কাছে যাব তাই জানি না।

যাই হোক—প্রায় সবাই ছবি দেখতে গেলেন।

অবাক হয়ে ছবি দেখলেন ভগবতী। আলো ছায়ায় কি অদ্ভুত মায়া। মানুষ বা গাছপালা নদীবাড়ী জীবজন্তু কোনটাই—মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর সন্তুও যেন সত্যিকারের সন্তু—তেমনি সত্যিকারের মা ডাক। গল্পের খুঁটিনাটি অত বুঝলেন না,—ওদের দুঃখের ভারে মনটা কেমন ভারী হয়ে উঠল। এ বুঝি সব সংসারের চিরন্তন দুঃখ।

একটি দুঃখী মেয়ে গান গাইলে। কি চমৎকার ওর গলা। মেয়েটির চেহারা যদি আলাদা না হতো—ভুল হতো বুঝি কমলাই গাইছে। ভুল হলোও—পরের গানখানি গাইবার সময়। মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে না ছবিতে—গানের সুর ভেসে আসছে। আশ্চর্য্য চেনা গান—চেনা সুর। এই ভজন গান কতবার শুনেছেন কমলার মুখে। সুধীনবাবুদের ঘরে বসে মঞ্জুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছে। একবার নয়—অসংখ্যবার গেয়েছে কমলা। গান শুনতে শুনতে ভাবে আপ্লুত হয়েছেন ভগবতী। চোখের জল মুচেছেন গান শেষ হলে। বলেছেন—মনে মনে, আহা! এ গান কখনও মানুষকে মন্দ পথে নিয়ে যায় না। গান গেয়ে মেয়েটিও যেন শান্তি পাচ্ছে।

মিত্তির-বউ গা টিপলে, দিদি শুনছ? ঠিক যেন কমলার গলা। ওই যে বাসায় বসে গাইত না? ছুঁড়ীটা শিখিয়ে ছিল। সেই গানটিই ত গাইলে।

পরের দিন সকালে সন্দেহ ভঞ্জন করলে মিত্তির-বউ। দিদি গো—ঠিকই ধরেছি আমি। ও গান কমলাই গেয়েছে।

তা কি করে হবে—স্পষ্ট দেখলাম আর একটি মেয়ে গাইছে।

—হয় দিদি—হয়। ওনার মুখে শুনলাম—যারা বক্তিতে করে তারা বেশীর ভাগই গাইতে জানে না। সেই-জন্যে করে কি—ভাল ভাল গাইয়েদের দিয়ে গান গাইয়ে নেয়—সেই গান ছবির সঙ্গে জুড়ে দেয়। ছবির মানুষ হুবহু মুখ নাড়ে—ঠোঁট নাড়ে—হাত নাড়ে, মনে হয় ওই বুঝি গাইছে।

তবু বিশ্বাস হল না ভগবতীর। কমলাকে ডেকে শুধোলেন, এ সত্যি? তুই গেয়েছিস গান?

কমলার মুখখানি কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল, মাথা নামিয়ে আমতা আমতা করে বললে, আমি?

হাঁ—সবাই বলছে—এমন নাকি হয়। একজন মুখ নাড়ে—আর একজনের গান শোনাবার জন্য। সত্যি?

কমলা বললে, তা তো জানি না।

ভগবতী ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। বুঝেছেন—মেয়ে সত্য কথা গোপন করছে। এই লুকোচুরি খেলা—এই স্পষ্ট সত্য না বলায় আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেন না। জীবনে প্রথম বুঝি স্বভাবকে অতিক্রম করে রূঢ় হলেন। বললেন, তোমার বয়স বাড়ছে না তো—জানবে কি করে! আমার কাছেও লুকোচ্ছিস? ছিঃ—ছিঃ!

হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উত্থিত গভীর ধিক্কার-বাণী সহ্য করতে পারলে না—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শুধু বললে, মা—মাগো।

সেই সঙ্গে ভগবতীও কাঁদলেন। কি অসহ্য জ্বালা দেহে—কি উত্তাপ মাথায়! তিনি কি পাগল হয়ে যাবেন! শহর কোথায় নিয়ে চলেছে তাঁদের? ঘর থেকে পথে—পথ থেকে অন্ধকার বনের মধ্যে। মিছেই সংসার পেতে ছলনা করছেন—নিজের সঙ্গে। এ যে ঘর ভাঙ্গার আয়োজন। একা মানুষ—সহায় সম্বলহীন স্ত্রীলোক—কোন শক্তিতে কি বুদ্ধিতে রক্ষা করবেন এই সংসার? নিজ মঙ্গল-বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে দাঁড় করিয়ে এদের করবেন নিরাপদ?

সারা রাত্রি বিনিদ্র হয়ে ছটফট করতে লাগলেন। হায় ভগবান—একি করলে? স্বামী যে পথে যেতে নিষেধ করে গেছেন—সেই পথেই এগিয়ে চলেছে সবাই। এত করে বুঝিয়ে—এত করে অনুনয় করেও তার গতিরোধ করা গেল না!

সকালে সন্তু ও কমলা দেখলে—ভগবতী জ্বরে অচৈতন্য-প্রায়—ভুল বকছেন।

ওরা পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চিকিৎসা হল বেশ কিছুদিন ধরে—হাতের পুঁজি

প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থল থেকে ফিরে এলেন ভগবতী। ক্রমে পথ্য পেয়ে উঠে বসলেন, তবে চলতে গেলে এখনও মাথা টলে টলে পড়ে।

মা—ওষুধ খাও। কমলা গ্লাসে ওষুধ ঢেলে সামনে দাঁড়ায়।

মা—তোমার জন্যে বেদানা আনব? সন্তু জিজ্ঞাসা করে।

মা—তোমার মাথা টিপে দেব? মিণ্টু সেবা-ব্যগ্র হাত দুখানি এগিয়ে আনে।

ওদের এই ব্যগ্রতা—এই সেবার ঔৎসুক্য—রোগের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ, মনকে সুস্থ করে তোলে। এ যেন ঔষধের চেয়েও—পথ্যের চেয়েও বেশী। চোখ বুজে উপভোগ করেন ভগবতী। মন অকারণে খুসি হয়ে ওঠে।

তোর বড় কষ্ট হচ্ছে কমলা। একা হাতে সবই তো করছিস।

না মা—বেশ ভাল লাগছে। তুমি তো কোনদিন রান্নাঘরে ঘেঁষতে দাওনি আমায়—দিলে এর চেয়ে ভাল রাঁধতে পারতাম!

না মা, চমৎকার রাঁধছ, খেয়ে ভারি তৃপ্তি হয়। হাঁরে কমলা, এই যে অসুখে এত সেবা করলি—ডাক্তার ডাকলি—ওষুধ কিনলি, এর খরচ তো কম নয়। কোথায় পেলি টাকা?

যেখান থেকেই পাই—জানতে চেয়ো না।

ভগবতী বললেন, আমি জানি—ওঁর আপিসের টাকা কবে ফুরিয়ে গেছে। ছবির দরুণ যে টাকা পেয়েছিল সন্তু—তাও শেষ হয়ে যাবে শীগ্‌গির। তার পর কি হবে?

সন্তু টাকা আনছে মা, তাতেই সংসার চলছে।

কি করে উপায় করে ও? চাল বেচে?

হাঁ। তা ছাড়া কে আমাদের টাকা দেবে—কমলা উত্তর দেয়।

ইস্কুলের ছেলে—ওতে পড়ার ক্ষতি হয়।

হোক—তোমার কাছে আমাদের ইস্কুল! না হয়—একটা বছর মাটি হবে ওর।

নারে, মা হাসলেন। একটি বছর লোকসান মানে ঠিক একটি বছরই নয়। একটা বছরের লোকসানে শুনেছি একটা জীবন মাটি হয়ে যায়।

সন্তুকে ডেকে বললেন, তোমাদের ক্লাসে ওঠা কবে হয়ে গেছে সন্তু?

পোষ মাসে।

এটা কি মাস?

মাঘ শেষ হয়ে এল।

নতুন ক্লাসে—নতুন বই কিনতে হল তো?

হাঁ।

কমলাকে বিস্মিত চোখে চাইতে দেখে সন্তু চোখ টিপলে।

ভগবতী বললেন, একটি কথা আমার শোন বাবা, চাল আনা ছেড়ে দে।

তাহলে খাব কি মা?

কেন, ইস্কুলের ছেলে কি ব্যবসা করে?

উপায় না থাকলে করে। মাস্টার মশায় একদিন বলছিলেন—আগে লেখাপড়া, না আগে বাঁচা? সবাই বললে, আগে লেখাপড়া। আমি বললাম, ভাল ভাবে বাঁচবার জন্যই তো লেখাপড়া শেখা। মাস্টার মশায় বললেন—ঠিক বলেছ তুমি।

কিন্তু লেখাপড়া না শিখে বেঁচে কি লাভ!—কমলা বললে।

সন্তু বললে, সে আমি জানি না। তবে বাঁচাটা যে লাভের—সেটা কে না জানে! এতে লজ্জারই বা আছে কি?

ভগবতী চোখ বুজে ওদের তর্ক শুনছিলেন। বেশ লাগছে। কিশোর ছেলেরা অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সে তো তর্ক নয়—কলহের সুর। ওদের ছেলেমানুষিপনায় মনে কৌতুক জমে—স্নেহরসে উদ্বেল হয় মন। এই তর্ক তো জীবনের প্রতিষ্ঠা নয়—, মনের বিলাসমাত্র। মনে মনে বললেন ভগবতী,—আহা বেঁচে থাকুক ওরা। ওদের কি জীবিকা নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়স এখন, না পরিশ্রমের কাজে ওদের ঠেলে দেওয়া উচিত? কিন্তু যা অন্যায় তাকে প্রতিরোধ করবার শক্তি নাই ভগবতীর।

একদিন বললেন, একখানা পোষ্ট কার্ড নিয়ে—একখানি চিঠি লিখে দে তোর কাকাবাবুকে। লিখে দে—চালাখানি যেন মেরামত করিয়ে রাখেন—একটু বল পেলেই দেশে যাব।

সন্তুকে কাছে বসিয়ে চিঠি লিখিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন ভগবতী।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের রাষ্ট্র-ধারণা

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও রাষ্ট্র-ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ককে আশ্রয় করে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের রাষ্ট্র-ধারণা গ'ড়ে উঠেছে। রাসেলের যখন আবির্ভাব কাল তখন অর্থাৎ ১৯শতকের শেষার্দ্ধ হ'তেই রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বের পরিসর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল, ফলে সেদিন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। সেদিন সমাজ-কল্যাণের প্রয়োজনে রাষ্ট্র-ক্ষমতার পরিসর বৃদ্ধির দাবীতে বিভিন্ন-ধারার সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই সমাজতন্ত্রবাদীদের সাথে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের দ্বন্দ্বও তাই সেইকাল হতে আজ অবধি রাষ্ট্রীয়-মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিস্ফুট হ'য়েছে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী বার্ট্রাণ্ড রাসেল রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে উনিশ শতকের গোড়ার দিকের Laissez Faire বাদীদের মত যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি তাঁর বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সম-সাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন-ধারার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই ১৯শতকের শেষার্দ্ধে একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আবার একথাও তিনি বলেছেন, শিল্প-কলকারখানার কালে রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে রূপান্তরিত করতে না পারলে সামাজিক সমস্যা দূর করা যাবে না। এই দ্বন্দ্বই রাসেল-মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই তাঁর পৃথিবী সম্পর্কে নেতিবাচক (Pessimism] মনোভাবের পরিচয় পাই। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সকল প্রকার দোষ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ রাষ্ট্র-ক্ষমতার বৃদ্ধি ও সমাজতন্ত্রবাদ, তা মার্ক্স-পন্থীই হোক আর আওয়েন-পন্থীই হোক, একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বুঝেছিলেন, এই সমাধানের পথ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিনিময়ে তৈরী করতে হবে। তাই এই সমাধানে তাঁর কোন সমর্থন ছিল না। এই দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধারের কোন Positive পথ তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। তিনি বোধহয় হতাশ হয়েই তাই বলেছিলেন, "Drastic withdrawal from the world is made necessary by the erresisteble tyranny of nature and the insatiable desires of man."

উনিশ-শতকের শেষার্দ্ধে ও বিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে য়ুরোপ তথা সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্র-ক্ষমতার পরিসরের প্রশ্নে তুমুল আন্দোলন সুরু হয়। অবশ্য আজও এই আন্দোলন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। রাষ্ট্রীয়-মানস সেদিন মূলতঃ দুটি ধারায় প্রবাহিত ছিল। প্রথমটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ধারা এবং অপরটি, জনকল্যাণ-কামনায় রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রসারের ধারা অর্থাৎ সংস্কারপন্থী ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদের ধারা।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অন্যতম সমর্থক ছিল সেদিনের একচেটিয়া ধনিক-বণিক ও সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণী,যারা শ্রমিক মালিক সম্পর্ক ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিল। কেননা সেদিন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এদের শ্রেণী-স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।

অর্থনৈতিক সম্পদে মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ধন-বৈষম্যের ফলে সমাজ-জীবনে খেটে-খাওয়া এবং বুদ্ধি জীবিদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। এদের প্রয়োজনেই সেদিন সমাজতন্ত্রবাদের আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে। সেণ্ট সাইমনপন্থী এবং মার্ক্সপন্থী বিপ্লববাদী এই দুই ধারায় প্রবাহিত ছিল এই সমাজতন্ত্রবাদের আন্দোলন। অবশ্য একথা স্মরণ রাখতে হবে, দ্বিতীয় ধারার আবির্ভাব ঘটেছিল প্রথম ধারার আবির্ভাবের পরে ; বরং বলা চলে, প্রথম ধারার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই।

অর্থনৈতিক জীবনে শিল্প-বিপ্লব এবং রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত করেছিল সমাজ-মানসে তার প্রত্যক্ষ অবদান মানব ও মানস মুক্তির সাধনা। প্রথমে এই মুক্তির কামনাতেই রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের আন্দোলনের সূত্রপাত। আবার একথাও বলা চলে, বিগত দিনের সামন্ত-যুগীয়-সমাজ-ব্যবস্থায় একদিকে রাজার সার্ব্বভৌম ক্ষমতা এবং অপরদিকে মানস-জীবনে চার্চ্চ-শাস্ত্র-গুরুর সর্ব্বব্যাপী ও প্রতিবাদহীন নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই বিজ্ঞানের বিকাশ ও শিল্প-বিপ্লবের সাথে সাথে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটিত হ'তে থাকায় ও জীবন-সংগ্রাম ক্রমশঃই সহজতর হ'তে থাকায়, বিগত দিনের বিধি-বন্ধন, চার্চ্চ-রাষ্ট্র-গুরুর নির্ম্মম প্রতিবাদ হীন নির্দ্দেশ-নামার হাত থেকে মানব ও মানস-মুক্তির আন্দোলন প্রবল হ'তে থাকে। তাই সেদিন যেমন অর্থনৈতিক জীবন তেমনি মানস-জীবন অর্থাৎ সাহিত্য, দর্শন, কলা, চারু ও কারু শিল্প সব কিছুই নূতন আদর্শের প্রেরণায় নূতন সৃষ্টির উন্মাদনায় মত্ত হ'য়ে উঠেছিল। যদিও এই মানব ও মানস-মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ১৬।১৭ শতকে প্রথম ইতালী এবং পরে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে রেণেশাঁ আন্দোলনের সাথে সাথে— যার মূলে ছিল বিজ্ঞানের বিকাশ ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি এবং অন্ধবিশ্বাসের ওপর যুক্তিবাদের প্রাধান্য লাভ আর শিল্প-বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সেদিন এই আন্দোলন চরম পরিণতি লাভ করে।

শিল্প-বিকাশের পক্ষে সেদিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ হ'তে মুক্তি, অবাধ-প্রতিযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্য এবং শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য্য বলে সেদিনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকৃত হ'য়েছিল।

কিন্তু শিল্প বিপ্লবোত্তর কালে ধন-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন অবাধ-প্রতিযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্যের সুযোগে ক্রমশঃই অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য খুবই অল্প-সংখ্যক ধনিক-বণিক গোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ায় একচেটিয়া ব্যবসায়ের পত্তন হ'তে থাকে এবং দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ ব্যবহার ও বণ্টন ব্যবস্থার অভাবের ফলে অর্থনৈতিক জীবনে দরিদ্র, বেকার সমস্যা ও শ্রমিক-মালিক বিরোধের সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিতে থাকে। এই অবস্থায় ইংলণ্ড ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার দাবীতে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দেয়। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের ধারণার আবির্ভাব এই রকম সময়েই ঘটে। সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দ্দশার নিরসনের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের দাবী ওঠে। তখন বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আইন (Labour Legislation) এবং সামাজিক বীমা (Social Insurance) আইনের পত্তন হয়।

এই সময়ে সমাজ-তান্ত্রিক ভাবধারার যে আবির্ভাব ঘটে তা প্রধানতঃ দুটি ধারায় প্রবাহিত ছিল—প্রথম ধারা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ আইন সভার মধ্যে যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে অধিকতর সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠার মতবাদ—বিশ শতকের ৪০ দশক থেকে এই মতবাদই নানা সংস্কার পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে Social Welfare Stateএর মতবাদ হিসাবে প্রচলিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় ধারা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদ অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজের দ্রুত ও আমূল পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রমিক একনায়কত্ব প্রবর্ত্তন করে পূর্ব্ব সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার মতবাদ। রুশ-বিপ্লবের আদর্শ এই মতবাদ। প্রথম ধারার প্রবক্তা সেণ্ট-সাইমন, আওয়েন এবং পরবর্ত্তীকালে, জর্জ বার্ণাড শ, লাস্কী প্রভৃতি। আর দ্বিতীয় ধারার প্রবক্তা, কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এবং পরবর্ত্তীকালে লেনিন।

সাইমন-পন্থী বা মার্ক্স-পন্থী—উভয় সমাজতন্ত্রবাদেই রাষ্ট্র-ক্ষমতার বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মার্ক্সবাদে বলা হয়েছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হিসাবে শ্রমিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে রাষ্ট্রকে সর্ব্বেসর্ব্বা করতে হ'বে—তারপরে সমাজ থেকে যখন শ্রেণী-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ফলে বিলুপ্ত হ'বে—তখন রাষ্ট্রও আর থাকবে না। উভয় পন্থী সমাজতন্ত্রবাদ স্বীকার করেন। সমষ্টিগত মঙ্গলই ব্যষ্টিগত মঙ্গলের মাধ্যম। সমাজে প্রচলিত শ্রেণী বৈষম্যের অবসানের (ক্রমশঃ অথবা দ্রুত) মাধ্যমে সর্ব্বাধিক সমাজ কল্যাণ সাধন সমাজতন্ত্রের আদর্শের মূল-ভিত্তি।

সংস্কার-পন্থী সমাজতন্ত্রবাদের উপরের দুটি দৃষ্টান্ত থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল—সমাজ-জীবনে যে ধন বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে তাকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আইন-কানুনের সাহায্যে করতে হ'বে। অনেক রাষ্ট্রেই সেদিন এই আদর্শ অনুযায়ী কাজ সুরু হয়েছিল। collectivism ও সংস্কার-পন্থী-সমাজতন্ত্রবাদের আরেক রূপ।

এর পাশাপাশি মার্ক্স-পন্থী বিপ্লবী-সমাজতন্ত্রবাদের ধারণাও গড়ে উঠেছে। এঁদের মতে ধনতান্ত্রিক-সমাজের শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রে শোষিত শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু হ'বে। দেশের সকল সম্পদ, উৎপাদন ও তার বণ্টন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ মালিকানা এই শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং রাষ্ট্রে কোনরূপ শ্রেণী-বৈষম্য এবং ব্যক্তি-মালিকানা স্বীকৃত হবে না।

এই হ'ল সেদিনের প্রধানতম দুটি রাষ্ট্র-ধারণার মোটামুটি পরিচয়। ১৯ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগে রাষ্ট্র-কাঠামো ক্রমশঃই শেষোক্ত রাষ্ট্র-ধারণানুযায়ী গ'ড়ে উঠতে থাকে। শুধু তাই নয়, ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের ফলে শ্রমিক একনায়কত্বমূলক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হয় এবং যুদ্ধোত্তর যুগে (১৯১৪-১৯১৮) ইটালী ও জার্ম্মানীতে ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে ডিক্টেটরশিপের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই সকল ঘটনা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মনে নানারূপ সংশয়ের সৃষ্টি ক'রেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বার্টাণ্ড রাসেলের রাষ্ট্র-ধারণার ও বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী রাসেলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রচনাগুলিতে রাষ্ট্র, গোষ্ঠীও সমিতির কোন প্রকার ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিনিময়ে রাষ্ট্র বা সমিতির কোনপ্রকার ক্ষমতা বৃদ্ধিকে তিনি সর্ব্বদা আক্রমণ করেছেন। সেই রাষ্ট্রীয় একনায়কত্ব (Political dictatorship). মুষ্টিমেয় ধনিক-বণিক গোষ্ঠীর হাতে অর্থনৈতিক একনায়কত্ব (monopolism) প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে তিনি নিন্দে করেছেন। একদিকে যেমন তিনি প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রের প্রতিবাদ করেছেন, অপরদিকে তেমনি একচেটিয়ামূলক ধনতন্ত্রের (monopoly capitalism) বিরুদ্ধেও তাঁর রচনায় প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। আবার এর ঠিক পাশাপাশি তিনি তাঁর ভাষায় State-socialismএর অধীনে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা সম্পর্কেও গভীর শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, সকল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তিনি কেবলমাত্র কার্ল-মার্ক্সের রচনারই পরিপূর্ণ ও ব্যাপক আলোচনা করেছেন। যদিও তাঁর মতে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদের চেয়ে Guild socialism এবং syndicalism অনেক ভাল—কেন না এই দুই ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের তবু ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ শতকের ধনতান্ত্রিক-সমাজ-ব্যবস্থার গলদ তিনি বিশেষ করেই উপলব্ধি ক'রেছিলেন—কিন্তু সেটা দূর করতে গিয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দিতে তিনি সম্মত ছিলেন না। যদিও মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও প্রসার অবশ্যম্ভাবী—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে অন্যতম প্রতিবন্ধক। তবে Guild socialism ও syndicalism এর প্রতি সমর্থন থাকলেও তাঁর বিভিন্ন রচনাতে এই সমাজতন্ত্রবাদ কেবলমাত্র প্রসঙ্গত উল্লিখিত, অথচ মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদ এবং সোভিয়েটতন্ত্রের

পুনঃ পুনঃ সমালোচনা করেছেন। তাই মার্কপন্থীরা বলছেন, এর মূলে রয়েছে রাসেলের সক্রিয় শ্রেণী স্বার্থ। যে শ্রেণী-স্বার্থ সোভিয়েট সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাবের পর সারা বিশ্বে শ্রমিক জাগরণের ফলে বিপন্ন হবার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের এলাকায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রসার সুরু হয়। ১৯০২ সালে রাসেল তাঁর A free man's worship পুঁথিতে এই প্রসঙ্গে তাঁর Power সম্পর্কিত মতবাদের বিশ্লেষণ করেছেন।

রাসেল বলছেন, এই বস্তু-জগতের স্থূল স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে মুক্ত রেখে কল্পনা-জগতের আশ্রয় নেওয়াই শ্রেষ্ঠ পথ। "Drastic withdrawal from the world is made necessary by the erresistible tyranny of nature and the insatiable desires of men"—চলতি সমাজ-জীবনের স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, ধনতান্ত্রিক সমাজের একচেটিয়া ব্যবসায়ের কুৎসিত স্বরূপ এবং পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উৎপত্তির ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা থেকে মুক্তির পথ হিসাবেই তিনি উপরিউক্ত নেতিবাচক পথ নির্দ্দেশ করলেন। তাই রাসেল সম্পর্কে সমালোচকরা লিখেছেন Russel's theory of power and possessiveness supplies the main reason for condemning or disparaging any institution which possesses real power and seeks more.

রাসেলের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত মতবাদের পরিচয় পাই তাঁর রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ধারণা থেকে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে রাসেল বিশ শতকের গোড়াতে দাঁড়িয়েও তাই উনিশ শতকের গোড়াকার রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ধারণার প্রতিধ্বনি করলেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতাগুলি কেবল আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার মধ্যেই কেবল মাত্র সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

একথা বলেছি, ১৯ শতকের শেষ ভাগ থেকেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং মধ্যভাগ থেকেই বিভিন্ন ধরণের সমাজতন্ত্রের দর্শন চিন্তাজগতে প্রাধান্য লাভ করে—বিশেষ ক'রে কার্ল মার্ক্সের দর্শন সেদিনের চিন্তাজগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছিল তার একটি ধারার বলিষ্ঠ রূপায়ন ঘটে রাসেলের রাষ্ট্রদর্শনে। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্র কর্তৃত্ব বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তির স্বাধীনসত্ত্বা বিপন্ন হবার শঙ্কা ঘটে—আর সে অবস্থা সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে নিদারুণ দুর্দ্দিনের সূচনা ক'রে। এই সমস্যা সমাধানের পথ হিসাবে রাসেল বলছেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছাড়া রাষ্ট্রের অন্যান্য কাজ বিভিন্ন স্বাধীন সংগঠনগুলির দ্বারা পরিচালিত হবে।—কেননা এই সংগঠনগুলি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে তাদের জীবনে এদের গুরুত্ব তারা অস্বীকার করতে পারে না। হ্যারল্ড লাস্কিও তাঁর রাষ্ট্র সম্পর্কিত মতবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই কথাই বলেছেন। (Authority as a Federal—Gr. of Politics) রাসেলের মতে এই বিভাগের মধ্যে দিয়েই কেবল মাত্র সংগঠন ও স্বাধীনতা একত্রে রক্ষা করা যেতে পারে। তবে একথাও তিনি বলছেন—কোন সংগঠনই যেন এমন ক্ষমতাশালী না হ'য়ে ওঠে, যার ফলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ বিপন্ন হ'তে পারে। আবার আরেকটি শঙ্কার কথা এই প্রসঙ্গে রাসেল উল্লেখ ক'রে বলছেন, The state is jealous of lesser organisations which must deprive it of power if they are to succeed.

রাসেলের এই মন্তব্য কিন্তু সেদিনের চলতি রীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। সেদিনের রাজনৈতিক ও সমাজ-মানসের প্রবণতার ধারাই ছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা, বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের মধ্যেই য়ুরোপের তিনটি দেশে একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা সার্থক হ'ল। দেশগুলি হ'ল, রাশিয়া, জার্ম্মাণী ও ইটালী। যদিও প্রথম দেশের একনায়কত্বের সাথে অপর দুই দেশের একনায়কত্বের ধারণার মৌলিক প্রভেদ ছিল। তবে একথা সত্য—এই সকল দেশগুলিতে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিনিময়ে রাষ্ট্রই একমাত্র শক্তিশালী সংগঠনে পর্য্যবসিত হয়। এসব দেশে গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতি (traditional)-গুলি সম্পূর্ণ বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছিল। আবার একথাও সত্য, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার এলাকা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল এবং কল্যাণধর্ম্মী রাষ্ট্র ধারণার (Welfare state) শুধু মাত্র সেদিন আবির্ভাবই ঘটেনি, বাস্তবে অনেক রাষ্ট্রেই তার রূপায়নের চেষ্টা চলেছিল। আর এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা যদি মানুষের জীবনে না থাকে তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ বা ব্যক্তিত্বের বিকাশের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যে হ'য়ে যায়। শিল্প-সভ্যতায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রাষ্ট্রীয় সংগঠন ব্যতীত ঘটে না, একথা আজকের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার কথা। লাস্কিও বলেছেন, অর্থনৈতিক সমস্যা ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন তামাসা মাত্র। কিন্তু রাসেলের কাছে এ অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নেই। বোধহয় তাঁর নিজের জীবনে কোনদিনই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিপন্ন হবার সম্ভাবনা ঘটেনি। রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এমন একটানা জেহাদ ঘোষণা করেছেন যেন মনে হয়, পৃথিবীতে তাঁর একমাত্র প্রতিবিম্বিই এই রাষ্ট্র—যার একটু ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তিনি ক্ষুব্ধ হ'ন। তিনি লিখছেন, The members of the Govt. have more power than the others, even if they are democratically elected and so do officials appointed by a democratically elected Govt. The larger the organisation, the greater the power of the executers. Thus every

increase in the orgainsations increases inequality of power by simultaneously diminishing the independence of members and enlarging the scope and the initiative of the Govt. (Power—161)

রাসেলের মতে ক্ষমতার লোভ এবং মজুত করবার ঝোঁক এই—দুইটিই মানুষের instinct, আর এই দুইটি instinct মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক। তবে রাসেল এ কথাও বলছেন, মানুষের এই প্রবৃত্তির সংস্কার করা সম্ভব—সুষ্ঠু ও উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে। তাঁর শিক্ষা-দর্শনের মূল ভিত্তিই এই। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতি তিনি এতই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে সেই কারণেই বিশেষ করে Kropotkin প্রবর্ত্তিত anarchism এর প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। রাষ্ট্রকে দ্রুত ধ্বংশ করার (abolition of state) প্রচলিত মতবাদের তাঁর কাছে একটা আবেদন ছিল কিন্তু 'তিনি মনে করতেন' এমতবাদ কাল্পনিক। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-ক্ষমতার উপর তাঁর এত শ্রদ্ধা ছিল, কারণ তা মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী, তাঁর মতে রাষ্ট্রহীন সমাজ-ব্যবস্থাই মানুষের জীবনের একমাত্র কাম্য। কিন্তু তিনি মনে করতেন বাস্তবে এই আদর্শের রূপায়ন সম্ভব নয়। এই মতবাদের পেছনে মার্ক্সবাদীরা মনে করেন, তাঁর শ্রেণীস্বার্থ রয়েছে। কেননা একদিকে রাষ্ট্র-ক্ষমতার পরিসর বৃদ্ধির সাথে সাথে বিত্তশালী মানুষ, ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ে—কাজেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করে। আবার সমাজ-জীবন থেকে রাষ্ট্রকে একেবারে নিঃশেষ ক'রে দিতে যে বিপ্লবের প্রয়োজন তা' ঐ শ্রেণীর অস্তিত্বের পক্ষেও ভয়ঙ্কর। আর রাসেল যে অভিজাত উচ্চ শ্রেণীর সমাজোদ্ভূত—একথা ত' কারও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

তাই রাসেল, মার্ক্স-লেনিনবাদের "সমাজতান্ত্রিক-রাষ্ট্রের পরিণামে উবে যাওয়া" সম্পর্কিত ধারণাকে মেনে নিতে পারেন। সমাজতান্ত্রিক পর্য্যায়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চরম হওয়ার (Dictatorship of the Proletertiate) পর কি করে যে শেষে উবে যেতে পারে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

ক্ষমতাবৃদ্ধির শঙ্কায় শঙ্কিত রাসেল স্বভাবতঃই অ্যানার্কিজম্, সিণ্ডিক্যালিজম্ এবং গিল্ড-সোস্যালিজমের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন—অবশ্য তিনি একথাও বলেছিলেন, এই মতবাদগুলির মধ্যে প্রথমটি কাল্পনিক, দ্বিতীয়টি অবাস্তব এবং ভয়ঙ্কর, আর তৃতীয় মতবাদকে যদিও অন্যান্য মতগুলি অপেক্ষা বেশী পছন্দ করতেন, তবুও ঐ মতবাদ তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন।

২০ শতকের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রকে সামগ্রিকভাবে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে রূপান্তর-চেষ্টা। এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য রাষ্ট্রের অধীনে শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে সুরু করে দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক-সম্পদের সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য্য। অনেক রাষ্ট্রই আজ সে পথে পা বাড়িয়েছেন।—তাতে দেখা গিয়েছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অগ্রবিস্তর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ ব্যাপকতর হয়েছে—হ্রাস পায়নি।

অবশ্য রাসেল ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার দোষত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং এই ব্যবস্থায় মানুষের সকল মানুষের জীবনে সুখ, শান্তি ঘটে না—এ বোধও তাঁর ছিল। তাই এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন। তবে তিনি সমাধানের পথ হিসাবে subjective পরিবর্ত্তনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে বিপ্লবের মাধ্যমে objective পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে সমাধান-প্রচেষ্টা মূঢ়তা মাত্র। এইখানে গান্ধীজীর সাথে তাঁর মিল। গান্ধীজীও ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ধন-বৈষম্য-জাত মানুষের দুঃখদুর্দ্দশার থেকে রেহাই পাওয়ার পথ হিসাবে অন্তরের পরিবর্ত্তনের কথাই বলেছেন। এই প্রসঙ্গে রাসেল যে ফরমুলা দিয়েছেন, তা হ'ল, If man in general, changed their attitude in this or that respect socialism and peace could soon be realised for there is no outword which presents it.

আবার ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধন-বৈষম্য প্রসূত দুঃখদুর্দ্দশার প্রভাবেই বোধহয় রাসেল বলেছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা প্রগতির পক্ষে অন্যতম বিঘ্ন এবং এই ব্যবস্থার বিনাশ উন্নততর জগত সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য্য। তিনি একথাও বলেছেন, Industrialism can not continue efficiently much longer without becoming socialistic. (Prospects of Industrial organisation—P—145)

তাই মনে হয়, বিপ্লব-কালীন-রাশিয়ার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তাতে প্রশংসামূলক মনোভাবের পরিচয়ই পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, Every one works hard, but there is no insecurity. Theatres, opera and ballet are admirable and some seats are reserved for unionist. There are no drunkenness or prostitution and women are freer from molestation than anywhere else in the world." The whole impression is one of virtuous, well-ordered activity. "(Bolshevism—Practice and theory) কিন্তু সাথে সাথে রাশিয়ার রাষ্ট্র-ক্ষমতা-বৃদ্ধির দোষের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। তাই এত কথা লিখবার পরও তিনি লিখছেন, "The average working man, to judge by a rather hasty impression, falls himself the slave of the Govt. and has no sense whatever of having been liberated from tyranny (Ibid—100)

কম্যুনিষ্ট মতবাদকে সেদিন তিনি fanatical creed ব'লে অভিহিত করেছেন এবং বলছেন, creed এর প্রভাবে জনসাধারণ ক্রমশঃই Skeptic হ'য়ে পড়ে। তিনি আরও বলেছেন, সোভিয়েট

নেতৃত্ব এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের উত্তম ও স্বাধীনতালিপ্সাকে পঙ্গু ক'রে দেয়।

সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ হ'ল, এই ব্যবস্থা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে। তিনি মনে করেন, গণতন্ত্রই সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করার একমাত্র ব্যবস্থা।

কিন্তু রাসেলের মতে, রাশিয়ায় গণতন্ত্রের নামগন্ধ নেই। তিনি বলেন, যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয় সেখানে গণতন্ত্র টি'কতে পারে না। মার্ক্সবাদীরা অর্থনৈতিক সাম্যের উপরে জোর দিতে গিয়ে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন, তার ফলে যে বিপদ সৃষ্টি হয় তা অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তি-মালিকানার অস্তিত্বের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর।

রাসেল গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন, কারণ তার মতে, প্রার্থী ও তার মতবাদ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলির বুলির মর্জ্জির উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই Functional অথবা বৃত্তিভিত্তিক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ট্রেড-য়ুনিয়ন ডেমক্রাসী নির্ব্বাচন পদ্ধতির আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত এবং নির্ব্বাচকমণ্ডল "Common Purpose"কে ভিত্তি করে গ'ড়ে তোলা উচিত। রাশিয়ায় কিন্তু Factory-Soviet এবং কৃষিখামার সোভিয়েটগুলি electoral এবং মৌলিক নীতি নির্দ্ধারণ একক হিসাবেই গণ্য হয়। এই সকল সোভিয়েট থেকে যাঁরা নির্ব্বাচিত হন, তাঁরা কেউই রাজনীতিবিদ্ নয়—ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় কর্ম্মরত চাষী মজুর।

Megill সাহেবের মন্তব্য দিয়েই রাসেলের রাষ্ট্র ধারণা সম্পর্কিত আলোচনার ছেদ্ টানি। দম্ভ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষমতা এবং লোভ— রাসেলের মতে এই চারটি হ'ল মানুষের basic instinct এবং রাজনীতিতে যা কিছু ঘটে তার মূলে এইগুলিই সক্রিয় রয়েছে। প্রুধঁ, ক্রপট্‌কিন, এবং ফরাসী সোস্যালিষ্টদের স্বাধীনতার আদর্শে তিনি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের মত রাসেল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। সিণ্ডিক্যালিজম্ অ্যানার্কিজমের উপর মতবাদকে অবাস্তব বলে তিনি মনে করতেন। আবার Reformed capitalism বা মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রের উপরেও তাঁর কোন আস্থা ছিল না ; কারণ তিনি মনে করেন এ দুই ব্যবস্থায় মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। তাই His theory of human passions that left him no way but to waver between solutions he regarded impractical and solutions he regarded as undesirable. এই হ'ল তাঁর জগৎ সম্পর্কে নিরাশবাদী ধারণার মূলভিত্তি।

মৃতা সতীন্

শ্রীকৃষ্ণধন দে

১

ওগো, শোন, কাঁদছে কে মাঝ রাতে ফুঁপিয়ে,
—দমকা বাতাস এসে পুঁইমাচা কাঁপিয়ে,
পুকুরের ভাঙা ঘাটে একা বসে' কাঁদে কে,
মাঝে মাঝে ঝুপ্ করে' জলে পড়ে ঝাঁপিয়ে !
বাতাসের শব্দ ও ?—ভুলব না সে-কথায়,
বল, বল কে ওখানে. যদি তা'রে চেনা যায় !
ওগো, শোন, আসছে কে চুপি চুপি এ ঘরে,
বাসনের নাড়াচাড়া শুনছ না কে করে,
ওই শোন জানালায় মাথা তা'র ঠোকে কে,
আলনার কাছে গিয়ে চোখ মোছে কাপড়ে !
কত ঠাঁই খোঁজে সে গো কি যে তা'র জিনিসে,
আলুগোছে মাথা রাখে তোষকে ও বালিসে ;
কবেকার ওষুধের শিশিভরা দেরাজে
হাত তা'র ছুঁয়ে যায় মিক্‌চার ও মালিসে !
দাঁড়ায় সে জানালায় চেয়ে দূর আকাশে,
মাঝ্ রাতে কালি চাঁদ দেখা যায় ক্যাকাশে !

বাতাবি গাছের তলে চুপ করে' বসে কে,
বুক-ফাটা শ্বাস তা'র ফেলে বুঝি বাতাসে !
গৃহ-কোণে পড়ে থাকা বেতে-বোনা ঝাঁপিতে,
লক্ষ্মীর ধান আজো চায় বুঝি মাপিতে,
কবেকার আল্‌পনা সিঁদুরের রেখাটি
ছুঁতে গিয়ে হাত তা'র থাকে শুধু কাঁপিতে !
নিজ হাতে আধ্-বোনা পশমের মোজা গো,
দালানের এক কোণে আজো আছে গোঁজা গো !
তা'র প্রতি বার বার ফিরে ফিরে চায় সে,
স্মৃতি কা'র পড়ে মনে, ভোলা কি সে সোজা গো !
মরায়ের পাশে দেখ, আলো-ছায়া জ্যোছনায়
মাটিতে লুটিয়ে কাঁদে ও কে কি-যে বেদনায়,
মরায়ের গায়ে-আঁটা আয়না ও কড়িতে
গোবরের ছোপটুকু আজো ও কে ছুঁতে চায় !
তা'রি প্রিয় পোষা টীয়া আছে কি ও খাঁচাতে ?
তুড়ি দিয়ে তাই তা'রে চায় বুঝি নাচাতে ?

ছুটে গিয়ে উঠানের এক পাশে দেখে সে
মেটুলিতে রং ধরে ভরা-পুঁইমাচাতে !
কবে পাখী এঁকেছিল দেওয়ালে কে সিঁদুরে,
ঘুরে ফিরে তা'রি পানে দেখে হায়, শুধু রে !
চৌকাটে ফোঁটা-আঁকা কার ভাই-ফোঁটাতে,
রোজ তাই দেখে যায়, এসে রাত দুপুরে !
তোমারে সে কোন কথা চায় বুঝি বলিতে,
বার বার থেমে যায় ভীরু পায়ে চলিতে !
উঠানে সে চেয়ে দেখে, আলো-ছায়া-মাখানো
লেবু ফুল ছুঁয়ে যায় রাতজাগা অলিতে !
মশারীর চারপাশে চাপাসুরে কাঁদে কে,
ছুঁতে এসে ছোঁয় না'ক, দুখে বুক বাঁধে কে ?
যে-কথাটি বলে' বলে' নিতি মোরে ডাক গো,
সে-কথাটি শুনিবারে আজো যেন সাধে কে !
বাতাসের শব্দ ও ? ভুলব না সে-কথায়,
বল, বল, কে এসেছে, যদি তা'রে চেনা যায় !

মাতৃসঙ্গীত।*

আমি আর কিছুতেই ভয় না করি,
অভয়ার অভয়-পদ
পেয়েছি এই হৃদয় ভরি'
আঁধার সরণী তলে
যুগল চরণ-তপন জ্বলে,
সেই পায়েরি পরশে মোর
সকল বাধা যায় যে সরি'।
আমি আর কিছুতেই ভয় না করি॥

এখন চলি নাইবা চলি,
মা যে আমায় নিয়ে চলে,
প্রলয়-রাতে প্রদীপ সম
রাখে আপন আঁচল তলে।
তুফান তোলা হ'ক পারাবার,
মা যে হ'ল মাঝি আমার,
মায়ের মরণ-হরণ-চরণ তলে
সঁপেছি এই জীবন-তরী।
আমি আর কিছুতেই ভয় না করি॥

কথা ঃ নিশিকান্ত (পণ্ডিচেরী) সুর ও স্বরলিপি ঃ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সা সা II {রা -মা মা | পা পদা -মা I পদা -ণর্সা -া | ণধর্সা -র্সনা দা I
আ মি আ র্ কি ছু তে০ ই ভ০ ০০ য়্ না০০ ০ ক

I পা -া -া | -া -া (পা I র্সণা র্সা -ার্স | ণর্সা ণধা -ণা I
রি ০ ০ ০ ০ অ ভ০ য়া র্ অ০ ভ০ য়্

I দা পা -দা | মা পদা -ণর্সা I ণদা পা -জ্ঞা | জ্ঞপা মা -দা I
প দ ০ পে য়ে০ ০০ ছি এ ই হৃ০ দ য়্

* বিলম্বিত লয়ে গেয়।

I জ্ঋা সা -া | -া সা সা)} I -া II
ভ রি ০ ০ "আ মি" ০

II { দা দা মা | জ্ঞা মা দণসঋা I ণা র্সা -া | -া -া -া I
আঁ ধা র স র ণী০০০ ত লে ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা ঋ্র্া | জ্ঞ্র্া র্মা র্মা I জ্ঞ্র্ার্ঋা -জ্ঞ্র্া র্সা | -ঋ্র্া জ্ঞ্র্মর্মজ্ঞ্র্া ঋ্র্া I
যু গ ল চ র ণ ত ০ ০ প ০ ন ০ ০ জ্ব

I র্সা -া (-ঋ্র্া | -ণা -র্সা -দা)} I -া | -া -া -া I
লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -াঋ্র্ ণধা | -ণা দা পা I পা পদণর্সা -র্সণা | দা পা -া I
সে ই পা০ ০ য়ে রি প র০০০ ০ শে মো র্

I জ্ঞপা পা পদা | -ণা ণদা পা I মজ্ঞা -া পা | পা মা পা I
স ক ল০ ০ বা ধা যা০ ০ য়্ যে ০ স

I ণা -দা -া | -া সা সা II
রি ০ ০ ০ "আ মি"

দ্া ণ্া II{ণ্া সা -াঋ | ণ্া -জ্ঞা ঋজ্ঞা I ঋা সা -া | -া -া -া I
এ খন চ লি ০ না ই বা চ লি ০ ০ ০ ০

I সা -া রা | জ্ঞা মা -া I মপা মপা -পমা | জ্ঞরা জ্ঞা -া I
মা ০ যে আ মা য়্ নি০ য়ে০ ০ চ০ লে ০
I সা জ্ঞা জ্ঞা | ঋা সা -ণ্া I সা দা দা | দা পা -দা I
প্র ল য় রা তে ০ প্র দী প স ম ০

I পা -র্সা র্সণা | দা পা -া I মজ্ঞা -া মা | পদণর্সা র্সণা দা I
রা ০ খে আ প ন্ আঁ০ ০ চ ল০০০ ০ ত

I পা -া -া | -া (দ্া ণ্া)} I -া -া I
লে ০ ০ ০ এ খন্ ০ ০

I { দা দা -মা | মদা দা -র্সা I র্সা -া র্সা | -ঋ৴া জ্ঞা৴ -জ্ঞ৴ঋ৴ I
তু ফা ন্ তো৹ লা ০ হো ক্ পা ০ রা ০

I র্সা -া -া | -া -া -া I র্সা -া ঋ৴া | জ্ঞা৴ -র্মা র্মা I
বা ০ ০ ০ ০ র মা ০ যে হ ০ ল

I জ্ঞ৴র্রা -জ্ঞা৴ র্সা | -ঋ৴া জ্ঞা৴ -জ্ঞ৴ঋ৴া I র্সা -া -(ঋ৴া | -ণা -র্সা -দা)} I -া |
মা৹ ০ ঝি ০ আ ০ মা ০ ০ ০ ০ র্ ০

-া পা দা I র্সা র্সা র্সা | ঋ৴া র্সা -া I
র্ মা য়ের্ ম র ণ হ র ণ্

I ণধা ণা ণা | ণদা পা -া I জ্ঞপা পা -া | পা পা -া I
চ৹ র ণ ত লে ০ সঁ পে ০ ছি এ ই

I পা পা -া | পা -মা পা I ণা -দা -া | -া সা সা II II
জী ব ০ ন ০ ত রী ০ ০ ০ "আ মি"

বৈশাখের প্রার্থনা ঃ শান্তিনিকেতন

আনন্দ বাগচী

হে বৈশাখ, এসো এসো, আমার চৈত্রের দিনগুলি
ধ্যানচ্ছায়া তলে তব লীন হোক, এই পাতাঝুরি
ধূসর প্রহরে ফের আমার চৈত্রকে আমি ভুলি
হে বৈশাখ, নামো তুমি উর্ধ্ব অন্তরের প্রান্ত জুড়ি'।

খোয়াই তুলেছে তপ্ত হাই, আম্রকুঞ্জের দুপুর
ঝিম ধ'রে আছে, দূরে তালযূথ ক্লান্ত রেখা টেনে
ফুরায় আপন ছায়া, অচেনা পাখির ডুব-স্বর
পল্লব গভীর থেকে ভেসে আসে ক্লান্তি মেনে মেনে।

হে বৈশাখ, গান দাও, হে বৈশাখ স্বপ্নলেখা দাও
আজো সেই মহালগ্ন। আমার আত্মার ক্ষাররসে
আর্তিম্লান শেষ করো, একাবলী আকাশ উধাও—
করো মত্ত ঝড় আনো, তৃপ্ত করো ভৈরব রভসে।

ঘাসের বাসরে শেষ নীল রাত, ঝিঁঝিট থেমেছে
হাওয়ার অশান্ত হাত অন্ধকার ডালে নেমে আসে,
আকাশে মাটিতে মিলে এক ছবি, গান
থেমে গেছে
ধ্রুপদ বিস্তার তার মিশে আছে প্রতিটি নিশ্বাসে।
শালের সকাল এসে খুঁজে গেছে জীবনের নাম,
ঋষিকল্প, হেথা মোরা উত্তর প্রণাম রাখিলাম।

একটি আষাঢ়ে গল্প
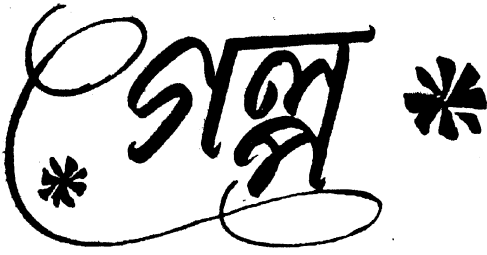
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিনের মেঘমেদুর সন্ধ্যায় আড্ডাটা জমেছিল জোর। বৈঠকীচক্রের চাস্পৃহ চঞ্চল চাতকদের চক্রান্তে অনেকগুলো আষাঢ়ে গল্পই যখন বেরিয়ে এলো তখন সোমনাথের কাহিনীটাও যে ঐ গল্পমহাসিন্ধুর তরঙ্গবিক্ষোভে মিলিয়ে যাবে তার আর আশ্চর্য্য কি।

সোমনাথের সঙ্গে আমার আলাপ সেই আড়াইযুগ আগের কলেজী জীবনে—যখন মৌতাতী মন হোত উধাও ক্ষণে ক্ষণে, ভরজোয়ান্ দেহটা উঠতো তেতে কথায় কথায়। শতাব্দীর একপাদেরও বেশী গেছে চলে। যৌবনোত্তর দিনে হিমবাহ হাওয়া জানান দিচ্চে—জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু জীবনটা ত বন্ধনহীন গ্রন্থি নয়—পাকে পাকে জড়ানো পাশমোচন করতে সময় নেয় বই কি। আজই না হয় বারলাইব্রেরীতে বসে ঝিমুই, রাজাউজীর মারি, ঘনঘন চায়ের অর্ডার দিয়ে শুষ্ক ওষ্ঠকে সরস করে তুলি, শাঁসালো সলিসিটররা পাশ কাটিয়ে চলে যায়, মিলর্ডদের দরবারে কচিৎ ডাক পড়ে। কিন্তু এককালে এই আদিনাথই উত্তর কলকাতার নামকরা ছেলে ছিল,—স্মার্ট, চৌকস্, বলিয়ে, কইয়ে। অর্থে আভিজাত্যে সম্পদে পিতৃপদগৌরবে, বংশ গরিমায় ভারেও কাটতাম, ধারেও বটে। চেহারাটা কন্দর্পকান্তি না হলেও মন্দ ছিল না, লেখাপড়াতেও ছিল আগ্রহ, আর চপ কাটলেট্ খাইয়ে, থিয়েটার সিনেমা দেখিয়ে, সর্দ্দারী করে একদল ভক্তও জোগাড় করেছিলাম, যাদের কুষ্টির নামে ঘনঘন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হোত। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রমহলে (হায়রে তখন ছাত্রীরা সংখ্যায় কম আর ওসব কলেজে নৈব চ নৈব চ) একটু স্থান ও মাষ্টার মহলে খাতির জমিয়েছি—এমন সময় একদিন গুঞ্জন হয়ে উঠলো গুঞ্জরণ। পক্ষ বিধূনন করে মফঃস্বল কলেজের বড় ছাড়পত্র হাতে মোটা জলপাণি নিয়ে কে এক সোমনাথ নাকি উদয় হয়েছেন, তার নাকি বহু প্রশংসা করেছেন বিচক্ষণ অধ্যাপকরা, তার একটা লেখাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন করা হচ্চে কলেজ ম্যাগাজিনে, এবারকার কলেজ ডিবেট নাকি তাকে দিয়েই আরম্ভ করানো হবে। মনটা খচ্ করে উঠলো—কে সে অর্বাচীন, বলা নেই কওয়া নেই আমার একলার এলাকায় উড়ে এসে জুড়ে বসলো। বন্ধুরা বললে—যা না, বাজিয়ে দেখ্ না, বৃহৎ মৎস্য না কি, আমরা ত হার মেনেছি—

খুঁজে নিতে দেরী হলোনা, নিরীহ গোছের ভীরু রোগা কালো একটি ছেলে, না আছে কোঁচানো ধুতি, না আছে গিলে করা পাঞ্জাবী, জেল্লাদার জুতো বা নিভাঁজ স্যুট। তার মুখের কথায় খই ফোটেনা, হাতে টেনিস র‍্যাকেট দোলেনা, কালোচুলের ব্যাকব্রাশে ঢেউ খেলেনা।

আমি এগিয়ে গিয়ে পাকড়ালাম তাকে কলেজ লাইব্রেরীতে, মোটা মোটা বইএর মধ্যে ডুবে আছে সে।

বললাম্—আপনার নাম সোমনাথ, আমার নাম আদিনাথ, আপনি থাকেন পশ্চিমে, আমি পূবে, বায়ু বহে পূরবৈয়া, তা এলাম আলাপ করতে, চলুন না চা খেয়ে আসা যাক্—

আমার নিখুঁত স্যুটের দিকে তাকিয়ে সে হেসে বললে—ধন্যবাদ আপনি পশ্চিমের কি পূবের সে মীমাংসা পরে হবে, আর চা-টা আর একদিন হবে এখন্, তাড়া কি?

আমি খোঁচা দিতে ছাড়লুম না—আপনি দেখছি এখনও সেই দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষমাসের যুগে আছেন—আজকের জীবনটা আরো জরুরী, হিমালয়ে গিয়ে নাকে সর্ষে তেল দিয়ে যোগাভ্যাসের সময় নেই, মনু কালিদাসের যুগও গেছে হারিয়ে।

সে বললে—পৃথিবীটা কি শুধু গতিময়, দ্বন্দ্ববিধানময়ও যে—

কথাটা লুফে নিয়ে আমি জবাব দিলাম—আরে সেইজন্যেই ত বলছি—রণং দেহির জন্যে একটু বলসঞ্চয় দরকার—

হেসে উঠলো সে, বললে—পৃথিবীটা যে বাস্তয় সেটারও প্রমাণ দিচ্ছেন আপনি—বলং বলং বাক্যবলং—এতে মাথা ফাটিয়ে না হোক ধরিয়ে দেয়—

আমি বললাম্—সোমনাথের মাথাটা চিরদিনই ফেটেছে বাক্যে নয়, সোজা ডাণ্ডায়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার কলঙ্কের স্বাক্ষর বয়ে আমরা বেড়িয়েছি ঐ বাহুবলেরই অভাবে।

সে একটু গম্ভীর হয়ে বললে—আপনারা শুধু বাইরের মাথা ফাটাটাই দেখলেন, অন্তরের মহিমাটা বুঝলেন না—ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত দেবতাকে কেউ কোনদিন হঠাতে পারবে না—সে এগিয়ে চলেছে, চলবেও, তার পথের শেষ নেই, যাত্রার অন্ত নেই, ধ্যানের সীমা নেই।

কী থেকে কী কথা এসে গেলো—বলতে বলতে তার চোখমুখ যেন বদলে যেতে লাগলো, যেন কোন সুদূরের পাকা রং লেগেছে—সকাল বেলার আলোয় এক ঝলক্ সোনা।

আমি হেসে বললাম—ও সব বড় বড় কথা জানিনে ভাই—তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম এই আর কি—

সোমনাথও হেসে বললে—সেই ভাল, এত আমার সৌভাগ্য এক মিনিটেই তুমি করে আপন করে নিলেন আপনি।

আমার মন চাইলেও মুখ ফুটতো না।

বন্ধুরা শুনে রায় দিলে—এঁচড়ে পাকা, সেকেলে ভূত। টেররিষ্ট নয়ত। শক্তিমান রাজপুরুষদের সঙ্গে পিতৃ-পিতামহদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকায় ছেলেবেলা থেকেই ঐ জীবগুলির প্রতি আমাদের অর্থাৎ খাঁটি কলিকাতাবাসীদের একটা সম্ভ্রম মিশ্রিত ভয় ছিল।

তবু ওর সঙ্গে আলাপটা বেশ আন্তরিকভাবেই জমে গেলো। নেড়েচেড়ে দেখা গেলো, দাঢ্য আছে, বিশ্বাস আছে, নিষ্ঠা আছে, কিন্তু অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ মন। মেয়েদের সম্বন্ধে সহজাত ঔৎসুক্য আছে, কিন্তু বেপরোয়া নয়, রীতির সীমা লঙ্ঘন করেনা, নীতির বাঁধনে মনের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। কতদিন ওর সঙ্গে গিয়েছি বেলুড়ে, দক্ষিণেশ্বরে, জোড়াসাঁকোয়, রামমোহন লাইব্রেরীতে। দেখেছি একসঙ্গে অভিনয়, শুনেছি গান বক্তৃতা। মুক্ত-ধারা দেখে মনে হলো এ যেন অভিজিৎ, রক্তকরবীর রাজা যেন ওরই মধ্যে গোমরাচ্ছে নন্দিনীকে পাবার জন্য। তপতীর শেষ দৃশ্যের চিতার আগুনে ও যেন নিজেই বহ্নিমান হয়ে উঠলো। এম-এ পাশের পর দুজনে পুরী হয়ে কোনারকে বেড়াতে গেছি, মূর্ত্তিগুলো দেখে ও লাফিয়ে উঠলো, বললে—আদি পাথরকে যারা এমন মোলায়েম করে তুলতে পারে তারাই সত্যিকার রসসাধক, তাই তাদের কাছে মিথুন মূর্ত্তিগুলোও জীবন নিষ্ঠার অভিব্যক্তি—

আমি হেসে বললাম্—আদিনাথকে আর আদিরস শেখাবার দরকার নেই বন্ধু, নিজের জীবনে ওটার চর্চ্চা করো—

অন্য বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতো—বাবা, এযে একেবারে কৃষ্ণপ্রেম, বিরতি আহারে, রাঙাবাস পরে। তোর মত সোনার টুকরো ছেলে ঐ খ্যাপার সঙ্গে ঘুরিস কিসের আশায়—

কেউ কেউ টিপ্পনী কাটতো—ও খাঁটি ব্রহ্ম চ্যাঙারী, মিথ্যে তুই ওই পদে মাথা মুড়ালি—ওর নয়নে কাজল নেই তাই সজলনয়নারা ওর কাছ দিয়েও ঘেঁসবেনা, এমন নিরামিষ প্রেমে লাভ কি—

আমি বলতুম—লাভ ক্ষতি খতিয়ে কি আর কেউ প্রেম করে—চলে আয় চাঙ্গোয়ায়—মালপোর সঙ্গে মাটন্ও বেখাপ্পা নয়—

সেই বছরই বিলেত চলে গেলাম—ব্যারিষ্টারী পড়তে। সোমনাথকে ভুলিনি, চিঠিপত্র দিতো না সে। বছর কয়েক পরে একটা নামজাদা বিলাতী জার্নালে ওর লেখার একটা সপ্রশংস সমালোচনা পড়ে মন বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো—সতীর্থদের একজন কীর্ত্তিমান হচ্ছে জেনে আনন্দও হলো। ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরে এলাম—শুনলাম ও তখন বড়-চাকুরী নিয়ে চলে গেছে উত্তরদেশে, লেখে ভাল, বলে ভাল, চিত্তবান বিত্তবান—কিন্তু ঐ সত্যবানের কোন সাবিত্রী তখনও জোটেনি।

কতোবছর পরে হঠাৎ দেখা সেদিন। ছোটনাগপুরের

প্রাগৈতিহাসিক শিলাসনে বসেই এই ভাঙাগড়া কাহিনীর আর এক অধ্যায় সুরু হলো। তালটা তুলেছিল তপনই—পূজোর ছুটীটা কোথায় কাটানো যায়—হিল্লী দিল্লী, কাশ্মীর, শিলং উটী পুরানো হয়ে গেছে—সমুদ্র পারে কথায় কথায় যাঁরা যান—তাঁরা হয় বিশিষ্ট রাজপুরুষ, না হয় লক্ষ্মীর বরপুত্র—আমাদের অর্থনৈতিক সুসামাচার সুবিধের নয়—অতএব প্রাণ ও মান দুইই বাঁচে এমন কিছু সুলভ ব্যবস্থার প্রয়োজন। তপন বললে—কোথায় রাশিয়া, কোথায় আমেরিকা দেশ বিদেশ থেকে লোক আসছে আমাদের প্ল্যান দেখতে, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছে দুর্মুখের দল—আর ঘরের কোণে দামোদর ময়ূরাক্ষী চিত্তরঞ্জনের কাণ্ডখানা আজও আমরা দেখলাম না, কাগজেই পড়ি—বক্তৃতাতেই শুনি—নতুন তীর্থ গড়ে উঠছে।

পরিকল্পনা মাফিক যাত্রা হলো সুরু। গৃহিণীরা শেষ পর্য্যন্ত গৃহকেই আঁকড়ে রইলেন না। আমরা অবশ্য সেকেলে নই যে বলবো—পথে নারী বিবর্জ্জিতা বা পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, অবশ্য যার সঙ্গে সপ্তপদ গমন করে হোমাগ্নিপূত ধোঁয়ায় চোখের জলে নাকের জলে হয়েছি এবং আজও হচ্চি—তিনি যে কসে হাল ধরে বসে আছেন, তরী বানচাল হতে দেননি সে কথাও বলা বাহুল্য।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পিচ-গড়ানো রাস্তা দিয়ে গাড়ী চললো হুহু করে, দামোদরের ধারে ধারে শালপলাশের নীচে নীচে বিদ্যুত কলের পাশে পাশে, চিত্তরঞ্জন সিন্ত্রীর দুধার দিয়ে।

মন খুশী হয়ে বললে—হাঁা, কাজ হচ্চে।

রবি বললে—সত্যিই আলো এলো, দাদা—

আমি বলি—তা আর বলতে—

তপনটা চিরকালেরই খুঁতখুতে, খোঁচা দিলে—সবই ত হচ্চে দাদা, বাড়ীঘর দুয়ার উঠছে, চকচকে, ঝকঝকে, ছিমছাম, বড় বড় ট্রাক্টর চলছে, ক্রেন, ডাম্পার—কিন্তু নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ গড়ে উঠছে কই—

আমি বলি—ওরে হবে রে হবে, একদিনে কি হয়—

তপন বলে—কিন্তু তার লক্ষণই যে দেখা যায় না—এ যেন উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া, নীচে থেকে গড়ে তোলা নয়। প্রদীপ ঘষা হোল, বিরাট্ যন্ত্রদানব এলো, মাথা খাড়া করে দাঁড়ালো, গড়ে উঠলো বিরাট কল-কারখানা বাঁধ, অবাক হয়ে দেখলে সকলে, বললে—বাহবা, কেয়াবাৎ, কিন্তু চাকার ঘর্ঘর শব্দের মাঝে হারিয়ে গেলো ছোটছেলের কান্না, ঐ ভবিষ্যমান মানুষের দীর্ঘশ্বাস—যে পলে পলে হয়ে উঠতে চায়।

আমি বললাম—বিশ্বাস রাখতে হয় ভাই—

তপন বললে—না, দাদা শুধু অনুর্বর রুক্ষ মরুক্ষেত্রই শ্যামশোভায় ঝলমল করবে না, গড়ে উঠবে সন্তুষ্ট সমাহিত কর্ম্মীর দল—আনন্দ উচ্ছল প্রতিষ্ঠান—দুর্দমনীয় নদনদী প্রাকৃতিক বাধাগুলিই বশ্যতা স্বীকার করবে না, মানুষের মনের গলি ঘুঁজি খোঁচ খাঁচগুলোও সমান হয়ে যাবে, তবেই ত সার্থক সৃষ্টি—

আরে তুই যে সোমনাথের চেলা হলি, সে বলতো বিজ্ঞান শুধু আলোই আনবে না, জনসাধারণের মোহ-বিহ্বল মন থেকে মুছে নেবে কুশিক্ষা, ব্যাধি, অনশনের জ্বালা, রসলক্ষ্মী আসবেন অমৃত ভাণ্ড হাতে, তবেই ত দেশ জাগলো।

সোমনাথ কে দাদা?

বলছি—

ইংরাজীতে ঐ যে একটা প্রবাদ আছে যে যদি শয়তানের নাম করো অমনি তিনি হাজির হন সশরীরে। হলোও তাই, যেন কাকতালীয়। কিছুদূর গিয়ে গাড়ীটা তেতে উঠেছে, তাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করানোর উদ্দেশ্যে একটু দাঁড়িয়েছি—এমন সময় দেখি সোমনাথ নামছে আর একটা গাড়ী থেকে—আমার চেয়েও দিব্যি চোস্ত সুটসার্টপরা, ধোপ দুরস্ত। আমাদের দেখে হৈ হৈ করে উঠলো। বললে—বা, বেশ ত, আমি আছি এইদিকে একটা খবর দিতে হয়—

ও যে কাছাকাছি কোথাও থাকে সে কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম বটে আগেকার মস্ত বড়ো কাজ ছেড়ে দিয়ে এদিকে কোথায় একটা গবেষণার কাজ নিয়েছে।

সোমনাথই বললে—তা, আদি তোর অস্তটি কোথায়? দেবতাত্মা হিমালয়ে না হয় তার ছোট ভাই বিন্ধ্যেরই এলাকায় এসে পড়েছিস—সহধর্ম্মিণী না হলে কোন ধর্ম্মকর্ম্ম সহজ হয়!

না ভাই, ওদের মর্ম বোঝাই ভার—ব্যারিষ্টারীর অচলায়তনে এখনও উঠিনি, আয়টা এখনও সচল—

তপনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বললে—জানলেন, বাপ-মা সার্থক নামই রেখেছিল, আমি সোমনাথ যুগে যুগে বর্বরদের হাতে মারই খেলাম।

তপন হেসে বললে—কিন্তু মনে হচ্চে বর্বরেরা আপনার দিকে বিশেষ নজর দেন নি—

আমি হেসে জবাব দিলাম—ওর মালবিকা মালতিকারা মহাকালের মন্দিরে দীপই জ্বালে, সংসার সমুদ্রে দ্বীপ গড়ে তোলেনা—

সোমনাথ চুপ করে রইলো উদাস হয়ে, তারপর বললে—দেখ্, আদি, গভীর অমাবস্যার রাত্রে নিবিড় অন্ধকারের মাঝে একটি প্রদীপ শিখাকে জ্বলতে দেখেছিস্, কি তার রূপ—

কথাটা ঠিক বুঝলাম না, এগুলোও না, হয়ত বা অজান্তে কোন নিভৃত তন্ত্রীতে আঘাত দিয়েছি। ধরে নিয়ে গেলো ও জোর করে, ওর বাসায় তিন দিন আটকে রাখলে—ভোজ আর ভোজ্য, শুধু দৈহিক নয়, মানসিকটাও হলো গুরুপাক্। কতো গল্প, কতো কবিতা, ডন্ ইলিয়ট, রবীন্দ্রনাথ, গ্রীক ট্রাজেডি, অরবিন্দের অতিমানস—কিছুই বাদ গেলোনা—কমউনিজম, অণুপরমাণুর রহস্য, আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য, নীতি, পলিটিক্স সবই ভিড় করে এলো—অদ্ভুত মনীষা, বিচার শক্তি, বলবার ক্ষমতা।—আমরা অবাক্ হয়ে শুনলুম, কিন্তু ওর নিজের জীবনের একটি কথাও বললে না, কইলে না, আভাস দিলে না—বিয়ে করেছে কি করেনি, কোন নারীর সঙ্গে নিজেকে মনে মনে মিলিয়েছে কি না—এমন উপযুক্ত বরের যে বরাঙ্গনা জুটবেনা একথা ভাবতেও মন কেমন করে, তবে কী—

সেই তিনদিনের হুল্লোড়ের পর ওর সঙ্গে আর দেখাই হয়নি। এর পরের গল্প—মিনতির—সে কে, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো সোমনাথের কাহিনীতে সে কথা উহ্য না রেখে বলেই ফেলি। সোমনাথের সঙ্গে ওর পরিচয়টা ঠিক কোন কোঠায় পৌছয় তাও বুঝতে পারিনি, যদিও এটা জানি যে মেয়েরা সব মিলিয়ে একটা জটিল মনস্তত্ত্ব। পাকিস্তান ছেড়ে তাদের একদল গিছলো আসামে আর একদল এসেছিল উত্তরদেশে—বি-এ পাশ-করা মিনতির ছিল চমৎকার গলা। সে যোগ দিলে সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয়ে—গানের মধ্যেই খুঁজতে গেলো জীবনের সুরসুন্দরকে, ফলে জীবিকায় ধরে টান। ছিটকে বেরিয়ে পড়ে সে চাকরীর খোঁজে। এমনি দিনে তার দেখা সোমনাথের সঙ্গে ঐখানকারই এক রসিকরঞ্জন সভায়। গান গাইবার ডাক পড়েছিল মিনতির। সে গেয়েছিল প্রীতমপ্রিয় রামচন্দ্রের গান—নবজলধর ঘনশ্যাম বলেছেন—শবরী বসে আছে প্রতীক্ষায় অপেক্ষমানা—যৌবনবতী হচ্চে জরতী। সে গেয়েছিলো—

“আঁখিতে প্রেমের আলো, সবারে বাসিয়া ভালো
যে তুমি চেতনা জ্বালো, বেদনায় বসুধার
সে তোমারে করি বন্ধু নমস্কার

সোমনাথ যে কখন সেই সভায় গিয়েছিল তা কেউ জানে না কিন্তু একথা সত্যি তার দরদী মন অদ্ভুত ভাবে অভিভূত হয়েছিল। ভাবলে যাবার সময় আলাপ করে নেবে, কিন্তু হলের বাইরে এসেই সে হয়ে গেলো নির্বিকার—পদস্থ লোকেদের সঙ্গে কথা কইতে কইতেই বেরিয়ে গেলো।

শিক্ষানবিশীদের নিয়ে মস্ত বড় ক্লাস বসে। মাঝে মাঝে সোমনাথ তাদের ডাকে, উপদেশ দেয়, বুঝিয়ে দেয় জটিল তথ্যগুলি। হঠাৎ একদিন চোখে পড়লো মিনতিকে, ডেকে বললে—আপনিই না সেদিন গান গেয়েছিলেন—

মিনতি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সোমনাথ একটু উত্তেজিত হয়ে বললে—আপনাকে এ চাকরী দিলে কে, যার যা কাজ—গান, গানের চর্চা করুন গে, সেতার তানপুরায় তান তুলুন গে—

মিনতি সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলেছিল—কিন্তু আজকের যুগে ত আর—জীব দিয়েছেন যিনি আহার জোগাবেন তিনি—বলে চুপ করে বসে থাকা যায় না, একটা কিছু করতেই হয়—

এই সূত্রেই অল্প স্বল্প আলাপ, সামান্য একটু পরিচয়। সোমনাথ একদিন তাকে ডেকে বললে—যাচ্চি চলে এখান থেকে—

মিনতি ভাঙা গলায় বলে—সে কী আমরা ত শুনিনি কেউ—

সোমনাথ. বললে—অনেক জিনিষই শোনা যায় না কানে, বলা যায় না মুখে, মন দিয়েই জানতে হয়, বুঝতে হয়, পেতে হয়—

মিনতি অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করে—বাবা বলছিলেন, যাবার আগে আমাদের ওখানে একদিন আসবেন না—

সোমনাথ জবাব দিলে—তাড়া কী, আচ্ছা দেখা যাবে।

তাগাদা দেয় মিনতি, সোমনাথ এড়িয়ে যায়। যাবার আগের দিন মিনতি বললে—এত করে বললুম, তবু এলেন না, আপনি সত্যিই নির্মম—

সোমনাথ বলেছিল—আপনার নিমন্ত্রণ আমার চিরকালের আমন্ত্রণ হয়েই থাক্ না—হয়ত ওরই আশায় একদিন ফিরে আসবো—

চোখে জল এসেছিল মিনতির। পায়ের ধূলো নিতে গিয়েছিল।

সোমনাথ বাধা দিয়ে বলেছিল—প্রণামের যোগ্য হই আগে, তার পরে প্রণাম নেবো।

আমি কল্পনা করছি সোমনাথ কিন্তু সেদিন মনে মনে বলেছিল—ঐ দুফোঁটা চোখের জলই আমার অমূল্য সম্পদ হয়ে রইলো—এই পাওয়াই মানুষের সব চেয়ে বড় পাওয়া।

কিছুদিন দুপক্ষে সামান্য চিঠি লেখা চললো—তার সুর ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত হয়ে এলো। মিনতি ভাইফোঁটার প্রণাম জানায়, নববর্ষের আশীর্ব্বাদ পায়, বিজয়ার শুভেচ্ছা নেয়, লেখে—এখনও কি আপনার অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচলো না, ছোট বোনের মত বয়সী মেয়েকেও তুমি লিখতে ভয় করে—আমি কিন্তু সেদিন স্বপ্ন দেখছি। আপনি ফিরে এসেছেন—

সোমনাথ জবাবই দিলে না। অভিমান করে মিনতি, ক্ষুব্ধ হয়, ভাবে, সত্যিই ত, কদিনেরই বা আলাপ, কতটুকুই বা জানাশোনা। সোমনাথ ভাবে—মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়, ত্যাগে, শ্রদ্ধায়, আন্তরিকতায়, যতক্ষণ না বাইরের কপাট বন্ধ হয়, ততক্ষণ ত ভিতরের মূল্য নির্দ্ধারণ হয় না—অশোধিত মনের মানদণ্ডে সবই যে ঝুটা হায়।

এরি মধ্যে শুনতে পেলে সে, মিনতি নাকি চাকরী ছেড়ে দিয়ে আবার গান নিয়ে পড়েছে, শিখছে ও শেখাচ্চে। মনে মনে আশীর্ব্বাদ জানালে—যে এই সুর তানের প্রয়োগেই তার সিদ্ধি হোক্, ফুটে উঠুক শুচিশুভ্র শান্ত পরিবেশে একটি নীড়।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, হঠাৎ কি একটা কাজে ঐ সহরে এলো সোমনাথ। কী ভেবে মেয়েদের হষ্টেলে গিয়ে খবর নিলে মিনতি আছে কিনা, শুনলে সে নাকি অত্যন্ত অসুস্থা, হাসপাতালে আছে। সেখানে গিয়ে খবর নিলে, মিনতি বহুদিনই ভুগচে নানা রোগে, ব্যাধির চেয়ে আধি হয়েছে বড়, সম্প্রতি হয়েছে একটা শক্ত অপারেশন—তাজা রক্ত দিতে হবে, দামী ইনজেকশনের ব্যবস্থা—ব্লাড প্ল্যাসম্ চাই। গরীবের ঘরের মেয়ে—বাপ দাদা নেই, সামান্য আয়—তাও ছোট ভাই বোন মায়ের সাহায্যে যায়—সবাই মিলে চাঁদা তুলে, স্কুল থেকে কিছু ধার দিয়ে খরচটা চালানো হচ্চে, কিন্তু নিত্য নূতন উপসর্গে সেও সামান্য। সোমনাথ কি বুঝলো জানি না কিন্তু উঠলো তখনি। নিজের গায়ের রক্ত দিয়ে আর মোটা টাকার চেক লিখে দিয়ে চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে দিলে; কিন্তু নিজে সামনে এসে দেখা দিলে না। অপেক্ষাকৃত সুস্থ হবার পর তার চেঞ্জে যাবার ব্যবস্থা করে সে চলে গেলো ওখান থেকে।

একটু ভাল হয়ে মিনতি একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল মণিকাদিকে—তার চিকিৎসার এতো রাজকীয় ব্যবস্থা কি রকম করে হলো। পিউরিট্যান অধ্যক্ষা মণিকাদি জবাব দেন নি, এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সোমনাথের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, শুধু তাকে বলেছিলেন—দেখুন লম্পটের লাম্পট্যকে বরং বরদাস্ত করা যায় কিন্তু আপনাদের মহত্ব অসহনীয়—

তবু এমন যে মণিকাদি—পুরুষের নাম করতে যিনি ঝাঁটা ধরেন তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে সোমনাথ ঠিক তার জানাশোনা পুরুষগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে না।

আস্তে আস্তে মিনতি জেনে ফেলে সোমনাথের কথা, বলে—জানলে মণিকাদি—আজ ওর রক্ত মিশেছে আমার ধমনীতে। মুঘলযুগে শুনেছি রাখীবন্ধ ভাই হোত—এ কীসের বাঁধন জানি না কিন্তু এ ঋণ শুধবো কিসে?

মণিকাদি আস্তে আস্তে বলেন—এ ঋণের কি শোধ হয়—যতই দেওয়া যায় ততই যায় বেড়ে। ওকে ধরতে গেলে ধরা দিতে হয়—

মিনতি বল্লে—না মণিকাদি, ধরা না দিয়েও পাওয়া যায়—কদিন পরে সোমনাথের এক চিঠি আসে—

কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন পরে তোমায় চিঠি দিচ্ছি, আশা করি এতদিনে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছো। আজ আমার মন নিশ্চিন্ত, তুমি আপনির দ্বন্দ্ব হয়েছে লুপ্ত। আমি আজ চলেছি, চাকরী ছেড়ে দিয়েছি, হিমগিরির কোণে কোণে আমার পথ বিস্তৃত নয়, ত্র্যম্বকের পুঞ্জীভূত মহিমা ওখানে নেই, আমি চলেছি জনপদের মধ্য দিয়ে—যেখানে ক্ষুধিত মানুষ, ব্যথিত দেবতা বসে থাকে একমুষ্টি অন্নের আশায়—আমি আজ অন্নপূর্ণার পূজারী, তাঁকে ডাকছি—বলছি—ষড়ৈশ্চর্য্যময়ী হয়ে নেমে এসো মা সকলের মাঝখানে—আমার দেবতা আজ পথিক মানুষের রূপ নিয়েছে—তারই চরণ শব্দ বরণ করে চলবো—কোথায় গিয়ে পৌছবো তা জানি না—কোন সার্থকতার তীরে, কোন মানস সরসের পাশে—আমার কাছে চলাই সত্য। যে সাধক মুক্তির দিশারী, যে বাউল একতারা বাজায়, যে রসিক সাহিত্যে কলায় মাতে—সেও যেমন একটা উন্মাদনার বশেই চলে আমিও হয়ত তেমনি চলেছি। হয়ত একদিন স্বপ্ন ভেঙে যাবে—তা যাক্। কিন্তু আমি গৈরিক পরিনি, সৈনিক সন্ন্যাসী নই, নিরঞ্জন ধ্রুবকে পাবার আশায় পূর্ব্বাস্য হয়ে পদ্মাসনে বসিনি। আমি নেমেছি সকলের সঙ্গে কাঁধে জোয়াল দিয়ে কাজ করবার জন্য—সমাজায় ইদম্। শুধু খেয়ে পরে বাঁচাটাই বড় নয়—শস্যশ্যামল আলো ঝলমল ধরিত্রী ভরে উঠবে প্রেমে গানে সুরে বিজ্ঞানের শক্তিতে, জ্ঞানের তপস্যায়, তবেই ত মানুষ হবে সার্থক। সেই মানুষের কানেই তুমি তোমার গান শোনাও; আমি আমার কোদাল ধরি, বিজ্ঞানী ট্র্যাক্টর চালাক, বিদ্যুতের শক্তি আনুক, কবি আনুক তার কথা, শিল্পী তুলুক মূর্চ্ছনা।

একটা কথা বলে রাখি—কারণ সংসারের কোলাহলে আমি আর ফিরবো কিনা জানি না—আমি অনামী হয়েই সামান্য ভাবে কাজ করে যাবো সবাইএর সঙ্গে এই আমার পণ। প্রথম দিন থেকেই তোমায় আমার ভালো লেগেছিল—তোমার মধ্যে দেখেছিলাম সর্ব্বনাশের সুর নয়, গভীরতার ছন্দ—পাছে সেটা আবিলতায় নষ্ট হয় তাই সে সত্যটাকে জোর গলায় জাহির করিনি—হয়ত ভুল করেছি, হয়ত ভুল করিনি—কারণ নারী আর পুরুষ, তাদের সম্পর্ক মানে লোকে বোঝে কানাকড়ি নিয়ে এক চাল খেলা। তা হয়ত নয়, তবু এর মধ্যে মোহকে রঙীন করে ধরে তোলবার একটা আকর্ষণ আছে। তাকেই সাধারণ লোকে রসিয়ে রাঙিয়ে জরিয়ে বলে ভালবাসা। এটা যে অন্যায়, এটা যে নিন্দনীয় একথা বলবো না, বরং বলবো এর মধ্যে যে জীবননিষ্ঠ সত্যটি আছে, তাকে আমরা বারে বারে বৈরাগ্যের বুলি আউড়িয়ে অপমান করেছি। এই আসক্তির মাঝেই আছে প্রাণের লীলা, তার নবরূপায়নের সঙ্কেত, তার বহু হবার চেষ্টা। কিন্তু নিষ্ঠা না থাকলে এই জিনিষটা কত ঠুনকো তা যারা চালাক তারাই জানে। কিন্তু হয়ত লোকে বুঝবে না বলবে, যার মনে প্যাশন নেই, যে যৌবনধন্য জীবনের কামনাকে আহ্বান করতে জানে না, সে ত কাপুরুষ, দুর্ব্বল, ভণ্ড। হয়তো সে অভিযোগ সত্যি, কিন্তু আর একদিক থেকে সে যে ভরে উঠতে পারে, তার চাইবার কিছু না থাকতে পারে, দেবারও হয়ত কিছু নেই—এ কথাটাও সমান সত্যি যে। অমিট্রায়ের মত হে বন্ধু বিদায় বলে চলে যাবার যার ক্ষমতা আছে সেই একদিন চুপি চুপি ফিরে আসতে পারে অনাহূতের মত গভীর নৈঃশব্দের মাঝে। সেদিন যেন বাতায়নে একটি প্রদীপ জ্বলে—সিংহদ্বার হোক না বন্ধ—কামনার তপ্ত লাভায় গলিত লাঞ্ছিত শত শত তীব্র আলো সেদিন নাই বা জ্বললো। কল্যাণ হোক্ এই আশীর্ব্বাদই করি, কিন্তু কার কল্যাণ কোন পথে তার নিশানা দিতে পারবো না, প্রত্যেককে নিজের তপস্যায় নিজের মতো জেনে নিতে হয়—এই তার স্বধর্ম্ম।"

ঝর ঝর করে কেঁদেছিল মিনতি।

সেদিন মণিকাদিরও চোখের জলের বাধা ছিল না।

সবাই বললে—তার পর—

আমি বললাম—গল্পের এই ত ইতি। নটেগাছটি মুড়ুলো—

বন্ধুদের সাড়ম্বরে অভিমত হলো—এটা গল্পই নয়, একটা অবাস্তব মানস পরিচয়—

হেসে আমি জবাব দিলাম—গল্প মাত্রেই গল্প, আর নারী মাত্রেই অর্দ্ধেক কল্পনা—

হয় ত তাই—হুঙ্কার দিলেন গৃহিণী—আষাঢ়ে মানুষই আষাঢ়ে গল্প করে—

আমি বললাম—দেবী, সভয়ে নিবেদন করি যে আমার জন্ম মার্গশীর্ষমাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে—তাহলে তোমায় খেতাব দেওয়া হোক—উন্মার্গ বিশারদ, উদ্ভটসাগর —আর তোমার বন্ধুর জন্য খাঁটি সর্ষপ তৈল সংযোগে বিশুদ্ধ কর্ণমর্দনের ব্যবস্থা—

কিন্তু আমি যদি এই গল্পের একটা ছোট এপিলোগ জুড়েদি—গৃহিণী উত্তেজিত হয়ে বললেন—কী, তাকেও পাঠিয়ে দেবে ত ভৈরবী হতে, না পথে নেমে কাজে জুটে যেতে—না কিছুতেই না—কি সুখে ঐ শান্ত নিরপরাধ মেয়েরা পাষণ্ড পুরুষগুলোর পিছনে ঘুরবে—এত কাঁদিয়েও তোমাদের আশ মেটে না—কেবল বড় বড় কথা—মেয়েরা অতো খেলো নয়, সস্তা নয় যে কেবল ভারের ঘরে বিকুবে। আমি হলে ওকে যার সঙ্গে হোক বিয়ে দিয়ে দিতুম—কেন সে বঞ্চিতা, ক্ষুব্ধা হয়ে বাস করবে, কেন সে হবে না রক্তমাংসের প্রিয়া, গৃহিণী হ্লাদিনী, জননী, ধাত্রী, মা—

সাফল্যের পথ

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়নাথ কুণ্ডু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান যখন ব্রহ্মদেশ দখল করে তখন বিদেশী শাসকবর্গের পোড়ামাটী-নীতি ও আমাদেরই স্বদেশবাসী স্বার্থান্ধ ব্যবসায়িগণের অর্থ লোলুপতার ফলে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ বাঙ্গলা দেশে উপস্থিত হয় তাহাতে চল্লিশ লক্ষ বাঙ্গালী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও বাঙ্গালীর সামাজিক ভিত্তি কাঁপিয়া ওঠে। তাহার পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের বৃহত্তম অংশের স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজনে পাকিস্থানের সৃষ্টির নিমিত্ত বাঙ্গলা যখন বিভক্ত হইল, তখন লক্ষ লক্ষ গৃহহারা পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুর আগমনে পশ্চিমবাঙ্গলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু হইয়া পড়িল।

এই দুইটী ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে বাঙ্গালী-সমাজ সামগ্রিক ভাবে আজ গুরুতর সংকটের মধ্যে অবস্থিত। নৈরাশ্য, দুঃস্থিতি ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা অমানিশার ঘোর অন্ধকারের ন্যায় বাঙ্গালী-সমাজের চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ভারতীয় জাতীয়ত্বের জন্মদাতা বাঙ্গালীর হৃদয় আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ ও রক্তাক্ত। কর্ম-প্রেরণার অভাবে আজ সে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ঘনান্ধকারে বাঙ্গালী আজ বৃথাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে তাহার সাফল্যের ও সমৃদ্ধির পথ। সে এমন নেতার সাক্ষাৎ পাইতেছে না যিনি তাহাকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বলিতে পারেন,

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

বাঙ্গালীর এই ঘোর দুর্দিনে সাহায্য করিতে পারে শুধু মনোবিজ্ঞানের একটী মৌলিক তত্ত্ব। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে এই তত্ত্ব প্রথমে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বিশ্ববিখ্যাত অ্যালড্ কার্নেগী। ইঁহারই অনুপ্রেরণায় ও ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বিদ্‌গণের অক্লান্ত গবেষণায় মনোবিজ্ঞানের এই শাখা আজ বিশেষভাবে উন্নত।

এই তত্ত্ব মনুষ্য জাতিকে নানাবিধ জীবন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে। ইহা এমন প্রণালী প্রণয়ন করিয়াছে যাহার দ্বারা প্রত্যেকটী দুর্বিপাক ত্রুটি-বিচ্যুতি, বিচার বিভ্রাট, অসাফল্য ও নিরাশাকে অমূল্য সম্পদে রূপায়িত করা যায়। ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসূত চারিত্রিক অপূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করিয়া ইহা মানুষকে তাহার হৃদয়াবেগ ও চিন্তাধারাকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে সাহায্য করে যাহাতে সে প্রভূত কার্য-পারকতার অধিকারী হয়।

জীবন সাফল্যের এই মূল তত্ত্ব ষোলটী প্রধান সূত্রের সমষ্টি—এবং এই সূত্রসমূহের আলোচনাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এই তত্ত্বের আলোচনার প্রারম্ভের পূর্বে সাফল্য লাভের পক্ষে অপরিহার্য একটী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানুষের ভৌতিক দেহে সাধারণতঃ দুইটী বিপরীত ধর্মী ব্যক্তিত্ব (Personality) পাশাপাশি বাস করে। তাহাদিগকে "অস্তিধর্মী" (Positive) ও "নাস্তিধর্মী" (Negative) ব্যক্তিত্ব বলা যাইতে পারে, সাধারণতঃ ইহাদিগকে সুমতি ও-কুমতি নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহারা প্রতিনিয়ত পরস্পরের সহিত বিবদমান। সুমতির প্রভাবে মানুষ চিন্তা করে তাহার ঐশ্বর্য, অটুট স্বাস্থ্য, ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও গৌরব-প্রাপ্তির বিষয়েই এবং উপযুক্ত সময়ে যথোপযোগী কার্য করিয়া অবশেষে সে ঐ সমস্তই লাভ করে। আর কুমতির প্রভাবে মানুষ চিন্তা করে, কার্য করে এবং প্রকৃতই বাস করে দারিদ্র্য, আশঙ্কা, সন্দেহ ও স্বাস্থ্যভগ্ন-স্বাস্থ্যের পরিবেশের মধ্যে। ইহার প্রভাবে সে তাহার সকল কার্যেই

প্রকৃত কার্য তার আশঙ্কা করে এবং কদাচিৎই তাহাতে নিরাশ হয়; যে প্রকার জীবনাবস্থা সে আকাঙ্ক্ষা করে না সেই প্রকার অবস্থার বিষয়ই সে সর্বদা চিন্তা করে এবং দারিদ্র্য, উদ্বেগ, লোভ কুসংস্কার ও স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি কষ্টদায়ক অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। ইহারা উভয়েই প্রকৃত পক্ষে সম্ভাবান, কাল্পনিক নহে। ইহাদের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যক্ত হইয়াছে। জীবনে প্রকৃত সাফল্য লাভ করিতে হইলে কুমতিকে মন হইতে নির্মূল করিয়া উহা সর্বদা সুমতির দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের ষোলটী সূত্র এই দুষ্কর কার্য সাধনের একমাত্র সহায়। পৃথিবীতে সামান্য অবস্থা হইতে যাঁহারা উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জীবনের প্রথম হইতেই এই তত্ত্বের একাধিক সূত্রের সাহায্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদ সমূহে এই পরমহিতকর সূত্রগুলির পৃথকভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিবার পূর্বে পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য নিম্নে ইহাদের পরিসংগ্রহ দেওয়া হইল।

১। একটী সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য

বিক্ষিপ্ত ও অপ্রয়োজনীয় কার্যে বৃথা সময় নষ্ট ও ক্ষমতার অপব্যয়ের হস্ত হইতে ইহা মানুষকে রক্ষা করে। উদ্দেশ্য বিহীনভাবে জীবন স্রোতে গা ভাসাইতে না দিয়া স্থির লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ইহা মানুষকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করে।

২। আত্মপ্রত্যয়

দারিদ্র্য, বিরুদ্ধ সমালোচনা, স্বাস্থ্যহীনতা, প্রিয়জনের ভালবাসা হারান, বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যুকে মানুষ প্রধানতঃ ভয় করে। আত্মপ্রত্যয় লাভ করিতে হইলে মানুষকেই এই ছয় প্রকার মুখ্য ভয়কেই জয় করিতে হয়। দ্বিতীয় সূত্র এই বিষয়েই মানুষকে শিক্ষাদান করে।

৩। অতি-মন

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মনোবৃত্তিকে স্বাতন্ত্র্যবর্জিত ও স্বার্থহীন ভাবে কোন নির্দিষ্ট সংকল্প সিদ্ধির উদ্দেশ্যে একত্রে সংমিশ্রণ করিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে অতি-মন বলে। নিজস্ব ত্রুটী বিচ্যুতি ও অপূর্ণতাকে দূর করিয়া অসীম কার্যক্ষমতার অধিকারী হইতে ইহা মানুষকে সাহায্য করে।

৪। মিতব্যয়িতার অভ্যাস

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিমিত ভাবে ব্যয় করিয়া নিজস্ব আয়ের একটী সুনির্দিষ্ট অংশকে সঞ্চয় করিতে ইহা মানুষকে শিক্ষা দেয়, কারণ ক্রমবর্দ্ধমান সঞ্চিত অর্থই পরিশেষে ব্যক্তিগত ক্ষমতার ভিত্তিস্বরূপ হয়।

৫। অনির্দিষ্ট কার্যোপক্রম ও নেতৃত্ব

কর্মক্ষেত্রে অনুগামী না হইয়া কি প্রকারে নায়ক হইতে পারা যায় এই সূত্রে তাহাই মানবজাতিকে শিক্ষা দেয়। ইহা মনুষ্য হৃদয়ে নেতৃত্বের এমন সহজ প্রেরণা (instinct) জাগরিত করে যাহার দ্বারা সে উন্নতি ও গৌরবের শীর্ষ স্থানে আরোহণ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়।

৬। অনুমান শক্তি

নূতন নূতন ভাবধারায় মনকে উদ্দীপিত করিয়া প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল কর্ম পদ্ধতি সমূহের পরিকল্পনায় মানবকে ইহা সাহায্য করে। ইহার দ্বারা পুরাতন ভাবধারাকে নূতন ভাবধারায় রূপান্তরিত করা যায় এবং ইহারই সাহায্যে পুরাতন ভাবধারাকে নূতন ভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হয়!

৭। উদ্দীপনা

সহযোগী ও অনুগামীদের হৃদয়ে স্বকীয় ভাবধারা ও কর্মধারার প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ জন্মাইতে ইহা মানুষকে সাহায্য করে। সহযোগিতা প্রাপ্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক, মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণক্ষম (Attractive) ব্যক্তিত্বের ইহা ভিত্তি স্বরূপ।

৮। আত্মসংযম

উদ্দীপনাকে সংযত করিয়া তাহাকে ইচ্ছামত পরিচালনা করার ইহাই একমাত্র নিয়ন্ত্রণচক্র। কার্যকর উপায়ে ইহা মানুষকে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে শিক্ষা দেয়। আত্মোন্নতির পক্ষে ইহা সোপান স্বরূপ।

৯। পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কার্যানুষ্ঠানের অভ্যাস

ইহা ক্রমবর্ধমান লভ্য সূত্রের (Law of Increasing Return) সুবিধা পাইতে শিক্ষা দেয়। ইহারই সাহায্যে মানুষ অবশেষে নিজস্ব পারিশ্রমিক হইতে বহুগুণ অধিক প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। এই সূত্রের সাহায্য ব্যতীত কোনরূপ কর্মক্ষেত্রেই সাধারণ অবস্থা হইতে কেহই নেতৃস্থানীয় হইতে পারে না।

১০। মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণক্ষম ব্যক্তিত্ব

ইহা মানুষের কর্মোদ্যমে লিভারের (Lever) ন্যায় কার্য করে। ইহার সাহায্যে কর্মক্ষেত্রের পর্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্ন সমূহকে অনায়াসে অপসারিত করা যায়। ইহা দ্বারা অনায়াসে অন্যের সহযোগিতা লাভ ও অল্পসময়ে নেতৃত্ব সৃষ্টি সম্ভবপর।

১১। যথাযথ চিন্তা

দীর্ঘস্থায়ী সাফল্যের ইহা ভিত্তিপ্রস্তর বিশেষ। ইহার দ্বারা সাধারণ সংবাদ (Information) হইতে যথাযথ ঘটনাকে (Fact) পৃথক করা যায়। ঘটনা সমূহকে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে ইহা মানুষকে শিক্ষা দেয়। ইহার সাহায্যে প্রয়োজনীয় ঘটনা সমূহ হইতে নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যায়।

১২। একাগ্রতা

পারদর্শিতা লাভ না করা পর্যন্ত এক সময়ে একই বিষয়ে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিতে ইহা শিক্ষা দেয়। অপরকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের অভিজ্ঞতাকে স্বীয় কার্যে প্রয়োগ করিতে ইহা সাহায্য করে। ইহারই প্রভাবে সহজলভ্য শক্তি সমূহের ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়া তাহাদিগকে নিজস্ব অভিষ্টসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করা যায়।

১৩। সহযোগিতা

অতি-মন সূত্রের প্রয়োগে সকল বিষয়ে দলবদ্ধ হইয়া কার্য করার (Team work) মূল্য ইহা শিক্ষা দেয়। হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মনোমালিন্যকে অপসারিত করিয়া স্বকীয় কর্ম প্রচেষ্টার সহিত অপরের কর্ম প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করিতে (Co-ordinate) ইহা সাহায্য করে। স্বীয় কর্মে পৃথিবীর শক্তিত জ্ঞানরাশির প্রয়োগও ইহা সুলভ করিয়াছে।

১৪। প্রকৃত কার্যতার উপকারিতা

নিজস্ব ও অপরের বিগত ত্রুটী বিচ্যুতি ও অকৃত কার্যতাকে কি ভাবে উন্নতিলাভের উপায় স্বরূপ ব্যবহার করা যায় ইহা তাহাই শিক্ষা দেয়। সাময়িক অকৃতকার্যতা ও চিরস্থায়ী পরাভবের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ইহার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

১৫। সহিষ্ণুতা

ইহার দ্বারা সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় কুসংস্কারের সর্বনাশকর পরিণামকে পরিহার করা যায়। পরমত সহিষ্ণুতা যুক্তি ও তথ্যানুসন্ধানের পথ উন্মুক্ত রাখে এবং ইহারই অভাবে যাহারা পরম বন্ধুতে পরিণত হইতে পারিত তাহারা পরম শত্রুতে রূপান্তরিত হয়। ইহার অভাবেই ভারত আজ দ্বিধা বিভক্ত।

১৬। সুবর্ণময় নীতি

অপরের নিকট হইতে যেরূপ আচার ব্যবহার আশা করা যায় তাহার বা তাহাদের প্রতি সেইরূপ আচরণ করার নামই সুবর্ণময় নীতি। অসীম প্রভাব সম্পন্ন এই বিশ্বজনীন নীতির সাহায্যে কোন ব্যক্তিবিশেষের কিংবা সংঘ বিশেষের ঐক্যপূর্ণ সহযোগিতা অনায়াসে লাভ কর' যায়। এই নীতি-জ্ঞানের সম্যক উপলব্ধির অভাবই বানব জীবনে অসাফল্য আনয়নের মুখ্য কারণ।

এই প্রস্তাবনা শেষ করিবার পূর্বে একটী বিষয়ের উল্লেখ করার প্রয়োজন। প্রত্যেক জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা কোন স্থির লক্ষ্যে পৌছিবার শুধু উপায় মাত্র এবং যে জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা মনস্তত্বীয় ও নৈতিক উপদেশ সমূহের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে সে জাতির কোন ভবিষ্যৎ নাই। সে জাতির প্রতিষ্ঠা বালির উপরে নির্মিত প্রাসাদের সঙ্গে তুলনীয়, আপাতদৃষ্টিতে তাহা যতই বিশাল ও গুরুত্ব বিশিষ্ট মনে হয় তাহার ধ্বংস ততই অনিবার্য। সুতরাং জাতীয় উন্নতির পথে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের পরম মঙ্গলকর এই সূত্র সমূহের স্থান বড়ই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার সার

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ভক্ত-সখা অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনে চরিতার্থ করলেন শ্রীগভবান। শেষ উপদেশ দিলেন—

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।

এ শ্লোকটি সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেছেন—এটি নিঃশ্রেয়স অনুষ্ঠানে সমস্ত গীতা-শাস্ত্রের সারভূত অর্থ। শ্রীধরস্বামী এ শ্লোককে বলেছেন, সর্ব্বশাস্ত্রার্থসার পরম রহস্য।

সত্যই তো মুমুক্ষুর অনুষ্ঠানের সকল তত্ত্বের সার এই শ্লোকের কয়েকটি শব্দে নিহিত। মৎকর্ম্মকৃত—আমার অর্থে কর্ম্ম যিনি করেন তিনি মৎকর্ম্মকৃৎ। মৎপরম—আমি যাঁর পরম পুরুষ তিনি মৎপরম। আমি যাঁর পরমগতি তিনিই মৎপরম। মদ্ভক্ত—যে লোক আমাকে সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্বাত্ম এবং সর্ব্বোৎসাহে ভজনা করেন। সঙ্গবর্জ্জিত ধন-মিত্র-পুত্র-কলত্র-বন্ধুবর্গের প্রীতি ও স্নেহের আসক্তি পরিত্যাগী। বৈরীবিহীন ব্যক্তি নির্ব্বৈর। কিন্তু সে বৈরী-ভাব দমন প্রয়োজন সর্ব্বভূত সম্বন্ধে। তাঁর কর্ম্মকৃৎ তাঁকে পরমার্থ বোধী, তাঁর অনন্য ভক্তিযোগে ভক্ত, সঙ্গ বর্জ্জিত এবং কোনো সৃষ্টজীবে যাঁর শত্রুতা নাই, তিনিই ভগবানকে লাভ করেন।

বলা বাহুল্য শ্লোকে বর্ণিত সকল গুণগুলি একাধারে লাভ করা আবশ্যক। একটির অভাব হলে জীবন-স্রোত একমুখ হবে না, নিষ্ফল হবে গতি।

এ শিক্ষা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার বিশেষ শিক্ষার পর। তিনি বুঝিয়েছেন আত্মা অবিনশ্বর। এ জীবনটা সারা-জীবনের মাঝের একটি ব্যক্ত অধ্যায় মাত্র। জীবন-ধারণ অসম্ভব কর্ম্ম ব্যতিরেকে। কর্ম্মের ফলাফলে আসক্ত হয়েই জীবন নব নব কর্ম্মস্রোতে ভাসে। কামনা-পুষ্ট কর্ম্ম-

স্রোতের পরিণাম অতিক্রম সম্ভব নিষ্কাম কর্ম্মে। জ্ঞান প্রয়োজন—জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে গেলে। সে জ্ঞান শুধু জ্ঞান নয়—পরমার্থ অনুসন্ধানের চেতনা। তাকে মাধুরী দান করবে ভক্তি—সার্থক করবে কর্ম্ম ও জ্ঞানকে পরাভক্তি, আত্ম-নিবেদন, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র আমিত্বকে অব্যয়, অনন্ত চেতনায় সমর্পণ। যোগ তার উপায়। সৃষ্টির তিনি আদি, সৃষ্টি মাঝে সর্ব্বত্র বিদ্যমান স্রষ্টা। সূত্রে গাঁথা মণির মতো সকল পদার্থই শ্রীভগবানে অবস্থিত। সর্ব্বভূতে তাঁর আবেশ। তাঁর বিভূতির তো অন্ত নাই। অধিক জানবার প্রয়োজন নাই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাত্র তাঁর একাংশে অবস্থিত।

এই সব উপদেশ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য দান করলেন। সুতরাং আমার কর্ম্ম, আমাকে পরম বোধ, আমার ভক্ত প্রভৃতি শব্দে সূচিত তাঁর সেই বিশ্ব-ব্যাপক অখণ্ড, অব্যয়, অনন্ত চেতনা। সর্ব্বভূতাশয় তিনি—সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর না হলে তাঁকে লাভ করবার আশা বাতুলতা।

এই সারতত্ত্বের নির্দ্দেশ স্পষ্ট। কিন্তু প্রত্যেক শব্দটির সাথে মেশানো আছে বহুভাব। সারা গীতা-শাস্ত্রে শ্রীভগবান বিভিন্ন প্রসঙ্গে, নানা পর্য্যায়ে যে সব উপদেশ দিয়েছেন, তাদের অনুশীলন করলে তাঁর বাণীর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা হবে সহজসাধ্য।

কর্ম্ম এবং জ্ঞানকে শুদ্ধ করে ভক্তি। সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য ভগবানের সৃষ্টিধারার শুদ্ধতা অব্যাহত রাখা। প্রকৃত জ্ঞান এই লীলা-তরঙ্গের উৎসমুখের অনুসন্ধান। সেই তত্ত্ববোধে বিবেক-বুদ্ধি নির্ধারণ করবে কোন্ কর্ম্ম বৈধ, কোন্ কর্ম্ম অবৈধ ও অনিষ্টকর অনন্ত জীবনের যাত্রাপথে। কর্ম্ম শেষ হলে গীতের রেশের মত, তার বোধ ঘোরে চিত্তে, তার ফল থাকে কর্ম্মধারায়। কর্ম্ম মনকে আবিষ্ট করে, তার ফল হাঁসায় কাঁদায় নাচায় ঘোরায় মানুষকে। কিন্তু প্রতি কলাকাষ্ঠার কর্ম্ম পরিণত হয় নতুন কর্ম্ম প্রবৃত্তিতে। তাই কর্ম্মফলে অনাসক্তির উপদেশ।

মনের পটে পরমেশ্বরে ভক্তি থাকলে, জ্ঞান হয় বিশুদ্ধ এবং একমুখ। সহজ বিবেক-বুদ্ধি ভক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে কোন্ কর্ম্ম ঈশ্বর-গ্রাহ্য ও অগ্রগতির সহায়ক সে ধারণা সমুজ্জল করে মনের পট। যার ফলে জ্ঞান হয় উদ্দীপিত, কর্ম্ম হয় সুচারু। সুষ্ঠু কর্ম্ম, প্রজ্ঞা এবং ভক্তি—এ তিনের সংযোগে মানুষের প্রকৃত উন্নতি ও অগ্রগমন অনিবার্য্য।

স্থূলভাবেও যদি মৎকর্ম্মকৃৎ শিক্ষার অন্তর্নিহিত ভাব গ্রহণ করি, তা হলেও এর মধ্যে যে নীতি বিদ্যমান তার অনুশীলনে মনুষ্য-চরিত্র হতে পারে সুমহান। যে কর্ম্ম করি, সে কর্ম্ম সেই প্রভুর, এ কথা সদা মনের পটে বিদ্যমান থাকলে, গর্হিত কর্ম্ম সম্পাদন করা হবে অসম্ভব। অহমিকা হবে লুপ্ত। নিরাশা প্রাণকে করবেনা বিষময়। কারণ ভক্তিতে উপলব্ধি হবে প্রভু আমার রাজাধিরাজ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চিরশুদ্ধ, চিরমুক্ত, অনন্ত আনন্দের আধার। সর্ব্বভূতে যিনি বিদ্যমান—কোন্ ভূতে করব হিংসা, কার প্রতি হব দ্বেষান্বিত, কার করব ক্ষতি বা নাশ—তাঁর প্রতি হিংসা, দ্বেষ প্রকট না করে? আরাধ্যের সম্পদে হিংসা বা দ্বেষ ভক্তে কী সম্ভব। কাজেই ভক্তিতে মগ্ন থাকে যদি মন, গর্হিত কর্ম্মের প্রলোভন এলে, সে পাপবর্জ্জন হবে সুলভ ও অল্পায়াসসাধ্য। তাই শুদ্ধ হবে সাধক।

হাত পা বেঁধে কর্ম্মত্যাগ করলে তো মনের কর্ম্ম নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু কর্ম্ম তাঁরই কর্ম্ম এ চেতনায় অধোগতি হবে বন্ধ।

মৎকর্ম্মকৃৎ—আমার কর্ম্মকারী—কথাটি ক্ষুদ্র। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বাণী শ্লোকের অপর শব্দগুলির সাথে মিলিয়ে বুঝলে প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উপলব্ধি হয়। সর্ব্বভূতে বিরাজিত তিনি। সুতরাং সর্ব্বভূতের হিত-সাধন, তাঁরই সেবা। পরকে ঈশ্বরের মন্দির ভাবলে, যাকে ভাবি পর, তার মাঝে দেখব পবিত্রতা। পরহিতকর কর্ম্ম হবে জগদীশ্বরের কর্ম্ম। অন্যের সেবা হবে তাঁর একাংশের সেবা। আমিত্বের গণ্ডী হবে বিস্তৃত। অনন্ত-প্রসার হবে আমার আমিত্ব। তখন আমিত্ব ঘৃণ্য না হয়ে হবে পবিত্র যখন পরের ক্রন্দনের স্রোতে মেলাতে পারব আমার অশ্রুজল পরের সুখে কাটবে আমার দুঃখ।

এর ওপর শ্রীভগবানকেই পরম জেনে তাঁর কর্ম্ম করছি এ ভাব চিত্তের পটভূমিতে সদা বিরাজ করলে, কোন্ প্রভু-ভক্ত দুষ্ট কর্ম্মে পারে আপনাকে প্রবৃত্ত করতে?

তৃতীয় নির্দ্দেশ—তাঁর ভক্ত হবার। যে ভক্ত সে যে সদাই দর্শন পায় আরাধ্যের নিজের হৃদয়-মন্দিরে। ভক্ত সদা উদ্‌গ্রীব শ্রীভগবানের নাম শুনতে, তাঁর গুণকীর্ত্তন করতে, তাঁর শরণ নিতে, সেবা করতে তাঁর শ্রীচরণ। প্রার্থনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য বা আত্ম-নিবেদন থাকে ভক্তের সাধনার মূলে। যে পরম রস আস্বাদন করেছে তার আনন্দের অভাব কি চিরানন্দ ভুবনে।

গার্হস্থ্য জীবনের কথা আলোচনার ফলে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছাই। প্রভূর ভক্তের দ্বারা কি প্রভূর সৃষ্ট বিশ্বের ক্ষতি সম্ভবপর? ভক্ত নির্ম্মল শান্তি-প্রিয় নিষ্ঠাবান মুমুক্ষু।

স্নেহ ও প্রেম টেনে রাখে মানুষকে সংসারে। সংসারে আসক্তি না কাটালে কোনো মহৎ কর্ম্ম সম্ভবপর নয়। আত্মীয়ের স্নেহ ও প্রেম শ্রীভগবানে অর্পণ করলে সঙ্গবর্জ্জনে জীবন রসহীন হয় না। শ্লোকের নির্দেশ আসক্তি বর্জ্জন।

অহিংসা ভারতের সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি। অহিংসার শিক্ষা শ্রীমদ্ভাগবদ্ জুড়ে। আমি অন্যত্র এ বিষয় আলোচনা করেছি। ভক্তিতে মানুষ সর্ব্বত্র সান্নিধ্য বোধ করে শ্রীভগবানের। তিনি বলেছেন—যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে আর সমস্তই আমাতে দেখে, সে ব্যক্তি আমাকে দৃষ্টির বাহিরে রাখেনা আমিও তাকে রাখিনা দৃষ্টির অন্তরালে। *

সর্ব্বভূতে ঈশ্বর বিদ্যমান—এ চেতনা জন্মে জ্ঞানে এবং ভক্তির গাঢ় উপলব্ধিতে। ভক্ত তো শ্রীহরি ব্যতীত কিছু দেখেনা কোথাও—গাছে, পাথরে, কাষ্ঠে বা সলিলে। জীবের তো কথাই নাই। এ উপলব্ধির সাক্ষাৎ প্রমাণ দিয়েছেন সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্ত প্রহ্লাদ পিতাকে স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি সহস্র অক্ষি, সহস্র বাহু—অনন্ত অফুরন্ত তাঁর রূপ। সে রূপের ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম হলে তো আর ভগবান মনের আড়ালে যেতে পারেন না। বিশ্বরূপ ভগবান। আমি দেখলে তিনি দেখেন এ উপলব্ধি হবে—যখন মন আয়ত্ব করবে বিশালতা।

এ বাণীর অন্তর্নিহিত শিক্ষা এই যে আত্মদর্শন দৃঢ় হয়, যখন সাধক উপলব্ধি করেন, ঈশ্বর সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত। সর্ব্বভূতে ঈশ্বর-জ্ঞান যতদিন না জন্মে, ততদিন মানুষ বিভিন্ন ভূতে পার্থক্যের সন্ধান পায়। কিন্তু জ্ঞান উপজিলে বোধগম্য বিষয় থাকে মাত্র এক—একমেবাদ্বিতীয়ম। আত্মদর্শন হলে সাধক তো আর বিশ্বদ্রষ্টা শ্রীভগবানের দৃষ্টির অন্তরালে যেতে পারেনা। কারণ সাধক উপলব্ধি করে বিশ্বদৃষ্টি—সাধ্য বা সাধক কেহ কারও দৃষ্টির বাহিরে যেতে পারেনা। বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্যই তত্ত্বমসির উপলব্ধি। সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানই মাত্র স্বার্থকে বিনষ্ট করতে পারে। অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যিনি ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধির ফলে তাঁকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি আত্মপ্রসাদে প্রসন্নাত্মা। অর্থাৎ ক্ষুদ্র আমিত্ব পরিত্যাগ ক'রে আত্মার উপলব্ধিতে প্রসন্ন। কারণ সাধকের নিজের আত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশ। এমন লোক শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি নিজের উপমায় সকল ভূতের সুখ বা দুঃখ সমান বোধ করেন। তিনি ব্রহ্মভূত সুতরাং সর্ব্বভূতে সমদর্শী। ভক্তির দ্বারা তিনি ভগবানকেই জানেন। এমন জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত পরমেশ্বরে পরমভক্তি লাভ করেন। *

পরাভক্তির এক বিশেষ লক্ষণ সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান।

ভগবান কর্ত্তব্য-বুদ্ধির আদর্শকে বারম্বার বুঝিয়েছেন স্পষ্ট কথায়, স্পষ্ট নির্দ্দেশে। তিনি বলেছেন—তুমি সর্ব্বান্তকরণে সমস্ত কর্ম্ম আমাকে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক সতত আমাতেই সমাহিত চিত্ত হও। †

কর্ম্ম-নিবেদন বুদ্ধিযুক্ত হল এবং সর্ব্বদা তাঁকে পরম ভেবে আমিত্ব লোপ ক'রে চিত্তপ্রসার করলে আনন্দধামের সন্ধান হয় সার্থক। এ শিক্ষা ভারতের। সর্ব্বতোভাবে তাঁর শরণাগত না হ'লে তো স্বার্থের ক্ষুদ্রতা আমিত্বের মোহ-গহ্বর হ'তে বিশাল ব্রহ্মে স্থানলাভ করা সম্ভবপর নয়। জ্ঞানে ও ভক্তিতে তাঁর শরণ নিলে তাঁরই প্রসাদে পরম শান্তিলাভ সম্ভবপর। সে পথে শাশ্বত নিত্যধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শেষে ভগবান আবার বল্লেন অর্জ্জুনকে—সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার শ্রেষ্ঠ বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর। তুমি যে আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাই তোমাকে এই কল্যাণকর বাক্য বলছি।—তুমি মদ্গতচিত্ত হও। তুমি আমার ভক্ত হও, তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান কর আমারই জন্য। তুমি আত্মপরমা-স্বরূপ আমাকেই নমস্কার কর। তুমি যে আমার প্রিয়। আমি তোমার কাছে সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি যে তা হ'লে তুমি আমাকেই পাবে। তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম সব পরিত্যাগ করে আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি কি তা তো তোমায় বলেছি, চাক্ষুস বিশ্বরূপ দেখিয়েছি—সর্ব্বাত্মন্, সর্ব্বভূতের সম্যক অধীশ্বর। আমি তোমায় সর্ব্বপ্রকার পাপ হ'তে মুক্ত করব। শোক ক'রনা।

এই হল শিক্ষার সার। ভগবানে মন সমর্পণ সকল অবস্থায় জীবকে শুদ্ধ করে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

---

* যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

* ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতেপরাম্। ১৮।৫৪

† চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব। ১৮।৫৭

লীলা নাটক

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

১২৮৩ সালের মাঘ মাস

জয়রামবাটি। ভানুপিসীর গৃহ। ভানুপিসী দাওয়ায় বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিল। সারদামণির প্রবেশ

সারদা ॥ ভানু-পিসি, আজ কেমন আছ ?

ভানু ॥ এসেছো মা, এসেছো ?

গান

বহুদিন পরে বঁধুয়া এল।
ছিল প্রাণ, তাই দেখা যে হল ॥
দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরানগরে ছিলে তো ভাল ॥
তোমার বিরহে সহিলাম যত।
পাষাণ হইলে ফাটিয়া যেত ॥

সারদা ॥ হয়েছে, হয়েছে। গলায় যখন গান এসেছে তাহলে শরীরও ভাল আছে বলো ?

ভানু ॥ তোমার দেওয়া চরণামৃতেই তো ভাল হয়ে উঠলুম। আমার কর্তার অসুখের সময় তোমায় পাই নি কেন ? তবে তো সে আর অকালে চলে যেত না। তাঁকে তো আমি ধরে রাখতে পারি নি—তুমি আমায় কেন বাঁচালে মা ?

সারদা ॥ আমি কি আর তোমাকে বাঁচিয়েছি ? এসব ঠাকুরের ইচ্ছা।

ভানু ॥ ও ঠাকুরকেও চিনি—ঠাকুরাণীকেও চিনি। এই অসুখে শুয়ে সত্যি বলছি মা, একদিন সাদা চোখে তোমায় চতুর্ভুজা দেখছি। সাধে কি আর ঠাকুর তোমাকে ষোড়শী-পূজা করেছিল মা ? আচ্ছা মা, তোমার তো এত লজ্জা—তা সেই ষোড়শী পূজার সময় ঠাকুর তোমায় কাপড় পরিয়ে দিলেন এতেও তোমার হুঁস হ'লো না ?

সারদা ॥ কি জানি পিসি। কোন হুঁসই তখন আমার ছিল না। সেদিন নাকি প্রসাদী মাংস পর্যন্ত খাইয়েছেন, অথচ কখনও তো মাংস খাই না আমি।

ভানু ॥ তখন যে তুমি সাক্ষাৎ জগদম্বা। এখনও—তখনও।

সারদা ॥ দেখ পিসী, ওসব কথা বলতে নেই। আমি সংসারের দশজনের মতই একজন। নইলে কি পারতাম না আমার অমন স্নেহময় বাবাকে কালরোগের হাত থেকে বাঁচাতে। নইলে কি আমাশয় রোগে আমি নিজে অমন ভুগি ? আমাদের গাঁয়ের সিংহবাহিনী মায়ের দুয়ারে হত্যা দিয়ে তবেই না বেঁচে উঠলুম। সব ভোগই আছে পিসি। এই তো ঠাকুরের ষোড়শী পূজোর পরই কামার-পুকুরের মেজঠাকুর দেহ রাখলেন। দু'বছর যেতে না যেতেই দক্ষিণেশ্বরে শাশুড়ী ঠাকৃরুণও গঙ্গা পেলেন। সেই থেকে ঠাকুরেরও আর কোন খবর পাচ্ছি না। কেবলই মনে হয়, আমি নেই—না জানি তাঁর কত অযত্নই হচ্ছে।

ভানু ॥ মনে তো হবেই গো। রাধিকার সেই গান জানো না—

গান

"কালো বেরাল কে পুষেছে পাড়াতে।
তোরা ধরে দে গো ললিতে ॥
সেই বেরালকে ধরতে গেলে
বাঁধবে বেরাল পাটেতে ॥

কোন্ ভাতার-পুত-খাগী।
ও সে বেরাল সোহাগী।
ভাঁড়ে রাখতে দেয় না ঘি।
দই খেয়েছে, ভাঁড় ভেঙেছে।
মুখ পুঁচেছে কাঁথাতে॥"

তাই বলি, ওগো শ্যাম-সোহাগিনী—তাঁর অযত্ন হচ্ছে, নিজের ধন পরের হাতে তুলে দিয়ে তুমি এখানে বসে আছো? এই তো ভূষণ মণ্ডল দলবল নিয়ে কামারপুকুর থেকে কোলকাতা যাবে গঙ্গা-স্নানে। যাও না তাদের সঙ্গে চলে।

সারদা॥ ভাবছি তাই যাবো ভানু-পিসি। আমার হয়েছে উভয়-সঙ্কট। তোমাদের কাছেও-তো না এসে পারি না পিসি, বুড়ী মা-টা যে এখনও বেঁচে রয়েছে—তোমরাও তো রয়েছো। আবার সেখানে তিনি—ঠাকুর তো নয়, একেবারে শিশু। যে-দিন সুযোগ পেতুম—নিজ হাতে ঠাকুরকে স্নানের জন্য তেল মাখিয়ে দিতুম। তিনি স্নানে যেতেন, আমি খাবারের থালা সাজিয়ে বসে থাকতুম। তাঁকে খাওয়ানো—সে যে কি বিপদ, সে তোমরা বুঝবে না পিসি।

ভানু॥ কেন মা?

সারদা॥ খেতে বসে মাকে নিবেদন করতে গিয়েই—মায়ের পায়ে তাঁর মন যেত ডুবে—হ'তো ভাব-সমাধি। কে খাবে? কাকে খাওয়াবো? নানা কথা বলে ঐ ভাব-সমাধি ঠেকিয়ে রাখতে পারতুম আমি। এ যে কি আনন্দ—এ যে কি দুঃখ—তুমি তা বুঝবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বরের পথে তেলেভোলা ডাকাতে মাঠ। ঝোপের আড়ালে বসিয়া ডাকাত-দম্পতি শিকারের অপেক্ষা করিতেছে

ডাকাত॥ বললুম তুই আমার সঙ্গে আসিস নি—বাঁজা মেয়েছেলে অযাত্রা, তা তুই শুনলি না। এই তো সূর্যদেব পাটে বসলেন। তারকেশ্বরে যারা যাবে তারা বেলা থাকতে থাকতে চলে গেল। আর কি কেউ এই ডাকাতে মাঠে মরতে আসবে? যত সব অযাত্রা—

স্ত্রী॥ দেখ, অযাত্রা অযাত্রা করিসনি বলছি—আমি যদি বাঁজা, তুইও আঁটকুড়ো।

নেপথ্যে সারদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কালী কৃপাহি কেবলম্,' কালী কৃপাহি কেবলম্,, 'কালী কৃপাহি কেবলম্

ডাকাত॥ ওরে, চুপ চুপ—ওই শোন কে আসছে।

স্ত্রী॥ (নেপথ্যের কণ্ঠস্বর অনুধাবন করিয়া) আরে, এ যে মেয়েছেলের গলা।

ডাকাত॥ হোক্ না মেয়েছেলে। আরে মেয়েছেলে শীকারই তো ভালো। গায়ে দু'খানা সোনাদানা থাকে।

সারদা॥ (নেপথ্য হইতে) 'কালী কৃপাহি কেবলম্, কালী কৃপাহি কেবলম্, কালী কৃপাহি কেবলম্।'

স্ত্রী॥ ওরে তা'হলে আমি একটু আড়ালে দাঁড়াই। আমি আবার রক্তটক্ত দেখতে পারি না।

স্ত্রীর অন্তরালে গমন। সারদার প্রবেশ

সারদা॥ কালী কৃপাহি কেবলম্—

ডাকাত॥ (বজ্রনির্ঘোষে) এই! কে যায়? দাঁড়াও।

সারদা॥ এই যে বাবা, তুমি এখানে আছ, বাঁচলুম।

ডাকাত॥ (কর্কশ কণ্ঠে) বাঁচলুম মানে?

সারদা॥ হ্যাঁ বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে। আমিও পথ বোধ হয় ভুলেছি। সামনেই ডাকাতে মাঠ। এদিকে সন্ধ্যেও হয়ে এলো। তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি আমার সঙ্গীদের কাছে তারকেশ্বরে পৌছে দাও।

ডাকাত॥ আমি! আমি পৌছে দেব?

সারদা॥ হ্যাঁ বাবা, তুমি।

ডাকাত॥ আরে, ও বৌ, বেরিয়ে আয়, দেখ দেখি। মেয়েলোকটা কি বলছে।

স্ত্রীর আত্মপ্রকাশ

স্ত্রী॥ কে রা?

সারদা॥ এই যে মা, আমি তোমার মেয়ে—সারদা। সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় একা আমি বিষম বিপদে পড়েছিলাম। ভাগ্যে বাবা আর তুমি এসে পড়লে। নইলে এই ডাকাতে মাঠে কি করতুম—বলতে পারি নে।

ডাকাত॥ আমরা কে তা জানো?

সারদা॥ কেন জানব না—একলা বিপদে পড়ে

ছিলাম—তোমরাই তো আমাকে বাঁচাতে এসেছ। এই আমার পায়ের মল জোড়া খুলে দিচ্ছি। তোমার কাছে রাখ বাবা, নইলে ডাকাতে দেখলে আমায় কেটে ফেলবে।

ডাকাত॥ (স্ত্রীকে) ওরে, আমার যে সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

স্ত্রী॥ আ-হা, মেয়েটা বড্ড ভয় পেয়েছে গো।

সারদা॥ না বাবা, তোমাদের যখন পেয়েছি, আর ভয় কি? তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে থাকেন। আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও, তাহলে তিনি তোমাকে খুব আদর-যত্ন করবেন।

ডাকাত॥ (স্ত্রীকে) নে, হ'লো তো! ছেলেমেয়ে নেই বলে দুখ্‌খু করতিস্‌। বাঁজা বলে তুই ছিলিস্‌ অযাত্রা। নে এবার মেয়ে পেলি—নিখরচায় জামাই পেলি। জয়বাবা তারকেশ্বর। চল মা—আমরা থাকতে তোমার কোন ভয় নেই।

সারদা॥ (ক্লান্তভাবে) আমি জানি—আমি জানি। চল বাবা—

স্ত্রী॥ কিন্তু তোর মুখে যে আর কথা সরছে না মা। পাশের ক্ষেত থেকে কড়াইশুঁটি তুলেছি, এগুলি খেতে খেতে চল মা।

সারদা॥ মা গো, তোমার কি দয়া! কিন্তু তারকেশ্বরে আমার সঙ্গীরা রইল—

ডাকাত॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ এই চটিতে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে তোমাকে তারকেশ্বরে তোমার সঙ্গীদের কাছে পৌছে দিয়ে আসবো। এখন চল দেখি—হ্যাঁরে, ও বৌ, ও তো দাঁড়াতে পারছে না দেখছি—তুই ওকে কোলে নে—

সারদা॥ না বাবা, তোমরা আমায় ধরে নিয়ে চলো। ঠিক যেতে পারবো।

স্ত্রী॥ দাঁড়াতেই পারছ না—চলবে কি করে! ওঠো মা, ওঠো আমার কোলে ওঠো। আমার কোন কষ্ট হবে না গো—আমরা বাগ্দীর মেয়ে, বোঝা বইতেই আমাদের জন্ম। জয় বাবা তারকেশ্বর।

তাহারা সকলে অগ্রসর হইল

তৃতীয় দৃশ্য

রামকৃষ্ণ একখানি চৌকির উপর উপবিষ্ট। পার্শ্বে সারদা ওষুধের খলেও ঔষধ লইয়া দণ্ডায়মান

সারদা॥ নাও, ওষুধটা খেয়ে ফেলো।

রামকৃষ্ণ॥ সামান্য একটু সর্দি হয়েছে, তার জন্যে ওষুধ খেতে হবে?

সারদা॥ হ্যাঁ হবে?

রামকৃষ্ণ॥ তুমি এদ্দিন ছিলে না। তা এমন সর্দি কত হয়েছে, কত সেরে গেছে।

সারদা॥ আমি এসেছি বলেই বুঝি এখন সারবে না?

রামকৃষ্ণ॥ না, না, তা কেন! সে কি! দাও খাচ্ছি। তুমি ডাকাত বশ করে এসেছ, আর রোগ বশ করতে পারবে না? দাও খাচ্ছি।

রামকৃষ্ণ ওষুধ খাইলেন

লক্ষ্মী কোথায়? তাকে যে দেখছি না?

সারদা॥ রান্নার জোগাড় করছে।

রামকৃষ্ণ॥ তা বেশ। ওকে এবার সঙ্গে এনে বড়ই ভালো করেছ। তুমি শুধু ওর কাকী নও, বাপ-মা-মরা এই মেয়ের তুমিই এখন সব। এখন থেকেই ঈশ্বরে যাতে মন যায় তাই করবে।

সারদা॥ সকাল সন্ধ্যা নাম জপ সবই করে—কীর্তনও গায়।

রামকৃষ্ণ॥ বেশ, বেশ। যেমন কচি বাঁশ অতি সহজে নোয়ানো যায়, পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভেঙে যায়, তেমনি ছেলেদের মন সহজে ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু বুড়োদের মন ঈশ্বরের দিকে টানতে গেলে ছেড়ে পালায়। আজ কি রান্না হচ্ছে?

সারদা॥ সে খেতে বসে দেখবে এখন।

রামকৃষ্ণ॥ এঁচোড়ের ডালনা হবে একদিন বলেছিলে?

সারদা॥ আজ হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ॥ এ্যাঁ হচ্ছে! কাঁঠাল ভাঙতে হাতে বেশ করে তেল মেখে নিয়েছিলে তো?

সারদা॥ (হাসিয়া) নিয়েছিলুম। (হাত দেখাইয়া) হাতে কোন দাগ দেখছ?

রামকৃষ্ণ॥ তেল মেখে নিলে দাগ তো থাকবে না।

তাই তো আমি বলি এই সংসাররূপ কাঁঠালকে যদি জ্ঞানরূপ তেল হাতে মেখে সম্ভোগ করা যায়, তা হলে কামিনীকাঞ্চনরূপ আঠার দাগ আর মনে লাগতে পারবে না।

সারদার হাতখানি টানিয়া লইয়া দেখিলেন

না, তোমার হাতে কোন কলঙ্ক নেই। এ কি! এ নতুন শাঁখা আবার কবে পরলে? ভারী সুন্দর তো!

সারদা॥ তোমার ভক্ত শম্ভু মল্লিকের বাড়ী থেকে দিয়েছে।

রামকৃষ্ণ॥ ও, হ্যাঁ। শুনেছি তো শম্ভু মল্লিকের স্ত্রী তোমাকে নাকি জয়মঙ্গলবারে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ষোড়শোপচারে তোমার পূজো করেছেন?

সারদা॥ তোমাকে তারা দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করেন। তোমাকে পান না—তাই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে দুধের সাধ ঘোলে মেটায়।

রামকৃষ্ণ॥ বা-বা-বা—এটা তো বেশ বলেছ গো। কিন্তু দেখ, শম্ভু তোমার জন্তে ঐ যে চালাঘর তৈরী করতে লেগে গেছে—সে কিন্তু আমার দুঃখ দেখে নয়, তোমার নহবতে থাকার কষ্ট দেখে।

সারদা॥ তা যদি বল, নহবৎ ছেড়ে যেতেই আমার কষ্ট হবে।

রামকৃষ্ণ॥ কষ্ট কি বলছো গো? তাহলে আমি শম্ভুকে ডেকে বলে দি ও ঘর তৈরি থাক।

সারদা॥ না···তা ব'লো না, মনে ব্যথা পাবে।

রামকৃষ্ণ॥ ও! মা বলে ডেকেছে বুঝি। তা বেশ—তা বেশ।

হৃদয়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল

হৃদয়॥ (নেপথ্যে) মামা—

রামকৃষ্ণ॥ কে রে, হৃদে? আয়, আয়···

হৃদয়ের প্রবেশ

হৃদয়॥ তোমার ভক্ত বিশ্বনাথ, নেপাল সরকারের সেই কাপ্তেন গো—মামীর ঘর তৈরী হবে শুনে বেলুড়ের কাঠের গোলা থেকে তিনখানা সালের গুড়ি পাঠিয়েছিল। তার একখানা কাল জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কি বরাত করেই এসেছিল, মানী, তোমার একটা কাজও কি ভালভাবে হবার উপায় নেই?

রামকৃষ্ণ॥ থাম না হৃদে, একখানা গেছে আর একখানাও তো দিতে পারে?

সারদার প্রস্থান

হৃদয়॥ না মামা, এমন অপয়া মেয়েছেলে আমি দেখিনি। কোনদিন তোমায় ভাসিয়ে দেবে!

রামকৃষ্ণ॥ দেখ হৃদে (নিজের দেহ দেখাইয়া) একে তুই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে কথা বলিস ব'লে, ওকে আর কখনও এমন কথা বলিস না। এর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস—হৃদে, কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষে করতে পারবে না। এ তুই জেনে রাখিস্ শালা।

মন্দিরাভিমুখে রামকৃষ্ণের প্রস্থান। হৃদয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় রামকৃষ্ণের আহারের জন্য জলের পাত্র ও আসন লইয়া লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী॥ ও, ঠাকুর তোমাকে বকছিলেন দাদা?

হৃদয়॥ আমাকে নয়তো আর কাকে? জান্লি লক্ষ্মী—ওঁর বকুনি খেতে ভূভারতে এই একটি লোকই আছে! আর তো সবাই বাবা সোনা।

লক্ষ্মী॥ তা তুমিই টিকবে দাদা। জানতো ঠাকুর বলেন—যে সয় সেই রয়। খাওয়ার সময় হয়েছে যে। কোথায় গেলেন?

হৃদয়॥ কোথায় আবার যাবেন! গেছেন ভবতারিণী মার কাছে। গিয়ে দুঃখ করছেন, মা, হৃদেটাকে এমন করে বকলুম। তা তুই খাবার জায়গা কর্—আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লক্ষ্মী॥ পাঠিয়ে দিচ্ছি মানে? ওঁকে খাওয়ানোর সময় তোমাকেও কাছে থাকতে হবে দাদা। নইলে আমি একা ওঁকে খাওয়াতে পারব না।

হৃদয়॥ কেন?

লক্ষ্মী॥ ওমা, দেখলে তো সেদিন! দেখি খেতে বসে মাকে নিবেদন করতে গিয়েই মায়ের পায়ে তাঁর মন ডুবে গেলো—ভাব-সমাধি হ'লো। তখন কে খাবে—কাকে খাওয়াব! ভাগ্যিস্ তুমি দাদা এসে পড়েছিলে, তাই রক্ষে।

হৃদয়॥ আজ আমারই রক্ষে নেই, আবার আমি কাকে রক্ষা করব! না, না, ওসব আমি পারব না। তিনি কোথায়?

লক্ষ্মী॥ মা? আর সবারই রান্না রাঁধছেন যে।

হৃদয়॥ গুষ্টীর পিণ্ডি পরে হবে। আগে এসে ঠেলা সামলাও। ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা কথা বলে ভাব-সমাধি ঠেকিয়ে রাখবার লোক হচ্ছেন একমাত্র তিনি। আমি কে? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো! ওরে বাবা, ঐ যে আসছেন। পেটে কিছু পড়লেই ঠাণ্ডা হবে। বুঝিয়ে শুঝিয়ে মামীকে আমি এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হৃদয়ের প্রস্থান। লক্ষ্মী আসন পাতিয়া আহারের জায়গা করিয়া দিল

রামকৃষ্ণ॥ (আসনে বসিয়া) আজকে কি রান্না হয়েছে রে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী॥ তা খুব হয়েছে কাকা। গাঁদালের ঝোল চাও পাবে, সুক্তোতো আছেই, মোচার ঘণ্ট তাও বোধ করি হয়েছে।

রামকৃষ্ণ॥ ওরে বাবা, এ যে একেবারে রাজসূয় যজ্ঞ—আর কি? আর কি রেঁধেছে রে?

লক্ষ্মী॥ হ্যাঁ, আর একটা জিনিস আছে। চমকে দেবার মতো।

রামকৃষ্ণ॥ চমকে দেবার মতো! সেটা কি?

লক্ষ্মী॥ সে বলবো না। যখন খাবে তখনই বুঝবে।

সারদা ভাতের থালা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। লক্ষ্মী হাওয়া করিতেছে

রামকৃষ্ণ॥ লক্ষ্মী বলছিল চমকে দেবার মতো কি একটা রেঁধেছো। সেটা কি গো, বল—মাকে তো নিবেদন করতে হবে।

সারদা॥ বলছি…বলছি।

ভাতের থালা সামনে রাখিয়া বাটিগুলি নামাইতে নামাইতে বলিলেন

শুষ্‌নি শাকের ঝোল রেঁধেছি। শুষ্‌নি শাকের গল্প শোননি বুঝি। সে খুব রগড়। আমার তো শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গিয়েছিল।

রামকৃষ্ণ॥ বল কি গো—

সারদা॥ তুমি খাও আমি বলছি। না, না, ওই তেতোটা আগে খাও।

রামকৃষ্ণ॥ বেশ তাই খাচ্ছি—তুমি গল্পটা বল।

সারদা॥ এক চোর সাধু সেজে এক গ্রামে চুরি করতে এলো।

রামকৃষ্ণ॥ বটে! সাধু সেজে?

সারদা॥ হ্যাঁ সাধু সেজে। কি হলো জানো—যত ভক্ত আসে সবারই হাতে শুষ্‌নি শাক দিয়ে বলে রাতে এই শাকের ঝোল খাবে।

রামকৃষ্ণ॥ রাতে শাক?

সারদা॥ কেউ খায় না তো—তা সাধু বলেছে, সবাই খেলে।

রামকৃষ্ণ॥ ও, তারপর রাতে বুঝি সবাই এক একটি কুম্ভকর্ণ! হাঃ হাঃ হাঃ

সারদা॥ পরের দিন দেখা গেল সাধু আর নেই—ভক্তদের সিন্দুকও সব ফাঁকা।

রামকৃষ্ণ॥ তা আমার তো সিন্ধুক টিন্দুক নেই—তবে আমাকে কেন?

লক্ষ্মী॥ সেটা আমি বলি কাকা। তুমি শেষ রাতে উঠে নহবত ঘরে গিয়ে, আমাদের দোর গোড়ায় জল ঢেলে—শেষ রাতেই ঘুম থেকে তুমি আমাদের তুলে দাও—ঘুমটা তোমার ভাল হয় না কি না—বোধ করি তাই।

রামকৃষ্ণ॥ ও! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

চতুর্থ দৃশ্য

রামকৃষ্ণের কক্ষ। কাশী হইতে আগত একটি প্রাচীনা ব্রাহ্মণ বিধবা এবং হৃদয় আলাপরত

হৃদয়॥ তুমি ভেবো না বুড়ীদিদি, আমি দেখে এলাম মামা ভবতারিণীর ঘরে ধ্যানে রয়েছেন। আর অসুখ আছে বলে মনে হলো না।

প্রাচীনা॥ না বাবা হৃদু, যে আমাশা হয়েছে, কাল সারা রাত ঘর-বার করেছে। একটু ঘুমোয় নি বাবা। ওকে ধরে এনে শুইয়ে দাও, একটু ঘুমোক। যাও বাবা, যাও, আমি ময়লাটা ফেলে দিয়ে আসি।

হৃদয়॥ বলছো যাচ্ছি। এখন শুনলে হয়। আমি কি ভাবি জানো বুড়িমা? মা বেটীর কী দয়া! নইলে জানা নেই, শোনা নেই, কোথাকার কে এক বুড়ী বামুনি

তুমি—তুম্ করে কাশী থেকে সটান চলে এলে দক্ষিণেশ্বরে—মামাকে আমাশার এ কাল ব্যাধি থেকে টেনে তুলতে!

প্রাচীনা॥ কি জানি বাবা—তাই তো এলাম।

হৃদয়॥ ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো আছি এক আমি। তা এত ময়লা ফেলতে আমিও পারতুম না বুড়ীদিদি। আর যার পারার কথা তিনি তো দিব্যি বহাল তবিয়তে বাস করছেন নতুন তৈরী চালাঘরে।

প্রাচীনা॥ আরে হনুমান, তোরই দ্বিতীয় পক্ষের কচি বউ সেখানে বসে পাহারা দিচ্ছে। নইলে দেখি তো—ঠাকুরের জন্য মা'র আমার কী আকুলি-বিকুলি! কান পেতে বসে থাকে কখন আমি যাব। গিয়ে বলব—কেমন আছেন ঠাকুর। কি পথ্য খাবেন! আর তার সে-পথ্য তৈরী করা সে যেন এক তপস্যা। তোরা বুঝবি নে রে—বুঝবি নে।

হৃদয়॥ বুঝি সবই—তবে একটু দেরীতে এই যা। আচ্ছা আসি বুড়ীদিদি।

হৃদয়ের প্রস্থান। প্রাচীনা থানকতক ময়লা কাপড় লইয়া বাহিরে যাইবেন এমন সময় পথ্য লইয়া সারদা ও লক্ষ্মীর প্রবেশ

প্রাচীনা॥ এই যে মা। তুমি নিজে এসেছ।

সারদা॥ পথ্য আনতে আপনার যেতে দেরী দেখে আমি ভেবে মরি।

লক্ষ্মী॥ সে আকুলি-বিকুলি দেখে আমি নিয়ে এলাম ধরে।

প্রাচীনা॥ তা বেশ হয়েছে। কিন্তু হৃদুর বউ? তাকে কার কাছে রেখে এলে?

লক্ষ্মী। ঐ যে সেই একটি মেয়ে আসে—তাবিচ কবচ চায়, তাকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

একটি স্ত্রীলোকের প্রবেশ

ওমা, এই দেখ! তোমাকে বসিয়ে রেখে এলাম, আর তুমি এরই মধ্যে ছুটে চলে এলে?

স্ত্রীলোকটি কাতর দৃষ্টিতে মার্জনা ভিক্ষা করিল

সারদা॥ লক্ষ্মী, তুই পথ্যটা ধর, আমি যাচ্ছি।

লক্ষ্মী॥ না, না, তুমি থাকো। আমি যাচ্ছি। তুমি তো আর ছুটতে পারবে না। আর তুমি গেলে সঙ্গে সঙ্গে যাবে এই এঁচোড়ের আটা।

লক্ষ্মীর প্রস্থান

প্রাচীনা॥ ঠাকুর মন্দিরে ধ্যানে বসেছেন। হৃদুকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছি। তোমরা বসো মা, আমি ঘাট থেকে আসছি।

প্রাচীনার প্রস্থান

স্ত্রীলোক॥ দিদিমণি বলে গেলো—আমি নাকি এঁচোড়ের আটা। আঁটকুড়ি যে বলে নি—তাই রক্ষে। সাধে কি তোমার পায়ে পায়ে ঘুরছি। বাঁজা মেয়েছেলের যে কি দুঃখ, তা কি তুমি বোঝ না মা?

সারদা॥ (ম্লান হাসিয়া) বুঝি বৈ কি মা।

স্ত্রীলোক॥ সবাই বলে তোমার নাকি অনেক ক্ষমতা। (সারদার পদধারণ করিয়া) আমায় একটা তাবিজ-কবচ কি ওষুধ—যা হয় একটা দাও।

সারদা॥ (পা মুক্ত করিয়া স্ত্রালোকটির হাত ধরিয়া) শোন মা, শোন। ছেলে হয়—এমন কোন ওষুধ আমার জানা নেই। তুমি বরং আমার ঠাকুরকে ধরো। কিন্তু আজ নয়—এখন তার বড় অসুখ।

স্ত্রীলোক॥ ও মা! ঠাকুরকে কি আমি ধরিনি! তিনিই তো তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন মা।

সারদা॥ আমাকে দেখিয়েছেন। ছেলে হবার ওষুধ জানব আমি! ভালো লোকই দেখিয়েছেন।

স্ত্রীলোক॥ কিন্তু তিনি মিথ্যে বলেন না মা। আমায় তুমি দয়া করো। কোলে কেউ এলো না বলে—শুধু কি নিজের দুঃখ! উঠতে বসতে লাঞ্ছনা! তোমার পায়ে পড়ি মা—কোলে আমার ছেলে দাও।

সারদার পদচারণ। প্রাচীনার পুনঃ প্রবেশ

প্রাচীনা॥ ও মা! একি! শোন বাছা, তুমি যার কাছে এসেছ, ওর কোলে কি কোন ছেলে দেখছ? ওর মনের ব্যথা—তোমার চেয়ে মা, এতটুকুও কম নয়। কী ওষুধ তোমাকে দেবে ও? নিজের ঘরে বসে ঠাকুরকে ডাকো, যখন হবার তখন আপনিই হবে।

স্ত্রীলোক॥ তাই তো! এটা তো আমি ভেবে দেখিনি মা। তা ঠাকুর তো নয়—সাক্ষাৎ দেবতা। তোমার ওপরেই যখন তাঁর কৃপা হ'লো না, তখন আমি কোন ছার! (সারদাকে) তাহলে আসি মা। (প্রাচীনাকে) আসি ঠাকরুণ।

কাহাকেও প্রণাম না করিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে প্রস্থান

প্রাচীনা॥ আমি তোমার ব্যথাও বুঝি মা।

সারদা॥ না মা, আমার কোন দুঃখ নেই।

প্রাচীনা॥ সে তুমি মুখে যাই বলো মা—এ যে কী দুঃখ—সারা জীবন ধরে আমি বুঝেছি।

রামকৃষ্ণের প্রবেশ

রামকৃষ্ণ। ওরে বাবা! একজন খাওয়াবেন ওষুধ, আর একজন খাওয়াবে পথ্য। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর।

সারদা পথ্য ঢালাঢালি করিতে লাগিলেন

প্রাচীনা॥ না, না, তুমি বাবা অমন করে বলো না। মা আমার থাকে অতদূরে - সেই চালাঘরে। কখন কেমন আছে খবর পায় না বলে আকুলি-বিকুলি করে মরে। আমি বলি—অতদূরে কেন? মা আমার আগের মত নহবতেই থাক না।

সারদা॥ না, মা। ভাগনে বউটি একা থাকবে। ভাগ্নে এখানেই ঠাকুরের কাছে থাকেন কি না।

প্রাচীনা॥ তা হোক। ওরা লোকটোক রেখে দেবে। এখন তোমার কি একে রেখে দূরে থাকা চলে?

রামকৃষ্ণ॥ তা বাপু, তোমরা যা ভালো বোঝ করো। এখন বার্লিটা দাও দেখি, খেয়ে পেটটা ঠাণ্ডা করি।

সারদা বার্লি লইয়া ঠাকুরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন

প্রাচীনা॥ একি মা! কলুর বলদের মতো চোখে ঠুলি বেঁধে স্বামী-সেবা কি গো? ঠাকুর-দেবতা কি লোকে অমনি করে দেখে?

সারদার ঘোমটাটি খুলিয়া দিয়া

এমনি করে দেখে। তবে না দেখা। তুমি খাওয়াও এই ফাঁকে আমি গঙ্গায় ডুবটা দিয়ে আসি।

প্রাচীনার প্রস্থান

সারদা পথ্যের পাত্রটি ঠাকুরের হাতে দিলেন

শ্রীরামকৃষ্ণ॥ (পাত্রটি হাতে লইয়া) আঃ—চাঁদে যেন গেরোণ লেগেছিল। তা বেশ, তা বেশ।

ঠাকুর এক চুমুকে বার্লি খাইয়া ফেলিলেন

নাও, মনোবাঞ্ছা পুরলো তো?

সারদা॥ (মৃদু হাস্যে) কি আবার পুরলো?

রামকৃষ্ণ॥ (সোচ্ছ্বাসে) ওঃ, হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—একটা ছেলেপুলে হল নি, মনে খুব দুঃখ। তা তোমার ভাবনা কিসের—তোমায় এমন সব রত্ন-ছেলে দিয়ে যাব, মাথা কেটে তপিস্যে করেও মানুষে পায় না। পরে দেখবে, এত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে, তোমার সামলান ভার হয়ে উঠবে।

বিরাম ক্রমশঃ

বৃদ্ধের নিবেদন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

সত্যিই হয়েছি খুব বুড়ো,
জ্যাঠা বলি ডাকে সবে কেহ আর বলে নাক খুড়ো।
'বুঢ্‌ঢা হ্যায় আস্তে ভাই'—বলে বাসকন্‌ডাক্টার।
দেখিলে প্রণাম করে পক্বকেশ দন্ত নাই যার।
করুণার পাত্র এবে, সবে কয় আহা ও বুড়ায়
সর্বাগ্রে বিদায় কর বসিয়ে রেখ না আর ঠায়।
সিঁড়িতে নামিতে গেলে কেউ হাত ধরে তাড়াতাড়ি
বলি মুখে ধন্তবাদ, মনে করি এ যে বাড়াবাড়ি।
ট্রামে চলি দাঁড়াইয়া, লেডি বলে আপনি বসুন,
বসে পড়ি তার পাশে বুড়োর যে মাফ সাতখুন।
পথে ঘাটে দেখা হলে যত সব পরিচিত জন
উৎকণ্ঠায় কণ্ঠভরা প্রশ্ন করে—'আছেন কেমন?'
"এখনো বাহিরে কেন হুঁশ নাই বেজে গেছে সাত,
বাড়ী পহুঁছিতে দাদু হয়ে যাবে রীতিমতো রাত।"
নানা ছলে সবাই স্মরায়
তোমারে ভুলিয়া থাকা আর প্রভু শোভা নাহি পায়।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

জড়বাদ

মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের প্রথমেই চার্বাক দর্শনের বর্ণনা করিয়াছেন, এবং চার্বাককে নাস্তিক-শিরোমণি বলিয়াছেন। এই দর্শন লোকায়ত দর্শন নামেও পরিচিত এবং বৃহস্পতি ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন—"নীতি ও কামশাস্ত্রানুসারে অর্থও কামই পুরুষার্থ, পারলৌকিক অর্থ কিছুই নাই, ইহা যাহাদের বিশ্বাস, তাহারা চার্বাক মতেরই অনুসরণ করে। এইজন্য চার্বাক মতের লোকায়ত নাম অন্বর্থ। কেহ কেহ বলেন—যাহারা চার্বাক মতাবলম্বী, তাহারা এই লোকই একমাত্র সত্য, অন্য লোক নাই, মনে করে বলিয়া এই মতকে লোকায়ত মত বলে (অয়ং লোকো, নাস্তি পর ইতি মানী কঠ ২।৬)। আবার কাহারও কাহারো মতে 'চর্ব' ধাতু হইতে চার্বাক শব্দ উৎপন্ন। চর্ব ধাতুর অর্থ চর্বন করা, খাওয়া, চার্বাক-পন্থীরা কেবল খায়, ধর্ম ও নীতি বলিয়া কিছু তাহাদের নাই ; এই জন্য তাহারা চার্বাক নামে অভিহিত। 'চর্ব' ধাতু হইতে উৎপন্ন চার্বাক শব্দের অর্থ রাক্ষস ও হইতে পারে। এই মত রাক্ষসদিগের মত—আসুর মত, এই বিশ্বাসেও ইহাতে চার্বাক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। চার্বাক নামে কোনও লোক ছিল কিনা, তাহা সন্দেহস্থল। কিন্তু মহাভারতে চার্বাকনামা এক ব্যক্তির যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে। বেদ-বিরোধী মত যে অতি প্রাচীন কালেই ছিল, বেদের মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু চার্বাক মত যে সাধারণ লোকের মধ্যে বহুল প্রচারিত ছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। ইহলোককেই চার্বাক-পন্থিগণ একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিত, বলিয়া তাহাদের লোকায়তিক নাম হইয়াছিল, ইহাই অধিকতর সম্ভবপর।

এই মত বৃহস্পতি কর্তৃক প্রবর্তিত বলিয়া উপনিষদে আছে। এই জন্য ইহার নামান্তর বার্হস্পত্য দর্শন। এই বৃহস্পতি কে? বৈদিক দেবতা-দিগের মধ্যে এক বৃহস্পতির নাম পাওয়া যায়। বৃহস্পতিনামা ঋষি-রচিত দুইটি সূক্ত ও ঋগ্বেদে আছে (১০।৭১-৭২)। বৃহস্পতি-সহায় ইন্দ্র নাস্তিক লোকদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন, ইহাও ঋগ্‌বেদে আছে (৮।৯৬।১৫)। বৃহস্পতিরচিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক এক স্মৃতিগ্রন্থও বর্তমান আছে। নবগ্রহের এক গ্রহের নামও বৃহস্পতি। দেবতাদিগের পুরোহিতের নামও বৃহস্পতি। দেবতাদিগের যিনি গুরু, তিনিই নাস্তিক মতের প্রচারক, ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। ইহার ব্যাখ্যায় মোক্ষমূলার ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত প্রজাপতি ও ইন্দ্র বিরোচন সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলেন, ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন যখন প্রজাপতির নিকট আত্ম-তত্ত্ব শিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন, তখন প্রজাপতি প্রথমে বলিয়াছিলেন চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ দেখা যায় ও জলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার মধ্যে যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তাহাই আত্মা। বিরোচন ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিয়াছিল, এবং প্রজাপতির নিকট পুনরায় না গিয়া দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু মৈত্রায়ণ উপনিষদে এই কাহিনী ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। তাহাতে আছে ইন্দ্রের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এবং অসুরদিগের বিনাশের জন্য বৃহস্পতি এক-মিথ্যাদর্শনের উদ্ভাবন করেন, এবং অসুর-দিগকে তাহা শিক্ষাদেন। এই দর্শনে যাহা পুণ্য, তাহাকে পাপ, এবং যাহা পাপ, তাহাকে পুণ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। অসুর ভিন্ন অন্য সকলকে এই দর্শন পাঠ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। ইহাই বৃহস্পতির দর্শন এবং চার্বাক দর্শন নামে পৃথিবীতে প্রচারিত। কিন্তু বৃহস্পতি-রচিত কোনও গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে বর্ণিত চার্বাক দর্শন যে বৃহস্পতির অনুমোদিত, একথা তাহাতে আছে।

চার্বাক দর্শন যে ভারতের প্রাচীন দর্শনদিগের অন্যতম, বাল্মীকির রামায়ণে ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ম্যাকডনেলের মতে রামায়ণের রচনা খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। (History of Sanskrit Literature 309) রাম বনবাসে অবস্থিত হইয়া যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভরত তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া পরলোকগত পিতার রাজ্য-গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাম অস্বীকৃত হন। তখন জাবালি নামে এক ব্রাহ্মণ তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ জড়বাদ (অযোধ্যাকাণ্ড—১০৮)। তিনি বলিয়াছিলেন "অর্থধর্মপরা যে যে তাং স্তান্ শোচামি নেত-রান্। তে হি দুঃখং ইহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য লেভিরে"। "যদি ভুক্ত মিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি. দদ্যাৎ প্রবসতাঃ শ্রাদ্ধং, ন তৎ পথ্যশনং ভবেৎ"। "দান সংবদনা হেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ। যজস্ব, দেহি, দীক্ষস্ব, তপঃ তপ্যস্ব সন্ন্যজস্ব:" "স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে। প্রত্যক্ষং যৎ, তৎ আতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু"। যাহারা অর্থ ধর্মপর, আমি তাহাদের জন্য শোক করি, অন্যের জন্য নয়। তাহারা ইহলোকে দুঃখ পাইয়া মৃত্যুতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। একজনের ভুক্ত অন্ন যদি অন্যের দেহে যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রবাসীর শ্রাদ্ধ করিলেও বিদেশে প্রবাসী সে অন্ন পাইতে পারে। ইহার পরে কিছু নাই, ইহা স্থির জানুন। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা আশ্রয় কর, পরোক্ষ বর্জন কর। যজ্ঞ কর, দান কর, দীক্ষা নাও, তপস্যা কর, সন্ন্যাসগ্রহণ কর, এই সকল যে শাস্ত্রে আছে (বেদাদি) তাহারা ধূর্ত লোকের কৃত। ইহা স্পষ্টতঃ বার্হস্পত্য দর্শনের অনুবাদ।

চার্বাক মত

ক্ষিতিঃ অপ্ঃ তেজ ও মরুৎ এই চারিটি তত্ত্ব। তাহারা দেহাকারে পরিণত হয়। নানাবিধ দ্রব্যের মিশ্রণে যে মত্ত প্রস্তুত হয়, তাহার

মাদকতাশক্তি থাকে। (কিণ্বাদিভ্যঃ মদশক্তি বৎ) সেইরূপ চারিভূতের মিশ্রণে যে দেহ নির্মিত হয়, তাহাতে চৈতন্য শক্তি থাকে। চৈতন্য একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য নহে। চতুর্ভূতের মিশ্রণেই তাহার উৎপত্তি হয়। দেহের বিনাশ হইলে চৈতন্যের ও নাশ হয়। "এতেভ্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনু বিনশ্যতি। ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।" (বৃঃ আঃ—উপঃ—৪।৫।১৩)—উপনিষদের এই শ্লোক চার্বাক মতের সমর্থনে সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে। আত্মা "এই সকল ভূত হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাকে না।"

চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষই এক মাত্র প্রমাণ। অনুমানাদি প্রমাণ চার্বাক দর্শনে স্বীকৃত নহে। দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।

এই মতে কামিনী-সঙ্গাদিজন্য সুখই পুরুষার্থ। এই সুখ দুঃখ-সংভিন্ন, সুতরাং ইহার পুরুষার্থত্ব নাই, ইহা বলা যায় না। যে দুঃখ পরিহার করিবার উপায় নাই, তাহা যেমন ভোগ করিতে হইবে, তেমনি প্রাপ্ত দুঃখ তুচ্ছ করিয়া সুখকে ও উপভোগ করিতে হইবে। মৎস্যার্থী কণ্টক ও শল্কযুক্ত মৎস্য গ্রহণ করে, কিন্তু শল্ক ও কণ্টক বর্জন করিয়া সারভাগ ভক্ষণ করে। ধান্যার্থী তৃণলগ্ন ধান্য আহরণ করিয়া তৃণ ত্যাগ করে এবং ধান্য গ্রহণ করে। সুতরাং দুঃখ-ভয়ে সুখ ত্যাগ করা উচিত নহে। ভীরু যদি দৃষ্ট সুখ ত্যাগ করে, তবে সে পশুবৎ মূর্খ।

কেহ কেহ বলেন যদি পারলৌকিক সুখ না থাকে, তবে বহু অর্থব্যয় এবং আয়াস স্বীকার করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কেন অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করেন। কিন্তু ইহা কোনও প্রমাণই নহে। বেদ অনৃত, ব্যাঘাত (বিরোধ) ও পুনরুক্তি দোষে দূষিত। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পরস্পরের বিরোধী। এই বেদ অবলম্বন করিয়া ধূর্ত্ত বক বৈদিকেরা আপনাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছে। বেদ ধূর্ত্তদিগের প্রলাপ মাত্র।

অগ্নিহোত্রঃ ত্রয়ো বেদাঃ, ত্রিদণ্ডং, ভস্মগুণ্ঠনং।
বুদ্ধি-পৌরুষ হীনানাং জীবিতো ইতি বৃহস্পতিঃ॥

বৃহস্পতি বলেন, অগ্নিহোত্র, তিনবেদ, ত্রিদণ্ড (ত্রিগুণ উপবীত) ও ভস্মলেপন বুদ্ধি ও পৌরুষহীনদিগের জীবিকা। কণ্টকাদি জন্য দুঃখই নরক, লোকসিদ্ধ রাজাই ঈশ্বর এবং দেহপাতই মোক্ষ। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও নরক, ঈশ্বর অথবা মোক্ষ নাই। দেহ ও আত্মা অভিন্ন বলিয়াই আমরা "আমি কৃশ", "আমি কৃষ্ণবর্ণ" ইত্যাদি বলিয়া থাকি। "আমার দেহ" যখন বলি, তখনও আমি ও দেহ অভিন্ন। রাহুর মস্তক ভিন্ন অন্য অঙ্গ নাই। তবুও আমরা 'রাহুর শির' বলিয়া থাকি। ইহা ঔপচারিক।

প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, প্রত্যক্ষই যদি একমাত্র প্রমাণ হইত, অনুমানাদি প্রমাণ যদি না থাকিত, তাহা হইলে ইহা সত্য হইতে পারিত। কিন্তু অনুমানও তো একটা প্রমাণ। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে ধূম দেখিয়া সেখানে অগ্নি আছে, ইহা লোকে ভাবে কিরূপে? কিন্তু এই অনুমানের দৃঢ়ভিত্তি নাই। যখন ধূম দেখি তখন ধূমের সঙ্গে পূর্ব্বে দৃষ্ট অগ্নির কথা মনে হয়। কিন্তু ধূম ও অগ্নির এই সম্বন্ধ সমগ্র ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে দৃষ্ট নহে। ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ হইবার তো কোনও সম্ভাবনাই নহে। অতীতেও সর্ব্বস্থানের সর্ব্বকালের ধূম আমার প্রত্যক্ষ হয় নাই, সুতরাং ধূমের সঙ্গে যে অগ্নি সর্ব্বকালেই থাকে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। ব্যাপ্তিজ্ঞান সীমিত-সংখ্যক প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞতার সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তির সীমা। সুতরাং তাহা হইতে অনুমান অসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ নাই। যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সত্য। যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার অস্তিত্ব নাই। অন্যের সাক্ষ্যের কোনও মূল্য নাই। উপমা হইতে অনুমান সম্ভব নহে। অনুমান সত্য হইতে পারে, নাও পারে। যখন তাহা সত্য হয়, তখন তাহা দৈবাৎ হয়।

এক অনুমান অন্য আর একটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও বলা চলে না। কেননা ইহা স্বীকার করিলে দ্বিতীয় অনুমানের জন্য অন্য আর একটি অনুমানের প্রয়োজন হয়, এবং তৃতীয় অনুমানের জন্য আবার আর এক অনুমানের প্রয়োজন হয়। ফলে অনবস্থার উদ্ভব হয়। অন্যের সাক্ষ্য যে প্রমাণ হইতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, এই সাক্ষ্যও অনুমানের উপর নির্ভরশীল। সাক্ষী যে সত্যবাদী, তাহাও অনুমানগম্য। বিশেষতঃ অনুমান যদি অন্যের সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে, তাহা হইলে কেহই নিজে কিছুই অনুমান করিতে পারে না।

যদি বল ধূম ও অগ্নির মধ্যে সার্ব্বিক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না. ইহা যদি স্বীকার ও করা যায়, তাহা হইলেও ধূম-সামান্য এবং অগ্নি-সামান্য যে সহভাবী, তাহা তো সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ হয়। অগ্নিত্ব ও ধূমত্বের এই নিত্য সহভাব হইতে অগ্নি ও ধূমের সহভাব অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু অগ্নিত্ব ও ধূমত্বের মধ্যে সম্বন্ধ-জ্ঞান ও সীমিত-সংখ্যক অগ্নি ও ধূমের সহভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সার্ব্বিক সহভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রত্যক্ষই যখন একমাত্র জ্ঞান, তখন জড়ই একমাত্র সত্য—কারণ জড় বস্তুই কেবল প্রত্যক্ষ হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ সনাতন। তাহাদের হইতেই বুদ্ধির আবির্ভাব। তাম্বুল, সুপারি এবং চূণের সংযোগে যেমন রক্তবর্ণের উৎপত্তি হয়, তেমনি ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারি পদার্থের সমবায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়।

যাগযজ্ঞের কোনও ফল নাই। মণি, মন্ত্র ও ঔষধের ব্যবহারে যেমন কখনও কখনও ফল পাওয়া যায়, যাগযজ্ঞাদির ফলও তেমনি আকস্মিক। "অদৃষ্ট" বলিয়া কিছু নাই। জগতে নানা প্রকার সৃষ্টি, সকলই আকস্মিক। ইহার কোনও কারণ নাই। যদি তাহা স্বীকার না কর, তাহা হইলে জগতের এই বৈচিত্র্য স্বভাব হইতে উদ্ভূত বলিতে হইবে—যেমন অগ্নির উষ্ণতাপ, জলের শৈত্য ও বায়ুর শীতল স্পর্শ। বৃহস্পতি বলিয়াছেন—স্বর্গ নাই, অপবর্গ নাই, আত্মা নাই, পারলৌকিকও কিছু নাই। বর্ণাশ্রমে উপদিষ্ট কোন ক্রিয়ারও কোনও ফল নাই। যজ্ঞে নিহত পশু যদি স্বর্গে যায়, তবে যজমান যজ্ঞে নিজের পিতাকে বলি দেয় না কেন? মৃত

ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিলে যদি তাহার তৃপ্তি হয় (শ্রাদ্ধে দত্ত দ্রব্য যদি মৃত ব্যক্তি পাইতে পারে), তাহা হইলে ভ্রমণে বাহির হইবার সময় পাথেয় সংগ্রহের প্রয়োজন কি ? (গৃহে অন্ন রন্ধন করিয়া নিবেদন করিলেই সেই দূরস্থিত ব্যক্তি পাইতে পারে।)। স্বর্গে অবস্থিত পিতা যদি পৃথিবীতে দত্ত দান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে পৃথিবীতে অবস্থিত পিতাকে প্রাসাদোপরি রাখিয়া নিম্নে দান করিলে, তিনি তাহা পান না কেন ? "যাবৎ জীবেৎ, সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" যতদিন বাঁচিবে, সুখে বাঁচিবার চেষ্টা করিবে, ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিবে। ভস্মীভূত দেহ কিরূপে ফিরিয়া আসিবে? দেহ হইতে বাহির হইয়া যদি জীব পরলোকে গমন করে, তবে বন্ধু-স্নেহবশতঃ ফিরিয়া আসে না কেন? ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করিয়া আপনাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছে। "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ, ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ। জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।" তিন বেদের কর্ত্তাগণ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর। "জর্ফরী তুর্ফরী" প্রভৃতি বিকট বাক্যে বেদ পূর্ণ। বহু প্রাণীদিগের উপকারের জন্য রমণীয় চার্ব্বাকের মত আশ্রয়নীয়।

ইহাই চার্ব্বাক দর্শন। ইহার অসংযত ভাষা ও দুর্নীতিমূলক মত পড়িয়া মনে হয়, কেহবা জড়বাদকে লোকসমাজে ঘৃণিত করিবার জন্য এতাদৃশ ভাষায় উহাকে প্রচার করিয়াছে। কিন্তু কোনও কোনও বৌদ্ধ-গ্রন্থেও ব্রাহ্মণদিগের গ্লানিকর ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপরি উদ্ধৃত শ্লোকগুলি চার্ব্বাকবাদীদিগেরই রচিত মনে করিতে হইবে। সুখই এই মতে জীবনের লক্ষ্য, কিন্তু সুখের মধ্যে কোনও গুণভেদ ইহা স্বীকার করে না। উচ্চতর সুখের জন্য হীনতর সুখে ত্যাগের কথা বলে না। কর্ম্মের ভালমন্দ পাপপুণ্য স্বীকার করে না। এই নীতিহীন সমাজবিরোধী মত যদি সমাজের সর্ব্বস্তরে বিস্তৃত হইত, তাহা হইলে সমাজধ্বংস অনিবার্য্য হইত। সুতরাং এই মত যে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা মনে করা যায় না। মেগাস্থিনীসের বিবরণ বহু পরবর্ত্তী হইলেও তাহাতে তৎকালীন সমাজ নীতিহীন বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। চৌর্য্য ও দস্যুতা তখন নিতান্তই বিরল ছিল।

কিন্তু চার্ব্বাকবাদী সকলেই যে সুখের গুণভেদ স্বীকার করিত না, তাহা না হইতেও পারে। দুই শ্রেণীর চার্ব্বাকবাদীর উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়—ধূর্ত্ত ও সুশিক্ষিত। উভয়ের মধ্যে কি ভেদ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। "সুশিক্ষিত" বিশেষণ হইতে মনে হয় সুশিক্ষিত চার্ব্বাকপন্থিগণ, উচ্চতর সুখকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

ভারতীয় দর্শনে চার্ব্বাক দর্শনের যে একটী মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যতই ঘৃণিত হউক, এই মতের সংঘাতে দার্শনিক চিন্তা নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল। অন্যান্য সকল দর্শন চার্ব্বাক-মত-খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছিল এবং যুক্তিহীন বিশ্বাস বর্জ্জন করিয়া যুক্তিদ্বারা স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

চার্ব্বাক দর্শনের সুখ-বাদের সহিত গ্রীক দর্শনের সুখ-বাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আরিস্টিপপাস সাইরেনাইক সম্প্রদায়ভুক্ত হন। তিনি সুখকেই জীবনের লক্ষ্য বলিতেন এবং সুখের গুণভেদ স্বীকার করিতেন না। এই সুখ দৈহিক সুখ, বর্ত্তমানের সুখ, সমগ্র জীবনের সুখ নহে। কোনও কর্ম্ম হইতে যদি সুখের উৎপত্তি হয়, তবে তাহা কর্ত্তব্য, পরিণামের কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই ছিল তাহার মত। কিন্তু সুখের প্রাপ্তি ও তাহার রক্ষার জন্য তিনি বিচার, আত্ম-সংযম ও বিশেষ বিশেষ কামনা জয় করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন—সুখের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা জয় করিতে হইবে, তাহার দাস হইলে চলিবে না। তাহার জন্য কোন্ সুখ বর্জ্জন করিয়া কোন্‌টি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার বিচার আবশ্যক। তাহার আত্ম-সংযমের অর্থ ভোগবর্জ্জন নহে, বিচারপূর্ব্বক ভোগ। সকল সুখই এক জাতীয়, ভালমন্দ তাহার মধ্যে নাই।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে এপিকিউরাসের আবির্ভাব হয়। তাহার শিষ্য নাস্তিক লাটিন কবি লুক্রেসিয়াস লিখিয়াছিলেন—"মানব জীবন যখন ধর্ম্মের নিষ্ঠুরতায় দলিত ও লাঞ্ছিত ছিল, তখন তিনি ধর্ম্মের নিগড় হইতে মানবকে মুক্ত করিয়াছিলেন।" এপিকিউরাস সুখকেই পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করিলেও তাহার দর্শন ছিল চরিত্রনীতিমূলক। জড়বাদ তাহার দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি হইলেও, এবং তাহাতে ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইলেও, তাহার মতে সৎকর্ম্মের ফল সুখ, এবং সেই জন্যই তাহা করণীয়। সমগ্র জীবনব্যাপী স্থায়ী ও শান্ত সুখই এপিকিউরাসের দর্শনের সুখ। দুঃখের সোপান বলিয়া অনেক তথাকথিত সুখ বর্জ্জনীয়। সুখের সোপান বলিয়া অনেক দুঃখ গ্রাহ্য। সমগ্র জীবনব্যাপী সুখ দৈহিক সুখ হইতে পারে না, তাহা আধ্যাত্মিক সুখ। দেহের অনেক সুখ জ্ঞানীর কাম্য হইতে পারে না। অবিচলিত ধৈর্য্য ও শান্তি, স্বকীয় উৎকৃষ্টতর স্বরূপের উপলব্ধি এবং অদৃষ্টের আঘাতের ঊর্দ্ধে স্থিতিই জ্ঞানীর আধ্যাত্মিক সুখ। এপিকিউরাস বলিয়াছিলেন সুকৃতি ও সুখ পরস্পর সম্বদ্ধ এবং সুকৃতি ব্যতীত সুখ, এবং সুখ ব্যতিরেকে সুকৃতি (virtue) অসম্ভব। আত্মসংযম, মিতাচার, সন্তোষ ও প্রকৃতির অনুগত জীবন ভিন্ন সুখ হইতে পারে না। চিত্তের প্রশান্তি ও মনের স্থৈর্য্যই স্থায়ী আনন্দের উৎস। সুখের বাস্তব অনুভূতি ভাবাত্মক সুখ, দুঃখের অভাব হইতে উদ্ভূত প্রশান্তির অনুভূতি অভাবাত্মক সুখ। এই অভাবাত্মক সুখই পুরুষার্থ। ভাবাত্মক সুখ আনন্দের বৃদ্ধি না করিয়া তাহা জটিল করিয়া তোলে। প্রকৃতির অনুসরণ করিলেই আনন্দ পাওয়া যায়। অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা অথবা ভবিষ্যৎ অনিষ্টের ভয় জীবনকে বিষাক্ত করে। মৃত্যু যখন আসে, তখন আমাদের অস্তিত্বের বিলোপ হয়, সুতরাং মৃত্যুকে ভয় করিবার কিছু নাই। দুঃখের প্রধান কারণ ভয়। মৃত্যু ও প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাস ভয়ের কারণ। মৃত্যুর পরে মানুষ দুঃখে পতিত হয়, ইহাই প্রচলিত ধর্ম্মে শিক্ষা দেয়। কিন্তু মৃত্যুর পরে দুঃখভোগ করিবার কেহ থাকে না। সুতরাং ভয়ের কারণ নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিলেও এপিকিউরাস দেবতাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু দেবতাগণ মানুষের সম্বন্ধে কিছুই করেন না। এই সুখবাদ ও চার্ব্বাকবাদ নিতান্ত ভিন্ন।

আর্য্য সঙ্গীতে ছয় রাগ

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল্

সঙ্গীতে রাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে রাগ কাহাকে বলে তাহারই আলোচনা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ রাগ সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকের ধারণা অতি তরল। সেইজন্য ইহার আলোচনা একটু বিশদভাবে করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হয়। লোকে বলে—'রেগে আগুন'। ইহা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে স্বাভাবিক অবস্থায় বিকার ঘটিয়াছে। তাহা হইলে প্রশ্ন হয় স্বভাব কাহাকে বলে। যাহা কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দেশ, কাল, সুখ, দুঃখ, প্রবৃত্তি আদির মূল কারণ তাহাই স্বভাব। স্ব অর্থে আত্ম সুতরাং প্রকৃতিগত আত্মার ভাবই স্বভাব। এই স্বভাবই ব্যাপকাখ্য জীব ও ব্যাপকাখ্য ঈশ্বর। অর্থাৎ আধার ও আধেয়রূপে জীব ও ঈশ্বর। এই স্বভাবই সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠান করে। সুতরাং স্বভাবই কারণ তদ্ব্যতীত সমুদায়ই কার্য্য। পুণ্য ও পাপ যেমন পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়াও একত্রে বাস করে সেইরূপ জ্ঞান জড় না হইয়াও জড়দেহে নিবদ্ধ। জ্ঞান আত্মা হইতে উৎপন্ন। জ্ঞান মনের ধর্ম্ম। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই বিষয় বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। এই যদি স্বভাব হয় তবে ইহার বিকার পরিদৃশ্যমান হয় কি করিয়া। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে বিকার ঘটাইবার শক্তি একমাত্র অগ্নিতেই অবস্থিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে যখন কোন জিনিষ রং করা হয় তখন তাহার বিকার ঘটে। কিন্তু অগ্নি কোথায়। একটু চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইবে যে সাধারণতঃ অগ্নি বলিতে স্থূল অগ্নি বিবেচনা করি। কিন্তু তাপকেও অগ্নি বলা হয়। এই তাপ সর্ব্ব বিষয়ে বর্ত্তমান। যেমন দুই খণ্ড প্রস্তর ঘর্ষণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। প্রস্তর খণ্ডে অগ্নি নিহিত হেতু স্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব। এই অগ্নি সর্ব্ব বিষয়ে বর্ত্তমান। প্রশ্ন উঠে বিষয় কাহাকে বলে। "গ্রহণেন গ্রাহ্যো যথা ব্যবহ্রিয়তে স বিষয়ঃ।" বিষয় কথাটি বি-সি+অন্ক প্রত্যয়ে সিদ্ধ। সি ধাতু অর্থে বন্ধন। যাহা আত্মাকে মোহ পাশে বন্ধন করে তাহাই বিষয়। গ্রাহ্য ও গ্রহণের সম্পর্ক কল হইল বিষয়। অগ্নি হেতু বিষয় জ্ঞান হয়। অগ্নি সোমাত্মক সৃষ্টি। ইহাই শিবশক্তির কার্য্য। "শিবাগ্নিনা তনুং দগ্ধা শক্তি সোমামৃতেন সঃ।" শিব দগ্ধ করেন আর শক্তি অমৃত বর্ষণ করিয়া নব প্রাণে সঞ্জীবিত করে। জীবের মূলাধারে শিবরূপী অগ্নি অবস্থিত এবং সহস্রারে সোমরূপী চন্দ্র অবস্থিত। চন্দ্র সোমরস ক্ষরণ করিয়া শিবরূপী অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে। ইহা হেতু জীব দেহ ধারণে সক্ষম। অগ্নিই গতি দান করে। বিজ্ঞানোপাধিক বহ্নি চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীরকে সচেতন করে। প্রাণ বিজ্ঞান ও চিদাত্মার সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টমান হয়। বিজ্ঞানাত্মা, চিদাত্মা ও প্রাণের সমষ্টিই জীবাত্মা। ইহাতেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদায় প্রতিষ্ঠিত। অগ্নিই গতি দান করিয়া রতি শক্তি প্রদান করে। রতি অর্থে অনুরাগ।

পুরানে উল্লিখিত আছে যে মহর্ষি অঙ্গিরা তপঃ প্রভাবে অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়েন এবং হুতাশনের বরে বৃহস্পতিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েন। বৃহস্পতি ভৌতিক তত্ত্বে তেজস্বিতা বুঝায়। অগ্নি নানা প্রকার। বহুবিধ কর্ম্ম দ্বারা বিখ্যাত। এক একটী পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম সম্পাদন করে। অঙ্গিরা হইতে শুভার গর্ভে বৃহৎকীর্ত্তি, বৃহৎজ্যোতি, বৃহৎমনা, বৃহদ্ভাস ও বৃহস্পতির উদ্ভব। ভানুমতী ও রাগা ইঁহাদের কন্যা। এই রাগাই সর্ব্বভূতের অনুরাগ উৎপন্ন করে। ইহারা সকলেই বৃহস্পতি হইতে বিচার্য্য। অঙ্গিরার তৃতীয় কন্যা শিনি বালি অতিশয় তনুত্ব প্রযুক্ত রতি শক্তি প্রদান করে। শিনি কথাটি শি+নিক্ক প্রত্যয়ে সিদ্ধ। শি অর্থে তীক্ষ্ণ করা। তনু কথাটি তন্+উ+ক প্রত্যয়ে সিদ্ধ। তন্ অর্থে বিস্তার করা। যে অগ্নি দুঃখিত লোকের মঙ্গল সাধন করে তাহার নাম শিব। যে অগ্নি তপস্যায় সিদ্ধি প্রদান করে তাহার নাম পুরন্দর। পুরন্দর কথাটী পুর+দৃ+খপ ক্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। পুর অর্থে নগর, গৃহ। দৃ অর্থে বিদারণ করে। অর্থাৎ যিনি দেহরূপ গৃহ বিদারণ করেন অর্থাৎ ইন্দ্রাগ্নি যাহা চিৎ স্বরূপ রবির জন্ম নক্ষত্র। যখন বায়ু সহায়ে অগ্নি পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয় তখন উহা শুচি অর্থে শৃঙ্গার নামে অভিহিত হয়। ইহা কালচক্রে মিথুন রাশি হইতে বিচার্য্য। বিশ্বজিৎ অগ্নি লোকের বুদ্ধি আক্রমণ করে। বিশ্বজিৎ—বিশ্ব+জি (জয় করা)+ক্কিপ্ কা প্রত্যয়ে সিদ্ধ। বিশ্ব কথাটী বিশ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বিশ্ অর্থে প্রবেশ করা। যে অগ্নি প্রাণকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহার নাম কবি। কবি অর্থে সূর্য্য, ব্রহ্মা কবি—কু+ইন্ ক। কু অর্থে ধ্বনি, পৃথিবী। ক্রোধাগ্নির নাম মন্যু। তাঁহার ভার্য্যা স্বাহা। এই সমুদয় অগ্নি স্থূলত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—গৃহপতি, দক্ষিণা ও আহবণী। জীবের যাহা কিছু জ্ঞান বা বোধ এই তিন অগ্নি সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

রাগই অগ্নি স্বরূপ। রাগ কথাটি রনজ্+ঘঙণ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। রণজ্—অর্থে রং করা অর্থাৎ চিত্ত বিনোদন করা। যাহা মনের এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার উদ্ভব করে তাহাই রাগ। যখন দেহস্থ অগ্নি দেহস্থ বায়ু সাহায্যে মনের বিকার ঘটায় তখন রাগ উৎপন্ন হয়। এই রাগ জীবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী উদ্দীপ্ত হয়। অন্তঃকরণ রাগের অধীনে শরীরস্থ বায়ুকে সঞ্চারণ করে। সেই কারণ রাগ উদ্দীপ্ত অগ্নি স্বরূপ। রাগ হেতু দেবাদিদেবের পঞ্চবদন।

অগ্নি জাত বেদ। চিৎ ও অচিতের মিলনে প্রথমেই অগ্নির উৎপত্তি। ঋগ্বেদে উক্ত আছে—

"অপো হ যদ্ বৃহতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।"

যখন আপ সমূহ অর্থাৎ কারণ বারি বিশ্বে প্লাবিত হইয়াছিল সে সময় তাহাদের গর্ভাধান হয় এবং তাহারা অগ্নিকে প্রসব করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

“শুভ্র-সমুজ্জ্বল
হে চির-নির্ম্মল—”

ফটো : গৌর দত্ত

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সারনাথের সাক্ষী

ফটো : সমরেন্দ্রনাথ মিত্র
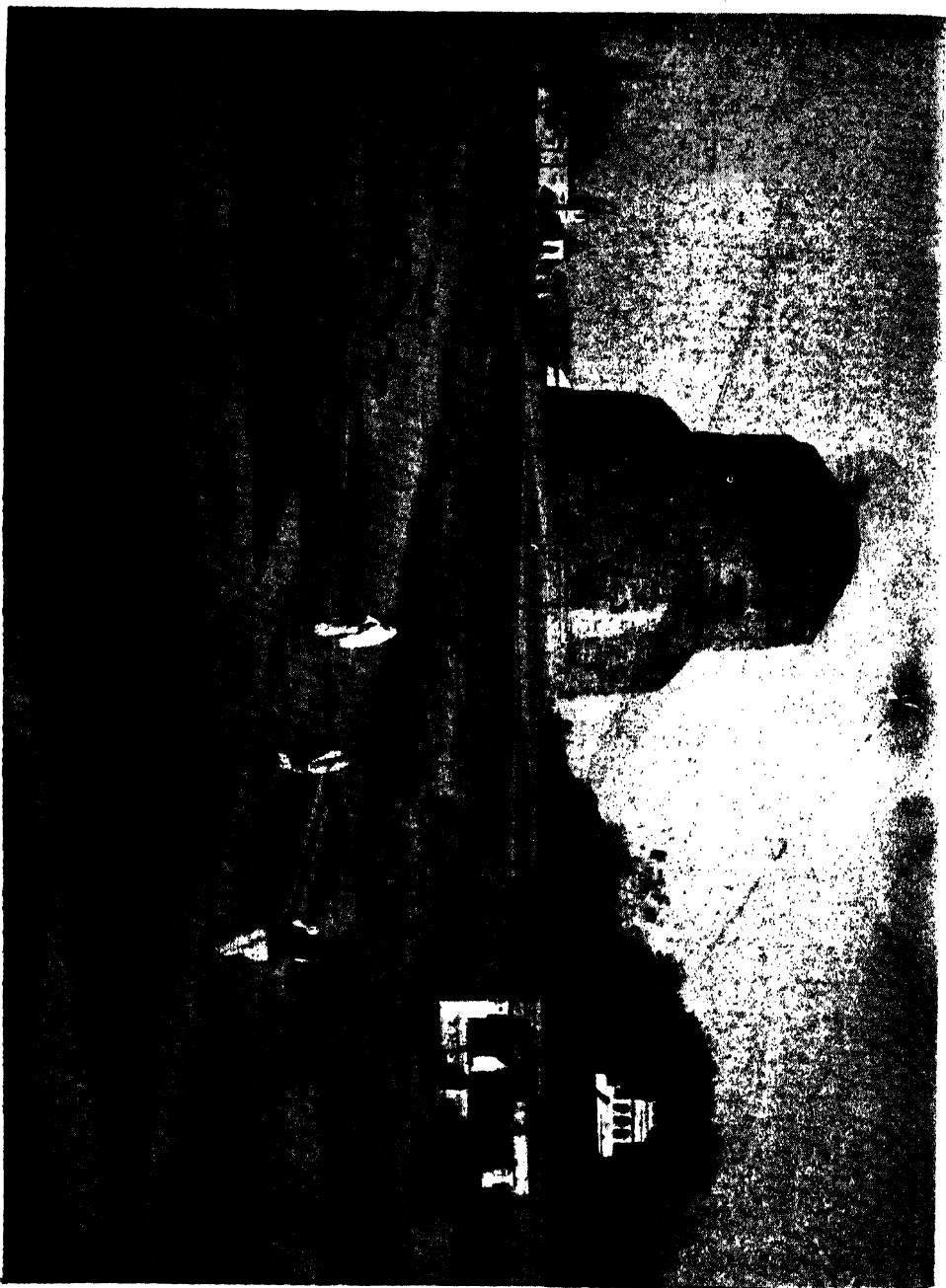
তাহার প্রভাবেই অগ্নি জাতবেদা ও জ্ঞান দেবতা। তাহার প্রভাবেই আমাদের দেহ মন ইত্যাদি সকল বস্তুই কার্য্য করে।

মনই অচিত। মনই ব্রহ্মা। ব্রহ্মার মন হইতে কামদেব উৎপন্ন। কামদেব হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সৃষ্টি প্রবৃত্তি প্রদান করে। যাহা কর্ম্মসাধ্য তাহা বিনাশী—কাম কালচক্রে লগ্নাৎ, চন্দ্রাৎ বা শুক্রের সপ্তম হইতে বিচার করিতে হয়। এই কাম যখন স্বার্থ ভুলিয়া পর কল্যাণে রত হয় তখন বৈষ্ণবমতে প্রেম হয়। এই কারণে প্রেমিকের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ।

মনকে সাধারণতঃ চিত্ত বলা হয়। ইহা অন্তঃকরণ ত্রয়ের মিলিতাবস্থা। কিন্তু ত্রিভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণের এক মৌলিক অংশ এই মন নহে। তাদৃশ মৌলিক মনের কার্য্য কেবল সংস্কারাধান বা স্থিতি। কারণ জ্ঞান ও চেষ্টা বা প্রখ্যা (সদৃশী) ও প্রবৃত্তি যখন বুদ্ধি ও অহঙ্কারমূলক তখন অবশিষ্ট স্থিতিরূপ অন্তঃকরণ ধর্ম্ম মনের হইবে। এই মনেতে বাহ্যকরণ হেতু যে তরঙ্গ উঠে তাহাই ভাব। এই ভাব যখন স্থায়ী হয় ও রতিযুক্ত হয় তখন তাহা রসে পরিণত হয়। এই মনই ব্রহ্মা।

মনই বুদ্ধিকে অভিভূত করে তাই কাম অনঙ্গ হইয়া সর্ব্বশরীরে ও ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করে। চৈত্রমাসের সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশীর দেবতা কাম বলিয়া উহা মদন ত্রয়োদশী বলিয়া বিখ্যাত, কামই বৈচিত্র্য প্রদান করে। এই তিথিতে প্রাণকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়া দেখাইয়াছেন যে কাম থাকিতেও ঈশ্বরকে ব্রহ্মরূপে না জানিয়া নিজ পতিরূপে উপলব্ধি করা যায়।

পুষ্প হইতে ফল। তাই ফলোৎপাদন হেতু ইনি পুষ্পধন্বা। কামের অপর একটী নাম মকরকেতন। তপরাশি মকর—কামের কৃপা না হইলে তপস্যা হয় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় কামের আয়ুধ। তাহারাই তাহার পঞ্চবাণ। দুষ্পার কামসাগর নব নব উর্ম্মিমালায় পূর্ণ। রমণীয় ঘটনাবলি ইহাতে মকর ও কুম্ভীর রূপে সঞ্চরণ করে। এই সাগরে মিলিত হইবার জন্য বেগে রতি স্রোত প্রবাহিত হয়। অভাব বোধই কামের কারণ। অভাব বোধ সত্ত্বেও অভাব পূরণের নিমিত্ত অপকর্ম্ম না করিয়া দুঃখ ভোগই তপস্যা। কাম নিম্নগামী হইলে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাম। কাম নিম্নপথে বাধা প্রাপ্ত হইয়া উন্নত পথে অগ্রসর হয় তখনই মানসিক উন্নয়ন। শনি সংযত করে। রাহু অশুভ প্রকাশ আবরণ করে। মূল রস কামের বেলা আদিরস বা মধুর রস। ইহার বেগ উন্নয়ন হইলে প্রেমিক কবি হয়, রূপোন্মাদী শিল্পী হয়, নিষ্ঠুর অস্ত্র-চিকিৎসক হয়, ত্যাগী যোগী হয়। পঞ্চ ইন্দ্রির একধারে রতি স্বামী। তাই পঞ্চ পাণ্ডব পাঞ্চালীর স্বামী।

জ্ঞানের দ্বারা সংযত হইবার অভ্যাস হইলেই বিবেকের, জ্ঞানের তেজ বৃদ্ধি হয়। যম নচিকেতাকে এই বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। শনি ও কেতু শুভ হইলে অগ্নি বিদ্যা প্রদান করে।

কামদেবের হস্তে নাশের পঞ্চপত্রী। তাহারা যথা—সম্মোহন—যাহা মুগ্ধ ও আবিষ্ট করে, সমুদ্বেগ—যাহা মনের বেগ দান করে, শোষণ যাহা মানসিক স্থৈর্য্য বিনাশ করে, উন্মাদনা—যাহা মত্ততা প্রদান করে এবং স্তম্ভন—যাহা ক্লান্তি, মূর্চ্ছাদির দ্বারা নির্ব্বেদ অবস্থায় লোপ করে। ইহাদের লক্ষ্য করিয়া কামকে সংযত করা উচিত। বিশুদ্ধ জ্ঞানই বিবেক উদ্বুদ্ধ করে। কার্য্য কারণ ব্যতীত জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। কার্য্য কারণ প্রকৃতির নিয়ম। দৈব বা নিয়তি বিধি অপেক্ষা বলবান। কালই নিয়মানুযায়ী ফলপ্রদান করে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লিখিত আছে যে শ্রীদামের অভিশাপে শ্রীমতীকে শতবর্ষ বিরহ বিচ্ছেদ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কাম ভদ্র অভিলাষও প্রদান করে। ফলোৎপাদনে যত্ন করে। কামের স্ত্রী রতি। যদি শুদ্ধ ভালবাসা থাকে কামই উন্নতি প্রদান করে। ইহাই বৈষ্ণবদিগের "সহজিয়া" পন্থা। এই রতি হইতে প্রীতি অর্থে ভালবাসা এবং তাহা হইতে প্রেম। এই প্রেম যখন স্বার্থশূন্য হয় তখন প্রণয় অর্থাৎ মনকে অন্যদিক হইতে ঘুরাইয়া আনে এবং রঞ্জিত করিয়া রাগ উৎপন্ন করে। এই রাগ হইতে অনুরাগ যাহা মনকে বিষয়ান্তর হইতে বিরত করে এবং তখন মন এক ভাবে মাতিয়া উঠে এবং তখনই হয় ভাব এবং এই ভাব হইতে মহাভাব যাহা মহাপ্রভুর ও শ্রীরামকৃষ্ণের হইয়াছিল। এই মহাভাব হইল আত্ম-নিবেদন। অর্থাৎ যখন সর্ব্বভাবযুক্ত সমিধ সহিত অগ্নিরূপী আত্মায় আধার রূপ অহন্তায় আহুতি প্রদান করা হয় তখনই মহাভাব উৎপন্ন হয়। ইহাই আহবনী অগ্নির ক্রিয়া।

বশিষ্ঠ পুত্র কশ্যপ, প্রাণপুত্র প্রাণ ও অঙ্গিরা পুত্র চ্যবন ও ত্রিগর্ব্বাচার তপস্যায় পঞ্চবর্ণ মহাপ্রভাব পঞ্চতেজ উৎপন্ন হয়। বৃহজ্জাবাল উপনিষদে উক্ত আছে যে উহারই পঞ্চাননের পঞ্চবদন। এই পঞ্চবদন হইতে পঞ্চভূত ও পঞ্চবর্ণ উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চবর্ণ হইল পঞ্চরাগ।

সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরবর্ণ বিশিষ্ট ধ্বনি ভেদ হেতু যাহা সকলের চিত্তকে রঞ্জন করে তাহাই রাগ নামে অভিহিত হয়। শাস্ত্র যথা—

> "যো অসৌ ধ্বনি বিশেষস্তু স্বরবর্ণ বিভুষিতঃ।
> রঞ্জকো জন চিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ॥"

মতঙ্গদেব—

> "যথা শ্রবণ মাত্রেন রঞ্জন্তে সকলা প্রজাঃ।
> সর্ব্বেষাং রঞ্জনাদ্ধে তো স্তেন রাগঃ ইতি স্মৃতঃ॥"

সোমেশ্বর—

যাহা শ্রবণে সকলের চিত্ত বিনোদন হয় এবং সকলের চিত্ত বিনোদনের হেতু যাহা তাহাই রাগ। "রঞ্জয়তীতি রাগঃ।"

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে "রঞ্জয়তীতি রাগঃ" যদি হয় তাহা হইলে রাগিণী কি করিয়া হয়। স্ত্রীলোক যেমন সুন্দর সুশ্রী পুরুষও সেইরূপ সুন্দর সুশ্রী হয়। এই সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও যেমন তাহাদের প্রভেদ সেইরূপ রাগ ও রাগিণীর মধ্যে প্রভেদ। রঞ্জন যদিও উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান, কিন্তু সেই রঞ্জনের প্রকার ভেদ আছে। রূঢ়ত্ব হেতু রাগ পুরুষ বাচ্য প্রাপ্ত। রাগের এই রূঢ়ত্ব সম্বন্ধে সঙ্গীত রত্নাকর বলেন—

"অশ্বকর্ণবৎ রূঢ়ো যৌগিকো বা মন্থবৎ।
যোগরূঢ় অথ বা রাগো জ্ঞেয় পঙ্কজ শব্দবৎ ॥"

শালবৃক্ষ যেমন রূঢ়, যোগস্থ ব্যক্তি যেমন সাবলীলতা হীন, মন্থ দণ্ড যেমন শোভাহীন এবং কর্দ্দমযুক্ত স্থানের ধ্বনি যেমন কর্কশ রাগও সেইরূপ রূঢ়। এই কারণে রাগ পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

আর্য্য সঙ্গীত শ্রুতির বিশেষ বণ্টনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বিশেষ বণ্টনে সপ্তকগঠিত। শ্রুতির বণ্টন যথা—৪ ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ২। ইহাই হইল আদি সপ্তক বা ষড়জ গ্রাম। এই যে বিশিষ্ট স্বর বিন্যাস ইহারা সকলেই শুদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোন স্বরই বিকৃত নহে। এই হেতু এই গ্রামকে পুরুষ আখ্যা প্রদান করা হয়। যাহা বিকৃত তাহাই প্রকৃতি। বিকার প্রকৃতিরই হয় পুরুষের বিকার নাই। এই ষড়জ গ্রামকে বিকার করিবার জন্য মধ্যম ও গান্ধার গ্রামের উৎপত্তি। এই দুই গ্রামের মিশ্রণে যাবতীয় রাগ ও রাগিণী সৃষ্ট। যেখানে ষাড়জী গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল তাহা রাগ নামে পরিচিত ও যেখানে মধ্যম বা গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল তাহা রাগিণী নামে পরিচিত। এ সম্বন্ধে রাগ ও রাগিণীর আলোচনাকালীন বলা হইয়াছে।

রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে ছয় রাগ, কাহারও মতে সাত রাগ কাহারও মতে আরও অধিক। আধুনিক সঙ্গীতশাস্ত্রবিদদের মতে সমস্তই রাগ, রাগিণী বলিয়া কিছুই নাই। রাগিণী আছে কি নাই তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। কোনও মতের স্থিরতা নাই। এবং যাহারা বলেন সমস্তই রাগ তাহারা রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞান দিতে পারেন না। সঙ্গীত শাস্ত্র রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন যে পঞ্চাননের পঞ্চমুখ অগ্নির পঞ্চ শিখা। এই পঞ্চমুখ হইতে পঞ্চরাগের উৎপত্তি। শিব হইল নাদ রূপী শব্দ ব্রহ্ম। নাদ অগ্নিরূপী। নাদ সম্বন্ধে সঙ্গীত শাস্ত্র বলেন—

"ন-কারং প্রাণ নামানাং দ-কারং অনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নি সংযোগত্বেন নাদোঽভিধীয়তে ॥"

সঙ্গীত দর্পণ—

ন-কার হইল প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু এবং দ-কার হইল অগ্নি। অর্থাৎ দেহস্থ অনল ও অনিলের পরস্পর সংযোগ হেতু নাদ রূপে প্রকাশ পায়। এই অগ্নিই কাম কলা রূপা কুণ্ডলিনী। এই কুণ্ডলিনী শক্তি মানব দেহের মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত। মেরুদণ্ডই পঞ্চভূতের আধার স্বরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহ ধারণ করে এবং তাহাদেরই জ্ঞানের সহায় মস্তিষ্ককেও ধারণ করে। জ্ঞান দেবতা শিব পরশু দ্বারা অহং ও ইদং জ্ঞান উৎপন্ন করেন। এই কারণ হেতু পঞ্চাননের পঞ্চ বদন হইতে পঞ্চ রাগ ও দেবীর মুখ কমল হইতে এক এই সর্ব্বসাকুল্যে ছয় রাগ। অর্থাৎ শিব শক্তি সহযোগে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর উদ্ভব। পঞ্চাননের পঞ্চ বদন যথা—

সদ্যোজাত—ইহা ক্ষিতিভূত জ্ঞাপক। ইহার বর্ণ-সিত। এই মুখ হইতে শ্রীরাগ উৎপন্ন। ধরা পৃথু রাজার কন্যা বলিয়া পৃথিবী। তপ রাশিতে আদিত্যের অবস্থানকালে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রী অগ্নিকুমারের সহিত মিলিত হওয়া হেতু এই তিথি শ্রীপঞ্চমী বলিয়া খ্যাত। এই তিথিতেই বাক্‌দেবীর পূজা। তাই এই রাগের অধিষ্ঠান কণ্ঠে।

বামদেব—ইহা অপভূত জ্ঞাপক। ইহার বর্ণ রক্ত। এই মুখ হইতে বসন্ত রাগের আবির্ভাব। মনরূপ চন্দ্র যখন ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণ হয় তখন ভগবানের দোললীলা। ধরিত্রী তখন নব অনুরাগে রঞ্জিত। সেই হেতু ইহার অধিষ্ঠান ওষ্ঠে।

অঘোর—ইহা অগ্নিভূত নির্দ্দেশক। ইহার বর্ণ কনক। কনক কথাটী কন (দীপ্তি পাওয়া) + অন্ ক প্রত্যয়ে সিদ্ধ। এই মুখই হইতে ভৈরব রাগের উৎপত্তি। ধ্বনিষ্টা নক্ষত্রে সবিতায় অবস্থানকালীন কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবরাত্রি। তাই ইহার অধিষ্ঠান তালুতে। রসনার বিকার হেতু অবিকৃত তালু হইতে ধ্বনি ভেদ হয়।

তৎপুরুষ—বায়ুভূত জ্ঞাপক। ইহার বর্ণ নীল। অগ্নি হইতে নীলের উৎপত্তি। কালকুট ভক্ষণে কণ্ঠ নীল বর্ণ। রেবতী নক্ষত্রে রবির থাকা কালীন নীলের উৎসব। এই আনন হইতে রাগ পঞ্চম উৎপন্ন। রসের আস্বাদ রসনায়। সেই কারণ এই রাগের অধিষ্ঠান রসনায়।

ঈশান—ব্যোমভূত জ্ঞাপক। ইহার বর্ণ পিঙ্গল। পিঙ্গল কথাটী পিনজ ধাতু হইতে উৎপন্ন। পিনজ্, অর্থে রং করা। মিশ্রিত বর্ণ অর্থাৎ নীল পীতাদি। মেঘের বর্ণই পিঙ্গল। সেই হেতু এই মুখ হইতে মেঘ রাগের উৎপত্তি। দেহস্থ অগ্নি হেতু শীর্ষস্থ সোমবর্ধিত হয়। সেই হেতু এই রাগের অধিষ্ঠান মুর্দ্ধায়।

অগ্নির আলোচনা কালীন দেখান হইয়াছে যে অগ্নি দুঃখিত লোকের মঙ্গল সাধন করে তাহাই শিব। অঙ্গিরা কন্যা শিনি বালি অতিশয় তনুত্ব প্রযুক্ত জীবের রতি শক্তি প্রদান করে। তনু শব্দটী তন্ (বিস্তার করা) + উ ক প্রত্যয়ে সিদ্ধ। অর্থাৎ যিনি বিস্তার করেন। প্রকৃতি শক্তিই জীবের বিস্তারের কারণ। অগ্নি যখন বায়ু সহায়ে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয় তখন তাহাকে শুচি নামে অভিহিত করা হয়। অনিল ও অনল সংযোগেই নাদের উৎপত্তি। কালচক্রের মিথুন রাশির বৈদিক নাম শুচি। মিথুন রাশিই হইল প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন জ্ঞাপক। মিথুন কথাটি মিথ অর্থে বধ করা হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ যাহা পুরুষকে আবরিত করে। প্রকৃতি শক্তির আবরণ হেতু জীবের আত্ম বিস্মরণ। এই মিথুন রাশির অধিপতি হইল আদ্রা নক্ষত্র। আদ্রা নক্ষত্রের দেবতা শিব যিনি দুঃখ হইতে ত্রাণ করেন। এই আদ্রার সংখ্যা হইল ছয়। কাজেই রাগ হইল ছয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাগ উদ্দীপ্ত অগ্নি স্বরূপ। মিথুন রাশির অপর একটী নাম নট রাশি। কারণ শিবের এক নাম নটরাজ। এই পঞ্চ রাগ শ্রবণে দেবী আনন্দে দ্রবীভূত হওয়া হেতু নারা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। যেহেতু তিনি নটরাজের গীত শ্রবণে নার আশ্রয় করিয়া নিজে একটী গাহিয়াছিলেন। সেই হেতু রাগটির নাম হইল নট নারায়ণ। এই নারায়ণ সম্বন্ধে কূর্ম্ম পুরাণে (ষষ্ঠোঽধ্যায় পূর্ব্বভাগঃ—পঞ্চম শ্লোক) উক্ত আছে—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

আপ্ হইল নারা, নর প্রসূত। তাহারই আশ্রয় নারায়ণ। নারা—প্রধান নরের প্রসূত নর সূনব। এক বস্তু হইতে অপর বস্তু উৎপন্ন হইলে উৎপন্ন বা উৎপাদিত বস্তুকে পুত্র বলা হয়। নর হইতে উৎপন্ন নারা এবং তাহাই আপ্। আপ্ শব্দের অর্থ হইল ইন্দ্রেন আপ্তাঃ ইতি আপ্। আপকে সরস্, অর্ণ ও ইদম্ বলা হয়। ইন্দ্রাৎ প্রাপ্তা ইতি আপঃ। ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বেদে জলকে আপ বলা হইয়াছে। অকারাদি বর্ণকেও আপ বলা হয় কারণ বর্ণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি অঙ্গিরা হইতে শুভারগর্ভে বৃহস্পতির আবির্ভাব। অঙ্গিরা কথাটী অঙ্গ (জ্ঞান) + ইরস্ বা অন্গ (গমন করা) + ইরস্ হইতে উৎপন্ন। শুভা কথাটী শুভ্ (শোভা পাওয়া) + ক প্রত্যয়ে সিদ্ধ। অর্থাৎ জ্ঞান হইতে যাহা শোভা প্রাপ্ত হয় তাহাই বৃহস্পতি অর্থাৎ বাগ্মী নাদ। জ্ঞান দেবতা শিব। মিথুন রাশির সপ্তম হইল সহস্য রাশি। সপ্তম হইতে গমনের বিচার। সহস্য কথাটী সহস্ শব্দ হইতে হইতে উৎপন্ন। সহস্ অর্থে শক্তি, জ্যোতি। সহস্য রাশির অপর নাম হইল ধনু রাশি। ধনু হইল শক্তির প্রতীক যাহাতে গুণ যোজনা করা হয়। গুণ হইল ত্রি। এই কারণে ইহা হইল প্রকৃতি। ইহার অধিপতি হইল বৃহস্পতি। বৃহস্পতির সংখ্যা হইল ছত্রিশ। এই কারণ রাগিনী হইল ছত্রিশ।

আর্য্য সঙ্গীতে রাগ ও রাগিণীর আলোচনাকালীন বলা হইয়াছে যে কম্পিত রসনা, কণ্ঠ, তালু, দন্ত, মূর্দ্ধা ও ওষ্ঠ দ্বারা আঘাত নিমিত্ত বিভিন্ন শব্দ প্রকাশিত হয়। ইহাই আহত ধ্বনি এবং এই ছয় স্থানে ছয় রাগের অধিষ্ঠান। তাহাদের প্রত্যেক স্থানে ছয় শক্তির ক্রিয়া হেতু ছত্রিশ রাগিণী। এই ছত্রিশ রাগিণীর ছত্রিশ ব্যঞ্জন বর্ণ। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনার বাসনা রহিল। এক্ষণে ছয় রাগের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীরাগ

"ষড়জে ষাড়জী সমুদ্ভূত শ্রীরাগঃ"

"সঙ্গীত রত্নাকর"—

"ষাড়জী গ্রাম সমুদ্ভূত এবং ষড়জ স্বরে অধিষ্ঠিত। ষড়জ স্বর হইল আদিস্বর সেই হেতু এই রাগের অধিষ্ঠান ষড়জ স্বরে। ইহাতে সপ্তস্বর ব্যবহৃত হয় এবং আরোহণে ধৈবত ও গান্ধার বর্জ্জিত। শাস্ত্র যথা—

"সম্পূর্ণো রিষভাদি স্যাদারোহে ধগ বর্জ্জিতঃ।"

আরোহণে ধৈবত ও গান্ধার বর্জ্জিত হইবার কারণ ধৈবত হইল শৃঙ্গার রস জ্ঞাপক এবং গান্ধার হইল ক্রোধ জ্ঞাপক। আরোহণেই রাগের রূপ প্রতীয়মান হয়।

পুরাণে উল্লিখিত আছে যে দেবরাজ লক্ষী দেবীকে দৈত্যরাজকে পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে লক্ষী দেবী কহিলেন যে দৈত্যরাজের সংযমন শক্তি বিনষ্ট ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়া হেতু তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। দেবরাজ কহিলেন—কি উপায়ে আপনারে চিরদিন ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইব। লক্ষীদেবী কহিলেন—আমাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া চারি স্থানে সংস্থাপিত কর। তাহাতে দেবরাজের অনুরোধে নিজেকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া প্রথমাংশ পৃথিবীতে, দ্বিতীয়াংশ সলিলে, তৃতীয়াংশ অগ্নিতে এবং চতুর্থাংশ যোগীদিগের মধ্যে সংস্থাপিত করিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীরাগ সদ্যোজাত মুখ হইতে উদ্ভূত এবং ইহা ক্ষিতিভূত জ্ঞাপক। ইহা বিষ্ণুশক্তিসম্পন্ন, ত্রিলোকব্যাপ্ত, বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণ ও সলিলোত্থিত। ইহাতে মধুর রস নিবদ্ধ এবং ইহা পর্ব্ব পর্ব্ব করিয়া বৃদ্ধি পায়।

ভৈরব রাগ

"সম্পূর্ণো ভৈরবঃ প্রোক্তো গান্ধারাদি মূর্চ্ছনাঃ।"

হৃদয় প্রকাশ—

ইহাতে সপ্তস্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে গান্ধার মূর্চ্ছনা প্রবল। এই মূর্চ্ছনায় নাম হইল অশ্বক্রান্তা। গান্ধার স্বর হইল শঙ্কর দৈবত যিনি পরশু দ্বারা বুদ্ধি তত্ত্বকে দ্বিধা করিয়া অহং ও ইদং জ্ঞান উৎপন্ন করেন।

ইহা অঘোর মুখ হইতে উৎপন্ন এবং ইহা অবিকারী শক্তি সম্পন্ন। ইনি সর্ব্বভূতে রত হওয়া হেতু ভূতনাথ। ইহার মস্তকে সমুদ্রোত্থিত চন্দ্র অবস্থিত। ইনি সকল গুণের আশ্রয় স্বরূপ বলিয়া নির্গুণ হইয়াও গুণময়। ইনি সকল চিন্তার অতীত বলিয়া অবাঙ মনসো গোচর।

বসন্ত রাগ

"ষড়জাদি মূর্চ্ছনা মান্তা গনি তীব্র বসন্তিকা।"

পারিজাত—

ইহাতে ষড়জাদি মূর্চ্ছনা প্রবল এবং গান্ধার ও নিষাদ তীব্র। ষড়জাদি মূর্চ্ছনার নাম হইল উত্তর মন্দ্রা। ইহাতে গান্ধার ও নিষাদ চতুঃ শ্রুতি সম্পন্ন। চতুঃ শ্রুতিক গান্ধার হইল কাকলি গান্ধার প্রসারিণী নামক শ্রুতিতে অবস্থিত। প্রসারিণী শ্রুতি শৃঙ্গার রস জ্ঞাপক। চতুঃশ্রুতিক নিষাদ হইল কাকলি নিষাদ। শ্রুতি হইল কুমুদ্বতী যাহা দেহ ও মনকে মুদ করে অর্থাৎ হৃষ্ট করে। কাকলি অর্থে মধুর অস্ফুট কূজন।

ইহা বামদেব মুখ হইতে উৎপন্ন। বামদেব হইল কন্দর্প। অর্থাৎ কামদেব। ইহাতে উন্মাদনা, সর্ব্বব্যাপী প্রবল ইন্দ্রিয় শক্তি আবদ্ধ। ইহা শৃঙ্গার রসাত্মক ও দোলন জ্ঞাপক।

মেঘ রাগ

"মেঘ পূর্ণ ধত্রয় স্যাৎ উত্তরায়তা মূর্চ্ছনা।
বিকৃতো ধৈবতো জ্ঞেয় শৃঙ্গার রস পূরকঃ॥"

সঙ্গীত দর্পণ—

এই রাগেতে উত্তরায়তা মূর্চ্ছনা প্রবল। অর্থাৎ ধৈবত হইতে যে মূর্চ্ছনা সমুদ্ভূত। ধৈবত শৃঙ্গার রস জ্ঞাপক। ধৈবত স্বর বিকায় করিলে

রোহিণী নামক শ্রুতিতে অবস্থিত হয়। রোহিণী কথাটী রুহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। রুহ অর্থাৎ বীজ বপন করা।

ইহা ঈশান মুখ হইতে জাত। সমুদ্র মন্থন করলে দাবানল উথিত হইয়া গণ হেতু কামাগ্নিতে রূপায়িত হইয়' দেহাকাশ কর্ষণ করিয়া রস বর্ষণে জীবের জীবন ধারণ কার্য্য সমাধা করে।

নট নারায়ণ

"নট নারায়ণো রাগঃ কাকল্যন্তর রাজিতঃ।"

মন্দর্যাম—

নট নারায়ণ রাগেতে কাকলি নিষাদ ও কাকলি গান্ধার ব্যবহার্য্য। কুমুদ্বতী ও প্রসারিণী নামক শ্রুতিতে এই দুই স্বর অবস্থিত। কাকলি অর্থে মধুর, অস্ফুট কুজন। ইহাতে শৃঙ্গার রস নিবদ্ধ। ইহা শিবশক্তি মিলন জ্ঞাপক।

ইহা দেবীর মুখ কমল হইতে জাত। ইহা কামাদি যুক্ত ও মৈথুনাভিলাষিতার পরিচায়ক। ইহা মধুর অস্ফুট হর্ষোধ্বনি যুক্ত কম্পন হইতে কামোদক নিঃসৃতের পরিচায়ক।

রাগ পঞ্চম

"মধ্যম পঞ্চমীজাত কাকল্যন্তর সংযুক্তঃ।
হৃষকা মুর্চ্ছনাপেতো গেয় কামারি দৈবতঃ॥"

রত্নাকর—

এই রাগ মধ্যম গ্রাম জাত। মধ্যম স্বরের দেবতা সবিত্রী যিনি ব্রহ্মার বামে অধিষ্ঠিত। ইহাতে হৃষ্যকা নামক মূর্চ্ছনা প্রবল। ইহাতে কাকলিস্বর ব্যবহার বহুল। ইহা কামাদি রসে অর্থাৎ মধুররসে গেয়।

হৃষ্যকা মূর্চ্ছনা পঞ্চম স্বর হইতে উৎপন্ন। পঞ্চম স্বরের অবস্থিতি আলাপিনী নামক শ্রুতিতে। আলাপিনী শ্রুতির সংখ্যা সপ্তদশ। সপ্তদশ নক্ষত্র শুক্রের সপ্তমে অবস্থিত অর্থাৎ বৃষ রাশির সপ্তমে। বৃষ হইতে বর্ষণ। শুক্রের সপ্তম হইতে কামের বিচার। লক্ষী দেবী পঞ্চমী তিথিতে অগ্নি কুমারের সহিত মিলিত হন। সেই কারণ এই তিথিকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়। এই তিথিতে বাক্‌দেবীর পুজা। পূর্ব্বে বলিয়াছি কাম নিম্নপথে বাধা প্রাপ্ত হইলে মানসিক উন্নয়ন করে।

কালবিদ জানেন লক্ষী শক্তি লক্ষণ জ্ঞাপক কেতু গ্রহ হইতে বিচার্য্য এবং উহার জন্ম নক্ষত্র রসরূপ চন্দ্রের ও অগ্নিরূপ রবির রাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত। ঐখানে চন্দ্র পূর্ণ হইবারে কালে পঞ্চমী তিথিতে বাগ্‌দেবীর পুজা ও বসন্ত ঋতুর জন্ম। ষড়জস্বর যেমন চন্দ্রের জন্ম নক্ষত্র সেইরূপ পঞ্চমস্বর রবির জন্ম নক্ষত্র। মিলন হেতু মিত্র নক্ষত্র।

এই রাগ মহাদেবের তৎপরুষ মুখ হইতে উৎপন্ন। সেই কারণ ইহা হইল মহাপুরুষ। দেহস্থ বায়ু ও শব্দকে বেষ্টন করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে অবস্থান করিয়া ভূভার পালন করেন।

হৃষ্যকা অর্থে রোমাঞ্চ। পঞ্চ ইন্দ্রিহ বোধ হেতু আত্মার বিশেষ ক্ষেপন বশতঃ রোমাঞ্চ। সেই কারণ এই রাগ মহাপুরুষ।

বর্ত্তমান যুগে সঙ্গীতের সর্ব্বভারতীয় সভা, আসর, বৈঠক বা জলসার অভাব পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু কোথাও আর্য্য সঙ্গীতের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস দেখা যায় না। ইহার কারণ বৈদিক কালজ্ঞান লুপ্ত হওয়াতে যেমন আর্য্য ধর্ম্ম লুপ্ত প্রায় সেইরূপ প্রকৃত সঙ্গীতেরও অবনতি বিশেষ ভাবে পরিদৃশ্যমান।

শিবম্

সূর্য ঃ পৃথিবী

শান্তশীল দাশ

হে সূর্য, প্রতিটি দিন মুঠো মুঠো সোনায় সোনায়
ভরে দাও এ পৃথিবী ; এত সোনা যায় যে কোথায়
কে জানে ! তাকিয়ে দেখি, পৃথিবী সে আদিমকালের
আজো আছে একই মতো ; দীর্ঘকাল প্রভাত সূর্যের
রক্তিম আভায় তার অন্তরের নিরুদ্ধ কালিমা
আজো তো হয়নি শেষ ; একালের কোথায় যে সীমা ?
কবে শেষ হবে এই পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকার :
তোমার সোনালী রোদ মেখে নিয়ে সারা অংগে তার
কবে হবে এ পৃথিবী জ্যোতির্ময়ী প্রসন্নবদনা,
শুচি-শুভ্র স্নিগ্ধ হাস্যে বিচ্ছুরিবে আলোকের কণা ?

হে সূর্য, তুমি তো আলো ঢেলে দাও প্রতিদিন এসে,
প্রতিদিন এ পৃথিবী আলোর বন্যায় যায় ভেসে,
সে-আলোর রঙে রাঙা হলো-না-তো আজো এ জীবন ;
হে সূর্য, তোমার সোনা সে মিথ্যা নিশীথ স্বপন ?

শতদল

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

বৃদ্ধ

শরৎকালের শেষাশেষি। সন্ধ্যার বেশী দেরী নেই। দামী পোষাকপরা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছেন। ধূলোমাথা তাঁর বকলশ-ওয়ালা পুরানো ধরণের জুতো দেখে মনে হল তিনি বহু পথ হেঁটে ফিরছেন। বাঁধানোপ্রান্ত দীর্ঘবেতের ছড়ি বগলে, কালো চোখের তারায় তাঁর অতীত যৌবনের ছাপ—ধবধবে শাদা চুলের সঙ্গে তাঁর চাউনির যেন একটু অসামঞ্জস্য লক্ষিত হচ্ছিল। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আভায় তিনি চারদিকের বাড়ি-ঘর চেয়ে দেখছিলেন। এ অঞ্চলে বোধ করি তিনি নবাগত, কারণ পথচারী কেউ তাঁর দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছিল না—কদাচিৎ দু' একজন তাঁর সৌম্য চেহারা দেখে তাঁকে নমস্কার জানাচ্ছিল। অবশেষে একটি উঁচু চিলেকোটাওয়ালা বাড়ির সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন—আর একবার শহরের চারদিক চেয়ে তিনি সেই বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। দরজা খোলার শব্দে বাড়ির একটি জানালা খুলে গেল—সবুজ পর্দা সরিয়ে একজন বৃদ্ধা চেয়ে দেখল। ভদ্রলোক তাঁর ছড়ি তুলে ইঙ্গিত ক'রে বললেন—"এখনও আলো জ্বালা হয় নি?"—উচ্চারণে তাঁর দক্ষিণ অঞ্চলের ধাঁজ স্পষ্ট। বৃদ্ধা পরিচারিকা জানালার পর্দা আবার ঠিক ক'রে দিল। বৃদ্ধ প্রকাণ্ড দরদালানের ভিতর দিয়ে একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলেন। ঘরে দেয়ালের ধারে ওক কাঠের বড় বড় আলমারি ও চিনামাটির বাসন সাজানো। সামনের দরজা দিয়ে অপর একটি ছোট দরদালানে পড়লেন। এখান থেকে একটি সিঁড়ি উপরে উঠেছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে একটা দরজা খুলে তিনি মাঝারি সাইজের একটি ঘরে ঢুকলেন। ঘরটি বেশ নিরিবিলি—একটি দেয়ালে নানারূপ দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সংগ্রহ ও বইএর আলমারি—অপর দেয়ালে মানুষ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি টাঙানো—টেবিলের সবুজ ঢাকনার উপর কয়েকখানি খোলা বই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—লাল ভেলভেটের কুশনযুক্ত একখানি আরাম কেদারা টেবিলের পাশে। টুপি ও ছড়ি ঘরের এককোণে রেখে হাত দু'খানি একত্র ক'রে তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন আরাম কেদারায় বসে। বসবার কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে এল। একফালি চাঁদের আলো জানালার সার্সি দিয়ে ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছবির উপর পড়ল। আলোর রেখাটি যেমন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল—বৃদ্ধের চোখও অন্যমনস্ক ভাবেই তার অনুসরণ করছিল।—আলোর রেখা শেষকালে গিয়ে পড়ল সাদাসিধে কালো ফ্রেমে বাঁধানো ছোট্ট একটি ছবির উপর। বৃদ্ধ অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন—"এলিজাবেথ!" কথাটি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই কালচক্র ঘুরে গেল—তিনি পৌঁছিয়ে গেলেন তাঁর প্রথম যৌবনে।

দুটি শিশু

দেখতে দেখতে একটি চপলা বালিকামূর্তি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বালিকার বয়স বছর পাঁচেক—নাম এলিজাবেথ। এর নিজের বয়স তখন বছর দশেক। লাল রেশমী রুমাল বালিকার গলায় জড়ানো; রুমালখানি তার কটা চোখের সঙ্গে বেশ মানিয়েছিল।

মেয়েটি আনন্দে বলে উঠল—"রাইনহার্ট, আজ আমাদের ছুটি, আজ আমাদের ছুটি। সারাদিন আর ক্লাসের বালাই নেই—কালও স্কুল বন্ধ।"

জার্মান কবি থিওডর ষ্টর্মের (১৮১৭-১৮৮৮) 'ইমেনজে' কাহিনীর বঙ্গানুবাদ

রাইনহার্টের বগলে ছিল শ্লেট, সেটা দরজার পেছনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে উভয়ে লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বাগানে পড়ল—বাগানের গেট পেরিয়ে শেষে গিয়ে পৌছালো মাঠে। অনেকদিন পরে তারা পেয়েছে ছুটি। এলিজাবেথের সাহায্যে ঘাসপাতা দিয়ে এখানে রাইনহার্ট তৈরি করেছে একটা ছোট্ট খেলাঘর। গরমকালের সন্ধ্যায় তারা দু'জন এই ঘরে খেলা করবে। কিন্তু ঘরে যে এখনও বেঞ্চি পাতা হয় নি। রাইনহার্ট তাই তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ ক'রে দিল। পেরেক, হাতুড়ী, তক্তা সে আগেই জোগাড় ক'রে রেখেছিল। ইতিমধ্যে এলিজাবেথ বুনো মঙ গাছের আংটির মত গোল গোল ফল আঁচল ভরে কুড়িয়ে এনে মালা গাঁথতে শুরু করে দিল। অনভ্যস্ত হাতে হাতুড়ির ঘা ঠিক মত পড়ে না—পেরেক যায় বেঁকে, তবু নাছোড়বান্দা রাইনহার্ট শেষ পর্যন্ত বেঞ্চি তৈরি ক'রে ফেলল। খেলাঘরের কাছে তখনও রোদ ছিল, কাজেই মাঠের অপরপ্রান্তে ছায়ায় বসে এলিজাবেথ মালা গাঁথছিল। বেঞ্চি তৈরি হলে রাইনহার্ট এলিজাবেথকে ডাক দিল—ছোট্ট মেয়েটি ছুটে আসাবার সময় তার চুলের গোছা বাতাসে উড়ছিল। কাছে এলে রাইনহার্ট এলিজাবেথকে বলল—"বড্ড ঘেমে গেছিস, আয় এখন ঘরে এসে বস—বেঞ্চি তৈরি হয়ে গেছে। এখন বেঞ্চে বসে তোকে কিছু গল্প শুনাই।"

দু'জনে নতুন বেঞ্চির উপর বসল—এলিজাবেথ মালাটি শেষ করতে লাগল। রাইন গল্প শুরু করল—"তিন যে ছিল কাটুনি—"

এলিজাবেথ মুখভঙ্গী করে বলে উঠল—"আঃ, ও গল্প আর তোমায় বলতে হবে না—ও গল্প আমি খুব জানি—রোজ রোজ তুমি ত ঐ একই গল্প বল।"

তিন কাটুনির গল্প রেখে রাইনহার্ট আরম্ভ করল সিংহের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত মানুষের গল্প।…"রাত্রি গভীর হয়ে এল—ঘুটঘুটে অন্ধকার—সিংহরা আছে ঘুমিয়ে—থেকে থেকে ঘুমের মাঝেই তারা বিরাট গর্জন ক'রে উঠছে, আর রক্তের মত লাল লম্বা লম্বা জিভ বের করে চাটছে—হতভাগ্য লোকটি এই দেখে ভয়ে আধমরা হয়ে পড়ল। হঠাৎ তার সামনে এক ঝলক আলো। চোখ মেলতেই দেখে একজন দেবদূত। দেবদূত হাত দিয়ে ইসারা করামাত্র লোকটি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সিংহের গহ্বর থেকে।"…

এলিজাবেথ খুব মন দিয়ে শুনছিল। সে বলল—"দেবদূত? তা হলে নিশ্চয় তার পাখা ছিল?"

রাইনহার্ট বলল—"এত শুধু গল্প, সত্যিই কি দেবদূত আছে?"

এলিজাবেথ বিস্ময় এবং সন্দেহের সুরে বলল—"সবই কি তাহলে মিছে? তাই যদি হবে তবে মা, মাসী এবং স্কুলের দিদিমণিদের মুখেও ঐ কথা শুনি কেন?"

রাইনহার্ট জবাব দিল—"অত শত আমি জানিনে।"

"তা হলে সিংহের কথাও কি ভুয়া?"

রাইনহার্ট বলল—"সিংহের কথা মিছে হবে কেন? সিংহ ত ভারতবর্ষেই অনেক আছে। সেখানকার মন্দিরের পুরোহিতরা সিংহ-চালিত গাড়ীতে চড়ে মহা আরামে মরুভূমির মধ্য দিয়া চলাফেরা করে। আমি বড় হলে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে যাব। তুই জানিস না, ভারতবর্ষ আমাদের দেশের চেয়ে কত হাজার হাজার গুণ বেশী সুন্দর। মস্ত মজার কথা এই যে, সে দেশে শীতকাল ব'লে কিছু নেই। তুইও ত আমার সঙ্গে সে দেশে যাবি?"

"হ্যাঁ, তবে মাকে এবং তোমার মাকেও কিন্তু সঙ্গে নিবে হবে।"

রাইনহার্ট বলল—"না, সে হবে না, তখন ত তারা খুব বুড়ো হয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে কেন?"

"আমি কিন্তু একা যেতে পারব না"—বলল এলিজাবেথ।

"তুই নিশ্চয়ই পারবি, তুই ত তখন আমার বউ হবি—কাজেই তখন আর তোকে কারো সাহায্য নিতে হবে না।"

"মা কাঁদবে যে!" এলিজাবেথ বলে উঠল।

"আরে আমরা ত গিয়ে আবার ফিরে আসব। আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাবি কিনা চট করে বলে ফেল। না হলে, আমি একাই যাব—যেয়ে আর কিন্তু ফিরব না।"

এই কথা শুনে এলিজাবেথ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল—"আমার উপর চোখ রাঙিও না—আমি সত্যি তোমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাব।"
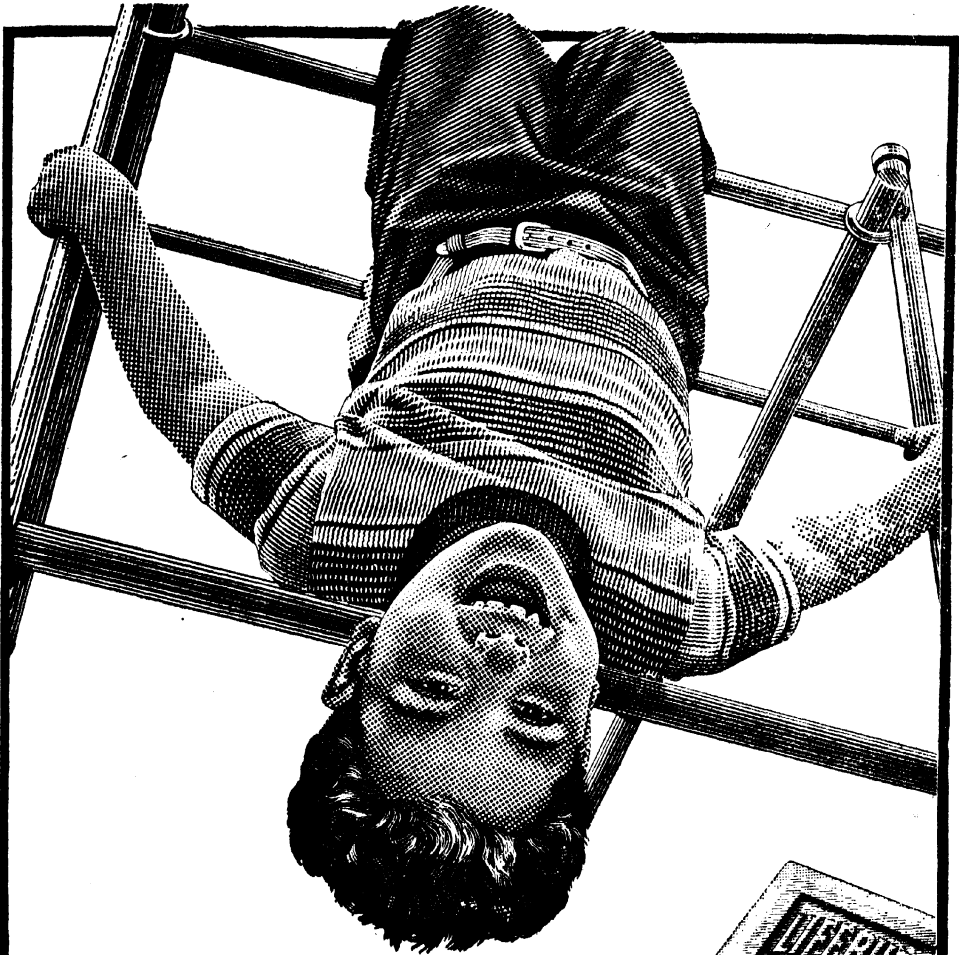
LIFEBUOY
SOAP
সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্তে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়
LIFEBUOY
SOAP
L. 457-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

রাইনহার্ট মহানন্দে খেলাঘর থেকে বেরিয়ে এলিজাবেথকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে লাফাতে লাফাতে বাড়ীর পানে ছুটল—আর সঙ্গে সঙ্গে গলা ছেড়ে গাইতে লাগল—

"মনের হর্ষে ভারতবর্ষে যাব মোরা দুই জনে
বাঘ সিংহ হাতী কত দেখব ঘুরে বনে বনে।
মজার দেশে ভারতবর্ষে যাবই যাব দুই জনে।"

এই সময় বাগানের গেটের কাছ থেকেও রাইনহার্ট ও ও এলিজাবেথের নাম ধরে ডাকার শব্দ তারা শুনতে পেল। "আমরা আসছি, মা!" বলে উভয়ে হাতধরাধরি করে লাফাতে লাফাতে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল।

—বনে—

দুটি শিশু এই ভাবে দিন কাটাত। মেয়েটি ছিল ঠাণ্ডা —ছেলেটি দুরন্ত, কিন্তু একজন অপরকে ছেড়ে থাকতেও পারত না। প্রায় সমস্ত ছুটির দিন—শীতকালে ঘরের কোণে, গ্রীষ্মকালে ঝোপ-ঝাড়ে বেড়াত। একদিন স্কুলের মাষ্টার মহাশয় এলিজাবেথকে রাইনহার্টের সামনে গালি দেন। রাইনহার্ট তখনই তার হাতের শ্লেটখানি টেবিলের উপর ঝনাৎ করে ফেলে দেয় যাতে ক'রে মাষ্টার মহাশয়ের দৃষ্টি এবং মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এতে কোনও ফল হয় না। পরের ঘণ্টায় ছিল ভূগোলের ক্লাশ। রাইনহার্ট সে ক্লাসের পড়ায় আর মন দিতে পারল না। ঐ ক্লাসে বসে বসে সে লম্বা একটা কবিতা লিখে ফেলে। কবিতাটিতে সে নিজেকে ঈগল-ছানার সঙ্গে, স্কুল মাষ্টারকে দাঁড়কাকের এবং এলিজাবেথকে সাদা পারাবতের সহিত উপমিত করে। ঈগলছানার পালক উঠলেই সে দাঁড়কাকের উপর প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। লেখবার সময় এই ক্ষুদে কবির চোখে জল এসে গেল। সে সত্যি সত্যি এই ব্যাপারে বড় অভিভূত বোধ করছিল। বাড়ি এসে বাঁধানো একখানা খাতা যোগাড় করে তার প্রথম পৃষ্ঠায় ধরে ধরে সুন্দর হরফে তার প্রথম কবিতাটি লিখে রাখল।

কিছুদিন পরে রাইনহার্ট অন্য একটি স্কুলে গেল। সেখানে তার সমবয়সী অনেক বালকের সঙ্গে তার বেশ ভাব জমে উঠলেও এলিজাবেথের সঙ্গে তার খেলাধুলা আগের মতই চলতে থাকল। যে সকল ছড়া ও উপকথা সে বারবার এলিজাবেথকে শুনিয়েছে তার মধ্যে কোন্ কোন্‌টি তার ভাল লাগে তা নোট করে নিতে লাগল এবং তার মনেও একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল তার চিন্তাকে কবিতায় রূপ দেবার জন্য—কিন্তু কেমন যেন সে তাতে কৃতকার্য্য হয়ে উঠতে পারছিল না। কাজেই যে ভাবে সে অপরের কাছে শুনেছে সেই ভাবেই উপকথাগুলি লিখে ফেলতে শুরু করে দিল। লেখা শেষ হলে খাতাটি সে এলিজাবেথের হাতে দিতে এলিজাবেথ সযত্নে তার দেরাজের মধ্যে রেখে দিল। রাইনহার্টের মন আনন্দে ভরে উঠত যখন তার সামনেই এলিজাবেথ ঐ খাতার লেখা মাঝে মাঝে তার মাকে পড়িয়ে শুনাত।

দেখতে দেখতে সাত বছর কেটে গেল। উচ্চ শিক্ষার জন্য রাইনহার্টকে বাড়ি ছেড়ে দূরের শহরে যেতে হবে। এলিজাবেথ ভাবতেই পারে না রাইনহার্টের অভাবে সে কিরূপে দিন কাটাবে। যা হোক সে শুনে আশ্বস্ত বোধ করল একদিন রাইনহার্ট যখন তাকে ডেকে বলল যে সে চলে গেলেও সেখানে বসে তার জন্য গল্প লিখবে এবং মায়ের নামে যখন চিঠি দেবে তার মধ্যে গল্প পাঠিয়ে দেবে। গল্পগুলি তার কেমন লাগে সে যেন তা লিখে জানাতে ভুলে না যায়। চলে যাবার দিন ক্রমে ঘনিয়ে এল। এর মধ্যেই কিন্তু এলিজাবেথের বাঁধানো খাতায় অনেকগুলি কবিতা নতুন লেখা হয়ে গেছে। এই খাতাখানি এলিজাবেথের বড় আদরের বস্তু। ইতিমধ্যেই রাইনহার্ট এ খাতার অর্দ্ধেকটা গান ও গল্পে ভ'রে ফেলেছে।

জুন মাস। পরের দিন রাইনহার্টের যাত্রার দিন। কাজেই তার সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটানোর পালা। পরিচিত কয়েকজন মিলে নিকটস্থ বনে বনভোজনের ব্যবস্থা করল। কয়েক ঘণ্টার পথ—কাজেই বনের ধার পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়ে নেমে খাবারের ঝুড়ি নিয়ে সবাই হেঁটে চলল বনের দিকে। প্রথমে পড়ল আমগাছের বন—ঠাণ্ডা, স্যাতসেতে, আঁধার-আঁধার, মাটিতে থানগাছের কাঁটার ছড়াছড়ি। আধ ঘণ্টা চলার পর থান-বন শেষ হয়ে এল বীচগাছের বন। এ বনের ভিতর অনেকটা ফর্সা—সবুজ পত্র-পল্লবের ফাঁক দিয়ে রোদের ফালি এসে

পড়েছে বনতলে—মাথার উপরে এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে চলেছে কাঠবিড়ালীর দল।

একটি জায়গায় অতি প্রাচীন কয়েকটি বীচগাছ পরস্পর বেড়ে উঠে মাথায় মাথায় মিশে বেশ একটা চাঁদোয়ার মত করেছে। বনভোজনের দলটি সেখানে এসে থামল। এলিজাবেথের মা একটি খাবার-ঝুড়ি খুললেন। পাড়ার একজন বুড়ো ভদ্রলোক নিলেন খাবার তত্ত্বাবধানের ভার। তিনি বললেন—"হে ছোট পাখীরা, আমার চার পাশে বস—আর মন দিয়ে শোন আমি যা বলি। প্রত্যেকেই তোমরা দু' টুকরো ক'রে রুটি পাবে। মাখন আনতে ভুলে গেছি, কাজেই তার বদলে যার যার মত বনের ভিতর ষ্ট্রবেরি খুঁজে তাই দিয়ে রুটি খাবে—যারা তা জোগাড় করতে না পারবে তাদের শুকনো রুটিই চিবোতে হবে। জীবনেও কিন্তু এই রকমই ঘটে। আমার কথা বুঝলে ত?"

ছেলেমেয়েরা চীৎকার করে বলে উঠল—"হ্যাঁ, খুব বুঝেছি।"

বৃদ্ধ আবার তাদের সম্বোধন করে বললেন—"হ্যাঁ, দেখ, আমার কথা কিন্তু এখনও ফুরায় নি। আমরা বুড়ো যারা—তারা ঘরে অর্থাৎ এই জায়গায় বসে থাকব—বসে বসে তোমাদের জন্য আলু ছাড়াব, আগুন করবো, টেবিল পাতব—আর ঠিক যখন বারটা বাজবে তখন ডিম সেদ্ধ করব। কাজেই তোমরা যে ষ্ট্রবেরি সংগ্রহ করবে তার অর্দ্ধেকই কিন্তু আমাদের প্রাপ্য—আর সেগুলি আমরা খাব অন্যান্য খাবার খাওয়ার পর। এখন তোমরা পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যার যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে পা বাড়াও—তবে মনে রেখো, দুষ্টুমি যেন ক'রো না।

বলা বাহুল্য ছেলেমেয়েরা একথা শুনে বৃদ্ধের অলক্ষ্যে নানারূপ মুখভঙ্গী করল। বৃদ্ধ আবার চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—"দাঁড়াও, এখনও আমার ভাল করে সব বলা হয় নি। যে আদৌ ষ্ট্রবেরি যোগাড় করতে পারবে না—তাকে আমাদের কিছু দিতে হবে না—আর আমাদের কাছ থেকেও সে কিছুই পাবে না। আজ তোমাদের একটি পরীক্ষার দিন—আজ যাঁরা ষ্ট্রবেরি খুঁজে পাবে তারা জীবনেও হবে জয়যুক্ত।"

ছেলেমেয়েরা আগের মতই মুখভঙ্গী করে দুই দুই জন একসঙ্গে এক এক দিকে বেরিয়ে পড়ল।

রাইনহার্ট বলল—"আয় এলিজাবেথ, আমার সঙ্গে আয়—শুকনো রুটি তোকে চিবাতে হবে না—নিশ্চয়ই—ষ্ট্রবেরি কোথায় পাওয়া যায় সে আমি জানি।"

এলিজাবেথ তার ঘাসের টুপির দুটি ধার একত্র করে বাহুতে ঝুলিয়ে বলে উঠল—"এই দেখ ষ্ট্রবেরি রাখবার ঝুড়ি আগেই প্রস্তুত।"

তার পর উভয়ে গভীর থেকে গভীরতর বনের ভিতর দিয়ে চলল—স্যাঁতসেঁতে প্রায়-অন্ধকার ঘন বনতল দিয়ে। সব নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে গাছের উপরের আকাশ থেকে অদেখা বাজপাখীর আওয়াজ কানে আসছে। ঘন বনের পরে সামনে পড়ল নিবিড় ঝোপ। এত ঘন ও ডালপালা পরস্পর এত জড়ানো যে রাইনহার্টকে অগ্রগামী হয়ে অতি কষ্টে ডালপালা লতাবেষ্টনী ছাড়িয়ে পথ করতে করতে যেতে হল।

সহসা তার পেছন থেকে এলিজাবেথ ডেকে উঠল—"রাইনহার্ট, একটু দাঁড়াও না, ভাই?"—রাইনহার্ট ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল কিন্তু তাকে দেখতে পেল না। অবশেষে সে দেখল একটু দূরে এলিজাবেথ কাঁটাগাছের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে—কাঁটাঝোপের উপরে তার মাথার খানিকটা দেখা যাচ্ছে মাত্র। রাইনহার্ট তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে কাঁটাগাছ সজোরে সরিয়ে তাকে মুক্ত করে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল। নীলরঙের একটি প্রজাপতি এখানে বনফুলের উপর পৎপৎ করে ঘুরছিল। রাইনহার্ট এলিজাবেথের উত্তপ্ত মুখের উপর থেকে ঘামে ভেজা চুল সরিয়ে দিল, তারপর টুপিটি তার মাথায় পরিয়ে দিতে চাইল—এলিজাবেথ যথেষ্ট আপত্তি করল, কিন্তু অনেক করে বলাতে শেষকালে সে টুপিটি পরতে রাজী হল।

"কই। তোমার ষ্ট্রবেরি কোথায়?"—বলে এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে ভাল করে হাঁফ ছাড়ল।

রাইনহার্ট বলল—"তুমি আদৌ এগোতে পারলে না—তাই আগেই বোধ করি, কটকটে ব্যাং, বেজী বা পরীরা ষ্ট্রবেরি সব উজাড় করে দেছে।"

এলিজাবেথ বলল—"তোমার যত সব বাজে কথা। আমি মোটেই ক্লান্ত হইনি—চলো না দেখি এগিয়ে—আমি তোমার সাথে ষ্ট্রবেরি কুড়োতে পারি কিনা দেখে নিও।"

তাদের সামনেই ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে একটি ঝরণা—ঝরণাটি পেরিয়ে আবার বন। রাইনহার্ট এলিজাবেথকে চ্যাংদোলা করে দুই বাহুর উপরে নিয়ে ঝরণা পার করে দিল। ছায়াঘন বড় বড় গাছের বন পেরিয়ে একটি ফাঁকা জায়গায় তারা এসে পড়ল। এলিজাবেথ বলে উঠল—"এখানে নিশ্চয়ই ষ্ট্রবেরি পাওয়া যাবে—বেশ মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি।" তারা জুনের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে চারিদিক খুঁজে সারা হল—কিন্তু ষ্ট্রবেরির সাক্ষাৎ মিলল না। রাইনহার্ট শেষে বলল—"এ গন্ধ ষ্ট্রবেরির নয়—এক রকম গাছ থেকে এই মিষ্টি গন্ধ আসছে।"

এলিজাবেথ বলল—"জায়গাটি বেশ নিরিবিলি ও মনোরম—আমাদের দলের অপর সকলে এখন কোথায়?"

ফেরবার কথা এতক্ষণ একটিবারও রাইনহার্টের মনে পড়েনি। "একটু অপেক্ষা কর, দেখি বাতাস কোন

দিক থেকে আসছে?”—ব’লে সে হাত উঁচু করল, কিন্তু বাতাসের গতি বুঝতে পারল না।

এলিজাবেথ বলল—“থাক, আমার মনে হচ্ছে কারা যেন কথা বলছে। পেছন ফিরে একবার ডাক দেখি?”

রাইনহার্ট হাত মুখের কাছে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল—“এই যে, এখানে এস!” “এই যে…” বলে প্রতিশব্দ এল। ওরা সাড়া দিয়েছে বলে এলিজাবেথ হাততালি দিয়ে উঠল।

“না, এ কিছুই না, এ প্রতিধ্বনি মাত্র।”—বলল রাইনহার্ট।

এলিজাবেথ রাইনহার্টের হাত জড়িয়ে ধরে বলল—“যাও, আমার যে বড্ড ভয় করছে।”

রাইনহার্ট বলল—“ভয় কিসের? এত ভাল জায়গাতে ভয় কিসের? ছায়াতে ঘাসের মধ্যে ব’সে পড় দেখি। খানিকক্ষণ জিরানো যাক। আমরা শিগগিরই ওদের সন্ধান পাব।”

রাইনহার্টের কথায় সে শাখাপ্রশাখাবিস্তৃত একটা বড় বীচগাছের তলায় বসে উৎকর্ণ হয়ে রইল। রাইনহার্ট কয়েক পা দূরে একটি কাঠের গুঁড়ির উপর বসে নীরবে এলিজাবেথের পানে চেয়ে রইল! সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে—গ্রীষ্মের দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। সোনালি আভাযুক্ত ইস্পাত-নীল ছোট ছোট মাছি উড়ে উড়ে এলিজাবেথের চারপাশে গুণ গুণ শব্দ করছিল। মাঝে মাঝে বনের ভিতর থেকে কাঠঠোকরার এবং অন্য বন্য-পাখীর শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

“শোন,” এলিজাবেথ বলল—“কাদের যেন গলা শোনা যাচ্ছে।” রাইনহার্ট বলল—“কোথায়?”

“আমাদের পিছনে, শুনতে পাচ্ছ না?—এখন ত ঠিক দুপুর।”

“তা হলে আমাদের পিছনেই শহর—সেইদিকে সোজা গেলেই সাথীদের দেখা পাব।”

তখন দুজনে ফিরতে শুরু করল। স্ট্রবেরি খোঁজা তাদের শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে এলিজাবেথ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিছুদূর যেতেই গাছের ভিতর থেকে দলের লোকদের হাসির রোল শোনা গেল। কাছে গিয়ে তারা দেখল—মাটির উপর একখানা শাদা কাপড় বিছানো, আর তার উপর স্ট্রবেরির ছড়াছড়ি। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বোতামের ছিদ্রতে রুমাল সংলগ্ন করে নিবিষ্ট মনে একটি রোষ্ট কাটতে কাটতে তার পাশের ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করে নীতিবাক্য আওড়াচ্ছেন।

এলিজাবেথ এবং রাইনহার্টকে গাছের ফাঁকে আসতে দেখেই ছেলেমেয়েরা সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠল—“এই যে হারানো মাণিকজোড় ফিরে এসেছে।”

বৃদ্ধ তাদের পানে না চেয়েই বলে উঠল—“তোমাদের রুমাল খালি কর—টুপি উলটিয়ে যা কিছু এনেছ এখানে রেখে দাও।”

“আমরা খিদে তেষ্টা ভিন্ন আর কিছু কুড়িয়ে পাইনি”—বলে উঠল রাইনহার্ট। “যদি তাই হয়”—বলে বৃদ্ধ খাবার-ভরা রেকাবী তাদের সামনে তুলে ধরলেন—“তবে রেকাবীতে যা আছে তাতে তোমরা হাত দেবে না নিশ্চয়ই; কারণ প্রতিজ্ঞা আছে যে কোনও অলস লোককে খেতে দেওয়া হবে না।” বলা বাহুল্য বৃদ্ধের এটা নিছক রসিকতা মাত্র। তিনি শেষে সবাইকে আদর করে একত্রে বসিয়ে পেটপুরে খেতে দিলেন।

পথপ্রান্তে বালিকা

বড়দিনের বিকাল। বেশ খানিকটা বেলা থাকতেই অন্যান্য ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে রাইনহার্ট টাউনহলের রেস্তোরাঁয় গিয়ে পুরানো ওকের টেবিলে স্থান নিল। ঘরের ভিতরটা আঁধার বলে সকাল সকাল বাতি জেলে দিয়েছিল। কিন্তু তখনও ভিড় জমে নি—রেস্তোরাঁর মালিক দেয়ালের থামে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করছিল। হলের এককোণে বসেছিল একজন বেহালাবাদক, আর তার পাশে জিপসি সাজে সজ্জিত বীণা হাতে একটি নর্তকী। কোলের উপর বীণাটি রেখে নর্তকী চটুলভাবে সামনের দিকে চেয়েছিল।

ছাত্রদের টেবিলে শ্যামপেন বোতল খোলার শব্দ শোনা গেল। “পান কর বোহেমিয়া প্রিয়া”—বলে একজন কেতাদুরস্ত যুবক ভর্তি একটি গ্লাস নর্তকীর সামনে ধরল। “গ্লাসে আমার দরকার নেই”—বলে উঠল নর্তকী।

“তা হ’লে গান কর”—বলে যুবক একটি রৌপ্যমুদ্রা তার কোলের উপর ফেলে দিল। নর্তকী সেদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করে তার কালো চুলের মধ্যে আঙুল বুলাতে লাগল। বেহালাবাদক তার কানে কানে কি যেন ফিসফিস করে বলল। নর্তকী তার চিবুক বীণার উপর রেখে মৃদুস্বরে বলল—“আমি কিন্তু ওর জন্য বাজাব না।”

এই সময় রাইনহার্ট গেলাস হাতে নিয়ে লাফিয়ে গিয়ে নর্তকীর সামনে দাঁড়ালো।

একটু বিরক্তির স্বরে নর্তকী বলে উঠল—“কি অভিপ্রায়?”

“তোমার চোখ দুটো একবার দেখতে চাই।”

“আমার চোখ দেখে তোমার লাভ?”

রাইনহার্ট তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—“আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি মেকী।”

নর্তকী তার চিবুক হাতের তালুতে রেখে ঢুলুঢুলু-ভরা চোখে রাইনহার্টের দিকে চাইল।”

রাইনহার্ট তার গেলাস নিজের মুখে তুলে বলল—"তোমার ঐ সুন্দর কলুষমাখা আঁখির উদ্দেশে"—তার পর সে ধীরে ধীরে গেলাসে চুমুক দিতে থাকল।

নর্তকী হেসে মাথা নেড়ে "দাও পেয়ালা" বলে তার হাত থেকে গেলাস নিয়ে অবশিষ্ট মদটুকু খেল—আর চোখ নিবদ্ধ রাখল রাইনহার্টের চোখের উপর। তার গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে সে গাইতে আরম্ভ করল :—

একটি দিনের তরে
পেয়েছি মোহিনী রূপ
নিশি না পোহাতে মোরে
গ্রাসিবে অন্ধকূপ।

যখন বেহালাদার তন্ময় হয়ে গানের সঙ্গে সঙ্গত করছে, তখন একজন নবাগত এসে ছাত্রদের দলে ভিড়ল। সে এসে বলল—"রাইনহার্ট আমি বলি যে তুমি ঘরে ফিরে যাও। তুমি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু খৃষ্ট যে তোমার ঘরে ঢুকে বসে আছে।"

রাইনহার্ট বলল—"খৃষ্ট শিশু? সে আমার কাছে কেন আসবে?"

"বল কি? তোমার সারাঘর থানগাছ ও ব্রাউনরুটির গন্ধে ভরে গেছে।"

রাইনহার্ট গেলাস রেখে দিয়ে টুপিতে হাত দিল। "কি অভিপ্রায় তোমার?"—নর্তকী প্রশ্ন করল।

"আমি শিগগিরই ফিরে আসছি।"

ললাট কুঞ্চিত ক'রে নর্তকী মৃদুস্বরে বলল—"যেও না"—সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

রাইনহার্ট কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করে বলল—"না, পারব না।"

জুতোর ডগা দিয়ে ঠেলা দিয়ে মৃদু হেসে নর্তকী বলল—"যাও, অকেজো ঢেঁকি।"

নর্তকী মুখ ফিরাতেই রাইনহার্ট ধীরে ধীরে রেস্তোরাঁ থেকে সরে পড়ল।

বাইরে রাস্তায় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তার উত্তপ্ত ললাটে শীতল হাওয়ার স্পর্শ খুব আরামদায়ক মনে হ'ল। রাস্তার পাশের বাড়ি থেকে এখানে ওখানে জানালা দিয়ে দীপশোভিত থানগাছের আলো এসে পড়েছে। কোনও কোনও বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েদের সহর্ষ কলরব, বাঁশীর ও কাঁশির শব্দ কানে আসছে। দলে দলে ভিখারী ছেলে-মেয়ে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যাচ্ছে—কেউ বা সিঁড়ি বেয়ে উঠে সজ্জিত গৃহাভ্যন্তরে খৃষ্টের আলোকোজ্জল মূর্তি দেখবার জন্য জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। কারণ অভাবের তাড়নায় তাদের বাড়িতে ত আর এ উৎসব-আয়োজনের সম্ভাবনা নেই। তাদের কাছে এ উৎসব বিলাসীর বিলাসব্যসন মাত্র। যেতে যেতে রাইনহার্ট দেখতে পেল সহসা একটি বাড়ির সদর দরজা খুলে গেল এবং গৃহস্বামী তীব্র গালাগালি দিতে দিতে একদল ভিখারী ছেলেমেয়েকে আলোকিত গৃহ থেকে অন্ধকার গলির মধ্যে তাড়িয়ে দিল। কোনও বাড়ি থেকে বা ছোট্ট মেয়ের গাওয়া পুরানো বড় দিনের গান ভেসে আসছিল। রাইনহার্টের সেদিকে কান দিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। সে তাড়াতাড়ি একটির পর একটি রাস্তা পেরিয়ে চলল। যখন বাসায় পৌঁছালো, তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে—সিঁড়ির কাছে সে একবার হোঁচট খেয়ে পড়ল—তার পর উঠে তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরে ঢুকল। সহসা একটা মৃদু সুবাসে তাদের দেশের বাড়ির তার মায়ের বড়দিনের সাজানো ঘরের গন্ধ যেন তার নাকে লাগল। কম্পিত হস্তে সে বাতি জ্বালল। বাতির আলোকে দেখল—টেবিলের উপর রয়েছে মস্ত বড় একটা প্যাকেট। প্যাকেট খুলামাত্রই তার অতি-পরিচিত বড়-দিনের কেক বেরিয়ে এল—অপর একখানা রুটির উপর তার নামের আদ্যাক্ষরগুলি সুনিপুণভাবে চিনি দিয়ে তোলা—এ লেখা কিন্তু এলিজাবেথ ভিন্ন আর কারো নয়। তার পর ছোট্ট একটি প্যাকেটের মধ্যে সুন্দরভাবে বোনা তোয়ালে, রুমাল, জামার কাফ এবং দুখানি চিঠি—একখানি মায়ের লেখা, অপরখানি এলিজাবেথের। শেষের চিঠিখানিই সে প্রথমে খুলল। এলিজাবেথ লিখেছে :—

"চিনি দিয়ে তোলা গোটাগোটা অক্ষর দেখেই বুঝবে কেক তৈরিতে কে সাহায্য করেছে—আর সেই তোমার জামার কাফ বুনে পাঠিয়েছে। বড়দিনের আনন্দ আমাদের এখানে আর নেই; মা রোজই রাত্রি সাড়ে ন'টায় চরকায় সুতো কাটা বন্ধ করে—তুমি কাছে না থাকায় এবারের শীতকাল বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। তোমার দেওয়া লিনেট পাখিটি গত রবিবার মারা গেছে—আমি খুব কেঁদেছি। অবশ্য পাখিটির জন্য যত্নের ত্রুটি কোনও দিন করি নি। তার খাঁচার উপর রোদ এসে পড়লেই বিকালে সে খুব জোরে গান ধরত। তুমি ত জান, পাখীর চীৎকার শুনলেই তাকে চুপ করানোর জন্য মা খাঁচার উপর কাপড় চাপা দিত। আজকাল বাড়ি একেবারেই নিঝুম। মাঝে মাঝে কেবল তোমার পুরানো বন্ধু এরিখ আমাদের বাড়ি আসে। তুমি না একবার বলেছিলে এরিখকে তার ব্রাউন কোটের মত দেখতে। সে বাড়িতে পা দিলেই তোমার সেই কথা আমার মনে পড়ে—তামাসার কথাই বটে! তবে তাকে কিছু ব'লো না; সে তা হ'লে বিরক্ত হবে। তুমি লিখো, বড়দিনে তোমার মাকে কি উপহার পাঠাব? তুমি ত কিছুই লেখ নাই। আমাকে কি উপদেশ দেবে? এরিখ কালো চক দিয়ে আমার চেহারা আঁকে—আমাকে তিন তিনবার ঠায় একঘণ্টা

করে তার কাছে বসতে হয়েছে। আমার কিন্তু এ একেবারে অসহ্য লাগে। একজন অচেনা পুরুষ মানুষ আমার দিকে ততক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকবে—একি সহ্য করা যায় বল দেখি? এতে আমার আদৌ ইচ্ছা বা উৎসাহ ছিল না—কিন্তু মা যে বকে—সে বলে যে, এতে ভারনার সাহেবের ভাবী বধূর যথেষ্ট আনন্দিত হবারই কথা!

কিন্তু রাইনহার্ট, তুমিও ত কথা রাখছ না। তুমি আমাকে মাঝে মাঝে গল্প লিখে পাঠাবে বলেছিলে, কিন্তু এত দিনের মধ্যে একটি লেখাও ত পাঠালে না? তোমার মার কাছে আমি প্রায়ই অনুযোগ জানাই—তিনি বলেন —"এরিখের আমার এখন এত কাজ যে ওসব ছেলেমি করবার কি তার সময় আছে, মা?" আমি কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করি না,—নিশ্চয়ই তলে তলে কোনও কারণ ঘটছে--যার জন্য তুমি আমার কথা আর ভাব না!"

এর পর রাইনহার্ট মায়ের চিঠি পড়ল। পড়া শেষ হলে দু'খানি চিঠিই ধীরে ধীরে ভাঁজ ক'রে সে যথাস্থানে রেখে দিল। সহসা বাড়ির জন্য তার মন উতলা হয়ে উঠল। ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারী করতে করতে অর্ধস্ফুটস্বরে বলতে লাগল—

"ওরে আপনভোলা বুঝেও বুঝিস না
তোর তরে যে কেঁদে মরে তার পানে চাস না।"

তার পর ডেস্কের কাছে গিয়ে কিছু টাকা বের করে আবার রাস্তায় নেমে পড়ল। রাস্তা ততক্ষণ প্রায় নিঝুম হয়ে গেছে। বড়দিনের গাছের বাতি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় গতায়াত গেছে বন্ধ হয়ে। ফাঁকা রাস্তায় সোঁ সোঁ করে উত্তুরে হাওয়া বইছে। ছেলে বুড়ো যার যার বাড়ি আগুনের পাশে বসে গল্প-গুজব করছে। বড়দিনের সন্ধ্যার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয়ে গেছে।

রাইনহার্ট টাউনহল রেস্তোরাঁর কাছে যেতেই বেহালার বাজনা ও নর্তকীর গানের সুর শুনতে পেল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খোলার শব্দে চেয়ে দেখল—একটি কালো চেহারা টলতে টলতে স্বল্পালোকিত প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। রাইনহার্ট বাড়ির ছায়া দিয়ে তাড়াতাড়ি দূরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে সুন্দর আলোকিত সজ্জিত একটি জুয়েলারী দোকানে প্রবেশ করল। লাল প্রবালের ছোট্ট একটি ক্রুশ কিনে সে যে পথে এসেছিল সেই পথ দিয়ে ফিরে চলল। তার বাসার অল্প দূরে ছিন্ন মলিনবস্ত্র পরিহিত একটি মেয়েকে উঁচু দরজার নিকট দেখতে পেল। মেয়েটি দরজা খোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। রাইনহার্ট জিজ্ঞাসা করল—"তোমায় সাহায্য করতে পারি কি?" মেয়েটি কোনও জবাব না দিয়ে কেবল সজোরে দরজার ভারী শিকল নাড়তে লাগল। রাইনহার্ট গিয়ে ততক্ষণ তার নিজের দরজা খুলেছে। মেয়েটিকে ডেকে সে বলল—"আমার এখানে এস—বড়দিনের কেক পাবে।" মেয়েটি দৌড়িয়ে এল—রাইনহার্ট সদর দরজা বন্ধ করে মেয়েটিকে সঙ্গে করে তার ঘরে নিয়ে গেল। মেয়েটি এতক্ষণ কিন্তু একটি কথাও বলে নি।

বাইরে বেরুবার সময় ঘরের বাতি জেলে রেখেই গিয়েছিল। "এই নাও," বলে সে তার বড় কেকখানি ভেঙে অর্ধেকটা তার কাপড়ের মধ্যে দিল—চিনি দিয়ে নাম লেখা কেক অবশ্য সে ভাঙল না—সযত্নে এক পাশে রেখে দিল। "যাও এখন বাড়ি গিয়ে মাকে দাও—ভাই-বোন মা বাবা সকলে মিলে খাও"—বলে রাইনহার্ট দরজা খুলে বাতি হাতে করে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল। মেয়েটি চক্ষের নিমেষে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাড়ির পানে ছুট দিল। ভিখারী মেয়েটি রাইনহার্টের এই অযাচিত করুণায় এত অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে যতক্ষণ রাইনহার্টের সামনে ছিল একটি কথাও বলতে পারে নি—শুধু ফ্যালফ্যাল ক'রে তার পানে চেয়ে ছিল।

রাইনহার্ট ঘরের আগুন নেড়ে ভাল ক'রে জ্বালিয়ে দিল। ধূলিমাখা দোয়াতটি টেবিলের উপর তুলে নিয়ে সারারাত জেগে চিঠি লিখল—একখানি তার মায়ের কাছে, অপরখানি এলিজাবেথের নামে। মায়ের প্রেরিত কেকে সে আদৌ হাত দিল না—কিন্তু কাফটি হাতে পরল—তার মোটা কাপড়ের কোটের সঙ্গে না মানালেও সে উহা পরতে ছাড়ল না। চিঠি লেখা শেষ হলে সে ঠায় বসে রইল। অবশেষে শীতের সূর্য্যর রশ্মি বরফজমা জানালার কাচের উপর এসে পড়ল। সামনের আয়নায় তার উস্কোখুস্কো গম্ভীর চেহারা দেখে চমকে উঠল।

—বাড়িতে—

ইষ্টারের ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাইনহার্ট বাড়ি গেল! পৌছাবার পরদিন প্রাতে সে এলিজাবেথদের বাড়ি হাজির হ'ল। সুন্দরী তন্বী তার দিকে এগিয়ে আসতেই রাইনহার্ট বলল—"বা, তুই অত বড় হয়ে গেছিস?" শুনে এলিজাবেথের গণ্ডদেশ আরক্তিম হয়ে উঠল—মুখ দিয়ে তার কোনও কথা বেরুল না। অভ্যর্থনার সময় সে তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, রাইনহার্ট তার হাত ধরে ছিল। এখন সে ধীরে ধীরে তার হাত সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল। এই প্রথম সে তাকে যেন একটু ইতস্ততঃ করতে দেখল—এমনটি কিন্তু সে পূর্বে কখনও লক্ষ্য করে নি। সে এমন ভাব দেখাল যেন অজানা কারো সামনে দাঁড়িয়েছে। দিনের পর দিন রাইনহার্টের সঙ্গে দেখা হতে লাগল, কিন্তু তার এই আড়ষ্ট ভাব কিছুতেই কাটল না। যখন শুধু ছুটিতে বসে থাকত তখনও অধিকাংশ

সময় এলিজাবেথ নীরব থাকত। রাইনহার্ট এতে বেশ অস্বস্তি বোধ করত। শেষে কথাবার্তার একটা সুযোগ সে খুঁজে বের করল। ছুটির মধ্যে রাইনহার্ট এলিজাবেথকে কিছু উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শেখাবে বলে স্থির করল। উদ্ভিদ্ বিদ্যা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সে কয়েক মাস খুবই ব্যাপৃত ছিল। এলিজাবেথ সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে ভালবাসে—তাছাড়া বিষয়টি শিক্ষামূলক বলে সে এতে সানন্দে সম্মত হল। সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন তারা মাঠে এবং ঝোপ-ঝাড়ে উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহের জন্য বেরোত এবং ডালাপালা ফুলকুঁড়ি সমেত বিভিন্ন উদ্ভিদ নিয়ে তারা বাড়ি ফিরত। রাইনহার্ট বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে এলিজাবেথের কাছে এসে উদ্ভিদ্‌গুলির শ্রেণী-বিভাগ করে রাখা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় তাকে শিখাত।

এই উদ্দেশ্যে একদিন বিকালে এসে রাইনহার্ট দেখল, জানালা ধরে এলিজাবেথ একটি সোনালী রঙের খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এ খাঁচাটি সে আগে কখনো দেখে নি। খাঁচাতে একটি ক্যানারী পাখী ডানা ঝাড়ছে আর সেই সঙ্গে চীৎকার করছে—মাঝে মাঝে এলিজাবেথ খাঁচার মধ্যে আঙুল বাড়িয়ে দিলে পাখীটি আঙুল ঠোকরাচ্ছে। আগে এই জায়গায় ছিল রাইনহার্টের দেওয়া লিনেট পাখাটি। রাইনহার্ট একটু রহস্য করে বলে উঠল—"তা হলে দেখছি আমার হতভাগ্য লিনেট পাখাটি মরে দিব্যি একটা ক্যানারি পাখী হয়ে এসেছে!"

এলিজাবেথের মা কাছেই চরকায় সুতো কাটছিলেন। তিনি জবাব দিলেন—"কেন বাবা, লিনেট মরে কি ক্যানারী হয়?—তোমার বন্ধু এরিখ তাদের খামারবাড়ি থেকে এ পাখীটি এনে এলিজাবেথকে উপহার দিয়ে গেছে।"

"কোন্ খামার?" একটু বিস্মিত হয়ে রাইনহার্ট জিজ্ঞাসা করল।

"তাও বুঝি জান না?"—মা বললেন।

"ব্যাপারটা কি?" রাইনহার্ট একটু স্বগত ভাবেই বলল।

মা বললেন—"গত কয়েক মাস থেকে এরিখ ইমেন হ্রদের ধারে তার বাবার দ্বিতীয় খামারের দখল পেয়েছে।"

রাইনহার্ট বলল—"কিন্তু আপনারা ত আমায় সে বিষয়ে কিছুই জানান নাই।"

মা বলে উঠলেন—"তুমিও ত বাপু তোমার বন্ধুর কোনও খোঁজ খবর লও নি। যা হোক, এরিখ ছেলেটি বড় ভাল, তার সব দিকেই নজর আছে। বেশ বিবেচক ছেলে।"

এই বলে কফি তৈরি করতে মা বাইরে গেলেন। এলিজাবেথ তখনও রাইনহার্টের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে তার নতুন পাখীটির জন্য ডালাপালা দিয়ে বাসা তৈরিতে ব্যস্ত। সে না ফিরেই বলল—"দয়া করে একটুখানি সবুর কর, আমি এখনই প্রস্তুত হচ্ছি।"

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে রাইনহার্টের মুখে কোনও জবাব এলো না। অল্প পরেই এলিজাবেথ তার দিকে ফিরল—ফিরে রাইনহার্টের চোখে মুখে একটা গভীর বেদনার ছায়া সে লক্ষ্য করল।

"তোমার কি হয়েছে, রাইনহার্ট?"—বলে সে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

"আমার?"—শুধু এই একটিমাত্র কথা বলে স্বপ্নাবিষ্টের মত সে চোখ তুলে চাইল এলিজাবেথের চোখের দিকে।

"তোমাকে এত গম্ভীর ও ব্যথিত দেখাচ্ছে!"—এলিজাবেথ বলল।

রাইনহার্ট বলতে লাগল—"এলিজাবেথ, আমি কিন্তু তোমার এ হলদে পাখীটি সহ্য করতে পারি না।"

এলিজাবেথ আশ্চর্য্য হয়ে ফ্যালফ্যাল করে রাইনহার্টের দিকে চেয়ে রইল। তরুণী যুবকের মনের ভাব বুঝতে পারেনি। "তুমি এক অদ্ভুত মানুষ!"—এলিজাবেথ বলে উঠল।

সে এলিজাবেথের হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে নিল—এলিজাবেথ কোনও আপত্তি করিল না। শীগগিরই মা আবার সেখানে এসে পড়লেন।

কফি খাওয়া শেষ হলে মা আবার তার চরকা নিয়ে বসলেন—রাইনহার্ট এবং এলিজাবেথ পাশের ঘরে তাদের আনীত উদ্ভিদ্‌গুলি শ্রেণীবিভাগ করে ঠিকমত রাখবার জন্য গেল। ফুলের পরাগ-দণ্ড, গাছের পাতা, কুঁড়ি প্রভৃতির বর্ণনা দিয়ে সাবধানে শ্রেণীবিভাগ করে প্রত্যেকটির ছুটি করে নমুনা মোটা একখানা খাতার পাতায় রাখল। সাজানো শেষ হলে এলিজাবেথ বলে উঠল—"মে ফুল কিন্তু এখনও আমাদের খাতায় রাখা হয়নি।"

রাইনহার্ট পকেট থেকে একটা ছোট বাঁধানো খাতা বের ক'রে খাতার ভাঁজ থেকে আধ-শুকনো একটি গাছ এলিজাবেথের সামনে ধরে বলল—"এই যে তোমার মে ফুল রয়েছে।"

এলিজাবেথ খাতায় ঐ গাছের বর্ণনাযুক্ত পাতাটি দেখে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি কি আবার গল্প লেখা শুরু করেছ?"

"গল্প আর লিখি না"—বলে রাইনহার্ট খাতাখানি এলিজাবেথের হাতে দিল। খাতায় কেবল উচ্চাঙ্গের কবিতা—বেশীর ভাগই পুরো এক পৃষ্ঠা ধরে লেখা। এলিজাবেথ পাতার পর পাতা উলটিয়ে চলল। কবিতার নামগুলিই সে দেখছিল।—

"যেদিন মাষ্টার মহাশয় তাকে বকলেন", "যবে বনের মাঝে সে হারালো পথ", "ইষ্টারের আনন্দঘনদিন", "যবে সে আমারে দিল প্রথম লিপি"—এই ভাবে প্রায় সবগুলি

লেখা। রাইনহার্ট তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে ছিল। এলিজাবেথ আবার খাতাখানির প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পাতা উলটাতে লাগল। রাইনহার্ট লক্ষ্য করল—এলিজাবেথের মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে রক্তিমাভ হয়ে উঠল। সে তার চোখ দুটি দেখতে ইচ্ছা করল, কিন্তু এলিজাবেথ আর মুখ তুলে চাইল না—অবশেষে নত মুখে নীরবে বইখানা রাইনহার্টের সামনে রেখে দিল।

দেখতে দেখতে ছুটির শেষদিন এসে গেল। যাত্রার দিনের সকাল। রাইনহার্টের কথামত এলিজাবেথ মার কাছে অনুমতি চেয়ে নিল—যাতে ক'রে তাদের বাড়ি থেকে কয়েকটি রাস্তার ব্যবধানে ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা পর্য্যন্ত সে তার সঙ্গে গিয়ে তাকে বিদায় দিতে পারে। সে রাইনহার্টদের বাড়ির গেটে এসে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হল। রাইনহার্ট তার কাঁধে হাত রেখে নীরবে তার পাশে পাশে চলল! ঘোড়ার গাড়ী ছাড়বার জায়গার যতই নিকটে আসতে লাগল ততই রাইনহার্টের মনে হতে লাগল এই দীর্ঘদিনের বিদায়ের মুহূর্তে এলিজাবেথকে কিছু দরকারী বিষয় জানিয়ে যাওয়া উচিত, যার উপর উভয়ের সারাজীবনের সুখশান্তি আশা আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করছে। আসল কথাটি কিন্তু কিছুতেই তার মনে আসছিল না। সে মনে মনে নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করছিল।—চিন্তাভারে তার গতিও মন্থর হয়ে পড়ছিল।

এলিজাবেথ বলে উঠল—"তুমি বড্ড দেরীতে বেরুলে—গির্জার ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে।"

এ কথাতেও রাইনহার্টের গতি দ্রুততর হ'ল না। শেষকালে জড়িত কণ্ঠে সে বলে উঠল—"এলিজাবেথ, দুই বছরের মধ্যে তুমি আর আমায় দেখতে পাবে না—যদি সত্যিসত্যিই তুমি আমাকে ভালবাস, তবে অবশ্য আমি আবার ফিরে আসব।" এলিজাবেথ ঘাড় নাড়ল এবং করুণভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। "আমি কিন্তু তোমার হ'য়ে যথেষ্ট বলেছি",—খানিকক্ষণ থেমে সে বলল, "আমার হয়ে? কেন? এর দরকার হ'ল কিসে?"

"মায়ের কাছে তোমার জন্য প্রতিবাদ করতে হয়েছে। গতকাল তুমি আমাদের বাড়ী থেকে চলে আসবার পর তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল।—মা বলছিল, আমার উপর তোমার আর আগের মত টান নেই।"

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে রাইনহার্ট তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তার চোখের দিকে ভাল করে চেয়ে বলল,—"আমার ভাব কিন্তু আদৌ বদলায় নি। তুমি তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পার। তুমি আমাকে নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে না, এলিজাবেথ!"

সে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল—"না।"

রাইনহার্ট তার হাত ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাকী পথটুকু চলতে লাগল। বিদায়ের সময় যতই নিকটে আসতে লাগল তার মুখ ততই প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে এলিজাবেথকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করল—"রাইনহার্ট, তোমার আরও যেন কি বলবার ছিল?"

"আমার একটি গোপন কথা আছে—খুব মজার কথা সেটা"—এই বলে সে জলজ্বলে চোখে এলিজাবেথের দিকে তাকাল। "দু'বছর পরে আমি ফিরে এলে একথা তুমি বুঝতে পারবে না।" এই বলতে বলতে তারা ঘোড়ার গাড়ীর কাছে গিয়ে পৌঁছাল। তখন গাড়ী ছাড়বার ঠিক সময় হয়ে গেছে। রাইনহার্ট আর একটিবার তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল।

"বিদায়, বিদায় এলিজাবেথ, ভুলো না কিন্তু।"

সে ঘাড় নেড়ে শুধু "বিদায়" কথাটি উচ্চারণ করল। রাইনহার্ট গাড়ীতে উঠবামাত্রই ঘোড়া চলতে শুরু করল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সংশয়

অমলকান্তি ঘোষ

প্রতিশ্রুতি—থাকবে চিরকাল।
তোমার সুর হারার পথে প্রান্তরে।
শান্ত জল কম্প্র উত্তাল···
চপল কলি আসছে নির্জনে।

হঠাৎ সুরে হারিয়ে যাওয়া মনে
জাগবে সাম সঙ্গীতের ধ্বনি!
আসবে ফিরে শুভ্র জ্যোতির্ময়
প্রতিশ্রুতি, জ্ঞানের রজনী!

সৌন্দর্য্যের রানীর কান্তি আপনারও হতে পারে!
দিনে দিনে সুন্দর হয়ে উঠুন…
হ্যাঁ, আপনারও উজ্জ্বল সুন্দর কান্তির স্বপ্ন সফল হয়ে উঠতে পারে! প্রতিবার স্নানের অথবা মুখ ধোয়ার সময় রেক্সোনার ক্যাডিল সমৃদ্ধ ফেনা গায়ে মুখে ভাল করে মেখে ধুয়ে ফেলুন। আপনার কান্তি দিনে দিনে আরও সতেজ আরও মসৃণ লাবণ্যে ভরে উঠবে।
"মিস রেক্সোনা"
১৯৫৫ সালের রেক্সোনা সৌন্দর্য্য প্রতিযোগীতার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী
…রে ক্সো না র
সাহায্যে স্বাভাবিকভাবে
একমাত্র ক্যাডিল* যুক্ত সাবান
* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈলসমূহের এক বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
বড় সাইজেও পাওয়া যায়
R.P. 130-X52 BG

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

"সিয়াটোয়" কাশ্মীর—
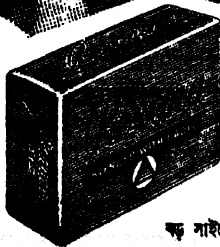
দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সংস্থা (সিয়াটো) একটি সামরিক জোট। ১৯৫০ সালের প্রথমে যখন ইন্দোচীনে যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব ওঠে, তখন আমেরিকা উহার বিরোধিতা করিয়াছিল; কমুনিষ্ট শক্তির সহিত আপোষ না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে "হিমালয় প্রমাণ প্রতিশোধ" গ্রহণের [illegible] করিয়াছিলে মিঃ ডালেস্। আমেরিকার বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়াই ইন্দোচীনে যুদ্ধ-বিরতি এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত জেনেভা চুক্তি জুলাই মাসে সম্পাদিত হয়। জেনেভায় অনুসৃত এই শান্তিকামী নীতির বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার উদ্যোগে ম্যানেলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল; ম্যানিলা চুক্তিই "সিয়াটো"র ভিত্তি। উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটো) অনুকরণে এশিয়ার একটি সামরিক জোট গড়িয়া তোলাই ম্যানিলা চুক্তির উদ্দেশ্য। সম্ভাবিত কমুনিষ্ট আক্রমণকারীকে সামরিক শক্তির দ্বারা প্রতিরোধ করিবার বিঘোষিত উদ্দেশ্যে এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস্ ও পাকিস্থান "সিয়াটো" নামক সামরিক জোটে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিণ যুবকদের যমালয়ে পাঠান হইতেছিল বলিয়া আমেরিকার জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়; কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। আমেরিকার অনুসৃত "গায়ের জোরের" নীতির ফলে পুনরায় ফরমোসা ইন্দোচীন অথবা কোরিয়ায় যুদ্ধ বাধিলে আমেরিকার যুবকদের যাহাতে আর জলপারে পাঠাইতে না হয়,—এশিয়াবাসীর হাতে মার্কিনী ডাণ্ডা দিয়া প্রতিবেশী এশিয়াবাসীর মাথা যাহাতে ফাটানো সম্ভব হয়, তদুদ্দেশ্যেই "সিয়াটোর" প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আধা-ফ্যাসিস্ত থাইল্যাণ্ড এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্বাধীন ফিলিপাইনস্ ব্যতীত পূর্ব্ব এশিয়ার অন্য কোনও রাষ্ট্র এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে আগাইয়া আসে নাই। হাঁ, আসিয়াছে দূর হইতে পাকিস্থান। পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কম্যুনিজম্ কোনও সমস্যাই নয়; পররাষ্ট্রক্ষেত্রে কোনও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সহিত তাহার বিরোধও নাই। তবু সে পূর্ব্ব-এশিয়ার সিয়াটোয় ভিড়িয়াছে, পশ্চিম-এশিয়ার বাগ্দাদ চুক্তিতে যোগ দিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের মধ্য দিয়া বাগ্দাদের পথে কোনও সামরিক বাহিনী পাকিস্থানের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে না, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া হইতেও কেহ তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে না। আক্রমণ আশঙ্কায় সে বাগদাদ্ চুক্তিতে বা সিয়াটোয় যোগ দেয় নাই। আন্তর্জ্জাতিক সামরিক জোটে ভিড়িয়া সে ভারতের বিরুদ্ধে খুঁটির জোর বাড়াইতে চাহিতেছে। আমেরিকার সহিত তাহার সামরিক দোস্তীও এই কারণে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট অনুন্নত পাকিস্থান তাহার স্যাঙাৎ আমেরিকার নিকট মানুষকে বাঁচাইবার কল চাহিতেছে না, চাহিতেছে মানুষ মারিবার কল।

এ হেন পাকিস্থানের রাজধানী করাচীতে গত মার্চ্চ মাসে সিয়াটো কাউন্সিলের অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে পাকিস্থান ঘোষণা করিয়াছিল যে, সিয়াটো কাউন্সিলে সে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে। করাচী বৈঠকের ২দিন পূর্ব্বে বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ সেলুইন্ লয়েড্ দিল্লীতে বলিয়া যান যে, কাশ্মীর প্রসঙ্গ করাচী বৈঠকে আলোচনার যোগ্য বিষয় নয়। ফরাসী পররাষ্ট্রসচিব মঃ পিনো বলিয়াছেন, "কাশ্মীর প্রসঙ্গ "সিয়াটোর" ঠিক এলেকায় পড়ে না।" সিয়াটোর মূল পাণ্ডা মিঃ ডালেসও নাকি পণ্ডিত নেহরুকে বলিয়া গিয়াছেন যে, মার্কিণ প্রতিনিধিমণ্ডল কাশ্মীর প্রসঙ্গ আলোচনার বিরোধী ছিলেন। তবু, কাশ্মীরকে হিমালয়ের চূড়া হইতে টানিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে আনা হইয়াছিল পাকিস্থানের আবদার রক্ষার জন্য। কাশ্মীর প্রসঙ্গ করাচীতে আলোচিত হইয়াছে, এবং সে সম্পর্কে একটা বিবৃতিও দেওয়া হইয়াছে। এশিয়ার সামরিক জোটগুলিতে পাকিস্থানের বিশেষ গুরুত্ব আছে, তাহাকে তোষণ করা পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এশিয়ায় তথা সমগ্র জগতে ভারত বিশিষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। পাকিস্থান সেই ভারতের জ্ঞাতিরাষ্ট্র, এবং তথায় অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি ও অপদার্থতার জন্য জনসাধারণের দুর্দ্দশা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, পাকিস্থানী নেতারা ততই ভারতের নিন্দায় অধিকতর পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেছেন। এশিয়াকে রক্ষা করিবার অজুহাতে এই মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক ঘাঁটী স্থাপনের এবং সমরোত্তেজনা জীয়াইয়া রাখিবার যে আয়োজন, তাহার বিরোধিতায় অ-কম্যুনিষ্ট জগতে নেতৃত্ব আজ ভারতের। সেই ভারতের জ্ঞাতি-শত্রুকে সামরিক জোটে ভিড়াইয়া তাহার সামরিক শক্তি বাড়াইয়া দিলে ভারত খানিকটা সায়েস্তা হইবে, এবং তাহাকে দিয়া ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার করাইতে পারিলে সে প্রচারের দাম বেশী হইবে—ইহাই সামরিক জোটের মাতব্বরদের ধারণা।

মিঃ ডালেস্ করাচীতে কাশ্মীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া এবং পাকিস্থানকে বিপুল পরিমাণে সামরিক সাহায্যের খোলাখুলি প্রতিশ্রুতি দিয়া দিল্লীতে আসিয়া বলেন যে, পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করিতে পারে, ইহা তিনি ভাবিতেই পারেন না; আর পাকিস্থান যদি ভারত আক্রমণ করেই, তাহা হইলে আমেরিকা পাকিস্থানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। এই প্রতিমধুর আশ্বাসে বড় রকমের ফাঁক রহিয়াছে।

পাকিস্থান সমগ্রভাবে ভারতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক, আর না-ই হউক, মার্কিনী ট্যাঙ্ক-বিমানের জোরে সে যুদ্ধ করিয়া সমগ্র কাশ্মীর দখল করিতে সচেষ্ট হইতে পারে। পাকিস্থানের কাশ্মীর উপত্যকা আক্রমণকে ডালেস্ নিশ্চয়ই ভারত-আক্রমণ বলিবেন না ; এই অঞ্চলকে যে তাঁহারা ভারতের অংশ মনে করেন না, তাহা তিনি সিয়াটো কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়া আসিয়াছিলেন। আর, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কে আক্রমণকারী, আর কে আক্রান্ত, তাহা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্কের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। কোরিয়ায় কম্যুনিষ্টরা বলিয়াছে যে, দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণকারী, অ-কমুনিষ্টরা উত্তর কোরিয়াকে দোষী বলিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট রুশিয়ার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে একদিনের মধ্যে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘের রায় লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত আক্রমণকারী সেখানে কে, তাহা নিরপেক্ষ তদন্তের দ্বারা আজও প্রতিপন্ন হয় নাই। আর আইনের দৃষ্টিতে যে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ, পাকিস্থান সেই কাশ্মীর আক্রমণ করায় তাহার বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘে ভারতের অভিযোগ সম্পর্কে আজ আট বৎসরের মধ্যে কোনও সিদ্ধান্ত হয় নাই। কাশ্মীরে গণ-ভোট লওয়া হইবে বলিয়া ভারতের যে সদিচ্ছামূলক আশ্বাস, তাহাই সেখানে বড় হইয়া উঠিয়াছে।

মধ্য-প্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থ বিপন্ন—

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের তিন-মহাদেশপ্লাবী গরলরাশি হইতে উত্থিত একমাত্র রাজনৈতিক অমৃত প্রাচ্যের গণ-অভ্যুত্থান। যুদ্ধোত্তর কালে প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোথাও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, কোথাও নব-উত্থিত শক্তির সহিত সে আপোষ করিয়াছে, কোথাও স্থানীয় প্রতিক্রিয়া-শক্তির সহিত মিলিত হইয়া জাগ্রত জনগণকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে ; আবার কোথাও নবজাগ্রত জাতির সহিত প্রভুশক্তির এখনও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চলিতেছে। ভূমধ্য-সাগরের তীরে আরব জগতে এবং এই সাগরের বক্ষে সাইপ্রাসে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে গণ-অভ্যুত্থান ইহা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে—নির্য্যাতিত প্রাচ্যের মহান অভ্যুত্থানেরই ইহা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজনৈতিক ভূগোলে সাইপ্রাসের অবস্থিতি যেখানেই হউক, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনতায় সাইপ্রেষ্টেরা প্রাচ্যের অধিবাসীরই স্বগোত্রীয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রায় একচেটিয়া ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের সর্ব্বপ্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ—খনিজ তৈলের ক্ষেত্রে বৃটিশের কর্ত্তৃত্ব ছিল অপ্রতিহত, রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সে-ই প্রভুত্ব করিয়াছে। দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়েই মধ্যপ্রাচ্যের তৈলক্ষেত্রে মার্কিণ স্বার্থের অনুপ্রবেশ ঘটে। সৌদী-আরবের তৈল-কূপগুলিতে মার্কিণ ব্যবসায়ীদের এখন একচ্ছত্র অধিকার ; কুয়েটের তৈল-স্বার্থে শতকরা ৫০ ভাগ, পারস্যের তেলে শতকরা ২০ ভাগ এবং ইরাকের তেলে শতকরা ২৫ ভাগ মালিকানা আমেরিকার। ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৫৫ সালের মধ্যে মধ্য-প্রাচ্যের মোট উৎপন্ন তৈলের মালিকানায় আমেরিকার অংশ শতকরা ১৩ ভাগ হইতে ৬৫ ভাগে পরিণত হইয়াছে, বৃটেনের অংশ শতকরা ৬০ ভাগ হইতে কমিয়া ৩০ ভাগ হইয়াছে। অর্থনীতিক্ষেত্রে বৃটিশ প্রভাব হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতিক্ষেত্রের উপর তাহার প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। পারস্যের আবাদান শুধু বৃটিশের অর্থনৈতিক স্বার্থেরই কেন্দ্র ছিল না—তাহার পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভুত্ববিস্তারের কেন্দ্রও ছিল আবাদান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই আবাদান গিয়াছে, সুদানে বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়াছে, সুয়েজ অঞ্চলে মিশরীয় ভূমি হইতে বৃটিশের সামরিক শক্তি অপসারিত হইয়াছে। ইহার পর, মধ্য-প্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার একমাত্র স্তম্ভ ছিল ইরাক ও জর্ডান। এই স্তম্ভের জার্ডানিয়ান্ প্রান্তটি এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইরাকে ও জর্ডানে বৃটিশের অনুরক্ত হাসেমাইট্ বংশের নৃপতি রাজত্ব করেন। জর্ডানের রাজা হুসেন গত মার্চ্চ মাসে আরব-লিজিয়ন হইতে গ্লাব পাশাকে তাড়াইয়াছেন।

১৯৩৯ সালে লেফ্টেনাণ্ট জেনারেল জন্ ব্যাগট্ গ্লাবের নেতৃত্বে আরব লিজিয়ন গঠিত হয়। বৃটিশের অর্থে এবং জেনারেল গ্লাব ও আরও কয়েকজন বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে জর্ডানে এই আরব বাহিনী পোষা হইত। ইহাদের ব্যয়ভার বহন করিতেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে অর্থ জোগাইতেন, তাহা জর্ডানের রাজকোষে যাইত না—এই অর্থের উপর জর্ডান্ গভর্ণমেণ্টের কোনও কর্ত্তৃত্ব ছিল না। জাতীয় চেতনাসম্পন্ন জর্ডানিয়ান্দের মনে পূর্ব্ব হইতে এই বাহিনীতে বৃটিশ কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ছিল। গত ডিসেম্বর মাসে আরব লিজিয়ন্ জর্ডানের বাগদাদ্-চুক্তি-বিরোধী বিক্ষোভ কঠোর হস্তে দমন করে ; তাহার পর হইতে এই বাহিনীতে বৃটিশ কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। মিশর, সৌদী আরব, সীরিয়া প্রভৃতি বৃটিশ বিরোধী (বিশেষতঃ বাগ্দাদ্ চুক্তি বিরোধী) আরব রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে হয়ত জর্ডান গভর্ণমেণ্টকে চাপও দেওয়া হইতেছিল। রাজা হুসেন্ গ্লাব পাশাকে অপসারিত করিয়া তাঁহার নিজের দেশের অধিবাসীর দাবী পূর্ণ করিয়াছেন এবং প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের স্বজাতীয়দের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন। গত কয়েক মাস জর্ডানে যে গণ-বিক্ষোভ চলিতেছিল, তাহার প্রত্যক্ষ উপলক্ষ অবশ্য বাগদাদ চুক্তি ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে মুক্তির জন্যই এই গণ-আন্দোলন। জর্ডান গভর্ণমেণ্টকে বাগদাদ্ চুক্তিতে স্বাক্ষর করাইবার অসামর্থ্যে এই আন্দোলনের আশু উদ্দেশ্য ইতিপূর্ব্বেই সফল হইয়াছিল। গ্লাব পাশার পদচ্যুতিতে উহার গভীরতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রথম সফলতা লাভ করিল। পক্ষান্তরে আরব লিজিয়নের উপর বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব চলিয়া যাওয়ায় মধ্য-প্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থে নিয়োজিত হইবার উপযোগী সকল (মোরাইল্) বাহিনী বৃটেনের হাতছাড়া হইল। জর্ডানের ঘটনাবলীর দ্বারা ইরাক প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা প্রবল। ইরাকের হাসেমাইট্ নৃপতি ফৈজল যদি নীতি পরিবর্ত্তনে বাধ্য হন, তাহা

হইলে মধ্য-প্রাচ্যে বৃটিশ প্রভাবের অবসান ঘটিবে: বাগদাদ্ চুক্তি ভাঙ্গিবে, সর্ব্বপ্রধান বৃটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ—ইরাক পেট্রোলিয়ম্ কোম্পানীর অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে।

উদ্বেলিত সাইপ্রাস্—

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বাঞ্চলে সাইপ্রাস্ দ্বীপটি বৃটেনের অধিকৃত। তথনকার অধিবাসীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ গ্রীক্, এক ভাগ তুর্কি। সাইপ্রেয়েট্ গ্রীক্‌রা বহুকাল হইতে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে, কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তর এই দাবীতে কোনও গুরুত্ব দেন নাই, কারণ দাবীর সহিত হিংসাত্মক তৎপরতা ছিল না। তাহার পর, সম্প্রতি মিশরের দাবীতে বৃটেন যখন সুয়েজ হইতে অপসরণ করিতে বাধ্য হয়, এবং তাহার সামরিক ঘাঁটী সাইপ্রাসে স্থানান্তরিত করিতে আরম্ভ করে, তখন সাইপ্রেয়েটদের স্বায়ত্তশাসনের দাবী এবং গ্রীসের সহিত মিলিত হইবার দাবী ("এনোসিস্" নামে এই দাবী পরিচিত) প্রবল হইয়া ওঠে। গ্রীক্ গভর্ণমেণ্ট এবং সাইপ্রেয়েট্ গ্রীক্‌দের পক্ষ হইতে আর্কবিশপ ম্যাকারিও আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, সাইপ্রাসে বৃটিশ অবস্থানে তাঁহারা আপত্তি করিবেন না। কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তর এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেন। স্বভাবতঃ সাইপ্রাসে তখন গণ-আন্দোলন প্রবল হইয়া ওঠে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাদের চিরাচরিত ভেদনীতি অনুসারে সংখ্যালঘু তুর্কিদিগকে সাইপ্রেয়েট্ গ্রীকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করেন। তুরস্ক গ্রীস ও বৃটেনকে লইয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকও বসে। কিন্তু সাইপ্রাস্‌কে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিবার কোনও নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা করিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অস্বীকার করেন। স্বভাবতঃ ত্রিপক্ষীয় বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায়। সংখ্যালঘু তুর্কিদের উস্কাইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করানো সম্ভব হইয়াছে; কিন্তু সাইপ্রেয়েটদের জাতীয় ভাবপ্রবণতাকে সাম্প্রদায়িকতার খাতে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনতার আন্দোলন বন্ধ করা যায় নাই। এই আন্দোলন এখন প্রবল হিংসাত্মক রূপ লইয়াছে। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিলে সাইপ্রেয়েট্ গ্রীকরা "এনোসিস্" দাবী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে সাইপ্রাসের জাতীয় আন্দোলনের নেতা আর্কবিশপ্ ম্যাকারিওর সহিত বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নূতন করিয়া আলোচনা আরম্ভ হয়। মার্চ্চ মাসের প্রথমে এই আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থতার প্রথম কারণ—সাইপ্রাসের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ভার স্থানান্তরিত করিতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সম্মত হন নাই, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে তাঁহারা প্রস্তুত নন, এমন কি যেখানে চার-পঞ্চমাংশ অধিবাসী গ্রীক্, সেখানে আইন পরিষদে গ্রীক্‌দের প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে কিনা, সে সম্পর্কে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত ছিলেন না। কোনও দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা এই ধরণের স্বায়ত্তশাসনাধিকার হজম করিতে পারেন না, আর্ক-বিশপ্ ম্যাকারিও-ও পারেন নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অতঃপর আর্কবিশপকে এবং তাঁহার সহকারী আরও তিন জন ধর্ম্মযাজককে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। তাঁহাদের কৈফিয়ৎ—ম্যাকারিও হিংসাত্মক তৎপরতার প্রশ্রয় দিতেছিলেন, তাঁহাকে নির্ব্বাসিত না করিলে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা সম্ভব নয়। ফল যথারীতি উল্টাই হইয়াছে। ম্যাকারিও ও তাঁহার সহকারীরা নির্ব্বাসিত হইবার পর সাইপ্রাসে সন্ত্রাসবাদী আগুন আরও বেশী দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

সাইপ্রাস্‌কে উপলক্ষ করিয়া গ্রাস্ ও তুরস্কের মধ্যে মনোমালিন্য হইয়াছে। এই দুইটি রাষ্ট্র অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) সভ্য গ্রীস্, তুরস্ক ও যুগোশ্লেভিয়াকে লইয়া আবার বল্‌কান্ চুক্তি হইয়াছে। গত বৎসর যুগোশ্লেভিয়ার সহিত রুশিয়ার আপোষ হওয়ায় বল্‌কান্ চুক্তির সামরিক উদ্দেশ্য অবশ্য ব্যর্থ হইয়াছে; গ্রাস্ ও তুরস্কের বিরোধের ফলে এই জোট এখন একেবারেই ভাঙ্গিতে বসিয়াছে। সর্ব্বোপরি, এই বিরোধে "ন্যাটো" ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। "ন্যাটোর" প্রাণ-উদ্যোক্তা আমেরিকার ইহাতে উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সম্প্রতি সাইপ্রাসের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটেন্ তাহার এই "ঘরোয়া ব্যাপারে" আমেরিকার হস্তক্ষেপ পছন্দ করিতেছে না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যর এণ্টনী ইডেন সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, মধ্য-প্রাচ্যের বৃটিশ তৈল স্বার্থ রক্ষার জন্য সাইপ্রাস্ তাঁহাদের প্রয়োজন; উহা তাঁহারা হাত ছাড়া করিবেন না। ইতিপূর্ব্বে বৃটেনের পক্ষ হইতে বলা হইত যে, মধ্য-প্রাচ্যের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্যই সাইপ্রাসের প্রয়োজন। সমগ্রভাবে মধ্য-প্রাচ্যের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার কথা বলিলে সাইপ্রাসের ব্যাপারে অন্যান্য শক্তির সামরিক স্বার্থ স্বীকার করিতে হয়। তাই, বৃটেন্ আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে সাইপ্রাস সংক্রান্ত "ট্যাক্‌টিক্‌স্" বদলাইয়াছে; বৃটিশ তৈল-স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে উহা সচেষ্ট হইয়াছে।

ষ্ট্যালিনোত্তর রুশিয়া—

ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট রুশিয়ায় এক-নায়কত্বের অবসান হইয়াছিল; প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল রাষ্ট্রের সমষ্টিগত নেতৃত্ব। নেতৃত্বেরক্ষেত্রে ষ্ট্যালিনের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদী ছিল; সোস্যালিষ্ট রাষ্ট্রের গঠনে এবং ফ্যাসিস্ত আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষার তাঁহার দান ছিল অতুলনীয়। ষ্ট্যালিনের স্থান গ্রহণের উপযোগী দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই বলিয়া সমষ্টিগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাই লোকে এতদিন মনে করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেসে ষ্ট্যালিনের ঘনিষ্ট সহকর্ম্মী ক্রুশ্চেভ্, মিকোয়ান্ প্রভৃতি ষ্ট্যালিনের উপস্থাপিত তত্ত্বের এবং ষ্ট্যালিনের আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ষ্ট্যালিন নিজেকে অন্যায়ভাবে-এক-নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণকে তাঁহার পূজার উৎসাহ দিয়াছিলেন। ক্রুশ্চেভ্ নাকি কম্যুনিষ্টদের এক গোপন সভায় অত্যন্ত কঠোরভাবে ষ্ট্যালিনকে আক্রমণ করিয়াছেন। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের এই ষ্ট্যালিন-বিরোধী উচ্ছ্বাসে সমগ্র জগতে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে।

ষ্ট্যালিনের আমলে ব্যক্তি-পূজা যে চরমে পৌঁছিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন সোভিয়েট রুশিয়ার জনগণকে যদি ব্যক্তির পরিবর্ত্তে সমষ্টিকে পূজা করিতে শেখান হয়, তাহা হইলে সত্যই প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ষ্ট্যালিনের আমলে লিখিত সোভিয়েট রুশিয়ার ইতিহাসে বিপ্লবের কয়েক জন প্রধান নায়কের নাম অবলুপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী জীবনে ইঁহারা যদি দেশোদ্রোহীও হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও ইঁহাদের সমগ্র ভূমিকা অবিকৃতভাবে ইতিহাসে স্থান পাওয়া উচিত ছিল। ষ্ট্যালিনোত্তর যুগে যদি ইতিহাস এইভাবে সংশোধিত হয়, তাহা হইলে রুশিয়ার বিদ্যার্থীদের প্রকৃত উপকার হইবে। পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ষ্ট্যালিন অত্যন্ত অনমনীয় নীতি অনুসরণ করিয়াছেন ; "হয় তাঁহার পক্ষের না হয় তাঁহার বিরুদ্ধে"—ইহাই তিনি বুঝিতেন। যুগোশ্লেভিয়ার প্রতি তাঁহার আচরণ, ইহার প্রমাণ। ভারত সম্পর্কে তৎকালীন রুশ সমালোচকদের মনোভাবও উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ষ্ট্যালিনোত্তর যুগে সোভিয়েট রুশিয়ার এই পররাষ্ট্রীয় নীতির আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; সহ-অবস্থিতির নীতি এখন আর কথার কথা নয়,—ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার ঐকান্তিক প্রয়াস চলিতেছে।

ষ্ট্যালিনোত্তর যুগের রুশিয়ার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ষ্ট্যালিনের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ কাপুরুষতার পরিচয়। ষ্ট্যালিনের আমলের নীতিকে যাঁহারা সমালোচন করিতেছেন, তাঁহারাও সে নীতির জন্য দায়ী ; যদি সে দায়িত্ব তাঁহারা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে মানুষ হিসাবে তাঁহারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। আত্মসমালোচনা করিয়া অতীতের ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া লওয়া, এবং নূতন নীতি অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া প্রশংসনীয়। অতীতের ভুলত্রুটির জন্য অন্যের উপর দোষারোপ—বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির উপর—হীনতার পরিচায়ক। (৩১।৩।৫৬)
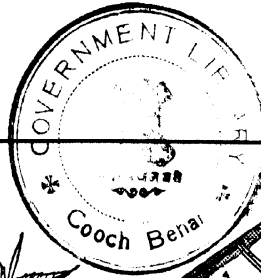
পরিচালক—উপানন্দ

নববর্ষে

আজ নূতনের জন্ম দিনে তোমরা যারা আমাদের সংসারে এসেছ নবীন অতিথি, গ্রহণ করো আমাদের শুভেচ্ছা, আমাদের আশীর্ব্বাদ। সংসার সমাজ-অরণ্যে তোমরা আমাদের সজীব সবুজ কিশলয়, হর্ষে আন্দোলিত হোক্ তোমাদের মনপ্রাণ।

শুভ সৌর নববর্ষ এসেছে প্রাচ্যের পূর্ব্বদ্বারে, এর প্রথম প্রভাতকে স্বাগত বন্দনা করেই সুরু হবে আমাদের বর্ষ পরিক্রমা—প্রতিঋতুর বৈচিত্র্য সমারোহে তোমরা মুখর করে তুল্‌বে বাংলার সামাজিক পার্ব্বণ-উৎসব—আমরা তা আনন্দে লক্ষ্য করবো। তোমরা আমাদের আশার প্রদীপ—সুন্দরের বার্ত্তাবহ।

বাঙালীর ভাব-জীবনের সকল বিশিষ্টতা নিহিত আছে তোমাদের মধ্যে: তাকেই প্রোজ্জ্বল করে তোলবার যে সাধনা আবশ্যক, সেই সাধনা তোমরা গ্রহণ করো। তোমরাই বাঙ্গালীর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকরূপে আমাদের উত্তর সাধক, স্বজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র প্রকাশ তোমাদের উপর করছে নির্ভর। আমরা জানি, তোমরাই আমাদের সমাজের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিভূ। তোমাদের জীবনাদর্শের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্ত হবে সোনার বাংলার পুনরভ্যুদয়।

আজ তোমাদের যে পথ দিয়ে চল্‌তে হবে, সে পথ সহজগম্য নয়—সাধনা-সাপেক্ষ। সেই সাধনার জন্য নৈতিক শক্তি আর বলিষ্ঠ আদর্শের প্রয়োজন, এদিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উদ্দেশ্যহীন গতিকে প্রাণধর্ম্ম করে নিজেদের ভাবী পথ কণ্টকিত করো না, আর স্বজাতির কল্যাণ লক্ষ্মীকে বিদায় করে দিয়ে, মহাস্থবিরতাকেই জীবনে অবলম্বন করো না। স্বদেশের স্বতন্ত্র মানসিক ঐশ্বর্য্যের ও চিন্তাধারায় স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ পরিচয় দেবায় শুভ লগ্ন তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তা হেলায় হারিও না। নববর্ষে স্বদেশের নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, তারই জাগরণী গান তোমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক্। তোমাদের দৈনন্দিন যাত্রা-পথে ফুটে উঠুক স্বদেশের ভাবধারার অক্ষয় সৌন্দর্য্য।

যারা পরানুকরণ করে নিজেদের জাতিগত, ধর্ম্মগত, সমাজগত, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আত্মপ্রসাদলাভ করছে, তারা যেন তোমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারে—ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মত হওয়া কি বাঞ্ছনীয়?—তাদের যে সমাদর দেখা যায়, তা অবজ্ঞা-মিশ্রিত, এই সমাদর তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে শুধু আত্মপ্রসাদলাভ করে না, নানাপ্রকার কৌশল জাল বিস্তার করে আপনাদের গরিমান্বিত করে আত্মপ্রচার আরম্ভ করে ও মদগর্ব্বিত হয়। তোমরা যেন তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ো না।

তোমাদের মৃত্তিকাতে যে ফসল ফলে, সেই ফসলই তোমাদের পুষ্টি-বর্দ্ধক—যে দেশে গাঙ্গেয় বারি কল্যাণপ্রদ, সে দেশে জর্ডন নদীর বারি এনে সংস্কৃতি-বিধৌত করবার আবশ্যক হয় না। যেখানে আশাবরী সুরে মন মেতে ওঠে, সেখানে বিঠোফেন সিম্‌ফনি বাজিয়ে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের দ্বারা জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে কলঙ্কিত করাই জেনে রেখো আত্মহনন।

তোমাদের সংস্কৃতি, সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে তোমাদের মৃত্তিকার অনুপযোগী যে ফসল—তার বীজ বিদেশ থেকে এনে ছড়িয়ে দিওনা, তাতে তার পরিণতি শোচনীয় হয়ে উঠ্‌বে। ভাব-সম্মিলন ভালো, ভাবদুষ্ট হওয়া ভালো নয়। তোমাদের গৌরবের পরিচয় হবে তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের ধারাকে বহন করে এনে তাকেই নিজেদের সাধনার দ্বারা মহিমান্বিত করে তোলা—আত্মবিলোপ সাধনের জন্যে অপরের সংস্কৃতি সমাজও সাহিত্যের অনুকরণ করে নিজেদের প্রাচীন গৌরবধারাকে বিকৃত করো না, তাতে আত্মবিলোপ সাধন হবে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন ভারতের শাশ্বত আত্মার মহান্ আদর্শকে পৃথিবীর সম্মুখে তুলে ধরে—বাংলা তথা সমগ্র ভারতের সংস্কৃতি, কাব্য, সাহিত্য, চিন্তাধারা, মনন ও জীবনদর্শন তিনি অভিনবরূপে বিশ্ববাসীর নিকট দেখিয়ে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও জীবন-দর্শনের মহামহিমান্বিত রূপ বিশ্বের সম্মুখে প্রকাশ করে জগদ্বরেণ্য হয়েছিলেন। এঁরা ছিলেন সর্ব্বোন্নত বলিষ্ঠতম দীপ্তিমান মহামানব। এঁদের পদাঙ্কানুসরণ করাই তোমাদের প্রয়োজন, এঁদের ভাব ধারায় অবগাহন করে তোমরা তোমাদের সাধনায় অগ্রসর হবে।

তোমরা বোধ হয় জানো ভারতের সাধনার একটা বৈশিষ্ট্য আজ দীর্ঘ বহু সহস্র বৎসর ধরে, রাজনৈতিক উত্থান পতন ও বৈদেশিক আক্রমণ ও শাসন সত্ত্বেও, ভারত সভ্যতাকে অটুট করে রেখে এসেছে। সেই সাধনার বৈশিষ্ট্য কি, তোমরা অনুসন্ধান করে দেখো, আর তা গ্রহণ করে নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিও। বিজাতীয় পরানুকরণপ্রিয়তার ফলে যারা আজ সাহিত্যে, সমাজে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রশংসা পাচ্ছে

জেনো রেখে তারা শূন্যগর্ভ—তাদের দান অল্পকালের মধ্যেই নিস্প্রভ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। সংবাদপত্রে তাদের পৌনঃপুনিক প্রকাশিত নাম ও প্রতিকৃতি দেখে তারা আত্মস্ফীত হচ্ছে বটে, জেনে রেখো এই সব অহংমন্য লোক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাবে না। এরা শফরী, অল্প জলের মধ্যে লাফিয়ে বেড়ায়।

আজ তোমাদের মধ্যে চাই চরম দুঃসাহসিক বলিষ্ঠ—যৌবনদৃপ্ত কর্ম্মশক্তি—যাতে করে তোমরা তোমাদের সংহতিকে সুদৃঢ় করে রাখ্‌তে পারো। শতাণীক ঋষি নিজের পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহারণ্য মধ্যে বিচরণ করতে করতে যেরূপ পথ হয়, তেমনই বার বার অধ্যয়ন করতে করতে ক্রমে জ্ঞানের উদয় হয়ে থাকে. কেননা অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতও ক্রমে অতিক্রম করা যায়। তোমাদের কর্ম্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করো অধ্যয়নরত সংহতি শক্তিতে। বিদ্যা যার নেই, তার কীর্ত্তিও নেই। তোমরা বুদ্ধিমান, তাই অপমানকে অগ্রে রেখে আর মনকে পশ্চাতে রেখে নিজেদের কার্য্য উদ্ধার করবে। কেননা কার্য্য ধ্বংস হ'লে মূর্খতামাত্র প্রকাশ পায়।

তোমাদের মধ্যে সুন্দর মানসিক আবহাওয়া সৃষ্টি করো—যার ভেতর দিয়ে প্রত্যক্ষ হয় যেন তোমাদের ভদ্রতা, ভব্যতা, বিচারশক্তি, সহানুভূতি, প্রতিবেশীর প্রতি শ্রদ্ধা, অনুগতজনের প্রতি স্নেহ। দেশপ্রেম আর সমাজবোধ নিয়ম-শৃঙ্খলা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা ভিন্ন কোন মহৎ কাজ হয় না—তরুণ জীবনে কোন কুৎসিত অভিব্যক্তি যেন অন্তর থেকে জাগিয়ে তুলোনা—তা'তে ধ্বংস অনিবার্য্য। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাসের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে অপরিণতবুদ্ধি অপরিপক্ক বয়সের ভুলে এমন কাজ করো না যা জাতীয় উন্নয়নের পরিপন্থী। সত্যকে আদর্শকে শুধু উত্তরাধিকার সূত্রেই গ্রহণ করোনা, অন্তঃকরণ দিয়ে সেগুলিকে উপলব্ধি ক'রবে—তা না হোলে সার্থকতা আসবে না।

আমাদের কাহিনীর সমাপ্তি যেখানে ঘটে যাবে, আর অদৃষ্ট দেবতা যেখানে আমাদের শেষ গতিরেখা টেনে দেবেন, সেখানে আরম্ভ হ'বে তোমাদের নতুন কাহিনী আর তোমাদের জীবনের নতুন অধ্যায়, নতুন পরিচ্ছেদ—সেই সময়ের নববর্ষ নিয়ে আসবে স্বদেশের বহু বিচিত্র ঘটনার স্মৃতিকে, জাগিয়ে তুলবে সেই সঙ্গে স্বজাতির বহু গৌরব-সম্ভাবনাকে। বঙ্গোপসাগরের কূলে তোমাদের জীবনের খেলাঘর, তোমাদের অরণ্যে বাস করে ভীষণ ব্যাঘ্র রয়েল বেঙ্গল টাইগার, তোমাদের সম্মুখে নৃত্য করে কেউটে গোখ্‌রো প্রভৃতি বিষধর সাপ—তোমাদের আদি কাহিনীর যাঁরা নায়ক যেমন চাঁদসদাগর, শ্রীমন্ত প্রভৃতি, পৃথিবীর নানাপ্রান্তে বাণিজ্যতরী নিয়ে বন্দরে বন্দরে অভিযান করেছেন, তোমাদেরই দেশের বীর সন্তান বিজয়সিংহ নিঃসহায় হয়ে বেরিয়ে সিংহলে রাজ্যস্থাপনা করেছিলেন, তোমাদের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতি বার্দ্ধক্যেও তুষারাবৃত হিমালয়ের পথ ধরে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তোমাদের বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষ সহায়সম্বলহীন অবস্থায় ভারতের বাহিরে গিয়ে বিজয় পতাকা উড়িয়েছিলেন—তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অন্তরে জেগে উঠ্‌তো প্রাণের উৎসাহ ঝড়ের রাত্রে, সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় তাঁরা দুলে দুলে নব নব উপনিবেশের সন্ধানে ছুটে গেছেন, তাঁরা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগকে বন্ধুর মত আলিঙ্গন দিয়ে নব নব যুগের প্রভাতকে এনেছেন—তোমরা তাঁদের সন্তান। নববর্ষে তোমরা প্রতীজ্ঞা করো তাঁদের কৃতী সন্তানসন্ততি হয়ে বিশ্ববরেণ্য হ'তে। আলোকের পথে অগ্রসর হও সংশয় মোহ ভয় আর অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে।

আজ আনন্দসুন্দর দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ছে উষার নবীনতা কাকলী-কল্লোল মুখর দেশে। আবার এসেছে বৈশাখ—কী বার্ত্তা এনেছে সঙ্গে করে কান পেতে শোনো। যে বৎসরটাকে, আমরা বিদায় দিলাম চড়ক আর গাজনের উৎসব করে, তাকে আর ফিরে পাবো না। যে বীজ সে ছড়িয়ে গেল আমাদের অন্তরে বাহিরে, তারই ফসলের প্রত্যাশায় কেটে যাবে আমাদের দিনগুলো। অনন্তকালের সীমাহীন সিন্ধুর বুকে এমনি করে এক একটি বর্ষ বুদ্‌বুদের মত উঠে মিশে যাচ্ছে—এক একটি আয়ুর পাতা খসে পড়ছে জীবনবৃক্ষ থেকে—তবু আমাদের অসীম যাত্রা দুর্গম তীর্থের সন্ধানে, মহামানবের পদধ্বনি কানে আসছে—দেবতার মধ্যে পড়্‌ছে মানুষের ছায়া। অতিমানস চেতন স্তর থেকে দিব্য-প্রকাশের সম্ভাবনা অনুভূত হচ্ছে—আমাদের অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের রেখা অঙ্কিত হচ্ছে মহাকালের অলক্ষ্য নির্দ্দেশে। তোমরা প্রস্তুত হও—আজ নতুনের জন্মতিথিক্ষণে তোমাদের সকলের চিত্তে জাগ্রত হয়ে উঠুক শুচিশুভ্র ভাব। অমৃতের সন্তানগণ! ওঠ, জাগো, তপস্যা করো অধ্যয়ন ব্রতী হয়ে।

বিবেকানন্দ বলেছেন—"সত্যের অন্বেষণ, স্বাধীনতা ও মহত্ত্বের জন্য প্রাণপণে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং যাবতীয় মহৎ কর্ম্মের সাধনার ফলেই ব্যক্তি ও জাতি উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়। যে জাতির লোকেরা সত্যান্বেষী নয়, যেখানে মানুষ মানসিক জড়তা, আলস্য ও পুরাতন জীর্ণ আচার প্রথায় নিমজ্জিত, সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভারতবাসীদের এখন সমস্ত জড়তা ও সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে।'

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—'যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ। ভগবান কল্পতরু। তাঁর কাছে যে যা চায়, সে তাই পায়।'

তোমরা এখন সুকুমারমতি। অধ্যয়ন আর জ্ঞান অর্জ্জন করে মানুষের মত মানুষ হওয়াই তোমাদের একমাত্র ভাব হওয়া উচিত। তা যদি হয়, তা হোলে লাভ হবে. যুগাবতার পরমহংসদেবের কথা মিথ্যা হোতে পারে না। ভগবানের কাছে নববর্ষে ঐ ভাবেই প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে। বিবেকানন্দের উপরোক্ত বাণী তোমরা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করো, আর তাঁরই বাণী কার্য্যে পরিণত করে ভাবী ভারতের মঙ্গল বিধান করতে অবহিত হও।

বৈশাখ মাসটী আমাদের পক্ষে বিশেষ পবিত্র। ভগবান বুদ্ধদেব বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই দিনে তাঁর বুদ্ধত্ব আর মহাপরিনির্ব্বাণ হয়েছিল। পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই মাসেই শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব। নুতন খাতার মহরৎ এই মাসেই হয়ে থাকে। সূর্য্য সিদ্ধান্তে সৌর, চান্দ্র, নক্ষত্র ও সাবন এই চারি প্রকার মানে মাসাদির ব্যবহার উক্ত হয়েছে। শকাব্দ ও বঙ্গাব্দই সৌর বৈশাখ মাসে আরম্ভ হয়—যে সময়ে অশ্বিনী নক্ষত্রে অর্থাৎ মেষ রাশিতে সূর্য্যের সঞ্চার হয়। আমাদের নূতন সৌর বৎসর সেই সময় থেকেই সুরু হয়। যে চান্দ্রমাসে সাধারণতঃ বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত, তাকেই আমরা চান্দ্র বৈশাখ নামে অভিহিত করি। এই মাসে আমন ও শরৎ পক্ক ধান্যের বীজ বপন করা হয়। এ মাসটী যদিও বসন্ত ঋতুর শেষ মাস বলে শাস্ত্রে কথিত হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে একে গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম মাস বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। তোমরা এসময়ে ঘৃত, দুগ্ধ বেশী পরিমাণে পান করবে, পরমান্ন ভোজন করবে, আর শীতল স্থানে অবস্থান করবে। দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য তোমাদের সুদৃঢ় হোক্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। তোমরা যে অন্ধকার অতিক্রম করেছ, তা সুপ্তির অন্ধকার। আজ এসেছে আলোকের উদ্বোধন নববর্ষের পথে—আজ পেয়েছ তোমরা যুগারম্ভের প্রভাত। মহামিলনের আনন্দ পারাবরে অবগাহন করে তোমরা নববর্ষের উৎসবে আমাদের সঙ্গে যোগদান করো এই আহ্বানই তোমাদের কাছে জানাচ্ছি।

—

ফটো : সমর মিত্র

ভগবান তথাগত

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তোমারে স্মরণ শ্রদ্ধায় করি নিখিল মানব সনে,
আড়াই হাজার বছরের পরে নব বরষের ক্ষণে।
রাজার দুলাল জীবের জন্য সারাটী জীবন ধরি,
পথে পথে কেঁদে গিয়েছ তুমি যে মুক্তি-সাধনা করি।
করুণার মহা অবতার হয়ে এলে মানুষের মাঝে,
প্রেম দিয়ে আর প্রাণ দিয়ে গেলে শত প্রাণীদের কাছে।

সোনার মুকুট ধনসম্পদ রাজ্য সিংহাসন
তোমারে ভুলাতে পারেনি কখন—প্রাণ ও হৃদয় মন—
শৈশব হোতে জীব-কল্যাণে স'পেছ দেবতা তুমি!
ক্ষমা-সুন্দর রূপেতে এসেছ রচিতে প্রজ্ঞা ভূমি।
নির্ব্বাণ লোকে অনির্ব্বাণের শুনালে তত্ত্ব কথা,
তোমার বিহনে আজিও কাঁদিছে পাদপাদপ-লতা।

এলো বৈশাখা-পূর্ণিমা প্রভু! তব অর্চ্চনা তরে,
এই শুভদিনে একদা জনম নিয়েছ রাজার ঘরে।
এই দিনে তব জন্মান্তরের অভিনব রূপ লয়ে
বোধিতরু-তলে হয়েছ বুদ্ধ মুক্তির কথা কয়ে।
এই দিনে তুমি চলে গেছ আর ধরায় এলে না ফিরে
আজো মল্লিকা তোমারে খুঁজিছে নিরঞ্জনার তীরে।
তব জীবনের কাব্যকাহিনী দয়াহীন সংসারে
যুগ হোতে যুগে ধ্বনিয়া উঠেছে দানবের সংহারে।
সভ্যতা যেথা দস্যুতা হোলো মানুষ কঠিন ক্রূর,
যেথায় তোমার বাণী বন্দনা শোনা যায় সুমধুর।
ভগবান তুমি মানুষের বেশে আপনার পরিচয়—
কাঙালের রূপ ধরে দিয়ে গেলে আজো তাহা বিস্ময়।
জনম-মরণ জর শোক ব্যাধি নিয়তির যাহা দান,
দেখায়ে গিয়েছ কেমনে তাদের হোতে পারে অবসান।
তোমারে প্রণাম করি তথাগত আলোক-বার্ত্তাবহ
মহাভারতের তীর্থ-দেউলে কথা কহ—কথা কহ।

সাঁচীর বৌদ্ধস্তূপ ফটো—ভানু সেনগুপ্ত

কৌতূহল!

(রঙ্গরস)

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

তোমরা কি বলতে পারবে, আজকালকার বাচ্চাদের ঘড়ির ওপর এত রাগ কেন? কদিন ধ'রে আমাদের এ অঞ্চলে কি হচ্ছে শোনো;—পন্টু তার বাবার রিষ্টওয়াচটাকে—ভগবান জানেন কি রকম ক'রে খুলেছে, কাঁচ ভেঙেছে, কাঁটা ভেঙেছে। দিনকতক পরে লালবাড়ীর নীলা তার ঠাকুর্দ্দার টাইম্‌পিস্‌টাকে টেবিল থেকে নামিয়েছে, আছড়েছে। নামালো কি ক'রে ক্ষুদে মেয়েটা উঁচু টেবিল থেকে ছোট ঘড়িটাকে? জানি না। আর আজ, আমাদের বাড়ীর খোকন দেয়ালঘড়ি, যেটা তাকের ওপর বসানো ছিল, খাটে উঠে তাতে হাত দিয়ে কাঁটাগুলো হরদম ঘুরিয়েছে, পেণ্ডুলাম ধ'রে টেনেছে, তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

পন্টুর বাবা নীলার মা ছেলেমেয়েদের কি করেছে জানিনা, আমি ত ঠিক্ করেছি খোকনের পিঠে পাথার বাঁট্‌টা ভাঙব। ওয়ালক্লক্ কি ওর খেলার জিনিস? এত খেলনা, পুতুল, রথ, ছবির বই ট্রাইসাইকেল সব প'ড়ে রইলো—তার ওপর আমার অত সখের অত দামী ঘড়িটার দিকে লোভ? এত সহ্য করা যায় না, সহ্য করা উচিত নয়। ওকে রীতিমত শিক্ষা দিতে হবে।

কিন্তু তাকে পাই কোথায়? অফিস থেকে ফেরবার আগেই সে পাড়ার কোন্ বাড়ীতে গিয়ে লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, আসুক সে!

গুম্ হ'য়ে ব'সে আছি। এলো রামদুলাল। আজ তাদের দোকান বন্ধ, সপ্তাহে দেড়দিন যেমন বন্ধ থাকে, তাই সিনেমা দেখ্‌তে এসেছে। টিকিট কেনা আছে। গল্প করতে এলো। বল্লে—মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে আছেন কেন?

বল্লাম—দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব তোমায়, ছেলেটা সেই দামী ঘড়িটা নিষ্ঠুরভাবে ভেঙেছে।

তাতে হয়েছে কি?

হয়েছে কি? এত সহজে তুমি কথাটা বল্‌তে পারলে? ও, তোমারই ত লাভ। মেরামত করতে পাঠাব তোমার দোকানে। তুমি ত চাও যত ইচ্ছে ঘড়ি ভাঙুক ছেলেরা।

—আচ্ছা, এবারের মেরামতটা না হয় আমি অম্‌নি ক'রে দোব। আমার ভাইপো ভেঙেছে, আমি সারিয়ে দোব।

চৌরঙ্গীতে প্রকাণ্ড দোকান রামদুলালের। কত দামের কত বিচিত্র ঘড়ি সেখানে! মুক্তোর সাইজের ছোট্ট ঘড়ি থেকে মানুষ-সমান বড় বড় ঘড়ি, কত রকমের

বাজনা সব। এমন ঘড়ি আছে যাতে দমই দিতে হয় না জীবনে, হাতে প'রে থাক্‌লেই দম হ'য়ে যায়। জলের মধ্যে ফেলে রাখ্‌লেও অচল হয় না, এমন ঘড়িও আছে। কোনো ঘড়িতে পাখীর ডাক, কোনো ঘড়িতে কুকুরের ডাক। রামদুলাল সাহেব-বাড়ীতে কাজ করত পাঁচশো টাকা মাইনেয়, এখন ত মাসে হাজার হাজার টাকা নিজের কারবারে রোজগার করে। সেই রামদুলাল ঘড়িটা দেখ্‌লে। দেখে বল্‌লে, পাঠিয়ে দেবেন আমার দোকানে। এক পয়সা লাগবে না।

তারপর হেসে বল্‌লে, দেখুন দাদা, আমি যে আজ ঘড়ির ব্যবসায়ে এত টাকা কামাচ্ছি, এর মূলে আছে ঘড়ি ভাঙা। বাবার ঘড়ি ভেঙেছিলুম, বাবা মা মেরে বলেছিলেন, যেমনটি ছিল, তেম্‌নি জুড়ে দাও। জুড়তে পারিনি, কিন্তু জোড়বার চেষ্টাতে অনেকটা এগিয়ে গেছ্‌লুম এ লাইনে। ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনিও একদিন ছেলেমানুষ ছিলেন। নিজের ছেলেবেলার কথা ভাবুন ত!

নিজের ছেলেবেলার কথা ভাবতে গিয়ে কিছুই মনে পড়লো না। শুধু মনে পড়লো, বড় বড় ঘড়িগুলোকে দেখে ভয় করত। একলা ঘরে টিক্ টিক্ টক্ টক্ শব্দ যখন করত, তখন মা পাশে না থাক্‌লে ঘুম আস্‌ত না। তার ওপর বাজবার আগে, কর্‌র্ ক'রে একটা যে আওয়াজ হত, সেটা ত রীতিমত ঘাব্‌ড়ে দেবার মতন।

ছোট সোনার ঘড়ি টেবিলে টিক্ টিক্ করত, হাতই দিতাম না, পাছে হাত দিলেই থেমে যায়, আর জামাইবাবু এসে বকুনি লাগায়।

সেদিন এখন আর নেই। এখন ছেলেদের ভয় ভাঙাতে হবে, কৌতূহল জাগাতে হবে। আপনাদের মতন ম্যাদা-মারা গোবর-গণেশ ছেলে হলে চল্‌বে না। চালাক চতুর ছেলে চাই। কৌতূহল ভালো জিনিস। এ যুগের ছেলেরা ঘড়ি ভাঙবেই, আপনারা পারেন ত ঘড়ি সাম্‌লান্, ছেলেদের ধম্‌কানো চল্‌বে না—ব'লে রামদুলাল চ'লে গেল। শেষের কথাটা শুন্‌তে-পেয়ে খোকন ঘরে ঢুক্‌লো।

বল্‌লে, বাবা, আমার কৌতূহল হয়েছিলো।

শোনো কথা! ছেলের কৌতূহল হ'য়েছিলো! এদিকে কৌতূহল যখন বানান করতে বল্‌লুম, তখন বল্‌লে কিনা কয়ে ওকার কো, আর হ্রস্বউ, তয়ে হ্রস্বউ আর ল!

—

লখিয়া

ডাঃ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী

এম-এ, পি-আর-এস, পি এচ-ডি

পাহাড়গুলো পার কোরেই কোডারমা। তারই কাছে রাস্তা হতে একটু দূরেই লখিয়ার ছোট্ট দোকান। ছাতু, খই, ছোলাভাজা, মটরভাজা ও আরও কয়েকটি খুচরো জিনিষ মাটির গামলায় সাজিয়ে লখিয়া বসে থাকে সকাল হতে রাত আটটা পর্যন্ত। পাশেই ছোট গ্রামে এক বুড়ির কাছে সে রাতে শুতে যায়। তার এজগতে আপনার জন কেউ নেই। যখন ও চার বৎসরের ছিলো—ওর বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়—আর ওর মা মারা যায়, যখন ও দশ এগারো বৎসরের মেয়ে। তারপর হতে ও এই বুড়ীর বাড়ীতেই থাকে। বুড়ী ও আর পাঁচজনে মিলে একবার ওর বিয়েও ঠিক করেছিলো এক হাঁপানীওলা বুড়োর সঙ্গে। লখিয়ার কান্নাকাটি কেউ গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু বিয়ের দিন বুড়ো বরের হাঁপানী ভয়ানক বেড়ে গিয়ে তিন দিনের ভিতরেই বুড়ো মারা গেলো। লখিয়ার বিয়ে আর হলো না। আর সেই থেকে লখিয়া যে বড়ো অপয়া তা সব জায়গাতে রটে গেলো এমন ভাবে—যে তার আর বিয়ে হয় নি। বুড়ীই ওকে এখানে দোকানে লাগিয়ে দিয়েছে। বুড়ী মুদীয়ানেরই দোকান এটি। আগে নিজেই দোকানে বসতো—এখন আর পারে না। তাই বুড়ী বাড়ীতে থাকে, আর ছোলা মটর ভুট্টা ভাজে। দোকানের কাজ হয়ে গেলে লখিয়াও বাড়ীতে এসে অনেক কাজ করে, আর বুড়ীর দেখাশোনা করে—সেবা যত্ন করে। বুড়াও লখিয়াকে ভালোবাসে—লখিয়ার জন্ম ও জীবন তার সামনেই সব ঘটেছে—শেষকালে লখিয়াকে আশ্রয় দিয়ে বুড়ীরও মিলেছে তার নিঃসঙ্গ শেষ জীবনে একটু মমতার আশ্রয়। তারও লখিয়া ছাড়া কেউ নেই।

লখিয়ার এখন বয়স তিরিশের কাছাকাছি। আগে-

পাশের সকলেই ওকে ভালোবাসে—কারণ ওর স্বভাবটি বড়ো ভালো। দোকানে বসে সামনের পাহাড় আর বনের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেই ওর কাটে সারা বেলা। এমনই কেটেছে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি মেলে ওর দীর্ঘ দশ বছর—যবে থেকে ও ওই দোকানে বসেছে। ওর মুখে একটি গভীর নির্লিপ্তি। কি যেন ও সর্ব্বদাই ভাবে। সকলেই ওকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে। এ যেন সাধারণ দোকানী নয়। গরম হোক ঠাণ্ডা হোক, ও একটি সাদা চাদরে সমস্ত দেহটা ভালো করে ঢেকে—হাঁটু দুটি বুকের কাছে টেনে তাদের দুহাতে জড়িয়ে আর তাদের ওপর মাথা রেখে চুপটি করে বসে থাকে—আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকে। মাথাটিও ওর সাদা চাদরেই ঢাকা থাকে—শুধু ওর বিষণ্ণ শান্ত মুখখানি অন্তহীন গভীর চাউনি নিয়ে জেগে থাকে।

—ক'জন লোকই বা ওর দোকানে আসে। কোনো শ্রান্ত পথিক হয়তো ওর কাছ হ'তে কিছু ছাতু বা ভুট্টার খই কিনে পাশে গাছের তলে বসে খায়। পরে লখিয়ার কাছেই জল চায়। লখিয়া উঠে মাটির কলস থেকে ঠাণ্ডা জল এনে তার অঞ্জলি পূর্ণ করে ঢেলে দেয়। পথিক তৃপ্ত হয়ে চলে যায়—আর লখিয়া আবার তেমনি ভাবেই বসে থাকে। কথা প্রায় সে বলেই না। কেবল দেখে, আর কি-যেন ভাবে!

কি বা ভাবে? আজ সন্ধ্যাবেলা হ'তে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়চে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। পথে কেউই নেই। সুমুখের পাহাড় অন্ধকারে একটা দৈত্যের মতো আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—তার মাথার দেবদারু-শালের জটায় শাঁই-শাঁই আওয়াজ হচ্ছে। দোকানের ঝাঁপি বন্ধ করে গ্রামে ফিরে যাওয়াই দরকার এখন। কেমন একটা কি-হারানোর বেদনা আর অজানা আশঙ্কায় মন ছেয়ে উঠছে। তবু যেন এই লখিয়ার ভালো লাগছে। চাদরটা আবার ভালো করে মুড়ি দিয়ে লখিয়া বসে। ঠাণ্ডা বাতাস যেন পরমাত্মীয়ের মতো ওর মুখ-চোখে লেগে ওর মন-প্রাণ দেহ জুড়িয়ে দিচ্ছে। যেন কতো গভীর তত্ত্বকথা বলে ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। লখিয়া আগাগোড়া ওর জীবনের কথা ভাবছে—দোকানের কোণে ঝোলানো হারিকেনের আলোটা মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ ক'রে উঠছে, আর মস্ত হ'য়ে পড়া লখিয়ার ছায়াটা দুলে দুলে উঠছে!

ও ভাবে ওর বাবার কথা—একটা আবছায়া অনুভব ছুঁয়ে যায় ওর মনকে—একজন ওকে কোলে করে বেড়াচ্ছে। আর একটা ছবি অস্পষ্ট রং নিয়ে মনে আসে—পরম নির্ভর-ভরা স্নেহনীড়ের মতো বিরাট বুকে তাকে বলিষ্ঠ বাহুতে ঘিরে রেখে একজন হাসিমুখের ছোট্ট লখিয়ার হাত ধরে একটি সুপুষ্ট কালো গরুর গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছে—আর ওর ভারী ভয় করচে—কেঁদে ফেলেছে! সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা জলজ্বলে ছবি ফুটে ওঠে—বাড়ী ফিরেই লখিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে তার হাতে একটা বড় সাদা লাড্ডু আর একটা টুকটুকে লাল কাঠের ঘোড়া দিচ্ছে ওর বাবা!—এই ক'টা ছবিই ওর সম্বল। বার বার এগুলি তার স্মৃতির ঝুলি হ'তে সন্তর্পণে বার করে উলটে পালটে নিবিড় করে দেখে এগুলিকে। মার কাছে শুনেছে, বাবার কতো কথা! বাবা তাকে কতো ভালোবাসতো। পাথর-কাটা কাজে বেরুবার সময়ে তাকে অনেক আদর করে—তবে যেতো। আবার দুপুরবেলা যখন লখিয়ার মা স্বামীর খাবার নিয়ে সেখানে যেতো—তখন মেয়েকে কোলে নিয়ে সে খেতে বসতো—আর সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে লখিয়াকেও খাওয়াতো। রাতেও তাই। আশেপাশের মেলা-তলা হ'তে বাবা ওর জন্যে খেলনা আনতো নানারকম। বাবা নাকি ওর মাকে বলতো—"চাঁদের মতো বেটী হয়েছে রে—আর আমাদের ছেলেমেয়ে চাই নে—!" আরও নাকি বলতো—"নান্‌হীর বিয়ে দিয়ে জামাইকে কাছেই রাখবো—ওরাই আমাদের বুড়ো-বয়সে দেখা-শোনা করবে!"

হঠাৎ কিন্তু সব উলটে গেলো। একদিন রাতে—সেদিন 'হপ্তা' পেয়ে—নেশা কোরে মারামারি করে লখিয়ার বাবা আর একজন পাথর-কাটা কুলীর মাথা ফাটিয়ে দিলো—সেও নেশা করেছিলো—দুজনে খুব ঝগড়া হয়। যারা ওকে ধ'রে বাড়ী নিয়ে এসেছিলো তারা সকলেই লখিয়ার বাবাকে ভালোবাসতো—তারা বললে, "তুই পালিয়ে যা'—লোকটা মারা যেতে পারে!" তারও তখন নেশা ছুটে গেছে—ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—পাথরের মূর্ত্তির মতো একবার শুধু ঘুমন্ত মেয়েকে তুলে একবার বুকে

চেপে ধরে কেঁদে ফেললে। তখন আর সময় নেই—মুহূর্তের মধ্যেই সে পাহাড় আর গাছের ঘন ছায়ায় মিলিয়ে গেলো। মাথা-ফাটা লোকটি সত্যিই মারা গেলো—লখিয়ার বাবাও আর ফিরলো না। আট-দশ বছর লখিয়ার মা আশায়-আশায় কাটিয়ে শেষে কাঁদতো—বলতো, "হয়তো সে মরে গেছে—নইলে একবারও কি আসতো না, তার এতো আদরের 'নান্‌কী'কে দেখতে!"

পাহাড়ের দিকে চেয়ে লখিয়া ভাবে ঐ পাহাড়ের ওপারে কতো দেশ আছে। সেখানে ওর বাবা এখনও এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিরাট পেশীবহুল শক্ত তার দেহ—বড়ো বড়ো পা ফেলে সে কতো পথ অতিক্রম করছে—কতো নদী পার হচ্ছে—কতো পাহাড় ডিঙ্গোচ্ছে—কতো গহন বনের মধ্য দিয়ে নিঃশঙ্কভাবে চলেছে তো চলেছেই।—সে কি তার ছোট্ট মেয়েটিকে ভুলে গেছে? মার কাছে শুনেছে—ওর খুব কচি বয়সের একগাছি রূপার বালা ওর বাবা বুকে লকেটের মতো করে ঝুলিয়ে রাখতো—গলার নরীর সঙ্গে বেঁধে।

কেন বাবা একটিবারও আসে না? পুলিশের ভয়ে? তবে খুব বুড়ো হলে নিশ্চয়ই আসবে—কে তখন চিনবে? শেষ জীবনটায় সে নিশ্চয়ই মেয়েকে কাছে চাইবে। লখিয়া খুব সেবাযত্ন করবে। মা মরবার সময় বলেছিলো—"লখিয়া তুই এ গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাস নে। তোর বাবা যদি বেঁচে থাকে একদিন তোকে দেখতে আসবেই।"

আবার মনে হয় দুঃখিনী মা বেচারি কতো খেটে-খুটে আর কখনও ভিক্ষে করে দিন চালাতো। লখিয়া তখন কিছুই বুঝতো না—এখন সব বুঝেছে—বড়ো কষ্ট। মনে হয়, মার তৈরী রুটির ও প্রায়ই সবগুলো খেয়ে ফেলতো। মা তখন মকাইভাজা বা ছাতু টাতু খেয়ে নিতো। রাতে শীত করলে মা উঠে আগুন জ্বালতো, আর ওকে বুকের কাছে জড়িয়ে শুয়ে থাকতো। কতো দুঃখে কষ্টে কেটেছে দিনগুলো। তারপর মার অসুখ হলো। ওযুধ-বিযুধ কিছুই পেলো না। একটু দুধও পেটে পড়লো না। মা মরে গেলো। লখিয়া সেই থেকে এই বুড়ীর কাছে। সেই থেকেই সংসারটা ওর কাছে কেমন হয়ে গেলো। কারুর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না—কেবল চুপ কোরে বসে নানা কথা ভাবে আর দূরের দিকে চেয়ে থাকে। ওর মনে হয়—ওর মাও এই দূরের কোন তারায় একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে একলা থাকে, আর ওর জন্য বসে থাকে বাতি জ্বালিয়ে। মাকে কি ও আর কখনো দেখতে পাবে? হয়তো কোনও দিন কোন গ্রহ নক্ষত্রের রাজ্যে! বাবা আর মার সঙ্গে ও আবার মিলবে। এ পৃথিবীতে ছাড়াছাড়ির কি পূরণ হয় অন্য কোনও লোকে?

মন যেন ছড়িয়ে এলিয়ে গেছে তার বিগত জীবনের অন্ধকারে—যেখানে সে খুঁজে ফিরছিলো তার কয়েকটি প্রিয় আবছা ছবি। সামনের অন্ধকারের পানেই লখিয়ার দৃষ্টি মেলা রয়েছে—কিন্তু মন তার চেয়ে রয়েছে আপন অন্তরে—মাঝে মাঝে কেবল সে মন দৃষ্টির ডাকে বাইরে এসে আবার বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে সন্ধ্যারাত্রির সেই গাঢ় নিঃসীম অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিলো। লখিয়ার মনে হয় এই অন্ধকারই বুঝি ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হ'য়ে তার মা আর বাবার সঙ্গে একতার একটি সূক্ষ্ম পরশ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। ওর নিদারুণ নিঃসঙ্গতাও যেন ঐ অন্ধকারে দুরন্ত হয়ে উঠেছিলো।

উঠি উঠি ক'রেও উঠতে পারছিলো না লখিয়া। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস ওর মুখে চোখে লাগছিলো। এক সময়ে ওর চোখ বুজে এলো। একটু বোধ হয় তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো, হঠাৎ চমকে উঠে চেয়ে দেখে তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মস্ত এক সাধু। সাধুর মাথায় জটা আর মুখে সাদা দাড়ি। স্থিরনেত্রে সাধু তার দিকে চেয়েছিলো অন্তর্ভেদীভাবে। লখিয়া প্রথমটা একটু ভয়ই পেয়ে গেলো—তারপর একটু সামলে নিয়ে বললে, "বলুন সাধুবাবা—কি সেবা নেবেন? কিছু খাবেন?" সাধু বললেন, "না বেটি। আমি এখুনি চলে যাবো।—একটা দেশলাই দিতে পারিস?" দেশলাই দিয়ে লখিয়া সাধুর পায়ের ধুলো নিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলো একটু সেবাযত্ন করার জন্যে—"সাধুবাবা! আমার বাড়ীতে চলুন—দুখানি রুটি শাক খেয়ে একটু বিশ্রাম নেবেন।"

"আচ্ছা মা! যখন এতো বলছিস একটু বসি তোর

এই দোকানটাতেই—কি সেবা করতে চাস কর মা।” সাধুর “মা” ডাকে যেন আশ্চর্য স্নেহ ঝরে পড়লো। লখিয়া তৎপর হয়ে উঠে একটা পাশে শতরঞ্চি পেতে দিলো। লাড্ডু ছাতু গুড়—যা তার সামান্য দোকানের সম্বল ছিলো সাজিয়ে নিয়ে এলো একখানি ঝক্‌ঝকে কাঁসিতে। লোটা ভরে দিলো মাটির কলসির ঠাণ্ডা জল।

এই সামান্য আয়োজনেই পরম পরিতৃপ্ত হলেন সাধু। লখিয়ার চোখে জল এলো। আজ তার মন বড় বেদনার ভারে নত। সাধু শতরঞ্চিতে শুতে লখিয়া তাঁর ধূলাকাদা মাখা পা দুটিতে তেল দিয়ে ঘষে দিতে লাগলো। সাধু চুপ করে চোখ বুজে রইলেন। “সাধুবাবা। কি করলে আমি শান্তি পাবো বলুন।”

“হ্যাঁ বেটি! জানি তোর মনে গভীর দুঃখ আছে—তোর বাপকে মনে পড়ে?” সাধু সেইভাবেই বলেন। শিউরে উঠলো লখিয়া—এ সাধু তো সবই জানেন! “সাধুবাবা, তাহলে আপনি আমার বাবার কথা জানেন!” কাঁপতে থাকে লখিয়ার কণ্ঠ।

“হ্যাঁরে মা! জানি বৈকি। সে তোকে ভোলেনি মা—চার পাঁচ বার লুকিয়ে গাঢাকা দিয়ে এসে তোকে দেখে গেছে—চোখের দেখাটুকু।”

“কোথায় আছেন তিনি সাধুবাবা?—কবে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন?”

“তুই তো ভালোই আছিস মা—একসঙ্গেই যদি থাকবি তো এমনভাবে তাকে চলে যেতেই বা হলো কেন? এ সব ভগবানের খেয়াল রে বেটি—যাকে যেমন রাখেন।”

“আমার যে দিন আর কাটে না সাধুবাবা—আপনি নিয়ে যাবেন আমাকে বাবার কাছে?” লখিয়ার গলা বুজে আসে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। পরমস্নেহে সাধু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন—“কাঁদিস না মা! এই নে শান্তির উপায়—কেদারজীর পরসাদ।” নিজের গলা হ'তে একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা খুলে লখিয়ার হাতে দেন সাধু—“এই মালাটি রোজ জপ করবি—মনের কষ্ট ভুলে যাবি—আশীর্বাদ করছি।” করুণ ধীর স্বরে বলতে বলতে সাধু আবার চোখ বন্ধ করেন। লখিয়া মালাগাছি মাথায় ঠেকিয়ে গলায় পরলো। নিঃশব্দে সাধুর কতো দীর্ঘ সুদীর্ঘ পর্য্যটন শ্রান্ত ধূলিধূসর পা দুটিতে কোমল সেবা-স্নিগ্ধ হাতটি বুলিয়ে দিতে লাগলো। ওর চোখের ধারা মাঝে মাঝে শুকোত, মাঝে মাঝে আবার ঝরে পড়তে লাগলো অজস্র। দেখতে দেখতে সাধু গভীর আরামে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন—ক্লান্ত অযত্ন-মলিন, ঝড় রৌদ্র বৃষ্টি শীত আর ধূলির স্পর্শ-বিবর্ণ সেই মুখে তখন পরম শান্তিভরা সুষুপ্তির দুঃখশোক শ্রান্তিহরা আনন্দের আভাস জেগে উঠেছে। লখিয়া সাধুর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে আছে নিঃশব্দে—হঠাৎ সাধুর সাদা দাড়ির ফাঁক দিয়ে বুকের ছেঁড়া গেরুয়া পিরাণের মধ্য হ'তে একটি ছোট্ট রুপোর বালা বার হয়ে আছে দেখে লখিয়ার নয়ন মন হৃদয় এক অবর্ণনীয় আনন্দ-বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেলো। অজ্ঞাতেই ও সাধুর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে “বাবা!” বলে ডেকে উঠলো। চকিতে সাধুর ঘুম ভেঙে উঠে বসে মেয়ের মাথা বুকে চেপে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো—তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলো—“কেউ কারুর বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে নয় রে নান্‌কি—আমরা সব পুতুল—ভগবানের হাতের খেলনা। আমার জন্যে ভাবিস না, ভগবানের কথাই ভাবিস। তা তুই পারবি মা। এই সংসার-ত্যাগী বুড়ো সাধুকে বাবা বলে ফিরিয়ে নিয়ে কি করবি বেটি? হয়তো পুলিশে ধরেই নিয়ে যাবে। যেটুকু কষ্ট ছিলো মনে—তাও তোকে দেখে আর কিছু নেই। এই তো সেবা নিয়ে গেলাম মা—মরণের মুহূর্ত পর্যন্ত মনে থাকবে। আহা! মার আমার চোখ দুটি ঠিক সেই ছোট্ট বেলার মতোই কালো আর গভীর রয়েছে!”

“আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো বাবা···” আর্ত স্বরে বলে ওঠে লখিয়া।

“ভগবানই তোর বাবা লখিয়া—তিনি তোর সঙ্গেই রয়েছেন।” বিষাদ-নির্লিপ্ত-ভরা মুখে সাধু উঠে দাঁড়িয়ে এবার যাবার জন্যে পা বাড়ালো অন্ধকার পথের দিকে আবার। লখিয়ার দিকে চেয়ে বললো, “মা, তুই এইখানে বসেই অনেক শিখবি। দেখবি কি মজার এই সংসার। এই পাহাড়, নদী মেঘ, সূর্য তারা—এ সব সেই অলখ নিরঞ্জনের কল্পনা মাত্র—এ সব ভোজবাজি রে নানকী—সব বুঝতে পারবি আস্তে আস্তে···!” চোখের জল মুছতে মুছতে লখিয়ার বাবা আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে লাগলো। লখিয়া মাথা তুলে বলে উঠলো—“বাবা

তুমি আবার আসবে তো ? আর একবার তোমার সেবা করতে দেবে তো···?"

"আসবো মা—!" বহুদূর হ'তে সাধুর বিদায় বাণী ভেসে এলো।

লখিয়া সেইদিকে চেয়ে রইলো। তারপর আবার পূর্বের মতোই মাথাটি হাঁটুর ওপর কাৎ করে রেখে ভাবতে লাগলো। সত্যই সবই তার কাছে ভোজবাজি মনে হলো। সত্যই কি তার সাধু হয়ে-যাওয়া বাবা এসে তার সেবা নিয়ে চলে গেলো ?—না, এ স্বপ্ন নয় ? হয়তো এ জীবনটাই একটা স্বপ্ন! কার খেয়াল-মতো তার এই জীবন, তার চিন্তা, কাজ-ভাব সকল ? এর কি কোনও অর্থ আছে ? সে কেবল দেখে যাবে—কিছুতেই সত্য বলে বুকে টেনে নেবে না। ঐ পাহাড়টাও একটা খেয়ালের খেলনা। বাবা আজ সাধুরূপে এসে সত্যই মেয়েকে মুক্তিমন্ত্র দিয়ে গেছেন।—আস্তে আস্তে গলা হতে রুদ্রাক্ষের মালাটি খুলে হাতে নিয়ে লখিয়া জপ করতে লাগলো।

—

রামটেক পর্বত

শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

কমলা লেবুর দেশ নাগপুর ; মারাঠাদের দেশ নাগপুর ; অবশেষে এখানে আমরা এসে পৌছলুম বেলা প্রায় ১০টার সময়। পথের ধারে দেখলুম

নাগপুর রেলওয়ে ষ্টেশান
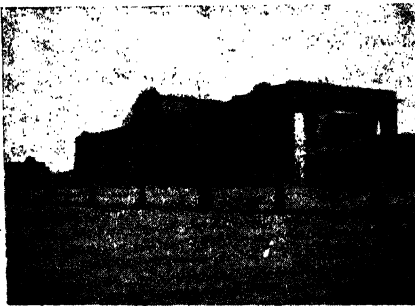
কামতি নদীর জলধারায় পুষ্ট সুন্দর সতেজ কমলা, লেবুর বন। এই বৃক্ষগুলি যখন পীতাভ ফলভারে আভূমি আনত হয়ে থাকে, তখন না জানি এই বনের দৃশ্য কত রূপময় হয়! আমাদের নাগপুর আসার উদ্দেশ্য হোল রামটেক পর্বত ও অম্বর হ্রদ ইত্যাদি দেখা। এখান থেকে ভোরবেলা একটি গাড়ী যায় রামটেকে ; আবার সন্ধ্যাবেলা সেই গাড়ীই যাত্রী নিয়ে ফিরে আসে। এর মাঝখানে রামটেক যাওয়ার আর কোনও ট্রেণ নেই। অবশ্য অন্যান্য যানবাহন আছে। কাজেই পরের দিন ভোরবেলা রামটেক যাত্রা স্থির করে, একটু বিশ্রাম ও স্নানাহার সেরে নিয়ে আমরা নাগপুর সহর দেখতে বহির্গত হলুম। নাগপুর স্টেশান বেশ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। এইটাই B. N. R. অধুনা ইস্টার্ণ রেলের শেষ স্টেশান। এরপর থেকেই G. I. P. অধুনা সেন্ট্রাল রেলপথ সুরু হয়েছে। স্টেশানে দুটি রেলের পাশাপাশি দুটি সুবৃহৎ গাড়ী আছে। অনতিদূরে একটি প্রাচীন দুর্গ। এটি ভোঁসলার দুর্গ নামে খ্যাত।

ভোঁসলার দুর্গ—নাগপুর

অতীতের স্বাধীন মহারাষ্ট্র শক্তির পঞ্চস্তম্ভের মধ্যেকার অন্যতম স্তম্ভ ভোঁসলার অক্ষয় কীর্তি এই প্রাচীন সুবৃহৎ দুর্গ। প্রতি বৎসর পনরোই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে এই দুর্গপ্রাকার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ভিতরে নাকি প্রাচীন দ্রব্য সম্ভার কিছু কিছু সুরক্ষিত আছে। সহর পরিক্রমণান্তে আমরা মহারাজ-বাগে গেলুম। এটি একটি সুরম্য উদ্যান বাটিকা। এর মধ্যে উদ্ভিদশালা ও পশুশালাও আছে। পশুশালার জন্তুদের মধ্যে হরিণগুলি ভারী চমৎকার। জনসমাগমে সচকিত হয়ে যখন তারা দলবদ্ধ হয়ে বড় বড় কালো চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকে তখনকার সে দৃশ্য হয়ে ওঠে অতি রমনীয়। উদ্যানটী নানা জাতের পুষ্প ও বৃক্ষাদিতে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত। অনেক প্রাচীন বনস্পতিও এখানে দেখলুম। মহারাজ বাগ দেখে সহরের একেবারে শেষপ্রান্তে আমরা "জারিতলাস্ত" নামে মানুষ-সৃষ্ট একটা প্রকাণ্ড হ্রদ দেখতে গেলুম। হ্রদটী সমতলভূমি থেকে অনেক উচ্চে একটি টিলার মত মনোরম স্থানে অবস্থিত। এখান থেকেই সমস্ত সহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। সুবৃহৎ জলাশয়টির কানায় কানায় নির্মল জল টল-টল করছে। তার তটভূমি সবুজ তৃণাচ্ছাদিত। স্থানটি বেশ নির্জন ও সুষমামণ্ডিত, সেখানে কিছুক্ষণ বসে আমরা আরও একটু ঘুরে ফিরে আস্তানায় ফিরে এলুম।

পরের দিন যথারীতি ভোরবেলায় আমরা নির্দিষ্ট গাড়ীতে উঠে

বসলুম। রাত্রির অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে অপসৃত হয়ে এসেছে, আর ফুটে উঠছে বকের পালকের মত নরম সাদা আলো। তার মধ্যে দিয়ে প্যাসেঞ্জার গাড়ী এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে। কনহান নদী পার হয়ে কিছু দূরে গিয়ে পর্বত শিখরে দৃষ্ট হোল রামটেক মন্দিরের শ্বেত শুভ্র চূড়া। বেলা প্রায় সাতটার সময় আমরা এসে পৌছলুম ক্ষুদ্র জনবিরল রামটেক স্টেশানে। এখানে টাঙ্গাওয়ালাদের ভাড়ার রেট বাঁধা আছে। ভাড়া নিয়ে তারা ঝামেলা করে না। আমরা টাঙ্গায় উঠে বসলুম মন্দির যাত্রার উদ্দেশে। পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট দেশ রামটেক।

বহির্জগতের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। নিজেদের ক্ষেত ফসল, গরু ঘোড়া, বাজার ব্যবসায়, স্ত্রীপুত্র, দুঃখ দারিদ্র্য, কলহ অশিক্ষা অজ্ঞতা প্রভৃতি নিয়ে এখানের লোক বেশ নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করে।

স্টেশান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে, রামটেক মন্দির ও অম্বর হ্রদ। "রাম সাগর" এখানের আর একটী বিখ্যাত হ্রদ। কিন্তু তখন সে হ্রদ জলশূন্য মরুময় ছিল। মধ্যপ্রদেশ সরকার রাম সাগরের জল কৃষি কার্যের জন্য ব্যবহার করছিলেন। সেইজন্য সরকারের সেচ বিভাগ থেকে খাল কেটে নেওয়া হয়েছে। মন্দিরে যাবার আগে স্নানের জন্য আমরা প্রথমে অম্বর হ্রদে গেলুম। চতুর্দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। তার কোলে কোলে সবুজ অরণ্যরাজি। তার মধ্যে একটী সুন্দর ও সুবৃহৎ হ্রদ। দূর থেকে ঠিক কোনও নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি বলে ভ্রম হয়। তার ধারে ধারে কয়েকটি বাঁধানো ঘাট আছে এবং কতকগুলি পরিত্যক্ত মন্দিরও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতবড় সুন্দর হ্রদটির জল ঘন শৈবাল দামে আচ্ছন্ন। হাত দিয়ে সেই দাম সরিয়ে দিলে নীচে স্ফটিক শুভ্র জল ছল ছল করে ওঠে। রামটেক গিরিশৃঙ্গে যে কয়টি হ্রদ দেখেছি তার সব গুলিই এই রকম ঘন সবুজ দামে আচ্ছন্ন। স্থানীয় লোকেরা ওই জলই ছেঁকে নিয়ে পান করে। পাষাণ কঠিন পর্বতের মধ্যে হ্রদগুলি কিন্তু ভারী সুন্দর। এ সম্বন্ধে একটী প্রচলিত কাহিনী আছে। একদা অতীতকালে অম্বর নামে এক রাজপুত রাণা অশ্বপৃষ্ঠে এই অরণ্য পথ অতিক্রম করার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। সেই রাণা আবার কুষ্ঠরোগী ছিলেন। একে রোগ যন্ত্রণা, তার উপর আবার জলপিপাসা, তিনি অস্থির হয়ে অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে একটী বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করলেন এবং গভীর ক্লান্তিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হলেন। কিছুক্ষণ পর নিদ্রাভঙ্গ হলে দেখলেন—তাঁর সম্মুখে ধরণী বক্ষ ভেদ করে স্বচ্ছ বারিধারা উত্থিত হচ্ছে। দারুণ তৃষ্ণার সময় তিনি তা ভগবানের অপার করুণার দান মনে করে তাঁকে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করে অঞ্জলি ভরে সেই শীতল সুপেয় জল পান করলেন এবং অবগাহন স্নান করে দেহের ক্লান্তি দূর করলেন। কিন্তু আশ্চর্য, স্নানান্তে বিস্মিত হয়ে রাণা দেখলেন, তাঁর গাত্র চর্ম অপূর্ব রূপ লাবণ্য মণ্ডিত হয়েছে এবং দেহে কুষ্ঠ ব্যাধির চিহ্ন মাত্রও নেই। তখন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে তিনি সেইস্থানে একটী সরোবর খনন করান এবং সেই সরোবরই আজ অম্বর হ্রদ নামে খ্যাত। অম্বরের অপর এক নাম ভোগবতী। জলের রং সবুজ দেখে চন্দা পাপড়ী ভয়ে জলে নামল না। এবার আমরা মন্দিরে যাবো। হ্রদের পাশ দিয়ে চলে গেছে সরু বনবীথি। তার আশে পাশে কয়েকটী ফুল মিষ্টি ইত্যাদির দোকান ছিল। আমরা সেখান থেকে পূজার জন্য কিছু জিনিষ কিনলুম। অদূরে দেখা গেল, পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজানো সোপান রাজি পথিককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এই সিঁড়ির সংখ্যা সুদীর্ঘ সাড়ে সাতশত হবে। রামচন্দ্রের মন্দির একেবারে পর্বতের শীর্ষদেশে। ধীরে ধীরে সোপান অতিক্রম করে আমরা উপরে উঠতে লাগলুম। এই কঠিন পার্বত্য পথে, একটু বিশ্রাম করে, আবার হেঁটে, অবশেষে আমরা শৃঙ্গদেশে এসে উপস্থিত হলুম। এইস্থান আরও নিস্তব্ধ,—আরও বন্য সুষমায় রহস্যময়। অপার্থিব সৌন্দর্য-লোকের পাদপীঠে পদার্পণ করেই আমাদের মন থেকে কোথায় অন্তর্হিত হোল অসহ্য পথশ্রম ও দৈহিক ক্লান্তি। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় শুধু প্রকৃতির মুক্ত উদার রূপ। শ্যামায়িত তরঙ্গ ভঙ্গে হিল্লোলিত হয়ে চলেছে দূর দূরান্তরের পথে, মিশেছে গিয়ে অসীম দিগন্তে। সে আর এক রমণীয় শোভা।

লক্ষ্মীনারায়ণ ইনসটিটিউট অফ টেকনলজি—নাগপুর

মেডিকেল কলেজ—নাগপুর

এখানে হনুমানের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী—হয়ত বা রামচন্দ্রের পুণ্যপীঠভূমি বলে। তারা যে একদা সমর-কুশলী ছিল, এই কলিযুগের পরিপ্রেক্ষিতে আজও সেকথা বিস্মৃত হয়নি। তাই হস্তধৃত সামগ্রীর লোভে নিরীহ পথচারীকে আক্রমণ করতে ওরা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। এখনো সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে পথ চলতে হয়। কিন্তু এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। এই বীর হনুসম্প্রদায় রামনাম শুনলে অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে যায়। রাম রাম সীতা রাম, উচ্চকণ্ঠে বললেই তারা বিক্রম ভুলে স্থির হয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে থাকে। আশ্চর্য রামনামের মহিমা। আর একটা হনুমান দেখেছি এই মন্দিরের চিলকোঠার মধ্যে। বিশ্রাম উপভোগের জন্য সেখানে গিয়ে প্রকাণ্ড জন্তুটিকে দেখে কেউই কক্ষে প্রবেশ করতে সাহস পায়না। ঘরের মধ্যে সে সঙ্গীদের নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল। ভাদুড়ী তাড়া দিতে সবগুলি পালিয়ে গেল, কিন্তু ধাড়ীটির সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। তখন নিরুপায় হয়ে আমরা সমস্বরে রামনাম করতে সে ঠিক মানুষের মত চক্ষু মুদ্রিত করে রেলিংয়ের উপর উঠে গিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।
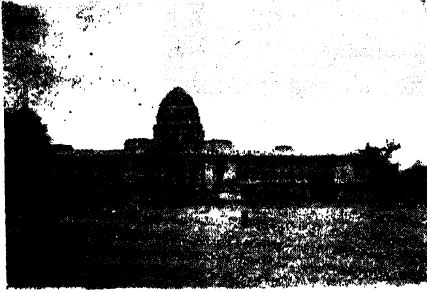
নাগপুর বিচারালয়

তারপর আমরা বহুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করেছি, এবং আমাদের সঙ্গে অনেক রকম খাদ্যদ্রব্য থাকা সত্ত্বেও সে আমাদের দিকে আর দৃকপাত করেনি। ছাদের রেলিংএর উপর কেমন যেন আবিষ্টের মত বসে ছিল।

রামটেক মন্দির ঠিক দুর্গাকারে গঠিত। চতুর্দিক-পরিবেষ্টিত গোলাকৃতি পাষাণ প্রাচীরের অভ্যন্তরে অনেকগুলি তোরণদ্বার আছে। ছোট বড় বহু মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামসীতার, লক্ষ্মণের, কৌশল্যার, দশরথের ও বাল্মীকির মন্দিরই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম। মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে কারুশিল্পের বিশেষ কোনও নিদর্শন না থাকলেও চারু-শিল্পের চিত্রণ দেখা যায়। যেমন নানা বর্ণযুক্ত রেখায় নানাবিধ পৌরাণিক চিত্রাবলী অঙ্কন ও আলিম্পন রেখা ইত্যাদি। মন্দিরের গঠন প্রণালী অত্যন্ত বিস্ময়জনক। এর ভিত্তি, প্রাচীর, ছাদ, তোরণ ইত্যাদি সবই পাথরের। দৈর্ঘ্যে উচ্চতায়, এবং এই পাষাণ খোদাই কার্যের চমৎকারিত্বায় দেব-দেউলগুলি মানুষের মনে বিস্ময় জাগায়। একদা প্রাচীনকালে নাকি এই স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। শোনা যায় অদ্যাবধি তাঁর সেই পবিত্র যজ্ঞকুণ্ডে বংশপরম্পরায় সন্ন্যাসীকুল হোমাদি করে আসছেন। বিরাট কুণ্ডে স্তূপীকৃত ভস্ম কখনও শীতল হয় না। সেই কুণ্ডের ধারে আমরা একজন মৌনী ফলাহারী সাধুকে দেখলুম। তিনি আজ বারো বৎসর মৌনী আছেন। আমরা অর্থ প্রণামী দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি নীরবে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু অর্থ স্পর্শ করলেন না। শহর অঞ্চলে এই সব ঘটনাকে আমরা ভণ্ড ভড়ং, ইত্যাদি বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু এখানে কেমন যেন সবই সত্য ও শুদ্ধ বলে মনে হোল। সেই প্রকাণ্ড যজ্ঞকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলুম, বহুকালের ব্যবধান-বিস্মৃত অতীত ইতিহাসের একটা পুণ্যময় পরম প্রোজ্জ্বল অধ্যায়কে। সব সত্য, সব স্পষ্ট, সবই অনুভূতির আবেগে গভীর অনুপ্রাণনীয়। আমরা অনেকক্ষণ বসে রইলুম সেই বশিষ্ঠাশ্রমের লতাকুঞ্জে। আকারে ইঙ্গিতে মৌন সন্ন্যাসী ভাদুড়ীর সঙ্গে অনেকক্ষণ বাক্যালাপ করলেন। ছন্দা-পাপড়ীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, এক বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর। তারা গল্পের মধ্যে দিয়ে মহানগরী কলিকাতায় ফিরে গেছে। এই সন্ন্যাসীটী প্রকৃত পথিকৃৎ। সমগ্র ভারতবর্ষের পথ প্রান্তরে এঁর অন্তরাত্মা, নিত্য ভ্রাম্যমান। যখন খুশী পথে বেরিয়ে পড়েন। কোথাও দুদিন স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। পথই এঁর পরমার্থ। ছন্দা.পাপড়ীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সহাস্য বদনে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে শাদা বকের পাঁতি। তাদের ডানায় বিচিত্র বর্ণের হিল্লোল। আকাশ পথের পথিকৃৎ ওরা। আমরা মাটীর।

বশিষ্ঠাশ্রমে অনেকক্ষণ অবস্থান করে আমরা প্রবেশ করলুম প্রধান মন্দির রামসীতার গর্ভগৃহে। সমস্ত মন্দির ভরে দেউলে দেউলে তখন আরতি হচ্ছিল। আমাদের দুর্গাপূজায় যেমন ঢাক বাজে, এখানেও তেমনি অন্যান্য বাদ্যের সঙ্গে গভীর শব্দে ঢাক বাজছিল। আরতির পঞ্চ-প্রদীপের স্বর্ণাভায় রামসীতার মূর্তি স্বর্গীয় সুষমায় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল। একই পূজারী সমস্ত মন্দিরে আরতি করে ফিরছেন। তাঁর নৃত্যশীল গতিচ্ছন্দে হাতের প্রদীপ থর থর করে কাঁপছে। কাঁপছে তার সুবর্ণ শিখা। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রত্যাহত হয়ে ফিরছে বাদ্যধ্বনি—আরণ্য প্রকৃতির স্তব্ধতা মুহূর্তের জন্য ভঙ্গ হচ্ছে আবার স্থির হয়ে যাচ্ছে গহন বনস্থলীর নিবিড় শ্যামলিমায়। আমরা দেবদর্শন ও পূজাদি সাঙ্গ করে নাটমন্দিরে এসে উপবেশন করলুম। সেখানে প্রাচীর গাত্রে অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্দুক, রাইফেল, বল্লম, বর্শা, তীর, ধনুক ইত্যাদি সুরক্ষিত দেখে, ভাদুড়ী একজন পাণ্ডাকে প্রশ্ন করাতে, সে বললে, "এখানে এই মন্দিরসংলগ্ন অরণ্যে বহু হিংস্র জন্তুর বসবাস আছে। সুযোগ পেলেই তারা মানুষকে আক্রমণ করে। তাই তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই সব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়। প্রভু রঘুবীর নিজেই শত্রু নিধন করেন, আমরা শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। সমস্ত মন্দিরগুলি দেখে, একটী নিম্নে অবতরণের সিঁড়ির কাছে ছায়া স্নিগ্ধ বৃক্ষতলে আমরা এসে বসলুম। সেখানে একটু নীচের দিকে বনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পাষাণ নির্মিত চৌকোণাকৃতি কুণ্ড ছিল। সেটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে এই বনের সমস্ত হনুমানগুলি বসেছিল। মনে হচ্ছিল ওরা যেন কোনও

জরুরী সভায় বসেছে। প্রাচীনকালে এটা যজ্ঞকুণ্ডরূপে ব্যবহৃত হোত। এখানে বোধহয় হোম হোত। এটা মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ। কাজেই বনজঙ্গলও এখানে নিবিড়। আর জনসমাগমও এখানে মোটে নেই। মন্দিরের সম্মুখভাগের বনের মধ্যে স্থানীয় লোকের অনেকগুলি কুটীর আছে। পাহাড়ের গায়ে তাদের ক্ষেত ফসল, গোচারণের গরু, চাষের বলদ ইত্যাদি দেখা যায়। পালপার্বণে যাত্রী সমাগমও বেশ হয় মন্দিরে। কিন্তু এইদিকপানে বোধহয় কোনও যাত্রী কদাচ পদার্পণ করে না। কাজেই বল্লীলতা ঘাসের ফুল পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে জানায় তাদের সাদর সম্ভাষণ।

রামটেক পর্বত থেকে আমাদের বিদায় নেবার পালা। একদিন রামচন্দ্র এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, আজ আমরাও সেখানে বসে বিশ্রাম করছি। এর মধ্যে কত যুগ যুগান্তরের ব্যবধান রয়েছে, রামায়ণের কাহিনীর সত্য ও কল্পনা সম্বন্ধে কত সন্দেহ রয়েছে। তথাপি মনে হয় এই বনের গাছ ফুল, পর্বত পাষাণ সকলেই যেন অস্পষ্ট স্বরে বলছে, "এ সবই সত্য, আজ তোমরা বসেছ যেমন সত্য, সেদিন রামচন্দ্র, সীতাদেবী লক্ষ্মণসহ এখানে বসেছিলেন তাও সত্য।"

রামটেক শব্দটা হোল মহারাষ্ট্রীয়। মারাঠী ভাষায় টেকের অর্থ হোল, বিশ্রাম নেওয়া। রামটেক; অর্থাৎ রাম বিশ্রাম নিয়েছেন। স্থানীয় লোকেরা বলে, পিতৃ সত্য পালনার্থে রামচন্দ্র সীতা দেবী ও লক্ষ্মণ সহ বনগমনকালে পথে একদা এই স্থানে বিশ্রান্তিলাভ করেছিলেন। সেই পুণ্য স্মৃতি মাহাত্ম্যই রামটেক তীর্থে পরিণত হয়েছে।

ছন্দা পাপড়ী বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অনেক সুন্দর ও অসুন্দর পাথর সংগ্রহ করেছে। এখন তারা নীচে নামার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের বিশেষ তাড়া ছিল না। কেননা, রামটেক থেকে প্রত্যাবর্তনের গাড়ী ত সেই সন্ধ্যাবেলা। আর দ্বিপ্রাহরিক আহারের সুব্যবস্থাও আছে এক জায়গায়। গভীর আলস্যে শেষে নিমজ্জিত হওয়া গেল।

সময়ের স্রোত বয়ে চলেছে। তার তটপ্রান্তে বসে আছি আমরা কয়েকজন মাত্র পথিক। আমাদের চতুর্দিক বেষ্টনকারী পর্বতাকীর্ণ বনের মধ্যে কি প্রসন্ন ঔদার্য; অনাবিল মুক্তি পরম প্রশান্তি বিস্তৃত রয়েছে। বনস্পতি সমূহের বিশালতায়, তরু পল্লবের স্নিগ্ধ কমনীয়তায় নিভৃত ছায়া বীথিকুঞ্জে কি সুন্দর অনির্বচনীয় ভাবই না তরঙ্গায়িত হচ্ছে।

এই অরণ্যের প্রতি তৃণপত্রে, পর্বতের পাষাণ গাত্রে, মন্দিরের পূজারীর বিনম্র ভক্তিতে সেই শৈবাল আচ্ছাদিত মানুষের পানীয় জলের অভ্যন্তরে শুনতে পেলুম সেই বাণীই অস্ফুটে উচ্চারিত হচ্ছে। আমার আত্মা, প্রত্যেক মানুষের আত্মার সাথে তার অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ। আমরা এগিয়ে যাবো; সম্মুখ হতে সম্মুখতর পথে, মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে এই মন্দিরভূষিত রামটেকের অরণ্য পর্বত তার দুর্লভ দৃশ্যাতীত আনন্দানুভূতির অন্তরঙ্গতায়।

দামোদর-পরিকল্পনা

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

দস্যি মেয়ে এবার তুমি ঘুচিয়ে ফেল দস্যিপনা,
পেতেম না তো তোমায় দিয়ে উপকারের একটু কণা।
শাসন বারণ মানো নি তো যা' খুশি তাই যখন ক'রে—
অপকারের লীলায় সারা দেশটা তুমি রাখ্‌তে ভ'রে।
গ্রীষ্ম দারুণ—পাগ্‌লি মেয়ে গায়ে বালু-চাদর মুড়ি,
থাক্‌তে পড়ে, উঠ্‌তে নাকো ম'রলে হাজার মাথা খুঁড়ি।
বর্ষাধারে শক্তি তব উঠ্‌ত বেড়ে দ্বিগুণ তেজে—
গৃহস্থ ও চাষীর ঘরে শোকের গীতি উঠ্‌ত বেজে।
গত দিনের সে সব কথা থাক কাহিনী হয়েই আজ,
সে সব কথা আবার বলে নাইরা তোমা দিলেম লাজ!
গর্বে পরো দু' হাতে আজ এয়োতীর এ চিহ্ন নোয়া,
কল্যাণেরি বন্যা আনো—সম্ভাবনা-বিপুল-ছোঁয়া।

ফসল দানে হরিৎ ধানে উষর মাটি সরস করি—
ধন্য হ'য়ো কল্যাণী গো—স্বদেশভূমি-সেবায় ভ'রি।
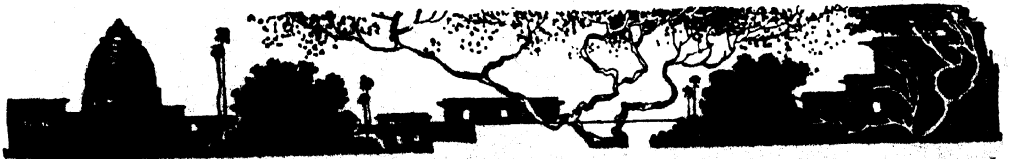
বুদ্ধ জয়ন্তী

শ্রীগোকুলচন্দ্র রায়

ভগবান বুদ্ধের ২৫০০ তম জন্মতিথি উপলক্ষে, সমারোহে বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব পালন করা হ'বে—তারই আয়োজন চলেছে—এই খবর সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নিখিল-ভারত বাৎসরিক অধিবেশনে—প্রধান মন্ত্রী ভগবান বুদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এইরূপ প্রস্তাব কংগ্রেসের ইতিহাসে প্রথম হ'লেও—অত্যন্ত আশাপ্রদ। নব ভারতের ইতিহাসে ভগবান বুদ্ধের পূর্ণ স্থান না দিলে নয়—নেহেরুজির সম্মানসূচক এই প্রস্তাব তারই ইঙ্গিত মনে হয়।

কলকাতায়—সেদিন ভারতের ঐতিহাসিকদের মহাসম্মেলন হয়ে গেল। সকলেই একমত—ভারতের ইতিহাস নতুন করে রচনা করতে

তথাগত

হবে। নব ভারতের নতুন ইতিহাস আমরা ভগবান বুদ্ধকে আশ্রয় করে গ'ড়ে তুলব।

গৌতম বুদ্ধের আর্বিভাবের পূর্ব্বে, বেদ ও উপনিষদের ঋষিদের ঐতিহাসিক তথ্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত বললেও অতি-উক্তি হবে না। সে তথ্য আবিষ্কার করাও অত্যন্ত দুরূহ এবং এত প্রাচীন যে—কোন আবিষ্কারই প্রমাণ-যোগ্য বলে মনে হবে না। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রমাণ বিষয়ে ত কোন সন্দেহই নেই। তবে মনে রাখতে হবে—ভারতের ইতিহাসের সুদৃঢ় ভিত্তি—গৌতম বুদ্ধের প্রকৃত তথ্যের উপর স্থাপন ক'রতে হবে।

গৌতম বুদ্ধের কথাও ত কম প্রাচীন নয়। কালের গতি অত্যন্ত জটিল। প্রকৃতির এই বিসদৃশ পরিণাম—অবিরাম, অক্লান্ত প্রবাহে চলেছে—কোথাও ভাঙ্গে, কোথাও গড়ে, আবার কোথাও বিকৃত করে। কাল স্রোতের ঘূর্ণিপাকে আমরা আসল বুদ্ধকে হারিয়েছি—আর শুধু তাতেই ক্ষান্ত হই নি, আরও দূরে চলে গেছি—আসল বুদ্ধের স্থানে—নকল বুদ্ধকে বসিয়েছি। নবম অবতারকে কেবলমাত্র একজন নীতি শিক্ষার আচার্য্যের পর্য্যায়ে এনে ফেলেছি। এখানে নীতি শিক্ষার উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার—যেন নীতি-শিক্ষার ব্যাপারে আমরা ভুল না বুঝি। নীতি শিক্ষা মানব জীবনে বিশেষ প্রয়োজন, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। ভগবান বুদ্ধের নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। যে মহামানবেরা মানব জীবনের চরম লক্ষ্য আবিষ্কার করেছিলেন—গৌতম তাঁহাদের অন্যতম। সেই পূর্ণ ও অখণ্ড জ্ঞানের অধীশ্বরকে আমরা অনাত্মবাদী বলে ঢাকঢোল পিটে বেড়াচ্ছি। আরও নানা প্রচলিত কিংবদন্তিকে আমরা অবিচারে মেনে নিয়েছি—যেমন গৌতম দেবতা বিশ্বাস করতেন না, তিনি দুঃখবাদী, নিরীশ্বরবাদী ও শূন্যবাদীছিলেন এবং আরও কত কি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি তার ইয়ত্তা নেই। এই সব ভ্রান্ত ধারণা সমূলে নির্মূল হওয়া দরকার।

আবার পুরাতন ভুল সংশোধন করার কথায় মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েক লাইন—

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে

হে গৌতম! হে মহামানব! তুমি ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মানবদেহে আবির্ভুত হয়েছিল—দেহধারী মানবের নিকট সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়ার জন্য। আমরা সাধারণ মানুষ—তুমি মানবদেহে প্রকটিত না হলে—আমরা আমাদের সাধারণ জ্ঞানে বুঝব কি করে? হে বুদ্ধ! তুমি শুদ্ধ শাশ্বত, তুমি পূর্ণ, প্রেম ও প্রীতি। তুমি জন্ম মৃত্যুর অতীত। তুমি পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্ত—তুমি অন্তরে বাহিরে—তুমি সর্বত্র। তুমি সেদিনেও পূর্ণ মানবদেহে ছিলে আজও আছ। তুমি নিত্য নূতন, তুমি চির পুরাতন—তুমি চিরন্তন। তুমি অশরীরী অবস্থায় ধর্ম্মরূপে, আকাশে, বাতাসে প্রতি অণুপরমাণুতে রয়েছ—প্রতি মানবের হৃদয়ে ধর্ম্মরূপে—ধ্রুবতারার মত নির্দ্দেশ দিতেছ—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তুমি আর তোমার ধর্ম্ম অভিন্ন—নিত্য সনাতন।

হে গৌতম! মানবরূপে তোমার সারা জীবন—অক্লান্ত-অবিরাম প্রচেষ্টা—সেই নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান—সকল দুঃখের অকূল সমুদ্রের, সকল চঞ্চলতার বিভূতির পারের পথ আবিষ্কার। তুমি শ্রমণদের মধ্যে মহা-

শরণ—ভারতের এই নবজাগরণে তোমার কর্ম্মপ্রচেষ্টা, কর্ম্মে অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা—আমাদের সকল কর্ম্মে প্রেরণা সঞ্চার করুক। তোমার কর্ম্মের উজ্জ্বল আদর্শ আমাদের সকল মোহ সকল আলস্য অপসারিত করুক। তোমার সঙ্ঘের আদর্শ আমাদের ভারতের সকল ভাইবোনদের একতাসূত্রে আবদ্ধ করুক। তোমার কর্ম্মকুশলতা, সকল কর্ম্মে নিপুণতার দৃষ্টিভঙ্গি অতি অপূর্ব্ব। মনে পড়ে তোমার শেষ বাণী—

(পালি) "অপ্পমাদেন সম্পাদেথ

'অপ্রমত্ত হয়ে সম্পাদন কর'

হে সিদ্ধার্থ! অপূর্ব্ব তোমার সিদ্ধি—তুমি জ্ঞান ও কর্ম্মের মহা সমন্বয়। কে বলে জ্ঞানও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না? তুমিই ত তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তুমি জাগ, তোমার উদাত্ত স্বরে ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত হউক। তোমার সিদ্ধির ফল হতে আমরা সকল অর্থের মূল তত্ত্ব অবগত হই। তুমি ধন্য—তোমার সিদ্ধি ধন্য। তোমার জ্ঞানের আলোক শুধু ভারতবর্ষকেই উদ্ভাসিত করেছিল—তা নয়—সারা বিশ্ব উদ্ভাসিত করেছে—অন্তর্দৃষ্টিতে এখনও করছে। তোমার নিজের ভাষাতেই তুমি :—

(পালি) 'দেব মনুষ্যষানং সত্থা'

দেবতা ও মানুষের শাস্তা (শিক্ষক ও শাসক)

তুমি বেদ বেদান্তের সার। প্রাচীন দর্শন সাংখ্য ও বৈশেষিকের চুম্বক-স্বরূপ। তোমার জ্ঞানের আলোক আবার আমাদের হৃদয়কে জাগিয়ে তুলুক!

এই শুভমুহূর্ত্তে বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে, এস আমরা ভারতবাসী সবে—সঙ্ঘবদ্ধ হই—প্রকৃত বুদ্ধের প্রতিষ্ঠান করার জন্য। আমরা বুদ্ধ খাতক হয়ে আর কত কাল কাটাব? কালের প্রভাবে যে সকল ভুল ভ্রান্তি এসে পড়েছে—যে সকলকে অপসারিত করে—বুদ্ধের আসল শিক্ষা ও তত্ত্বের দিকে নজর দিতে হবে। ভুল ভ্রান্তির কথা ভাব্‌তে গেলেই—প্রথমেই মনে আসে—সবচেয়ে সাংঘাতিক—মারাত্মক বল্লেও অতি-উক্তি হবে না এরূপ একধারণা—সে হ'ল "বুদ্ধ আত্মা স্বীকার কর'তেন না" আমরা জোর গলায় প্রশ্ন করতে চাই—এরূপ মিথ্যা অপবাদ সাধারণ বৌদ্ধ সমাজ—বুদ্ধের ঘাড়ে কেমন করে চাপালেন? আমরা অনুধাবন কর'লেই দেখ'তে পাব—গৌতম বুদ্ধ প্রকৃত আত্মজ্ঞ ছিলেন—তাঁর মাগধী ভাষায় কথোপকথন থেকে পাই—

(পালি) অত্ত দীপো ভব

অত্ত সরণো

অঞঞ ন সরণো

ধম্ম দীপো ভব

ধম্ম সরণো

অঞঞ ন সরণো

দীপং কইরাথ মেধাবী

যং ওঘো নাভিকীরতি"

আত্মা দ্বীপ হউক

আত্মাকেই আশ্রয় কর

অন্যকে আশ্রয় করিবে না

ধর্ম্ম দ্বীপ হউক

ধর্ম্মকে শরণ কর

অন্যকে শরণ করিবে না

মেধাবী আত্মা ও ধর্ম্মকে এইরূপ দ্বীপ করিবেন

যাহাকে সংসার স্রোত ভেঙ্গে চুরে না দেয়

আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেতে পারি পরিব্রাজক বাৎসগোত্রী (বহুগোত্ত) যে প্রশ্ন বুদ্ধকে করেছিলেন এবং পরে বুদ্ধ আনন্দকে স্পষ্ট

বুদ্ধ বিহার (বুদ্ধগয়া) ফটো—হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ভাবে আত্মা সম্বন্ধে যে মতামত দিয়েছিলেন। বহুগোত্ত প্রশ্ন করলেন—বুদ্ধকে—

(পালি) "অত্থি অত্তা? অত্থি অত্তা? অত্থি অত্তা?

আত্মা আছে কি? আত্মা আছে কি? আত্মা আছে কি? বুদ্ধ এই প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না কারণ তিনি বহুগোত্তের মনোভাব বুঝেছিলেন। বুদ্ধের কোন উত্তর না পেয়ে বহুগোত্ত আবার প্রশ্ন করলেন—

(পালি) "নত্থি অত্তা, নত্থি অত্তা, নত্থি অত্তা?

তাহলে আত্মা কি নেই, আত্মা নেই, আত্মা নেই? বুদ্ধ তথনও কোন উত্তর দিলেন না—অগত্যা বহুগোত্ত নিরুপায় হয়ে উঠে চলে গেলেন।

বহুগোত্ত এই ভাবে চলে যাওয়ার পরই, আনন্দ যেন বুদ্ধের প্রতি দোষারোপ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার কি বহুগোত্তের প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত ছিল না?" বুদ্ধ তথন শান্ত ভাবে আনন্দকে এই ব্যাপারের আদি ও অন্ত বুঝিয়ে দিলেন এই ভাবে:—

"ভাই আনন্দ! আমি যদি বহুগোত্তকে বলতাম আত্মা আছে সে ধরে নি'ত সম্মত অর্থাৎ শাশ্বত বাদ। ফলে দাঁড়াত এই যে প্রত্যেক জীবের পৃথক পৃথক আত্মা আছে এবং সেই পৃথক পৃথক আত্মা নিত্য—এইরূপ আমার মত বলে প্রচার করত। কিন্তু এই মত ত আমি প্রচার কর'তে পারি না। এই মত একেবারেই মিথ্যা। আবার যদি তাকে বলতাম আত্মা নেই—তাতে আমার পক্ষে উচ্ছেদবাদ প্রচার করা হত। বাস্তবিক পক্ষে বহুগোত্তের আত্মা কি যথাযথ বোঝবার ক্ষমতা নেই—অতএব এক্ষেত্রে আমার পক্ষে মৌন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।"

বুদ্ধের এই ভাষণ থেকে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই যে বুদ্ধ প্রকৃত আত্মজ্ঞ ছিলেন। আবার এই প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্যরাখা দরকার হবে, অত্তা (আত্মা) ও ধম্ম (ধর্ম্ম) বুদ্ধের বুদ্ধত্ব এবং এক ও অভিন্ন। ধর্ম শব্দ নানা অর্থে প্রয়োগ আছে। আছে সত্য সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে কিন্তু এখানে ধর্ম মুল এবং চরম সত্য। এ বিষয়ে আমাদের ধারণা আরও স্বচ্ছহতে পারে যদি আমরা বুদ্ধের শিষ্য 'বক্কলির' সহিত বুদ্ধের কথার অনুসরণ করি। বক্‌কলি এক সময়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এই হেতু বহুদিন বুদ্ধ সমীপে আসার সুযোগ পাননি। পরে সুস্থ হয়ে এসে বুদ্ধকে বল্লেন—"আমি বড়ই মনকষ্টে ছিলাম—বহুদিন আপনার দর্শন লাভ হয় নি"। বুদ্ধ সস্নেহে উত্তর দিলেন—"পুতিকায়েন কিং"?

শরীরটা ত পচা মড়ার মত—সে দেখে কি হবে? তারপর বলছেন সত্যিকার কি দেখতে হবে—

"যো ধম্মং পস্সতি সো মং পস্সতি
যো মং পস্সতি সো ধম্মং পস্সতি"

যে ধর্মকে দেখে—সে আমাকেই দেখে যে আমাকে দেখে—সে ধর্মকেই দেখে! কি চমৎকার এই বিশ্লেষণ। এখানে 'আমাকে' মানে গৌতমের 'পুতিকায়' নয়—শরীর নয়—আমাকে মানে—বুদ্ধের বুদ্ধত্বকে। অত্তা ও ধর্ম বুদ্ধের অশরীরী, অনিদর্শন বুদ্ধত্ব ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। —বুদ্ধ অতিধর্মের এই অতুচ্চ শিখর ও শেষ সিদ্ধান্ত।

বেদান্তের কথা—"ন প্রজ্ঞা না প্রজ্ঞা"
প্রজ্ঞাও নয় আবার অপ্রজ্ঞাও নয়
বুদ্ধের প্রতিধ্বনি "নৈব সঞ্‌ঞা নাসঞ্‌ঞা" (পালি)
সঙ্গাও নয় আবার অসঙ্গাও নয়।

তাজমহল

শ্রীনীলরতন দাশ

রাজ-বিরহীর অশ্রুবিন্দু জমিয়া পাষাণস্তূপে
প্রেমের সমাধি করিল সৃষ্টি ভুবন-ভুলানো রূপে।
প্রেয়সী মহিষী মমতাজ লাগি' মমতায়-ভরা হিয়া
মর্ম্মর ছবি আঁকিল মর্ম্ম নিঙাড়ি' রক্ত দিয়া!

পাষাণের শ্বেত শতদল সম শুভ্র তাজমহল,
পাষাণ ফুলের আকুল গন্ধ বিথার ইন্দ্রজাল।
কোজাগরী রাতে মনে হয় তারে দিব্যস্বপ্নমাখা,
কল্পলোকের মায়া মরীচিকা অঙ্গে তাহার আঁকা!

জ্যোছ্‌না-ধবল অপ্‌সরাদের উজল রূপের ছায়া
যমুনার জলে বিম্বিত হ'য়ে তাজ লভিয়াছে কায়া।
অভাগিনী কোনো বাল-বিধবার অনুপম তনু-লতা—
শুভ্র বসনে সজ্জিত যেন মূর্ত্ত পবিত্রতা!

কঠিন শিলার বাঁধন-ছন্দ রচিত এ মহাগান,
যেন শিল্পীর তুলির পরশে মুক্ত বন্দীপ্রাণ।
ফটিকের এই বিরহ-কাব্য বিরচিত মনোদুখে—
মিটায় বিরহী চিত্তের ক্ষুধা সুধাসম যুগে যুগে!

তাজের মিনারে মহলে ছড়ানো বেদনার ইতিহাস,
পাথরের বুকে পাষাণ ফলকে জড়ানো দীর্ঘশ্বাস।
রাজ-বিরহীর মর্ম্মবেদনা আজো যেন সেথা ঝরে,—
কত না বিরহী ফেলে অশ্রু এ প্রেমের তীর্থ 'পরে!
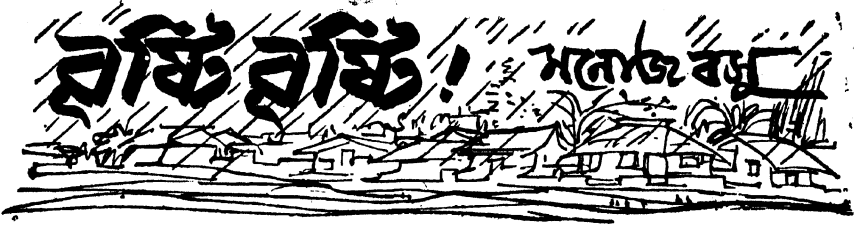
—তেরো—

বিশ্বেশ্বর কলম ধরেছেন। বদলাবেনই। সরমা কিছু অন্যায় বলেন না, কান্না তাঁর অকারণ নয়। অমন করে বলতেই বা হবে কেন। ইরাবতীর মা তিনি, বিশ্বেশ্বরও তেমনি বাবা তো বটে! বাপের দায়দায়িত্ব নেই মেয়ের উপর?

মরীয়া হয়ে কলম ধরে বসেছেন। অশ্বত্থামা হত ইতি গজ—গোছের ব্যাপার করে ছেড়ে দিতে হবে। সাপ না মরে, লাঠিও না ভাঙে। অরুণাক্ষ ছেলেটা বড্ড ভাল—আহা, হয়ে যাক বিয়েথাওয়া; সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক ওরা। ইতিহাসে মিছে কথা লেখা যায় না, যতদূর পারা যায় চেপে যাবেন। একটু-আধটু ঘুরিয়ে লিখবেন। তাই থেকেও যদি বুঝে নেয়, তেমন বুদ্ধিমানের সঙ্গে পারা যাবে কেমন করে?

লিখছি, লিখছি—ভাবনা কোরো না বড় বউ। বদলে দিচ্ছি যতটা পারা যায়।

…কাশীশ্বর রায় আসলে নীলকর টমাসের চর। তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ উৎকোচ লইয়া কাশীশ্বর রামনিধিকে ধরাইয়া দেন। রামনিধি তিলমাত্র সন্দেহ করেন নাই; বন্ধুর নিমন্ত্রণ পাইয়া সরল বিশ্বাসে তাঁহার কলিকাতার বাড়ি গিয়া উঠিলেন…

টমাস সাহেবের লেখা চিঠি পাওয়া যাচ্ছে—টাকা-পয়সা নিয়ে দরাদরি হচ্ছিল কাশীশ্বরের সঙ্গে, অবশেষে একটা ফয়শালা হয়ে গেল। তার উপরে টমাস প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, কুঠির উকিল করা হবে কাশীশ্বরকে। দাদন হিসাবে অর্ধেক টাকা কাশীশ্বরের হাতে এসে গেছে, তারও প্রমাণ পাচ্ছি পুরাণো জমাখরচে। পাটোয়ারি মানুষ কাশীশ্বর—দলিল স্বরূপ সমস্ত চিঠিপত্র যত্ন করে রেখে দিয়েছেন, এক টুকরোও বেহাত হতে দেন নি। সাহেবদের ভাল রকম জানতেন কিনা তিনি—কাজ হাসিল করার পর ক্লাইব উমিচাঁদের সঙ্গে যেমনটি করেছিল। সেইজন্যে সামাল সামাল। আর এখন সমস্ত তাঁর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবছেন বিশ্বেশ্বর। উৎকোচ শুনতে বড্ড খারাপ, সে জায়গায় 'বহু অর্থের বিনিময়ে কাশীশ্বর রামনিধিকে ধরাইয়া দেন'। আর 'চর' কথাটাও তুলে দেওয়া যেতে পারে স্বচ্ছন্দে।…

সারা দুপুর ধরে পাতা ছয়েক এমনি কাটকুট হল। স্ফূর্তির চোটে হাঁকডাক করে সরমাকে নিয়ে এলেন। শোন এবারে বড় বউ, দিয়েছি ওলটপালট করে। 'চর' কথাটা কেটেই দিলাম। কি দরকার? তেমন বিশেষ প্রমাণও নেই যে কাশীশ্বর চরবৃত্তি করতেন। টাকার বিনিময়ে রামনিধিকে ধরিয়ে দিলেন—সে ঐ একবারেরই লেনদেন। চর বলতে বোঝায় যেন চিরদিন ধরে এই ধরণের কাজ করে আসছেন। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? অতএব স্বচ্ছন্দে ও-কথাটা বাদ দিতে পারি। কি বলো, ঠিক হচ্ছে না?

সরমা কাগজ ক'টা ফ্যাস-ফ্যাস করে ছিঁড়ে ফেলেন।

কি, ও কি, ছিঁড়ে ফেললে কেন?

ভেবে ভেবে আধখানা কথা বদলাচ্ছ, কেউ পড়ে না তোমার ছাইপাঁশ। পড়লেও এত খুঁটিয়ে পড়ে না। আগুনে পোড়াবো সমস্ত। পুড়িয়ে সংসারের আপদ শান্তি করব।

খর-খর করে তিনি চলে গেলেন। অর্থাৎ আরও অনেক বদলাতে হবে, যা হয়েছে এ সব কিছুই নয়। বড় মুশকিলের ব্যাপার। টমাসের চিঠি বের করে নিলেন, গভীর মনোযোগে প্রতিটি কথা ধরে ধরে পড়ছেন। যা

টমাস লিখেছেন, তা ছাড়া অন্ত রকম মানে দাঁড় করানো যায় কিনা? অসম্ভব। ভাষার মারপ্যাচ থাকতে দেবার পাত্র কাশীশ্বর নন; সর্তগুলো জলের মতো পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কাজে নামেন নি। সরমা বিশ্বেশ্বরের উপর রাগ করেন, কিন্তু বিপদ ষোলআনা বানিয়ে রেখেছেন কাশীশ্বর নিজে। এ চিঠি রাখতে গেলেন কেন, কলঙ্কের দলিল? কাজ হয়ে গেলে তিনিই তো পোড়াতে পারতেন।

সেই থেকে কথা বন্ধ করে আছেন সরমা। আচ্ছা, বোঝে না কেন যে ইতিহাসে নাটক-নবেলের মতন মনগড়া কথা লিখবার জো নেই। ইরাবতী যত আদরের হোক, মেয়ের জন্ম জ্ঞানের ভাণ্ডারে মেকি ঢোকানো চলে না। কাশীশ্বরের চেয়ে সে অপরাধ কম হবে কিসে? কম তো নয়ই—লক্ষ গুণ, কোটি গুণ। কাশীশ্বরের বিশ্বাসঘাতকতা একটি মানুষের সম্পর্কে। বিশ্বেশ্বর অপরাধী হয়ে থাকবেন—এখন মত মানুষ আছে আর ভাবীকালে যারা সব জন্মাবে। ভগবান, দাও কিছু নতুন তথ্য—পুরাণো কাগজপত্রের মধ্যে প্রমাণ বেরিয়ে পড়ুক যে টমাস কুঠিয়ালের ঐ চিঠি জাল—কুঠিয়ালদের ব্যাপক ষড়যন্ত্র কাশীশ্বরকে খেলো করবার জন্য। 'কোম্পানির আমলের পরিশিষ্টে' বিশ্বেশ্বর ডঙ্কা পিটিয়ে সেই খবর জাহির করে দেবেন। সব দিকে ভাল হবে, ভাল ঘর-বরে বিয়ে হয়ে যাবে মেয়ের, তাঁরও পাপ কাজ করতে হবে না। এমনি কিছু করে দাও হে ভগবান!

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। রাত অনেক হয়েছে, নিশুতি শহর। গলির মোড়ে গোটাকয়েক কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে শুধু। আর মাথার উপরে প্লেন উড়ে গেল একটা। কুকুরের ডাক থেমেছে। অতল নিঃশব্দতা।

বিশ্বেশ্বরের চোখে ঘুম নেই। কী কাণ্ড, শরীর খারাপ হয়ে পড়বে, কাল সকালে উঠতে পারবেন না, ঘুমানোর দরকার। একটা অসুখ বিসুখ হয়ে পড়া মানে বাড়ির মানুষদের বিব্রত করা। তার চেয়েও বড় কথা—কাজকর্ম থেমে থাকবে অসুখের জন্য। একবার বন্ধ হয়ে গেলে যন্ত্রের জোড়াতালি দিয়ে আবার চালু করা কঠিন হয়, বিস্তর সময় লাগে। আর, আজকাল যে কথাটা বারম্বার মনে ওঠে বিশ্বেশ্বরের—সময়ের বালু ঝরে ঝরে জীবনের পাত্র খালি হয়ে এলো। কাজের অনেক বাকি, অকারণে তিলেক সময়-হানি চলবে না।

বাইরে এসে কলের জল থাবড়ে দিলেন মাথায়, চোখে-মুখে, দু-পায়ের পাতায়। দেহ ঠাণ্ডা হোক। এই নিশিরাত্রে চারিদিক তাকিয়ে মনে হয়, অজানা কোন এক আজব জায়গা। রাক্ষসে খেয়ে-ফেলা কোন এক প্রেতপুরী। রাস্তার আলোগুলো নিঃশব্দে সেই পুরীর পাহারা দিচ্ছে।

শুয়ে পড়লেন চোখ বুঁজে। ঘুমাতেই হবে।...সাদা ভেড়ার পাল চরছে পাহাড়ের উপরে—এক, দুই, তিন, চার...মনে মনে গুণে যাও পঞ্চাশ অবধি। পঞ্চাশ, উনপঞ্চাশ, আটচল্লিশ গোণ আবার উল্টো দিক দিয়ে।... অঙ্কের মাস্টার আচ্ছা করে একদিন কান মলে দিয়েছিল... হাট করতে গিয়ে ভুল করে কার পাতাড়ি-মাছের খালুই নিয়ে এসেছিল...নদীতে ঝাঁপ খেয়ে পড়ত ঝুঁকে-পড়া আমের ডালের উপর থেকে...ঘুমিয়েছে ভেবে গায়ে কাঁথা চাপিয়ে মশারি গুঁজে দিয়ে মা রান্নাঘরে খেতে গিয়েছেন, দুষ্টামি করে তিন বছুরে বিশ্বনাথ কেঁদে উঠল...

বুড়ো বিশ্বেশ্বর পিছুতে পিছুতে তিন বছরে এসে পৌচেছেন। তারও আগে আছে, আর মনে পড়ে না। তারই নাম তো ইতিহাস। ছোট্ট খুকি ইরা কথায় কথায় দু-পাটি দাঁত মেলে দাঁতের বাহার দেখাত। নতুন দাঁত উঠলে দেখাতে ইচ্ছে করে বোধ হয়। সরমা এলো নতুন বউ হয়ে মাথায় সোনার সিঁথিপাটী, পায়ে গুজরি—ও-সব গয়না আজকাল পরে না, বিয়ের মেয়েকে কিন্তু ঠিক ঠিক মানায় না ও-সমস্ত না পরলে...

ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘটনা—চৈত্রমাসের শিমুলতুলোর মতো আসছে একটু স্মৃতির সামনে, কোন দূরে উড়ে যাচ্ছে আবার। ঘুম আসে—সত্যি সত্যি এলো এবারে বুঝি ঘুম—

ওঠ ঐতিহাসিক। কত লোক এসেছি, তোমার ছোট্ট তপোবন ভরে ছাপিয়ে যাচ্ছে। চোখ মেলে উঠে বসে দেখ কি কাণ্ড! আলস্য লাগছে বিশ্বেশ্বরের উঠতে আর ইচ্ছে করে না। সমস্তটা দিন বড় ঝক্কি গিয়েছে আজ। কত অনুযোগ-বিদ্রূপ, কত রকমের অনুনয়—বাড়ির কত চোখ-রাঙানি।

উঠবার শক্তি নেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জোড় খুলে গেছে। জোড় পরিয়ে সমস্ত ঠিকঠাক করে খাড়া হয়ে বসা—সে অনেক হাঙ্গামা। শুয়ে শুয়ে দু-চোখ মেলেই দেখতে লাগলেন যেন বিশ্বেশ্বর। বাপরে—হাজার দু-হাজার এসে জমেছে এইটুকু ঘরের ভিতরে। 'কোম্পানির আমলে' যত লোকের কথা আছে, কেউ বড় বাদ নেই। সামান্য অতি-সাধারণ থেকে মহামহিম ধুরন্ধরেরা। আলোর মতন, ছায়ার মতন—চেহারা সুস্পষ্ট আছে কিন্তু আয়তন নেই। নতুবা এক ঘরে হাজার হাজার মানুষের স্বচ্ছন্দ সঙ্কুলান হয় কেমন করে ?

তারপর মনে হল, ঠিক বায়ুভূত নয়—খসখস আওয়াজ হচ্ছে যেন শিয়রের দিকে, চলাচল করছে অন্ধকার ঘরে। —আরে, আরে, কি সর্বনাশ! কত রকমের কাগজপত্রে ঠাসা এ ঘর—পায়ের ঘায়ে ছড়িয়ে উড়িয়ে ঘুরঘুর করছ যে বড়!

বিরক্ত হয়ে বিশ্বেশ্বর শিয়রের দিকে ডানহাত বাড়ালেন। পা ধরে টেনে এনে—কি করবেন, আছাড় দেবেন নাকি ? ঘুমের অলস মস্তিষ্কে ভাবছেন, যা হোক করা যাবে একরকম। এবং ধরেও ফেললেন—পা নয়, হাত একখানা। অন্ধকার হোক, চোখ বোঁজা থাক— তা হলেও স্পর্শ পেয়ে বুঝতে তাঁর সিকি মিনিটও লাগে না। অশরীরী ইতিহাসের মানুষ কেউ নয়—মেয়ে, কিম্বা বুড়ো মা তরুণী মেয়ের মূর্তি হয়ে মৃত্যু-পার থেকে আবার এসেছেন।

কোমল কণ্ঠে বললেন, এখানে কেন রে ইরা ? ঘুমোসনি ? ঘরের মধ্যে এলি তুই কেমন করে ?

কাজ করতে করতে ঘুমিয়েছেন। হাতের কাছে টেবল-আলো, আন্দাজি সুইস টিপে দিলেন। তন্দ্রালু চোখ মেলে তাকালেন মেয়ের দিকে। ঘুম টুটে গেল মুহূর্তে। কড়া হয়ে বললেন, হাতে তোর কি রে ? কি আছে হাতে, লুকোচ্ছিস কেন ?

তড়াক করে উঠে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়ের হাত এঁটে ধরলেন। আঁচলের তলা থেকে পড়ে গেল বস্তটা। ফাইল। স্তূপাকার কাগজের ভিতর থেকে বাছাই করে ফাইলে ঢুকিয়ে রেখেছেন। শিয়রের কাছে থাকে, দরকারের সময় হাতড়ে বেড়াতে না হয়। কাশীশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে যত মৃত্যুবাণ সমস্ত এই এক জায়গায়— একটি তূণের ভিতর।

বজ্রগর্জনে বিশ্বেশ্বর বলে উঠলেন, কেন নিয়েছিলি এসব তুই ? কোথা যাচ্ছিলি ?

আশ্চর্য শান্ত ইরাবতী। সহজ ভাবে বলে, চুরি করতে এসেছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে আঁধারে তোমার গায়ে হাত পড়েছে, তাইতো তুমি ধরে ফেললে।

স্তম্ভিত হয়ে বিশ্বেশ্বর তার দিকে তাকান। কথা সরে না। ইরাবতী বলতে লাগল, কাগজগুলো নিয়েই যত গণ্ডগোল। মা'র সঙ্গে তোমার আলাপ বন্ধ। কৃতান্ত-কাকা পঞ্চাশবার আসছেন, নতুন নতুন লেখা বানিয়ে দাও ওর উপরে। ছাপিয়ে তিনি দু-পয়সা লুঠবেন। অম্বুজাক্ষ ডাক্তারবাবু চটাচটি করে চলে গেলেন। মণিরামপুর নিয়ে গিয়ে এই সর্বনেশে বস্তু তোমায় গছিয়ে দিয়েছে, ঝেড়ে ফেলতে না পারলে নিস্তার নেই।

তুই বললি একথা ইরা ? এই ইতিহাসের খেয়ালে বরাবর তুইই তো আস্কারা দিয়েছিস। বাড়ির মধ্যে একমাত্র তুই। সবাই যাচ্ছেতাই করে, সকলের সঙ্গে তুই আমার জন্য লড়িস।

বিশ্বেশ্বরের গলার স্বর কেমন হয়ে গেল। কোটরগত দু-চোখের সকল দৃষ্টি পুঞ্জীত করে কি যেন চেয়ে চেয়ে দেখছেন ইরার মুখে, আর ঘাড় নাড়ছেন।

ঠিক, ঠিক—সর্বনেশে কাগজ। সোনার ছেলে অরুণ এরই জন্য মুখ চুণ করে চলে গেল। রাত দুপুরে তোর চোখে ঘুম নেই। বাপের ঘরে চোর হয়ে ঢুকেছিস্—

একটু হেসে ইরাবতী লঘু করে নিতে চায়, আর তোমার চোখে বড্ড ঘুম বুঝি বাবা—নাক ডেকে ডেকে ঘুমুচ্ছিলে ? কতক্ষণ ধরে ঐ জানলা দিয়ে দেখছিলাম, তা জানো ?

তাই তো বলছি রে! বাপ আমি নই, তোর শত্রু। বড় বউ মিথ্যে বলে না—শত্রু তোর শুধু নয়, খেয়াল বশে এমন সাজানো সংসার তছনছ করছি। হাড়ভাঙা কষ্ট করে তুই সামলাচ্ছিস, তোরই আখের নষ্ট করে দিচ্ছি। কম সর্বনেশে মানুষ আমি!

যে ফাইল কেড়ে বিশ্বেশ্বর দু-হাতে বুকের উপর নিয়েছিলেন, সেটা আবার এগিয়ে ধরেন মেয়ের দিকে।

নিয়ে যা মা। বড় লোভের জিনিষ, আমার কাছে আর রাখব না। তোর পথের কাঁটা—নিয়ে পুড়িয়ে ফেলগে। ঘরের সমস্ত কাগজপত্রে একদিন এসে দেশলাই ধরিয়ে দে তোরা মা আর মেয়ে। দায়মুক্ত হয়ে আবার আমি চাকরি খুঁজতে বেরুই।

ইরার দু-চোখ ভরে জল এলো। বলে, বাবা এত বড় অন্যায় করতে এসেছি—তুমি বকলে না, রাগারাগি করলে না, এ তুমি কেমন হয়ে গেলে বাবা? গালিগালাজ করো, ধরে মারো আমায়—

হয়তো বা মার খাবার জন্যই এগিয়ে এসে মাথা বাড়িয়ে দেয়। অত বড় ঐ মেয়েকে খুকির মতন বিশ্বেশ্বর কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কতকটা যেন আপনার মনে বলছেন, আমার এক মিথ্যে দম্ভ। আরে, কত দেশের কত ইতিহাস গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বেমালুম হল, আমি কোন ছার, আমি যাচ্ছি ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে মিনার গড়ে তুলতে। কিছু হবে না, শুধু ধুলো মাথাই সার।

ইরাবতী কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি যে কত বড়, কেউ তা বুঝল না। তোমার কাজের কেউ দাম দেয় না। ঘরে বাইরে এত লাঞ্ছনা, এ আমি সইতে পাচ্ছি নে বাবা। বিশ্বাস করছ না কেন বল তো, সত্যিই আমি চুরি করতে এসেছিলাম। মেয়ে হয়ে বুঝি চুরি করা যায় না? জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, কত কষ্ট তোমার। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লে তবু এপাশ-ওপাশ করছ। সমস্ত দেখছি। তখন ঠিক করলাম, ঐ শয্যাকণ্টক নিয়ে নেবো যেমন করে হোক। মাথায় জল ঢালতে তুমি বাইরে এলে, ফুড়ুৎ করে অমনি ঢুকে পড়েছি। কিচ্ছু তুমি টের পেলে না। আমার সঙ্গে পারবে তুমি!

কান্নার মধ্যে একটু হাসির ঝিকিমিকি। একেবারে এক ফোঁটা মেয়ে যেন। বিশ্বেশ্বর বলেন, তোর কত গুণ তা-ও কি বুঝতে পারল কেউ? তার কোন আদর হয়েছে? মেয়ে দেখতে এসে অম্বুজ ডাক্তার আমায় কতকগুলো ধমক দিয়ে চলে গেল। আরে, আমার যে অপরাধই হোক, তোর গুণেই তোকে ঘরে নিয়ে তোলা উচিত। নিয়ে তো বর্তে যাবে।

ইরা বলে, আমরা গরিব বলে মানুষে এত হেনস্তা করে। পণ নিয়ে কথাকাথি—সেখানেই বনল না, মিথ্যে তার উপর মেয়ে দেখে ফল কি? ভালই হয়েছে বাবা, আমার হয়রানি হল না।

পণ? বিশ্বেশ্বর ঘাড় নাড়লেন, না, পণের কথা কিছু হয় নি তো অম্বুজ ডাক্তারের সঙ্গে। ওখানে বিনা পণে হয়ে যেত—আমরা ইচ্ছে করে যা দিতাম। গোলমাল বাধল কাশীশ্বরের ব্যাপার নিয়ে।

ঐ তো পণ বাবা। এত বছর ধরে প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত্রি যে সাধনা করেছ, তার সমস্ত ফলাফল তোমার কাছে চেয়ে বসল। এর চেয়ে বড় পণের দাবি কে কবে করেছে?

বিশ্বেশ্বর বললেন, ভেবে দেখলাম মা—আমি ঐ এক কথাই সমস্তটা দিন অনেক রকমে ভেবেছি—গরিব লোকের পক্ষে এ সব বই লেখা মানায় না। আমি ফের চাকরি-বাকরি করব। তেমন আর শক্তি নেই, তবু চেষ্টা দেখতে হবে। আজ হোক কাল হোক, করতেই তো হবে কিছু—চিরকাল তুই এইভাবে খেটে মরবি, সে তো হতে পারে না, আগেভাগে লেগে পড়াই ভাল। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি মা। পরজন্মে যদি ভাল ঘরে জন্মাই, তখন ইতিহাস নিয়ে কাজ করব, এ জন্মে ইতি।

ক্ষেপে গেলেন নাকি বিশ্বেশ্বর? চোখ-মুখের ভাব অস্বাভাবিক। এক সঙ্গে এত কথা এমন করে উনি বলতে পারেন, কে জানত? মায়ের সঙ্গে হামেশাই খিটিমিটি বাধে, সেটা কিছু নয়—কিন্তু অম্বুজ ডাক্তারের অপমানটা মনে বড় লেগেছে। আর, সকলের বড় আঘাত দিয়েছে ইরাবতী নিজেই—বিশ্বেশ্বরের পায়ের নিচের শেষ মাটিটুকুও সরে গেল ইরাবতীর আঁচলের নিচে কাগজগুলো দেখতে পেলেন যখন। মেয়েও বিপক্ষ-দলে, তবে আর কে রইল তাঁর দিকে? দেবতার মতো বাবাকে সকলে মিলে আমরা মেরে ফেলছি।

আর একটা কথা বলতে দেয় না বিশ্বেশ্বরকে। যত বলবেন, উত্তেজিত হয়ে উঠবেন ততই। জোর করে ইরা শুইয়ে দিল, হাতপাখা নিয়ে পাখা করছে। কড়া পাহারাদার শিয়রে—বিশ্বেশ্বর কি করবেন, শান্ত ছেলের মতো চোখ বুঁজে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলেন। ইরাবতী বাতাস করছে আর ভাবছে আকাশ-পাতাল। রি-রি

করে সর্বাঙ্গ জ্বালা করে—তারই জন্য এত বড় মূল্য আদায় করবে বিশ্বেশ্বরের কাছ থেকে। পাশাপাশি আবার অরুণাক্ষের অসহায় ভীত মুখের ছবি মনে আসে, বেদনায় অন্তর ভরে যায়। তারপরে—অনেকক্ষণ পরে মনে হল, ঘুমিয়ে পড়েছেন বিশ্বেশ্বর ঠিক। হাতের পাখা নামিয়ে রেখে সন্তর্পণে উঠে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ইরাবতী নিজের ঘরে চলে গেল।

পাতলা ঘুমের মধ্যে বিশ্বেশ্বর দোর ভেজানো টের পেলেন। একজনে গেল, কিন্তু আরও তো অনেকে ঘর ভরে রইল। চোর ধরে ফেলে বিশ্বেশ্বর যেই আলো জ্বেলেছিলেন, ইতিহাসের লোকগুলো অমনি যেন ছুটোছুটি করে এ-আলমারির তলায় ও-বইয়ের নিচে ঐ কাগজের ফাঁকে চক্ষের পলকে উধাও। বিদ্যুতের আলোয় চেয়ে চেয়ে দেখ, কিছু নেই কোন দিকে। শুধু ইরাবতী, তার বাবা, আর ঘরময় ঠাসা কাগজপত্তোর। আঁধার ঘরে ইরাবতী বাপের মাথায় বাতাস করছিল, জুত পেয়ে তারা তখন—হ্যাঁ, চোখ বুঁজে বুঁজেই বিশ্বেশ্বর স্পষ্ট দেখলেন—অন্ধি-সন্ধি থেকে সুড়সুড় করে বেরিয়ে তারা সব আবার জাঁকিয়ে বসল এদিকে-ওদিকে নিচে উপরে। ইরাবতী চলে যেতে মজা এখন ষোল আনা জমেছে—চলাচলের খসখসানি, ফিসফাস কথাবার্তা···

অস্ফুট, অতি ক্ষীণ—তারপরে কথাবার্তা প্রবল হয়ে আসছে ক্রমশ। আগে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, বোবা মানুষের মতো উঁ-উঁ-উঁ করে একসঙ্গে সবাই বলতে চায়, এখন আন্দাজে কিছু কিছু বুঝছেন। কথা তাঁকে নিয়েই, তাঁকে শোনাবার জন্য। কয়েকটি কণ্ঠ তার মধ্যে স্পষ্ট না হোক, বেশ প্রখর হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। তাঁকে গালি দিচ্ছে, নিন্দেমন্দ করছে। কারা তোমরা, পরিচয় দাও। কত জ্বালায় জ্বালাতন হয়েছি, কেউ তার কি খবর রাখ? মরা মানুষ তোমরা—মড়ার খাতিরে জলজ্যান্ত আসল মানুষদের ভাসিয়ে দেবো কেমন করে?

বিশাল পুরুষ—অঙ্গে মলিন ছিন্ন কয়েদির সাজ, গলায় মালার মতো জড়ানো ফাঁসির দড়ি, রক্তাক্ত দুটো চোখের মণি অগ্নিগোলকের মতো কোটর থেকে ঝুলে বেরিয়ে এসেছে, দীর্ঘায়িত জিহ্বা ঝুলে পড়েছে বুকের নিম্নাংশ অবধি আবৃত করে—বলছেন তিনি। কথা নয়, আওয়াজ খানিকটা, ক্ষোভ আর ক্রোধ গর্জাচ্ছে সেই আওয়াজের মধ্যে। আঙুল তুলে তুলে যেন বলছেন, রামনিধি আমি। সম্পর্কে তুমি প্রপৌত্র বলে নয়, ঐতিহাসিকের কাছে দাবি আমার। গলায় দড়ি বেঁধে দম আটকে নৃশংস ভাবে আমায় মেরে ফেলল। পরম বন্ধুকে টাকা দিয়ে কখন কিনে ফেলেছে—শুধু আমি বলে কেন, সকল মানুষের চোখে সে এতকাল ধুলো দিয়ে বেড়িয়েছে। তোমার চোখেই কেবল ফাঁকি চলল না, তুমি ধরে ফেলেছ। ন্যায়ের দণ্ড তোমার হাতে ঐতিহাসিক, আমি বিচার চাচ্ছি। সর্বকালের মানুষের সামনে কাঠগড়ায় তুলে বিচার করো বিশ্বাসঘাতক কাশীশ্বরের।

বিশ্বেশ্বর হাউহাউ করে কেঁদে পড়লেন, আমি গরিব। কন্যাদায় আমার। ভাল সম্বন্ধ পেয়েছি। ইরা আমার বড্ড ভাল, অরুণও ভাল ছেলে। দুটিতে সুখে থাকবে। সেই লোভে মেয়ে হয়েও আজ কাগজ চুরি করতে আমার ঘরে ঢুকে ছিল। মেয়ের সাধ-বাসনা পায়ে থেঁতলে দিই আমি কেমন করে?

আবার উল্টোদিকে আর এক ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। কাতর কণ্ঠ। এ তো একেবারে চেনা মুখ, চেনা চেহারা। কাশীশ্বর রায়। মানুষটিকে দেখে এসেছেন মণিরামপুর গিয়ে—অম্বুজাক্ষের বাড়ির অয়েল-পেন্টিংএ। সেই দাম্ভিক চেহারা কি রকম হয়ে গেছে এখন, হাতজোড় করে কাকুতি করছে। দেখ, আমায় এত বড় করলে তুমিই। আকাশে তুলে ধরে পাঁকের মধ্যে ছুঁড়ে দিও না আবার। আমায় মার্জনা করো। অনেক শাস্তি হয়েছে। লাঠি মেরে মাথা ভেঙে চাঁদপাল ঘাটের পাশে চরের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল, শিয়ালে আমার দেহ নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করল সারারাত্রি। সকাল হলে শকুনের দল ঘিরে বসল। মেছো-কুমির অদূরে মাথা ভাসান দিল কিঞ্চিৎ প্রসাদ-লাভের আশায়। অনেক তো হয়ে গেছে। শাশ্বতকালের দরবারে আর আমায় দাঁড় করিয়ে দিও না।

বিশ্বেশ্বরের চোখে জল আসে। বড় দরদ দিয়ে লিখেছিলেন কাশীশ্বরের অধ্যায়টা। লিখতে লিখতে মানুষটাকে ভালবেসেছিলেন। রামনিধিকে সকলে জানে; পিছনে পিছনে ছায়ার মতো যে-জন সকল কার্যের সহায় হয়েছিলেন, তাঁর নাম বড় কেউ জানে না। ইতিহাসের অবজ্ঞাত কাশীশ্বর—তাই রামনিধির চেয়েও হয়তো বেশি মমতা কাশীশ্বরের উপর। আজকে তাঁকেই আবার আঙুল দেখিয়ে ভণ্ড বিশ্বাসঘাতক বলা—এ তো নিজেরই বুকে ছুরি বসানোর ব্যাপার। ছুরি বসানো ঐ সঙ্গে সরমার ঘর-সংসারের উপর, ইরা মায়ের সাধ-আহ্লাদ-ভালবাসার উপর···

সারারাত এমনি কেটেছে। ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন, জেগে উঠে বারম্বার শয্যায় উঠে বসা। ভোরের দিকে ঘুমটা এঁটে এলো। কেউ ডাকে নি তাঁকে; ডেকে তুলে দেবার

মানুষই বা কে ? ইরা তো বেরিয়ে গেছে মেয়ে পড়াতে, সরমা আলাপ বন্ধ করে আছেন। আজকে বিশ্বেশ্বর যদি মরে পড়ে থাকেন, সরমা বোধ হয় নেড়েচেড়ে দেখতে আসবেন না। দোষ দেওয়া যায় না—মেয়ের মা, আহা, মেয়ের ভাবনায় পায়ের উপর পড়ে কত আকুতি করেছেন !

হেনকালে নিচে অরুণাক্ষর মতন গলা শুনতে পেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন বিশ্বেশ্বর। সিঁড়ির উপর থেকে ডাক দেন, অরুণ, একবার শুনে যেও বাবা। বড্ড দরকার, আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে যেও না।

ইরাবতীর সঙ্গে কাল অমন কথাবার্তার পর অরুণাক্ষ ধৈর্য ধরে চুপচাপ বাড়ি বসে থাকে কেমন করে ? আবার এসেছে আজ। আরও সকাল সকাল যে আসে নি, সে কেবল ইরার বেরিয়ে পড়বার অপেক্ষায়। রোজ রোজ দেখলে ভাববে কি মেয়েটা ? যা মেজাজ—কিছুই বলা যায় না, এইটেই হয়তো বা বিষম অপরাধ হয়ে দাঁড়াল। ভালয় ভালয় কাটলে যে হয় এখনকার দিনগুলা। কন্যার ভাবগতিক খুব ভাল, এখন পিতাঠাকুর মশায়ের মতিগতি কোন ধারায় চলেছে, খোঁজখবর না নিয়ে সোয়াস্তি নেই। তাই এসেছে। সরমার সঙ্গে গল্প জমিয়ে নেবে, তারই মধ্যে হুড়হুড় করে সব কথা আপনি বেরিয়ে আসবে। সরমা রেখে ঢেকে বলতে জানেন না, কিম্বা চান না অরুণাক্ষের কাছে কোন-কিছু চেপে রাখতে। আস্তে আস্তে এই প্রসঙ্গই উঠছিল, এমন সময় উপর থেকে বিশ্বেশ্বর ডাক দিলেন, শুনে যাও অরুণ—

সরমা বলে ওঠেন, যাও। যতক্ষণ না যাচ্ছ, অমনি তো চেঁচামেচি চলবে। গিয়ে শোন গে, আবার কোন মহৎ কাজ করে বসে আছেন, সারা দিনরাত ভেবে ভেবে হ্রস্বই-র জায়গায় দীর্ঘঈ বসিয়েছেন কোথায়। এ বাড়ি মানুষ আসে ! মানুষ এসে দুটো ভালমন্দ কথা বলবে, তা উপরতলায় কেমন সঙ্গে সঙ্গে জট নড়ে ওঠে।

অরুণাক্ষ তপোবনে গেল। কাগজপত্রের ফাইলটা তার হাতে দিয়ে বিশ্বেশ্বর বললেন, এই নাও, নিয়ে পালিয়ে যাও। শিগগির ঘর থেকে চলে যাও বাবা। বড্ড লোভের জিনিষ—বলা যায় না, আবার হয়তো ছোঁ মেরে নিয়ে নেবো সমস্ত।

অরুণাক্ষ হতভম্ব হয়ে গেছে। বলে, কি এসব ?

সেই যে গন্ধমাদন নিয়ে এসেছিলাম, ঝাড়াই-বাছাই করে এই দাঁড়িয়েছে। বাকি সমস্ত ভুষিমাল। তা ওজনে কম হলে কি হয়, দামে ভারী। কোহিনুর হীরের কতটুকু আর ওজন বলো ! তোমাদের বাড়ি থেকে এনেছিলাম, তোমার হাতে ফেরত দিচ্ছি—

পুলকিত স্বরে অরুণাক্ষ বলে, পরিশিষ্ট আর লিখবেন না তবে ?

কোন কিছুই লিখব না আমি। এ জন্মে আর নয়। আমার মৃত্যু হয়েছে। তাই তো কাগজপত্তোর সরিয়ে দিচ্ছি। থাকলে হয়তো লোভ হবে লিখবার। ইতিহাসের ছাত্র, তোমায় আমি বেশি কি বলব। সর্বনেশে জিনিষ, লোভ সামলানো ভারি দায়। তার উপরে যখন তখন কৃতান্ত এসে 'কাশীশ্বরের কি করলেন' তাগিদে তাগিদে অস্থির করে তুলেছে।

একটুখানি ইতস্তত করে অরুণাক্ষ বলে, এসব নিয়ে আমি কি করব, বলে দিন—

আমি কি জানি আর কি বলব ! ইতিহাস ভালবাস বলে সেই টানে টানে এসে পড়েছিলে এ-বাড়ি। কত পড়াশুনো তোমার, কত পণ্ডিতজনের কাছে পাঠ নাও। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, চিরকাল কেরাণিগিরি করে এসেছি—আমি তোমায় বলে দেবো, কি করতে হবে এই সমস্ত নিয়ে ?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ইতিহাসের গবেষণা আমার মতন লোকের জন্য নয়। এতদিন ধরে জড়ো-করা বোঝার কি গতি হবে, ভেবে সোয়াস্তি পাচ্ছিলাম না। ইরাকে বলছিলাম, তুই নিয়ে পুড়িয়ে ফেল। সে কিছু কাজের কথা নয়, মনের দুঃখে বলেছিলাম। তোমার কথা তখন মনে পড়েনি। শুধু এই কখানা কাগজ নয় বাবা, আস্তে আস্তে ঘরের বোঝা খালি করে নিয়ে যাও তোমার বাড়ি। কেমন যেন আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে এর মধ্যে। রাত্রিবেলা একলহমা ঘুমুতে পারি নি। যত কিছু আছে সাফ-সাফাই করে আমায় মুক্তি দাও অরুণ—

অরুণাক্ষ নিচে নামছে, সিঁড়ির মুখে সরমা দাঁড়িয়ে আছেন।

কি হল ?

অরুণাক্ষ বলে, সব ঠিক হয়ে গেল মা। দু-চার দিনের মধ্যে বাবা এসে পাকাপাকি করে যাবেন। আগে-ভাগে এসে আমি তারিখটা বলে যাব।

কথাবার্তা কি হল, বলো দেখি শুনি।

কাশীশ্বরের কথা আর লিখবেন না উনি। লিখবার উপায়ও রইল না, কাগজপত্র সমস্ত আমায় দিয়ে দিলেন।

উল্লাস ভরে ফাইল উঁচু করে দেখাল। বলে, বাবাকে গিয়ে বলি। দেখিয়ে দেবো এই সমস্ত জিনিষ। আর কোন রকম বাধা তো রইল না। আপনি আশীর্বাদ করুন।

সরমার পায়ের ধুলো নিয়ে সে চলে গেল। দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সরমা বিড়বিড় করে বললেন, সুভালাভালি কাজটা করে দাও ঠাকুর। আমার ইরা সর্বসুখী হোক।

ক্রমশঃ

প্যাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি সরকারের তরফ হইতে দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ষ্টুডিও নির্ম্মাণ করিবেন। এই দেড়লক্ষ টাকা নাকি 'পথের পাঁচালী' ছবি হইতে লাভ পাওয়া গিয়াছে। ষ্টুডিওটি সমবায় পদ্ধতিতে প্রযোজকেরা পরিচালনা করিবেন। পরিচালনাক্ষেত্রে

বাংলার চিত্র ও নাট্যজগতের একমাত্র বিদুষী মুসলিম শিল্পী বনানী চৌধুরী। বর্তমানে ইনি মিনার্ভা নাট্যমঞ্চের সঙ্গে জড়িত

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

যদি আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে প্রযোজকদের পক্ষে ছবি নির্ম্মাণ করা সহজসাধ্য হইবে। ছবির গল্প-লেখক, চিত্র-পরিচালক, প্রযোজক এবং চিত্র-প্রদর্শক এই চারটী স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই ষ্টুডিওতে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হইবে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছবির গল্প-লেখকদের দক্ষিণা সম্পর্কে ডাঃ রায় তাঁহার উদার মতবাদের পরিচয় দিয়াছেন। যোগ্য লেখক নির্ব্বাচন করার ভার পড়িয়াছে রাজশেখর বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খ্যাতনামা আরও দু-একজন সাহিত্যিকের উপর—সংবাদটি চিত্র-শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-মাত্রেরই মনে আশার সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই।

* * * *

বাংলা চিত্রজগতের মধুক্ষরা বাঙালী মেয়ে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

বেতার ও তথ্যমন্ত্রী ডাঃ কেশকার নাকি যুদ্ধের সময় চিত্র-নির্ম্মাণের জন্য যেরূপ লাইসেন্স প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল পুনরায় সেইরূপ লাইসেন্স প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে তিনি নাকি চিন্তাও করিতেছেন। যে সময় লাইসেন্স প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল সে সময় অনেকে কেবলমাত্র ঐ লাইসেন্সটুকু বিক্রয় করিয়াই অনেক অর্থ রোজগার করিয়াছেন। লাইসেন্স প্রবর্ত্তন করিলে নির্ঝঞ্ঝাটে একশ্রেণীর প্রযোজক বেশ কিছু লাভ

হইবেন বলিয়াই আমাদের ধারণা। এমতাবস্থায় লাইসেন্স প্রবর্ত্তিত না হওয়াই সমীচীন।

*　　*　　*　　*

দিল্লীর সিনেমা হাউসগুলির প্রবেশ মূল্য অত্যধিক এবং এক সিনেমা হাউসের সহিত অন্য সিনেমা হাউসের প্রবেশ মূল্যের সমতা নাই। এই সকল কারণে দিল্লী বিধানসভা নাকি এক বেসরকারী প্রস্তাবে রাজ্যসরকারকে প্রবেশ মূল্যের সমতা বজায় রাখার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা কার্য্যকরী হইলে চিত্রমোদীরা সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।

*　　*　　*　　*

গীতা দত্ত রায়—বম্বের চিত্রজগৎ এই বাঙালী মেয়েটির কণ্ঠস্বরে পাগল

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

রাশিয়ার চলচ্চিত্র পরিচালক প্রোলিন সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এক অনুষ্ঠানে বলিয়াছেন যে, রাশিয়ার প্রায় সকল অভিনেতা—অভিনেত্রীই মাস মাহিনায় চাকুরী করেন। কেবলমাত্র কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী প্রতি স্যুটিং-এর দিনে ৭৫০ রুব্‌ল অর্থাৎ ৮৯০৲ টাকার মত অতিরিক্ত পাইয়া থাকেন। কোন অভিনেতা—অভিনেত্রীই একটীর অধিক ছবিতে অভিনয় করেন না। আমাদের দেশের মত তাঁরাও অবশ্য ছবিতে অভিনয় করা কালীন থিয়েটারে যথারীতি অভিনয় করেন। প্রোলিনের উক্তির প্রতি আমাদের দেশের শিল্পীদের অবহিত হইতে বলি।

*　　*　　*　　*

শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা—কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত নির্মিয়মান 'শ্রীশ্রীমা' চিত্রের নাম ভূমিকায় একে দেখা যাবে

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

গত ২০শে মার্চ্চ রামমোহন লাইব্রেরী হলে বাংলা চলচ্চিত্র সমর্থক সমিতির উদ্যোগে 'যৌন আবেদনপূর্ণ চলচ্চিত্র' বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৌধুরী তাঁহার সভাপতির ভাষণে বলেন—দেশী ও বিদেশী যৌন-আবেদনপূর্ণ চলচ্চিত্রগুলি একদিকে যেমন শিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় অপ্রাপ্ত বয়স্কদের প্রলুব্ধ করিতেছে, অপরদিকে তেমনি ইহাই সামাজিক অবনতির এক প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেন্সরবোর্ডে অধ্যাপক এবং সমাজের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিদের সদস্য করিয়া লওয়া উচিত। অপ্রাপ্তবয়স্করা যাহাতে যৌন-আবেদনপূর্ণ ছবি একবারেই না দেখিতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। শ্রীচৌধুরীর কথাগুলি খুবই যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু 'ট্র্যাঙ্গুলার'

মার্কা ছবিগুলিতেই অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভীড় দেখা যায়। এ বিষয়ে চিত্রগৃহের মালিকদের এমন কি দ্বাররক্ষীদের পর্য্যন্ত সমাজসেবার ব্রত লইয়া সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। নচেৎ কোনক্রমেই ইহার প্রতিবিধান করা সম্ভব হইবে না।

*　*　*　*

আমেরিকার চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি মিঃ এরিক এ্যানেন জনষ্টন সম্প্রতি ব্যবসাসূত্রে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এখানে অনুষ্ঠিত কোন চা-চক্রে তিনি বলেন—ভারতীয় চিত্র-প্রযোজক ও ব্যবসায়ীদের সহিত কারিগরি বিদ্যার আদানপ্রদান করা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। আমেরিকা-ভারতের মধ্যে যদি এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করা যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা উভয় দেশই লাভবান হইবে।

*　*　*　*

মধু বসুর পরিচালনায় নির্ম্মিয়মান 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' চিত্রে বালক দানী ঘোষের ভূমিকায় দেখা যাবে নবাগত এই বালক অভিনেতাকে

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার পরিচালিত শ্রীরঙ্গম আজ কয়েক মাস হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উক্ত নাট্যশালার বর্ত্তমান মালিকগণ গৃহের আমূল সংস্কার করিয়া বিশ্ব-রূপা নামে শীঘ্রই উহার দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ সহরের উপকণ্ঠে বিশাল জমির উপর এই নাট্যশালাটি অবস্থিত। বর্ত্তমান মালিকগণ ইহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রমোদ-ক্ষেত্রের সংলগ্ন প্রমোদ-উদ্যান ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতার প্রমোদ-ক্ষেত্রের ইতিহাসে ইহা অভিনব। সম্প্রতি বিশ্বরূপার অন্যতম মালিক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সরকার সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের নবনির্ম্মিত নাট্যশালা ও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে সবিশেষ জানাইয়া বলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্ব্বজন পরিচিত উপন্যাস "আরোগ্য নিকেতনের" নাট্যরূপ তাঁহারা প্রথম নাটক হিসাবে মঞ্চস্থ করিবেন। রোগক্লিষ্ট সমাজকে রোগমুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা আলোচ্য কাহিনীকে প্রথম নাটক হিসাবে পাদ-প্রদীপের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন। আমরা এই নূতন নাট্যশালার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সাফল্য কামনা করিতেছি।

*　*　*　*

সম্প্রতি কোন বিখ্যাত কথাশিল্পী ও নাট্যকারের নিকট ব্যক্তিগত কারণে উপস্থিত হইয়াছিলাম। বয়োজ্যেষ্ঠ কথা-শিল্পী সস্নেহে আহ্বান করিয়া নিকটে বসাইলেন। সম্মুখে এক নবীন সাহিত্যিক বসিয়াছিলেন। তাঁহারাই পার্শ্বে সাহিত্যিক ও শিল্পী বন্ধু সমাসীন। সকলেই আমার সুপরিচিত। কথা প্রসঙ্গে বাংলার নাট্যশালার কথা উঠিল। নবীন সাহিত্যিক বলিলেন—ও দেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিকেরা নাকি নাট্যশালা হইতেই সর্ব্বাধিক অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। আমি অবশ্য একথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। নবীন সাহিত্যিক ও দেশের দু' একজন সাহিত্যিকের নামও করিলেন। কিন্তু ওরকম দু'একজন সাহিত্যিক আমাদের দেশের নাট্যশালা হইতেও কিছু না কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু দু-একটী নজীর দ্বারা সামগ্রিক বিচার চলে না। কথাশিল্পী মাত্রেই যে নাট্যরচনা করিবেন এর যেমন কোন হেতু নাই—তেমনি নাট্যকারমাত্রেই যে কথা-শিল্পী হইবেন এমনতর আশা করাও অন্যায়। নবীন সাহিত্যিকের আলোচনায় প্রকাশ

পাইল, বাংলার নাট্যশালা যাঁহারা চালাইয়া আসিতেছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় অযোগ্য। ৮৬ বৎসরকাল বাংলার নাট্যশালা বাঁচিয়া আছে। অযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারায় এই দীর্ঘকাল যদি তাহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, বাংলা ও বাঙালীর অস্তিত্ব-কাল পর্য্যন্ত ইহা বাঁচিয়া থাকিবে। সাধারণ নাট্যশালার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইহা অনস্বীকার্য্য। ইহার মাধ্যমে বহু পরিবার অন্নসংস্থান করিয়া থাকেন। নাট্যশালার মালিকেরা লাভ ও লোকসানের দুই বোঝাই যেমন বহিয়া বেড়ান তেমনি একথা তাঁহারা কোনদিনই বিস্মৃত হন নাই যে ইহা জমি তৈয়ারীর ক্ষেত্র। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ-চন্দ্র বলিয়াছেন—'না না, ও কাজ ভাল। জমি ভাল করে পাট করলে যা রুইবি তাই ফল্‌বে। 'ঠাকুরের এই কথার পর গিরিশচন্দ্রের পক্ষে নাট্যমঞ্চের সংস্রব ত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। বাংলার নাট্যশালার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই নবীন সাহিত্যিক বুঝিতে পারিবেন দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় কি করিয়াছে। কেবলমাত্র সাময়িক বিচারের দ্বারা ইহাকে দোষ দুষ্ট করিলে চলিবে না।

* * *

গত ২৯শে জানুয়ারী, হাওড়া ইষ্টার্ণ রেলওয়ে রঙ্গ-মঞ্চে ও, আর, সি, এল, রিক্রিয়েশান ক্লাবের উদ্যোগে শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত মীরাবাই নাটক অভিনীত হয়। নাটকটীর প্রতিটী-ভূমিকা সু-অভিনীত হওয়ায় অনুষ্ঠানটী সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। অভিনয়ের প্রারম্ভে সালিখা সঙ্গীত ও নৃত্য বিদ্যালয়ের—শ্রীজয়গোপালের ছাত্রী

কুমারী বন্দনা মিত্র ও কুমারী চন্দনা মিত্র

কুমারী বন্দনা মিত্র ও কুমারী চন্দনা মিত্র রাধাকৃষ্ণ নৃত্যে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেন—ইঁহাদের নৃত্যানুষ্ঠানটী অতীব মনোজ্ঞ ও রসোত্তীর্ণ হইয়াছিল।

ধামেক স্তূপ

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

উষর প্রান্তর বক্ষে দাঁড়াইয়া ম্রিয়মান স্তূপ
অহিংসার মূর্তবাণী প্রচারিছে হিংসার ধরায়।
ডুবেছে গৌরব রবি, তবু শান্ত সমাহিত রূপ
সীমার সীমানা লঙ্ঘি অসীমের পানে আজো ধায়।

শতাব্দীর শোভাযাত্রা অনেক, অনেক বর্ষ আগে
এ স্তূপের পাদমূলে থেমেছে, নেমেছে ধর্মধারা।
সাফল্যের প্রসন্নতা, প্রীতির প্রেরণা অনুরাগে
শ্যামল সম্পদে পূর্ণ করেছিল জীবন-সাহারা।

ভুলেছি ধামেক স্তূপে, ধর্মের মর্মার্থ গেছি ভুলে,
জীবন সন্ধান ছাড়ি জীবিকা সন্ধানে চলি ধেয়ে।
মৈত্রীর মিতালী ক্ষেত্রে গত মহাজনপদধূলি
মাখি অঙ্গে, সোনার ভারত জাগে স্মৃতিপথ বেয়ে।

ধর্ম অনুশাসনের স্মারণিক এ ধামেক স্তূপ,
বোধিসত্ত্ব বাণীবহ, অশোকের কীর্তি অপরূপ।

মেয়েদের কথা
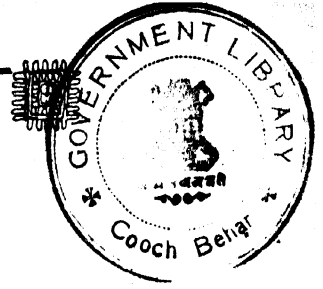
সুখের সংসার

চিত্রাঙ্গদা

"সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে", কথাটি কার রচনা, কবেকার রচনা বলতে পারি না। সেদিন এক বান্ধবীর বাড়ীতে বাঁধানো ফ্রেমে চমৎকার এম্ব্রয়ডারীর গৌরবের মধ্যে তার সাক্ষাৎ পেয়ে ভাবলাম, সত্যিই কি তাই? সত্যি কি শুধু রমণীর গুণে সংসার সুখের হতে পারে? তবে হচ্ছে না কেন? তবে কেন ঘরে ঘরে এত অশান্তি? রমণীরা নিজের গুণে যদি সুখের নীড় রচনা করতে পারে তবে তারা অশান্তি ভোগ করে মরছে কেন? তবে কি তারা নিজেরা শান্তি চায় না—সুখের সংসার তৈরী করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করছে না? না এমন কোন শক্তি আছে যাতে তাদের সুখের ঘর গড়ার সকল আয়োজন নষ্ট করে দিয়ে যাচ্চে—চূরমার করে দিচ্ছে অন্তরের সকল কামনা দিয়ে গড়া শান্তির নীড়।

যদিও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে অনেক সংসারে বধূ অশান্তি সৃষ্টি করে, ভাই-এ ভাই-এ ভেদ সৃষ্টি করে, যার জন্যে শাস্ত্রে তাকে 'দারয়তি-ভ্রাতৃণ' ইতি দ্বারা বলে আখ্যা দিয়েছে। শব্দের পুংত্ব ও বহুবচনত্ব প্রকাশ করেছে তার সংসার-ভাঙার মহাশক্তি। কিন্তু সংসারের অশান্তি সৃষ্টির জন্য রমণী বা বধূরাই মাত্র দায়ী নয়। আরও অনেক শক্তি আছে যাতে করে বধূ বা রমণীর সকল রমণীয়তা সত্ত্বেও তার সকল প্রয়াস সত্ত্বেও সুখের সংসার ভেঙে-চুরে ছারখার হয়ে যায়। সে-শক্তির ক্ষমতা অসীম—সংখ্যা অগণিত। তাদের সঙ্গে একা রমণী পেরে উঠবে সে আশা করা সত্যি বড় বেশী অন্যায় আশা করা নয় কি?

আশা করা অন্যায়। কিন্তু তবু মনের কোণে কোণে বেজে উঠছে একটি রাগিণী 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' রমণীর গুণে সংসার সত্যি সুখের হতে পারে যদি সে-সংসারের প্রতিটি পুরুষ ও নারী সে সুখের সংসার গড়তে সাহায্য করে। একা রমণীর চেষ্টায় সব সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু সকলে যদি একটা আদর্শ পরিবার শান্তির পরিবার গড়ে তুলতে চায়, তবে তা অবশ্যই সম্ভব। সংসারে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, রোগ-শোক-মৃত্যু আছে, অভাব-অনটন দুর্ঘটনা আছে, তবু পরিবারের সকলে যদি চায় তবে শান্তির নীড় রচনা মোটেই অসম্ভব নয়। প্রশ্ন হতে পারে, যদি দুঃখ-কষ্টই রইল, তবে শান্তির নীড় রচিত হবে কিসে, কিসেরই বা সে-শান্তি? শান্তি সে হচ্ছে পরিবারের অভ্যন্তরস্থ শান্তি—যা রোগ-শোক-মৃত্যু-অভাব-অনটনে ভেঙ্গে যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করছি—একটা দুঃস্থ পরিবারের কথা; যেখানে পরিবারের কর্তার উপার্জন বড় সামান্য, কর্তা যা রোজগার করেন, গিন্নী তা দিয়েই সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন, দুঃখের ও দারিদ্র্যের সংগে একজোট হয়ে সংগ্রাম করছেন স্বামী; স্ত্রী ছেলে মেয়ে সব। সংসারটায় কষ্ট আছে বটে, কিন্তু শান্তি নেই বলতে পারেন না। শান্তির চেয়ে বড় সুখ কি আছে?

শান্তির দৃষ্টান্ত যত সহজ, তত সহজ নয় তার সন্ধান পাওয়া। জীবনে সে মৃগতৃষ্ণিকার মতই সে দূরে সরে যাচ্ছে। সংসারে কিছুর অভাব নেই, দুই ভাই রোজগার করছে। দুই ভাই-এর মধ্যে বড় মিল। বিয়ে হয়েছে তাঁদের। বড় ভাই-এর স্ত্রী বড় মিশুক, তার স্বামীর জন্যে যেমন শ্রদ্ধা—দেবরের জন্যে তেমন স্নেহ। কিন্তু তার স্বামী সে-টা সুনজরে দেখতে পারে না, কি রকম একটা ঈর্ষ্যা যেন জেগেছে তার! তেমনি ছোট ভাই-এর স্ত্রীও যেন কেমন বড়জায়ের স্নেহে করছে সন্দেহ। এমনি একটা একটা সংসারে বলতে পারেন শান্তি থাকতে পারে? না থাক্ রোগ-শোক-মৃত্যু, না থাক্ অভাব অনটন, না থাক্ দৈব-দুর্বিপাক-দুর্ঘটনা, কিন্তু তবু শান্তির স্থান সেখানে নেই—সুখের কথা অবাস্তব কল্পনা মাত্র। কিন্তু একক্ষেত্রে

যদি দুই ভাই আর তাদের স্ত্রী আত্ম-সমীক্ষণ করেন, পর্য্যবেক্ষণ করেন পরিবারের অন্যান্যদের ব্যবহার, নির্ধারণ করতে পারেন, তার প্রকৃত তাৎপর্য, মূল্য—তাহলে সন্দেহের বিষে সে-সংসারটা জর্জরিত হতে পারে না ;—যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সকলের চেষ্টায় তাকে বিষমুক্ত করতে পারে, আনন্দ-উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

যদিও শান্তির নীড় রচনায়, সুখের সংসার-সৃষ্টিতে পরিবারের সকলের মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন, তবু যেহেতু রমণী পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ তাঁর চেষ্টায় কি ভাবে সংসার সুখের হতে পারে, সে কথাই এখানে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হবে। তাঁর সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণ যাতে করে রমণীর সুখের সংসার গড়ে উঠতে পারে, আবার ভেঙ্গে যেতে পারে। পরিবারের প্রতিটি মানুষের জীবনবিকাশের জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি মানুষ পেতে পারে আনন্দ, শান্তি, পারিবারিক সুখ তাও আলোচনা করা হবে। সুখী পরিবার শুধু পরিবারস্থ লোকেদের সুখের জন্যই প্রয়োজন নয়,—সারা দেশের সমৃদ্ধি ও সুখের জন্যই প্রয়োজন। কারণ অসুখী পরিবারের সন্তান স্কুলের ভাল ছাত্র হতে পারে না, অসুখী পরিবারের কেরাণী অফিসে ভুল করে, অসুখী পরিবারের মজদুর কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটায়, অসুখী পরিবারের মেয়ে বৌ হয়ে পরের ঘরে গিয়ে সুখের সংসার তৈরী করতে পারে না। একটা অসুখী পরিবার থেকে সারা দেশে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। অতএব আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সুখের সংসার চাই। প্রতি ঘরের নারীকে সে সুখের সংসার রচনা করতে হবে। আজ সবে তার জন্য সংকল্প করুন।

অভিভাবিকার দায়িত্ব

রেখা মুখোপাধ্যায়

পুরুষ অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় দিনের অধিকাংশ সময় বাইরেই কাটায়। নারীর ওপরে আছে সংসারের আহার্য্য প্রস্তুতের আর বিশ্রাম সুখ রচনার ভার। গৃহের চারিধারে সুস্থ, ভদ্র পরিবেশ গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব অনেকটা ব্যাপকভাবে তারই ওপর নির্ভর করে। এ দায়িত্ব নারী হিসাবে আমরা কতটুকু পালন করছি এটাই আমার বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়। নৈতিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যহীনতার বিরুদ্ধে আজ-কাল আমরা পুলিশ ও সরকারকে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করতে দেখ্‌ছি এবং তাঁরা আমাদের বারংবার সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামে সহযোগিতা ক'রতে আহ্বান ক'রছেন। কিন্তু আমরা একথা একবার চিন্তা ক'রে দেখিনা যে আমাদেরই হাতে-গড়া ছেলে-মেয়েরা সমাজের আবর্জ্জনা হ'য়ে সমাজের অগ্রগতির পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে।

ছেলে মেয়েদের সুস্থ সমাজের উপযোগী ক'রে মানুষ করার দায়িত্ব প্রত্যেক মায়েরই আছে। সুস্থ মনোবৃত্তিই সুস্থ সমাজ গ'ড়ে তোলার সহায়ক। কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে সম্প্রতি যে লঘু মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্চে তা বলিষ্ঠ সমাজ গঠনের সহায়ক নয়। সবচেয়ে আক্ষেপের কথা এই যে জাতি গঠনের গুরু-দায়িত্ব যে মেয়েদের হাতে ন্যস্ত তাদের আচার ব্যবহারেও সমাজের ক্ষতিকারক কতকগুলো সমস্যার উদ্ভব হয়েচে। আপাততঃ মেয়েদের কথাই এখানে বক্তব্য। ছেলেদের চাইতেও মেয়েদের মধ্যে বিলাসিতা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ভাবে বেড়ে চলেচে। যাঁরা নিরপেক্ষ বিচার করবেন তাঁরা ব'লতে বাধ্য হবেন যে আধুনিক অল্পবয়স্কা মেয়েরা যে সাজসজ্জা ক'রে পথে ঘাটে বার হন তাতে অনেক সময়ই রুচি, সংযম এবং শালীনতার অভাব থাকে।

সৌন্দর্য্যকে ঘসে মেজে লোকের সামনে দর্শনীয় ক'রে তোলার সযত্ন প্রয়াস তাদের দেহ ঘিরে যে উগ্র বিকৃত রুচির পরিবেশ রচনা করে তা ভারতের মাটির উপযোগী নয়। এর ওপরে আজকাল এই সব মেয়েদের থাকে অতিরিক্ত বাইরে বার হবার ঝোঁক। চোখের সামনে অনেক মা জ্যেঠিমাকে তাঁদের সংসারে অল্পবয়স্কাদের গৃহকর্ম্মে যোগদানের জন্য নিষ্ফল অনুনয় করতে দেখেছি। কিন্তু মেয়েদের তখন অবসর নেই। রবিবারের স্বল্প অবসর আর শনিবারের বিকেলটা—যে সময়টুকু তাদের ইস্কুলের পড়ার বাইরে, তখন তাদের নাচের ইস্কুল আছে, গঠনের মাষ্টার আসরে—জলসা আছে, মজলিস আছে। চারিধারে সূক্ষ্ম কলার আমন্ত্রণ। রান্নাঘরের বঁটি হাতাগুলো মা

মেটে চচ্চড়ি

উপকরণ—মেটে আধ সের, আলু গোটা চার, তেল আধ পোয়া, ফুলকপি পাঁচ-ছয় টুকরা, ধনে, জিরে, হলুদ, লঙ্কা, গোলমরিচ, আদা, পেয়াজ-বাটা পরিমাণ মত, গরম মসলা এবং লবণ ও তেজপাতা পরিমাণ মত, কিছু পেয়াজ-কুচি ও একটা রসুন-কোয়া, একটা আস্ত ডিম।

প্রথমে মেটেগুলি ছোট ছোট করে কেটে নিন্, আলুও ছোট করে কেটে নিন্, তার পর আলু মেটে বেশ করে ধুয়ে নিন্। এখন কড়াই উননে দিয়ে তেল ঢেলে দিন্। পরে তেলে লঙ্কা পেয়াজ রসুন ফোড়ন দিয়ে মেটে, আলু, কপি ছেড়ে দিন। এবার সব মসলা-বাটা, লবণ, তেজপাতা দিয়ে নাড়তে থাকুন। যখন জল মরে যাবে, তখন কিছু তেল দিয়ে নেড়ে-চেড়ে ডিমটা ভেঙ্গে দিন্। এখন জল ঢেলে দিন্, জল পরিমাণ মত দেবেন।

এবার ঢেকে দিন, তারপর অল্প ঝোল থাকতে ঘি গরম মসলা দিন্। ঝোল শুকিয়ে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন। লুচি ও পরটার সঙ্গে খাবার উপযুক্ত। প্রত্যেক ঘরে ঘরে রান্না করে খেতে পারেন।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি. এস্

সাংখ্য ও যোগ দর্শন ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান আবার পৃথক করবার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। তাদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। তারা যেন একই পরিবারের দুটি ভাই ; মিল আছে প্রচুর, অমিল যৎসামান্য।

সাংখ্য ও যোগ দর্শনের কতকগুলি তত্ত্ব সাধারণ ভারতবাসীর চিন্তা-ধারার অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সহিত কে না পরিচিত ? আমাদের প্রাত্যহিক আলাপ আলোচনায় প্রায়ই তাদের ব্যবহার করে থাকি। যোগ ও যোগাভ্যাস নানা আকারে আমাদের মধ্যে প্রচার লাভ করেছে। রাজযোগ, হঠযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি কত যোগের কথা আমরা শুনি। হঠযোগী নানা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম ক'রে আমাদের এখনও চিত্ত বিনোদন করেন। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও যোগের নানা 'আসন' গ্রহণ করতে অনেকে অভ্যস্ত।

উভয় দর্শনেরই দার্শনিক মত অনেকখানি এক। এই যুগ্ম দর্শনের মতে বিশ্বের উপাদান একমাত্র তত্ত্ব নয়, বহু তত্ত্ব। তাদের ভিত্তি হল দুটি মূল ও স্বতন্ত্র বস্তু ; এক দিকে প্রকৃতি ও অন্য দিকে বহু পুরুষ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি ও পুরুষ বিচ্ছিন্ন। দৃশ্যমান বিশ্ব তখন অপ্রকাশ থাকে। সাম্যাবস্থা নষ্ট হলেই প্রকৃতি হতে 'মহৎ'এর উৎপত্তি। এই 'মহৎ' জ্ঞান বা বুদ্ধির সমস্থানীয়। তা হতে 'অহঙ্কার'। এই 'অহঙ্কার'কে ভিত্তি করেই একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। অপর পক্ষ 'পঞ্চতন্মাত্র' হতে 'পঞ্চভূতের' উৎপত্তি। এই পঁচিশটি পদার্থ দিয়ে বিশ্ব গঠিত। তারা বিশ্বের উপাদান। বিশ্বের উপাদান বিশ্লেষণ ক'রে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে বলেই এই দর্শনের নাম 'সাংখ্য দর্শন'।

এই পর্য্যন্ত উভয় দর্শন এক পথে চলেছে। এর উপর যোগ দর্শনে কিছু অতিরিক্ত তত্ত্ব সংযুক্ত হয়েছে। সেই অতিরিক্ত তত্ত্বই তাকে সাংখ্য হতে বিশিষ্ট করে। 'পুরুষের' সহিত 'বুদ্ধির' সাধারণ অবস্থায় সংযোগ হবার ফলেই দৃশ্যমান জগতের অনুভূতি জাগে। পুরুষকে 'বুদ্ধি' হতে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে এই অনুভূতির বিলোপ হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'যোগ'এর ব্যবস্থা। যোগ 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ' ক'রে, দ্রষ্টা বা 'পুরুষকে' 'বুদ্ধি' হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্বরূপে ফিরিয়ে আনে। এই হল 'যোগের' প্রাথমিক কাজ। এই হল যোগ দর্শনের একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব।

সাংখ্য দর্শনের পঁচিশটি পদার্থের সহিত যোগ দর্শনে আর একটি পদার্থ যুক্ত হয়েছেন। এই নিয়ে যোগ দর্শনের পদার্থের সংখ্যা ছাব্বিশ। ইনি হলেন 'ঈশ্বর'। যোগ দর্শনের এই 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে ধারণা বেশ স্বতন্ত্র ধরণের। বহু 'পুরুষের' মধ্যে তিনিও একটি 'পুরুষ'। তবে তিনি বিশিষ্ট। তিনি নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ স্বরূপ। যা ধারণা করা যায় না—এত পরিমাণ জ্ঞান শক্তি তাঁর মধ্যে বর্ত্তমান। তাঁর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ 'পুরুষ' সুখ দুঃখ বোধ, কর্ম্মফল ভোগ প্রভৃতি হতে নিস্তার পায় না। কিন্তু ঈশ্বর এই সকল উপদ্রব হতে মুক্ত। তিনি 'ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈ রপরামৃষ্টঃ'। তিনি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি ক্লেশ হতে মুক্ত, তিনি কর্ম্ম হতে নিবৃত্ত, কর্ম্মফল হতে মুক্ত এবং বাসনা কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট। এই 'ঈশ্বর' দৃশ্যমান জগতের উৎপাদনে কোন কর্ত্তব্য করেন বলে উল্লেখ নাই। তবে 'ঈশ্বর' প্রণিধানের ফলে 'সমাধি' লাভ সহজ হয় এবং তিনি গুরুর গুরু এইরূপ উক্তির উল্লেখ আছে। এই হল যোগ দর্শনের দ্বিতীয় অতিরিক্ত তত্ত্ব।

শ্রীতারকচন্দ্র রায় ইতিপূর্ব্বে দর্শন সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর আজীবন সাধনা ও অনন্য সাধারণ পরিশ্রমের

ফলে বাংলা সাহিত্যের দর্শন শাখা বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছে। তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' একটি বিরাট গ্রন্থ। তাতে প্রাচীনকাল হতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। পরিণত বয়সে নূতন ক'রে তিনি নিজেকে আর এক সুকঠিন কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত করেছেন। সেটি হল বাংলা ভাষায় ভারতীয় দর্শন রচনার কাজ। তিনি দীর্ঘায়ু হয়ে এই কর্ত্তব্য শেষ করুন এই কামনা করি।

পাশ্চাত্য দর্শনের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু ভারতীয় দর্শনের বর্ণনাকে "ইতিহাস" বলিতে সংকুচিত হয়েছেন। তার একটি যুক্তি আছে। তার কারণ উপাদানের অভাব ও তথ্যের অস্পষ্টতা। সেই জন্য নানা দর্শনের, কালের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে উত্থান ও আলোচ্য বস্তুর ভিত্তিতে পরস্পর সম্বন্ধ একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। সেই কারণে যথাসম্ভব ইতিহাসের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও তিনি তাহার গ্রন্থকে ইতিহাস নামে অভিহিত করেন নাই। প্রথম উদ্যমে তিনি সাংখ্য ও যোগ দর্শন সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। পরে অন্য দর্শন আলোচিত হবে। এই গ্রন্থমালার নাম ''ভারতীয় দর্শন' দেওয়া হয়েছে এবং তার অন্তর্ভুক্ত এই বিশেষ গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে 'সাংখ্য ও যোগ'। বইখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশ করেছেন এবং তার মূল্য মাত্র চার টাকা।

দুটি দর্শন আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচনার পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত। দর্শন দুটির উত্থানের কাল, তাদের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী, বস্তুতত্ত্ব (Cosmology) ও জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) সম্বন্ধে তাদের মতবাদ যথাক্রমে আলোচিত হয়েছে। তার পর দর্শন দুটির সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

সমগ্র গ্রন্থ পাঠ ক'রে দেখা যায় দর্শন দুটির মতগুলি গ্রন্থকার অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারেন নি। সেই কারণে সমালোচনা বহুল পরিমাণে প্রতিকূল হয়েছে। তার সঙ্গত কারণও রয়েছে যথেষ্ট। বিচার ক'রে দেখতে গেলে বাস্তবিক দেখা যায় সাংখ্য ও যোগ দর্শনের অনেকগুলি তত্ত্ব ঠিক তর্কশাস্ত্রানুমোদিত নয়। সেই তত্ত্বগুলির পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যেরও একাধিক ক্ষেত্রে অভাব লক্ষিত হয়।

দু একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। সাংখ্য বলেন 'পুরুষের' সন্নিধানে 'প্রকৃতির' সাম্য ভাব নষ্ট হয়ে দৃশ্যমান জগতের জ্ঞান ও তার সম্পর্কিত নানা অনুভূতির উদয় হয়। কিন্তু এ সবই ঘটে—'প্রকৃতির' মধ্যে 'পুরুষ' তার দ্বারা আদৌ স্পৃষ্ট হয় না। তাই যদি হবে তা হলে 'পুরুষের' মধ্যে ভোগের অনুভূতি আসে কেন? তার কোন সংগত ব্যাখ্যা নাই। জ্ঞান, অনুভূতি, সুখদুঃখ বোধ সবই 'প্রকৃতির'। 'পুরুষ' যেন দর্পণ। তাতে 'প্রকৃতির' মধ্যে সংঘটিত এই সব ঘটনা যেন প্রতিবিম্বিত হয়। তাই যেন হল, কিন্তু দর্পণ ত তার মধ্যে যা প্রতিবিম্বিত হয় তাকে নিজের অন্তর্ভুক্ত বলে অনুভব করে না। 'পুরুষ' কিন্তু করে।

যোগ দর্শনে 'ঈশ্বর'কে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে ঠিক ঈশ্বরের মর্য্যাদা দেওয়া হয় নি। তিনি বহু 'পুরুষের' মধ্যে একটি বিশিষ্ট 'পুরুষ' মাত্র। বিশ্ব সৃষ্টির উৎপাদনে তাঁর বিশেষ কর্ত্তব্যও কিছু দেওয়া হয় নি। তিনি একটি অতিরিক্ত পদার্থ। সাংখ্যদর্শনের যে ব্যাখ্যা তাতে তাঁর প্রয়োজন অনুভূতই হয় নি। যোগ দর্শনের ব্যাখ্যায় তাঁকে একটি স্থান দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তা এমন বিশিষ্ট নয়। এ ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নয়।

গ্রন্থকার অতি সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত সমালোচনা করে এই ধরণের নানা অসামঞ্জস্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সম্পর্কে তাঁর সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের তুলনামূলক সমালোচনা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। উপসংহারে তিনি আক্ষেপ করেছেন. "বেদান্তের জ্ঞানময় অব্যক্তের এই প্রথম প্রকাশ অর্ব্বাচীন সাংখ্যে অচেতন বুদ্ধিমাত্রে পরিণত হইয়াছে।"

এই সব দেখে আমার মনে হয় সাংখ্য ও যোগ দর্শনের এই আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেটা হৃদয়ঙ্গম হয় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বস্তুটিকে আলোচনা করলে। এই সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে 'ঈশ্বরবাদ' এর উৎপত্তি কি ক্রমে হয়েছিল তার আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বেদের যুগের মানুষ প্রকৃতির বক্ষে বিরাজমান নানা শক্তির বিকাশের মধ্যে বিভিন্ন দেবতার আবিষ্কার করেছিল। উষা, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সেখানে বিভিন্ন দেবতারূপে নানা সূক্তে পূজিত। ক্রমশ এই নানা দেবতা হতে এক প্রধান দেবতা আবিষ্কার করবার আকুতি একটা চোখে পড়ে। এইভাবে এক অবস্থায় বরুণকে প্রধান দেবতা বলে বরণ করা হয়, কারণ তিনি ধৃতব্রত, তিনি ধর্ম্মস্য গোপ্তা'। ক্রমে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে গিয়ে দেখা যায় এই বিভিন্ন দেবতার পরিবর্ত্তে 'পুরুষ সূক্তে' সর্ব্বব্যাপী এক বিরাট পুরুষকে সমগ্র বিশ্বের আশ্রয়স্থল বলে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি বিশ্বে যা কিছু আছে তাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তার বাহিরে ও বিস্তার ক'রে আছেন। 'স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্'। এইরূপে বহু দেবতাবাদ হতে একেশ্বরবাদ এবং একেশ্বরবাদ হতে সর্ব্বেশ্বরবাদে সংক্রমণের এক ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা পাই।

পরবর্ত্তীকালে উপনিষদের যুগে এই সর্ব্বেশ্বরবাদই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেখানে ঈশ্বরকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়েছে, 'ভূমা' বলা হয়েছে। কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী, সকলকে জুড়ে তাঁর অবস্থিতি। জগতে যা কিছু আছে সবই 'ঈশাবাস্যং'। ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি।' এই সব কিছুই 'ব্রহ্ম' তাতেই তাদের জন্ম, তাতেই তাদের পরিবর্দ্ধন এবং তাতেই তাদের লয়। সকল প্রাচীন উপনিষদগুলি অবলম্বন ক'রে এই প্রধান ভাবধারাই বিরাজমান।

তার পরে হঠাৎ একদিন দেখি ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদে ভারতীয় দর্শন আকৃষ্ট হয়েছে। হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম্মকে যেমন একদিন মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থানচ্যুত ক'রে ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তির পূজায় ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তেমন দেখা যায় বেদান্তের সর্ব্বেশ্বরবাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করেছে ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ। গীতার যুগে তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ হয়ে গিয়েছে। আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী;

এই চার শ্রেণীর উপাসকের মধ্যে গীতা ভক্তকে শ্রেষ্ঠ উপাসক বলে প্রচার করেছেন।

এমন কি বেদান্তের ব্যাখ্যাতে ও এই দুই বিপরীতধর্ম্মী মতবাদের প্রাধান্য দেখা যায়। শঙ্করের ভাষ্য অদ্বৈতের ভিত্তিতে বিভাগহীন একক সর্ব্বেশ্বরবাদ প্রচার করেছে। অপর পক্ষে রামানুজ-ভাষ্য দ্বৈতের ভিত্তিতে একেশ্বরবাদের গলায় বরমাল্য দিয়েছে। শঙ্করের ব্যাখ্যায় কিন্তু একটি মাত্র বিভাগহীন সত্তার দ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। রামানুজের ব্যাখ্যায় বিশ্ব একই শক্তির বিকাশ হলে ও তার মধ্যে বিভাগ আছে, তার মধ্যে ভক্ত ও ভগবান উভয়েরই স্থান আছে।

এখন এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে সাংখ্য ও যোগের যে ব্যাখ্যা তাতে দ্বৈতের ভিত্তিতে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করবার একটা আকুতি আছে, কিন্তু ঈশ্বর নিজ মহিমায় সেখানে পুর্ণরূপে প্রকাশ পান নি। বিশ্বের উৎপাদনের ব্যাখ্যায় বহু উপাদানকে স্বীকার করা হয়েছে, তাদেরই মধ্যে এক কোণে ঈশ্বর যেন অনাদরে পড়ে রয়েছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানা হয়েছে, ঈশ্বরের বিভুত্ব দার্শনিকের মনে তখন ও পরিস্ফুট হয় নি।

এই সব দেখে মনে হয় যেন উপনিষদের সর্ব্বেশ্বরবাদ ও দ্বৈতের ভিত্তিতে পরবর্ত্তীকালের একেশ্বরবাদের ক্রম বিকাশের মধ্যে সাংখ্য ও যোগ দর্শনের অপরিণত 'ঈশ্বর' যেন একটি মধ্যবর্ত্তী অবস্থার নিদর্শন। সর্ব্বেশ্বরবাদ এই অপরিণত ঈশ্বর বাদের মধ্য দিয়েই ভক্তের একেশ্বরবাদে পরিণত হয়েছেন। এই সামগ্রিক দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে দেখলে এই বিভিন্ন অবস্থাগুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতার সূত্র আবিষ্কার করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাংখ্য ও যোগ দর্শনের আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যের একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদের ক্রম-বিকাশের পথে সাংখ্য ও যোগ দর্শন একটি মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। একেশ্বরবাদ এখানে অপরিণত অবস্থায় বর্ত্তমান। তাই এই অসামঞ্জস্য।

ইছামতীর তীর

শ্রীবুদ্ধদেব ঘটক

বকেরা দাঁড়িয়ে ভিজে, হেথা-হোথা চিলের ডানায়
গুঁড়ো-গুঁড়ো সোনা রোদ ঝিকিমিকি জ্বলে,
গাং-শালিখেরা ওড়ে ইতি-উতি বসে দলে দলে
ওপারে হাঁসেরা স্থির গা-ভিজিয়ে পালক ছাড়ায়।
সকালের ছায়া-ছবি ভাসে মনে মনে :
তরুণী গাঁয়ের মেয়ে বাঁশ-বন পার হয়ে এসে
ডুবিয়ে কোমল বুক নদী জলে ছায়া ভালোবেসে
কী আরামে চোখ বুঁজে স্বপ্ন-জাল বোনে।
কতো জনপদ বধূ গ্রাম আর সবুজ প্রান্তর
সারাটা সকাল জুড়ে কর্মব্যস্ত চাষী
বীজ বোনে মাঠে মাঠে শস্য অভিলাষী
মধুর ফসলে স্বপ্নে কাটে কতো দিনের প্রহর।
টুকরো স্মৃতির মতো সারি সারি কতো জলছবি
জড়ায় ছড়ায় মনে এক সাথে ভাসে,
সকালের রৌদ্ররূপে জলীয় বাতাসে
এক বুক সোঁদা গন্ধে ভরে প্রাণ-ফুলের সুরভি।

সুভাষচন্দ্র এখনও জীবিত—

গত ৩রা এপ্রিল মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্য ও নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সহ-সভাপতি শ্রীমুথুরামালিঙ্গম থেবর মাদ্রাজে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ প্রচারের ৫ বৎসর পরে ১৯৫০ সালে তিনি চীনে সুভাষচন্দ্রের সহিত ৯ মাস কাল একত্র বাস করিয়াছেন। নেতাজী এখনও জীবিত ও তিনি চীনেই অবস্থান করিতেছেন। তিনি বলেন—গত ফেব্রুয়ারী মাসেও তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নূতন করিয়া সংযোগ স্থাপন করেন ও তাহার পর হইতে সে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। আসামের সীমান্তবর্তী চীনের সিক্কিয়াং প্রদেশে এসিয়াবাসীর মুক্তি সংস্থা নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে—সুভাষচন্দ্র তাহার অধ্যক্ষ। চীন সরকার উক্ত সংস্থার সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। শ্রীথেবর এই সকল কথা বলার পরও নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ভারতসরকার কর্তৃক গঠিত শা নাওয়াজ কমিটী কাজ করিতেছেন। সা নাওয়াজ ছাড়াও নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু ও আন্দামানের শাসক শ্রীশঙ্করনাথ মৈত্র ঐ কমিটীর সদস্য। দেখা যাউক—কমিটী যদি সুভাষচন্দ্রকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন। সমগ্র দেশ আজ নেতাজীর আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা হউক, ইহাই একান্ত মনে প্রার্থনা করি।

সহস্র বৎসর ব্যাপী নাম কীর্ত্তন—

বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া সহরের নিকটস্থ শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী সেবিত মাধাইতলা আশ্রমে গত ১৩৫৮ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ হইতে সহস্র বৎসর ব্যাপী ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীনিতাইচরণ দাস বর্তমানে উক্ত মাধাইতলা আশ্রমের পরিচালক। এক হাজার বৎসর ব্যাপী অখণ্ড নামকীর্ত্তনের সংকল্প লইয়া তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার বর্তমানে পঞ্চমবর্ষ চলিতেছে। গঙ্গা হইতে অনতিদূরে সহরের প্রান্তে বিরাট ভূখণ্ডের উপর ঐ মাধাইতলা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। প্রকাশ ঐ স্থান মহাপ্রভু-সহচর জগাই—মাধাইএর সাধনা স্থান ছিল। তথায় বহুসংখ্যক গৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং অধ্যক্ষের অধীনে প্রায় ৫০ জন সেবক তথায় বাস করিয়া অখণ্ড নামকীর্তন যজ্ঞ পরিচালন করিতেছেন। ঐ আশ্রমে সম্প্রতি একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি সংস্কৃত শিক্ষা-কেন্দ্র খোলার আয়োজন করা হইয়াছে। আশ্রমের বিশেষ কোন আয় নাই—একখণ্ড ধান্যক্ষেত্র এবং একটি সবজিবাগান তাঁহাদের সম্বল। বাকী সমস্ত ব্যয় ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। বর্তমান নাস্তিকতার যুগে যাহারা সহস্র বর্ষ ব্যাপী নাম-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, দেশের ভক্ত সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই তাঁহাদের সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। ঐ সঙ্গে তথায় ক্রমে বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। নদীয়া জেলার নবদ্বীপে ও মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে যেমন সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, স্থানীয় অধিবাসীরা উদ্যোগী হইলে কাটোয়া মাধাইতলায়ও সেইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে। বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র কাটোয়া দেশবাসীর উপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে দেশবাসী তদ্দারা অবশ্যই উপকৃত হইবে।

নিখিল ভারত গো-কল্যাণ সম্মিলন—

গত ১৬ই চৈত্র হইতে তিনদিন কলিকাতা দমদম ক্যান্টনমেণ্টে কুমারপাড়া রোডস্থ কৃষি-গোপালন-শিক্ষা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে নিখিল ভারত-গো-কল্যাণ সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রী ডাক্তার আর আমেদ উদ্বোধন করেন এবং শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ প্রধান অতিথি ও শ্রীদেবকীনন্দন জালান সভাপতি হইয়া কৃষি ও গোপালন সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিনে অধ্যাপক ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ও তৃতীয় দিনে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালান সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। বর্তমানে সকল দেশবাসী যাহাতে কৃষি দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও গোপালন দ্বারা দুগ্ধ উৎপাদনে সচেষ্ট হন সে জন্য সম্মেলনে বিবিধ প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রত্যেক দেশবাসী এ বিষয়ে অবহিত না হইলে দেশের খাদ্যাভাব ও দুগ্ধের অভাব দূর করা সম্ভব হইবে না। আমরা সম্মিলনের উদ্যোক্তাদিগের সাফল্য কামনা করি।—

নাগা বিদ্রোহ দমন চেষ্টা—

উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল ও আসামে নাগা বিদ্রোহীদের অত্যাচারে সকল শান্তিপ্রিয় মানুষ বিপন্ন হইয়াছেন। ভারতসরকার নাগা-বিদ্রোহ দমনের জন্য ও বিদ্রোহী নাগাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য উপদ্রুত নাগা পাহাড় অঞ্চলে একটি সামরিক ক্ষমতা-সম্পন্ন প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। আসাম রাজ্যের পুলিস ও আসাম রাইফেল বাহিনী ঐ কেন্দ্রের অধীন হইবে। নূতন কেন্দ্রের অধিনায়ক হইবেন—মেজর জেনারেল কোচার। ইস্টার্ণ কমাণ্ডের জি-ও-সি লেঃ জেনারেল শান্ত সিং ঐ বিষয়ে সকল ব্যবস্থা করিবার জন্য শিলং গিয়াছিলেন ও ১লা এপ্রিল তাঁহার কর্মকেন্দ্র লক্ষ্ণৌয়ে ফিরিয়া গিয়াছেন। নূতন কেন্দ্র হইতে নূতন অধিনায়কের পরিচালনায় অবশ্যই নাগা-বিদ্রোহ দমন সম্ভবপর হইবে।

প্রধানমন্ত্রীর বস্তি পরিদর্শন—

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু গত ১লা এপ্রিল দিল্লীর কয়েকটি বস্তি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ভারত সেবক সমাজ এই পরিদর্শনের

ব্যবস্থা করেন ও শ্রীনেহরু দুই ঘণ্টাকাল বস্তির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। খোলা নর্দমার পাশ দিয়া সরু গলি পথে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে। শ্রীনেহরু বলিয়াছেন—ঐ সকল বস্তি ভাঙ্গিয়া মাঠে পরিণত করা প্রয়োজন এবং বস্তি বাসীদের জন্য উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। শুধু দিল্লীর মত সহরে নহে, ভারতের সর্বত্র ঐরূপ বাসের অযোগ্য স্থানে বহু দরিদ্র লোককে বাস করিতে হয়। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি সকলের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করিবেন ?

উদ্বাস্তু-সমস্যা ও যুদ্ধকালীন জরুরী—

পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্দ্ধমান ও উৎকট উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় দিল্লী গিয়াছিলেন—৫ই এপ্রিল কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি জানাইয়াছেন—তিনি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ ও কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহের চাঁদ খান্নার সহিত আলোচনা করিয়াছেন সকলে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যাকে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থারূপে গণ্য করার প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন। পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার শীঘ্রই কলিকাতার আসিবেন। ফলে উদ্বাস্তুদের অল্প সময়ের মধ্যে গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য কাজের জন্য অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা সম্ভবপর হইবে। গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত পূর্বাঞ্চলে মোট ৩৮ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমন করিয়াছে, তাহার মধ্যে ৩১ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। ১৯৫৪ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত যে ২৮ লক্ষ উদ্বাস্তু আসিয়াছে, তন্মধ্যে ১৯ লক্ষ পুনর্বাসন লাভ করিয়াছে। সে জন্য সরকারের ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থারূপে গণ্য করিয়া উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা দেখিবার জন্য সকলে সাগ্রহে অপেক্ষা করিবে।

চতুর্থ ইস্পাত কারখানা—

৫ই এপ্রিল উৎপাদন মন্ত্রী শ্রীকে-সি-রেড্ডি লোকসভায় জানাইয়াছেন যে চতুর্থ ইস্পাত কারখানা বিহারের বোকারোতে স্থাপিত হইবে। দামোদর পরিকল্পনার অধীনে বোকারোতে বৃহৎ বিদ্যুৎ-উৎপাদন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারী বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম উৎপাদন কারখানা ভুপালে স্থাপিত হইবে। অনুন্নত অঞ্চলের উন্নতির জন্য ভুপালে এই কারখানার স্থান নির্বাচিত হইয়াছে। রাউরকেল্লা, নাঙ্গাল ও নেইভেলীতে তিনটি নূতন সার-উৎপাদন কারখানা স্থাপিত হইবে। বোকারো অঞ্চলে প্রচুর সুলভ বিদ্যুৎ, জল, কয়লা, প্রভৃতি পাওয়া যাইবে। ঐ স্থান জনবিরল—কারখানা হইলে তথায় বহু লোক বাস করিতে সমর্থ হইবে।

নূতন এলুমিনিয়াম কারখানা—

কেন্দ্রের শিল্প-মন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো ৫ই এপ্রিল লোকসভায় জানাইয়াছেন—হীরাকুঁদ বাঁধ পরিকল্পনা অঞ্চলে বার্ষিক ১০ হাজার টন এলুমিনিয়াম উৎপাদনক্ষম একটি কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ভারত ও কানাডার যুক্ত চেষ্টায় ঐ কারখানা চলিবে। ১৯৫৭ সালের উহার উৎপাদন আরম্ভ হইবে।

সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা—

কলিকাতা সহরে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য কোন স্বতন্ত্র হাসপাতাল ছিল না। সম্প্রতি বেলিয়াঘাটায় ৪ তলা দুইটি ব্লক নির্মিত হইয়াছে, তথায় শুধু সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগকে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইবে। ঐ হাসপাতালে ৬৫০টি শয্যা থাকিবে। ঐরূপ আরও দুইটি ব্লক তথায় নির্মাণ করা হইবে—সেখানে কলেরা ও বসন্ত ছাড়া অন্য সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিবে। উহার একটিতে পেইং ও অপরটিতে জেনারেল ওয়ার্ড হইবে। যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ রোগীকে ঐ হাসপাতালে লওয়া হইবে না। কলিকাতায় এই ধরণের হাসপাতাল এই প্রথম হইল। রোগীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, যতই হাসপাতাল খোলা হউক না কেন রোগীর স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। কি করিয়া রোগীর সংখ্যা কমানো যায়, এখন সকলকে সে চিন্তাও করিতে হইবে।

নদীয়া জেলায় আক্রমণ—

নদীয়া জেলার তেহট্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে গত ৩১শে মার্চ শনিবার পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকার নাটুয়া গ্রাম হইতে পাকিস্তানীরা তিনজন রাখাল ও শতাধিক গরাবি পশু ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি খালে মাছধরা লইয়া বচসার ফলে এই ঘটনা হইয়াছে। এই ভাবে ভারতীয় এলাকার সর্বত্র পাকিস্তানীরা সুবিধা পাইলেই হানা দিয়া থাকে। পাকিস্তান সীমান্তে তাহারা সর্বত্র সৈন্য-সমাবেশ করিতেছে। ইহার প্রতীকারের উপায় নির্ধারণ করিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করি।

তেজস্ক্রিয় কুণ্ডের জল—

বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরে কতকগুলি কুণ্ডের জল গরম। ঐ জল তেজস্ক্রিয় গুণ সমন্বিত কি না সে বিষয়ে গবেষণা করা হইতেছে। ঐ জলে স্নান করিলে বাত, চর্মরোগ ও অন্যান্য বহু রোগ সারিয়া যায়। প্রাথমিক অনুসন্ধানের ফলে জল সম্পর্কে উৎসাহজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ জল চিকিৎসার জন্য ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। বক্রেশ্বর ছাড়াও বীরভূমে বহু স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বৈজ্ঞানিক যুগে সেগুলিকে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

মুরাডীতে বসন্তোৎসব—

গত ২৭শে মার্চ মানভূম জেলার মুরাড়ি রেল ষ্টেশনের নিকট পঞ্চকোট পাহাড়ের নীচে কৃষ্ণপুর গ্রামে স্থানীয় শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা সংঘের উদ্যোগে এক বাগান বাড়ীতে বৃক্ষতলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তথায় সভাপতিত্ব করেন এবং বার্ণপুরের শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সমাজ সেবক কর্মী স্বর্গত ডাক্তার উমাপদ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-কথা তথায় আলোচিত হয় এবং সংঘের সম্পাদক শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে কি ভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাধনা চলিতেছে, তাহার বিবরণ পাঠ করেন। অতি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে এই ভাবে সভার অধিবেশন—উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্য। ঐ স্থান যে বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালীর অধ্যুষিত তাহার পরিচয় পাইয়া উপস্থিত সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

যজ্ঞেশ্বর

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

তখনও আমাদের দেশে দ্বিতীয় মহাসমরের পদধ্বনি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বড়দিনের বন্ধে গ্রামে এসেছি। কয়েক-দিন আগে সপরিবারে এসেছেন উপেন মল্লিক মশাই। মল্লিক মশাই অতিদূর সম্পর্কে আমার কাকা। কলিকাতা হাইকোর্টের নামকরা ব্যারিস্টার। দীর্ঘকাল দেশ ছাড়া হলেও কৃতী সন্তান হিসাবে এ অঞ্চলে সুপরিচিত। বিলাত-ফেরত ব'লে অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা তাঁকে বলে 'সাহেববাবু'। বহুদিন পরে সাহেববাবুর আকস্মিক আগমনে গ্রামের লোক যেমন হয়েছে বিস্মিত, তেমনি হয়েছে আনন্দিত।

বছরের প্রথমদিকে উপেনকাকার সাংঘাতিক অসুখ করে। কলিকাতার চিকিৎসকরাও তেমন ফল দেখাতে পারেন না। তিনি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমন সময় একদিন তাঁর মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন—"উপেন, ভাবিসনে। আমাদের কাঞ্চনপুরের কালীতলায় পূজা মানত কর। অসুখ সেরে যাবে।" মানসিক ক'রে সুস্থ হয়েছেন উপেনকাকা। তাই এসেছেন সাধ মিটিয়ে পীঠ-স্থানে পূজা দিতে।

বেশ লাগে গ্রামের উৎসবময় আবহাওয়া। আরও ভালো লাগে শীতের দিনের প্রাকৃতিক পরিবেশ। আপন-ভোলা আঁকা-বাঁকা পায়ে চলার পথ। পরিপূর্ণ সরষে-ক্ষেতে হরিতের ঢেউ। আত্মত্যাগী খেজুর গাছে রসের কলস। দূর দিগন্তে উদার আকাশের চরণ ছুঁয়ে পৃথিবীর প্রেম নিবেদনের ছবি।

ডাঙাপাড়ার বিলের ধারে বেড়িয়ে ফিরছি। মুচিপাড়ার তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে আছে যজ্ঞেশ্বর। আমাকে দেখে বলে—দাদাবাবু, পেন্নাম হই। ক'বছর আসেন নি যে?

—নানা কাজ। ইচ্ছা সত্ত্বেও আসতে পারিনি। তুমি কেমন আছ? খবর সব ভালো?

—আর চালাতে পারছিনে দাদাবাবু। আমাকে এখন গেরোয় ধরেছে।

যজ্ঞেশ্বরের কণ্ঠে হতাশার সুর। বলি—সে কি কথা, তোমার মতো বাজনদারের সংসার চলেনা!

—কি ক'রে চলবে? মল্লিকবাবুরা গাঁয়ের বাস তুলে দিয়েছেন অনেককাল। আপনারাও প্রায় তাই। গাঁয়ে পূজোর পাট একরকম উঠে গিয়েছে। আগে কত তিন গাঁয়ের লোক এসে কালীতলায় পূজো দিত। এখন কেউ আসেনা। ঠাকুর দেবতার ওপর লোকের আর তেমন বিশ্বাস নেই। ঢাক বাজানো আমার জাত ব্যবসা। তার থেকে রোজগার একদম বন্ধ! মদনডাঙা নিচিনপুরের মুচির ছেলেরা গোয়াড়িতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজোয় ও ৺সরস্বতী পূজোয় বাজিয়ে চার পাঁচ মাসের খোরাকির ব্যবস্থা করে। আমার রক্তের জোর কমে গিয়েছে; আমি কি ওদের মতো পারি? ভাগে কিছু জমি করি, তাতে কোন রকমে ছ' মাসের পেটের ভাত হয়। বয়েস হয়েছে, বেশী খাটুনি কি পোষায়?

—তোমার বয়েস কত হ'ল?

—আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারিনে। যে বছর পশ্চিম পাড়ার বাঁড়ুজ্যে মশাই পাঁজায় আগুন দিয়েছিলেন সেই বছর আমি মায়ের দুধ ছেড়ে তামাক ধরেছিলাম। সে কি আজকের কথা! প্রায় তিন কুড়ি বছর হবে।

নিরক্ষর যজ্ঞেশ্বরের সরলতায় হাসি পায়। বলি—এবার তোমাদের সাহেববাবুর পূজোয় ভারি ধুম। মোটা বকশিশ মিলবে, ভাবনা কি?

যজ্ঞেশ্বর কোন কথা বলেনা। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ইঁটখোলার মাঠে শেয়াল ডাকে। গাছের ডালে ডালে রাতের বাসা নিয়ে পাখিরা ঝগড়া বাধায়। চলতে শুরু করেছি, এমন সময় যজ্ঞেশ্বর সংকুচিতভাবে

পিছু ডাকে—দাদাবাবু, কাল সকালে আপনার দর্শন পাবো কি ?

—হ্যাঁ, এসো।

আমাদের ছেলেবেলায় যজ্ঞেশ্বর মুচির খুব নাম ডাক ছিল। তার ঢাকের কী বাহার! সামনের চামড়ার ঘিয়ে রং, পিছনের সাদা চামড়ায় চকচকে গাব, সারা দেহ সালু দিয়ে মোড়া, তার ওপর দুলছে বিচিত্র বর্ণের পাখির পালকের গুচ্ছ। ঢাকের শুধু রূপই ছিলনা, গুণও ছিল। মাথায় ন্যাকড়া-জড়ানো দুটী সরের কাঠির সাহায্যে কত রকম আওয়াজই না বার করত যজ্ঞেশ্বর! বড় কাঠির সংগে ছোট কাঠির কি অপূর্ব সহযোগিতা! তারা যেন রাম লক্ষ্মণ। আগমনীর বাজনা, আরতির বাজনা, বিসর্জনের বাজনা মুগ্ধ করত সকলকে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, হাসিমাখা মুখ, স্বপ্নভরা চোখ। যখন যজ্ঞেশ্বর আপন সুরে আপনি মেতে বাজিয়ে যেত একটানা তখন অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকতাম তার দিকে। মনে হ'ত সে বাদ্যকর নয়, যাদুকর। সূক্ষ্ম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা কি ভাবেন বলতে পারিনে, কিন্তু আমার শিশুমনের মধ্যে পূর্ণযৌবন যজ্ঞেশ্বরের ঢাকের বাজনা যে ইন্দ্রজাল রচনা করেছিল তা আজও মুছে যায়নি। শৈশবের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ হলেও অতুলনীয় নয় কি ?

বেলা আন্দাজ সাতটা। রোয়াকে শীতের রোদে চা খাচ্ছি। যজ্ঞেশ্বর এসে হাজির। বার্ধক্যের ছায়া নেমেছে চেহারায়। অত্যন্ত মনমরা ভাব। কাছে এসে কুণ্ঠার সংগে বলে—শুনছি সাহেববাবু দাদুপুর মদনডাঙা নিচিনপুর আর কোন কোন গাঁ থেকে এগারজন ঢাকী আনছেন ৺মায়ের পুজোয়। আমাদের গাঁয়ে ঢাকীর অভাব। সব মরে হেজে গিয়েছে। যুধিষ্ঠিরের ছেলে ছোট। কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি। আমার কি অপরাধ যে বাজাবনা ?

—গাঁয়ের পুজোয় তুমি বাজাবেনা! তাই কখনও হতে পারে! তুমি ভুল শুনেছ যজ্ঞেশ্বর।

—না দাদাবাবু। গাঁয়ের লোক সাহেববাবুর কান ভাঙিয়েছে—আমি বুড়ো হয়েছি, আমার বাজনা আর তেমন সরেস হয়না, আরও কত কি।

—বলো কি, গাঁয়ের মানুষগুলো কি সব ভূত হয়ে গিয়েছে? এযে অসম্ভব। তুমি বাড়ি যাও যজ্ঞেশ্বর। দেখি আমি কি করতে পারি।

যজ্ঞেশ্বরের চোখে জল। খুবই স্বাভাবিক। প্রেমের অপমানের পর প্রতিভার অপমানই বোধ হয় বুকে বাজে সব চেয়ে বেশী। যজ্ঞেশ্বর ছিল আদর্শবাদী মানুষ। গ্রামবাসীর পূজার মজুরী চাইত না। যে যা বকশিস দিত তাই হাত পেতে নিত। রোজগারের দিকে লক্ষ্য ছিল না। বাজনার তারিফ করলেই সে আহ্লাদে আটখানা। যজ্ঞেশ্বর নিঃসন্তান। পরিবার বলতে স্ত্রী দামিনী আর বিধবা বোন মাতঙ্গিনী। সংসার চালিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত হলে খরচ করত ঢাকের সাজ-সজ্জায়। আর হাতে কাজ না থাকলে উঠনে কলকেফুলের গাছের নিচে পিঁড়ির ওপর বসে ঢাক বাজাত। বার মাস তার বাজনা শুনে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক ভাবত কাঞ্চনপুরে নিত্য পূজা হয়। নীরব সাধক আর কা'কে বলে ?

সন্ধ্যার দিকে উপেন কাকার বৈঠকখানায় যাই। তখন পুরোহিত দ্বারিকানাথ ও গ্রামের মাতব্বরেরা পূজার কথাবার্তা শেষ ক'রে বাড়ি ফিরছেন। কাকাবাবুকে প্রণাম ক'রে বলি—আপনার কাছে অভিযোগ নিয়ে এসেছি।

উপেন কাকা দিলদরিয়া মানুষ। স্মিত মুখে বলেন—তোমার আবার অভিযোগ কি হে ? এটা তো হাইকোর্ট নয়, আর আমার 'গাউন'ও ছেড়ে রেখে এসেছি কলকাতায়।

—কাকাবাবু, আমাদের পল্লী-সমাজ ভেঙে পড়েছে। পদে পদে অবিচার। এখানে বিরামবিহীন বিচারের আয়োজন আছে বললে অত্যুক্তি হয় না। যাক, আসল কথাটা বলি। আপনার পুজোয় ভিন গাঁ থেকে এগার জন ঢাকী আসছে ; তাদের বায়না হয়েছে কি ?

—না, কাল হবে। কেন বল তো ?

—আমাদের গাঁয়ের যজ্ঞেশ্বর বাজাবে না ?

—তা তো জানিনে। মুখুজ্যে মশাই বললেন এ গাঁয়ে তেমন ঢাকী নেই। এক বুড়ো আছে, তাকে দিয়ে কাজ চলবে না। তিনি অন্য জায়গা থেকে বাছাইকরা ঢাকী আনবার ব্যবস্থা করছেন। আর কিছু নয়, তোমার কাকীমার ইচ্ছা পুজোটা নিখুঁতভাবে হয়।

—শুনুন কাকাবাবু, আপনি এ তল্লাটের খবর রাখেন না। আমি বার বছর বয়েস পর্যন্ত গাঁয়ে কাটিয়েছি। এখন গাঁয়ে বাস না করলেও যোগাযোগ রাখি। আমার মতে যজ্ঞেশ্বরের মতো ঢাকী এ মুলুকে হয়নি, হবেও না। সত্যিকারের শিল্পী। খোশামোদ করতে পারে না ব'লেই বোধ হয় গাঁয়ের বর্তমান কর্তারা ওকে আমল দিতে চায় না। যজ্ঞেশ্বর না বাজালে গাঁয়ের মাথা হেঁট হবে, আপনার অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

—তোমার পরামর্শ দিতে হবে বই কি। আমি তো বাইরের লোকের শামিল।

—আমার একটা প্রস্তাব আছে। ভিন গাঁয়ের দশ জন সেরা ঢাকী আসুক আপনার বাড়িতে। তাদের সংগে যজ্ঞেশ্বরও বাজাক। মুখুজ্যে মশায়কে বলুন কাল সন্ধ্যায় মহড়ার আয়োজন করতে। তাতে যজ্ঞেশ্বর অযোগ্য বিবেচিত হলে আর একজনকে নেবেন। মরা হাতী লাখ টাকা। আমি 'চ্যালেঞ্জ' করছি কেউ দাঁড়াতে পারবে না যজ্ঞেশ্বরের কাছে।

—চমৎকার প্রস্তাব॥ গাঁয়ের পুরনো লোককে 'চান্স' দেওয়া উচিত। তাছাড়া আমিও দেহাতী বাজনার 'স্টাণ্ডার্ড'টা বুঝতে পারব। কলকাতায় তালতলার ৺কালী পুজোয় একশ এক ঢাকের বাজনা শুনেছি। বেশ উঁচুদরের বাজনা।

সে-দিনের স্মৃতি আজও আমার কাছে রমণীয়। মল্লিক বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। বারান্দায় গ্রামের নেতারা, সিঁড়ির ওপর পাশাপাশি উপেন কাকা ও আমি। শান্ত সন্ধ্যা। নক্ষত্র-খচিত আকাশের নিচে যেন প্রকৃতির আসর রচনা। এগার জন ঢাকী উপস্থিত। তারা প্রত্যেকে দশ মিনিট বাজাবে। কয়েক মিনিট পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি। প্রথম ওঠে দাদুপুরের দশরথ মুচি। সে থামলে আর ন'জন ওঠে। বাজনা কতকটা এক ধাঁচের—আসর জমানো ও ঢেউ-খেলানো। হাতের কাজে দক্ষতার পরিচয় মেলে। কিন্তু সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাজায়। বাজনায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না—উপেন কাকার ভাষায় 'স্ট্যাটিক'।

উপেক্ষিত যজ্ঞেশ্বর এতক্ষণ একধারে বসে চুপ ক'রে বাজনা শুনছিল। এইবার তার পালা। ঢাক কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। পরণে আটহাতী ধুতি হাঁটুর ওপর মালকোঁচামারা, গায়ে ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথায় রং-ওঠা গামছা জড়ানো। প্রথমে চড় বড় ক'রে বাজিয়ে সমস্ত চত্বরটা চক্রাকারে পরিক্রমা ক'রে আসে। তার পর কেন্দ্রস্থলে গিয়ে মিনিটখানেক জিরিয়ে নেয়। তার পর আস্তে আস্তে বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে পা পা ক'রে এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। সামনে এসে বাঁ-পায়ে ভর দিয়ে ডান পা তুলে কুঁজো হয়ে বড় কাঠিটি ঠেকায় উপেন কাকার পায়ে। প্রস্তাবনা—প্রণাম—পালা। কেন্দ্রস্থলে ফিরে যায় যজ্ঞেশ্বর। এক একটি ছড়া কাটে আর তার ছন্দটি ফুটিয়ে তোলে বাজনার মধ্য দিয়ে। অদ্ভুত ব্যাপার।

* * * *

বল ভাই নিতাই নিতাই

* * * *

বম বম ভোলানাথ,
অগ্রদ্বীপের গুপীনাথ।

* * * *

চিংড়ি মাছের খোসা,
দাদা, বউ ক'রেছে গোসা।

* * * *

কচু গাছে ধরল লিচু,
বেলগাছে বকুল।
অনেক দিনের টেকো মাথায়
আজ বুঝি গজাল চুল॥

* * * *

হাতঘড়িটা দেখি। দশ মিনিট অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। সেদিকে খেয়াল নেই কারও। নির্বাক বিস্ময়ে শুনছে সবাই। বোল বন্ধ হয়। শুরু হয় মিহি মাঝারি চড়া বাজনা, একতলা দোতলা তেতলা। কী বিচিত্র শব্দতরঙ্গ! সারা উঠন জুড়ে, চারিদিক ঘুরে ঘুরে, নাচের ফাঁকে ফাঁকে পা বদল ক'রে অবিরাম বাজিয়ে চলে যজ্ঞেশ্বর। যেন অলৌকিক কায়কল্পে যৌবন ফিরে পেয়েছে সে। কুহকী চন্দ্রালোকে তাই তো মনে হয়। সেই দিঘল দেহ, সেই স্মিত আনন, সেই উদাস চাহনি!

আমাদের দিকে আবার এগিয়ে আসে যজ্ঞেশ্বর। সামনে হাঁটু গাড়তেই ঢাকের পালকগুচ্ছ স্পর্শ করে উপেনকাকার পা। শেষ প্রণাম ক'রে সেইখানেই বসে পড়ে সে। টস টস ক'রে ঘাম ঝরছে, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে, ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে। বুড়ো বয়সে এত পরিশ্রম কি সহ্য হয়? আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগলে মানুষ বুঝি এমনি মরিয়া হয়ে ওঠে।

প্রকৃত গুণীরা চিৎকার করেন—শাবাশ, শাবাশ।

মুখুজ্যে মশাই মাথা চুলকে বলেন—যগে'র এই বয়সে যে এতখানি ক্ষমতা আছে তা ভাবতেও পারিনি।

যজ্ঞেশ্বরের মাথায় হাত রেখে উপেনকাকা বলেন—অতি সুন্দর বাজিয়েছ যজ্ঞেশ্বর। ঢাকের এমন বাজনা কোথাও শুনেছি ব'লে মনে পড়েনা। বড় ক্লান্ত হয়েছ, বিশ্রাম কর।

আমাকে বলেন—এ হ'ল আসল 'ডাইনামিক' বাজনা, একটা 'অ্যাটমস্‌ফিয়ার' সৃষ্টি করে। যজ্ঞেশ্বর শুধু বাদক নয়, কবি।

মুখুজ্যে মশাইকে কাছে ডেকে কানে কানে বলেন—ভিন গাঁয়ের ঢাকীদের পাঁচ টাকা ক'রে বকশিশ দিয়ে বিদায় করুন। আমার পূজোর জন্য যজ্ঞেশ্বরই যথেষ্ট।

গ্রামান্তরের ঢাকীরা খুশী হয়ে চলে যায় যজ্ঞেশ্বরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। প্রহ্লাদ কবিরাজের বয়েস আশির ওপর। ভারি রসিক। বলেন—দেখ উপেন্দর, কথায় বলে 'ঢাকের দায়ে মনসা বিকানো'। প্রবাদ যখন রয়েছে তখন একাজ করেছিল নিশ্চয় কেউ কোন কালে। যজ্ঞেশ্বরের মতো ঢাকী পেলে অসম্ভব কি?

উপেনকাকা বলেন—যজ্ঞেশ্বর, আমার পুজোয় এগার ঢাকের প্রয়োজন নেই। একা তুমি বাজাবে। তোমার বাজনা যেমন কানে মিষ্টি লাগে তেমনি প্রাণে ভাব লাগায়। এতে কেবল আমি খুশী হবনা, ৺মা কালীও খুশী হবেন।

করযোড়ে উঠে দাঁড়ায় যজ্ঞেশ্বর। তার মুখে পরম পরিতৃপ্তির হাসি। তার অবজ্ঞাত মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় যজ্ঞেশ্বরের সংগে দেখা। সে আমার জন্য নির্জনে অপেক্ষা করেছিল। আমার হাত চেপে ধ'রে বলে—দাদাবাবু, আপনি আমার ইজ্জত বাঁচিয়েছেন। ভগবান আপনাকে দশজনের একজন করুন।

অভিভূত যজ্ঞেশ্বর আর কিছু বলতে পারে না। কিছুক্ষণ আগে তার মুখে যে সফলতার হাসি ফুটে উঠেছিল সেটা কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে রূপান্তরিত হয়ে আমার হাতের ওপর গড়িয়ে পড়ে। কাঠ-ঠোকরা-ডাকা রাতে কাত্তু-ঠাকরুণের কাঁঠালতলায় যজ্ঞেশ্বরের সংগে সেই আমার শেষ সাক্ষাৎ। পরদিন জরুরী তার পেয়ে হঠাৎ আমাকে কলকাতা রওনা হতে হয়। উপেনকাকার ৺কালী পূজায় উপস্থিত থাকতে পারেনি।

যজ্ঞেশ্বরের আশীর্বাদে দশজনের একজন হতে পেরেছি ব'লে মনে হয় না। তবে তার মতো ইজ্জত বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করেছি জীবনের ধূলি-ধূসর পথে। বদলির চাকরিতে ঢুকে ঘুরতে হয়েছে এখানে সেখানে। দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক জীবনে বিস্তর বিপ্লব ঘটেছে। গ্রামের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে একেবারে।

স্বাধীন দেশের নূতন পরিবেশ। কৃষ্ণনগর কলেজ হলে সাড়ম্বরে ৺সরস্বতী পূজা। সন্ধ্যার সময় আরতি দেখতে এসেছি। হলের একপাশে ঢাকের সারি। একটি ঢাক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দূর থেকেই। কাছে গিয়ে চমকে উঠি। এ যে যজ্ঞেশ্বরের ঢাক! শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত অতি-পরিচিত জিনিস। ভুল হবার কথা নয়। ভিড়ের ভিতর থেকে এক পাড়াগাঁয়ে ছোকরা বেরিয়ে এসে বলে—বাবু, আপনি এখানে! ছেলেবেলায় দেখেছি আপনাকে কাঞ্চনপুরে। আমার নাম সদানন্দ, বাবার নাম যুধিষ্ঠির। কলেজে ঢাক বাজাতে এসেছি।

—বেশ বেশ, শুনে সুখী হলাম। অনেক বড় হয়ে গিয়েছ, পরিচয় না দিলে চিনতে পারতাম না। আচ্ছা, ঐ ঢাকটি কার বলতে পার?

—আজ্ঞে আমার।

—তোমার! ঠিক যজ্ঞেশ্বরের ঢাকের মতো। আশ্চর্য।

—আজ্ঞে আপনি ঠিকই ধরেছেন। ও ঢাক তাঁরই বটে। আমি ওটা কিনেছি।

—কিনেছ! কি রকম?

—চড়কের সময় যগী জ্যেঠা মারা গিয়েছেন। দামিনী জ্যেঠি কুড়ি টাকায় ঢাকটি আমার কাছে বিক্রি ক'রে গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছেন নবদ্বীপে।

প্রাণে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে বেঞ্চির ওপর বসে পড়ি। কোথায় সরে যায় কলেজ হলের আলোর সমারোহ, ঘূর্ণীর রূপকারের অপরূপ প্রতিমা, সুসজ্জিত ছাত্রছাত্রীর আনন্দ-চঞ্চল সমাবেশ! চোখের সামনে ভেসে ওঠে মল্লিক বাড়ির জ্যোৎস্না-স্নাত বিস্তৃত অঙ্গনে বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বরের যৌবনময় বাজনার অবিস্মরণীয় দৃশ্য। কত কি ভাবি। আমি যদি ঢাকী হতাম তাহলে যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রীর কাছ থেকে অনেক বেশী দামে কিনে নিতাম ঐ ঢাক। আর যদি ধনী জমিদার হতাম, তাহলে সদানন্দ যা চায় তাই দিয়ে ঐ ঢাক কিনে নিয়ে সযত্নে রেখে দিতাম পারিবারিক সংগ্রহশালায়। সদানন্দকে বলি—সদানন্দ, তুমি ভাগ্যবান। যজ্ঞেশ্বরের ঢাক তোমার হাতে পড়েছে। স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখো ওকে—আর ভক্তি দিয়ে রক্ষা ক'রো ওর মর্যাদা।

আরতি দেখা হয় না॥ বাড়ি চলে আসি। নিরন্তর অন্তরে জাগে যজ্ঞেশ্বরের কথা। রাত্রে চোখে ঘুম নেই। জানলা দিয়ে দেখি অতন্দ্র চন্দ্র চেয়ে আছে আমার পানে। তার ম্লান আলো যেন সহানুভূতিতে ভরা। জীবনব্যাপী সাধনার এই পরিণতি! সন্তানহীন যজ্ঞেশ্বরের সমস্ত বাৎসল্য দিয়ে গড়া ঢাক আজ অন্যের হাতে। শোকাকুলা পত্নী ঘরছাড়া। শব্দের মায়াকার নীরবের দেশে। না, না, তাহতে পায়ে না।

রাত্রিশেষের স্বপ্ন কী সুন্দর! স্বর্গে দেবাদিদেবের পূজা হচ্ছে। দীপ্তিময় চন্দ্রাতপতলে রূপোর কাঠি দিয়ে সোনার ঢাক বাজাচ্ছে যজ্ঞেশ্বর। মাথায় মণিমুক্তামণ্ডিত উষ্ণীষ, কপালে রক্তচন্দন লেখা, গলায় শুভ্রকুসুম মালিকা। ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন বিরাগ-বিহীন সেই বাজনা—অপূর্ব—অদ্ভুত।

শ্রুতি-তত্ত্ব

শ্রীভবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(মার্গ সঙ্গীত)

অদ্যাবধি সঙ্গীতের শ্রুতি সম্বন্ধে গবেষণায় কেহই কোন স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। বিষয়টি আজও সকলেরই অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। মৎপ্রদত্ত শ্রুতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং ব্যাখ্যা (সংক্ষেপে) সঙ্গীতজ্ঞ, সুধী এবং বৈজ্ঞানিক সমাজ গ্রহণ করিলে আমার বহুদিনের শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রুতি বলিতে কি বুঝায়? সুরের সূক্ষ্মাংশ, সুরের ওজন অথবা সুরের দূরত্ব বলিতেই বা কি বুঝায়? যদিও এই সকল শব্দ শ্রুতি অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে অনেকেরই এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নাই। শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন গ্রামে ২২ শ্রুতি বিদ্যমান বলিয়াছেন। যথা—

গান্ধার গ্রাম=গ—৪, ম—৩, প—৩, ধ—৩, ন—৪, স—৩, র—২।

মধ্যম গ্রাম=ম—৩, প—৪, ধ—২, ন—৪, স—৩, র—২, গ—৪।

প্রাচীনষড়জগ্রাম=স—৩, র—২, গ—৪, ম—৪, প—৩, ধ—২, ন—৪।

প্রচলিত ষড়জগ্রাম=স—৪, র—৩, গ—২,ম—৪, প—৪ধ—৩. ন—২।

এখন দেখা যাইতেছে বিভিন্ন গ্রামেই শ্রুতিসংখ্যা বাইশ। স-৪ শ্রুতি. র-৩, শ্রুতি বলিতেই বা কি বু স সুরের নীচে ৪ শ্রুতি হিসাব করিয়া এবং উর্দ্ধে ৪ শ্রুতির হিসাব ধরিয়া কোনভাবেই ২২ শ্রুতির হিসাব বা মাপ না পাইয়া, জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা সকলেই গোলক ধাঁধায় ঘুরিতেছেন এবং পাশ্চাত্য মতানুসারে ২২ শ্রুতি স্থলে ২৪ শ্রুতি বিদ্যমান এই ধারণা অনেকে পোষণ করেন। আবার অনেকেই হয়ত ভাবেন, শাস্ত্রকার তবে কি ভুল বলিয়াছেন? আমাদের মুনি ঋষিগণ যে কোন বিষয়েই বর্তনান জগৎ হইতে অনেক উন্নত ছিলেন। ২৪ শ্রুতি বলার মত ভ্রম তাঁহারা করিতে পারেন কি?

শ্রুতি তত্ত্ব বুঝিতে হইলে শব্দ বিজ্ঞান (Sound Pitch) বুঝা দরকার। শব্দ (সুর) বায়ুর কম্পনে (Vibration) উত্থিত হইয়া আমাদের কাণে পৌঁছে। স (সুর বা শব্দ) প্রতি সেকেণ্ডে যত বার কম্পন নিষ্পন্ন করে; র্স সুর তাহার দ্বিগুণ কম্পনে, প সুর তাহার $\frac{৩}{২}$ গুণ কম্পণে, গ সুর তাহার $\frac{৫}{৪}$ গুণ কম্পনে এবং ম সুর তাহার $\frac{৪}{৩}$ গুণ কম্পণে উত্থিত হয়। এইরূপে অন্যান্য সুরগুলি ও এক একটি অনুপাতে—উত্থিত হইয়া স সুর হইতে র্স সুরের অন্তর স্থিত সুর সমূহে তিনপ্রকার অন্তরের (interval) সৃষ্টি করে—একটি বৃহৎ, একটি মধ্য এবং একটি ক্ষুদ্র। ইহাদের অনুপাত হইতেছে যথাক্রমে $\frac{৯}{৮}$, $\frac{১০}{৯}$, $\frac{১৬}{১৫}$।

বিচার স্থলে সপ্তকে (octave) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মতানুসারে ২৪ শ্রুতি (সুরের কম্পন সংখ্যার দূরত্ব) হিসাবে বর্ত্তমান প্রচলিত ষড়জ-গ্রাম আলোচনা করিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। সুবিধার জন্য স সুরের কম্পন সংখ্যা (Frequency) প্রতি সেকেণ্ডে ২৪০ ধরা গেল। যদি স সুরের প্রতি সেকেণ্ডে ২৪০ কম্পন সংখ্যা হয়, তাহা হইলে—

এ স্থলে পূর্ব্বেই বলা প্রয়োজন যে, স—চ শ্রুতি, র—৩ শ্রুতি, র—৩ শ্রুতি বলিতে, স, র, সুর হইতে উর্দ্ধগামী শ্রুতি পথই বুঝিতে হইবে। কারণ আদি স্বর হইল স (ষড়জ) এবং শ্রুতি সুরের কম্পন সংখ্যার দূরত্বের (vibration) সূক্ষ্ম সমবিভক্ত অংশ নহে। শ্রুতি যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে মন্দ্র (উদারা) সপ্তকে ২২ শ্রুতি হইলে মধ্য

স	সুরের	প্রতি	সেকেণ্ডে	কম্পন	সংখ্যা———— — =		২৪০ হইবে।
র	"	"	"	"	"	২৪০ × ৯/৮ =	২৭০ "
গ	"	"	"	"	"	২৭০ × ১০/৯ =	৩০০ "
ম	"	"	"	"	"	৩০০ × ১৬/১৫ =	৩২০ "
প	"	"	"	"	"	৩২০ × ৯/৮ =	৩৬০ "
ধ	"	"	"	"	"	৩৬০ × ৯/৮ =	৪০৫ "
ন	"	"	"	"	"	৪০৫ × ১০/৯ =	৪৫০ "
স	"	"	"	"	"	৪৫০ × ১৬/১৫ =	৪৮০ হইয়া

স সুর হইতে র্স সুরের কম্পন সংখ্যা দ্বিগুণে পরিণত হইবে।

ভারতীয় সঙ্গীতে স, র, গ, শ্রুতি বা সুরের সহিত প, ধ, ন, সুরের মিল রাখা হইয়াছে। পাশ্চাত্য সুর অনুপাতে এখানে ধ সুরের কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ৪০০ হইবে, এবং ভারতীয় সঙ্গীতে ৪০৫ হইবে। তাহা হইলে স, র, গ, সুরের সহিত প, ধ, ন, সুরের মিল থাকিবে।) এখন স সুর হইতে র্স সুরের (সপ্তকের) কম্পন সংখ্যাকে কোন দূরত্ব লইয়া ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা ২৪ সম অংশে ভাগ করিয়া সুরের (শব্দের) কম্পন সংখ্যার (vibration) দূরত্বে উপরোক্ত মাপ অনুপাতে যথাস্থানে সুর সংস্থাপন করিলে দেখা যাইবে যে স, র গ, ম, প প্রভৃতি সুরগুলি যথাক্রমে (কেন্দ্র) ৩, ৬, ৮, ১২, ১৬½, ২১, ও ২৪ সংখ্যায় অবস্থান করে এবং প্রত্যেক অংশগুলি ১০এর কম্পন সংখ্যায় ব-ড়িয়া উপরোক্ত ব্যবধান অনুপাতে স সুর হইতে র্স সুরের কম্পন সংখ্যা দ্বিগুণে পরিণত হয়। এই সম বিভক্ত অংশগুলি শ্রুতি ধরিলে এবং স সুরের কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ২৪০ হইলে সপ্তকে ২৪ শ্রুতির হিসাব পাওয়া যায়।

(মুদারা) ও তার (তারা) সপ্তকে যথাক্রমে ৪৪ ও ৮৮ শ্রুতি হইত অর্থাৎ বিভিন্ন সপ্তকে এবং বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন রকম শ্রুতি বর্ত্তিত এবং বাদী ও সম্বাদী সুর গুলিও সব অবস্থাতেই ৯ এবং ১৩ শ্রুতির ব্যবধানে অবস্থান করিত না। শ্রুতি হইল সুরের দূরত্বের ওজনের (Weight বা Pitch) সূক্ষ্মাংশ অথবা সপ্তকের উপরোক্ত তিন প্রকার অন্তর (ওজন) গুলির সমষ্টি। সুরের কম্পন সংখ্যার দূরত্বে সপ্তকের প্রথমার্দ্ধে ১৩ শ্রুতি ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৯ শ্রুতি বিদ্যমান।

স সুরের কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ২৪০ হইলে সপ্তকের কম্পন সংখ্যার ২৪ সম অংশে দেখা যাইবে ১৭'৫৩২ বা ১৮ শ্রুতি বিদ্যমান— প্রথমার্দ্ধে ১০'২৬৬ শ্রুতি এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৭'২৬৬ শ্রুতি।

২৪ × ৯/৮ = ২৭ = ৩ শ্রুতি (২৭ — ২৪)

২৪ × ১০/৯ = ২৬⅔ = ২'৬ " (২৬⅔ — ২৪)

২৪ × ১৬/১৫ = ২৫৩/৫ = ১'৬ " (২৫৩/৫ — ২৪)

স সুরের কম্পন সংখ্যা (Frequency) স্থিরভাবে হইলে	ম সুরের কম্পন সংখ্যা নিম্ন ভাবে হইবে	প সুরের কম্পন সংখ্যা নিম্ন ভাবে হইবে
২৪০	৩২০ (২৪০ × ৪/৩)	৩৬০ (২৪০ × ৩/২)
২৭০	৩৬০ (২৭০ × ৪/৩)	৪০৫ (২৭০ × ৩/২)
৩০০	৪০০ (৩০০ × ৪/৩)	৪৫০ (৩০০ × ৩/২)
৩৬০	৪৮০ (৩৬০ × ৪/৩)	৫৪০ (৩৬০ × ৩/২)

সুতরাং :—

স—ম=র—প=গ—ধ—(এখানে গ সুরের সহিত ধ সুরের সম্বাদীত্বে ধ—৪০৫ স্থলে কম্পন সংখ্যা ৪০০ হইবে)

প—র্স=৭'২৬৬ শ্রুতি।

স—প=র্—ধ=গ—ন=ম—র্স=১০'২৬৬ শ্রুতি।

স র গ ম=প ধ ন র্স=৭'২৬৬ শ্রুতি।

স র গ ম প=ম প ধ ন স=১০'২৬৬ শ্রুতি।

স—র্স=১৭'৫৩২ বা ১৮ শ্রুতি।

সুর————	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	স
প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন সংখ্যা—	২৪০	২৭০	৩০০	৩২০	৩৬০	৪০৫	৪৫০	৪৮০
সুরের কম্পন সংখ্যার দূরত্ব—	০	৩	৩	২	৪	৪½	৪½	৩=২৪
শ্রুতি (সুরের ওজনের দূরত্ব)—	০	৩'০০০	২'৬৬৬	১'৬০০	৩'০০০	৩'০০০	২'৬৬৬	১'৬০০=১৭'৫৩২ বা ১৮

উল্লিখিত বিচারে দেখা যাইতেছে যে সপ্তকে ১৭'৫৩২ বা ১৮ শ্রুতি। তবে শাস্ত্রকারগণ ২২ শ্রুতি বলিয়াছেন কেন? যাঁহারা সঙ্গীত শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে সব অবস্থাতেই বাদী ও সম্বাদী সুরগুলি ৯ অথবা ১৩ শ্রুতির ব্যবধানে থাকিবে (৮ এবং ১২ শ্রুতির ব্যবধানে নহে)। যেমন স বাদী সুর হইলে ম কিংবা প সুর সম্বাদী সুর হইতেই হইবে। অর্থাৎ স হইতে ম ও প সুর যথাক্রমে ৯ ও ১৩ শ্রুতির ব্যবধান হইবে। অথবা ম ও প সুর যথাক্রমে ৯ম ও ১৩শ শ্রুতিতে অবস্থান করিবে। কাজেই বুঝা যায়, স্বরের মান (Standard note) আরও উর্দ্ধে হইবে। যদি স সুরের কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০ হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সপ্তকে ২২ শ্রুতি বিদ্যমান এবং সুরের কম্পন সংখ্যার ৩০ সম অংশে দেখা যাইবে যে কম্পন সংখ্যার প্রথমার্দ্ধে ১৩ শ্রুতি এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৯ শ্রুতি বিদ্যমান। এখন এই ৩০ সম অংশে উক্ত প্রকারে সুর সংস্থাপন করিলে দেখা যাইবে নিম্ন প্রদর্শিত চিত্রানুযায়ী কম্পন সংখ্যায় সুর অবস্থান করে।
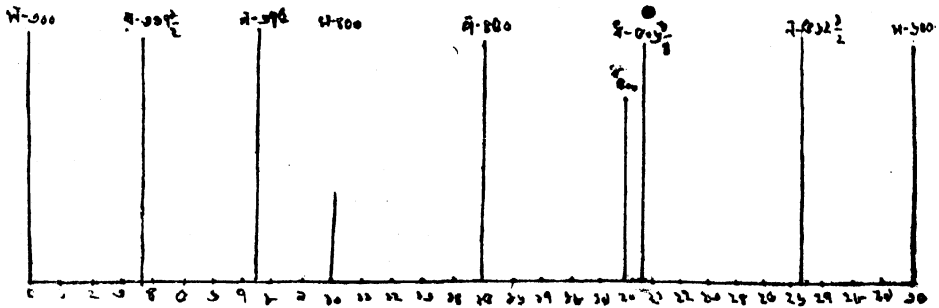
এখন দেখা যাইতেছে যে কেবল ম, প, ও স (র্স) সুর পূর্ণ সংখ্যাতে অবস্থান করিতেছে এবং স হইতে ম ও প সুর কম্পন সংখ্যার ঠিক ১০ম এবং ১৫শ অংশ ব্যবধানে স্থিত হইয়া ৯ম ও ১৩শ শ্রুতির ব্যবধানে অবস্থান করিতেছে। সূক্ষ্মভাবে শ্রুতির হিসাব লইতে গেলে দেখা যাইবে—

৩০ × $\frac{৯}{৮}$ = ৩৩$\frac{৩}{৪}$ = ৩'৭৫ শ্রুতি—(৩৩$\frac{৩}{৪}$ − ৩০)

৩০ × $\frac{১০}{৯}$ = ৩৩$\frac{১}{৩}$ = ৩'৩ শ্রুতি (৩৩$\frac{১}{৩}$ − ৩০)

৩০ × $\frac{১৬}{১৫}$ = ৩২ = ২ শ্রুতি (৩২ − ৩০)

সুর—	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	র্স
কম্পনসংখ্যা—	৩০০	৩৩৭½	৩৭৫	৪০০	৪৫০	৫০৬¼	৫৬২½	৬০০
সুরের কম্পন সংখ্যার দূরত্ব—	০	৩'৭৫০	৩'৭৫০	২'৫০০	৫'০০০	৫'৬২৫	৩'৭৫০=৩০	
শ্রুতি (সুরের ওজনের দূরত্ব)—	০	৩'৭৫	৩'৩৩	২'০০	৩'৭৫	৩'৭৫	৩'৩৩	২'০০ =২১'৯১

সূক্ষ্ম হিসাবে ৪,৩,২ এবং ২২ শ্রুতি সংজ্ঞা যথাক্রমে ৩'৭৫, ৩'৩৩, ২ এবং ২১'৯১ হইবে কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ৪,৩ এবং ২২ সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন বিভক্ত সংখ্যা বলিতে গেলে তাহাতে গণ্ডগোল এবং অনর্থের সৃষ্টিই হইবে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে ইহাও আছে যে অর্দ্ধ শ্রুতির তারতম্যে কিছু দোষ হয় না। Logarithm এর সাহায্যেও উপরোক্ত শ্রুতির হিসাব পাওয়া গিয়াছে।

নিম্নলিখিত চিত্রটিতে একদৃষ্টিতেই শ্রুতি এবং বাদী সম্বাদীর অবস্থান সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।
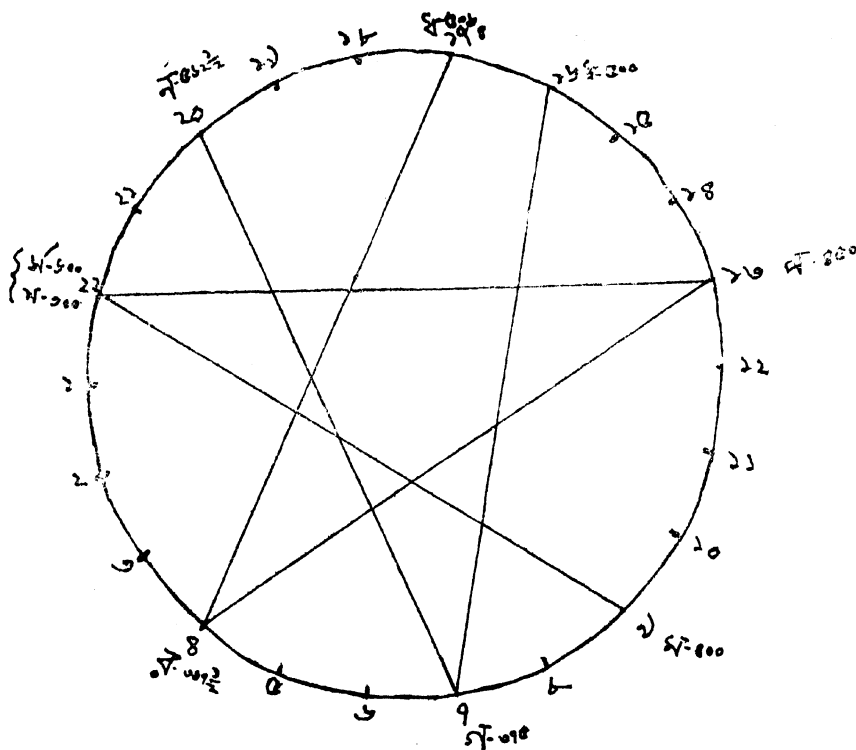
বিচারে দেখা যাইবে অনেক শ্রুতির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই এবং স্থান গুলি পরিবর্ত্তনশীল। যেরূপ উপরোক্ত চিত্রে দেখা যায় ধ স্বরের দুইটি স্থান। বিকৃত স্বরগুলির এরূপ অনেক প্রভেদ দেখা যাইবে। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

"শ্রুতি স্থানে স্বরান্ বক্তুং নালং ব্রহ্মাপি তত্ত্বতঃ
জলেচ সুতরাং মাগো মীনানাং নোপলক্ষ্যতে
গগনে পক্ষীনাং যদ্বৎ তদ্বৎ স্বর-গতা শ্রুতিঃ।
শ্রুতিনাবেশা প্রোক্তা তথাচ্যা চ কলা মতা
যথা তৈল গতং সর্পির্যথা কাষ্ঠ গতোঽনলঃ
জ্ঞায়তে ছাত্রোপদেশেন যথা স্বর গতা শ্রুতিঃ॥

উপদেশে বীণাযন্ত্র হইতে শ্রুতির জ্ঞান নিতে বলিয়াছেন।

বীণাযন্ত্রে (তার যন্ত্র) দেখা যাইবে যে স, র, গ, ম, স্বর যে সারিকাতে উদ্ভুত হয়, অন্য তারে সেই সারিকাতেই বা সেই দূরত্বে প, ধ, স, স স্বর ও বাদিত হয়। আবার স হইতে প স্বর যে দূরত্বে বাদিত হয়, অন্য তারে সেই দূরত্বে ম হইতে র্স স্বরও পাওয়া যায়।

কাজেই 'শ্রুতি' হইল নির্দ্দিষ্ট স্বরের মান (Standard note or frequency) হইতে তদূর্দ্ধ স্বরের (অর্থাৎ সপ্তকের সুর সমূহের) ওজনের দূরত্ব, যাহার সূক্ষ্ম সমবিভক্ত অংশ হইল ২২ এবং কম্পন সংখ্যার দূরত্বের প্রথমার্দ্ধে ৯ শ্রুতি বিদ্যমান। ২২ শ্রুতি বলিতে ২২ ইঞ্চি বা ২২ অঙ্গুলি প্রমাণ দূরত্ব বলিতেও ভুল হইবে না।

অনেকের ধারণা যে ভারতীয় সঙ্গীতে নির্দ্দিষ্ট সুরের মান (Standard note) বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু সে ধারণা খুবই ভুল। শ্রুতির হিসাব নির্দ্দিষ্ট সুরের মান হইতেই ধরা হইয়াছে।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিচার করিলেই বিভিন্ন গ্রামের শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। প্রাচীনকালে ষড়জ ও মধ্যমগ্রাম ধরাতলে প্রচলিত ছিল। গান্ধার গ্রাম দেব-লোকে গীত হইত। ইহা ধরা তলে অপ্রচলিত ছিল। মধ্যম গ্রামের তাৎপর্য্য এই যে অনেক রাগ রাগিনী আছে যাহা যন্ত্র সপ্তকেই বেশী স্থিতির জন্য স্বরের মান একটু উঁচু না হইলে শ্রুতি মধুর হয় না। যেমন বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে যে 'গারা' রাগে ম সুরকে স সুর ধরিয়া গাহিবার রীতি। গারা রাগে প সুরের উর্দ্ধে সুর উঠিবে না। সেই জন্যই মধ্যমগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়। গান্ধার গ্রাম, যাহার মান ষড়জ গ্রাম হইতে ৭ শ্রুতি উর্দ্ধে, দেবকণ্ঠেই সম্ভব। এই গ্রামে দেখা যায় পর পর তিন শ্রুতি অন্তর তিনটি সুর যাহা প্রচলিত ধারা বিরুদ্ধ।

নিম্নে দুই মতে শ্রুতির নাম দেওয়া হইল—

(১) তীব্রা, নান্দী (২) কুমুদ্বতী, বিশালা, (৩) মন্দা, সুমুখী (৪) ছন্দোবতী, বিচিত্রা (৫) দয়াবতী, চিত্রা (৬) রঞ্জনী, ঘণা (৭) রতিকা, চালনিকা (৮) রৌদ্রী, মালা, (৯) ক্রোধী, সরসী (১০) বজ্রিকা, মাতঙ্গী (১১) প্রসারিণী, মাধবী. (১২) প্রীতি, মৈত্রী (১৩) মার্জ্জনী, শিবা (১৪) ক্ষিতি, কলা, (১৫) রক্তা, কলরবা (১৬) সন্দিপনী, বালা (১৭) আলাপিনী, সাঙ্গবরী (১৮) মদন্তী, জিয়া (১৯) রোহিনী, মৃতা (২০) রম্যা, রসা (২১) উগ্রা, মাত্রা (২২) শোভিনী, মধুকরী।

সত্যনিষ্ঠা ও সতীত্ব

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু এম-এ

একই মূল বা একই কাণ্ড হইতে উদ্গত দুইটী শাখা, অথবা বলা যাইতে পারে একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটী ফুল—সত্য ও সতীত্ব। কেহ বলেন যুগ্ম-নীতি, আবার কাহারও মতে একই নীতির দুই পিঠ—পুরুষে সত্যনিষ্ঠা আর নারীতে সতীত্ব। ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তির দিক দিয়া যেমন সত্য ও সতীত্ব যমজ শব্দ, তাত্ত্বিক বিচারেও তেমনই ইহারা যুগল-ভাব। বাক্ ও অর্থ যেমন সম্পৃক্ত, পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর যেমন পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, সত্য ও সতীত্ব তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তেমনই অভেদাত্মা। [অস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয় সৎ ও সতী। অর্থাৎ যাহা থাকে, মরে না—যাহা অমর, অবিনশ্বর, চিরন্তন, শাশ্বত, নিত্য, ধ্রুব, সনাতন। ব্যবহারিক জগতে অবশ্য সত্যের মধ্যেও আপেক্ষিকতা রহিয়াছে। বল্মীকের তুলনায় হিমালয় অধিক স্থায়ী, গোষ্পদের তুলনায় সমুদ্র, প্রদীপের তুলনায় সূর্য্য, দাসরাজ বংশের তুলনায় ইক্ষ্বাকুকুল, মানুষের তুলনায় চতুরানন। আবার হিমালয়, সূর্য্য এবং সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি পর্য্যন্ত ব্রহ্মের তুলনায় অস্থায়ী অর্থাৎ অসত্য বটে।]

মানব-সমাজে আমরা দেখিতে পাই যাহার মধ্যে যে পরিমাণ বা যতখানি ভাল (সৎ—মূল্যগুণ) তাহার স্থায়িত্বও তদনুরূপ। যে প্রথা, যে বিধি, যে ক্রিয়া, যে নীতি, যে সংগঠন যত সৎ (মূল্যগুণ) তাহার আয়ুষ্কালও তত দীর্ঘ। সিনেমার তরল চটুল গান কিছুক্ষণের জন্য সারামন দখল করিয়া বসিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার আবেদন স্থায়ী হয় না; পক্ষান্তরে চণ্ডীদাসের পদাবলী বা রবীন্দ্রনাথের বলাকা সারাজীবন হৃদয়ে গাঁথা থাকে। সুরাসক্তির বা কামোন্মাদের বন্যা মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্য সব কিছু ডুবাইয়া দেয়, ভাসাইয়া লইয়া যায়, কিন্তু সে আসক্তির বা মত্ততার প্রচণ্ডতা থাকে কতক্ষণ? বন্যা যে বেগে আসে সেই বেগেই নিজকে ক্ষয় করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে—নিমাই সন্ন্যাসের একটী গানের, রামপ্রসাদের একটী সংগীতের রেশ মনের কোণে অনুরণিত হইতে থাকে বহুকাল। তাহার কারণ কাম ক্ষণিক, করুণা বা ভক্তি স্থায়ী—ভাষান্তরে প্রথমটী অসৎ, দ্বিতীয়টী সৎ।

আমাদের আদিকবি-রচিত ভারতের প্রথম ও প্রধান জাতীয় মহাকাব্যে আমরা এই যুগ্ম-নীতির সাক্ষাৎ পাই। রামায়ণের নায়ক বা মূলচরিত্র রামচন্দ্র সৎ, সত্যবাদী, সত্যসন্ধ এবং নায়িকা সীতা সতী-শিরোমণি। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন করিয়া অশেষ ক্লেশ বরণ করিলেন। তাঁহার সকল পারিবারিক সম্পর্কে তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ—পিতার প্রতি, ভ্রাতার প্রতি, পত্নীর প্রতি, এমন কি বিমাতার প্রতিও তিনি কর্ত্তব্য-পরায়ণ। তাঁহার পিতা ছিলেন বহুপত্নীক এবং সে যুগে রাজন্যদের বহুবিবাহ নিন্দনীয়ও ছিল না—তথাপি রামচন্দ্র ধর্ম্মানুরোধেও দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই, যজ্ঞ-সম্পাদনকল্পে সহধর্ম্মিনীর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য সীতার স্বর্ণ-প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ

করাইয়াছিলেন। সীতাগতপ্রাণ রামের একনিষ্ঠ প্রেমের মাহাত্ম্য ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই যেন ঐ দম্পতির যুগল-নামের প্রথমে সীতার নাম উচ্চারিত ও লিখিত হয়। রামের সীতা বলিয়াই রামভক্তগণ রামসীতা না বলিয়া সীতারাম বলিয়া থাকেন। সামাজিক সম্পর্কেও রামচন্দ্র খাঁটী—প্রজার প্রতি, ভৃত্যের প্রতি, এমন কি আততায়ীর প্রতিও তিনি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ। বালী-পুত্র তাঁহার বাৎসল্য-রসে যে কতদূর অভিসিঞ্চিত হইয়াছিল তাহা রামচন্দ্রের কোন উক্তিতে ধরা না পড়িলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় অঙ্গদের বিদায়-অশ্রুজলে। এই সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ, সত্যসন্ধ মানবই আমাদের শাস্ত্রে, সাহিত্যে ও সমাজে আদর্শ মানব, এমন কি নারায়ণের অবতার বলিয়া স্বীকৃত ও কীর্ত্তিত হইয়াছেন। পুরুষের আদর্শ যেখানে সৎ-ত্ব বা সত্য অথবা সৎ-ক্ষ্য=সত্য অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা সেখানে নারীর আদর্শ অবশ্যই হয় সতী-ত্ব। বহু প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে সীতা যে এই আদর্শকে শুধু রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, ইহাকে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। তিনি একাধারে এই আদর্শের চিরন্তন প্রতীক ও পূর্ণবয়বা সাকারা মূর্ত্তি হইয়া বিরাজ করিতেছেন। রাবণের পাশবিক বল ও ঐশ্বর্য্য, লোকাপবাদ, অগ্নি-পরীক্ষা, স্বামী কর্ত্তৃক নির্ব্বাসন, কোন কিছুতেই এই পবিত্রতা নারীর একনিষ্ঠ পতিভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। যুগ যুগ ধরিয়া সীতারামের পুণ্য-নামে সত্যনিষ্ঠার ও সতীত্বের জয় ঘোষিত হইতেছে এবং আজ পর্য্যন্ত ঐ যুগ্ম-নীতির মূর্ত্তবিগ্রহ—সীতারামের যুগলমূর্ত্তি—ভারতের চিত্ত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি ভারত-সভ্যতার উপাদান-রাশি কালক্রমে নষ্ট হইয়া গেলেও কিছু আসে যায় না যদি সীতা-চরিত্র থাকে। একমাত্র সতী-চরিত্রের বলে সমগ্র ভারত-কৃষ্টির পুনরুদ্ধার সম্ভব। স্বামীজির এই উক্তিটী অত্যুক্তি নয়। ইহার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য আজ বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকব্যাপী আদর্শভ্রংশ, দুর্নীতি ও তরলতার মধ্যে দাঁড়াইয়া আজ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিতেছে যে সত্যনিষ্ঠার ও সতীত্বের যে ধ্রুব আদর্শ রহিয়াছে উৎসাহ, উদ্দীপনা যত্ন ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে ঘরে ঘরে তাহার অনুশীলন ও প্রচার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কি চাই? না, ছেলে হবে সত্যনিষ্ঠ, মেয়ে হবে সতী। ছেলে কবি হউক, বৈজ্ঞানিক হউক, ব্যবহারাজীব হউক বা চিকিৎসক হউক, প্রধান মন্ত্রী বা প্রধান সেনাপতি হউক, খেলোয়াড় হউক, কি সাঁতারু হউক,—কিছু আসে যায় না। তাহাকে সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সত্যব্রত' সত্যবাক্ সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। মেয়ে স্কুলে কলেজে পড়ুক, বা চাকরী করুক বা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা হউক—কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সে যেন সতীত্বের আদর্শ চিরদিন সযত্নে সগৌরবে পালন করিতে পারে। নারীত্বের পূর্ণ-পরিণতির এবং মাতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যও সতীত্ব অপরিহার্য্য নয় কি? স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, গার্হস্থ্য-নীতি, সৌজাত্য-বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিদ্যাই সতীত্বের আদর্শকে স্বীকার ও সমাদর করিতে বাধ্য। বিশুদ্ধনীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও ব্যক্তিগত জীবনের সুখশান্তি, পারিবারিক জীবনের সুষমা ও শৃঙ্খলা এবং সামাজিক জীবনে সংঘর্ষ-নিবারণ ও সামঞ্জস্য-রক্ষার পক্ষেও সতীত্বের ব্যবহারিক উপযোগিতা ও মূল্য সুধী-সমাজে ক্রমশঃ আরও হইতে থাকিবে।

যে সন্তান জন্মিলে কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থ হ'ন এবং বিশ্বের দরবারে দেশের ও জাতির মর্য্যাদা বাড়ে তেমন সন্তানের আগমনের প্রতীক্ষায় প্রতি গৃহে গৃহস্থ ও গৃহিণীকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সেই মহামানবের আবির্ভাবের, সেই নারায়ণের অবতরণের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। কোন্ শুভক্ষণে কোন্ দশরথ ও কৌশল্যাকে তিনি ধন্য করিবেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রতি গৃহে চাই পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রস্তুতি—সংযম, সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা ভাবী জনক-জননীর দেহমন চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইবে। পুরুষোত্তম কখনও জন্মিয়াছেন রাজপ্রাসাদে; কখনও কারাগারে, কখনও বা গোশালায়; তবে সর্ব্বক্ষেত্রেই উৎস ও আধার অর্থাৎ জনক জননীর দেহমন অনাময় ও পবিত্র ছিল। আজ দম্ভ, স্বার্থপরতা, ও হিংসা মানব-সভ্যতার দেবভূমি অধিকার করিয়াছে, এমন কি স্বয়ং বিজ্ঞান দৈত্য-দানবের হাতে বিশ্ব-বিধ্বংসী অস্ত্র তুলিয়া দিতেছে। এ যুগের এই বৃত্রাসুরের সংহারের জন্য আজ আবার নব-'কুমার-সম্ভবের' প্রয়োজন। কিন্তু তাহার যুগোপযোগীযোগ্য আয়োজন কোথায়? সত্যাশ্রয়ী সর্ব্বত্যাগী মদনদহন শিবের সঙ্গে পরমাসতী তপস্বিনী উমার মিলন চাই। ছলাকলাময়ী নটীর গর্ভে কিংবা অসংযত বিলাসীর ঘরে কি জন্মিবে শক্তিধর দেশনায়ক বা মুক্তিদাতা যুগাবতার? সু-পিতা ও সু-মাতা না থাকিলে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মধ্যে সু-সন্তান আসিবে কোথা হইতে? সু-পিতা মানে সত্যনিষ্ঠ পুরুষ, আর সু-মাতা মানে সতী নারী। সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও সতী নারীর মিলিত তপশ্চর্য্যার বরস্বরূপ পাওয়া যায় সেই মহামানবকে।

বাংলার ও বাঙ্গালীর আজ ঘোর দুর্দ্দিন। সমগ্র দেশ আজ কংসের কারাগার। খণ্ডিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, হৃতশ্রী বঙ্গভূমির মুক্তিদাতা বাহির হইতে আসিবে না। কৃষকের কুটীরে, কুলি-বস্তিতে, উদ্বাস্তু-শিবিরে যেসব দেবকী-বসুদেব দুঃখের হোমানল জ্বালিয়া নীরবে তপস্যা করিতেছেন তাহাদের কাহারও না কাহারও ঘরেই আসিবেন সেই সঙ্কট-ত্রাতা মুক্তিদাতা নরোত্তম। তাহাদের আর্ত্ত-আকুতিতে তাহাদের সন্তানরূপেই তিনি এই অভিশপ্ত খণ্ডিত বঙ্গ-ভূমিতে আবির্ভূত হইবেন। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা যেন আজ বঙ্গ-জননীর সেবার ও মুক্তির জন্য জীবানন্দের মত পুত্র ও শান্তির মত কন্যা প্রার্থনা করি। এই প্রার্থনা যাহাতে পূর্ণ হয় তৎকল্পে ভাবী-জনক-জননীকে দীর্ঘকাল কঠোর ব্রত পালন করিতে হইবে।

শ্রীমান্, ধীমান্, শক্তিমান্, ত্যাগী, তেজস্বী বীরসন্তান লাভের জন্য সত্যিকার ঐকান্তিক ব্যাকুলতা থাকিলে আবার বাংলার এই মাটীতেই বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ ও নেতাজীর মত পুরুষসিংহের আবির্ভাব হইবে। নট-নটীতে দেশ ছাইয়া গেল, সবাই যেন চায় গন্ধর্ব্ব কিন্নর হইতে। মানুষের কোন কদর নাই। আদর নাই—কেহ মানুষ হইতে চায় না, মানুষ করিতেও পারে না। দ্বিজেন্দ্রলালের সেই অমর বাণী/

আজ বাঙ্গালী জাতিকে স্মরণ করিতে বলি—"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ"। মানুষ হইতে হইলে ও মানুষ করিতে হইলে বাংলার নর-নারীকে দীর্ঘকাল সত্যের এই সাধনা—যথাক্রমে সত্যনিষ্ঠার ও সতীত্বের সাধনা—করিতে হইবে।

পুণ্যশ্লোক নলরাজা, পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির এদেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন। কেননা, তাঁহারা ছিলেন সত্যসন্ধ। হরিশ্চন্দ্র, ভীষ্ম, শ্রীবৎস প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সকলেই ছিলেন সত্যব্রত। সত্যনিষ্ঠায়েই ভারতে পুরুষের পৌরুষ ও মহত্ব। দময়ন্তীর নল, সাবিত্রীর সত্যবান, উমার শিব, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, সীতার রাম—নিজ নিজ ইষ্ট। সতীর ক্ষেত্রে ইষ্ট-নিষ্ঠা আর পতি-নিষ্ঠা একই। সীতার বা দময়ন্তীর পক্ষে সতীত্ব সহজ, স্বাভাবিক, অনায়াস এবং অবশ্যম্ভাবী—যেমন তরলতা জলের, দাহিকা অগ্নির। সতীত্বই নারীর স্বধর্ম। সীতা সাবিত্রীর সতীত্বের প্রেরণা স্ব-প্রকৃতি হইতে স্বভাববশে উৎসারিত হইয়াছে। সতীনারী মাত্রেই এক অর্থে স্বয়ংবরা। তাঁহার চিরপোষিত আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভীপ্সা, মনোমন্দিরে পূজিত ইষ্ট বা আদর্শ বিধাতার বরস্বরূপ স্বামীর মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হ'ন। তাঁহার পতি-দেবতাই নরদেবতা, নরোত্তম নয়। তেমন পুরুষোত্তম পুরুষের পায়ে দেহ মনপ্রাণ সঁপিয়া দিতে কোথাও কোন বাধা নাই অর্থাৎ সেখানে অন্তর্বিরোধ নাই। ভারতবর্ষে সতীত্বের আদর্শ আরও উঁচু। সতীত্ব স্বামীর গুণ ও যোগ্যতার অপেক্ষা রাখে না। কুষ্ঠীর আখ্যানে সতীত্বের এমন একটী চরম দৃষ্টান্ত (extreme example) আছে যাহা আধুনিক রুচির মাপকাঠিতে শুধু অনমুমোদনীয়ই নয়, পরন্তু অতিশয় উৎকট, অদ্ভুত, এমন কি বীভৎস বলিয়া বিবেচিত হইবে। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে স্কন্ধে বহন করিয়া তাহার কুৎসিৎ কামনা পুরণের জন্য সতীনারী বারবণিতার নিকটে যাইতেছেন। এ দৃশ্য একদিক দিয়া ধিক্কারজনক বইকি? কিন্তু ইহার আর একটা দিকও আছে। স্বামীর কদর্য্যব্যাধিদুষ্ট দেহ ও কুৎসিৎ মন পতিব্রতার পতিপরায়ণতার বিন্দুমাত্র লাঘব করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন যে, বহুযুগ ধরিয়া অনুশীলনের ফলে ভারতীয় হিন্দুনারীর মনে স্বামী একটী নৈর্ব্যক্তিক ভাব মাত্রে রূপান্তরিত ও পর্য্যবসিত হইয়াছে। স্বামী আর তাহার নিকট দোষেগুণে জড়িত রক্তমাংসে গড়া দেহের অধিকারী একটি ব্যক্তি নয়। স্বামীর কুগঠিত কুৎসিৎ দেহ, অযোগ্যতা, দুর্ব্যবহার—কোন কিছুতেই এই ভাবের পূজায় ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না, যেমন অশিক্ষিত শিল্পীর অপটু হস্তের নির্ম্মিত বিগ্রহের অপূর্ণতায় ভক্ত উপাসকের ভক্তির ন্যূনতা হয় না।

আচার্য্য বিনোবা

শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার

মহাত্মার যোগ্যশিষ্য—ক্ষীণতনু তুমি কটিবাস,
তোমারে হেরিয়া দূরে চলে যায় যত অবিশ্বাস।
কবি তুমি, কর্ম্মী তুমি, মহাদর্শ তুমি মূর্ত্তিমান্,
ভূদান যজ্ঞের স্মৃতি চিত্তপটে রহিবে অম্লান॥

বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব—

আগামী ২৪শে মে বুদ্ধদেবের জন্মের ২৫০০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ভারতের ৪টি প্রধান বৌদ্ধ তীর্থ—(১) লুম্বিনী (২) বুদ্ধগয়া (৩) সারনাথ ও (৪) কুশীনগরে বিরাট আয়োজন চলিতেছে। লুম্বিনী নেপালের অন্তর্গত—সেখানে যাওয়ার ভাল রাস্তা হইয়াছে ও তথায় দুইটি নূতন অতিথিশালা নির্মিত হইয়াছে। বুদ্ধগয়ায়ও নূতন রাস্তা নির্মিত হইতেছে—বহু যাত্রী যাহাতে সুখে তথায় বাস করিতে পারে, সেজন্য সকল ব্যবস্থা করা হইতেছে—তথায় বিজলী আলোরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সারনাথেও নূতন রেল-ষ্টেশন ও নূতন অতিথিশালা নির্মিত হইয়াছে। কুশীনগর এত দিন প্রায় অনাদৃত ছিল—সেখানেও বহু গৃহাদি নির্মাণ করা হইয়াছে ও তথায় যে বিরাট মূর্তি আছে, তাহা আলোকিত করার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে প্রত্যেক ভারতবাসীর ও এই ৪টি তীর্থ দর্শন করা কর্তব্য। তীর্থযাত্রীদের যাহাতে কোন অসুবিধা ও কষ্ট না হয়, সেজন্য ভারত সরকার সকলপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন।

কবি ভারতচন্দ্র উৎসব—

২৪পরগণা শ্যামনগর-মুলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারের ৫০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় গত ৩০শে চৈত্র হইতে তথায় তিন দিবসব্যাপী জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। বিরাট মণ্ডপে প্রথম দিন সন্ধ্যায় বহু লোকের সমাগমে শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে উৎসব আরম্ভ হয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। নির্বাচিত সভাপতি কবি শ্রীসুবোধ রায় উৎসবে উপস্থিত হইতে না পারিয়া ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এক লিপি প্রেরণ করেন। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্মীদের চেষ্টায় এক পল্লীগ্রামে যেরূপ বিরাট ভাবে অধুনা-বিস্মৃত কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের স্মৃতি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা অসাধারণ ও অভিনব। দেশের সর্বত্র এই ভাবে সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রচারে সকলে সচেষ্ট হইলে দেশে নূতন জীবনের সঞ্চার হইবে।

সাহিত্যতীর্থের উদ্যোগে কবি শ্রীকুমুদ মল্লিক সংবর্ধনা—প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যতীর্থের সদস্যগণ সহ বর্ধমানে কবির ভবনে গিয়া তাঁহাকে সংবর্ধিত করেন

ঋষি বঙ্কিম সংগ্রহ শালা—

সকলেই জানেন, ২৪ পরগণা নৈহাটির নিকট কাঁঠাল পাড়ায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক বসত বাটীর একাংশে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ঋষি-বঙ্কিম-সংগ্রহ-শালা ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা পরিচালনা করিতেছেন। আপাততঃ ঋষি বঙ্কিমের ব্যবহৃত বৈঠকখানা বাড়ীতে উহার কার্য্য চলিতেছে। ঐ প্রতিষ্ঠানকে বৃহত্তর করার জন্যও উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। গত ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাব দিবসে তথায় বিরাট আড়ম্বরের সহিত বঙ্কিম উৎসব পালন করা হইয়াছে। তথায় যোগেশচন্দ্র বাগল সভাপতি, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধক রূপে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ঋষি বঙ্কিম কলেজের অধ্যাপক

ও ছাত্রবৃন্দ এবং স্থানীয় গ্রাম সমূহের বঙ্কিম-ভক্ত অধিবাসাবৃন্দ উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। ঐদিন বাংলার সর্বত্র ঋষি বঙ্কিমের জীবন ও সাহিত্য আলোচিত হইলে তদ্দ্বারা দেশবাসী উপকৃত ও উন্নত হইবে।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের নাম রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করায় ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্‌-ডি, গত ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সেনেটের সভায়

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সর্বসম্মতিক্রমে আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। এ পর্যন্ত যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। তাঁহার বর্তমান বয়স ৪৫ বৎসর। ডাঃ দাশগুপ্ত সুপণ্ডিত ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার এই নিয়োগে আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য-পরিষদ—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে হাওড়ায় নৃসিংহনিলয়ে হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন উৎসবে পরিষদের সভাপতি শ্রীযামিনীকান্ত সোম ও সম্পাদক ডক্টর নিমাইসাধন বসু অভিভাষণ পাঠ করিবার পর পরিষদের সহঃ সভাপতি শ্রীচরণদাস ঘোষ মহাশয়ের বিবৃতি পঠিত হয়। তৎপরে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার সাহায্যে ঐ অধিবেশনের প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত পিয়ের ফালোঁ ও সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায় মহাশয়ের সহিত সমবেত সজ্জন মণ্ডলীর পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত ফালোঁ শিল্প-প্রধান হাওড়ায় এই সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান সুগঠিত হওয়ার জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন সাহিত্যিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। এই অধিবেশনে হাওড়া, কলিকাতা ও বাংলার সুদূর পল্লীঅঞ্চল হইতে আগত নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকগণ স্বরচিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন। তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযামিনীকান্ত সোম। হাওড়ার বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী ও যন্ত্রকুশলিগণ সমবেত শ্রোতাদিগকে আনন্দ পরিবেশন করিয়াছিলেন।

পরলোকে মণিলাল গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় পুত্র মণিলাল গান্ধী গত ৪ঠা এপ্রিল দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্বানের নিকটস্থ ফিনিক্সে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৯৪ সালের ২৮শে অক্টোবর তাঁহার জন্ম হয়। ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার শৈশব কাটিয়াছে। ১৯১৪ সালে তিনি পিতার সহিত ভারতে আসেন, কিন্তু ১৯১৮ সালে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রের সম্পাদক হইয়া পিতার আদেশে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া যান। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরোধিতা করিয়া তিনি বহুবার কারাদণ্ডভোগ করেন। তাঁহার পত্র ইংরাজি ও গুজরাটী উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইত। গত ডিসেম্বর মাসে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হন ও আর আরোগ্য লাভ করেন নাই। মিষ্টভাষী, ধর্মপ্রাণ, নিরামিষাশী মণিলাল তাঁহার পিতার অহিংস আদর্শের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ট্রফি ঃ

ক'লকাতার রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রঞ্জিট্রফির ফাই-নালে বোম্বাই ৮ উইকেটে বাংলাকে পরাজিত করে।

বাংলা ঃ ২৫৫ (পি সেন ৫৫, বি চন্দ ৫৫, শিবাজী বোস ৪০ ; হারদিকার ৩৯ রানে ৮, বালু গুপ্তে ১০১ রানে ২ উইকেট) ও **১৭৯** (শিবাজী বসু ৬৮। বালু গুপ্তে ৮০ রানে ৫ ও উমরীগড় ৩৯ রানে ৪ উইকেট)

বোম্বাই ঃ ৩০৮ (পলি উমরীগড় ১১২, পি কামাত ৬৯, এম কে মন্ত্রী ৬৮। পি চ্যাটার্জি ১০১ রানে ৭ উইঃ) ও **১২৯** (২ উইকেটে। রেলি ৪৯,)

বাংলা টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিন ৭ উইকেট পড়ে বাংলার ১৯৯ রান হয়। ২য় দিনে লাঞ্চের ৪০ মিনিট আগে বাংলার ১ম ইনিংস ২৫৫ রানে শেষ হয়। মনোহর হারদিকার ৩৯ রানে ৮টা উইকেট পান। বোম্বাই ২ উইকেট হারিয়ে ২১৫ রান করে। উমরীগড় সেঞ্চুরী করেন। ৩য় দিন বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংস শেষ ৩০৮ রানে, লাঞ্চের ২০ মিনিট পর। ফলে বোম্বাই ৫৩ রানে বাংলার থেকে এগিয়ে যায়। তৃতীয় দিনের খেলায় মোট ১৩টা উইকেট পড়ে—বোম্বাইয়ের ৮টা এবং বাংলার ৫টা। বাংলার ন্যাটা বোলার পি চ্যাটার্জি সবশুদ্ধ ৭টা উইকেট পান, ১০১ রান দিয়ে। বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভাল হয়েছিল। চা-পানের বিরতির সময় বাংলার ১ উইকেট পড়ে মোট রান ছিল ৯০ ; উইকেটে তখন শিবাজী বোস (৫৩) এবং বেচু দাশগুপ্ত (৫)।

৬৬ রানের মাথায় শিবাজী বোস ক্যাচ তুলে কপাল-জোরে বেঁচে যান। উমরীগড়ের বল বাংলার পক্ষে 'শক্তিশেল' হয়ে দাঁড়ায়। উমরীগড় এই দিন বাংলার ৪টে উইকেট পান। খেলা শেষের নির্দ্ধারিত সময়ে দেখা গেল ৫ উইকেট পড়ে বাংলার মাত্র ১৪০ রান উঠেছে। অর্থাৎ বাংলা মাত্র ৮৭ রানে এগিয়েছে, হাতে ৫টা উইকেট ; ওদিকে ২ দিনের খেলা বাকি। বোম্বাইয়ের ২য় ইনিংসের খেলাও বাকি। ৪র্থ দিনের এক ঘণ্টার খেলায় বাংলার বাকি ৫টা উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৩৯ রানে। ২য় ইনিংসে মোট রান দাঁড়ায় ১৭৯। এই দিন মনোহর হারদিকার একাই বাংলার বাকি ৫টা উইকেট পান।

বোম্বাই ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ; জয়লাভের জন্যে তাদের ১২৭ রান দরকার। তিনটে বাজতে দশ মিনিট সময়ে বোম্বাইয়ের ২ উইকেটে ১২৫ রানের মাথায় রেলি একটা বাউণ্ডারী মারেন ; তার ফলেই বোম্বায়ের আর ব্যাট করার দরকার পড়লো না, তারা ৮ উইকেটে জয়ী হ'ল। বোম্বাই এ নিয়ে ৮ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হ'ল। ইতিপূর্ব্বে তারা রঞ্জি ট্রফি পেয়েছে—১৯৩৪, ১৯৩৫, ১৯৪১, ১৯৪৪, ১৯৪৮, ১৯৫১ এবং ১৯৫৩ সালে।

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

টোকিওতে অনুষ্ঠিত ১৯৫৬ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের দলগত বিভাগে জাপান এবং মহিলাদের দলগত বিভাগে রুমানিয়া চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ১৯৫৫ সালেও জাপান এবং রুমানিয়া যথাক্রমে

পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছিলো।

আলোচ্য বছর ইণ্টার-গ্রুপ ফাইনালে 'এ' গ্রুপের বিজয়ী জাপান ৫-১ খেলায় 'বি' গ্রুপের বিজয়ী চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত ক'রে পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ান হিসাবে সোয়াথলিং কাপ পায়। জাপান এবং চেকোশ্লোভাকিয়া নিজ নিজ বিভাগের মোট ৭টি খেলাতেই জয়ী হয়েছিলো।

মহিলাদের দলগত বিভাগে রুমানিয়া ৭টি খেলাতেই জয়ী হ'য়ে কোর্বিলোন কাপ' পায়। ২য় স্থান পায় ইংলণ্ড —জয় ৬টা এবং হার ১টা।

পুরুষদের দলগত বিভাগে ভারতবর্ষের জয় ৩টে, হার ৪টে খেলা। নিজ বিভাগের তালিকায় ভারতবর্ষ ৫ম স্থান পায়।

ভারতবর্ষের জয় (৩) ঃ ভারতবর্ষ ৫—৩ খেলায় পর্ত্তুগেলকে, ৫—৪ খেলায় আমেরিকাকে এবং ৫—২ খেলায় দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে।

ভারতবর্ষের হার (৪) ঃ চীন ৫—০ খেলায়, ভিয়েৎনাম ৫—১ খেলায়, ইংলণ্ড ৫—২ এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ৫—০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

কোর্বিলোন কাপের খেলায় (মহিলাদের দলগত বিভাগ) ভারতবর্ষ ৭টার খেলার মধ্যে ১টায় জয়ী হয়ে তালিকায় সর্ব্ব নিম্ন স্থান পেয়েছে। ভারতবর্ষ ৩—২ খেলায় পিপিলস চীনকে পরাজিত করে।

ইংলণ্ড ৩—০, আমেরিকা ৩—২, হংকং ৩—২, জাপান ৩—০, রুমানিয়া ৩—০ এবং কোরিয়া ৩-০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ওচিরো ওগিমুরা (জাপান) ২১।১৩, ২২।২৪, ২১।১৮, ১৮।২১, ২১।১৩ পয়েণ্টে তোশিয়াকা তানাককে (হোল্ডার) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস তোমি ওকাওয়া (জাপান) ২১।১৫, ১৩।২১, ২৩।২১, ৯।২১, ২১।১৬ পয়েণ্টে মিস কিকো ওয়াতানবিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবল্‌স : ওচিরো ওগিমুরা এবং যোশিও তোমিতা (জাপান) ২১।১৩, ২১।১০, ২১।১১ পয়েণ্টে আইভান আন্দ্রিয়াদিস এবং লাডিশ্লাভ ষ্টিপেককে (চেকোশ্লোভাকিয়া, পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবল্‌স : মিসেস্ অ্যাঞ্জেলিকা রোজেনু, এবং মিস্ এলা জেলার (রুমানিয়া) ২১।১৪, ১৪।২১, ১৫।২২, ২১।১৯, ২১৯ পয়েণ্টে মিস কিকো ওয়াতানবি এবং মিস ফুজি এগুচিকে পরাজিত করেন।

অল-ইণ্ডিয়া রেগেটা ঃ

ক'লকাতার ঢাকুরিয়া লেকে অনুষ্ঠিত অল্-ইণ্ডিয়া রেগেটা প্রতিযোগিতার ফাইনাল ফলাফল—

উইলিংডন ট্রফি : ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব ১ লেংথ দূরত্বে মাদ্রাজ বোট ক্লাবকে পরাজিত করে। সময় ৩ মিঃ ১৭ সেঃ।

ভেনাবলস বাউল : লেক ক্লাব ৩ লেংথ দূরত্বে মাদ্রাজ 'এ' ক্লাবকে পরাজিত করে। সময় ৩ মিঃ ৪২ সেঃ।

ম্যাকলীন স্কালস : এ বি এল ষ্টীল (করাচী 'এ') ৩ লেংথ দূরত্বে এ এস আর্টোনিকে (লেক ক্লাব 'বি' পরাজিত করেন। সময় ৩ মিঃ ৪৪ সেঃ।

ডেভিস কাপ ঃ

ইষ্টজোনের ১ম রাউণ্ডে ভারতবর্ষ ৫—০ খেলায় সিংহলকে পরাজিত করেছে। ভারতবর্ষ পরবর্ত্তী রাউণ্ডে জাপানের সঙ্গে খেলবে।

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বোট রেস ঃ

ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বাৎসরিক বোট রেসে কেম্ব্রিজ ১¼ লেংথ দূরত্বে অক্সফোর্ডকে পরাজিত করে। এই দূরত্ব পথ অতিক্রম করতে কেম্ব্রিজের সময় লাগে ১৮ মিঃ ৩৬ সেঃ। টেমস নদীর উপর এই বোট রেসের দূরত্ব ৪¼ মাইল (পুটনী ব্রীজ থেকে মর্টলেক পর্য্যন্ত)। ১৮৫৭ সাল থেকে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বোট রেস আরম্ভ হয়েছে। কেম্ব্রিজ জয়ী হয়েছে ৫৫ বার এবং অক্সফোর্ড ৪৬ বার। ১৮৭৭ সালে প্রতিযোগিতা অমীমাংসীত থেকে যায়। ১৯৫৫ সালেও কেম্ব্রিজ জয়ী হয়।

রাজ্য ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

১৯৫৬ সালের রাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নাম ঃ পুরুষদের সিঙ্গলসে মনোজ গুহ ; ডবলসে মনোজ গুহ এবং সুনীল বসু ; মহিলাদের সিঙ্গলসে মীরা দাস ; মিক্সড ডবলসে নমীতা বোস এবং মনোজ গুহ।

অল-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন ঃ

অল-ইংলণ্ড আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় মালয় এবার নিয়ে উপর্য্যুপরি সাত বার পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে এডি চোং জয়ী হন। চোং ১৯৫৩ এবং ১৯৫৫ সালেও সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। এবারও মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পান, গতবারের চ্যাম্পিয়ান মিস মার্গারেট (আমেরিকা)। মালয় পায় পুরুষদের সিঙ্গলস, আমেরিকা পায় মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডবলস, ডেনমার্ক পায় পুরুষদের ডবলস এবং ইংলণ্ড পায় মিক্সড ডবলস খেতাব। পাঁচটি ফাইন্যাল অনুষ্ঠানের মধ্যে ডেনমার্কের প্রতিনিধি তিনটিতে উঠেছিলেন—পুরুষদের সিঙ্গলস, ডবলস (দু' জোড়াই ডেনিস) এবং মিক্সড ডবলস। আমেরিকা দুটিতে—মহিলাদের সিঙ্গলস (অল-আমেরিকান ফাইন্যাল) এবং ডবলস।

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধ ঃ

বিশ্ব ওয়েলটার ওয়েট বিভাগে জনি সাক্সটন (নিউ-ইয়র্ক নিগ্রো) ১৫ রাউণ্ডের লড়াইয়ে কার্মেন ব্যাসিলিওকে পরাজিত ক'রে পুনরায় বিশ্ব খেতাব লাভ করেছেন। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে কিড গ্যাভিলনকে (কিউবা) হারিয়ে সাক্সটন প্রথম বিশ্ব খেতাব পান। কিন্তু গত বছর এপ্রিল মাসে টনি ডেমার্কোর কাছে খেতাব হারান। গত জুন মাসে এই বিশ্ব খেতাব হাত ছাড়া হয়ে ব্যাসিলিওর কাছে আসে।

পাক-ইংলণ্ড টেষ্ট ম্যাচ ঃ

করাচীর ৪র্থ বা শেষ বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড (এম সি সি 'এ' টীম) ২ উইকেটে পাকিস্তানকে পরাজিত করে। মোট ৪টি টেষ্ট খেলার ফলাফল দাঁড়ায়—পাকিস্তানের জয় ২, ইংলণ্ডের জয় ১ এবং খেলা ড্র ১।

৪র্থ টেষ্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ

পাকিস্তান ঃ ১৭৮ (ওয়াজির মহম্মদ ৭৬, লক ৪৯ রানে ৫ উইকেট) ও **১৩০** (মস ২৭ রানে ৩ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ ১৮৪ (ক্লোজ ৭১ ; ফজল মহম্মদ ৬৫ রানে ৬ উইকেট) ও **১২৬** (৮ উইকেটে)।

টেবল টেনিস ঃ

বাংলার টেবল টেনিস খেলার ১৯৫৫ সালের ক্রমপর্য্যায় তালিকায় শ্রী বি, এন্, লাহিড়ী শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। মহিলাদের বিভাগে শ্রীমতী চমন কাপুর ও কুমারী উষা

বি, এন, লাহিড়ী

আয়েঙ্গার এক সাথে শীর্ষস্থানে আছেন। নীচে খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় তালিকা দেওয়া হল।

পুরুষ	মহিলা
১। বি, এন, লাহিড়ী	১। সি, কাপুর
২। ই, সলোমন	উষা আয়েঙ্গার
৩। জে, ব্যানার্জ্জী	৩। তপতী মিত্র
৪। এস, ঘোষ	
৫। এস, মুখার্জ্জী	

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—নিউজিল্যাণ্ড টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

অক্‌ল্যাণ্ডের ৪র্থ অর্থাৎ শেষ টেষ্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ড ১৯০ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে দিলে নিউজিল্যাণ্ড তার টেষ্ট ক্রিকেট জীবনে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ জয়ের রেকর্ড করে। এ পর্য্যন্ত নিউজিল্যাণ্ড বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মোট ৪৫টি টেষ্ট ম্যাচ খেলেছে। ফলাফল—নিউজিল্যাণ্ডের জয় ১, হার ২২, খেলা ড্র ২২। এখন নিউজিল্যাণ্ডের 'টেষ্ট রাবার' পাওয়া বাকি রইলো। যে সব দেশ এ পর্য্যন্ত টেষ্ট ক্রিকেট খেলেছে তাদের মধ্যে এক নিউজিল্যাণ্ডই 'রাবার' লাভ করতে পারে নি। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে দুই দলের মধ্যে কেবল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এভার্টন উইকস সেঞ্চুরী করেন। উইকসের তিনটে সেঞ্চুরী—১ম টেষ্টে ১২৩, ২য় টেষ্টে ১০৩ এবং ৩য় টেষ্টে ১৫৬।

৪র্থ টেষ্টের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ২৫৫ (রীড ৮৪) ও **১৫৭** (৯ উইকেটে ডিক্লেঃ, এ্যাটকিনসন ৫৩ রানে ৭ উইঃ)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ১৪৫ (কেভ ২২ রানে ৪, ম্যাক্‌গীবন ৪৪ রানে ৪ উইকেট) ও **৭৭** (কেভ ২১ রানে ৪, বিয়ার্ড ২২ রানে ৩ এবং এ্যালবেষ্টার ৪ রানে ২ উইঃ)

জাতীয় স্কুল গেমস ঃ

কটকে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল গেমস প্রতিযোগিতায় **মধ্যপ্রদেশ** চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ বালকদের বিভাগ—১ম মধ্যপ্রদেশ (৪২ পয়েণ্ট); ২য় পশ্চিম বাংলা (৩২ পয়েণ্ট) এবং পেপসু (৩২ পয়েণ্ট)

বালিকা বিভাগ—১ম মধ্যপ্রদেশ (৪৬ পয়েণ্ট); ২য় উড়িষ্যা (৪২ পয়েণ্ট)।

মহিলা হকি প্রতিযোগিতা ঃ

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্টার-স্টেট মহিলা হকি প্রতিযোগিতায় বাংলা এবং বোম্বাই দল যুগ্মভাবে জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি গোল শূন্য ড্র যায়। ২য় দিনে উভয় পক্ষেই একটি ক'রে গোল হয়। অতিরিক্ত সময় খেলা সত্ত্বেও কোন পক্ষই চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করতে পারে নি।

হকি লীগ ঃ

ক'লকাতার প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলের সঙ্গে ভবানীপুরের জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল।

বর্ত্তমানে একমাত্র মোহনবাগান ক্লাবই অপরাজেয় আছে। নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ভবানীপুর ক্লাবকে ৩—০ গোলে পরাজিত ক'রে গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান এবারও লীগ বিজয়ের পথ অনেক পরিষ্কার ক'রে নেয়; এখন বাকি ২টো খেলা থেকে আর মাত্র একটা পয়েণ্ট নিতে পারলেই লীগ চ্যাম্পিয়ান খেতাব তাদের হাতে এসে যাবে। ভবানীপুর-পুলিশের খেলা ড্র হওয়াতে মোহনবাগানের লীগ পাওয়ার পথ আরও পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।

গান

মধু গুপ্ত

তোমায় ধরিয়া রাখিতে শিল্পী
কতনা প্রহর জাগে,
সুর-সাধকের কণ্ঠ তোমায় পেতে চায় গীতিরাগে !!
আমি যে প্রেমিক প্রেমভরা মন ল'য়ে,
স্বপনে তোমার রহিগো বিভোর হ'য়ে ;—
জীবনে আমার দেখা দাও যদি প্রিয়া হ'য়ে অনুরাগে !!

সূর্য্যের সাথে ভোরের আকাশে বাহির হ'য়েছি আমি,
রাত্রি নামার সাথে সাথে হই চন্দ্রের অনুগামী !!
যদি পাই দিশা সূর্য্য চাঁদের কাছে,
কোন আলো হাসি তোমার ভুবনে আছে ;
সার্থক হয় প্রাণের-সাধনা
এ জীবন ভালো লাগে !!

গন্ধরাজ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ফুলের রাজা গন্ধরাজ। তার গন্ধে মাতোয়ারা হয় বাতাস, আকৃষ্ট হয় ভ্রমর, মুগ্ধ হয় মানুষ। তার পাপড়িতে পাপড়িতে কি মোহিনী লুকান আছে কে জানে?

তেমনি আজ বলতে পারা যায় গল্পের রাজাও গন্ধরাজ। দশটি ছোট গল্পের দলে তার সুরভি প্রকাশ। যাঁরা নারায়ণ বাবুর উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁরা তাঁর এ কয়টি ছোট গল্প পাঠ করলে চমৎকৃত হবেন,—কেমন দক্ষতা তাঁর রচনায়, কতখানি শক্তি তাঁর কাহিনীর ইন্দ্রজাল সৃজনে!

মানুষের মন কত বিচিত্র। তার পরতে পরতে কত চাওয়া-পাওয়া, কত আশা-নিরাশা জমা রয়েছে কে জানে, কখন সে কি করে তার হেতু তার নিজের কাছে জানা নেই। প্রত্যেকটি গল্পে মানুষের মনের সে বিচিত্র খেলা দেখতে পাওয়া যাবে। 'ধস' গল্পটিতে শয্যাশায়ী ভবতোষ "উন্মত্ত দানবীয় শক্তিতে কাঠ সরাচ্ছে," সে শক্তির উৎস কোথায়, নারায়ণবাবু তার সন্ধান দিয়েছেন। 'কল্প পুরুষ' গল্পে তিনি দেখিয়েছেন, বিবাহের অর্থ কি, বৈধব্যের তাৎপর্য কি, কেন প্রেমিক শিবেনের হাতের মালা প্রেমিকা অমিতার গলায় পড়লো না, মাটিতে পড়ে গেল, এক অজানা কল্পিত পুরুষ তাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'তাস' গল্পে রেখা পুড়িয়ে ফেলেছিল তাস, না তার মনের গোপন ভাবটিকে সে কথাটা লেখক কেমন সহজ ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন তা না পড়লে বুঝতে পারা যাবে না। হরিণের রঙ, দরজা, গন্ধরাজ কয়টি গল্পই বড় করুণ—মানুষের সুখ দুঃখের কত কথায় রচিত।

'ইদু মিঞার মোরগা' কাহিনীটি না পড়লে কেউ জানতেই পারবেন না 'হাস্যরস সৃষ্টিতেও নারায়ণবাবুর হাত কত পাকা। বাংলা সাহিত্যে হাসির গল্পের 'ইতিহাস যদি কখনও কেউ লেখেন, 'ইদু মিঞার মোরগা'র কক্কর-কঃ ডাক শুনতে পাওয়া যাবে নিশ্চিত।

ছোট গল্পের এ সংকলনটি পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

সুরুচি সেনগুপ্তার শ্রেষ্ঠ গল্প :

লেখিকার স্বনির্বাচিত এগারোটি ছোটগল্পের সংকলন। ছোটগল্পের যুগ না হলেও শ্রেষ্ঠ গল্পের যুগ। সুতরাং সে দিক থেকে গ্রন্থখানি যুগোপযোগী হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই।

লেখিকা বাংলা সাহিত্যে তাঁর পরিচিতি পূর্বেই অর্জন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে যে গল্পগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সেগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পগুলির লিখনভঙ্গী বেশ সহজ ও সাবলীল। মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস ও আবেগ প্রবণতায় বাস্তবতার গতি ব্যাহত হ'লেও, কয়েকটী গল্প পাঠকের মনে রেখাপাত করে। 'শেষের পরিচয়', 'লেবুফুল' এবং 'প্রিয়া ও জননী' গল্প তিনটী উল্লেখযোগ্য।

[প্রকাশিকা : সুরুচী সেনগুপ্তা। 'সুরুচী কুটীর' ২০, জুবিলী পার্ক। কলিকাতা—৩৩। দাম—৩৷৷০ টাকা।]

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

নাচের ইতিকথা : (প্রথম খণ্ড)

শ্রীগোপী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীদেবপ্রসাদ বসু

ভূমিকায় শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন—"নৃত্য কলা যে জাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন এ কথা আজ আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে শিখেছি। * * সেকেলে সাহিত্যিকদের ভূরি পরিমাণ রচনার দৌলতেই আমরা আজ প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, কিন্তু বাংলাদেশে নাচ আজ লোকপ্রিয় হ'লেও তাকে অবলম্বন করে কোন স্থায়ী সাহিত্য গড়ে ওঠে নি। * * লেখক প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর নাচ নিয়ে একটি নির্ভরযোগ্য মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন এবং তার ব্যবহারিক দিকটাও বাদ দেন নি।"

পুস্তকের বিষয় বস্তু মোট ৪ ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগে ত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য কলার উৎপত্তি। দ্বিতীয় ভাগে ৩০ পৃষ্ঠায় নৃত্য কলার প্রয়োগ সূত্র। তৃতীয় ভাগে ১৮ পৃষ্ঠায় নৃত্য শিক্ষার অভ্যাস পদ্ধতি ও চতুর্থ ভাগে ২২ পৃষ্ঠায় ভারত-নাট্যমের পূজারিণী নৃত্য, কথাকলির নমস্কারম্ নৃত্য, সাঁওতালী ঝুড়ি নৃত্য এবং সাপুড়ে নৃত্যের শিক্ষালাভ প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। লেখকদ্বয় এই পুস্তকে বহুসংখ্যক নৃত্য-চিত্র ও মুদ্রা-চিত্র প্রকাশ করিয়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ দান করিয়াছেন। এখন ঘরে ঘরে বালক বালিকাগণকে নৃত্য-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে—কাজেই এই গ্রন্থও সর্বত্র আদৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

[প্রাপ্তিস্থান : ঢাকা ষ্টুডেণ্ট লাইব্রেরী। ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ; কলিকাতা—১২। দাম—২৷৷০ আনা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ত্রিবেণী : অনুরূপা দেবী

আজকের দিনে আত্মবিস্মৃত আত্মঘাতী বাঙালী জাতির পক্ষে তার প্রাচীন গৌরবময় সুবর্ণ যুগ পাল বংশের যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য। বাংলার পালবংশ একদা সমগ্র ভারত জয় করে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। এই বংশেরই রাম পাল ত্রিবেণী উপন্যাসের প্রধান নায়ক। আলোচ্য গ্রন্থে পাত্রপাত্রী ও গল্প সংস্থান সম্বন্ধে লক্ষ্য করে দেখা গেল, ঐতিহাসিকতার সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা ছাড়া স্থানে স্থানে রোমান্টিকতার রস-মাধুর্য্য উপভোগ্য হয়েছে। প্রবীণা স্বনামধন্যা গ্রন্থকর্ত্রীর লিপিচাতুর্য্যে ত্রিবেণীর রসকলস্বনায় সারস্বত কেদার বাহিনী ধারার পরিচয় পেয়ে আনন্দলাভ করা গেল।

দিব্যের মৃত্যুর পর বরেন্দ্রীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ভীম যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে অজেয় করে তুলেছিলেন, সেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ভীমের জাঙ্গাল নামধেয় দুর্গপ্রাচীর ভেদ করে মহামহিমান্বিত রাম পাল একদা বিজয়কেতন উত্তোলন করে রাজ্যেশ্বর হোলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী ভীম কারাকক্ষে আবদ্ধ রইলেন। বরেন্দ্রভূমির উদ্ধারকারী মহারাজাধিরাজ রাম পালের কীর্ত্তিগাথা রচনা করলেন রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী, আর তা চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হোলো। অবশেষে কৈবর্ত্তপতি ভামকে রাম পাল মুক্তি দিলেন। গ্রন্থে রাম পালের আদর্শ চরিত্রের আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় ত্রিবেণীর জনপ্রিয়তা, তবে এর ভাষা ও রচনাশৈলী প্রাচীন পদ্ধতি সম্মত। যাঁদের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বোধ আছে এবং বাংলার প্রাচীন ঐতিহাসিকতার দিকে অনুরাগ আছে, তাঁদের পক্ষে ত্রিবেণী বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক হবে ; সাধারণ শ্রেণীর পাঠক পাঠিকারা আভিধানিক দুর্বোধ্য শব্দ-ভারাক্রান্ত এই উপন্যাস পাঠে আনন্দলাভ করবেন, এরূপ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না।

[প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিসিং কোং লিঃ। ৯৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য ৫॥০ আনা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শিকারী-জীবন : শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

উচ্চশ্রেণীর শিকার কাহিনী বলিতে আমরা ঠিক যে বস্তু আশা করি, আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনীগুলি ঠিক সেই শ্রেণীর নয়। তবে একথাও নিশ্চিত যে শিকারী জীবনের বিচিত্র উন্মাদনার স্পর্শ ইহার সর্বত্র ছড়াইয়া আছে বলিয়া শিকার-কাহিনী হিসাবেও বইখানি জনপ্রিয় হইবে। গ্রন্থের রচয়িতা শুধু শিকারী নন, তিনি একজন সুখ্যাত সাহিত্যিক, সে জন্য স্বভাবতঃই তাঁহার রচনা রস-সমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

বইখানির বহিরাবরণ মনোরম। আয়তন ও রূপসজ্জার নিরিখে দাম সস্তা বলা চলে।

[প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩, হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা ৭। মূল্য ৩॥০ আনা।]

পরিক্রমণ : শান্তশীল দাশ

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের লেখক শ্রীশান্তশীল দাশ রবীন্দ্রধর্ম্মী কবিগোষ্ঠীর একজন এবং তিনি পুরাতন রীতিতে ছন্দবদ্ধ রসস্নিগ্ধ কবিতা রচনায় ইতিপূর্ব্বেই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। পরিক্রমণের প্রেমের কবিতাগুলি সহজ সুর ও আন্তরিকতার জন্য পাঠক হৃদয় স্পর্শ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। পরিচ্ছন্ন রুচি সম্মত প্রচ্ছদপট গ্রন্থটির মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিয়াছে।

[প্রকাশক : তুলি-কলম। ৫৭।এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ২৲ টাকা।]

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "শ্রেষ্ঠ গল্প" (স্ব-নির্বাচিত)—৪৲
শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত ইতিহাস "স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম" (১ম খণ্ড—২য় সং)—৩৲
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "নবীন যুবক" (৪র্থ সং)—২॥০
কল্যাণী প্রামাণিক প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "শিশুতরু"—২৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ "রাজমোহনের বৌ"—২৲, ত্রৈলোক্যনাথের "কঙ্কাবতী"—২৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত সঞ্জীবচন্দ্রের "কণ্ঠমালা"—২৲
স্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "গহন রাতের ছায়া"—১॥০
শ্রী[illegible]চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "দেশপ্রেমে ভারতবাসী"—৸৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

গীতার উপক্রম, বিষয় ও উপসংহারে সঙ্গতি

শ্রীপরেশপ্রসন্ন সেন

গীতার সূত্রপাত ধৃতরাষ্ট্রের একটি প্রশ্নে। এই প্রশ্ন করিবার পূর্বেই তিনি সঞ্জয়ের নিকটে যুদ্ধবৃত্তান্ত অনেক দূর পর্যন্ত শুনিয়াছেন; ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; কৌরব ও পাণ্ডব—দুই চিরশত্রু যুদ্ধার্থে কুরুক্ষেত্রে সমবেত, উভয় পক্ষের দুই সেনা পরস্পরের সম্মুখীন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত; যুদ্ধদিবস প্রাতে উভয়পক্ষের সেনানায়কগণ ব্যূহ রচনা সমাপন করিয়া যুদ্ধারম্ভের সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব; এই অবধি শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'বল, বল সঞ্জয়, তার পরে কে কি করিল?'

উত্তরে সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন, "পাণ্ডবসেনা ব্যূহ রচনা করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া দুর্যোধন আচার্যের নিকটে গিয়া বলিলেন, 'চাহিয়া দেখুন, উভয়পক্ষই প্রস্তুত, তবে আর বিলম্ব কেন?' এই কথা শুনিয়া কৌরব সেনাপতি ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করিয়া সঙ্কেত করিলেন, তখন উভয়পক্ষে তুমুল ধ্বনি উত্থিত হইল। অর্জুন দেখিলেন—কৌরব সেনা প্রস্তুত, তখন তিনি শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্ত হইয়া ধনু উদ্যত করিলেন—এই পর্যন্ত গীতাশাস্ত্রের উপক্রম, ভূমিকা; ইহার পর ঘটনাস্রোত এক অপ্রত্যাশিত ধারায় প্রবাহিত হইল, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন এক অতি দীর্ঘ 'অদ্ভুতং রোমহর্ষনং' সংবাদ, অর্জুনের বিষাদ, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে সেই বিষাদের বিনাশ ও সবশেষে তিনি উপসংহার করিলেন এক অনাবশ্যক ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া—কৃষ্ণার্জুন যে পক্ষে, সেই পক্ষেরই জয় অবধারিত—ইহাই আমার মত।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণাম যে কী হইবে, সে সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তিনি নিশ্চিত জানিতেন, এই যুদ্ধে বিজয়ের কোন আশাই নাই,—সঞ্জয় ইহা জানেন। তার উপরে, যুদ্ধারম্ভের কিছুদিন পূর্বে স্বয়ং ব্যাসদেব হস্তিনায় আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যখন দিব্য-চক্ষুদানের প্রস্তাব করেন, সঞ্জয় তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দান নেন নাই, কারণ তাঁহার পরম-প্রিয় সন্তানগণের ভীমার্জুনের হস্তে দুর্গতি স্বচক্ষে দেখিতে তাঁহার রুচি হয় নাই। সেই জন্যই সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করিতে তিনি ব্যাসদেবকে অনুরোধ করেন। তারপরে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, দশদিন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, এই দুঃসংবাদও তিনি সঞ্জয়ের মুখেই শুনিয়াছেন। পরে প্রশ্ন করিয়া কেমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কে কি করিল, এখন তাহাই শুনিতেছেন। এমন অবস্থায় সঞ্জয়ের ঐ মন্তব্যের প্রয়োজনীয়তা কী ছিল ?

এ সময়ে সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি বহুবিধ যোগের ব্যাখ্যা শুনিবার আগ্রহেও তিনি প্রশ্ন করেন নাই ; শুনিতে যে তিনি কোনরূপ উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন, তাহাও মনে হয় না। সঞ্জয় একাদিক্রমে অধ্যায়ের পর অধ্যায় বলিয়া যাইতেছেন, তিনি নীরবে কেবল শুনিতেছেন। সঞ্জয়ের মন্তব্যের পরেও তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হয় নাই—ইহা নিতান্তই অস্বাভাবিক নয় কী ?

গীতার উপক্রম ঐতিহাসিক, গীতার বিষয়বস্তু শাস্ত্রীয় ধর্মতত্ত্ব, গীতার উপসংহার এক মন্তব্য—হিতোপদেশের গল্পের উপসংহারে উক্ত নীতিবাক্যের অনুরূপ ; এই তিনের মধ্যে যে সুসঙ্গতি নাই, ইহা সুস্পষ্ট। এই কারণে ভাষ্যকার, টীকাকার, ব্যাখ্যাকারবর্গ সঙ্গতি প্রতিষ্ঠায় যত্ন করিয়াছেন ; কেহ বলেন গীতা ইতিহাস, ইতিহাসে এমন ঘটনা অসম্ভব নহে ; কেহ বলেন গীতাশাস্ত্র, ইতিহাস একটা উপলক্ষ মাত্র ; কেহ বলেন গীতা রূপক। পড়িয়া দেখিয়াছি, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নহে, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় ইতিহাস উড়িয়া যায়। তবে গীতাকে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে রূপকের সাহায্যে রচিত ধর্মশাস্ত্র মনে করিতে পারিলে মনে হয় যেন সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

গীতা রূপক হইলে এই শাস্ত্রের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিও রূপক নিশ্চয়। এই শাস্ত্রের প্রধান চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ; তাঁহারা কি রূপক ?

গীতার প্রথম অধ্যায় 'অর্জুনবিষাদযোগ', শেষ অধ্যায় 'মোক্ষযোগ' ; মহাভারত-ইতিহাসে আমরা অর্জুনের স্বভাবের যে পরিচয় পাই, গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখি সেই স্বভাবকে বিষাদরাহু পূর্ণগ্রাস করিয়াছে, অর্জুন বলিতেছেন, 'আমি এই যুদ্ধ করিব না!' শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিয়া শেষ অধ্যায়ে তিনি বলিলেন, 'আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, 'যুদ্ধ করিব'—তাঁহার স্বভাব রাহুগ্রাস হইতে মোক্ষলাভ করিল। বিষাদ দূর হইল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বুঝিলাম, কিন্তু বিষাদ উপস্থিত হইল কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বেশী ভাল করিয়া অর্জুনের স্বভাবকে আর কে জানিতে পারেন ? সেই শ্রীকৃষ্ণই এই বিষাদ দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং'—তোমাতে এই মোহ কোথা হইতে আসিল ? এই প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন যাহা বলিলেন, উহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিলেন, বলিলেন—'ও বুঝিলাম, পণ্ডিতের মুখে শোনা কথা আবৃত্তি করিলে ; কিন্তু পণ্ডিতের কথা পরিপাক করিতে পার নাই ; এখন আমি যা বলি, শোন।'

আচ্ছা, রণক্ষেত্রে, সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে অবস্থিত হইয়া অর্জুনের এই ক্লৈব্য এই হৃদয়দুর্বলতা কেন ? এই 'প্রজ্ঞাবাদ'ই বা কেন ? এ সকল কথা কি তিনি আগে বলিতে পারিতেন না ? ভীষ্মদ্রোণের সঙ্গে ইহার পূর্বে আর কি কখনো তিনি যুদ্ধ করেন নাই ?

বিরাট পর্বে তিনি একাকী সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, উদ্‌যোগ পর্বে তাঁহাকে দেখি—ভীমেরই মত অধীর আগ্রহে তিনি শত্রু-বিনাশের সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেছেন। যুদ্ধারম্ভের পূর্বদিন রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে সর্বসমক্ষে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন—'ভীষ্মকেই আমি প্রথমে বধ করিব।' রাত্রি প্রভাতে মহা উৎসাহে রণসাজে সাজিয়া রণক্ষেত্রে আসিলেন, শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্ত হওয়ার পর অকস্মাৎ তাঁহার কি জানি কি হইল, তিনি বলিলেন, 'হে কৃষ্ণ, রথখানি দুই সেনার মধ্যভাগে স্থাপন কর, আমি একবার দেখিয়া লই, যুদ্ধ করিতে হইবে তাঁহাদের সঙ্গে, কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যম্ !' এ আবার কেমন কথা, তিনি কি কিছু না জানিয়াই যুদ্ধ করিতে

আসিয়াছেন ? তারপর আজন্ম শক্রদের দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, ইঁহারা স্বজন, বান্ধব, মিত্র ; তখন তাঁহার শরীর কাঁপিল, গায়ে কাঁটা দিল, মুখ শুকাইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িয়া গেল ! অর্জুনের এই স্নায়বিক দৌর্বল্য কি ঐতিহাসিক, না ইহার আর কোন কারণ আছে ? আরও দেখ, এই ব্যাধির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জুন কৃষ্ণকে শুনাইলেন এক বক্তৃতা। এই চমৎকার বক্তৃতাটী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'ইহা এক অতি উৎকৃষ্ট কাব্য ; কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে।' 'মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি, ভ্রমতীব চ মে মনঃ', তাহার লক্ষণ কি এই কাব্য ?

এই সকল প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া উচিত নহে, মানি, তবু হইয়াছিল এবং গীতার ভাষ্যে ও টীকায় অনুসন্ধান করিয়া উত্তরও পাইয়াছি ; দেখিয়াছি অর্জুনের স্বভাবে বিষাদ আগমের কারণ সম্বন্ধে দুই মত আছে ; একটি ঐতিহাসিক, অন্যটি দার্শনিক বা শাস্ত্রীয়। প্রথমে ঐতিহাসিক মতটী সংক্ষেপে বলিব।

কুরুক্ষেত্র পূর্বে রণক্ষেত্র ছিল না, ছিল এক অতি উচ্চস্তরের ধর্মক্ষেত্র—শ্রুতি ও ইতিহাসে 'প্রমাণ' পাওয়া যায়। সকলেই জানেন, স্থান বিশেষে মানুষের মনে তদনুযায়ী ভাবের উদয় হইয়া থাকে ; কুস্থানে মনে কুভাব আসে, পুণ্যস্থানে ধর্মভাব আসে, শ্মশানে বৈরাগ্য আসে। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের স্থানমাহাত্ম্যে অর্জুনের মনে এই ধর্মভাব আসিয়াছিল ; হিংসায় অপ্রবৃত্তি, স্বজন হত্যায় ও মিত্রদ্রোহে আপত্তি, যুদ্ধে বিরক্তি বা বৈরাগ্য এমন ধর্মক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব নহে, বরং স্বাভাবিক—অর্জুনের মনোভাব শ্মশান-বৈরাগ্যের সমতুল্য।

ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, এই মত সুনিশ্চিত নহে। ধর্মক্ষেত্রের প্রভাব কি কেবল কুরুক্ষেত্রে 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' সীমাবদ্ধ ? সেখানেও এই মহিমার প্রদীপটী জ্বলিয়া উঠিলে শ্রীকৃষ্ণ উহাকে ফুৎকারে নির্বাপিত করিয়া দিবেন কেন ? এত বড় বিরাট ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আর ত কাহারও মনে যুদ্ধে বৈরাগ্যের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না ! যুধিষ্ঠিরের মনে শ্মশানবৈরাগ্য আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কখন ? কুরুক্ষেত্র যখন মহাশ্মশানে পরিণত, তখন। ভাবিয়া দেখ, অর্জুনের এই মনোভাব যদি ধর্মভাবই হইবে, তবে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে 'কশ্মলং' বা মোহ বলিবেন কেন ? শ্রীকৃষ্ণের মতে যাহা মোহ, ক্লৈব্য, অনার্যোচিত মনোবৃত্তি তাহাকে ধর্মভাব, শ্মশানবৈরাগ্য বলা সঙ্গত নহে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ধর্মভাব নষ্ট করেন নাই, নষ্ট করিয়াছেন মোহ, শোনা কথার পাণ্ডিত্য।

দার্শনিক মতটী আচার্য শঙ্করের ; তাঁহার দৃষ্টিতে গীতা ইতিহাস নহে, গীতা উপনিষৎ, গীতা যোগশাস্ত্র। গীতার প্রথমাংশ ঐতিহাসিক, শর সে অংশের ভাষ্য রচনার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। তাঁহার মতে গীতা উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের মতই শাস্ত্র, সেইজন্যই এই গ্রন্থ তাঁহার নিকটে 'ব্যাখ্যার যোগ্য', সেই কারণেই ইহার শাস্ত্রীয় অর্থপ্রকাশের জন্য তিনি যত্ন করিয়াছেন, ভাষ্য ভূমিকায় এই শাস্ত্রের 'প্রয়োজন' বুঝাইয়াছেন, 'বিষয়' বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মত, 'শোকমোহসাগরে নিমগ্ন অর্জুনকে আত্মজ্ঞানদানে ঐ সাগর হইতে উদ্ধার করাই এই গীতা শাস্ত্রের প্রয়োজন।' এই প্রয়োজন হইল কেন ?

'মোহ' বা মূঢ়তার কারণ 'অজ্ঞান' ; অজ্ঞান আত্মজ্ঞানের অভাব বা আত্মজ্ঞানবিরোধী জ্ঞান, আত্মা সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান, ভুল বিশ্বাস। এই মিথ্যা বা ভুল জ্ঞানের দরুণ আমাদের মনে আত্মপর ভেদবুদ্ধি হয়, আমরা ভাবি, 'অয়ং নিজঃ পরোবেত্তি'—ইনি আমার স্বজন, আপন, প্রিয়—আর উনি আমার পর, শক্র, অপ্রিয়। মিথ্যাজ্ঞানজনিত মোহে অভিভূত হইয়া আমরা মমত্ববোধে আপনজনের অনিষ্ট আশঙ্কায় উদ্‌বিগ্ন হই, বিষাদগ্রস্ত হই, আপনজনকে হারাইব ভাবিতেই শোকে আচ্ছন্ন হই, হারাইয়া ফেলিলে ত কথাই নাই। এই ব্যাধির একটিমাত্র ঔষধ আছে, উহা আত্মজ্ঞান, আত্মবিদ্যা—'তরতি শোকং আত্মবিৎ'। এই ব্যাধিতে মানবজাতি আচ্ছন্ন, মানবজাতিকে শোকমোহসাগর হইতে উদ্ধার করার জন্য ধর্মসংস্থাপনই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য, অর্জুন এই শাস্ত্রে নিমিত্ত বা উপলক্ষমাত্র। দাতা কোন কিছু দান করিতে সঙ্কল্প করিলেই ত দান করা সম্ভব হয় না, দানপ্রার্থী একজন কেহ উপস্থিত না হইলে দান চলে না। শোকমোহাতীত হওয়ার উপদেশ দান করিতে হইলে দাতা চাই। দাতা শ্রীকৃষ্ণ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পুরুষোত্তম, প্রার্থী নানা গুণে

বিভূষিত কর্মযোগী, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন। কিন্তু ঐতিহাসিক অর্জুন আত্মজ্ঞানপ্রার্থী হইবেন, ইহা স্বাভাবিক নহে। অতএব শাস্ত্রের প্রয়োজনে গীতার অর্জুন মোহে আক্রান্ত, শোকমোহসাগরে নিমগ্ন; প্রথম অধ্যায়ে তিনি শোক-সংবিগ্নমানসঃ' আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি অনুশাসনপ্রার্থী।

শঙ্কর বুঝাইয়াছেন, শ্রুতিশাস্ত্রে দুই ধর্মের নির্দেশ আছে, প্রবৃত্তিধর্ম ও নিবৃত্তিধর্ম। সংসারী পুরুষের ধর্ম প্রবৃত্তিধর্ম, সংসারধর্ম। এই ধর্মে 'নীতি' অর্থাৎ অগ্রগতির পথ কর্মনিষ্ঠা। শ্রুতিশাস্ত্রে 'কর্ম' শব্দের পারিভাষিক অর্থ শ্রৌতকর্ম, ইষ্টকর্ম, যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্ম। শ্রুতিতে এই কর্মনীতি সংক্ষেপে নির্দিষ্ট, শ্রুতির অনুগত স্মৃতিতে কর্মপ্রবন্ধ সবিস্তারে বর্ণিত। স্মৃতিতে উক্ত আছে, 'শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং কর্ম নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠান করিলে মানব ইহলোকে পায় কীর্তি, আর পরলোকে পায় অতুলনীয় সুখ। শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিহিত কর্মের ফলকে শাস্ত্রে বলে 'অর্থ'। অনুষ্ঠেয় কর্ম ধর্ম, বহু কর্ম বলিয়া কর্মবর্গ বা ধর্মবর্গ, কর্মবর্গের ফলসমূহ অর্থবর্গ; অর্থবর্গ কাম বা ভোগের উপকরণ, ভোগ নানাপ্রকার, তাই কামবর্গ; কাম তৃপ্ত হইলে সুখ বা মোক্ষ বা কামমুক্তি, মোক্ষবর্গ লাভ হয়। কাম যখন পরিতৃপ্ত হয় তখন মানব মনে করে, আমি ধন্য হইলাম, কৃতকৃত্য হইলাম, জন্ম সার্থক হইল। ইহাকেই সংসারী পুরুষ বলেন, 'পুরুষার্থ' লাভ, 'চতুর্বর্গ'সাধনা।

নিবৃত্তিধর্মাবলম্বী পুরুষ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী; এই ধর্মও শ্রুতিতে উক্তআছে উপনিষদে; এই শ্রুত্যুক্ত ধর্মের কোনও স্মৃতি নাই; গীতা সেই অভাব পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। এই ধর্মে নীতি কর্মত্যাগ, সন্ন্যাস সকল রকমের শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মসন্ন্যাস, সর্বকর্মসন্ন্যাস। সন্ন্যাস-নিষ্ঠার ফল জ্ঞান; উপনিষদে 'জ্ঞান' শব্দের পারিভাষিক অর্থ আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান, আত্মা আর ব্রহ্ম যে দুই নহে, একই বস্তু এই জ্ঞান। আত্মা ও ব্রহ্মকে একীকরণকে উপনিষদে বলে 'একায়ন'; একায়ন সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে আত্মা আর পর এক হইয়া যায়, ইদং সর্বং আত্মা হইয়া যায়, তখন আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পর কেহ থাকে না, তখন পুরুষ পরকে আত্মায় একীভূত করিয়া হন 'পুরুষঃ পরঃ' বা 'পরপুরুষ', পুরুষোত্তম। এই পরপদে আত্মাকে বিলীন করিতে পারিলেই 'পরং আপ্নোতি পুরুষঃ'।

অতএব শ্রুতিতে উক্ত দুই ধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি; দুই ধর্মে দুই বিপরীত নীতি বা পথ, কর্ম ও কর্মসন্ন্যাস; প্রাপ্য ফলও বিপরীত, 'অর্থ' ও 'জ্ঞান; লক্ষ্যও বিপরীত, 'স্বর্গসুখ' ও 'অমৃতত্ব'; প্রচুর ভোগের উপকরণ বা 'অর্থ' যে পুরুষ কর্মফলস্বরূপ পাইয়া সঞ্চিত করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছামাত্র ইচ্ছামত কামভোগ করিয়া যে সুখ পাইতে পারেন, উহা 'স্বর্গসুখ'; সর্বকর্মসন্ন্যাসের ফলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পুরুষ পরমপদে লীন হইয়া যে অক্ষয়, অক্ষর, অমৃত, আনন্দরসে ডবিয়া থাকিতে পারেন উহাই 'অমৃতত্ব'—যে আনন্দের মৃত্যু নাই, অপচয় নাই, অপায় নাই, 'আনন্দরূপে অমৃতরূপে যাহা চিরবিরাজমান, তাহাই 'অমৃতত্ব'। দুই ধর্মেরই জননীশ্রুতি, দুই ধর্মেরই উপদেষ্টা, রক্ষাকর্তা, গোপ্তা 'ব্রাহ্মণ'; এই দুই ব্রাহ্মণও বিপরীত। প্রবৃত্তিধর্মে গুরু ব্রাহ্মণ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত, শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মানুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ; নিবৃত্তিধর্মে গুরু ব্রাহ্মণ অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞানী, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পুরুষ; ইনি বর্ণে ব্রাহ্মণ না হইলেও বর্ণব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন, যেমন 'জনকাদয়ঃ', যেমন শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুনের গুরু শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশ জাতিবর্ণনির্বিশেষে বিশ্বমানবের গ্রহণীয় বলিয়াই এই শাস্ত্র ব্যাখ্যার যোগ্য, শঙ্করাদি ভাষ্যকারগণ কর্তৃক সমাদরে ব্যাখ্যাত।

শঙ্কর বলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে ভারতে প্রবৃত্তিধর্মের প্রভাবে নিবৃত্তিধর্ম অভিভূত হইয়াছিল। কামোদ্ভববশতঃ ধর্মের অনুষ্ঠাতৃবর্গ 'অর্থকাম' হইয়া পড়িয়াছিলেন; এই কারণে নিবৃত্তিধর্মশিক্ষামূলক একখানা স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল; সেই প্রয়োজন মিটাইয়াছে এই গীতাশাস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান বিনাশ করিতে আমার এই উপদেশ, সাধু ব্যক্তির পরিত্রাণ ও অসাধুর অন্যায়, অত্যাচার, প্রভাব, প্রতিপত্তি বিনাশের নিমিত্তই আমার এই উপদেশ, ধর্ম-সংস্থাপনই এই উপদেশের অর্থ, জনকাদি রাজর্ষিগণ যে 'যোগ' নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া সিদ্ধপুরুষ হইয়াছিলেন সেই 'যোগ' লুপ্ত হইয়াছে, আমি সেই যোগের উপদেশই

আজ তোমাকে দিলাম।" ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান, কামোদ্ভবাৎ অনুষ্ঠাতৃবর্গের অর্থলাভতৃষার প্রমাণ কোথায় ?

যুধিষ্ঠির সাধু, ধার্মিক, তাঁহার গ্লানিই ধর্মের গ্লানি; ধার্মিক বলিয়াই তিনি পাইয়াছিলেন অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, বঞ্চনা, প্রতারণা। দুর্যোধন অসাধু, দুষ্কৃতকারী বলিয়াই তিনি পাইয়াছিলেন অর্থ, বিত্ত, রাজ্য, প্রভাব, প্রতিপত্তি আর ভীষ্মদ্রোণের সহায়তা। এই ত ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয়—ইহার মূল কারণ ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অধর্মকে ধর্মজ্ঞান।

ধার্তরাষ্ট্রগণ আততায়ী, দুষ্কৃতকারী; জতুগৃহে আগুন দিয়াছেন, ভীমকে বিষ খাওয়াইয়াছেন, কপটদ্যূতে পরের রাজ্য হরণ করিয়াছেন, পরনারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছেন। এমন আততায়ীকে শাসন করা, প্রয়োজন হইলে হত্যা করা ধর্ম, অধর্ম নহে। ভীষ্ম দ্রোণের ক্ষমতা ছিল, অধিকার ছিল এই অন্যায়ের অত্যাচারের প্রতীকার করার; সেই কর্মে অধিকার সত্ত্বেও তাঁহারা অকর্মে আসক্ত, প্রতীকার করেন নাই; শুধু তাই নহে, অন্যায় তাঁহারা কেবল সহেনই নাই, অন্যায়ের সেনাপতিত্ব করিয়াছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে উভয়ে একবাক্যে বলিয়াছেন—"পুরুষ অর্থের দাস, আমরা কৌরবের অর্থে ভৃত, সুতরাং ভৃত্যবৎ কৌরবের পক্ষে যুদ্ধ করিব," যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিতে পারিব না, এই ক্লীববৎ বাক্য বলিতেছি। এই ক্লৈব্য ধর্ম নহে, ইহা অনার্যোচিত, ধর্মবেশী অধর্ম। অর্থের দাসত্ব পৌরুষ নহে, অন্যায়ের প্রতীকারই পৌরুষ।

যুধিষ্ঠিরও অর্থের দাস, অর্থ চতুর্বর্গ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ; তাঁহারও মনোভাব, আততায়ী যেহেতু ভ্রাতা, তাঁহার সহায় যেহেতু পিতামহ, গুরু, আচার্য, ব্রাহ্মণ, অতএব যদি মাং অপ্রতীকারং অশস্ত্রং শস্ত্রপানয়ঃ ধার্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ তন্মে ক্ষেমকরং ভবেৎ'! তিনি নিজে প্রতীকারে অনিচ্ছুক, অন্যায় নীরবে সহিতে ইচ্ছুক, আবার ভীমার্জুনকেও প্রতীকারে বাধা দেন। অন্যায় যে করে তাহাকে সকলেই ঘৃণা করে, কিন্তু অন্যায় যে সহে, প্রতীকারক্ষমতাসত্ত্বেও যে ক্লীববৎ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, সেও কি ঘৃণার পাত্র নহে ? সর্বকর্মসন্ন্যাস সকল প্রকার শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম সন্ন্যাস, কারণ, সেই কর্মে পুরুষ হয় অর্থের দাস। সর্বকর্ম বলিতে যদি আমরা অন্যায়ের প্রতীকার, সাধুর সহায়তা, দুঃখীর দুঃখ দূর করা, আর্তের সেবা করা, শরণাগতকে রক্ষা করা প্রভৃতিও বুঝি তবে সেই সকল কর্মসন্ন্যাস অধর্ম। 'অর্থ' দুই প্রকার, স্বার্থ ও পরার্থ। স্বার্থসাধনা ত্যাজ্য, পরার্থসাধনা ত্যাজ্য নহে, কার্য। ঐ কার্যকর্ম অনাসক্ত হইয়া অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, 'পরং আপ্নোতি পুরুষঃ'। পরকে আপন, 'স্ব' মনে করিলে পরার্থ স্বার্থ হয়, পরার্থে কার্যকর্মে মানুষের আত্মপর ভেদজ্ঞান দূর হয়। কিন্তু পরার্থসাধনাও আমরা যে যতটুকু করি তাহা করি স্বার্থে। অর্থের দাসরূপে ব্যবহারজীবী ধনবানের সহায়তা করেন, চিকিৎসক চিকিৎসা করেন; দাতা দান করেন পুণ্যলোভে, তীর্থে অতিথিশালা নির্মাণ করেন পুণ্যলোভে, এই কর্ম পরার্থে নহে, স্বার্থে। তাই অসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর, অসক্তঃ হি আচরণ্, কর্ম পরং আপ্নোতি পুরুষঃ'। এই কর্মেই 'জনকাদয়ঃ সংসিদ্ধিং আস্থিতাঃ।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, অর্জুনের ক্লৈব্য অর্জুনের নহে, ভীষ্মের, দ্রোণের, কৃপের, এমন কি যুধিষ্ঠিরের। মনোযোগ দিয়া পড়িলেই মনে হয় অর্জুনের প্রজ্ঞাবাদ অর্জুনের নহে, যুধিষ্ঠিরের, অর্জুন যেন গ্র্যামোফোন রেকর্ড। শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কারও অর্জুনকে নহে, তাঁহাকে ক্লীব বলিলে তিনি নীরবে সহ্য করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশও অর্জুনের প্রতি নহে, ভারতের প্রতি। ধর্মক্ষেত্র ভারত তখন কুরুক্ষেত্রে পরিণত। শ্রুতির দুই ধর্মে চলিতেছে সংগ্রাম, এক পক্ষ 'কুরু', কর্ম করো, অন্য পক্ষ 'ত্যজ', 'মা কুরু', সন্ন্যাস করো। কর্ম করাও করা, কর্মত্যাগ করাও 'করা'—উভয়ে কৌরব। এই ভ্রাতৃদ্রোহ শ্রুতির দুই ধর্মের কলহ 'কুরুক্ষেত্র'; ধর্মক্ষেত্র ভারতে কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম। এই 'কুরু' ও 'ত্যজ' কেবল শাস্ত্রীয় কর্মবিষয়েই নহে, সাংসারিক উন্নতিবিধায়ক কর্মবিষয়েও। 'কুরু' যেন তেন প্রকারেণ নিজ আর্থিক উন্নতি করেন; 'ত্যজ' তাহা করেন না, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, বঞ্চনা, প্রতারণা সব নীরবে সহ্য করেন। এই ত ভারতের চিত্র! শ্রীকৃষ্ণ উদাত্তস্বরে বলিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ,' 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ' 'প্রজ্ঞাবাদ বোঝ নাই,' 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত!' অতএব অর্জুন গীতায় নিমিত্তমাত্র; তিনি ভারতের প্রতীক,

প্রজ্ঞাবাদ শুনিয়া 'শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন', ক্লৈব্যপ্রাপ্ত, অর্থের দাস বলিয়া 'কৃপণ', পুণ্যলোভাতুর, স্বর্গকাম, অকর্মে আসক্ত। এই ভারতের, শোকে মোহে নিমগ্ন ভারতের উদ্ধারকারণে গীতার কর্মোপদেশ। উপদেষ্টা কৃষ্ণ, ঐতিহাসিক কৃষ্ণ নহেন, শ্রীকৃষ্ণ, তিনি বুদ্ধির প্রতীক। বুদ্ধি মানবের হৃদয়রথের সারথি। সংসারক্ষেত্রে আমরা চলি বুদ্ধির চালনায়; উপনিষদে দেখা যায় বুদ্ধি দুই প্রকার 'অজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান'। সংসারী পুরুষের বুদ্ধি অজ্ঞান, সেই বুদ্ধি আমাদিগকে চালায় অর্থের লক্ষ্যে, কামের লক্ষ্যে, 'কুটিল কুপথ ধরিয়া'। ত্যাগী বা স্বার্থত্যাগী পুরুষের বুদ্ধি বিজ্ঞান, সেই বুদ্ধি তাঁহাকে চালায় আত্মত্যাগের পথে 'পর'কে লক্ষ্য করিয়া—সেই পুরুষ পরং আপ্নোতি।

বুদ্ধির আসন হৃদয়ে; শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'; বুদ্ধির দুই ভাব 'পরা' ও 'অপরা,' পরার্থবুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধি। বুদ্ধির 'পর' ভাব আমরা জানি না, 'পরংভাবং অজানন্তঃ', তাই শ্রীকৃষ্ণকে ভাবি তিনি 'মানুষীং তনুমাশ্রিত, ব্যক্তি, অব্যক্তকে ভাবি 'ব্যক্তিমাপন্ন'! শঙ্কর বলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব, 'দেহবান ইব, জাত ইব,' মনে হয় যেন দেহধারী, জাত, কিন্তু তাঁহার পরভাবে তিনি পরাবুদ্ধি বা 'পুরুষঃ পরঃ'।

পরা বুদ্ধি অর্জুনকে বলিতেছেন 'যুধ্যস্ব'; কেন বলিতেছেন? অর্জুন 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' অবস্থিত, বিচারমূঢ়, বলিতেছেন, 'ন যোৎস্যে'। 'কুরুসেনা আর 'ত্যজ' সেনার মধ্যে পড়িয়া তিনি কর্মত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত। 'কুরু' অর্থকামনায় কর্মরত; 'ত্যজ' বলেন, 'অর্থ চাই না, রাজ্য চাই না, ভোগ চাই না, সুখ চাই না, স্বর্গ চাই না, আধিপত্য চাই না—চমৎকার কাব্য। কিন্তু আততায়ীর অন্যায়ের প্রতীকার করিব না, যুদ্ধ করিব না, বরং ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, বরং মরিব, এ কেমন কথা? শ্রীকৃষ্ণ এই প্রজ্ঞাবাদ বিনাশে উদ্যত, তিনি বলিতেছেন, 'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্'। যুদ্ধ করিতে হইবে 'কাম' নামক 'দুরাসদ' শত্রুর বিরুদ্ধে; 'দুরাসদ' বলিতে 'দুর্যোধন,' 'দুঃশাসন'। আমাদের কামপ্রবৃত্তি দুর্যোধন, দুঃশাসন, সেই প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেই হইবে।

এইবার রূপকটীর অর্থ করিলে দেখা যাইবে গীতার উপক্রমে, বিষয়ে ও উপসংহারে কোনই অসঙ্গতি নাই। তুমি, আমি, আমরা সকল সংসারী পুরুষ, নর ও নারী, বালক, যুবক, বৃদ্ধ প্রত্যেকে 'ধৃতরাষ্ট্র'। 'রাষ্ট্র' অর্থ, সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত লইয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সংসার। এই সংসার আমাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রকে আমরা বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে ব্যস্ত, তাই অন্যায় করি, অন্যায়ের প্রতিবাদ করি না, অন্যায়ের সহায়তা করি। ইহা অন্ধত্ব, আমরা প্রত্যেকে অন্ধ, 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ'। আমাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নাই, আত্মজ্ঞান নাই, আমরা অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন। আমাদের বিত্ত নিয়া হয় সংগ্রাম, আপন পুত্রে আর ভ্রাতার পুত্রে। আপন পুত্রগণ 'মামকাঃ', ভ্রাতার পুত্রগণ 'মামকাঃ' নহে, শত্রু, পর। সংগ্রামকালে মনে বার বার প্রশ্ন ওঠে, কে কী করিল। 'করিল' অর্থে 'পাইল'—প্রথম কোর্টে মোকদ্দমায় হারিয়াছি, জানি, আপীল হইতেছে, আপীলে কে কি করিল? কৃষ্ণ ও অর্জুনের জয় হইল; কৃষ্ণ বুদ্ধি, অর্জুন কর্ম, কৃষ্ণার্জুন 'বুদ্ধিযুক্ত কর্ম'—কর্মরথের সারথি পরাবুদ্ধি। তাই কৃষ্ণ 'যোগেশ্বর', 'যোগব্যাখ্যাতা', 'পরং যোগং উপদেষ্টা'। অর্জুন 'ধনুর্ধর', যে ধনু উদ্যত করার পর সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে হস্তভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহা আবার তুলিয়া লইয়া উদ্যত করিয়াছেন কামকে বিনাশ করিতে।

ধর্মক্ষেত্র ভারত, কুরুক্ষেত্র শ্রুতি, 'কুরু' ও 'মাকুরু' জননী; ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত?

ব্যাসদেব শ্রুতিশাস্ত্রের প্রতীক, তাঁহার এক পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, কামান্ধ, অন্যপুত্র পাণ্ডু, কোনও বিশেষ কারণে কামত্যাগী, বনচারী। 'পাণ্ডু' 'পণ্ডা' হইতে ব্যুৎপন্ন, জ্ঞানী, অথবা সন্ন্যাসের প্রতীক পাণ্ডুবসন পরিধানকারী। ধার্তরাষ্ট্র সংসারী পুরুষের মানসতনয়, কাম, শত শাখায় বিভক্ত কাম; কামপরিচালক বুদ্ধি 'শকুনি'। পাণ্ডবত্যাগী, কর্মত্যাগী, অকর্মে অনুরক্ত, অন্যায় সহকারী, তুষ্ণীভূত। এমন ত্যাগীকে ধনুর্ধর হইতে বলেন বুদ্ধি, পরাবুদ্ধি। ব্যাসপ্রসাদে ঐ অদ্ভুত যোগকথা শুনিয়াছেন সঞ্জয়, তিনিও কামজয়ী, কিন্তু গীতাতত্ত্ব তাঁহার নিকটেও 'অদ্ভুত'।

সঞ্জয় কৃষ্ণকথা শুনিয়াছেন, 'কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্'; তাঁহার চাইতে বড় সাক্ষী কে? তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই কৃষ্ণকথার সারমর্ম। শ্লোকার্ধে যেমন উপনিষদের তত্ত্ব, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা জীবমাত্রই ব্রহ্ম, পর, অপর নহে, এক শ্লোকে তেমনি গীতার তত্ত্ব, যে পুরুষের হৃদয়ে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্ধর পার্থ একত্র অবস্থিত সেই পুরুষ 'পরমাপ্নোতি'। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে যোগ শিখাইয়াছিলেন, সঞ্জয় তাহা শুনিয়া বলিয়াছেন, 'ইমং গুহ্যং পরং যোগং শ্রুতবান্'। সেই যোগ বুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগ বা 'বুদ্ধিযোগ'।

বুদ্ধিযোগ জ্ঞানযোগ নহে, কর্মযোগ নহে, ভক্তিযোগ নহে, অদ্ভুতযোগ, যাহা শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে নাই, আভাসে আছে, এই স্মৃতিতে স্পষ্টীকৃত। এই যোগ জানিতেন উপনিষদের রাজর্ষিগণ, পরে অব্যবহারে নষ্ট হয়, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে। সময় ও সুযোগ পাইলে গীতার 'বুদ্ধিযোগ' যেমন বুঝিয়াছি, বলিতে যত্ন করিব।

ছায়া

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার, যা নিয়ে কারুরই মাথা ঘামাবার কথা নয়। কিন্তু তাই যেন জগদ্দল পাথরের মত অসীমের বুকে চেপে বসেছে। অসহ্য ভার তার। কী কুক্ষণেই লেখাটির কথা অসীম সবিতাকে বলতে গিয়েছিল—যার জন্য এত কাণ্ড!

রবিবারের খবরের কাগজে একটি গল্প বেরিয়েছে—ছায়া। অসীম তা অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করছিল। ছায়ার সঙ্গে জয়তীর চমৎকার মিল। ছায়ার মধ্যে জয়তী এলো কেমন করে?

জয়তী ও জীবনের ছায়াই। কলেজের জীবনে সামান্য আবেদন নিয়ে একদিন এসেছিল—পরবর্তী জীবনে তা নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছে।

তবু জয়তীর প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে ঝড়ের দোলা লাগায় অসীম আর সবিতার নিরুপদ্রব জীবনে। যদিও তার কোন গুরুত্ব নেই। সবিতা জানে সে-কথা। তবু ঢেউ তোলে—জয়তীই যদি এত ভালো—তবে তাকে ঘরে আনলেই তো পারতে।

অসীম উপভোগ করে। বিবাহিত জীবনের একটানা ছন্দে বৈচিত্র্য আসে বৈকি! কিন্তু বেশি দুর অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়। তাই বহুবারই এ প্রসঙ্গের যবনিকা পতন ঘটাতে হয় অসীমকে আসল কথাটাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়ে—কিছুই নয়। কলেজের সহপাঠীর বোন—মাত্র কয়েকদিন চায়ের টেবিলে আলাপ।

তবু যেন তাতেই গৌরব বোধ করে অসীম। কুমার জীবনের এক মহার্ঘ পরিচ্ছেদ।

সবিতার এতে সত্যিকারের মনক্ষোভের কোন কারণ নেই; কারণ জয়তী আজ জলের দাগের মতই মিলিয়ে গেছে অসীমের জীবন-নদীতে।

একটা-আধটা কথার বিক্ষিপ্ত টুক্‌রো গল্পের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ছায়ার কণ্ঠ থেকে। এতদিন পরে সেই টুক্‌রো কথাগুলি যেন জোড়া লাগে। একটি পরিপূর্ণ ভাষার চেহারায় অসীমের কাছে তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ছায়া কী তবে জয়তীই?

রবিবারের কাগজের এক পৃষ্ঠায় কয়েকটি কলমেই গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে—যার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। এখুনি হয়ত সবিতা উনানে আঁচ দিতে ওই পাতাটিকেই টেনে নেবে। একবার খেয়াল করে দেখবেও না যে ওটা আজকের কাগজ—সবটা এখনো পড়াই হয় নি। এমন তো কতদিনই হয়েছে। কোন একটা খবরের জন্যে অসীম তন্ন তন্ন করে কাগজ খুঁজছে; অবশেষে জানা গেল সবিতা তাই দিয়েই উনান ধরিয়েছে। কিংবা সে নিজেই অযত্নে কোথায় যে রেখে দেবে তা আর কিছুতেই মনে পড়বে না। আর খুকুর দৌরাত্ম্যই কী কম? বই কাগজ নিয়েই তার খেলা বেশি। বই-কাগজ নিতেও যতক্ষণ আবার টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতেও ততক্ষণ। কিংবা শিশি বোতলওয়ালা ডেকে সের দরে দেওয়া। একমাস ধরে খবরের কাগজের স্তূপ জমেছে। সকাল-বেলাতেই সবিতা সেই কথা বলতে এসেছে অসীমকে—আজ তো ছুটির দিন। অফিসের তাড়া নেই। একটা শিশি-বোতলওয়ালা ডাক তো।

অসীম তখন চায়ের পেয়ালার সঙ্গে রবিবাসরীয় গল্পের মৌতাতে মশগুল।

—কী কানে ঢুকল কথাটা?

অসীম উৎসুক পাঠরত। গল্পের নায়িকা ছায়া তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাইরের দিকে কান দেবার বা মন ফেরাবার সময় নেই তার।

—শুনছ? সবিতা স্বামীর হাতের কাগজখানা হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিলে।

অসীম হাঁ হাঁ করে উঠল—লক্ষ্মীটি, একটু পরে।

—কী একটু পরে?

অসীম মিনতি জানালে—একটু পরে তোমার কথা শুনছি। কাগজটা দাও। পড়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আর একটুখানি বাকী আছে।

সবিতা হেসে বললে—এমন কী খবর যে আফিং-এর মৌতাতে মজে উঠেছ?

অসীম উত্তর দিলে—খবর নয় গো, খবর নয়। একটা গল্প।

সবিতা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলে—গল্প! তাও সত্যিকারের খবর কিছু নয়।

অসীম বললে—ভারী মিষ্টি গল্প।

স্বামীর কথায় হেসে ফেললে সবিতা—গল্প কী আবার টক কিংবা তেতো বা পানসে হয় নাকি?

—হয় বৈকি। মিষ্টি গল্প লেখা ভারী শক্ত।

—আর টক্ বা তেতো গল্প?

সবিতার রসিকতার প্রতি এখন আর অসীমের লোভ নেই। অন্য সময় হলে এই কথা নিয়ে কত বিন্যাসই না করত সে। এখন আর সে মন নেই। সত্যিই গল্পটা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া রোমান্স গল্পের হরফে রক্ত-মাংসের চেহারা নিয়ে তার কাছে হাজির হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে তার জীবনেরও মিল।

পিনাকী আর ছায়া একদিন তারা জীবনের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল। ছায়া পিনাকীর বন্ধু রজতেশের বোন—'ফার্স্ট'ইয়ার আর্টসের ছাত্রী। রজতেশের জন্মতিথিতে আর সকলকে ছেড়ে নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ছায়া পিনাকীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেছিলেন বেশি।

অসীমের বেলাতেও ঠিক তাই ঘটেছিল। জয়তী তখন আই-এ পড়ে। জয়তী অসীমের সহপাঠী সুধীনের বোন। আরো আশ্চর্য—গল্পের ছায়াকে সে যেন দেখতে পাচ্ছে, আঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে তার সান্নিধ্যের। শুধু স্পর্শ করার পরিবেশ আজ সে হারিয়ে ফেলেছে। তবু অনেকদিন পরে জয়তীকে নতুন করে অনুভব করার একটা মনকে আজ অসীম ফিরে পেয়েছে যেন। গল্পের পরিণতির জন্যে তাই তার মনটা ছটফট্ করছে।

সবিতার দিকে হাত বাড়িয়ে অসীম অনুনয়ের সঙ্গে বললে—লক্ষ্মীটি সবু, দাও কাগজখানা, গল্পটা শেষ করে ফেলি। আর একটুখানি বাকী আছে।

সবিতা অভিমানে ঠোঁট ফোলালে—এমন কী গল্প যার দাম আমার চেয়েও বেশি?

—এই তো। কি থেকে কী নিয়ে এলে আবার!

—হ্যাঁ গো বুঝেছি। আমি তো এখন দু'চোখের বিষ কিনা। তাই দু'দণ্ড কাছে এলেও সহ্য করতে পার না আর।

—তা কেন? তুমি তো সর্বক্ষণের। যারা ক্ষণিকের তাদের শুধু মাঝে মাঝে কাছে পেতে মন চায়।—অত্যন্ত অসতর্কে কথাটি বলে ফেলেই প্রমাদ গুণলে অসীম।

সবিতা ধরে ফেলেছে তার দুর্বলতাকে। কাগজটাকে রাগে দুমড়ে ফেলে অসীমের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সবিতা চেঁচিয়ে উঠল—বেশ তো। মাঝে মাঝে কেন সারা জীবন ধরেই সেই ক্ষণিকার সঙ্গে বাস কর না কেন।

সবিস্ময়ে অসীম প্রশ্ন করে—ক্ষণিকা?

—হ্যাঁ, ক্ষণিকা। তোমার জয়তী গো জয়তী। আমার পোড়া কপাল না পুড়িয়ে জয়তীকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করলেই তো পারতে। আমাকে আনবার জন্যে কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

মাত্রাটা বেশি হয়ে গেছে। অসীম তা অনুভব করে। সবিতার দু'চোখ ছাপিয়ে জল—এখুনি তা উদ্বেলিত সমুদ্রের ঢেউএর মতন ছড়িয়ে পড়ছে।

কাগজটা ফেলে দিয়ে সে সবিতার কাছে এগিয়ে এলো—আচ্ছা, কী ছেলেমানুষের মতন রাগ করছ বলতো। এর কোন মানে আছে?

অশ্রু-বন্যায় ভেসে যায় সবিতা। ভিজে গলায় বলে—পছন্দই যদি না হয়েছিল স্পষ্ট করে বলো নি কেন? আমার বাপ-মার এতই কী গলগ্রহ হয়েছিলুম আমি?

অসীম অনুনয় জানায়—লক্ষ্মীটি, চুপ করো। তোমার এখন কথার সত্যিকারের কোন মানেই নেই। আমি তো নিজে পছন্দ করেই তোমাকে বিয়ে করেছিলুম। আর জয়তীর সঙ্গে কী সম্পর্ক আমার সে তো তুমি নিজেই জান।

—তবে বার বার তার নাম কর কেন?

অসীম হেসে বলে—তোমায় রাগাবার জন্য।

জয়তী যে মিথ্যে সবিতা তা জানে, কিন্তু মনোতোষকে জানবার কথা অসীমের নয়। রবিবারের কাগজের গল্পটা পড়াতে গিয়েই যত বিপদ।

গল্পটা পড়তে গিয়েই সবিতা চম্‌কে উঠল—যেন সাপ দেখেছে!

—কী, ব্যাপার কী? হঠাৎ অমন ক'রে উঠলে যে!

অসীমের কথায় সবিতা বললে—ওমা, এযে আমাদের মনোতোষদার গল্প।

অসীমের বিস্ময়ের আর অবধি নেই—মনোতোষদা? তুমি গল্প-লেখককে চেন নাকি?

—বিলক্ষণ! সবিতা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

অসীম গম্ভীরকণ্ঠে বললে—তা এতদিন আমাকে বলো নি কেন?

—এমন কী গুরুতর কথা যে তোমাকে বলতে হবে? পাল্‌টা জবাব দিলে সবিতা।

—একজন লেখকের সঙ্গে তোমার এত পরিচয়, তা জানবার সৌভাগ্য হত আমার। অসীমের কথাটা সবিতা কিন্তু তলিয়ে বুঝলে না। বললে—কী এমন মহাজন মনোতোষ রায় যে তার কথা ফলাও করে তোমার কাছে প্রকাশ করতে হবে?

অসীম প্রশ্ন করলে—কী করে আলাপ হল তোমার সঙ্গে?

—আলাপ না ছাই? আমাদের বাড়ির কথা তো জান—কী ভীষণ পর্দানশীনা ছিলেন আমার মা। বাড়িতে কাক-চিলের ছায়া পর্যন্ত পড়বার উপায় ছিল না।

অসীম গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য প্রকাশ করলে—বাঘের ঘরেই তো ঘোঘের বাসা।

—তার মানে?

—মানে কিছুই নয়। অত্যন্ত সহজ আর স্পষ্ট।

সবিতা বললে—তুমি কী আমাকে সন্দেহ কর?

অসীম উত্তর দিলে—না, তা নয়। তবে এতদিন তো তোমার মনোতোষদাকে চিনতাম না। নামও শুনি নি।

—নাম শোনবার মতন কোন দুর্ঘটনা তো ঘটে নি।

—তবু অকপটে তোমার বলা উচিত ছিল।

—কী বলবো?

—এই মনোতোষ রায় তোমার পরিচিত।

সবিতা হেসে বললে—অমন পরিচিত তো বহুজনই। তা হলে তাদেরও একটা নামের ফিরিস্তী তৈরী করি?

অসীম প্রশ্ন করলে—গৌরবার্থে বহুবচন?

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ গৌরব-জন এই মনোতোষ রায়—বাংলা-দেশের যিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক।

—তা তিনি বহুজন হবেন কেমন করে?

অসীম ব্যঙ্গ করে বললে—বললুম তো গৌরব-জন হলেই বহুজনের শামিল হয়ে থাকেন। সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে তার প্রয়োগ দেখা যায়।

সবিতা রেগে উঠল—ন্যাকামি রাখ।

অসীম অত সহজেই ন্যাকামি পরিহার করতে পারলে না। মনের কোণে কোথায় যেন একটু কাঁটার খোঁচা খচ্ খচ্ করে বিঁধতে থাকে। বললে—সত্যি করে বলই না ব্যাপারটা কী?

সবিতা জিগ্যেস করলে—কিসের ব্যাপার?

—এই মনোতোষ পর্ব।

—কিছুই নয়।

—তবু?

—এই রামা, শ্যামা, যদু, মধু।

অসীমকে যেন ভূতে পেয়েছে। আর কাঁটার খচ্ খচানিও যায় না। বললে—তার মানে?

সবিতা বললে—মানে অতি সহজ। রামা হচ্ছে আমাদের বাড়ির অতি পুরাতন ভৃত্য। যে আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে।

অসীম বাধা দিলে—তার কথা কে শুনতে চাচ্ছে?

সবিতা বললে—আর শ্যামা হচ্ছে আমাদের বাড়ির পাচক। তাকেও তুমি চেন।

গম্ভীরকণ্ঠে অসীম মন্তব্যপ্রকাশ করলে—ইয়ার্কি রাখ।

—ইয়ার্কি করলুম আবার কোথায়?

—ইয়ার্কি নয়তো কী? রামা-শ্যামার কথা কে শুনতে চাচ্ছে?

—তবে যদু-মধুর কথা শুনতে চাচ্ছ? শোন তবে বলি: যদু-মধু দুই ভাই। রজনী মুদির ছেলে। বেচারি

করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

বিড়াল কিন্তু সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল—"না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?" সে কিছুতেই বুঝিল না যে 'সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।' বলিল—আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?

এই কথাগুলি ১৮৭৫ সালের।

এই সময়ে ইওরোপে সোশিয়্যালিজমের নবজাগ্রত হিংস্ররূপ দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার আবির্ভাব বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ভারতবন্ধু Keir Hardie M. P. সাহেবের মাধ্যমে—পার্লামেণ্টে ১৮৮৮ সালে।

তাঁহার কয়েকটি বক্তৃতার সঙ্গে বঙ্কিমের উপরোক্ত মন্তব্যগুলির আশ্চর্য্য মিল আছে। চিন্তাবীরেরা একই প্রকার চিন্তা অনেক সময় করিয়া থাকেন বলিয়া প্রবাদ। ও দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া যে Economic Socialismএর প্রতিষ্ঠা হইল, বহু পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে এদেশেও সেই জাতীয় ব্যবস্থার কল্পনা করিয়াছিলেন। ধীরভাবে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ অনুশীলন করিলে বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতে Socialistic pattern, Seculor মতবাদ, পুরাতন জমিদার প্রজাপ্রথার বিলুপ্তি, কৃষক মঙ্গল প্রভৃতি নব নব মঙ্গলাত্মক পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তৎকালীন শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের উপায় নির্দ্ধারণ সম্পর্কে তাঁহার অভিমতগুলি বর্ত্তমানে সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার রসসিঞ্চিত সাহিত্যিক অবদানের পর স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষ জাতীয় উন্নতির পরিপোষক হইয়া রহিয়াছে। উভয়েই সারা ভারতকে—শুধু বাংলাদেশ নহে—সম্বোধন করিয়া আলস্য ইন্দ্রিয়ভক্তি ও কুসংস্কার ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে বঙ্কিম কতোদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"এদেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না—তাহার প্রতি সমবেদনা নাই—তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। বাংলার লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না। সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়—এই কথা বাংলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না—সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।"

ভারতের প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু মহোদয় ঠিক এই কথাই বলিতেছেন। তাই আশা হয়, বঙ্কিমের যুগে যাহার সাফল্য সম্ভব ছিল না, বর্ত্তমান রাষ্ট্রের অর্থসাহায্যে তাহা সম্ভব হইতে চলিয়াছে, Adult Educationএর জয় হউক।

তদানীন্তন বিজ্ঞানের অনেকগুলি মূলসূত্র তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; বিজ্ঞান ও ইতিহাসের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগাইবার প্রচেষ্টা, দেশ স্বাধীন হইবার পর সার্থক হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

"দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইনে" বঙ্কিম রহস্যচ্ছলে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকাশ বর্ত্তমান বিবাহ-আইনে দেখা যায়।

"১৫ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিচ্ছেদ করিতে উদ্যোগ করে, কি বিবাদ করার সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিবেন)।

অন্ধ অনুকরণস্পৃহা, কপটতা, ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি ও জাতিভেদ প্রভৃতির উপর কষাঘাত করিয়া তাঁহার বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্রাদি বহু যত্নে অধ্যয়ন করিয়া ভারতের যাহা গৌরবময়, সুন্দর, মহান ও বিশ্বসমাজে সম্ভ্রমের যোগ্য, তাহা অনবদ্য ভাষায়, চিত্তাকর্ষক ভাবে একনিষ্ঠ সাধকের মতো প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল পাশ্চাত্য মনীষী অপক্ষপাত বিচারে ভারতের ঐতিহ্য, ভাবধারা ও সুবিখ্যাত শাস্ত্রগ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে হৃদয়ের আতিথ্য দিয়াছেন। অহেতুক বা ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত হীন সমালোচনা তাঁহার তীব্র তিরস্কার পাইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই অসামান্য পরিশ্রম ও যুক্তিসহ বিচারের প্রমাণ তাঁহার মন্তব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। পাণ্ডবদের ঐতিহাসিকতা সপ্রমাণ করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে থিয়ডোর গোল্ডষ্টুকার সাহেবের মহান অবদানের প্রশংসা করিয়াছেন।

মহাভারত ও ভাগবত বিষয়ে যুক্তিসহ বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা, প্রক্ষিপ্ত নির্ব্বাচন প্রণালী শিক্ষা দিয়া, আবেগশূন্য সংযত পদ্ধতিতে তিনি যে সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের উপযুক্ত। প্রাচীন গ্রন্থ ও কিংবদন্তীর প্রভাব সত্ত্বেও অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাদির মোহ কাটাইয়া মেঘমুক্ত চন্দ্রমার মতো শ্রীকৃষ্ণকে দীপ্যমান করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে পাশ্চাত্যদেশ সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে আক্রমণ করিতেছিলেন। সব্যসাচীর ন্যায় তাঁহার দুই হাতই সক্রিয় হইয়াছিল। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহারই মতো এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাতে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা রামমোহনের মতো যুদ্ধ করিয়া দেশকে বিশ্বসভায় সুপ্রতিষ্ঠ করেন।

কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিম নিজে লিখিয়াছেন—"বঙ্গদর্শনে (১ম সংস্করণে) যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম আর এখন (২য় সংস্করণে) যাহা লিখিলাম, আলোকে অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ের ততদূর প্রভেদ। মত পরিবর্ত্তন—বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার ও ভাবনার ফল।"

রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে বলেন—"বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্ত্তমান পতিত হিন্দু সমাজ ও বিকৃত হিন্দু-ধর্ম্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে, সে আঘাতে বেদনা বোধ ও কথঞ্চিৎ চেতনালাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।

বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিলেও সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব গুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছেন।

ইহাতে তাঁহার মনুষ্যাতীত কোন প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশমাত্র প্রতিবিম্ব হইল। * * * শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা অমানুষী কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবে না; উদ্যোগ পর্ব্বে ৭৮ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছেন—আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।

"অহং কি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকারতঃ।
দৈবং তু ন ময়া শক্যং কর্ম্ম কর্ত্তুং কথঞ্চন॥"

স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন; এই বিশ্বাসই পরজন্মে বিশ্বাস; পরজন্মে বিশ্বাসই ধর্ম্মের পথে প্রথম পদক্ষেপ। চিত্তশুদ্ধি, উদারতা ও মানবিকতার একজন শ্রেষ্ঠ পূজারীরূপে, নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুশীলনের একজন সার্থক ঋত্বিকরূপে তাঁহার পরিচয় পাই ধর্ম্মতত্ত্বে, অনেকগুলি উপন্যাস ও ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে। 'আনন্দমঠ,' 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' নিষ্কাম ধর্ম্মের উদাহরণগুলি আমাদের শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তের মতো সমুজ্জ্বল এবং সেই মতো অনুকরণের পক্ষে অসম্ভব সুকঠিন। কিন্তু ছবিগুলি হৃদয়কে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরিয়া দেয়, সেগুলিকে দেওয়ালে টাঙাইয়া নিত্য নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। দেখিতে দেখিতে মনে হয়, আমরা কতো ছোট, কতো অকিঞ্চন, কতো মিথ্যা অহঙ্কারে ভরা।

সমালোচনা-সাহিত্যে উপেক্ষিতা জয়ন্তীকে দেখিয়া মনে হয়, জ্ঞান, ভক্তি ও শুচিলাবণ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অযথা নির্য্যাতন হাসিমুখে সহ্য করিতেছে।

যে গতিবাদ ও প্রকৃতিপূজার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসভায় সমাদৃত, যাহা বাঙালী লেখকের অনন্ত প্রেরণার উৎস, যাহা জীবনকে বিচিত্র-সৌন্দর্য্যে পুলকিত করে—সেই গতিবাদ ও প্রকৃতির উপাসনা বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনায় শান্তমাধুর্য্যে, অনির্ব্বচনীয় হৃদয়াবেগে ধন্য করিয়া থাকে। মনে হয় নবকুমারের সহিত সমুদ্রতীরে বসিয়া অনন্যমনে আরও কিছুক্ষণ জলধিশোভা দেখিতে থাকি, শৈবলিনীর স্বপ্নদৃষ্ট সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জড়প্রকৃতিকে বার বার প্রণাম করি।

সন্ন্যাসী লইয়া বঙ্কিমের সূতিকাগারে জীবনের উন্মেষ, সন্ন্যাসী লইয়া অপরূপ উপন্যাসাবলীর বিকাশ, সন্ন্যাসী লইয়াই তাঁহার পরমারাধ্য পিতৃদেবের ও তাঁহার নিজের অন্তিম সময়ের পরিচয়।

বাংলা ভাষাকে তিনি রূপ দিয়াছেন, ভাব দিয়াছেন, ললিত মাধুর্য্যের আস্বাদনে সাহিত্যরসপিপাসুকে ধন্য করিয়াছেন। কতো বিদগ্ধজন রসে অনুগগণ—তাঁহার "গদ্যপদ্য" রচনার ছন্দে মাতোয়ারা হইয়া পাতার পর পাতা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান যন্ত্রযুগে বঙ্কিমের 'এই আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাকে ভালোবাসা দিয়ে' গড়া মানসীপ্রতিমা যেন অনাদর, উপেক্ষা ও ধ্বংসের পথে যাইতেছে।

তাঁহার দেহরক্ষার ৬২ বৎসর পরে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনার রমণীয় আবেষ্টনের স্মৃতিবিজড়িত এই কাঁটালপাড়া বাসভবনে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে আসিয়া মনে হইতেছে এই তপোবনে যে জীবন ছিল, দীপ্ত মুক্ত সে মহাজীবনের বিভূতির কণামাত্র যেন চিত্ত ভরিয়া লইতে পারি—তাঁহার আদর্শের উপযুক্ত হইতে যেন চেষ্টা করি। যেন ভুলিয়া না যাই এই শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্ট একজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন

শ্রীবিনোবা *

['স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন'-এর প্রথম কিস্তি চৈত্রের 'ভারতবর্ষে' ছাপা হয়েছে। বিনোবার মুখবন্ধ তৎসঙ্গে যায় নি। সে ত্রুটি এবার পূরণ করা যাচ্ছে। ভূমিকাটি মামুলী নয়, পথ-প্রদর্শক।—অনুবাদক]

উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সালের শীতকালে সিউনী জেলে কতিপয় বন্ধুর কাছে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যানগুলি দেয়া হয়। ভারতের সর্বত্র হাজারো নরনারী সত্যাগ্রহী সান্ধ্যপ্রার্থনায় এই সব লক্ষণ ভক্তিভাবে নিত্য পাঠ করে থাকেন। তাদের জন্তে বিশেষ করে ব্যাখ্যানগুলি পুস্তকাকারে উপস্থিত করা যাচ্ছে। পুস্তকের আকার দিতে গিয়ে শাস্ত্র সন্তোষার্থ যতটা প্রয়োজন অদল বদল অবশ্যই করা হয়েছে।

স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে এক সমগ্র দর্শন নিহিত। তাহা খুলে ধরার প্রযত্ন এখানে করা হয়েছে। সম্ভবতঃ প্রথম পাঠে এর কোন কোন অংশ হৃদয়ঙ্গম হবে না। কিন্তু বার বার পাঠ ও চিন্তা করলে আর যতটা বোঝা যাবে, আচরণে ততটা করলে ধীরে ধীরে অনুভব দ্বারা সবটা বোঝা যাবে।

ত্রিশ বছরের নিদিধ্যাসনে যে অর্থ স্থির বলে বুঝেছি তাহা এখানে সমুপস্থিত করছি। এদিক-ওদিক ত কিছু হওয়ারই কথা। তবে তাহা থেকে বাঁচার উপায় সব কিছু ঈশ্বরার্পণ করে ছুট নেয়া। এ মনোভাব হতেই এই প্রকাশন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যান

(১)

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনো-গতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত-প্রজ্ঞস্ তদোচ্যতে॥

* শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ অনূদিত

১২. সমাধির আরও একটু বিশ্লেষণ

অর্জুনের প্রশ্ন আমরা দেখেছি। প্রজ্ঞা কাকে বলে, সমাধি কি, সে বিচারও করা হয়েছে। প্রজ্ঞা সাধারণ বুদ্ধি নয়; যার ঝোঁক নির্ণয়ের দিকে সেই বুদ্ধি। এ প্রজ্ঞা 'স্থিত' মানে সোজা খাড়া থাকা চাই। সোজা খাড়ার মানে নিশ্চিত ও সরল। সমাধি মানে ধ্যান-সমাধি নয়, তাও আমরা দেখেছি। 'সমাধি' শব্দের এখানে একটু বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। সমাধি শব্দে 'সম্' ও 'আ' উপসর্গ আর 'ধা' ধাতু আছে। সমাধান শব্দের ব্যুৎপত্তিও ঠিক ঐ। চিত্তের সমাধানের স্থিতি মানে সমাধি। সমাধান মানে সম-তুলন। দাঁড়ির দু' পাল্লা ঠিক সমান হলে বলা হয় দাঁড়ি সমতোল হয়েছে. দাঁড়ির সমাধান হয়েছে। চিত্তের স্থিতি তুলাদণ্ডের মত সমতোল, অচল ও শান্ত হয়েছে ত তার সমাধান হয়েছে। এ সমাধি সদা-স্থায়ী। কখনও ভঙ্গ হয় না। পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ স্থিতির তুলনা করা হয়েছে বায়ুশূন্য স্থানের কম্পহীন দীপ-শিখার সঙ্গে। একেই দীপ-নির্বাণ বলে। দীপ-নির্বাণ-এর অর্থ 'নিষ্কম্প দীপের মত একভাবে জ্বলিতে থাকা' এরূপ করতে হবে। 'দীপ নিভে যাওয়া' এরূপ অর্থ করা ঠিক হবে না। নিভে যাওয়ার পরেকার শান্তি শরীর থাকতে মেলার নয়। সমাধি মানে চিত্তের সেই শান্ত স্থিতি যা এ দেহেই অনুভব করা যায়, আর যা কখনও ভাঙ্গে না। এভাবে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর, এ প্রশ্নে যে সমাধি শব্দ রয়েছে তা থেকেই সূচিত হচ্ছে। সে কথাই এখন ভগবান এক শ্লোকে (উপরে উদ্ধৃত) ব্যাখ্যা করে বলছেন।

১৩. স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধির নিষেধক ও বিধায়ক মিলে পূর্ণ ব্যাখ্যা

এখানে সমাধির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। 'উচ্যতে' শব্দ এখানে ব্যাখ্যার দ্যোতক এরূপ বুঝতে হবে। এ শ্লোকের ব্যাখ্যা সমর্পক * ও সম্পূর্ণ। অর্থাৎ তার স্বরূপ দ্বিবিধ—নিষেধক ও বিধায়ক। এরূপ দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করলেই তা পূর্ণ হয়। উদাহরণার্থ 'অহিংসা শব্দ নিন। 'হিংসা করো না' এ হচ্ছে তার নিষেধক অর্থ। 'ভাল বাস' এ হচ্ছে বিধায়ক অর্থ। দু'য়ে মিলে অহিংসার ব্যাখ্যা হবে। 'প্রজহাতি যদা কামান্' নিষেধক লক্ষণ আর 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ' এ—হচ্ছে তার বিধায়ক স্বরূপ। এই উভয়বিধ লক্ষণ সুনিশ্চিত ও সূক্ষ্ম ভাষায় বলা হয়েছে।

১৪. নিষেধক ব্যাখ্যা : নিঃশেষে কামনা ত্যাগ

'মনের সর্ব কামনা ছাড়া' এ নিষেধক লক্ষণের কথা এখানে বলা হয়েছে। 'মন' বিবিধ বাসনার পুঁটলি। এর মানে তেমন মন আদৌ থাকতে নেই। কোন জ্যোতিষীর নজর এমনি আমার হাতের ওপর পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার হাতে ত হৃদয়ের রেখা দেখছি না।' আমি বলেছিলাম, 'তা হলে ত আমার ভগবান লাভ হয়েছে।' আমি মনে করি—মানুষের বুদ্ধিই থাকুক, মন না থাকাই ভাল। বুদ্ধিতে তার মিশে যাওয়া চাই। মন মানে সংকল্প-বিকল্প। মন মানে কামনার গাঁটরি। সংকল্প-বিকল্প কিংবা কামনা-আদিকে বুদ্ধির আজ্ঞাধীন হতে হবে। মন ও বুদ্ধিতে যেন আড়াআড়ি, রেষারিষি না চলে। বুদ্ধি বলবে, মন করবে, বস্। নির্ণয়ের কাজ বুদ্ধির। বুদ্ধি বিধি-প্রণয়ন-কারী বিভাগ। মন আমল-দারী (কার্যকরী) বিভাগ। বুদ্ধির ক্ষেত্রে আদৌ সে নাক গুঁজতে যাবে না। যে যার কাজ করবে। লাড়ু মিঠে কি তেতো, তা খাওয়ার মত কি অখাদ্য, জিভ এটুকু মাত্র দেখবে। কতটা লাড়ু খাওয়া হবে তা ঠিক করা তার কাজ নয়। তাতে নাহক যেন সে নাক গলাতে না যায়। এভাবে মনকে বুদ্ধির অনুসরণ করে চলতে হবে। ধীরে ধীরে বুদ্ধিতে তার লীন হয়ে যেতে হবে। মনরূপী গাঁটরি থেকে যদি এক এক টুকরা করে নেকড়া বার করে নেন ত গেল গাঁটরি। বস্তুতঃ মন সে অবস্থায় বশীভূত হয়েছে, শান্ত হয়েছে, মজেছে, বুদ্ধির সঙ্গে একরূপ হয়ে গেছে। এ হচ্ছে সত্যিকার মনোনাশ। মনোনাশ মানে মনের শক্তির নাশ নয়। মনোনাশ অর্থ মন বুদ্ধির অনুগামী হবে। বিনা তর্কে বুদ্ধির নির্ণয় অনুসারে কাজ করবে। মনের কার্য করার শক্তি নাশ করার প্রশ্ন নেই। সে শক্তি সদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। হাঁ, তবে মনের কামনার লেশ পর্যন্ত নাশ করা চাই। এ প্রকারে মনের যত কিছু কামনার ত্যাগ হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যাখ্যার নিষেধাত্মক অঙ্গ।

১৫. বিধায়ক ব্যাখ্যা : আত্মদর্শন

এখন ব্যাখ্যার বিধায়ক অঙ্গের বিচার করা যাচ্ছে। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ বিধায়ক লক্ষণ। স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মাতেই সন্তুষ্ট। বাইরের ছবি অপেক্ষা ভিতরের দৃশ্যে সে তৃপ্ত। বস্তুতঃ বাহ্য দৃশ্য অপেক্ষা অন্তরের দর্শনই অধিক সুন্দর, অধিক মহান্। কবি কাব্যে দৃশ্য বর্ণনা করে। সে দৃশ্য অপেক্ষা তার ঐ বর্ণনা অধিক মধুর। এর হেতু এই যে তার ধ্যেয়বাদময় অন্তরঙ্গ বাহ্য দৃষ্টি অপেক্ষা রমণীয়। সেই রমণীয় আত্ম-দর্শনের কথা এই বিধায়ক লক্ষণে বলা হয়েছে। এ দু' লক্ষণ মিলে স্থিতপ্রজ্ঞের পরিপূর্ণ কবি। কামনা সে ত্যাগ করে আর সন্তোষের ধারা ত তার অন্তরে বইছেই। আনন্দ কামনাতে নেই, এ ভাবে তার চিত্ত পূর্ণ। আর সত্যসত্যই কামনাতে আনন্দ কিংবা সন্তোষ আছে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। কামনা থেকে শান্তি, শীতলতা, সন্তোষ মিলে, অনুভব একথা বলে না। উল্টো, কামনার দরুণ মন সতত ছটফট করতে থাকে। ছটফটভাব মানুষকে ব্যাকুল করে। ছটফটভাব আগুন জ্বালায়। অতএব কামনা গিয়েছে শীতলতা কমবে এ আশঙ্কার আদৌ হেতু নেই। কামনা হতে সমাধান (সন্তোষ) মিলে এরূপ মনে হয় ত তা আভাসই মাত্র। আনন্দ আসে কামনার তৃপ্তি থেকে অন্য কথায় কামনার অভাব থেকে। কামনা পূর্ণ হওয়া মানে এক প্রকারে শমন (শাপ) হওয়া. নষ্ট হওয়া। বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে

---

* সমর্পক—সমুচিত

আনন্দের উৎস মূল কামনা নয়, কামনা-মুক্তি তাই দ্বিবিধ লক্ষণে এখানে বলা হইয়াছে যে সন্তোষ কামনার পূর্ণ ত্যাগে ও আত্মাতে অর্থাৎ নিজ স্বরূপেতেই।

১৬. আত্ম-দর্শন ও কামনা-ত্যাগ একে অন্যের কার্য-কারণ

এখানে যে দ্বিবিধ লক্ষণের কথা বলা হল তা কেবল বিধায়ক ও নিষেধকই নয়। তা থেকে আর দুই প্রকারের অর্থ পাওয়া যায়। স্বরূপে এদের প্রথমটি প্রারম্ভিক ও অপরটি প্রগত, এরূপও বলা যেতে পারে। প্রথমটি কামনা-মাত্র ছেড়ে দেবার সাধন-রূপ। অপরটি কামনা-ত্যাগ হতে প্রাপ্ত স্থিতির দ্যোতক। অতএম প্রথমটি হচ্ছে সাধন-রূপ প্রারম্ভিক, দ্বিতীয়টি তার ফলিত-রূপ প্রগত। 'বাহ্যস্পর্শেএব সক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্'—বাহ্য বিষয় থেকে চিত্ত আলগা হলে, ভিতর কিরূপ আনন্দে ভরা, তা বোঝা যায়, এ বাক্য দ্বারা গীতা এই ক্রম নির্দেশ করিয়াছে। তার উল্টো, স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণেই পরে একথাও বলা হয়েছে যে যেমন-যেমন আত্ম-দর্শন হতে থাকে তেমন-তেমন কামনার রস শুকাতে থাকে। একথার অর্থ এই যে আত্ম-দর্শন সাধন, আর কামনা-নাশ তার ফল। সে দিক থেকে আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ-কে ঘনীভূত লক্ষণ বলে গণ্য করা যাবে। আত্ম-তৃপ্তি দেখা যায় না। কামনা-ত্যাগ চোখে পড়ে। অমুক লোকে কামনা দেখা যায় না, এ হচ্ছে তার প্রকট লক্ষণ। আত্ম-দর্শনের তা নিদর্শন ও পরিণাম। অতএব তাকে ফল-স্বরূপ বলা যাবে। কিন্তু প্রথমে আত্ম-দর্শন, কি প্রথমে কামনা-ত্যাগ এরূপ তর্ক বৃথা। এ যেন, প্রথমে বীজ কি প্রথমে বৃক্ষ, এরূপ তর্ক। আত্ম-দর্শন ও কামনা-ত্যাগ একে অন্যের কার্য-কারণ।

(২)

১৭. কামনা-ত্যাগের চার প্রক্রিয়া

কামনা মাত্রের নিঃশেষ ত্যাগের কথা এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কামনাকে কাঁটার সমান জ্ঞান করা হয়েছে। সোনার হলেও কাঁটা বিঁধেই। সোনার হলেও ছুরি প্রাণ-নাশ করেই। অতএব গীতার সিদ্ধান্ত, সব কামনা ঝাঁটিয়ে দূর করতে হবে। কিন্তু গীতার নজির দেখিয়েই বলা হয় যে কতক কামনা রাখাতে গীতার আপত্তি নেই। 'ধর্মবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ' এ বচন প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা হয়। তাই এ প্রশ্নের বিচার আবশ্যক। এই দুই বচনে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নেই। এক বাক্যে যে গন্তব্যে আমরা পৌঁছাতে চাই সেই গন্তব্যের নির্দেশ আছে। অপর বাক্যে দেখানো হয়েছে কামনা কি প্রকারে নাশ করা যাবে। সাধারণ ভাবে কামনা নাশের প্রক্রিয়া চার প্রকারের: (১) ব্যাপক প্রক্রিয়া, (২) একাগ্র প্রক্রিয়া (৩) সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া ও (৪) বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া।

১৮. কর্ম-যোগের ব্যাপক প্রক্রিয়া

(১) ব্যাপক প্রক্রিয়া। কামনা ব্যক্তিগত। তাকে সামাজিক রূপ দেয়া কর্মযোগে কামনা-নাশের এক উপায়। মনে করুন, কোন গ্রামবাসী তার ছেলেকে পড়াতে চান। তিনি গ্রামে স্কুল খুলতে পারেন। নিজ ছেলের লেখা-পড়ার সাথে সাথে অন্য ছেলেদেরও পড়ার সুবিধা তাতে হবে। এরূপে নিজ কামনাকে সামাজিক রূপ দেখা যায়। প্রাচীন যুগের একটি উদাহরণ দিই। কারো মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হতো ত তাকে বলা হতো খাবে খাও কিন্তু যজ্ঞের রূপ দিয়ে খাও। যজ্ঞ করে অন্যকে খাইয়ে যজ্ঞশিষ্ট খাও। মেয়েরা ঘরে এরূপই করে। পিঠা-পায়স খাওয়ার ইচ্ছা সবারই। পিটা বানায়। সকলকে আগে সন্তোষ করে খাওয়ায়। অবশিষ্ট থাকে ত নিজেরা খায়। বলতে গেলে তাদের ভাগে পড়ে শ্রম। মেয়েরা এভাবে নিজ বাসনাকে পরিবারব্যাপী রূপ দেয়। এ হচ্ছে কর্মযোগে কামনা-নাশের উপায়। ব্যক্তিগত বাসনাকে সামাজিক রূপ দেয়া মানে ব্যাপক হতে হতে বাসনা মিলিয়ে যাওয়া—এই প্রক্রিয়ার এ হচ্ছে লক্ষ্য।

১৯. ধ্যান-যোগের একাগ্র প্রক্রিয়া

(২) একাগ্র প্রক্রিয়া। মনের বহু বাসনার মধ্যে কোন্ বাসনা আপনার সব চাইতে প্রবল তুলনা করে তা বুঝে নিন। বাকী সব বাসনা দূর করে ঐ এক বাসনায় মজে যান। তাতে চিত্ত একাগ্র করুন। ধরুন, কোন বিদ্যার্থীর বহু বাসনার মধ্যে বেদাভ্যাস একটি। আর তা অপর সব বাসনা অপেক্ষা প্রবল। সে গুরুগৃহে গিয়ে থাকবে, যেমন জুটে খেয়ে অধ্যয়ন করবে। তার ফলে মিষ্টি খাওয়ার বাসনা তার মরে যাবে। এভাবে নিজের যা মুখ্য বাসনা তা নির্ণয় করে তদনুসারে সমগ্র জীবন রচনা করা হচ্ছে ধ্যানযোগের উপায়। যে সব বিদ্যার্থীতে বিদ্যার্জনের ইচ্ছা প্রবল সে সব বিদ্যার্থীতে ইহা আমরা দেখতে পাই। অন্য সব বাসনা নিগ্রহ করে বিদ্যার জন্য তারা কষ্ট সহ্য করে। 'সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা, কুতো বিদ্যার্থিনঃ সুখম্' একথাই ব্যাসদেব বলেছেন। আমরা কিন্তু বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলি যে আমাদের ছাত্রালয়ে সুখ সুবিধা ও বিদ্যা দু' ব্যবস্থাই আছে। এ ভাবাই ভুল। সুখের দিকে মন গিয়াছে ত বিদ্যায় মন বসবে না। নিজ বাসনার বাছ-বিচার করে যে বাসনা সর্বাপেক্ষা প্রবল তাতে একাগ্র হও। আজিকার বিজ্ঞানীরা ভৌতিক ক্ষেত্রে তেমনটাই করেন। নিজ নিজ পরীক্ষায় তারা সকল শক্তি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। একে বলে ধ্যান-যোগ। অন্য সব বাসনা দূর করে এক বাসনায় কেন্দ্রিত করা চাই। তার পরে তাহাও ত্যাগ করা চাই, এ হচ্ছে উপায়। একাগ্রতা আয়ত্ত হয়ে গেলে পরে সে বাসনাও ত্যাগ করে সত্তা হন।

২০. জ্ঞান-যোগের সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া

(৩) সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া। স্থূল ছাড় ও সূক্ষ্ম ধর, এরূপ উপায়ের কথা এ প্রক্রিয়ায় বলা হয়েছে। বেশভূষায়, সাজাগোজায় আগ্রহ থাকে ত

শরীরের বেশভূষার দিকে মন না দিয়ে অন্তরঙ্গের বেশভূষার দিকে মন দাও। বুদ্ধিকে সাজাও, নিপুণ বানাও। নূতন বিদ্যা অর্জন কর। কলা শেখ। শরীরের অবোধ শৃঙ্গার অপেক্ষা এই বৌদ্ধিক শৃঙ্গার সূক্ষ্ম। এর চাইতেও সূক্ষ্ম শৃঙ্গার-বিধি হচ্ছে হৃদয়কে শুভ গুণে মণ্ডিত করা। যে আতরে শরীর সুসজ্জিত হয় সে আতর অপেক্ষা বুদ্ধিচাতুর্যের সৌরভদায়ী আতর সূক্ষ্ম। আর হৃদয়ের শুভগুণ-সম্পত্তি-রূপ নির্যাস তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। বিঠাই-মা তাঁকে কেমন সাজিয়েছেন তার দিব্য বর্ণনা নামদেব এক অন্তরঙ্গে করেছেন। মা সন্তানের বাহ্যাঙ্গ যেমন সাজান অন্তরঙ্গ শৃঙ্গারের ঠিক তেমন বর্ণনা তাতে আছে। বাহ্য শৃঙ্গার অপেক্ষা অন্তঃশৃঙ্গারের দ্বারা জীবনের শোভা অশেষরূপে বাড়বে। শোভার স্থূলরূপ ছাড়ুন ও সূক্ষ্ম রূপ আয়ত্ত করুন। আনন্দ কামনায় নয়, কামনার তৃপ্তিতে। স্থূল কামনার তৃপ্তি কঠিন। কারণ সে ক্ষেত্রে বাহ্য সাধন যোগাড় করতে হয়। কামনা যদি সূক্ষ্ম হয় ত তৃপ্তির পথে অন্তরায় কমে যায়। কারণ নিজ অন্তরের সাধনসমূহ দ্বারাই তা তৃপ্ত হয়। এভাবে কামনা অন্তরমুখ ও সূক্ষ্ম হতে হতে পরে একেবারে নষ্ট হতে পারে কিংবা হওয়া চাই। এ হচ্ছে জ্ঞান-যোগের উপায়।

২১. ভক্তি-যোগের বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া

(৪) বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া মতে আমরা বাসনা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কিংবা স্থূল ও সূক্ষ্ম এরূপ ভাগ-বিভাগ করি না। শুভ বাসনা ও অশুভ বাসনা এরূপ ভাগ করে থাকি। উত্তম বাসনা যেমনটি আছে রাখুন, মন্দ দূর করে দিন। মিষ্টি খেতে ইচ্ছা হয়েছে। ভাল, মিঠাই না খেয়ে আম খান। মিঠাইতে হানি হতে পারে। আর তাতে রজোগুণই বাড়বে। আম স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। আর সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করবে। এ প্রক্রিয়ার আরম্ভেই আমরা বাসনা মারতে বলছি না। অশুভ ছাড়, শুভ ধর, এ কথাই বলা হচ্ছে। শুভ কি আর অশুভ কি তা লোকে নিজ বুদ্ধি অনুসারে ঠিক করবে। যথা মত তথা প্রমাণ। কতকগুলি বাসনার বিষয়ে শুভ-অশুভ-নির্ণয় সায়ান্স বা বিজ্ঞানের সহায়তায় করা যেতে পারে। কতকগুলি বাসনার বাছবিচার বিজ্ঞানের সহায়তায় করা গেলেও, অন্তে শুভ কি আর অশুভ কি তার নির্ণয় যার বাসনা তাকেই আপন বিচার অনুসারে করতে হবে। অশুভ বাসনার ত্যাগ ও শুভ বাসনার পুর্ত্তি করতে করতে মন শুদ্ধ হয়ে বাসনা তবে যাবে। এ হচ্ছে কামনা-নাশের বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া।

২২. বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া সব দিক হতে সুরক্ষিত

এই চার প্রক্রিয়ার মধ্যে শেষের বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া সর্বাধিক ভয়শূন্য, সুতরাং সর্বাপেক্ষা উত্তম। আর প্রায় সব ভক্তিযোগই তা গ্রহণ করেছে। অন্য প্রক্রিয়ায় শক্তি আছে। ভয়ও তেমন খুব আছে। ব্যাপক প্রক্রিয়ায় কামনাকে সামাজিক বানানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে কামনাই যদি অশুভ হয়, তবে? কারো মদ খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে ত এ প্রক্রিয়া অনুসারে সে শরাবের সার্বজনিক ক্লাব খুলতে পারে। কিন্তু তা দ্বারা তার নিজের ও সমাজের অধঃপাত হবে। সেরেফ সামাজিক রূপ দিলেই বাসনা শুদ্ধ হল তা নয়। একাগ্র প্রক্রিয়াতেও এই ভয় আছে। যে বাসনারত চিত্ত একাগ্র করার তা যদি অশুভ হয়, ব্যস্, সব শেষ। চিত্তের একাগ্রতা যোগ-শাস্ত্রের বিষয়। সে সম্বন্ধে পতঞ্জলি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে রেখেছেন যে ধ্যানযোগের আচরণ যথ-নিয়ম পূর্বক করতে হবে। নতুবা তা থেকে অনর্থ ঘটবে। ধ্যান-যোগ তারক না হয়ে হবে মারক। সামাজিকতায় ও একাগ্রতায় শক্তি আছে সত্য। কিন্তু বিপথগামী হলে সে শক্তি হেতু মানুষ রাক্ষসই বনবে। সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াও সুরক্ষিত নয়। বাসনা সূক্ষ্ম হলেই পবিত্র হবে তা নয়। কাউকে কাম-বাসনায় পেয়ে বসেছে। সে যদি অমূর্ত কামের চিন্তা করতে থাকে তবে তা সম্ভবতঃ আরও অধিক ভয়ানক হবে। ভক্তিযোগ দ্বারা গৃহীত এই 'বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া' সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত। তাই ত তুলসীদাসজী বলেছেন, 'ভগতি সুতন্ত্র অবলম্বন আনা।' অন্য সব সাধনে যে ভয় আছে তা দূর করার জন্য তাদের ভক্তিযোগের আশ্রয় নিতে হয়। ভক্তির অন্য আশ্রয়ের দরকার নাই। অন্য সাধন শক্তিশালী কিন্তু ভয়েরও বটে। এদিকে শক্তি, ওদিকে সংরক্ষা। ভক্তি ও শক্তিতে এই ব্যবধান। ভক্তিতে যদি শক্তির মিলন না হয় তবে তা দুর্বল হবে কিন্তু অপবিত্র বা মারক হবে না। উল্টো, শক্তি যদি ভক্তিহীন হয় তবে তা সর্বনাশ করে ছাড়বে। ভক্তি কোন অবস্থায়ই অকল্যাণ করে না। অতএব কামনা-নাশের ভক্তিযোগ-অনুসৃত বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া সব দিক থেকে সুরক্ষিত ও অনুকূল। 'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি' এ বাক্য দ্বারা ঐ কথাই ইঙ্গিতে বলা হয়েছে।

সৃষ্টির স্বপন নিয়ে জাগি

আলোক মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু জেগে আছে ঐ দিগন্তের বিভ্রান্ত বলয়ে,
আমি কবি—সৃষ্টির স্বপন নিয়ে জাগি!
আমার আত্মার ফল্গু সৃজনের ধারা চলে বয়ে,
প্লাবনের প্রতীক্ষায় দুর্নিবার প্রাণস্রোত মাগি।

আমার রক্তের ডাকে আগামী দিনেরা কথা বলে,
আমার বুকের মাঝে শুনি আমি যুগান্তের ভাষা,
আমার হৃদয়-স্পন্দ: সুন্দরের ছন্দ-গুণে চলে,
আমার দু-চোখভরা পূর্ণতার অপেক্ষার আশা।

মানুষের নারায়ণ আমার ধ্যানের মাঝে জাগে,
ডেকে বলে—'ভয় নাই তামস তপস্যা হবে শেষ!'
জীবনের শুষ্ক-শাখা সৃষ্টির মলয়ানিল রাগে-
মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে—আমি চেয়ে রই নির্নিমেষ!

৬০

যেদিন দেওয়াল ধরে চলতে পারলেন ভগবতী—সেই দিনই জলচৌকির সামনে এসে বসলেন। বসেই তাঁর মাথা ঘুরে উঠল। কমলাকে ডেকে বললেন, হ্যাঁরে—মধুসূদন গেলেন কোথায় ?

—ভাল জায়গাতেই আছেন ঠাকুর।

এ ঘর থেকে ওঁকে সরালি কেন ? আতঙ্কে বিবর্ণপ্রায় হয়ে উঠল ভগবতীর মুখ।

কি করব—এক ঘর এক দোর, তুমি পড়ে—ডাক্তার আসছে—মানুষজন আসছে—ওষুধ পথ্যি···এর মধ্যে ঠাকুরকে ফেলে রাখা উচিত নয় বলে পুরুত-জেঠিমা ঠাকুর নিয়ে গেলেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাথরের মূর্ত্তির মত বসে রইলেন ভগবতী। একে একে সবই চলে যাচ্ছে। ঘরের যত উপচার আয়োজন—মনের যত প্রীতি-ভালবাসা—তাঁর নিজের প্রাণটাই কি এতই মূল্যবান ? শূন্য ঘরে এ প্রাণটুকু জীইয়ে রেখে—কি বা লাভ !···বেশ বুঝছেন—এই ঘরের মায়াও ত্যাগ করতে হবে। সংসারে আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য না হলে—সে সংসার তো ভূতের বোঝা বওয়ার সামিল।

আর কিছুদিন পরে কথাটা কমলাই পাড়লে। মা শুনছ, সন্তু বলছিল—আমাদের টাকা যখন কমেই এসেছে—এত বড় ঘরে থাকবার কি দরকার ?

ঘর ? অন্য ঘর কোথায় পাবি ? অন্যমনস্কের মত উত্তর দিলেন ভগবতী।

আছে মা—মঙ্গলা-মাসী বলছিল। ঠিক এরই নীচে আদ্ধেক ভাড়া। একটু স্যাঁতসেঁতে—তা তক্তাপোষ পেতে নিলেই হয়ে যাবে।

—ওই ঘর ! একটিমাত্র দরজা—জানালা নেই। ও ঘরে মানুষ থাকতে পারে ?

—ছিল তো মানুষ। আমাদের মত অবস্থা যাদের—তারাই থাকে। মাসী বলে—কলকাতার গোয়াল-ঘরটিও পড়তে পায় না।

—ও ঘর যে গোয়ালের চেয়েও···, ভগবতীর কণ্ঠরুদ্ধ হল। মুখ ফিরিয়ে আত্মসম্বরণ করলেন।

খানিক পরে বললেন—নাই বা রইলাম এখানে—আমাদের দেশ আছে তো।

এখানে না থেকে উপায় কি মা। সন্তু তবু কিছু আনছে—দু'বেলা জুটছে দু'মুঠো।

ওরে না—না—না। আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠলেন ভগবতী। অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ওর উপার্জ্জনে আমরা বেঁচে থাকব—এই ভাবে ও আমাদের বাঁচাবে। কিন্তু ও যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওকে মেরে ফেলে আমাদের বেঁচে থেকে লাভ কি। ওকে বাঁচতে দে—কমলা—ওকে বাঁচতে দে।

ভগবতী পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

সন্তু বললে, মা—কেমন আছ ? ডাক্তারবাবুকে ডাকব ?

প্রবলবেগে মাথা নাড়লেন ভগবতী, না—না—না।

কমলা বললে—মাকে দেশে পাঠিয়ে আমরা দু'জনে এখানে থাকতে পারি না ?

তাতে মা রাজী হবেন না। তবে আমি একলা থাকি যদি হোটেলে—

তুই বুঝি পড়াশোনা ছেড়ে দিলি ?

সন্তু ম্লান হেসে বললে—পড়াশোনা। আগে বাঁচি ত !

—দিনকয়েক পরে ভগবতী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে উঠলেন। কমলাকে ডেকে বললেন, উনুনে আঁচ দে—আজ আমি রাঁধব।

তুমি রাঁধবে? এই রোগা শরীর নিয়ে ওপর নীচে নাই বা করলে, মা।

না রে—আমাকে রাঁধতেই হবে। ভারি একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখলাম কাল।

কি স্বপ্ন মা?

স্বপ্নে দেখলাম—যেন বাড়ীতেই রয়েছি। বাড়ীতে অনেক লোকজন—পূজোর কি বিয়ের যেমন সমারোহ ব্যাপার হয় তেমনি। আত্মীয় কুটুম্ব এসেছেন—পাড়া-পড়শীরা সব এসেছে। বাইরে কোথায় ঢোল আর কাঁসি বাজছে—মধুসূদনের ঘর থেকে ধূপ ধুনো গুগ্‌গুলের গন্ধ ভেসে আসছে—আর স্তোত্রপাঠ হচ্ছে—তার শব্দ। বাবা স্তোত্রপাঠ করছেন।—এত যে লোকজন চলছে ফিরছে—কারও সঙ্গে আমি কথা কইছি না—আমাকে ডেকেও কেউ কিছু বলছে না। এমন সময় সদর দরজা দিয়ে একটি ছেলে বাড়ীর মধ্যে এল, কি কান্তিমান ছেলে—সমস্ত জায়গাটা যেন আলোয় আলোময় হয়ে গেল। পরণে একখানি গরদ কি মটকার ধুতি—গায়ে ওরই চাদর—সেই চাদর ফুঁড়ে দেখা যাচ্ছে তার ধবধবে রং। গলার পৈতে গাছটিও ধপধপ করছে—কানে দুটি বীরবৌলি—যেমন পৈতের সময় সন্তুর কানে ছিল—মাথাটি কিন্তু নেড়া নয়—এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল—কাঁধের ওপর পড়েছে। পা দু'খানিতে যেন পদ্মফুল ফুটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছেলে। সোজা চলে এলো আমার কাছে। এসে আমার মুখের পানে চাইলে। যেমন ক্ষিদে পেলে মিণ্টু খোঁতন চায়—তেমনি চাউনি। তারপর স্পষ্ট শুনলাম—যেন বলছে, ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দে। স্বর তো নয়—বাঁশীর আওয়াজ। সমস্ত দেহ কেঁপে উঠল আমার—প্রাণের ভেতরটা যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল। মনে হল—দেহ আমার গলে যাচ্ছে—গঙ্গা যেমন ঢেউ খেলে বয়ে যাচ্ছে—তেমনি। কেমন হাঁপ লাগল—আঁকুপাঁকু করতেই ঘুম ভেঙে গেল। দেখি—ঘামে বিছানা ভিজে গেছে। বলতে বলতে ভগবতীর দেহে রোমাঞ্চ জাগল।

খানিক অভিভূতের মত থেকে বললেন, উনি আর কেউ নন, আমাদেরই মধুসূদন। আমরা ওঁকে ঘরছাড়া করেছি—উনি আমাদের ছাড়তে পারছেন না। ওঁর সেবার ত্রুটি হচ্ছে—ভোগ দেওয়া হচ্ছে না—তাই আমার কাছে এসে বললেন, ক্ষিদে পেয়েছে।

ওঁকে আজই নিয়ে আসবে মা!

একটু ভেবে ভগবতী বললেন, তোমার পুরুত জ্যেঠাকে নেমন্তন্ন করে এসো—ভগবান ব্রাহ্মণের বেশে এসেছেন—ব্রাহ্মণের মধ্যে উনি আছেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করালে ওঁকে ভোজন করানো হবে। সন্তুকে বল ভাল করে বাজার করে আনুক—আমি রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দেব—সেই প্রসাদ সবাই মিলে পাব।

মধুসূদনকে আজই কি আনা হবে মা?

আজ থাকুক, একটা ভাল দিন দেখে—

সন্তুকে ডাক তো মা—সে গেল কোথায়?

কমলা একটু ইতস্ততঃ করে বললে, কাল সন্ধ্যেবেলায় বলছিল বটে—কোন বন্ধুর বাড়ীতে যাবে। বন্ধু যাবে কলকাতার বাইরে।

ভগবতী ব্যগ্রস্বরে বললেন, তাহলে হাট বাজার করবে কে? খাওয়ানোর ব্যবস্থা কি হবে।

আজ থাক না হয়।

নারে—ঠাকুরের পেট ভরছে না—স্বপ্নের সেই মুখ দেখলে পাষাণ ফেটে যায়। আর কাউকে দিয়ে বাজার আনিয়ে দে মা।

টাকা বোধ হয় সন্তুর কাছে আছে। কমলা মাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য শেষ চেষ্টা করলে।

ভগবতী বললেন, ওই তো ওর জামা টাঙানো রয়েছে, ওর পকেটেই টাকা আছে। ক'দিনই শুয়ে শুয়ে দেখছি কিনা—ওই জামার পকেট থেকেই সে টাকা বার করে।

মিণ্টু ছুটে গিয়ে জামার পকেটে হাত পুরলে। দু'মুঠো ভর্ত্তি করে ছুটে গেল ভগবতীর কাছে। মাদুরের উপর দু'মুঠোই আলগা করে দিয়ে বললে এই নাও।

সিকি-আনি-দুয়ানি আর পয়সা কতকগুলি ছড়িয়ে পড়ল মাদুরের উপর। তার সঙ্গে পড়ল একটা কাগজের প্যাকেট।

ভগবতী বললেন, এটা কিসের বাক্স রে?

মিণ্টু বললে, সিগ্রেটের বাক্স মা। টপ করে বাক্সটা

তুলে নিয়ে খোলটা খুলে তিন চারটা সিগারেট বার করে বললে, এই দেখ।

সন্তুর পকেটে এসব কেন? ও কি সিগারেট খায়? কমলার পানে চেয়ে গম্ভীর থমথমে গলায় প্রশ্ন করলেন ভগবতী।

কমলা বললে, আমি কেমন ক'রে জানব মা! ওকে সিগ্রেট খেতে দেখিনি তো কোনদিন।

হাঁ মা—দাদা সিগ্রেট খায়—আমি দেখেছি। মিণ্টু তাড়াতাড়ি বললে।

কখন দেখলি?—ওকে ধমক দিলে। তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ও সিগ্রেট খেয়েছে, নয়?

মিণ্টু ধমক খেয়ে কেঁদে ফেললে।

ভগবতী কঠিনকণ্ঠে বললেন, ওকে ধমকালে তার দোষ ঢাকবে না কমলা—মিছে কেন ওকে বক্‌ছিস।

মিথ্যে মিথ্যে অজয়ের নামে লাগাবে তাই বলে!

মিথ্যে নিয়েই যে কারবার আমাদের—আমরা সত্যি কথা বলব কখন! বলতে বলতে ভগবতী শুয়ে পড়লেন। তারপর কাঁপা গলায় বললেন, গায়ে একটা কিছু চাপা দিয়ে দে—শীত করছে।

শীত করছে? তবে কি জ্বর আসছে আবার! কমলা সভয়ে মায়ের কপালের উপর হাত রাখলো।

ওর হাতখানা সরিয়ে দিয়ে তিক্তকণ্ঠে বললেন ভগবতী, জ্বর হলেও যে বাঁচি—অমনিতে তো মরণ হবে না। হু—হু—করে ওঁর দুচোখে জল গড়িয়ে পড়লো। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন ভগবতী।

কমলা যেমন হতভম্বের মত হয়ে গেল। সন্তু বাড়ী নেই—চাল আনতে গেছে। সে কথা মাকে জানালে ওঁর অসুখ যদি বেড়ে যায়, তাই ভয়ে মিছে কথা বলেছে কমলা। কিন্তু তাতেই কি বিপদ কাটল! তখন সে কি করবে? জ্বর বেড়ে যাবে, তখনই ভুল বকতে সুরু করবেন মা। সে ভুল বকা শুনলে মনে হবে কত জ্বালায় জ্বলে জ্বলে তবে এমন অসুখটি বাধিয়েছেন।

সেবার পুরুত-জ্যেঠিমা তো স্পষ্টই বললেন, তোমরা যে যাই বল বাছা—ও দেহের রোগ নয়, মনের রোগ। ছেলে মেয়েরা ভূতের হলে—আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি কখনো এমন ব্যারাম হত না।

ওঁদের ডেকে আনতেও ভরসা হয় না কমলার। মা কি তবে অমনি করে ভেবে ভেবে জ্বর করবেন—আর এমনি করে ভেবেই হঠাৎ মারা যাবেন। এ বিপদে কাকে ডাকবে সে!

ঘরের বাইরে রমার সঙ্গে দেখা। সিঁড়ি দিয়ে নীচেয় নামছিল রমা—কমলার কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে তার কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে রে! কাঁদছিস কেন?

কমলা কাঁদতে কাঁদতে বললে, মা'র আবার জ্বর এসেছে। সন্তু বাড়ীতে নেই—আমি কি করব।

ভয় কি—চ, আমি দেখছি।

ব্যবস্থা যা কিছু করবার সেই করলো। রোগীর ঔষধ পথ্য থেকে—ছোট ছেলেদের খাওয়ানো-নাওয়ানো—সান্ত্বনা দেওয়া সব কিছু।

ডাক্তার বললেন, রোগীর হার্ট বড়ই দুর্ব্বল—বায়ু পরিবর্ত্তন করলে ভাল হয়।

এই অবস্থা যাদের—তারা হাওয়া বদলাবে কেমন করে ডাক্তারবাবু!—রমা বললে।

পশ্চিমে হাওয়া খেতে যাবার কথা বলছি না। কাছে পিঠে কোথাও—নিদেন পক্ষে নিজের দেশ যদি থাকে—সেখানে গিয়ে থাকলেও সামলে উঠবেন। ওঁর মনের উপর আঘাত লেগেছে—অত্যন্ত শক পেয়েছেন—তাই হার্টটাও উইক করে দিয়েছে। দেশ থাকে তো সেইখানে গিয়ে থাকুন না কিছুদিন।

ডাক্তার চলে গেলে রমা কমলাকে বললে—দেশেই যা না হয়।—

কমলা বললে, চিঠি দেয়া হয়েছে কাকাকে, উত্তর আসেনি।

বেশ ত—দু'দশদিন অপেক্ষা কর—ততদিনে খানিকটা সামলে উঠুন কাকীমা।

—এক সপ্তাহ পরে জ্বর ত্যাগ হল ভগবতীর। শিয়রের কাছে রমাকে দেখে—ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—আবার বাঁচিয়ে তুললি আমায়! তোদের সঙ্গে কি শত্রুতা করেছিলাম আমি—যে বার বার শাস্তিভোগ করাবার জন্য আমায় টেনে টেনে তুলছিস?

রমা ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে,

আপনি ছাড়া এদের কে আছে—কাকীমা! এরা সংসারে ভেসে যাক—এই কি চান আপনি?

আমি আর ওদের কি করলাম মা। সংসার যে আমার ভেসেই গেল! মধুসূদনকে ধরে রাখতে পারলাম না, ছেলেমেয়েদেরও মানুষ করে তুলতে পারলাম না। রাত পোয়ালে—এই ঘর ছেড়ে নীচেয় নামতে হবে। উনি যা চেয়েছিলেন, যেটুকু তৈরী করেছিলেন—তার কিছুই মেটাতে পারলাম না—উল্টে ওঁর তৈরী জিনিস ভেঙ্গে—এদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছি। আমার মরণ হলে এদের ঘর হয় তো ভাঙ্গত না।

কাঁদতে লাগলেন, ভগবতী।

কমলা রমার পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে—মাকে চুপ করাও রমাদি—বেশী কাঁদলেই জ্বর বাড়বে।

রমা বললে—আপনি মিছে ভাবছেন—কাকীমা। আমরা ঘর ভাঙ্গি না—ঘর গড়ি। এক ঘর নষ্ট হয়—নতুন ঘর তৈরী করি। মানুষ কখনো নীচেয় নামছে—কখনো ওপরে উঠছে। নীচেয় নামে বলেই তার সাধনা হয় উপরে উঠবার। শুনেছি ভগবানকে পাবার সাধনাও এই রকম। নীচে থেকে উপরে ওঠার। ভাবুন তো আমার কথা।

আমার মনে যে বল নেই মা।

এদের মুখ চেয়েও বুকে বল আনতে হবে। পৃথিবীতে না খেয়ে শুকিয়ে হয়ত অনেকে মরে—কিন্তু যারা চেষ্টা মাত্র না করে হায় হায় করে—তাদের জন্য আমার একটুও কষ্ট হয় না—কাকীমা। তাদের মরাই উচিত। কমলাকে আমি সেলাই শেখাব—কি করে বাঁচতে হয় তার উপায় বলে দেব। আপনি ভাববেন না।

কিন্তু আমি যে এখানে আর থাকতে পারছি না।

বেশ তো—তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন—আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।

আহা—সুখী হও মা—সুখী হও। আশীর্ব্বাদ করি মনের মত স্বামী লাভ কর—সুখের ঘর তোমার গড়ে উঠুক।

কমলাকে একান্তে ডেকে হেসে বললে রমা, মনের মত স্বামী লাভ ভাগ্যের কথা—তবে মনের মত ঘর আমরা ইচ্ছে করলে—চেষ্টা করলে তৈরী করে নিতে পারি। পারি না?

কমলা বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

রমা বললে, দূর বোকা, স্বামী লাভ নাইবা হল, ওটাকে সব চেয়ে বড় বলে মনে করলে—মনের মত ঘর আমাদের না-ও মিলতে পারে! আমরা মনের মত ঘর যদি গড়তে পারি, মনোমত স্বামীলাভও অবশ্য ঘটবে। মন্দিরটা ভাল না হলে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করা যায়? ভাঙ্গা মন্দিরের দেবতা নিয়ে কার মন ভরে বল তো?

কমলা বললো, আমাদের যে তিনদিন বাদেই ভাঙ্গা মন্দিরে নামতে হবে। ভাবছি—মা সে আঘাত সহ্য করতে পারবেন কি!

তার আগেই ওঁকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কে করবে ব্যবস্থা! আজ আট দিন হল সন্তু আসেনি। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি।

দাঁড়া—কেষ্টকে ডাকছি আমি। খবর দিচ্ছি।

কেষ্ট এসে বললে, তুমি তো জান রমাদি—ওপথে আমি আর যাই না।

কিন্তু ছেলেটার কি হল—ও খবরটি চাই—ভাই।

আচ্ছা—খবর আমি এনে দিচ্ছি।

পরের দিন বিকেল বেলায় ফিরে এল কেষ্ট। রমাকে একান্তে ডেকে চুপি চুপি বললে, রমাদি—ভারি খারাপ খবর। চাল আনবার সময় পুলিশের সঙ্গে কি কথা কাটাকাটি হয় একটা দলের। কেষ্ট সেই দলে ছিল। পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করে, ওরা ইঁট পাটকেল ছোঁড়ে। পুলিশ বন্দুক ছোঁড়ে—দু'জন মারা গেছে—দশ বারো জন আহত হয়েছে—

রমা রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, সন্তু কি তবে—

না, মারা যায় নি। কেষ্ট বললে, আহতও হয়নি। তবে ধরা পড়েছে। বিচারে ওদের কি হয় বলা যায় না। জেল হতেও পারে।

রমা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বহুক্ষণ। অনেকক্ষণ কেটে গেল। ভগবতীকে কি সান্ত্বনা দেবে সে? এ আঘাত তিনি কখনই সইতে পারবেন না।

সহসা একটা উপায় তার মাথায় এল। তাড়াতাড়ি কেষ্টর একখানা হাত ধরে বললে, খবরদার একথা যেন কাকে-পক্ষীতে টের না পায়—ও বাড়ীর কাউকে বলবি

নে। তুই জেনেছিস—আর আমি জানলুম। আরও একটি কাজ তোকে করতে হবে। কাল হোক, পরশু হোক—সন্তর মাকে ওঁদের দেশের বাড়ীতে দিয়ে আসতে হবে। পাড়াগাঁয়ে ওঁদের বাড়ী খানিকটা দূর আছে। পারবি নে।

পারব।

রমা ভগবতীকে বললে, পরশু আপনাদের দেশে পাঠিয়ে দেব কাকীমা। কেষ্ট আপনাদের রেখে আসবে।

কেন সন্তু? সন্তু কোথায় গেল! আকুল প্রশ্ন করলে ভগবতী।

সে তো তার বন্ধুর বাড়ীতে গেছে। কাল বুঝি চিঠি দিয়েছে, ফিরতে আরও এক সপ্তাহ দেরী হবে। বন্ধুর মা-বাবা ওকে নিজের ছেলের মত যত্ন করছেন—ছাড়তে চাইছেন না।

আহা ভগবান তাঁদের সুখে রাখুন। তা আমরা চলে গেলে—সে কোথায় এসে থাকবে? জিজ্ঞাসা করলেন ভগবতী।

কেন—আমার কাছেই থাকবে। দিদির কাছে কি ভাই থাকে না?

আহা—বাঁচালে মা। আমার মাথায় যত চুল··· আশীর্ব্বাদের বন্যায় রমাকে পরিপ্লাবিত করে তুললেন ভগবতী।

যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। গৃহদেবতা মধুসূদনকে ঘরে আনিয়ে ভোগ-পূজো দিয়েছেন ভগবতী—পুরোহিত মশায়কে আহার করিয়ে নিজেরা প্রসাদ পেয়েছেন। একে একে সবাই শুনেছে খবরটা। সবাই দেখা করে যাচ্ছে একে একে। একসঙ্গে থাকতে গেলে অনেক কিছু সঞ্চিত হয়—অনেক কিছু থেকে বঞ্চিতও হতে হয়। তবু সঞ্চয়ের আনন্দ ও যাতনার বেদনা ভুলে অত্যন্ত নিকট-আত্মীয়ের মত কাছে এসে দাঁড়ায় মানুষ। বিদায়ের সুরে দুঃখ আছে—। দুঃখ মনকে সঙ্কুচিত করে না—করে প্রসারিত। হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরলে যা দূরে ঠেলে দেয় মানুষকে—তা আত্মসুখ। আর এক নাম তার স্বার্থ। নিকটে থাকলে এর থেকে আত্মরক্ষা করা কঠিন। কিন্তু বিদায়ের প্রখর কিরণে এটি সূর্য্য কিরণে কুয়াশা-লুপ্তির মত নিঃশেষিত হয়—এবং সেই সূর্য্য কিরণে যেমন করে বৃন্তে উদ্ভাসিত শতদল সমস্ত দল মেলে শোভা বিস্তার করে—তেমনি করে মনের কোমল বৃত্তির দলগুলি প্রকাশিত হয়। মিত্তির বউ···পুরুতগিন্নি, কেষ্টর-মা, মঙ্গলা-বাড়ীউলি—এবং আরও অনেকে এসে চোখের জল ফেললেন। বললেন, আবার এস দিদি—নীরোগ হয়ে—হাসিমুখে ফিরে এস। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি।···

এখন দেশ থেকে চিঠিখানি এলেই ভগবতী রওনা হয়ে যান। কাল সকালে নিশ্চয় পত্র আসবে। ভগবতীর মন বলছে—জবাব আসবে কাল সকালেই।

সারারাত ঘুম হল না ভগবতীর। আজ দুঃখ কিংবা সুখ কোন জিনিস তাঁর নিদ্রাকে হরণ করলে? বহুদিন ধরে মনে পুষে রাখা সাধ সহরের রুদ্ধ চাপে ধীরে ধীরে লয় হয়ে আসছিল মনের মধ্যে—কণামাত্র আশার আলো দেখতে পান নি এই ক'টি দীর্ঘ বছরে। সেই নিবু-নিবু দীপশিখা সহসা তৈলবিন্দু থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল পরে নিজের গ্রামে ফিরে চলেছেন ভগবতী। কিন্তু সেই প্রদীপের নীচে অনেকখানি অন্ধকারও যেন জমা হয়ে রয়েছে। যে গৌরব নিয়ে প্রবাসিনী হয়েছিলেন ভগবতী—অমরনাথ সে গৌরব হরণ করে নিয়েছেন। বেদনা আর আনন্দ দুই সারারাত্রি মথন করতে লাগল ভগবতীকে। শীতের সারারাত্রি বিনিদ্রভাবে কেটে গেল।

বেলা দশটায় একখানি পত্র এল। দেশ থেকে লিখেছেন কাকা। পত্রখানি পড়ে কমলার মুখ শুকিয়ে গেল—কাঁপতে কাঁপতে ও রমার কাছে গিয়ে বসে পড়লো। বললে, এই নাও চিঠি—এইমাত্র দেশ থেকে এল। এখন বলত রমাদি—কি করব আমি? পত্রখানি রমার কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে দুহাতে মুখ ঢাকলে কমলা।

রমা তাড়াতাড়ি পত্রখানি তুলে নিয়ে পড়লে—

শুভাশীর্ব্বাদরাশয়ঃ সন্তু,

মা কমলা, তোমাদের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে ও বাড়ীর সমস্ত কুশল জানিবা। তোমরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছ জানিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম। কিন্তু মা,

তোমাদের বাটীর অবস্থা তো—অমর বাবাজীবন জীবিত থাকিতেই অবগত করাইয়াছিলাম। সময় থাকিতে তোমরা সে বিষয়ে কর্ণপাত করিলে না। সংস্কার অভাবে চালাখানি বহুদিন হইল ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন দেখিলে বুঝিতে পারিবে না যে—কোনকালে এখানে বাসগৃহ ছিল। কাল-কাসুন্দা, শিয়াল-কাঁটা আর ভাঁটের জঙ্গলে তোমাদের ভিটাখানি ছাইয়া ফেলিয়াছে। তবে যদি একান্তই দেশে ফিরিতে মনস্থ করিয়া থাক তো তোমার মাতাঠাকুরাণীকে জানাইবে যেন পত্রপাঠ কিছু টাকা পাঠাইয়া দেন। আমি ভিটার জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া—মাথা গুঁজিবার মত একখানি চালা তুলিয়া দিব।···

যে ঘর এই ভাবে ভূমিসাৎ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে—তা পুনর্নির্ম্মাণের আশ্বাস—রমা কেমন করে দেবে বুঝতে পারলে না।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে ও চুপ করে বসে রইল।

রমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কমলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ওর কান্নার সুরে রমা যেন চাবুক খেয়ে জেগে উঠল। কমলাকে দু'হাত বাড়িয়ে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললে, দূর বোকা মেয়ে, এতে কাঁদবার কি হ'ল। আমাদের ঘর কি কখনও ভাঙ্গে? পৃথিবীটা যত বড়ই হোক না কেন—আমরাও পাল্লা দিয়ে দৌড়ই তার সঙ্গে। আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেও যেতে পারে না।

কমলা অশ্রু-ভেজা স্বরে বললে, কিন্তু রমাদি, সেই ঘরে কেমন করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব মা-কে?

মা-র জন্ত আমরা নতুন ঘর তৈরী করব। পারব না? কেন পারব না? বাপের ঘর, স্বামীর ঘর, ছেলের ঘর—কোন্ ঘরটা তৈরী করি না আমরা বল তো?

তুমি মাকে বুঝিয়ে বলবে চল—

আজ থাক, কাল বলব।

আজ নয় কেন? কমলার স্বরে ঈষৎ উত্তেজনা।

কাল সন্তু যদি ফিরে আসে উনি সহজেই বুঝবেন, বিশ্বাস করবেন আমার কথা।

সন্তু যদি কাল ফিরে না আসে?

রমার মুখে মৃদুহাসি ফুটে উঠল। কমলার মাথায় ডান হাতখানি রেখে বললে, কালকের কথা—কাল ভাবব ভাই, আজ নয়। একটু থেমে বললে, বলেছি না—পৃথিবী যদি সীমাহীন হয়—আমাদের আশাও হবে অফুরন্ত। সেই আশাকে আশ্রয় করেই আমরা বেঁচে থাকব। ঘর আমাদের ভাঙ্গে না—এ কথা বিশ্বাস কর ভাই, না হলে আমি কোথাও তলিয়ে গেলাম না কেন?

—কমলা মাথা তুলল—চাইল রমার পানে।

রমার আশা-আশ্বাসভরা উজ্জ্বল মুখের পানে মৃদুদৃষ্টি মেলে চেয়েই রইল সে, আর কোন কথা বলতে পারল না।

সমাপ্ত

মীরাবাই

সঙ্গীতাচার্য্য বসন্ত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত-রত্ন

রাজপুতানার মরুপ্রান্তর

চিতোর দুর্গের অভ্যন্তরে শান্ত পার্ব্বত্যপরিবেশে একটী নির্জ্জন দেবালয়। এই দেবালয়ে চৌহানবংশীয়া একটী রাজকুমারী তিন-শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভজন-রাগ-সংগীত গেয়ে বেড়াতেন। তখন দিল্লীতে বাদশাহ আকবর, "স্পেন"এ দ্বিতীয় ফিলিপ, এবং ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকাল।

রাজকুমারীর সুমিষ্টকণ্ঠ সেদিন কত প্রভাতকে জানাত অভিনন্দন, কত সন্ধ্যাকে করত মুখরিত। মন্দিরের সোপানে দাঁড়ালে দেখা যায় মহাকাল—এখানে তাঁর বিশেষ কোন চিহ্ন রেখে যেতে পারেন নি। তিনশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যে রবি দিনান্তে যে আলো বিকীরণ করত, প্রভাতের যে অরুণালোক যে সহস্ররেখায় প্রবেশ করত আজও ঠিক তেমনি করছে। কেবল যে কণ্ঠ অনুক্ষণ জগৎপিতার চরণে মুক্তির জন্য আকুল নিবেদন জানাত তাই নীরব। সে কণ্ঠের অধিকারিণীই হাওয়ার সঙ্গে গেছে মিশে।

বাতাসে ঢেউ খেলান মাড়োয়ারের রুক্ষপ্রান্তরে ক্ষুদ্রগ্রাম কুর্কী ১৬ শতাব্দীর সেপ্টেম্বর মাসের এক প্রভাতে উৎসব বেশে সজ্জিত; কারণ রাজপুত সর্দ্দার রতনসিংএর একটী অতি সুলক্ষণা কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। সেই কন্যাই আমাদের মীরাবাই।

সর্দ্দার সাহেবের বিশাল প্রাসাদে জাঁকজমকের সঙ্গে অতি আদরে তিনি লালিত-পালিত হতে লাগলেন। তাঁকে সেবা করবার জন্য

নিপুণ দাসদাসী নিযুক্ত করা হল। তারা সারাদিন তাঁর দেহ লেপন করে চন্দনগন্ধে, সুশোভিত করে নানা রত্নালঙ্কারে ও পরিচ্ছদে, ঘুম পাড়ায়, দোলায় চাপিয়ে এবং দোলা দেয় ঘুমপাড়ান গান গেয়ে।

ক্রমে তিনি শশিকলার মত দিন দিন বড় হতে লাগলেন এবং কথা বলতে শিখলেন অনর্গল। ঘরময় ছুটছুটী করে প্রাসাদ আলো করে বেড়াতে লাগলেন পরম উল্লাসে।

একদিন রসুনচৌকির "রাগালাপের" সুমিষ্ট স্বরলহরীতে যখন আকাশ-বাতাস মুখর, বালিকার মন তখন আনন্দে নৃত্য করে উঠল। দৌড়ে তিনি মায়ের কাছে গিয়ে বিবাহবেশে সজ্জিত কনেকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "মা' একে ?" মা' জনস্রোতের দিকে চেয়ে বললেন : ও বে'র কনে। কিন্তু বালিকাকে নিরস্ত করা যায় না। কেবলই বলেন, তিনি দেখতে যাবেন। তখন মা' গৃহবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তা'র ঔৎসুক্য নিবারণের চেষ্টা পেলেন। বললেন : উনিই তোমার বর। তখন কিন্তু তিনি জানতেও পারলেন না যে যাঁকে তিনি খেলাচ্ছলে সেদিন গৃহবিগ্রহ দেখিয়ে দিলেন সেখান থেকেই হল তা'র কৃষ্ণপ্রেমের উৎপত্তি। কারণ—জগতে এমনি হয়। এমনি ছোটখাট ঘটনা থেকেই হয়ত বাংলার চৈতন্যদেব ও বাউল সম্প্রদায়, পাঞ্জাবএর গুরু নানক, সৌরাষ্ট্রের "দাদ", বোম্বাইএর বিষ্ণুদিগম্বর, উত্তরপ্রদেশের স্বামী হরিদাস, বিহারের বিদ্যাপতি, উড়িষ্যা আসাম ও বাংলার বৈষ্ণবসাধু সম্প্রদায়, মধ্যভারতের সুরদাস ইত্যাদি ভগবানের সত্তা ও বিশ্বের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন এবং রাগসংগীতের সুর ও কথার মাধ্যমে তারই স্বরূপ প্রকাশ করে গেছেন। মানবজাতির মধ্যে যাঁরা দানব হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন তাদের মানুষকে তাঁদের অধিকারে বঞ্চিত না করতে। নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন তাদের দেশের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করবার।

দিন যায়। নিদাঘ আসে তার ফলফুলডার নিয়ে, বর্ষা আনে শ্যামঘটা, শরতে নদীতীরে কাশের বনে লাগে দোলা, হেমন্ত আনে কুহেলিকা ; শীত আনে দীর্ঘশ্বাস, বসন্ত আনে উৎসব রজনী ; আবর্ত্তিত হয় ষড়ঋতু, বালিকা মীরা হন কিশোরী।

পিতামাতার মনে কিন্তু সুখ নেই কারণ সন্ধ্যা থেকে সকাল অবধি মীরা বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত। সেই মূর্ত্তির সম্মুখে তিনি হাসেন কাঁদেন গান গা'ন। তবে কি তিনি পাগল হয়ে যাবেন ?

পিতামাতা অনেক ভে'বে তাঁদের অপরূপ রূপসী কন্যার বিবাহ স্থির করলেন চিতোরের রাণা কুম্ভের সঙ্গে। রাণা কুম্ভ স্ত্রীকে স্নেহ করতেন এবং শীঘ্রই আবিষ্কার করলেন এই বয়সেই তাঁর মনে এসেছে বৈরাগ্য। তখন বর্ষীয়সী শ্বশ্রূমাতা এবং অন্যান্য পুরমহিলাগণ চেষ্টা করলেন—যা'তে তাঁর মন সংসারে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু—

"রাণাজী মৈঁ গোবিন্দকি গুণ গাস্'া
চরণামৃতকো নেম হমরে নিত উঠ দরশন পাস্'া"

("মীরাবাইকে ভজন।")

গোবিন্দ তাঁর মন অধিকার করেছেন। কাজেই তিনি পৃথিবীর অতীত অতিমানবীয় ভাবে বিভোর হয়ে রইলেন।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে রাণা কুম্ভের ভগ্নী রাজকুমারী উদা ভ্রাতার কর্ণে তোলেন তাঁর সম্বন্ধে কুৎসা। ক্রুদ্ধ রাণা একদিন রাত্রি নিশীথে যখন সমস্ত পুরী নিদ্রিত তখন তরবারি হস্তে পত্নীর জীবনান্ত করবার জন্য ছুটলেন। কিন্তু মীরাবাই সেখানে নেই। তিনি দেবালয়ে। রাণা ছুটলেন। ঝড়ের মত পৌছে দেখেন তিনি মূর্ত্তির সামনে নিস্পন্দ বসে। ভাবলেন একি !

কিন্তু জগৎ বড়ই কঠিন। দুষ্ট লোকের রসনা তাঁকে কলঙ্কিনী বলে চিত্রিত করতে লাগল।

রাণা কুম্ভ অনেক ভেবে তাঁকে একটী গোবিন্দজীর মন্দির তৈরী করে দিলেন—সেখানে তিনি ভজন-পুজন নিয়ে শান্তিতে দিন কাটাতে পারেন।

মীরাবাইর অপরূপ কাহিনী মহম্মদীয় কুলগৌরব ও দিল্লীর তদানিন্তন গুণগ্রাহী মোগল-বাদশাহ আকবরের কানে গিয়ে পৌছায়। তাঁর দরবারে তখন রাজতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাগ-সংগীতের পীঠস্থান গোয়ালিয়র-এর ধ্রুপদ্ গায়ক তানসেন্ বিরাজমান। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে একদিন ভিক্ষুকের বেশে মীরাবাইর মন্দিরে উপস্থিত হলেন।

চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত চিতোর দুর্গে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় উপস্থিত হওয়া বাদশাহের পক্ষে তখন অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত মেবারের রাজপুতগণ মোগলসাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের পক্ষে তখন বিষম বিঘ্নস্বরূপ। বাদশাহ আকবরের নিকট কিন্তু এসব কিছুই স্থান পায়না। মীরাবাইর অপূর্ব্ব নৃত্য গীত তিনি শোনেন ও দেখেন। দেখেন তাঁর মুখের স্বর্গীয় জ্যোতি। অবশেষে বহুমূল্যবান রাজকণ্ঠের মালা ভক্ত মীরাবাইর নিষেধসত্বেও বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দিয়ে তিনি নিঃশব্দে ফিরে আসেন। পরদিন কিন্তু হৈ-হৈ কাণ্ড। দাবানলের মত সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল যে মোগল কাল রাতে মন্দিরে প্রবেশ করেছিল। রাণাজী ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করলেন এবং চৌহন রাজপুতগণ ফুলতে লাগলেন এই কারণে যে মীরাবাই তাঁদের বংশ কলঙ্কিত করেছে।

রাণাজী তাঁর পত্নীকে খবর পাঠালেন যেন তিনি নদীতে ডুবে হোক, জহর খেয়ে হোক—যে প্রকারে পারেন মৃত্যু বরণ করেন ; কারণ সমস্ত রাজপুতানাকে তিনি দুরপণেয় কলঙ্ক পঙ্কে নিমজ্জিত করেছেন। মোগলকে তিনি দেবদেউলে প্রবেশ করতে দিয়েছেন।

বিগ্রহ বুকে নিয়ে ভজন গাইতে গাইতে তখন তিনি চলেন সেই নদীতীরে যেখানে তাঁকে বিষ খেয়ে ডুবে মরতে হবে। দিনান্তের সূর্য্য তখন অস্ত যায় যায়। গোধূলির রক্তিমচ্ছটা আরাবল্লী পর্ব্বতের চূড়ায় ও নদীতীরে অপরূপ সমারোহ সৃষ্টি করেছে। সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যখন তিনি ডুবে যেতে লাগলেন তখন কোন এক অদৃশ্য হস্ত তাঁকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললেন "মীরা পতির সঙ্গে তোমার জীবন শেষ হয়েছে। এখন তুমি আমার নিকট এস।"

প্রাচীন ব্রজধামে বৃন্দাবন

নিধুবনে স্বামী হরিদাস তাঁর নিভৃত কুটীরে গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ রাগসংগীত গায়ক সুরকার, কবি এবং "সুরদাসীমলহার" বা "সুরমলহার" রচয়িতা সুরদাসকে এখানেই "তালিম" দিতেন। মীরাবাই এসে তাঁর সঙ্গীতশিষ্যা হলেন। তিনি তাঁর নিকট রাগসংগীত শিক্ষা করেন আর বঙ্কুবিহারী কৃষ্ণের মন্দিরে ভজন গান। ভক্তগণ শীঘ্রই তাঁকে ঘিরে ধরল। চিতোর থেকে তাঁর প্রজাগণ এসে পুনরায় তাঁকে নিজ মন্দিরে ফিরে যেতে অনুরোধ করল। একদিন ভিক্ষুকের বেশে রাণাও এসে তাঁর নিকট ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু কি আছে তাঁর? কি তিনি দিতে পারেন? জগতে পুঁজিপতি, বিত্তশালী ও সরকারী-বেসরকারী আমলাদের একমাত্র কাজ ও কাম্য ভোগ, লালসা, সাধারণ মানুষকে কোনও ছলে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা এবং দশজনের ওপর প্রভুত্ব করা। সে সবই তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এসেছেন। গৈরিকবসন, রুদ্রাক্ষমালা এবং ভিক্ষাপাত্রই এখন তাঁর একমাত্র সম্বল। রাণা মার্জ্জনা চেয়ে তাঁকে চিতোরে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। তিনি রাজী হলেন।

চিতোরে তিনি আবার ফিরে এলেন। সমস্ত পুরবাসী আবার আনন্দে নিমগ্ন হ'ল এবং মন্দিরে আবার তাঁর কণ্ঠধ্বনি শোনা যেতে লাগল। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তগণ আসতে লাগলেন তাঁকে দেখতে—জানাতে তাদের শ্রদ্ধা।

কিন্তু রাণাজীর পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে এবং একদিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণবায়ুও আকাশে মিশে গেল।

মীরাবাই এখন থেকে দিনরাতই মন্দিরে পড়ে থাকেন। জপতপ নিয়েই তাঁর দিন কাটে। কোথায় কি হচ্ছে সে সম্বন্ধে তিনি কোন খোঁজই রাখেন না। এদিকে চিতোরে নতুন রাণা হয়েছে। নাম তাঁর রতন সিং—প্রাক্তন রাণার কোনও সদগুণই পাননি। যতদূর জানা যায় তিনি অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং বহুবার মীরাবাইকে হত্যা করবার অপচেষ্টা করে প্রতিবারই বিফল মনোরথ হন। পদস্থ এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও এখনও যেমন দুর্নীতিপরায়ণ অনেক ক্ষেত্রেই তখনও সেরূপই ছিলেন। মীরাবাইর নিকট চিতোরের আবহাওয়া বিষাক্ত মনে হওয়াতে তিনি পুনরায় চিতোর ত্যাগ করেন এবং পুনরায় বৃন্দাবনে আসেন। এবার তিনি বৃন্দাবন থেকে দ্বারকা অবধি সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করে এখানে এসে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করতে লাগলেন। ক্রমে পশুপাখী থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই তাঁকে একান্ত পরমাত্মীয় মনে করতে লাগল। পরমবৈষ্ণবী মীরাবাইর নিকট বৃন্দাবনের ধূলিকণা অবধি প্রিয় বস্তু হয়ে পড়ল।

অবশেষে, একদিন যখন তাঁর জীবনের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল তখন তাঁর পবিত্র আত্মা অনন্তে মিশে গেল।

নানকপন্থী বা কবিরপন্থীদের সঙ্গে মীরাবাইর মতের খুবই সাদৃশ্য আছে। ঐ সকল সম্প্রদায়এর গ্রন্থেও তাঁর দোঁহা দৃষ্ট হয়। যে দার্শনিক মতবাদ তিনি জগতের জন্য রেখে গেছেন তা' আজও লক্ষ লক্ষ লোককে বিমল আনন্দে নিমগ্ন করে। সে তত্ত্ব গৃহীকে দেয় সান্ত্বনা, শোকার্ত্তের মনে এনে দেয় শান্তি এবং বঞ্চিতকে দেয় প্রেরণা।

চিতোর দুর্গের অভ্যন্তরে গুল্মরাজীসমাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ওপরে যে মন্দিরে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভারতীয় রাগসংগীতএ ভজন গেয়ে বেড়াতেন তা' আজও বর্ত্তমান। মন্দিরের সোপান, দেয়াল, পাষাণচত্বরে মহাকাল তাঁর বিশেষ কোনও চিহ্ন রেখে যেতে পারেন নি। সেখানে আজ কদাচিৎ কারুর চরণচিহ্ন পড়ে। পথিকেরাই আজকাল সাধারণতঃ এখানে আসে। স্মরণ করে তিনশতাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

শত শত বৎসর পূর্ব্বে সংগীত-শিল্পী, সুরকার, কবি ও ভক্ত মীরাবাই যে সকল গীতি-কবিতা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য সরল, নিরলঙ্কার ভাষায় লিখে রেখে গেছেন আজও তা' ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন তুচ্ছ করে কালজয়া অমরত্ব লাভ করেছে। তাঁর রচিত রাগসংগীতের সুর আজও ভারতের প্রতি নগর থেকে সুদূর পল্লী অবধি প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও শোনা যায়। আজও তাঁর রচিত কবিতা এবং রাগসংগীতের সুর ব্যতীত বেতার, গ্রামোফোন, সিনেমা, জলসা, সংগীত সম্মেলন কিছুই সার্থক হয়না। উচ্চাংগ "খেয়াল" গায়কগণ নিজেরা যে রীতিতে তাঁদের গানের কবিতা লেখেন তিনিও সেই নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করে-ছিলেন সেই নীতি যে নীতিতে অপ্রয়োজনীয় চাঁদ, ফুল, লতাপাতা ইত্যাদি নিরর্থক শব্দ ও অনুপ্রাস-অলঙ্কার বর্জ্জন করে অল্প কয়েকটী সরল নিরলঙ্কার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথায় সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা যায় সে সমস্তই জগতের যত বড় বড় কবিগণ তাদের গুটিকয়েক লোকের জন্য লিখিত দুর্ব্বোধ্য যত বড় বড় কবিতায় যে ভাব, শৌর্য্যবীর্য্য, দর্শন, তত্ত্ব, আদর্শ, বীরত্ব ইত্যাদি প্রকাশ করেন। যে নীতিতে রাগসংগীতের সুর এবং তার নিত্যনুতন "তান"-আলাপের লাবণ্যময় বিলাসে নিত্যনুতন আবেদন সৃষ্টি করা যায়। সে সংগীত সামন্ততান্ত্রিক যুগের "ঘারানা"-কলঙ্কিত নয় এবং কেবলমাত্র বিত্তশালীও পুঁজিপতিদের এবং তাদের বংশধরদের জন্য নয়। সে সংগীত গণতান্ত্রিক রাগসংগীত এবং সর্ব্বসাধারণের সংগীত।

সে সংগীত "হাঙ্গারী" বা "স্পেন" দেশে যা সাধারণতঃ সংগীতের নামে চলে তা' নয়। মঞ্চ, চলচ্চিত্র ও "গ্রামোফোনে" "আধুনিক-সংগীতের নামে হেঁড়ে-গলার গায়কের যে গান তা'ও নয়। নয় সে বাঁধাধরা স্বরলিপি অনুযায়ী হেঁড়ে-গলার য়ুরোপীয় ঢঙের বিকৃতরুচি, সুর, কবিতা-বৃত্তি এবং স্বরান্ত-কম্পন—যে ধরণের গান' সাধারণত ঘটা করে আমাদের দেশে গাওয়া হয় এবং সংগীতের নামে সংগীত প্রতিষ্ঠানগুলিতে শেখান হয় এবং যা' একমাস শোনার পর পুরান হয়ে যায় আর তা'রপর পুরান গান বলে কেউ শোনে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পরিবেশন করেছে শিক্ষা—চরম ও পরম সৃষ্টি লীলার। সে শিক্ষা পেলে আর অবশিষ্ট থাকে না জীবন-রহস্য সম্বন্ধে কোনো জ্ঞাতব্য তত্ত্ব। শিক্ষক স্বয়ং নররূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—শিষ্য অর্জ্জুন, পাণ্ডববংশের সে যুগের প্রধান ধনুর্দ্ধর, গুরু কৃষ্ণের সখা শিষ্য।

কিন্তু এ শিক্ষা লাভ করলেন কোথায় কৌন্তেয় অর্জ্জুন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে। কী রোমাঞ্চকর ঘটনা। মুনি, ঋষি, মহামানব, সিদ্ধ ও সন্ন্যাসী নিভৃত নিরালায় বসে যে তত্ত্ব আয়ত্ত করতে পারে না সম্যক রূপে—সে মহা-সমাচার শুনলেন পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রের উভয়পক্ষের সেনার মাঝে রথে, সারথী সখা শ্রীকৃষ্ণের মুখে। শুনলেন, বুঝলেন, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করলেন সংশয় বা কুহেলিকা অপসারণের জন্য। কখনও বা সংগ্রহ করলেন নূতন তথ্য। কিন্তু বুঝলেন চরমরূপে পরম কথা। কারণ শেষে বল্লেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াঽচ্যুত।

স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।১৮।৭৩

—হে অচ্যুত তোমার কৃপায় আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হল। আমি আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতি লাভ করলাম। তোমার উপদেশে আমি স্থিরচিত্ত হয়েছি, আমার সমস্ত সন্দেহ তিরোহিত হয়েছে। এখন কর্ম্ম করব তোমারই উপদেশ অনুসারে।

মহর্ষি, মহামুনি, আচার্য্য, উপাধ্যায় ও উপদেষ্টারা তপোবনের শান্ত, নিরুপদ্রব, মধুর নিরালায় শিক্ষাদান করতেন অন্তেবাসীদের। কোলাহলের মাঝে প্রমাথী মন হয় চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত। বাক্য এবং অর্থের ঐক্য বক্তা এবং শ্রোতার মনে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে, একের মনোভাব অন্যের জ্ঞানগম্য হয় না। গুরু এবং শিষ্যের মনোবৃত্তি হওয়া চাই এক-কেন্দ্র। কুরুক্ষেত্রে গুরু সর্ব্বজ্ঞ, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতব্য। শিষ্য স্নেহ-ভাজন অর্জ্জুন। সঞ্জয়ের মত বরেণ্যকে সে আলাপন শুনে বলতে হয়েছে—আমি এইরূপে মহাত্মা বাসুদেবের এবং পার্থের এই বিস্ময়কর এবং রোমহর্ষক আলাপ শ্রবণ করেছি।

এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর আলাপ কেন হ'ল কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে, এ রহস্য যখন আলোচনা করি, সত্যই হই বিস্মিত এবং রোমাঞ্চিত।

বেদব্যাসের প্রসাদে দিব্য-চক্ষু লাভ করে শ্রীসঞ্জয় শুনেছিলেন গীতামৃত। শুনিয়েছিলেন সে সমাচার মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রকে। গুরু-শিষ্যের উভয় চিত্ত এক না হলে শিক্ষা হয় নিস্ফল। শিক্ষালাভের প্রচেষ্টাও হয় নিরর্থক—চিত্তবৃত্তি একমুখ না হ'লে। মন চঞ্চল। তাকে উপদেশের ভাবস্রোতে নিয়ন্ত্রিত করা তো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। যোগ-শিক্ষার অবকাশে স্বয়ং পার্থকে স্বীকার করতে হ'য়েছিল—হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল প্রমাথী। শরীরের ইন্দ্রিয়-গণের বিক্ষেপের ফলে হয় সে পরবশীকৃত। মন প্রবল এবং দৃঢ়। তাকে নিরোধ করা বায়ুকে শাসন করার মত সুদুষ্কর। এই ভাবই উদয় হচ্চে মনে।*

কী পরিবেশ। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সমরাভিলাষী অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনায় পরিপূর্ণ। সবাই মহা-সমর সজ্জায় সজ্জিত জয়াভিলাষী—সশস্ত্র। এ যুদ্ধের অবতারণা দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধির ফলে। তিনি সূচ্যগ্র মেদিনী দিতে অস্বীকৃত জ্ঞাতি পাণ্ডুপুত্রদিগকে। ক্ষাত্র-ধর্ম্ম, লোক-ধর্ম্ম, ন্যায়-ধর্ম্ম এ সিদ্ধান্তের বিরোধী। তাই বিপক্ষ-পক্ষ এ যুদ্ধকে জেনেছেন ধর্ম্মযুদ্ধ! উভয়পক্ষের সমরায়োজন পূর্ণ। অস্ত্র-বিনিময়ের কাল সমাগত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী।

যুদ্ধের প্রাক্কালে দেখলেন রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যদের ব্যূহ। নিজ পক্ষে আছেন মহা মহা বীর—আচার্য্য দ্রোণ, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ স্বয়ং ভীষ্মদেব। আরও আছেন—কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-তনয় ভূরিশ্রবা। রণমদমত্ত আরও বহু শস্ত্রধারী রণকুশল বীরবৃন্দ। পাণ্ডব পক্ষেও আছেন পঞ্চভ্রাতা—যাদের মধ্যে অর্জ্জুন এবং ভীমের প্রতাপ ও সমর সাধনার খ্যাতি ভারত-বিস্তৃত। প্রত্যেকেই দেহকে

---

* চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।৬।৩৪।

ভাবছেন তুচ্ছ, ক্ষাত্র-ধর্ম্মকে মেনে নিয়েছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান রূপে। জীবনকে জানেন তাঁরা মরণের পূর্ব্বাভাস —কীর্ত্তিই প্রকৃত জীবন। সবাই আপনার দৃঢ় সংকল্প প্রচারে ব্যস্ত—শঙ্খ, পনগ, গোমুখী প্রভৃতির স্পর্দ্ধা-ধ্বনিতে। সেই ধ্বনি হ'ল প্রবল। এই কোলাহল, গণ্ডগোল, জিঘিংসা, রক্ত-প্লাবন সংকল্পের মাঝে অর্জ্জুনের হ'ল বিষাদ। বিষণ্ণ বন্ধুর ক্ষাত্র-চিত্তবৃত্তি উদ্দীপনের অবকাশে শিক্ষা দিলেন সারথী নারায়ণ জীবনরহস্যের সার-তত্ত্বের—চিত্র দেখালেন সেই দেশের, অশান্তির অন্তরে সেথা শান্তি সুমহান।

তপোবনের রিমরিম ঝিমঝিম শান্ত, সুধীর পরিবেশে শিক্ষায়তন না হয়ে এ হট্টগোলে শান্তির পরিপন্থী ক্ষেত্রকে শিক্ষাক্ষেত্র নির্ব্বাচন করলেন কেন শ্রীকৃষ্ণ? এ কি বিচিত্র লীলা? তিনি উদ্ঘাটন করলেন পরম রহস্য—আত্মা, পরমাত্মা কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি অনুরাগ বিরাগের। শিক্ষা দিলেন চরিত্র-নিয়ন্ত্রণের সংস্কার এবং বিভিন্ন প্রবৃত্তির। প্রকৃতির যে সব প্রকাশে চিত্ত হয় বিস্ময়-চঞ্চল, যাদের মাধুরীতে প্রাণ হয় সরস ও মোহিত, বোঝালেন শ্রীকৃষ্ণ যে তারা তাঁরই বিভূতি এবং সেই স্বার্থ-বুদ্ধি রক্ত-লোলুপ জনতার মাঝে শ্রীকৃষ্ণ দেখালেন কুন্তীপুত্রকে নিজের স্বরূপ—বিশ্বরূপ।

এ দিনে কেন? এ ক্ষেত্রে কেন?

শিক্ষার সাফল্য তিন উপাদানে—গুরুর উপদেশের দক্ষতা, শিষ্যের বোধ-শক্তির প্রখরতা এবং বিষয়ের মনোহারিতা। অথচ আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফলে জানি যে স্থান ও কাল সহায়তা করে একের মনোভাব অন্যের মনে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে।

এ ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়-বস্তু কি?

মনুষ্যের গৌরবময় কৃষ্টি নিবদ্ধ উপনিষদে। এ শাস্ত্রে আছে বৈদিক চিন্তাধারার সার—জীবন রহস্যের চরম ও পরম সত্য। জগতের হিরণ্ময় আবরণ অপসারণ করবার কৌশল ব্যক্ত করেছে উপনিষদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষৎ। উপনিষৎ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, তাই গীতা স্ত্রীলিঙ্গ গীতম নয়। উপনিষদগুলি গাভীস্বরূপ। দোগ্ধা গোপাল-নন্দন। সুধীভক্ত বৎস-স্বরূপ পার্থের দুগ্ধ পানের জন্যই গীতামৃত লাভ হয়েছিল উপনিষদ গাভী দোহনের ফলে। এ কথা বলা হয়েছে বৈষ্ণবীয়-তন্ত্রসারে গীতামাহাত্ম্যে। সে তন্ত্রসারে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের মুখে—হে পার্থ গীতা আমার হৃদয়-স্বরূপ। গীতা আমার উত্তম সারতত্ত্ব। গীতা আমার অত্যুগ্র এবং উত্তম জ্ঞান।*

গীতা যে পরম তত্ত্ব এবং তথ্যসমন্বিত শাস্ত্রের সার এ কথা স্বীকার করেছে যুগ-যুগান্তর মাত্র এ পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ নয়। সত্য শাশ্বত। তাই সকল ধর্ম্মে, সকল মতে বহু শিক্ষা পাওয়া যায়, যার বিভাস, বিকাশ বা অবতারণা শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়।

মানব বৈষ্ণবী মায়ায় আবদ্ধ। কিন্তু তার অন্তরে বহ্নি-শিখা সদাই জ্বলছে অজ্ঞান আবরণকে ভস্মীভূত করবার আগ্রহে। অর্জ্জুনের চিত্তের একাগ্রতার বহু পরিচয় দিয়েছে মহাভারত। পাণ্ডব-বংশের রাজ-পুত্র কি দেশের কৃষ্টি হতে বঞ্চিত ছিলেন? তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। গীতার শিক্ষা সেই রসকে গাঢ় করলে রাজ-পুত্রের মন যে উদ্বেলিত হচ্ছিল বিচার-বুদ্ধির উৎস-মুখ হ'তে। তিনি সেই নির্দ্দয় যুদ্ধক্ষেত্রে বিষণ্ণ হলেন? কেন? যখন স্থির হয়ে মনের পটে চিত্র আঁকি বিষণ্ণ পার্থের, কানে বাজে তাঁর শাস্ত্র কথা। তিনি জানতেন বৈদিক অনুশাসন—পিতৃ দেবোভব, আচার্য্য দেবোভব। শাস্ত্রের শান্তি পাঠ—ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি! তাঁর অভিযোগের কথা বিশ্লেষণ করলেই তো বুঝি যে, অর্জ্জুন ব্যথিত—শাস্ত্রের অনুশাসনে চিত্তবৃত্তি সংযোগের ফলে। স্ত্রীজাতির সম্মান ভারতের লোকধর্ম্ম। যুদ্ধ শেষে দুর্বৃত্তদের কুকর্ম্মে স্ত্রীজাতি পারে শ্রদ্ধা হারাতে। ভ্রষ্টা স্ত্রী সমাজের কাল কীট। পিণ্ডোদক ক্রিয়া আর্য্যের কুল-ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম বিপন্ন। একাগ্রচিত্ত পাণ্ডু-পুত্র মনোনিবেশ করলেন শাস্ত্র কথায়। তিনি বাণ-নিক্ষেপ করবার সময় কোলাহলের মাঝে দেখেছিলেন মাত্র পক্ষীর চক্ষু তাঁর ধনু-র্ব্বিদ্যার পরীক্ষার দিনে।

গীতা তো শাস্ত্র কথা। যখন তাঁর মন শাস্ত্রে, তখন চতুর সারথী তাঁকে গভীর শাস্ত্র কথা শোনালেন। বিক্ষেপ

---

* সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ
পার্থো বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং অহম।
গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্।

সম্ভাবনা সাধারণ পুরুষের। কিন্তু যোগী অর্জ্জুন—চিত্তবৃত্তি নিরোধ যার অল্পায়াসসাধ্য। লোক-শাস্ত্র তো দর্শনশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। সে নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝালেন শ্রীকৃষ্ণ—যা অবস্থিত চরিত্র সাধনের মূলে।

গীতা তো এলোমেলো শাস্ত্র কথা নয়। উপনিষদ হ'তে বেছেছেন নীতি শ্রীকৃষ্ণ। নিজের মনোমত করে সাজিয়েছেন সত্যের ডালা শিষ্যকে প্রসাদ বিতরণের কল্যাণ মানসে। তিনি বলেননি, সে সত্য সেদিনের আবিষ্কার। জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে ভগবান বলেছেন—এ শিক্ষা সনাতন। তিনি ক্ষত্রিয়জাতির ইষ্টদেবতা সূর্য্য-তেজের মাধ্যমে, পরে মনু তার পর ইক্ষাকুর দ্বারা এই জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাজর্ষিগণ এই যোগ পুরুষ-পরম্পরায় শিক্ষা করতেন। কালক্রমে ইহা বিনষ্ট হয়েছে।

সত্য সনাতন, নন্দনকাননের ফুল। যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ভগবান ভ্রান্ত মানবজাতিকে সত্য রাজ্যের চির-প্রফুল্ল কুসুম-শোভিত দীপ্ত পথ প্রদর্শন করবার উদ্দেশ্যে। সমাজের উন্নতির জন্য, অধর্ম্মের মূলোচ্ছেদের মানসে, তাঁরা মালা গাঁথেন সত্য-কাননে-কুসুম চয়ন ক'রে। শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ বা প্রভু যীশু প্রভৃতি জ্ঞান ভাণ্ডার হ'তে যে রত্ন আহরণ করে জগতকে উপহার দিয়েছেন তারা তো বিগুমান ছিল নানা রত্ন-কোষে। অবতার বা মহাপুরুষ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করেন শিক্ষার। কোন্ কোন্ কুসুম-সত্য সংগ্রহ ক'রে এক মালায় গাঁথলে জগতের মঙ্গল হবে, ধর্ম্মের গ্লানি দূর হবে, দুষ্কৃতের হবে বিনাশ, সাধু পাবে পরিত্রাণ? সে সংযোজনই ধর্ম্ম-সংস্থাপনের আয়োজন। এদের রূপ-বদলায় যুগে যুগে, অথচ মালা শাশ্বত সত্যের কুসুমে গ্রথিত।

অর্জ্জুন ছিলেন বিজ্ঞ, কৃতবিগু, ক্ষত্রিয়-সন্তান্। তিনি শাস্ত্র কথা বিদিত ছিলেন। একাগ্রতা ছিল তাঁর চরিত্রের মূলে। তাই যখন নানা শাস্ত্র হ'তে বিধিনিয়ম উদ্ধার করে সংশ্লিষ্টভাবে উপহার দিলেন ভগবান-সখা পার্থকে, পিষ্য স্মরণ করলেন নীতি, বুঝলেন তাদের বিন্যাস—কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তির সংযোগ। যখন উপদেশের আখ্যান বস্তু আলোচনা করি তখন মনে হয় অস্ত্রের ঝনঝনা হতে সত্যের আত্ম-প্রতিষ্ঠার শক্তি প্রবল। ভগবানের রণক্ষেত্রে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার মূলে এ শিক্ষাও বিগুমান যে—যা সত্য, যা মনুষ্য-প্রকৃতির অন্তস্তলে দেদীপ্যমান, যা শাশ্বত সনাতন, সে সত্যে জ্ঞানীকে আকর্ষণ করলে হৃদয়ের দীপ জ্বলে ওঠে তার প্রভায়। বাহিরের কোলাহলের সাধ্য থাকে না সে জ্ঞানালোক হতে চিত্তকে নিগ্রহ করার।

শিষ্য অর্জ্জুন নিশ্চয় জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যফলে জন্মলাভ করেছিলেন পাণ্ডবকুলে। তা হতে বড় কথা, মিত্ররূপে লাভ করেছিলেন শ্রীভগবানকে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি তাঁরই মতো এক বীর ক্ষত্রিয় সন্তানরূপেই জানতেন।

অর্জ্জুনের মানসিক শক্তি ছিল অসাধারণ—একাগ্রতার কল্যাণে। সাধারণ মানবের মন ও সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় বিক্ষিপ্ত হয়, তুচ্ছ কারণে। গভীর চিন্তার সময়, কত শব্দ, কত রূপ আমাদের মত সামান্য লোকের কানের পাশ দিয়ে, চক্ষের সম্মুখ হতে, বিফল হয়ে চলে যায়—মনের দুয়ার ভেদ করতে পারে না। যখন মনোনিবেশ করি কোনো গভীর বিষয়ে—দামিনীর ঝলকও পৌছতে পারেনা আঁখির ভিতর দিয়ে চিত্তের দরবারে। বিষাদের কারণগুলা ভাবলে বোঝা যায় অর্জ্জুনের মন ছিল কোন্ বিষয়ে সন্নিবিষ্ট। তাই কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের চিত্তাকর্ষক আলোচনাই তাঁর মনকে রাখলে বেঁধে। অস্ত্রের নিঠুর ঝনঝনা দামামা দুন্দুভি বা শঙ্খের রোলকে চেতনা গ্রহণ করলে না।

একাগ্রতায় বিক্ষেপ হয় নিষ্ক্রিয়—এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে শিক্ষকের লীলাভিনয়। তাইতো বলে আমার স্বল্পবুদ্ধি।

আমাদের এ যুগের প্রবচন সত্য—গুরু মেলে লাখে লাখ, চেলা মেলে এক। উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করলে অনায়াসে জন্মে শস্য। শত চেষ্টাতেও উষর ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন অসম্ভব। এ লীলায় জগত বুঝলে পার্থের মার্জ্জিত বোধ-শক্তি। তার গ্রহণ-ক্ষমতা অসাধারণ। অযোগ্য পাত্রকে শ্রীকৃষ্ণ মিত্রতার সম্মান দান করেন নি। অর্জ্জুন একচিত্ত হ'য়ে শুনেছিলেন শ্রীভগবানের বচন। সেকথা গীতার শেষে স্বয়ং বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শাস্ত্র শ্রবণ করলে? * অর্জ্জুন উত্তরে বল্লেন—

হ্যাঁ আমার মোহ হয়েছে বিনষ্ট, সন্দেহ হয়েছে দূর।

* কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। ১৮।৭২

বলেছি অর্জ্জুন ছিলেন 'শাস্ত্রজ্ঞ। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল। সে জ্ঞান দৃঢ় হল শ্রীকৃষ্ণের মুখে ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ ক'রে। তাঁর পূর্ণ বিভূতি সম্বন্ধে বিস্তারিত তত্ত্বান্বেষী পার্থ নিজের বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ভৃগু প্রভৃতি ঋষির বচন জানতেন। তিনি বিদিত ছিলেন দেবর্ষি নারদের শিক্ষা—অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতির শাস্ত্র বিবৃত বর্ণনা ভগবদ্‌তত্ত্ব বিষয়ে। সেই জ্ঞানের উপর যখন স্পষ্ট স্বল্পকথার বিবৃতি শুনলেন তিনি, তখন তাঁর মনের একাগ্রতা নিবদ্ধ হ'ল সেই পরম তত্ত্বে। তখন কি বাহিরের কোলাহল পৌঁছতে পারে তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে? তিনি ভাবে বিভোর হয়েছেন, ভৃগু, নারদ, অসিত, দেবল ব্যাসের বিবৃতি সমর্থন পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখে যিনি স্বয়ং জ্ঞেয়। তাই উচ্ছ্বসিত প্রাণে তিনি বলেছিলেন—

পরম ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম।
আহুস্তামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।

সত্যই তো আমি শিক্ষা পেয়েছি—ঋষি, দেবর্ষি প্রভৃতির কাছে তোমার তত্ত্ব। এখন তুমি স্বয়ং শেখাচ্চ সে পরম বিদ্যা আমাকে। ওগো বুঝেছি তুমি পরব্রহ্ম, পরম আশ্রয়, তুমি পবিত্র পরম পুরুষ। সবার অন্ত আছে পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু তুমি যে নিত্য পুরুষ, তুমি স্বপ্রকাশ, তুমি যে বিশ্বব্যাপী।

এই চেতনা যখন উদ্বুদ্ধ হল প্রাণে, তখন রণভেরী, মরণের ছবি, বিজয়ের খদ্যোত চমক্‌ বা পরাজয়ের ভীম-বিভীষিকার সাধ্য কি অর্জ্জুনের চিত্তকে আবিষ্ট করে। যখন বিভূ বলেছেন—আমি আত্মভাবস্থ প্রজ্জ্বলিত জ্ঞান দীপের দ্বারা তমোনাশ করি।

এ লীলাভিনয়ের মূল শিক্ষা স্পষ্ট। বিষয়-বস্তু যদি পৌঁছে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে সুরক্ষিত বৃত্তিতে, আবশ্যক হয় না নিরালার শিক্ষা-ক্ষেত্র। শিষ্য যদি একাগ্র-মন হয় তা'হলে ভাবনা কি তার? যেথা সেথা শিখতে পারে তত্ত্ব। পরমহংসদেব বলতেন—ব্যাকুল হও তখন দীপ আপনি জ্বলবে।

তারপর গুরুর কথা। শ্রীগুরু যে সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বজ্ঞ। আমি মূর্খ, অন্যে পণ্ডিত—এ সৃষ্টি লীলাও তো তাঁর। সবার জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছেন—আঁধার ছেড়ে আলোকের দিব্যধামে পৌঁছবার। তিনি সর্ব্বভূতাশ্রয়াস্থিত কিন্তু নিজের ওপর মায়ার আবরণ ঢেকে বিশ্বে প্রকাশ। যার বুদ্ধি মোহ-পাশ কাটায়, সে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে তাঁকে। শেষ অনুভূতি তো ব্যক্ত করা যায় না, কারণ-তিনি বাক্য ও মানসের উর্দ্ধে। বাক্য সেখানে পৌঁছে না—মনেরও শক্তি নাই সে ধামের সমাচার সংগ্রহের। অনুভূতি হয় মাত্র আনন্দের। তাতেই আসে নির্ভীকতা।

জ্ঞান পরিবেশনে যে ক্রম অনুবর্ত্তন করেছিলেন শ্রীগুরু সারথী সে নির্ব্বাচনে ছিল মনস্তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ। যখন সাংখ্যযোগ বিবৃত করলেন শ্রীকৃষ্ণ, হয় তো অর্জ্জুনের প্রজ্ঞা একবার হ'ল চঞ্চল। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন—হে কেশব, যোগে অবস্থিত স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ কি? স্থিত-প্রজ্ঞ কিরূপ বাক্যালাপ করেন? কিরূপ ভাবে বাস করেন তিনি? বিচরণ করেন কেমন পথে?

তখন একে একে স্থিরমতির লক্ষণ বিবৃত করলেন নারায়ণ। বল্লেন—হে কৌন্তেয়-মোক্ষ-কামী যত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও মনহরণ করে বলপূর্ব্বক প্রমাদী ইন্দ্রিয়গণ।

অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন ইন্দ্রিয় জয় করতে। বিষয় হতে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি উঠিয়ে নিতে। কেন? হয় তো তিনি বুঝলেন কুরুক্ষেত্রের প্রভাব। ক্রোধ সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্রে। তার মূল উচ্ছেদ না হলে এ যুদ্ধ ধর্ম্ম-যুদ্ধ হবে কেমন করে? অহিংসা মূলমন্ত্র। তাই সাবধান করে দিলেন কৌন্তেয়কে—ক্রোধের শেষ পরিণাম বিনাশ।

আমার মনে হয় গীতার উপদেশের বিষয়-নির্ব্বাচনের ক্রমের মাঝে আছে শিষ্যের অন্তরে দৃষ্টির মাধুরী, অদ্ভুত দেশকালের প্রতিক্রিয়া অতিক্রমের ব্যবস্থায়।

ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। জ্ঞান পবিত্র। শ্রদ্ধাবানের আগ্রহকে দেশকালের বিপরীত স্রোত, রোধ করতে পারে না। তিনি বলেছেন—শ্রদ্ধাবান, তৎ-পরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ ক'রে অতি শীঘ্র মোক্ষলাভ করেন।

অবশ্য পূর্ণ-আলাপের সংশ্লেষণে জানা যায়—এ জ্ঞান-ভক্তির পটভূমিতে হয় অর্জ্জিত, কর্ত্তব্য-কর্ম্মের মাঝে।

এমনি বহুস্থলে অর্জ্জুনের প্রশ্ন হ'তে বোঝা যায়, তাঁর আগ্রহ জানবার। সে উৎসাহকে কি রোধ করতে পারে কোলাহল? কোথাও বা সংশয় এসেছে—যেমন যোগ শিক্ষার প্রসঙ্গে। কিন্তু দক্ষ-শিক্ষক অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝেছেন, শিষ্যের মনোভাব আর সযত্নে দূর করেছেন সন্দেহ।

ভারতীয় দর্শনের বিশিষ্ট দুটি নীতি—পুনর্জ্জন্মবাদ এবং কর্ম্মফলতত্ব। এই নীতির বিকাশ অর্জ্জুনের মতো ভাগ্যবানে।

গুরু এক্ষেত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সম্যকজ্ঞান ব্রহ্ম নির্ব্বাণের তত্ব শিখিয়েছেন শিষ্যকে—পরে ব্যাসের বিশাল বুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ব-সংসারকে। তত্ব তো গুরুতেই নিবদ্ধ। কৃষ্ণ জানলেই জানা যায় মোক্ষপথ, মোক্ষধাম। মনুষ্যবেশী শ্রীগুরু, বিশ্বে বিস্তৃত, মায়ার আবরণে ঢাকা। উপলব্ধির ফলে জীব উচ্ছ্বাসে বল্‌তে পারে—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এতো মধুর।

শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সে অসীম রূপ প্রকাশ করেছেন সীমার গণ্ডী লঙ্ঘন করবার অবকাশ দিয়ে। যখন সে বিবৃতি চিত্তে প্রবেশ করে তখন জ্ঞান—জ্ঞেয়কে উপলব্ধি করে ধীরে ধীরে। তিনি বোঝালেন—কোলাহলের সাধ্য নাই সে আলোককে ম্লান করবার। কবি গেয়েছিলেন—সব কোলাহলে যেন দিনমান গুলি অনাদি অনন্ত জ্ঞান। তিনি গেয়েছিলেন—

তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে
বিশ্ব-সাগর ঢেউ খেলায়ে ওঠে তখন দুলে।

সে আলোর তো ছায়া নাই। শস্ত্রের ঝিকিমিকি কি নেভাতে পারে সে আলো। সে কথা প্রমাণ করবার জন্যই তো শ্রীকৃষ্ণের চতুরালী—যুদ্ধক্ষেত্রকে শিক্ষায়তনে পরিণত করবার প্রয়োজন।

গুরু শিষ্যের মনের সংযোগই প্রকৃষ্ট বিদ্যা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—গীতোক্ত যোগের পথিক মন-প্রাণ দেহরূপ আধার এমনভাবে বিভক্ত করতে পারেন যে তিনি জনতায় নির্জ্জনতা, কোলাহলে শান্তি; ঘোর কর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে পরম নিবৃত্তি অনুভব করেন। তিনি অন্তরকে বাহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন না, বরং বাহ্যকে অন্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সরল শিক্ষায় ব্যাপারটা সহজে বোধগম্য হয়। তিনি বলেছেন—কেউ কেউ অনেক কষ্টে ক্ষেত্রে জল সেচে আনে। আনতে পারলে ফসল হয়। কারো জল সেচতে হল না—বৃষ্টি-জলে ভেসে গেল। কষ্ট করে জল আনতে হল না।...আর নিত্য সিদ্ধ, এদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হয়ে আছে। যেমন ফোয়ারা বুজে আছে। মিস্ত্রী এটা খুলতে ওটা খুলতে ফোয়ারাটা খুলে দিলে। আর ফর ফর করে জল বেরুতে লাগলো।*

শ্রীকৃষ্ণ সেই ফোয়ারা খুলে দিলেন অর্জ্জুনের। জলে ধুয়ে গেল সব মোহ কালিমা।

সারা গীতায় ছড়ানো ভগবানের স্বরূপের কথা। ধীরে ধীরে সে অনুভূতি গভীর হয়, ডুবে যায় তাতে সকল কোলাহল। মন হয় দৃঢ়। পূর্ণ উপলব্ধি বিশেষ সাধনা-সাপেক্ষ। অর্জ্জুনের চিত্ত যখন হল দৃঢ়, তখন হৃদয়ে জলে উঠ্‌লো বিশ্বরূপ। কিন্তু সে জ্যোতি তিনিও সহ্য করতে পারলেন না—তাঁর মন হল প্রব্যথিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন—

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হইল ভয়।

কর্ম্মযোগের শিক্ষা হয়েছে এতো প্রবল যে অর্জ্জুন মোক্ষ পথ ছেড়ে আবার সংসারের পথে নামতে চাহিলেন। সসীম প্রকাশও তো তাঁর লীলা। তাই অর্জ্জুন বল্লেন—হে সহস্রবাহু, তুমি আমার পরিচিত চতুর্ভুজরূপে আবার আবির্ভূত হও।

আরও বিস্ময়কর ব্যাপার মোক্ষশাস্ত্র শিক্ষা দিলেন—কোলাহলের মাঝে ডুবে লোকক্ষয় করবার উদ্দেশ্যে।

মানুষকে মুক্তি পেতে হবে কোলাহলের মধ্যে বাস করে। কারণ পরের উপকার না করলে, জীবের মাঝে শিবের উপলব্ধি না জন্মালে, মুক্তির চেষ্টা লাভ করতে পারে না সাফল্য। ভক্ত প্রহ্লাদ বলেছিলেন—

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ সবিমুক্তিকামা
মৌনং চরতি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠা।
নৈনং বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ
একোনাস্তং তদন্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যেৎ।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২য় ভাগ—৫২ পৃঃ।

নিজের মোক্ষকামী দেব ও মুনিরা কেহ কেহ বিজনে মৌনাচরণ করেন। তাঁদের পরার্থ-নিষ্ঠা নাই। এদের ত্যাগ ক'রে নিজের মোক্ষকামী অনুদার হতে চাহি না। মাত্র একের জন্য, অন্যের জন্য নয় এখন শরণ নিতে চাহি না ভ্রমবশতঃ।

অর্জ্জুন সাধারণের মঙ্গলকামী—তিনি বিজনে শরণ নিলেন না শ্রীকৃষ্ণের। তিনি অহিংসার শিক্ষা নিলেন সে কাম্য সম্পাদনের যা হিংসাই পারে সাধারণতঃ।

আমাদের এ যুগের কবি তাই যাচিঞা করেছিলেন—

আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।

বিস্ময় আসে লীলা স্মরণ করে। আবার প্রাণ আপ্লুত হয় হর্ষে যখন বুঝতে চেষ্টা করি, নিজের অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, রহস্যের মর্ম্ম কথা—কেন রণক্ষেত্র হ'ল শিক্ষাক্ষেত্র।

আবার কানে বাজে শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের। একাগ্রতাই যোগ। একাগ্রের ইন্দ্রিয়বোধ আত্মস্থ। প্রথমে নির্জ্জনতা আবশ্যক মন-সংযমের—তাই চারা গাছে বেড়া দিতে হয় গরু ছাগলের ভয়ে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হ'লে তাতে দশটা গরু ছাগল বাঁধলেও ভয় নাই। মা কালীর মন্দিরে তিনি যখন ধ্যান করতেন, তাঁর গায়ে পাখী বসত। তাই অবধূত গুরু বলেছিলেন ব্যাধকে যে বরের শোভা-যাত্রার বাদ্য শুনতে পায় নি—লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি কোলাহলে।

এই একাগ্রতার মহিমার শিক্ষা রয়েছে রণক্ষেত্রকে শিক্ষাক্ষেত্র করবার প্রয়োজনে।

প্রধান সঙ্কেত ভুললে বলবে না—আমাদের এই জীবন-রণ-ক্ষেত্র। 'আমাদের বিষাদকে চিরন্তন করতে পারে না যদি অর্জ্জুনের মত আমরা আপনার ভেবে শ্রীকৃষ্ণকে সারথি করি হৃদয় রথের নিত্য কর্ত্তব্যের সমরক্ষেত্র। তা হ'লে আমরাও শুনতে পাব নিষ্কাম কর্ম্ম, শুদ্ধজ্ঞান এবং অচলা ভক্তির বাণী। তখন দেখব শান্তির রূপ অশান্তির অন্তরে। তখন বুঝব তাঁর নির্দ্দেশ—যে মানুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ ক'রে, নির্ম্মম, নির্ব্বৈর হয়ে চলে জীবন-পথে, সে শান্তি পায়। আরও শুনব বাণী যার ফলে সংসার হবে স্বর্গ।

তাই বুঝি এ শিক্ষায়তনের প্রধান সঙ্কেত—মনের রথে বসাও শ্রীকৃষ্ণ সারথিকে।

বিচিত্র তাঁর লীলা।

বুনিয়াদী শিক্ষা

শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায় এম-এ

'বুনিয়াদ' কথার অর্থ ভিত্তি। ভিত্তি মজবুত না হলে যেমন নতুন তৈরি ঘর অল্পকাল মধ্যেই ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়—তেমনি শিক্ষার ভিত্তি ভাল না হ'লে শিক্ষার উদ্দেশ্যই যায় ব্যর্থ হয়ে যায়। শিশুর দেহ-মনের সুন্দর সামগ্রিক বিকাশ-সাধনই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। তাই—যে জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষা কর্মের মাধ্যমে শিশুর জীবনে তার দেহমনের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে একে একে ফুলের মত ফুটিয়ে দেয়—যে শিক্ষাপ্রণালী শিশুকে স্বাবলম্বন এবং শ্রমের মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ কোরে শিশুর জীবনের পটে প্রতিফলিত করে তার সম্ভাবনার সর্ববিধ বিকাশসাধন—সেই শিক্ষাই বুনিয়াদী-শিক্ষা।

বুনিয়াদী শিক্ষা এদেশে কেমন ক'রে কোন্ ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে—কোথায় এর উৎস—কেমন ক'রে বাধার পর বাধা অতিক্রম ক'রে এই শিক্ষা ব্যবস্থা কালের ও যুগের অপ্রতিহত গতির সাথে পা ফেলে আগিয়ে এসেছে দুর্নিবার বেগে—প্রথমে তারই একটা মোটামুটি আলোচনা আবশ্যক বলে মনে করি।

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতকের প্রথমাংশে। কিন্তু তার আগেও প্রাচীন ভারতের যে শিক্ষা-ব্যবস্থার এবং শিক্ষায় উৎকর্ষের সন্ধান আমরা পাই—তা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে কোন অংশে হীন নয়।

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে তখনকার দিনে গ্রামের পাঠশালাগুলি সমগ্র পল্লীবাসীদের 'শিক্ষা-ব্যবস্থার যে-পরিমাণ আয়োজন এবং উপকরণে সমৃদ্ধ ছিল তাতে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিল অক্ষুণ্ণ। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগেও এ্যাডম্ সাহেবের রিপোর্ট অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাই যে সে-সময় শুধু বাংলা দেশেই(১) প্রায় এক লক্ষ

পাঠশালা গ্রামের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষাদান ক'রে এসেছে অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে। সে পাঠশালাগুলিকে আড়ম্বর, আদব-কায়দা বা অর্থ নৈতিক সমস্যা গ্রাস করতে সক্ষম হয় নাই। চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারী-চালায় অথবা গাছতলায় পঠন-পাঠনের কাজ সুশৃঙ্খলে সমাধা হোতো। অস্পৃশ্যতা বা সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধও ছিল না সেখানে। সামান্য জমাখরচ করতে আর মাতৃভাষায় অল্প লিখতে এবং পড়তে শিখলেই পাঠশালার কাজ শেষ ক'রে ছেলেরা জমিদারী সেরেস্তায় বা মহাজনের গদীতে কাজ পেতো। এদিক দিয়ে সেকালের পাঠশালার শিক্ষাও বৃত্তিমূলক শিক্ষার আসন দাবী করে।

তারপর বিদেশী শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে হঠাৎ দেখা দিল ইংরাজী-শিক্ষার প্রবল বন্যা—যার দুর্নিবার স্রোতে পাঠশালার আদর্শ গেল তলিয়ে—বিখ্যাত 'Filtration theory' সগর্বে ঘোষণা করলো যে উচ্চশ্রেণীর লোককে উচ্চশিক্ষিত করতে পারলে সে শিক্ষা আপনাআপনি চুইয়ে গিয়ে দেশে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করবে। অ্যাডাম সাহেব নানা তথ্য আর তত্ত্বের সাহায্যে এই 'থিওরির' বিরোধিতা ক'রে সামান্য খরচেই কিভাবে দেশের পাঠশালাগুলির সংস্কার ক'রে নিয়ে তাদেরই মাধ্যমে নূতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটানো যায় তারই একটা আদর্শ তুলে ধরলেন সরকার তথা জনসাধারণের চোখের সামনে। কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা !' প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা গেল উবে। উড়ে এসে জুড়ে বসলো নব্য শিক্ষাব্যবস্থার নামে ইংরাজী ভাষার অপ্রতিহত প্রভাব—রেশারেশি সুরু হোয়ে গেল প্রাচীনে আর নবীনে।

তারপর এলো উডের ডেস্‌প্যাচ্ (২)। এতে সাহায্য-দান নীতি, স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বৃত্তিশিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব প্রভৃতি উচ্চ এবং উল্লেখযোগ্য সংস্কারের কথা থাকলেও এতে লাভবান হয়েছিলো মধ্য আর উচ্চশিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার দিকটা এতে ছিল অবহেলিত।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন যে শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন তাতে মাতৃভাষার অবজ্ঞা আর পরীক্ষার প্রাধান্যের তীব্র সমালোচনা থাকলেও আসলে তাঁর গতিবিধি প্রথম থেকেই দেশের লোকের সন্দেহের উদ্রেক করায় এবং অবশেষে বঙ্গদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনায় দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু হওয়ার ফলে দেশের মনে একটুও দাগ কাটতে পারলো না তাঁর নীতি। তাছাড়া লর্ড কার্জনের আমলে প্রাথমিক শিক্ষার অল্পবিস্তর ব্যবস্থার প্রয়াস দেখা গেল বটে কিন্তু তখনও দেশের শতকরা বিশ জনের বেশী ছেলে পড়াশোনা করতো না—আর মেয়েদের তো ব্যবস্থাই ছিল না কিছু। এই আন্দোলনের অল্পকাল পরেই মর্লি-মিণ্টোর শাসন-সংস্কার এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা এবং ভেদবুদ্ধির বীজ বপন করে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গোখ্‌লে আবশ্যিকভাবে ছেলেদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অনুমতি চেয়ে একটা বিল পেশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সামান্য বিলও ভারত সরকারের অনুমোদন না পেয়ে প্রতিহত হ'য়ে গেল প্রস্তাবের স্তরেই। কিন্তু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডের সংস্কার ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নব-নির্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলী গোখ্‌লের পরাজয়ের শোধ নিয়ে নিলেন। তাঁরা জোরগলায় মন্তব্য করলেন যে "শিক্ষাসংস্কারের প্রথম কথা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার" এবং ফলে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে সৃষ্টি হোয়ে গেল প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন। এই আইনগুলি মূলতঃ একই ধারার। এগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত হ'ল এক বোর্ড—ছয় থেকে এগারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হোত—এতে বোর্ডের ইচ্ছানুসারে বেতন কোথাও বা নেওয়া হোত, আর কোথাও বা হোত না।

এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হোল। কিন্তু ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হার্টগ কমিশন স্থির করলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা এখন যে স্তরে আছে তাতে তাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করলে অপর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষতি এবং উদ্যমের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না। কারণ প্রথমতঃ দেশের লোক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তখনও সম্যক অবহিত হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ দেশবাসী তাদের ছেলেমেয়েদিগকে সাংসারিক কাজে সহায়তা না ক'রে পড়াশোনার আওতায় আটকে রাখতে নারাজ।

এর স্বপক্ষে অবশ্য কয়েকটি অকাট্য যুক্তিও ছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ দরিদ্র। ছেলে পরের ঘরে মুটে-মজুরি বা রাখালি ক'রেও যদি নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের উপর সামান্য টাকাও উপার্জ্জন করে তাতে গরীব বাপ-মা স্বস্তির শ্বাস ফেলে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি এমনই নীরস এবং ভারাক্রান্ত যে শিশু সেখানে যেতেই ভয় পায়। তৃতীয়তঃ অন্য দেশের মত এদেশে সরকার বই, খাতা, বেতন ইত্যাদির জন্য পরিবারকে কোন সাহায্যই দেয় না। তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষকের একান্তই অভাব। দুএকজন অভিজ্ঞ এবং ট্রেইনড্ শিক্ষাব্রতী থাকলেও চাহিদার অনুপাতে সে-সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এর একমাত্র সমাধান আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন। কিন্তু সরকারের হাতে উপযুক্ত অর্থ সংস্থান কই ?

শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থাটাকে স্বচ্ছল ক'রে নেবার জন্য খাজনার ওপর ধরা হোলো একটা শিক্ষাকর। প্রধানতঃ ছয় থেকে দশ এই চারবছরের প্রাথমিক শিক্ষাকেই সঠিক সময় বলে নির্দ্ধারণ করা হোলো আর জেলাবোর্ডের হাত থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার এলো জেলা-স্কুলবোর্ডের হাতে।

শিক্ষাক্ষেত্রে উপর্যুপরি এত বিভিন্ন ধরণের সংস্কার, বিপর্যয় এবং পরিবর্ত্তন দেখা দিলেও মতভেদ এবং প্রতিবাদের মাত্রাও কম নয়।

---

(১) কটক, বিহার ও ছোটনাগপুর তৎকালে বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত ছিল।

(২) Wood's Despatch of 1854.

এর থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কোন ব্যবস্থাই এ-পর্যন্ত দেশের জীবনধারার সাথে সুষ্ঠু এবং সুসমঞ্জস সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে নাই। তবে—একথা অনস্বীকার্য যে কালের অগ্রগতির সাথে সংস্কারের পর সংস্কার এদেশের শিক্ষার ধারাটীকে ক্রমশঃ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর ক'রে দিয়েছে।

এবার এলো জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। এতে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার দাবী প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল সমর্থনের মাধ্যমে। তারপর দেশবাসীর চোখ পড়লো বেকার-সমস্যা সমাধানের দিকে। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে শুধু পুঁথিপাঠে এই সমস্যার সমাধান হবে না। পুঁথির সাথে ব্যবহারিক ও হাতে কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকলে সে—শিক্ষা ছাত্রেরা জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। তাদের নিজ নিজ ইচ্ছা, রুচি ও জীবনের আদর্শ অনুসারে যার যেদিকে আগ্রহ সে সেই ভাবেই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

এই সমস্ত সুপরিকল্পিত চিন্তাকে কেন্দ্র ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগলো 'শিক্ষাধারার স্রোত। শিক্ষাবিদেরা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে প্রাথমিক স্তরেও শিক্ষার প্রকৃতির এবং পাঠ্যরীতির পরিবর্তন চাই। এই রূপান্তর সাধনে সক্রিয় ইন্ধন জোগালো গান্ধীজীর ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা' এবং সার্জেন্ট সাহেবের 'সার্জেন্ট পরিকল্পনা'।

যুদ্ধোত্তর প্রাথমিক শিক্ষা-সংগঠন পরিকল্পনা প্রধানতঃ সার্জেন্ট—পরিকল্পনার সাথেই যুক্ত। তৎকালীন ভারত-গভর্ণমেন্টের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা সার জন সার্জেন্টের নেতৃত্বে দেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত কমিটি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতিকে গ্রহণ করেন এবং শিক্ষা-ব্যবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিকে কি ভাবে কার্যকরী ক'রে তোলা যায় তারই একটা পরিকল্পনা তৈরী করেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ওয়ার্দ্ধাতে জাতীয়তাবাদী শিক্ষাবিদদের তথা তৎকালীন সাতটি কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীদের নিয়ে একটি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন গান্ধীজী। সেখানে গান্ধীজী তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। সম্মেলনের শিক্ষাবিদরা এই পরিকল্পনার মূলনীতিকে একবাক্যে স্বীকার ক'রে নেন এবং ডাক্তার জাকির হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন ক'রে সেই কমিটির উপর এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী ক'রে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই পরিকল্পনাই ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনা নামে পরিচিত এবং এতে মূলতঃ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি মেনে নেওয়া হয় :—

(ক) সাত বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর বয়স অবধি সাত বৎসর ধ'রে শিশুদের বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া হবে।

(খ) মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে।

(গ) বুনিয়াদী-শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক।

(ঘ) কাজের ভেতর দিয়ে শিশুর আগ্রহ ও কৌতুহলকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া হবে।

(ঙ) সমগ্র শিক্ষার ভেতর কোনখানেই ইংরাজী-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। তবে পঞ্চম শ্রেণী থেকে (সাত বছরের শেষ দু-বছর) রাষ্ট্রভাষা (৩) শেখাবার ব্যবস্থা করা হবে।

(চ) স্বাবলম্বন এবং শ্রমের মর্যাদাবোধের দিকে জোর দেওয়া হবে।

"Such education......must be self-supporting; in fact, self-support is the acid test of its reality."

যদি ছেলেমেয়েরা শিক্ষাকালীন কিছু রোজগার করতে পারে সেটা প্রশংসারই কথা। তাতে ছাত্রদের মনে শ্রমের মর্যাদাবোধ, আত্ম-নির্ভরশীলতা এবং সার্থক সৃষ্টির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা জাগে এবং এরই মাধ্যমে তারা সঞ্চয় করে প্রকৃত মনুষ্যত্বের শিক্ষা। তাছাড়া হাতের কাজের মাধ্যমে মনের অধিকতর বিকাশলাভ ঘটে। এর ভেতর পেশাদারীর কোন প্রশ্নই নাই। তবে—একটা কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ছাত্ররা নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থে বাজারে যাবে না। সে-ব্যবস্থা করতে হবে জাতীয় সরকারকে।

(ছ) কোন একটা উৎপাদনমূলক শিল্পকে আশ্রয় ক'রে শিক্ষা দিতে হবে। যথা, চরকা ও তাঁতশিল্প; কৃষি বা কাঠের কাজ। এ-ভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রত্যক্ষ ফল অবশ্যম্ভাবী। কারণ নিজের প্রয়োজনে ছেলেরা যা শেখে তা তারা ভোলে না; কিন্তু পরীক্ষার তাড়ায় যা শেখে তা অল্পদিনেই ভুলে যায়।

(জ) বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম-শিক্ষার কোন সুযোগ থাকবে না। কারণ প্রথমতঃ ধর্মতত্ত্ব প্রণিধান করার মত যোগ্যতা এবং বয়স এই অল্পবয়স্ক শিশুদের হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ আমাদের পূর্বপুরুষদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা উদার চরিত্র-সৃষ্টির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অবশ্য কিছু কিছু ধর্ম-বিষয়ক গান তারা গাইতে পারে এবং ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষদের জীবনীও তারা পড়বে।

চিরাচরিত পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষাকে নাকচ ক'রে গান্ধীজীর প্রদর্শিত শিক্ষা-ধারার আলোকসম্পাতে আমরা কেমন ক'রে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছি তারই সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনায় আসা যাক এবার।

পূর্বতন পন্থায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকেই দেওয়া হোয়েছে প্রাধান্য। সেখানে শিক্ষার্থী হোয়েছে গৌণ। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক এবং কর্মমাধ্যম।

প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে জ্ঞানলাভই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত হোয়েছে; কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর দৈহিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক এবং আনুভূতিক দিকগুলির কোনটিকেই উপেক্ষা করা হয়নি। এদের সমষ্টিগত সর্বাঙ্গীণ বিকাশকেই আদর্শ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

পুরাতন ব্যবস্থায় শিক্ষার সাথে শিশুর জীবনের বা তার পারিপার্শ্বিক জগতের নাড়ীর যোগ ছিল না। তাই অনেক সময় পাঠ্যবস্তুকে গলাধঃকরণ ক'রে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েও অনেক

---

(৩) গান্ধীজীর পরিকল্পনা অনুসারে রাষ্ট্রভাষা 'হিন্দী' নয়—'হিন্দুস্থানী'।

শিশু শিক্ষার প্রকৃত কল্যাণ থেকে থাকতো বঞ্চিত। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা শিশুর বাস্তব-জীবনের সাথে তার পরিবেশের একটা নিবিড় যোগস্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

পুরাণো শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি—প্রতিযোগিতা। এতে রেশারেশি-দলাদলি এবং হিংসা-কলহের বীজ অজ্ঞাতে বপন করা হোতো শিশুর উর্বর মানসক্ষেত্রে। অদূর ভবিষ্যত-জীবনে সেই বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে যখন পরিণতি লাভ করতো বিশাল মহীরূহে, তখন সমাজের চত্বরেও দেখা দিত তার বিষময় প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বুনিয়াদী-শিক্ষার প্রাণকথা হলো সহযোগিতা। মিলেমিশে কাজ করার মাধ্যমে তারা ছোটবেলা থেকেই সাম্য-মৈত্রী-প্রীতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার যে মহৎ আদর্শে চরিত্রগঠন করে তা উন্নততর সমাজ-জীবন গড়ে তোলার অমূল্য উপকরণ।

এ-পর্যন্ত দেখা গেল যে বুনিয়াদী-শিক্ষা প্রাণময় তথা সৃজনাত্মক এবং বর্ত্তমান প্রগতিশীল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই একটা কোন নির্দ্দিষ্ট বাঁধাধরা তালিকা বা সংজ্ঞার গণ্ডীতে রেখে একে বিচার করলে ভুল হবে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধারায় হোয়েছে এর প্রকাশ—আর সেইটিই এর জীবনের লক্ষণ।

ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সর্বাংশে ভ্রমাত্মক। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে এই অভিযোগের মালমশলা জুগিয়েছে গোঁড়া ওয়ার্ধা-পন্থীদের সংকীর্ণতা এবং তাঁদের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী। প্রথম অভিযোগ—'ছাত্রদের উৎপন্নদ্রব্যের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ থেকে যদি বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হয় তাহ'লে শিক্ষকেরা পড়ানোর চেয়ে ছেলেকে খাটিয়ে নেওয়ার দিকেই অধিকতর মনোযোগী হবে।' কিন্তু অর্থোৎপাদক যে শিল্পের পরিকল্পনা এতে আছে তার মানে এ নয় যে—অর্থোৎপাদনই মুখ্য। মানুষের স্বীয় সৃষ্টির যে অলৌকিক শক্তি এবং তৃপ্তি প্রোথিত হ'য়ে আছে তার শিরা-উপশিরায়—নানান্ হাতের কাজের মাধ্যমে তাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগদানের কথাই বলা হোয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায়।

অবশ্য বাস্তবদিকটাকেও উপেক্ষা করা চলবে না। কারণ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার মূলে যে ক'টি কারণ নিহিত আছে তার ভেতর দেশের অর্থাভাব অন্যতম। একটা মোটামুটি হিসাব করলে দেখা যায় এতে এ-পর্যন্ত মাত্র এগারো লক্ষ ছেলেমেয়ের শিক্ষার সুযোগ মিলেছে. আর সরকার থেকে খরচ করা হয় বাৎসরিক দেড় কোটি টাকা। বাকী আঠারো লক্ষ ছেলেমেয়ের কোন ব্যবস্থাই সম্ভবপর হয়নি এখনও। তাই—এই সব ছেলেমেয়েরা যদি হাতের কাজে মাথাপিছু মাসিক একটা ক'রে টাকাও রোজগার করে, তাহ'লে শিক্ষার অনগ্রসরতা অচিরেই দূরীভূত হবে।

কেউ বা বলেছেন যে বুনিয়াদী শিক্ষায় স্বাধীনভাবে ভাষা বা সাহিত্যশিক্ষার সুযোগ নাই। আমরা পুঁথিকে প্রাধান্য দি' বলেই আমাদের মনুষ্যত্বেরও এই দুর্দ্দশা। নিজেকে বিভিন্ন ধারায় প্রকাশই যদি ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হ'য়ে থাকে তাহ'লে আপন আপন শক্তি, সামর্থ্য এবং রুচি অনুযায়ী আত্মপ্রকাশের এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কোন শিক্ষাব্যবস্থায় আছে কিনা তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ হাতে-কলমে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং নানা দেশ-বিদেশের বিবরণ আর গল্প শুনে তাদের কল্পনাপ্রবণ মনে পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে ঢের বেশী রেখাপাত হয়। বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া মহকুমায় বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার যে ব্যাপক পরীক্ষা গৃহীত হয় তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা, অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান কোন অংশে কম নয়—উপরন্তু বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা তাদের অনেক বেশী।

গত ক' বছরের মধ্যে বুনিয়াদী-শিক্ষার প্রসার এবং পরিবর্ত্তনও ঘটেছে অল্পবিস্তর। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম আবির্ভাবের সময় এতে সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের কথাই বলা হয়েছে। তারপর এই পরিকল্পনা পরিণতি পেয়ে গেল ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের 'নয়া-তালিম' পদ্ধতির ভেতর! নয়াতালিমের প্রস্তাবিত স্তরগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) তিন বছর বয়স থেকে ছ' বছর বয়স অবধি—পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা।

(খ) সাত বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর বয়স অবধি—বুনিয়াদী শিক্ষা।

(গ) পনেরো বছর বয়স থেকে আঠারো বছর বয়স অবধি—উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা।

(ঘ) আঠারো বছর বয়স থেকে—বয়স্কদের শিক্ষা।

প্রস্তাবিত প্রত্যেক স্তরই হবে কর্মকেন্দ্রিক। প্রথম স্তরে খেলা আর কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান। দ্বিতীয় স্তরে বিস্তারিত পাঠক্রম দেওয়া হোয়েছে। তৃতীয় স্তরটি মুখ্যতঃ বৃত্তিমূলক (Vocational)। তারপর বয়স্ক-শিক্ষার প্রবর্ত্তনই নয়া-তালিমের অভিনব সম্প্রসারণ।

দুশো-বছরের একটানা পরাধীনতার পর দেশবাসী লাভ করেছে মুক্ত-আলোর আস্বাদ। জাতীয়-সরকার দেশের সর্ববিধ উন্নতি-সাধনের জন্য যে-সমস্ত উন্নয়ন-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার ভেতর বুনিয়াদী-শিক্ষা-পরিকল্পনা অন্যতম। কিন্তু গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমাজ-দর্শন বা সর্বোদয়-পরিকল্পনার মূলনীতি থেকে বর্ত্তমান বুনিয়াদী-শিক্ষার ধারাটী এখনও সরে আছে অনেক দূরে। ধনোৎপাদনের উপরেই নির্ভর করে দেশের সমৃদ্ধি। কিন্তু এই ধনোৎপাদনের ভার ন্যস্ত আছে দেশের অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের হাতে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক এবং শিল্পোৎপাদন পরিস্থিতি অবনতির পথে। আমাদের আশা—বুনিয়াদী-শিক্ষার পরিপ্রেক্ষায় দেশের শিশুরা শ্রমশীল এবং স্বাবলম্বী হ'য়ে স্বাধীন-ভারতের যোগ্য নাগরিক বোলে পরিচয় দেবার অধিকার অর্জন করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হবে এক ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ সমাজ। যার লক্ষ্য হবে—সৃজনী-শক্তির অভিনব পরিস্ফুরণ এবং সামগ্রিক মানব-কল্যাণ।

অনুপমা
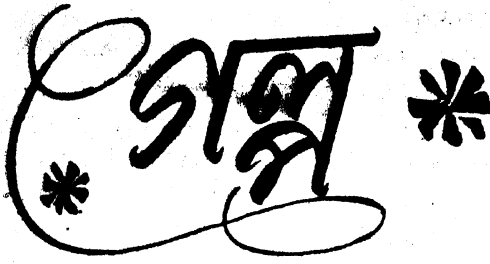
দুলাল দেববর্মণ

ট্রেন থেকে নেমেই অবাক হয়ে গেল অনুপম। অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এবার আর ভীড় জমে যায়নি কাঞ্চনডাঙা ষ্টেশনে। সেক্রেটারী ভূপেশ চাটুজ্যে কেবল একাই এসেছেন।

প্রথমে নমস্কার বিনিময় এবং সাদর সম্ভাষণের পালা। চাটুজ্যেমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, ট্রেনে কোনো কষ্ট হয়নি তো ?

না—কষ্ট আর কিসের! একটু হেসে উত্তর দিলো অনুপম, আপনাকে যে এবার একা দেখছি—আর কেউ আসেনি বুঝি ?

হ্যাঁ, এসেছে তো সবাই, তবে ওরা ওপারের প্ল্যাটফরমে গেছে। এখুনি এসে পড়বে। ডাকবো নাকি কাউকে ?

না, থাক। নিরুৎসাহ গলায় উত্তর দিলো অনুপম।

সিংগল লাইনের ষ্টেশন। ষ্টেশনের সামনেরটুকুই কেবল ডবল করে পাতা। বিপরীতমুখী দু'খানি ট্রেনের ক্রসিঙের আড্ডা। ওপারের ট্রেনখানি তখনো দাঁড়িয়ে আছে ওদিককার প্লাটফরমের গায়ে।

আচ্ছা, ওরা সবাই ওখানে কেন ? কোনো বিখ্যাত বক্তা-টক্তা কেউ আসছেন নাকি এবারে ?

চাটুজ্যেমশাই হাসলেন—বক্তা-টক্তা কেউ নয়! শুধু শুধু বক্তৃতা শুনে কী লাভ হবে, বলুন ?

ওপারে তবে কে এলেন ?

চাটুজ্যেমশাই জানালেন, কলকাতার একজন গাইয়ে মেয়ে। আজকের সভায় উনিই নাকি গান গাইবেন।

তাই নাকি ? তা কী নাম ভদ্রমহিলার ? আর কোনোদিন এসেছেন আপনাদের এখানে ?

না, আসেননি। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। আমাদের এ্যাসিস্টাণ্ট সুব্রতই ওকে এনগেজ্ করেছে। গানে নাকি খুবি নাম কিনেছেন শহরে! এরকম নাম-করা গায়িকাকে গাঁয়ে আনা সত্যিই ভাগ্যের কথা!

ওপারের প্ল্যাটফরমে তখন রীতিমতো কোলাহল উঠে গেছে। যাকে এই গাঁয়ে আনা ভাগ্যের কথা, তিনিই এসে গেছেন! কিন্তু, কী আশ্চর্য এই গাঁয়ের ছেলেগুলো! অন্যবার এরাই তো প্ল্যাটফরম ছেয়ে থাকে অনুপমদাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। অনুপমকে পেয়ে খুবি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সবাই। কিন্তু এবার—আশ্চর্য!

একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলো অনুপম। ষ্টেশন থেকে ওদের সমিতির আস্তানা পর্যন্ত চাটুজ্যেমশাই কী যে সব বলতে বলতে এলেন—তার কিছুই শুনতে পায়নি সে।

অবশেষে চাটুজ্যেমশাইয়ের কথা কানে গেলো—এই অফিস ঘরেই একটু বসুন আপনি। আমি এখুনি ফিরে আসছি। ওরাও এসে পড়লো বলে।

চা-ইত্যাদি নিয়ে একটু পরেই ফিরে এলেন ভূপেশবাবু। সংগে সংগে ওরাও সবাই এসে পড়লো হুড়মুড় করে! কিন্তু কোলাহলটা হঠাৎ থেমে গেলো দরজার কাছে এসেই। কে একজন জিজ্ঞাসা করলো, অনুপমদাও এসে গেছেন তো ?

উত্তরটা দিলেন চাটুজ্যেমশাই, কোন্‌বার উনি না আসেন, তাই শুনি ? তোমাদের সব যেমন—দু'একজনকেও অন্তত থাকতে হয় ওপারে! উনি কী মনে করলেন ভাবো তো—

অন্যমনস্কতাটুকু তাহলে চাটুজ্যেমশাইয়েরও নজর এড়ায়নি! একটু লজ্জিতই হতে হলো অনুপমকে। সামান্য একটি গাইয়ে মেয়ের উপর অভিমান করে সভার সভাপতিকে ক্ষুণ্ন হওয়া চলে না কিছুতেই।

একি—অনুপমদা ? আপনি এখানে ?

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলো অনুপম—কুন্তলা! সেই সুশ্রী, শ্যামা, রহস্যময়ী মেয়ে কুন্তলা সেন! দীর্ঘ ন বছর

পরে এই ওকে প্রথম দেখলো সে। অনেকক্ষণ চোখদুটি নামাতে পারলো না সেই দুটি রহস্যঘন চোখের উপর থেকে!

এবার কথা বললো সুব্রত রায়, সমিতির এ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী—অনুপমদাকে আপনি চেনেন, কুন্তলাদি? উনি যে আমাদেরই সভাপতি। ওঁরই আদেশে এবং প্রেরণায় আমরা গড়ে তুলেছি এই প্রতিষ্ঠান!

কুন্তলাও বোধকরি খুবি অবাক হয়েছিলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, আপনার শরীরের এ কী চেহারা হয়েছে বলুন তো? দেশের সেবায় নামতে গেলে নিজের সেবার কথাটা বুঝি এমনি করেই ভুলে যেতে হয়?

হয়তো ভুলেই যেতে হয়!—ম্লান হেসে উত্তর দিলো অনুপম, এই শরীরটা দেখে খুবি কি খারাপ মনে হচ্ছে?

না, খু-উব ভালো বলেই মনে হচ্ছে! শুনেছি, অনেক টাকা পয়সার মালিক হয়েছেন। বিরাট ব্যবসা ফেঁদেছেন। নতুন বাড়ীও তৈরী করে ফেলেছেন একখানা। টাকা-পয়সা, নাম-যশ সব দিক দিয়েই নাকি বেড়ে উঠেছেন ওজনে! কিন্তু একটা কথা—এই সবের ফাঁকে নিজের শরীরটার ওজন নিয়ে দেখেছেন কখনো, বলুন?

অনুপম বললো, আমার সব খবরই জেনে ফেলেছো দেখছি! এবার তোমার খবরও কিছু জানতে দাও! গান গেয়ে গেয়েই নাকি কাটিয়ে দিচ্ছো জীবনটা—সত্যি?

কিছুটা সত্যিই। আমার মতো মেয়েদের গান গাওয়া ছাড়া আর কী উপায় থাকতে পারে, তাই বলুন!

মুখে মুখে উত্তর দিতে তেমনি নিপুণাই রয়ে গেছে কুন্তলা। ওর দিকে আর একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলো অনুপম—কিন্তু সেই তন্বী, তরুণী মেয়েটি আর নেই! দিব্যি দোহারা চেহারা এখন। আরো নয়টি বছর বয়স বেড়েছে ওর। তার সে বয়েসের পরিচয় গোপন রাখবার জন্যে বিশেষ কোনো প্রসাধন বা মেক-আপের প্রয়োজন হয়নি। শুধু কালো কাজলের দু'টি সূক্ষ্ম আঁচড়েই আজও বিদ্যুন্ময় হয়ে আছে চোখের সেই রহস্যটুকু!

কুন্তলা জানালো, খবর অনেক আছে। ফাংশন তো আরম্ভ বিকেল চারটের—এখনো নয়টি ঘণ্টা বাকী! আচ্ছা, আপনি আজ খাওয়া-দাওয়া করছেন কোথায়? এই ভদ্রলোকের বাড়ীতেই তো?

এই ভদ্রলোক অর্থাৎ চাটুজ্যেমশাই। অনুপম জানালো, সেই রকমই তো কথা আছে—।

তাহলে সেটার খেলাপ করে ফেলুন, চলুন আমার সংগে—

কোথায়?

আমার মাসীমার বাড়ী, এই গাঁয়েই তার শ্বশুরের ভিটে। এই মাসীমার সূত্রেই আজ আসতে পেরেছি এই গাঁয়ে। আর এই আসার সূত্রেই তো—যাকগে, এখন তাড়াতাড়ি চলুন তো আমার সংগে!

চাটুজ্যে মশাইয়ের মুখের দিকেও একবার তাকাতে হলো। ভদ্রলোক ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। চান-খাওয়ার অবকাশে সমিতির অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি পেশ করবার ইচ্ছে ছিলো হয়তো। সুতরাং আশ্বাস জানিয়ে বলতে হলো অনুপমকে—আপনি বরং এক কাজ করুন চাটুজ্যেমশাই, সমিতির যে সব জিনিসের অভাব, একটা লিষ্টি বানিয়ে ফেলুন! যাবার সময় আমার হাতেই দিয়ে দেবেন। ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে—

চাটুজ্যেমশাই আর আপত্তি করলেন না।

মাসীমার বাড়ী মাত্র মিনিট সাতেকের পথ। কিন্তু এই সাত মিনিটের মধ্যেই গত ন বছরের জীবন পাড়ি দিয়ে কুন্তলা আবার ফিরে গেলো অনেকদিন আগের একটি সান্নিধ্য-মধুর দিনে! আর, শুধু ফিরে গেলো না, অনুপমকেও ফিরিয়ে নিয়ে গেলো।

খেতে বসে জিজ্ঞাসা করলো অনুপম, কই, তোমার খবরগুলো তো এখনো পরিবেশন করলে না?

করবো—করবো, এখুনি এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বলুন তো?—কুন্তলা হেসে বললো, খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু জিরিয়ে নিন, তার পরে তো!

খাওয়া-দাওয়াও সারা হলো। একটা বিছানা পেতে দিয়ে কুন্তলা বললো, এবার একটু গড়িয়ে নিন। আমি ততক্ষণ মাসীমার সঙ্গে দুটো কথা বলিগে।

ইদানীং দুপুরের চান-খাওয়ার পরেও একটু গড়িয়ে নেবার অভ্যেস জন্মে গেছে অনুপমের। গড়াতে গড়াতে এক-আধ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে হয় প্রতিদিনই। কিন্তু আজ আর সে ঘুম ধরা দিলো না। ন বছর আগের

কতকগুলো আধপোড়া স্মৃতিই আবার জীবন্ত হয়ে উঠলো সারা অন্তর-মন জুড়ে।

কুন্তলাকে অনুপম প্রথম দেখেছিলো ওদের কলেজের ক্লাসে। সেই প্রথম দেখার মধ্যে অবশ্য কোনো মোহ বা পক্ষপাতিত্ব ছিলো না। পক্ষপাতিত্ব দেখা গেলো পুরো একটি বছর পরে! তখন সবে টিউশনিতে হাত দিয়েছে অনুপম।

টিউশনিটা অবশ্য মন্দ জোটেনি। একটি ছেলেকে পড়াতে হতো। মাসের শেষে পারিশ্রমিকও পাওয়া যেতো মন্দ নয়।

একদিন পড়াতে গিয়ে দেখলো অনুপম—ঠিক পাশের ঘরেই কে যেন গান আরম্ভ করে দিয়েছে! বেশ মিষ্টি গান। গলাও ঠিক তেমনিই।

ছাত্রটিকেই জিজ্ঞাসা করতে হলো—কে গাইছে মণ্টু?

মণ্টু জানালো, ও দিদিমণি, মিনুদিকে গান শেখাতে এসেছেন।

মিনুদি—মিনতি, মণ্টুর দিদি। দিদিমণির পরিচয়ও অবশ্য জানা গেলো পরে। অনুপমদেরই কলেজের মেয়ে—কুন্তলা সেন।

পরদিনও সেই মিষ্টি গলার গান শুনলো অনুপম। তার পরের দিনও।

কিন্তু দিনের পর দিন শুনতে শুনতে গানের মিষ্টতা যেন কমে আসতে লাগলো। পড়াতে বসে তারী অসুবিধে হতে লাগলো অনুপমের। শুধু অনুপমেরই নয়, মণ্টুরও। দিদিমণির গান আর মিনুদির সারেগামা শুনতে শুনতে পড়াশুনা মাথায় উঠবার জোগাড়। একই গান, একই সুর কাহাতক শোনা যায় দিনের পর দিন!

একদিন মণ্টুর মাকে ডেকে সব বলতে হলো। পাশের ঘরে গান-বাজনা চললে এ ঘরের পড়াশুনা অচল হয়ে ওঠে। গানের ব্যবস্থা অন্য ঘরে বা অন্য সময়ে হলেই ভালো হয়।

কিন্তু অন্য কোনো ঘরের ব্যবস্থা হলো না। ব্যবস্থা করবার মতো তৃতীয় আর একখানি ঘরও ওঁদের ছিলো না। তবে আশ্বাস দিলেন, সময়টা বদলে দেওয়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখবেন।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কোনোটাই বদলে দেওয়া গেলো না। না সময়, না ঘর।

অবশেষে মণ্টুর বাবাকেই একদিন বললো অনুপম, দেখুন এই সোরগোলের মধ্যে আর পড়াতে পারছি না। এ মাসের কটা দিন গেলে না হয় একজন নতুন মাস্টার দেখবেন।

কিন্তু নতুন মাস্টার দেখতে হলো না। মাসের বাকী কটাদিন পার না হতেই গানের আসর গেলো স্তব্ধ হয়ে। ক'দিন আর শুনতে পাওয়া গেলো না সেই গানের গলা!

একদিন মণ্টুকেই শুধালো অনুপম, ব্যাপার কী—গানের সময় কি বদলে দেওয়া হয়েছে?

মণ্টু জানালো, উনি তো আর আসছেনই না আমাদের বাড়ীতে! সময় বদলে নাকি আসতে পারবেন না। বাবা বললেন কিনা যে আপনি পড়ানো ছেড়ে দেবেন, তাই—।

কেন জানি না, কথাটা শুনে মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেল।

সেইদিন ফেরবার পথেই ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলো অনুপম। বাড়ীটা সঠিক চেনা ছিলো না। একজন সহপাঠীকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হলো।

যথাস্থানে গিয়ে বার দুই কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গিয়েছিলো। কুন্তলা নিজেই এসে দাঁড়িয়েছিলো দরজার সামনে, একেবারে মুখোমুখি—?

আপনি—?

হ্যাঁ, আমিই।—কুন্তলাকে আরো বিস্মিত করে উত্তর দিয়েছিলো অনুপম, এই রাত্রেই আসতে হলো জ্বালাতে! কিছু মনে করবেন না, একটা জিজ্ঞাস্য আছে, তাই—

আসুন, ভিতরে এসে বসবেন—।

ভিতরে যেতে হলো। ওর ছোটো ভাইটি তখনো পড়ছিলো। কুন্তলা নিজেও বোধ হয় বসেছিলো বই নিয়ে। মাদুরের উপরে একটি লণ্ঠন, লণ্ঠনের চারপাশে কিছু বই-খাতা ছড়ানো। রান্নাঘরে মা রান্নায় বসে-ছিলেন। অনুপমকে কোথায় বসতে বলবে, তাই ভেবেই হয়তো বিব্রত হয়ে উঠেছিলো কুন্তলা। অনুপম কিন্তু বসে পড়েছিলো সেই মাদুরেরই একটি কোণে। বসে বলেছিলো, আসুন, কথাটা আগে সেরে ফেলা যাক—!

কুন্তলা একথায় কোনও উত্তর না দিয়ে হুকুম জানিয়ে-ছিলো ওর ভাইটিকে—মাকে চায়ের জল চড়াতে বলে আয় তো রবি—

অনুপম জানিয়েছিলো, চায়ের হাংগামা করে আর দরকার নেই। ও পর্বটা মণ্টুদের ওখান থেকেই সেরে এসেছি। এখন বলুন দিকি—ওদের বাড়ীর টিউশনিটা কেন ছেড়ে দিলেন ?

অনেকক্ষণ নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো কুন্তলা। তারপর উত্তর দিয়েছিলো, বাধ্য হয়েই ছাড়তে হলো। সময় বদলানোর আর উপায় ছিলো না।

কে বলেছে আপনাকে সময় বদলাতে ?

চকিতে মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলো কুন্তলা। তারপর উত্তর দিলো, আমার সুবিধামতো সময়ে ওদের বাড়ীতে গেলে আপনার খুবি অসুবিধা হয়। আপনি ওবাড়ীর পুরনো শিক্ষক, সুতরাং—

অনেক করে বোঝাতে হলো কুন্তলাকে। কিন্তু কিছুতেই সে রাজী হলো না মণ্টুদের বাড়ীতে যেতে। এমন কি, ওর মা-ও এসে বোঝালেন অনেক—তাতেও না !

অগত্যা হাল ছেড়ে দিতে হয়েছিলো অনুপমকে। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেও দাঁড় ছেড়ে দিতে হয়নি। কুন্তলার মা এবং ভাইয়ের সংগে আলাপ জমে গিয়েছিলো অনুপমের। অনুপমের সংগে কথা কয়ে খুবি খুশী হয়ে উঠলেন ওর মা। ফেরবার সময় আবার আসতে বলে দিলেন বার বার করে !

আবার আসতে হলো একদিন। তারপর আবার আর একদিনও। তারপর যা হয়। প্রায় প্রতিদিনই আসা-যাওয়া সুরু হয়ে গেলো অনুপমের। কুন্তলার আর ওর মধ্যেকার ব্যবধানটুকুও এইভাবে কমে আসতে লাগলো, দিনের পর দিন।

তারপরই সুরু হয়ে গেলো জানাজানি এবং কানাকানি ! সহপাঠীদের কেউ কেউ তো প্রকাশ্যেই সুরু করে দিলো সমালোচনা—ঠাট্টা এবং তামাসাও !

একদিন কুন্তলাকেই ডেকে বললো অনুপম, দেখো, এই সব ফেউয়ের মুখ বন্ধ করা দরকার—তোমার কী মত ? —বলাবাহুল্য, ততদিনে 'আপনি'র ব্যবধান ঘুচিয়ে 'তুমি'র সান্নিধ্যেই নেমে এসেছে ওরা !

কুন্তলা উত্তর দিয়েছিলো, বেশ তো, কিন্তু কী করে বন্ধ করবে শুনি ? গুণ্ডামী তো আর করতে পারবে না !

দরকার হলে তা-ই করতে হবে, কুন্ত ?—অনুপম হেসে বলেছিলো, তবে সেটা 'ঐ ফেউদের উপরে নয়—মানে, তোমার উপরেই—

তার মানে ?

তার মানে শুভস্য শীঘ্রম !—এই সোজা কথাটির মানে আর বুঝতে পারলে না ?

মানেটা বুঝিয়ে দেবার পরেও কিন্তু চুপচাপ বসে থাকলো কুন্তলা। কোনো উত্তর দিলো না।

কী ব্যাপার, একেবারে চুপ হয়ে গেলে যে ?

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর কুন্তলা উত্তর দিয়েছিলো, ও এখন কী করে হবে বলো ? এখুনি যদি বিয়ে করতে হয়—রবির পড়াটা বন্ধ হয়ে যাবে। মাও আবার পড়েছেন সেই পুরনো পেটের অসুখে। যা অবস্থা, আর সেরে উঠবেন বলে মনে হয় না। ওঁকেই বা কে দেখবে বলো ? আমার কথায় হয়তো রাগ করবে, অনুপমদা। কিন্তু তুমি তো জানো আমাদের অবস্থা। মার শেষ সম্বল গয়না কখানিও বিকিয়ে গিয়েছে। আর আমার নিজের জন্যেও একটা কাজের চেষ্টা দেখতে হবে। মা সেরে উঠুন, রবি মানুষ হয়ে উঠুক, তখন অবশ্যই ভাবতে পারবো আমার বিয়ের কথা। তবে, তার আগেই যদি তোমার বিয়েটা সারা হয়ে যায়, তাহলে—

তাহলে—কী ?

ম্লান হেসে উত্তর দিয়েছিলো কুন্তলা—আমার বিয়ের কথাটা আর ভাববারই দরকার হবে না !

উত্তর শুনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলো অনুপম। কুন্তলাকে আর ভুল বোঝা চলে না। ভুলে যাওয়া তো নয়ই।

কুন্তলাও বলেছিলো তারপরেই—আমাকে আজ তুমি ভুল বুঝতে পারো, অনুপমদা। কিন্তু তোমাকে আমি ভুলবো না কোনোদিনই !

কুন্তলার সেদিনের কথা আজও ভুলে যায়নি অনুপম।

কুন্তলা যা বলেছিলো, তাই সত্যি হলো। কলেজ ছাড়তেই হলো ওকে। ওর এক মামাই নাকি জোগাড় করে দিলেন একটা গাঁয়ের ইস্কুলের মাস্টারী। সেই মামার বাড়ীতে থেকেই ও গানের ক্লাস করতে লাগলো। ছুটি-ছাটা পেলে বাড়ীতেও আসতো মাঝে মাঝে। অনুপমের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ হতো।

ইস্কুল-জীবন থেকেই দেশের কাজের দিকে একটু-আধটু ঝোঁক ছিল অনুপমের। কলেজ-জীবনের গোড়ার দিকেও সেই ঝোঁকেরও জের চলতে লাগলো। সভা-সমিতিতে গিয়ে বক্তৃতা করা আর মিছিলের পুরোভাগে থেকে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' করা তার অভ্যাসে গিয়ে দাঁড়ালো। পরে এই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্কও হয়ে গেছে কুন্তলার সংগে। দেশের সেবা করতে গিয়ে নিজের পড়াশুনার ক্ষতি করাটা মোটেই পছন্দ নয় কুন্তলার। প্রথম প্রথম অবশ্য কুন্তলাকেই হারতে হতো তর্কে, কিন্তু পরে হার স্বীকার করতে হয়েছে অনুপমকেই। সংঘ-সমিতিতে তার ক্রম-বর্ধমান অনুপস্থিতি বন্ধুমহলে সত্যিই বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে!

পরে কিন্তু সেই বিস্ময়ের পালা এসে দাঁড়ালো কুন্তলারই।

একটানা চার মাস মামার বাড়ীতে থাকতে হওয়ায় অনুপমের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি কুন্তলার। খোঁজ-খবরও নেওয়া হয়নি নিয়মিত। সুদীর্ঘ চার মাস পরে বাড়ীতে ফিরেই সে খবর পেলো—অনুপমদা জেলে গেছে! দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই নাকি প্রয়োজন হয়েছে তার মতো দেশ-সেবীদের দেশবাসীর চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখার!

সেই জেলের ভেতর থেকে যখন বের হলো অনুপম, তখন অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে দেশের। দেশবাসীর মুখে-চোখে তখন নতুন পাওয়া স্বাধীনতার আলো। জেল থেকে বেরিয়েই সে সোজা চললো কুন্তলাদের বাড়ীতে। কিন্তু গিয়ে দেখলো—দরজায় তালা লাগানো! পাশের বাড়ীর লোকের কাছে জানা গেলো, ওদের কেউই আর এ বাড়ীতে থাকে না! কুন্তলার মা মারা গেছেন বছর খানেক আগেই। রবি ম্যাট্রিক পাশ করেই ঢুকে পড়েছে রেলের চাকরীতে। কুন্তলা যে কোথায় আছে—কেউ বলতে পারলো না! সেই মামার বাড়ীতেই সে নাকি আর থাকে না। গানের ইস্কুলের মাস্টারীও করে না।

জেলের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে যেটুকু আলোর মুখ দেখা গিয়েছিলো, এই খবর শোনার পর সেটুকুও আবার নিভে গেলো। কুন্তলাদের দরজার সামনে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো, খেয়াল ছিলো না অনুপমের।' যখন খেয়াল হলো, তখন সে পথে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর সেই পথে-পথেই ঘুরে বেড়ালো অনেক দিন। ঘরের টান জেলে থাকতেই ছিঁড়ে গিয়েছিলো। নিজের ঘর-দোর বাঁধা রেখে ছোট মেয়েটিকে পরের ঘরে তুলে দিয়ে অনেক আগেই সংসারের মায়া ত্যাগ করেছিলেন অনুপমের বাবা।

বেশ কিছুদিন ভেসে বেড়ালো অনুপম। অবশেষে নোঙর ফেললো একটা মফঃস্বল শহরে এসে।

তারপর একে একে কেটে গেলো দীর্ঘ নয়টি বছর। যে দেশের কাজের পুরস্কার হিসাবে একদা বরণ করে নিতে হয়েছিল কারাগার, সেই কাজেরই বিনিময়ে এবার পাওয়া গেলো সোনার সিঁড়ির সন্ধান! তবে তখনকার সেই দেশসেবার কাজ, আর এখনকার এই কাজ—এর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ! কয়েক বছরের মধ্যে এই কাজেও বেশ খ্যাতি জুটে গেলো অনুপমের। খ্যাতির পিছনে পিছনে বেশ সংগতিও! অনেকগুলো মূল্যবাম লাইসেন্স, পারমিট এবং সুপারিশ-পত্রের জোরে বেশ কয়েকটি ব্যবসা খুলে বসলো সে। একখানা নতুন হালফ্যাসানের বাড়ীও তৈরী করে ফেললে। সুতরাং, শোনা খবর হলেও বাড়ী এবং ব্যবসা' সম্বন্ধে কুন্তলা যা যা বলেছে, তা মিথ্যে নয় একবর্ণও!

কী একটা কাজে মাসীমা এসেছিলেন ঘরের মধ্যে। অনুপম তথনো জেগে আছে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বাবা, ঘুম হলো না তোমার?

কই আর ঘুম হলো মাসীমা!—এখন কটা বাজে বলুন তো?

তা প্রায় বিকেল হতে চললো বই কি!—

চমকে উঠলো অনুপম—এতটা সময় সে কেবল স্মৃতির রোমন্থন করেই কাটিয়ে দিয়েছে! জিজ্ঞাসা করলো, কুন্তলা এখন কী করছে মাসীমা, ঘুমুচ্ছে বুঝি?

আর সে ঘুমিয়েছে! মাসীমা ম্লান হাসলেন—খানিকক্ষণ এটা-সেটা বকে কাটালো। তারপর সেতারটা নিয়ে সেই যে ঘরে ঢুকেছে, আর বেরুনোর নাম নেই!

বিস্মিত হয়ে উঠে পড়তে হলো অনুপমকে। ওঘরের বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হলো খানিক। ভিতর থেকে ভেসে আসছে পাহাড়-গলা নদীর মতো একটা

স্রোত। চাপা, একটানা একটা সুর। সুরের আর্তনাদও বলা চলে। আর্তনাদটা সেতারের না কুন্তলার গলার, সঠিক বোঝা গেলো না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকতে হলো অনুপমকে। ঠিক সেই মুহূর্তে ডাকতে সাহস হলো না। অবশেষে মাসীমাই গিয়ে ধ্যান ভাঙালেন ওর। অনেক ডাকাডাকির পরে তবে দরজা খুললো ও। বাইরে এসেই চমকে উঠলো অনুপমকে দেখে! লজ্জিত হয়ে বললো, সত্যি ভারী দেরী হয়ে গেছে অনুপমদা! আর একটু দাঁড়ান, এখুনি তৈরী হয়ে আসছি!

পথে বেরিয়ে কুন্তলা বললো, এইবার খবর-বিনিময়ের পালা। কই আর তো কোনো খবরই জিজ্ঞাসা করছেন না আমার সম্বন্ধে?

হ্যাঁ, এইবার করবো। অনুপম বললে, কিন্তু তার আগেও একটি জিজ্ঞাস্য আছে আমার—এই 'আপনি' ডাকের দূরত্ব এই মুহূর্তেই তুমি ঘুচিয়ে দেবে কিনা?

উত্তরে কুন্তলা হাসলে। ম্লান হাসি। বললে, না ডাকলেও যাকে একান্ত কাছাকাছি অনুভব করা যায়, বাইরের এই ডাকটুকুই কি তার কাছে বড়ো বলতে চাও?

অনুপম হেসে ফেললে—থাক, হার স্বীকার করছি তোমার কাছে! কিন্তু তোমার কোন্ খবরটি যে সকলের আগে জানতে চাইবো, তা-ই স্থির করে উঠতে পারছিনে। সত্যি, এত জিজ্ঞাসা যে জমে রয়েছে!

আমারও ঠিক ঐ একই অবস্থা। তোমারও কোন্ খবরটি যে আগে জিজ্ঞাসা করবো, ভেবে পাচ্ছি নে! আচ্ছা, সত্যি সত্যি উত্তর দেবে একটা প্রশ্নের?

প্রশ্নটিই বলে ফেলো না—

বলছি। শুনলাম, আজও তুমি বিয়ে করোনি! কেন করোনি, জানাবে?

কেন যে বিয়ে করেনি—এ প্রশ্নের উত্তর অনুপমের নিজেরই জানা ছিলো না। নতুন অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর তার জীবনে যে নারীর আবির্ভাব ঘটেনি তা নয়। কিন্তু নারী-রত্নের অভাব তাতে পূর্ণ হয়নি। বিয়ের কথা উঠলেই মনে পড়ে কুন্তলার কথা। আর মনে পড়ে পরস্পরকে দেওয়া তাদের কয়েকটি প্রতিশ্রুতির ভাষা!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলো অনুপম, ন'বছর আগের সেই প্রতিশ্রুতিটিকে ভুলে যাইনি বলেই করিনি বোধহয়।

অনেকক্ষণ মৌন হয়ে পথ চললো কুন্তলা। তারপর বললো, আমার সব খবর এখনো শোনা হয়নি তোমার। ন'বছর আগের সেই প্রতিশ্রুতির তুলনায় নিজেকে কতো যে ছোটো করে ফেলেছি, তা যদি জানতে—

তা আমি জানতেও চাইনে! আমি আজ জানতে চাচ্ছি—ন বছর আগের সেই জিজ্ঞাসার উত্তর শুধু কি এইটুকুই?

না, আরো আছে। আমি যেখানে থাকি, সেখানে খুবি জড়িয়ে পড়েছি। গান গেয়ে নাম কিনেছি—এ খবর সত্যি। কিন্তু এর চাইতেও বড়ো সত্যি আছে। অসহায়, অনাথ ছেলে-মেয়েদের একটি আশ্রমের আমিই এখন পরিচালিকা। আমি না থাকলে ছেলেমেয়ে কটা আবার হয়তো ঘুরে বেড়াবে পথে পথে।

স্তব্ধ হয়ে পথ চলতে লাগলো অনুপম। অসহায় ছেলেমেয়েগুলোকে দেখা শোনার জন্য যার এতো আগ্রহ, আর একজনের সহায়-হীনতা দেখেও সে যে কেন দেখতে পাচ্ছেনা!

সমিতির বার্ষিক অনুষ্ঠান বেশ ভালোই জমে উঠলো।

অনুষ্ঠানের আদিতেই একখানি গান গেয়ে শোনাতে হলো কুন্তলাকে। উদ্বোধনী সংগীত।

আর একখানি গান গাইতে হলো কুন্তলাকে। আর একখানিও। মুগ্ধ শ্রোতাদের অনুরোধ এড়াতে পারলো না বেচারী।

সমিতির দু'একজন কর্মী কিছু কিছু বললেন। কয়েক-জন বৃদ্ধ গ্রামবাসীও অকুণ্ঠ প্রশংসা জানালেন ছেলেদের কাজের। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করলেন সমিতির সভাপতির উদ্দেশ্যে।

তারপর উঠলেন সেক্রেটারী ভূপেন্দ্র চাটুজ্যে। তিনি পাঠ করলেন গত এক বছরের বিষদ্ কার্য-বিবরণী।

এবার উঠবার পালা স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের। অনুপম উঠি-উঠি করছে, এমন সময় উঠে দাঁড়ালো কুন্তলা! সভা-পতির অনুমতি গ্রহণের ভূমিকা সেরেই সে আরম্ভ করলো —আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। আমি একজন সামান্য গায়িকা মাত্র। আমার

উপার্জনের পরিমাণও খুব বেশী নয়। এই সামান্য উপার্জন থেকেই যথাসাধ্য বাঁচিয়ে এই সমিতিকে কিছু সাহায্য করতে চাই। আপনারা যদি দয়া করে এই সামান্য দান গ্রহণ করেন, তবে এখান থেকে ফিরেই আমি একশোটি টাকা পাঠিয়ে দেবো—

বলা বাহুল্য, কুন্তলার প্রস্তাব অভিনন্দিত হলো বিপুলভাবেই!

অভিনন্দনের উচ্ছ্বাস থামতেই উঠে দাঁড়ালো অনুপম। সে ভেবেছিলো, অন্যবারের মতো এবারও গুটিকয় মামুলি কথা বলেই অভিভাষণের পালা শেষ করবে। কিন্তু শেষ করতে পারলো না। দশ মিনিটের জায়গায় পুরো এক ঘণ্টা বলার পরও তার বক্তব্য শেষ হলো না! দেশের কথা, সমাজের কথা, মানুষের কথা—এই সবের সঙ্গে সমিতির কথা জুড়ে দিয়ে শুধু প্রেরণা এবং উত্তেজনারই সৃষ্টি করলো না সে, পরম উদারতার সংগে বহু আশা এবং আশ্বাসের বাণীও শুনিয়ে দিলো!

সুতরাং এবারও জোর হাততালি পড়লো, সংগে সংগে জোর অভিনন্দনও!

উৎসাহিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর উপর উত্তেজিত চোখ দুটি একবার বুলিয়ে নিলো অনুপম। অভিনন্দন-ধন্যা কুন্তলাকে দেখে নেবার লোভটুকুও সংবরণ করতে পারলো না কিছুতেই!

সভার শেষে আবার সেই রেলওয়ে ষ্টেশন। সেই ট্রেনের ক্রসিং। আপ এবং ডাউনের দু'খানি ট্রেনই এসে দাঁড়িয়ে গেলো কাঞ্চনডাঙা প্লাটফরমে।

পুরো ন ঘণ্টার বন্ধনকাল শেষ হয়ে এলো। যার যেথা ঠাঁই, সেথা পাড়ি জমাবার জন্যে আবার এসে জমতে হলো সেই রেল-বন্দরেই। কুন্তলাও এসে পৌছে গেলো অনুপমের প্রায় সংগে সংগেই। তবে তার প্লাটফরম আলাদা। অনুপম যাবে আপ-এর ট্রেনে, কুন্তলা ডাউনে। এবার কিন্তু আপ-ডাউন দুই প্লাটফরমেই ভীড় জমে গেছে সমিতির সভ্যদের।

কিন্তু, এই সব ভীড় আর যেন সহ্য হচ্ছিলো না অনুপমের। মফঃস্বল অঞ্চলে ফার্ষ্টক্লাস কামরার যাত্রী ওঠে না বড়ো একটা। আজও কেউ ওঠেনি দেখা গেলো। বেছে বেছে সেই নির্জন উচ্চশ্রেণীর কামরাতেই চড়ে বসলো অনুপম।

একখানি ট্রেনের ছাড় ঘণ্টা পড়ে গেলো।

অনেক চেষ্টা করেও পাশের গাড়ীর দিকে ভালো করে তাকাতে পারলো না অনুপম। কুন্তলার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই সে লুকিয়ে চলে এসেছে এই কামরাতে। ধরা পড়ে গেলে আবার যদি বিদায় নেবার অভিনয় করতে হয়? যাকে বিদায় দেওয়া যায় না, তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া—অভিনয় ছাড়া আর কী?

হঠাৎ ওপাশের দরজাটি খুলে যেতেই চমকে উঠলো অনুপম!—কুন্তলাই এসে ঢুকে পড়েছে এই কামরার মধ্যে! হয়তো ছুটতে ছুটতেই আসতে হয়েছে ওকে—এখনো হাঁপাচ্ছে পুরা দমে! দুই হাতে আবার ডজন খানেক ফুলের মালার বোঝা!

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো অনুপম, একি—তুমিও এই ট্রেনেই যে? এখুনি যে এ ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে—?

হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিলো কুন্তলা, তোমার মালা ক'গাছি দিতে এলাম। ভুল করে ওরা দু'জনের মালাই তুলে দিয়েছে আমার কামরাতে!

অনুপম হাসলো। সে জানে—ওরা 'ভুল' করে এ মালা তুলে দেয়নি কুন্তলার কামরাতে!

মালাগুলো এক পাশে রেখে দিয়ে হঠাৎ একটা প্রণাম জানিয়ে বসলে কুন্তলা। বললে, কতোকাল পরে দেখা হলো, এখন পর্যন্ত একটা প্রণামও জানানো হয়নি—

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো সমিতিরই দু'জন ছেলে! একজনের কাঁধে কুন্তলার সেই সেতারটি। সে বললে, এটা নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরছি, কুন্তলাদি! ওপারের প্লাটফরমে গিয়েও আপনার দেখা পেলাম না, তাই খুঁজতে খুঁজতে—

সেতারটি তুলে নিতেই ডাউনের ট্রেণখানি চলতে সুরু করলে। অনুপম বললে, ঐ যাঃ—, তোমার ট্রেন যে ছেড়ে দিলে, কুন্তলা—!

কুন্তলা কিন্তু একটুও বিচলিত হলো না অনুপমের কথায়। নির্বিকার চোখ দুটি মেলে শুধু তাকিয়ে থাকলে চলন্ত ট্রেনখানির দিকে।

আপ-এর ট্রেনখানিও নড়ে উঠলো এবারে—! আবার জানাতে হলো অনুপমকে, এ ট্রেনও যে এবার ছেড়ে দিচ্ছে—

উত্তরে অনুপমের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো কুন্তলা। তারপর শুধু বললে, ঠিক—।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

জৈন দর্শন

জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি

জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্দ্ধমান মহাবীর বৈশালী নগরে (বর্ত্তমান পাটনার ২৭ মাইল উত্তরে) "জ্ঞাত" নামে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ছিল সিদ্ধার্থ এবং মাতার নাম ত্রিশলা। বৈশালী ছিল লিচ্ছবী-বংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের রাজ্য এবং মহাবীরের মাতা ছিলেন লিচ্ছবীরাজের ভগিনী। মহাবীরের জন্ম হয় বুদ্ধদেবের কিছু পূর্ব্বে। মহাবীরের স্ত্রীর নাম ছিল যশোদা। তাঁহার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। মহাবীরের বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাহার পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দীবর্দ্ধনের অনুমতি লইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বারো বৎসর কঠোর তপস্যার পরে কৈবল্য-সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। ৪২ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২৭ অব্দে পরলোকগমন করেন।

তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মহাবীর "জিন" হন। যিনি ষড়রিপু জয় করিয়াছেন তিনিই জিন। জৈনশাস্ত্রে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের নাম আছে। মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর। তীর্থ শব্দের অর্থ "ঘাট"। যাহা দ্বারা নদীগর্ভ হইতে তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাই তীর্থ। জৈন তীর্থঙ্কর-গণ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্থিত হইবার সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, বলিয়া তাঁহারা তীর্থঙ্কর। মহাবীরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্করের নাম পার্শ্বনাথ। ৭৭৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া জৈনগণ বিশ্বাস করেন। কিন্তু জৈন ধর্ম্ম সনাতন, এবং যুগে যুগে তীর্থঙ্করগণ আবির্ভূত হইয়া এই ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। বর্ত্তমান যুগের প্রথম তীর্থঙ্করই ঋষভদেব। সকল তীর্থঙ্করই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মোক্ষপ্রাপ্তির অর্থ আমরা পরে আলোচনা করিব।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়

জৈনগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। দিগম্বর অর্থ দিগ্বসন—অর্থাৎ বসনহীন, উলঙ্গ। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উভয় সম্প্রদায়েই এক। অন্য বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ে যে ভেদ তাহা এই। শ্বেতাম্বর জৈনগণের বিশ্বাস যে মহাবীরের ভ্রূণ প্রথম দেবানন্দা নাম্নী নারীর গর্ভে উৎপন্ন হয়, এবং সেই ভ্রূণ ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত হয়। দিগম্বরগণ ইহা বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা সাধনায় সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন খাদ্যই গ্রহণ করেন না বলিয়া দিগম্বর-দিগের বিশ্বাস, কিন্তু ইহা শ্বেতাম্বরগণ স্বীকার করেন না। তৃতীয়তঃ দিগম্বরদিগের মতে যে সন্ন্যাসী কোনও সম্পত্তির অধিকারী এবং যিনি বস্ত্র-পরিধান করেন, তিনি এবং কোনও স্ত্রীলোকই মোক্ষলাভ করিতে পারে না, মোক্ষলাভের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। শ্বেতাম্বরগণ ইহাও স্বীকার করেন না। শ্বেতাম্বরদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য দিগম্বরগণ স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে মহাবীরের তিরোধানের পরেই জৈনশাস্ত্র তিরোহিত হয়। ৮৩ খৃষ্টাব্দে দিগম্বর-শাখা মূল-সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। দিগম্বরগণ বলেন—তাঁহারাই সনাতন আচার পালন করিতেছেন। তাঁহারা আরও বলেন—মহাবীরের তিরোধানের বহুদিন পরে প্রাচীন আচারের কঠোরতা বর্জন করিয়া অর্দ্ধকালক নামে সম্প্রদায় স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে এবং অর্দ্ধকালকগণই পরে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। পরবর্ত্তীকালে ৮৪টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে জৈনগণ বিভক্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভেদ নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়ে।

সমগ্র ভারতবর্ষে জৈনদিগের সংখ্যা কুড়ি লক্ষও নহে। দিগম্বর জৈন বাংলায় বেশী নাই। দক্ষিণ ভারতে, পূর্ব্ব রাজপুতানা এবং পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশেই তাহাদের বাস। ভারত বিভাগের পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। গুজরাট এবং পশ্চিম রাজপুতানাতেই অধিকাংশ শ্বেতাম্বর জৈন বাস করেন। জৈন সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষোপজীবী, কৌপীনধারী ও ক্ষৌরিত মস্তক। সম্বল তাহাদের ভিক্ষাপাত্র ও যষ্টিমাত্র। প্রত্যহ তিন ঘণ্টার অধিককাল নিদ্রা যাওয়া তাঁহাদের নিষেধ। দিনের অবশিষ্ট সময় তাহাদের পাপের জন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, ধ্যান, অধ্যয়ন এবং ভিক্ষায় ব্যয়িত হয়। যাহাতে কোনও প্রাণী হত্যা না হয়, তাহার দিকে গৃহী ও সন্ন্যাসী প্রত্যেক জৈনকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। কৃষি ও অন্যান্য যে সকল ব্যবসায়ে জীবহত্যার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের দ্বার জৈনদিগের নিকটে রুদ্ধ। এই জন্য অধিকাংশ জৈনই বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

জৈন দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) উমাস্বাতিকৃত তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র (তৃতীয় শতাব্দীর পরবর্ত্তী)
(২) সিদ্ধসেন দিবাকরকৃত ন্যায়াবতার (৫ম শতাব্দী)
(৩) হরিভদ্রকৃত ষড়দর্শন সমুচ্চয় (৯ম শতাব্দী)
(৪) মেরুতুঙ্গ রচিত ষড়দর্শন বিচার (১৪শ শতাব্দী)
(৫) নবতত্ত্ব (অজ্ঞাত) (১৪শ শতাব্দী)
(৬) হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্র (১২শ শতাব্দী)
(৭) দেবসূরিকৃত প্রমাণ-নয়-তত্ত্বালোকালংকার (১২শ শতাব্দী)
(৮) বিদ্যানন্দকৃত জৈন শ্লোক বার্ত্তিক (৮ম শতাব্দী)

(৯) গুণভদ্র রচিত আত্মানুশাসন (৯ম শতাব্দী)
(১০) নেমিচন্দ্র রচিত দ্রব্যসংগ্রহ (১০ম শতাব্দী)
(১১) অমিতচন্দ্র রচিত তত্ত্বার্থসার
(১২) মল্লিসেনকৃত স্যাদ্বাদমঞ্জরী (১৩শ শতাব্দী)
(১৩) গোম্মতসার
(১৪) লব্ধীসার
(১৫) ক্ষপাসার
(১৬) ত্রিলোকসার
(১৭) পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায় (৯ম শতাব্দী)
(১৮) তর্কবার্ত্তিক
(১৯) অনন্তবীর্য্য রচিত পরীক্ষা মুখ সূত্র লঘু বৃত্তি (১১শ শতাব্দী)
(২০) প্রমেয়-কমল-মার্ত্তণ্ড (প্রভাকর ৮২৫ খৃঃ অঃ)

জৈন শাস্ত্র

জৈন ধর্ম্ম যে অতি প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যজুর্ব্বেদে ঋষভ, অজিতনাথ এবং অরিষ্টনেমি নামে তিন জন তীর্থঙ্করের উল্লেখ আছে। ভাগবত পুরাণ মতে ঋষভদেব হইতেই জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে "নিগন্থ" নামে এই সম্প্রদায়ের এবং তাহার গুরু নাতপুত্ত বর্দ্ধমান মহাবীরের উল্লেখ আছে। বুদ্ধের সময়ে যে সকল রাজা ছিলেন, জৈন শাস্ত্রেও মহাবীরের সমসাময়িক বলিয়া তাহাদের উল্লেখ আছে। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় জৈন শাস্ত্রও প্রথমে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা হইত। সমগ্র শাস্ত্র কণ্ঠস্থ রাখা দুরূহ। ফলে প্রাচীন শাস্ত্রের কিয়ৎ অংশ নষ্ট হয় এবং মতভেদের উৎপত্তি হয়। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পাটলিপুত্র নগরে ধর্ম্মের প্রকৃত মতগুলি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হয়। ইহার পরে খৃষ্টীয় ৪৫৪ অব্দে বলভী নগরে আর এক সভায় ধর্ম্মমতগুলি চূড়ান্তরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই সভায় ৮৪খানা গ্রন্থ শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে ৪১খানা সূত্রগ্রন্থ, ১২খানা নির্যুক্তি (ভাষ্য), একখানা মহাভাষ্য, এবং কতকগুলি প্রকীর্ণক (বিচ্ছিন্ন—অশ্রেণীবদ্ধ) গ্রন্থ ছিল। সূত্রগ্রন্থদিগের মধ্যে ছিল ১১ অঙ্গ, ১২ উপাঙ্গ, পাঁচ চেদ, পাঁচ মূল, এবং আট বিবিধ গ্রহ। ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল গ্রন্থ অর্দ্ধ-মাগধী ভাষায় লিখিত ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে সংস্কৃত ভাষাতেও জৈন গ্রন্থ লিখিত হইতে থাকে। দিগম্বর জৈনদিগের মতে খৃষ্টীয় ৫৭ অব্দে জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হয়। এই সময়ে শাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোকের অভাব হইয়াছিল, এবং মহাবীরের ও কেবলীসন্তদিগের উপদেশ সকলের মধ্যে যাহা যাহা কাহারও কাহারও স্মৃতিতে রক্ষিত ছিল, তাহাই মাত্র শাস্ত্রের অবশিষ্ট ছিল। ইহার উপরই সপ্ততত্ত্ব, নবপদার্থ, ষট্‌দ্রব্য এবং পঞ্চ অস্তিকায় সম্বন্ধীয় শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত শাস্ত্রের বহু ভাষ্য ও টীকা পরে রচিত হইয়াছিল।

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় পদ্য ও গদ্যে জৈনদিগের অনেক গ্রন্থ আছে। কাব্য, নাটক, নীতি-কথা, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিভাগে জৈনদিগের দান—সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় নগণ্য নহে।

জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম

বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈন ধর্ম্মের মধ্যে কয়েক বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উভয় ধর্ম্মেই অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়েই বহু সন্ন্যাসী আছে। উভয়েই নিরীশ্বরবাদী। উভয় ধর্ম্মেই বেদের প্রামাণ্য অস্বীকৃত। বুদ্ধ ও মহাবীরের উপদেশের মধ্যেও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন—বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম মূলতঃ এক, এবং জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক শাখা। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের জীবনের ঘটনার মধ্যেও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। উভয়েই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়েই বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়ের আত্মীয় ও শিষ্যদিগের নামের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে। একই শতাব্দীতে প্রায় এক সময়েই উভয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। বুদ্ধ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন ৫৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে, মহাবীর ৫২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে। মৌর্য্যবংশীয় রাজগণ তাহাদের সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ইহা উভয় সম্প্রদায়েরই দাবি। উভয় ধর্ম্মের তীর্থস্থানগুলি পরস্পরের নিকটবর্ত্তী। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয় এই দুই সম্প্রদায়ের একটি অন্যটির শাখা। এই সমস্ত সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া বার্থ তাঁহার Religions of India গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জৈন ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কোলব্রুকের মতে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে প্রাচীন। প্রায় প্রত্যেক বস্তুরই আত্মা আছে, এই জীববাদ (animism) জৈনধর্ম্মের বিশেষত্ব। বৌদ্ধধর্ম্মে এই বিশ্বাস নাই। এই বিশ্বাস কোলব্রুকের মতে ধর্ম্মের অভিব্যক্তির ইতিহাসে প্রথমেই উদ্ভূত হয়। জেকোবি, বুলহার এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বার্থের মত গ্রহণ করেন নাই। গৌতম বুদ্ধ ও বর্দ্ধমান মহাবীরের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি প্রভেদও আছে, এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে বিভিন্ন উৎস হইতে উদ্ভূত, তাহাতে বর্ত্তমানে কেহ সন্দেহ করেন না। জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী।

জৈন-দর্শন

জৈন সাহিত্য প্রধানতঃ পালি ভাষায় লিখিত। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য জৈন দার্শনিকগণ সংস্কৃত ভাষাতেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

জৈন দর্শন বহুত্ববাদী ও বস্তুবাদী। বাহ্য জগৎ, যাহা আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, তাহা সত্য। জগতে দ্বিবিধ বস্তুর অস্তিত্ব আছে—প্রাণবান্ ও প্রাণহীন। প্রত্যেক প্রাণবান বস্তুর আত্মা (জীব) আছে। সুতরাং অহিংসা—জীবহিংসা বর্জ্জন—জৈন মতে পরম ধর্ম্ম। জৈন ধর্ম্মের আর একটি প্রধান কথা—পরের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। জৈন অনেকান্তবাদের উপর এই পরমতসহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত।

জৈন মনো-বিজ্ঞান

জৈন মতে সংবিদ (consciousness) প্রত্যেক আত্মার স্বরূপ। জড় হইতে সংবিদের উদ্ভব হইতে পারে না। সংবিদ্ স্ব-প্রকাশ। আলোকের ন্যায় অন্যের সাহায্য ব্যতীত সংবিদ আপনিই প্রকাশিত হয় এবং অন্য বস্তুও ইহার আলোকে প্রকাশিত হয়। অন্য বস্তু যখন সংবিদ্ কর্তৃক প্রকাশিত হয় না, তখন কোনও বাধা কর্তৃক সংবিদের আলোক প্রতিহত হওয়াই তাহার হেতু। বাধা যদি না থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিত। শক্যভাবে সর্ব্বজ্ঞতা প্রত্যেক আত্মায় বর্ত্তমান, কিন্তু এই শক্যতা যে বাস্তবতা প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহার কারণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বাধা। আমাদের মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল এবং ইহারাই আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্তির পথে বাধা।

জৈন মতে জ্ঞান মুখ্যতঃ দ্বিবিধ—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। অপরোক্ষ জ্ঞান অব্যবহিত জ্ঞান, বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়-সাহায্যে লব্ধ জ্ঞান; পরোক্ষ জ্ঞান অনুমান লব্ধ-ব্যবহিত জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান সম্পূর্ণ অপরোক্ষ নহে, কেননা আত্মা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভিন্ন এই জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়লব্ধ ব্যাবহারিক জ্ঞানের অতিরিক্ত সম্পূর্ণ অপরোক্ষ (পারমার্থিক) জ্ঞানেরও অস্তিত্ব আছে। কর্ম্মের বাধা দূরীভূত হইলে সেই জ্ঞানলাভ হয়। তখন আত্মা অব্যবহিতভাবে বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে, ইন্দ্রিয়-দিগের ও মনের তখন প্রয়োজন হয় না।

পূর্ণ অপরোক্ষ জ্ঞান ত্রিবিধ—(১) অবধি জ্ঞান, (২) মনঃ পর্য্যায় এবং (৩) কেবল জ্ঞান। যখন কেহ কর্ম্মের বাধা আংশিকভাবে দূর করিতে সমর্থ হয়, তখন দূরস্থ অথবা অতি সূক্ষ্ম অথবা অস্পষ্ট রূপবান বস্তু দর্শন করিবার শক্তিলাভ করে। এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ বলিয়া ইহার নাম অবধি জ্ঞান। বর্তমানে এতাদৃশ জ্ঞানকে Clairvoyance বলে। ঘৃণা, ঈর্ষা প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইতে পারিলে অন্য মনের—(অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ের) জ্ঞানলাভ করা যায়। ইহাই মনঃ পর্য্যায়। বর্ত্তমানে ইহাকে Telepathy বলে। যখন জ্ঞানরোধী যাবতীয় কর্ম্মের বিনাশ সাধিত হয় তখন সর্ব্বজ্ঞতাপ্রাপ্তি হয়। ইহাই কেবল জ্ঞান। মুক্ত আত্মাগণই এই জ্ঞানলাভ করেন। এই জ্ঞান দেশ-কালে অবাধিত এবং সর্ব্বপ্রসারী। ইহা ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ এবং বর্ণনাতীত, কিন্তু অনুভবগম্য।

উপরি উক্ত কয়েক প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত আর দুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে মতি-জ্ঞান এবং শ্রুতি-জ্ঞান। ইন্দ্রিয় অথবা মনের সাহায্যে যে কোনও জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাই মতি। বাহ্য বস্তুর ইন্দ্রিয়জ এবং মনোজ জ্ঞান, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক, অভিনিবোধ, অনুমান—(deductive reasoning) "মতি"র অন্তর্গত। মতি-জ্ঞান আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ে প্রথম বস্তুর দর্শন হয়। এই দর্শনই মতি-জ্ঞানে পরিণত হয়। শব্দ, প্রতীক এবং চিহ্ন দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা শ্রুতি। মতি-জ্ঞান বস্তুর সহিত পরিচয় হইতে লব্ধ হয়। শ্রুতি-জ্ঞান উৎপন্ন হয় বস্তুর বর্ণনা শুনিয়া।

মতি, শ্রুতি, ও অবধি জ্ঞানে ভ্রম সম্ভবপর। কিন্তু মনঃ-পর্য্যায় ও কেবল জ্ঞান অভ্রান্ত। জ্ঞানের সত্যতা নির্ভর করে ব্যবহারে তাহার হিতকারিতার উপর। যে জ্ঞান দ্বারা আমরা যাহা মঙ্গলকর, তাহা প্রাপ্ত হই, এবং যাহা অমঙ্গলকর, তাহা পরিহার করি, তাহাই সত্য। বস্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহাই সত্য জ্ঞানে প্রতিফলিত হয়। এই জন্যই তাহা হিতকারী। মিথ্যাজ্ঞানে বস্তুর অন্যান্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ সত্যভাবে প্রকাশিত হয় না। যখন শুক্তিতে মুক্তাভ্রম হয়, তখন যে স্থানে ও কালে মুক্তার অস্তিত্ব নাই, সেইস্থানে ও সেই কালে মুক্তায় দর্শন হয়। ভ্রান্ত জ্ঞানের লক্ষণ সংশয়, বিপর্য্যয় (বস্তু স্বরূপতঃ যাহা, তাহার বৈপরীত্য) এবং অনধ্যবসায় (অসতর্কতাজনিত ভ্রম)।

অন্যের নিকট শ্রবণ হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাই শ্রুত জ্ঞান। লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাও শ্রুতজ্ঞান। এই জ্ঞানের পূর্ব্বে মতি জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কথিত ও লিখিত শব্দের জ্ঞান শ্রুত জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন।

কেহ কেহ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সংব্যবহারিক এবং সার্ব্বিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অবধি, মনঃ পর্য্যায় এবং কেবল জ্ঞান পারমার্থিক জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জা (ইন্দ্রিয় নিবন্ধন) এবং ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ (অতিন্দ্রিয় নিবন্ধন) জ্ঞান সংব্যবহারিক জ্ঞানের অন্তর্গত। সংব্যবহারিক প্রত্যক্ষ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের জ্ঞান। বস্তুর ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও স্মৃতি এই জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয়। জ্ঞানের ইচ্ছা-পরিতৃপ্তি ক্রিয়াই সংব্যবহারিক প্রত্যক্ষ। কেবলীর জ্ঞান পূর্ণ (সকল), অন্যের জ্ঞান অপূর্ণ (বিকল)। স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক (সার্ব্বিক হইতে বিশেষের জ্ঞান) অনুমান (মধ্যবর্ত্তী অবয়বের সাহায্যে (middterm জ্ঞান এবং আগম (প্রাচীনের সাক্ষ্য) ভেদে পরোক্ষ পঞ্চবিধ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ স্বচ্ছতার প্রভেদ। কেননা জৈনমতে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ প্রতীতির গৌণ সাধন মাত্র। (Vide Dr Radha Krishnn's Indian Philosophy vol. I. P. 296).

জীবের স্বরূপ চেতনা বা সংবিদ। (Con-sciousness) প্রথম দর্শন (প্রতীতি) পরে জ্ঞান রূপে চেতনা প্রকাশিত হয়। দর্শনে বস্তুর অস্তিত্ব মাত্রের অনুভব হয়, তাহার বিশেষত্বের জ্ঞান হয় না। তাহা সংবেদনের অনুভবমাত্র। তাহার অর্থবোধ হয় না। "জ্ঞানে" বস্তুর বিশেষত্বের অনুভব হয়। দর্শনের পাঁচক্রম—(১) ব্যঞ্জনাবগ্রহ, (২) অর্থাবগ্রহ, (৩) ইহা, (৪) অব্যয় এবং (৫) ধারণা। বাহ্য উত্তেজনা (Stimulus) ইন্দ্রিয়ের বহিঃপ্রান্তে পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার উৎপত্তি করে, এবং বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সংযোগ বিধান করে। ইহায় ব্যঞ্জনাবগ্রহ। ইহার ফলে চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়, সংবেদন অনুভূত হয়, এবং বস্তুর অস্তিত্বমাত্রের অনুভব হয়। ইহাই অর্থাবগ্রহ। তৃতীয় ক্রম "ইহায়" "ইহা কি" এই প্রশ্নের উদয় হয়, এবং বস্তু সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভের ও অন্যান্য বস্তুর সহিত ইহার সাদৃশ্য ও ভেদ জানিবার চেষ্টার উদ্ভব হয়। তাহার পরে অতীতের অনুভবের

সহিত উপস্থিত অনুভবের সাদৃশ্য ও ভেদের তুলনাদ্বারা বস্তুর বিশেষত্বের অনুভব হয়। ইহাই "অবায়"। তাহার পরে "ধারণা"র সংবেদন বস্তুর গুণরূপে অনুভূত হয়, এবং তাহার প্রত্যয় স্মৃতিতে রক্ষিত হয়।

জ্ঞানের উপরি উক্ত বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে জৈন দর্শন বস্তুবাদী (Realist)। ইহাতে বস্তু ও তাহার বিজ্ঞান পৃথক বলিয়া স্বীকৃত—বস্তু বিজ্ঞানবাহ্য, বিজ্ঞানের বাহিরে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত। বস্তুর গুণ এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ অব্যবহিত ভাবে অনুভূত হয়; তাহা চিন্তা অথবা কল্পনা সৃষ্ট নহে। জ্ঞান-প্রক্রিয়া কর্ত্তৃক জ্ঞানের বিষয় কোনও প্রকারে রূপান্তরিত হয় না। জীবের সংবিদ কখনও নিষ্ক্রিয় হয় না, তাহা আপনাকে ও বিষয়কে একসঙ্গে প্রকাশিত করে। আত্মা ও অনাত্মা—বিষয়ী ও বিষয়—উভয়ে একত্র প্রকাশিত হয়। আলোক যেমন আলোকিত বস্তুর সঙ্গে আপনাকে প্রকাশিত করে, তেমনি জ্ঞান আপনাকে এবং তাহার বিষয়কে প্রকাশিত করে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জ্ঞান কেবল বাহ্য বস্তুকে প্রকাশ করে, আপনাকে প্রকাশিত করে না। জৈন মতে যখনই কোনও বস্তুর জ্ঞান হয়, তখন বিষয়ী বিষয়ের সঙ্গে আপনাকেও জানে। তাহা যদি না হইত, আত্মা যদি জ্ঞেয় বস্তুর সহিত আপনার জ্ঞানলাভ না করিত, তাহা হইলে কেহই তাহাকে এই জ্ঞান দিতে পারিত না। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার সহিত "আমি জানিতেছি" এই জ্ঞান যুক্ত থাকে। সংবিদ কিরূপে অচেতন পদার্থকে প্রকাশিত করিতে পারে, এই প্রশ্ন অর্থহীন, কেননা সংবিদের স্বরূপই হইতেছে বস্তুকে প্রকাশ করা।

আত্মসংবিদে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ, বাহ্য সম্বন্ধ মাত্র নহে, অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞানী ও জ্ঞানের মধ্যেও সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ, একটি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অন্যটির অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভেদ নির্দ্দেশ করা যায়। আত্মসংবিদে বিষয়ী, বিষয় ও জ্ঞান একই বস্তুর বিভিন্ন বিভাব (aspects)। জ্ঞানবিহীন কোনও জীবের অস্তিত্ব নাই, এবং জ্ঞানও জীব ব্যতীত অন্যত্র সম্ভবপর নহে।

পূর্ণ অবস্থায় আত্মা পূর্ণ-জ্ঞান ও পূর্ণ-দর্শন। এই জ্ঞান ও দর্শন সমকালেই উদ্‌ভূত হয়, কিন্তু বদ্ধজীবে জ্ঞানের পূর্ব্বে দর্শনের উদ্ভব হয়। পূর্ণজ্ঞানে সংশয়, বিমোহ এবং বিভ্রমের স্থান নাই। কর্ম্ম-কর্ত্তৃক দর্শন ও জ্ঞান উভয়েরই বাধা হয়। যে সকল কর্ম্মদ্বারা দর্শনের বাধা হয়, তাহারা দর্শনাবরণীয় কর্ম্ম, এবং যে সকল কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের বাধা হয়, তাহারা জ্ঞানবরণীয় কর্ম্ম। আত্মার মধ্যেই যাবতীয় জ্ঞান বর্ত্তমান, কিন্তু বাধার অস্তিত্ব বশতঃ সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। বাধা বিদূরিত হইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের প্রকাশের বাধা হইতেছে চারি রিপু (Passions—কষায়) এবং প্রবল চিত্তাবেগ (Emotions)। ইহাদের অস্তিত্ববশতঃ আত্মার মধ্যে জড় পদার্থ (সূক্ষ্ম কার্ম্মিক জড়) প্রবেশ করিয়া, আত্মার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বাধাদান করে; ইহাদের ফলে সাংসারিক জীবনের প্রতি মমতাবোধ উৎপন্ন হয়; এবং বাহ্য বর্ত্তমানকালে স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল তাহাতেই জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে। যাহাতে আমাদের স্বার্থ নাই তাহা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে পড়িয়া থাকে। আত্মা যখন জড়ের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করিতে সক্ষম হয়, তখন সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। জড়কে আত্মার মধ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাহার শক্তির ধ্বংস করিতে পারিলেই ইহা সম্ভবপর হয়। সকল আত্মাই চেতন এবং বুদ্ধিমান। জড়ের সহিত তাহাদের বিভিন্ন পরিমাণে সংযোগের দ্বারা তাহাদের বিভেদের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়।

প্রত্যক্ষজ্ঞানে বাহ্যবস্তুর স্বরূপই প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শ হইলে আত্মার দর্শনাবরণ ও জ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হওয়ার ফলে আত্মার মধ্যস্থিত জ্ঞান প্রকাশিত হয়। আত্মার দৃষ্টিশক্তিই ইন্দ্রিয়-শব্দবাচ্য, বাহ্য দৈহিক ইন্দ্রিয় নহে। আত্মার সহিত দেহের প্রত্যেক অংশ সংযুক্ত। আত্মার যে অংশ চক্ষুর সহিত সংযুক্ত, সেই অংশে দৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যখন কোনও বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তখন সেই বস্তু দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা লাভ করে; তখন দ্রষ্টা আত্মার জ্ঞানাবরণ উত্তোলিত হয়, এবং আবৃত জ্ঞান উন্মুক্ত হয়। বাস্তবিক কেহ চক্ষুদ্বারা দর্শন করে না। চাক্ষুষ জ্ঞান—সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানই, জ্ঞানাবরণ উন্মোচনের ফলে আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হয়। কোনও ইন্দ্রিয়ই অনুভবগম্য নহে, অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতির অনুভব হয় না। সুতরাং আত্মার বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব-কল্পনা অসংগত। মনের অস্তিত্বও অনুভবগম্য নহে বলিয়া জৈনগণ তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জীবের কর্ম্মদ্বারাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আত্মার আবরণ উন্মোচিত হয়। বাহিরে বিষয়ের অস্তিত্ব, আলোকও ইন্দ্রিয়ের পটুতাও ইহার কারণ।

জৈন দার্শনিকদিগের এই মত হইতে অনুমিত হয়, তাঁহারা আত্মার উপর জড়ের ক্রিয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করেন না। পাশ্চাত্য দার্শনিক-দিগের ও অনেকে ইহা স্বীকার করেন নাই। জৈন মতে দৈহিক পরিবর্ত্তন ও আত্মিক পরিবর্ত্তন সমকালবর্ত্তী, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নাই। দেহের ঘটনাবলী জড়ের নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়। জীবের মানসিক অবস্থা তাহার কর্ম্মের ফল। দৈহিক পরিবর্ত্তনদ্বারা তাহা সংঘটিত হয় না। এই মতে জ্ঞান একটি দুর্বোধ্য ব্যাপার। আত্মার আবরণ-উন্মোচন কিরূপে দৈহিক ক্রিয়ার সমকালে উৎপন্ন হয়, তাহা দুর্ব্বোধ্য।

তত্ত্ববিদ্যা

অনেকান্তবাদ

জৈন মতে "অনন্তধর্ম্মকং বস্তু"—প্রত্যেক বস্তুর অসংখ্য ধর্ম্ম আছে। বস্তুর মধ্যে অনবরত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, এবং প্রত্যেক বস্তু প্রতিক্ষণে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন এই সকল পরিবর্ত্তন মিথ্যা—"বাচারম্ভণ"মাত্র। মৃত্তিকা এবং স্বর্ণ হইতে বিবিধ দ্রব্য নির্ম্মিত হয়; তাহারা সকলেই অস্থায়ী ও মিথ্যা, উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে মৃত্তিকা এবং স্বর্ণই স্থায়ী ও সত্য।

বিভিন্নতা নামরূপ হইতে উদ্ভূত। নাম ও রূপ মিথ্যা। বৌদ্ধ মত বস্তুর মধ্যে চিরস্থায়ী বা ধ্রুব কিছুই নাই। তাহার গুণই অনুভূত হয়, এবং গুণসকল নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। চিরস্থায়ী "সৎ" অজ্ঞানের বিজ্ম্ভনা মাত্র। তাহা কখনও দৃষ্টিগোচন হয় না। এই সকল গুণ কোনও স্থায়ী বস্তুতে আবির্ভূত হয় না, তাহারা তাহাদিগের হইতে ভিন্ন কোন বস্তুর গুণ নহে। গুণ হইতে স্বতন্ত্র কোনও কিছুর অস্তিত্বই নাই। আছে কেবল ক্ষণস্থায়ী গুণ সকল। গুণ সকল নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নিত্য পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহারা সত্য। জৈন মত এই দুই মতের মধ্যবর্ত্তী। এই মতে গুণের কেবল অস্তিত্ব আছে, তাহাদের আধারে অস্তিত্ব নাই, ইহাও যেমন সত্য নহে, তেমনি বস্তু আছে, কিন্তু তাহাদের গুণ নাই, ইহাও সত্য নহে। দুই মতেই আংশিক, সত্য আছে, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে (১) তাহার কতকগুলি ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়, (২) কতকগুলি নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় এবং (৩) কতকগুলি ধর্ম্মের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। বস্তুর ধর্ম্ম প্রতিক্ষণে যে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা সত্য, কিন্তু সকলগুলি পরিবর্ত্তিত হয় না, কতকগুলির মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে। যখন মৃত্তিকা পিণ্ড হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়, তখন মৃত্তিকার পিণ্ডত্বের ধ্বংস হয়, কিন্তু মৃত্তিকা মৃত্তিকাই থাকে। পিণ্ডরূপ ঘটরূপের উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হয়। বস্তুর কতকগুলি ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তিত থাকে বলিয়া বস্তু স্থায়ী। যখন স্বর্ণখণ্ড অলংকারের রূপ ধারণ করে, তখন যে সকল ধর্ম্মের আধার স্বর্ণ, তাহাদের পরিবর্ত্তন হয় না। প্রত্যেক বস্তুর এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহা শত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অপরিবর্ত্তিত থাকে। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একটি অপরিবর্ত্তিত অংশ বর্ত্তমান। সুতরাং 'সতে'র স্বরূপ সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তমানও নহে, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তমানও নয়। প্রতিক্ষণে তাহার কতকগুলি ধর্ম্ম তিরোহিত হইতেছে এবং কতকগুলি নূতন ধর্ম্ম তাহাতে সংযোজিত হইতেছে। যে সকল ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় না তাহার বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম, যাহাদের পরিবর্ত্তন হয় তাহারা আপতিক (তটস্থ)। চৈতন্য আত্মার স্বরূপগত ধর্ম্ম। তাহার বিনাশ নাই। কিন্তু সুখ, দুঃখ, কামনা, ইচ্ছা প্রভৃতি আপতিক। দ্রব্যের সকল পরিবর্ত্তনই আপতিক গুণ সকলের পরিবর্ত্তনের ফল। আপতিক ধর্ম্মের অভিধান "পর্য্যায়."। "গুণ-পর্য্যায়বদ্ দ্রব্যম্"। যাহার গুণ ও পর্য্যায় আছে, তাহাই দ্রব্য। বৌদ্ধ মত ঐকান্তিক বহুত্ববাদী (absolute pluralisn), বেদান্ত ঐকান্তিক অদ্বৈতবাদী (absolute monism), জৈন মত আপেক্ষিক বহুত্ববাদী (Relative Pluralism)। জৈন মতে প্রত্যেক বস্তুই অনেকান্ত (ন × একান্ত); কোনও বস্তু-সম্বন্ধে কিছুই অনপেক্ষ অর্থাৎ ঐকান্তিক ভাবে বলা যায় না। কোনও বস্তু-সম্বন্ধে যাহাই বলা যায়, তাহা ঐকান্তিক সত্য নহে, আপেক্ষিক ভাবে সত্য। তাহার সত্যতা কতকগুলি প্রতিবন্ধের (condition) অপেক্ষা করে। তাহা স্থান, কাল, অবস্থা এবং আরও বহু প্রতিবন্ধকর্ত্তৃক সীমিত।

প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম্ম অসংখ্য। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই কেবল সমস্ত ধর্ম্মের জ্ঞান এক সঙ্গে লাভ করিতে পারেন; বস্তু ও তাহার সকল ধর্ম্ম এক সঙ্গে তাহার জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যাহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ তাহারা সকল বস্তুরই এক একটি বিভাব এক সময় দেখিতে পান। সুতরাং কোনও বস্তু-সম্বন্ধে তাহারা যাহা বলেন, তাহা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই প্রসঙ্গে জৈন দার্শনিকগণ এক উদাহরণের উল্লেখ করেন। কয়েকজন অন্ধলোকের মধ্যে হস্তীর স্বরূপ লইয়া তর্ক হইয়াছিল। একজন, যে তাহার পদস্পর্শ মাত্র করিয়াছিল, সে কহিল, হস্তী একটী স্তম্ভের ন্যায়। আর একজন তাহার কর্ণস্পর্শ করিয়াছিল। সে বলিল তাহা "কুলা"র ন্যায়। তৃতীয় ব্যক্তি তাহার দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। সে কহিল হস্তী পর্ব্বতের ন্যায়। চতুর্থ ব্যক্তি শুঁড় স্পর্শ করিয়াছিল। সে কহিল হস্তী স্থুল লতার ন্যায়। প্রত্যেক বর্ণনাই আংশিক সত্য, কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিভিন্ন দর্শনে জগতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। জগতের বহু বিভাবের মধ্যে এক একটি বিভাব এক এক দার্শনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বিশ্বের যাবতীয় বিভাব কাহারো দৃষ্টিতে পড়ে নাই। হস্তীর বিভিন্ন বর্ণনার ন্যায় প্রত্যেক দর্শনই যে সত্য হইতে পারে. তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন নাই। জগৎ বিভিন্ন দ্রব্যের সমবায়ে গঠিত। জগতের উপাদান-ভূত দ্রব্যসকলের স্বরূপ গুণ চিরস্থায়ী,' সুতরাং জগৎও চিরস্থায়ী। উপাদান-দিগের "পর্য্যায়" সকল অস্থায়ী; সুতরাং জগৎ পরিবর্ত্তনশীলও বটে। বিশ্বের মধ্যে স্থায়ী কিছুই নাই, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বৌদ্ধদিগের এই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ জৈন দার্শনিকদিগের মতে ভ্রান্ত। আবার বৈদান্তিকগণ যে পরিবর্ত্তনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া, এক অপরিবর্ত্তনীয় 'নিত্য' পদার্থই স্বীকার করেন, ইহাও জৈন মতে ভ্রান্ত। উক্ত দ্বিবিধ 'মতের প্রত্যেকেই "সতে"র "এক অন্তে" আবদ্ধ এবং আভাসিক (fallacious)। বিশ্ব ও তাহার উপাদান অপরিবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তী—উভয় বর্ণনাই সত্য।

জৈন মতে দ্রব্য সৎ। সতের ধর্ম্ম তিনটি, (১) স্থায়িত্ব, (২) উৎপত্তি, (৩) লয়। দ্রব্যের এক অংশ অপরিনামী, তাই দ্রব্য স্থায়ী। তাহার এক অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং তাহার স্থলে নূতন অংশের উৎপত্তি হয়। দ্রব্যে সতের তিন ধর্ম্মই বর্ত্তমান, সুতরাং দ্রব্য সৎ।

লীলা নাটক

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের বাস-কক্ষ। রামকৃষ্ণ কতিপয় ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। তাহার ভিতর মাড়োয়ারী ভক্ত লছমীনারায়ণও আছেন।

রামকৃষ্ণ॥ যত মত তত পথ। যেমন এই কালীবাড়ীতে আসতে হ'লে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা বিভিন্ন লোকের সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

জনৈক ভক্ত॥ তাহ'লে কোন ধর্ম বড়—এ নিয়ে এত মারামারি কেন?

রামকৃষ্ণ॥ ঐ ভুলই তো আমরা করছি। যেমন জল এক পদার্থ—দেশ, কাল পাত্র-ভেদে তার ভিন্ন নাম হয়। বাঙ্গালা দেশে জল বলে, হিন্দীতে পানি বলে, ইংরাজীতে ওয়াটার বা একোয়া বলে। পরস্পরের ভাষা না জানা থাকলে কারুর কথা কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু জানলে আর ভাবের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না। আসল কথা হ'লো মায়ার বন্ধন কাটিয়ে ভগবানে ডুবতে হবে। (ভিখারীর প্রতি) গা'নারে পাগ্‌লা—সেই গানটা—

ভিখারীর গান

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
(ওরে) খোঁজ্ খোঁজ্ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন
(আবার) দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ!
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গি, চালায় আবার সে কোন জন
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ।

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল

রামকৃষ্ণ॥ যাও, সব আরতি দেখে এসো। গিয়ে দেখো, কলকাতা থেকে আরো সব কত ভক্ত এসেছে।

সকলেই আরতি দেখিতে চলিয়া গেল—গেল না শুধু মাড়োয়ারী ভক্ত লছ্‌মিনারায়ণ

(লছমিনারায়ণের প্রতি) তুমি গেলে না যে বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ?

লছমিনারায়ণ॥ আপনার পায়ে আমার একটা আর্জি আছে।

রামকৃষ্ণ॥ কি আর্জি বাবা?

লছমিনারায়ণ॥ আমি দশ হাজার টাকা আপনার সেবার জন্য দিতে চাই ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ॥ (কথাটা শোনামাত্র রামকৃষ্ণ অত্যুচ্চ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন)

লছমিনারায়ণ॥ আপনার কোন কিচ্ছু অভাব না থাকে এইটা আমি চাই ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ॥ শালা, তুম্ হিঁয়াসে আবি উঠ্ যাও। তুম্ হাম্‌কো মায়াকা প্রলোভন দেখাতা হ্যায়?

লছমিনারায়ণ॥ আপ্ আভি থোড়া কাঁচা হ্যায়।

রামকৃষ্ণ॥ ক্যায়সা হ্যায়?

লছমিনারায়ণ॥ মহাপুরুষ লোগোকো খুব উচ্চ অবস্থা হোনেসে ত্যাজ্য গ্রাহ্য এক সমান বরাবর হো যাতা

হ্যায়, কোই কুছ দিয়া অথবা লিয়া উস্‌মে উন্‌কা চিত্তমে সন্তোষ বা ক্ষোভ কুছ নেই হোতা।

রামকৃষ্ণ॥ (ঈষৎ হাসিয়া) দেখ, আসিতে কিছু অপরিষ্কার দাগ থাকলে যেমন ঠিক ঠিক মুখ দেখা যায় না তেমনি যার মন নির্মল হয়েছে, সেই নির্মল মনে কামিনী-কাঞ্চন দাগ পড়া ঠিক নয়।

লছমিনারায়ণ॥ বেশ কথা, তবে হৃদয়, যে আপনার সেবা করে, না হয় তার নামে আপনার সেবার জন্য টাকা থাক।

রামকৃষ্ণ॥ না, তাও হবে না। কারণ, তার কাছে থাকলে যদি কোন সময় আমি বলি যে অমুককে কিছু দাও বা অন্য কোন বিষয়ে আমার খরচের ইচ্ছা হয়, তাতে যদি সে দিতে না চায় তখন মনে সহজেই এই অভিমান আসতে পারে যে, ও টাকা তো তোর নয়, ও আমার জন্য দিয়েছে। এও ভাল নয়। না বাপু, ও হবে না। তুমি এবার ওঠ দেখি। মন্দিরে গিয়ে দেখ—চাঁদের হাট বসে গেছে।

লছমিনারায়ণ॥ চাঁদের হাট?

রামকৃষ্ণ॥ কলকাতা থেকে সব সোনারচাঁদ ছেলেরা এসেছে। নরেন দত্ত, গিরীশ ঘোষ, রাম, হরিপদ, চুনী, বলরাম, মাস্টার, আঃ—গিয়ে একবার দেখ না। ওদের দেখলেও কাজ হয়।

লছমিনারায়ণ॥ আচ্ছা, আচ্ছা। প্রণাম লিজিয়ে।

রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান। অন্য দ্বারপথে যোগীন-মার প্রবেশ

রামকৃষ্ণ॥ এই যে যোগীন, তুমি কখন এলে?

যোগীন॥ (রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া) এসেছি তো কখন। তা এখানে দেখছি কেবল লোক আর লোক। প্রণাম করে যাব তারও জো নেই। তাতে দুঃখও নেই। নহবতে মা'র কাছে বসে মা'র কাজ করে দিচ্ছিলাম। দেখুন বাবা—মাকে আর দেশে যেতে দেবেন না। মা না থাকলে এ-রাজপুরীও মনে হয় আঁধার।

রামকৃষ্ণ॥ বুঝলে যোগীন, এইবার নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে সারদামণির সাতবার আসা হ'লো। শরীরটা ওর ভাল নয়। তার ওপর এই যাতায়াত। এক সময়ে হৃদুকে বলেছিলুম, তাই তো হৃদে, ও কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্য-জন্মের কিছুই করা হবে না। তা এখন দেখছি, ও অনেক এগিয়ে গেছে। যায় নি যোগীন?

যোগীন-মা॥ সে বাবা আপনি জানেন।

রামকৃষ্ণ॥ তা জানি বৈ কি। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অমঙ্গল হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে আসা। ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী—জ্ঞান দিতে এসেছে। মহাবুদ্ধিমতী। ওকি যে সে রে! ও আমার শক্তি।

সারদার প্রবেশ

সারদা॥ এই যে যোগীন-মা, তুমি এখানে! আরও কিছু পান সাজতে হবে এলাচ-মশলা দিয়ে—ভক্তদের জন্য।

রামকৃষ্ণ॥ (হাসিয়া) আর খালি চুণ-সুপুরি দেওয়াগুলো বুঝি আমার জন্যে!

সারদা॥ তা হোক। তুমি তো আপনজন। যাও গো যোগীন-মা।

যোগীন-মা॥ যাচ্ছি গো যাচ্ছি।

যোগীন-মার প্রস্থান

সারদা॥ এই নাও গো, তোমার পান।

রামকৃষ্ণ॥ আপনজন হাতে করে দিলে যা দেয় তাই মিষ্টি; কিন্তু তাই বা গিলতে পাচ্ছি কই। পেনেটি মচ্ছবে আমাকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে গেল। গিয়ে আমার গলার বেদনা বেড়ে গেল। একমাস ধরে ঘটা করে খুব চিকিচ্ছে তো করলে গো, কিন্তু কমলো না তো।

সারদা॥ তোমার জন্যে সকালে দুধ-ভাত, বিকেলে সুজির পায়েস করছি। এখন থেকে কিছুদিন এই খেয়ে দেখ। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ছেলেদের আসবার সময় হ'লো।

রামকৃষ্ণ॥ কি গো, আরও ছেলে চাও নাকি?

সারদা॥ কেন চাইব না? এমনি সব রত্নে মায়ের সংসার ভরে উঠুক।

রামকৃষ্ণ॥ রত্ন! তুমি চিনলে কি করে?

সারদা॥ আমার বারান্দার বেড়াতে একটা ফুটো করে রেখেছি, সেই পথে দেখি, তুমি রঙ্গরসের তুফান তোল—নাচ-গাও—আর তোমার চারপাশে চাঁদের হাট। কখনও রাখাল, শরৎ, লাটু—কখনও রাম, বলরাম, গিরিশ,

কেশব—আবার কখনও বা মাস্টার, যোগীন, পূর্ণ—আর, নরেন তো আছেই।

রামকৃষ্ণ॥ হুঁ বাবা, সবাইকে চেন দেখছি। তুমি রত্নগর্ভা গো—রত্নগর্ভা। আর ঐ নরেন—ও যেন সহস্রদল কমল। ওঁর তুলনা নাই।

সারদা॥ নাই-ই তো। নইলে যখন টাকার এত ঠেকা—তুমি বলে দিলে, যা ভবতারিণীর কাছে চাইলেই পাবি—তা কিনা তিনবারের একবারও টাকা চাইতে পারলো না! চাইলে শুদ্ধা ভক্তি!

রামকৃষ্ণ॥ তা আমি তো বলে দিয়েছি, ও না চাইলেও ওর মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। তা সংসারে টাকার দরকারও হয় বৈ কি। হ্যাঁ গা শোন, মাড়োয়ারী ভক্ত লছমীনারায়ণ দশ হাজার টাকা দিতে চাইছে। আমি নিতে পারবো নি বলায়—তোমাদের নামে দিতে চাইছে। তুমি নাও না কেনে?

সারদা। তা কেমন করে হবে? আমি নিলে ও টাকা তোমারই নেওয়া হবে। না, না, ও টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।

রামকৃষ্ণ। আহা। বাঁচালে—আমায় বাঁচালে সারদা, আমায় বাঁচালে…! দেখেছো, কি সুন্দর জোছনা উঠেছে—জানলায় এসে দেখো। আমি মন্দিরে চল্লুম।

রামকৃষ্ণের প্রস্থান

সারদা॥ ঠাকুর! তোমার ঐ জোছনার মত অন্তর নির্মল করে দাও। চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

১২৯২ সালের ভাদ্র মাস।

রামকৃষ্ণের কক্ষ। রামকৃষ্ণ গলায় প্রলেপ লাগাইয়া বিছানায় বসিয়া আছেন। জনৈক ভক্তের প্রবেশ

ভক্ত॥ কি হয়েছে ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ॥ (গলার প্রলাপ দেখাইয়া মৃদুস্বরে) এই দেখ না—ব্যথা বেড়েছে।

ভক্ত॥ শুনলুম সেদিন আপনি পেনেটি মচ্ছবে গিয়ে খুব ভিজেছেন, সেইজন্যেই বোধ হয় ব্যথাটা বেড়েছে।

রামকৃষ্ণ॥ (বালকের ন্যায় অভিমানভরে) হ্যাঁ, দেখ দেখি এই উপরে জল, নীচে জল, আকাশে বৃষ্টি, পথে কাদা, আর রাম কিনা আমাকে সেখানে নিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এলো! সে পাশ-করা ডাক্তার, যদি ভাল ক'রে বারণ করতো—তাহলে কি আমি সেখানে যাই। না বাপু, আমার গলায় লাগছে। তুমি বাপু দরজাগুলো ভেজিয়ে দিয়ে যাও তো, আমি একটু শোব।

ভক্তের তথাকরণ ও নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রস্থান। রামকৃষ্ণ দেহে গাত্রাবরণ দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সারদা পা টিপিয়া ঘরে আসিয়া তাঁহাকে তদ্রূপ অবস্থায় দেখিয়া দুধের বাটিটি জল চৌকির উপর নামাইয়া রাখিতেই শব্দ হইল

রামকৃষ্ণ॥ কে? লক্ষ্মী? তুই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা।

সারদা॥ হ্যাঁ যাবো। দুধ এনেছিলাম। তুমি যখন জেগে উঠেছ—দুধটা খেয়ে নাও গো।

রামকৃষ্ণ॥ আহা তুমি! তোমাকে, তুই বলে ফেলেছি—তোমাকে তুই বলে ফেলেছি। আমি মনে করেছিলাম—লক্ষ্মী। দেখ গো—কিছু মনে করো নি।

সারদা॥ সে কি গো! তুমি তো আর দেখে বলো নি। নাও ওঠ, এই দুধটুকু খেয়ে ফেল।

রামকৃষ্ণ॥ হ্যাঁ, এখন তো দুধই ভরসা। কব্‌রেজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এসে জল খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে গেল। হ্যাঁ গা, জল না খেয়ে কি পারবো?

সারদা॥ পারবে বৈ কি। নাও দুধের বাটিটা ধরো।

রামকৃষ্ণ। এতটা দুধ?

সারদা॥ কত আর! এক সের পাঁচ পো হবে।

গোলাপ মা প্রবেশ করিল

গোলাপ॥ আজ কেমন আছেন ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ॥ এই যে গোলাপ মা, এসো, এসো। হ্যাঁ গা, দেখে তো, আমার হাতে কত দুধ হবে বলো তো?

গোলাপ॥ তা ৫।৬ সের হবে বৈ কি!

রামকৃষ্ণ॥ (সারদার প্রতি) কি গো?

সারদা॥ গোলাপ জানে না, এখানকার মাপ গোলাপ জানবে কি করে?

গোলাপ॥ তা বটে, তা বটে!

রামকৃষ্ণ॥ হ্যাঁ গা, এ বাটিতে কত ধরে? ক' ছটাক, ক' পো?

সারদা॥ দুধ খাবে, তা ক' ছটাক—ক' পো—অত কেন? অত হিসেবে দরকার কি?

রামকৃষ্ণ॥ মতলবটা বুঝি বেশি দুধ খাইয়ে টেনে তোলা—তা হজম করতে পারব কি! দিয়েছ—খাচ্ছি। (দুধ পান করিয়া) নাও গো, হ'লো তো?

সারদা॥ আচ্ছা, আমি আসি। নরেনরা আসবে। ওদের খাবারটা করে রাখি।

সারদার প্রস্থান

রামকৃষ্ণ॥ শরীরটা সেরে উঠবে বলে ও ভুলিয়ে টুলিয়ে খাওয়ায়। তা আমার ভালই লাগে। ভাত বেশী দেখলে আমি আঁতকে উঠি। (গুপ্ত কথা বলার ভঙ্গীতে) তাই ভাত টিপে টিপে সরু করে দেয় সারদা! ও ভাবে আমি বুঝি না। কিন্তু বুঝি আমি সবই। কিন্তু তবু খাই—ওর অন্তরের ক্ষুধা মেটাতে। ঐ আবার আসছেন। তুমি এখন এসো।

গোলাপ-মা'র প্রস্থান ও সারদার পুনঃ প্রবেশ

সারদা॥ হ্যাঁ গা, দেখ আমার কি ভুল। দুধ খাইয়ে চলে গেলুম; কিন্তু ওষুধটা খাইয়ে যেতে ভুলে গেলুম।

রামকৃষ্ণ॥ ভুল তবে আরো হচ্ছে গো।

সারদা খলে ওষুধ মাড়িতে লাগিলেন

তুমি তো রোজ আমাকে খাইয়ে যাও। আজ ও মেয়েটাকে দিয়ে ভাতের থালা পাঠালে কেনে?

সারদা॥ জানি, ও মেয়েটি ভাল নয়। কিন্তু কী করব বলো? ওর মিনতি দেখে আমি 'না' বলতে পারলুম না।

রামকৃষ্ণ॥ সারা দিনের ভিতর ঐ একটিবার তুমি আস। ঘরোয়া দুটো কথা কইবার ঐটুকু সময়।

সারদা॥ সে কি আমি জানি না?

রামকৃষ্ণ॥ তবে আমার খাবার আর কোন দিন কারও হাতে দেবে না বলো—

সারদা॥ আমি কি তা চাই না? এত বোঝ, আর এটুকু বোঝ না? তবে এও তোমাকে বলে রাখছি, কেউ আমার কাছে মা বলে চাইবে, আর আমি তা দেব না—এমনটি কখনও হবে নি। তুমি তো খালি আমার একলার ঠাকুর নও, তুমি যে সকলের।

রামকৃষ্ণ॥ তা ঠিক, তা ঠিক। মা কি না—আকুল হয়ে কেউ কিছু চাইলে 'না' বলতে পার না।

সারদা॥ হ্যাঁ গা, কি অসুখ হ'লো—একি আর তোমার সারবে না?

রামকৃষ্ণ॥ সারা না সার', মা'র ইচ্ছা।

সারদা॥ ভক্তরা কেউ কেউ বলেন—তুমি যদি মা ভবতারিণীর কাছে একটিবার বলো 'আমায় ভাল করে দাও মা'—তবে এখুনি সব রোগ সেরে যায়।

রামকৃষ্ণ॥ রোগ সারাবার কথা বলবো কি গো? আগে দুএকদিন বলেছি, তরবারির খাপটা একটু মেরামত করে দাও। আজকাল আমিটাই খুঁজে পাচ্ছি না যে। যে-মন একবার সচ্চিদানন্দে দিয়েছি, তাকে আবার টেনে আনব এই হাড় মাসের খাঁচায়? নাঃ—

সারদা॥ তুমি আর কথা বলো না। মনে হচ্ছে তোমার গলায় লাগছে। ওবেলা তোমার ভালো খাওয়া হয় নি। এবেলা আমি সকাল সকাল খাবার করে দি।

রামকৃষ্ণ॥ (সারদার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া) কী আবার খাব? (সারদার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কী যেন ভাবিয়া) হ্যাঁ—এর পরে আর কিছু খাব না। কেবল পায়সান্ন—কেবল পায়সান্ন।

সারদা॥ (সশঙ্কচিত্তে) না, না, সে কি! কেবল পায়সান্ন কি গো? না, না, তুমি অমন কথা বলো না। তোমার কথা মিথ্যে হয় না সেই আমার ভয়। আমি তোমার মাছের ঝোল-ভাত রেঁধে দেবো, খাবে—শুধু পায়েস কেন?

রামকৃষ্ণ॥ (ভাবাচ্ছন্নকণ্ঠে) না—পায়সান্ন, পায়সান্ন—কেবল পায়সান্ন।

রামকৃষ্ণের ভাব-সমাধি হইল। সারদা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন

তৃতীয় দৃশ্য

নহবৎখানার সম্মুখভাগ। যোগীন-মা ও গোপাল-মা কথোপকথনরত।

যোগীন-মা॥ লক্ষণ আমি ভালো বুঝছি না।

গোলাপ-মা॥ আমিও না।

যোগীন-মা॥ ঠাকুরের নিজের কথা হুবহু সব মিলে যাচ্ছে। বার বার আমরা বলতে শুনেছি—"অনেক লোক যখন আমাকে দেবজ্ঞানে মানবে, শ্রদ্ধা ভক্তি করবে, তখনি এ শরীরের অন্তর্ধান হবে!" ভক্তের ভীড়টাতো দেখেছ? রাতদিন লোক গিস্ গিস্ করছে। এক একদিন দেখি—আর শিউরে উঠি।

গোলাপ-মা॥ ভীড় তো হবেই। লোকের আর দোষ কি! ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে কে না চায়? এমনি করেই তো সব পাপী-তাপী উদ্ধার হয় যোগীন। কিন্তু এই ভগবানকে আমাদের মধ্যে ধরে রাখতে পারবে কি? জানো যোগীন, চার-পাঁচ বছর আগে মাকে যা বলেছিলেন—সেও খুব ভয়ের কথা। আর তাও মিলে যাচ্ছে—অক্ষরে অক্ষরে।

যোগীন-মা॥ কি গোলাপ?

গোলাপ-মা॥ দেহ কখন রাখবেন—মাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—যখন দেখবে যার তার হাতে খাব—

যোগীন-মা॥ সে তো অনেকবার খেয়েছেন—কলকাতার সব নেমন্তন্নে।

গোলাপ-মা॥ যখন দেখবে কলকাতায় রাত কাটাব—

যোগীন-মা॥ তাও কাটিয়েছেন—ভক্ত বলরাম বসুর বাটীতে।

গোলাপ-মা॥ যখন দেখবে খাদ্যের অগ্রভাগ আর কাউকে দিয়ে বাকীটা খাব—

যোগীন-মা॥ সেও ঘটেছে। ঐ নরেন অজীর্ণ রোগে ভুগছিল—দক্ষিণেশ্বরে পথ্যের ব্যবস্থা হবে না বলে আসতো না। ঠাকুর ডেকে এনে যখন তা শুনলেন, তখন নিজের ঝোল-ভাতের অগ্রভাগ নরেনকে সকাল সকাল খাইয়ে বাকীটা নিজে খেয়েছিলেন। মা বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুর বললেন—ওতে কোন দোষ হবে না। তোমার নতুন করে রাঁধতেও হবে না।

গোলাপ-মা॥ তবেই দেখ—তার পরেই এমন অসুখ! ভয় হয় না?

রামকৃষ্ণের সেবক-ভক্ত লেটোর প্রবেশ

লেটো॥ মা! কোথায়?

যোগীন-মা॥ কি রে লেটো, বৌ-বাজার থেকে নাকি বড় ডাক্তার এসেছে ঠাকুরকে দেখতে?

সারদার প্রবেশ

লেটো॥ হ্যাঁ গো—রাখাল ডাক্তার। ঠাকুরের জিভ্ টেনে দেখলে। গলা দিয়ে রক্ত পড়েছে শুনে বাইরে এসে বললেম—বড় শক্ত ব্যারাম আছে। কি হবে মা?

গোলাপ-মা॥ তবে বাপু কলকাতায় নিয়ে যাওয়াই ভালো।

সারদা॥ নরেন—গিরিশ—ওরা নাকি সেই ব্যবস্থাই করেছে।

লেটো॥ ডাক্তার-সাব্ও তাই বলে গেলেন। শ্যাম-পুকুরে বাড়ী ভাড়া হোয়ে গেছে। ঠাকুরকে পথ্য খাইয়ে নিয়ে এখুনি আমরা রওয়ানা হোব।

সারদা॥ পথ্য আমি করে দিচ্ছি। তুমি জেনে এসো লেটো, আমি কি তোমাদের সঙ্গে যাব?

লেটো॥ না মা, ঠাকুর বলেছেন কলকাতার বাড়ীতে জায়গা হবে না। আপনি মা পথ্য করে দিন চট্‌পট্।

সারদা॥ কি পথ্য খাবেন—ডাক্তার কী খেতে বলেছেন?

লেটো॥ ডাক্তার সাব বললে—কী আর খাবেন! সাগু-টাগু খেতে না চান—এক পায়েস খেতে পারেন। ভাত আর চোল্‌বে না। রেঁধে দিন মা পায়েস। আমি গোছগাছ্ করে আসছি।

লেটোর প্রস্থান। সারদা সেইখানে বসিয়া পড়িলেন

যোগীন-মা॥ বসে পড়লে যে মা?

সারদা নিরুত্তর রহিলেন

গোলাপ-মা॥ ওঠ মা, যাও, চট্‌পট্ একটু পায়েস রেঁধে দাও।

সারদা তথাপি নিরুত্তর

যোগীন-মা॥ অতটা পথ যাবেন, এইখান থেকে একটু ভালো করে খাইয়ে দিতে হবে বৈ কি।

লক্ষ্মীর প্রবেশ

সারদা॥ লক্ষ্মী, যা তো মা, ঠাকুরের জন্য পায়েস রেঁধে দে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির।

লক্ষ্মী॥ আমি কি ভালো পারব মা? ঠাকুরের পথ্যি তুমিই রেঁধে দাও মা।

সারদা॥ আমি পারব না, আমি পারব না—পায়েস রাঁধতে আমি পারব না।

লক্ষ্মী চলিয়া যাইতেছিল

যোগীন-মা॥ দাঁড়াও বাছা।

লক্ষ্মী দাঁড়াইল

যোগীন-মা॥ তোমার কি হয়েছে বলো তো মা? এমন করে ভেঙে পড়লে চলবে কেন!

গোলাপ-মা॥ ভালো চিকিৎসার জন্যেই কলকাতা যাচ্ছেন। যাবার আগে তোমার হাতে পথ্য পাবেন না?

সারদা॥ না।

গোলাপ-মা॥ তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো?

সারদা॥ সে তোমরা বুঝবে না। লক্ষ্মী, তুই গেলি?

লক্ষ্মীর প্রস্থান

যোগীন-মা॥ এটা কি ভালো হ'লো মা?

সারদা॥ কেন তিনি আমাকে বলেছেন—এখন থেকে তিনি শুধু পায়েসই খাবেন! ডাক্তারও তাই বলছে। ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে—তোমরা বুঝছ না। পায়েস আমি রাঁধতে পারব না—পারব না।

সারদার প্রস্থান

যোগীন-মা॥ পথ্যের ব্যাপার নিয়ে কোন একটা মন-কষাকষি হয়েছে গোলাপ।

গোলাপ-মা॥ আমারও তাই মনে হচ্ছে। দেখ যোগীন, ঠাকুর বোধ হয় মা'র ওপর রাগ করে কলকাতা চলে যাচ্ছেন। আর তাই বোধ হয় সঙ্গে নিলেন না।

এই কথোপকথনের মধ্যে সারদা পুনরায় ইঁহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি পরবর্তী কথাগুলিও স্তব্ধ হইয়া শুনিলেন

যোগীন-মা॥ আমারও তাই মনে হচ্ছে গোলাপ। নইলে কলকাতার বাড়ীতে সবার জায়গা হবে—জায়গা হবে না শুধু মা'র?

গোলাপ-মা॥ তবেই দেখ! চলো, একবার গিয়ে দেখি।

যোগীন-মা॥ হ্যাঁ—চলো।

ঠাকুরের উদ্দেশ্যে উভয়ের প্রস্থান। সারদা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন

সারদা॥ গোলাপ ঠিকই বলেছে। আমার ওপর যদি রাগই না হবে—তবে কেন আমাকে ফেলে যান! কেন তাঁর পায়ে আমায় এতটুকু ঠাঁই তিনি দেন না!

বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভারতীয় গোজাতির ক্রমাবনতির ধারা

রায় বাহাদুর রাজেশ্বর দাশগুপ্ত আই-এ, এম-আর-এ-এস (ইংলণ্ড)

আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথম উত্তর ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তথা হইতে গঙ্গার গতি ধরিয়া ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ তখন অনার্য্যজাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল; সুতরাং পদে পদে আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐসকল সংঘর্ষে সচরাচর আর্য্যগণই জয়ী হইতেন এবং পরাজিত অনার্য্যগণকে বাঁধিয়া আনিয়া আপনাদের দাসত্বে নিয়োজিত করিতেন। ঐ অনার্য্যগণ শূদ্রনামে অভিহিত হইত। আর্য্যগণ ঐরূপ যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকাতে তাঁহাদের আহার্য্য সংগ্রহ এবং যাগ, যজ্ঞ, উপাসনা ইত্যাদি বিষয়ে নিতান্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময়েই কার্য্যবিভাগ করিয়া লওয়ার জন্য জাতিভেদের সূত্রপাত হয়। যাঁহারা যাগযজ্ঞ ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত রহিলেন তাঁহারা হইলেন ক্ষত্রিয়, আর যাঁহারা কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা সকলের খাদ্যের সংস্থান করিতে লাগিলেন তাহারা হইলেন বৈশ্য। বাকি অনার্য্যগণ দাসত্ব কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া শূদ্র নামে পরিচিত হইল। আহার্য্য সংগ্রহের ভার বৈশ্যগণের উপর পতিত হওয়াতে তাঁহারা আর্য্যগণের আনীত গোজাতির সাহায্যে হলকর্ষণ করিয়া আর্য্যগণের আহার্য্য উৎপন্ন করিতে লাগিলেন।

আর্য্যগণের সঙ্গে যে গোজাতি আনীত হইয়াছিল ভারতবর্ষের জলবায়ুর প্রভাবে তাহা ক্রমে ভিন্নভাবাপন্ন হইতে লাগিল। তৎকালে ভারতবর্ষের গোজাতির সংমিশ্রণে উহাদের মৌলিকত্ব নষ্ট হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বর্তমান সময়ে পাঞ্জাব অঞ্চলে "হিসার" বা "হান্সি" জাতীয় যে সকল গরু দেখিতে পাওয়া যায় সম্ভবতঃ ঐগুলি আর্য্যগণের দ্বারা আনীত গোজাতির বংশধর। ঐ সকল গরু যতই দক্ষিণে আসিতে আরম্ভ করিল, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ততই তাহাদের আকার ও স্বভাব বিকৃত হইয়া যাইতে লাগিল। আর্য্যগণ মধ্যএসিয়া হইতে উত্তর ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ স্থানের গরুই তাঁহারা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মধ্য-এসিয়া এবং উত্তর-ভারতের আবহাওয়ার মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে সুতরাং ঐ সকল গরু উত্তর-ভারতে থাকা পর্য্যন্ত তাহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতির বিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। মধ্য-ভারতে আসিয়া উহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং ক্রমে বঙ্গদেশে আসিয়া উহারা নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িল এবং উহাদের দুগ্ধদায়িকা শক্তিও কমিয়া গেল। বাংলাদেশের যতই দক্ষিণ অঞ্চলে যাওয়া যায় গরুর আকৃতি ততই ছোট এবং উহাদের দুগ্ধদায়িকা শক্তি ততই কম দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলি, বর্দ্ধমান অঞ্চলের গরুর উচ্চতা ৪০" হইতে ৪৪" ইঞ্চি এবং দুগ্ধের পরিমাণ /৪ হইতে /৫ সের। কিন্তু সিলেট, নোয়াখালী অঞ্চলের গরুর উচ্চতা ৩২" ইঞ্চি হইতে ৪০" ইঞ্চি এবং দুগ্ধের পরিমাণ বড় জোর /১ সের।

২০১২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশের গরুর যেরূপ দুগ্ধ-দায়িকা শক্তি এবং শ্রমসহিষ্ণুতা ছিল এখন আর তাহা নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—গো জাতির প্রতি দেশবাসীর অবিচার, অত্যাচার এবং অমনোযোগিতাই উহাদিগকে দৈনন্দিন ঐরূপ অবনতির দিকে টানিয়া আনিতেছে। গো জাতির অবনতি বিষয়ক প্রধান প্রধান কারণগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(১) গোজাতির অবনতির কারণ—উপযুক্ত জনক বৃষের অভাব—

বাংলাদেশের কৃষকগণের পালের গরুর সঙ্গে প্রায়ই বৃষ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃষ দ্বারা নানা কারণে চাষের কার্য্য ভাল হয় না বলিয়া উহারা ষণ্ডবাছুরগুলির মুষ্ক ছেদন করিয়া ঐগুলিকে বলদে পরিণত করিয়া ফেলে। জনন-কার্য্যের জন্য অন্ততঃ এক একটি বৃষ আপন আপন পালে রক্ষা করা কৃষকগণ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করে না; কারণ ঐ বৃষটির খাদ্যের জন্য সম্বৎসরে যে খরচ হয় তাহা উহারা নিতান্তই অপব্যয় বলিয়া মনে করে। এদেশের হিন্দুগণ পূর্ব্বে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে শাস্ত্রোক্ত বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত ষাঁড় উৎসর্গ করিয়া তাহা ধর্ম্মের নামে ছাড়িয়া দিত।

ঐসকল ষাঁড় স্বাধীনভাবে আহার বিহার করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট হইত এবং ঐ সকল বিপুলকায় ষণ্ড দ্বারাই স্থানীয় গাভীগণের গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। মুসলমানগণের মধ্যেও খোদার নামে ঐরূপ বৃষ ছাড়িয়া দেওয়ার নিয়ম ছিল, সুতরাং তখন গাভী ঋতুমতী হইলে গর্ভাধানের জন্য গৃহস্থগণের বিশেষ কোন চিন্তার কারণ ছিল না। এখন দেশবাসীর আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার ব্যয় সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এখন যাহারা বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করেন তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই অল্পমূল্যে রুগ্ন "এঁড়ে" বাছুর ক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা নিয়ম রক্ষা করেন মাত্র, কিন্তু ঐ সকল বাছুর এখন আর ধর্ম্মের নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না উহা ঐ শ্রাদ্ধকার্য্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হয়।

বর্ত্তমান সময়ে ক্বচিৎ কোন হিন্দু বা মুসলমান গৃহস্থ ২।১টি এঁড়ে বাছুর ঐরূপ ধর্ম্মের নামে বা খোদার নামে ছাড়িয়া দেয় বটে কিন্তু উহারা কৃষক সাধারণের সহানুভূতির অভাবে এমন কি অত্যাচারে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে এবং উপযুক্ত খাদ্যাভাবে স্বাভাবিকরূপে গঠিত ও

বৰ্দ্ধিত হইতে পারে না। পূর্ব্বে ধর্ম্মের ষাঁড় কাহারও শস্তের অনিষ্ট করিলে তাহারা ঐগুলিকে তাড়াইয়া দিয়াই ক্ষান্ত থাকিত কিন্তু অধুনা কৃষকগণ অনেক সময়ে ঐগুলির প্রতি নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। উহাদের দ্বারা শস্তের অপচয় হইলে অনেক সময়ে অস্ত্র দ্বারা উহাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া অঙ্গহানি করিয়া দেয়। অনেক সময়ে ৩।৪ দিবস অনাহারে বাঁধিয়া রাখিয়া মৃতপ্রায় হইলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আবার কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত নিরীহ বৃষগুলিকে লাঙ্গলে জুড়িয়া দিয়া সারাদিন উহাদের দ্বারা হলকর্ষণ করে। উহাদের প্রতি অত্যাচারের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে না, কোন কোন স্থানের নৃশংস মুসলমান কৃষকগণ আবার দলবদ্ধ হইয়া ঐগুলিকে হত্যা করে এবং বণ্টন করিয়া আপনাদের ভোজের কার্য্যে লাগায়। তৎপরে সকলে চাঁদা করিয়া অতি অল্প মূল্যে একটি এঁড়ে বাছুর ক্রয় করে এবং ঐ ষণ্ডের পরিবর্ত্তে উহা ছাড়িয়া দেয়। ঐ সকল কারণে এখন গাভীর গর্ভাধানের জন্য ৫।৭ গ্রামের মধ্যেও একটি ষাঁড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বে এদেশের কলুগণ ষণ্ডদ্বারা ঘানি চালাইত এবং অর্থ বিনিময়ে ঐ ঘানির ষাঁড় দ্বারা স্থানীয় গাভীসমূহের গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। যদিও ঘানি চালাইবার দরুণ উহাদের স্বাভাবিক সন্তান উৎপাদন শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যাইত, তথাপি উহাদের দ্বারা যথাসময়ে গাভীগণের ঋতু-রক্ষা হইতে পারিত। বর্ত্তমান সময়ে তৈল নিষ্কাষণের জন্য বাষ্পীয় কলের প্রচলন হওয়াতে প্রতিযোগিতায় দেশীয় ঘানি এক-প্রকার লোপ পাইয়াছে।

কচিৎ কোন স্থানে ব্যবসায় হিসাবে কেহ কেহ জনন কার্য্যের জন্য বৃষপোষণ করিয়া থাকে। স্থানীয় লোকের গাভী ঋতুমতী হইলে অর্থ বিনিময়ে ঐ সকল বৃষের নিকটে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু অতিরিক্ত মৈথুন দ্বারা ঐ সকল ষণ্ড এইরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে উহাদের দ্বারা অনেক সময়ে গাভার ঋতুরক্ষা হয় না এবং হইলেও উত্তম শাবকের আশা করা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে জননোপযোগী ষণ্ডের অভাব এদেশের গো-জাতির অবনতির একটি প্রধানতম কারণ।

(২) খাদ্যের অল্পতা

পূর্ব্বকালে গোষ্ঠ বা গোচারণের মাঠ বলিয়া প্রতি গ্রামেই অল্পবিস্তর পতিত জমি থাকিত। রাখালগণ ভোরে উঠিয়া আপন আপন গরু লইয়া তথায় চরাইতে যাইত। গরুগুলি স্বেচ্ছামত তথায় বিহার করিয়া ঘাস দ্বারা উদর পূরণ করিত, রাখালগণ তাহাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিত এবং সন্ধ্যাবেলা আহারের ফলে গরুগুলির উদর পূর্ণ হইলে উহাদিগকে লইয়া বাড়ী ফিরিত। ঐ সময়ে গৃহস্থের অবস্থা অনুযায়ী উহাদিগকে একবার জাব খাওয়াইয়া অথবা না খাওয়াইয়াই বাঁধিয়া রাখা হইত। বর্ত্তমান সময়ে বাংলার যে সমস্ত জেলাতে পাট জন্মে সে সকল জেলার অধিকাংশ গ্রামেই গোচারণের জন্য এককাঠা ভূমিও পতিত দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষকগণের বাড়ীর নীচে গরু দাঁড়াইবার জন্য যে "কোলা" বা "পালান" জমি পূর্ব্বে পতিত অবস্থায় থাকিত এখন তাহাও পাটচাষের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। নিতান্ত অসুবিধা হয় বলিয়া, নতুবা কৃষকগণ তাহাদের বাটীর অঙ্গনে পাটের চাষ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। পূর্ব্বে গবাদির যাতায়াতের জন্য মাঠের ভিতর দিয়া যে সকল "গোবাট" বা "হালট" ছিল তাহার পরিসর ১৬ হইতে ৮ হাতের কম ছিল না।

রাখালগণ উহাতেও রীতিমত গরু চরাইতে পারিত। বর্ত্তমান সময়ে কৃষকগণ দুইপাশ হইতে উহা নিজ নিজ ক্ষেত্রের সামিল করিয়া লইয়া এতদূর সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে যে, উহার উপর দিয়া লাঙ্গলসহ লোক যাতায়াত করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে ক্ষেত্রের আইলকে "হাত আইল" বলে—উহার পরিসর এক হস্ত পরিমাণ ছিল বলিয়াই উহাকে "হাত আইল" বলা হইত। অনেক সময়ে রাখালগণ গরুর দড়ি ধরিয়া অতি সন্তর্পণে দুই পাশের শস্য রক্ষা করিয়া উহাতে গরু চরাইত। ঐরূপ একখানা বড় ক্ষেত্রের চারিপাশের আইল ঘুরিয়া আসিলে একটি গরুর উদর পূরণ হইয়া যাইত।

বর্ত্তমান সময়ে কৃষকগণের ক্ষেত্রের আইলের অবস্থা এইরূপ সংকীর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে উহার উপর দিয়া চলিবার সময় পা টিঁকিতে চাহে না। এইরূপে কৃষকগণ নানাদিক দিয়াই গরুগুলিকে তাহাদের খাদ্য গ্রাস হইতে বঞ্চিত করিতেছে, অথচ উহাদের উদর পূরণের জন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থাও করিতেছে না। এ অবস্থায় এদেশের গোজাতি যে দিন দিন অবনতির দিকে অগ্রসর হইবে তাহা আর বিচিত্র কি! মাঠে না চরাইয়াও গরুর উন্নতি হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে গরুর খাদ্যের জন্য যে পরিমাণ খরচ করিতে হয় ঐ খরচ বাংলা দেশের দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে চালাইয়া উঠা সম্ভবপর হয় না এবং অর্থনীতির দিক দিয়া দেখিলেও উহাতে "ধূপের দামে মনসা বিক্রি" হইয়া যায়। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাংলাদেশের গাভীর দুগ্ধ দায়িকা শক্তি কম সুতরাং ইহাদিগকে মাঠে চরিতে না দিয়া বাড়ীতে বাঁধিয়া খাওয়াইলে সম্বৎসরে যে পরিমাণ খরচ হয়, তাহার সহিত তুলনা করিলে ঐ গাভী প্রদত্ত সম্বৎসরের দুগ্ধের মূল্য মোটেই লাভজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গে বর্ষার সময় ৪।৫ মাস লাঙ্গলের কার্য্য বন্ধ থাকে, সুতরাং বলদগুলিদ্বারা ঐ সময় কোন-প্রকার উপার্জ্জন হয় না। এমতাবস্থায় উহাদিগকে বারো মাস বাঁধিয়া খাওয়াইতে যে খরচ হয় সে পরিমাণ উপার্জ্জন উহাদের দ্বারা সম্ভবপর নহে। উল্লিখিত কারণ পরম্পরা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে বঙ্গদেশে গো-চারণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পতিত ভূমির একান্ত আবশ্যক।

(৩) অপালন বা পরিচর্য্যার ত্রুটি

বাংলাদেশের গরুর অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, বাঙ্গালী গরুর পরিচর্য্যা করিতে জানে না অথবা জানিলেও তাহারা উহার আবশ্যকতা সম্যক্ উপলব্ধি করে না। বাংলাদেশের প্রবাসী অথবা উপনিবেশী হিন্দুস্থানী বা পাঞ্জাবীগণ দ্বারা পালিত গরু এবং বাঙ্গালার পালিত গরুর আকৃতি,

'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
- এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP

শ্রমসহিষ্ণুতা এবং দুগ্ধদায়িকা শক্তির বিষয়ে তুলনা করিলেই এ বিষয়টি সহজে প্রমাণ হইতে পারে। বাঙ্গালী ভিন্নস্থান হইতে একটি হৃষ্ট-পুষ্ট এবং অধিক দুগ্ধবতী গাভী, উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিলেও তাহার অপালনের দোষে সম্বৎসরের মধ্যে উহার পঞ্জরের হাড় বাহির হইয়া পড়ে এবং পিছনের দিক সরু হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, কোন পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানী অল্পমূল্যে একটি বাংলা দেশীয় ক্ষীণকায় গরু ক্রয় করিলেও তাহার রীতিমত পরিচর্য্যার ফলে সম্বৎসরের মধ্যেই উহার পঞ্জরাস্থি ঢাকিয়া গিয়া পশ্চাদ্ভাগ নিটোল হইয়া উঠে। ইহাদ্বারা বোঝা যায় বাংলাদেশের গরুর অবনতি কেবল আবহাওয়ার দোষেই হইতেছে না, ইহার প্রধান কারণ রীতিমত পরিচর্য্যার অভাব।

আরও দেখিতে পাওয়া যায় গৃহস্থগণের মধ্যে যাহারা সাধারণতঃ ২।১টি গরু পোষণ করেন তাহাদের গরুগুলি সাধারণতঃ একটু শ্রীসম্পন্ন হয়, পক্ষান্তরে এক পালে অধিক গরু থাকিলে উহাদের প্রায় সমস্তগুলিই কঙ্কালসার অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ দুই একটি গরুর রীতিমত পালন ও পরিচর্য্যা করা একজন গৃহস্থের পক্ষে যেমন সাধ্যায়ত্ত, একসঙ্গে অনেকগুলি গরুর পালন ও পরিচর্য্যা করা তেমন সাধ্যায়ত্ত নহে কিন্তু সচরাচর বাঙ্গালী কৃষকগণের বাড়ী হইতে "হেলে" বলদ ও গাভীতে মিলিয়া ছোটখাটো এক এক পাল গরু বাহির হইতে দেখা যায়। গৃহস্থ মনে করে অনেকগুলি গরু রাখিলে অনেক কাজ এবং অনেক দুগ্ধ পাইবে। আর গরুর সংখ্যা বেশী হইলে গৃহস্থ হিসাবেও তাহার নাম জাহির হইবে। এক্ষেত্রে যাহার ৪টি গরু পোষণ করিবার মত অবস্থা আছে, তাহার পালে ৮টি গরু থাকিলে সবগুলিই অর্দ্ধাহারে থাকিয়া দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাংলা দেশের যে সকল জেলাতে পাট জন্মে ঐ সকল জেলার পল্লীগ্রামে গোচারণের জন্য পতিত জমি একপ্রকার নাই বলিলেই হয় এবং পাটের চাষে জল আবদ্ধ থাকাতে ধানের চাষ বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে সুতরাং ঐ সকল স্থানে গরুর অন্যতম খাদ্য বিচালিও অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন ঐ সকল জেলার পল্লীগ্রামের ব্যবসায়ীগণ ভিন্ন স্থান হইতে নৌকাযোগে বিচালি খরিদ করিয়া আনিয়া গৃহস্থগণের নিকট ওজন দরে বিক্রয় করে। ঐভাবে খড় ক্রয় করিয়া গরুকে খাওয়াইতে হইলে একটি সাধারণ গরুর জন্য বৎসরে ৩০।৩৫ টাকার খড়ের প্রয়োজন হয়, অথচ ঐরূপ খরচ করিবার সামর্থ্য এদেশের সাধারণ গৃহস্থগণের নাই। সুতরাং দেশের গরুগুলি গোচারণ ভূমির অভাবে যেমন কাঁচা ঘাস হইতে বঞ্চিত তেমন উপযুক্ত পরিমাণ খড়ের অভাবে 'শুক্‌না ঘাস' হইতেও বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

মাঠের কাঁচা ঘাস না পাইলে গরুর জাবরের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে হয়। এদেশের সকল গৃহস্থের বাড়ীতে গরুর জাবের বন্দোবস্ত নাই। বড় জোর সন্ধ্যাবেলা মাঠ হইতে ফিরিয়া আসার পর জলের সঙ্গে বা ভাতের মাড়ের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ শুক্‌না খড় কাটিয়া দেওয়া হয়। রীতিমত খৈল, ভুষি খড় সহযোগে তৃপ্তিদায়ক জাব খাওয়া অতি অল্প গরুর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ সদ্য-প্রসূত গাভাগুলিকে, দুগ্ধের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য সকল গৃহস্থই অল্প বিস্তর জাব দিয়া থাকে কিন্তু দুধ কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই জাবের ব্যবস্থা চুকিয়া যায়। "হেলে" বলদগুলিকে হালে জুতিবার পূর্ব্বে ভোরবেলা একবার শুক্‌না বিচালি ও জল দ্বারা জাব দেওয়া হয়। পরে দুপুরবেলা চাষীগণ যখন মাঠে বসিয়াই মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করে ঐ সময়টা উহারা একটু 'জিরেণ' পায় কিন্তু উহাদের জন্য কোন প্রকার খাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে না। নিকটে জল থাকিলে একবার জলপান করে এবং অভ্যাস দোষে আশে পাশের ঘাস কামড়াইয়া বেড়ায় চাষীদের খাওয়া শেষ হইলেই পুনরায় উহাদিগকে লাঙ্গলে জুতিয়া দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যার সময় ছুটি পায়। বাড়ী পৌছিলে আবার পূর্ব্ববৎ জল ও বিচালি সংযোগে জাব দেওয়া হয়। সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম এবং পাঁচনীর প্রহারের পরিবর্ত্তে তাহারা যে খাদ্য পায় তাহা উহাদের পক্ষে যেমন অপ্রচুর তেমনই অসার। এইরূপ অপরিচর্য্যার ফলে যখন তাহাদের কার্য্য করিবার শক্তি একেবারে লোপ পায় তখন উহাদিগকে হাটে লইয়া বিক্রয় করা হয়। ইহার পর তাহাদের যে গতি হয় তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

(৪) গো-বৎসের হতাদর

গোজাতির ভবিষ্যৎ বংশধর বাছুর। সুতরাং বাছুরগুলিকে যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া সুস্থ ও সবল রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে উহা ভাল গরুতে পরিণত হইতে পারে কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সম্বন্ধে গোড়াতেই গলদ। সচরাচর এদেশের লোকে মনে করে—দুগ্ধের জন্যই যখন গাভী পালন করা তখন উহা হইতে যত বেশী দুধ আদায় করা যায় ততই লাভ। বাছুরের যে তাহার মাতৃস্তন্যের উপর একটা ন্যায্য দাবী আছে সে বিষয়টি তাহারা একেবারে ভুলিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় বাছুরকে তাহার মাতার নিকট হইতে পৃথক করিয়া রাখা হয়, সমস্ত রাত সে উপবাসী থাকে। পরদিন প্রহরেক বেলা উত্তীর্ণ হইলে গাভাটিকে নিঃশেষে দোহন করিয়া বাছুর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তখন বাছুরটি মাতার নিঃশেষিত প্রায় বাঁট চাটিয়া সামান্য যাহা কিছু আদায় করে তাহা তাহার শরীরে পোষণের পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে। ঐ অবস্থায় দুগ্ধপোষ্য বাছুরগুলি বাধ্য হইয়া ঘাস খাইতে আরম্ভ করে এবং অনেক সময় শৈশব অবস্থাতেই মরিয়া যায়। আর যেগুলি বাঁচিয়া থাকে সেগুলি তথাকথিত দেশী গরুতে পরিণত হয়।

আবার এক শ্রেণীর গৃহস্থ আছে তাহারা বাজারে দুগ্ধ বিক্রয় না করিয়া গোয়ালার নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইয়া দুগ্ধ বিক্রয় করে। গোয়ালা প্রতিদিন গৃহস্থের বাড়ী আসিয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়। এক একজন গোয়ালা এইরূপ প্রতিদিন বিভিন্ন স্থানে ৪০।৫০টি গাভী দোহন করে, সুতরাং গোয়ালা আসিয়া দুগ্ধ দোহন না করা পর্য্যন্ত বাছুরটিকে অন্ততঃ বেলা দুই প্রহর আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকিতে হয়। ইহার পর সাধারণ গৃহস্থ যে গরু হইতে অন্ততঃ /১ সের দুগ্ধ দোহন করে, গোয়ালা সেই গরু হইতে অন্ততঃ /১।০ সের দোহন না

করিয়া ছাড়ে না। এক্ষেত্রে বাছুরের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়ায় তাহা সহজেই অনুমেয়। ফলতঃ ঐ অবস্থায় অধিকাংশ বাছুরই মরিয়া যায়।

(৫) গোশালার কদর্য্যতা

আমাদের দেশের গোশালা বা গোহালগুলি গোজাতির অবনতির অন্যতম কারণ। এদেশে সাধারণতঃ যে সকল গোশালা প্রস্তুত করা হয় তাহাতে বায়ুচলাচলের কোন প্রকার ব্যবস্থা থাকে না। একদিকে একটিমাত্র দরজা থাকে, তাহাও রাত্রিকালে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ঐরূপ একটি গোহালে একসঙ্গে অনেকগুলি গরু রাত্রিযাপন করে। তার পর মশক নিবারণের জন্য ঐ আবদ্ধ গৃহে সমস্ত রাত্রি ধূমের বন্দোবস্ত থাকে। এই ক্ষেত্রে গরুগুলির অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় তাহা সহজেই অনুমেয়। গরুগুলির শয়নের স্থান অত্যন্ত উচ্চাবচ এবং গর্ত্তবহুল থাকাতে ঐ স্থানে চোনা এবং গোবর আটকাইয়া গিয়া রীতিমত কর্দ্দমে পরিণত হয়। গরুগুলি উহার উপরে শয়ন করিয়াই রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হয়। গোহালের আবর্জ্জনা এবং গোবর ইত্যাদি পচাইয়া যে সব সার প্রস্তুত করা হয় ঐ সার প্রস্তুতের গর্ত্ত গোহালের এত নিকটে থাকে যে উহার দুর্গন্ধেও গরুগুলির স্বাস্থ্যহানি হয়। অতএব দেখা যাইতেছে এদেশের গোজাতির আহার এবং শয়নের যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে তাহা তুল্যরূপে উহাদের জীবনধারণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে। অতএব এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় বাঁচিবার জন্য তাহাদের যে অতিরিক্ত জীবনী-শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা যে তাহাদের অবনতির পথে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিতেছে, এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক নহে। তবে, আশা হয় অবনতির যে কারণগুলি প্রধানতঃ পর্য্যালোচিত হইল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া ঐ কারণগুলি যথাসাধ্য নিবারণ ও প্রতিরোধ করিতে পারিলে আবহমানকালের শতবাধা সত্ত্বেও ভারতীয় গোজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবপর হইবে।

যক্ষের প্রত্যাবর্ত্তন

· অমল মুখোপাধ্যায়

খোল্ বধূ দ্বার দেখ্‌রে চেয়ে
অঞ্চলে মুছি অশ্রুনীরে,
নির্ব্বাসনের নিশিভোরে আমি
বিরহী যক্ষ এসেছি ফিরে।
ছাড়ি' তব দুখ-শয়ন ধূলার
বাঁধো লুণ্ঠিত কুন্তল-ভার,
বিষাদের অবগুণ্ঠনে আর
মুখ-পারিজাতে রেখোনা ঘিরে।

আষাঢ়ের মেঘে বছরে বছরে
মোর ব্যথা-বাণী দিয়েছি আঁকি,'
(মোর) চাতক-পরাণ প্রেমবারি যাচি'
বক্ষ চিরেছে তোমারি লাগি।
বিরহের কত নদ-নদী আর
বন-পর্ব্বত-মরু হ'য়ে পার
সার্থক হ'ল মোর অভিসার
আজি এ প্রেমের তীর্থ-তীরে॥
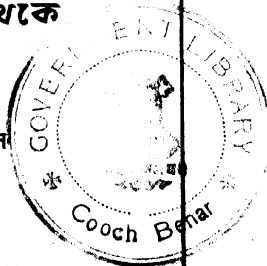
মানবমুক্তির মহাকবি

ফ্রউলাইন সোনিয়া ফ্যাঙ্ক্‌হানেল্‌

পরিচয় :—ইনি পশ্চিম জার্মানীর একটি বিদুষী কুমারী। এঁর পিতা ইঞ্জিনীয়ার। কর্মোপলক্ষে ভারতে আছেন। কুমারী ফ্যাঙ্কহানেল্‌ প্রতিভাশালিনী। তিনি ভারতীয় ভাষা শিখেছেন। বাংলা বলতে ও লিখতে ভালই পারেন। আবৃত্তি ও অভিনয়ে ইনি বিশেষ পারদর্শিনী। এঁর অসাধারণ কাব্য-প্রীতি ও সাহিত্যানুরাগ দেখে বিস্মিত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ইনি মূল বাংলা থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন— ভাঃ সঃ

বিশ্বের ঐতিহাসিক যুগ পরিচয়ে যে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে নেদারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অর্জনই আমার মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীকে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম করে তুলেছিল। যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির দীপ্ত নিষ্ঠুর অভিমান এবং শক্তিমত্ততার সাংঘাতিক লালসা আমাদের কাছে প্রশংসার দাবী করতে পারে, তবে নির্যাতিত মানবাত্মা যখন তার অপহৃত মহৎ অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম করে, আর সেই শুভ প্রচেষ্টায় পরস্পর মিলেমিশে একযোগে কাজ করায় অনভ্যস্ত জাতিগুলিও যখন একতাবদ্ধ হয় এবং বারংবার ব্যর্থতার ফলে তাদের মনে যে অবিচলিত পণ সুদৃঢ় হয়ে ওঠে যা, অত্যাচারীর ভয়াবহ নৃশংসতা ও অসম শক্তির দ্বন্দ্বেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়,—এ যে আরও কত বেশি গৌরবজনক একথা বলাই বাহুল্য।

এ কথা ভাবলেও বিপুল উৎসাহে মন ভরে ওঠে যে, শক্তির দম্ভে অন্যায়ভাবে পররাষ্ট্র অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অন্ততঃ একটা উপায় আমাদের আছে—যার প্রয়োগে মানুষের স্বাধীনতা-হরণের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকেও ব্যর্থ করে দেওয়া যায়। যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা দিতে পারলে উৎপীড়কের অপহরণার্থে প্রসারিত বলিষ্ঠ বাহুকেও দুর্বল করে ফেলা যায়। সংহত বীর্য ও অদম্য অধ্যবসায়ের গুণে শেষ পর্যন্ত যে কোনও ভীষণতম শক্তিকেও নিঃশেষ করে দেওয়া যায়। এ সত্য আমার মনে এমন সচেতন-ভাবে এর আগে আর কখনও প্রবেশ করতে পারেনি, যেমন করেছিল সেই স্মরণীয় বিপ্লবের ইতিহাস, যা পরস্পরের একতার বলে স্পেনের অধীনতা পাশ থেকে সংযুক্ত নেদারল্যাণ্ডকে মুক্তি দিয়েছিল। এদের এই একতার মহান ও স্মরণীয় দৃষ্টান্তটি তাই পৃথিবীর লোকের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা আমার কাছে অযোগ্য প্রমাণ বলে মনে হয়নি। আমার বিশ্বাস যে পাঠকদের অন্তরেও তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির একটা চিত্ত-আলোড়নকারী চৈতন্যকে আমি জাগ্রত করে তুলতে পারবো এবং নিঃসংশয়ে এই তর্কাতীত অভিনব প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবো যে, সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যখন আপাতঃ দৃষ্টিতে অসম্ভব কোনও দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তখন কেবলমাত্র দৃঢ় সংকল্প ও একতার বলে
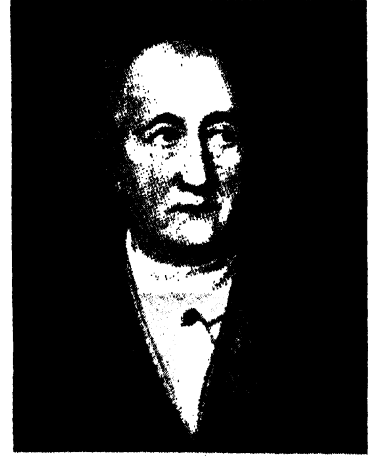
মহাকবি গ্যয়টে

তারা কি অজেয় শক্তিরই না অধিকারী হয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে!

মানবমুক্তির মহাকবি, জার্মাণ সাহিত্যের অমর শিল্পী ফ্রেডরিক ভন শিলার তাঁর 'সংযুক্ত নেদারল্যাণ্ডের বিপ্লব' শীর্ষক বইখানির ভূমিকায় এই ভাবে মুখবন্ধ শুরু করেছেন। স্বাধীনতার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, মহৎ চিন্তাধারা, পৃথিবীর উন্নতি সাধনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, যা কিছু মিথ্যা, যা কিছু হীন, যা কিছু হেয় তার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা—এই একটি-মাত্র মানুষ ফ্রেডরিক ভন শিলারের মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

'Und setzet ihr nicht das Leben ein
Nie wird euch das Leben gewonnen sein!
And if you do not pledge your life
life will never be thine!

শিলার বলেছেন—জীবন, অর্থাৎ যে জীবন সত্য, যা কেবলমাত্র দৈহিক অস্তিত্ব রক্ষা নয়, তাকেই বলে স্বাধীনতা, পূর্ণ মানবতা বিকাশের স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথের পাঠকেরাও কবির রচনার মধ্যে আদর্শ জীবনের এ আভাসটুকু পেয়েছেন—

যদি মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও,
প্রাণ আগে করো দান।

তিনি কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যই আজীবন যোঝেন নি, তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতাও চেয়েছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা ছিল তাঁর কাম্য। তিনি বলতেন—মুক্তিই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, মুক্তিই মানব জীবনের শেষ লক্ষ্য।

ফ্রেডরিক ভন শিলারের মৃত্যুর পর দেড়শত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। এই সার্দ্ধ এক শতাব্দীর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। শিলারের জীবিতকালে জার্মাণী নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি প্রদেশ পৃথক ভাবে এক একজন শাসনকর্তার অধীনে ছিল। এই সব শাসকেরা ডিউক নামে অভিহিত হতেন। স্ব স্ব রাজ্যে এঁরা সর্বময় কর্তা ছিলেন। যথেচ্ছা শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। এঁরা সকলে ক্রমে একতাবদ্ধ হয়ে একটি বিশাল সংযুক্ত রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু জার্মাণির যে রূপান্তরই ঘটে থাক না কেন, শিলার আজও জার্মাণীর আদর্শ কবি হয়ে আছেন। জার্মাণ যুবকেরা আজও তাঁরই রচনা থেকে যৌবনের প্রেরণা পায়। আজ জার্মাণী আবার দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম উভয় জার্মাণীতেই শিলারের সংলাপ আজও রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠে শোনা যায়। বিদ্যায়তনগুলিতে তাঁরই কবিতা পড়ানো হয়। এ থেকে আমরা এই সান্ত্বনা পাই যে, যিনি যথার্থ মহাপুরুষ তাঁর প্রতিভাকে নিত্যপরিবর্তনশীল কালের প্রভাব কোনও দিনই নিষ্প্রভ বা নিরুদ্ধ করতে পারে না।

শিলারের সাহিত্য কেবলমাত্র জার্মাণীর মধ্যে বা য়ুরোপের অভ্যন্তরেই আবদ্ধ থাকবে এমন কথা আমি চিন্তাও করতে পারিনি। যাঁরা শ্রেষ্ঠ মনীষী, দার্শনিক, অসামান্য শক্তিশালী সাহিত্যিক, তাঁরা কেবলমাত্র তাদেরই দেশের মানুষ নন। তাঁরা সারা পৃথিবীর বরণীয়। এই সব মহাপুরুষেরা যা বলেন, যা লেখেন, যা নিয়ে চিন্তা করেন তা' সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য। তাঁদের যে আদর্শ তা' জগতের শান্তি ও মুক্তির আদর্শ। যেমন ধরুন—নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতা। এ আকাঙ্ক্ষা বা এ কামনায়—সর্বজনীনতা সম্বন্ধে পৃথিবীতে কোথাও দ্বিমত থাকতে পারে না। শিলার যদি জার্মাণীতে না জন্মে ভারতে ভূমিষ্ঠ হতেন তাতেও তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশে কোনও বাধা হ'ত বলে আমি মনে করিনি, কারণ, ভারতের কবি ও চিন্তাশীল মনীষীরা চিরদিনই আত্মার মুক্তি ও জন্মভূমির স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে গেছেন—যেমন

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়!" (রঙ্গলাল)

অথবা,—"সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়" (হেমচন্দ্র)

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথা আগেই বলেছি—

"—'দাও' 'দাও' বলে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলেনাত' কিছু
যদি মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে কর দান"

মহাকবি ফ্রেডারিক্ ভন্ শিলার

সকল দেশের সকল শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যেই প্রায় একই ভাব ও ভাবনা, একই অনুভূতি ও ব্যঞ্জনার যে ঐক্য দেখা যায়, তাতে মনে হয় না যে, এঁরা কখনো পরস্পরের নিকট হতে হাজার হাজার মাইল দূরে বাস করতেন এবং এঁদের আবির্ভাব বহু শতাব্দীর ব্যবধানে ঘটেছে!

আমার কাছে এটা তাই বড় দুঃখের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, শিলারের মতো একজন দেশকালাতীত সর্বজনীন কবির চিন্তার ঐশ্বর্য আমাকে এমন এক ভাষায় আপনাদের কাছে বহন করে আনতে হচ্ছে যা আপনাদেরও নয় এবং শিলারেরও নয়। আপনাদের দেশে যেভাবে বিভিন্ন বিদেশী ভাষার অনুশীলন চলেছে তাতে আমি আশা করিব যে অদূর ভবিষ্যতে শিলারের বাণী তাঁর নিজের ভাষাতেই আপনাদের কাছে এসে পৌঁছবে। অনুবাদের সাহায্য নিতে হবে না।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে উটেন্‌বার্গের একটি ক্ষুদ্র জনপদে জনৈক সামরিক অস্ত্র-চিকিৎসকের পুত্ররূপে যোহান ক্রিস্টফ শিলার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আশৈশব তিনি প্রচণ্ড উৎসাহী ও আদর্শবাদী বালক ছিলেন। অল্পবয়স থেকেই তাঁর ঝোঁক ছিল শাস্ত্র ও পুরাণ ঘেঁটে তিনি ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন করবেন। কিন্তু, আমি এমন কথাও বলতে চাই, যে সৌভাগ্যক্রমেই নিয়তি তাঁকে অন্যপথে নিয়ে গিয়েছিল।

উটেনবার্গের শাসনকর্তার আদেশে শিলারের পিতা পুত্রের শিক্ষার ভার সামরিক বিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সামরিক বিদ্যালয়টি উটেনবার্গের ডিউকের নিজস্ব তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হ'ত। পিতা মাতার স্নেহচ্ছায়া থেকে বহুদূরে এসে এক

জার্মান বিদুষী কুমারী সোনিয়া ফ্যাঙ্ক্‌হানেল্‌

জঙ্গী স্কুলের কঠোর পরিবেশের মধ্যে শিলারকে বিদ্যা শিক্ষা করতে হয়েছিল। তাও, আপন অভিভাবকদের ইচ্ছানুরূপ নয়, তাঁর নব অভিভাবক ডিউকেরই খেয়াল মতো। ধর্মশাস্ত্রানুশীলনের পুণ্য অভিলাষ পরিত্যাগ করে আইনজীবীর পেশা গ্রহণের উপযোগী হবার জন্য তাঁকে ব্যবহারবিধি অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই ডিউকের মত গেল বদলে। তিনি শিলারকে ডেকে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের আদেশ দিলেন। শিলার প্রাণের দায়ে শাসক-প্রভুর আদেশ মেনে নিতে বাধ্য হলেন বটে, কিন্তু তাঁর সমস্ত মন এই মানুষটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো এবং তিনি এই পৃথিবীর ওপরও বিরূপ হয়ে উঠলেন। যেখানে একজন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন একটা জীবন গ্রহণে বাধ্য করা হয়, যে-জীবন সে চায় না এবং যে-জীবন গ্রহণের ফলে তার নিজের মধ্যে যে শক্তি ও প্রতিভার যোগ্যতা আছে তাকে কোনওদিনই কাজে লাগাবার সুযোগ পাবে না। শিলারের জীবনের এই যে বিরোধ অন্তরে এসে প্রবেশ করলো ভবিষ্যতে তাঁর নানা রচনার মধ্যে বারংবার মানুষের এই সমস্যাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যে, অত্যাচারীর উৎপীড়ন শুধু যে মানুষের মর্যাদার পক্ষেই অসম্মানজনক তাই নয়, পৃথিবীর প্রগতি ও মানবের উন্নতির পক্ষেও তা সমূহ বিপজ্জনক।

শিলারের প্রথম নাটকে তাই আমরা দেখতে পাই তিনি প্রারম্ভেই মানুষের মুক্তির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। বয়স তখনও উনিশের মধ্যে। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই লিখে ফেললেন এই নাটক। নাম দিলেন, 'ডাকাতরা'! নাটকের শিরোনামের নিচেয় এই তরুণ লেখক আর একটি কথাও বসিয়েছিলেন—'যথেচ্ছাচারী শাসকরা নিপাত যাক!'

এই নাটকের নায়কের চরিত্রে আমরা শিলারের নিজের জীবনেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। একটি মানুষ গতানুগতিক প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ বিশ্বের যত কিছু অন্যায় অবিচার অত্যাচার মিথ্যাচার পাপ ও অধর্মের বিরুদ্ধে যেন প্রলয় ঝড়ের মতই রুদ্ররূপ ধারণ করেছে! তিনি যেন আবেগের চরম সীমায় গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন প্রতিপদেই! যিনি ভালবাসেন দেবতার মতো, ঘৃণা করেন দানবের মতো। নাটকের নায়ক কার্লমুর একজন দস্যু নিয়ে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে চলেছেন। সমস্যামূলক এই চরিত্র, কখনও নিজের বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রতিহিংসার জ্বালায় ফেটে পড়ছেন, আবার কখনও বা এই জঘন্য নোংরা সমাজের আঘাতে বিপর্যস্ত ও অত্যাচারিত প্রাণীদের মুক্তির জন্য গভীর বেদনায় কাতর হয়ে উঠেছেন। জীবনের পবিত্রতা শান্তি ও মুক্তির জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রতীক্ষার অন্ত ছিল না।

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝেছিলেন যে কেবলমাত্র ধ্বংসের দ্বারা সুখ ও শান্তির অধিকারী হওয়া যায় না। আক্রোশ ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা শুধু অপরাধীকে শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, মানুষের মধ্যে যা কিছু সৎ যা কিছু মহৎ তাকেও সমূলে বিনষ্ট করে।

তবু তিনি বলেছেন, সে ক্ষতিও ক্ষতি নয়। যা ভেঙেছে, যা নষ্ট হয়েছে, যে আঘাত বহু নরনারীকে ক্ষত বিক্ষত করেছে, অনেক সম্ভাবনা-পূর্ণ ভাবনাকে হত্যা করেছে, তারও প্রয়োজন ছিল। তারও কিছু সার্থকতা আছে বৈকি। বলিদান চাই, নইলে পূজা সম্পূর্ণ হয় না। আত্মত্যাগের ভিতর দিয়েই আত্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব। তাই, আমরা দেখতে পাই নাটকের নায়ক কার্লমুরের সঙ্গে কবি নিজে যেন একাত্ম হয়ে বলছেন—"I am this sacrifice. I myself must suffer death for them. I go to deliver myself into the hands of justice."

আপাত দৃষ্টিতে একটা কার্লমুরের পরাজয় বলে মনে হলেও, প্রকৃত পক্ষে মানুষের স্বাধীনতা ও আত্মার মুক্তির জন্য তাঁর যে মরণ-পণ যুদ্ধ তাতে শেষ পর্যন্ত জয়মালাই পড়লো গিয়ে তাঁর কণ্ঠে।

এই নাটকখানি শেষ হয় শিলারের বয়স যখন একুশবছর। তিনি

শিক্ষা ছেড়ে তখন জঙ্গী-চিকিৎসক রূপে জীবন শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর "ডাকাতের দল" নাটকখানির আশাতীত সাফল্য দেখে তিনি একরকম স্থিরই ক'রে ফেলেছিলেন যে সৈনিক বিভাগে ডাক্তারী করা তাঁর পোষাবেনা। তিনি এই নাট্যকারের জীবনই গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে 'ডাকাতের দল' নাটক দেখে তাঁর মুরুব্বী ডিউক গেলেন চটে। পাছে তাঁকে কোনও কঠিন শাস্তি পেতে হয় এই ভয়ে শিলার গেলেন ডিউকের নাগালের বাইরে 'ম্যানহাইম' অঞ্চলে পালিয়ে। অর্থাভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি অতি কষ্টে আরও দু'খানি নাটক লিখে ফেললেন "The conspiracy of fiesco in Genoa" এবং "Love and Intrigue" প্রথম নাটকখানিতে তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে একটি বীর যুবক নিষ্ঠুর শাসকের প্রত্যাচার থেকে দুর্বল উৎপীড়িত জনগণকে মুক্ত করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'য়ে শেষে নিজেই শক্তি ও শাসনের ক্ষমতা লোভে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ায়, ঠিক তাঁর জয়ের মুহূর্তে বন্ধু ও সঙ্গীদের দ্বারা নিহত হলেন। দ্বিতীয় নাটকখানিও এক অনির্বচনীয় শক্তিশালী করুণ বিয়োগান্ত নাটক—যার মধ্যে দেশের তদানীন্তন কদাচারী ও কুটিল অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি কঠিন অভিযোগ নিয়ে এসে অত্যাচারিত জনসাধারণের সম্মান রক্ষা ও সত্য পালনের জন্য অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।

ছাব্বিশ বছর বয়সেই শিলার তখনকার জনপ্রিয় নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে তখনও তিনি বিপর্যস্ত। কয়েকজন বন্ধুর সদয় সাহায্য কোনও রকমে তাকে উপবাসে মৃত্যু হওয়া থেকে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই দুঃখের দিনে দুর্বল শরীরে তাঁর এক মারাত্মক ব্যাধি সঞ্চারিত হয়েছিল, তখনকার লোকে সে রোগকে বলতো 'হিমজ্বর' (Cold fever) এবং শেষ পর্যন্ত এই রোগের প্রকোপই শিলারের অকালমৃত্যুর কারণ হয়। শিলারের জীবন নিন্দা ও প্রশংসার যুগপৎ আলো ছায়ায় এগিয়ে এসেছিল। কখনো বহু-বিখ্যাত বিশিষ্ট বন্ধুদের অকুণ্ঠ প্রশংসায় উৎসাহিত হয়েছেন তিনি, আবার কখনো, যাঁরা তাঁকে এক নির্বোধ ভাবুক মাত্র বলেই মনে করতো তাদের বিদ্রূপ ও উপহাস সহ্য করতে হয়েছে। এই ভাবে তিনি তাঁর মানবমুক্তিকামী শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম "ডন কার্লো" শেষ করেন।

এই মানবমুক্তির মহাব্রতে দীক্ষিত কবি তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনের শ্রেষ্ঠ সহায়ক হবে বুঝে ইতিহাসের এক গভীরতম অন্ধকারময় যুগকে তাঁর নাটকের পটভূমিকা রূপে বেছে নিয়েছিলেন। স্পেনের দিগ্বিজয়ী শক্তির সম্মুখে যেদিন পৃথিবী নতজানু হয়ে পড়েছে, দোর্দণ্ড প্রতাপ দ্বিতীয় ফিলিপ যেদিন সগর্বে শাসনদণ্ড পরিচালনা করছেন, সেই সময় স্পেনের অধীন এক সুদূর ক্ষুদ্র প্রদেশ নেদারল্যাণ্ড তার মুক্তিকামনায় অমিত শক্তিশালী স্পেনের বিরুদ্ধে মরিয়া হ'য়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিলে। শুধু কি তাই? সেই সময় স্পেনের পুরোহিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মান্ধ মূঢ়তার জন্য হাজার হাজার মানুষ যারা রোম্যান ক্যাথলিক শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রোটেসট্যান্ট শাখা অবলম্বন করছিল—তাদের অবিশ্বাসী নাস্তিক বলে রাজশক্তির সাহায্যে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হচ্ছিল। নিষ্ঠুর নৃশংস চরিত্র হিসাবে তিনি দ্বিতীয় ফিলিপকে আঁকতে গিয়ে দেখিয়েছেন স্পেনের অধীশ্বর ক্যারল শক্তিমান হলেও তাঁর একান্ত একাকিত্বের জন্য তিনি সকলের করুণার পাত্র! আবার, তাঁর যে দুঃসাহসী বীর্যবান আশা ও উৎসাহে অবিচল প্রতিদ্বন্দ্বী মার্ক্'ইস্ পোজা, তাঁর অবস্থাও তথৈবচ! এই নাটকের চূড়ান্ত আকর্ষণ হল ফিলিপের সামনে দাঁড়িয়ে মার্ক্'ইস পোজার সেই জ্বলন্ত ভাষণ, যেখানে তিনি ফিলিপকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে একমাত্র সর্ব-মানবের স্বাধীনতাই জগতে শান্তি সুখ ও সম্পদ এনে দিতে পারে।

এই নাটকখানি শেষে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলারের দুঃখের দিনও যেন ফুরিয়ে এল। শিলারের অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্যয়টের অনুরোধে ইয়েনার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি একাধিক চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং 'নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ' এবং 'তিরিশ বছরের যুদ্ধ' নামে দু'খানি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু, কবির স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়তে থাকে। দেবতার মতো যাঁর পরম সুন্দর কান্তি, রক্তিম সুবর্ণের মতো চিকণ কেশ, সাগরের মতো অতল গভীর দুটি নীল চোখ এবং দীর্ঘ ঋজু দেহ যেন ধীরে ধীরে এক কংকালসার ছায়া মূর্তিতে পরিণত হয়েছিল। কঠিন রোগ যতই তাঁর দেহকে জীর্ণ করে ফেলছিল শিলার ততই যেন বিবিধ রচনা নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করেছিলেন। এই দারুণ অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি Wallenstein, Mary Stuart, The Vergin of Orleans, The Bride of Mesina এবং Wilhelm Tell প্রভৃতি কয়েকখানি তাঁর বিশ্ববিশ্রুত স্বাধীনতা-সংগ্রামাত্মক নাটক রচনা করেছিলেন।

তিনি আরও অনেকগুলি নাটক লিখবার জন্য সংকল্প করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু, বিপ্লবী গণশক্তির ঐক্যবদ্ধ অভ্যুদয়ে অত্যাচারী সম্রাটের রাজশক্তিও কেমন করে পরাভূত হ'তে পারে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ Wilhelm tell নাটকখানি রচনার পর মাত্র ৪৬ বছর বয়সে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল। এই স্বল্প জীবনের মধ্যেই তিনি বিশ্বসাহিত্যে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তার তুলনা মেলেনা। কি কাব্যে, কি নাটকে, কি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক কলাকুশল সুচারু প্রবন্ধে নিবন্ধে জার্মান ভাষা ও সাহিত্যকে নানাদিক দিয়ে সুসমৃদ্ধ করে গেছেন তিনি। এমন মহৎ চরিত্রের সাহিত্যসেবী জার্মানীতে আর দ্বিতীয় একজনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মহাকবি গ্যয়টে তাই তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে—"শিলার সেই যৌবন শক্তির অধীশ্বর ছিলেন যা এই নিরানন্দ পৃথিবীর সকল নৈরাশ্যময় অন্ধকার স্তূপকে একদিন না একদিন বিদীর্ণ করে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করতে পারে।

পরিচালক—উপানন্দ

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

আবার এসেছে বুদ্ধ-পূর্ণিমা। আকাশ তেম্নি নীল, জ্যোৎস্নায় ঝলমল, আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে যেমন ছিল। হিমাদ্রির পাদদেশে রোহিণীর তীরে লুম্বিনী কাননে শাক্য-দুলাল গৌতমের আবির্ভাব হোলো এম্নি দিনে অতুল ঐশ্বর্য্যের আবেষ্টনীর মধ্যে। প্রকৃতির স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশ এমনই ছিল. যা তোমরা আজ দেখ্‌ছ। এম্নি সুন্দর রাতে এলেন ক্ষমা-সুন্দর অবতার-পুরুষ জীবের ত্রাণকর্ত্তা হয়ে, মাটির বুকের স্তন্যপান করে।

বর্ষ এলো, বর্ষ চলে গেল নদীর স্রোতের মত। কত শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, মৃগদাব, বৈশালী, উরুবিল্ব—ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সরে গেল, কত দেশ, কত মহাদেশের পরিবর্ত্তন হোলো, কত চৈত্য, বিহার সীতার মত ধরিত্রীগর্ভে চলে গেল, তবু লুপ্ত হোলো না তাঁর বাণী, তাঁর মহান্ আদর্শ। তিনি রেখে গেলেন তাঁর আবির্ভাবক শাশ্বত করে। ইতিহাসের প্রান্তরে প্রান্তরে, মানুষের মনের ভূগোলের বিভিন্ন দিকে আজও তাঁর চলেছে পদচারণা—তিনি জাগ্রত। নতুবা যীশুখৃষ্ট থেকে সুরু করে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, গান্ধী পর্য্যন্ত আমরা তাঁর মহাজীবনের মহা-করুণার রূপ দেখ্‌তে পেতাম না। তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে গেছেন নতুন মানসিক চেতনা—আন্তর্জ্জাতিকতার উদারক্ষেত্রে ভারতের প্রতিষ্ঠা হোতে পার্‌তো না, যদি না তাঁর মৈত্রী ও করুণার পতাকা বহন করে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেশে দেশে যেতেন সত্যের আদর্শ প্রচার কর্‌তে, আর প্রত্যেক দেশেই না গভীর ভাবের আলোড়ন সৃষ্টি হোতো তাঁদের পদার্পণে।

ধর্ম্মপ্রচারের নেপথ্যে তিনি চিরজাগ্রত হয়ে রয়েছেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত্ত প্রতীকরূপে। মহামানবের মহামিলনের শ্রীক্ষেত্র এই ভারত-তীর্থ-দেউলে এস আজ আমরা এই পুণ্যতিথিতে তাঁর বন্দনা গান করি। এস বলি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। এই তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই তিথিতে তাঁর বুদ্ধত্বলাভ হয়েছিল আর এই তিথিতে তাঁর তিরোধান। তাঁকে কেন্দ্র করে শুধু ভারতে নয়, সিংহল, ব্রহ্ম, তিব্বত, জাপান, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে নব-ভাবধারার উন্মত্ত প্লাবন হয়ে গেছে—সেই প্লাবনের রেখে-যাওয়া পলিমাটিতে জন্মলাভ করেছে পৃথিবীর আন্তর্জ্জাতিক ধর্ম্ম-সংস্কৃতির সোনার ফসল। শ্রাবস্তীপুরীতে আজো যেন কাঁদে থেরী যশোধরা, কাঁদে মল্লিকা নিরঞ্জনার তীরে, কাঁদে অম্বপালী বৈশালী-পথে।

তিনি কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে, কোন শ্রেণী বা সমাজের জন্যে তাঁর ধর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করে যান নি। তিনি জানতেন তাঁর উদার ধর্ম্ম একদিন শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মানুষের সমাজ-হৃদয়ে এক নতুন মানস-চেতনা, এক নতুন সম্ভাবনার বীজ বপন করবে। তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন যে মহাশক্তি, সেই শক্তির পুণ্যপ্রভাবে ভারতের সাহিত্য-শিল্প, ভারতের দর্শন-বিজ্ঞান, ভারতের মনন, ধ্যান ও সাধনা, ভারতের চিন্তাধারার নতুনরূপে ক্রম-বিবর্ত্তন হোলো—ভারতের অস্থিতে মজ্জায় বৌদ্ধ-সংস্কৃতির শোণিত-প্রবাহ আজও লুপ্ত হয় নি। শঙ্করাচার্য্য নব্য হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সত্য, কিন্তু ভারতের বৌদ্ধবাদকে আমাদের সমাজ-সংসার থেকে উচ্ছেদ করে যেতে পারেন নি।

রাজা শুদ্ধোদনের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান সিদ্ধার্থ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ সম্পদ, পরমাসুন্দরী স্ত্রী সব কিছু ছেড়ে দিয়ে পথে পথে জীবের জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছেন—কেমন করে জীবের দুঃখ দূর হবে—তার জন্যে করে গেছেন তীব্র-সাধনা অনাহারে অনিদ্রায় গভীর-অরণ্যে। তার পর তিনি নিরঞ্জনা-তীরে বোধিবৃক্ষতলে মহাবোধি-লাভ করলেন বুদ্ধগয়ায়—সেদিনও ছিল এম্নি সুন্দর জ্যোৎস্না-বেষ্টিত পূর্ণিমা।

যেদিন কৈশোরোত্তরক্ষণে অনোমার তীরে রাজবেশ ত্যাগ করে গৌতম মস্তক মুণ্ডন করলেন, আর কৌপীন পরে ছন্দককে তরবারিখানি ফিরিয়ে দিয়ে অনাবিষ্কৃত নতুন পথে যাত্রা সুরু করলেন, আর মৌন হয়ে নত মস্তকে ছন্দক অশ্রুপাত করতে লাগ্‌লো, সেদিন ভারতের নবযুগের

সূচনা দেখা দিল নবপ্রভাতের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বুদ্ধ জীবের প্রকৃত দুঃখ দূর করতে পেরেছিলেন কিনা সেইটেই বড় কথা নয়, তিনি যে রাজার ছেলে হয়ে জীবের দুঃখে কাতর হয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন সেইটেই বড় কথা। তাঁর মধ্যে ছিল নিগূঢ় আন্তরিকতা। তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তাই ব্যক্ত করে বলেছিলেন—'আমার কথা শুনেই তোমরা আমার ধর্ম্ম, আমার মত বা পথ গ্রহণ করো না—তোমরা নিজেদের মধ্যে আমার কথাগুলি নিয়ে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করো—যদি সত্য হয় তবে গ্রহণ করো, তা না হোলে বর্জ্জন করো—আমার কথা যাচাই করে নিয়ে, তবে তা নেবে—উপরোধে অনুরোধে নিও না, বিশ্বাস করো না—' এম্নি ছিলেন তিনি সত্যনিষ্ঠ আদর্শপুরুষ।

তিনি প্রচলিত প্রাকৃতিক ভাষায় তাঁর বাণী শুনিয়ে গেছেন। সেই ভাষা পালি ভাষারূপে বিশ্ব-সমাদৃত। ভারতের ন্যায়শাস্ত্রের আদি বিকাশ হয়েছে তাঁরই চিন্তাধারার সূত্র গ্রহণ করে। 'অভি ধর্ম্মকোষ ব্যাখ্যাই' প্রথম ভারতীয় ন্যায়গ্রন্থ। ভারতীয় শিল্পের বিবর্তন ঘটেছে নতুনভাবের প্রবর্ত্তনে, তাঁর সাধনার পর তাঁর ধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা।

তোমরা যদি ভারতবর্ষ পরিক্রমা করো, তাহোলে দেখ্‌তে পাবে সম্রাট অশোকের শিলাস্তম্ভগুলিতে ধর্ম্মসেবায় উৎসর্গ করা প্রাচীনতম শিল্প-কীর্ত্তি—দেখ্‌তে পাবে বারহুতের স্তূপবেষ্টনীর খোদাইয়ের অলঙ্কারে বৌদ্ধ-শিল্পশ্রী, সাঁচীর স্তূপে, অজন্তা এলোরায়, পশ্চিমভারতের কত গুহামন্দিরের প্রাচীরে, চৈত্যগুহার অন্তরে বাহিরে সিংহলের অনুরাধাপুরে, ব্রহ্মে, কাম্বোজে, শ্যাম মালয়ের অরণ্যপথে দেখ্‌তে পাবে শ্রীবুদ্ধের সৌম্যমূর্ত্তি, প্রশান্তবাণী, জীবন-আলেখ্য আর মর্ম্মগাথা।

বৈদিকযুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে যে বাণী প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, তা যাগ-যজ্ঞ, কর্ম্মকাণ্ড ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, প্রাচীন ঐতিহ্যের ঘাত-প্রতিঘাত আর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে যে সত্য অমৃতের পুত্রগণ অন্বেষণ করেও পেলোনা, সেই সত্য, সেই বাণী ভগবান তথাগত বিশ্বের নরনারীকে দিয়ে গেলেন—বল্লেন—তোমরা সকলেই অমৃতের সন্তান, কেননা তোমরা সকলেই—নির্ব্বাণলাভের অধিকারী। দৃঢ় প্রযত্ন, মহান বীর্য্য ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের দ্বারা তোমরাও মহাজ্ঞানী হোতে পারো—সত্যকে পেতে পারো, বুদ্ধ হোতে পারো। আমি যে ধর্ম্ম তোমাদের কাছে প্রচার করছি তা তোমাদের স্পষ্টভাষায় বলছি, প্রত্যক্ষ কোন অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক তত্ত্বে তোমাদের বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। তোমরা অষ্টাঙ্গ মার্গের অনুসরণ করো অর্থাৎ সম্যক্‌ দৃষ্টি, সত্য বাক্য, সৎসঙ্কল্প, সদাচরণ, সাধুজীবিকা অবলম্বন, সৎচেষ্টা, সৎ স্মৃতি ও সৎ ভাবনা এই আটটী নিয়ম পালন করো। আর নিজেরা পরখ করে দেখো আমার ধর্ম্ম সত্যি কিনা, আমি তোমাদের সবাইকে দেখে যেতে আহ্বান করছি। কিন্তু মনে রেখো, তোমরা যদি আত্মদীপ হোয়ে বিহার না করো, আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার সাধন না করো, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ করে দৃঢ় প্রযত্নের আশ্রয় গ্রহণ না করো, মার বা পাপের সঙ্গে বীরের মত যুদ্ধ না করো, তা হোলে কোন দেবতা, কোন মহাপুরুষই তোমাদের উদ্ধার করতে পারবেন না।

ভগবান বুদ্ধ অধোমুখবারি কুম্ভের মত নিজেকে নিঃশেষে দান করেছেন, যে অমৃতের তিনি সন্ধান পেয়েছেন, তা অকৃপণভাবে জগতের নরনারীকে বিলিয়ে গেছেন। নৈতিকচরিত্র অটুট রাখবার জন্যে তিনি 'শীল' রক্ষার উপদেশ দিয়েছেন, আর এই চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি জীবন বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হননি। তিনি বীরের মত সংসারের তুচ্ছ সুখসম্পদ ত্যাগ করে মহান সত্যকে আবিষ্কার করেছেন—জীবে প্রেম, অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও সেবার দ্বারা মানবতার বিকাশ হয়, বুদ্ধত্বলাভ হয় আর পরিনির্ব্বাণ ঘটে। নানা আচার্য্যের কাছে গিয়ে তিনি জ্ঞানের অন্বেষণ করেছেন, শেষে কঠোর সাধনার দ্বারা তিনি প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত করে সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি সিংহের মত নিজের বীর্য্য প্রকাশ করে সর্ব্বত্র বিচরণ করেছেন—এই বীর্য্যের দ্বারাই মার বা পাপকে পরাভূত করে বুদ্ধ হোয়েছিলেন—এই শ্রেয়ের পথেই তিনি সকলকে আহ্বান করেছেন। তিনি সর্ব্বংসহা পৃথিবীর মত ক্ষমতার আদর্শ স্থাপন করেছেন—কারও প্রতি অনুরাগ বা বিদ্বেষভাব পোষণ করেননি। লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ কোন কিছুই তাঁর চিত্তে বিকার আনেনি—তিনি সকল দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে ক্ষান্তির আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। গ্রহ যেমন কখনো নিজ কক্ষ পথ থেকে পরিপুষ্ট হয় না, বুদ্ধও কখনও সত্যের পথ থেকে সরে যান নি। তোমরা তাঁর মহাজীবনের আদর্শকে সম্মুখে রেখে কায়মনোবাক্যে সত্যকে রক্ষা করবে। পর্ব্বত যেমন সর্ব্বদা অবিচলিতভাবে আপন অধিষ্ঠানে অবস্থিত থাকে, দারুণ ঝঞ্ঝা বাদলেও কখন স্থানচ্যুত হয় না, তেম্নি বুদ্ধও সর্ব্বদা আপন অধিষ্ঠানে অবস্থিত ছিলেন। তাই কোনো বাধাবিঘ্নই তাঁকে লক্ষ্য হোতে ভ্রষ্ট করতে পারেনি। তিনি ছিলেন স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ ও বীতরাগ; তোমরাও তাঁর মত সর্ব্বদা নিজেদের লক্ষ্য হোতে ভ্রষ্ট হয়ো না, উন্নত আদর্শ রক্ষার জন্যে স্থিরসঙ্কল্প করবে। তোমরা হবে তাঁরই মত সুন্দর, নিষ্পাপ, ফুলের মত নির্ম্মল আর সত্যব্রত।

তিনি মৈত্রীভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিলেন, সকলকে সমভাবে মৈত্রীস্নিগ্ধ করুণার চক্ষে দেখেছিলেন, তাই তাঁর মৈত্রী বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়েছিল, তাঁর কাছে পাপী বা পুণ্যাত্মার প্রভেদ পর্য্যন্ত ছিল না। তোমরাও তাঁর মত সকল জীবের সঙ্গে, সকল মানুষের সঙ্গে পরম আত্মীয়তা করো আর বিশ্বমৈত্রী ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হোয়ে জগতে শান্তি বিতরণ করো—জগতের যত অমঙ্গল, পাপ, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার বুদ্ধের মত প্রেমদান করে দূর করো। তোমরা এই মহাপথিককে অবলম্বন করো।

তিনি শুচি ও অশুচির প্রতি সমভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন, তাই তাঁর কাছে উপাদেয় বা হেয় বলে কিছু ছিল না। তোমরাও তাঁরই মত শুভাশুভ বা হিতাহিত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে যাও আর জগতের সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী পেরিয়ে শান্তি-স্নিগ্ধ অন্তরে বিচরণ করো। তোমরা বুদ্ধের মত গৌরবময় মহাজীবনের অধিকারী হও।
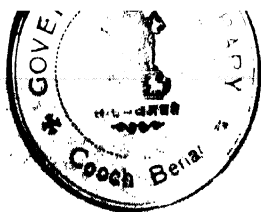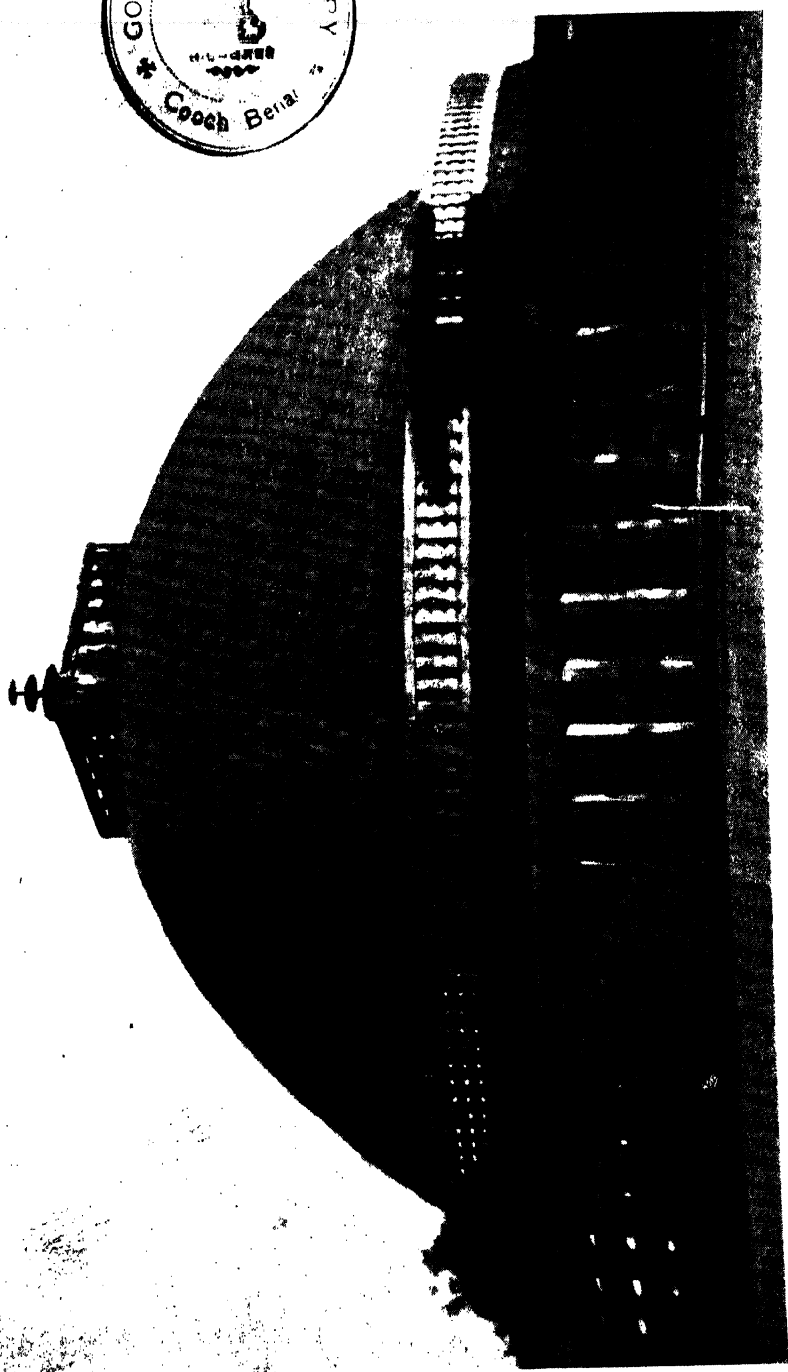
সাঁচীর স্তূপ

ফটো : ভানু সেনগুপ্ত

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

স্তূপ দ্বার—সাঁচী

ফটো : ভানু সেনগুপ্ত
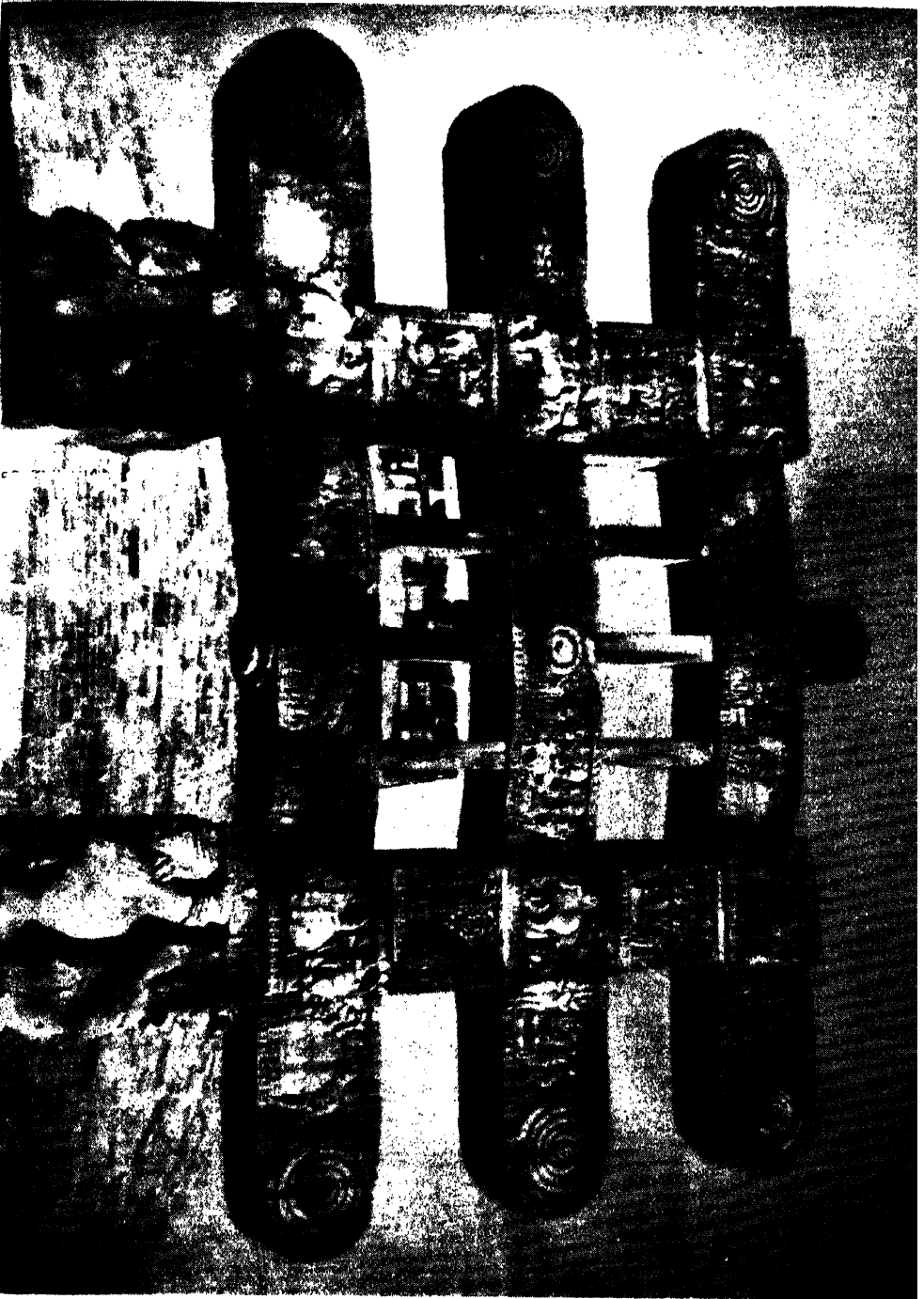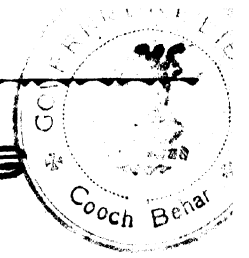
মহাপুরুষের চিন্তার দ্বারাই নবজন্ম লাভ করা যায়। নীতিশাস্ত্রেও বলা হয়েছে—যার যেমি ভাবনা, তার তেমি সিদ্ধি। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—যাঁরা বিষয়ে অনাসক্ত, যাঁদের চিত্ত বাসনাহীন তাঁদের চরিত-কথা নিয়ত অনুধ্যান করলেই আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলোকে কোন একটি উচ্চ লক্ষ্যের দিকে স্থির করা যায়, এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই—এইভাবে চিন্তার ফলে মানুষ অবস্থাতেই মহামানব বা দেবতা হওয়া যায়। তোমরা বুদ্ধের আদর্শ গ্রহণ করে মহর্ষির উপদেশ অনুসারে মহৎ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চিন্তায় বিভোর হও—বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে এটাই একান্তভাবে কামনা করি। আশীর্ব্বাদ করি সাম্য, মৈত্রী, তিতিক্ষা, অহিংসা ও সর্ব্বজীবে প্রেম তোমাদের মধ্যে জেগে উঠুক। জিজ্ঞাসা ও বিচার এ যুগের বৈশিষ্ট্য—এর মধ্য দিয়ে তোমাদের চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হোক ভাবী ভারতের মহান আদর্শের বনস্পতি। মহামানবের মিলন-তীর্থের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অচলায়তনে যা শুনিয়ে গেছেন পঞ্চকের গানটীতে—তারই বাণী তোমাদের কাছে তুলে ধরে আমাদের বক্তব্যের উপসংহার ক'রছি—

"আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাইরে।
আমি আপনাকে ভাই মিলব যে বাইরে।'

ভগবান বুদ্ধ

রমেন গুপ্ত

রাজার কুমার সংসারত্যাগী ওগো বীর সন্ন্যাসী
তোমার মূরতি জাগিছে স্মরণে হিংসাক্ষুব্ধ ক্ষণে,
হীন স্বার্থের কলুষ-মলিন যুগসঞ্চিত তম নাশি'
মুক্তির বাণী শুনাবে কি আর বঞ্চিত জনগণে!

সাধনায় তুমি সিদ্ধ পুরুষ ভগবান তথাগত
বিষয় বিভবে পদাঘাতে ঠেলি' হয়েছিলে আগুয়ান,
বৈরাগ্যের রাজটীকা পরি' আঘাত সহিলে কত
ভোগেরে ত্যজিয়া উদাত্ত স্বরে গাহিলে ত্যাগের গান।

প্রেম ও মৈত্রী বন্ধনে তুমি হিংসারে করি' জয়,
জরাজর্জর মানবেরে ঋষি শুনালে শান্তিবাণী,
মরণবিজয়ী হে মহাপুরুষ ওগো চির অক্ষয়
ভিক্ষুর বেশ ধরেছিলে যে গো রাজৈশ্বর্য্য দানি'।

অপার তোমার মহিমা কেমনে গাহিবে এ দীন কবি
আণবিক যুগে দেখা দাও পুনঃ নতুন জনম লভি।

বিভ্রাট

(রূপকথা)

শ্রীহরিপদ গুহ

সেদিন ঘড়ির কাঁচ বদ্‌লে দেবার পর থেকে নতুন-বৌদির সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। আমাকে তিনি খুব স্নেহ কর্‌তেন। এখন গল্পের জন্য তাঁকে আর বেশী সাধাসাধি কর্‌তে হয় না, আমি অনুরোধ কর্‌লেই তিনি গল্প বল্‌তে আরম্ভ করে দেন। সেদিন ছিল কি একটা ছুটির দিন। দুপুরবেলা তাঁকে ধরে বসলুম—বৌদি, আজ একটা গল্প বল্‌তে হবে কিন্তু।

তিনি একটু হেসে বল্‌লেন—'বেশ, শোন—

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

তিনজন পরাজিত সৈনিক ফিরে চলেছে। কোথায় যাবে জানে না। তাদের কোন গৃহ কিম্বা আত্মীয়স্বজন নেই, সুতরাং তাদের পথেরও শেষ নেই, চলেছে তো চলেইছে, পথ আর ফুরোয় না।

তিন বন্ধুই অত্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত।

হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে তারা যখন একটা গভীর বনের মধ্যে এসেছে, তখন রাত হয়ে গেছে। পথ আর চলা যায় না। তারা স্থির কর্‌ল—সে রাতটা সেখানেই কাটাবে। একটা বড় গাছের তলাটা পরিষ্কার করে সেখানে বিশ্রামের যোগাড় কর্‌ল। ঠিক্ হলো—পালা করে তিনজনে রাত্রে পাহারা দেবে।

প্রথম সৈনিক আগুন জ্বালিয়ে তার সাম্‌নে বসে পাহারা দিতে লাগল, যাতে কোন হিংস্র জন্তু এসে তাদের কোন ক্ষতি কর্‌তে না পারে। অপর সৈনিক দুজন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তারা শুয়ে পড়্‌ল।

সৈনিক বেচারা একা বসে পাহারা দিতে লাগ্‌ল। সময় আর কাটতে চায় না। হঠাৎ লাল জামা গায়ে একজন বামন তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। তার আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে সে গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন কর্‌ল—কে ওখানে?

সৈনিক জবাব দিল—বন্ধু।

বামন আবার জিজ্ঞাসা করল—কি রকম বন্ধু?

যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক। এখন একেবারে ভবঘুরে। এসো, আগুনের পাশে বসে বিশ্রাম করো, বলে সৈনিক তাকে অভ্যর্থনা করলো।

বামন বল্লে—তোমার জন্ম দুঃখিত বন্ধু, তোমার কিছু উপকার করতে চাই। ধরো—এই কোটটি নাও! এটা গায়ে দিয়ে, তুমি মনে মনে যা ইচ্ছে করবে, তাই পাবে। কাল সকালে তোমার বন্ধুদের এটা দেখিও।

তখন প্রথম সৈনিকের পাহারা শেষ হয়ে গিয়েছিল, সে দ্বিতীয় সৈনিককে জাগিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়্‌ল। একটু পরেই তার নাসিকা ধ্বনি শোনা গেল।

দ্বিতীয় সৈনিক আগুনে কয়েকখানি কাঠ ফেলে দিয়ে তার পাশে বসে পাহারা দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই বামনের আবির্ভাব হলো। সে একেও পূর্ব্বের মতো প্রশ্ন করলো। দ্বিতীয় সৈনিক প্রথম সৈনিকের মত উত্তর দিয়ে তার পাশে বস্‌তে অনুরোধ করলো।

বামন খুসি হয়ে তার হাতে মোহর পূর্ণ একটা থলে দিয়ে বললে—যতই খরচ করো না কেন, থলে সব সময় পূর্ণই থাক্‌বে, কখনো খালি হবে না। তারপর সে তাকে অভিনন্দন করে ধীরে ধীরে বনের ভেতর মিলিয়ে গেল। তার মন খুসিতে ভরে গেল। সে মনে মনে কতই না আকাশকুসুমের সৃষ্টি করতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ পরে তার সময় হয়ে গেল। সে তৃতীয় সৈনিককে জাগিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়্‌ল, এবং গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়্‌ল।

তৃতীয় সৈনিকের পাহারা আরম্ভ হলো।

একটু পরেই সেই বামন এসে তার অতিথি হলো এবং তাকেও আগের মত প্রশ্ন করল। সে প্রথম ও দ্বিতীয় সৈনিকের মত উত্তর দিয়ে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল।

বামন মহা খুসি হয়ে তাকে একটা বাঁশী দিয়ে বল্লে—যখনই এই বাঁশী বাজাবে, চারদিক থেকে দলে দলে লোক তোমার কাছে ছুটে আসবে। তাদের তুমি যা আদেশ দেবে, তারা তাই করবে। বলে—বামন বিদায় নিয়ে চলে গেল।

তখন সকাল হয়ে গেছে। পাখীরা প্রভাতী গাইতে সুরু করেছে। তিন বন্ধু পরস্পরকে নিজ নিজ সৌভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করে বামন প্রদত্ত উপহার দেখালে।

আবার তারা ভ্রমণে বেরুলো। কত দেশ, কত নগর, পার হয়ে গেল। শেষে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ল; এ ভাবে লক্ষ্যহীন ভ্রমণ আর তাদের ভাল লাগ্‌ল না। তারা স্থির করল—এবার তারা সংসারী হবে।

প্রথম সৈনিক বামন প্রদত্ত কোটটা গায়ে দিয়ে মনে মনে একটি সুরম্য প্রাসাদ কামনা করল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটি সুন্দর অট্টালিকা সেখানে নির্ম্মাণ হয়ে গেল। তিন বন্ধু আনন্দে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখ্‌ল—প্রতিটি কক্ষ সুন্দর সুন্দর দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত।

দ্বিতীয় সৈনিক তার থলি থেকে মোহর ঢাল্‌তে লাগ্‌ল। সে যতবার ঢালে, থলি ততবারই পূর্ণ হয়ে যায়।

তৃতীয় সৈনিক যেই তার বাঁশীতে 'ফু' দিয়েছে, অমনি তার পাশে দলে দলে লোক এসে জমা হতে লাগ্‌ল। সে তখন বাঁশী বাজান বন্ধ করে এক একটি লোককে সংসারের এক একটি কাজের ভার দিতে লাগ্‌ল।

তিন বন্ধু বসে বসে রাজার হালে খায় আর গল্প করে। কয়েক দিনেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ল।

তিন বন্ধুতে আবার একদিন অনির্দ্দিষ্টের পথে যাত্রা করল। তাদের মন খুসিতে ভরে উঠ্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে ক্রমে তারা এক নূতন রাজ্যে এসে উপস্থিত হলো।

সেই দেশের রাজা তিন বন্ধুকেই সাদরে গ্রহণ করলেন।

সেদিন বিকেলে দ্বিতীয় সৈনিক রাজকুমারীর সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। রাজকুমারী তাকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার এই থলিতে কি আছে? ডাকিনী-বিদ্যায় আগেই এই তিনজন সৈনিকের গুপ্ত রত্নের কথা জানতে পেরেছিল সে।

সে সরল বিশ্বাসে বোকার মত থলির গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দিলে।

সারা রাত জেগে রাজকুমারী ঐ থলিটির অনুরূপ আর একটি থলে প্রস্তুত করে মোহরে সেটা পূর্ণ করে রাখ্‌লে।

পরদিন সে খুব তাড়াতাড়িই ভ্রমণ করে ফিরে এলো। রাজপুরীতে এসে সে ঐ সৈনিককে অভ্যর্থনা করে তার

কক্ষে নিয়ে গেল এবং একটু বিশ্রামের পর তাকে এক গ্লাস শীতল সরবৎ পান করতে দিল। সরবতের মধ্যে সে কিছু ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। সেটা পান করতেই সৈনিকের দু'চোখ ঘুমে বুজে আস্‌তে লাগ্‌ল।

রাজকুমারী ধীরে ধীরে তার পকেট থেকে মোহরের থলেটি তুলে নিয়ে নকল থলেটি যথা স্থানে রেখে দিল।

পরদিন তাদের কিছু অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে সে থলি হতে কিছু মোহর বের করে নিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় থলে আর পূর্ণ হলো না।

বন্ধুদের কাছে সে পূর্ব্বদিনের সমস্ত ঘটনা অকপটে খুলে বল্‌ল। তখন তারা সবই বুঝ্‌লে, তার বোকামীর জন্য তাকে বেশ তিরস্কার করলে।

কিছুক্ষণ পরে প্রথম সৈনিক তাকে কোমল স্বরে বল্‌লে—ভয় করো না বন্ধু, যেমন করেই হোক্ তোমার থলে আমি ফিরিয়ে আনব।

সে তার কোট্‌টা গায়ে দিয়ে রাজকন্যার শোবার ঘরে যেতে ইচ্ছে করলে। চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে সে সেখানে গিয়ে হাজির হলো। 'দেখ্‌লে—রাজকন্যা মনের আনন্দে বসে মোহরের থাক্ সাজাচ্ছে। এত তন্ময় যে সৈনিকের উপস্থিতি সে টেরও পেল না।

হঠাৎ সে পিছন দিকে তাকিয়ে সৈনিককে দেখে 'চোর' 'চোর' বলে চীৎকার করে উঠ্‌ল। তার চীৎকারে চারদিক থেকে প্রহরীর দল ছুটে এল।

বিপদে কেমন দিশেহারা হয়ে সে পালাবার সহজ পন্থা ভুলে গেল। সামনে খোলা জানলা দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে গিয়ে সে সেখান দিয়ে লাফিয়ে পড়্‌ল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার কোট্‌টা একটা হুকে আট্‌কে সেখানে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল, আর সে গিয়ে পড়্‌ল বাগানে। সেখান থেকে উঠে সে চোঁ-চাঁ দৌড়।

রাজকন্যা কোট্‌টা জানলা থেকে তুলে এনে যত্ন করে রেখে দিলে। বিনা চেষ্টায়ই সে তার আকাঙ্খিত বস্তু পেয়ে গেল।

তিন বন্ধু এক বুক নিরাশা নিয়ে তাদের প্রাসাদের দিকে ফিরে চল্‌ল। এমন অমূল্য উপহার দুটো যে এভাবে খোয়া যাবে, এ তাদের স্বপ্নেরও অগোচর!

পরদিন তৃতীয় সৈনিক তার বাঁশীতে 'ফু' দিয়ে একটি সুমধুর সুর ধর্‌ল। সুরের যাদুমন্ত্রে দলে দলে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যেরা অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার পাশে সমবেত হতে লাগ্‌ল। সে তন্ময়ভাবে বাঁশী বাজিয়েই চলেছে।

যখন বাঁশী বাজান শেষ হলো—দেখা গেল যে, লক্ষ লক্ষ সৈন্য-সমবেত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

পরদিন তারা মার্চ্চ করে সেই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা কর্‌ল। সেই রাজ্য অবরোধ করে তারা 'যুদ্ধং দেহি' বলে আহ্বান কর্‌ল।

রাজামশাই খবর পেয়ে ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি দূত পাঠিয়ে দিলেন। তিন বন্ধু বলে পাঠালো—রাজকুমারী তাদের অমূল্য থলে ও আশ্চর্য্য কোট্ নিয়েছে, সেগুলো ফিরিয়ে না দিলে তারা প্রতিশোধ নেবে।

রাজা কন্যাকে সব কথা বল্‌লেন। সব শুনে সে পিতাকে কয়েক দিন অপেক্ষা করতে বল্‌লে। শীগ্‌গিরই সে একটা ব্যবস্থা করবে।

পরদিন সে একটি ভিখারী বালিকার বেশ ধারণ করে তার সহচরীকে সঙ্গে নিয়ে এক সাজি বড় বড় গোলাপ ফুলসহ শত্রু শিবিরে প্রবেশ কর্‌ল।

ভিখারী বালিকা প্রত্যেক শিবিরের সামনে ঘুরে ঘুরে গান করতে লাগ্‌ল এবং তার সহচরী সারেঙ্গী বাজিয়ে সুর দিতে লাগ্‌ল।

সমস্ত শিবির থেকে সৈনিকেরা বাইরে বেরিয়ে এসে বালিকার মধুর সঙ্গীত শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। সকলে তার কাছ থেকে এক একটি গোলাপ নিয়ে আশাতীত মূল্য দিতে লাগ্‌ল এবং আরো গান গাইতে বল্‌লো।

বালিকার তীক্ষ্ণদৃষ্টি চারদিকে ঘুরে ফির্‌ছিল। সে দেখ্‌লে যে, ঐ তিন বন্ধুও বাইরে এসেছে।

সে গান করতে করতে তাদের শিবিরের পেছন দিক্ দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখ্‌ল যে, বাঁশীটি সামনেই একটা দড়িতে ঝুলছে। সে তাড়িতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে তার ফুলের সাজিতে রেখে বাইরে বেরিয়ে গান করতে করতে চলে গেল।

সৈন্তেরা সব চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। মন্ত্রমুগ্ধের মত তারা তার পিছু পিছু চল্‌তে সুরু করে দিলে। ক্রমে সমস্ত শিবিরগুলি খালি হয়ে গেল। তিন বন্ধু শিবিরে ফিরে এসে দেখ্‌লে—তাদের অত সাধের বাঁশীটিও উধাও হয়ে গেছে। তাদের আর বুঝতে বাকী রইল না যে, এ ঐ রাজকন্যারই কাজ! বামনের দেওয়া তিনটি আশ্চর্য্য উপহারই রাজকন্যার করতলগত হলো।

যে বনে তারা বামনের দেখা পেয়েছিল, সেই বনের দিকে তারা এগিয়ে চল্‌ল। কিছু দূর এলে দ্বিতীয় সৈনিক বল্‌ল—বন্ধুগণ, এবার আমাদের আলাদা হওয়া কর্ত্তব্য, প্রত্যেকের ভাগ্য পৃথক্‌ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। দেখা যাক্ কার অদৃষ্টে কি আছে। বলে সে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। প্রথম ও তৃতীয় সৈনিক একত্রে পূবদিকে চল্‌তে লাগ্‌ল। তারা স্থির কর্‌ল যে, দুজনে একসঙ্গে থাক্‌বে, কখনো আলাদা হবে না।

দ্বিতীয় সৈনিক চল্‌তে চল্‌তে একটা গভীর বনের মধ্যে এসে প্রবেশ কর্‌ল। সারাদিন পথ চলে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; একটা বড় গাছের নীচে শুয়ে পড়ে সে বিশ্রাম কর্‌তে লাগল। একটু পরেই নিদ্রাদেবী তার দু'চোখে ঘুমের পরশ বুলিয়ে দিয়ে তার সকল ক্লান্তি হরণ করে নিল।

পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘুম ভাঙ্গল। তখন তার মনের গ্লানি অনেকটা কমে গেছে। সে চেয়ে দেখলো—যে বৃক্ষতলে সে শয়ন করেছিল, সেটা একটা আপেল গাছ। বড় বড় সুপক্ক আপেলে গাছটি বোঝাই। তার খুব খিদে পেয়েছিল, সে কয়েকটা পাকা আপেল ছিঁড়ে নিয়ে এক একটি করে সে তিনটি আপেল খেয়ে ফেল্‌ল।

হঠাৎ তার নাকের ডগাটা কেমন সুড় সুড় করে উঠ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নাক্‌টা বড় হয়ে তার বুকের কাছে ঝুলে পড়্‌ল। সে তার নাক স্পর্শ করে শিউরে উঠল। এ যে বেড়েই চলেছে! বুক ছেড়ে শেষে মাটিতে পড়ল। তারপর সটান সোজা লম্বা হয়ে দ্রুত গতিতে সাম্‌নের দিকে এগিয়ে চলেছে।

তার বন্ধু দু'জন ঐ বনের শেষপ্রান্ত দিয়ে ভ্রমণ কর্‌ছিল। হঠাৎ তারা দেখতে পেলো কি একটা বস্তু তাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। তারা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে—এটা একটা নাক ছাড়া আর কিছু নয়। তখন দুই বন্ধু নাক লক্ষ্য করে সাম্‌নের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে তারা অবশেষে সেই আপেল গাছের নীচে এসে উপস্থিত হলো। এই নাকেশ্বর বন্ধুকে নিয়ে তারা বড়ই বিপদে পড়ল।

ঠিক্ সেই সময়ে সেখানে পূর্ব্ব-পরিচিত সেই বামনের আবির্ভাব হলো। সে হেসে বল্‌ল—কি বন্ধু, কেমন আছ সব? এ কি অবস্থা তোমাদের? ভয় নেই, এখনই এর নাক ভাল করে দিচ্ছি।

নিকটেই একটা বড় নেস্‌পাতি গাছ ছিল। সে একজনকে আদেশ কর্‌ল—যাও, ঐ গাছ থেকে একটা নেস্‌পাতি নিয়ে এসো।

তখনই তা আনা হলো। বামন একটা নেস্‌পাতি কেটে এক টুক্‌রো দ্বিতীয় সৈনিকের হাতে দিয়ে বল্‌ল—এটি খেয়ে ফেলো বন্ধু। পর পর আরো কয় টুক্‌রো দিয়ে বামন বল্‌ল—ব্যস্ আর নয়!

তার নাক তখন কম্‌তে আরম্ভ করেছে। একটু পরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো।

বামন তাদের দুর্ভাগ্যের কথা সবই জান্‌তে পেরেছিল; সে বললে—তোমরা কয়েকটা আপেল ও নেস্‌পাতি সঙ্গে নিয়ে যাও। সেই রাজকন্যাকে প্রথমে আপেল খেতে দিও। তখন তারও তোমার মত অবস্থা হবে। তখন তাকে বলো—সে তোমাদের জিনিষগুলো আগে ফিরিয়ে দিক্ তবে নাক ভাল হবে, তার আগে নয়। সে তোমাদের সব জিনিষ ফিরিয়ে দিলে তখন তাকে নেস্‌পাতি খেতে দিও, তবেই তার নাক ভাল হয়ে যাবে। যাও আর দেরী করো না!

তারা আবার সেই রাজ্যে এসে উপস্থিত হলো। দ্বিতীয় সৈনিক তখন মালীর বেশ ধারণ করে একটা ঝুড়িতে আপেল নিয়ে রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত। সে রাজামশাইকে অভিবাদন করে বল্‌ল—

মহারাজ, আমার গাছের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল রাজকুমারীর জন্য এনেছি!

তিনি লোক দ্বারা মালীকে রাজকুমারীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। পাকা আপেলগুলি দেখে রাজকুমারীর মন খুসিতে ভরে গেল। সে ফলগুলি নিয়ে মালীকে আশাতীত পুরস্কার দিল। মালী মহা খুসি হয়ে চলে গেল।

রাজকুমারী আর লোভ সামলাতে পার্‌ল না! মালী যেতে না যেতেই সে একটি ফল কেটে খেতে আরম্ভ করে দিল। এমন সুমিষ্ট ফল সে পূর্ব্বে আর কখনো খায়নি। একটি শেষ হতেই সে আর একটিতে কামড় বসালো। অনেকক্ষণ থেকেই তার নাক্‌টা কেমন সুড়সুড় কর্‌ছিল। খেতে ব্যস্ত ছিল বলে সে তখন ততটা খেয়াল করে নি। দ্বিতীয় আপেলটা শেষ করে সে তখন তৃতীয়টা ধরেছে। হঠাৎ চেয়ে দেখে তার নাক জান্‌লার উপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সটান সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আপেল খাওয়া তখন তার মাথায় উঠেছে! সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌ল। খবর পেয়ে রাজামশাই বড় বড় ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন।

রোগী দেখে ডাক্তারদের চোখ একেবারে ছানাবড়া! তাদের চোদ্দ পুরুষেও কখনো এমন রোগের কথা শোনেনি, ওষুধ দেবে কি!

রাজামশাই ঘোষণা কর্‌লেন—যে তাঁর মেয়ের নাক ভাল কর্‌তে পার্‌বে, তাকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। কোন বৈদ্যই এগুতে সাহস কর্‌ল না।

তখন সেই মালী-বেশী সৈনিক ডাক্তার সেজে এসে হাজির হলো। রাজামশাই তার হাতেই মেয়ের চিকিৎসার ভার দিলেন। সে মনে মনে বেশ খুসি হয়ে উঠ্‌ল। সেদিন আর কোন ওষুধ দিল না।

পরদিন সে এসে তাকে ছোট্ট এক টুক্‌রো নেস্‌পাতি খেতে দিয়ে চলে গেল। এবার নাক ধীরে ধীরে কম্‌তে সুরু করেছে।

পরদিন এসে দেখ্‌লে সে, নাক অনেকটা কমেছে। সে মনে মনে বল্‌ল—রাজকন্যা ভয় না পেলে আসল কাজ হাসিল হবে না। তাই সে আজ তাকে এক টুক্‌রো আপেল খেতে দিয়ে গেল। তার নাক আবার সুড়সুড় করে বাড়্‌তে আরম্ভ করেছে। দারুণ ভয়ে রাজকুমারীর মুখ শুকিয়ে একেবারে আম্‌সী হয়ে গেছে।

পরদিন এসে সে বল্‌ল—আমি মন্ত্রবলে জান্‌তে পেরেছি—তুমি অপরের দ্রব্য আত্মসাৎ করেছ, সেই পাপেই এই রোগ। সেগুলো তাদের ফেরৎ না দিলে, তোমার নাক ভাল হবার আশা নেই।

সে দৃঢ়কণ্ঠে এ অভিযোগ অস্বীকার কর্‌ল।

'জিনিষগুলো ফেরৎ না দিলে আমার সাধ্য নেই যে এ নাক ভাল কর্‌তে পারি।' বলে আর এক টুক্‌রো আপেল খেতে দিয়ে সে চলে গেল।

সব শুনে রাজামশাই জিনিষগুলো ফেরৎ দেবার জন্য মেয়েকে অনুরোধ কর্‌লেন। তখন আর সে উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না; রাজী হয়ে গেল।

পরদিন সে আস্‌তেই রাজামশাই জিনিষগুলো এনে তার হাতে ফেরৎ দিলেন। হারানো জিনিষগুলো ফেরৎ পেয়ে অতি সাবধানে যত্ন করে রেখে, রাজকুমারীকে আজ একটি আস্ত নেস্‌পাতি খেতে দিল। খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাক দ্রুতগতিতে কম্‌তে আরম্ভ করেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো।

রাজকন্যার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠ্‌ল। রাজার মনে আনন্দ ধরে না! তিনি তখনই তাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিতে হুকুম দিলেন।

তিন বন্ধুর মুখে আবার হাসি ফিরে এলো। তারা সেই প্রাসাদে ফিরে গিয়ে মনের সুখে বাস কর্‌তে লাগ্‌ল।

এবার আমার কথাটি ফুরালো।

শিশুসাহিত্য প্রসঙ্গ

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শিশু-সাহিত্যের সেবাই জাতি গঠনের সেবা, সে কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রত্যেকেই স্বীকার করবো। শিশুরাই জাতির মেরুদণ্ড, তাদের ভিৎ গড়ার মূলেই রোয়েছেন আমাদের শিশু-সাহিত্যিকগণের বিভিন্ন ধরণের

সেবা ও অবদান। বর্ত্তমান আলোচনায় তারই কিছু কিছু অবদানের কথাই অল্প কথায় বলবার চেষ্টা করব।

এবারের নিখিল ভারত-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে (মাদ্রাজ অধিবেশন) যিনি শিশু-সাহিত্যের সভাপতি নির্ব্বাচিত হোয়েছিলেন, তিনি সকলেরই পরিচিত—প্রখ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শিশুদের সাহসী ও নির্ভীক হ'বার ইংগিতই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। বাংলা দেশের ডাকাতদের বিচিত্র কাহিনীগুলিকে গল্পচ্ছলে কোরেছেন পরিমার্জ্জিত, সহজ ও সরল। সেগুলি ছেলে-মেয়েরা পড়ে পরিতৃপ্তিই লাভ কোরে থাকে।

'কৈশোরক'—মাসিক পত্রিকাটির মাধ্যমে তিনি অনেক শিশু-মনের কথাকে গল্পে-ছড়ায়-ছন্দে পরিপুষ্ট কোরেছেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীসুধাংশু গুপ্ত কিছুকাল এই পত্রিকাটি সম্পাদনায় সচেষ্ট ছিলেন।

'মাস-পয়লা' মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন, 'স্বপন-বুড়ো' ওরফে শ্রীঅখিল নিয়োগী ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ছোটদের মনের কথাকে চিঠির মারফতে কি কোরে লেখা যায় স্বপনবুড়োই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ছড়া লেখাতেও তাঁর বেশ মিষ্টি হাত—তাঁরই রচিত একটি ছড়ার কিয়দংশ আপনাদের পরিবেশন করলাম :—

"খোকা যখন হাসে—
ক্ষীর-সাগরের সোনার-কমল আপনি সুখে ভাসে !
পাখ্-পাখালি গায় কত গান,
ধীর সমীরণ মাতায় পরাণ ময়ূরপঙ্খী নাওখানি যে
আপনি ঘাটে আসে—
লাখো-লাখো ফুল ফোটে ভাই ডাকে নীলাকাশে !
খোকা যখন কাঁদে—
পাতালপুরীর কোন অজগর মনকে এসে বাঁধে !
রয় যে ঢাকা আলোর মালা—
দিনের বেলা পিদিম জ্বালা
রাজার কুমার যায় হারিয়ে দৈত্য দানার ফাঁদে।"

অখিল নিয়োগীর "বিষ্ণুশর্ম্মা" কিশোর-নাট্য সর্ব্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে (কালিকা থিয়েটারে) বহু অর্থব্যয়ে মঞ্চস্থ হয়। চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজা-গোপালাচারী ও ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু সেখানে নাটকটি দেখে প্রীত হন। তাঁরা বলেছেন, এই শিক্ষা-মূলক নাটকখানি প্রত্যেক ছেলেমেয়েদেরই খুশীর খোরাক জোগাবে।

'কৈশোরিকা' মাসিক পত্রিকা। এককালে এই পত্রিকাটির খুব নাম ছিলো। 'দৈনিক কিশোর' পত্রিকা সম্পাদনা কোরেছেন—শ্রীখগেন্দ্র মিত্র। এঁর লিখিত জীবনী, খেলা-ধুলা, ছবি-ছড়ায় কিছু দিন ছেলে-মেয়ে মহলে খুশীর খোরাক জুগিয়েছিলো। শ্রীখগেন্দ্র মিত্র বর্ত্তমানে অনেক তথ্য পরিবেশন করছেন, বিভিন্ন কিশোর পত্র-পত্রিকায়।

'কিশোর-বাংলা' মাসিক পত্রিকা। সম্পাদনা করেন, শ্রীঅরূপ ওরফে স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পত্রিকাটির অনেক নোতুন নোতুন বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রত্যেক মাসের সম্পাদকীয় মহলে সেই মাসের স্মরণীয় ঘটনাবলী এবং যাঁদের রচনা প্রকাশিত হোত, সেই সকল কবি ও সাহিত্যিকদের সাধারণ পরিচিতিও দেওয়া হোত।

'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকা। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত। এতে কিছুদিন কিশোর-আলোচনার একটি বিভাগ বা দপ্তর ছিল। রচনাগুলি সহজ ও সরল ভাষায় লেখা—ছেলে-মেয়েরা পড়ে খুবই আনন্দ উপভোগ করতো।

'খোকা খুকু' মাসিক পত্রিকা। সম্পাদনা করেন শ্রীনিশিকান্ত সেন। ছেলে-মেয়েদের গঠন ও নীতি-মূলক গল্প-কবিতা, ছবি-ছড়াতে পূর্ণ ছিল। শ্রীসুকুমার দে সরকার—জন্তু-জানোয়ারের গল্প লেখায় তাঁর হাত খুব মিষ্টি ছিল। বরদাকান্ত মজুমদার—ছেলে-মেয়েদের অনেক হাসি খুশীর মাল-মসলা দিয়েছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর—বিভিন্ন প্রকাশকেরা তাঁর বিভিন্ন ধরণের গল্পের বই প্রকাশিত ক'রে থাকেন। শিশুসাথীরও জনপ্রিয় লেখক।

শ্রীধীরেন বল। রেখা ও লেখায়, মন-মাতানো ছবি-ছড়ায় নানাভাবে ছোটদের মন ভুলিয়েছেন। তাঁর কার্টুনও প্রশংসনীয়।

শ্রীহরেন ঘটক। 'স্বপন' বুড়ো পরিচালিত 'যুগান্তর-পাত্তাড়িতে' "শেয়াল-পণ্ডিতে"র ছড়া কার্টুন সহযোগে লিখে থাকেন। একটু নমুনা দিলাম :—

"কাঁকড়া ধরা শিখ্‌তে পারিস
একটা শুধু-সর্ত্তে,
আধা-আধি বখ্‌রা দিবি
তাহার পরিবর্ত্তে !
ওরে বাবা ! গেলাম মারা
ব্যাপার এ নয় তুচ্ছ !
কর্কটেরি দংশনে আজ
বিপন্ন মোর পুচ্ছ।"
—"কাঁকড়া শিকার।"

শ্রীমতী লীলা মজুমদার—ছেলে-মেয়েদের মাঝে তিনি নিজেকে অনেক-খানি বিলিয়ে দিয়েছেন। তাদের মনের সাড়ায় যোগ দিয়ে তাদেরই মনের কথাকে লেখনীতে প্রকাশ করেছেন সরল ও মিষ্টি ভাষায়। ইনি এখন বেতারে ছেলেমেয়েদের বিভাগের ভার নিয়েছেন।

শ্রীমতী আশা দেবী—ছড়ায়, কবিতায় আর গল্পে তাঁর লেখা ছেলে-মেয়েদের কাছে ভালোই লাগে। তাঁরই রচিত একটি মজার ছড়া উদ্ধৃত করলাম :—

"লাল তারা নীল তারা ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্,
সাত ভাই চাঁপাদের মিঠে হাসি ফিক্‌ফিক্।
ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝুমঝুম্ দিনারীর থমথম্,

ঘুম নেই ঘড়িটার বেজে চলে টিক্‌টিক্।
লাল তারা নীল তারা ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্।"

—"রাতের ছড়া।"

শ্রীমতী সুখলতা রাও—তাঁর কবিতার ছন্দ গভীর দোলাই দেয় ছোট ছেলে-মেয়েদের মহলে। ছোট্ট কবিতা—শিলা-বৃষ্টির নমুনাতে বোঝা যাবে :—

"বৃষ্টির মেঘ এলো　　কালো রঙ হ'য়ে গেলো
আকাশের নীল।
গুরু গুরু দে'য়া ডাকে　　বিদ্যুৎ ফাঁকে ফাঁকে
করে ঝিলমিল।
ঝম্ ঝম্ বাজে মল　　নামে বৃষ্টির জল
হাসে খিলখিল।
ঠুস্‌ঠাস্ চারিদিকে　　ছুঁড়ে মারে পৃথিবীকে
মুঠো মুঠো শিল।"

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী—তিনি কোলকাতার বেতারে "শিশু-মহলে" ইন্দিরা-দি নামেই পরিচিতা। এই অনুষ্ঠানের মারফতে তিনি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের মেলা-মেশার সুযোগ দিয়েছেন। তাদের মনের গভীর আকাঙ্খাকে তাদেরই সংগে শিশু হোয়ে পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়াই তাঁর এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেগুলির জন্য ছবি-ছড়ার-গান, জীবনী, খেলা-ধুলা, নাটক, অভিনয়, চিঠির জবাব আরও—কত তথ্য সংগ্রহ কোরে শিশুদের মন মাতিয়ে রেখেছেন।

কুমারী বিজয়া রায়—ছোটদের কবিতায় "কথামালা"-র গল্পগুলি লিখে কুমারী বিজয়া খ্যাতি অর্জন করেছেন শিশু-মহলে। শিশু-উপযোগী ছন্দে কবিতা লেখাতেও তাঁ'র হাত মন্দ নয়। "ভগবান-ভূত"—তাঁরই রচনা।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী—রস-রচনায় সুনাম আছে। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে দৈনিক বসুমতীতে শ্রীপ্রশান্ত চৌধুরী (পথেরসাথী) পরিচালিত "আমাদের-পাতা"-য়, এক নিঃশ্বাসের গল্পে, ছেলে-মেয়েদের উৎসাহিত করেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। গল্পের বই আর ডিটেক্‌টিভ রচনায় তাঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। কবিতা লেখাতেও তাঁ'র হাত খুব মিষ্টি। "নতুন ভারতের পঞ্চবীর"—কবিতাটিতে বলেছেন যে সুভাষচন্দ্রের (নেতাজীর) দ্বারা গঠিত স্বাধীন জাতীয় বাহিনীর সংগে যখন ইংরেজ ও আমেরিকানদের যুদ্ধ চলছিল, তখন ব্রহ্মদেশে কি ঘটনা ঘটেছিলো তারই বর্ণনা :—

"অলঙ্ঘ্যণ মৃত্যু—"মাইন"—ভারতের পাঁচছেলে,
সমরক্ষেত্রে ছোটে ভীমবেগে হতাহত দেহ ঠেলে।
সাঁজোয়া-গাড়ীর শ্বেত সারথিরা ভাবে ঐ পাঁচজন,
তাহাদের কাছে করিতে আসিছে আত্মসমর্পণ।"

*　*　*　*

"পঞ্চ বীরের দেহের সংগে পঞ্চ সাঁজোয়া যান,
বিপুল শূন্যে অণু অণু হোয়ে লভে মহানির্ব্বাণ ;
বাকি গাড়ি নিয়ে শত্রুরা সব সভয়ে পালালো ছুটে ;
'জয় জয় জয় বিজয়ী ভারত !' সকলে গাহিয়া উঠে।"

শ্রীযামিনীকান্ত সোম—"ছোটদের রবীন্দ্রনাথ"—বইখানি তাঁর বেশ সুনামই এনেছে। তাঁর লেখার ভেতর পাওয়া যায়, পুরানো দিনের স্মৃতিকে যুগে যুগে জাগিয়ে রাখার ইংগিত।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার—ছোটদের কবি-সাহিত্যিক ইনি। এঁর রচিত "হাসি-খুশী"-র বই বাঙলার ঘরে ঘরেই সুপরিচিত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ছবি-ছড়াগুলি সহজেই আয়ত্ত কোরতে পারে। ছোটদের রামায়ণ মহাভারতের গল্পও তাঁর অন্যতম রচনা।

কবি শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—ইঁনি রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের মধ্যে অন্যতম। মাসিক প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ এবং রবিবাসরীয় সাহিত্যের সভাতে দীর্ঘদিন সেবা কোরে আসছেন। মৌচাকে ও শিশুসাথীতে তাঁর শিশু-উপযোগী কবিতা উত্তরোত্তরই প্রকাশিত হোয়ে থাকে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—"পথের-পাঁচালী"—তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। অপুর পাঠশালার বর্ণনা এবং তা'র কবি-প্রবণ মনের নিগূঢ় তত্ত্বটিকে বিভূতিভূষণ এক অভিনব রূপ দিয়ে বলেছেন :—

"কেবল অতীত দিনের পাখী-ডাকা গ্রাম্য-সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি গ্রাম্য বালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত !"

—"অপুর পাঠশালা।"

শ্রীশান্তিপাল—সাঁতারে তাঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। সাঁতারু শান্তি পাল নামেই তিনি পরিচিত। ছোটদের উৎসাহ দিতে ও শিশু-উপযোগী কবিতা লেখায়— সচেষ্ট আছেন।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু। ছড়ার কবিতায় তিনি পরিচিত। এলো-মেলো ছন্দে অনেক সুন্দর সুন্দর শিশু-ভোলানো ছড়া আছে। নমুনাতেই বোঝা যায় :—

"নাম প্যালারাম, মোরা ডাকি জরাসন্ধ,
চট্ ক'রে ক্ষেপে ওঠে কবিতার গন্ধে।
সাবধান, কবি বলে কর্‌বে যে সন্দ
ভুলে যদি তার সাথে কথা কও ছন্দে।"

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়—ইঁনি শিক্ষাব্রতী। তাঁর কবিতা সাময়িক পত্রিকায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ছোটদের জন্যেও কবিতা লিখে থাকেন।

শ্রীপ্রভাকর মাঝি—ইঁনি শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন এবং বহু পত্র-পত্রিকায় উত্তরোত্তর কবিতা-গল্প প্রকাশিত হোয়ে থাকে। ছেলেদের ছুটির মাসে লিখে জানিয়েছেন :—

"গ্রীষ্মের ছুটি আজ ইস্কুল বন্ধ,
আয় ছুটে ন্যাড়া-ভোলা-মন্টু ও নন্দ।
ঘোষেদের গাছে আম থোকো থোকো ঝুলছে,
সবুজের 'পরে আজ কে সিঁদুর গুলছে!

শ্রীরবিদাস সাহারায়—গল্পে ছোটদের কবিতা রচনা ক'রে থাকেন। তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ বিভিন্ন কিশোর পত্রিকাতে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে।

কটক বন্দ্যোপাধ্যায়—শিশুদের উপযোগী তাঁর বহু কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হোয়েছিল। কিছুদিন হোলো ইঁনি পৃথিবী থেকে চির-বিদায় নিয়েছেন। নিম্নে তাঁর রচনার নমুনা দেওয়া গেল।

"ওই যে চাষী কান্তারাম,
ও শুধু কাজ করে আর হাসে,
লাভ লোকসানের বালাই নেই।
যদি বলি, 'কান্তদা, কেন খাট এত?
উত্তর দেয় সে, 'তুম্‌রা তবে খাবা কি?'
—"চাষী কান্তারাম।"

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী—ইনি প্রবীণা হ'লেও শিশুদের কবিতা লেখাতেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন ক'রেছেন। তাঁর রচনার কিছু নমুনা আপনাদের কাছে দিলাম :—

"খুকুর ছিল একটি কুকুর,
নাম ছিলো তা'র 'আচ্ছা,'
'আচ্ছো' যখন নেহাৎ ছোট—
বল্‌তো সবাই 'বাচ্ছা!'
কুকুর ছানার প্রদর্শনী বস্‌লো যেবার বংগে
'বাচ্ছা' নিয়ে 'ডগ্‌-শো'তে সেই
বাচ্ছা কুকুর সংগে
'প্রথম' হ'য়ে ফিরলো বাড়ী, এ্যায়সা কুকুর বাচ্ছা—
"কোই না দেখা' বললে সবাই—
'বাচ্ছা' সব সে আচ্ছা!"
—"আচ্ছা।"

তরুণ উদীয়মান কয়েকজন কিশোর সাহিত্যিকও আজকাল শিশু-সাহিত্য সেবায় উন্নতি সাধন ক'রে চলেছেন। সাময়িক পত্রিকার মারফতে দু' এক জনের লেখা সুনজরেই পড়ে। শ্রীঅশোক দাশ, শ্রীঅশোক নী ও কল্যাণ গুহ প্রভৃতি—

শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ—চিত্র-শিল্পী ও ব্যঙ্গ-কবি। শিশুদের পাঠ্‌তাড়িতেও মাঝে মাঝে যোগ দিয়ে থাকেন। ছড়ার সাথে কার্টুন ছোটোরা সুর মিলিয়ে গায় :—

"বক মামা ও বক মামা গো টিপ্‌টা দিয়ে যাও,
গাছের মাথায় ছ'পণ কড়ি গুণে নিয়ে যাও।
* * * মালীদের ঐ কালো শোলোক্ বেঁধে,
বক মামাকে ডেকেই সারা সেধে।"
—"বকরা যায় উড়ে।"

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী—চিত্র-শিল্পী, ছোটদের ছড়া-ছবিতে উপহার দিয়েছেন অনেক লেখা ও রেখা। তাঁর ছবি ও ছড়া-কবিতা নামকরা শিশুদের পত্র-পত্রিকায় বাহির হয়ে থাকে। 'তোমরা থাকো'—র খানিকটা নমুনাতে তাঁকে বোঝা যাবে :—

"থাক্ তোমাদের মস্ত সহর
কোটরগত ঘুণ-ধরা,
নিরেট কোরে কবর গ'ড়ে
খাঁচায় থাক্ মন-মরা।
আমরা যা'ব ছাতিম তলায়
কিম্বা খোলা ময়দানে,
চু-কিৎ-কিৎ-খেলতে হ'বে
মুক্ত হাওয়ায় সবখানে।"

শিল্পী শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীত্রিভঙ্গ রায়, শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তী. ফণীগুপ্ত, শ্রীনরেন্দ্র দত্ত, কাফি খাঁ ওরফে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, P. C. L. শ্রীসমর দে, শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার প্রভৃতি। তাঁদের হাতের নিখুঁত চিত্র-শিল্পের সংগে প্রত্যেকেই পরিচিত।

শিশু-সাহিত্যে আরও অনেক প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের কিছু না কিছু অবদান র'য়ে গেছে। সকলের পরিচয় পুংখাপুংখানুরূপে হয়তো বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব হ'ল না—তবে পুনরায় তাঁদের অনুসন্ধানের আশায় রইলাম। প্রাথমিক ভাবে আমরা আরও যাঁদের পরিচয় পাই তাঁদের নামও এই সংগে উল্লেখ করলাম :—

শ্রীরজনীকান্ত সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীনিশীথ রায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কামিনী রায়, কাজি নজরুল ইসলাম, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীঅশোক মিত্র, শ্রীবিনয় গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীআশাপূর্ণা দেবী, শ্রীমতী সুধা দোব্‌জা, শ্রীতারাপদ রাহা, বন্দেআলীমিঁয়া, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, রামনাথ বিশ্বাস (ভূপর্য্যটক), জসীমউদ্দীন, শ্রীমন্মথ রায় প্রভৃতি। এঁরাও শিশুদের মনের খোরাক জুগিয়ে সুনামই অর্জন কোরেছেন। অনেকের লেখা গল্প—ছবি ছড়া ছোটরা মাঝে মাঝে নাম-করা পত্র পত্রিকাতে দেখে বা পড়ে থাকে। এঁদের মধ্যে এখনও অনেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখে থাকেন।

শিশুদের সাহিত্য যাঁরা রচনা কোরেছেন বা যাঁ'রা কোরবেন, সহজ-সরল এবং ছেলে-মেয়েদের বোধগম্য ভাষাতেই তাঁদের রচনা করা উচিত। কচিও কাঁচাদের মনের ভাষা যেন তা'রা খুসী মনেই গ্রহণ কোরতে পারে, এটাই আমরা ছোট-বড় সকল শিশু-সাহিত্যিকের কাছেই নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করবো। এদের মনের কথা বলতে হোলে লেখক-লেখিকাকে ছোট্ট ছেলেমেয়ে সাজ্‌তে হ'বে—নিজেদের মনেই জাগাতে হ'বে তাদের পাম-খেয়ালী ছন্দের প্রশ্ন। জবাব দিতে হ'বে তাদেরই ভাষায়। তবেই সার্থক হ বে সেই সকল রচনা।

বাঙলা দেশে শিশু-সাহিত্যের পুষ্টির এখনও কিছুটা অভাব র'য়ে গেছে—সেটুকু পরিপূর্ণ করার জন্য আমরা তাঁদের অনুরোধ জানাবো, যাঁ'রা এই বিষয়ে সচেষ্ট ও উদ্যোগী আছেন বা ভাবী-কালের অপেক্ষায় আছেন। কারণ আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ কোরেছিলাম যে—"শিশুরাই-জাতির পিতামাতা।" তাদের মেরুদণ্ড শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার-আচরণে, ধৈর্য্য সাহসে শক্ত কোরে গ'ড়ে তোলবার গুরুদায়িত্বই তো হলো শিশু-সাহিত্য-সেবীদের। এ বিষয়ে তাঁদের প্রত্যেককেই বিভিন্নভাবে সচেতন ও সচেষ্ট হোতে আহ্বান জানাচ্ছি।

শতদল

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একখানি চিঠি

প্রায় দুবছর কেটে গেছে। একদিন সন্ধ্যার রাইনহার্ট কাগজপত্র নিয়ে যে সহপাঠীর সঙ্গে বাসায় বসে একত্রে পড়াশুনা করত তার অপেক্ষা করছে, এমন সময় কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল। "এস!" বন্ধু নয়, ল্যাণ্ডলেডি!

"হের ভারনার, তোমার একখানি চিঠি আছে!"—বলে চিঠি হাতে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

বাড়ি থেকে আসার পর রাইনহার্ট এলিজাবেথকে কোনও চিঠি লেখে নি—সেও তার কাছ থেকে চিঠি পায় নি। এ চিঠিও তার নয়—মায়ের হাতের লেখা চিঠি। রাইনহার্ট চিঠি খুলে পড়ল এবং আবার নিম্নলিখিত অংশটুকু পড়ল :—

"তোমার এই বয়সে বাছা, প্রত্যেকটি বছরই নতুন রূপ ধরে আসছে—কারণ যৌবন কার্পণ্যের বা দারিদ্র্যের ধার ধারে না।—এখানে কিন্তু অনেক কিছুই অন্যরূপ হয়ে গেছে এবং তা জেনে তুমি মনে ব্যথাও পাবে খুব বেশী, কারণ আমার কাছে ত তোমার মনের খবর অজানা নেই। —এতদিন পরে গতকাল এরিথ এলিজাবেথের সম্মতি পেয়েছে। অবশ্য গত কয়েকমাসের মধ্যে সে একাধিকবার এলিজাবেথের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গিয়েছিল। এলিজাবেথ প্রথমে কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিল না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে স্বীকৃতি দিয়েছে।—তারই বা দোষ কি?—তার ত এখনও বুদ্ধি পাকে নি।—বিয়ে শিগগিরই হচ্ছে। বিয়ের পর মা-মেয়ে উভয়েই এরিথের সঙ্গে এখান থেকে চলে যাবে।"

ইমেন হ্রদ

আবার একটি বছর কাবার হয়ে গেল। বসন্তের ঈষদুষ্ণ বিকাল। ছায়াবহুল ঢালু বনপথে চলেছে একজন সুদর্শন যুবক—মুখমণ্ডল তার শক্তিব্যঞ্জক, রৌদ্রতপ্ত। গম্ভীর চোখে বহুদূর পর্য্যন্ত সে একবার দেখে নিল। একঘেয়ে পথে চলতে তার মন টানছিল না—নতুন পথে বাধবাধও ঠেকছিল। কিছুক্ষণ পরে সে একখানি খামারের গাড়ী দেখতে পেল। ধীরে ধীরে গাড়ীখানি নাচে থেকে উপরের দিকে উঠছিল।

গাড়ীর সঙ্গে যে চাষী যাচ্ছিল তাকে যুবক জিজ্ঞাসা করল—"হ্যাঁগো, এই পথই কি ইমেন হ্রদে গিয়ে পড়েছে?"

লোকটি তার গোল টুপিটি একটু নেড়ে বলল—"হ্যাঁ, ঠিক নাক বরাবর চলে যান, বাবু।"

"আচ্ছা, এখান থেকে ইমেন হ্রদ কতদূর হবে?"

"আধ পাইপ তামাক পুড়তে না পুড়তেই সেখানে পৌছাবেন। খামারের মালিকের বাড়িও হ্রদের গা ঘেঁসেই।"

চাষী চলে গেল। যুবকও দ্রুত পদক্ষেপে গাছের ছায়ায় এগিয়ে চললেন। প্রায় পনের মিনিট পরে বাঁ ধারের গাছের ছায়া শেষ হয়ে গেলে পথটি চলল একটি উঁচু টিলার উপর দিয়ে। টিলার উপরে তেমন পুরানো বড় গাছ নেই। টিলা পেরিয়ে সামনে পড়ল দূরপ্রসারী রৌদ্রস্নাত মাঠ—দূরে অনেক নীচে হ্রদ—প্রশান্ত, গাঢ় নীলজলপূর্ণ। হ্রদের প্রায় চার পাশেই বনরাজি-বেষ্টিত—কেবল একটি জায়গা ফাঁকা এবং তার ভিতর দিয়ে বহু

দূরের একটি পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। বনের সবুজ পত্রাবলীর আড়াআড়ি অজস্র ফলের গাছ শাদা ফলসম্ভারে বরফাবৃত মনে হচ্ছিল। ফলবাগিচা ছাড়িয়ে উচ্চ তটভূমির উপর লাল ইটের তৈরি মালিকের বাড়ি মনোরম দেখাচ্ছিল। বাড়ির চিমনির উপর থেকে একটি বক চক্রাকারে কিছুক্ষণ উড়ে ধীরে ধীরে গিয়ে হ্রদের জলে নামল।···"এই ইমেন হ্রদ"—স্বগতভাবে বলে উঠল যুবক। তা হলে সত্যিই সে তার ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছে গেছে।

কিছুক্ষণ নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—বিকালের স্নিগ্ধ সোনালী রৌদ্রে তটস্থ বনের এবং বাড়ির ছায়া হ্রদের নির্মল জলে কি অপরূপ সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তার পর সে আবার চলতে শুরু করল! পাহাড়ের ঢালু পথে চলবার সময় সে গাছের ছায়ায় ছায়ায় যেতে থাকল। মাঝে মাঝে ডালের ফাঁকে ফাঁকে হ্রদের দিকে দৃষ্টি পড়ায়—হ্রদের জল রৌদ্রে চিকমিক করছে দেখতে পাচ্ছে। আবার সে একটা চড়াইতে উঠতে লাগল—দু' পাশের গাছ ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসছে—ঘন পল্লবযুক্ত আঙুরের ক্ষেত পথের দুধারে—তার পরেই উভয় পার্শ্বে প্রস্ফুটিত ফল-গাছের শ্রেণী—গাছে গাছে অজস্র মৌমাছি গুঞ্জনরত। সহসা তার চোখে পড়ল ব্রাউন ওভারকোট পরিহিত সুদর্শন যুবক তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসে সে তার টুপিতে হাত দিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল—"এস এস ভাই রাইনহার্ট, তোমার অপ্রত্যাশিত আগমনে আমাদের ইমেন হ্রদের পল্লীভবন আনন্দমুখর হোক।"

যুবক বলল—"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, এরিখ। তোমার এই সাদর আমন্ত্রণের জন্য অজস্র ধন্যবাদ!"

তারপর আরো কাছে এলে প্রগাঢ় প্রীতির সঙ্গে উভয়ে উভয়ের করমর্দন করল। পুরাতন স্কুলের সহপাঠীকে এরিখ বলল—"তা হ'লে সত্যিই তুমি আমাদের এখানে এলে?"

"হ্যাঁ এরিখ, সত্যিই আমি এবং তুমিও বটে—তফাতের মধ্যে তোমায় পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।"

এই কথায় এরিখ হর্ষের হাসি হাসল এবং তাতে তার স্বভাব-সরল চেহারা আরও প্রফুল্লতর হয়ে উঠল। "হ্যাঁ ভাই রাইনহার্ট, ইতিমধ্যে আমার ভাগ্য খুব খুলে গেছে—বোধকরি জান সে খবর!"—এই বলে সে আবার রাইনহার্টের দিকে হাত বাড়িয়ে খুব খুসীর সঙ্গে করমর্দন করে বলল—"সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—কেউ আশা করে নি—একেবারে আশার অতীত!"

"আশ্চর্য্য ব্যাপার? কার তরফ থেকে?" রাইনহার্ট জিজ্ঞাসা করল।

"এলিজাবেথের পক্ষে!"

"এলিজাবেথ! আমার কথা তুমি তাকে জানাও নি ত?"

"কিছু না, ভাই রাইনহার্ট সে এখন তোমার কথা আদৌ মনে করে না—তার মাও না!"

"সেই জন্যই ত আমি গোপনে তোমায় লিখেছি—যাতে বেশী আনন্দ পেতে পারি। তুমি ত জান, আমি বহুদিন ধরে মনে মনে এই আশা পোষণ করে আসছিলাম।"

রাইনহার্ট বিচলিত হয়ে পড়ল। বাড়ির যতই নিকটে আসবে—শ্বাস নিতে তার যেন ততই বেশী কষ্ট হচ্ছে। পথের বাঁ ধারের আঙুরের ক্ষেত শেষ হয়ে আরম্ভ হল সবজি বাগ—এই বাগান বিস্তৃত হয়ে ক্রমশঃ নেমে গেছে হ্রদের কিনারা পর্য্যন্ত। বকটি ইতিমধ্যে মাটিতে নেমে সবজি ক্ষেতের আলের মধ্যে গম্ভীর ভাবে পদচারণা করছে। এরিখ হাততালি দিয়ে জোরে বলে উঠল—"দেখ দেখি, মিশরীয় (বক) আমার মটরশুটির চারাগুলি তছনছ করছে।"

পাখীটি ধীরে ধীরে উড়ে একটি নতুন তৈরি বাড়ির ছাদে গিয়ে বসল। এ ঘরটি সবজি বাগানের শেষপ্রান্তে এবং এর দেয়ালের উপর ঝুঁকে পড়েছে পিচ এবং আখরোট গাছের ডালপালা। "ঐ দেখ ডিসটিলারী—দু বছর হ'ল আমি ওটা চালু করেছি। ফার্মের ঘর-বাড়ি বাবাই তৈরি করে গেছেন—বাসগৃহটি অবশ্য ঠাকুরদার আমলের—কাজেই বুঝতে পারছ, ক্রমশই কিছু কিছু বাড়ানো হচ্ছে।"—এরিখ বলল।

এই কথা বলতে বলতে তারা বেশ একটু ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। এ জায়গাটি খামার-বাড়ির পাশে এবং প্রধান বাসগৃহের পিছনে অবস্থিত। এর দুপাশে উঠে

সৌন্দর্য্যের রানীর কান্তি আপনারও হতে পারে!
দিনে দিনে সুন্দর
হয়ে উঠুন...
হ্যাঁ, আপনারও উজ্জ্বল সুন্দর কান্তির স্বপ্ন সফল হয়ে উঠতে পারে! প্রতিবার স্নানের অথবা মুখ ধোয়ার সময় রেক্সোনার ক্যাডিল সমৃদ্ধ ফেনা গায়ে মুখে ভাল করে মেখে ধুয়ে ফেলুন। আপনার কান্তি দিনে দিনে আরও সতেজ আরও মসৃণ লাবণ্যে ভরে উঠবে।
"মিস রেক্সোনা"
১৯৫৫ সালের রেক্সোনা
সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতার
শ্রেষ্ঠ সুন্দরী
...রেক্সোনার
সাহায্যে স্বাভাবিকভাবে
একমাত্র ক্যাডিল* যুক্ত সাবান
* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈলসমূহের এক বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
বড় সাইজেও পাওয়া যায়
RP. 134-X52 BG
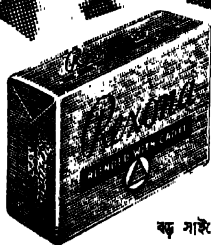
গেছে বাগানের উঁচু দেয়াল—তার পিছনে দেখা যাচ্ছে ইউগাছের সারি—তারও পিছনে পুষ্পশোভিত গাছের সারি—আর এই সব গাছের ডাল ঝুলে পড়েছে উঠানের উপর। সারাদিনের কর্মক্লান্ত রৌদ্রতপ্ত কর্মীরা ইতস্ততঃ যাবার সময় বন্ধুদ্বয়কে নমস্কার জানাচ্ছিল। এদের কোনও কোনও লোককে ডেকে দিনের কাজ কতদূর কি হল সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল এরিথ। এর পর তারা বসত-বাটিতে এসে পৌছাল। উঁচু, ঠাণ্ডা একটা দরদালানে তারা ঢুকল। এর শেষপ্রান্তে গিয়ে তারা বাঁদিকে মোড় ফিরে কয়েক পা গিয়ে একটি দরজা খুলে একটি প্রশস্ত উদ্যানগৃহে প্রবেশ করল। ঘরের সামনা-সামনি দুটি জানালার উপর ঝুলে পড়েছে বসন্তসুলভ প্রচুর পত্রপুষ্পযুক্ত লতানো গাছ। ফুল বাগানের মাঝখানটি দিয়ে চলে গেছে সোজা চওড়া লাল কাঁকর-বিছানো পথ। সেই সোজাসুজি তাকালে হ্রদের এবং তার অপর-পারের বনশ্রেণীর মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে।

বাগানের দিকের দরজার পাশে শান-বাঁধানো একটা উঁচু জায়গায় একটি তরুণী উপবিষ্ট। ঘরে লোক দেখে সে উঠে তাদের দিকে এগিয়ে এল, কিন্তু অর্ধেক পথ এসেই সে থমকে দাঁড়াল এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে নবাগতের পানে চেয়ে রইল। নবাগত হাসিমুখে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। "রাইনহার্ট, আ কপাল, তুমি এখানে কি মনে করে?—অনেকদিন তোমায় দেখিনি"—বলে উঠল তরুণী।

"হ্যাঁ, অনেকদিনই বটে!"—এই বলে রাইনহার্টের আর বাক সরল না—সে কি একটা অসহ্য অব্যক্ত বেদনা বোধ করল হৃদয়ে। কমনীয় মূর্তি—সেই মূর্তি—যে ক' বছর আগে তাদের নিজেদের শহরে তাকে বিদায় জানিয়েছিল।

এরিথ হর্ষোৎফুল্লমুখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। সে বলল—"এলিজাবেথ, একে আমি তোমার জিম্মায় দিলাম—যাকে তুমি আদৌ প্রত্যাশা করনি—আর কখনো দেখবে বলেও ভাবনি।" এরিথের প্রতি সহোদরাসুলভ সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এলিজাবেথ বলল—„এরিথ, এ তোমার যথেষ্ট অনুকম্পা।"

সে তার ছোট্ট হাতখানি আদর করে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল—"একে যখন একবার আমাদের মধ্যে পেয়েছি, আর শিগগির ছাড়া হবে না—এ দীর্ঘ-কাল বাইরে একা একা ছিল—একে আবার আমাদের আপন করে নিতে হবে। দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ—কেমন বিদেশীর মত সম্ভ্রান্ত শহুরে চেহারা হয়েছে এর!"

এলিজাবেথের সলজ্জ দৃষ্টি খনিকের জন্য রাইনহার্টের মুখের উপর পড়ল, "এখন কিন্তু আমাদের আর একত্র থাকা ঠিক হবে না"—রাইনহার্ট ধীরভাবে বলল।

ঠিক এই মুহূর্তে একতাড়া চাবি হাতে করে এলি-জাবেথের মা দরজার কাছে এলেন।

তার পর উভয়ের মধ্যে কুশল প্রশ্নাদির অনেকক্ষণ অবধি চলল। অবশেষে মেয়েরা তাদের কাজ নিয়ে বসল।

পরদিন রাইনহার্ট এরিথের সঙ্গে বেরিয়ে তাদের ক্ষেত-খামার, আঙুর ও যবের ক্ষেত এবং ডিসটিলারী পরিদর্শন করল। সব কিছুই বেশ সুবিন্যস্ত—সুন্দরভাবে গোছানো। ক্ষেতে এবং কারখানার যে সব লোক খাটছে, তাদের সবারই বেশ স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল চেহারা দেখে রাইনহার্ট খুব খুসী হল। দুপুরে পরিবারস্থ সকলে উদ্যানগৃহে সমবেত হত এবং গৃহকর্তার কাজের অবসর অনুসারে দিনের অবশিষ্ট অংশটা প্রায় পরস্পরের সাহচর্যেই কাটত। কেবল রাত্রের আহারের পূর্বে এবং সকালের দিকে কিছু সময় রাইনহার্ট নিজের কাজ-কর্ম কিছু কিছু করত। গত কয়েক বছর থেকেই যেখানেই সন্ধান পেত সেখান থেকেই লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করত। এখানে এসে সেগুলি শ্রেণীবদ্ধ করার কাজে এবং এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোক-সঙ্গীত সংগ্রহেও ব্যাপৃত ছিল। এলিজাবেথ বরাবরই ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে। এরিথের সতত প্রবহমান সর্বতোমুখী স্নেহধারা সে বিনয়-নম্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই গ্রহণ করত। রাইনহার্ট কিন্তু ভাবত যে আগের সেই চপলা হাসিখুসী মেয়েটী একেবারে শান্তশিষ্ট বধূটিতে পরিবর্তিত হয়েছে।

এখানে আসার দ্বিতীয় দিন থেকেই রাইনহার্ট বিকালে হ্রদের ধারে বেড়ানো আরম্ভ করল। পথ বাগানের ঠিক গা ঘেঁসেই গেছে। বাগানের শেষপ্রান্তে উঁচু জায়গায় বড় একটা বীচ গাছের নীচে একখানি বেঞ্চি পাতা। এলিজাবেথের মা এর নাম দিয়েছিলেন সান্ধ্য বেঞ্চি। কারণ সন্ধ্যার সময় বিশেষতঃ সূর্যাস্ত দেখবার এটা প্রশস্ত জায়গা। একদিন সান্ধ্য ভ্রমণান্তে রাইনহার্ট এই পথে

ফিরছে এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামল। জলের ধারে একটি লেবু গাছের তলায় সে দাঁড়াল, কিন্তু বৃষ্টির মোটা মোটা ফোঁটা পাতা ভেদ করে তার গায়ে এসে পড়তে লাগল। একেবারে যখন শেয়ালভেজা হয়ে গেছে, তখন তাড়াতাড়ি করে লাভ নেই ভেবে সে ধীরে ধীরেই বাড়ির দিকে চলল। তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে, বৃষ্টির ফোঁটাও আগের মতই পড়ছে। এইভাবে সে যখন সান্ধ্য বেঞ্চির কাছাকাছি এসেছে তখন সেই বীচ গাছের গুঁড়ির কাছে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে বলে তার মনে হল। যখন আরও কাছে এসে চিনবে চিনবে করছে—তখন সে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। মনে হল সে যেন কারও প্রতীক্ষা করছে। রাইনহার্ট বুঝল—এ নিশ্চয় এলিজাবেথ। পা চালিয়ে সে তাকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেল যখন, স্ত্রীলোকটিও বাগানের পথ ধরে বাড়ির দিকে গিয়ে একটি অন্ধকার সরুপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাইনহার্ট এ ব্যাপারের কিছু মানে বুঝতে পারল না—মনে মনে এলিজাবেথের উপর একটু চটে গেল। তার মনে একটু সন্দেহও ছিল যে এ সত্যি এলিজাবেথ কিনা—তবে একথা সে তাকে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পেল না। অবশ্য ফিরে সে সোজাসুজি উদ্যান গৃহেও ঢোকে নি, কারণ তার কৌতুহল ছিল বাগানের দরজা দিয়ে এলিজাবেথ ও ঘরে প্রবেশ করে কিনা তা লক্ষ্য করবার।

মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে

কয়েকদিন বাদে সন্ধ্যার প্রাক্কালে অভ্যাসমত পরিবারস্থ সকলে উদ্যান গৃহে সমবেত। দরজাগুলি উন্মুক্ত। হ্রদের অপর পার্শ্বস্থ বনশ্রেণীর শীর্ষদেশ বরাবর সূর্য।

রাইনহার্ট মধ্যাহ্নভোজনের পর বেরিয়ে গিয়ে এই অঞ্চলের একজন বন্ধুর নিকট থেকে স্থানীয় পল্লীগীতি সংগ্রহ করত। আজ সন্ধ্যায় তার দু'একটি গান শোনাবার জন্য সকলেই তাকে ধরল। সে তার কামরায় গিয়ে একতাড়া কাগজ নিয়ে এল—কাগজে বিশেষ যত্নের সঙ্গে লেখা কয়েকটি পাতা নজরে পড়ল।

সবাই টেবিলের পাশে বসল। এলিজাবেথ রাইনহার্টের কাছে। রাইনহার্ট বলল—"সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে পড়া আরম্ভ করা যাক—আমি কিন্তু এখনও সবগুলি ভাল করে দেখে নি।" এলিজাবেথ কাগজের ভাঁজ খুলে বলল "—এই যে একটি গান; এটি কিন্তু তোমাকে গাইতে হবে রাইনহার্ট।"

মাঝে মাঝে অনুচ্চ সুরসংযোগে তিরোল প্রদেশের পল্লী-সঙ্গীত একটি পড়ল। উপস্থিত সবাই গানটি বেশ উপভোগ করল। "এ সুন্দর গীতটী কে রচনা করেছে?" —এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করল।

এরিথ বলল—"কেন? অনন্তকাল ধরে এগুলি দর্জির দোকান, নাপিতের সেলুন আনন্দমুখর করে আসছে।"

রাইনহার্ট বলল—"এ সব গীত রচনা করতে হয় না—এগুলি স্বয়ম্ভূ—আপনা আপনি জন্মে—এগুলি আকাশ থেকে পড়ে দেশের উপর ভেসে বেড়ায় ডেইজি ফুলের বীজের মত—এখানে ওখানে,হাজার হাজার জায়গায় একই সময়ে গাইতে শোনা যায়। আমাদের জীবনের সুখ দুঃখ আমরা খুঁজে পাই এই সব গীতির মধ্যে; মনে হয় আমরা প্রত্যেকেই এদের সৃষ্টিতে বরাবর সাহায্য করে আসছি।"

রাইনহার্ট আর একটি পাতা খুলল—"উচল অচলে চড়িয়া কেনবা চাহিনু অতলতলে"—এলিজাবেথ বলল—"ওটি আমার জানা আছে; তুমি আরম্ভ কর, আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরছি।" এই বলে উভয়ে এই চমৎকার গীতটি গাইল। গানটির মানে এত রহস্যপূর্ণ যে শুনে মনেই করা যায় না যে এটা কোনও মানুষের উদ্ভাবনা। এলিজাবেথ কতকটা চাপা গলায় পুরানো সুরে সঙ্গে সঙ্গে লয় দিল।

এলিজাবেথের মা এতক্ষণ অলসভাবে তাঁর সেলাই নিয়েছিলেন। এরিথ দুই হাত পরস্পর সংবদ্ধ করে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। গানটি গাওয়া শেষ হয়ে গেলে রাইনহার্ট নীরবে পাতাটি একপাশে রেখে দিল। হ্রদের ধার থেকে গোষ্ঠে ফেরা গোধনের গলায় ঘণ্টার শব্দ আসন্ন সন্ধ্যার নৈঃশব্দের মধ্যে ভেসে আসছিল; সঙ্গে সঙ্গে রাখালবালকের সুমিষ্ট মেটোসুরে গাওয়া গানের চরণটি তাদের কানে এল—

"উচল অচলে চড়িয়া কেনবা চাহিনু অতলতলে
মরকত মালা গলায় পরিতে কেন ফাঁস দিনু গলে।"

রাইনহার্ট একটু মৃদু হেসে বলল—"শুনলে ত, এ গান মুখে মুখেই চলে আসছে।"

এলিজাবেথ বলল—"হ্যাঁ, এ রাখালবালকদের গান—মাঠ থেকে গরু তাড়িয়ে আনবার সময় তারা এতে বেশ আনন্দ পায়।"

তারা আরও কিছুক্ষণ শুনতে পেল, পরে গোলাবাড়ির পিছনে পড়ায় আর শোনা গেল না।

রাইনহার্ট বলল—"এ গানের কোনও বয়স নেই—এ সব গান বনের তলে ঘুমিয়ে থাকে। ঈশ্বর জানেন, কে কবে এদের খুঁজে বের করেছে।"

সে আর একটি নতুন পাতা টেনে বের করল।

ইতিমধ্যে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে; সন্ধ্যার একটা রক্তিম আভা হ্রদের অপর পারের বনশ্রেণীর শীর্ষদেশে ফেনার মত মনে হচ্ছিল। রাইনহার্ট পাতাটির ভাঁজ খুলল। এলিজাবেথ কাগজখানার একপাশে হাত রেখে দেখতে লাগল। রাইনহার্ট পড়তে আরম্ভ করল—

প্রাণ যারে পেতে চায়—
মা যে তায় বাদ সাধে
কেমনে ভুলিব তারে—
পরাণ তাই ত কাঁদে।
সক্ষোভে কহিব মায়
এমন করিলে কেন?
কে আছে জগতে আজ
অপরাধী আমা হেন!
(আমার) মাথা হয়ে গেছে হেঁট
কোনও আনন্দ নাই
এর চেয়ে ভাল দোরে দোরে ঘুরে
ভিখ মেগে যদি খাই!

পড়ার সময় রাইনহার্ট অজানিতে কাগজের মৃদু কম্পন অনুভব করল। তার পড়া শেষ হলে আস্তে তার চেয়ার পেছনে সরিয়ে নিয়ে এলিজাবেথ নিঃশব্দে উঠে বাগানের ভিতর চলে গেল। মায়ের চোখ তার অনুসরণ করল। এরিখ তার পিছনে পিছনে যেতে উদ্যত হলে মা বলে উঠলেন—"এলিজাবেথের বাইরে দরকার আছে।"

শুনে এরিখ নিরস্ত হ'ল।

বাইরে বাগান এবং হ্রদের উপর আঁধার ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে। খোলা দরজা দিয়ে রাত্রের প্রজাপতি পৎপৎ ক'রে উড়ে এসে ঘরের আলোর চারপাশে দ্রুতবেগে ঘুরছে—আর সঙ্গে ফুলেরও সুগন্ধ উদ্ভিদের সুবাস ভুর ভুর করে ঘরে ঢুকছে। হ্রদের জলের ধারে ব্যাঙের শব্দ শোনা যাচ্ছে—জানালার নীচে বসে নাইটিংগেল তার দুরন্ত সাথীকে গলা ছেড়ে ডাকছে—গাছের উপরে চাঁদ উঠেছে। রাইনহার্ট কিছুক্ষণ চেয়ে রইল লতাকুঞ্জের পথের দিকে—যে পথে এলিজাবেথের মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপর সে কাগজপত্র জড়িয়ে রেখে উপস্থিত ওঁদের নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে জলের ধারে চলে গেল।

বনশ্রেণী নীরবে দাঁড়িয়ে। তাদের অন্ধকার ছায়া হ্রদের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়ে পড়েছে। হ্রদের মাঝখানটা কিন্তু চাঁদের কিরণে বেশ আলোকিত। মাঝে মাঝে গাছের ভিতরে বাতাস সোঁ সোঁ শব্দ করছে—ঝড়ো হাওয়া নয়—গ্রীষ্মের রাত্রির নিশ্বাস। রাইনহার্ট হ্রদের ধার দিয়ে চলেছে। একটি ঢিল ছুঁড়লে পৌঁছে, এমন দূরে হ্রদের জলের মধ্যে সে একটি শ্বেতপদ্ম দেখতে পেল। ফুলটিকে কাছে নিয়ে দেখবার বাসনা হঠাৎ তাকে পেয়ে বসল। সে জামাজুতো ছেড়ে জলে ঝাঁপ দিল। জল তত গভীর নয়, কিন্তু কাঁটাযুক্ত জলজ উদ্ভিদ্ এবং নুড়ি তার পায়ে ফুটতে লাগল। সে যতই যায়—সাঁতার জল পায় না। সহসা সে ডুবজলে পড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে জলের একটি ঘূর্ণিতে ডুবে গিয়ে বেশ খানিকক্ষণ বাদে ভেসে উঠল। তখন সে হাত-পা ছুঁড়ে জল ঠেলে চক্রাকারে সাঁতার কাটতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে তার হুঁস হ'ল—কোন্ পথে সে জলে নেমেছিল। সে আবার পদ্মটি দেখতে পেল—বড় বড় চকচকে দুটি পাতার মাঝখানে রয়েছে পদ্মটি। ধীরে ধীরে সে সাঁতার দিয়ে এগোতে লাগল। মাঝে একবার তার বাহু জল থেকে উঠালে হাতের ছিটকানো জলকণা চাঁদের কিরণে ঝিকমিক করে উঠল; কিন্তু দুঃখের বিষয়—ফুল থেকে তার ব্যবধান কিছুতেই কমছে না। তীর তার পিছনেই রয়েছে। চেষ্টার কোনও ত্রুটি সে করছে না—অধিকতর উৎসাহভরে সে ফুলের দিকে সাঁতার দিয়ে চলেছে। অবশেষে সে ফুলের এত নিকটে এসে পড়ল যে চাঁদের আলোকে সে জল থেকে ফুলের শুভ্র পাতার পার্থক্য দিব্যি বুঝতে

পারল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলের পাতার কণ্টকাবৃত দীর্ঘ নালে তার খালি গা ও পা জড়িয়ে গেল। সেই অজানা জলরাশি চারপাশে এত কালো দেখাচ্ছিল—পিছনে একটি বড় মাছও তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে দূরে বনের মধ্যে 'ঘুম' করে পড়ল। অদ্ভুত এই পরিবেশে সহসা তার গা ছমছম করে উঠল। সে সজোরে পদ্মনালের জড় এড়িয়ে পড়ি-মরি ক'রে দ্রুত ডাঙ্গার পানে সাঁতার কেটে চলল। ডাঙ্গায় উঠে হ্রদের দিকে চাইতেই সে আবার সেই শাদা ফুলটি দেখতে পেল। চাঁদের আলোকে হ্রদের নীলজলের মধ্যে কি অপরূপ শোভাই না বিস্তার করে বিরাজ করছে সেই একটিমাত্র শ্বেত শতদল।

কাপড়-চোপড় পরে রাইনহার্ট ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরল। উদ্যানগৃহে সে দেখতে পেল এরিখ এবং এলিজাবেথের মাকে। পরদিন প্রায় সারাদিনের জন্য বিষয়কর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁরা ব্যাপৃত।

মা তার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—"বাপু, এতরাত অবধি কোথায় ছিলে?"

রাইনহার্ট একটু থতমত হয়ে বলল—"আমার কথা বলছেন? আমি একটা জলপদ্মের খোঁজে বেরিয়েছিলাম—কিন্তু পদ্মটি তুলতে পারলাম না।"

এরিখ বিস্মিতভাবে বলল—"ভাবিয়ে তুললে যে হে বড়! জলপদ্মের তোমার কি দরকার?"

রাইনহার্ট উদাসভাবে বলল—"এক সময়ে এ ফুল আমার খুবই প্রিয় এবং পরিচিত ছিল—সে অবশ্য অনেকদিনের কথা।"

এলিজাবেথ

পরদিন বিকালে রাইনহার্ট ও এলিজাবেথ হ্রদের অপর পারে বেড়াতে বের হল।—কখনও ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে কখনও বা হ্রদের ধারের উঁচুনীচু পাড় ডিঙায়ে তারা চলতে লাগল। এলিজাবেথ আগেই এরিখের অনুমতি চেয়ে রেখেছিল যে তার এবং মায়ের অনুপস্থিতিকালে সে রাইনহার্টকে হ্রদের অপর পারের সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখিয়ে আনবে। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে একস্থান থেকে আর একস্থানে ছুটেছে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে একটি শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত গাছের ছায়ায় বসে পড়ল; রাইনহার্ট তার সামনে একটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দূর থেকে কোকিলের সুমিষ্ট কুহুস্বর ভেসে আসছিল। সহসা রাইনহার্টের মনে পড়ল ঠিক এমনই একটা বনবিহার একবার তারা করেছিল। সে একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বলল—"এখন ষ্ট্রবেরি খোঁজা থাক, কি বল?"

এলিজাবেথ উত্তর দিল—"এ ত ষ্ট্রবেরির সময় নয়।"

"তা সময় আসতে কতক্ষণ?"—বলে উঠল রাইনহার্ট।

এলিজাবেথ নীরবে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং উভয়ে আবার চলা শুরু করল। এলিজাবেথ যখন পাশাপাশি যাচ্ছে—রাইনহার্ট ফিরে ফিরে তার দিকে তাকাচ্ছিল; কারণ সুন্দর কাপড়চোপড় পরে তন্বী তরুণীকে বেশ মানিয়েছিল। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করেই সে দু'এক পা পিছিয়ে পড়ছিল, যাতে করে সে তার গতিভঙ্গী ভাল করে দেখতে পায়। এই ভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারা ছোট ছোট ঝোপযুক্ত একটা উন্মুক্ত স্থানে এসে পড়ল। এর পরেই সামনে দূর-প্রসারী শস্যক্ষেত্র। রাইনহার্ট নীচু হয়ে মাটি থেকে ফুলসমেত একটি উদ্ভিদ্ তুলে নিল। গাছটির দিকে ভাল করে চাইতেই তার মুখেচোখে একটা ব্যথার ভাব ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করল—"এ ফুলটি চেন?" এলিজাবেথ তার দিকে চেয়ে বলল—"এ ত এরিকা ফুল—এ ফুল আমি বন থেকে কত কুড়িয়ে আনতাম।"

রাইনহার্ট বলল—"বাড়িতে আমার একখানি পুরানো খাতা ছিল; আমি তার মধ্যে কবিতা ও গান লিখে রাখতাম—অনেকদিন অবশ্য তাতে কিছুই লেখা হয় নি। সেই খাতার পাতার মধ্যে একটি এরিকা ফুল ছিল—কিন্তু সেটা ছিল শুকনো দুমড়ানো। বলতে পার? সে ফুলটি আমায় কে দিয়েছিল?"

এলিজাবেথ নীরবে ঘাড় নাড়ল; চোখ নত করে সে কেবল রাইনহার্টের হাতের গাছটি দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ সে এইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সে চোখ তুলে চাইলে রাইনহার্ট দেখল তার দুই চোখ জলে ছল ছল করছে।

সে বলল—"এলিজাবেথ, দূরের ঐ নীল পাহাড়ের ওপারে রয়েছে আমাদের কৈশোর; এখন কোথায়?" এলিজাবেথ তার কথা বলতে পারল না। উভয়ে নিঃশব্দে

পাশাপাশি হ্রদের দিকে চলল! বাতাস খুব গুমোট—পশ্চিম আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ উঠতে দেখা গেল।

"এ যে কালবৈশাখীর মেঘ" এই বলে এলিজাবেথ দ্রুত পা ফেলে চলল। রাইনহার্ট ও মাথা নেড়ে নীরবে হ্রদের ধার দিয়ে তাদের নৌকার কাছে গিয়ে পৌছাল।

হ্রদ পার হবার সময় এলিজাবেথ নৌকার প্রান্তে হাত রেখে বসেছিল। হাল ধরে নৌকা চালাবার সময় রাইনহার্ট এলিজাবেথের দিকে এবং এলিজাবেথ রাইনহার্টের বরাবর দূরের পানে দৃষ্টি রেখে চলেছে। রাইনহার্টের দৃষ্টি বিশেষ করে এলিজাবেথের হাতের উপর নিবদ্ধ ছিল।—এই হাতই ত তাকে প্রতারিত করেছে—যেমন তার মুখ তাকে নীরব করেছে। রাইনহার্ট এলিজাবেথের অবয়বের মধ্যে এমন একটা অব্যক্ত বেদনার প্রকাশ দেখতে পেল—যে বেদনা মেয়েদের মধ্যে দেখা যায়—যখন তারা রাত্রে ব্যথিত হৃদয়ের উপর সেই হাত বুলিয়ে দেয়। এলিজাবেথ যখন টের পেল রাইনহার্টের দৃষ্টি পড়েছে তার হাতের উপর, তখন সে ধীরে ধীরে হাতখানি পাটাতনের উপর থেকে তুলে জলের ভিতর রাখল।

বাড়ীতে পৌছে উঠানে ছুরিকাঁচি শানদেওয়াদের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দেখল। কালো বাবরি চুলওয়ালা একটি লোক শম্বুকগতিতে গিয়ে গাড়ীতে উঠল এবং জিপসি ঢং-এর একটি সুর অর্ধস্ফুটভাবে ভাঁজতে লাগল। নিকটেই গলায় ফিতাবাঁধা একটি কুকুর শুয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে। ঘরের রকের উপরে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া কাপড় পরণে একটি ভিখারী মেয়ে। দেখে মনে হয়—এক সময় সে সুন্দরীই ছিল কিন্তু এখন ক্ষতাদিতে বীভৎস চেহারা। মেয়েটি ভিক্ষার জন্য এলিজাবেথের দিকে হাত বাড়াল।

রাইনহার্ট পকেটে হাত দিল, কিন্তু তার আগেই এলিজাবেথ নিজের ব্যাগে যা কিছু ছিল সব ঝেড়ে ভিখারিণীর খোলা হাতের মধ্যে ঢেলে দিল। তারপর মুখ ফিরিয়ে এলিজাবেথ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। সে যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রাইনহার্ট তা টের পেল।

সে তাকে সান্ত্বনা দেবে ভাবল—কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করে তা থেকে বিরত হয়ে—সিঁড়ির নীচেই সে দাঁড়িয়ে রইল। ভিখারী বালিকা তখনও নিশ্চলভাবে রোয়াকে ভিক্ষার পয়সা হাতে করে দাঁড়িয়ে। রাইনহার্ট তাকে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি আর কি চাও?"

সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—"আর কিছুই চাই না।" তারপর মুখ ফিরিয়ে অর্থহীন দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে ধীরে ধীরে দরজার পানে চলে গেল। রাইনহার্ট কি যেন একটা নাম ধরে ডাকল কিন্তু সে আর সাড়া দিল না। মাথা নীচু করে দুহাত ক্রুশের মত আড়াআড়িভাবে বুকের উপর রেখে ধীরে ধীরে সে উঠানে নেমে চলে গেল। যেতে যেতে সে অনুচ্চস্বরে গাইতে গাইতে চলল:—

মরিব মরিব আমি
একেলা মরিব।

গানের কলিটি রাইনহার্টের কানে এল। ভাবাবেশে তার নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল; কিন্তু শীঘ্রই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে সে নিজের কামরায় প্রবেশ করল। সে কিছু কাজ করবে বলে বসল, কিন্তু কোনও চিন্তাই তার মাথায় এল না। ঘণ্টাখানেক বসে থাকবার পর সে পরিবারের বসবার ঘরে গেল। সে ঘরে কেউ ছিল না—ঠাণ্ডা, সবুজ গোধূলি; এলিজাবেথের শেলাইয়ের টেবিলে পড়ে আছে একগাছি লাল রিবন—এইটিই সে বিকালে গলায় পরেছিল। রাইনহার্ট এটি হাতে তুলে নিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন তড়িতাহতের মত সে এটি রেখে দিল। রাইনহার্টের মনে কোনও শান্তি ছিল না—সে আবার হ্রদের দিকে চলল। হ্রদের ধারে গিয়ে নৌকাখানি ছেড়ে দিয়ে চলল। যে পথে সে এলিজাবেথের সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরেছে, ঠিক সেই সেই স্থান দিয়ে নৌকা চালনা করল। যখন সে পুনরায় বাড়ি ফিরল, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। উঠানে ঘোড়ার গাড়ির সইসের সঙ্গে দেখা—সে ঘোড়াকে ঘাস দিতে যাচ্ছে। এরিখ এবং এলিজাবেথের মা এইমাত্র ফিরে এসেছেন। দরদালানে ঢুকেই সে শুনতে পেল উদ্যানগৃহে এরিখ একাকী এদিক ওদিক পায়চারী করছে। রাইনহার্ট তার কাছে গেল না। খানিকক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে সে তার নিজের ঘরে চলে গেল। গিয়ে আরামকেদারায় জানলার ধারে বসল—উদ্দেশ্য সেখান থেকে নাইটিংগেলের গান সে শুনতে পাবে। কারণ নাচে দেওয়ালের ধারেই নাইটিংগেল

রাত্রে গান করল। রাইনহার্ট কিন্তু নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনতে পেল না। বাড়িতে অন্যান্য ঘরে সবাই শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। সে ঠায় জেগে বসে আছে। প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে—কিন্তু তার কোনও খেয়ালই নেই। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বসে রইল। অবশেষে উঠে সে খোলা জানালার ধারে গেল। রাত্রের শিশির ঝিরঝির করে পড়ছে—নাইটিংগেলের শব্দও গেছে বন্ধ হয়ে। ধীরে ধীরে পূবদিক থেকে রাতের আকাশের ইস্পাত-নীল রং ফিকে হলদে আভায় রূপান্তরিত হচ্ছে। একটা হাল্‌কা হাওয়া উঠে রাইনহার্টের আতপ্ত কপালে শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিল। প্রথম ভরতপক্ষী উল্লাসে গান গাইতে গাইতে মাটির ঘাসের বিছানা ছেড়ে বিমল নীল আকাশের পানে উঠল। রাইনহার্ট সহসা ফিরে টেবিলের কাছে গেল। খানিকক্ষণ হাতড়িয়ে সে একটি পেনসিল হাতে পেল। পেনসিলটি পেয়েই একখণ্ড শাদা কাগজে কয়েক লাইন লিখল। লেখা শেষ হলে সে টুপি এবং ছড়ি নিল, কাগজখানা টেবিলে ভাল করে রেখে দিল এবং অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে নীচে দরদালানে নামল। উষার আঁধার তখনও বাড়ির আনাচে-কানাচে বেশ জমাট হয়ে আছে। বাড়ির বড় বিড়ালটি খড়ের বিছানা থেকে উঠে পিঠ উঁচু করে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে তার পিঠ রাইনহার্টের হাতের সাথে ঘসতে লাগল। কারণ অন্যমনস্কভাবেই রাইনহার্ট বিড়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। বাইরে গাছের ডালে বসে চড়ুই পাখীরা স্তোত্র আরম্ভ করেছে—তারা যেন সবাইকে ডেকে বলছে—"ওঠ, ওঠ, আর রাত নেই।" উপরের ঘরের একটি দরজা খোলার শব্দ কানে এল—কে যেন সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।—রাইনহার্ট ফিরে দেখে এলিজাবেথ তার সামনে দাঁড়িয়ে। সে রাইনহার্টের বাহুর উপর তার হাত রাখল—ঠোঁটও নাড়ল কিন্তু রাইনহার্ট কিছুই শুনতে পেল না। অবশেষে সে বলল—"তুমি আর এসো না লক্ষীটি, আমি সব জানি, তবু সত্যি বলছি তুমি আর ফিরে এসো না।"

রাইনহার্ট বলল—"না, কখনও না।" এলিজাবেথ হাত নামিয়ে নিল, আর কিছুই সে বলতে পারল না। দরদালান ধরে রাইনহার্ট দরজার দিকে এগোতে থাকল—শেষপ্রান্তে পৌছে আর একবার ঘুরে এলিজাবেথের দিকে চাইল। এলিজাবেথ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে রাইনহার্টের দিকে চেয়ে রইল। রাইনহার্ট এক পা ফিরে এলিজাবেথের দিকে বিদায়সূচক হাত নাড়ল। তার পর নিজেকে সজোরে টেনে নিয়ে দরজা দিয়ে সে বাইরে চলে গেল।

বাইরে নবীন উষালোকে পৃথিবী মনোরম শ্রী ধরেছে। সূর্যের প্রথম রশ্মি মাকড়সার জালের শিশির বিন্দুতে বিচ্ছুরিত হয়ে ঝিলিক দিচ্ছে। রাইনহার্ট আর পিছনের পানে চাইল না,দ্রুতপদক্ষেপে সে সামনে এগিয়ে চলেছে—ধীরে ধীরে বন্ধুর শান্ত পল্লীভবন পিছনে সরে যাচ্ছে—আর তার সামনে প্রসারিত হচ্ছে বৃহৎ, অন্তহীন জগৎ।

বৃদ্ধ

জানালার সার্সি দিয়ে ঘরে চাঁদের আলোর আগমন গেছে বন্ধ হয়ে—ঘরে জমেছে অন্ধকার। বৃদ্ধ কিন্তু তখনও মুষ্টিবদ্ধ হস্তে আরামকেদারায় বসে অপলকনেত্রে সামনের দিকে চেয়ে আছে। ধীরে ধীরে ভেসে উঠল তার চোখের সামনে ঈষৎ অন্ধকারে ঢাকা কালো জলে ভরা প্রশস্ত হ্রদ—একটির পিছনে একটি, হ্রদের পর হ্রদ—যত দূর তত গভীর ও বৃহৎ—সর্বশেষটি এত দূরে যে বৃদ্ধের দৃষ্টিতে আবছায়া মত দেখাচ্ছে সেটা।—আর সেই শেষ হ্রদটির ভিতর প্রশস্ত দুটি পাতার মাঝখানে ফুটে রয়েছে একটি অনিন্দ্যসুন্দর শ্বেত শতদল।

ঘরের দরজা খুলে গেল। উজ্জ্বল আলোক ছটা এসে পড়ল ঘরের ভিতর। "ভালই হল, তুমি এসেছ ব্রিগিটে, আলোটা একবার টেবিলের উপর রেখে দাও দেখি।"

এই বলে বৃদ্ধ চেয়ার সরিয়ে টেবিলের কাছে গেল—খোলা বইখানি তুলে তন্ময়ভাবে পড়তে শুরু করে দিল। এই সব বই-ই ত এক সময়—তার যৌবনের শক্তি যুগিয়েছে।

বঙ্গপ্রবাসী কাশ্মীরী কবি শিহ্লণ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সংস্কৃত সাহিত্যের শতক কাব্য বিভাগে শিহ্লণ মিশ্র রচিত 'শান্তিশতক' একটি উজ্জ্বলমণি। এই কাব্যের শ্লোকাবলী এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে লেখকের সন্ধান কালদেশ হয়ত নিশ্চিতরূপে জানা না থাকলেও বাংলার ঘরে ঘরে অনেকের মুখে মুখে তাঁর কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে সাধারণ্যে বহুল প্রচারলাভ করেছিল। তদ্ব্যতীত কি বিষয়োৎকর্ষে বা বর্ণনাচাতুর্যে, কি কাব্যগত ভাববিন্যাসে বা অলঙ্কার-বৈচিত্র্যে কাব্যরূপেও শিহ্লণের শতকগ্রন্থ শীর্ষস্থানীয়। কবি এগ্রন্থে একটি সুনির্দিষ্ট স্বকীয় রীতি অনুসরণ করে মানবজীবনের সার্থকতা নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। তা'তে দেখা যায় যে কবি এক স্বতন্ত্র বিচার শক্তির অনুসরণ করে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছেন, এজন্য স্থানে স্থানে কবির সমুজ্জল বর্ণনা কবির অন্তর উপলব্ধির পরিচয়টিকে সার্থকরূপে প্রকট করতে সমর্থ হয়েছে। সেজন্য কবির কাব্য প্রণয়নের দৃষ্টিভঙ্গীতে ও সকল ক্ষেত্রেই একটা বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে।

কবির 'শিহ্লণ' এই নাম হইতে স্বভাবতঃই ধারণা হয় ইনি কাশ্মীর-বাসী। কারণ, সমজাতীয় নামবিশিষ্ট কহ্লণ, বিহ্লণ, জহ্লণ প্রভৃতি সকলেই কাশ্মীরীয় স্বনামখ্যাত কবি ও গ্রন্থকার। কাব্যের বর্ণনায় ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি স্থলের পরিচয়েও দেখা যায় উত্তর ভারতের বা হিমগিরির পাদদেশের সঙ্গেই যেন কবির পরিচয় বা আত্মীয়তা।

কবি কোথাও বলেছেন, "হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্থ"। আবার কোথাও বলেছেন—"লক্ষীরমণচরণ—ভ্রষ্ট—গঙ্গাপ্রবাহব্যামিশ্রায়াং দৃশদি—" ইত্যাদি। অথচ এটী আশ্চর্যের বিষয় যে কাব্যটি কবির স্বদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায় নি, কিন্তু বঙ্গদেশে এমন কোন কাব্য চর্চার গৃহ ছিলনা, যেথানে এই 'শান্তিশতক' কাব্যের পঠন পাঠন হয়নি। প্রচারের দিক থেকে মনে হয়, শিহ্লণের সঙ্গে বঙ্গদেশের একটী ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; খুব সম্ভবতঃ, তিনি এই দেশেই বাস করতেন। শিহ্লণের শান্তিশতকের সমজাতীয় পুস্তক ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্যশতক'; অনেক স্থলে উভয়ের সাদৃশ্য আছে। শিহ্লণ ভর্তৃহরির শৈব মতকে অনেক সময় বৈষ্ণব-মতানুগ করে প্রকাশ করেছেন। শিহ্লণের শান্তিশতকে নাগানন্দের একটী কবিতা উদ্ধৃত আছে। অন্যদিকে, শ্রীধরের সদুক্তি-কর্ণামৃতে (১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) শান্তিশতকের কবিতা উদ্ধৃত আছে। বিহ্লণের সঙ্গে শিহ্লণের নামসাম্যে কোনও বিভ্রম ঘটেছে বলে মনে হয় না। কারণ, অগণিত পুঁথিতে কবির নাম শিহ্লণই আছে। রাজতরঙ্গিণীকার "কহ্লণ" খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন; শ্রীধর ও জোনরাজ তাঁর পরবর্তী—তাঁদের রাজতরঙ্গিণীতে শান্তি-শতকের বা শিহ্লণের কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। যে কোন কারণেই হোক স্বদেশ কাশ্মীরে কবির কোন প্রভাবই অঙ্কুরিত হয়নি। তার একটি কারণ অনুমান করা যায়—তিনি তখনকার রাজার কোন আনুকূল্য পান নাই। কারণ রাজার প্রতি তিনি মোটেই অনুরক্ত ছিলেন না, বরং রাজোচিত গুণাবলীর অভাব দেখে অপদার্থ ও অমর্যাদাকারী অযোগ্য রাজার তিনি নিন্দাবাদই করতেন। রাজানুকূল্য-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় হয়ত বা প্রতিকূলতায়ই সেখানে কেহ রাজদ্বেষীকে রাজভয়ে সম্মান দেখাতে সাহসী হয়নি বা তাঁর গ্রন্থও প্রচারলাভে সুযোগ পায়নি। রাজার প্রতি এই আনুগত্যহীনতা তাঁর বহু কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে অপূর্ব শ্লোকে ও বিদ্রূপের ভঙ্গীতে—

> "কৃত্বা শাস্ত্রবিভীষিকাং কতিপয়গ্রামেষু দীনাঃ প্রজাঃ।
> মথ্নন্তো বিটজল্পিতৈরুপহতা ক্ষোণীভুজস্তে কিল॥" ইত্যাদি।

আবার ততোধিক কঠোরতায় ও রাজার অপদার্থতা প্রকাশ করে বলেছেন—

> "যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্পার্থদং
> সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্॥" ১, ১১ ইত্যাদি।

তদানীন্তন রাজার সদ্‌গুণ থাকলে, মানদাতৃত্ব থাকলে, গুণগ্রাহিতার পরিচয় পেলে গুণী ব্যক্তি, বিশেষতঃ যিনি ভগবৎপ্রেমিক তিনি, বিশেষ অপমান বা অত্যাচার সহ্য না করলে এতখানি, কঠোর হতে পারতেন না বা দেশমান্য নরপতিকে নরাধম বলতে কুণ্ঠাহীন হতেন না। এই জন্যই দেখা যায় কবি আপন অভিমতও ব্যক্ত করে যে গৃহসংসারেই যাঁর মমতা নেই—সংসার বিচ্ছিন্ন তাঁর প্রতি আর সে রাজার কি অধিকার—রাজা তাঁর কি করতে পারেন? রাজরাজের রাজ্যের তিনি তখন প্রজা—তাই বলেছেন—মন, বাক্য, ইন্দ্রিয় গ্রামকে লক্ষ্য করে—

> "জিহ্বে লোচন নাসিকে শ্রবণ হে ত্বক্ চাপি নো বার্ষসে।
> সর্বেভ্যস্তু নমস্কৃতাঞ্জলিরহং সপ্রশ্রয়ং প্রার্থয়ে।
> যুষ্মাকং যদি সম্মতং তদধুনা নাত্মানমিচ্ছামহং
> হোতুং ভূমিজাং নিকার দহম জ্বালা করালে গৃহে॥ ৪, ১২

হৃদয়ের অন্তর্দাহ তিনি কঠোরতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাঁর ৪, ১৫ নং কবিতায়, যেখানে তিনি রাজন্যবৃন্দকে "দ্বিচরণ পশু" বলে উল্লেখ করেছেন—

> গতঃ কালো যত্র দ্বিচরণপশূনাং ক্ষিতিভুজাং
> পুরঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা বিষয়সুখমাস্বাদিতমভূৎ।
> ইদানীমস্মাকং তৃণমিব সমস্তং কলয়তাম্
> অপেক্ষা ভিক্ষায়ামপি কিমপি চেতস্ত্রপয়তি॥

রাজার প্রতি ধিক্কারের অন্ত যেন নেই, গ্রন্থের সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন কথা প্রসঙ্গে রাজাকে নিরন্তর ধিক্কার দিয়েছেন—ব্রহ্মপ্রাপ্তি নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ শ্লোকে তিনি বলছেন—

সন্তি স্বাদুফলা বনেষু তরবঃ স্বচ্ছং পয়োনির্ঝরং
বাসো বল্কলমাশ্রয়ো গিরিগুহা শয্যা লতাবল্লরী।
আলোকায় নিশাসু চন্দ্রকিরণাঃ সখ্যং কুরঙ্গৈঃ সহ
স্বাধীনে বিভবেপ্যহো নরপতিং সেবন্ত ইত্যদ্ভুতম্॥

কবির স্বকীয় বৈলক্ষণ্য রীতি সূচনা থেকেই লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ গ্রন্থরচনাতে অভীষ্টদেবতার নমস্কারাদিই বিঘ্নবিনাশাদির কারণ রূপে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এখানে কিন্তু কবি সে রীতির অনুসরণ করেন নি। প্রচলিত গতানুগতিক ধারাবাহিকতার নিয়ম বর্জন করে কবি স্বীয় বুদ্ধি প্রতিভার শাণিত ফলকে পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন—জীবনে কার প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক; কবি নিজে যাকে প্রভাবশীল ভেবেছেন, সে সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে সর্বাপেক্ষা মর্যাদা তাকেই দান করেছেন। তাই কবি বলেছেন—

নমস্যামো দেবান্ নহু হতবিধেস্তেপি বশগা
বিধির্বন্দ্যঃ সোপি প্রতিনিয়তকর্মৈক ফলদঃ।
ফলং কর্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥ ১,১ম শ্লোক।

অথচ কবি কিন্তু দার্শনিক মত স্থাপনের উদ্দেশ্যে মীমাংসকাচার্যের পন্থা অনুসরণ করে কর্মের প্রাধান্য নিরূপণ করতে অভিলাষী হননি। ত্রিজগতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে অবস্থিতির ফলে কর্মের নাগপাশ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং কর্মফল যে ভাবেই হোক, যে দিনই হোক—একদিন তা অবশ্যম্ভাবীরূপে জীবনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেই, পরিত্রাণ নেই। কর্মের এই প্রাধান্য লক্ষ্য করে তাই কবি নিজের বিচার বুদ্ধির সমর্থনে বলেছেন—

"আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্তম্
অম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টম্।
জন্মান্তরার্জিতশুভাশুভকৃন্নরাণাং
ছায়েব ন ত্যজতি কর্মফলানুবন্ধঃ॥" ৩,২১

কবির এই স্বাতন্ত্র্যশীল অনুভূতি-রীতির পিছনে একটি ইতিবৃত্তের সন্ধান পাওয়া যায়! অবশ্য কবির নিজের লেখা থেকে তার অকাট্য প্রমাণ কিছু উদ্ধার করা সম্ভব নয় উপায়ও নাই। এটা জনশ্রুতি মাত্র, তথাপি এর সমর্থনে কবির লেখা আমরা সর্ব-সমক্ষে উপস্থাপিত করব।

জানা যায় শিহ্লণ নামা কবি প্রথম জীবনে একবার বনিতায় একান্ত আসক্ত ছিলেন। একদিন তিনি "আগামীকল্য পিতৃশ্রাদ্ধ, সুতরাং ঐ দিন আর আসা হইবে না"—এই বলে প্রণয়িনীর গৃহ থেকে স্বগৃহে চলে আসেন। পরদিন যথাবিধি শ্রাদ্ধকার্য সমাপনান্তে সন্ধ্যাসমাগমে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। শ্রাদ্ধাবশিষ্ট কতকগুলি উপাদেয় দ্রব্য সংগ্রহ করে সকলের অলক্ষ্যে চলেন সন্ধ্যার অন্ধকারে গণিকার আলয়ে, নদীর পরপারে। অথচ অন্ধকার রাত, খেয়া নৌকাও উধাও হয়েছে। তিনি চিন্তাকুল হলেন, অকস্মাৎ দেখা গেল—নদীর ধার দিয়ে কি যেন একটা লম্বমান পদার্থ স্রোতোবেগে চলেছে. এ বস্তু কি আর হবে, নিশ্চয় কদলী বৃক্ষ। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাকে অবলম্বন করে তিনি ওপারে এলেন—ভাবলেন প্রণয়িনীকে চমকিত করে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হবেন—কিন্তু প্রিয়ার দ্বার রুদ্ধ। তিনি দেখলেন রুদ্ধ কপাটের একপার্শ্বে দোদুল্যমান রজ্জু। ঐটি অবলম্বন করে কোনরূপে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্বক বাটিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। উচ্চস্থান থেকে পতনের শব্দে প্রিয়া উঠলেন জেগে। যথাস্থানে এসে তাঁকে গভীর রাত্রে এ অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলেন। কি উপায়ে এত রাত্রে নদী অতিক্রম করা সম্ভব হলো এবং বাড়ীতে প্রবেশই বা কি ভাবে করলেন, উত্তরে তাঁর মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য প্রিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে দেখলেন কপাটের পার্শ্বে একটি মৃত সর্প পড়ে আছে। নদীতীরে গিয়ে দেখলেন কদলীবৃক্ষ কোথায়—একটি অর্ধগলিত শব একধারে শায়িত আছে। গণিকার বুঝতে বিলম্ব হলো না—ব্রাহ্মণ কি অদ্ভুত উপায়ে এখানে এসেছেন; তাঁর এই সর্বনাশা নেশা দেখে প্রিয়া নিরতিশয় তিরস্কার করে বললেন—"আমার প্রতি যে হাস্যকর উন্মত্ততার পরিচয় আজ দিলে—এ পাগলামি যদি প্রকৃত পথে পরমার্থ বিষয়ে সম্ভব হতো তবে হয়ত জীবনের একটা সদ্গতির আশা ছিল"। তখন ব্রাহ্মণের চৈতন্যোদয় হয়েছে। তিনি ফিরলেন—সংসারের প্রীতি প্রণয়ের স্বরূপ বুঝে। ভাবলেন যেখানে এত ভালবাসা তারই যদি "রূপ" এই, তবে অন্যত্র আর কথা কি! সংসারের স্বরূপ নিমিষে বুঝে গৃহদ্বার ছেড়ে পথে বের হয়ে পড়লেন।

অনুরূপ কাহিনী আমরা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সম্বন্ধেও জানতে পারি। তাহাও জনশ্রুতিমূলক। ঐ বিল্বমঙ্গলও পরবর্তী জীবনে পরমভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত "বিল্বমঙ্গল" এবং "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" নামে দুইখানি উৎকৃষ্ট রসসমৃদ্ধ সংস্কৃত কাব্য মুদ্রিত অবস্থায়ই পাওয়া যায়।

কবি শিহ্লণের কাব্যে এই কাহিনীর সমর্থনে কোন স্পষ্ট প্রমাণ কিছু নেই। কবি বলেছেন—

"যত্নেন শান্তিশতকং বিদধে বিবেকী
শ্রীশিহ্লণঃ প্রকৃতিসুন্দরশুদ্ধবুদ্ধিঃ"॥ ১,৩

কবি বিবেকী শিহ্লণ "প্রকৃতি সুন্দর শুদ্ধবুদ্ধিঃ" বলিয়া এখানে পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতি সুন্দর পদে "প্রকৃত্যা স্বভাবেন সুন্দরী নির্মলা বুদ্ধির্যস্য" এই অর্থ গ্রহণ করলে 'স্বভাবতঃ শুদ্ধচিত্ত' এই অর্থ আসে, তাতে পূর্বোক্ত কাহিনীর বিরুদ্ধতাই প্রকাশ পায়। কিন্তু কবির উক্তিতে তাহাতে বিরোধ হয়। কবি নিজেই একস্থানে বলছেন—

"যদাসাদজ্ঞানং স্মরতিমিরসংস্কারজনিতং
তদা জাতং তারামরমিদমশেষং জগদপি।

ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনযুষাং
সমীভূতা দৃষ্টিস্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে।" ৪.১৪

গ্রন্থের অন্যত্রও কবি একস্থলে অনুরূপ ভাব প্রকাশ করে বলেছেন—

"পূর্বং তাবৎ কুবলয়দৃশাং লোললোলৈরপাঙ্গৈঃ
আকর্ষদ্ভিঃ কিমপি হৃদয়ং পূজিতা যৌবনশ্রীঃ।" ৪.১৬ (ক)

কবির "পূর্বং তাবৎ" এই স্পষ্টোক্তি প্রমাণিত করে না যে কবি স্বভাবতঃই নির্মলবুদ্ধি ছিলেন, পরন্তু "কুবলয়দৃশাং লোললোলৈরপাঙ্গৈঃ" এই সব বহুবচন লক্ষ্য করবার মত। মনে হয়, প্রথম জীবনের কালিমাও প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি, সাহসের সঙ্গে আত্মদোষের প্রকৃত পরিচয়-জ্ঞাপন করেছেন। অন্য একটী শ্লোকেও বলেছেন—

গতঃ কালো যত্র প্রণয়িনী ময়ি প্রেমকুটিলঃ
কটাক্ষঃ কালিন্দীলঘুলহরিবৃত্তিঃ প্রভবতি।
ইদানীমস্মাকং জঠরকমঠী পৃষ্ঠকঠিনা
মনোবৃত্তিস্তৎ কিং ব্যসনি বিমুখৈব ক্ষপয়সি॥ ১৩॥

এতে পূর্বোক্ত জনশ্রুতির পরোক্ষ সমর্থন কল্পিত হয়। সুতরাং এই সব পরবর্তী শ্লোকাবলীর সঙ্গে অর্থবিরুদ্ধতা রক্ষা করতে হলে "প্রকৃতি সুন্দর শুদ্ধবুদ্ধি" পদের 'প্রকৃত্যা, ইহার "স্বভাবেন" এই অর্থ গ্রহণ করে "স্বভাবতঃ শুদ্ধচিত্ত" অর্থ করা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এজন্য 'প্রকৃত্যা' ইহার "নার্য্যা" কয়াচিৎ নার্য্যা এই অর্থ করতে হয়, নারীকেও প্রকৃতি—শব্দে অভিহিত করা হয়। (প্রকৃতি পুরুষ) অর্থাৎ কোন রমণীর সহায়ে যার বুদ্ধি সুন্দর ও শুদ্ধ হয়েছে। তাই দেখা যায় পরবর্তী জীবনে পরিবর্তনের কথাও কবি নিজ মুখেই ব্যক্ত করে বলেছেন—

"সম্প্র ত্যন্তর্নিহিতসদসদ্ভাবলব্ধ প্রবোধ—
প্রত্যাহারে বিশদহৃদয়ে বর্ততে কোঽপি ভাবঃ ৪.১৬ (খ)

কবি সব বর্জন করে এরূপে বিবেকভাবাপন্ন হয়ে গেলেও এই বৈরাগ্যের স্বরূপ যে শুধু গৃহ পরিজনের সম্পর্ক ত্যাগ বা নির্জনবাসমাত্রার্থক নয় এবং প্রকৃতপক্ষে বিষয়াসক্তি বর্জন করতে না পারলে গৃহত্যাগের যে কোন অর্থই হয় না তা' পরিস্ফুট করে কবি বৈরাগ্যের স্বরূপ দেখাতে চেষ্টা করেছেন এবং গৃহত্যাগ যে তার সাধনমাত্র বা উপলক্ষ, লক্ষ্য যে আসক্তি ত্যাগ—গীতোক্ত এই আদর্শবাদ স্বীকার করে নিরাসক্তের গৃহবাসেও যে সিদ্ধি সম্ভব, তা তিনি স্পষ্ট বলেছেন—

"বনেষু দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ".

তাই নিরাসক্ত ব্যক্তি সর্বত্র নিরাপৎ—"নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্।" (২.৩০) যোগী গৃহবাসীই হোন আর অরণ্যবাসীই হোন্, তাঁর কোনওদিক থেকে ভয় থাকতে পারে না—

ধৈর্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয্যাভূমিতলং দিশোঽপিবসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ ভয়ং যোগিনঃ। ৪.৯

পূর্বেই বলা হয়েছে সর্বত্র কবি একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছেন। তাই দেখা যায় গীতোক্ত আদর্শ প্রকাশ করলেও কবি যেন নির্লিপ্ত জীবনে, নির্জনে যোগাভ্যাসে নিরত হয়ে ব্রহ্মোপাসনায় মন দিতে চান, তাঁর মতে এটাই পরম শান্তির উপায়। প্রথমেও তাই বলেছেন— "যদি শান্তৌ মনো দেয়ং যদি মুক্তিপদে রতিঃ, তদা শিহ্লণমিশ্রস্য পদ্মমারাধ্যতাং ধিয়া।" (১.২)

আহা! কি দুঃখ! পতঙ্গের অগ্নিপতন বা মাছের বড়িশস্থ খাদ্য ভোজনের উদাহরণ থেকে মোহগ্রস্ত মানব নিজের দুর্গতির বিষয় ভেবে নিতে পারে না—

অজানন্ দাহার্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং
ন মীনোঽপি জ্ঞাত্বা বৃতবড়িশমশ্নাতি পিশিতম্!
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজটিলাম্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা॥ ১.৮

এ অপূর্ব মানবজীবন আমরা হেলায় নষ্ট করি, চিন্তামণি কাচমূল্যে করি বিক্রয়—

জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া॥

তাই তিনি বলেছেন শান্তির সন্ধান দিতে গিয়ে—

"সন্তো লক্ষ্মীরমণচরণভ্রষ্টগঙ্গাপ্রবাহ—
ব্যামিশ্রায়াং দৃশদি পরমব্রহ্মদৃষ্টির্ভবামি।"

এই ব্রহ্মোপাসনার যে উপনিষদ্ বিদ্যানুসারে উপনিষদের সিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধে পর্যবসান, কবির যেন তাই লক্ষ্য, কবি বলেছেন— "জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মণি" (৪.২৫) এর দ্বারা পরব্রহ্মে লীন হওয়ার কথাই ধ্বনিত হচ্ছে, এই ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধে উপনিষদ্ বিদ্যার চরম পরিণতি। কবির এটাই লক্ষ্য, তাই কবি বলেন—

"ইতো ন কিঞ্চিৎ পরতো ন কিঞ্চিৎ
যতো যতো যামি ততো ন কিঞ্চিৎ।
বিচার্য্য পশ্যামি জগন্ন কিঞ্চিৎ
স্বাত্মাববোধাদধিকং ন কিঞ্চিৎ॥" ১ ইত্যাদি (৪.২৭)

কিন্তু এই উপনিষদবেদ্য ব্রহ্মোপাসনার যে অসঙ্কীর্ণ জ্ঞানমার্গের প্রক্রিয়া বা কৌশল উপনিষদে বলা হয়েছে, ওঙ্কার তত্ত্বাবলম্বনে সাধনপথ নিরূপণ করা হয়েছে, তা' থেকে এক্ষেত্রে ও যেন কবির কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। "স্বাত্মাববোধাদধিকং ন কিঞ্চিৎ" এই উপনিষদবেদ্য আত্মসাক্ষাৎকারের কথা স্পষ্টতঃ উচ্চারণ করলেও ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে কবি ভিন্ন পন্থারও

(১) এই শ্লোকটী ডাঃ যোহন হেবার্লিনের সংস্করণে নেই।

অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে কবি ভক্তিসমাকুল চিত্তে বলছেন—"ত্রিলোকীনাথো নো হৃদি বসতু দেবো হরিরসৌ" (৪.২২)। এতদপেক্ষাও স্পষ্ট করে পুরুষোত্তম নারায়ণের স্বপদদাতৃত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপাত্মক মোক্ষপদদাতৃত্ব প্রকাশ করে ভক্তিমার্গে অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কবি বলেছেন গ্রন্থের প্রারম্ভভাগেই—

"নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা

সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি সুরে নারায়ণে তিষ্ঠতি।" ইত্যাদি (১.১১)

নারায়ণের এই স্বপদদাতৃত্ব বর্ণনায় রামানুজমতানুযায়ী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আভাস সূচিত হলেও তন্মতে মুক্তিতে সচ্চিদানন্দ স্বরূপতায়ও ভগবদ্দাসত্ব লাভেই মোক্ষরূপতা নিরূপিত হওয়ায় এবং ভক্তিকেই তার উপায়রূপে নির্ধারিত করাতে কবি শিহ্লণের অভিমত—

"জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরব্রহ্মণি" (৪.২৫) এই উক্তির সঙ্গে বিরোধ থাকাতে রামানুজের মতবাদের সঙ্গেও তাঁর বৈলক্ষণ্য স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হচ্ছে। পরন্তু পুরুষোত্তমের 'স্বপদদাতৃতা' এবং "লীয়ে পরব্রহ্মণি" ইত্যাদি কথার যথাযথ সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হলে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এভাবে ব্রহ্মভূততা প্রতিপালন দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধিকার শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীর নিজস্ব মতবাদের সঙ্গে কবি শিহ্লণের মতসাদৃশ্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। উভয়ের এই মত মিলনের পক্ষে কোন গভীর তথ্য আছে কিনা তা অবশ্য অনুসন্ধানযোগ্য। মধুসূদন একান্ততঃ অদ্বৈতব্রহ্মবাদী হয়েও মাধ্বমত খণ্ডন দ্বারা অদ্বৈত মত সংস্থাপন ও অদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণ করেও বলেছেন—

"কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে"

এই উক্তি করে তিনি যে অদ্বৈতমতে প্রতিষ্ঠিত আছেন পূর্বমত বর্জন করে, একথা বলেননি, তাঁর সমর্থনে গ্রন্থান্তরে উপযুক্ত মনোভাবের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা তিনি দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন—সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণাত্মৈক্যলাভই জীবের পরম পদ। ভগবানকে প্রভুরূপে ব্যবহিত রেখে নিত্যকালের জন্য হলেও তাঁর দাসত্বে বা পার্ষদরূপে তাঁর সঙ্গে অধিষ্ঠান না করেও উভয়ের অকুণ্ঠিত মিলনে সর্ববাধাব্যবধানরহিত পরম ঐক্যের, পরমানন্দৈকতানতার ভিত্তিতে একরসতার উপলব্ধিতে পূর্ণমিলনেই মিলনের চরম সার্থকতা—এটাই পরমবৈষ্ণব পদ, যা জীবের পরম আস্বাদ্য ও আকাঙ্ক্ষিত। কবি শিহ্লনের উক্তিতে এরি যেন ধ্বনি শুনতে পাই,—

"ত্রিলোকীনাথো নো হৃদি বসতু দেবো হরিরসৌ" ৪. ২২ ॥

আবার ব্রহ্মভূয়তার তৃষ্ণা ও কবিকে উন্মাদ করেছে, দেখতে পাই—"সন্তো লক্ষ্মীরচণরণত্রষ্টগঙ্গাপ্রবাহব্যামিশ্রায়াং দৃশদি, পরমব্রহ্মদৃষ্টির্ভবামি" (৪.২৩) তিনি স্পষ্টই বলেছেন—অনাবিল ব্রহ্মসরে অবগাহনই একমাত্র লক্ষ্য—

সংসারমৃগতৃষ্ণাং ত্বং মনো ধাবসি কিং মুধা।

অনাবিলমিদং ব্রহ্মসরঃ কিং নাবগাহসে ॥ (৪.২৮) (১)

(১) এ শ্লোকটা ডাঃ যোহন হেবার্লিনের সংস্করণে নেই ॥

কবি এইরূপে সর্ববিষয়ে এক একটি স্বাতন্ত্র্য বা বৈলক্ষণ্য রক্ষা করে অগ্রসর হয়েছেন।

কাব্যটিকে কবি চারিটি পরিচ্ছেদে বিভাগ করেছেন। প্রথমতঃ কৃতকর্মের জন্য কবির পরিতাপ (১—২৯)—অনন্তর বিবেকোদয়-বশতঃ তার বহুবিধ প্রশংসা ও স্তুতিগান (১. ২৮)। তৃতীয়তঃ মানবজীবনের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে বিচারবিশ্লেষণ ও শ্রেয়স্কর পন্থা নিরূপণের রীতি দেখান হয়েছে (১—২৪)। চতুর্থতঃ পরমলক্ষীভূত ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে মানবজীবনের চরিতার্থতা জ্ঞাপন করা হয়েছে (১. ২৬)। বিষয়রূপে এক অসাধারণ ও ভাবমহিমোজ্জ্বল উচ্চাদর্শকে গ্রহণ করলেও কবি কাব্যগত বৈচিত্র্য ও অলঙ্কারবিন্যাসের পটুতায় এবং অর্থগৌরবে গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে প্রতিভার বিন্দুমাত্র কার্পণ্য দেখাননি। এ গ্রন্থের আর্যা, অনুষ্টুভ, শিখরিণী, হরিণী, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শার্দুলবিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা, বসন্ততিলক প্রভৃতি বহুবিধ ছন্দ এবং কাব্য-লিঙ্গ, বিভাবনা, সন্দেহসঙ্কর, রূপক, নিদর্শনা, উপমা, অর্থান্তরন্যাস, শ্লেষ ইত্যাদি বহুবিধ অলঙ্কারের সন্নিবেশে ও পদমাধুর্যে এ গ্রন্থ সুধীজন-মানসে অনায়াসেই গৌরবাস্পদ আসন অধিকার করে নিয়েছে। অতি অনবদ্য এ গ্রন্থের ভাবধারা সুপ্রকট হয়েছে স্রগ্ধরা ছন্দে বিবেকোৎ-পাদিনী সরস রচনায়—

"কৈতদ্বক্ত্রারবিন্দং ক তদধরমধু ক্বায়তাশ্চ কটাক্ষাঃ

ক্বালাপাঃ কোমলাস্তে কচ মদনধনুর্ভঙ্গুরো ভ্রূবিলাসঃ।

ইত্থং খট্বাঙ্গকোটৌ প্রকটিতদশনং মঞ্জুগুঞ্জৎসমীরং

রাগান্ধানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালম্ ॥" ১. ২৭

অর্থাৎ এই যে মুখপদ্ম তাহার কি পরিণাম! অধরামৃতই বা কোথায় সেই দীর্ঘায়ত অপাঙ্গবিলোকন—তাহাই বা কোথায় এখন! আর মৃদুল বচনমধু সেই বা কোথায় গেল! কামকুটিল ভ্রূভঙ্গীর বা এখন কি গতি!—শবাধারের অগ্রাবস্থানে দন্তপংক্তি বিস্তৃত করে মনোজ্ঞ বায়ুগুঞ্জরণে মস্তকস্থ অস্থিখণ্ড বা শবকপাল কামমত্তপুরুষদের মহামোহবিলাসে এভাবে যেন বিদ্রূপ জ্ঞাপন করে থাকে।

এরূপে আরো একটি সুন্দর শ্লোকে কবি লালসার গতিক্রমের একটি সুন্দর বর্ণনায়—লালসার চরিতার্থতায় তার নিবৃত্তি বা উপশমের পরিবর্তে উত্তরোত্তর বিবৃদ্ধির যুক্তি দেখিয়ে ত্যাগের পথকেই গ্রহণযোগ্যরূপে সিদ্ধান্ত করেছেন—

"নিঃস্বো বষ্টিশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো

লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।

চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি

ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃপুনরহো আশাবধিং কা গতঃ ॥" *

* এই শ্লোকটী ডাঃ যোহন হেবার্লিনের সংস্করণে নাই। এটী জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত হলো। এটী জীবানন্দ সংস্করণের ২, ৬নং শ্লোক। এই সংস্করণের ২, ২৩নং শ্লোকও হেবার্লিনে নেই।

অর্থাৎ যে রিক্ত সে কামনা করে শতমুদ্রা, শতপেয়ে শতী যিনি তিনি আবার অতৃপ্তহৃদয়ে সহস্রের লালসায় ধাবিত হন, সহস্রাধিকারীর আবার 'লক্ষে'র পানে লক্ষ্য, লক্ষপতি তখন ভূপতিত্ব ব্যতিরেকে তৃপ্ত নহেন, ভূপতি আবার সম্রাটপদবীর তৃষ্ণায় ব্যাকুল, সম্রাটের ও আবার সুরপতিত্বে দৃষ্টি, সুরপতি ইন্দ্র ও ব্রহ্মা পদবীতে, ব্রহ্মা বিষ্ণু পদবীতে অভিলাষী—এরূপে দেখা যায় আশার আর শেষ কোথাও নেই—অর্থাৎ চরিতার্থতা দ্বারা কামনা পরিপূর্ণ করতে কেহ কখনো পারে না। পারেন কেবল বিশুদ্ধমনা যোগীশ্বরের।

আশা নাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধৈর্যদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্তসুদুস্তরা প্রকটিতপ্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ॥

এরূপে দেখা যায় বৈরাগ্যের যাদুস্পর্শে কবির মনে সার্বজনীন প্রীতির ধারা এমনই ব্যাপকতররূপে প্রবাহিত হয়েছিল যার গুণে অপরের গ্লানি শোকদুঃখ পরিতাপ নিজের অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে বিচার করে তিনি মনোবেদনা অনুভব করতেন। যথার্থ অনুভূতির ফলে অন্তরে যে বিদ্রোহ জেগেছিল, কবিতা বর্ণনায় তখনকার রাজপরিচয়েও যে তার এক কদর্য অত্যাচারিতার রূপ প্রকটিত হয়ে পড়েছে, তাহা বিশেষ লক্ষণীয়। সাধারণ ভূস্বামিগণও যে তখন অত্যাচারিরূপে নিজেদের পরিচিত করে তুলেছেন কবির বেদনা থেকে তা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। কবি আক্ষেপ করে বলেছেন—

"কৃত্বা শস্ত্রবিভীষিকাং কতিপয়গ্রামেষু দীনাঃপ্রজাঃ
মনথন্তো বিটজল্পিতৈরুপহতা ক্ষৌণীভুজস্তে কিল।
বিদ্বাংসোঽপি বয়ং কিল ত্রিজগতীসর্গস্থিতিব্যাপদাং
ঈশস্তৎ পরিচর্যয়া ন গণিতো যৈরেষ নারায়ণঃ॥"

অর্থাৎ সামান্য দু'একটি গ্রামের দুর্বল প্রজাদের উপর পীড়ন চালিয়ে, শস্ত্রভয় প্রদর্শন করে এবং ধূর্তচাটুকারদের চাটুবচনে গর্বিতচিত্ত যে কতগুলি (নরাধম) তারাই ভূপতিতের সম্মান লাভ করে—অর্থাৎ যার হলো ভূভক্ষক, তাদেরই পরিচয় ভূপালক—আর আমরাও কিনা তেমনি যে এই তথাকথিত ভূপালগণেরই সেবাচর্চায় ত্রিভুবনের অধীশ্বর যিনি নারায়ণ, তাঁকেও গণনার মধ্যেই আনিনা, অথচ আমরা হলাম বিদ্বান্ ধীমান!

সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে আমাদের আয়ু হচ্ছে ক্ষীণ, বহুশত কার্য-কারণে সময়ের প্রতি আমাদের খেয়াল থাকে না। জন্মমরণব্যাধি এত সব দুঃখ দেখেও আমাদের ভীতি জন্মায় না—মোহময়ী প্রমোদমদিরা পান করে জগৎ উন্মত্ত হয়ে আছে—

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং
ব্যাপারৈর্বহুকার্যকারণশতৈঃ কালোপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিয়োগমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে।
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ॥ ৪.২৯

কবি তাই নিরন্তর ভাবেন, কবে তিনি গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলায় পদ্মাসনে বসে, ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাসনবিধিতে যোগপ্রাপ্ত হয়ে—নিজের জীবনকে সার্থক জীবনে পরিগণিত করবেন—

গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্য
ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য।
কিং তৈর্ভাব্যং মম সুদিবসৈর্যত্র তে নির্বিশঙ্কাঃ
সংপ্রাপ্স্যন্তে জঠরহরিণা গাত্রকণ্ডূবিনোদম্॥ ৪.১৭

কবি নিরন্তন ভাব্ছেন কবে গঙ্গাজলপূত ভিক্ষান্ন দ্বারা উপরত—সমস্তেন্দ্রিয়সুখ ব্রহ্মাভ্যাসে এমন স্থিরতনু হয়ে থাকতে পারবেন—যা দেখে বনপক্ষীরা তাঁকে গাছের গুঁড়ি ভেবে তাঁর স্কন্ধে ও মস্তকে নিরন্তর নিপতিত হবে—

কদা ভিক্ষাভক্তৈঃ করকলিতগঙ্গাম্বুতরলৈঃ
শরীরং মে স্থাস্যত্যুপরত—সমস্তেন্দ্রিয়সুখম্।
কদা ব্রহ্মভ্যাসস্থিরতনুতয়ারণ্যবিহগাঃ
পতিষ্যন্তি স্থাণুভ্রমহতধিয়ঃ স্কন্ধশিরসি॥ ৪.১৮

এ গ্রন্থ আলোচনাকালে নিরন্তরই আমাদের মনে হতে থাকে—কে এ কবি যে বাঙ্গালীর মনের কথা এমন সুন্দর করে, কেবল বাংলাভাষাকে সুন্দর সংস্কৃতচ্ছন্দে প্রাণদান করে—রূপায়িত করে বাংলার মনের কথা বিশ্ববাসীকে শোনাচ্ছেন? কে এ মধুসূদন সরস্বতীর সগোত্র জ্ঞানমার্গী বৈষ্ণব? কে এ বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু-ধর্মগ্রাসী বঙ্গজননীর ক্রোড়লালিত মহামহিম সন্তান? নামে তিনি কাশ্মীরী, কিন্তু নিশ্চিত তিনি বঙ্গপ্রবাসী গঙ্গাতোয়সংপুষ্টতপোধ্যানপরায়ণ বরেণ্য কবি। ১

---

(১) দুঃখের বিষয়, বিভিন্ন পুঁথিতে এঁর কবিতাবলীর সংখ্যা বিভিন্ন দৃষ্ট হয়। ডক্টর যোহন হেবার্লিনের যে সংস্করণ আমরা ব্যবহার করেছি, তাতে ১০৭টী কবিতা দৃষ্ট হয়। এ প্রবন্ধে প্রদত্ত কবিতাঙ্ক হেবার্লিনের সংস্করণের অনুযায়ী। পুনরায় দেখা যায়—জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দুটী (পূর্বের পাদটীকা দেখুন) বেশী শ্লোক এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে দুটী বেশী শ্লোক আছে। এ গ্রন্থে এগারটী শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। কোন কবিতা প্রক্ষিপ্ত, তা স্থির করতে অনেক গবেষণা প্রয়োজন হবে।

বৃটেনের পথে-ঘাটে

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম-এ (এড্), এম-এ (লণ্ডন), টি-ডি (লণ্ডন)

সেদিন ছিল রবিবার, বরষা থেমেছে মাঝরাত থেকে, ভোর হয়ে এসেছে, বেরিয়ে পড়তে হবে বেলা বাড়বার আগেই। মন টেনেছে নিরালা বনানীর দিকে। লণ্ডন থেকে বেশ খানিকটা দূরে—নাম এপিংফরেষ্ট, গ্রীণকোচে উঠে পড়লাম, কোনমতে শীতের রাজ্য পেরিয়ে, শ্রমিক পল্লীকে পেছনে ফেলে কোচ চল্ল। যাবার পথে চোখে পড়ল দারিদ্র্যের রুক্ষ রূপ। প্রায় সব দেশেই তার রূপ সমান—কোথাও পক্ষপাতিত্ব নেই। স্যাঁৎসেঁতে পুরনো ঘরবাড়ী, কাঁচের জানলায় পর্দা জোটেনি—কয়েকটি ছেঁড়াজোড়া জামাকাপড় ঝুলছে। তখনও শ্রমিকদের মধ্য-রাত্রি। অনেক রাত পর্য্যন্ত হৈ চৈ স্ফূর্ত্তি করে সবে বোধহয় নিদ্রাপুরীর যাত্রী হয়েছে। কালো কালো ভাঙ্গাচোরা ইঁট বারকরা বাড়ীগুলো জোর গলায় জানিয়ে দেয় যে, সেটা হচ্ছে একটা শ্রমিকপল্লী। মাঝে মাঝে দুই একটা মোরগ বাড়ীর বাইরে এসে ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছে।

পেরিয়ে এলাম শ্রমিকদের রাজ্য—মনে হল এরাও তো মানুষ—সভ্যদেশেই বা এদের কি অবস্থা। ভাবছিলাম অনেক কথা। হঠাৎ চোখে ভেসে উঠল সবুজের রাজ্য—চারিদিকে যেন সবুজের প্লাবন। নগরীর ত্রস্ত কোলাহল থেকে তখন আমরা দূরে চলে এসে প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেল কোচের মধ্যে—কত পল্লী, কত জনপদ, কত কোলাহল মুখর পার্ক পার হল, শেষে এসে পৌঁছলাম বনের ধারে, পথের প্রান্তে। লণ্ডনের কাছে এতবড় বনভূমি থাকতে পারে দেখলে বিশ্বাস হয় না। বাস ষ্টপ থেকে সকলের গতিপথই প্রায় নির্দ্দিষ্ট, সবাই চলেছি একদিকে, শুনলাম এই বনভূমিতে অনেক জন্তু জানোয়ারের বাস। মনে একটু শঙ্কা জাগল—যাক কাছে এসে পড়েছি। অদূরেই গহন বন। বনস্পতি কোথাও কোথাও ভীড় করে আছে, কোথাও আলোছায়ার লুকোচুরী, আবার কোথাও ঘন নিবিড় আঁধার। দিনের বেলাতেও সূর্য্যের প্রবেশাধিকার নেই। যেন নিথর নিঝুম স্বপ্নপুরী। মাঝে মাঝে স্তব্ধতাকে ভেদ করে আসছে কূজন কাকলী, আর তারই সাথে সুর মিলিয়ে পাখীদের নীড় বাঁধার শব্দ। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত এই অরণ্য। কোথাও সুদীর্ঘ ওকগাছের সারি—আবার কোথাও নুয়েপড়া উইলোগাছের ঝোপঝাড়।

বনের যেন শেষ নেই, মাঝে মাঝে ঢালু সবুজ খাদ, আর কাজল-দীঘি। বনফুল ফুটে আলো করেছে দীঘির পাড়কে। শিশির ভেজা ঘাসের পরে দুই একটি প্রজাপতি কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখানে কেন বনলক্ষ্মীর আসন পাতা।

হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে অনেকবার প্রকৃতির লীলানিকেতনের মাঝে। কিন্তু এখানে এসে খুঁজে পেলাম হারিয়ে যাওয়া আমিকে। ভেসে উঠল সেই শান্তস্নিগ্ধ ভারতীয় তপোবনের ছবি···আর আমার স্নিগ্ধ-শ্যামল দেশ-মাতৃকার রূপ।

এই সব বনভূমি বৃটেনের জাতীয় সম্পদ—তাই বহু টাকা ব্যয় করে এদের সৌন্দর্য্যকে অক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টার অন্ত নেই এদেশে। লণ্ডনের বহু পার্ক দেখে মন ভরেনি—কারণ সেখানে আছে মানুষের নিপুণ করস্পর্শ,—কিন্তু এমন এলোমেলো প্রকৃতির রূপের মধ্যে আছে বৈচিত্র্য, আছে মোহাবেশ।

কখন বেলা গড়িয়ে গেছে, ওকের সারি তখন সোনার সাঁঝে অস্ত-রবিকে দিন শেষের নতি জানাচ্ছিল। তাদের মাথা থেকে তখনও শেষ আলো মিলিয়ে যায়নি।

এবার ফিরবার পালা। বাসষ্টপে এসে শুনি শেষ বাস চলে গেছে—বিভ্রান্ত পথিকদের পথে ফেলে। মনে সারথির প্রতি অভিমান জাগল। রাত কাটবে কি করে এই হল চিন্তা। এমন সময়ে আরও দুটি প্রাণী সরল মনে আমাকে জিজ্ঞাসা করল "Have you lost your way ?" পথিক! তুমি কি পথ হারাইয়াছ? কথায় কথা-বেড়ে উঠল—শেষে আধঘণ্টা বাদে মনে হল তারা যেন কতদিনের পরিচিত বন্ধু। তারা এসেছে মধুযামিনী যাপনের জন্যে। স্থান নির্ব্বাচন ক্ষমতার তারিফ না করে পারলাম না। কোথায় ইটালীর কোন সাগর-সৈকতে তাদের প্রথম পরিচয়—তারপর হৃদয় বিনিময়।

শেষে আশ্রয় মিলল বনের ধারে একটি ছোট্ট "সরাইখানায়"। আমাকে পেয়ে ভুলে গেল তারা মধুযামিনীর কথা—সারারাত ধরে গল্প করতে চায়। নিশীথ রাত্রে দূরের গীর্জ্জায় ঘোষণা করল রাত্রি দ্বিপ্রহর। সকলের চোখই তখন জড়িয়ে এসেছে ঘুমের ঘোরে। শেষে যে যার ঘরে চলে এলাম।

অনেকদিন পরে আবার পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙ্গল। উঠে দেখি প্রভাত-রবির সোনার আলো যেন সেই বনলক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়তে চাইছে। চারিদিকে বসেছে পাখীদের হাট আর আনন্দ-উৎসব।

সকালে আবার সেই যুগলের সঙ্গে "ব্রেকফাষ্ট" টেবিলে দেখা। তাদের চোখে তখনও তন্দ্রা জড়ানো।

আজকে ঠিক হল সেখান থেকে একেবারে সাগর-সৈকত ব্রাইটনের সমুদ্রতীর—জনপদপল্লী পোরিকে। পথের ক্লান্তি নেই, কারণ সঙ্গে আছেন পরম রসিক দুটি তরুণ হৃদয়। তারাও চলেছে সাইকেলে।

বেশ কয়েকঘণ্টা দ্বিচক্রযানে অভিযানের পর দূর দিগন্তে ভেসে উঠল এক স্বপ্নলোকের ছবি। যেন পৃথিবী একরূপ ধরা দিল—তার ইঁট-কাঠের আবরণ সরিয়ে—সে যেন এক ভিন্ন জগৎ। মনে হল কি বিশাল এই পৃথিবী, কি বিচিত্র তার রূপ [illegible] এর শেষ কে জানে।

পৃথিবী যে সমতল একথা ভুলে যেতে হয় এই দেখলে। আদিঅন্ত শ্যামলের নীলাচল তরঙ্গ। কার অভিশাপে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে—তাই নিয়েছে কঠিন রূপ।

এদিকে সন্ধ্যা নেমে এল, ভুবন আঁধার হয়ে এল—সে রূপ মিলিয়ে গেল অতল আঁধারে। কিন্তু আমরা তখনও পথের প্রান্তে এসে পৌঁছায়নি। রাত্রির আশ্রয় মিলবে কোথায়?

ম্যাপ দেখে বুঝলাম, আমরা সমুদ্রের কাছেই এসে পড়েছি। বসতি ক্রমশঃই ঘন হয়ে আসছে। কল-কোলাহলে মুখর হয়েছে সমুদ্রতীর। হোটেল গড়ে উঠেছে এই সাগরতটে।

সেদিন রাতে জ্যোৎস্না উঠেছিল। ব্রাইটনের সমুদ্রতীর। কত কথা কানে ভেসে আসে, সবাই দেহ এলিয়ে দিয়েছে সেই উপলভরা উপকূলে। আকাশের চাঁদ যেন লুটিয়ে পড়তে চাইছিল বিপুল সিন্ধুর বুকে। চাঁদের আলোয় সমুদ্রকে যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেই মধুর পরিবেশ, গীতি-মদিরায় পাগল-করা প্রাণ-বিনিময় চলছিল।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। যেন সমুদ্রের জল কানের কাছে ছল-ছল করে উপছে পড়ছে। সারারাত্রি কেটে গেছে সমুদ্রের ধারে। নীল অঞ্চল বিছিয়ে দিয়েছে বিপুল সিন্ধু। সূর্য্য উঠল—জাগল ঘুমন্তপুরী।

জনপদ (লীডস্ নগরীর ইতিহাস)

লীড্স্ নগরীর মাঝে জড়িয়ে আছে অনেকদিনের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস। ইয়র্কসায়ারের মাঝখানে এই বিশিষ্ট নগরীর পত্তন হয়েছিল, কবে—কি ভাবে—কে জানে? তবে ৬৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে এই প্রাচীন নগরীর লিখিত ইতিহাস টুকরো টুকরো ভাবে পাওয়া যায়। প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে নাকি কেল্টিক সম্প্রদায় ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং এদের বৃগাণ্টস্ (Brigants) বলে লোকে জানতো। এদের প্রতিপত্তিও ছিল অপ্রতিহত। ৮৬৭ খৃষ্টাব্দের কথা—যখন এই ইয়র্কের বুকে এক লংকাকাণ্ড সুরু হ'ল। প্রবাসী ডেন (Danish) এই ইয়র্ককে নিল ছিনিয়ে, আর তাকে পুড়িয়ে শ্মশান করে দিল। এমনি করে একে একে সমস্ত নর্দ্দাম্ব্রিয়া ডেনদের করায়ত্ত হ'ল। কিন্তু এদের রাজত্বকালে বিপ্লবের আগুন সমানে জ্বলেছে। তাই ডেনরাজত্বের রক্তমাখা ইতিহাসে যে কত রাজার উত্থান পতন ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। ক্রমশঃ ডেনদের রাজধানী গড়ে উঠলো এই ইয়র্কের ধ্বংস স্তুপের উপর। একে একে ব্যবসা ও বাণিজ্যের পত্তন হ'ল।

তারপর নরম্যানদের পালা—যখন থেকে লীড্সের লিখিত ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি গীর্জা, তার পুরোহিতও মাত্র কয়েকবিঘা চাষের জমি নিয়েই লীড্সের ইতিহাসে এই অধ্যায়ের সূচনা। কৃষি পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে একে একে এই লীড্স্কে ঘিরে কারখানা, গীর্জা, ও বাড়ীঘর গড়ে উঠতে লাগলো। তারপর ১২০৭ সালের বারোই নভেম্বর, মরিস প্যাগানেলের (Morrice Paganel) চার্টার দানের সংগে লীড্সের ইতিহাসে যুগান্তর ঘটলো। এই চার্টারের ফলে অধিবাসীদের স্বাধীন জীবনযাত্রা, ও ভূমির অধিকার সম্পর্কে অনেক সুযোগ দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু পূর্ণ নাগরিক স্বাধীনতা থেকে তারা বঞ্চিতই রইল। ষোড়শ শতাব্দীর অবসান হ'ল একে একে।

এর পর লীড্স্কে কেন্দ্র করে বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠতে লাগলো। কৃষিপ্রধান পল্লীর রূপান্তর ঘটলো। এদিকে প্রথম ও দ্বিতীয় চার্লসের চার্টার অনুমোদনের ফলে লীড্সের নাগরিক মর্য্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় চার্টার লীড্স্কে 'নগরী' বলে ঘোষণা করলো। একদিনের গণ্ডগ্রাম আজ নগরীর গৌরবলাভ করে আলোক সজ্জায় হাসতে লাগলো। চারপাশের ছোট ছোট পল্লী লীড্সের অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

এয়ার নদীর তীরে এই সুন্দর নগর, তারই কলতানে নগরবাসীর ঘুম ভাঙ্গে। ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে নাকি এই নদীকে প্রথমে সেতু দিয়ে খণ্ডিত করা হয়েছিল এবং তারই তীরে গড়ে তোলা হয়েছিল সুন্দর একটি প্রার্থনা-মন্দির। আজ এই নগরী সমগ্র বৃটেনের এক বিপুল সম্পদ। পশমশিল্প এই নগরের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে। শহরের অনেক অধিবাসীই এই শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। শিল্প-প্রধান শহর হলেও পথঘাট পরিচ্ছন্ন। শিক্ষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি কোন দিক থেকেই লীড্স্ আজ পেছিয়ে নেই। কোথাও প্রশস্ত রাজপথের দুধারে সুরম্য-সৌধশ্রেণী—মাঝে মাঝে বিরাট প্রমোদ কানন, আর কোথাও বা প্রাচীন গীর্জা। স্থাপত্যশিল্প শিক্ষার মন্দির। একদিকে ব্যবসার কেন্দ্র ও প্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চল—অপরদিকে বৃটেনের বহু প্রাচীন খণ্ড-ছিন্ন ইতিহাস এই নগরীর সাথে জড়িত থাকায় লীড্স্ আজ বিশেষ দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এই নগরী অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষের জন্ম দিয়েছে। তাই বিখ্যাত নাট্যকার উইলিয়ম্ কঙ্গ্রিভ্, রসায়ন-বিজ্ঞানী জোসেফ্, ও এমনি আরও অনেক পুণ্য জীবনস্মৃতি জড়িত রয়েছে লীড্সের মাটীর সংগে। লীডসের বিখ্যাত প্রমোদোদ্যান হচ্ছে Temple ও Round Hay Park, এই রাউণ্ড হে পার্ক নগরের সবচেয়ে বড় ও সুন্দর উদ্যান। প্রায় ৯৪০ একর জমি নিয়ে এই পার্কটি। মাঝে মাঝে সুন্দর ফুলের বাগিচা। ছোট ছোট দীঘি ও একটি সুন্দর প্রাসাদ। এমনি ছোট বড় নয় দশটি পার্ক আছে এই নগরীর স্থানে স্থানে। এরা কেবল নগরীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে না। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখছে।

তারপর এখানকার সুন্দর সুন্দর প্রাচীন গীর্জা—Parish Church, সেন্ট জনস্ চার্চ, এডেন চার্চ ও আরও যে কত সুন্দর সুন্দর স্মৃতি জড়ানো গীর্জা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। একসংগে যখন এই সব গীর্জার ঘড়ি বেজে উঠে—তখন মনে জাগে এক অদ্ভুত অনুভূতি।

এ ছাড়াও বহু প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ লীড্সের পথে ছড়ানো। প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করার মত। লীড্সের যাদুঘর বড় না হলেও অনেকদিনের। এর মধ্যে Temple Newsom ও Abley Howse Museum দেখবার মত।

লীড্স্ নগরীর যানবাহনের মধ্যে দোতলা ট্রাম আজও লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর চলাফেরার পথে সহায়তা করছে। স্পন্দনমুখর এই নগরের চারিদিকে যেন জনস্রোত ছুটে চলে—তারই মাঝে পুষ্পরথের মত যখন দোতলা ট্রাম প্রশস্ত পথে চলতে থাকে, তখন সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সাধারণ পাঠাগার, বিশ্ববিদ্যালয়—লীড্সের অন্যতম-সম্পদ। বস্ত্র শিল্পকে ঘিরে বহু গবেষণার ব্যবস্থা এই বিশ্ববিদ্যালয়টির বিশেষত্ব। মোট কথা শিল্পপ্রধান নগরী হিসাবে লীড্স্ আজ বৃটেনের প্রধান প্রধান নগরীর অন্যতম।

পরিবর্তন

শ্রীমণিলাল বসু

আরাবলী পর্ব্বতের পাশ ঘেঁসে পীচ ঢালা বড় রাস্তা। রাস্তার অপরদিকে আগাছার জঙ্গল আর খানা-খোন্দরে নানা জাতের ভয়াল সরীসৃপের বাসভূমি। আরও দূরে শালবনে হিংস্র জন্তুদের বিচরণ ক্ষেত্র। এই ভয়ঙ্কর বিঘ্নসঙ্কুল পথেও পথিকের পথ চলার বিরাম নেই।

পথের ওপ্রান্তে জয়পুর, এ প্রান্তে অম্বর।

অম্বর প্রাসাদ মানুষের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ও যেন চুম্বকের মতই আকর্ষণ করে নেয় মানুষকে। তাই ভোর না হতেই জয়পুর রোড জনকোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে।

এই দীর্ঘ পথের মাঝখানে পাহাড়ের ওপর হোটেল জোলিমার। অম্বর প্রাসাদ পরিদর্শনান্তেক্লান্ত পর্য্যটকদল ফিরতি পথে এই হোটেল টিতে আশ্রয় নেয়—রাজপুতানার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রাণ ভোরে ভোগ করে নিতে। পাহাড়ের ওপর রক্তবর্ণ গ্রানাইট পাথরের হোটেল ভবনটীকে যেন ঠিক দুর্গের মত দেখা যায়। একদিন এটা দুর্গই ছিল হয়ত। কিংবদন্তী—এককালে এটা পিণ্ডারী দস্যুদের গুপ্ত আড্ডা ছিল। ওদের দস্যুতালব্ধ হীরা জহরতাদির এটাই ছিল নাকি রত্ন ভাণ্ডার।

দস্যুর রত্ন-ভাণ্ডার আজ হোটেলে রূপান্তরিত।

হোটেলের মালিক রামানুজ ব্যাস।

পাহাড়ের পূব দিক্‌টা অপেক্ষাকৃত সমতল। সেই জন্য এই দিকেই হোটেলের সদর। পশ্চিম দিকটা অত্যন্ত খাড়াই, নীচের যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। লোকালয়ের চিহ্নমাত্রও নেই। মানুষের সাড়া সেদিকে মেলে না। পশু পক্ষী কি আছে, কি নেই বোঝা যায় না। শান্ত নিস্তব্ধ দুপুরে কখনও হয়ত শকুনের তীব্র চিৎকারের মত, অথবা কখন হয়ত একটা হা হা শব্দ বাতাসের সাথে শোনা যায়। দিবারাত্র রহস্যময় বনভূমি রহস্য-আবরণে থাকে ঢাকা। শুধু একটি মাত্র রাতে এই বনে চাঞ্চল্যের সাড়া জাগে। সে দেওয়ালী রাতে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে সুপ্তবনভূমি অকস্মাৎ যেন জাগ্রত হয়। গভীর রাত্রে দূরবনভূমির অন্তস্তল থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন-ধ্বনি বাতাসের সাথে ভাসতে ভাসতে আসে। ক্রুদ্ধ একটানা গর্জ্জন ধ্বনি। আর চারিদিক থেকে একটা ভীতিসঙ্কুল আর্তস্বর সমস্ত বনভূমিকে মথিত করে তোলে। সমস্ত বন-ভূমি যেন এক ভয়ঙ্করের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে।

ক্ষণকাল পরে পশ্চিম পাহাড়ে খাড়াইয়ের নীচে সেই একঘেয়ে গর্জ্জনধ্বনি যেন শুরু হয়। ওখান থেকে দুটি ভয়ঙ্কর চক্ষু ক্ষুধিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে হোটেলের দিকে। সেই অতি ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সম্মুখে দৃষ্টি মেলাতে পারে, এমন সাহসী দেখা যায় না।

কিন্তু ভীত নয় শুধু রামানুজ ব্যাস; তার মতে ও নেকড়ের দুটো চোখ ছাড়া আর কিছু নয়।

মাত্র পাঁচটি বছর হোটেল চালিয়ে রামানুজ ব্যাস আজ লক্ষপতি। পাঁচ বছরে লাখ টাকা। অনেকের মতে রামানুজ আফিনের চোরা-কারবারী, হোটেল উপলক্ষ মাত্র।

এরূপ সন্দেহের বিশেষ কারণ ছিল। রামানুজের পিতা বিক্রম ব্যাসের গুপ্তহত্যায় পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। জয়পুর অঞ্চলে তার নাম ছিল জানোয়ার। জানোয়ারের ঔরষজাত জীব-জানোয়ারই। যে রক্তে রক্তলোলুপতার বীজ নিহিত, রক্তের প্রতি ক্ষুধা তার স্বাভাবিক। এই সমস্ত কারণে জোলিমারের রামানুজকে সকলে সন্দেহের চোখে দেখত, কিন্তু টুঁ শব্দটি করবার উপায় ছিল না কারো।

রামানুজের হোটেলখানা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে চলছিল ভালোই, কিন্তু হঠাৎ হোটেলের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

ঘটনাটা এই :—

বিখ্যাত হীরক-ব্যবসায়ী টগরমল এই হোটেলে উঠেছিলেন কিছু মূল্যবান প্রস্তর ক্রয় করবার জন্যে। কয়েকখানা বহু মূল্যবান প্রস্তর কিনেছিলেন বলেও শোনা যায়। দেওয়ালী রাতে তাঁর আজমীর রওনা হওয়ার কথা, কিন্তু মাঝ রাত্রে তাঁকে বিছানায় খুঁজে পাওয়া গেল না। বলাবাহুল্য তাঁর জহরতের পেটিকাটিও সেই সঙ্গে নিরুদ্দেশ।

পরের বৎসর জায়গীরদার বংশীধর চাগওয়ালারও ঠিক ঐ অবস্থা। মধ্যরাত্রে তিনিও হোটেল থেকে নিরুদ্দেশ।

উপর্য্যুপরি দুইটি নিরুদ্দেশ, বিশেষভাবে দুজন বিত্তশালী ব্যক্তির আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে বিচলিত করে তুললো। রামানুজের পূর্ব্ব পুরুষের কলঙ্কমলিন ইতিহাস পুলিসের নথিভুক্ত থাকা সত্ত্বেও রামানুজকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হোল না। প্রথমতঃ সে ধনী, তারপর তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই।

অবশেষে ইন্সপেক্টার শীশোদিয়ার ওপর এই নিরুদ্দেশ-রহস্যের যবনিকা ভেদ করবার ভার পড়ল।

সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করবার পরে শীশোদিয়া একদিন দ্বিপ্রহরে কতকগুলি কনষ্টেবলসহ নেমে গেলেন খাড়াইয়ের নিম্নে, গহন অরণ্য মধ্যে। উপরে শিকল বেঁধে অতিকষ্টে নামতে হোল সবাইকে নিম্নভূমিতে। নাহলে পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করে সবাইকে আসতে হোত এ অঞ্চলে। সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গল চারিদিকে। তারপর পাহাড়ীয়াদের কাছে তিনি জানতে পেরেছিলেন ওদিকটায় কোন এক ভয়ঙ্কর জানোয়ারের গতিবিধির কথা। সে নাকি এক ভীষণ জানোয়ার—শক্তির কোন তুলনা হয় না তার। যে কোন পশুপক্ষীকে সম্মোহিত করে আকর্ষণ করে নেবার শক্তি নাকি তার অসাধারণ। তার চোখের দিকে দৃষ্টি পড়লে আর রক্ষা নেই।

যাই হোক এই দুরধিগম্য স্থান যে এক মনুষ্যবর্জ্জিত প্রদেশ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতেই তিনি দলবলসহ উপরে উঠে এলেন। তাঁর সন্দেহ ছিল হয়ত পাহাড়ের নীচেয় দু' একখানি নর-কঙ্কাল তাঁর দৃষ্টিগোচর হবে।

শীশোদীয় অমিত-শক্তি জানোয়ারের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও তার আকৃতি-প্রকৃতির পরিচয় পান নাই। এক অতিকায় হিংস্রপ্রাণী প্রতি বৎসর দেওয়ালী রাত্রে এই পাহাড়ের নীচেয় ওতপেতে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উৎসুক দৃষ্টিতে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করতে থাকে জোলিমার হোটেলের দিকে। মাঝে মাঝে গর্জ্জন করে ওঠে ওদিকে তাকিয়ে, অধীর আগ্রহভরে কি যেন সে পেতে চায়। তারপর রাত্রি যখন গভীর হয়, পৃথিবী যখন সুপ্ত তখনই তার প্রার্থিত সামগ্রী তার মুখের কাছেই আছাড় খেয়ে পড়ে ঐ পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া থেকে। আছাড় খেয়ে পড়ে একটী মানুষ, মৃতদেহ নয় জীবন্ত মানুষ। সেই মানুষটিকে সে মুখে পুরে দেয় সহজেই—তারপর গলাধঃকরণ করতে থাকে স্বচ্ছন্দে পরম উল্লাসে গোক্ষুরার মুখে একটি বিড়াল শাবকের মতই।

এই জানোয়ার বিক্রম ব্যাসেরই আবিষ্কার, যার বলে পুলিসের চোখে সে ধূলি দিয়েছে অনায়াসে, যার বলে রামানুজ আজ লাখপতি।

বছর ঘুরে ফিরে এল নূতন দেওয়ালী। সন্ধ্যার এখনও অনেক দেরী. কিন্তু বিকেল থেকেই বাজির ধুম পড়ে গেছে সর্ব্বত্র। জয়পুর সহর থেকে বাজির আওয়াজ আসছে কামান গর্জ্জনের মত। হাউই উঠছে হু হু শব্দে—আকাশে সশব্দে ফেটে পড়ছে অসীম শূন্যে রঙিণ বিচিত্র আলোককণা।

সেই দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রামানুজের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বক্ষপঞ্জর ভেদ করে। মনে পড়ল তার গেল বছরের দেওয়ালীর ঘটা। তার হোটেল বাড়ীতে সে কি ঝিলমিলি। কত লোকের আনাগোনা। বৈদ্যুতিক আলোকসম্পাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সমস্ত পাহাড়টা যেন।

কতদিন গেল, তার হোটেলে জনসমাগম নেই। আশ্চর্য্য এই দেওয়ালীর রাতে তার একজন খদ্দেরও এল না। কিন্তু খদ্দের তার একজন অন্ততঃ চাই—নাহলে ক্ষুধার্ত্ত জানোয়ারের ক্ষুধা মিটাবে সে কি উপায়ে?

একে গভীর চিন্তা, তারপর ঘোর অন্ধকারে তার লক্ষ্যও ঠিক ছিল না। একটা তুবড়ি জ্বলে উঠতেই সে দেখতে পেল একটি লোক তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা গাঁঠরি।

পরম উল্লাসে সে আগন্তুকের হাত দুখানি ধরল দুহাতে—তারপর গাঁঠরিটা নিজেই তুলে নিয়ে হোটেলের দিকে

পা বাড়াল। আগন্তুককে একটি সুসজ্জিত কামরায় বসিয়ে বিনয়-নম্রমুখে জিজ্ঞাসা করল—কি খাবেন রাত্রে? লুচি পুরি, কচৌড়ি, কাঁলাকাঁদ পেট-ভরতি মাত্র দুটাকা। সিটভাড়া একটাকা মোটে।

আগন্তুক যুবার বয়স হয়ত তেইশ কিম্বা চব্বিশ। ধূলিমলিন পায়ে ততোধিক ধূলিযুক্ত জুতা, পরণে অর্দ্ধমলিন পা-জামা, তাও স্থানে স্থানে ছেঁড়া, মাথায় শতছিদ্র মলিন জরীর টুপী। দেখলেই মনে হয় বহুদূর পার হয়ে আসছে। ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল, নিষ্প্রভ দৃষ্টি তার চরম অবস্থারই সাক্ষ্য দেয়।

তার সব কথা বোঝা গেল না। কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ। এটুকু বোঝা গেল—সে রাত্রিটুকুই কাটাতে চায় মাত্র। আহারের প্রয়োজন তার নেই।

রামানুজ আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে একমুহূর্ত্ত কি ভাবল। তারপর হাসিমুখে বলল—ওঃ বলতে ভুলে গেছি মশাই আপনাকে। দেওয়ালী রাত্রে দাম নিই না মশাই খাওয়ার জন্যে। কম্‌পিটিসানের বাজার কিনা। একটু সুবিস্তা খদ্দেরকে দিতেই হবে একটা দিন।

মনে ভাবল—পকেট তোমার গড়ের মাঠ তা বুঝতে পেরেছি বাপু। খেয়ে নাও পেট ভরে জন্মের মত আজ।

রামানুজের কথার প্রত্যুত্তরে কি যেন বলতে গেল আগন্তুক, কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করে রামানুজ বলল—পুরি, কচৌড়ি, কাঁলাকাঁদ পেট ভরে খেয়ে নেবেন, সাব। একটু লজ্জা করবেন না যেন। আপনি আমার অতিথি। অতিথি ত ভগবান। আচ্ছা এখন নমস্কার—বলেই পা বাড়াল।

আগন্তুক কিছুক্ষণ তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অসীম বিস্ময়ে, তারপর তার দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। ময়লা উড়ানীখানা চেপে ধরল চোখের ওপর কিন্তু অশ্রু প্রবাহ বাধা মানল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বালকের মত।

আজ দুটো দিন সে উপবাসী। জল ভিন্ন কিছুই পেটে পড়েনি আজ দুটো দিন। তারপর এই পথশ্রম। তার সংসারের একমাত্র অবলম্বন তার বিধবা মায়ের আহ্বানে দেশে ফিরে চলেছে সে। স্বামীর ভিটের মায়ায় দেশ ছাড়তে পারেন নি তার মা। সেই ভিটেটুকু আজ যেতে বসেছে। আত্মীয়রা ষড়যন্ত্র ক'রে অসহায়া রমণীকে পথে বসিয়েছে; তাই বহুদূর থেকে ছুটে চলেছে পাগলের মত সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে।

চরম দুর্গতির দিনে ঐ দুটি সহৃদয় কথা তার সমস্ত হৃদয়কে প্লাবিত করে দিয়েছে। গভীর কৃতজ্ঞতায় তাই চোখের জল তার বাধা মানল না। রামানুজের গমন পথের দিকে তাকিয়ে সে মাথা অবনত করল গভীর শ্রদ্ধায়।

রাত্রি গভীর। কোনো সাড়াশব্দ নেই। রামানুজ আগন্তুকের ঘরে প্রবেশ করল চোরের মত। হাতে তার ক্লোরাফর্মের শিশি। একটু তুলার খুব প্রয়োজন তার। অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজে পেল না তুলো। কোথায় গেল তুলোর বাণ্ডিলটা। অধীর আগ্রহে এদিক ওদিক হাতড়াতে সুরু করল, তুলোর বাণ্ডিলটা তার অত্যন্ত দরকার।

পেটটি বোঝাই করে খেয়েছে লোকটা। অঘোরে ঘুমুচ্ছে—রামানুজের পক্ষে চমৎকার সুযোগ এই। ক্লোরাফর্মের তুলো নাকের কাছে রাখতে হবে কিছুক্ষণ, তারপর ও নিদ্রা আর সহজে ভাঙ্গবে না। বাছাধনকে দুহাতে পাঁজাকোলায় তুলে নিয়ে ঐ খাড়াই পর্য্যন্ত যাওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। জমাট অন্ধকারে কোন পুলিসের ব্যাটাও আজ নজর দিতে পারবে না তার ওপর। টগরমল মাড়োয়ারীর কথা মনে পড়তে তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। ঐ খাড়াই পর্য্যন্ত টেনে নিতে হাঁপিয়ে উঠেছিল সে। ব্যাটা যেন একটা হাতীর লাস।

বনের মধ্যে গভীর গর্জ্জন ধ্বনি উঠেছে। ও কিসের গর্জ্জন ধ্বনি বুঝতে তার বাকী রইল না। সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই হোল তাকে। তুলো তার একান্তই দরকার। আলো জ্বলতেই আগন্তুকের বুকের ওপর তার দৃষ্টি পড়ল। বুকের ওপর একখানা কাগজ, চিঠি বলেই মনে হোল তার।

কৌতূহলবশে কাগজখানা সে তুলে নিল হাতে। হ্যাঁ পত্রই বটে। নিদ্রার পূর্ব্বে আগন্তুক হয়ত পড়েছিল ঐ চিঠিখানা। খোলা চিঠি সেই অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে আছে বুকের ওপর। রামানুজ আস্তে আস্তে পড়তে লাগল

চিঠিখানা। পড়তে পড়তে মুখখানি তার কেমন যেন হ'য়ে গেল। চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা নতুন আলো। পড়া শেষে কিছুক্ষণ ভাবতে লাগল আপন মনে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আগন্তুকের দিকে। আবার পড়ল চিঠিখানা। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল, কি যেন সে ভাবছে আপন মনে।

তার মাথার মধ্যে যেন সব ওলট পালট হয়ে গিয়েছে, তুলোর কথা ভুলে গিয়েছে। ক্লোরাফর্মের শিশিটা কোন মুহূর্তে হস্তচ্যুত হয়ে মেঝের ওপর পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে খেয়াল নেই তার।

এক দুঃখিনী বিধবার অন্তর্বেদনার কাহিনী তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিছুতেই তা থেকে পরিত্রাণ পেতে পাচ্ছে না রামানুজ। প্রবঞ্চক আত্মীয়বর্গ কর্তৃক স্বামী নিহত, সম্পত্তি পরহস্তগত, বাসস্থান বটবৃক্ষছায়া—তাই একমাত্র পুত্রকে দেশে ফিরে আসবার জন্য পত্র লিখেছেন দুঃখিনী মা।

স্নেহ, মমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি রামানুজের জীবনে অর্থহীন শব্দমাত্র। যে শিক্ষা, দীক্ষা ও সংসর্গগুণে চরিত্র হয় উন্নত মার্জিত, সে শিক্ষার সংস্পর্শ তার জীবনে এক অলিখিত অধ্যায়। পিতার কাছে একটি শিক্ষাই সে পেয়েছিল—অর্থের জন্য সব কিছুই করবে। মানুষ জানোয়ারে তফাৎ নেই।

এই উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে এসেছে এতকাল। দুঃখের অনুভূতি জীবনে এই প্রথম। তাই সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তার জীবনের প্রতি যুগপৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তার সমস্ত ধ্যান-ধারণা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল মুহূর্তে। আলমারীটা সে খুলে ফেলল সশব্দে। প্রচণ্ড শব্দে আগন্তুকের যে নিদ্রাভঙ্গ হোল সেদিকে তার খেয়াল নেই। আলমারীর ভেতর থেকে টেনে বার করল এক বাণ্ডিল নোট। তারপর আগন্তুককে জাগরিত দেখতে পেয়ে তাকে ইঙ্গিত করল অনুসরণ করবার জন্যে।

উভয়ে জয়পুর রোডের ওপর এসে দাঁড়াল। রামানুজ গাঁঠরিটা টেনে নিল নিজ হাতে। তারপর গাঁঠরির মধ্যে নোটের বাণ্ডিলটা ঢুকিয়ে দিয়ে বলল—চলে যাও ভাই মায়ের কাছে। ঐ বাণ্ডিল সাবধান। আর মায়ের দুঃখ মোচন কোরো। মাকে কষ্ট দিও না।

ওপরে অনন্ত আকাশে অগণিত প্রদীপ্ত তারার মালা। ক্ষণকাল সেই দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল রামানুজ। তার মুখে ফুটে উঠলো এক অদ্ভুত হাসি। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো দুফোঁটা তপ্ত জল। আজ যদি তার মা' জীবিত থাকতো! আজ যদি সে অমনি করে মায়ের কাছে যেতে পারতো!

মিনতি

কামাখ্যা সরকার

শূন্য করে যাব যেদিন
আমার সকল দান,
অশ্রু জলের আলিম্পনে
লিখো না মোর নাম।

(আমি) হারিয়ে যেন পারি যেতে
এই পৃথিবীর দুয়ার হ'তে
নিঃস্ব করে আমার সকল—
জীবন-সাধা গান॥
বিদায় দিও আমার আপন
মুখর প্রকাশ নীরব গোপন,
সন্ধ্যা ছায়ার করুণ সুরে
দিনের অবসান॥

প্রশ্ন

বাণীকণ্ঠ

আবার কেন বারে বারে তোমায় মনে পড়ে?
এলো চুলের রাশি তোমার, হাওয়া লেগে আজো কি ওড়ে?
তোমার চোখের সজল দিঠি,
মুখের হাসি মিটি মিটি—
বিদায় বেলার গানটি তোমার আজো মনে জাগে,
হৃদি আমার ভরা আজো তোমার অনুরাগে।
কাজল-কালো আঁখি তোমার আর কি, আমায় খোঁজে?
কাছে গেলে, তেম্‌নি ক'রে, আর কি তা'রা বোঁজে?
অধর তোমার আর কি প্রিয়ে,
কাঁপে তেমন র'য়ে র'য়ে?
আর কি সেথা আমার লাগি আবেগ জেগে ওঠে?
চিত্তে তোমার আর কি প্রিয়া মূর্তি আমার ফোটে?

বেকার সমস্যা ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের বেকার সমস্যার সমাধানে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মোটেই সাফল্যলাভ করে নাই। অবশ্য এই ব্যর্থতার উল্লেখের অর্থ ইহাই নয় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের আর্থিক পুনর্গঠন প্রয়াস সমগ্রভাবে নিষ্ফল হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম পরিকল্পনার আমলে নদনদী সংস্কার, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, পথঘাট উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতি দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকারী কাজও কিছু কিছু হইয়াছে, তবে প্রত্যক্ষ ভয়াবহ বেকার সঙ্কট হ্রাস না পাওয়ায় রূপায়িত পরিকল্পনার যেটুকু বাস্তব সাফল্য জনসাধারণ সে সম্পর্কে উল্লসিত হইতে উৎসাহ বোধ করিতেছে না।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষিকেন্দ্রিক বা গ্রামকেন্দ্রিকভাবে রচিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে কৃষিব্যবস্থা ভারগ্রস্ত ও পুরাতন রীতির, নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ কৃষিতে খুবই কম। শিল্পপ্রসার না ঘটিলে এদেশে সার্বজনীন কর্মসংস্থান কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতে আশানুরূপ শিল্পপ্রসার একান্ত কঠিন এইজন্য যে, এদেশে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর ব্যবস্থা নাই এবং আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আনিতে হইলে তজ্জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। ভারত খাদ্যের হিসাবে অসচ্ছল ছিল বলিয়া বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত। এত বেশি বৈদেশিক মুদ্রা খাদ্যশস্যের হিসাবে ব্যয়িত হইলে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য আমদানীর পর অর্থাভাবে যন্ত্রপাতি আমদানি কঠিন হইয়া পড়ে। এইজন্যই সম্ভবতঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে কৃষিকেন্দ্রিক করিয়া ভারতকে খাদ্যের দিক হইতে স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি হইতে ভারতীয় অর্থনীতির শিল্পমুখিতা স্বাভাবিক।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাজকর্মের সম্ভাবনা এমনিই কম ছিল, বেকারসমস্যাসংশ্লিষ্ট আন্দোলনের ফলে যদিও অন্তর্বর্তীকালে ১৭৫ কোটি টাকার কতকগুলি কর্মসংস্থানসূচক ব্যবস্থা পরিকল্পনায় সংযোজিত হয়, তথাপি মোটের উপর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার তীব্রতা কমে নাই।* বিশেষ করিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই পরিকল্পনার আমলে কাজকর্মের সুবিধা না পাইয়া সবিশেষ হতাশ হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় অন্ততঃ ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের আশা করা হইয়াছিল, কার্যকালে নূতন নিয়োগ মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। কর্তৃপক্ষই অনুমান করিয়াছেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে মোট ৪৫ লক্ষের মত লোকের কাজ জুটিয়াছে। ভারতে আগেও প্রচুর বেকার ছিল, তাছাড়া এদেশে বৎসরে নিম্নপক্ষে ২০ লক্ষ করিয়া লোক নূতন কর্মপ্রার্থী হয় ধরিলে মোট বেকারের হিসাবে সরকারী কর্তৃপক্ষ অনুমিত ৪৫ লক্ষ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত হতাশজনক সংখ্যা। ইহার উপর যাহারা কাজ পাইয়াছে, তাহাদের কাজও সব সময়ে স্থায়ী নয় এবং উপার্জনের মাত্রাও সবসময়ে সপরিবারে জীবন-যাপনের নিম্নতম প্রয়োজনের উপযোগী নয়। কাজেই সব মিলাইয়া পরিকল্পনাকালীন কর্মসংস্থান পরিস্থিতি শোচনীয়ই বলা চলে।

প্রথম পরিকল্পনাকালের কর্মসংস্থান সমস্যার ভয়াবহতা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বহুলাংশে হ্রাস পাইবে, এরূপ আশা করা দেশবাসীর পক্ষে খুবই সঙ্গত। প্রকৃতপক্ষে আগেকার বেকারদের সহিত বর্তমানের নূতন কর্মপ্রার্থীদের ধরিলে বেকারসংখ্যা ক্রমেই স্ফীত হইতেছে, ইহাদের সঙ্গে আছে ইহাদের উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গ; সুতরাং ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যার হাহাকারে পরিকল্পনার আংশিক সাফল্য আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক।

দুঃখের বিষয়, এদিক হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও আশাপ্রদ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অবশ্য পরিকল্পনাটি এখনও খসড়া আকারে রহিয়াছে, সংসদে আলোচনান্তে ইহার রূপ কর্মসংস্থান-আত্যন্তিকতার দিকে পরিবর্তিত হইতেও পারে; তবে বর্তমান খসড়াটি পূর্ববর্তী খসড়ার পরিবর্তিত রূপ বলিয়া বেকার সমস্যার হিসাবে আবশ্যকীয় ইহার আমূল সংশোধন আশা করা কঠিন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও মোটামুটি প্রথম পরিকল্পনার মতই মূলধন আত্যন্তিক হইয়াছে। হয়তো ইহাতে একটি শুভ মনোভাব সূচিত হইয়াছে, স্থায়ী জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধির দিকেই ইহার লক্ষ্য, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন-ব্যবস্থা-কেন্দ্রিক এই পরিকল্পনায় দেশের প্রয়োজনের নিরিখে অত্যাবশ্যক কর্মসংস্থানের উপর জোর পড়ে নাই।*

---

* এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলি প্রধানতঃ সহরাঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া বিশেষভাবে সহরাঞ্চলের লোকই এখানে নাম রেজেষ্ট্রি করে। এইসব হিসাবে এদেশে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা নিম্নোক্তভাবে বাড়িয়াছে:— এক্সচেঞ্জের ১৯৫১, মার্চ—৩·৩৭ লক্ষ, ১৯৫৩, ডিসেম্বর—৫·২২ লক্ষ, ১৯৫৫, ডিসেম্বর—৬·৯২ লক্ষ।

* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসাবে পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন:—

"The principal objective of the second five year plan is to secure a more rapid growth of national economy and to increase a country's productive potential in a way that will make

আবাদি কংগ্রেসের নীতি অনুসারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের প্রতিশ্রুতি অবশ্য ইহাতে দেওয়া হইয়াছে এবং বেকারসমস্যা সমাধানের গুরুত্বের কথাও ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে, তবে উপরোল্লিখিত আগামী দিনের উজ্জ্বল আর্থিক ভারত গঠনের দিকেই ইহার লক্ষ্য বেশি। মনে হয় জাতীয় অর্থনীতির রূপ পরিবর্তনের দ্বারা পরিকল্পনা কমিশন আশা করিতেছেন যে, এই পরিবর্তনের ধারা পরবর্তী পরিকল্পনায় সক্রিয় থাকিলে পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গঠন সম্ভবপর হইবে।†

পরিকল্পনা কমিশনের অনুমান অনুসারে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন খাতে এক কোটির মত লোকের কর্মসংস্থান হইবে।* কিন্তু তাঁহাদের হিসাবে এই সময়ে ভারতে কাজের প্রয়োজন হইতে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ লোকের (সহরাঞ্চলে আগের বেকার ২৫ লক্ষ+সহরাঞ্চলে নূতন কর্মপ্রার্থী ‡ ৩৮ লক্ষ+গ্রামাঞ্চলে আগের বেকার ২৮ লক্ষ+গ্রামাঞ্চলে নূতন কর্মপ্রার্থী ৬২ লক্ষ), কাজেই পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ীই অর্ধ কোটির বেশি লোক প্রথম পরিকল্পনার শেষের মত দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও বেকার থাকিবে। এই বেকারের হিসাব পরিকল্পনা কমিশন কম করিয়া ধরিয়াছেন বলিয়াই আমাদের ধারণা এবং, বলা বাহুল্য, এ ধারণা সত্য হইলে প্রকৃত অবস্থা খুবই আতঙ্কজনক। যাহা হউক, পরিকল্পনা কমিশনের প্রায় অনুরূপভাবেই সম্প্রতি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বেকারের সংখ্যা ও কর্মসংস্থানের প্রয়োজনের হিসাব করিয়াছেন বলিয়া কমিশনের হিসাব ধরিয়াই আমরা আলোচনা চালাইতেছি। ডাঃ ভি কে আর ভি রাও বলিয়াছেন যে, আগামী ১৫ বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে ৪ কোটি ১০ লক্ষ লোকের কাজ চাই। অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ সম্প্রতি রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায় আগামী দশ বৎসরের হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সময়ের মধ্যে ভারতকে কাজ দিতে হইবে তিন কোটি লোককে। শ্রী বি এন দাতারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের কাজ চাই এবং এজন্য তিনি ১৯৫৬-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১ কোটি, ১৯৬১-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২ কোটি এবং ১৯৬৬-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের কাজের ব্যবস্থা করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। মোটের উপর উপরোক্ত হিসাবগুলিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে কর্মসংস্থান আশাপ্রদ হইবে না ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং প্রথম পরিকল্পনার মত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে প্রস্তুতিমূলক ধরিয়া সমস্যা সমাধানের অধিকতর আশা করা হইয়াছে তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর।

আগেই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এদেশে মূলধন বিনিয়োগের ধারার এবং অর্থনীতিকে কৃষি হইতে শিল্পে সরাইয়া লইয়া যাইবার প্রয়াসের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং তদনুসারেই হিসাবাদি নির্ধারিত হইয়াছে। এই পরিবর্তন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরবর্তীকালেও কার্যকরী থাকিবে। ভারগ্রস্ত কৃষিতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা কম, শিল্পবাণিজ্যের উপরই দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল, উপরোক্ত পরিবর্তনের পিছনে ইহাই প্রধান যুক্তি। এইভাবে দেখা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে কৃষিতে (সমাজ উন্নয়ন, সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণসহ) মোট মূলধনের শতকরা ৩৩ ভাগ বিনিযুক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তখন এইখাতে ধরা হইয়াছে শতকরা ২১ ভাগ; পক্ষান্তরে শিল্প ও বৈদ্যুতিক শক্তির খাতে প্রথম পরিকল্পনায় যেখানে শতকরা ১৮ ভাগ (৭+১১) বরাদ্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেখানে ধরা হইয়াছে শতকরা ২৮ ভাগ (১৯+৯)। এ ছাড়া রেলপথ খাতে প্রথম পরিকল্পনায় শতকরা ১২ ভাগের স্থলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শতকরা যে ১৯ ভাগ ধরা হইয়াছে, ইহাও প্রধানতঃ শিল্পের কাজে লাগিবে। জাতীয় আয়ের হিসাবেও দেখা যায়, প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পরিকল্পনার পূর্ববর্তী বৎসর বা ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে কৃষিতে শতকরা ১৮ ভাগ, খনিতে শতকরা ১৯ ভাগ, বৃহৎশিল্পে শতকরা ৪৩ ভাগ ও ক্ষুদ্রশিল্পে শতকরা ১৪ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর বা ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসর বা ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আয় কৃষিতে শতকরা ১৮ ভাগ, খনিতে শতকরা ৫৮ ভাগ, বৃহৎশিল্পে শতকরা

---

possible accelerated development in the succeeding plan periods. Immediate needs have to be met, but it is essential to think in terms of the more long range dividends that a big and bold programme of development has to offer.···The second five year plan has to increase the flow of goods and services available and also to carry forward the process of institutional change.

† দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় নিম্নলিখিত লক্ষ্যসমূহের কথা বলা হইয়াছে:—(১) জাতীয় আয়বৃদ্ধি, (২) জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি; (৩) দ্রুত শিল্পপ্রসার (মূল ও ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ), (৪) অধিকতর কর্মসংস্থান; (৫) আয় ও সম্পদের অসমতা হ্রাস এবং অর্থ-নৈতিক শক্তির অপেক্ষাকৃত সমবণ্টন।

‡ গৃহনির্মাণ ইত্যাদি—২১ লক্ষ (কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন—২'৬৬ লক্ষ, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি—৩'৭২ লক্ষ, শিল্প ও খনি—৪'০৩ লক্ষ, রেলপথসহ পরিবহন—১'২৭ লক্ষ, সমাজসেবা—৬'৯৮ লক্ষ, সরকারী চাকুরীসহ বিবিধ—২'৩৪ লক্ষ); সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি—'৫১ লক্ষ; রেলপথ—২'৫৩ লক্ষ; অন্যান্য পরিবহন—১'৮০ লক্ষ; শিল্প ও খনিজ—৮'০০ লক্ষ; কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প—৪'৫০ লক্ষ; বন, মৎসবিভাগ ও জাতীয় সম্প্রসারণ—৪'১৩ লক্ষ; শিক্ষা—২'৬০ লক্ষ; স্বাস্থ্য—১'১৬ লক্ষ; অপরাপর সমাজসেবা—১'৪২ লক্ষ; সরকারী চাকুরী—৪'৩৪ লক্ষ; ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি—২৭'০৪ লক্ষ; কৃষি—১৬ লক্ষ=মোট ৯৫'০৩ লক্ষ।

৬৪ ভাগ ও ক্ষুদ্রশিল্পে শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। কাজেই একথা ঠিক যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থনীতিকে কিছুটা কৃষি হইতে শিল্পের দিকে লইয়া যাইবার প্রয়াস রহিয়াছে।* ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় এই অর্থনীতিক পটভূমিকা পরিবর্তনের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। ডাঃ ভি কে আর ভি রাও এই অপরিহার্য পরিবর্তনের সপক্ষে ১৫ বৎসর পরে মোট জনসংখ্যার হিসাবে বিভিন্ন বিভাগের কর্মসংস্থানের নিম্নরূপ হার পরিবর্তন অনুমান করিয়াছেন :—

	বর্তমানের সংখ্যা	১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত সংখ্যা
কৃষিশ্রমিক	৭১·৯%	৫৮%
শিল্পশ্রমিক	৯·৭%	১৬·১%
বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদি	৬·৬%	৯·৮%

ভারতের বেকার সমস্যাকে নিম্নরূপ তিনভাগে ভাগ করা যায় :—(১) গ্রাম্যবেকার (বর্তমানে এই বেকারত্ব প্রধানতঃ কৃষিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের); (২) সহরাঞ্চলের বেকার (এই বেকারত্ব প্রধানতঃ দেশের শিল্প-বাণিজ্যিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল), এবং (৩) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার।

আগেই বলা হইয়াছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য-অর্থনীতির উপর জোর পড়িয়াছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিনিয়োগের রূপ কিছুটা পরিবর্তিত হইলেও কর্মসংস্থান শেষ পর্য্যন্ত গ্রামেই বেশি হইবে বলিয়া মনে হয়। মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দিয়া যে শিল্পসম্প্রসারণের আয়োজন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হইয়াছে, তাহাতে শিল্পপ্রসারের সহিত সমানানুপাতিক ভাবে কর্মসংস্থান অবশ্যই হইবে না। সাধারণতঃ আমরা আশা করি যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের ফলে অর্থ-নৈতিক কাঠামোর উপর যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাহাতে আনুপাতিকভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ বা তাহার কাছাকাছি কর্মসুযোগ জন্মে। আলোচ্য পরিকল্পনায় কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে সেরূপ সম্ভাবনা নাই, কারণ এই পরিকল্পনার ভোগ্যপণ্য বা ক্ষুদ্রশিল্পের দিকে আপেক্ষিক ঝোঁক নাই। সেইরূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকারদের জন্যও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনার মতই হতাশাজনক, কারণ ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রসারণের উপরই তাহাদের নিয়োগ প্রধানতঃ নির্ভর করে। একথা সকলেই জানেন যে শিক্ষিত বেকারদের ক্ষেত্রে এইরূপ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন প্রসারের সম্ভাবনা যথেষ্ট। এইজন্যই বোধহয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকারদের যাহাতে অন্ততঃ কিছুটা সুরাহা হয়, তজ্জন্য পরিকল্পনা কমিশন নিয়োজিত এক পর্যবেক্ষণ সংস্থা (study Group) অবস্থা পর্যালোচনা করিয়াছেন। ইহারা পরিস্থিতির গুরুত্ব স্বীকার করিয়া ১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে পণ্য পরিবহন ইত্যাদি সম্পর্কিত সমবায় মূলক প্রতিষ্ঠানাদি গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন এবং আশা-প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহাতে এই শ্রেণীর অতিরিক্ত ২ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের কাজ জুটিতে পারে। তবে এই সংস্থান মতে ১৯৫৬—৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে স্কুল-ফাইনাল পাশ যে ২০ লক্ষ কর্মপ্রার্থী দেখা যাইবে, তন্মধ্যে বড় জোর ১৪ লক্ষ ৫০ হাজারের কাজ জুটিতে পারে।

এবার গ্রাম্য-বেকারদের কথায় আসা যাক। ভারতবর্ষ গ্রামে গাঁথা দেশ এবং ভারতের ⅘ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। তাছাড়া সহরাঞ্চলে শিল্পাদিতে যাহারা কর্মপ্রার্থী, গ্রামের বেকারদের সহিত তাহাদের পারিবারিক সচ্ছলতাগত সম্পর্ক অনেকক্ষেত্রেই বিদ্যমান। গ্রাম্য-বেকারীর সমাধান কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও কুটির-শিল্প সম্প্রসারণের উপর নির্ভর করে। কৃষিকেন্দ্রিক প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর কৃষির অবস্থা স্বাভাবিকভাবে কিছুটা উন্নত হইয়া থাকিলে এবং বিবিধ নদনদী পরিকল্পনার ফলে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকশক্তি সহজপ্রাপ্য ও সুলভ হইলে গ্রামে কুটির-শিল্পের সম্প্রসারণ কঠিন নয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। গান্ধীজীর অর্থনীতির সহিত পরিচিতেরা জানেন যে, ভারতের বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য এবং গ্রামাঞ্চলে সার্বজনীন কর্ম-সংস্থানের জন্য গান্ধীজী কুটির-শিল্পের ব্যাপক প্রসার চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পে যে কর্মসংস্থান আশা করা হইয়াছে, কার্ভে কমিটি এবং পল্লী-শিল্প উন্নয়ম বোর্ড তদপেক্ষা অনেক বেশি কর্মসংস্থান আশা করিয়াছেন। পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণসহ গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে আশা করা হইয়াছে ৩০ লক্ষ লোকের কাজ, কার্ভে কমিটি বলিয়াছেন, ক্ষুদ্র ও গ্রাম্য-শিল্পের জন্য তাঁহাদের প্রস্তাবমত ২৫৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা (কেন্দ্রীয়খাতে ২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং রাজ্যসমূহেরখাতে ২৩৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা) ব্যয় করা হইলে ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইতে পারে। নিখিল ভারত পল্লী-শিল্প বোর্ড আবার শুধুমাত্র হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া এই শিল্পে ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের আশা করিয়াছেন। *

---

* বেসরকারী সূত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ২৩০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে তাহার খাতগুলি নিম্নরূপ :—সজ্ঘবদ্ধ শিল্প ও খনিজ—৫০০ কোটি টাকা; আবাদ, বেসরকারী পরিবহণ ও বৈদ্যুতিক-শক্তি-উৎপাদন প্রয়াস—১০০ কোটি টাকা; কৃষি ও গ্রাম্যশিল্প—৩০০ কোটি টাকা; গৃহনির্মাণ—১০০০ কোটি টাকা; উৎপাদনবৃদ্ধি, আর্থিক কর্মপ্রসার মজুতবৃদ্ধি ইত্যাদি—৪০০ কোটি টাকা। এই হিসাব হইতেও বুঝা যায় যে, পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে বেসরকারী হিসাবেও কৃষির তুলনায় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর জোর দিতেছেন এবং এইভাবে কৃষির তুলনায় শিল্পের উপর জোর দিয়া উপস্থিত জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো পরিবর্তন এবং পরিণামে কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধানের আশা পোষণ করিতেছেন

* এ সম্পর্কে আমি গত ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষে' দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মসংস্থান ও গ্রাম্য-শিল্প প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং এইখাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথে সম্ভাব্য সুবিধা অসুবিধা-সমূহও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থবরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি, তদুপরি পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন যে, জাতীয় আয়ের হিসাবে প্রথম পরিকল্পনাকালীন শতকরা ৭ শতাংশ লগ্নীর হিসাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শতকরা ১২ শতাংশ লগ্নী হইবে।* কাজেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যদি ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইয়া থাকে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হওয়া সেক্ষেত্রে আশ্চর্য নয়। তবে, আগেই বলা হইয়াছে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থবিনিয়োগ প্রধানতঃ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসুযোগ নাও সৃষ্টি করিতে পারে। তাছাড়া এদেশে প্রয়োজন নিম্নতমপক্ষে দেড় কোটি লোকের কাজের এবং সরকারী হিসাবেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে ৫০ লক্ষ বেকার লইয়া (আমাদের ধারণা এ সংখ্যা আরও অনেক বেশি)। সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তেও বিপুল সংখ্যক বেকারের সমস্যা দেশের অর্থনীতিকে ভারগ্রস্ত রাখিবে। বলা বাহুল্য, ভারতের আর্থিক উন্নয়নের বিরাট প্রচারকার্যের বিপরীতে এই সঙ্কটের কথা ভাবিতেও ভয় হয়। ইহার উপর যদি পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে টান পড়ে, অবস্থা সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আরও শোচনীয় হইবে। বড় বড় পরিকল্পনায় হাত দিয়া মাঝপথে কাজ বন্ধ রাখা যায় না, কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা এসব বড় পরিকল্পনায় যে কম, সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। কাজেই টাকা কম পড়িলে ছোটখাট কর্মসংস্থানমূলক পরিকল্পনারই আঘাত পাইবার কথা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজস্ব উদ্বৃত্তের হিসাবে ৮০০ কোটি টাকা (বর্তমান করহারে ৩৫০ কোটি, বর্ধিত করহারে ৪৫০ কোটি), সরকারী ঋণ ১২০০ কোটি টাকা, বিভিন্ন তহবিল বাবদ—২৫০ কোটি টাকা, রেলপথ হইতে ১৭০ কোটি টাকা, বৈদেশিক সূত্রে ৮০০ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয় ১২০০ কোটি টাকা এবং সূত্র স্থির হয় নাই এমন ভাবে ৪০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে শেষ দুইখাতে ১৬০০ কোটি টাকার অর্থসংগ্রহের আস্থাজনক সূত্র নির্ধারিত হয় নাই এবং অন্যান্য খাতেও এমন বিরাট পরিমাণ অর্থসংগ্রহের আশা করা হইয়াছে, যাহা কার্যক্ষেত্রে এই দরিদ্র দেশে সংগৃহীত হওয়া বাস্তবিকই কঠিন।

বে-সরকারী সূত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২৩০০ কোটি টাকা খরচের কথা বলা হইয়াছে এবং এই বে-সরকারী সূত্র হইতেও মোটামুটি আনুপাতিক কর্মসংস্থানের আশা করা হইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, রাজস্ব হিসাবে যখন বর্তমান করভারের উপর নূতন কর বসাইয়া ৪৫০ কোটি টাকা সংগ্রহের আশা করা হইয়াছে এবং ১২০০ কোটি টাকা ঋণ-সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে, তখন দেশবাসীর হাতের নগদ টাকা একরূপ টানিয়া লইবারই ব্যবস্থা হইয়াছে বলা চলে। বর্তমান আর্থিক দুর্দিনে সরকারকে এত টাকা যোগাইয়া বে-সরকারী সূত্রে দেশবাসী যে সত্যই পাঁচ বৎসরে ২৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। আবার টাকার অভাবে বে-সরকারী সূত্রে বিনিয়োগ কম হইলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও তদনুসারে হ্রাস পাইবার আশঙ্কা আছে।

ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানে র‍্যাশানালাইজেশনের নীতি চালু হইতেছে, ইহাতে শিল্পের উৎপাদনের সমানানুপাতিক ভাবে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না। কাজেই শিল্পনীতি যদি সংস্কৃত হয়, শিল্পের প্রসার ঘটিলেও তদনুযায়ী শিল্পে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান নাও ঘটিতে পারে।* এ অবস্থা চলিলে ভারতে বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ক্রমেই যে জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বেকার সমস্যা এমন বাস্তব সমস্যা এবং মানুষের শ্রমশক্তি অব্যবহৃত বা অপচিত হইলে তাহার প্রতিক্রিয়ায় সমাজের এমন ক্ষতি হয় যে, বেকার সমস্যার স্থায়ীরূপ জাতীয় স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক। আগেকার দিনের মত রাষ্ট্র আর এখন জনস্বার্থ-নিরপেক্ষভাবে চলিতে পারে না, কল্যাণব্রতী আধুনিক রাষ্ট্রের নিম্নতম কর্তব্য হইল কর্মোৎসাহ—নিয়োগে উৎসুক উপযুক্ত নাগরিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিকে উপযুক্ত কাজ দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, ভারত বর্তমানে শ্রমশিল্পের বিপ্লবের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। একথার আবেদন নিষ্ফল হইবে যদি বেকারদের আর্তনাদ ভারতের আকাশ বাতাস মথিত করিতে থাকে। বেকারত্বের তুচ্ছ ক্ষতি হইল কাজ না থাকা, দীর্ঘদিন বেকার থাকিলে মানুষ যে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, হতাশায় নিজেকে অপদার্থ বলিয়া মনে করে, ইহাই হইল বেকারত্বের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। আবাদী কংগ্রেসের সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর প্রস্তাব অথবা

---

* বৎসর	বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)	জাতীয় আয় (কোটি টাকায়)
১৯৫৬-৫৭	১০৫০	১১,৩০০
১৯৫৭-৫৮	১১১০	১১,৬৫০
১৯৫৮-৫৯	১১৮৫	১২,০২০
১৯৫৯-৬০	১২৭৫	১২,৪১০
১৯৬০-৬১	১৩৮০	১২,৮৫০

* বাস্তবিক যন্ত্র-শিল্পে সাম্প্রতিককালে উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বাড়িয়াছে, কিন্তু শিল্প সংস্কারের ফলে কর্মসংস্থান যে তদনুযায়ী বাড়ে নাই, নিম্নের হিসাব হইতেই তাহা বুঝা যাইবে :—

বৎসর	শিল্পোৎপাদনের সূচক সংখ্যা (১৯৪৬=১০০)	শিল্প-শ্রমিক সংখ্যা
১৯৫০	১০৫.০	২৫,০৪,৩৯৯
১৯৫১	১১৭.২	২৫,৩৬,৫৪৪
১৯৫২	১২৮.৯	২৫,৬৭,৪৫৩
১৯৫৩	১৩৫.২	২৫,২৮,০২৬

পরিকল্পনা কমিশনের দেশবাসীর সর্বনিম্ন আয়ের ৩০ গুণের মধ্যে সর্বোচ্চ আয়কে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রস্তাবের কার্যকারিতা নিঃসন্দেহে সার্বজনীন কর্মসংস্থানের উপর নির্ভর করে।

সম্প্রতি নেতাজী ভবনে শরৎ বসু একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় আমি যখন 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান' সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম, সভায় এই একটি প্রশ্নই সবচেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছিল যে, জাতীয় উন্নয়ন ও বেকার সমস্যার সমাধান বাস্তবিকই একসঙ্গে সম্ভব কি না। সেইদিন হইতে বারবার আমার মনে হইয়াছে, বেকার সমস্যার সমাধান ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখিয়া ভারতে বর্তমানে আর্থিক পুনর্গঠনের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা সমগ্রভাবে বেদনাদায়ক, এই পরিকল্পনায় এমন রূপায়নও নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল, যাহাতে উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তভাবে ভারতের ভয়াবহ বেকার সমস্যারও একটা সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে। পরিকল্পনা সুরু হইবার দীর্ঘ দশ বৎসর পরেও বেকারের একটা বড় সংখ্যা (Backlog) উপেক্ষিত থাকিয়া যাইবে, ভারতের ন্যায় পশ্চাৎপদ দেশে মানুষের শ্রমশক্তির এ অপচয় কি সত্যই বন্ধ করা যাইত না? রাশিয়া, চীন বা পশ্চিম জার্মানীতে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বেকার সমস্যার সমাধান একই সঙ্গে হইতে পারে, ভারতের ক্ষেত্রেই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? এখনও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খসড়া আকারে রহিয়াছে, শীঘ্রই সংসদে ইহার আলোচনা হইবে, তাহার পর ইহা চূড়ান্ত রূপ পাইবে। এ অবস্থায় চিন্তাশীল অর্থনীতিবিদগণ যদি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগী হন, সম্ভাবনাময় পরিকল্পনা-সংশ্লিষ্ট আলোচ্য অস্বস্তিকর দুর্ভাবনা হইতে মুক্তি হয়তো মিলিলেও মিলিতে পারে।

গয়া—বুদ্ধ-গয়া

শ্রীহৃষিকেশ দেব

তীর্থ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরুই নি, পুণ্য অর্জনের স্পৃহাও মনে বিন্দুমাত্র ছিল না। তবুও রাজগীর ত্যাগের পূর্বে বন্ধুবর অধ্যাপক দাশগুপ্ত যখন বল্লেন, "চলুন, গয়াটাও ঘুরে যাওয়া যাক, তখন সানন্দেই সম্মতি দিলুম। অন্য দু'জন সঙ্গীবন্ধু এবং বন্ধুপত্নী শ্রীমতী দেবেরও আপত্তি হলো না এ প্রস্তাবে।

ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতিমণ্ডিত স্থানগুলি আমাকে চিরদিনই আকর্ষণ করেছে তাদের মোহময় অতীত নিয়ে। গয়া শুধু হিন্দুর তীর্থ নয়, এর কাছে আছে বুদ্ধগয়া—আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এক বৈশাখী পূর্ণিমাতে যেখানে তথাগত গৌতম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁর সাধনায়, পেয়েছিলেন মানবজাতির জন্যে দুঃখজয়ী মন্ত্র—বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দির আজিও সাক্ষী হয়ে আছে সেই যুগসন্ধিক্ষণের পুণ্য স্মৃতির। বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থগুলির মধ্যে তাই সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে বুদ্ধগয়া। এ ছাড়া বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী, প্রথম ধর্মপ্রচার কেন্দ্র সারনাথ আর নির্বাণভূমি কুশীনগর উল্লেখযোগ্য।

ভারতের প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে অন্যতম গয়ার তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে বায়ুপুরাণে। গয়াসুর ছিলেন পরমভক্ত বৈষ্ণব,—বিষ্ণুর বরে তাঁর দেহ এত পবিত্র হয়েছিল যে তাঁকে স্পর্শমাত্রই সকলে স্বর্গে প্রবেশের অধিকারী হতো। সুতরাং কিছুদিন পরই যমরাজের দপ্তর বন্ধ হবার যোগাড়,—ওদিকে স্বর্গেও অত্যধিক জনসমাগমে হলো স্থানাভাব। দেবতারা তখন ব্রহ্মাকে মুখপাত্র করে গয়াসুরের নিকটে এসে বল্লেন—"ভগবানের বরে তোমার দেহ আজ ত্রিভুবনের মধ্যে পবিত্রতম স্থান; যজ্ঞ-সম্পাদনের জন্যে সেই দেহ আমরা প্রার্থনা করি।" গয়াসুর সাগ্রহে তাঁদের প্রস্তাবে রাজী হলেন। ব্রহ্মার দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে মুনি-ঋষি-দেবতারা উত্তর-শিয়রী গয়াসুরের দেহের উপর বিধিমত যজ্ঞ সম্পাদন করলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, এবার গয়াসুরের মৃত্যু হবে, কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখেন তাঁর দেহ তখনো স্পন্দিত হচ্ছে। আশে পাশে যত পাথর ছিল, সব চাপিয়েও যখন তা' বন্ধ করা সম্ভব হলো না, তখন ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং গয়াসুরের শিরে দক্ষিণপদ স্থাপনা করে অবশেষে তাঁর দেহকে নিশ্চল করে দিলেন। মুমূর্ষু গয়াসুর তখন প্রার্থনা জানালেন, "প্রভু, শেষবেলা আমাকে এই বর দিন যেন আপনার পদাঙ্কিত এই স্থানে পিণ্ডদান করলে উদ্দিষ্ট আত্মা সকল পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে।" ভগবান বল্লেন, "হে আমার পরমভক্ত তথাস্তু—এবং আজ থেকে এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রও তোমার নামেই প্রসিদ্ধ হবে।"

ফল্গু নদীর তীরে বিষ্ণুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান গয়া শহর। পাণ্ডারা বলে "গয়াজী।" পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীরা বলেন "গয়াধাম", কেউ বা বলেন "ব্রহ্মগয়া।" ভারতের বুকে বহু ঝঞ্ঝা আর সজ্ঘাত প্রত্যক্ষ করেছে এই প্রাচীন শহর। আজ হয়তো তীর্থ আর তার আনুষঙ্গিক প্রথার মূল্য অনেকখানিই কমে এসেছে, কিন্তু একথা তো অস্বীকার করতে পারি না যে একদিন এই সব তীর্থ আর প্রথা আমাদের বহু-বিস্তৃত দেশের বিভিন্ন অংশের লোকদের একসাথে মেশবার সুযোগ করে দিয়েছিল! নদী পাহাড় আর মরুভূমি অতিক্রম করে যারা এসেছে, তাদের ভাষা আলাদা, আচার আলাদা, পোষাকও হয়তো এক নয়, কিন্তু একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছে

হৃদ্যতার, অনুকূল পরিবেশ সুযোগ দিয়েছে পরস্পরকে জানবার। এখানেই তো বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের অন্তর্নিহিত ঐক্যের সাধনা।...

আওরংজেব উন্মত্ত আক্রোশে যখন সারা ভারতে মন্দির আর প্রতিমা ধ্বংশ করছিল. গয়াও রক্ষা পায়নি সেদিন তার রোষবহ্নি থেকে। মাত্র কয়েকঘণ্টার বর্বরতা মানুষের কত অপরূপ সৃষ্টি আর অতুলনীয় শিল্প চিরতরে লুপ্ত করে দিয়েছে।...তারপর "ধীরে ধীরে স্তব্ধ হলো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে দিল্লী রাজশালা", ভারতের ইতিহাসও অনেক মোড় ঘুরলো, অবশেষে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাই আরো বহু বিচূর্ণিত দেবমন্দিরের সাথে গয়ার বিষ্ণু মন্দিরও পুনর্নির্মিত করেন। সারা ভারত থেকে নিষ্ঠাবান হিন্দুরা এখানে এসে পূর্ব-পুরুষের মুক্তি-কামনায় বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করে বলেন ঃ

"ওঁ আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়॥
অতীতকুল-কোটিনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবন-ত্রয়ম্॥"

সুদূর বাংলাদেশ থেকে এভাবেই একদা এখানে এসেছিলেন নিমাই পণ্ডিত স্বর্গত পিতার পিণ্ডদান উদ্দেশে। কিন্তু বিষ্ণুপদচিহ্নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর হৃদয়ে নেমে এলো এক অপরূপ ভাব-বন্যা, অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত হলো। দুর্দান্ত বিদ্বান, মূর্খ পণ্ডিতদের মূর্তিমান ভয় স্বরূপ সেই নিমাই পণ্ডিত গৃহে ফিরে এলেন কৃষ্ণপ্রেমের ব্যথা বুকে নিয়ে। সে প্রেমের বন্যায় ভেসে গেলো বাংলা দেশের সকল কলুষ, সকল ভয়।

* * *

দাশগুপ্তের বিধি অনুসারে ভ্রমণ ব্যবস্থা স্থির হলো—প্রথমে পাটনার বাসে রাজগীর থেকে বিহার-শরীফ, সেখান থেকে আবার বাসে নেভাদা, নেভাদা থেকে ধরতে হবে গয়ার বাস। সবই "বিহার রাজ্য ট্রান্সপোর্টে"র পরিচালিত। পশ্চিমবঙ্গ "ট্রান্সপোর্ট" পরিবহনে রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু বিহারে কেন এই বিজাতীয় কথাটিকে এখনো হিন্দী অক্ষরে লেখা হয়, বোধগম্য হলো না।

* * *

ফল্গুনদীর পুল পেরিয়ে আমাদের বাস যখন গয়া শহরে প্রবেশ করলো, রাত তখন প্রায় সাড়ে সাতটা—আটটা। দাশগুপ্ত বল্লেন, "এখানে থাকবার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।" আমরা ইতিপূর্বে গয়া না এলেও সেবাশ্রমের প্রশংসা শুনেছি যথেষ্ট। নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের উপরও তাদের প্রভাব যথেষ্ট।

সেবাশ্রমের আপিসের ভারপ্রাপ্ত স্বামীজির সঙ্গে আলাপ করে রাত্রিবাসের জন্যে একটি ঘরের ব্যবস্থা করা হলো। আমাদের একটি মহিলা সঙ্গিনী থাকায় একাজটি অপেক্ষাকৃত সহজেই সম্পন্ন হয়েছিল। স্বামীজি সদালাপী, মিষ্টভাষী। কথা প্রসঙ্গে বল্লেন, "গয়াতে যাঁরা শ্রাদ্ধাদি কাজ করবার জন্য আসেন, তাঁদের পুরোহিত জোগাড় থেকে সর্বপ্রকার সহায়তার জন্যেই আমরা প্রস্তুত, যদিও স্থানাভাবে বহু যাত্রীর যথোপযুক্ত স্বাচ্ছন্দ্য দান আমাদের পক্ষে সর্বদা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ পিতৃপক্ষের সময় এত অসম্ভব ভীড় হয় যে উঠোনে তাঁবু খাটিয়ে বাসের ব্যবস্থা করতে হয়। কারুকেই তো' আর আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি না।"

বল্লুম, "আপনারা যা করছেন, তার তুলনা নেই। ইতিপূর্বে তো পাণ্ডা ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না। আর,-গয়ার পাণ্ডার বিভীষিকা তো সকলেই জানে।"

স্বামীজি হাসলেন, বল্লেন, "লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত—কি বলেন? তবু, পাণ্ডাপ্রথায় দোষত্রুটি সত্বেও একদিন যে এরা যথেষ্ট কাজ করেছে, সে কথা মানতেই হবে। যখন যাত্রীদের জন্যে আজকের মতো সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি, সে সময় নতুন অজানা জায়গায় অশিক্ষিত গ্রাম্য যাত্রীদের এরা পুরুষানুক্রমিক ভাবে পরিচর্যার ভার নিয়েছে, আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা রেখেছে, শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়াদিও সম্পন্ন করিয়েছে। বিনিময়ে যা পারে, তা' তো একজন যাত্রীর জীবনে শুধু একবারই, কারণ খুব কম লোকই একটি তীর্থে একাধিকবার গিয়ে থাকেন। তবে কি জানেন, জন কয়েকের সীমাহীন লোভ আর প্রতারণার জন্যে এদের সমাজই আজ লুপ্ত হতে বসেছে, বিরাট বিরাট বাড়ীগুলোও তাই যাত্রীর অভাবে শূন্য পড়ে আছে।"

স্বামীজির কথার সত্যতা অস্বীকার করতে পারি না। পুরুষানুক্রমিক পরিচয়ের ফলে বহুক্ষেত্রে আত্মীয়তার পরিবেশও গড়ে উঠেছে। বাঙালী তীর্থ-যাত্রীর প্রাধান্যের জন্যে পাণ্ডারা বাংলা বেশ ভালই জানেন। তাদের ঘরে যজমানদের স্বাক্ষর সম্বলিত পুরাতন খাতাপত্র বিশেষ যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা হয়। আমাদের পাণ্ডার বাড়ীতে এমনি একখানা পুরানো খাতায় পরে দেখেছি, আমার বাবার স্বাক্ষর ১৯১২ ইংরাজীর তারিখে। তিনি সেদিন এসেছিলেন তাঁর মায়ের শেষ কাজ সম্পন্ন করতে। তখন আমার জন্মই হয় নি। এতদিন পর তাঁর শেষ কাজ সম্পন্ন করতে এসে সেই খাতায় রেখে এলুম আমার স্বাক্ষর। ভবিষ্যতের পাতা খোলা রইল আমার অনাগত বংশধরের জন্যে।...

* * *

পরদিন ভোরবেলা কলতলায় অন্যান্য যাত্রীদের ভীড় দেখা দেবার পূর্বেই স্নান সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম বুদ্ধগয়ার উদ্দেশে। যান স্থির হলো এক্কা-ঘোড়ার গাড়ী। বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে এক্কার বহুল প্রচলন। বিবর্তনের গতিতে পৌরাণিক পুষ্পক-রথই এক্কাতে পরিণত হয়েছে কিনা, গবেষকরা বলতে পারবেন হয়তো, তবে আজ ঘোড়াদের পিঠে পাখার বদলে হাড় গুলোই উঁচু হয়ে আছে এবং অসতর্ক মুহূর্তে আরোহী 'পপাত ধরণীতল' হওয়াও আশ্চর্য নয়!

আমাদের এক্কার চালক একটি বাচ্চা ছোক্‌রা—সে বেশ মনের ফুর্তিতেই গাড়ী চালাচ্ছে। কখনো বা একটা গ্রাম্য গানের দু'এক কলি গলা ছেড়ে গেয়ে উঠছে, কখনো বা "চল বেটা পংখীরাজ—জোরসে চল" ঘোড়াকে উৎসাহ দিচ্ছে। তবে পংখীরাজের রূপ দেখে মনে হয়, তার পেটে দানাপানির মধ্যে পানি যথেষ্ট হলেও দানা বিশেষ পড়ে না, তাই চলনও মাঝে মাঝে হয়ে পড়ছিল বিশেষ মন্থর।

গয়া শহরের যে অংশে সরকারী আপিস-আদালত এবং অমাত্যদের বাসস্থান, সেদিকের রাজপথগুলি প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন, ধুলো ময়লা অপেক্ষাকৃত অল্প। আর পুরাতন অংশে—যেদিকে বিষ্ণু মন্দির—সেখানে পথ হয়ে এসেছে সঙ্কীর্ণ, দু'ধারে বিকলাঙ্গ আর বীভৎস রোগগ্রস্ত ভিখারীদের ভীড়—ভারতীয় তীর্থস্থানগুলির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গায়ে গায়ে বাড়ী—তাদের বহুদিন সংস্কার হয় নি।

যাইহোক, শীঘ্রই এসব পেছনে ফেলে এক্কা সকালের মিঠে রোদে বুদ্ধগয়ার পথে ছুটে চল্ল ঝাঁকুনী দিয়ে। পিচ বাঁধানো প্রশস্ত রাজপথ··· রুক্ষ হাওয়ায় মাঝে মাঝে ধুলো উড়ছে···দু'ধারে পত্রবহুল গাছগুলি শ্রান্ত পথিকের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে।··· চাষীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তার পাশে খেলা করছে···যাত্রী দেখলেই এক পৈসা মালিকবাবু, এক পৈসা বলে বহুদূর গাড়ীর পেছনে ধাওয়া করে।

দূর থেকে দেখা যায় দীর্ঘ-প্রসারিত, শ্রীহীন ফল্গুনদী চলেছে আমাদের পথের পাশাপাশি— মরুভূমির মতো ধূ ধূ করছে বালু তার বিস্তৃত বক্ষ জুড়ে···মাঝে মাঝে হয়তো সামান্য একটু জল কোথাও সকালের রোদে ঝিক্ মিক্ করে উঠছে। মনে পড়লো ছোটবেলায় শোনা কাহিনী—সীতার অভিশাপ। তবে আমাকে আর সে কাহিনী বিবৃত করতে হলো না, এক্কাওলা ছোকরাই পরমোৎসাহে সুরু করলো তার গল্প।

পিতৃসত্য পালনের জন্যে অযোধ্যা ত্যাগ করে এখানে স্বেচ্ছাকৃত বনবাসে এসেছেন রামচন্দ্র, সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ আর সহধর্মিণী সীতাদেবী। পুত্রশোকে রাজা দশরথের প্রাণত্যাগের সংবাদ পেয়ে রাম চল্লেন লক্ষ্মণকে নিয়ে শ্রাদ্ধের আনুষঙ্গিক সংগ্রহে। তাঁদের প্রত্যাবর্তনে হলো বিলম্ব। দশরথের ক্ষুধার্ত আত্মা তখন সীতার নিকট উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করলেন পিণ্ড। অনন্যোপায় সীতা ফল্গুতীরে বালু দিয়ে পিণ্ড প্রস্তুত করে তাই নিবেদন করলেন। রাম ফিরে এসে কিন্তু বিশ্বাস করলেন না এ কাহিনী। সীতার সাক্ষী ছিল তিনজন—ফল্গুনদী, তুলসী গাছ, আর এক বৃদ্ধ বট। ফল্গু আর তুলসী সীতার কথা অস্বীকার করলো। মিথ্যাবাদী তার শাস্তি নেমে এলো ফল্গুর উপরে নদী দেহের বিকৃতির রূপ নিয়ে—তার বিস্তৃত জলরাশি আবৃত হলো বালুতে; সেদিন থেকে তাই ফল্গু অন্তঃসলিলা। শাস্তিস্বরূপ তুলসীও জন্মায় ঝোপে-জঙ্গলে—কুকুর এসে মূত্রত্যাগ করে তার শিরে। সত্য কথা বলেছিল শুধু বৃদ্ধবট, তাই সীতার আশীর্বাদে ত্রেতাযুগ থেকে অক্ষয় হয়ে সে গয়াতে পুজো পেয়ে আসছে। কিন্তু মন্দিরের পাশেই এই অক্ষয় বটকে শেষ পিণ্ডদান না করলে পুণ্যকামীদের উদ্দেশ্য নাকি অসফল থেকে যায়।

গল্প শুনে শ্রীমতী দেব মন্তব্য করলেন—"কিন্তু যে রাম সীতার সত্যবাদিতায় অবিশ্বাস করেছিলেন, তার জন্যে রামায়ণকার আদি কবি কোন শাস্তিরই বিধান দিলেন না—এই হচ্ছে সবচেয়ে আশ্চর্য।"

দাশগুপ্ত বল্লেন, "সীতার চরিত্রের প্রতি রামের যে বিশেষ আস্থা ছিল না, তার তো একাধিক প্রমাণই আছে রামায়ণে।"

সঙ্গিনী বল্লেন, "হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টাতেও পেছ্ পা হন্ নি। সে চেষ্টার তো এখনো বিরাম নেই।"

তর্ক জমে উঠবার পূর্বেই কিন্তু পথ শেষ হয়ে এলো···এক সময় ফল্গুনদী দূরে সরে গিয়ে সম্মুখে গাছগুলোর মাথার উপর আকাশের পটভূমিকায় ভেসে উঠলো মহাবোধি মন্দিরের উন্নতশীর্ষ।···

কপিলাবস্তুর রাজসম্পদের সাথে যুবতী-পত্নী যশোধারা আর নবজাত পুত্র রাহুলকে ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ কত দেশ ভ্রমণ করলেন জরা-ব্যাধি-মরণ থেকে মুক্তির পথ-সন্ধানে, কিন্তু কোথাও শান্তি না পেয়ে অবশেষে নিরঞ্জনা (বর্তমান ফল্গু) নদীর ক্ষীণ জলধারা অতিক্রম করে একদা তিনি উপনীত হলেন শান্ত উরুবিল্ব গ্রামে। ক্ষুদ্র গ্রাম উরুবিল্ব এতদিন তার একান্ত নির্জনতায় বুঝি প্রতীক্ষা করেছিল দিব্য-পুরুষের পুণ্য-পদস্পর্শের মহালগ্নের। নদীতে অবগাহন করে বটবৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থ বসলেন কঠোর তপস্যায়, তাঁর সংকল্প ঃ

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চ লিষ্যতে॥"

—"বোধিলাভ না করে এই আসন আমি ত্যাগ করবো না।"··· যে আসনে বসে দীর্ঘ ও তপস্যার পর তিনি সত্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তারই উপরে দেবপ্রিয় সম্রাট অশোক নির্মাণ করেছিলেন এই মহাবোধি মন্দির। আকাশ উন্মুক্ত থাকবে না বলে সে সময় বোধিবৃক্ষকে তার স্থান পরিবর্তন করে মন্দিরের বাহিরে নতুন করে রোপন করা হয়েছিল। অশোকের প্রস্তুত মন্দির দেখেছেন পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন, দেখেছেন সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাঙ্। চৈনিক পরিব্রাজকেরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন মন্দিরের কারুকার্যের, বিশেষ উল্লেখ করেছেন দুশো ফিট উচ্চ মন্দিরের স্বর্ণ-কলস শোভিত গগন-স্পর্শী চূড়া, আর আশীফিট উচ্চ ধাতুনির্মিত বুদ্ধ মূর্তির। বলা বাহুল্য, আজ যে মন্দির আর মূর্তি আমরা দেখতে এসেছি, তা' অতীতের সম্পূর্ণ রূপ নয়। মহাকালের নিয়মে বারংবার এর ক্ষয় হয়েছে—কখনো বা প্রাকৃতিক, কখনো বা মানসিক আক্রমণে। আবার এর সংস্কারও হয়েছে একাধিকবার, চেষ্টা হয়েছে তার লুপ্ত-শ্রীর পুনরুদ্ধারের। বর্তমান মন্দির ৪৮ বর্গ ফিট জমির উপর অবস্থিত এবং এর উচ্চতা ১৭০ ফিট। চারকোণে প্রধান মন্দিরের অনুকরণে চারটি ছোট ছোট মন্দিরও আছে। এদের প্রত্যেকটিতে একটি করে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। অনেকে মনে করেন, এই মন্দিরগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধরা প্রধান মন্দিরের সংস্কারকালে নির্মাণ করেছেন। চার দিকের জমি মন্দিরের ভিত্তি থেকে প্রায় ১৫ ফিট উঁচু। বহুদিন সংস্কারের অভাবে এই অপূর্ব স্থাপত্য-কীর্তি মাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। অবশেষে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহামের নেতৃত্বে পুরাতত্ব বিভাগ কর্তৃক এর পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। এইসব কারণে মন্দিরের অলঙ্করণেরও বহু পরিবর্তন সম্ভব। অতীতের আড়ম্বর ও গৌরবের অনেকখানি আজ লুপ্ত হলেও শত-

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ-শতাব্দী-অতিক্রান্ত এই উন্নতশীর্ষ মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আজিও পথিকের মাথা অজান্তেই নত হয়ে আসে।...

মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার পূর্বদিকে একটি ছোট তোরণের পথে। মন্দিরের ভিতরে উচ্চাসনে উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধ—তাঁর সম্মুখে ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত। বুদ্ধমূর্তির মুখাবয়বে মঙ্গোলীয়ান প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—সম্ভবতঃ এটি নির্মিত হয়েছিল তিব্বতে। এখানেই বুদ্ধদেব তপস্যা করেছিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের দিন ভূমি ভেদ করে উঠে এসেছিল এখানে রত্ন সিংহাসন—'বজ্রাসন।'...মেজের মাঝখানে সিমেন্টে বাঁধানো চতুষ্কোণ একটি স্থান—শোনা যায় বৌদ্ধ আচার্যদের শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করে শঙ্করাচার্য বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রতীক স্বরূপ এখানে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন।...

শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠান আর প্রাণহীন বিধির শৃঙ্খলে বৈদিক ধর্ম যখন আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল সঙ্কীর্ণতায়, সেদিন ভারতের আধ্যাত্মিক পরিবেশ নিষ্কলুষ করবার জন্যে আবির্ভাব হয়েছিল শাক্যমুণি গৌতমের। আপাততঃ বিচারে বুদ্ধদেব বেদবিরোধীরূপে প্রচারিত হলেও বেদের জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল না, তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন প্রথাসর্বস্ব ক্রিয়াকাণ্ডের—যজ্ঞের বিকৃতিতে অর্থহীন অসংখ্য পশুহত্যার। বেদ এবং উপনিষদেরই বিস্মৃত বাণী সহজ প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে প্রচার করে তিনি প্রবেশ করলেন সাধারণ মানুষের অন্তরলোকে। বল্লেন, তৃষ্ণা থেকেই দুঃখের উৎপত্তি, অতএব তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই দুঃখের বিনাশ। এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ করলেন অষ্টশীল পালন করে সৎজীবন যাপনের পথে। বল্লেন :

"বাচানুররাখী মনসা সুসংবতো কায়েন চ অকুসলং না কয়িরা
এতে তয়ো কম্মপথে বিসোধয়ে আরাধয়ে মগ্‌গামিসিপ্প বেদিতং ॥"

—"বাক্যে ও চিত্তে সংযত থাকবে, শরীরের দ্বারা কোন অপবিত্র কাজ করবে না। এই তিনটি কর্মপথকে সর্বদা বিশুদ্ধ রাখবে এবং ঋষিগণ-নির্দিষ্ট পথে বিচরণ করবে।" পাপ বর্জন, কুশল কর্ম এবং নির্মল চিত্ত——এই তিনটিই বৌদ্ধধর্মের প্রধান অনুশাসন। গীতায় শ্রীভগবানের ন্যায় বুদ্ধদেবও গৃহীকে কোথাও সংসার ত্যাগের নির্দেশ দেননি। বলেছেন—অনাসক্ত জীবনযাপনের দ্বারা গৃহকে আশ্রম করে তোলাই হবে গৃহীর সাধনা। প্রাত্যহিক জীবনের লাঞ্ছনা-শোক-অশান্তি থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করলেন বুদ্ধ নির্লোভ ও অহিংসার পথে। অনাবশ্যক তত্ত্ব বিশ্লেষণ তাঁর অনভিপ্রেত ছিল—ঈশ্বর সম্বন্ধে তাই তিনি নীরব। মানুষের হৃদয়কে প্রেম ও ভালবাসার বাণীদ্বারা উদ্‌বুদ্ধ করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার মানসে তিনি বলেছেন :

"অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদারিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং ॥"

কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম শুষ্ক তর্কমূলক নিরীশ্বর বা শূন্যবাদে পরিণত হলো, ভেদসৃষ্টি হলো মহাযান আর হীনযান মতের। তার বিকৃতি দেখা দিল তান্ত্রিকতা আর আনুষঙ্গিক অভিচারে। বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাবে ক্রিয়াকলাপ-বহুল বৈদিক ধর্মও বিলুপ্তপ্রায়। আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণেরা নিজেদের সুবিধামত কাল্পনিক ধর্মের আশ্রয়ে পঞ্চ-মকারের চূড়ান্ত সদ্ব্যবহারে নিযুক্ত। ভারতব্যাপী সেই চরম দুর্দিনে আবির্ভূত হলেন অসামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন অক্লান্তকর্মী মহাপুরুষ শঙ্কর। ইতিপূর্বে কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তর্ক-যুদ্ধে আপন আচার্যকে পরাজিত করার অনুশোচনায় তিনি তুষানলে প্রাণত্যাগ করলেন। তখন তাঁর আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করার জন্যে এগিয়ে এলেন শঙ্কর—যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ।" সুরু হলো তাঁর দিগ্বিজয় আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষে। আপন তিক্ষ্ণধী মনীষার বলে কাশ্মীরের তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ থেকে কন্যাকুমারীকার সমুদ্রতীর, রাজস্থানের মরুপ্রান্তর থেকে আসামের অরণ্যানী পর্যন্ত সর্বত্র বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতদের স্বমতে আনয়ন করে ভারতের সামাজিক জীবনে যে বিপ্লব তিনি সম্পাদিত করেছিলেন, আজিও তারই প্রভাব অধিকাংশ ভারতবাসীকে একসূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে। শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলেছেন, কিন্তু নিজে কখনো কর্ম থেকে বিরত হন্ নি। পণ্ডিত নেহেরু তাই বলেছেন : "He (Sankar) was no escapist retiring into his shell or into a corner of the forest, seeking his own individual perfection and oblivious of what happens to other,"

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ তৎকালীন সমস্ত দার্শনিক মতকে ছাপিয়ে ভারতীয় চিন্তার মর্মমূলে যে বিশাল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এবং তান্ত্রিক ভ্রষ্টাচারের প্রতিপত্তি ক্রমেই জনসাধারণের মনে লুপ্ত হতে সুরু করলো। অবশেষে হিন্দুধর্মের বিপুল গ্রাস ক্ষমতা বৌদ্ধধর্মকে নিঃশেষে আপনার অঙ্গীভূত করে নিলে। আচার্য শঙ্কর রচিত বিষ্ণুর দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধদেবও অবতারজ্ঞানে পূজিত হলেন, বুদ্ধমূর্তি শিবমূর্তিতে রূপান্তরিত হলো। কোন কোন পণ্ডিত এমন কথাও বলেন যে গয়ার বিষ্ণুপাদচিহ্ন মূলতঃ বুদ্ধদেবেরই পদচিহ্ন।...তথাগত'র উপদেশ ছিল :

"ন হি বেরেণ বেরাণি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেণ চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥"

—"হিংসায় হিংসার ক্ষয় নাই, মৈত্রীর দ্বারাই শত্রুতার বিনষ্টি সম্ভব।" শঙ্কর কর্তৃক বিনা রক্তপাতে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তিতে এই নীতিই কার্যতঃ প্রতিপালিত হয়েছিল বলা যায়।

কিন্তু বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করে বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেও শঙ্কর বুদ্ধের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। তিনি যে শুধু বৌদ্ধ সন্ন্যাসবাদই গ্রহণ করলেন, তাই নয়, তাঁর প্রচারিত মায়াবাদও নির্গুণ ব্রহ্মের সাথে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও নির্বাণের পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে শঙ্করকে কোন কোন মহলে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" আখ্যা দেওয়া হয়।

এবার আমরা মন্দিরের বাইরে এলুম—পশ্চিমদিকে যেখানে আছে

বোধিবৃক্ষ। মনে পড়ে, এরই শাখা হাতে একদিন সঙ্ঘমিত্রা আর মহেন্দ্র যাত্রা করেছিলেন বাংলার বন্দর তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহলের পথে পিতা অশোকের ধর্মবিজয়ের সঙ্কল্প সাধন করতে, গিয়েছেন আরো কত আত্মত্যাগী প্রচারক সদ্ধর্মের বাণী বহন করে পৃথিবীর দিকে দিকে।

বৌদ্ধ কাহিনীতে বলে, বোধিবৃক্ষের ছায়ায় সাধনামগ্ন সিদ্ধার্থকে 'মার' কত প্রলোভন দেখালে, কত বিভীষিকার সৃষ্টি করলে তাঁর তপস্যা ব্যর্থ করে দেবার জন্যে। তাকে সাহায্য করতে সেদিন এসেছিল রতি, অরবি, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। কিন্তু তাহাদের রণ-কৌশল ব্যর্থ হলো, দীর্ঘ ৩৬ দিন তপস্যার পর সিদ্ধার্থ সন্ধান পেলেন জরা-মরণ-ব্যাধি থেকে মুক্তির পথ—মানুষের মধ্যে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। তিনি হলেন মার-বিজয়ী সম্বুদ্ধ। উরুবিল্ব'র বনতল ধ্বনিত করে মানুষের প্রতি সীমাহীন করুণায় তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো :

"ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং না পুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনাম্ আর্তিনাশনম্॥"

—"রাজ্য চাই না, স্বর্গ বা নির্বাণও চাই না, চাই শুধু দুঃখতপ্ত প্রাণীর আর্তিনাশ।"

এখানেই শ্রেষ্ঠী দুহিতা সুজাতা এসেছিলেন একদা পায়সান্ন নিয়ে বন-দেবতার পূজার মানসে। দীর্ঘদিন দেবতার দুয়ারে প্রার্থনা জানিয়ে সুজাতা পুত্রবতী হয়েছেন, আজ তিনি পূর্ণমনস্কামা। সেদিন বুদ্ধদেবের তপস্যার পঞ্চম সপ্তাহ। সুজাতা দেখেন—তরুতলে কাষায় বস্ত্র পরিহিত কৃশতনু এক অপূর্ব জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ. দৃষ্টিতে তাঁর অমিতদ্যুতি স্থির সৌদামিনীর স্নিগ্ধতা আর শান্তি, ললাটে চন্দ্র-কোটি-সুশীতল দিব্য আভা। সুজাতার মনে হলো এত সুন্দর, এত মধুর, এত করুণাসিক্ত মুখকান্তি বুঝি তিনি কখনো দেখেন নি। আপন শ্রদ্ধার্ঘ বুদ্ধের চরণে নিবেদন করে তিনি জানালেন প্রার্থনা : "যোগীবর, আমার ন্যায় আপনার মনোবাসনাও পূর্ণ হোক্।"...

হুয়েন সাঙের বিবরণীতে জানা যায়, সম্রাট অশোক কতদিন বোধি-বৃক্ষের নীচে এসে বসেছেন শান্তির সন্ধানে, কৃত দুষ্কর্মের জন্যে জানিয়েছেন অনুতাপ।...আবার খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার রাজা শশাঙ্ক—নরেন্দ্র গুপ্ত বারংবার এই বোধিবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করেছেন, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন শিকড়—যাতে আর কখনো না এর জন্ম হয়। কিন্তু তবুও তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে শাখা থেকে প্রশাখায় বোধিবৃক্ষ নবজন্ম লাভ করেছে। অজাতশত্রুর পর শশাঙ্কর ন্যায় বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বোধহয় আর দেখা যায় নি। শশাঙ্ক মহাবোধি মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি অপসারিত করে সেখানে মহাদেবের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন, বুদ্ধদেবের পদাঙ্কিত শিলাখণ্ডও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নদীগর্ভে বিসর্জন দেন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট "দুষ্ট গৌড়-ভুজঙ্গ" বলে তাঁকে নিন্দা করেছেন, হুয়েন্ সাঙের বিবরণীতেও তাঁর যথেষ্ট কুখ্যাতি করা হয়েছে, কিন্তু শশাঙ্কর এই বৌদ্ধ-বিদ্বেষ ধর্মগত: কারণের অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণেই অধিক প্রভাবিত হয়েছিল মনে হয়। শশাঙ্ক ছিলেন বীর যোদ্ধা. গৌড়বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে উত্তর-ভারতের অধিপতি বৌদ্ধ-ধর্মানুরাগী হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর ক্রমাগত সঙ্ঘর্ষ চলছিল। সে সময় শৈব-ধর্মাবলম্বী শশাঙ্কর বৌদ্ধ প্রজার অন্ততঃ কিছু অংশ যে হর্ষবর্ধনের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল, তা'তে সন্দেহ নেই। হয়তো বিভ্রান্ত শশাঙ্ক তারই দমনের চেষ্টা করেছেন বারংবার বৌদ্ধধর্মের উপর আঘাত হেনে। অথচ ইতিহাসের কি অমোঘ বিধান। শশাঙ্কর মৃত্যুর সাথেই বাংলার ক্ষাত্রশক্তি সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়ে দেশ যখন অন্তর্বিরোধ আর বহিঃশত্রুর আক্রমণে জর্জরিত, তখন বাংলাকে রক্ষার ভার গ্রহণ করলেন বৌদ্ধ গোপালদেব, এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজাদের শাসনেই বাংলাদেশ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বীরত্বে গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল।...বৌদ্ধধর্মকে রাজকীয় শক্তি-দ্বারা দমনের চেষ্টা আর কোন হিন্দুরাজাকে করতে দেখা যায় নি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিপত্তির দিনেও আসমুদ্র-করগ্রাহী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সিংহলের বৌদ্ধ রাজা মেঘবর্ণকে এই বুদ্ধগয়াতেই সিংহলী তীর্থযাত্রীদের জন্যে একটি বিহার নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন।

মন্দিরের পুনরুদ্ধারকালে মূল বোধিবৃক্ষটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কানিংহাম সাহেব তার একটি শাখা রোপণ করিয়ে দিয়েছিলেন, তা' থেকেই বর্তমান বৃক্ষটির উৎপত্তি।...

মন্দিরের চারিদিকে পাথরের রেলিংএর অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়—তার মাঝে মাঝে পাথরের স্তম্ভ। পদ্ম এবং বুদ্ধমূর্তির দ্বারা এদের অলংকৃত করা হয়েছে। এই রেলিংগুলি অশোকের পরবর্তী শুঙ্গ-যুগে প্রস্তুত বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। শুঙ্গ-বংশীয় রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হলেও বৌদ্ধ শিল্প ও ভাস্কর্য তাঁদেরই রাজত্বকালে যে সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছিল, তার প্রমাণ আছে ভারুতে, বুদ্ধগয়া ও সাঁচীর স্তূপ, মন্দির ও তোরণ ইত্যাদিতে।

মন্দিরের আশে-পাশে অসংখ্য ছোট বড় স্তূপ এবং বুদ্ধমূর্তি আছে। কালো পাথরের তৈরী এইসব স্তূপগাত্রে জাতকের বহু কাহিনী ও বিভিন্ন আকারের বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত। ছোট হলেও তাদের নিখুঁত শিল্প-চাতুর্য মনকে অভিভূত করে তোলে। এদের কোনটি বা সমাধি, কোনটি বা ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণের কৃতজ্ঞতার প্রতীক। মূর্তিগুলির অধিকাংশই অঙ্গহীন। হয়তো কোন কালাপাহাড়ের আক্রোশের সাক্ষী। বৌদ্ধ-ধর্মের অবনতি ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের দিনে কোন কোন উৎসাহী হিন্দুর পক্ষেও এ রকম ঘটনা অসম্ভব ছিল না। তারই একটি প্রমাণ দেখলুম 'পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির।' এখানে ছ'টি বুদ্ধমূর্তিকে গৈরিক কাপড় পরিয়ে রাখা হয়েছে। পূজারী পরিচয় করিয়ে দিলে : "এঁরা পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তী।" বলা বাহুল্য, আসল পরিচয় বুঝতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয় নি।

পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা আসেন বলে তীর্থ-যাত্রীদের সুবিধের জন্যে এখানে মহাবোধি সোসাইটির এবং ব্রহ্ম, তিব্বত ও চীনদেশীয় বিশ্রামশালা আছে। পূর্ত বিভাগের ডাকবাংলোটিও

উল্লেখযোগ্য। শুনলুম, চীনদেশীয় বিশ্রামশালাটির আজকাল বড়ই দুরবস্থা, কারণ চীন কম্যুনিষ্ট হওয়ার পর থেকে কোন সাহায্য আসছে না। এখানে বুদ্ধদেবের জীবন-সংক্রান্ত কয়েকটি সুন্দর চৈনিক চিত্র আছে।...

বুদ্ধগয়ার নিকট বিদায় নিয়ে আবার আমরা এক্কাতে আরোহণ করলুম। অন্তরে সঞ্চয় করে নিলুম তার ধুলিকণা থেকে অতীতের বাণী। মানুষের ইতিহাসে কল্যাণের আহ্বান নিয়ে এসেছেন কত সাধক, আমরা তাঁদের বারংবার ফিরিয়ে দিয়েছি ব্যর্থ নমস্কারে! তাই, শিষ্যের প্রদত্ত বিষাক্ত মিষ্টান্নে তথাগত লাভ করেন মহা-পরিনির্বাণ, যীশুখৃষ্ট প্রাণবলি দেন ক্রুশে, আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনে স্তব্ধ হয়ে যায় গান্ধীর হৃৎপিণ্ড। উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন "আত্মানং বিদ্ধি"—নিজেকে জেনে আত্মশক্তির বিকাশ কর। তারই প্রতিধ্বনি করে বুদ্ধ বল্লেন "আত্মদীপো ভবঃ"—আপন আলোকে পথ চিনে চলো। কিন্তু আজিও মানুষের নিজেকে জানা হলো না, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় চলারও তাই নেই সমাপ্তি। তারকালোকের ছন্দ আজ আমাদের নখদর্পণে, সৌরশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডারও করায়ত্ত, তবু হিংসা আর অবিশ্বাসের বিষবাষ্পে অন্ধ হয়ে আমরা শুধু বাঁচবার আশাটুকুই সভয়ে লালন করে চলেছি। তথাগত বলেছিলেন :

"অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চ নোপদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা মথামতা॥"

—"অপ্রমাদ নির্বাণের পদ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। যারা অপ্রমত্ত—তাদের মৃত্যু নেই, যারা প্রমত্ত—তারা মৃততুল্য।"...হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে এ বাণীর পুনরুদ্ধার কি আজ করবেন না কোন মৃত্যুঞ্জয়া পুরুষ?

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

মিশর-ইস্রাইলের "ক্রনিক" সীমান্ত-সজ্ঘর্ষ সম্প্রতি ব্যাপক যুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। জাতি-সজ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল হ্যামারস্কজের চেষ্টায় সে আশঙ্কা আপাততঃ দূরীভূত হইয়াছে। রুশিয়ার ভ্রমণপটু নেতৃদ্বয়—বুল্‌গানিন ও ক্রুশ্চেভ তাঁহাদের দশ-দিনব্যাপী বৃটেন্ ভ্রমণ শেষ করিয়াছেন। সেখানে পথে ঘাটে তাঁহারা অভিনন্দন ও মুখ-ভ্যাঙচানি দু-ই পাইয়াছেন। ভোজসভা, সাংবাদিক-বৈঠক প্রভৃতিতে তাঁহারা যথারীতি বক্তৃতা করিয়াছেন, মন্ত্রীদের সহিত গোপনে শলা-পরামর্শও করিয়াছেন; কিন্তু এই দীর্ঘ প্রয়াসের প্রত্যক্ষ ফল এখন পর্য্যন্ত শূন্য; পরোক্ষ ফল অবশ্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য। রুশ নেতাদের বৃটেন যাত্রার প্রাক্কালে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রচার দপ্তর—"কমিন্‌ফর্ম্মের" অবসান ঘোষণা করা হইয়াছিল; মধ্য-প্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতি-সজ্ঘের মাধ্যমে সহায়তা করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন আগ্রহ জানাইয়াছিল। তেহরানে বাগ্‌দাদ-চুক্তি-কাউন্সিলের সাম্প্রতিক বৈঠকেও পাকিস্থানের মন রাখিবার জন্য কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল; তবে, পাকিস্থানের আবদার এবার পুরাপুরি রক্ষিত হয় নাই। আল্‌জেরিয়ায় আরব-বিদ্রোহ আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছে; ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তিন লক্ষ সৈন্য নিয়োগ করিয়াও কূল পাইতেছেন না। সিংহলের সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে "মহাজন একসাথ পেরামুনা" দলের অপ্রত্যাশিত বিপুল সাফল্যে সিংহলী রাজনীতির গতি বামমুখী হইয়াছে, এবং ইহার প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্ত্য জগতে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে।

আরব-ইস্রাইল বিরোধ—

মিশর ও ইস্রাইলের মধ্যবর্ত্তী গ্যাজা অঞ্চলে বৎসরাধিক কাল ধরিয়া মধ্যে মধ্যে সজ্ঘর্ষ চলিয়া আসিতেছিল। গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এই সজ্ঘর্ষ ব্যাপক হইয়া ওঠে। ইস্রাইলের পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয় যে, মিশরীয় হানাদারী-বাহিনী ইস্রাইলের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাইয়াছিল। মিশরের পক্ষ হইতেও ইস্রাইলের বিরুদ্ধে প্রথম কামান চালাইবার অভিযোগ করা হয়। অবস্থা ক্রমেই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিতে থাকে; জাতি-সজ্ঘের যুদ্ধ-বিরতি-সুপারভাইজার জেনারেল বার্ণসের পক্ষে অবস্থা আয়ত্তে রাখা অসম্ভব হয়। লণ্ডনে ও ওয়াশিংটনে তখন গভীর উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি নষ্ট হইলে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি প্রযুক্ত হইবে। ইহার পর জাতি-সজ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারস্কজকে মধ্য-প্রাচ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় মিশর ও ইস্রাইলের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থা হইয়াছে: উভয়পক্ষ "আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত" অস্ত্র ধারণে বিরত থাকিতে সম্মত হইয়াছে; দুই পক্ষের সেনাবাহিনীকে কামানের পাল্লার বাহিরে রাখিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুর্কি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আরবদের বিদ্রোহ ঘটান হইয়াছিল তাহাদিগকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়া। ইহুদী ধনিকদের অর্থসাহায্যের বিনিময়ে অঙ্গীকার করা হইয়াছিল যে, ইহুদীদের জন্য জাতীয় বাসভূমি (ন্যাশন্যাল্ হোম্) স্থাপিত হইবে। যুদ্ধের অবসানে সিরিয়া ও লেবানন্ এবং প্যালেষ্টাইন্ স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে পাইল—রাষ্ট্র সজ্ঘের (লীগ অব্ নেশনসের) পক্ষ হইতে যথাক্রমে ফ্রান্স ও বৃটেনের অভিভাবকত্ব (ম্যাণ্ডেট্); ইরাকে ও জর্ডানে বৃটিশের অনুরক্ত হাসেমাইট্ বংশের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর প্যালেষ্টাইনের কতকাংশে ইহুদীদের জাতীয় বাসভূমি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সেখানে ইহুদীদের ব্যাপক বসবাস আরম্ভ হয়। আরবরা প্রথম হইতেই এই আয়োজনের বিরোধিতা করিতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনে যে বিপুল বৃটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে, স্বতন্ত্র ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন বন্ধ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের নির্ম্মম ইহুদী নিপীড়নে স্বতন্ত্র ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার আন্তর্জ্জাতিক পক্ষে জনমত সৃষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধের পর সেই সঙ্গে এই রাজনৈতিক স্বার্থ-চিন্তা সক্রিয় হইয়া ওঠে যে, আরব জগতের মাঝখানে ইহুদী রাষ্ট্রটি পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের নির্ভরযোগ্য ঘাঁটী হিসাবে কাজ করিবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার অল্পকাল পরে জাতি-সজ্ঘের পক্ষ হইতে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরম্ভ হয়। সে আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পাঁচটি আরব রাষ্ট্র উহাকে আক্রমণ করে। ইহুদী নেতা বেন্ গুরিয়েন্ তখনই ইস্রাইলের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বেপরোয়া ইহুদীদের নিকট আরবদের পরাজয় ঘটে। যুদ্ধ-বিরতির সীমারেখা নির্দ্ধারণের জন্য তখন জাতি-সজ্ঘের যে কর্ম্মচারিবৃন্দ নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াই ইস্রাইল জাতিসজ্ঘের পরিকল্পনার অতিরিক্ত দুই হাজার বর্গমাইল অধিকার করিয়া লয়। সেই সময় হইতে নয় লক্ষ আরব উদ্বাস্তু অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। সুতরাং পরাজয়ের গ্লানি আরবদের তো আছেই; তাহা ছাড়া, অতিরিক্ত দুই হাজার বর্গমাইল স্থান ইস্রাইলের অন্তর্ভুক্তি এবং আরব উদ্বাস্তুদের শোচনীয় অবস্থা তাহাদের ক্রোধ বৃদ্ধি করিতেছে। আরব-ইস্রাইলের যুদ্ধ আপাততঃ বন্ধ হইলেও দুই পক্ষ রণসাজে সজ্জিত। গত সেপ্‌টেম্বর মাসে আমেরিকার

"নিউজ এণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট" পত্রিকা ইস্রাইলের সমরায়োজন সম্পর্কে লেখেন. "ক্ষুদ্র ইস্রাইলের লোক-সংখ্যা মাত্র সত্তর লক্ষ ; ক্ষুদ্র রাজ্যটির আয়তন নিউ হাম্পসায়ার ষ্টেট্ অপেক্ষাও ছোট। কিন্তু সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সত্তর বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের প্রত্যেকটি ইস্রাইলী সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্য। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ইস্রাইল আড়াই লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করতে পারে ; অস্ত্রশস্ত্রও তাহার তৈয়ারী।...যুদ্ধের পরিকল্পনা, এমন কি যুদ্ধে ব্যবহারের সঙ্কেতিক চিহ্ন (কোড্ সিগ্-ন্যাল্) ঠিক হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদের পর্য্যন্ত সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক।" ইহার তুলনায় সংহতি ও প্রস্তুতির অভাবে আরবদের সামরিক শক্তি অনেক কম বলিয়া ঐ পত্রিকা মন্তব্য করেন। কিন্তু এই মন্তব্য এখন আর প্রযোজ্য নয়। মিশর ইতিমধ্যে কম্যুনিষ্ট শিবির হইতে অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়াছে। সৌদী আরব, সিরিয়া ও মিশরের মধ্যে সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, এবং সংযুক্ত কম্যাণ্ড গঠিত হইয়াছে। যুদ্ধ পরিচালনের সুচিন্তিত পরিকল্পনাও নিশ্চয়ই স্থির হইয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—আট বৎসর পূর্ব্বে আরবদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল বৃটিশের অনুরক্ত জর্ডানের সহিত মিশরের বিরোধ। সে বিরোধের এখন সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে আরব ও ইস্রাইলের মধ্যে যদি পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী হইবার সম্ভাবনা ; সজ্যর্ষের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হওয়াও অসম্ভব নহে। ড্যাগ্ হ্যামারস্কল্ডের মধ্যস্থতায় ব্যাপক যুদ্ধের আশঙ্কা আপাততঃ দূর হইল বটে ; কিন্তু আরব ও ইস্রাইলের বিরোধ স্থায়িভাবে মিটিতে এখনও অনেক বিলম্ব হইবে।

বাগ্দাদ্ চুক্তি ও মধ্য-প্রাচ্য সমস্যা—

বাগ্দাদ্ চুক্তি অতলান্তিক সামরিক জোটের (ন্যাটোর) প্রসারিত অঙ্গ। তুরস্ক ন্যাটোর সভ্য ; তাহার সাহায্যে আরব রাষ্ট্রগুলিকে এক এক করিয়া সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া মধ্য-প্রাচ্যে সামরিক জোট গড়া সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল ; আমেরিকার অনুগত মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্থান ও ইরাণ এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধিতে সহায়ক হইবে বলিয়াও মনে করা হয়। কম্যুনিষ্ট আক্রমণাশঙ্কা বিস্ফারিত করিয়া দেখাইয়া এবং "ন্যাটো"ই যে সে বিপদ হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়, তাহা বুঝাইয়া ইস্রাইলের বিরোধিতায় আরব রাষ্ট্রগুলির অখণ্ড মনোযোগ বদ্ধ করা যাইবে বলিয়াও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ আশা করিয়া থাকিবেন। গত ১৯৫৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তুর্কি-ইরাক সামরিক চুক্তি (বাগদাদ চুক্তি) সম্পাদিত হইবার সময় তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী মেণ্ডেরিস্ অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে "ন্যাটোর" মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিতে থাকেন—"ন্যাটোই বিপদের বিরুদ্ধে প্রকৃত বর্ম।" কিন্তু এই কীর্ত্তনে অন্য কোনও আরব রাষ্ট্র বাগদাদ চুক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই ; বরং বৃটিশের প্রভাবে ইরাক এই চুক্তিতে যোগদেওয়ায় আরব জগতে বৃটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরব জগতে এই চুক্তির বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়া আমেরিকা ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেয় নাই ; যোগ দিয়াছে বৃটেন, আর মার্কিণ প্রভাবিত ইরাণ ও পাকিস্থান।

সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে মধ্য-প্রাচ্যে সামরিক জোট গঠন বাগদাদ চুক্তির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য শুধু সম্পূর্ণ ব্যর্থই হয় নাই—কম্যুনিজম বিরোধিতার ব্যাপারে মধ্য-প্রাচ্যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়াছে। প্রাক্তন মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এচেসনের ভাষায় এই চুক্তি "শক্তি ও একতা আনে নাই—আনিয়াছে বিভেদ ও দুর্ব্বলতা।" বাগদাদ্ চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় জর্ডানে বৃটেনের সামরিক কর্ত্তৃত্বের অবসান হইয়াছে, সৌদী আরবের সহিত তাহার বিরোধ আরও বাড়িয়াছে, সুয়েজ হইতে অপসারণের পর মিশরের সহিত তাহার সম্পর্ক উন্নত হইবার যে সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে—আরব জনসাধারণের মনে এই ধারণা প্রবলতর হইয়াছে যে, তাহাদের স্বার্থ-বিরোধী ইস্রাইলকে শক্তিশালী করিবার জন্য এবং মধ্য প্রাচ্যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কর্ত্তৃত্ব সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যেই বাগদাদ চুক্তির প্রতিষ্ঠা। এদিকে সোভিয়েট রুশিয়ার তথা কম্যুনিষ্ট শিবিরের প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে মধ্য প্রাচ্যে। মিশর, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান প্রকৃতি রাজ্যে এখন বৃটেন ও আমেরিকা অপেক্ষা সোভিয়েট রুশিয়াই অধিকতর জনপ্রিয়। ইহার কারণ সোভিয়েট রুশিয়া সামরিক চুক্তির কথা বলে না, "শান্তির কথা বলে, বাণিজ্য, বন্ধুত্ব, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং এইরূপ আরও এমন সব কথা বলে যাহা এশিয়ার সন্দিগ্ধচিত্ত, অভিমানী ও ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণ শুনিতে চায়। (আল্ডাই ষ্টিভেন্সন্)। সংক্ষেপ, বাগদাদ্ চুক্তি সম্পাদিত হইবার দেড় বৎসর পরে আজ আরব জগৎ বিক্ষুব্ধ, পাশ্চাত্যের প্রতি বিদ্বিষ্ট, এবং যাহার বিরুদ্ধে এই চুক্তি, সেই সোভিয়েট রুশিয়ার মর্য্যাদা এখন মধ্য প্রাচ্যে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত।

গত ১৬ই এপ্রিল হইতে ১৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক বসিয়াছিল তেহরাণে। এই বৈঠকে চুক্তির ব্যর্থতার কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিয়াছেন কি না, তাহা অবশ্য অপ্রকাশ্য। বৈঠকের শেষে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে চুক্তিকে শক্তিশালী করিবার "জরুরী প্রয়োজনীয়তার" কথা বলা হয়। এই বৈঠকে অর্থ নৈতিক সহযোগিতার প্রতি বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকা বাগদাদ চুক্তির অর্থ-নৈতিক কমিটিতে যোগ দিয়াছে। পাকিস্থানের আব্দারে কাশ্মীরের প্রসঙ্গ এখানেও উত্থাপিত হইয়াছিল। তবে, গত মার্চ্চ মাসে "সিয়াটো" কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তিতে গণ-ভোটের দ্বারা কাশ্মীর বিরোধ মিটাইবার কথা বলা হইয়াছিল ; বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তিতে বিরোধ মিটাইবার কোনও উপায়ের কথা উল্লেখ করা হয় নাই,—শুধু বলা হইয়াছে যে, প্যালেষ্টাইন ও কাশ্মীরের বিরোধ মীমাংসিত হওয়া প্রয়োজন।

মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই অঞ্চল এখন শক্তিদ্বন্দ্বের ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে ; এই অবস্থা যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন এখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। প্রতিরোধমূলক বলা হউক, অথবা অন্য যে বিশেষণই দেওয়া হউক, সামরিক জোট গড়িলেই অন্য পক্ষ সে জোট ভাঙিবার জন্য

যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেই ; এই দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। গত বৎসর অক্টোবর মাসে মিশর কর্ত্তৃক কম্যুনিষ্টদের অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় পাশ্চাত্য মহলে যখন দারুণ চাঞ্চল্য, তখন লণ্ডনের 'নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন' প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য করেন, "যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, মধ্য প্রাচ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সামরিক কর্ত্তৃত্ব নিবারণ বৃটেনের ও পাশ্চাত্য শক্তিবৃন্দের জীবনমরণ স্বার্থ, তাহা হইলে এই অঞ্চলে মার্কিণ জেট বিমানের কর্ত্তৃত্ব নিবারণও সোভিয়েট ইউনিয়নের জীবন-মরণ স্বার্থ।" বর্ত্তমানে সৌদী আরবে মার্কিণ জেট বিমানের যে সব ঘাঁটী আছে, সে সব ঘাঁটী যদি অটুট থাকে, এবং বাগদাদ চুক্তি অথবা অন্য কোনরূপ সামরিক জোটের সাহায্যে এই ধরণের ঘাঁটী বাড়াইবার চেষ্টা যদি চলে, তাহা হইলে সে আয়োজন নষ্ট করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের কূটনৈতিক তৎপরতা ও অন্যপ্রকার চেষ্টাও চলিবে। স্থানীয় বিবদমান পক্ষগুলি এই সব চেষ্টা ও পাল্টা চেষ্টার দ্বারা উপকৃত হইতে চেষ্টা করিবে।

ইস্রাইল-আরব বিরোধের সুযোগে সোভিয়েট রুশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সোভিয়েট-বিরোধী সমরায়োজনের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি সে আরব-ইস্রাইলের মধ্যে শান্তি স্থাপনে জাতি-সঙ্ঘকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। তাহার এই প্রতিশ্রুতিকে অভিনন্দন না জানাইয়া উপায় নাই। কিন্তু তাহার এই আগ্রহের পশ্চাতে কূটনৈতিক উদ্দেশ্য রহিয়াছে: মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতি হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নকে দূরে রাখিয়া এখানে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার যে চেষ্টা, তাহা সে ব্যর্থ করিতে চায়। ইহার জন্য ক্ষেত্রও প্রস্তুত হইয়াছে পূর্ব্ব হইতে ঃ মিশরকে অস্ত্র সরবরাহ করিয়া এবং আরব রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া সে মধ্য প্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এখানকার ব্যাপার হইতে তাহাকে দূরে রাখা এখন দুষ্কর। আর, তাহার এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যে সঙ্গত, তাহা অস্বীকার করাও যায় না ; "বৃহৎ শক্তি হিসাবে সে পৃথিবীর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে চায়। মধ্য প্রাচ্যের ব্যাপার হইতে অবিরত দূরে রাখিয়া তাহাকে অবমাননা করা হইতেছে।" (লণ্ডন 'টাইমস্' ২৯।৯।৫৫)

বৃটেনে বুল্‌গানিন ও ক্রুশ্চেভ—

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এন্থনী ইডেন গত বৎসর জুলাই মাসে জেনেভায় রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন্ ও রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী মঃ ক্রুশ্চেভকে বৃটেনে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় বৃটিশ মহলে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। ইহার পর, অক্টোবর মাসে কম্যুনিষ্ট শিবির (চেকোশ্লোভাকিয়া) হইতে মিশরে অস্ত্র সরবরাহের সংবাদ প্রকাশ পায়, পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে চতুঃ-শক্তির আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সুতরাং, জেনেভায় যে আবহাওয়ায় স্যর এন্থনী ইডেন রুশ নেতাদিগকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, সে আবহাওয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর, গত শীতকালে মঃ ক্রুশ্চেভ ভারত-ব্রহ্মে ভ্রমণের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বক্রোক্তি করেন। বৃটেনে ইহাতে উষ্মার সঞ্চার হয় ; স্যর এন্থনী স্বয়ং এই উক্তির জবাব দিয়াছিলেন। এত কাণ্ডের পর গত মার্চ্চ মাসে রুশ নেতা মঃ ম্যালেন্কভ্ যখন বৃটেনে যান, তখন বৃটিশ জনসাধারণ তাঁহাকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানায়। বৃটেনের এক শ্রেণীর রাজনীতিক ইহাতে প্রমাদ গণেন ঃ ম্যালেনকভের জন্য যখন এত উৎসাহ, তখন বুল্‌গানিন্-ক্রুশ্চেভ আসিলে জনসাধারণ বোধ হয় একেবারে মাতিয়া উঠিবে। এই সব রাজনীতিকের তৎপরতা সম্বন্ধে গত ১৫ই এপ্রিল 'রয়টারের' প্রতিনিধি লণ্ডন হইতে জানান, "প্রাক্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যালেনকভ সম্প্রতি যখন এদেশে আসেন, তখন তিনি যে অভিবাদন ও চুম্বন লাভ করিয়াছেন, তাহাতে ভীত হইয়া, এবং বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের এই ধরণের জনপ্রিয়তায় মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাহাদের বিজয় হইবে আশঙ্কা করিয়া পার্লামেণ্টের সদস্যরা বৃটেনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন ; বৃটিশ জনসাধারণ যাহাতে হাসিতে ও করমর্দ্দনে ভুলিয়া না যায়, সে জন্য তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। সংবাদপত্রের প্রবন্ধে জনসাধারণকে দূরে থাকিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে...।" তাহার পর, রুশিয়ায় এবং পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কম্যুনিষ্ট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যাহারা ঐ সব দেশ ত্যাগ করিয়া অথবা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া বৃটেনে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা রুশ নেতাদিগকে অপমান করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যায়। স্বভাবতঃ স্থানীয় নেতাদের তৎপরতায় তাহারা উৎসাহ পাইয়াছিল। এই অবস্থায় গত ১৮ই এপ্রিল মার্শাল বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ বৃটেনে আসেন। সরকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থার কঠোর বেড়াজাল পূর্ব্ব হইতে রচিত হইয়াছিল ; সেই জালের মাঝখানে সরকারী অতিথিরূপে কড়া সরকারী পাহারায় রুশ নেতৃবৃন্দ দশ দিন বৃটেনে পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

এই পরিভ্রমণে এবং রুশ নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন বক্তৃতায় বৃটিশ জন-সাধারণের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। রুশ নেতা বা তাঁহাদের বক্তৃতায় একাধিকবার এই কথার উপর জোর দিয়াছেন যে, বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয় ; বৃটেনের সাহায্যে তাঁহারা আমেরিকার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে চান। তাঁহারা অর্থ-নৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন ! কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে সামরিক প্রয়োজনের জিনিসপত্র প্রেরণ সম্পর্কে "ন্যাটোর" সভ্য শক্তিগুলির প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আছে, বার্মিংহামে বৃটিশ শিল্প মেলায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভ বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় হাইড্রোজেন্ বোমা ফেলিবার ক্ষমতা সোভিয়েট ইউনিয়নের আছে ; পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নই এখন পর্য্যন্ত বিমান হইতে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে ; বাণিজ্য সম্পর্কে

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন সমরোপকরণ নির্ম্মাণে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তখন এই নিষেধাজ্ঞার মূল্য কি? ক্রুশ্চেভ্ মন্তব্য করেন যে, সমরোপকরণের কোনও সীমারেখা নাই, "মাখনও সমরোপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।" বৃটিশ শ্রমিক দল কমন্স সভায় রুশ অতিথিদের জন্য যে ভোজসভার আয়োজন করেন, সেখানে কিছু অপ্রীতিকর কথা কটাকাটি হয়। এখানে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভ বলেন যে, গত মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে বৃটেনের চেম্বারলেন মন্ত্রিমণ্ডল ও ফ্রান্সের দালাদিয়ার মন্ত্রিমণ্ডল হিট্‌লারকে রুশিয়া আক্রমণে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই উক্তিতে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ইহার পর, শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে কেহ কেহ রুশিয়ায় ও পূর্ব্ব ইউরোপে আটক সোস্যাল্ ডিমোক্রাটদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ক্রুশ্চেভ্ বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে কেহ আটক নাই; পূর্ব্ব ইউরোপের কথা তিনি জানেন না।

রুশ নেতৃবৃন্দের সহিত বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের আলোচনার কোনও প্রত্যক্ষ ফল হয় নাই; কোনও বিষয়েই তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। আলোচনা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার উল্লেখ করিয়া উহাদের মীমাংসার জন্য সদিচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। তবে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ বৃটেনের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি করিবার আগ্রহ জানাইয়া আগামী পাঁচ বৎসরে এত শত কোটী পাউণ্ড মূল্যের বৃটিশ পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কি কি পণ্য রুশিয়া কিনিতে চায়, তাহার একটি তালিকাও প্রকাশ করা হইয়াছে। বুলগানিন্-ক্রুশ্চেভের বৃটেন পরিভ্রমণের আর একটি বাস্তব ফল—স্যার এন্থনী ইডেন সোভিয়েট ইউনিয়নে যাইবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। বৃটেন পরিভ্রমণের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে মার্শাল বুলগানিন মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে বলেন যে, এই অঞ্চলে অস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করার ব্যাপারে অন্তর্জ্জাতিক চুক্তিতে যোগ দিতে তাঁহারা প্রস্তুত। ইঙ্গ-সোভিয়েট বাণিজ্যের শুভ প্রতিক্রিয়ার কথা এবং বৃটেনের সাহায্যে আমেরিকার সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক উন্নত করার কথা তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে তাঁহার উক্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তিনি বলেন, "রুশিয়া যখনই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রস্তাব গ্রহণ করে, তখনই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তাহা বর্জ্জন করেন। ইহা এক রহস্যজনক ব্যাপার।" বুলগানিনের এই উক্তি বৃটিশ উদারনৈতিক পত্রিকা "নিউ ষ্টেটসম্যান্ এণ্ড নেশনের" পূর্ব্ববর্ত্তী একটি মন্তব্যের প্রায় প্রতিধ্বনি। জাতিসঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ সাবকমিটীর আলোচনা সম্পর্কে গত ৭ই এপ্রিল ঐ পত্রিকা লেখেন, "গত সপ্তাহে রুশিয়া যে সব প্রস্তাব করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি প্রস্তাব কোনও না কোনও সময়ে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইয়াছিল।" ইহার পর ঐ পত্রিকা তিক্ততার সহিত বলেন যে, মীমাংসা তবু হইতেছে না; কারণ রুশিয়া যাহা প্রস্তাব করে, তাহাই খারাপ, এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রস্তাব পুনরায় যতক্ষণ রুশিয়ার দ্বারা উত্থাপিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই তাহা ভাল থাকে।

সিংহলী রাজনীতির বামমুখী গতি—

গত এপ্রিল মাসের নির্ব্বাচনে সিংহলে পাশ্চাত্য শক্তির অনুরক্ত ইউনাইটেড ন্যাশন্যাল পার্টির নয় বৎসরের শাসনের অবসান ঘটিয়াছে; ১১ই এপ্রিল কোটলেওয়ালা মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে মোট ৯৫টি আসনের মধ্যে ৫১টি আসন মহাজন একসাথ পেরামুনা দল অধিকার করিয়াছে। এই দলের নেতা মিঃ সলোমন বন্দরনায়ক নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়াছেন।

সিংহলে এই নির্ব্বাচনের ফল যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি বৈপ্লবিক। মিঃ বন্দরনায়ক ক্ষমতা লাভ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে তিনি ভারতের ন্যায় নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিবেন। চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সিংহলের এত দিন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না; বন্দরনায়ক সে সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, মিঃ বন্দরনায়ক ঘোষণা করিয়াছেন যে, সিংহলে বৃটিশ সৈন্য থাকিতে পারিবে না; কারণ "বৈদেশিক সৈন্যের অবস্থিতি জাতীয় সার্ব্বভৌমত্বের সহিত অসামঞ্জস্যকর।" অতএব, বৃটেন এতদিন ত্রিঙ্কোমালি ও কাটুনায়ককে নৌ ও বিমানঘাঁটিরূপে ব্যবহারের যে সুযোগ উপভোগ করিয়া আসিতেছিল, সে সুযোগে সে বঞ্চিত হইবে। মিঃ বন্দরনায়ক জানাইয়াছেন যে, আগামী জুন মাসে কমনওয়েলথ সম্মেলনের সময় তিনি সিংহলে ভারতীয়দের বসবাস সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর সহিত আলোচনা করিবেন।

সিংহলের রাজনীতিক্ষেত্রে এই আমূল পরিবর্ত্তনের ফলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রযূথে একটি নূতন রাষ্ট্র আসিল। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ স্বভাবতঃ ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন: প্রাচ্যের আর একটি রাষ্ট্রের উপর আমেরিকার নৈতিক প্রভাব শিথিল হইল, আর বিশেষভাবে বাস্তব ক্ষতি হইল বৃটেনের। তাহার জিব্রল্টরের প্রতি স্পেনের লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে, সম্প্রতি তাহার সুয়েজ গিয়াছে, এডেনের প্রতি য়েমেন্ শ্যেন দৃষ্টিপাত করিতেছে, সিঙ্গাপুরেও জাতীয়তাবাদীদের দাবী অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিতেছে। ইহার পর, সিংহলের ঘাঁটিগুলি হস্তচ্যুত হওয়ায় তাহার প্রাচ্য স্বার্থ রক্ষার সুপ্রাচীন সূত্রটি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

কমিন্‌ফর্ম্মের বিলোপ—

রুশ নেতৃবৃন্দ বৃটেনে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, "কমিনফর্ম্ম" বা আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট প্রচার দপ্তর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী "কমিণ্টার্ণ" বা কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের (আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান) মত শক্তিশালী ছিল না। তবে, ইহার মুখপত্রে বৈদেশিক কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা হইত, এবং তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া হইত। স্বভাবতঃ এই প্রতিষ্ঠানে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টিরই কর্ত্তৃত্ব ছিল। গত কিছুকাল যাবৎ অ-কম্যুনিষ্ট জগতে এই ধরণের অভিযোগ করা হইতেছিল যে, সোভিয়েট

রুশিয়া কমিনফর্ম্মের মারফৎ বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে প্রচলিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙ্গিতে উৎসাহিত করে; ইহার অস্তিত্ব সহ-অবস্থিতির আদর্শের বিরোধী। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তথা রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টি "কমিনফর্ম্ম" ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই অভিযোগের কারণ দূর করিলেন।

আল্‌জেরিয়ার মুক্তি-সংগ্রাম—

আল্‌জেরিয়ার আরব বিদ্রোহীদের মুক্তি সংগ্রাম চরম পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট আল্‌জেরিয়ার মোট আশী লক্ষ ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষের বিরুদ্ধে তিন লক্ষ ফরাসী সৈন্য নিয়োগ করিয়াছেন, এবং গেরিলা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে হেলিকপ্‌টার পাঠাইতেছেন। আরবরাও একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

ফরাসী শাসনতন্ত্র অনুসারে আল্‌জেরিয়া ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই, ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ আল্‌জেরিয়ার স্বাধীনতার কথা ভাবিতেই চাহেন না। আল্‌জেরিয়ার যে দশ লক্ষ ফরাসী অধিবাসী এখানকার সর্ব্বক্ষেত্রে কর্ত্তৃত্ব করে, ফরাসী রাজনীতিক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব প্রচুর। তাহারা শাসনতন্ত্রের সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। ফ্রান্সের বর্ত্তমান মালৎ গভর্ণমেণ্ট "ফরাসী-আল্‌জেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা" প্রবর্ত্তন করিয়া আরবদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানীয় ফরাসীদের বিরোধিতায় তাহা সম্ভব হয় নাই। এখন এই রাজ্যটিতে নররক্তের প্লাবন চলিতেছে। গত ১২ই এপ্রিল আমেরিকার 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার' পত্রিকা আল্‌জেরিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে লেখেন যে, গত ষোল মাসে আল্‌জেরিয়ায় ৫ হাজার ৭ শত জন আরব ও ফরাসী মরিয়াছে, বেসরকারী হিসাব ইহার দ্বিগুণ; এখন গায়ের জোরে আল্‌জেরিয়াকে শান্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩০।৪।৫৬

বুদ্ধ-নালন্দা

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

কালের তর্জনী না মানি' যে জ্ঞানাংকুর আজিও অমর অম্লান
অশোক-বকুল-তলে যার বেদীমূলে সহস্র প্রদীপ
নিত্য দীপ্যমান
লুণ্ঠকের কঠিন লোভ যার কাছে নতশির বারংবার
কালে কালে
বুদ্ধের পদরেণু-চন্দন-চর্চিত যার গর্বিত জ্যোতির্ভালে—
নমো নমো মর্ত্যের অলকনন্দা,
অয়ি নালন্দা!
মরুর প্রান্তর হতে আসি' পরিব্রাজক যেথায় রচিল
নন্দন-কানন
বুদ্ধের অমৃত-নামে ঘোষিল দিগ্‌বিদিকে
তমোনাশনের নিমন্ত্রণ
যার সোপানের পাদমূলে মগ্ন পথিক-তাপস
জ্যোতির্টিকা ললাটে
নিশীথেরে লজ্জা দানি' তিব্বত-তুষারে দীপংকর
জ্বালিয়েছে দীপশিখা—
নমো নমো মৃত্যুঞ্জয় অনিন্দ্যছন্দা,
অয়ি নালন্দা!

দিগন্তে পাহাড়ের চূড়া আর স্বুবর্ণ-সূর্যের ছটা যার
আশীর্বাদ যাচে
যার তপস্যার শিলাসন দেখি' রাজ-সিংহাসন তুচ্ছতার
পুচ্ছ হয়ে নাচে
চৈত্রের পত্রের মর্মরে আর আম্রমুকুলের গন্ধে মধ্যাহ্ন আত্মহারা
যার শাশ্বত স্বপ্ন তীর্থংকর কত অতীশের আজিও
রাত্রির ধ্রুবতারা—
নমো নমো বুদ্ধের মানস-নন্দা,
অয়ি নালন্দা!

ভগবান বুদ্ধ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(১)

রাত্রি গভীর। প্রাসাদ নীরব। সমগ্র পুরী নিদ্রিত। ঘুমিয়ে রয়েছে যশোধরা। বক্ষে তাঁর শিশু রাহুল। সিদ্ধার্থের চোখে নিদ্রা নেই, শয্যা যেন তাঁর কণ্টক। পালংক থেকে নেমে দাঁড়ালেন তিনি। গবাক্ষ পক্ষে বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালেন

সিদ্ধার্থ। (আপন মনে)—অন্ধকার! গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এ জগৎ। কেউ নেই যে বলতে পারে জীবনের দুঃখ শোক থেকে অব্যাহতির উপায় কি? কেউ নেই!

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন সিদ্ধার্থ। দ্বারে দ্বারে মিট মিট প্রদীপ জ্বলছে। প্রহরীরা দেওয়ালে ধাক্কা দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। সিদ্ধার্থ সকলের অবস্থা দেখতে দেখতে উদ্যানে এসে প্রবেশ করলেন। পাখীরা তখন মধ্য প্রহরের সংকেত জানিয়ে এক সংগে গেয়ে উঠল। একটা জম্বুবৃক্ষতলে বসলেন সিদ্ধার্থ। তাঁর মনে জাগতে লাগল পূর্বদিনের ঘটনা—

সিদ্ধার্থ। এ কে চন্ন? এর শির পলিত, চক্ষু জলভারাক্রান্ত, দেহ জীর্ণ।

চন্ন। যুবরাজ, এ হয়েছে এক বৃদ্ধ। এককালে এ শিশু ছিল, তারপর এল তার উন্মত্ত যৌবন। তারপর যেমনি বয়স বাড়ছে, রূপ গিয়েছে—বার্দ্ধক্য নেমে এসেছে।

সিদ্ধার্থ। এ লোকটা এমন করছে কেন চন্ন?

চন্ন। লোকটা অসুস্থ-রোগগ্রস্ত। এ অবস্থা আমাদের সকলের হতে পারে। ধনী দরিদ্র, অজ্ঞান-জ্ঞানী কেউই রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

সিদ্ধার্থ। এ চারটে লোক ঘাড়ে করে কি নিয়ে যাচ্ছে?

চন্ন। যুবরাজ, এ হচ্ছে শব, একটা লোক মরে গিয়েছে। তার মৃতদেহ আত্মীয়রা শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধার্থ। এই একটা লোকই মরেছে?

চন্ন। না, যুবরাজ, এ জগতে আরও অনেক লোক মরছে। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অনিবার্য! মৃত্যুর হাত থেকে কারো রক্ষা নেই।

সিদ্ধার্থ। তবে কেন জগতের লোক মৃত্যুকে ভুলে খেয়ে-দেয়ে নেচে-গেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে? একবারও ভাবছে না?

চিন্তাকুল সিদ্ধার্থের ধ্যানে সুপ্তি এল। এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখা দিলেন তাঁর স্বপ্নে

সিদ্ধার্থ। কে? কে আপনি?

পুরুষ। আমি শ্রমণ, যুবরাজ। জরা-রোগ-মৃত্যুর চিন্তায় আমি গৃহত্যাগ করেছি মুক্তিপথের সন্ধানে। জগতের সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়, থেকে যায় শুধু সত্য চিরন্তন। আমি অক্ষয় সুখের সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছি, তপস্যা করছি অনন্ত জীবনলাভের উদ্দেশ্যে।

সিদ্ধার্থ। শান্তিলাভ কি সম্ভব? জাগতিক সুখ-সম্ভোগের অসারতা আমাকে পীড়া দিচ্ছে—বিতৃষ্ণা এসেছে ভোগে, জীবনটাই অসহ্য মনে হচ্ছে? এর থেকে মুক্তি আছে?

পুরুষ। যেখানে উত্তাপ রয়েছে, শৈত্যের সম্ভাবনাও আছে সেখানে। যেখানে দুঃখ আছে, শান্তিও তার পাশে রয়েছে—ভোগের পথ ছেড়ে নির্বাণের পথে এসো, পরম শান্তি লাভ করবে।

সিদ্ধার্থ। আমার পিতা উপদেশ দিচ্ছেন—ভোগ কর জীবনটাকে, জাগতিক কর্তব্য কর, রাজত্ব কর, প্রজা শাসন কর, তাতে বংশের সুখ্যাতি হবে। অল্প বয়সে ধর্ম সাধনার কথা উঠতে পারে না।

পুরুষ। ধর্ম সাধনার বয়স নেই। ধর্মভাব যখনই মনে আসবে তখনই সাধনায় লেগে যেতে হবে।

সিদ্ধার্থ। তবে এই সময়, সকল বন্ধন কাটিয়ে যাবার। এই সময় সাধনার—এই সময় পূর্ণ জ্ঞানলাভের—এই সময় শ্রমণত্ব লাভের এই সময় নির্বাণের সন্ধানে বেরিয়ে যাবার।

ফিরে চললেন সিদ্ধার্থ নিজের শয়ন কক্ষে যেখানে যশোধরা শিশু-পুত্রকে বক্ষে নিয়ে শুয়ে আছে। বিদায়-বেদনায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল। চোখ ভেসে যাচ্ছিল জলে। কিন্তু তবু সংকল্প তাঁর ছিল দৃঢ়, বুদ্ধত্ব তাঁর চাই—নির্বাণ লাভ তাঁকে করতেই হবে

সারনাথের বুদ্ধমূর্তি

ফটো : সমরেন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

বুদ্ধতীর্থ বুদ্ধগয়া

ফটো : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(২)

ভিক্ষুর বেশ ধারণ করলেন সিদ্ধার্থ। মস্তক মুণ্ডিত, গৈরিক দেহবাস। রাজপোষাক পায়ের তলায় পড়ে রইল। সারথি চন্নের চোখে জল এসে গেল

সিদ্ধার্থ। চন্ন আমার জন্য দুঃখ করো না। পিতাকে বলবে, আপনার পুত্র অমৃতত্বলাভের সন্ধানে বেরিয়েছে—সে হারিয়ে যায় নি।

চন্ন। যথাদেশ যুবরাজ।

সিদ্ধার্থ। আমি আর যুবরাজ নই যে চন্ন।

চন্ন। আমার অন্তর যে সে কথা মানে না।

সিদ্ধার্থ। মানবে, সবই মানবে, মানুষের দুঃখ কষ্ট, শোক সময় সব ভুলিয়ে দেয়, আসারকে সার বলে মনে করে, ভোগে ভুলে থাকে—চরম সত্যকে দেখেও দেখতে পায় না।…কোন ভাবনা নেই চন্ন, তুমি গৃহে ফিরে যাও। মহারাজকে সান্ত্বনা দিও।

চন্ন। যথাদেশ যুবরাজ!

সিদ্ধার্থ। আবার?

চন্ন এবার কোন জবাব দিল না। রথে উঠে অশ্বের পৃষ্ঠে চাবুক বসাল তীব্র। ছুটে চলল অশ্বদ্বয়। সিদ্ধার্থ সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন না। এগিয়ে চললেন, প্রবেশ করলেন রাজগৃহ নগরে। তার পরে নদীতীরে অরণ্য মধ্যে বসলেন তপস্যায়।

ভ্রমণ করতে করতে সেখানে উপস্থিত হলেন নৃপতি বিম্বিসার সঙ্গে পারিষদ

বিম্বিসার। এ সাধনা-মগ্ন মহাপুরুষের ধ্যান ভাঙতে ভয় হয়। শাক্যকুলের প্রদীপ সংসারে বিরক্ত হয়ে এ বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছেন।

পারিষদ। মহাপুরুষের চোখ-মুখ থেকে যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে।

বিম্বিসার। হবে না? শাক্যবংশের গৌরব আজ পথে পথে ভিক্ষা করে ফিরছেন, অরণ্যে অরণ্যে তপস্যা করছেন!

সিদ্ধার্থ চোখ খুলে রাজা ও রাজপুরুষকে দেখলেন

বিম্বিসার। প্রণাম, শাক্যমুনি।

সিদ্ধার্থ। জয় হোক মহারাজের। মহারাজের যোগ্য আসন এখানে নেই। তৃণাসন—

বিম্বিসার। হাঁ, তৃণাসনেই বসছি।

সিদ্ধার্থ। সে আপনার অনুগ্রহ।

বিম্বিসার। শাক্যমুনি, আপনার হস্তে কি এ ভিক্ষাপাত্র শোভা পায়? এ হস্ত যে রাজদণ্ড ধারণের জন্য নির্মিত। রাজপুত্র চলুন, আমার প্রাসাদে গিয়ে সুখে থাকবেন, যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ একসংগে লাভ করার সাধনা করেন, তিনিই তো যথার্থ সাধক।

সিদ্ধার্থ। মহারাজ আপনার স্নেহের জন্য বিশেষ বাধিত। কিন্তু আমার প্রতি অনুকম্পা না দেখিয়ে একবার তাদের কথা ভাবুন যারা রাজ্যের দুশ্চিন্তায় অস্থির, ঐশ্বর্যের যাতনায় কাতর—যারা লব্ধ সম্পদ হারাণোর ভয়ে সর্বদা ত্রস্ত তাঁদের প্রতি করুণা করুন।

আপনি সুখে রাজত্ব করুন, আপনার প্রজা শান্তিতে বাস করুক, আমি আমার পথে চললুম, সত্যের সন্ধান আমাকে পেতেই হবে। জরা-ব্যাধি মৃত্যু মুক্তির পথ আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

বিম্বিসার। আপনি সিদ্ধিলাভ করুন, তার পর আমাদের কৃপা করবেন মুনিবর।

সিদ্ধার্থ উরুবিল্ব বনে উপস্থিত হলেন। সেখানে পাঁচজন মুণি তপস্যায় নিমগ্ন। সিদ্ধার্থের উৎসাহ জাগল,—তাঁকেও তপস্যায় নিযুক্ত হতে হবে। সিদ্ধিলাভ করতে হবে, মুক্তিলাভ করতে হবে। তিনি সেখানে তাদের সামনে তপস্যায় বসলেন। গুরুগম্ভীর নাদে উচ্চারণ করলেন নিজের দৃঢ় সংকল্প

সিদ্ধার্থ। ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু—

১ম তপস্বী। কে আপনি মুনিবর?
(পার্শ্বে তপস্বীকে ধাক্কা দিয়ে) ওরে দেখ, কে এসেছে দেখ, যেন স্বর্গ থেকে কোন দেবতা নেমে এসেছেন।

অন্যান্য তপস্বীরা চোখ মেলে তাকাল। উঠে দাঁড়াল চকিত হয়ে করজোড়ে

অপর চারজন। কে আপনি ভগবান্?

সিদ্ধার্থ। আমি ভগবান নই, আপনাদেরই মত একজন তপস্বী মাত্র।

১ম তপস্বী। সে কথনও নয়, আপনি আমাদের গুরু; আপনি যেমন তপস্যার উপদেশ দেবেন, তেমনি আমরা করব। আমরা পথ খুঁজে মরছি।

অপর চারজন। হাঁ, নিশ্চিত আমরা করব।

সিদ্ধার্থ। তবে চলুন সকলে আমরা তপস্যায় লেগে যাই; যে পর্যন্ত জন্মমৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পথ না পাব ততদিন, এ দেহ থাক আর যাক, আমরা তপস্যা করে যাব।

সকলে। হাঁ, যাব, নিশ্চিত যাব।

সিদ্ধার্থ বসলেন ধ্যানে। দিবারাত্রির জ্ঞান নেই—আহার নেই—নিদ্রা নেই। ছয় বৎসর অতীত হল এ কঠিন তপশ্চর্যায়। একদিন জম্বুবৃক্ষতলে ধ্যানে দেখলেন তিনি সেই শ্রমণ মূর্তি পুরুষ।

সিদ্ধার্থ। নমস্কার শ্রমণশ্রেষ্ঠ! আমার তো কিছু হলো না? এ ছয় বৎসরের তপশ্চর্যায় শরীর শীর্ণ জীর্ণ হয়েছে, বুদ্ধি ক্ষীণ হয়েছে, চিন্তায় দৈন্য এসেছে। অনশনে অনিদ্রায়, কঠিন তপস্যায় তো সত্যের সন্ধান পেলাম না?

শ্রমণ। এ তো ঠিক পথ নয়। খাদ্যে-পানীয়ে দেহকে সবল রাখতে হয়, বুদ্ধিকে রাখতে হয় প্রখর;—তবে তো সত্যানুভূতি হতে পারে। উঠ স্নান কর, দেহকে শীতল কর, খাও।

ধ্যান ভেঙে গেল। দুর্বল দেহটাকে কোনরকমে টেনে উঠে দাঁড়ালেন সিদ্ধার্থ। ধীরে ধীরে চললেন নদীতে সেখানে কোনরকমে স্নান করে গাছের ডাল ধরে নদীতীরে উঠলেন। কিন্তু পারলেন না দাঁড়িয়ে থাকতে। মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। গোপকন্যা নন্দা এসেছিল কলসী কক্ষে জল নিতে

নন্দা। এ কে মহাপুরুষ এখানে পড়ে? নিশ্বাস বইছে তো? মূর্ছিত হয়েছেন। একটু জল এনে দিই চোখে-মুখে।

নন্দা নদী থেকে জল এনে সিদ্ধার্থের চোখে-মুখে জল দিতেই চোখ মেলে তাকালেন তিনি

সিদ্ধার্থ। (ক্ষীণকণ্ঠে) কে তুমি? একটু জল দাও, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।

নন্দা। এই নিন প্রভু।

সিদ্ধার্থ। দুটি ভাত দিতে পারবে? আমি বড় ক্ষুধার্ত।

নন্দা। আচ্ছা, আমি নিয়ে আসছি প্রভু।

নন্দা বাড়ী গিয়ে সিদ্ধার্থের জন্য পায়স নিয়ে এল ছুটে। থালা ধরল তার সামনে। গ্রহণ করিলেন তিনি ধীরে ধীরে। ভক্তিমতী নন্দা বসে রইল তাঁর চরণতলে। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর গায়ে এল বল। তিনি ধীরে ধীরে গিয়ে বসলেন বোধিদ্রুমের তলে। আবার হল তাঁর তপস্যারম্ভ। কিন্তু কোথা থেকে তিন রূপসী তাঁর চারিদিকে আরম্ভ করল নৃত্য,—মার কন্যা মদিরা, কামনা, ও লালসা

তিন রূপসীর গান

ভুল পথে তুমি যেয়ো না।
বৃথা তপে দুখ পেয়ো না।
যৌবন যাবে চলে জানি।
পরে নাও দুদিনেরি মালাখানি
জরা আসবে যবে
কামনা ফুরাবে তবে
এবে শুধু মিছি মিছি
জ্বলে পুড়ে যেয়ো না।

সিদ্ধার্থ। চমৎকার তোমাদের গান। কিন্তু তার প্রতি আমার কোন মোহ নেই। তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হচ্ছে। তার জন্য আমার করুণা জাগছে। তোমরা এ পথ ছেড়ে, চিত্তের বিলাস ছেড়ে দিয়ে, চিত্তজয়ের তপস্যা কর।

মদিরা। না! ওর নেশা হল না।

কামনা। না! জাগল না কামনা!

লালসা। লালসাও এল না!

তিনজনে। মিছে হল ছলনা।

উঠল প্রলয়ংকর ঝড়। মার তার সমগ্র শক্তি নিয়ে সৃষ্টি করল তাণ্ডব। চমকাল বিদ্যুৎ। মেঘ গর্জনে আকাশ ভেঙে পড়ল। বোধিদ্রুম তলে সিদ্ধার্থ স্থির তপস্যায়। ক্রমে ঝড় থামল, আকাশ পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আকাশ থেকে দেবগণ মন্দার-মালা বর্ষণ করলেন। সিদ্ধার্থ ধ্যান ভেঙে উঠে বসলেন। তপুস্স ও ভল্লিক নামে দুই শ্রেষ্ঠী তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

সিদ্ধার্থ। কি চাও তোমরা?

ভল্লিক। মুনিবর, আমরা বাণিজ্যে বাহির হয়েছি, অর্থলাভ স্বর্ণলাভ যেন আমাদের হয়।

সিদ্ধার্থ। সে জিনিস আমি দিতে পারব না। আমি যা পেয়েছি, তোমাদের তাই দিতে পারি।

তপুস্স। তাই দিন প্রভু।

সিদ্ধার্থ। সে হল চারটি মহান সত্য—প্রথমটি হল—জন্ম দুঃখের,—বৃদ্ধি দুঃখের রোগ দুঃখের, মৃত্যুও দুঃখের, দ্বিতীয় হল—বাসনাই হল দুঃখের মূল কারণ। তৃতীয় হল, আত্মজয় সে বাসনাক্ষয়ের উপায়, দুঃখনাশের মন্ত্র। চতুর্থ হল নির্বাণলাভের অষ্ট মন্ত্র।—যথা, সদনুচিন্তন, সৎ সংকল্প, সদ্বাক্, সৎকর্ম, সজ্জীবিকা, সচ্চেষ্টা, সচ্চিন্তা সচ্চিত্ত।

ভল্লিক। সোনার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ যে আপনার এ জ্ঞান। আপনার উপদেশে আমাদের অজ্ঞান দূর হল।

তপুস্স। আপনাকে শত শত প্রণাম। আপনি প্রকৃত বুদ্ধ।

ভল্লিক ও তপুস্স দুজনেই প্রণাম করল বুদ্ধকে।

(ক্রমশঃ)

শেষের কবিতার লাবণ্য চরিত্র

প্রশান্তকুমার রায়

বাংলা ভাষায় রচিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপম এই উপন্যাস গ্রন্থখানি বঙ্গীয় পাঠক ও সমালোচক মহলে যতখানি উত্তেজনা, আলোড়ন ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে সম্ভবতঃ বর্ত্তমান শতাব্দীতে অন্য কোন বাংলা উপন্যাসে ততখানি দেখা দেয়নি। এই উপন্যাস আলোচনায় বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী দুই পক্ষ কেবল ভিন্ন নয়, একেবারে উল্টো মতামত প্রকাশ করে স্বপক্ষের অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। কারুর মতে এ বইয়ের যুগধর্ম্মের প্রভাববশত বুদ্ধিবাদের ঔজ্জ্বল্য বিকীর্ণিত হয়েছে ; কারুর মতে—বুদ্ধিবাদ গৌণ হয়ে প্রচণ্ড আবেগ বইখানিকে বিশেষত্বে মণ্ডিত করেছে। কেউ হয়তো বলবে, আইডিয়ার দ্বন্দ্বে গড়ে ওঠা একখানি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় অভিনব রূপক উপন্যাস হিসেবেই শেষের কবিতা সার্থক গ্রন্থ। আবার কোন আলোচক হয়তো বলবে, সামাজিক আভিজাত্যের প্রতি একটা দারুণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আলেখ্য বইখানিকে মূল্যবান করেছে, এমন কথাও শোনা যায়, পেয়ে না পাওয়ার চিরন্তন ট্র্যাজেডি 'শেষের কবিতার' শেষ কথা।

কিন্তু এইভাবে এই উপন্যাসের বিচার, সবিনয়ে বলা যায়, অন্ধের হস্তীদর্শনের মত অসম্পূর্ণ ; কেননা উল্লিখিত সমস্ত গুণগুলির মিলিত সত্তায় উপন্যাসখানি কেবলমাত্র উপন্যাসের স্তরে না থেকে কবিতার স্তরে উন্নীত হয়েছে। ভাব, ভাষা, ছন্দের অভিনবত্ব যেমন আছে, তেমনি ঘাত প্রতিঘাত সংঘাতের চমৎকৃতি আছে—ঘটনা, বর্ণনা ও পরিণাম যেমন আছে, তেমনি এসবকে মিলিয়ে মানুষের কামনা-বাসনার বর্ণসম্পৃক্ত শেষের কবিতাকে পূর্ণশ্রী করে তুলেছে। উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলি মানুষের বিচিত্র বাসনার রঙে রাঙা হয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে পরিণামে একটা মহা আত্মজিজ্ঞাসায় গিয়ে পৌচেছে। পাঠক সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে অনেক আলোচনা, সমালোচনার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বৃথাই শেষের কবিতার অন্ত খুঁজে বেড়ান ; কারণ কবিতার কোন শেষ ও স্থির রেখা নেই, রেশের মধ্যেই তার প্রাণ-পরিণাম।

আলোচ্য গ্রন্থের নায়ক অমিত রায় একটি অফুরন্ত জীবন্ত সঙ্গীত—যেন অস্থির হয়ে কেবল বেজে বেজেই চলেছে, আর বাজিয়ে তুলছে মানুষের প্রাণের বীণাকে ; সে বাজনায় তালভঙ্গ আছে—হয়তো ছেদও আছে—কিন্তু সমাপ্তি নেই। শেষের কবিতার উজ্জ্বলতম নায়িকা লাবণ্য তেমনি একটি বাজিয়ে তোলা বীণা। অমিত যদি জীবন সঙ্গীত হয়, লাবণ্য তবে জীবন বীণা। ঝঙ্কার-মুখর এ জীবন বীণার অনুরণন পাঠকের হৃদয়-তন্ত্রীতে বেজে ওঠে আর মুগ্ধ পাঠক অবাক বিস্ময়ে ভাবে এ স্পন্দনের শেষ কোথায়—এ যে শেষ হ'য়ে হয়নিকো শেষ! যে অমিটুরে একদা মেয়েদের সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করত, কিন্তু কোন বিশেষ মেয়ের প্রতি আগ্রহ দেখাত না, এবং যে অমিত রায় সময় কাটানোর জন্যে সুনীতি চাটুজ্জের দুরূহ ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করে আনন্দ উপভোগ করত, একদিন যখন সে শিলংয়ের নির্জ্জন বন-ভূমির স্নিগ্ধতায় লাবণ্যর দর্শন লাভ করল সেদিন তার সম্পূর্ণ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটে গেল মুহূর্ত্তে। এই পরিবর্ত্তন এক্সিডেণ্টের মতই একান্ত আকস্মিক, বাইরের মোটরের ধাক্কা তার অন্তস্তল পর্য্যন্ত গিয়ে যে আঘাতের যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করল সে আঘাতে গোটা মানুষটারই মন-মেজাজ গেল পাল্টে। তখন থেকে সে আর অমিটুরে নয়, একেবারে খাঁটী অমিত রায় হয়ে জেগে উঠল এবং সুনীতি চাটুজ্জের নিরস ভাষাতত্ত্বের অনুরাগী পাঠক সহসা ডজের কাব্যগ্রন্থ আস্বাদনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলে উঠল—"For god's sake hold your tongue and let me live"। শিলংয়ের নির্জ্জন বন-ভূমিতে এসে বাঁধভাঙ্গা ভালোবাসার উৎস আবিষ্কার করল অমিত আপনার মনোভূমিতে। লাবণ্যর অকস্মাৎ আবির্ভাবে অমিতর দুরন্ত প্রেম শতধারায় উচ্ছলিত হয়ে উঠল, কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতাকে সংবরণ করেছে লাবণ্য, তা না হলে অমিত রায় নিজেকে প্রতিমুহূর্ত্তে নতুন করে গড়ে তুলতে পারতো না—প্রেম-বৈচিত্র্যে ধন্য হতো না। লাবণ্য অমিত চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু—যাকে কেন্দ্র করে তার অ-মিত বাসনা কল্পনার স্বর্ণ-স্বর্গ গড়ে সেইদিকে উধাও হবার স্বপ্ন-সাধে মেতেছে। লাবণ্য মুখে যতই বলুক, ভালবাসার সৃজনী শক্তিতে অমিত তাকে মনের মত করে আরোপিত সৌন্দর্য্যে কেবলি বড় করে তুলছে ; বস্তুতঃ সে তা নয়, সে সাধারণ কিন্তু আমরা বুঝি, লাবণ্য প্রকৃতির সেই সাধারণত্বই লাবণ্যকে অসাধারণ করে তুলেছে। যা সাধারণ, যা স্বাভাবিক, যা বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে সহজভাবে মিশে আছে—মানুষ তার উপর পলেস্তারা লাগিয়ে স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক করে তুলতে চায়। তার ফলে কেতকী মিত্রকে মুখোস পরে সাজতে হয় কেটি মিটার ; মানুষের মনের কাছে কেটি মিটারদের আবেদন ক্ষণিকের—কেননা তারা কৃত্রিম, একদিন সে কৃত্রিমতা নিশ্চয়ই ধরা পড়ে। কৃত্রিমতাকে বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তারই নাম লাবণ্য অথবা কৃত্রিমতার আবরণ উন্মোচন করলে তবে লাবণ্যর পরিচয়। তাই ব্যক্তি-লাবণ্যকে নগর ও সহরের কৃত্রিম সভ্যতার বাইরে এই নির্জ্জন শিলংয়ের পাইন বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় অমিত ও পাঠকদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলেন লেখক। গ্রন্থে লাবণ্যর প্রথম আবির্ভাব লগ্নটি তাই বিশেষভাবে ভেবে দেখবার মত এবং লাবণ্যর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের কবি-মানস কল্পনার সুপ্ত পাপড়ি মেলতে সুরু করল।

এতক্ষণ লাবণ্যচরিত্র আলোচনার সময় এল। অমিত চরিত্রকে যদি তুলনা করা যায় একটি গদ্য কবিতার সঙ্গে, তবে লাবণ্যচরিত্র

নিবিড় ঘন গীতিকবিতা যা আপনার মধ্যে আপনি সংযত ও সংহত হয়ে আছে—নিটোল নিপুণ ও নিখুঁত। বেগের আবেগে গদ্য কবিতার ছুটে চলার মত বলিষ্ঠ বেগবান ও অমিত একদিন লাবণ্যকে বন্যার মত দিগন্তপ্লাবী করে তুলতে চেয়েছিল কিন্তু ব্যক্তি লাবণ্য বীর, স্থির ও ধ্রুব ; অমিতের স্পর্শে চাঞ্চল্য তার মনেও তরঙ্গ তুলেছে কিন্তু মনের পাড় ভেঙ্গে বাইরে—কথা ও কাজে—উচ্ছ্বাস হয়ে তা দেখা দেয়নি কখনো। লাবণ্য যেমন আপনার চিত্তবৃত্তিকে সংযত করে রেখেছে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও তেমনি অমিতের উচ্ছ্বাসকেও সে বলয়িত করে রেখেছে তার প্রতিদিনের ব্যবহার ও সংযমের মধ্যে দিয়ে। সহানুভূতি দিয়ে গড়া এক মমতা মাখানো চরিত্র লাবণ্যর। একদিকে সে যেমন অমিতকে কল্পনার রামধনু আঁকতে রঙের সহায়তা করেছে অন্যদিকে প্রতিশ্রুত অমিতকে তার পূর্ব্ব প্রণয়িনী কেটি মিটারের কাছে ফিরিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি ; অবশ্য অমিত যার কাছে ফিরে গেল সে আর কেটি মিটার নয়, ছিন্ন মুখোস চোখের জলে ধোয়া এনামেল মুক্ত স্বাভাবিক কেতকী মিত্র। এই স্বাভাবিককে চিনিয়েছে লাবণ্য। লাবণ্যই যেন অমিতের চোখের জল এবং সেই জলেই কেতকীর কৃত্রিমতা ধুয়ে গিয়ে সে স্বাভাবিকের পর্য্যায়ে উঠতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে যতটা সম্ভব কম করে চরিত্র বর্ণনা করেছেন, তার কারণ, তাঁর দৃষ্টি ছিল চরিত্র-গঠনে নয়, চরিত্র-সৃজনে এবং লাবণ্যর মধ্যে চরিত্র গড়ে ওঠার চেয়ে চরিত্র হয়ে ওঠার অবকাশ সবচেয়ে বেশী স্ফূর্ত্তিলাভ করেছে। তাই লাবণ্য সেই জাতীয় একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে, যাকে গড়া হয়নি বাইরের কোন উপাদানে অথচ ব্যবহারে সে বিশিষ্ট। পরিবেশ ও ঘটনা সংঘাতের চিত্রগুলির প্রতি লেখক কেবলমাত্র ইঙ্গিত করে লাবণ্যকে সামনে পাঠিয়ে তিনি আত্ম-গোপন করেছেন। যে লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিতে পাঠক লাবণ্যকে উপন্যাসের গোড়াতে দেখেছিল শেষ পর্য্যন্ত সেই অম্লানমূর্ত্তি স্পষ্ট হয়ে পাঠকের হৃদয়ে জাগরিত থাকে। গীতি কবিতার মতই একটি লাবণ্য ভাব ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম স্বরূপে।

লাবণ্যচরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে একটা প্রশ্ন সব পাঠককেই বিব্রত করে তোলে, যে প্রশ্নের উত্তর অমিতের মুখ থেকে আমরা গ্রন্থ শেষে শুনতে পাই বটে, কিন্তু তৃপ্ত হতে পারিনে—এমন কি অমিতের বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির মারপ্যাঁচ সত্ত্বেও না! সেই অতৃপ্ত-মন পাঠক অমিতকে ছেড়ে লাবণ্যকে জিজ্ঞেস করতে চায়, অমিতের সঙ্গে তার মিলনের বাধাটা ছিল কোথায়? তোমাদের মন-দেওয়া-নেওয়ার পরেও কেন বিচ্ছেদের হোমানলে আত্মাহুতি দিতে হয়? এরও ব্যাখ্যা চাই। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে, অমিতর উপর কেটির দাবী ঘোষণায় বেচারী লাবণ্য আসন্ন বিয়েটা ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু লাবণ্যচরিত্র আরেকটু বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাবো, ওর যৌবনের সূচনাতেই একটা আত্মাভিমান ও ব্যক্তিত্বের বীজ ওর মর্ম্মমূলে নিহিত ছিল এবং যখনি সেই ব্যক্তিত্বে বিন্দুমাত্র আঘাত লেগেছে তখনি তার সত্যদৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সত্যদৃষ্টি ও সত্যপ্রীতি লাবণ্যচরিত্রের আরেকটি মঙ্গলময় দিক এবং বোধহয় সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম দিক। লাবণ্যর বাবা অবনীশ দত্ত যখন প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েও কোন এক বিধবা রমণীর ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ল এবং একদিন যখন সে খবর উঠল গিয়ে লাবণ্যর কানে, লাবণ্য বিনা দ্বিধায়, এমনকি উৎসাহের সঙ্গে সৎমায়ের হাতে পিতাকে মিলিয়ে দিয়ে পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দিয়ে স্বোপার্জিত অর্থে জীবন-চালনার শপথ গ্রহণ করে অন্যত্র আপনার যোগ্য স্থান নিল। জীবন সত্যকে সে অস্বীকার করেনি অথচ তাকে অস্বীকার করতে হয়েছিল সহপাঠী শোভনলালের নিরব নিবিড় প্রেম। কিন্তু সে ততটা আত্মাভিমানের জন্যে নয়, যতটা বিদ্যানুশীলনজাত অহংভাবের জন্যে। আত্মাভিমানের জন্যে যদি হত তবে শোভনলালকে কোন কালেই তার মনে পড়তনা। অমিতের সঙ্গে মিলনের শেষ সন্ধ্যায় সেই বিদায় বাণীর মধ্যেও শোভনলালের স্মৃতি লাবণ্যের বুকে জেগে উঠেছিল এবং সে স্মৃতি-সত্যকে অমিতের কাছে সে গোপন করেনি কখনো। সবচেয়ে বড় কথা অমিতকে সে ছলনা করে ভোলাতে চেষ্টা করেনি। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা অটুট রাখতে যতখানি ব্যক্তিত্বের দরকার লাবণ্যে তা পূর্ণমাত্রায় ছিল। আর ছিল বলেই যোগমায়ার ঘটকালীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েও লাবণ্যকে ভেবে দেখতে হয়েছে অমিতর রুচি প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিকে যে প্রকৃতির কাছে নিজেকে ছোট বলে বারংবার মনে হয়েছে লাবণ্যর। যে স্বপ্ন নিয়ে অমিতর কল্পরাজ্য সৃষ্টি, যে সৃষ্টিতে সে নিত্য নতুন হয়ে ওঠে অমিতর জীবনে, সে স্বপ্ন গড়াই সত্য, তাকে বিবাহের বাঁধাধরা প্রাত্যহিক স্পর্শের মধ্য দিয়ে ম্লান করে দিতে পারল না লাবণ্য। তার ব্যক্তিত্ব তার প্রিয় কবি রবিঠাকুরকে স্বীকার করে বটে কিন্তু তাকে অন্যের উপরে জুলুম করে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়না ; আপনার রুচির উপরে অন্যের জুলুমও সে মানতে রাজী নয়। তবে অমিতের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অতলান্ত প্রেমের সম্মুখীন হয়ে অনেকবার তাকে হার মানতে হয়েছে ইচ্ছে করে বুঝেসুঝেই। এই নমনীয়তা লাবণ্যকে শাশ্বত নারীর কমনীয়তায় ভরে দিয়েছে। এই হারমানার মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে তা দিগন্তবিস্তৃত অসীম এবং এই হারমানার পরে লাবণ্যের পক্ষে একথা বলা যেন সহজ হয়ে আসে 'আমি তোমার, অনন্ত কালের জন্যে আমি তোমার'। একদিন যখন কেটি মিটার তার আত্মাভিমানে আঘাত করল সেদিন তার বাইরের দিকে দৃষ্টি চালনা করবার সুযোগ এল ; সেই সুযোগেই অমিতকে সে নতুন করে আরেকবার আবিষ্কার করল যেন ; যে আত্মাভিমান ও সত্যদৃষ্টি প্রত্যহের মেলামেশায় স্বার্থপরতায় একটু কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল আবার তা জাগরিত হল ; আবার ব্যক্তিত্ব এসে লাবণ্যের হাত ধরে সত্যের পথে পরিচালিত করল। কেটির চোখের জলে দুটো কাজ হয়েছে, একদিকে সে হৃদয়কে মেলে দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠল অন্যদিকে ঐ চোখের জলে লাবণ্যর সত্যদৃষ্টির উপরে যে কুয়াশা নেমে আসছিল তা ধুয়ে মুছে অপসারিত হল। দৃষ্টি ফিরে পেল লাবণ্য। নতুন করে বুঝল সে প্রেমের মর্য্যাদা। তার নারী হৃদয় আরেকটি বঞ্চিত হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করল। অমিতর সঙ্গে যে অদৃশ্য হৃদয় বন্ধন গড়ে তুলছিল সেই বন্ধনকে স্থায়ী করবার জন্যেই যেন সে অমিতর প্রাত্যহিক স্পর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে তার জীবনে বেদনার গীতিমাল্য রেখে গেল। সেই গীতিমাল্যের গন্ধে পাঠকের মুগ্ধমতি মন বলে ওঠে,—

> "Our sweetest songs are those
> that tell a saddest though,"

শেষ অঙ্কের 'saddest thought' কখনোই 'Sweetest' হতোনা যদি প্রেমের লিপিতে লাবণ্য তার স্বীকৃতি না দিয়ে যেত,—

> 'তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান
> গ্রহণ করেছ যতো ঋণী ততো করেছ আমায়,
> হে বন্ধু, বিদায়।"

প্রেম যখন পরস্পরকে ঋণী করে তোলে তখনই তার মর্য্যাদা ও স্থায়িত্ব।

ধম্মপদের ধর্ম

কমলানন্দ

বৌদ্ধদের গীতা ধম্মপদ। সকল শাস্ত্রের সার যেমন গীতায় সন্নিহিত, তেমনি তথাগত বুদ্ধ সকল ধর্মের মূল নীতি ধম্মপদে নিবদ্ধ করে গিয়েছেন। ধম্মপদের উপদেশ ও নীতি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, তথা মানব সমাজের প্রত্যেকের পালনীয়। এ বিশ্বজনীন উপদেশ সর্বদেশের মানুষকে মহামুক্তির সন্ধান দিয়েছে।

বৌদ্ধশাস্ত্র 'সুত্তপিটকে'র অন্তর্গত ধম্মপদ গ্রন্থ। ধম্মপদের ধর্ম শব্দের অর্থ কি এ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ বর্তমান। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু বলেছেন, "বৌদ্ধগ্রন্থে ধর্ম শব্দের বিভিন্ন প্রকার অর্থ দৃষ্ট হয়। ধর্ম শব্দে অনেক স্থলে পদার্থ মাত্রকেই বুঝায়,...অপর মতে ধর্ম অর্থে কর্ম অর্থাৎ সৎ বা অসৎ কার্যকে বুঝায়।...কেহ কেহ বলেন, ধর্ম অর্থে মনের ভাব বা অবস্থাকে বুঝায়......সাধারণতঃ ধর্ম শব্দের চারি প্রকার অর্থ দৃষ্ট হয়, গুণ, দেসনা, পরিয়ত্তি ও নিসত্ত।...বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন স্কন্ধের সাধারণ নাম ধর্ম।" 'ধর্ম' শব্দের অর্থ যাই হোক, এ প্রবন্ধে ধর্ম বলতে নীতি-ধর্মকেই ধরে নেওয়া হবে।

২৬টি বগ্‌গ বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হয়েছে ধম্মপদ। বিখ্যাত বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধ ঘোষ বলেছেন—

> যমকং অপ্পমদং চিত্তং পুপ্‌ফং বালেন পণ্ডিতং
> অরহন্তং সহস্‌ সেন পাপং দণ্ডেন তে দশ ॥
> জরা অত্তা চ লোকো চ বুদ্ধং সুখং পিয়েন চ।
> কোধং মলয়ঞ্চ ধম্মট্‌ঠং মগগ বগ্‌গেন বীমসতি ॥
> পকিন্নং নিরয়ং নাগো তনহং ভিক্‌খু চ ব্রাহ্মণো।
> এ তে ছব্বসতী বগ্‌গা দেসিতা দিচ্চ বন্ধু না ॥

অর্থাৎ যমক, অপ্পমাদ, চিত্ত, পুপ্‌ফ, বাল, পণ্ডিত, অরহন্ত, সহস্‌স, পাপ, দণ্ড, জরা, অত্তা, লোক, বুদ্ধ, সুখ, পিয়, কোধ, মল, ধম্মট্‌ঠ, মগ্‌গ, পকিন্ন, নিরয়, নাগ, তণহা, ভিক্‌খু, ব্রাহ্মণ,—এই ছাব্বিশটি অধ্যায়ে ভগবান বুদ্ধের নীতি-উপদেশ নিহিত।

যমক বগ্‌গে বুদ্ধ অন্তঃকরণ শুদ্ধির উপদেশ দিয়েছেন। মনের নির্মলতার উপর নির্ভর করে চিত্তের শান্তি। নির্মলান্তঃকরণ ব্যক্তিকে সুখ ছায়ার মত অনুসরণ করে। চিত্তকে কিভাবে বৈরভাব-মুক্ত করা যায়, তার উপায় বলা হয়েছে—

> অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,
> যে তং ন উপনয্‌হন্তি বেরং তেসুপসম্মতি।
> নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
> অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্ম সনন্তন ॥
> পরে চ ন বিজানন্তি, ময়মেত্থ সমামসে।
> যে চ তত্থ বিজানন্তি, তত সম্মন্তি মেধগা'॥

তিরস্কার, প্রহার, পরাজয়, অপহরণ দুশ্চিন্তা যাদের মনে স্থান পায় না, তাদের বৈরভাব কেটে যায়। বৈরভাবের দ্বারা বৈরভাবের নিরসন হয় না, অবৈরভাবের দ্বারাই তাকে জয় করা যায়। এই সনাতন ধর্ম্ম। মূর্খ মানুষ জানে না এ-সংসার দুদিনের। যাঁরা জানেন, তাঁদের সকল কলহ মিটে যায়।

অপ্পমাদ বগ্‌গে তথাগত অমৃতের সন্ধান দিয়েছেন—কি করে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। অপ্রমাদ অমৃতের পথ, মৃত্যুর পথ হল প্রমাদ। অপ্রমত্ত ব্যক্তি অমর, প্রমত্ত ব্যক্তি তো মৃত।

> অপ্পমাদ অমত পদং পমাদো মুচ্চনো পদং।
> অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা ॥

তাই ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন, কখনও প্রমাদের অনুসরণ করবে না, কাম-রতি-সম্ভোগে মজবে না, কারণ অপ্রমত্ত ব্যক্তি বিপুল সুখের অধিকারী হয়।

> মা পমাদ মনুযুঞ্জেথ মা কামরতি সন্থবং।
> অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং ॥

চিত্ত বগ্‌গে আবার চিত্তশুদ্ধির উপায় রয়েছে। চিত্তশুদ্ধি চিত্তসংযমের দ্বারাই সম্ভব। দুর্নিগ্রহ, লঘু, যথাকাম বিহার দমন করাই শ্রেষ্ঠ। একমাত্র সংযত চিত্তই সুখের মূল।

পুপ্‌ফ, বাল, পণ্ডিত, অরহন্ত, সহস্স পাপ, দণ্ড, জরা, অত্ত ও লোকবগ্‌গে তেমনি মনুষ্য জীবনকে সার্থক করে তোলার পথ প্রদর্শিত হয়েছে। বুদ্ধবগ্‌গে ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের সন্ধান দিয়েছেন। ক্ষান্তি-তিতিক্ষাই পরম তপস্যা, নির্বাণ সর্বশ্রেষ্ঠ গতি। পরঘাতী প্রব্রজিত হতে পারে না, পরপীড়নকারীরা শ্রমণ হতে পারে না, নিন্দা করবে না কারও; প্রহার করবে না কাকেও, প্রাতিমোক্ষে (নির্দিষ্ট শীলে) চিত্তকে ব্যাপৃত রাখবে, অন্তরে মিতাচারী হবে, নির্জনে বাস করবে, মনকে সমাধিতে মগ্ন রাখবে—এ হল বুদ্ধগণের নির্দেশ।

> খন্তী পরমং তপো তিতিক্‌খা
> নিব্বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,
> নহি পব্বজিত পরূপঘাতী,
> সমনো হোতি পরং চিহেঠ যন্তো।
> অনুপবাদ অনুপঘাতো, পাতিমোকেখ চ সংবর,
> মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্থঞ্চ সয়নাসনং।
> অধিচিত্তে চ অযোগো এত্তং বুদ্ধান সাসনং॥

সুখবগ্‌গে আছে সুখপ্রাপ্তির সন্ধান। যার রাগ দ্বেষ বৈর নেই সেই সুখী। যে জয়ী তার বৈরী অসংখ্য। পরাজিত ব্যক্তির অন্তর্দাহ কত? তাই উপসান্ত ব্যক্তি জয়-পরাজয়ের ঊর্দ্ধে সুখে বিহার করেন। রাগের মত আগুন নেই, দ্বেষের মত নেই পাপ, পঞ্চস্কন্ধতুল্য নেই দুঃখ, নির্বাণের চেয়ে নেই বড় সুখ! লোভ হল সব চেয়ে বড় রোগ, সংস্কার হ'ল পরম দুঃখ, একথা জেনে পণ্ডিত ব্যক্তি নির্ব্বাণ সুখ লাভ করেন।

> জয়ং বেবং পস্‌বতি দুক্‌খং মেতি পরাজিতা,
> উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয় পরাজয়ং।
> নত্থি রাগ সম আগ্‌গি; নাত্থি দোস সম কলি,
> নত্থি খন্দা দিশা দুক্‌খা, নত্থি সন্তি পরং সুখং॥
> জিগচ্ছা পরমা রোগা, সঙ্খারা পরমা দুখা,
> এতং ঞত্বা যথা ভুত্তং নির্ব্বাণং পরমং সুখম্।

পিয় বগ্‌গে, কাম-মোহ-রতি থেকে কি রকম বন্ধন দুঃখ উৎপন্ন হয় তা বলা হয়েছে।

> কামতো জায়তে সোকো কামতো জায়তে ভয়ং,
> কামতো সিপ্পমুক্তস্স নত্থি বোকো কুতো ভয়ং।

কোধ বগ্‌গে ক্রোধ জয়ের উপায় বলা হয়েছে। পরিস্ফুট করা হয়েছে ক্রোধে কি রকম সংসার জ্বলে যায়॥

মল বগ্‌গে মেলে আবিলতা থেকে মুক্তির উপায়।

স্ত্রীলোকের আবিলতা দুশ্চরিত্রতা, অহংকার দাতার মনের ময়লা, পাপকার্য ইহকাল পরকালের ময়লা, এদের চেয়েও নিকৃষ্টতর আবিলতা অবিদ্যা, এ আবিলতা বর্জন করে ভিক্ষুগণকে তিনি নির্মল হতে বলেছেন।

> মলিত্থিয়া দুচ্চরিতং মচ্ছেরং দদতো মনং।
> মলা বে পাপকা ধম্মাঅস্মিং লোকে পরম্হি চ॥
> ততো মলা পরতরং অবিজ্জা পরমং মলং,
> এতং মলং পহত্বান নিম্মলা হোথ ভিক্‌খবো॥

ধম্মট্‌ঠ বগ্‌গের উপদেশ বড় মনোরম। ধাম্মিকের লক্ষণ সেখানে বলা হয়েছে। সমালোচনার সুর তার মধ্যে স্পষ্ট। ভগবান বলেছেন—

> ন তাবতা ধম্মধরো যাবতা বহু ভাসতি
> যো চ অপ্পম্পি সুত্বান ধম্মং কায়েন পস্সতি।
>
> স বে ধম্মধরো হোতি যো ধম্মং নপ্পমজ্জতি॥

যে বহু ধর্ম্মকথা বলে বেড়ায়, তার ধর্ম্ম হয় না, কিন্তু যিনি অল্পমাত্র ধর্ম্মকথা শুনে জীবনে তায় প্রতিপালন করেন, তিনিই ধম্মধর হন, ধর্ম্ম থেকে তাঁর চ্যুতি হয় না।

যে কেবল ভিক্ষা করে বেড়ায় সেই ভিক্ষু হতে পারে না, সম্পর্কের অনুষ্ঠান না করে শুধু ভিক্ষা দ্বারা কেউ কখনও ভিক্ষু হয় না।

> ন তেন ভিক্‌খু হোতি যাবতা ভিক্‌খতে পরে,
> বিস্মং ধম্মং সমাদায় ভিক্‌খু হোতি ন তাবতা।

প্রাণিহিংসাকারী আর্য হতে পারে না। সর্বপ্রাণীতে অহিংসা দ্বারা লোকে আর্যত্ব প্রাপ্ত হয়!

> ন তেন অরিয়ো হোতি যেন পাণানি হিংসতি।
> অহিংসা সব্বপাণানাং অরিয়ো তি পচুচ্চতি॥

মগ্‌গ বগ্‌গ বিশুদ্ধ মার্গের দিশারী। পকিন্নক বগ্‌গে সাধু মহিমা কীর্তিত হয়েছে। নিরয়বগ্‌গে মনুষ্যের অকর্ত্তব্য কি তা বলা হয়েছে। সাবধান করে দেওয়া হয়েছে পাপকার্য সম্বন্ধে—যাতে নরক গমন অবশ্যম্ভাবী। পরদার-

সেবী প্রমত্ত ব্যক্তি, অপুণ্য, অনিদ্রা, নিন্দা ও নরক এ চার প্রকার কষ্ট ভোগ করে। হীন গতি প্রাপ্ত হয় সে। ভীতা প্রণয়িনীর সহিত ভীত প্রণয়ীর রতি ক্ষণস্থায়ী। তার উপর রয়েছে রাজদণ্ডের ভয়। অতএব পরদারগমন মনুষ্য-মাত্রের অকর্তব্য।

চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো
আপজ্জতী পরদারূপসেবী
আপুঞ্ঞলাভং ন নিকাম সের্য্যং
নিন্দুং তৃতীয়ং নিরয়ং চতুত্থং।
অপুঞ্ঞলাভো চ গাতী চ পাপিকা,
ভীতস্ম ভীতায় রতী চ থোকিকা,
রাজা চ দণ্ডং গরুকং পণেতি,
তস্মা নরো পরদারং ন সেবে॥

নাগবগ্গে রয়েছে সহিষ্ণুতার অমৃত উপদেশ। সংসারে দুর্জ্জনের অন্ত নেই। হিংসা-নিন্দা কটুকথা চারিদিকে তীরের মত ছুটে আসছে। মানুষকে সেখানে যুদ্ধ হস্তীর মত সহিষ্ণু হতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে নাগরাজ যেমন প্রক্ষিপ্ত তীর অকাতরে সহ্য করে, সংসারে তেমনি দুর্জ্জনের কঠিন বাক্য ধীরতার সঙ্গে সহ্য করে যেতে হবে।

অহং নাগো ব সংগামে চাপতো পতিতং সরং
অতিবাক্যং তিতিক্‌খিস্সং দুস্সীলো হি বহুজ্জনো।

মূর্খ লোকের সঙ্গে বাস করার চেয়ে একা থাকা ভাল। একাকী থেকে অপাপ হয়ে মাতঙ্গ হস্তীর মত অল্পোৎসুক হয়ে বাস করবে।

একস্স চরিতং সে য্যো
ন হত্থি বালে সহায়িতা,
একো চরে ন চ পাপানি কয়িরা।
অপ্পোস্সুক্কো মাতঙ্গহরঞ্ঞেংব নাগো।

তণহাবগ্গে তৃষ্ণাই যে মনুষ্যের জন্ম মৃত্যু বন্ধনে রেখে দিয়েছে একথা বুঝান হয়েছে। তৃষ্ণাকে দূর করার উদ্দেশ্যে আকাংক্ষা করবে বৈরাগ্যকে।

তসিনায় পুরক্‌খতা পজা
পরিসপ্পন্তি সসো ব বাধিত,
তস্মা তসিনং বিনোদয়ে,
ভিক্‌খু-অকঙ্খী বিরাগং অত্তনো।

ভিক্‌খুবগ্গে ও ব্রাহ্মণবগ্গে মনুষ্য কি ভাবে ভববন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারে সে পথের নিশানা মেলে। এ দেহ নৌকা মিথ্যা বিতর্ক জল সেঁচে ফেলে দিয়ে লঘু করতে হবে, রাগদ্বেষাদি বন্ধন ছিন্ন করলে তবে নির্বাণ লাভ হবে।

সিঞ্চ ভিক্‌খু ইমং নাচং সিত্তাতে লহুমেস্সতি
ছেত্বা-রাগঞ্চ দোসঞ্চ তো নিব্বাণমেহিসি॥

বাসনানিরসনের উপদেশ ধম্মপদের প্রায় প্রতি অধ্যায়েই দিয়েছেন তথাগত। মানুষের কি কর্তব্য কি অকর্তব্য তা যুক্তিতর্ক ও কাব্যের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেছেন ভগবান্। পাপ কি পুণ্য কি, পুনর্জন্মের হেতু কি, নির্বাণের উপায় কি, বাসনা বিনাশ করে কি ভাবে মানুষ মুক্তি পেতে পারে ধম্মপদে তা নিহিত আছে। তা'ছাড়া প্রতিটি অধ্যায় নীতিধর্মের উপদেশে পরিপূর্ণ। কি ভাবে মানুষ বৈরীভাব, হিংসাদ্বেষভাব থেকে মুক্ত হতে পারে সে উপদেশের মূল্য, এ হিংসা-উন্মত্ত পৃথিবীতে আজ কেউ-ই অস্বীকার করতে পারবেন না। অহিংসা মন্ত্রের উত্তর-অধিকারী ভারত তথা এশিয়ার দায়িত্ব তথাগত বুদ্ধের বিশ্বজনীন নীতিধর্মের বাণী সারা পৃথিবীতে বিঘোষিত করা। এ দায়িত্ব পালনে ভারত নিশ্চেত পিছিয়ে পড়বে না।

শান্তির অন্তরায়

চিত্রাঙ্গদা

সুখ-শান্তির অন্তরায় অস্বাস্থ্য। অসুস্থ নারী-পুরুষ সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারে না। কথাটা আপনাদের মনঃপূত হচ্ছে না, কিন্তু ভালভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, সাংসারিক অশান্তির শতকরা ৯৫ ভাগের মূলকারণ অস্বাস্থ্য। ভাবছেন তা নয়। ভাবছেন, আমি যদি স্বামী সোহাগ পেতুম, তবে হাজার অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি সুখী হতুম। আপনি যে স্বামী-সোহাগ পাচ্ছেন না, তার মূলেও রয়েছে সেই অস্বাস্থ্য—স্বামীর অস্বাস্থ্য। কর্তাকে বলে দিয়েছিলেন, আফিস্ কিংবা দোকান থেকে ফেরার পথে আপনার জন্যে একটুকরো ব্লাউজের কাপড় কিনে আনতে। কর্তার জানেন বদহজমের রোগ আছে, বেশী খেতে পারেন না। তারপর কাজের চাপ, বিকালে তার শরীর ঝিমিয়ে আসছে, সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার পথে তার কাপড় কিনে আনার কথা মনে নেই। বাড়ী ফিরে আসার পর আপনি যেই শুনলেন তিনি কাপড় আনেন নি—আপনার গলায় অনুযোগের সুর বেজে উঠল—আমি যা আনতে বলি তাই মনে থাকে না। অমনি কর্তারও গেল মেজাজ গরম হয়ে। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে কোথায় একটু চা খাবেন, না গটমট করে বাইরে চলে গেলেন। এই যে কাপড় আসে নি শুনেই আপনার মেজাজ বিগড়ে গেল, আর কর্তার মেজাজ সপ্তমে চড়ল তার কারণ হচ্ছে আপনাদের দুজনের শারীরিক অস্বাস্থ্য। যদি আপনাদের শরীর সুস্থ-সবল হ'ত তাহলে, কর্তা ভুলে একটা জিনিস না আনলেও আপনার তত রাগ হত না, কর্তার ভুলটা আপনি সহ্য করতে পারতেন। আর ওদিকে কর্তারও যদি শরীর সুস্থ-সবল থাকত বিকাল-বেলা কাজের শেষে তিনি তেমন ক্লান্তিবোধ করতেন না। আপনার আদেশমত তিনি সব কিছু কিনে নিয়ে আসতেন। আপনি ভাবছেন—না? আমাদের দুজনের কারোরই ত কোন রোগ নেই? রোগ না থাক, ভাল কথা। কিন্তু আপনারা দুজনেই সুস্থ সবল একথা বলতে পারেন না।

বলছেন, 'সুস্থ সবল হব কি করে?' তেমন খেতে পাই কোথায়? শুধু ডাল আর ভাত—ঝোলে তরকারিতে মাছ সে তো মসলার সামিল। এমন খেয়ে-দেয়ে সবল হওয়া যায়? নিশ্চিতই যায়। এমন সব সস্তা তরিতরকারী রয়েছে যার পুষ্টি-ক্ষমতা যথেষ্ট। যেমন ধরুন ডুমুর, কেটে কুটে রান্না করবার ঝঞ্ঝাট—তাই আপনি ডুমুর দুই চোখে দেখতে পারেন না। হিসাব করে চললে কম খরচে খুব পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়। কিন্তু আপনাদের সমস্যা তো পুষ্টিকর খাদ্যের নয়। আপনাদের সমস্যা হচ্ছে হজমের। হজম হবে কিসে? সেই যে বিয়ের আগে 'স্কিপিং'এর দড়ি ছেড়েছেন সে আর কখনও ধরে দেখেছেন। সে না হয় নাই ধরলেন, কিন্তু অন্য কোনও রকম ব্যায়ামের কথা কি কখনও ভাবেন? বলছেন—'ব্যায়াম? এই বয়সে ব্যায়াম?' এই তো আসল রোগ, ব্যায়ামের প্রতি অশ্রদ্ধার ফলেই আপনিও পূর্ণ সুস্থ নন,—আপনার কর্তাও নন। কর্তা ভাবছেন যা খাটেন তাতেই ব্যায়াম হয়ে যাচ্ছে, আপনিও ঠিক তাই ভাবছেন। কিন্তু আসলে এ ফাঁকি! সংসারের খাটুনিতে পরিশ্রম হয়, অবসাদ আসে, কিন্তু ব্যায়ামে আসে শক্তি—আসে স্বাস্থ্য—স্থির হয় যৌবন। ব্যায়াম করা দূরে থাক্, একটু বেড়ানোর অভ্যাস পর্যন্ত নেই। আপনাদের বেড়ানো মানে কোন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা,—আর তাঁদের সিঙ্গাড়া নিমকি ধ্বংস করে পেটে অম্বল সৃষ্টি করে বাড়ী ফিরে আসা। একটিবার ময়দানে গিয়ে জোরে হেটে আসতে পারেন না ছেলেমেয়েদের নিয়ে? ওদের মনটা খুশি হত্তো। না

পারেন, তবে ঘরের কোণেই মুক্তহস্তে ব্যায়াম করুন। আপনার কর্তাকে করতে বলুন। যদি না পারেন ত' অশান্তি ভোগ করুন।

ব্যায়াম শরীরকে সুস্থ করে, শরীর সুস্থ সবল হলে মন সবল হয়, তার সহনশক্তি বাড়ে, সংসারের ছোটখাটো খিটিমিটি সকল মনে বিকার সৃষ্টি করতে পারে না। সংসারিক শান্তি বজায় থাকে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—আপনাদের গৃহ-শান্তির অন্তরায় ব্যায়ামে উপেক্ষা।

—

বাংলার মেয়ের দৃষ্টিতে বাংলার সমস্যা

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

আজকের দিনে বাংলার সমস্যা দুইটি। প্রথমতঃ ক্রমবর্ধমান বাঙালী জনসংখ্যার অন্ন-সংস্থান। দ্বিতীয়তঃ তার ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির অনুকূল ব্যবস্থা। এই দুইটি সমস্যা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুষ্ঠুরূপে জীবন-যাত্রা নির্বাহ না করতে পারলে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্ন আদৌ ওঠে না। বস্তুতঃ মানুষ তখন জান্তব পর্যায়ের উচ্চে উঠতে পারে না এবং কোনও জ্ঞান বা রসের স্তরে পৌছানোও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাষার ব্যবহার তখন নিতান্তই কাজ চালানোর জন্যই চলে—তাকে আর শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয় না। প্রাণগত স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে যেমন মানসিক বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অসম্ভব—তেমনই আবার এইরূপ উৎকর্ষ আমাদের জীবন নির্বাহের প্রয়োজনেও লাগে। জাতির আর্থিক ও সামাজিক সমৃদ্ধির পরিপাটি ব্যবস্থার জন্য যেমন চাই প্রাকৃতিক সম্পদ ও জাতির কর্ম-কুশলতা তেমনই আবার এই দুইটিকেই সুচারুরূপে ব্যবহারে লাগাতে প্রয়োজন হয় তার জ্ঞান, নীতি ও রসানুভূতি যা তার সংস্কৃতির অন্তর্গত ব্যাপার, যেমন বিজ্ঞান, কাব্য ও দর্শনের চর্চা সে-দেশে হ'তে পারে না যে-দেশে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা অত্যল্প যেমন কোনও মরুভূমির দেশে। তেমনি আবার অনেক কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দৈহিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের অভাবে এবং জাতিগত প্রীতি ও ঐক্যবোধের অভাবে সেই দেশের মানুষের জীবন-যাত্রা-নির্বাহ তেমন সুন্দরভাবে হয় না। সেখানে প্রাচুর্যের বদলে দৈন্যই এসে পড়ে। এই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্যণীয় যে ঐক্যবোধ ও প্রীতির জন্য প্রয়োজন কেবল নীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের সম্যক জ্ঞানই নয়—বরং ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচুর্যও বটে। বর্তমানে একটি জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনের জন্য যেমন প্রয়োজন তার ভৌগোলিক ও দৈহিক সঙ্গতি, তার চেয়ে তেমনই বেশী প্রয়োজন তার সংস্কৃতি-গত মূলধন।

এখন দেখতে হবে আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী তার জীবন-ধারণের সমস্যা কতোখানি সমাধান করতে পারে। বাংলার জন-সংখ্যার অতি অল্পাংশই চাষ-বাস করে খায়। প্রথমতঃ বলা যায় চাষীদের অবস্থা আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো। সেচ, সার এবং কৃষি-সরঞ্জামের উন্নততর ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট থেকে হচ্ছে। কিন্তু বাকী জন-সংখ্যার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কি? বাঙালী কঠিন কাজ যেমন—সৈন্য, পুলিস, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, কাগজওলা, তুলোওলা, শিল-কাটানেওলা, ফেরীওলা, মুদী, ঝাড়ুদার, মুচী, কুলী-মজুর, মোটর, রিক্শা বা ঠেলা-চালক—কাজগুলি হাতের মুঠোয় রাখতে পারেনি—এই কাজগুলির সঙ্গে ঘুঁটেওলার কাজটিও তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। সুতরাং বাংলাদেশে এইসব কাজ করে অন্ন-সংস্থান করে বাংলার বাহিরেরই লোকেরা। বাঙালী অনেক সময় এটি লক্ষ্য করে মনে করে যে তার দেশ হ'তে অপরে ধন লুঠে নিয়ে যাচ্ছে বাঙালীকে বুভুক্ষিত রেখে। কিন্তু এটা মস্ত ভুল। কারণ কেউ কারুর মুখ দেখে পয়সা দেয় না। প্রত্যেকেই তার গুণের জোরেই রোজগার করে। যে-কাজ আমি পারবো না বা করবো না, সে-কাজ অপরে যদি ভালোভাবে সম্পন্ন করে আমার চেয়ে বেশী রোজগার করে—তাতে আমার বলবার কিছুই থাকে না। বললে সেটা হিংসারই দ্যোতক হয়ে দাঁড়ায়। কোন দেশই কারুর মৌরুসী নয়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে কোন প্রদেশই কোনও এক বিশেষ ভাষা-ভাষীর এক চেটে নয়। ভারতীয় সংবিধানে ভারতবর্ষ ভারতবাসীর। ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতির জন্য এই

সূত্রই মানতে হবে যে যোগ্যতা অনুসারেই কাজ দিতে হবে। কোনরূপ কৃত্রিম ব্যবস্থা করে যোগ্যকে ঠেকিয়ে অযোগ্যকে কাজ দিলে ভারতবর্ষের কার্য-তৎপরতা ব্যাহত হবে। কোনরূপ প্রদেশ, জাতি বা ধর্মগত দলাদলি এই দিক হ'তে ক্ষতিকর। যাই হোক বাঙালী তার দৈহিক গঠনের জন্যই হোক বা মানসিক রুচির জন্যই হোক— কোনও কারণে কিছু-ধরণের কাজ করতে একরকম অনিচ্ছুক বলতে হবে এবং ঐ সব কাজের সম্পূর্ণ যোগ্যতাও তার নেই। অথচ ঐ সব কাজ করে এক বৃহৎ জন-সংখ্যার অন্ন-সংস্থান হ'তে পারতো।

এখন বাকী রইলো চাকুরী, বৃত্তি (ডাক্তারী, ওকালতি ইত্যাদি) ও ব্যবসা। ব্যবসাতেও বাঙালী তেমন সুবিধা করে উঠতে পারছে না—সে যোগ্যতা তার থাকলে কোলকাতার এই বিরাট ব্যবসার ক্ষেত্র আজ অবাঙালীর হাতে চলে যেতো না। এখানেও আমাদের ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীর দ্বারাই দেখতে হবে। কোনরূপ সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ করলে কোন ফলই হবে না। বরং তাতে করে অপরের গুণটি কি তা লক্ষ্য করতে অপারগ হয়ে এবং সেই গুণটি আপনার মধ্যে অনুকরণ করার চেষ্টা না করে, আমরা অহেতুক নিজেদের বিক্ষুব্ধ করে তুলবো। এটা কাজের কথাই নয়। ব্যবসার পরে এখন অবশিষ্ট রইলো চাকুরী এবং বৃত্তি। বাঙালী প্রধানতঃ চাকুরীজীবী। অবশ্য বাঙালী জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ কয়েকটি বৃত্তি দ্বারা মোটামুটি ভালোভাবেই জীবন-নির্বাহ করছেন। বাঙালী ডাক্তার, উকীল ও শিক্ষক বাংলার বাইরেও নানা স্থানে থেকে অন্ন-সংস্থান করেন। কিন্তু বাঙালীর অধিকাংশই চাকুরীজীবী বা চাকুরীপ্রার্থী। এই চাকুরী অর্থে কেরাণীর চাকুরী বুঝতে হবে। কারণ সরকারী শাসন সম্বন্ধীয় চাকুরী করেন যাঁরা, তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। এখন প্রশ্ন—এতো কেরাণীর চাকুরী কোথা হ'তে আসবে ?

বাংলা-দেশে শিল্প খুবই প্রসার-লাভ করেচে এবং কেরাণীর চাকুরী অন্য দেশ অপেক্ষা এখানেই বেশী, সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হ'লেও যে দেশের অনেক জনসংখ্যাই এইরূপ নির্ঝঞ্ঝাট মস্তিষ্ক চালনার কাজ খোঁজে সে দেশে কার্যাভাব নিদারুণভাবে দেখা দেবেই। একটি কারখানার প্রতি একশো কুলী পিছু একটি কেরাণীর প্রয়োজন। সুতরাং যে দেশের মধ্যে কুলীর কাজ করবার লোক নেই—কেবল কেরাণীর কাজেরই প্রার্থী সকলেই, সেখানে কতো কারখানাই বা খোলা যায় ? আর প্রত্যেককে চাকুরী দিতে হলে বাইরে হতে এতো মজুর আনতে হয় যে, দেশের জনসংখ্যা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। মোটকথা বাঙালী যদি সকলেই কেবল একই ধরণের কাজ চায় তাহলে নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সকলেই যদি ওপরতলার লোক ("ভদ্রলোক") হয়ে থাকতে চায়— তাহলে নীচের তলার জন্য বাইরের লোক আমদানী করতেই হবে এবং তাদের ভরণ-পোষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা এমন কি সামাজিক ও সংস্কৃতিগত সুবিধা দিতেই হবে। ফলতঃ দেশ কোনও এক বিশেষ ভাষা-ভাষীর থাকতে পারে না। বাঙালীকে আজ তার নিজের দৈহিক এবং মানসিক গঠনের পরিণাম স্বরূপ নিজের দেশেই একরকম পরবাসী হ'তে হবে। এতে আক্ষেপ করার তার ন্যায়তঃ কোনও কারণ নেই। তবে ভাববার কথা এই যে এতো করেও বাঙালীর এক বৃহৎ অংশের কর্ম-সংস্থান হওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেচে। বাংলার বাইরে কিছু কিছু কর্ম-সংস্থান হ'তে পারে এবং এর আগেও হয়েচে। কিন্তু এখন তার সম্ভাবনা দিন দিন কমে আসচে—কারণ অন্যত্রও সবখানেই কেরাণী তৈয়ারীর কারখানা ইতিমধ্যেই চালু হয়েচে—যদিও সেই পরিমাণ "অফিস" তৈরী হয়নি বা হ'তে পারে না। সুতরাং বাঙালীর কিছু অংশ যদি সেনা-বিভাগ, পুলিস, কারখানা ইত্যাদিতে কায়িক শ্রমের কাজে যোগদান না করে, তাহলে তার অর্থনীতিতে বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য। ইহুদীদের মতোই তাকে শৈবাল-দলের মতো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং পরিণামে বাঙালীর পরম আদরের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বপ্ন ছাড়তে হবে। কারণ সবল ও সুস্থ অর্থ-নৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে জন্মভূমিতে একত্রিত বাস করলেই মাতৃভাষার মাধ্যমেই একটি জাতির সংস্কৃতিগত উত্থান হয়। বাঙালী যদি সত্যই তার নিজ ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসে তাহলে তাকে শ্রমবিমুখতা ত্যাগ করে সমাজ-জীবন-নির্বাহে আবশ্যক ছোট-বড়ো সকল কাজেরই (অন্ততঃ কিছু পরিমাণে) যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বিশেষতঃ

আজকের পৃথিবীতে শ্রমিকেরই জয়যাত্রা। শ্রমিকই ধন-উৎপাদনকারী। কেবল মাথা খাটিয়ে শ্রমিক খাটিয়ে নিয়ে নিজের সুখ-সুবিধা করবার দিন চলে গেছে। ভারত-গভর্ণমেণ্টও নীতির দিক হ'তে শ্রমিকের অবস্থার ক্রমিক উন্নতি-সাধনের প্রয়াসী। এটাই তো ন্যায্য ও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর দেশে এই রকম ব্যবহারই আশা করা যায়। একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে হলে বাঙালীকে কেবল তথাকথিত ভদ্রলোক হলেই চলবে না। তার দেহকে সবল ও শ্রম-সহিষ্ণু করতে হবে এবং তার মনে শ্রমের আসন বরণীয় করে তুলতে হবে।

এখন আমরা বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতির কথা বিচার করবো। যে-ভাষা বাঙালীর গর্ব এবং যে সংস্কৃতি তার বৈশিষ্ট্য, তাকে বাঁচাতে হলে বাঙালীকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে চলবে না। কোলকাতায় কয়েকজন, ভাগলপুরে দু'একজন, আর দিল্লীতে দেড়জন এই রকম সাহিত্যিকদের মাধ্যমে কোনও একটি ভাষা ও সংস্কৃতির বিশেষ উন্নতি-সাধন হ'তে পারে না। বৎসরে একবার মহা আড়ম্বরে কোথাও সভা করে বাঙালীর গুণ-কীর্তন করলেও কোন ফল হবে না। এখানে ওখানে দুয়েকটি করে প্রতিভার আবির্ভাবেও বিশেষ কাজ এগোয় না। স্বজাতি ও স্বদেশের সঙ্গে জাতির একতা ও একাত্মতা—অর্থাৎ স্বকীয়তায় বিশিষ্ট একটি প্রাণধর্মতা যা একটি পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়—সেই স্বকীয়তায় বিশিষ্ট প্রাণ-ধর্মতা উজ্জল না থাকলে জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি আশ্বিনের ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘের মতো আকাশে কখন বিলীন হয়ে যায় তা কে জানে! পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত একাধিক। "রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ!" বলে করুণ আর্তনাদ করে কোনও ফলই হবে না—যদি রবীন্দ্রনাথ যে দেশের কবি, যে অনন্ত রহস্য ও সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি, তার অজস্র নদ-নদী, মেঘভার সুশ্যাম বনরাজি, আকুল বিহ্বল পুষ্পগন্ধ, বিচিত্র পাখী-কূজনের বৈতালিক আর অপূর্ব রূপে রসে ভরা প্রভাত সন্ধ্যা নিয়ে, তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েচে—সর্বোপরি যে দেশের বিশিষ্ট ভাবধারাটি তাঁর কাব্যে প্রাণবান হয়ে উঠেছে—সেই সমস্তকেই আমরা "আমাদের" বলে সমস্ত হৃদয় দিয়ে গ্রহণ না করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃই ইতিহাসের পণ্ডিতদের বা ভাষাবিদ্দের গবেষণার বিষয় যেন না হয়ে পড়েন। বাঙালী তার দেশকে ও ভাবধারাকে মায়ের মতো আপন করে ভালবাসতে পারছে কিনা—সেই পরীক্ষাই করছেন আজ বিধাতা। বিস্মৃতির অভিশাপ বারে বারে বাঙালীর জাতীয় জীবনকে ম্লান করে দিয়েচে। আমাদের সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন-সম্বন্ধে বিস্মৃতি টুটে চেতনা আসলো জার্মান ও ইংরাজ গবেষকদের মারফতে। ভয় হয়—হয়তো কোনো এক সুদূর ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের ওপর শ্রেষ্ঠ Authority (জ্ঞানী) হবেন কোনও অবাঙালী পণ্ডিত। ভারতবাসীর ম্যাক্সমূলার সম্বন্ধে অবজ্ঞার মতোই সেদিন বাঙালীর ঐ অবাঙালী পণ্ডিতের দু এক স্থান বাংলা কথার অর্থ ও উচ্চারণে ভ্রম আবিষ্কার করেই সান্ত্বনা-লাভ করতে হবে।

আমাদের মূল বক্তব্য হলো—বাঙালীকে আরও আত্ম-সচেতন এবং সংহত হতে হবে—যদি সে মনে করে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতি-সাধনই তার জীবনের চরম লক্ষ্য। বাস্তবিকই ব্যক্তি-জীবনের সার্থকতা তার সমষ্টির সংস্কৃতি-গত উৎকর্ষে। কেবল খেয়ে-পরে ভালো থাকলেই হলো না। কোনও একটি অতিব্যক্তিক আদর্শে নিজকে সমাপত করে, আপনার বৃহৎ ব্যক্তিত্বকে আবিষ্কার করাই জীবনের লক্ষ্য ও আনন্দ। এই সমষ্টিগত মহাজীবনের ঐক্য সূত্র হলো ভাষা, এবং এই ভাষার মাধ্যমেই সেই বিশেষ সাহিত্য। সাহিত্য অর্থ—যা মানুষে মানুষে যোগ-সাধন করে। ভাষার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য দুই এইখানে। বিশ্ব-জগতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মানুষই পৃথিবীর নাগরিক। অতএব বাঙালীর পক্ষে সেদিক হ'তে ইংরাজী ও হিন্দীর অনুশীলন করা একান্তই প্রয়োজন। বিশ্ব-মানবীয় মনকে আপনার মনে প্রতিফলিত করতে পারায় যে আত্ম-সম্প্রসারণের তৃপ্তি-লাভ হয়—তা অবর্ণনীয় এবং উপযোগিতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু পরভাষা কখনই ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিজ সত্তার গভীরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না (সাধারণ হিসাবে)। কারণ অপরের ভাব ও ভাবনা কখনই পর-ভাষার মাধ্যমে আপনার করে নেয়া যায় না। এ প্রচেষ্টার অধিকাংশই ভাবানুকরণ ও ভাব-বিলাসে পর্যবসিত হয়। ব্যক্তি তার মাতৃভাষার মাধ্যমেই সমষ্টির সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করতে

পারে এবং ঐ-পথেই আপন সত্য ও বৃহৎ আত্মাকে লাভ করতে পারে। সুতরাং আপন মাতৃভাষাকে পুষ্ট করে তার সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতি-সাধন করা প্রত্যেকেরই পরম কর্তব্য। যাঁরা আমাদের গৌরবময়ী বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যকে পুষ্ট করে আমাদের জন্য মূলধন গচ্ছিত রেখে গেছেন—তাঁদের সেই অমূল্য সম্পদ নষ্ট করা নিতান্তই অ-কৃতজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান সকল দিক হতেই সাবধানে চিন্তা করে আজ বাঙালীকে তার ভাষা ও সাহিত্যের সংরক্ষণ এবং উন্নতি-বিধানের অনুকূল পার্থিব পৃষ্ঠভূমি তৈয়ারী করতে হবে। এর জন্যে কারুর সঙ্গে বিবাদের প্রয়োজন হবে না। বাঙালীকে আজ নিজের দোষ ত্রুটি দুর্বলতা খুঁজে বার করে তার প্রতীকার করতে হবে। একথা একবারও ভুললে চলবে না যে—আজ যে-আত্ম-সচেতনা বাঙালীর মধ্যে স্ফুরিত হচ্ছে—তার শত বিপর্যয় সত্ত্বেও সে যে আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি-হিসাবে শ্রদ্ধা পাচ্ছে—এ কেবল তার ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্যেই। এই ভাষা ও সাহিত্যই আমাদের রাখী-বন্ধনে মিলিয়ে রেখেছে—শত অন্ধকারেও আশার দীপ জেলে দিয়েছে। আজ বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নামেই আমরা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছি এক সঙ্গে। বাংলা-ভাষাকে দুর্বল করার গুপ্ত ও স্পষ্ট সকল কারণই পর্য্যবেক্ষণ করে প্রতীকার করতে হবে আর দৃঢ় করে তাকে বাঁচাতে হবে—তাতে কেবল বাঙালীই নয় সারা ভারতবর্ষও উদ্বোধিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামী প্রত্যেক বাঙালী ভারতকেই মাতৃরূপে দেখেছেন—আর সেই ভারত মাতাকে তাঁরা আপন বঙ্গমাতার মাধ্যমেই চিনেছেন। ভারতের প্রত্যেক ভাষা-ভাষীরই কর্তব্য তার নিজের ভাষার সেবা করা এবং সেই সেবার মধ্য দিয়েই ভারতের বৃহৎ আত্মার সন্ধান ও পুষ্টি করা।

কেক তৈরীর কথা

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় বি-এ

কেক্ তৈরী করবার আগে কতকগুলি নিয়ম মনে রাখতে হবে। যদি ফল ব্যবহার করেন, তাহলে প্রথমে পরিষ্কার করে নেবেন, আর প্রয়োজন হলে জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে তারপর ব্যবহার করবেন। কেক্ করবার সময় খুব ভাল করে ফেটাবেন, তাহলে হাওয়া বেশী ঢুকবে, আর কেকও ভাল ভাবে ফুলবে।

*প্রণালী—মাখন আর চিনি খুব করে ফেটান (একটি কাঁটা দিয়ে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সাদা হয়ে যায়—আর অনেকটা ক্ষীরের মত দেখায়। এবার ডিমকেও ফেটিয়ে এর সঙ্গে মিশিয়ে দিন—তবে অল্প অল্প করে। যখন অল্প করে মেশাবেন তখন সেটি আবার ভালভাবে ফেটিয়ে নিয়ে তবে দেবেন। প্রত্যেক বার ডিম মিশানোর আগে আর একবার করে ফেটিয়ে নেবেন। এবার গন্ধদ্রব্য দিতে পারেন, যেমন ভেনিলা, গোলাপজল প্রভৃতি। এখন ময়দা, নুন, বেকিং পাউডার (অথবা বাইকার্বনেট অব্ সোডা, আর ক্রীম্ অব্ টার্টার) একটি বড় ছাঁকনিতে একটু খানি করে দু'তিন বার দিয়ে ছেঁকে নিন। এভাবে জিনিসগুলি পরিষ্কার হয় আর হাওয়াও লাগে। এবার এদের ডিম মিশানো জিনিসগুলিতে একটু করে ঢালুন, আর সেই সঙ্গে চামচ বা কাঁটা দিয়ে আস্তে আস্তে মিশিয়ে দিন। ময়দা মিশানোর পর কখনোও কেক্ বেশী ফেটাবেন না, কেননা তাহলে ভারি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। এবার ফল, বাদাম প্রভৃতি দিয়ে বেশ ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। যদি দেখেন যে এই মিশানো জিনিষগুলি খুব আঁট বা শক্ত হয়ে গেছে, তাহলে অল্প

একটু দুধ মিশিয়ে দেবেন, যাতে এগুলি চামচে দিয়ে সহজ ভাবেই গড়িয়ে পড়তে পারে। কেক্ রান্না হয়ে গেছে কি না পরীক্ষা করবার জন্যে একটি ছুরি কেকটির ভেতর ঢুকিয়ে দেবেন। যদি তৈরী হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ছুরিটি পরিষ্কার আর সহজ ভাবেই বেরিয়ে আসবে।

খেজুরের কেক

উপকরণ—২ কাপ ছোটো ছোটো টুকরো করা খেজুর আর আখরোট, ময়দা আধপোয়া, গলানো মাখন (৩ টেবল্‌স্পুন), ৩টি ডিম, চায়ের চামচের ½ চামচে নুন, চায়ের চামচের ১ চামচ বেকিং পাউডার আর চিনি এক পোয়া।

প্রণালী—ডিমগুলিকে ভেঙ্গে একটি পাত্রে রাখুন, কিন্তু এখন ফেটাবেন না, আগে চিনি দিন তার পর বেশ ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এবার একটি অন্য পাত্রে ছাঁকনিতে ময়দা, বেকিং পাউডার আর নুন ছেঁকে নিয়ে মাখনের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এই জিনিসগুলি এবার ডিমের পাত্রতে ঢেলে দিয়ে বেশ ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার খেজুর আর আখরোট মিশিয়ে দিয়ে সমস্ত জিনিসটি একটি মাখন-মাখানো নিচু-গোচের টিনে ঢেলে দিন। এখন এটিকে দমে বসিয়ে রাখুন। কেক্ কিছুক্ষণ পরে ফুলে উঠিলে আর বাদামি রঙ হলে নামিয়ে রাখুন। ঠাণ্ডা হলে কেটে পরিবেশন করুন।

কিস্‌মিসের কেক্-বিস্কুট

উপকরণ—এক ছটাক মাখন, এক পোয়া ময়দা, বেকিং পাউডার ছোটো চামচের এক চামচ, আধ পোয়া চিনি, ১টি ডিম আর একটু দুধ।

ভেতরে দেবার জন্যে প্রয়োজন হবে ১ ছটাক কিস্‌মিস্, কিছু আখরোটের ছোটো ছোটো টুকরো, আর ১টি পাতি লেবুর রস।

প্রণালী—কেক তৈরী সম্বন্ধে লিখিতে গিয়ে প্রথমেই যে প্রণালী * দিয়েছি সেই ভাবে এর উপকরণগুলি মিশিয়ে নিন। ময়দা প্রভৃতি দেবার পর একটু দুধ মিশিয়ে নেবেন, যাতে বেশ শক্ত আটার মত হয়। এবার আর একটি পাত্রে আখরোট, কিস্‌মিস্ আর লেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এখন ছোটো ছোটো লেচি করুন এই ময়দা থেকে লুচির মত একটি গোল করে বেলে, ভেতরে কিস্‌মিসের যে পুর তৈরী কোরেছেন তাই দিন। এবার আর একটি লুচির মত বেলে তার ওপরে দিয়ে দিন। ভাল করে হাত দিয়ে চেপে ধারগুলি ঠিকঠাক করে নিন। ডিমের একটু হলদে নিয়ে ওপরে পাতলা করে লাগিয়ে দিন। মাখন বা ঘি মাখানো থালায় রেখে দমে বসান।

মন এক পাখি

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বসন্তের দিন গেল ফাল্গুনের বন ছেড়ে দূরে
চৈত্রের চৈতালী ফেলে, গাছেরই ফুলের নূপুরে
নেচে নেচে মলয়ার মধুকরী মালঞ্চবিহারী
দক্ষিণের ঘ্রাণ আসে মাঝে মাঝে তবু আকাঙ্ক্ষারই।

ঘাস ঝরা গ্রীষ্মের উত্তাপে বুঝি বাস্তব জীবন
এখানে কঠিন কর্ম ইঁট কাঠ পাথরের ধন,
ধোঁয়াটে আকাশে ফেরা সে ব্যস্তবাগীশ বড় জানি
আত্মকর্মে সুখের স্বপ্নালু চোখে কি কথা সন্ধানি!

ফুল গেছে হারায়ে বিষণ্ণ ক্ষেতে আঘ্রাণের গন্ধ
রেখে ঘ্রাণে
আবার নতুন ফুল চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিতে প্রাণে,
চেয়ে চেয়ে প্রতীক্ষার দিন আর রাত্রি যায় বৃথা;
অজান্তে কখন লেখা হয়ে যায় প্রেমের কবিতা।

বসন্ত ঋতুকে চেয়ে মন চাই, তাই মনে রাখি
অজস্র আশার ভিড়ে ভীরু মন যেন এক পাখি;
নিজের পালক চিরে প্রাণটুকু ধরে রাখে শুধু
উড়ে যায় আনন্দের আকাশেই মাঠ ছেড়ে ধুধু।

পাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' উপন্যাসটিকে রূপান্তরিত করেন। নাটকের বিষয়বস্তু সামান্য। কিন্তু নাটকীয় বিন্যাসে ইহা অদ্বিতীয়। নাটকটি হাল্কা রসাশ্রিত হইলেও মার্জ্জিত রস-পরিবেশনে ইহার যে কৌলিন্য আছে তাহা উৎসমুখে নাটকীয় চরিত্রগুলি উৎসারিত হইয়াছে। এক সময় নাটকটি ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। স্বর্গতঃ অপরেশচন্দ্র নাটকটি পরিচালনা করেন এবং স্বয়ং রসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বিদ্বজ্জনসমাজকে সেই সময় কবিগুরুর এই অভিনব সৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। কবিগুরুর এই নাটকটি বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। বাংলা নাটকের চিরাচরিত ধারা হইতে 'চিরকুমার সভা' সম্পূর্ণ অভিনব। এই অভিনব কাহিনীকে চিত্ররূপায়িত বড় সহজ কথা নহে। প্রবীণ

রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' কথাচিত্রে নীরবালার ভূমিকায় তপতী ঘোষ
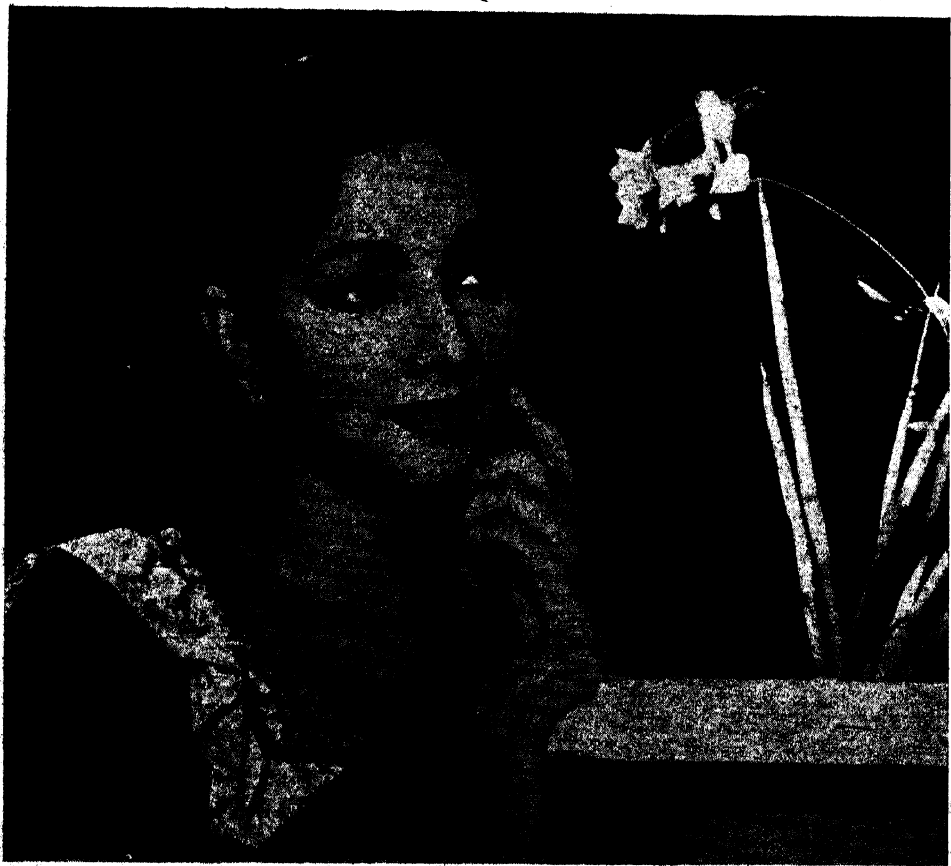
সংলাপে ও নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অভিনব। পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসু আলোচ্য কাহিনীর চিত্র-রসিক হলেন নাটকের প্রধানতম রসবেত্তা ও রসস্রষ্টা। যাঁহার নাট্য রচনায় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যাহার ফলে

গল্পের গতিবেগ ও পারস্পরিক ঘটনা কোথাও ব্যাহত হয় নাই। চিত্র ও শব্দগ্রহণ সুষ্ঠু। মঞ্চাভিনয়' কালীন অভিনয় ক্ষেত্রে যেটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল চিত্রাভিনয়ে তাহা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া পরিবেশ সৃষ্টির অনবদ্য কৌশলে দেবকীকুমারের পাকা হাতের ছাপ সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। নাটকে সংযোজিত গান অপেক্ষা চিত্র-নাট্যে রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি গান সংযোজিত হওয়ায় ছবিটি অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সুর-শিল্পী শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত সুরের মায়াজালে সকলকে মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ছায়া-ছবির মাধ্যমে আর্থিক আগমই একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। দর্শকের রুচিকে উন্নত করাও শিল্পের অন্যতম কর্ত্তব্য। দিলীপ পিক্‌চার্স সে কর্ত্তব্য পালন করায় তাঁহারা দর্শক সাধারণের অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। অভিনয়ের দিক দিয়া সকলের অভিনয়ই চরিত্রানুগ হইয়াছে। রসিকের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় দেখিয়া বার বার স্বর্গতঃ অপরেশচন্দ্রের কথাই মনে হইয়াছে। অহীন্দ্র চৌধুরীর মঞ্চের চন্দ্রবাবু অপেক্ষা চিত্রাভিনয়ের চন্দ্রবাবু অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বজন-আদৃত নাটকের চিত্ররূপ দেখিতে দেখিতে তাঁর সেই কবিতাটাই বার বার মনে হইয়াছে—"যে পারে, সে আপনি পারে, পারে সে ফুলে ফোটাতে"। একথা একমাত্র দেবকীকুমার সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

* * *

পাকিস্থানে কাঁচা ফিল্মের অভাব বিশেষ' ভাবে দেখা দেওয়ায়, পাকিস্থান সরকার সেই অভাব দূরীকরণার্থে ফিল্ম-নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করার জন্য একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

নিখিল ভারত ফিল্ম ফেডারেশনের কার্য্যকরী সমিতি তাঁহাদের বার্ষিক সাধারণ সভায় যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে গভীর ক্ষোভের সহিত বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার ফিল্মের উপর বহুবিধ নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করিতেছেন বটে কিন্তু এই শিল্প সংক্রান্ত বহুবিধ সমস্যার প্রতি তাঁহারা বিশেষ কোন উৎসাহ দেখাইতেছেন না। জাতিগঠনের কাজে এই শিল্পকে লাগানর যে সুযোগ আছে তাহার প্রতিও সরকারের তৎপরতার অভাব। ফিল্ম ফেডারেশনের ক্ষোভের হয়ত কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা বলি, অকারণ ক্ষোভ ত্যাগ করিয়া ফিল্ম শিল্পকে যে কোন সহৃদয় প্রযোজকও ত কাজে লাগাইতে পারেন।

* * *

কলিকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্রের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মার্চ্চ মাসে

	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬
হিন্দী এবং অন্যান্য ছবি	১১	১২	৫	৭	৯	১২
বাংলা ছবি	৫	৩	৩	৪	৩	৬
	১৬	১৫	৮	১১	১২	১৮

মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত

	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬
হিন্দী এবং অন্যান্য ছবি	২৫	২৭	২৬	২৩	[illegible]	২৯
বাংলা ছবি	১৩	১৩	১১	১৩	[illegible]	১৩
	৩৮	৪০	৩৭	৩৬	৩৬	৪২

উপরোক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্রের সংখ্যানুপাত হইতে চিত্র-শিল্পের প্রসার সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়। এমতাবস্থায় শিল্পপতিদের জাতিগঠনমূলক ছবি তোলার দিকে যত্নবান হওয়া উচিত। কেন না, যে চিত্র-শিল্প এতকাল সাধারণের নিকট নিন্দিত হইয়া আসিয়াছে, আজ তাহাকে দেশ-জাতি ও সমাজের সম্মুখে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিবার সুসময় আসিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম ভারতের শ্রেষ্ঠ দান—

সিংহলের প্রধান বৌদ্ধ ভিক্ষু ৮৩ বৎসরবয়স্ক মহানায়ক মহাথেরার কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে গত ২৯শে এপ্রিল তাঁহাকে কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটীতে এক উৎসবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধ-জয়ন্তী সমিতির সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে চীন, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্ম, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, নেপাল ও বাংলা দেশের প্রতিনিধিরা মহাথেরাকে পুষ্পার্ঘ্য দান করেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে মহাথেরা বলেন—বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। কোন রাজনীতিই ভারত ও সিংহলের প্রাচীন ও দৃঢ় সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিবে না। মহানায়ক মহাথেরা ভারতের বৌদ্ধ তীর্থগুলি দেখিতে আসিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি মন্দির—

কলিকাতা নিমতলা শ্মশানঘাটে যে স্থানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহ ভস্মীভূত করা হয়, তথায় একটি স্মৃতি মন্দির নির্মাণের জন্য রবীন্দ্র-ভারতী হইতে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় রবীন্দ্র-ভারতীর সভাপতি। গঙ্গার ভাঙ্গনে নিমতলা ঘাটের ঐ অংশ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—সে জন্য পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য কলিকাতার মেয়রের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী ঐ স্মৃতি মন্দির নির্মাণের জন্য রবীন্দ্র-ভারতীকে গত ২৮শে এপ্রিল ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দেহও নিকটস্থ একটি স্থানে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত সেখানেও কোন স্মৃতি মন্দির নির্মিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের মত ব্যক্তির স্মৃতি মন্দির নির্মাণে এত বিলম্ব হওয়া জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।

উপনির্বাচন—

মেদিনীপুর জেলার খেজুরী কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত বিধান সভার সদস্য কৌস্তুভকান্তি করণ পরলোকগমন করায় তথায় উপ-নির্বাচন হয়। গত ২৬শে এপ্রিল তাহার ফল প্রকাশিত হইলে জানা যায়—প্রজা সোসালিষ্ট দলের প্রার্থী শ্রীলালবিহারী দাস ৪১৪৪৯ ভোট পাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। কংগ্রেস-প্রার্থী শ্রীভিখারীচরণ মণ্ডল মাত্র ২১৬৫৭ ভোট পাইয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় প্রচার—

প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগ এ রাজ্যে সমবায় নীতি প্রচার ও প্রসারের জন্য ১৮ জন নির্বাচিত ও ৯ জন মনোনীত সদস্য লইয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের পরিচালক বোর্ড গঠন করিয়াছেন। পরিচালক বোর্ডের প্রথম সভায় শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি, শ্রীতারাপদ চৌধুরী সহ-সভাপতি ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। গত ২৮শে এপ্রিল ব্যারিষ্টার শ্রীজে-সি গুপ্তের গৃহে বোর্ডের ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় নূতন কর্মপদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। গত ৩রা মে বোর্ডের ৪ জন প্রতিনিধি সমবায় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বোর্ডের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ঐ সময় তথায় প্রচার ও গণসংযোগ বিভাগের রাজ্যমন্ত্রী শ্রীগোপিকাবিলাস সেন উপস্থিত ছিলেন—তিনিও বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। দেশের সমবায় সমিতিসমূহকে সকল প্রকার সাহায্য ও পরামর্শাদির জন্য বোর্ডের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

মন্ত্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু—

পশ্চিমবঙ্গের বিচার ও রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু গত ২রা মে মুর্শিদাবাদ হইতে মোটরে কলিকাতা আসার পথে বেলা ২টায় পলাশীর নিকট মোটর দুর্ঘটনায় আহত হন—৩রা মে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় বহরমপুর হাসপাতালে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯০৩ সালে তাঁহার জন্ম হয়—তাঁহার পিতা ব্রহ্মদেশে সিভিল সার্জেন ছিলেন। তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতায় সাফল্যের সহিত ব্যারিষ্টারী করিতেন—১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সাফল্যের সহিত দুইটি প্রয়োজনীয় বিভাগের কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। তিনি অমায়িক ও সহজ সরল ব্যবহারের জন্য সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক অকালমৃত্যুতে দেশবাসীর বিরাট ক্ষতি হইল।

পূর্ণচন্দ্র দাস—

বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাস গত ৪ঠা মে শুক্রবার দ্বিপ্রহরে দক্ষিণ কলিকাতার রাসবিহারী এভেনিউর উপর জনৈক অজ্ঞাতনামা আততায়ীর ছুরিতে নিহত হইয়াছেন। পূর্ণবাবুর সহিত একটি ১৮ বৎসরের যুবক ছিল—সে আততায়ীকে বাধা দিতে যাইয়া আহত

হয়। পূর্ণবাবু দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বোর্ডের অন্যতম সদস্যরূপে কাজ করিতেছিলেন। মৃত্যুকালে পূর্ণবাবুর বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের লোক। স্কুলের ছাত্ররূপে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। তিনি জীবনের প্রায় ৩০ বৎসরকাল জেলের মধ্যে কালযাপন করেন ১৯১০ সালে তিনি প্রথম ধৃত হন এবং সর্বশেষ ১৯৪০ সালে ধৃত হইয়া স্বাধীনতা লাভের সময় মুক্তি লাভ করেন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়াছেন। পরিণতবয়সে এই ভাবে তাঁহার মৃত্যু—সকলকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিহার-সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহার—

গত ৩রা মে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দিল্লী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ভারত সরকারকেও তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়া দেন। ডাক্তার রায় বলেন—উত্তর পশ্চিম কলিকাতা কেন্দ্র হইতে সংসদ সদস্য উপ-নির্বাচনে জনসাধারণের যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইয়াই তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তৎপূর্বে তিনি রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন। গত ২৪শে জানুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বঙ্গ-বিহার মিলন প্রস্তাব প্রথম ঘোষিত হয়, তাহার পর তিন মাসেরও অধিককাল ঐ প্রস্তাব লইয়া নানাবিধ আলোচনা হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার রায় খাজুরী ও উত্তর পশ্চিম কলিকাতার নির্বাচনের ফল দেখিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সম্মত হইয়াছেন।

বিহারের অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তর—

গত ২৩শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর কার্যকরী সমিতির এক সভায় নিম্নলিখিত রূপ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে—পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সম্মিলন সম্পর্কিত প্রস্তাব বিষয়ে এ যাবৎ যে অগ্রগতি হইয়াছে এই সভা তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে বাংলা ও বিহারের সম্মিলন সম্পর্কে প্রস্তাবের অর্থ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের পৃথক সত্তা অব্যাহত রাখা এবং পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা করা। বিহারের যে অঞ্চল ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তর করার কথা, তাহা অবিলম্বে হস্তান্তরিত হওয়া কর্তব্য এবং বাংলা ও বিহারকে পুনর্গঠন জন্য বিহার হইতে উক্ত অঞ্চল বাংলায় সেইরূপ ভাবে হস্তান্তর ব্যবস্থা সম্বলিত একটি বিল সংসদে উপস্থিত করা কর্তব্য। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গে মতভেদ নাই যে মানভূম জেলার ও কিষণগঞ্জ মহকুমার যে অংশ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নির্দেশ ও ভারত সরকারের ব্যবস্থা মত পশ্চিমবঙ্গের পাওয়া উচিত, তাহা অবিলম্বে আইন দ্বারা পশ্চিমবঙ্গকে প্রদান করা হউক।

কলিকাতার মেয়র নির্বাচন—

গত ২৩শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কলিকাতায় নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ ও ডাক্তার শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় পূর্ব বৎসরে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র ছিলেন—এবারও অধিক ভোট পাইয়া তাঁহারা মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অনিবার্য কারণ বশতঃ এ সংখ্যায় মনোজ বসুর ধারাবাহিক উপন্যাস বৃষ্টি বৃষ্টি বন্ধ রহিল। আগামী সংখ্যা হইতে যথারীতি চলিবে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

হকি লীগ ঃ

১৯৫৬ সালের ক্যালকাটা হকি লীগের ১ম বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। মোট ১৮টা খেলার মধ্যে মোহনবাগান ১৬টা খেলায় জয়ী হ'য়ে এবং ১টা ড্র ক'রে (অরোরার সঙ্গে ০-০ গোলে) লীগ চ্যাম্পিয়ান-সীপ পেয়ে যায়। শেষ খেলা ছিল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ; কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিং খেলায় যোগদান না করায় মোহনবাগান ওয়াক-ওভার পায়। ইতিপূর্ব্বে মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৩৫, ১৯৫১, ১৯৫২ এবং ১৯৫৫ সালে। এই নিয়ে মোহনবাগান পাঁচবার হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল।

আলোচ্য বছরের লীগ খেলায় মোহনবাগান মোট ৪৬টি গোল দেয় এবং মাত্র ২টি গোল খায় (রেঞ্জার্স এবং পাঞ্জাব স্পোর্টসের কাছে)। মোহনবাগান দলের ধরমপাল সিং ১৮টি গোল দিয়ে (একটি হ্যাট-ট্রীকসহ) লীগ প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাধিক গোল দেওয়ার সম্মান লাভ করেন।

মোহনবাগানের লীগ-বিজয় : জয় (১৭) এরিয়ান্সকে ২-০, রেঞ্জার্সকে ৩-১, ডালহৌসীকে ৩-০, পুলিশকে ১-০, জেভেরিয়ান্সকে ২-০, গ্রীয়ারকে ৫-০, মেসারার্সকে ৫-০, আর্মড পুলিশকে ৪-০, ওয়াড়ীকে ৩-০, ইস্টবেঙ্গলকে ১-০, আর্মেনিয়ান্সকে ৩-০, বি. জি. প্রেসকে ২-০, পোর্ট-কমিশনার্সকে ১-০, ভবানীপুরকে ৩-০, কাষ্টমসকে ৪-০, পাঞ্জাব স্পোর্টসকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে এবং মহমেডান দলের বিপক্ষে ওয়াক-ওভার পায়।

ড্র (১) : অরোরার সঙ্গে ০-০ গোলে।

ভবানীপুর ক্লাব রানার্স-আপ লাভ করেছে।

প্রথম বিভাগ থেকে ২য় বিভাগে নেমেছে অরোরা এবং ডালহৌসী।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা
(উপরের তিনটি ক্লাব)

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	১৮	১৭	১	০	৪৬	২	৩৫
ভবানীপুর	১৮	১৪	৩	১	২৬	৭	৩১
মহমেডান স্পোর্টিং	১৮	১৩	২	৩	৩৭	৭	২৮

বাইটন কাপ হকি ঃ

১৯৫৬ সালের কাপ ফাইনালে সার্ভিসেস হকেট্স দল প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান ক'রে ৩-১ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করে।

সার্ভিসেস হকেট্স ৬-১ গোলে কাষ্টমসকে, ৩-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে এবং ২-০ গোলে ওয়েষ্টার্ণ রেলদলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। মোহনবাগান ২-০ গোলে ঝাড়খণ্ডকে, ১-০ গোলে টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে এবং ১-০ গোলে ইউ পি একাদশকে হারিয়ে ফাইনালে যায়। সার্ভিসেস দলের পক্ষে গোল করেন গুরমাইল সিং ২ এবং হরদয়াল সিং ১। মোহনবাগানের পক্ষে গোল দেন পোয়ারা সিং।

পূর্ব্ববর্তী ফলাফল
(১৯৪৮ সাল থেকে)

১৯৪৮—উত্তরপ্রদেশ এবং পোর্ট কমিশনার্সের খেলা ১-১ গোলে ড্র।—যুগ্মবিজয়ী।

১৯৪৯—টাটা স্পোর্টস ক্লাব ২-১ গোলে পাঞ্জাব স্পোর্টসকে পরাজিত করে।

১৯৫০—টাটা স্পোর্টস ক্লাব ২-০ গোলে লুসিটা-নিয়ান্সকে পরাজিত করে।

১৯৫১—বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট ২-১ গোলে লাহোরের বাটা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে।

১৯৫২—মোহনবাগান ২-১ গোলে বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ার-ক্রাফটকে পরাজিত করে।

১৯৫৩—টাটা স্পোর্টস ক্লাব ২-১ গোলে নাগপুর ইউনাইটেডকে পরাজিত করে।

১৯৫৪—টাটা স্পোর্টস ক্লাব ১-০ গোলে ওয়েষ্টার্ণ রেলকে পরাজিত করে।

১৯৫৫—উত্তরপ্রদেশ একাদশ এবং ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের খেলা ০-০ গোলে ড্র।—যুগ্মবিজয়ী।

গোল্ড কাপ হকি ঃ

বোম্বাইয়ের গোল্ড কাপ হকি টুর্ণামেণ্টের ২য় দিনের ফাইনালে আফগান স্পোর্টস ক্লাব (ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান) ১-০ গোলে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দলকে (বোম্বাই) পরাজিত করে। দশ হাজার টাকা মূল্যের এই কাপটি বিজয়ী আফগান দল সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। কারণ দাতার সর্ত্ত অনুসারে কাপটি ভারতবর্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

সি. এ. বি. ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট ঃ

ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল তাদের নক্-আউট ক্রিকেট টুর্ণামেণ্টে মোহনবাগান এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবকে যুগ্মভাবে এ বছরের বিজয়ী ঘোষণা করেছে। ফাইনাল খেলাটি ২৮শে এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়নি। এপ্রিল মাসের কাঠফাটা রোদ ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত নয় জানিয়ে মোহনবাগান ক্লাব ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কাছে এক আবেদন পেশ করেন। এই আবেদনে খেলাটি দার্জ্জিলিংয়ে স্থানান্তরিত করার জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং মোহনবাগান ক্লাব দুই দলেরই যাতায়াত, বাসস্থান এবং খাইখরচার মোটা অংশ বহন করতে প্রস্তুত আছে বলা হয়। কিন্তু সি. এ. বি বড় কুলীন। মরসুমের মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ করতে না পারায় তাদের কৌলিন্য যায় না। কিন্তু মোহনবাগানের বদান্যতায় স্বীকৃতি দিয়ে তারা ছোট হ'তে যাবে কেন! তাই মোহনবাগান ক্লাবের প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য ক'রে দিয়েছে।

দুরপ্রাচ্য সফরে মোহনবাগান ফুটবল দল ঃ

খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় করুণা ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে মোহনবাগান ক্লাব দূরপ্রাচ্যের দেশ—ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং হংকং সফরে যায়। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের অধিনায়কত্বে ভারতীয় ফুটবলদল ১৯৩৫ সালে অষ্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল। হংকং একাদশ দলকে ৬-২ গোলে মোহনবাগান পরাজিত ক'রে ঘরে-বাইরে ভারতীয় ফুটবল খেলার মুখ রক্ষা করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ২য় এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় যে হংকং দল চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রেছিল প্রায় সেই দলটিই মোহনবাগানের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। ১৯৫১ এবং ১৯৫৪ সালে দূরপ্রাচ্য সফরকারী ভারতীয় ফুটবল দল এই হংকং শহরের ফুটবল দলের কাছেই পরাজিত হয়েছিল। সুতরাং মোহনবাগান ক্লাবের এ জয়লাভ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দূরপ্রাচ্য সফরে মোহনবাগান ক্লাব ১২টি খেলায় যোগদান করে—ইন্দোনেশিয়াতে ৬টি, সিঙ্গাপুরে ৩টি এবং হংকংয়ে ৩টি। মোহনবাগান ৭টি খেলায় জয়লাভ করে, হারে ৩টি এবং ৩টি খেলা ড্র যায়। ১২টি খেলায় মোহনবাগান ৩৬টি গোল (একটি আত্মঘাতি গোল) দেয় এবং ১২টি গোল খায়। দলের সর্ব্বোচ্চ গোলদাতা—কে পাল ৯টি (২টি হ্যাট-ট্রিক)।

কালিকট ফুটবল টুর্ণামেণ্ট ঃ

কালিকটে অনুষ্ঠিত কালিকট ফুটবল টুর্ণামেণ্টের (পি কে নায়ার মেমোরিয়াল গোল্ড ট্রফি) ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৩-২ গোলে হায়দ্রাবাদ ফুটবল এসোসিয়েশন একাদশ দলকে পরাজিত করে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি ৩-৩ গোলে ড্র যায়।

রকি মার্সিয়ানো ঃ

হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান রকি মার্সিয়ানো মুষ্টিযুদ্ধ থেকে অবসর নিয়েছেন।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্সি জো ওয়ালকটকে নক্-আউটে পরাজিত ক'রে রকি মার্সিয়ানো হেভিওয়েট বিভাগে প্রথম বিশ্ব-খেতাব লাভ করেন। তারপর বিশ্ব-খেতাব সম্মান রাখতে তাঁকে ৭টি মুষ্টিযুদ্ধে নামতে হয়েছিল।

এফ এ কাপ ফাইনাল ঃ

ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কাপ (এফ এ কাপ) ফাইনালে ম্যাঞ্চেষ্টার সিটি ৩-১ গোলে বার্মিংহাম সিটি দলকে পরাজিত ক'রে একই বছরে ১ম বিভাগ ফুটবল লীগ এবং এফ এ কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। গত বছর ম্যাঞ্চেষ্টার সিটি রানার্স-আপ হয়। এই নিয়ে তারা তিনবার এফ এ কাপ পেল। পূর্ব্ববর্ত্তী জয়লাভ—১৯০৪ এবং ১৯৩৪ সালে।

সাহিত্য সংবাদ

শাদা পৃথিবী ঃ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যক্ষেত্রে যে স্বল্প কয়জন সাহিত্যিক মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। প্রত্যেকটি কাহিনীর মধ্যে তাঁর একটি নিজস্ব ধারা বর্তমান। বিশেষ করে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাহিনী বিন্যাসের বৈচিত্র্য, পরিবেশ সৃষ্টির অভিনবত্ব, ভাষার কারুকার্য পাঠক চিত্তকে সম্মোহিত করে দেয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি গল্পগ্রন্থ। এতে মোট বারোটি গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই আপনাপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। 'মায়া কানন' গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর কয়েকজন নায়ক নায়িকাকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। 'শাদা পৃথিবী' রচনাটি ঠিক গল্প নয়। লেখক তাঁর নিবেদনে একথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এর মধ্যেও একটা নতুনত্ব বিদ্যমান। 'তক্ত মোরারক' ঐতিহাসিক কাহিনী। ঐতিহাসিক কাহিনী রচনায় শরদিন্দুবাবু সিদ্ধহস্ত। এ ব্যাপারে বর্তমানে তাঁর জুড়ি নেই। সুতরাং এ গল্পটি অপূর্ব। 'বালখিল্য' নামক গল্পটি একটি অদ্ভুত গল্প। এর মধ্যে যথেষ্ট হাস্যরসের মালমশলা আছে। সেই সঙ্গে আছে চিন্তার খোরাক। 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ' গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। মানুষের চাওয়া পাওয়ার কোনো সীমা পরিসীমা নেই, কারণ মন নামক জগৎটি একটি অজ্ঞাত এবং বিশাল জগৎ। সেখান থেকে কখন কি চাহিদা আসে মানুষ তার কিছুই পূর্বমুহূর্তে জানতে পারে না। সেই মন-জগতের একটি পট-উত্তোলন করেছেন শরদিন্দুবাবু এই গল্পটিতে।

শাদা পৃথিবী প্রত্যেক পাঠকের অন্তর জয়ে সমর্থ হবে বলেই মনে করি।

প্রচ্ছদসজ্জা, ছাপা প্রভৃতি চমৎকার।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—৩৲ টাকা] বি. না. চ.

দক্ষিণাপথে ঃ মানদাচরণ সাহা

১৯৫৩ সালের ১৩ই মে থেকে সুরু করে ২৮শে মে পর্য্যন্ত প্রায় একপক্ষ কাল ধ'রে দক্ষিণাপথের বিভিন্ন দেবদেউলের দেশে তিন হাজার পাঁচ শত মাইল পরিক্রমার আলেখ্য আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া গেল। মাদ্রাজকে কেন্দ্র করে চিদম্বরম্, তাঞ্জোর, রামেশ্বরম্ ধনুস্কোটি, মাদুরা, কন্যাকুমারিকা, এরনাকুলাম, নীলগিরি, উটকামণ্ড, মহীশূর, বাঙ্গালোর, কাঞ্চীভেরম্, মহাবলীপুরম্, ভিরুক্কালু কুণ্ড্রম (পক্ষীতীর্থ) প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শনের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হয়েছে, তারই সংক্ষিপ্ত বার্ত্তা প্রবহমান হয়েছে দক্ষিণাপথে। এইসব দিকে আমাদেরও পদচারণার সৌভাগ্য হয়েছিল।

ভ্রমণকাহিনী রচনায় গ্রন্থকারের প্রথম প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ভাষা স্বচ্ছ সরল ও মনোজ্ঞ। তবে এইসব কাহিনী বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক করতে গেলে যে দৃষ্টিভঙ্গী, সাহিত্যিকতা, লেখনশৈলী ও ভাষার পারিপাট্য একান্ত প্রয়োজন, তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। যাহোক্ গ্রন্থে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত প্রাচীন আর্য্য-দ্রাবিড় সভ্যতার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয়, স্থাপত্যশিল্পের ইতিকথা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তথ্য আর অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রূপ চিত্তাকর্ষক হয়েছে। আশা করা যায় পাঠক পাঠিকাদের চিত্তবিনোদন করবে। প্রচ্ছদপট, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই যুগোপযোগী।

[প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।] শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত ও কাহিনী ঃ শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

'সঙ্গীত ও কাহিনী' পড়ে দেখলাম। কাহিনীর দিক দিয়ে একটা অভিনবত্ব আছে। অদর্শবাদ চিরদিনই মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে থাকে—সে দিক দিয়ে, আদর্শবাদী কয়েকটি চরিত্রের সমন্বয়ে এই কাহিনীর মূল্য অনেকখানি। সত্যকিঙ্করবাবু স্বয়ং সঙ্গীতাচার্য্য এবং বাংলার খাঁটি ধ্রুপদী ঘরানার বাহক। তার ওপর, তিনি স্বয়ং কৃতী যন্ত্রশিল্পী। নিজের শিক্ষা, জ্ঞান ও অনুভূতির স্পর্শ দিয়ে তিনি এই গ্রন্থখানিকে সঙ্গীতময় ও রসমধুর করে তুলেছেন।

কাহিনীর মধ্যে যে কয়টি চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে—সন্ন্যাসী মহারাজ, সঙ্গীতসাধক, গুরুদেব, তাঁর সাধ্বীপত্নী, আদরিণী, লক্ষ্মী জমীদার, জমীদার তনয়া, প্রত্যেকেই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সত্যকিঙ্কর-বাবু অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে এই সুন্দর শঙ্গীতার্থী সমবায় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সাধনা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক—সঙ্গীতের বিশুদ্ধ রূপ ও ভাবের মহিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক, এই কামনা করি।

[প্রকাশক : গ্রন্থকার। ২৫ই, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪। দাম—৩।৹ আনা] শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

স্বর্ণগোধূলী ঃ আশা গঙ্গোপাধ্যায়

স্বর্ণগোধূলী একটি গল্পগ্রন্থ। দৃষ্টি, কাঁটাপথ, পনরাবৃত্তি, একক, আকস্মিক, স্বপ্ন সমাধি ও স্বর্ণগোধূলি এই সাতটি গল্প এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। শেষের গল্পের নামেই বইটির নামকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পেই একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ বর্তমান। ভাষা ও গল্পের আঙ্গিক রচনায় লেখিকার দক্ষতা আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে লেখিকার এই প্রথম প্রবেশ নয়। ইতিপূর্বেই নানা পত্র-পত্রিকায় লিখে তিনি পাঠক সমাজে পরিচয় লাভ করেছেন। গ্রন্থ হিসাবে এই তাঁর প্রথম গ্রন্থ। কিন্তু এরই মধ্যে লেখিকার সম্ভাবনার যে ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করা গেল তা অত্যন্ত আশাপ্রদ।

আশা করি বইখানি পাঠক সমাজে আদৃত হবে। ছাপা ও অঙ্গসজ্জা ভালো।

[প্রকাশক : শ্রীতমস বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—২৲ টাকা] শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত